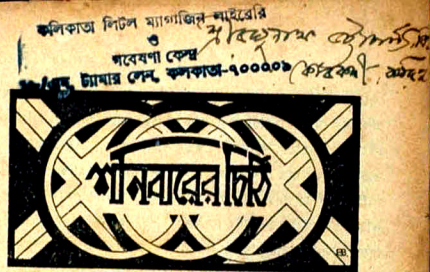


KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABFESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Accession No. KIMLGK 2001	Place of Publication 20/2 (মহানন্দপুর) রোড, কলিকাতা
Collection KIMLGK	Publisher প্রবাসী পত্র
Title কলিকাতা চিঠি	Size 4.5" x 6.5" 11.43 x 16.51 c.m.
Vol. & Number 6/2-32	Year of Publication ফেব্রুয়ারি, ১৯৪২ - অক্টোবর, ১৯৪৩
	Condition : <input checked="" type="checkbox"/> Good
Editor প্রবাসী (সম্পাদক)	Remarks :

C.D. Roll No. KIMLGK	
----------------------	--

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
পবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার সেন, কলিকাতা-৭০০০০৯



৮ম বর্ষ]

কার্তিক, ১৩৪২

[১ম সংখ্যা

নব বর্ষ

পাঠকগণ আমাদের নববর্ষের অভিবাদন গ্রহণ করুন। এই
মাস হইতে শনিবারের চিঠির নববর্ষ এবং অষ্টম বর্ষ আরম্ভ হইল,
এবং সৌভাগ্যবশত পূজার অব্যবহিত পরেই হইল, কাজেই বিজয়ার
অভিবাদনও এই সঙ্গে জানাইতে পারিয়া বড় আশ্রম বোধ করিতেছি।
বিজয়ার পরে বহু বন্ধুকে আলিঙ্গন করিয়াছি; বহুজনকে আলিঙ্গন
করিয়াছি যাহারা বন্ধু নহে; বহু অপরিচিত লোককে আলিঙ্গন
করিয়াছি যাহাদিগকে আলিঙ্গন করা যায় না; এবং পত্রদ্বারা এমন
লোককে আলিঙ্গন জানাইয়াছি যাহাদিগের সঙ্গে দেখা হইবার পর
দৈহিক আলিঙ্গন করিতে পরে সন্দোহ বোধ করিয়াছি।

অথচ বিজয়ার পরে প্রীতিভালবাসা! শ্রদ্ধাভক্তি জানাইবার যতগুলি

লৌকিক রীতি আছে তাহা পালন করিতেই হইবে, এবং হিন্দোষ প্রকাশের যে সব চিত্রাচরিত পদ্ধতি আছে তাহা চাপিয়া রাবিত্তেই হইবে। যাহাকে মারিবার জন্ত তাড়া করিয়া ফিরিতেছিলাম, তাহাকে ধরিবামাত্র দেখা গেল বিজয়া আসিয়া পড়িয়াছে; তৎক্ষণাৎ লাঠিটি ফেলিয়া দিয়া তাহাকে ধরিয়া আলিঙ্গন করিলাম। হে হে করিয়া একটু হাসিতেও হইল। অর্থাৎ শত্রু হাতে পাইয়াও ছাড়িয়া দিতে হইল—আবার ধরিতে পারিব কি না কে জানে। আমাদের পাঠকদের সহিত আমাদের কোনো শত্রুতা নাই; বরঞ্চ পরম মিত্রতা আছে বলিয়াই তাহারা আমাদের পাঠক। এবং মনে হয় বাহারাই পাঠক তাহারা মিত্র।

আনি, আমাদের বার্ষিক গ্রাহকদের মধ্যে কেহ কেহ ভি. পি. ফেরৎ দিয়া আমাদের সম্বল আঘাত দিবেন; কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমরা তাহাদিগকে ভুলিব না। উপরন্তু তাহাদের জন্ত আমাদের মমত্ব-বোধ বেশি হইবে। স্বাস্থ্যের বিচ্ছেদে মর্মে যে বেদনা অশ্রুত হয়, তাহাদের বিচ্ছেদে আমরা সেই বেদনা অশ্রুত করিব। অর্থের বন্ধন ছিন্ন করিয়া বিদায় লইলে সময়ে জীবনটাকেই অর্থহীন বলিয়া বোধ হইবে। অতএব হে ভি. পি. ফেরৎদাতা নিরুদ্র, তোমাকেও আজ অভিবাধন জানাইতেছি; গ্রহণে যত বিলম্ব ঘটুক, গ্রহণ কর।

এই উপলক্ষে আমাদের ভূতপূর্ব এক বন্ধুকে মনে পড়িতেছে। আমরা কোনো সময়ে মহাত্মা গান্ধীর হরিজন আন্দোলন সমর্থন করিতে গিয়া বলিয়াছিলাম, এই আন্দোলনে আমাদের কোনো সহায়ত্ব নাই। মহাত্মাজী যদি বলিতেন আতিভেদ ভুলিয়া দাও, তাহা হইলে

সে কথায় যত মতভেদই হউক তাহাতে তাহার মহাত্মা প্রকট হইত বেশি; কিন্তু অস্পষ্ট মাহুকে স্পর্শমাত্র করিবার বহুমূল্য আঘোজননের মধ্যে আমরা কোনো অর্থ খুঁজিয়া পাই নাই। আমরা তাহার আন্দোলনকে প্রাপণে মাত্র করিতে গিয়া বলিয়াছিলাম, ইহা মানা যায় না। ইহার মহত্ব প্রচার করিতে গিয়া বলিয়াছিলাম, ইহাতে আর যাহাই থাকুক, মহত্ব নাই। কিন্তু হায় আমাদের অদৃষ্ট!

হঠাৎ আমাদের এক গ্রাহকের নিকট হইতে সংবাদ পাইলাম, তিনি আমাদের এই মতবাদে ঠেঁগা হারাইয়াছেন। একখানি সহিংস পত্র দ্বারা তিনি আমাদের নিকট জানাইলেন, তাহাকে আমরা যেন আর কাগজ না পাঠাই। অর্থাৎ নন-কো-অপারেশনের স্বযোগটি তিনি নানারূপ অশ্রুবিধায় নিজে গ্রহণ না করিয়া আমাদের কাছেই দান করিয়াছিলেন। সেদিন আমরা অসহায়ভাবে তাহার সহিত নন-কো-অপারেশন করিয়াছিলাম।—আজ তাহাকেও অভিবাধন জানাইতেছি।

পূজার পূর্বে মনে করিয়াছিলাম, পূজা শেষ হইলে জীবনে একটা নতুন প্রেমা আসিবে। পূজা বা বড়দিন বা অজ্ঞ যে কোন একটা উৎসব আসিলেই এইরূপ মনে হয়। মনে হয়, সমস্ত নিকে একটা নতুন দৃষ্টি খুলিয়া যাইবে; পূর্বের অভিজ্ঞতায় বাহা ভুল মনে হইয়াছে, এবারে তাহার সংশোধন করিব; পূর্বে যাহা ভাল মনে হইয়াছে, এবারে তাহাকে আরো ভাল করিব; কিন্তু পূজা উত্তীর্ণ হইয়া গেল, কিছুই করিলাম না। ইহার কারণ এই যে সদিচ্ছা মনের একটি স্তম্ভবিশেষ। বর্ষান্তে বলিলেই বোধ হয় ঠিক হইবে। বর্ষান্তে স্মরণীয় ক্ষণটি বেশিক্ষণ থাকে না।

স্বতরাং ইহা লইয়া দুঃখ করিব না। কারণ এই ক্রটি শুধু আমাদের নহে, বিশ্বপ্রকৃতির মজ্জাগত। গোলাপ গাছ হয়ত ফুল ফুটাইবার পূর্বে সর্বদা প্রতিজ্ঞা করিতেছে, এবারে পূর্ণাপেক্ষা ফুলের উৎকর্ষ বাড়াইব, আমগাছ বৎসরান্তে প্রতিজ্ঞা করিতেছে আগামী বৎসর উৎকৃষ্টতর ফল ফলাইব—কিন্তু প্রতিবারেই সেই একই ফল-ফলের পুনরাবৃত্তি। বরঞ্চ ইহাই ব্যবহারিক জগতের পক্ষে স্বশোভন। আমের মিষ্ট যদি প্রতিবৎসর বৃদ্ধি হইতে থাকিত, কিংবা তেঁতুলের অম্ল প্রতিবৎসর উৎকর্ষপ্রাপ্ত হইত, তাহা হইলে তাহা মানুষের ব্যবহারে লাগিত কিনা সন্দেহ। স্বতরাং উৎকর্ষ বৃদ্ধির সমিচ্ছাটাই আসল—বৃদ্ধিই অবাস্তব।

সাময়িক পত্রিকাটিরও এইরূপ আরো ভাল হইবার একটি সমিচ্ছা বৎসরান্তে মনে জাগে। কিন্তু উহা আমজাম কিংবা তেঁতুলগোলাপের ইচ্ছার মতই সীমাবদ্ধ। পাঠকদিগকে এইরূপ একটি কথার দ্বারা উৎসাহিত করিবার ইহা একটি উপায় মাত্র। সংবাদপত্র যদি বলিত প্রতিদিন আমরা আরো ভাল সংবাদ দিব, তাহা হইলেও পাঠকেরা তাহা বিশ্বাস করিতেন। সংবাদের নতুনত্বই তাহার ভাল হইবার একটা প্রধান উপায়; কিন্তু ইহা ভালও নহে, মন্দও নহে, ইহা সংবাদ মাত্র। ইহার উপরে সম্পাদকের কোনো হাত নাই। কিন্তু মাসিকপত্রে যাহা বাহির হয় তাহা সংবাদ নহে, তাহা রচনা। ইহার জ্ঞান প্রধান প্রয়োজন কৌশল বা ভঙ্গি। এই রচনা-কৌশল সাবধান-বিষয়বস্তুকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত হয়। অল্প কথায় রচনা-কৌশল সূক্ষ্ম হইলেই তাহার বিষয়বস্তু সাবধান হইয়া উঠে। স্বতরাং ইহার উৎকর্ষসাধন সম্ভব। কিন্তু প্রতিবৎসর ইহার নিয়মিত এবং ইচ্ছাকৃত উন্নতি সম্ভব নহে। উন্নতি করিতে অনেক সময় যুগ কাটিয়া যায়।

কিন্তু উন্নতির আর একটা দিক আছে, যাহা এক পক্ষের তহবিলের অবনতির দ্বারা ঘটিতে পারে। আমরা এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া আমাদের কাগজের সৌষ্ঠব বাড়াইতে পারি—অর্থাৎ খরচ করিয়া যাহা যাহা সম্ভব তাহা সুবিধা করিতে পারি। কিন্তু একটি জিনিস ইচ্ছা করিলেই করিতে পারি না। ইচ্ছা করিলেই নিজের আর্থিক উন্নতি করিতে পারি না। তাহাদের তহবিলের দিকে আমাদের লক্ষ্য তাহাদের স্বপক্ষেও একই কথা। স্বতরাং আমরা টানিতে চাহিলেই যে তাহারা ছাড়িতে চাহিবেন এরূপ মনে হয় না; কাজেই এরূপে পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না। কাগজ ধ্বংস ছিল সেই রূপই রহিয়া গেল, আশা করি পাঠকের সংখ্যাও ঠিকই রহিয়া যাইবে।

অবশ্য অনেকে এমন আছেন যাহারা বেশি মূল্য দিতে না পারিলে কোনো কিছুই পছন্দ করেন না। তাহাদের বিষয়েও আমরা চিন্তা করিতেছি। আমরা এই দুই দলের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া শীঘ্রই একটা কিছু পরিবর্তন সাধন করিব। বৎসরের প্রথমে এই আর একটি সমিচ্ছা করিলাম। পূর্বেই বলিয়াছি, এই সমিচ্ছাই আমাদের সঞ্চল, ইহাই আমাদের সহিত আমাদের পাঠকদের সঞ্চল মধুময় করে।

পূজা উপলক্ষে প্রতিদিন অপরিখাপ্ত মাংস বাইয়া মাংসের উপর তাহা পাঠার উপর প্রায় বিতৃষ্ণা ধরিয়া আশিত্তেছিল, এমন সময় সংবাদ পাওয়া গেল এবারে পূজায় জীবহত্যার পরিমাণ অর্থাৎ হত জীবের সংখ্যা অস্বাভাবিক বৎসর হইতে একটু অতিরিক্ত হইয়াছে। টেটেনমানের সংবাদ, কাজেই পুনরায় মাংস বিষয়ে চালা হইয়া উঠিল। ঠিক এই

মুহুর্তে আবিসীনিয়ার যুদ্ধের সংবাদও প্রায় প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছে অর্থাৎ যুদ্ধ আছে কিন্তু প্রাণীহত্যা নাই—যেটুকু প্রাণের সাড়া পাওয়া যায় তাহা আবিসীনিয়াতে নহে—জেনিভাতে এবং তাহা মারণ অস্ত্রের বৈজ্ঞানিক যুদ্ধ নহে, শব্দব্যতীত বাগযুদ্ধ।

অতএব পাঠা লইয়াই আরম্ভ করিলাম। আমরা ছাগ-সাহিত্য এবং সেই সাহিত্যের জনকদের লইয়া ইতিপূর্বে বহু আলোচনা করিয়াছি, কিন্তু তাহাদের মৃত্যুকামনা করি নাই। সরস্বতীপূজায় যদি ছাগহত্যার রীতি প্রচলিত থাকিত তাহা হইলেও হয়ত বলির বিরুদ্ধেই আন্দোলন করিতাম—কারণ সরস্বতীর খেত অল্প কাহারো রক্তে রঞ্জিত হউক ইহা আমরা কখনো কামনা করি নাই, এখনো করিনা। আপাততঃ ষ্টেটসম্যানের সংবাদটির দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

সংবাদে দেখিতেছি—গিরিডি সাবডিভিশনে পূজা উপলক্ষে ১০.০০ ছাগবলি হইয়াছে। এই সংখ্যা অস্বাভাবিক অপরূপ অনেক বেশি। আমরা পূর্বেই অহুমান করিয়াছিলাম, পূজায় জীব বলির বিরুদ্ধে যে আন্দোলন শুরু হইল, তাহাতে ছাগ সম্বন্ধে সকলেরই দৃষ্টিভঙ্গি বাড়িবে। একটিমাত্র সাবডিভিশনে তেরো হাজার ছাগ বলি! ইহার বীভৎসতা হঠাৎ মনকে পীড়িত করে, মহাশয়ের উপর আস্থা রাখা দায় হইয়া উঠে; মনে হয় মাছুষ এক নির্ধমও হইতে পারে! যেদেশে বৃক্ষে অবতার বলিয়া পূজা করা হয়, চৈতন্যদেব যে দেশের জন্মে প্রেমের সৌধ গড়িয়া গিয়াছেন—সেই দেশে এই অকরণ অশ্রমের ব্যাপার পূজার নামে বা ধর্মের নামে অহুগ্নিত হয় কি করিয়া! পাঠক ভাবিয়া দেখুন।

আমাদের মনে হয়, এই নিষ্ঠুরতার জন্ত, অস্বস্ত এই নিষ্ঠুরতার দ্বারা ভালো মানুষের মনে আঘাত দিবার জন্ত দায়ী রামশর্মা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। ইহারা কেহ অনশনে থাকিয়া, কেহ কবিতা লিখিয়া এবং কেহ মন্তব্য লিখিয়া এই দুর্কাখ্যটি করিয়াছেন। হত জীবের সংখ্যা তেত্রিশ হাজার কিংবা তেরো হাজার ইহা আমরা কদাপি গণনা করি নাই। সমগ্র বঙ্গদেশে ইহার সংখ্যা এককোটি বা একলক্ষ তাহা লইয়াও কখনো চিন্তা করি নাই। মহাযুদ্ধে দেশপ্রেমের নামে কোটি লোক নিহত হইল সেবিষয়েও—“কি উয়ঙ্কর” “কি ভীষণ”, বা “কি বিরাট”, এইরূপ একটি কথা উচ্চারণ করিয়া আপন কর্তব্যে মন দিয়াছি। আমরা জানি, আমাদের দেশের সমস্ত ইহার চেয়েও ব্যাপক এবং জটিল। নিরক্ষরতার সমস্যা, কৃষি সমস্যা, শিল্পবাণিজ্য সমস্যা—এক কথায় অসংখ্য সমস্যা ইহা আমাদের একমাত্র ভীত সমস্যা। দিনের পর দিন, পাঠার সংখ্যা না গুণিয়া, মাছের সংখ্যা না গুণিয়া কেবল ঐ বিষয়ই চিন্তা করিয়াছি। এমন কি নিরাকার উপাসনা ভাল, কি মৃগীপূজা ভাল, কি গৃহপূজা ভাল ইহাও চিন্তা করিবার অবসর নাই। যাহার যাহা ধুশী করিতেছি, ইহা লইয়া কাহারো নশ্বে কাহারো শত্রুতা হয় নাই; হিন্দু হইয়া সর্গজাতীয় লোকের হাতে পাইতেছি, সমুদ্রযাত্রা করিতেছি, জাতিভেদ তুলিয়া বিবাহ করিতেছি, ইহা লইয়াও কোনো আন্দোলন হইতেছে না। অর্থাৎ ইহা এখন আর সমস্যাই নহে। এমন কি পণ্ডিত রামশর্মার অনশনও সমস্যা ছিলনা। দিব্য আরামে ছিলাম, কিন্তু কিসে কি হইয়া গেল!

রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখিয়া এবং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সম্পাদকীয় লিখিয়া সমস্ত ব্যাপারটির সঙ্গে সমস্যার রং লেপিয়া

দিলেন। কাজেই গিরিডির তেরোহাজার পাঠার মুক্ত প্রেতাশ্বা বাঙালীকে আজ ভয় দেখাইতেছে। ষ্টেটসম্যানও আজ ঐ তেরো হাজারের ব্যাপারটা একটা বিশেষ সংবাদ হিসাবে ছাপিয়া বাঙালীর মুখে কালি মাখাইতে সাহস করিল। ইংলণ্ডের রাজকবি যদি উদর পূজা উপলক্ষে সমগ্র যুরোপে দৈনিক যত গোহত্যা হয় তাহার বিরুদ্ধে কবিতা লিখিতেন তাহা হইলে একপু সংখ্যাগণনা ওদেশে চলিত কিনা জানি না।

জীবহত্যা না করিয়া বাচিয়া থাকা যায় কিনা, অর্থাৎ বাচিয়া থাকিতে হইলে জীবহত্যা অনিবার্ধ্য কিনা ইহা লইয়া অনেকে চিন্তা করিয়াছেন। কিন্তু এই ধরনের চিন্তার মধ্যে কিঞ্চিৎ কাকি আছে। অর্থাৎ আমরা যেন দায়ে পড়িয়া জীবনরক্ষার জন্ত জীবহত্যা করিতেছি। যেন হিংসা একটি বাহু ধর্ম, আমরা হিংসাকে নোটিশ দিয়া যে কোনো মুহূর্ত্তে মন হইতে বিদায় করিয়া দিতে পারি। যেন হিংসা না করিলে কিছুতেই ঝাটা যায় না বলিয়া নিতান্ত অসহায়ভাবে হিংসার আশ্রয় লইয়াছি। কিন্তু একপু যুক্তি ঠিক বলিয়া মনে হয় না। তবে ঐহায়া নিরামিষ খাইয়া মনে করেন হিংসা করিতেছি না, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহাদের সন্ধীভতার বিরুদ্ধে কিছু বলিয়া লাভ নাই। ঐহায়া গাছকাটা এবং পাঠাকাটা উভয়কেই হিংসা বলিয়া মানেন তাঁহারা চিন্তা করিলেই বৃত্তিতে পারিবেন, হিংসা (অবশ্য পরিমিত হিংসা) মানুষের একটি সহজ ধর্ম। মাছ মারিয়া কিংবা ছাগ হত্যা করিয়া কিংবা গাছ কাটিয়া হিংসা করিতেছি বলিয়া অবশ্যই বহুযুগ ধরিয়া মানুষ কাঁদিয়াছে। প্রতিপদক্ষেপে অসংখ্য জীবহত্যা করিতেছি কল্পনা করিয়াও মানুষ বহুযুগ কাঁদিয়াছে। একপু হিংসার একমাত্র সমাধান, এই বোধটি জাগ্রিয়ামাত্র আশ্বহত্যা করা। আমি অসহায়, আমি দায়ে

পড়িয়া হিংসা করিতেছি, আমি বাচিয়া থাকিবার জন্ত এই দুর্কার্য করিতেছি, ক্রমাগত ইহা না ভাবিয়া আশ্বহত্যা করা উত্তম। বাচিয়া থাকিবার জন্ত তোমাকে জীবহত্যা করিতে কে অহরোধ করিতেছে? বরঞ্চ জীবগণ যাহাতে বাচিয়া থাকে তুমি মরিয়া তাহার হুবিধা করিয়া দিলেই হয়! না, তাহা তুমি পার না। নিজে বাচিবার আকাঙ্ক্ষা বোল আনা—অথচ পশুর জন্ত কাঁদিতোও হইবে। ভগামি আর কাহাকে বলে!

আমরা যাহারা বৈষ্ণবও নহি শাক্তও নহি—অর্থাৎ যাহারা মগজে কোনো সম্প্রদায়ের ছাপ লাগাই নাই—আমাদের নিকট পশুহত্যা একটা সমস্তা নহে (পশুর মূল্য বাড়িলে সমস্তা হইতে পারে বটে)। পশুর মাংস খাইব এবং পশুর জন্ত কাঁদিব, দেহ ধারণ করিব এবং দৈহিক ভোগকে পাপ বলিয়া জানিব, পশুর মাংসে দেহ পুষ্টি করিয়া সভ্যতার যুগ প্রবর্তন করিব এবং পশুহত্যাতে বর্ষের অচুটান বলিয়া গালি দিব—এই বর্ষের মনোবৃত্তি যেন আমাদের না হয়।

অর্থাৎ আমরা যেন আগামী বৎসর অধিক পরিতৃপ্তির সহিত মাংসাহার করিতে পারি, এবং গত বৎসরের হত পশুর জন্ত যেন বুধা অশ্রুপাত না করি। পূজায় পশুবলি দিলে পাপ হয় কিনা, এবং পূজার নামে হিংসা বর্ষরত্নতার নামান্তর কিনা, ইহা পূজারী এবং সমালোচকদের উপর ছাড়িয়া দিয়া আমরা যেন আমাদের দৃষ্টি ষিওলজি হইতে ইকনমিক্স-এর দিকে ফিরাইতে পারি। ইহা ছাড়া অস্ত্র কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা সম্প্রতি আমাদের নাই।

শ্রীমতী কুঞ্জ দেবী

নেবু বাগানের কুঞ্জ, অধুনা কুঞ্জ সে বাড়ী-উলি,
বিশ বছরের ব্যবসার শেষে হঠাৎ সেদিন প্রাতে
দেবতার কাছে পাইল প্রত্যাদেশ !

ক্যাডাকর মত ঠ্যাং ফেলে ফেলে অস্তি বাঁচায়ে পথে—
পরণে গরদ—কানা খোঁড়াদের মুঠো মুঠো চাল দিয়ে
ফিরিতেছিল সে গন্ধা-গিনান সারি।

বাশবেড়ে থেকে নয়া-আমদানি পটলিও ছিল সাথে,
বক্স এগার তার—

কুঞ্জ তাহারে বাঁচাইয়া চলে 'ডানে'র নজর থেকে
ডান সে পুলিশ এবং—এবং যাক !

আসিতেছিল সে বউবাজারের পথে—

বায়ে ফুটপাথে ফিরিলি কালীবাড়ী,
প্রণাম সারিয়া ভীষণা কালীরে হঠাৎ তুলিতে মাথা,
বহু-মাথা-খাওয়া মাথা তার গেল ঘুরে !

স্পষ্ট তনিল, তনিল কুঞ্জবালা—

বের হওয়া জিভ ভিতরে না টেনে মা কালী বলিল তারে
পরম আদরে অতি স্নেহময় স্বরে,

"ক্যামা দে কুঞ্জ, বহু পাপ তুই করিলি বছর বিশ,
বহু ঘর ভেঙে জমালি অনেক টাকা ;
এখনও সময় আছে,

কথা শোন মোর, সব পাপ যাবে ধুয়ে,
সতী-গৌরবে মাথা তুলে ফের দাঁড়াবি ধরার বুকে—"

সেদিন প্রাতে গুরু গুরু বুকে তনিল কুঞ্জবালা,
মুজ্জী বাঁচায়ে তনিল সে ভীত প্রাণে—
মাঘের প্রত্যাদেশ—
তনিল না কেহ আর !

ট্রাম বাস আর উড়েদের দল তেমনি চলিল পথে
প্রতিদিন প্রাতে যেমন চলিয়া থাকে।
ঝাঁক মুটে চলে, ছলিত চামড়া পাঠা ও খাসীর দল
সমানে খুলিয়া রহে ;
পটলি কিছুই বৃদ্ধিতে না পেরে মা কালীরে গড় করে।
পড়িতে পড়িতে প্রত্যাদেশের সামলিয়ে নিয়ে টাল,
রিস্কায়ে চেপে পটলির সাথে কুঞ্জ ফিরিল ঘরে,
নেবু বাগানের দেড়তলা সেই পুরাতন বাড়ী থানি।

দশ-বায়ে দিন পরে,

বাড়ী বেচে দিয়ে নেবু বাগানের প্রবীণা কুঞ্জবালা,
শীতের প্রাতে কুয়াশার মত হঠাৎ উদাও হ'ল—
হাওয়া হয়ে গেল, ঠিকানা কোনো না রেখে,
পৌষের শেষে পটলের মত পটলি লোপাট হ'ল।

গ্রাম স্বঘরের ঠিক উত্তর দিকে—

চোখ রগড়িয়ে একদিন ভোরে প্রতিবেশী সব দেখে,
বহুকাল-খালি নবীন ঘোষের রঙচঙে বাড়ীখানা

নড়িয়া চড়িয়া বসে খেন পাশ ফিরে !
 ঘোর লাল পাড় গরদের শাড়ী কামিশ ধ'রে ঝোলে,
 চাকর বামুন ঝির কোলাহল মাকে,
 অতি সংঘত নারী-কণ্ঠের আদেশ ভাসিয়া আসে।
 পাশের বাড়ীর কুতূহলী কোনো রসিক ছোকরা দেখে,
 আলিশার পথে চেয়ে বেথে উকি মেয়ে,
 আসন পাতিয়া দখিন বারান্দাতে
 পট্টবসন পরিহিতা নারী করিছে চণ্ডী পাঠ—
 নেবু বাগানের বাড়ীউলি নয়—শ্রীমতী কৃষ্ণ দেবী।

শ্রীমতী কৃষ্ণ পেয়েছে প্রত্যাদেশ—
 ঋতুমান যত পুরুষ বাংলা দেশে
 বিবাহধর্মে পতিত হইয়া কুমার রহিয়া গেল,
 বিয়ে না করিয়া রয়ে গেল আইবুড়ো—
 তাদের কাহারো ধর্মরক্ষা করিতে সে নারে যদি,
 এক নারী হয়ে একটি পুরুষে গৃহী না করিতে পারে,
 নারীর ধর্মে, কুমারী ধর্মে পতিত হইবে সে যে,
 সত্যীর মহিমা হারায়ে যে চিরতরে।
 মা কালী তাহারে স্বয়ং গেছেন বলি—
 বাছা বাছা যত পাকা আইবুড়ো তাদের ঝরেও ধরি,
 বিবাহ-ধর্মে দীক্ষিত করি, ধর্ম রাখিতে হবে,
 নতুবা বিগত বিশ বছরের বহুজন-ঘাটা পাপ
 অনন্ত কাল চাপিবে তাহার শিরে।
 সহজে এ ব্রত না হলে উদ্যাপন,

সাধিতে হইবে ছলে বলে কৌশলে,
 তাতেও না হলে শেষ পথ অনশন !
 চণ্ডীপাঠের অবকাশে বসি শ্রীমতী কৃষ্ণবালা—
 যত্নে-রচিত তালিকাটি লয়ে হাতে
 বাছিছে লাগিল মনোমত পতি বহু বিবেচনা করি।

আচার্য্য পি. সি. রায়—
 পূজ্য অতীব, না হবে যোগ্য পতি।
 পত্নীহলভ চপলতা তাঁর সনে
 কিছুতে চলিবে না যে।
 বিবাহ-ধর্ম ঠেকিবে আসিয়া বৃদ্ধের, বস্ত্রায়;
 যদিবা না ঠেকে রসায়ন-বিজ্ঞানে।

কথার শিল্পী শরৎচন্দ্র, তিনি
 অতি লোভনীয় পাত্র যদিও তবু
 কঠিন হইবে বরকরা তাঁর সাথে।
 গৃহস্থ-প্রেম-নমুনা যা আছে তাহার উপস্থাসে
 সত্যী রমণীরা যেভাবে তাহের পতিদের সম্ভাষে
 এবসে অতি কঠিন হইবে সে ভাষা কবলে আনা,
 লজ্জা করিবে তার।

দরদী বিধান রায়,
 দরদী হলেও ডাক্তারি ক'রে ঘাঁটা পড়িয়াছে মনে;
 রাতদিন তাঁর 'কল'—
 মনখানি তাঁর জুড়িয়া রয়েছে শিল্প ও পলিটিক্স।

তার চেয়ে ভাল শ্রীযুক্ত কচি বোস,
চৌদ্দবর্ষ বিবাহ-ধর্ম্মে দাগা বুলালেন তিনি,
তবুও হয়নি অক্ষর পরিচয়!
হঠাৎ-সুমার শ্রীমান হুবোধ বহু—
খুঁকিল কুহু তবু শেষ কালে অনেক চিন্তা করি,
মামলায়-পড়া পত্তিরে ভজিতে সাহস হ'ল না মনে।

সুভাষচন্দ্র, দূরদেশে তিনি, আসিবেন অচিরে
কাগজে দেখি না কোনই সম্ভাবনা।
নির্দয় ইংরাজ
একটি নারীর পরম ধর্ম্মে অস্তিত্ব: সাধে বাদ।
বাদ সাধে যথা মিশন অনেকগুলি—
পুরুষ-ধর্ম্ম ভুলায়ে পুরুষে করিয়া অন্তরতী।

এরই মাঝখানে রহিয়া রহিয়া আগে কুঞ্জের মনে,
শ্রেষ্ঠপায়ে ছোঁয়াইয়া বুড়ি, বিধি করে বরবাদ,
কবিগুরু আর শ্রীনলিনী আর গৃহী দুই চারি জনে,
অতি অকারণে বেহাত করিল, বিধাতা সে বেদরদী।

ভাবিতে লাগিল তালিকা হচ্ছে শ্রীমতী কুহুবালা
পণ্ডিতারীর দিলীপ রায়ের কথা।
তার মাঝামানি কবে খেয়ে গেছে যত রাগ-রাগিণীরা
বাকী যাহা আছে তাও খেলো কবিতায়
পণ্ডিতারী সে অনেক যোজন দূর!

শ্রীউদয় শঙ্কর
নাচ ছাড়া আরো রয়েছে অনেক বাধা;
বারীন দাদাও সেদিন মাত্র দেছেন ধর্ম্মে মতি।

একে একে একে সবে ক্যান্সেল করি'
রয়ে গেল বাকী একটি মাত্র নাম।
সেই নাম হ'ল কুঞ্জের অপমালা
ঝুনো আইবুড়ো সম্পাদক সে দৈনিক কাগজের
বহু-পরিচিত সত্যেন 'জুমদার।
অনেক ভাবিয়া লিখিল কুহু তাঁরে পরিণয়-লিপি;
লিখিল, তোমার লাগি
নারী-চিত্তের শতদল মোর ফুটেছে অকস্মাৎ
তুমি তারে লও তুলি
সার্থক কর তোমার নামের মর্যাদা তারে দিয়ে।

স্ক্রিপল মজুমদার!
লিখিল জবাব অতীব রুঢ় সে ভাষা
অতীব স্পষ্ট এবং অতীব স্নেহ
ছাপার যোগ্য নহে।

শ্রীমতী কুহুবালা
বার দুই আরো চেষ্টা করিয়া বার্থ হইল যবে
বার্থ হইল পাঠায়ে দালাল নামজাদা কয়জন,
মানিষা প্রত্যাশেদে,
বন্দন দ্বীটে অনশন করে হুক।

অটল রহিল তবুও মজুমদার

হোটেল, গল্প, লীডার লেখায় মেতে!

নাহিক খেয়াল কে কোথায় তার লাগি করে অনশন
কার তপস্বী তাহারে কামনা করি'।

অনশন করে শ্রীমতী কুঞ্জ কেটে যায় একদিন

দরদীজনের সহসা টনক নড়ে;

খবর ক্রমেই রটিয়া গেল যে খবরদারীর চোটে

শ্রীবোলপুরেতে পড়'ছিল সংবাদ

কবি রবীন্দ্র বসিলেন ধ্যানাসনে।

মজুমদারের দৃষ্টতা 'মরি' রাগেতে গেলেন জলে,

প্তি কবিতা ফেলিলেন লিখি শ্রীমতী কুঞ্জে নমি'

লিখিলেন বাহা এই—

সাপী কুঞ্জবালা দেবী

আশ্রয়তী কোম্বাধোরে করিতে দিকার

হে সাপী জীবন বিতে চাহ আপনার।

তোমারে জানাই নমস্কার।

দ্বিরসোত্তে দৃঢ় হয়ে সংঘের নামে,

কাটে চিমটি ছোঁড়ে কিল দক্ষিণে ও বামে,

কামের বিলাস মুখে হোটলে যাহার—।

তার পাণ লবে তুলি বকেতে তোমার

তোমারে জানাই নমস্কার।

অকারণ পথপ্রষ্ট জীবের কন্দন,

মুখরিত করে নিত্য পথ ঘাট বন;

অবলের হত্যার অর্থে পুত্রা উপচার

যুচাও কলঙ্ক সাপী কাম দেবতার।

তোমারে জানাই নমস্কার।

এতখানি লিখে মনোবেদনায় ক্ষান্ত হিলেন কবি

পরদিন প্রাতে আর এক ষ্টাফা কবিলেন তাতে যোগ।

আশ্রয়তী হয় তবু বোঝনা যে নিজে,

শীত গ্রাথ বরষার মরে ভিলে জিলে,

অবাচিত ভূমি তার নিতে চাহ তার

কোম্বাধা-নরক হতে করিয়া উদ্ধার।

তোমারে জানাই নমস্কার।

কবিতা লিখিয়া, অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসে

খবর দিলেন, যে করেই হোক কুঞ্জে বাচাতে হবে।

মাসিক সম্পাদক

প্রবীণ এবং পুরাতন প্রবাসীর

খবর পেলেন নূতন কবিতা লিখেছেন কবিগুরু

কুঞ্জবালার নামে।

যারি নামে হোক, কবির কবিতা বটে;

এতখাতীত নারী-প্রগতির যুগে

নারীর পক্ষে কলম ধরাতা রীতি।

বিবিধ-সঙ্গে লিখিয়া দিলেন তিনি:

“কাড়িয়া যদিও লইতে চাহি না ব্যক্তির স্বাধীনতা।

তথাপি কুঞ্জবালা

যে-পণ করিয়া করিছেন অনশন

সেপণ অতীব সাধু;

বিবাহ এবং সভাধর্মের মধ্যাদা তিনি চান,

সত্য মজুমদার

বিবাহ তাহারে করিলে হতেম খুশী।

মুখে মুখে আর কাগজে কাগজে রটিল বার্তা ক্রমে,
 অনশনে কাটে কুঞ্জবালার দিন;
 দলে দলে লোক আসে বর্ধন স্ট্রীটে।
 নেতারা লিখিল বাণী ও আলীকর্দার;
 উঠিতে বসিতে সত্য মজুমদার
 এর ওর তার পাহিতে লাগিল পত্র ও টেলিফোন।
 মোটরে চড়িয়া বড় বড় সব লোক
 ধর্মতর্ক পণ কুঞ্জের ভাঙিতে আসিল সবে।
 উলটিয়ার দল
 বর্ধন স্ট্রীটে ভিড় করে শেষে চলে প্রবেশন করি।
 উঠিতে লাগিল ঠান্ডা
 লোক রোডে আরো দুই চারখানি গৃহ পত্তন হবে,
 বাহির হইল দৈনিক দুইখানা—
 “কৌমাৰ্যের কুন্তীপাক” ও “বিবাহ ধর্ম” নামে।
 চারিদিক হতে হায় হায় করে লোক,
 পার্কে পার্কে বসিতে লাগিল সভা,
 কুঞ্জবালার জয় সবে গাহে উচ্চ কণ্ঠ তুলি:
 চিরজীবী হোক সাক্ষী কুঞ্জবাল।
 মজুমদারের নামে
 ছি ছি করে লোক নির্ধম সে যে জোর করে দাঁও বিয়ে;
 তথাপি অটল সত্য মজুমদার।
 নিরম্ব অনশনেতে কুঞ্জ বেহঁসে পড়িয়া আছে;
 বর্ধন স্ট্রীট লোকে অরণ্য প্রায়।

বন্ধ হইল লরী গাড়ি আর মোটর মোটর-বাস
 রোটারির রোল ঢোকে না অফিসে, বাহির হয় না ভ্যান;
 হকারের দল কাগজ না পেয়ে ফেরে!
 সহসা প্রমাদ গণিল মাখন সেন,
 গড়গড়া আর নল হাতে তিনি উঠিলেন মোতালার
 চক্ষু পাকলি' কহেন মজুমদারে—
 তিনিও চৈতান জ্বোরে!
 হাতা হাতি আর মারামারি প্রায় স্রুক
 বিবাহ তোমায়ে করিতে হইবে কহিল মাখন সেন
 নতুবা কাগজ ওঠে!
 তার চেয়ে আমি হইব বিরাগী কহিল মজুমদার
 বেলুড়ে ঘাইব নন্দগোপালে লয়ে—
 বিধম ক্রোধেতে আশ-টে লইয়া ছুঁড়িল মাখন সেন।

খড় মড় করে দিবা-সুম থেকে আগিল বিবেক মুখো,
 টুলে হাত লেগে আশ-টে পড়েছে নীচে।
 সে দিনের ছেড়া “শক্তি-পূজা”টা উড়ে গড়ে গেছে ভূয়ে!
 কুঞ্জের কথা স্মরি
 লক্ষ্য উঠি লীড়ার লিখিতে বসে।

পুনশ্চ

একটা গল্প লিখিতে হইবে। কিন্তু লিখি কাহাকে লইয়া? কিরগময়ী রাখিতে আশ্রয় লইয়াছে—অন্নদাদিদি সেই যে গা-ঢাকা দিয়াছে আর কোন পাত্তা নাই—কমল মেডিক্যাল স্কুলে ভেনিরিয়াল পণার ওয়ার্ডে ভর্তি হইয়াছে। চাটুজ্ঞে পাড়ায় আর কেহ নাই। একবার নতুন পাড়াটা উকি মারিলাম—কিন্তু খেদিরও নাক খসিয়া গিয়াছে—বীভৎসতায় কাছে বাওয়া যায় না—বিনি-পানওয়ালাীর সামনের চুল উঠিয়া কপালটা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত হইয়াছে। এদিকে হিমি মেছুমীর একটা চোখ নষ্ট হইয়া গিয়াছে—অল্প চোখটা দিয়া সে ঘন ঘন চারিদিকে নয়নবান মারিতেছে, কিন্তু একটা পলু ভিক্ষুক ছাড়া তাহার ত্রিসীমানায় আর কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। বুকিলাম এ পাড়া লইয়া ভান্ডারীর গবেষণা চলিতে পারে কিন্তু গল্প চলিবেনা। একবার চট করিয়া তরুণ পাড়াটা ঘুরিয়া আসিলাম। লটা চাটুজ্ঞের গালের হাড়, পাউডার ও স্নো ছাপাইয়া উচু হইয়া উঠিয়াছে—হেনা রায়ের বসা-চোখে বজ্রি বৎসরের অস্বাস্থ্যকর দূষিত দৃষ্টি, লেখক হলধর ঘোষালের চেহারায় পাঠার ছাপ ফুটিয়া উঠিয়াছে—আটিষ্ট মুরলী সেন কুকুরের মত হেনা রায়ের পা চাটিতেছে—বুকিলাম এ পাড়ার অস্বস্ত দশ মাইলের মধ্যে গল্প ঘেষিতে পারে না—প্রবীণদের উজ্জত খজোর হাত হইতে অস্বস্ত হলধরকে বাঁচাইবার অল্প পণ্ডিত রামশঙ্ককে পাঠাইয়া দিতে মনস্থ করিয়া সরিয়া পড়িলাম। এলোমেলো ঘুরিয়া জ্ঞাত হইবে না, তাহার চেয়ে একবার সন্ধ্যা-মামার কাছে গিয়া পড়িতে পারিলে হয়ত একটা ভাল গল্পের গুটীয়া যাইতে পারে।

আমাদের সন্ধ্যা মামা—সমস্ত দিন বাহা পায় তাহাই পড়ে, সন্ধ্যার পর আকিং থাইয়া স্বিমায়ে। মামার পাঠ্য পুস্তকের কোন বাছ বিচার নাই। একদিন গিয়া দেখি গভীর মনোযোগ দিয়া একখান “ইউক্লিডের” জ্যামিতি পড়িতেছে। বলিলাম, মামা একি পড়ছ? মামা ঈষৎ হাসিয়া বলিল, জ্যামিতিখানা দেখছিলাম—বিউটিফুল লেখা—আমি আশ্চর্য হইয়া বলিলাম, মাতুল! এই বয়সে জ্যামিতি ভাল লাগে?—কেন লাগবে না ভায়া? পড়তে যদি জ্ঞান আর ভাবতে যদি শেখ তাহলে সবই ভাল লাগবে। এই ধর টু সাইডস অব এ ট্রায়েঙ্গল—ভাল করে ভেবে দেখ টু সাইডস—আমি বলিলাম—খুব হয়েছে মামা—আর নয়; বুঝেছি জ্যামিতি ছাড়া আমাদের গতি নেই। সেদিন কোনরকমে মামার হাত ছাড়াইয়া সরিয়া পড়িলাম। আর একদিন গিয়া দেখি মামা তরায় হইয়া গুপ্তপ্রেস পাঞ্জি অধ্যয়ন করিতেছে। আমাকে দেখিয়াই বলিল—দেখ ভায়ে তোমাদের রবিবাবু যা বলে, পাঞ্জিতেও ঠিক তাই লেখা আছে।—এই দেখ লেখা আছে “রাশীনা মুদ্রায়া লগঃ” অর্থাৎ কিনা জন্মের ঠিক মুহূর্ত্তে যে রাশি পূর্ণ দিগন্তে উঠে—সেইটিই লগঃ—এখন এই লগ যদি গোলমাল হয়ে যায় তাহাকে জ্যোতিষের মতে সমস্ত জীবনটা গোলমাল হয়ে গেল। ওদিকে আবার রবিবাবুর “লষ্ট লগ” মনে আছে ত—যেই ঠিক লগটি লষ্ট হল অমনি সমস্ত জীবনটি মাটি হয়ে গেল। রবিবাবু শুধু কেতাবে নয়, রেকর্ডে পর্যন্ত “সে কোথায় সে কোথায়” বলে টেঁচিয়ে উঠলেন। আবার ধর—হাত জোড় করিয়া বলিলাম রক্ষ কর মামা—আর ধরে কাজ নেই—সমস্ত জন্মের মত বুঝতে পেরেছি। তবু আজ যখন কোন পাড়াতেই গল্পের কোন কিনারা করিতে পারিলাম না—তখন সন্ধ্যার পর মামার

ঘরেই আসিয়া বসিলাম। জানতাম, স্বযোগ মত ধরিতে পারিলে গল্প নির্ধাৎ পাওয়া যাইবে। দেখিলাম মামা বাড়ি গুজিয়া চোখ খুলিয়া বসিয়া আছে, হাতে একখানা “গল্পগুচ্ছ”। কাগজিক মাসের লক্ষ্য। বেশ একটু মিঠে রসক ঠাণ্ডা পড়িয়াছে—চাপিয়া বসিলাম। মামার আর ধ্যানভঙ্গ হয় না। বলিলাম, মাতুল কি ধ্যান করছে?

কে ভোলানাথ, এস বাবা বস—অতি কষ্টে চোখ খুলিয়া মামা একবার আমাকে দেখিয়া লইলেন তাহার পর আবার ধ্যানস্ত হইয়া পড়িলেন—ডাকিলাম, মামা! মামা আবার মিট মিট করিয়া চাহিয়া বলিল, গল্প ত? শোন একটা বলছি। মামা একটু উগ্রিয়া বসিয়া জড়াইয়া জড়াইয়া ডাক দিলেন বাবা—নন্দলাল! নন্দলাল নিঃশব্দে আসিয়া গুড়গুড়ির মাধ্যম জলন্ত কলিকাটি বসাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। মামা ফুড়ুক ফুড়ুক করিয়া ছুই চারিটি টান মারিয়া বলিতে লাগিলেন, ঠিক ভর সম্বোধে হয়ে এসেছে গঙ্গার পাশ দিয়ে যে নিৰ্জ্জন রাস্তাটা গ্যাছে তাতেই বেড়িয়ে বেড়াচ্ছি—দূরে দেখি একটা ছরস্ত ঘোড়া হাঁকিয়ে কে চলে আসছে—একটু কান্ধাকাছি হাতে চিনতে পাঞ্জাম আমাদের সিঁতু! সিঁতু কে? সিঁতুকে চেন না? সিতাংশু মোলি? পয়লা নখরের বাড়ীতে থাকত? সামনে রাখা গল্পগুচ্ছটার উপর নজর পড়িল। রাখা না দিয়া বলিলাম—বুঝতে পেরেছি—আপনি বলুন। মামা বলিতে লাগিল—আমাকে দেখে সিঁতু একটু কাঁচুমাচু হয়ে রাশটা টেনে ধরলে। আমি বললাম কে সিঁতু নাকি? তারপর কি মনে করে? মস্তুরি পাছাড় থেকে নামলে কবে?

অনেক দিন হল।

জানত আমি চিরকাল স্পষ্টবাদী। বললাম বাবা সিঁতু, ছুঁড়ীটাকে সরিয়ে কোথায় রাখলে বলত?

সিতাংশু একটু চমকে একটা চৌক গিলে বলল—কার কথা বলছেন?

—অনিলা গো অনিলা।

সিতাংশু ঘোড়া থেকে নেমে পকেট থেকে একটি ছোট এনামেল করা কার্ড কেস বার করলে।

আমি বললাম—আমাকে আর দেখাতে হবে না—সেই নীলরঙের চিঠির কাগজের আছটুকু ত? ওতে অনিলার স্বামী ভুলবে—আমি ভুলছি না বাবা। ঠিক করে বলো দেখি মেয়ে মানুষটিকে কোথায় সরিয়ে রেখেছো? ঐ নীল কাগজে যেটুকু লেখা আছে সেটুকু ত সবাই জানি, কিন্তু পুনশ্চ যেটুকু লিখেছে—সেটুকু কোথায় বাবা?

সিতাংশু কোন কথা না বলে—ঘোড়াটাকে একটা গাছের গুড়িতে বেঁধে আমার কাছে এসে বলল—চল মামা গঙ্গার ধারে বসা যাক। ছুজনে গিয়ে গঙ্গার ধারে বসলাম। একটু চুপ করে থেকে সিতাংশু বলল—মামা তুমি ত আমাকে আজ থেকে জান না—বহুকাল থেকে জান—সেই কোন মাফাতার আমল থেকে। মেয়ে মানুষ নিয়ে কারবার আমার আজ নয়—আর এই মেয়ে মানুষের দালালি করে নাম করেছে টাকা করেছে অনেক। হীরার কথা মনে আছে ত। হীরা কিন্তু পাগল হল। রোহিণীর কথা ভোলনি বোধ হয়, সে খুন হল, আমি সম্মানী হয়ে ফেরার হল্যাম। মাঝ থেকে বন্ধিম চাটুজ্জে দালালী করে নামও করল—টাকাও করল। তার পরের কথা দর বিনোদিনী! ডাবলাম—এমন মাল বুঝি দেখিনি—কিন্তু কাছে গিয়ে দেখলাম—ওমা সেই হীরেই ভোল বদলেছে। তারপর এইত হালের কথা—কিরণময়ী এলো, দেখলাম সেই আদিম হীরে—এও পাগল হল। তারপর কত এলো কত গেলো—তারপর বিনোদিনী গিয়ে। এল

অনিলা। সত্যি বলছি মায়া—আমাকে খাধা লাগিয়ে দিলে।
মাইরি এই নীল রঙের চিঠির কাগজের অর্ডেকটুকু ছাড়া আমার
কাছে আর কিছু নেই।—এর সঙ্গে আমার পুর্বে জানা শোনা ছিল
কিনা কেউ জানে না—আমিও জানি না—এর সঙ্গে আমার চোখা
চোখির ইতিহাস সকলের চোখেরি আড়ালে রয়ে গেল—এর প্যালানর
মধ্যে প্রেম ছিল কি ভয় ছিল—আমি জানি না। তবে তোমায়
ছুঁয়ে দিবা কছি—এই হলাইন চিঠি ছাড়া আর কোন পুনশ্চ
নেই।

বুল্লাম, সিতু ফাঁকি দিচ্ছে। বাবা, আমার কাছে চালাকি।—
প্রর করলাম, আচ্ছা সিতু ঘোড়ায় তোমার পিছনে বসে ও কে ?
সিতু কোনো জবাব দিলনা। আমি কাছে গিয়ে বুল্লাম, কে মা
তুমি ?

ঘোড়ার উপর থেকে আরোহিণী বুল্লে—আমার নাম অনিলা।
অনিলা—অনিলা—পয়লা নম্বর—সিতাংশু মৌলি—পয়লা নম্বর—
বুল্লাম আমার নেশা জমিয়া আসিয়াছে—গল্প এখানেই শেষ
হইল, অর্থাৎ মাটি হইল।

শ্রীভোলানাথ মুখোপাধ্যায়।

WHY NOT ?

নীরব রজনী,

খুলিয়া-স্বপন দ্বার, আসে,
কল্পনার মায়াপূরী হইতে নির্গত,
যুগে যুগে দলে দলে সহস্র শঙ্কেতে,
ছায়াযুক্তি অবাস্তব তাক্জব অদ্ভুত,
শোভাযাত্রা যুমন্ত মগজ পথে।
সত্যামিত্যা মিলিত মিছিল,
অতৃপ্ত বাসনা যত মিলিয়া মিশিয়া
অপক্লপ স্বপ্নরস করি' আশ্বাসন
করে আফালন যতেক নাসিকা।

ইন্দ্রদেব ত্যজি শয্যাপরে স্বপ্নমগ্না ইজ্ঞাণীকে
চলিল নিশিথে পেটল চালিত ঐরাবতে

নন্দন কানন পথে,

পরি' বিছাতের কঠহার মেঘিনীরা হাসে বজ্রহাসি,
নক্ষত্রা করিছে ইসারা মিটি মিটি নয়ন ভজিতে,
হারাঈয়া অল্প-কয় কলা, চন্দ্রমা বন্ধিম, শোকে।
কুপথ পথিক যুবাজনে দিবে শিক্ষা, উগ্রচণ্ড ধুমকেতু
উদিত আকাশ পথে সমাজ সংস্কার লোভে।
উর্ধ্বশী, মেনকা, আদি ঘোমটা খুলিয়া
ধেমটা নর্তনে রত।

—যদিও বাজার মন্দা অতিরিক্ত সম্রাই বশতঃ ।

ভীষণ বিপদ ; গেলাসে ঘটিতে

কুতীর হাঙ্গর আদি বাধিয়াছে বাসা,

কাংলা টেকরা যত করিয়াছে সত্যাগ্রহ

পটলের প্রাণ রক্ষা হেতু ।

মুসোলিনী করেছে চকুম

টেকো লোকে না কাটিলে টেরী

দিয়ে ট্যাঙ্ক ; নয় কারাবাস ।

মকি-ম্যাণ্ড করিতেছে গ্রাফট ল্যাম্প পোষ্ট পরে ;

করপারেশন লভিয়া স্যাংখন ;

ক্যাণ্ডেল পাওয়ার তাহে বাড়িবে বলিয়া ।

আজি স্বপ্নলোকে দুনিয়া হইল হলিউড

মালেনের সাদি হ'ল সৈয়দের সাথে

মৌলভির ভেঙে যায় ঘুম

ক্লকোর্ডের জোয়ানিতে,

“দাড়িতে বিছনি কর” কে যেন বলেছে ।

খাইয়া বালিস, ভাতের খালায় মাথা দিয়া

ঘুমন্ত পেটুক

ঘন ঘন কঁপে ওঠে রোমাঞ্চ তড়নে ।

করিয়া রিসার্চ প্রমাণ হয়েছে

অলদ ক্যাডার ছিল ;

নতুবা ল্যাজের পরে, কেমনে বসিল ?

রবীন্দ্রীয় জীব লঙ্ঘ যত

নিষ্কমিল ময়দানে ভ্রমণ ইচ্ছায়

বিকট বকের সারি পদব্রজে গঠিল বলাকা ।

চতুষ্পদ অণু ধায় জননীর পশ্চাতে সঘনে ;

হাসিতেছে বুলবুল চেঁচারে বসিয়া

স্বপ্ন লজ্জা চুঁচু আকুলিত খোকা

কবিও আকুল হ'ল হেরিয়া খোকারে ।

শ্রীমধুকরকুমার কাঞ্জিলাল

“Which of your works of fiction do you consider the best, Mr. Penwright?”

“Oh, my last income-tax return.”

“Mother says she nearly died laughing over those stories you told her.”

“Where is she ? I know some funnier ones.”

চিঠি

সম্পাদক মহাশয়,

কাগজের একটি নির্দিষ্ট পরিসরের ভিতর যত ইংরেজী শব্দ ছাপা যায়, বাংলা তত ছাপা যায় না। ইহার কারণ এই যে ইংরেজী অক্ষর যত ছোট তৈয়ারী হয় বাংলা অক্ষর সেতুপ ছোট তৈয়ারী করা সম্ভব নহে। * অথচ বাংলা অক্ষর ত্যাগ করিয়া রোমান অক্ষর প্রচলন করাও অবিলম্বে হইবে বলিয়া বোধ হইতেছে না। কিন্তু তাহা না হওয়া পর্যন্ত কি আমরা ক্রমাগতই ঠিকিতে থাকিব? একই পৃষ্ঠা-সংখ্যা সমন্বিত একই মূল্যের বাংলা এবং ইংরেজী বই কিনিতেছি কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখুন, সমান মাল পাইতেছি না। তিন টাকায় শেলী বা কীটস-এর যতগুলি কবিতা পাওয়া যায়, রবীন্দ্রনাথের কবিতা তত পাওয়া যায় না। একটাকা ছয় আনা যত শব্দ বিশিষ্ট স্বরের নভেল পাওয়া যায়, ঐ মূল্যে তত শব্দ বিশিষ্ট বক্তৃতা বাবুর গ্রন্থ পাওয়া যায় না। অবশ্য যদি বলেন শূন্য কুন্তে শব্দ বেশি, এবং কুন্ত পূর্ণ থাকিলে শব্দ কম; তাহা হইলে উত্তরে ইহাই বলিতে চাহি যে কুন্ত ক্রয় করা আমার উদ্দেশ্য নহে, আমি পুস্তক কিনিতে ইচ্ছা করি। এবং আমি বিশ্বাস করি তাহাতে শব্দ যত বেশি ততই তাহা পূর্ণ। যদি বলেন, শব্দই যদি চাও, তাহা হইলে পি. এম. বাগচীর পত্রিকা কিনিতেই হয়। তাহার উত্তরে বলিব, আমি প্রতিবৎসর নিয়মিত উহা কিনিয়া থাকি, কিন্তু আজীবন কেবল পত্রিকা কিনিয়াই স্তব্ধ থাকিব, গল্প-

শনিবারের চিঠি

২০

উপক্ৰাস কিনিব না, এ কেমন কথা? পয়সা হাতে হইলেই কিনিব, এবং ঠিকিব। কিন্তু আর ঠিকিতে ইচ্ছা করি না। একটা কিছু উপায় বাহির করিতে হইবে। বাংলা ভাষায় আমি বই লিখি না বটে (কোনো ভাষাতেই লিখি না) কিন্তু বাংলা ভাষায় কথা বলি, স্তব্ধতা এ সম্বন্ধে আমারও কিছু বলিবার অধিকার আছে। অন্তত আমার বিশ্বাস তাহাই।

আপনার সাধু ভাষার অধিক পক্ষপাতী বলিয়া মনে হয়। লোক ঠকাইবার ইহা একটি সাধু রীতি সম্ভেদ নাই। আমিও সাধু ভাষাতেই লিখিতেছি, কেননা আমার প্রাণের ভাষায় লিখিলে আপনারা সে দেখা নাও ছাপিতে পারেন। কিন্তু সাধু ভাষা পছন্দ করিনা বলিয়া আমি নিজেকে অসাধু নহি। প্রাণের কথা খুলিয়াই বলিতেছি, ইহাই সাধুতার একটি প্রমাণ।

আমি আপনাদিগকে একটি অছরোধ করিতেছি। কিন্তু তৎপূর্বে সাধু ভাষা লোকঠকানো ভাষা কেন তাহা বলিতেছি। এবিষয়ে আমি একটি উদাহরণ দিলাম। ইহাতে দেখিবেন, সাধুভাষায় অনাবশ্যক অক্ষর বৃদ্ধি হয় কিন্তু শব্দ বৃদ্ধি হয় না। এবং অক্ষর বৃদ্ধিতে নির্দিষ্ট পরিসর কাগজে শব্দ সংখ্যা কম ধরে। অপর পক্ষে কথা ভাষায় ঠিক যত গুলি অক্ষর শব্দের জন্ত ন্যূনতম প্রয়োজন তাহার বেশি অক্ষর থাকিতে পারে না। ইহাতে একই স্থানে বেশি শব্দ ছাপা যায়। যথা : (কথ্যভাষা) “শিকাগো থেকে কাল রচেষ্টারে এসেছি।... অরকেনের সঙ্গে আমার আলাপ হ'ল। তিনি দু হাতে আমার হাত ধরে আমাকে খুব সমাদর ক'রে গ্রহণ করলেন—বললেন ইণ্ডিয়া ও জর্ডানি আমরা এক রাস্তায় চলছি। এই বৃত্তকে দেখে আমার খুব আনন্দ বোধ হ'ল।”

* সম্ভ্রতি বাংলায় লাইনোটাইপ আবিষ্কৃত হওয়ার অক্ষরের আকার পূর্ণাঙ্গের কা কিছু কমিয়াছে—কিন্তু তবু এ লেখার মূল্য কমিবে না।—লেখক

এই প্যারাগ্রাফটি সাধু ভাষায় পরিবর্তন করিলে দাঁড়ায়,—“শিকাগো হইতে কাল রচেষ্টারে আসিয়াছি।... অথকনের সঙ্গে আমার আলাপ হইল। তিনি দুই হাতে আমার হাত ধরিয়া আমাকে খুব সমাদর করিয়া গ্রহণ করিলেন—বলিলেন ইণ্ডিয়া ও জর্জনি আমরা এক রাস্তায় চলিতেছি। এই বুদ্ধকে দেখিয়া আমার খুব আনন্দ বোধ হইল।”

উপরের দুইটি প্যারায় দেখিবেন মূল কথাভাষার অক্ষরের সংখ্যা ১০০ এবং পরিবর্তিত সাধুভাষার অক্ষর সংখ্যা ১০২। অথচ শব্দ সংখ্যা এক। এইরূপে যদি দুইশত পৃষ্ঠার কথাভাষায় লিখিত একখানি বাংলা পুস্তকে একলক্ষ অক্ষর থাকে তাহা হইলে সেই পুস্তক সাধু ভাষায় পরিবর্তিত করিলে অক্ষর সংখ্যা বাড়িয়া প্রায় একলক্ষ দশহাজার হইবে। এই দশ হাজার অক্ষরকে স্থান দিতে গেলে আরো কুড়ি পৃষ্ঠা বাড়াইতে হইবে। ইহার ক্ষয় বহু টাকা অতিরিক্ত খরচ এবং ফলে পুস্তকের অক্ষর আকার এবং মূল্য বৃদ্ধি। কথাভাষায় পুস্তক লিখিত হইলে এই সমস্যা, গ্রানি এবং কুক্ষের দায় হইতে আপনারা মুক্ত হইতে পারেন।

আমার আরো একটি উপদেশ আছে। যে সমস্ত শব্দ একাদিকবার লিখিত হয় তাহার ক্ষয় একটি সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার করিলে অর্থ-সঞ্চিত কিছুমাত্র নষ্ট না করিয়া শব্দ সংখ্যাও কমাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। এই দরিদ্র দেশে ইহার চেয়ে সারবান উপদেশ আর কি হইতে পারে! যাহারা বই পড়িতে যথার্থ ভালবাসে নিত্যন্ত হর্ভাগ্যবশত ভগবান তাহাদিগকে ধনী করেন নাই। সুতরাং পাঠকশ্রেণী সঙ্ঘবদ্ধ-ভাবে আমার এই আন্দোলনে যোগ দিবেন ইহাই আকাঙ্ক্ষা। কবিতা পুস্তকেও আমরা এই ‘ছাঁটাই’ প্রক্রিয়া প্রচলন করিয়া কিরূপে লাভবান হইতে পারি তাহা উদাহরণ দিয়া দেখাইয়া দিতেছি। এই লাভ

আধিক লাভ নহে। ইহা শুধুই লাভ—পরে হয়ত ইহা হইতে আর্থিক লাভের রাস্তা খুলিয়া পাওয়া যাইতে পারে। মূল অর্থ ও ভাব অক্ষত রাখিয়া অর্থাৎ লেশমাত্র নষ্ট না করিয়া আমরা শব্দসংখ্যা (শুধু অক্ষর সংখ্যা নহে) কমাইবার উপায় বাহির করিয়াছি। যথা—

প্রিয়তম আমি তোমারে যে ভালোবেসেছি
দয়া করে কোরো মার্জনা, কোরো মার্জনা।

ভীক পাখী আমি তব পিঙ্গরে এসেছি

তাই বলে ঘর কোরোনা রুদ্ধ কোরোনা।

যাহা কিছু মোর কিছুই পারিনি রাখিতে

উতলা হৃদয় তিলেক পারিনি ঢাকিতে,

তুমি রাখো ঢাকি, তুমি করো মোরে কক্ষণ

আপনার গুণে অবলায়ে কোরো মার্জনা কোরো মার্জনা।

এই কবিতার পূর্বে কয়েকটি সাঙ্কেতিক চিহ্ন বসাইতে হইবে।

কোরো—[ক]

মার্জনা—[খ]

এই দুইটি মাত্র সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহৃত হইল, কারণ উক্ত দুইগুলিতে এই দুইটি শব্দই পুনঃপুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে। এইবার নূতন রীতিতে পড়া যাক—

প্রিয়তম আমি তোমারে যে ভালোবেসেছি
দয়া করে [ক] [খ] [ক] [খ]

ভীক পাখী আমি তব পিঙ্গরে এসেছি

তাই বলে ঘর [ক] না রুদ্ধ [ক] না।

যাহা কিছু মোর কিছুই পারিনি রাখিতে

উতলা হৃদয় তিলেক পারিনি ঢাকিতে,

তুমি রাখো ঢাকি, তুমি করো মোরে করুণা।

আপনার গুণে অবলারে [ক] [খ] [ক] [খ]

এইরূপ সঙ্কেতচিহ্ন অবশ্য কবিতার বেলায় বিশেষ উপকারে আসে না। কারণ কবিতার ছত্রসংখ্যা ইহাতে কমে না আর ছত্রসংখ্যা না কমিলে মূত্রণের বেলায় পত্র-সংখ্যাও কমাঁইবার উপায় নাই।

সুতরাং এই সঙ্কেতচিহ্নের ব্যবহার একমাত্র গড়েই স্বফল প্রদান করিবে। ধরুন যদি রবীন্দ্রনাথের সমগ্র গল্পগ্রন্থ হইতে “বিশ্ব” “দাশি” ও “অসীম” এই তিনটি শব্দ উড়াইয়া দিয়া তৎস্থলে ১, ২, ৩, কিংবা অ, আ, ই, এই দুইটি সঙ্কেত ব্যবহার করা যায় তাহা হইলে তাঁহার গল্প-গ্রন্থের আকার একতৃতীয়াংশ কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা। বীরবলের লেখা হইতে “কেননা” এবং “আর” এই দুইটি শব্দ উড়াইয়া দিয়া সঙ্কেতচিহ্ন বসান, দেখিবেন, একই ফল ফলিয়াছে। শরৎচন্দ্রের নাম করিলাম না, কারণ তিনি যে শব্দটি পুনঃপুনঃ ব্যবহার করিয়াছেন, এবং যাহার উপর তাঁহার বই বিক্রয় নির্ভর করে—সে শব্দটি সৌভাগ্য-বশতঃ একটি অক্ষর দ্বারা গঠিত। শব্দটি “তু”। শরৎ বাবুকে “তু” অক্ষরটি শব্দ হিসাবে ব্যবহার করিতে না দিলে তাঁহার mass appeal আর চলিবে না। আরো একটি শব্দ আছে, সেটি “কিন্তু”। কিন্তু এটা খর্জবা নহে।

পরিণেয়ে বক্তব্য এই যে, আমার কথাগুলি ভাবিয়া রেখিবেন।
ইতি—

শ্রীপরশর শর্মা

১৯৭৫-৭৬ সম্মতি-১

হুতীয়া অক্ষর

প্রথম দৃশ্য

হরদাসবাবুর বাটী সন্দের উদ্যান

হর্ষনাথ। দেখুন, সনতের নামে নালিশটা ঠিকে দিয়েছি।

হরদাস। কোন্ নালিশ?

হর্ষনাথ। সেই মঞ্জুরীর টাকার।

হরদাস। বেশ করেছ, কিন্তু আদায় হবে কি?

হর্ষনাথ। বাড়ি-ওয়ারেন্ট করবার ভয় দেখালেই হবে!

ছদ্মবেশী সনতের প্রবেশ

সনৎ। কি কথা হচ্ছিল, হর্ষনাথবাবু?

হর্ষ। আপনার কাছে আর গোপন করবো কেন, সনতের নামে পাওনা টাকার বাবদ নালিশ ক'রে দিয়েছি।

সনৎ। বেশ ক'রেছেন, কিন্তু সেই বাড়ীখানার কথা যেন মনে থাকে।

হর্ষ। সে এখন আপনার বলেই মনে করুন না। কিন্তু দেখবেন, সনৎ যেন কথাটা জানতে না পায়।

সনৎ। বিলক্ষণ! আপনি যদি তাকে না বলেন, আমি বলছি না।

হর্ষ। আমি বলবো! কিন্তু আমার কথা যেন আপনার মনে থাকে।

হর। মাঠার মশায়, আপনার ছাত্রী গান শিখছে কেমন?

সনৎ। এমন মনোযোগ দেখিনি।

হর। মাঠার মশায়, আপনি বৃদ্ধ হলেও আপনার মধ্যে একটি যুবক

নুকিয়ে আছে, নইলে এরই মধ্যে আমার নাতনিকে বশ করলেন কি করে ?

সনৎ। (স্বগত) কি সর্বনাশ, টের পেয়েছে নাকি ? (প্রকাশে)

আপনার আশীর্বাদ আর সঙ্গীতের মাহাত্ম্যে সবই সম্ভব !

স্বর। তা বেশ হয়েছে। এবার আমার নিখিলভারত ছাগপালন সম্বন্ধে বক্তৃতাটা শুনিয়ে দিই।

সনৎ। এর চেয়ে আর আনন্দের কি হ'তে পারে ? কিন্তু যে জন্ত আমাকে বেতন দেন, সে কাজ তো অবহেলা করতে পারি না।

হর্ষ। আপনার কর্তব্য জ্ঞান দেখে অভ্যস্ত খীত হলাম।

সনৎ। কর্তব্য জ্ঞান না থাকলে আর দুবেলা গান শেখাতে আসি ! বেতন তো পাই শুধু এক বেলায় জন্ত।

স্বর। আপনারা তাহলে থাকুন, দেখি আমি পথের মোড়ে কাউকে পাই কি না। আজকাল ভাল কথা শোনবার লোকের একান্ত অভাব। অথচ মনে কর—

ঘাইতে ঘাইতে

এই দেশে খনা লীলাবতী দময়ন্তী সীতা সারিজী গাঙ্গী মৈত্রেয়ী।

এরান

হর্ষ। তার পরে মাষ্টার মশাই, আমার কাজ কতদূর এগলো, মঞ্জরীকে আমার কথা-টখা বলছেন তো ?

সনৎ। বললে বিশ্বাস করবেন না, আপনার কথা শুনে তিনি লাল হয়ে ওঠেন।

হর্ষ। লজ্জায় ?

সনৎ। না, রাগে।

হর্ষ। রাগে ? কি সর্বনাশ !

সনৎ। ভয় পান কেন ? রাগ শেষের তো নানা অর্থ আছে।

হর্ষ। যাক বাঁচলাম। কিছু বলেন ?

সনৎ। একেবারে কিছু না !

হর্ষ। কি বিপদ !

সনৎ। ভীত হবেন না। যে সব কথা তার মনে হয়, তা কি এই বুড়ো মাষ্টারকে বলবার মত ?

হর্ষ। ওঃ বুঝছি ! তা হ'লে সনৎটার আর কোন আশা নেই।

সনৎ। আমি আসবার আগে যেটুকু ছিল তার বেশি নেই !

হর্ষ। তা হলেই হ'ল ! আপনি আমার প্রকৃত উপকারী, আপনাকে তুলছি না ! আচ্ছা, কি-জাতীয় গান আপনি শিখিয়ে থাকেন ?

সনৎ। যাতে সংসারের প্রতি বৈরাগ্য জন্মায়। যেমন ধরুন, শ্রাম-সঙ্গীত, রামপ্রসাদী গান, বাউলের গান, কিম্বা, “মনে কর শেষের সে দিন কি ভয়ঙ্কর” জাতীয় গান !

হর্ষ। আচ্ছা, “শেষের সে ভয়ঙ্কর দিনটা” বোধ হয় মৃত্যু ?

সনৎ। ধরুন, ভগবান্ না ককন, সনতের সঙ্গে মঞ্জরী দেবীর বিবাহ হ'ল, সেটা কি আপনার পক্ষে ভয়ঙ্কর নয় ?

হর্ষ। নাঃ ! তার আর উপায় নেই। আর কিছুদিনের মধ্যেই সনতের বিয়য় সম্পত্তি কিছুই থাকবে না, সবই মঞ্জরীর হরে যাবে।

সনৎ। এবং তারপরে কি ভাবছেন, সে সব হর্ষনাথবাবুর হবে ?

হর্ষ। মাষ্টার মশাই কি যে বলছেন ! চলুন, মঞ্জরীর কাছে যাওয়া যাক।

সনৎ। আমার সঙ্গে গেলে আপনার লাভ নেই। আমার সম্বন্ধে তো

আর কথাবার্তা হ'তে পারবে না। তার চেয়ে আমি গিয়ে
আপনার অন্তরে ভুঁই তৈরী করে রাখি গে—

হর্ষ। তবে আর দেবী করবেন না, এফুনি যান, আমারও কয়েকজন
মকেল বসে আছে। আমি দেখা করে আসি।

উভয়ের গ্রহান

দেবীর গুপ্ত ও মিস্ পুনর্ব্বার এবেশ

গুপ্ত। দেখুন, আপনি জীবনবীমার এজেন্ট, তৎসবেও আপনাকে
ভালবাসি, এর চেয়ে ভালবাসার বড় প্রমাণ কি আর থাকতে
পারে?

পুনর্ব্বার। জীবনবীমার এজেন্টদের ডয়ের কি আছে?

গুপ্ত। না, তেমন কিছু না, শুধু জীবনবীমার এজেন্টদের হাত থেকে
বাঁচাবার জন্য এক জীবনবীমা কম্পানি খোলা দরকার। দেখুন,
আমাদের মিলনের মধ্যে ভগবানের হাত আছে, আমি ডাক্তার,
আপনি জীবনবীমার এজেন্ট!

পুনর্ব্বার। মিলনটা সম্মেহজনক।

গুপ্ত। সম্মেহ-হীন প্রেম মেঘহীন সূর্য্যাস্তের মত। তাতে রঙ নেই,
মোহ নেই। কিন্তু আমার ভালবাসায় আপনার বিশ্বাস হচ্ছে
না কেন? সত্যি বলছি আপনার আগে আমি কোন মেয়েকে
ভালবাসিনি—

পুনর্ব্বার। আমিও সত্যি বলছি, আমিও এর আগে কোন পুরুষকে
ভালবাসিনি।

গুপ্ত। তবে?

পুনর্ব্বার। আপনি এর আগে কোন মেয়েকে ভালবাসলে বুঝতে
পারতেন মেয়ের ভালবাসা ও আমার ভালবাসায় কি প্রভেদ।

গুপ্ত। পড়ে মরুকগে প্রভেদ! আমার ভালবাসার আর একটা
প্রমাণ দিচ্ছি। আমার সব চেয়ে গোপনীয় কথা আপনাকে
আজ বলবো!

পুনর্ব্বার। কি সে কথা?

গুপ্ত। সে শুধু আমার নয়, আমাদের সমস্ত জাতের।

পুনর্ব্বার। মানবজাতির কথা?

গুপ্ত। না, ডাক্তারজাতির কথা।

পুনর্ব্বার। ডাক্তার কি মাহুষ নয়? তাদের আলাদা করে' দেখছেন
কেন?

গুপ্ত। শুনলে, আপনিও আলাদা করে দেখবেন।

পুনর্ব্বার। কি কথা? কোনো নতন ওষুধের কথা নিশ্চয়!

গুপ্ত। ঠিক তার উল্টো!

পুনর্ব্বার। ও: বুঝছি! পুরাণো ওষুধের নতন প্রয়োগ?

গুপ্ত। উহঃ! হ'ল না!

পুনর্ব্বার। এবার বুঝছি। নতন ওষুধের পুরানো প্রয়োগ!

গুপ্ত। না, না, সে আপনি কিছুতেই ভাবতে পারবেন না। ডাক্তারি
শিখবার আগে আমারও স্বপ্নের অগোচর ছিল। দেখুন,
একথা এর পূর্বে কোন ডাক্তার কোনো অব্যবসায়ীকে
বলেনি। এ যদি আপনি প্রকাশ করে দেন, তবে আমার জাত-
ভায়েরা সকলে মিলে আমাকে একঘরে ক'রবে। এ রহস্য
আপনাকে বলবার অর্থ আমার জীবন আপনার হাতে তুলে
দেওয়া।

পুনর্ব্বার। বসুন, বলুন, আমি প্রকাশ করবো না।

গুপ্ত। ঠিক, তিন সত্যি?

পূর্ণবা। হাঁ, তিন সত্যা!

শুভ। আমাদের ডাক্তারিতে কোন ওষুধ নেই।

পূর্ণবা। ওষুধ নেই! বলেন কি?

শুভ। না, একটাও ওষুধ নেই।

পূর্ণবা। তবে এত যে লাল কালো নীল হলদে কত ওষুধ দেখি!

শুভ। শ্রেফ জল!

পূর্ণবা। শুধু জল! তবে এত রঙের ওষুধ হয় কি রকমে?

শুভ। ওই সাধা জল হতভাগ্য রোগীর অসহায় অজ্ঞতার প্রিজন্মে লেগে বিজ্ঞুরিত হয়ে লাল নীল হলদে সবুজ বেগুনী নানা রঙের ওষুধের সৃষ্টি করেছে।

পূর্ণবা। তবে আপনারা ইন্জেকশন দেন, কি?

শুভ। বিস্ময় জল!

পূর্ণবা। তাই বা পান কোথায়? সব তো স্কোরিন।

শুভ। দেখুন আর সব ব্যবসায়ে জিনিষ খারাপ হ'লে কারিগরের দোষ হয়। কিন্তু ডাক্তারিতে সব দোষ রোগীর। আপেক্ষিক আরলের রাজাদের মত ডাক্তারদেরও 'ডিভাইন রাইট' আছে।

পূর্ণবা। যা বলেছেন, একজনকে ছোঁরা দিয়ে খুন করুন, হবে ফাঁসি। মোটর চাপা দিয়ে মারুন, হবে বড় জোর পকাশ টাকা জরিমানা।

শুভ। আর ইন্জেকশন দিয়ে মারুন, পাবেন ফীস বাবদ পকাশ টাকা।

পূর্ণবা। তবে ডাক্তারেরা অস্থির সারায় কি করে?

শুভ। হিপনটাইজ করে!

পূর্ণবা। হিপনটাইজ করে কাকে? রোগীকে?

শুভ। না, রোগীর অভিভাবককে।

পূর্ণবা। আপনি যাই বলুন, আমি একটি রোগীকে চিকিৎসকদের শুধু প্রেসক্রিপশনের জোরে সারাতে দেখেছি।

শুভ। কি রকম?

পূর্ণবা। একটি ছেলের খুব অস্থির হয়েছিল, মরে আর কি? তার বাপ তাকে দেখাবার জন্ত ডেকে আনলো। একজন অ্যালোপ্যাথ, একজন হোমিওপ্যাথ, একজন কবিরাজ, আর একজন সন্ন্যাসী। বাপ বলল, আপনারা পরামর্শ করে ওষুধ দিন। তখন একজন বলে ইন্জেকশন দিই, একজন বলে নাক ভটিকা, একজন বলে স্করফজ, আর একজন দিতে চায় জল পড়া। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, কোনটাই দিতে হ'ল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই রোগীর জ্ঞান ফিরে এল, রোগী সেয়ে উঠল।

শুভ। আপনি ভাবছেন সেটা চিকিৎসকদের গুণে?

পূর্ণবা। তা নয়?

শুভ। নিশ্চয়ই নয়। সেটা ওই পরামর্শ শুনে।

পূর্ণবা। কি রকম?

শুভ। রোগীর অবস্থা একটু জ্ঞান ছিল। তার কানে যেমনি ওই অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক পরামর্শ গেল, অমনি সে আত্মরক্ষার স্বাভাবিক ইচ্ছার বলে শক্তি সঞ্চয় করে উঠে বসল। কারণ সে বুঝতে পেরেছিল ওই পরামর্শ অস্থিরের ওষুধ পড়লে রোগের সঙ্গে সঙ্গে নিজের দফাও একেবারে সেয়ে যাবে।

পূর্ণবা। জানলেন কেমন করে?

শুভ। অনেক দিন থেকে ডাক্তারি ব্যবসা করছি কি না! যাক,

কথায় কথায় ব্যবসার অনেক গুট রহস্য বলে ফেলায়! এখন আমি আপনাদের হাতে।

পুনর্বা। আপনার কথা ভুলবো না। এখন যাই, বিকেলে আবার দেখা হবে। নমস্কার।

প্রস্থান

গুপ্ত। নমস্কার। পুনর্বা, পুনর্বা! আহা, কি সুন্দর নামটি!

ললিতের প্রবেশ

ললিত। কি মেজর গুপ্ত, এখানে ঠাড়িয়ে কি ভাবছেন?

গুপ্ত। এই যে ললিতবাবু, আপনার কথাই ভাবছিলাম!

ললিত। আমিও আপনার কাছেই আসছিলাম।

গুপ্ত। বটে! মণিকা দেবীর খবর কি?

ললিত। কে জানে। অনেকদিন তার খোঁজ রাখি না। দেখুন, মেজর গুপ্ত, জীবনে আমি এখন এক নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করেছি।

গুপ্ত। আর আমি জীবনে পুরাতন অভিজ্ঞতার এক নতুন রূপ দেখতে পেয়েছি—অর্থাৎ গ্রেম ভিনিঘটা। যে ঠিক কি তা আমি আজ বুঝতে পারছি। এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি জগতে আর কিছু নেই।

ললিত। মেজর গুপ্ত, এ কথা খুবই সত্য। তাহীতো গ্রেমের অপর এক নাম আরি রস।

গুপ্ত। ও কথা একেবারে মিথ্যে ললিতবাবু। গ্রেমের নাম অনাদি রস, কারণ তার আরস্ত নেই।

ললিত। এবং শেষ নেই।

গুপ্ত। জীবনের সে যে সিংহাসন।

ললিত। তার চেয়ে বলুন, ষিডিক ষার।

গুপ্ত। তার চেয়ে বলুন, বাতায়ন, যার ভিতর দিয়ে মন চলে যায়, কিন্তু দেহ যেতে পারে না।

ললিত। ঠিক। সেই বাতায়নিকার স্পর্শ পেতে হলে নীচে থেকে রসি বেয়ে উঠতে হয়—

গুপ্ত। রসি নয় ললিত বাবু, রস।

ললিত। ঠিক।

গুপ্ত। থামবেন না ললিত বাবু, এ সম্বন্ধে আরও ছুচার কথা বলুন!

ললিত। প্রেম, সমুদ্রের মত প্রতিপদ থেকে প্রতিপদক্ষেপে জোয়ারের বাহু বাড়িয়ে বাড়তে বাড়তে যায়—

গুপ্ত। এবং সমুদ্রের মতই চির পূর্ণ, তার ক্ষয় বৃদ্ধি নেই—

ললিত। এবং চিরদিন যায় অস্ত্র পাগল, সেই চক্রকে কখনো পায়না। প্রেম, সমুদ্রের মতই প্রিয়তমের অস্ত্র সর্বভাঙ্গী। তার অস্ত্রের যে স্থা ছিল, তা বেগেছে সে চাঁদের দ্বন্দ্ব, তাহীতো চাঁদ স্থধাকর—

গুপ্ত। এবং সমুদ্রের মতই প্রেম লবণাক্ত, যেন অশ্রুজলে ভরা।

ললিত। বাঃ বাঃ বেশ বলেছেন, মেজর গুপ্ত। প্রেম আর অশ্রু এক পদার্থেরই অবস্থান্তর, যেমন বরফ আর জল। কিন্তু সমস্তাই—জল থেকে বরফ, না বরফ থেকে জল? প্রেমের আগে অশ্রু, না অশ্রুর আগে প্রেম?

গুপ্ত। এ প্রশ্নের মীমাংসা আজো তো কেউ করতে পারল না। শুধু এইটুকু জানি, প্রেমের সমাধি বিবাহে!

ললিত। ঠিক! পঞ্চরসের পঞ্চম বিবাহে! মেজর গুপ্ত, বিঘটনা বেশ জমেছে আর একটু চালান।

গুপ্ত। অবিবাহিত প্রেম ধূমকেতুর মত, পৃথিবীর কাছে আসে কিন্তু

ধরা দেয় না, উতাপ দেয় কিন্তু আলো দেয় না, প্রসারিত বাহু দিয়ে পৃথিবীকে একবার মাত্র আলিঙ্গন করে অসীম শূন্যে আবার ছুটে চলে যায়—

ললিত। আর বিবাহিত গ্রেম রাশি রাশি অলঙ্ঘ উদ্ধার মত পৃথিবীতে পড়ে, পড়তে পড়তে ভঙ্গ হয়, ভঙ্গ হয়ে কোন চিহ্ন রাখে না, দিনের আলোয় কলঙ্কিত মুখ মাটির নীচে ঢাকে।

গুপ্ত। ঠিক বলেছেন! তবু আমি তাকেই বিবাহ করবো।

ললিত। আমিও তাকে বিবাহ করবো।

গুপ্ত। কে সে?

ললিত। কে সে?

গুপ্ত। এই দেখুন তার ছবি।

ললিত। এই যে তার ছবি।

উভয়ে।

বিম্মিতভাবে চোকার

পূনর্গবা! এবে পুনর্গবা!

ললিত। এ ছবি পেলেন কোথায়?

গুপ্ত। ছবি ছাড়ুন, এ মাছ পেলেন কোথায়?

ললিত। (জুঁক ভাবে) সাবধান। নারীর সম্মান রেখে কথা বলবেন, ইনি মাছ নন, নারী!

গুপ্ত। আমি ডাক্তার। নয় কি নারী তা আমি জানি, কিন্তু এ ফোটো আপনাকে কে দিলে?

ললিত। আমিও ঠিক ঐ কথা জিজ্ঞাসা করছি। শিগগির এর কৈফিয়ৎ দিন।

পরস্পরের চিত্র বিনিময়

গুপ্ত। কৈফিয়ৎ দোব তোমায়? লোকার!

ললিত। ভাগ্যবত!

গুপ্ত। রাস্কেল!

ললিত। ইন্ডিয়ট!

গুপ্ত। এমনি করে নারীকে প্রতারণা?

ললিত। এ ভাবে পুরুষকে প্রতারণা চলবে না!

গুপ্ত। এ অপমানের প্রতিশোধ দোব!

ললিত। পুনর্গবা, তোমার অপমান আমি দূর করবো!

গুপ্ত। পুনর্গবা, কোন ভয় নেই! You Lalit, তোমাকে আমি বন্দ-যুদ্ধে, যাকে বলে ডুয়েলে আহ্বান করছি!

ললিত। আমি এ আহ্বান গ্রহণ করলাম। পুনর্গবা! তোমার চোখের চাহনির অন্তরে—

গুপ্ত। মুখ সামলে! অনাস্থীয়া অপরে-প্রাণসমর্পিতা যুবতীকে সন্দেহিত করবার প্রথা ও নয়—

ললিত। তোমার পক্ষেও ঠিক একথা বাটে।

গুপ্ত। বাজে কথা যাক, কোন অস্ত্রে আপনি বন্দ যুদ্ধ করবেন? তরোয়াল, বন্দুক, ছোরা, না কি? মনে রাখবেন আমি যুদ্ধে গিয়েছিলাম—

ললিত। সে ছড়ি নাচানো দেখেই বুঝতে পারা যায়। যুদ্ধে গিয়ে তো শুধু টেক খুঁড়েছিলেন, অতএব আপনার পক্ষে কোদালই ভাল।

গুপ্ত। ফের অপমান! রাস্কেল, ইপিড! পুনর্গবা, তোমার কৃপার—

ললিত। সাবধান ও নাম আর মুখে এনোনা।

গুপ্ত। বটে! কাল কখন কোথায় লড়তে রাজী?

ললিত। তোমার বখন যেখানে ইচ্ছে।

গুপ্ত। বেশ, কথা রইল। কাল বিকেলে, আমার বাড়ীতে। আর, অস্ত্র ?

ললিত। কোদাল কিবা ডাক্তারি ছুরি।

গুপ্ত। আমাকে অপমান কর ক্ষতি নেই, কিন্তু আমার ব্যবসায়কে অপমান করোনা। আমি তোমাকে খুন, খুন করবো; 'ডুয়েলে' যেটুকু বাকি থাকবে সেটুকু ডাক্তারি ক'রে সাবড়ে দেবো! পুনর্নবাকে অপমান, আমার পুনর্নবা। ওঃ—

এস্থান

ললিত। আমার পক্ষে বশুক, ছুরি, ছোরা, তলোয়ার সবই সমান, কেবল ভরসা তোমার উপরে পুনর্নবা! তোমার চোখের দীপ্তি আমার অস্ত্র শালিত করে তুলুক। বাড়ালীর ঘর-কুনো জীবনের মরবার এর চেয়ে মহত্তর হুযোগ আর জুটবে না। কিন্তু ঈডিয়টটাকে আমি দেখাবো! পুনর্নবা! পুনর্নবা!

এস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

মঞ্জরীর কক্ষ

মঞ্জরী গান গাহিতেছিল

গীত

গান শেষ হইলে ছদ্মবেশে সনৎ প্রবেশ করিল

সনৎ। আচ্ছা মঞ্জরী, পুনর্নবা কে ?

মঞ্জরী। কি জানি কে!

সনৎ। একবার দেখতে হচ্ছে।

শনিবারের চিঠি

মঞ্জরী। আর দেখে কাজ নেই। যে দেখছে, সেই মজছে।

সনৎ। কিন্তু ললিতকে তো বাঁচাতে হবে। ওটা যে এত বোকা!

মঞ্জরী। ছ'জনে মারামারি করবে, শুনে অবধি মণিকা কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছে। ডাক্তার গুপ্ত বে জোয়ান!

সনৎ। তাই তো কি করা যায়? মণিকা গিয়ে ললিতকে ধরুক না!

মঞ্জরী। সে লজ্জার মাথা খেয়ে ললিতের কাছে গিয়েছিল। সে যে কি মাথামুগ্ধ বলল, মণিকা কাদতে কাদতে ফিরে এল।

সনৎ। তবে ?

মঞ্জরী। আমি হর্ষনাথবাবুকে দিয়ে পুনর্নবাকে একবার ডেকে পাঠিয়েছি, সে এতখনি আসবে, তুমি তাকে বুঝিয়ে বল।

সনৎ। বেশ, তাই বলবো।

মঞ্জরী। ওই শোন সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ, কে যেন আসছে, বোধ হয় হর্ষনাথ বাবু, চুপ করে থাকা ভাল নয়, একটা গান আরম্ভ কর।

সনৎ। গান করুন—

‘মনে কর শেষের সে দিন কি ভয়ঙ্কর

সেদিন সবাই কইবে কথা, তুমি রইবে নিরুত্তর’

হ’ল না হ’ল না! আর একটু চড়িয়ে; হ’! এইবার হয়েছে।

মঞ্জরী। (নেপথ্যের দিকে কান পাতিয়া) যাক্ চলে গিয়েছে।

(নেপথ্যে পুনর্নবা। মঞ্জরী দেবী আছেন ?)

মঞ্জরী। ওই বোধ হয় পুনর্নবা এসেছে, আমি দরজা খুলে দিচ্ছি, তুমি আবার না মজলে বাঁচি।

দার মোচন, পুনর্নবার প্রবেশ

এই যে আহন, নমস্কার; এইখানে বসুন। ইনি আমার সঙ্গীত শিক্ষক।

পুনর্বা। নমস্কার! আমায় কি লজ্জা ডেকেছেন মঞ্জরী দেবী?

সনৎ। দেখুন, মণিকা মঞ্জরী দেবীর বন্ধু। তিনি বন্দ্যুচ্চের কথা শুনে একেবারে ভেঙে পড়েছেন। এখন একমাত্র আপনিই তাঁকে রক্ষা করতে পারেন। আমি মঞ্জরী দেবী, মণিকা, এমন কি সমস্ত মাহুঘজাতির নামে আপনাকে অহরোধ করছি, হৃদয় পুরুষকে অপঘাত থেকে এবং একটি নারীকে অপমৃত্যু থেকে আপনি রক্ষা করুন!

পুনর্বা। দেখুন, আপনি বৃদ্ধ, প্রেমের মহিমা বুঝতে পারছেন না; প্রেমের লজ্জা মাহুঘ কি না করে!

মঞ্জরী। (রাগত ভাবে) একজন বৃদ্ধকে বয়স তুলে অপমান করা কি আপনার উচিত?

সনৎ। (বাধা দিয়া) আহা আপনি চূপ করুন না, বয়সের কথা তুললে বৃদ্ধের অপমান হবে কেন?

মঞ্জরী। আপনার মত এমন কঠিন হৃদয় দেখিনি। মনে রাখবেন, বাইরেটা মেয়ে মাহুঘের মত হলেই সবাই মেয়ে মাহুঘ হয় না।

সনৎ। এবং কিছু যদি মনে না করেন, তবে বলি, বাহিরের বৃদ্ধ হ'লেই লোকে ভেতরে ভেতরে হয় তো সত্য বৃদ্ধ হয় না।

পুনর্বা। আমি প্রতি মুহূর্তেই তা বুঝছি, আপনারা বরক কখাটা স্মরণ রাখবেন।

সনৎ। কেমন করে স্মরণ রাখবো বলুন; এর আগে তো আপনার মত দৃষ্টান্ত আর দেখিনি!

পুনর্বা। এবং আমি নিশ্চয় বলছি, এর পরও, আমার মত দৃষ্টান্ত আর দেখতে পাবেন না।

সনৎ। ভগবান কি একা আপনাকেই এমন অতুত করে দৃষ্টি করেছেন?

পুনর্বা। কক্ষণো না। আমাকে এমন অতুত করে' তুলেছে মাহুঘ।

সনৎ। সে কথা সত্যি মাহুঘই যত গোলি বাধায়। তা না হ'লে আজ আপনি সামাত্র ধেমালের লজ্জা হৃদয় যুবককে মৃত্যুর মুখে ঠাঁড় করিয়ে দিতে পারেন?

পুনর্বা। সামাত্র ধেমাল! হয়েছে বৃদ্ধ, আপনি কি বুঝবেন? পড়েন নি, ইউরোপে প্রণয়িনীর লজ্জা বীরেরা পরম্পরকে বন্দ্যুচ্চ আত্মনি করতো?

মঞ্জরী। ভারতবর্ষে কখনই এমন হ'তে পারত না। আপনি ভারতীয় নারী নন।

পুনর্বা। একথা আমি একশ বার স্বীকার করবো।

মঞ্জরী। শুধু তাই নয়, বাইরে থেকেই আপনি জীলোক, ভিতরটা আপনার পুরুষের মতই কঠিন।

পুনর্বা। এ কথাও আমি স্বীকার করছি।

মঞ্জরী। কিন্তু জানবেন আমার বন্ধু সাধারণ মেয়ের মত নয়।

পুনর্বা। তাঁকে বলবেন, আমিও অসাধারণ মেয়ে।

সনৎ। তা না হ'লে আর হৃদয় পুরুষকে এমন অপ্রস্তুত করতে পারেন!

পুনর্বা। কেন তাঁদের তো প্রস্তুত হবার সময় দিয়েছি।

মঞ্জরী। আপনাকে জোড় হাত করে অহরোধ করছি, আপনি এ মারাত্মক খেলা থেকে তাদের নিরস্ত করুন।

পুনর্বা। আপনারা তাঁদের বলুন না!

মঞ্জরী। বলছি, বলছি, একশবার বলছি, কিন্তু এ ক্ষেত্রে নারী আপনি, আপনি রক্ষা না করলে আর উপায় নেই।

পুনর্নবা। তবে আমার দ্বারাও সম্ভব নয়।

মঞ্জরী। কেন? আপনি কি নারী নন? কত্কা নন, ভাবী বধূ, মাতা কিছুই নন? সীতা সারিজী শকুন্তলা দময়ন্তী জ্যোপদীর উত্তরাধিকারী নন?

পুনর্নবা। বললে বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু সত্যি ও সব আমি কিছু নই।

মঞ্জরী। (ক্লান্তভাবে) তবে ছোটো লোককে যমের ছুয়োরে এগিয়ে দিয়ে ক্ষান্ত হোন।

পুনর্নবা। কিন্তু আমিই বা কি করতে পারি। তাঁরা দুজনই যে আমাকে ভালবাসেন।

মঞ্জরী। মণিকা বলে পাঠিয়েছেন, আপনি ললিতবারুক বদি বিয়ে করেন, তাতে তাঁর আপত্তি নেই। কিন্তু বন্দ্যুদেবের মধ্যে যাবেন না।

সনৎ। কিছা ইচ্ছা করলে মেজর গুপ্তকেও বিবাহ করতে পারেন।

পুনর্নবা। এই তো আবার মুগিল বাধলো! যে দুজন সেই দুজনই রইল। এখন কি করি?

মঞ্জরী। আপনি যাকে খুসী করুন।

পুনর্নবা। আমার কাউকেই ইচ্ছা করে না। আমার বিশ্বাস আমি কখনো কোন পুরুষকে বিয়ে করতে পারবো না।

মঞ্জরী। আপনার ভেতরের পরিচয় পেয়ে আমাদেরও সেই সন্দেহ হচ্ছে।

পুনর্নবা। আমার ভিতরের প্রকৃত পরিচয় পেলে সন্দেহ দূর বিশ্বাসে পরিণত হ'ত।

মঞ্জরী। আপনার প্রকৃত পরিচয় যেন কখনই পেতে না হয়।

পুনর্নবা। হয়ত শীঘ্রই পাবেন।

সনৎ। আপনার কাছে অহুতোধে কিছু হবেনা দেখছি। কিন্তু মনে রাখবেন, আপনি হু'জন মেয়ে আর একজন বুদ্ধের মনে যে কষ্ট আজ দিলেন তেমন কষ্ট কখনো কোন মেয়ে দিতে পারতো না।

পুনর্নবা। এ কথা মিথ্যা নয়। কিন্তু আমিও একটি কথা বলি, আপনার চুল দাড়ি পেকেছে বটে, বয়সে বৃদ্ধ হলেও বার্ডকোর গভীরতা আপনার মধ্যে নেই। থাকলে নারীর অন্তরের ব্যথা বুঝতে পারতেন।

সনৎ। এতবড় অপমান আপনার কাছ থেকে আশা করিনি। আমাকে নীরোঁধ বলুন, মুর্থ বলুন, সধ করবো। কিন্তু বৃদ্ধ নই প্রকৃতিসত্তরে একথা কেন বলবেন? যদি আমি বৃদ্ধ না হই, তবে জানবেন, আপনিও নারী নন।

পুনর্নবা। আপনার কথা আপনি জানেন, কিন্তু আমার পুরুষে নারী বলে মনে করলেও আমি নারী নই।

সনৎ। আপনার সঙ্গে তর্কে লাভ নেই। যিনি আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন তাঁর সঙ্গে বোঝাপড়া করুন।

সন্তের গ্রন্থান

মঞ্জরী। দেখুন মেয়েমানুষের রূপ ভালো, কিন্তু তার অহঙ্কার ভালো নয়, কিন্তু যার রূপ নেই, শুধু সাজসজ্জা দিয়ে মন ভোলানো ব্যবসা, তার সেই সাজসজ্জাগুলো গেলেই মন ভোলাবার ক্ষমতা থাকে। একথা নিশ্চয় জানবেন।

পুনর্নবা। সেটা নিশ্চয় জেনেছি বলেইতো ভরসা করে' হু'জন পুরুষকে বন্দ্যুদেব আহ্বান করতে পেরেছি।

মঞ্জরী। মনে রাখবেন, এ সাক্ষসজ্ঞ। বেশিদিন স্থায়ী না হ'তেও পারে।

পুনর্নবা। সত্যি বলছি এই পোষাকগুলোর ভার আমিও আর বইতে পারছি না।

মঞ্জরী। বলেন কি, এত সাধের সাক্ষপোষাকগুলো খুলবেন, তা হলে যে সব ফাঁক হয়ে যাবে!

পুনর্নবা। আমিও এখন তাই চাই।

মঞ্জরী। দিচ্ আপনার নারী জন্মে!

পুনর্নবা। প্রার্থনা করুন, শীঘ্রই যেন এ নারীজন্ম ঘুচে যায়।

প্রস্থান

মঞ্জরী। উঃ! একি আশ্চর্য মেয়ে! এর সঙ্গে কথা কইলে মনে হয় যেন একটা পুঙ্খমাছের সঙ্গে কথা বলছি।

মণিকার প্রবেশ

মণিকা। মঞ্জরী!

মঞ্জরী। পারলাম না ভাই মণিকা।

মণিকা। পানের ঘর থেকে সব শুনেছি ভাই। আমার অদৃষ্ট মন্দ, শুধু দুঃখ এই তাঁকে বাচাতে পারলাম না। আর যে-ভাগ্য নিয়ে জন্মেছি, জান না হতেই মা বাপ গেল, বড় হ'য়ে যখন ললিতবাবুর সঙ্গে পরিচয় হ'ল, তখনই বোঝা উচিত ছিল এত স্বপ্ন আমার অদৃষ্টে সঙ্গ হবেনা।

কাঁদিতে কাঁদিতে সোফার উপরে মুণ্ড জিয়া পড়িয়া রহিল

মঞ্জরী। কাঁদিনি ভাই। পাড়া, আমি একথানা পাখা নিয়ে আসি।

প্রস্থান

হর্ষনাথের প্রবেশ

হর্ষনাথ। (গদগদ ভাবে) এত দুঃখ কিসের? না হয় সে গিয়েছে, কিন্তু তার চেয়েও ভো ভোল লোক আছে!

মণিকা। (হর্ষনাথের দিকে চাহিয়া) ভালো লোকের কথা হচ্ছেনা - উকিলবাবু, সে আপনি বুঝবেন না।

কৃত প্রস্থান

হর্ষনাথ। (চক্ষু বিক্ষারিত করিয়া) ওরে সর্বনাশ! আমি ডেবেছিলাম মঞ্জরী! নাম ধ'রে ডাকলে কি বিপদই না হ'ত। অনেক ঠেকে ঠেকে নাম বলা ছেড়েছি। এখন কেবল সর্বনামের উপর দিয়েই কারবার করি। ভগবান পানিনি ভাষ্যতত্ত্বের কি বাহারই ক'রে রেখেছে! 'সর্বনামের' মহিমা তোমার কৃপাতেই বুঝেছি। দেখি আবার গেল কোথায়।

প্রস্থান

মঞ্জরীর প্রবেশ

মঞ্জরী। মণিকা! একি! মণিকা চলে গেছে? (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) থাক! ভালই হয়েছে। কি ব'লে যে ওকে সাধুনা দেব। ওর যে কি দুঃখ তা ভাবতে গিয়ে আমার নিজেরই কান্না আসছে। ভগবান কেন এমন ক'রলে, কেন এমন ক'রলে?

সোফার বসিয়া মুণ্ড জিয়া পড়িল

হর্ষনাথের দ্বারে দ্বারে প্রবেশ

হর্ষনাথ। (খানিকটা দাঁড়াইয়া থাকিয়া) এত কাঁদলে কি ক'রে চলে! সংসারে দুঃখ আছে—কিন্তু সাধুনা দেবার লোকও তো আছে!

মঞ্জরী। (হর্ষনাথের দিকে চাহিয়া) এখন যান, বিরক্ত করবেন না।

কৃত গ্রন্থান

হর্ষনাথ। ৭রে বাবা! এ আবার এল কখন? ভাগ্যিস মণিকা ভেবে নাম ধরে ডাকিনি। আমার যেমন সর্সনাম এদের দেখছি তেমন সর্সশাড়ী, সর্সরাউজ, সর্সধরণধারণ একই রকম। আর এখানে থাকা হবিধার নয়। যাই আইনের বই ফেলে রেখে ব্যাকরণ গৌমুদী থেকে সর্সনামের অধ্যায়টা আর একবার ভাল ক'রে ঝালিয়ে নিইগে।

গ্রন্থান

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্বরদাসবাবু বাটার অলিন্দ

সকালবেলা

স্বরদাস। নাঃ আর আমি পারি না। এখন মঞ্জরীর জন্ম পাজি পাই কোথায়? ছিল সনৎ, ভালো ছিল। তাকেও বিদেশ করলাম। এক আছেন হর্ষনাথ, অবস্থা মন্দ নয়, স্বভাব চরিত্রও ভাল। তিনি আবার রাজি হলে হয়, যাই তাঁর কাছে। বিকেল বেলা আবার আছে পতিতা সমস্তার সভা। ভালো কথা, বক্তৃতাটা তৈরী করে নিতে হবে। যেদেশে সীতা, সাবিত্রী, কুন্তী, দময়ন্তী, মৈত্রেয়ী, গার্গী—

ছথের পাজি লইয়া পুঁটির এবশ

পুঁটি। আচ্ছা দাদাবাবু, তোমার বাড়ীতে তো একমাত্র ঝি এই আমি, তুমি এতগুলো নাম ধরে ডাক কেন? লোককে দেখাও তোমার অনেক গুলো ঝি? কিন্তু কই আমার নাম তো একবারও কর না?

স্বরদাস। তুই বুঝবিনি, তুই এদের দেখিসনি।

পুঁটি। কি সর্সনাশ! তুমি এতগুলো ঝি তাড়িয়েছ, তবে তো আমাকেও কবে তাড়াবে!

স্বরদাস। তুই বুঝবিনি রে, বুঝবিনি।

গ্রন্থান

ভজুয়ার এবশ

ভজুয়া। বলি পুঁটিরাজী, বুড়োর সঙ্গে কি কথা হচ্ছিল? তুই শেষে এই রকম?

পুঁটি। আর তোমার গুটা কি হচ্ছিল গো? পথের মোড়ে দাঁড়িয়ে মেয়ে-ইস্কুলের মোটর গাড়ীর পানে তাকিয়ে ছিলে যে। আমার কি চোখ নেই!

ভজুয়া। পুঁটি, তুই কেবল গাড়ীই দেখিস, ভেতরের খবর তো রাখিস না।

পুঁটি। হাগো, কথাই তো হচ্ছে সেই। মেয়ে-ইস্কুলের গাড়ীর ভেতরে কি খবর পেলে? বলি, দেখলে কি?

ভজুয়া। মিষ্টি রে, মিষ্টি!

পুঁটি। মেয়েদের তোমার মিষ্টি লাগবেই!

ভজুয়া। আরে না, না, শুতে করে মিষ্টি খাচ্ছিল, একেবারে বাস মনোহারি ময়রার মিষ্টি!

পুঁটি। বটেই ত!

ভজুয়া। মাইরি, তোর গা ছুঁয়ে বলছি!

পুঁটি। গা ছুঁয়ো না বলছি!

ভজুয়া। শোন, রাগ করিসনে। মেয়ে-ইছুলে সভা আছে তাই গাড়াতে করে মিষ্টি নিয়ে যাচ্ছিল।

পুঁটি। সত্যি! তা হবে, পুজোর সময় ওদের সভা হয়, সেবার দিদি-মণির সঙ্গে গিয়ে বেবেছি কিনা!

ভজুয়া। পুঁটি, বড় তেঁটা!

পুঁটি। তেঁটা তো আমি কি করবো! জল খাও।

ভজুয়া। পুঁটি, দুধের তেঁটা কি জলে যায় রে? তোর ভাঁড়ে কি?

পুঁটি। ভাঁড়ে যা খুঁশি থাক তোর তাতে কি?

ভজুয়া। পুঁটি বড় ভাল।

পুঁটি। ভালো নয় তো কি? আমার দুধে কখনো জল থাকে না।

ভজুয়া। তোর দুধ নয়, তুই বড় ভালো।

পুঁটি। যাও। ইয়াকি' করো না।

ভজুয়া। সত্যি রে, বড় ভালোবাসি!

পুঁটি। দুধ সকলেই ভালোবাসে।

ভজুয়া। দুধ নয় রে, তোকে পুঁটিরগী!

পুঁটি। কত যে চাৎ শিখেছ!

ভজুয়া। ওরে তোকে রাগী করে তোর দৌলতে আমি রাজা রে।

পুঁটি। দেশ, ভালো হবেনা বলছি!

ভজুয়া। রে রে রাগ করে তুই একবার নখ নাড়া দে!

পুঁটি। চূপ কর!

ভজুয়া। রে রে দে, এখনো শ্রাকরার খার শোধ করতে পারিনি,

সেকত মুখনাড়া দেয়। তার চেয়ে তোর নখনাড়া অনেক ভাল।

পুঁটি। তোমার বড় বাড় হয়েছে, চললাম আমি।

এহান

ভজুয়া। আহা! রাগ করিস কেন, শোন, শোন!

পিছন পিছন এহান

২য় দৃশ্য

হর্ঘনাথবাবুর বৈঠকখানা।

টেবিল, চেয়ার, আলনারী থণাবণ ভাবে সজ্জিত, পাশে একটি

জায়গার পর্দাটানা রহিয়াছে

চন্দ্রনাথ। (পুরুষবেশে) আপনার সব কাজ আমি উদ্ধার ক'রে দিয়েছি। কিন্তু আজ বিকেলে দুজনে সত্যি না মারামারি করে বসে।

হর্ঘনাথ। সে জ্ঞাত ভয় নেই। একটা উপায় করা যাবে। তুমি আর একটা দিন কষ্ট ক'রে ছদ্মবেশে থাকো।

চন্দ্রনাথ। আর ভাল কথা, আপনার সে কাজটাও হয়েছে। ললিত-বাবু সমস্ত সম্পত্তি কালকে মণিকার নামে দানপত্র করে দিয়েছে। এবার চটপট মণিকাকে বিয়ে করে ফেলুন।

হর্ঘনাথ। আচ্ছা, ওকে দিয়ে দানপত্র করালে কি করে?

চন্দ্রনাথ। আমি বললুম, ললিতবাবু, প্রেমের জ্ঞান আপনি প্রাণ দিতে যাচ্ছেন, কিন্তু আরও কঠিন সপ্ত আমি চাই।

তিনি বললেন, কি চাই? আমি বললাম, যাকে আপনি এখন

মোটো দেখতে পারেন না, সেই মণিকাকে আপনার সম্পত্তি দান করতে হবে, তবে বৃদ্ধবো প্রেম সর্বস্বত্যাগী। তিনি তখনই তাঁর সম্পত্তি মণিকার নামে দানপত্র করে দিলেন।

হর্ষনাথ। তোমাকে একশ ধন্যবাদ! এবার মণিকাকে আয়ত্ত ক'রে ফেলতে হবে।

চন্দ্রনাথ। কিন্তু আর দেরী করবেন না। সব ফাঁস হয়ে যেতে কতক্ষণ! আমি বাসায় চললাম।

এখানে

হর্ষনাথ। যাক, জালে ছোটো মাছই পড়েছে, এবার টেনে তুললেই হয়।

মণিকার প্রবেশ

হর্ষনাথ। একি আপনি! কখন বসুন, আপনার কথাই ভাবছিলাম।

মণিকা। দেখুন, আমাকে দেখে আপনি আশ্চর্য্য হয়েছেন! আমি কুমারী, আপনার কাছে আমার একাকী আসা উচিত নয়, কিন্তু যে বিপদে পড়লে মাছঘের-বুদ্ধি নাশ হয়, আমি সেই বিপদে পড়েছি।

হর্ষনাথ। আপনার জন্ত আমি সব করতে পারি।

মণিকা। সেই জন্তই এসেছি। আপনি ললিতবাবুর বন্ধু, আমাকেও স্নেহ করেন।

হর্ষনাথ। নিশ্চয়। নিশ্চয়।

মণিকা। তাঁকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করুন! তিনি সংসারের কিছু জানেন না, তাঁকে অপঘাতের মধ্যে যাওয়াবেন না। আমি নিজে পুনর্ব্বা দেবীকে বলেছিলাম, তিনি রাজি হলেন না।

হর্ষনাথ। বেশ তো!

মণিকা। আপনাকে এ কাজটা করতেই হবে। আমি জোড় হাতে আপনাকে অহরোধ করছি!

হর্ষনাথ। কিন্তু ললিতের শিক্ষা হওয়া উচিত, সে আপনাকে যেমন কষ্ট দিয়েছে—

মণিকা। দেখুন এখন সে সব মনে করবার সময় নয়। যেমেরাম্ভব হলে বসন্তেন, আমার কি বিপদ। ললিতবাবুর যা কর্তব্য তিনি তা ক'রবেন, আমার কর্তব্য আমি ক'রবো।

হর্ষনাথ। বেশ, আমি প্রাণপণে চেষ্টা ক'রবো।

মণিকা। যাক, নিশ্চিন্ত হলাম। আপনার কাছে আমি চিরঋণী থাকবো।

হর্ষনাথ। থাক, থাক।

ভৃত্য রামচরণের প্রবেশ

রামচরণ। বাবু, ললিতবাবু আসছেন।

এখানে

মণিকা। ললিতবাবু! কি সর্ব্বনাশ, আমি এখন ঘাই কোথায়?

হর্ষনাথ। যাবেন কেন, থাকুন না।

মণিকা। না, না, তাঁর জন্তে যে আমি অহরোধ করতে এসেছি তা জানাতে চাই না। ওই যে তিনি এসে পড়লেন!

হর্ষনাথ। তবে এক কাজ করুন। এই পর্দাটার আড়ালে গিয়ে একটু অপেক্ষা করুন।

মণিকা। আমি যে এসেছি, তা বলবেন না।

মণিকা ঘরের এক কোণে পর্দার আড়ালে লুকাইল

ললিতের প্রবেশ

হর্ষনাথ। এই যে ললিতবাবু, আহুন।

ললিত। হর্ষনাথবাবু, আমি চললাম।

হর্ষনাথ। কোথায় যাচ্ছেন?

ললিত। সেই দেশে যেখানে থেকে আজ পর্যন্ত কেউ ফেরেনি।

হর্ষনাথ। আহা, ওসব কি কথা?

ললিত। -যাই আর না যাই মেজর গুপ্তকে শিক্ষা দেব। প্রেমের অপমান সহ্য করা আমার অভ্যাস নয়।

হর্ষনাথ। হাতে ওটা কি?

ললিত। এই জন্মেই তো এসেছি। একখানা দানপত্র। পুনর্বার অহরোধে সব একজনকে দানপত্র করে দিয়েছি, আপনাকে করে দিয়েছি তার এক্সিকিউটার। আপনার কাছেই এটা রাখুন। শুধু বলতে এলাম আপনার মত বন্ধুকে এ কাজের ভার দিয়ে নিশ্চিত মনে কঠোর কর্তব্যের পথে শান্তিতে যাত্রা করেছি।

হর্ষনাথ। সেজ্ঞ ভাববেন না। ওখানা দিন আমাকে। আমি সব ঠিক করে দেবো।

দানপত্র গ্রহণ ও টেবিলের উপরে স্থাপন

রামচরণের প্রবেশ

রামচরণ। বাবু, লোকেনবাবু আসছেন।

গ্রহণ

হর্ষনাথ। সর্বনাশ!

ললিত। কি হয়েছে? কে সে?

হর্ষনাথ। আপনার কাছে আর লজ্জা কি? আমার একজন পাণ্ডনাদার তাগাদায় আসছে। আপনার সম্মুখে অপমান করে যাবে, এই ভয়।

ললিত। তবে আমি একটু আড়ালে যাই।

হর্ষনাথ। তা হ'লে তো ভালই হয়।

ললিত। এই পদ্মাটার আড়ালে যাই।

হর্ষনাথ। (বাধা দিয়া) না, না, ওখানে নয়।

ললিত। (হর্ষনাথকে চুপি চুপি বলিল) ওখানে কাকে লুকিয়ে রেখেছেন? যেন কার শাড়ী দেখা যাচ্ছে।

হর্ষনাথ। (নিম্নস্বরে) আপনার কাছে আর লজ্জা কি। আমার একটি মহিলা বন্ধু।

ললিত। তাই বলুন। আপনি বেশ আছেন হর্ষনাথবাবু। কিন্তু আমি লুকোই কোথা?

হর্ষনাথ। একটু কষ্ট করে, এইখানে এই টেবিলের তলায় ঢুকুন।

ললিত। বেশ তো। তাতে আমার আপত্তি নেই।

ঘরের অন্তর্গতে একটি টেবিলের তলায় ললিতের উপবেশন; টেবিলের উপরের আস্তরণ খুলিয়া পড়িয়াছে

মণিকা। (মুখ বাহির করিয়া চাপা স্বরে হর্ষনাথকে) আমি যে এখানে আছি, তা যেন বলবেন না।

ললিত। (মুখ বাহির করিয়া চাপা স্বরে হর্ষনাথকে) আমি যে এখানে আছি তা যেন কিছুতে প্রকাশ করবেন না।

লোকেনের প্রবেশ

লোকেন। ওহে হর্ষনাথ, চন্দ্রনাথ আর কতদিন এই বেশে—

হর্ষনাথ। (বাধা দিয়া, নিম্নস্বরে ও বাস্তবাবে) আহা চুপ চুপ!

লোকেন। মণিকা নাকি ললিতের অঙ্গ অহরোধ করত—

হর্ষনাথ। (বাধা দিয়া, নিম্নস্বরে) আহা থামো! থামো! (সহজ ভাবে) দেখুন, খতটা আবার বদলে নিন, টাকা এখন আমি দিতে পারবো না।

লোকেন। (বিস্মিতভাবে) থত! টাকা! সে আবার কি?
হর্ষনাথ। হাঁ, শুনে আপনি বিস্মিত হচ্ছেন, কিন্তু যা অসম্ভব—

লোকেন। ব্যাপার কি?
হর্ষনাথ। চলুন, ওখরে গিয়ে সব ঠিক করা যাক।

হর্ষনাথ লোকেনকে একরকম জোর করিয়া টানিয়া লইয়া গেল

মণিকা। (মুখ বাহির করিয়া) বোধ হয় উনি জেনে ফেলেছেন,
আমি এসেছি!

ললিত। (মুখ বাহির করিয়া) ওঃ, সেদিন যুদ্ধ থেকে ক্ষান্ত হবার
জন্ত মণিকার কী সত্যের অহরোধ! বোধ হয় জেনেছে সম্পত্তি
তাকে দিয়েছি। মেয়েমাহুষ কেবল সম্পত্তিই চেনে!

মণিকা। (চাপা কণ্ঠে, মুখ বাহির করিয়া) পোড়া কপাল আমার!
সম্পত্তিই চিনি বটে!

ললিত। (টেবিলের তলে বসিয়া) বাঃ পর্দার আড়ালে পা দুখানি
কি সুন্দর! একটি শাড়ীর লাল পাড় দিয়ে ঘের দেওয়া
দুইখানি নীরব চরণপল্লব! যাই বল, পূর্ণবার পা কিন্তু এমন
সুন্দর নয়। কবি ওই রকম দু'খানি চরণপল্লব দেখেই
লিখেছিলেন,

“বাহা বাহা অক্ষর চরণ চলি যাতা

তাঁহা তাঁহা ধরণী হই মজু গাতা।”

মনে হচ্ছে ওই চরণ যেখান দিয়ে চলে যাবে সেখান দিয়ে
গ্রেমের রাজপথ সৃষ্টি হবে; পৃথিবীর শ্যামলতার কোমলতার
মহলক্ষ্যনা ওর সামনে দিয়ে খুলে যেতে থাকবে। ওই লাল
শাড়ীর আঁচড় কেটে দিয়ে বিধাতা বুঝিয়ে দিয়েছেন যে চরণ
দেখে মরণকে বরণ করবার ইচ্ছে কেন আগে! আজ এই চঠা

ফান্টেনে ৮২ নম্বর বাড়ীতে টেবিলের তলায় ব'সে বেশ বৃকতে
পারছি শুধু চরণপল্লব দেখে মুগ্ধ হ'য়ে কেন শ্রেমিককবি
ব'লেছিলেন “শীতল বলিয়া ও ছুটি চরণে শরণ লইছ আমি।”

মণিকা। (চাপা কণ্ঠে, মুখ বাহির করিয়া) ছিঃ ছিঃ মাহুষ এমন
করেও বলে। ভারি লজ্জা ক'রছে।

ললিত। পূর্ণবার পা কিন্তু এমন সুন্দর নয়।

মণিকা। (চাপা কণ্ঠে, মুখ বাহির করিয়া) যত দোষই ওঁর থাক, উনি
কিন্তু সত্যবাদী। দেখিতো দলিলখানায় পূর্ণবারকে কি দিলেন।

দলিলখানি লইবার জন্ত মণিকা পর্দার বাহিরে আসিতেছিল, কিন্তু

ললিতের কথা শুনিয়া আর বাহির হইল না

ললিত। হে নিম্নক চরণপল্লব, যেপথে আজো তোমার চলাচল আরম্ভ
হয়নি, আমি সেই পথের পথিক, তোমাকে বেটন ক'রে আমি
নুপুরের মত গুঞ্জরণ করবো। ওই চরণ রূপের আমি দাসক
স্বীকার করছি।

পুরুষবেশে চন্দ্রনাথের প্রবেশ

চন্দ্রনাথ। কেউ নেই দেখছি, গেল কোথায়?

ললিত। (টেবিলের তল হইতে বাহির হইয়া) আপনি বুঝি তাঁর
ভাই?

চন্দ্রনাথ। (বিস্মিত হইয়া) একি! ললিতবাবু যে!

ললিত। ঠিক চিনেছেন। আমিও চেহারা দেখে বুঝেছি, তিনি
আপনার দিদি।

চন্দ্রনাথ। (কিংকর্ষাবাহিমুঢ় হইয়া) হাঁ।

ললিত। যমজ ভাই বোন, না? আপনার নামটি কি?

চন্দ্রনাথ। চন্দ্রনাথ।

ললিত। গলার স্বর পর্য্যন্ত এক রকম! আপনারা যমজ? কি বলেন?

চন্দ্রনাথ। হাঁ প্রায় একসঙ্গে জন্মেছি।

ললিত। দেখুন কি ধরেছি। এই যে নাকের কাছে তিলটি পর্য্যন্ত এক রকম! বাস্তবিক যমজ ভাই বোন যেন এক বৃন্তে ছুটি ফুল।

চন্দ্রনাথ। আজ্ঞে হাঁ।

ললিত। দাঁতগুলো পর্য্যন্ত এক ধরণের। চন্দ্রনাথবাবু জানেন বোধ করি আপনার দিদির সঙ্গে আমার—

চন্দ্রনাথ। হাঁ, সব শুনেছি, চলুন ওপরে যাওয়া যাক।

ললিত। আপনার দিদি পুনর্বা দেবী ওখানে আছেন বুদ্ধি?

চন্দ্রনাথ। হাঁ হাঁ, চলুন। পুনর্বা, পুনর্বা! নামটিই তাঁর সর্ষপ!

উজ্জয়ের গ্রন্থান

মণিকা। ঠিক কথাই বলেছে এই নামটিই তাঁর সর্ষপ।

পদ্মার বাহির হইয়া টেকিলের উপর হইতে দলিলটা লইয়া পড়িল

কিন্তু এ কি, তিনি ভালবাসেন পুনর্বাকে অথচ সম্পত্তি দিলেন আমাকে, এর কারণ কি? কিছু তো বুঝতে পারছি না। আর কতক্ষণ এভাবে থাকবো? হর্ষনাথবাবু না এলে যেতেও পারি না, কার-না-কার হুমুখে গিয়ে পড়বো। কিন্তু চহণ-পল্লব সম্বন্ধে উনি বেশ ব'লছিলেন। লোকে বলে উনি কল্লনাবিলাসী, কিন্তু আমার মনে হয় সত্য কথা বলাই ও'র

সভাব। ওমা, ললিতবাবু আবার এই দিকে আসছেন যে!

পদ্মার আড়ালে লুকাইল

কিংকর্ষাবিমুক্ত ললিতের ক্রান্ত প্রবেশ

ললিত। ঈশা, শেষে মিশরের পিরামিড, এর পরে লোকে বলেছে তুমিও নেই! এতদিন দেখলাম, আলাপ করলাম, যার জন্তে প্রাণ দিতে যাচ্ছিলাম, এখন শুনি সে মোটে মেয়েই নয়! আগ্রার তাজমহল, কবে শুনবো তুমি কবর নও, খানা খাবার হোটেল! উঃ কি ভুল! আমার মত বস্তুতাত্ত্বিক যখন এমন ভুল করে স্বপ্নবিলাসীদের না জানি কি চুর্দ্দশা হয়! পুনর্বা আর চন্দ্রনাথ একই ব্যক্তি! পুনর্বার ছদ্মবেশ চন্দ্রনাথ নয়, চন্দ্রনাথের ছদ্মবেশ পুনর্বা! হায় হায় মরীচিকার জন্তে মণিকাকে কি কষ্টেই না দিয়েছি! আর কি সে আমার সঙ্গে কথা বলবে? পুনর্বাকে ভালবাসতাম কিন্তু মনে যেন একটা অস্বস্তি ছিল, আজ বুঝতে পারছি তা মণিকার প্রেমের ক্ষুধার। মণিকা যদি ক্ষমা না করে, তবেই আমার উচিত শাস্তি হয়। কি নিষ্প্রায় কোমল স্বভাব! আমার উচিত দণ্ড হয়েছে। তার কাছে গিয়ে কি করে আবার কথা পাড়বো! ভগবান যদি কোন রকমে আমার মনের কথা তাকে জানিয়ে দিতেন। নাঃ এখন আর তার কাছে যাবো না। শিলং চলে যাই, মাস দুই পরে ফিরবো। সেখান থেকে তাকে চিঠি লেখা যাবে। বোধ হয় আর ক্ষমা করবে না। সেই দলিলটা নিয়ে যাওয়া যাক। আরে দলিলটা কই! দলিল কে নিলে! এই তো এখানেই ছিল। তবে নিশ্চয় এই মহিলাটির কাজ। কি মুন্সিল! কি বলেই বা সোধোন করি। (গলা ঝাঁকার দিয়া) অ'য় যবনিকাস্ত্ররালবর্তিনী

অনুষ্ঠান বহস্যময়ী, আমার দলিলখানা ফিরিয়া দিন। সাড়া নেই! অগ্নি শাড়ীর রক্তপাড়া যেটুকু চরণপল্লবের অধিকারিণী, আমার জরুরি দলিল খানা দিন। এও তো মজা! নিজে তিনি দেখা দেবেন না, কিন্তু অস্ত্রের গোপনীয় দলিল পাঠ করবেন। দেখুন, সোজা ভাষায় বলছি, দলিল দিন নতুবা পর্দা টেনে ফেলবো। আরে, নড়ে চড়ে কিন্তু সাড়া দেয় না! আপনি যেই হোন আমি পর্দা টানলাম। আবার! পর্দা চেপে ধরে! নাঃ, জোর করতে হচ্ছে।

জোর করিয়া পর্দা অপসারণ; মণিকা বাহির হইল

ললিত। এ আবার কি? আপনি, তুমি, মণিকা! নাঃ, আজ কাউকে বিশ্বাস নেই। পর্দার আড়ালে তুমি, টেবিলের তলায় আমি! তুমি এখানে এলে কি করে?

মণিকা। হর্বনাথবাবুকে আপনার জন্তে একটা বিষয়ে অস্থরোধ করতে এসেছিলুম।

ললিত। আমার জন্তে অস্থরোধ করতে? কেন? যাতে ডুয়েল না হয়?

মণিকা। জানি না, হ'তে পারে।

ললিত। আড়ালে থেকে তো মনের কথা শুনে নিচ্ছে? মাগ করবে, না শিল্প ব্যবস?

মণিকা। ছিঃ, আমি কি তোমাকে মাগ করতে পারি! তুমি আমাকে কর।

ললিত। (মাগতাকে জড়াইয়া ধরিয়া) তাই করছি।

মণিকা। লক্ষ্মীটী—ছাড়া।

ললিত ছাড়িয়া বিতে মণিকা; দলিল ছিঁড়িয়া ফেলিল

ললিত। দলিল ছিঁড়ে ফেললে যে?

মণিকা। তোমার মত সত্যবাদীর কাছে আবার দলিলের দরকার কি?

ললিত। সত্যি কথা কোথায় শুনেলে?

মণিকা। ওই যে টেবিলের তলায় বসে কি সব বলছিলে।

ললিত। সব শুনেছ?

মণিকা। স—ব।

ললিত। কি হুট। চল যাই।

উজ্জয়ের গ্রন্থান

চন্দ্রনাথ লোকেন ও হর্বনাথের প্রবেশ

হর্বনাথ। সব কসকে গেল! দেখ, একেই বলে অদৃষ্ট! উঃ, শেষকালে আমারই বৈঠকখানায় বসে ছ'জনে বেশ প্রেম করে গেল! আর আমি যে তিমিরে, সেই তিমিরে।

চন্দ্রনাথ। মন্দ কি? আড়ালে বসে বেশ খিয়েটার দেখা গেল!

হর্বনাথ। সব তোমার দোষ! কেন যে ছদ্মবেশ না পরে এখানে এলে!

চন্দ্রনাথ। সায়াদিন কি সং সেজে থাকার মশাই?

হর্বনাথ। যাক এক কাজ কর। তুমি মেয়ে সেজে এস, তোমাকে যেতে হবে মেজর গুপ্তর কাছে। মোচড় দিয়ে চট করে কিছু টাকা আদায় করে আনতে পার কিনা দেখ। তারপরে বিকেলের গাড়ীতে তুমি দেশে রওনা হও। আর আমি যাচ্ছি মঞ্জুরী কাছে। ওকে ফন্ডালে চলবে না। দেখ, হাতে ছুটো-বাগ থাকবার কি সুবিধে।

চন্দ্রনাথ। চললাম।

হর্বনাথ ও লোকেন কিছুক্ষণ গালে হাত দিয়া বসিয়া রহিল

গ্রন্থান

লোকেন। শেষে তীরে এসে তরী ডুবলো হে ?

হর্ষনাথ। সেই জন্তেই তো লাকিরে ঘাটে উঠতে পারলাম, কিন্তু মাঝগাড়ে ডুবলে কি কাণ্ড হ'ত বলতো ?

লোকেন। দেখ, এখন মঞ্জরীকে আয়ত্ত ক'রতে পার কিনা।

হর্ষনাথ। সেটা অবশ্য হাতছাড়া হবে না।

লোকেন। তা নইলে মুখিলে পড়বে। ওর সম্পত্তি যদি ঈগগিরি না পাও, তবে পাওনাদারের তাড়ায় বিপদ হবে। সবাই খেয়ে আছে এই জন্তে যে মঞ্জরীর সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে।

হর্ষনাথ। তুমি যাওনা ভাই, মোহনলাল মাজোয়ারীকে একবার সান্থনা দিয়ে এস। বল বাবুর বে' লাগলো ব'লে।

লোকেন। বেশ, চললাম। তুমি চন্দ্রনাথকে দিয়ে মেজর গুপ্তর কাছ থেকে কিছু যদি বাগাতে পার দেখ।

এখানে

নারীবেশে চন্দ্রনাথের প্রবেশ

হর্ষনাথ। বাঃ, কার সাধ্য তোমাকে পুরুষ ভাবে। এইবার এস দেখি। আমার কাছে বোস। মেজর গুপ্তর কাছে গিয়ে এইরকম ভাবে গলায় হাত দিয়ে একথানা ছবি তুলবে। সবাই ভাববে এরা প্রণয়ীযুগল।

গলায় হাত দিয়া উপবেশন

কৃত হরদাসবাবুর প্রবেশ

হরদাস। হর্ষনাথ, আঁা একি! ছি: ছি: ছি:!

হর্ষনাথ। (উঠিয়া) হরদাসবাবু, বহন।

হরদাস। বহন! ছি: ছি:! কি দেখলাম, এতো মগ্নেও ভাবিনি!

স্বভী জীলোক নিয়ে তুমি—ওঃ!

হর্ষনাথ। হরদাসবাবু, ইনি জীলোক ন'ন।

হরদাস। (রাগিয়া) দেখ, আর মিথ্যা কথা বলে পাণ বাড়িও না।

একে অন্যায়, তাতে মিথ্যা কথা। আমি জানি হর্ষনাথের স্বভাবচরিত্র ভালো, শেষে সেও—নাঃ আর কাউকে বিশ্বাস করবার উপায় নেই।

হর্ষনাথ। ইনি জীলোক ন'ন।

হরদাস। আবার মিথ্যা কথা! বুড়ো হ'য়েছি ব'লে কি মেয়ে-পুরুষের ভেদ চিন্তে পারবো না? হরি হরি, এরি সঙ্গে মঞ্জরীর বিয়ে দিতে যাচ্ছিলাম!

হর্ষনাথ। হরদাসবাবু, কথা শুনুন।

হরদাস। নাঃ, আর এখানে নয়। আর মেয়েগুলোই বা কি? ছি ছি ছি! এ দেশের কি হ'ল? বেদেশে সীতা সাবিত্রী শকুন্তলা মৈত্রেয়ী গার্গী—সেই দেশে হায় হায় হায়!

মাথা চাপড়াইতে চাপড়াইতে এখানে

চন্দ্রনাথ। দেখুন, আমি পুরুষ সাজলেও বিপদ, নারী সাজলেও বিপদ, এখন করি কি?

হর্ষনাথ। আর আমার বিপদ দেখছ না? মণিকা তো কঁকে গেছেই, এবার বুকি মঞ্জরীও যায়। আমি একবার হরদাসবাবুর বাসায় যাই।

মেজর গুপ্তর প্রবেশ

গুপ্ত। হর্ষনাথবাবু! এ কি আপনি এখানে? আপনি জানেন হর্ষনাথ বাবু, পুনর্বা একজনের বাগদত্তা, তাকে নিয়ে একাকী কি করা হচ্ছে? (আত্মনিঃশ্বাসটাইয়া) একপ্রহ্ন ইওর কনডাক্ট।

হর্ষনাথ। বহন বলছি। আপনি আমার বন্ধু হয়ে—

গুপ্ত। না। আমি আর আপনার বন্ধু নই; আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী।
আই চ্যালেঞ্জ ইউ, কি নেবেন? ছোরা না পিঙ্কল?

হর্ঘনাথ। কিছুই নয়।

গুপ্ত। ইউ মাঠ।

হর্ঘনাথ। (হতভব হইয়া) ইনি একটা কাজে—

গুপ্ত। কোন কথা সুনতে চাইনা। ছোরা-পিঙ্কলে অভ্যাস না থাকে
আহ্ন, মুষ্টি যুদ্ধ করুন।

হর্ঘনাথ। আমি কিছুই করবো না। ও আবার কি কথা!

গুপ্ত। (রাগিয়া) ইউ মাঠ। আপনি আমার বন্ধু বলে পরিচয়
দিতেন! ঝাউগোল, রাঙ্কেল, ট্রেডিং!

হর্ঘনাথের হাত ধরিয়া টানিয়া

নিন, আরম্ভ করুন। এই নিন স্ট্রেট লেকট।

ঘুবি মারিলেন

হর্ঘনাথ। কি বিপদ! মেজর গুপ্ত, ইনি জীলোক নন।

গুপ্ত। আমি বিয়ে করিনি বলে কি জীলোকও চিনি না। এই নিন
রাইট আউট।

আর এক ঘুবি

হর্ঘনাথ। (কাদ কাদ ভাবে) চন্দ্রনাথ, প্রাণ তো যায়, তুমি এক
কাজ কর। নিজের মুষ্টিতে একে একবার দেখা দাও।

চন্দ্রনাথের গ্রন্থান

গুপ্ত। নন্দেল! আর এক ঘুবি দেব নাকি?

হর্ঘনাথ। আর কিছু দরকার হবে না। যথেষ্ট হয়েছে।

দশাই, পূর্ণবা ওর নাম নয়। ও পুরুষ মাহুয়, নাম চন্দ্রনাথ।

গুপ্ত। এগেন? আমি আপনাকে উচিত শিক্ষা দেব। উঠুন
শীগগির।

হর্ঘনাথ শুইয়া গড়িল

চন্দ্রনাথের ধবংশে অবশ

হর্ঘনাথ। (উঠিয়া বসিয়া) এবার বিশ্বাস হল যে ইনি মেয়ে নন?

গুপ্ত। একি! তাইত! তা, এটাই যে এর চন্দ্রবেশ নয়, তা বুঝবো
কি করে?

হর্ঘনাথ। এবার আমি নাচার। বিশ্বাস না হয় ডাক্তারি মতে পরীক্ষা
করে দেখুন।

চন্দ্রনাথ। গুপ্ত সাহেব সত্যিই আমি পুরুষ।

গুপ্ত। মাই গড্! হঁ, অ্যানাটমিতে সেই রকমই দেখছি। পৃথিবীটা
অদ্ভুত স্থান! আই বেগ ইওর পার্ডন। হর্ঘনাথবাবু, এতে
আর একবার প্রমাণ হয়ে গেল মাহুয়কে ভালবাসবার জন্ত
আমার জন্ম হয়নি। মাই গড্! মাহুয় জাতটাকে গলটোনের
মত অপারেশন করে ফেলে দিলে তবে যদি পৃথিবীর উপকার
হয়। মাই গড্! বেগ ইওর পার্ডন, জেন্টল মেন, বেগ ইওর
পার্ডন।

ছড়ি নাচাইতে নাচাইতে গ্রন্থান

চন্দ্রনাথ। ঘুবিগুলো খুব লেগেছে নাকি?

হর্ঘনাথ। তুমি ধাম। পড়ে মরুকগে ঘুবি। তুমি থাকো, আমি
চন্দ্রাম সুরদাসবাবুর বাসায়। সেটা ফকে গেলেই গেছি।

গ্রন্থান

তৃতীয় দৃশ্য

মঞ্জরীর কক্ষ, মঞ্জরী গান গাহিতেছিল

গান

গান শেষ হইলে ছদ্মবেশে সনতের প্রবেশ

সনৎ। মঞ্জরী, মণিকার আর খবর পেলে ?

মঞ্জরী। আজ সে আসেনি। ললিতবাবুকে ধামাতে পারলে না ?

সনৎ। নাঃ সে একেবারে মরীয়া হ'য়ে উঠেছে। দাঁড়াও, এগুলো খুলে পাশের ঘরে রেখে আসি আমি। দরজাটা বন্ধ কর।

উত্তরের বিপরীত দিকে গ্রন্থাগার ও পুনঃ প্রবেশ

মঞ্জরী। কিন্তু গুপ্ত সাহেব যে ক্ষেপে উঠলেন তাই ভাবি। আমিভেটো ওই দান্তিক মেয়েটার মধ্যে কোন রূপ দেখতে পাইনা।

সনৎ। মেয়েমাছুষ কখনো দর্পণ ছাড়া আর কোথাও রূপ দেখতে পায় না।

মঞ্জরী। তোমাকেও কি পুনর্বার ছোঁয়াচ লেগেছে নাকি ?

সনৎ। আশ্চর্য্য কি ?

মঞ্জরী। তবে একথানা লাঠি এনে দিই, লেগে যাও। মেয়ে দেখলে তোমরা যে সব ভুলে যাও।

সনৎ। এত অহঙ্কার! কবি আর সাহিত্যিকরা মিলে তোমাদের মাথা খারাপ করে দিয়েছে।

মঞ্জরী। নিশ্চয়ই। সুকক্কেজ বল, লঙ্কাকাণ্ড বল, সকলেরই মূলে একজন ক্রীলোক।

সনৎ। একে বল বৃষ্টি প্রশংসা? রূপক ভেঙে ওর সরল অর্থ হচ্ছে—
এই যে—ঋগ্ভা বাধাতে একটি মেয়ে দরকার।

মঞ্জরী। বা! তুমিই তো বললে কবিরী আমাদের মাথা খারাপ করে দিয়েছে।

সনৎ। দিয়েছে বইকি। তবে সেটা প্রশংসা করে নয়, ঋগ্ভা করতে উৎসাহ দিয়ে।

মঞ্জরী। কিন্তু আর কতদিন এমন ভাবে চলবে। আমার সর্ব্বদা ভয় হয় কখন যে ধরা পড়ো।

সনৎ। ধরা তো পড়তেই হবে। নালিশ করেছে, দরকার হলে বাড়ি ওয়ারেন্ট করবে, সব শুনেছ তো ?

মঞ্জরী। ইস, আমি হুকুম দিলে তো করবে। আমি একদিন স্থবিধে পেলে দাদা-মশাইয়ের কাছে কথা পাড়বো।

সনৎ। তিনি শুনবেন ?

মঞ্জরী। তুমি জানোনা, তিনি আমাকে কত ভালবাসেন। কেবল ঐ লোকটার পরামর্শে।

সনৎ। আমাকেও তো ভালবাসতেন।

মঞ্জরী। একদিন ধর না তাঁকে। সাদা মন, ধরলেই রাজি হবেন।

সনৎ। স্থযোগ খুঁজছি। এত ব্যস্ততা কি? নালিশ করে আমার বাড়ী ঘর নেবে, তার আগে না হয় লোকটাকে নিলে—

মঞ্জরী। যাও, কিযে বল!

সনৎ। বাজে কথা যাক, যে-জন্ম আমাকে মাইনে দাও তাই করি।
একটা গান শেখো।

মঞ্জরী। তোমার ও শ্রীশান-বৈরাগ্যের গান করতে পারবো না।

সনৎ। বেশ তো একটা রংদার গান শেখো।

মঞ্জরী। বেশি জ্ঞারে নয় কিন্তু।

সনৎ চাপা হুঁরে গান ধরিল এবং মঞ্জরী তাহার ধরে ধর মিলাইয়া গাহিতে লাগিল।

গান শেষ হইলে সনৎ বলিল

সনৎ। কি রকম লাগলো?

মঞ্জরী। মন্দ নয়, কিন্তু সে রকম হল না।

সনৎ। কোন রকম?

মঞ্জরী। সেই যে সেদিন শুনিযেছিলে, পাখীর গান, জংলা পাখী।

সনৎ। না, না, সেটাতো আধ্যাত্মিক গান নয়, তোমার দাদামশায়
শুনলে কি ভাববেন?

মঞ্জরী। তিনি বাড়ী নেই। গাও না লক্ষীটি!

সনৎ। বেশ, তুমি যখন মনিব, আদেশ অমান্ত করি কেমন করে?

সনৎ গান গাহিতে লাগিল

“জংলা পাখী পোষ না মানে

জংলা পোষা হল দায়”

মঞ্জরী। ওই শোন কে যেন আসছে! শীগগির অস্ত্র একটা গান ধর।

সনৎ। কিছু তো মনে আসছে না।

মঞ্জরী। শীগগির, শীগগির, ওই যে এসে পড়ল।

‘জংলা পাখী’ গানটি খাটি রামপ্রসাদী হুঁরে গাহিয়া গেল, কেবল
নাখে মাঝে ‘মা’ ‘ভামা’ প্রভৃতি বসাইয়া দিল
বাহিরে হরদাসবাবু

হরদাস। মঞ্জরী, দরজাটা খোল তো।

সনৎ। (চাপা গলায়) আমার পরচুলা? দাড়ি? শীগগির ও ঘর
থেকে আনো।

মঞ্জরীর প্রস্থান, সনতের জোরে জোরে গান ও

মঞ্জরীর পুনঃ প্রবেশ

মঞ্জরী। তাইতো? সেগুলো গেল কোথায়?

হরদাস। মঞ্জরী, মাটার মশাই, দরজা খুলুন।

সনৎ। (রামপ্রসাদী হুঁরে) পরচুলা কই? মা, ওমা ভ্রামা রে!

মঞ্জরী। বোধ হয় টম নিয়ে পালিয়েছে।

সনৎ। (কর্ণপতর রামপ্রসাদীতে) ওমা ভ্রামা, আমার সব নিলি তুই,
এখন এই বিপদে রক্ষা কর!

হরদাস। এত দেবী কেন? দরজা খুলুন।

সনৎ। আজ্ঞে পাড়ান। ছিটকিনিটা বেজায় আটকে গেছে।

মঞ্জরী। (ব্যাকুল ভাবে) টম, টম, আয়। লক্ষী টম, শীগগির আয়।

হরদাস। দরজা এত আটকে গেল কেন?

সনৎ। কেমন করে বলবো বলুন। আধ্যাত্মিক গানেই বোধ হয়।

(চাপা গলায়) টম এল?

মঞ্জরী। না।

দরজা ধরিয়া টানাটানিতে ছিটকিনি খুলিয়া গেল। হরদাসবাবু

প্রবেশ করিলেন

হরদাস। একি! তুমি, সনৎ? মাটার কই?

সনৎ। তাইতো!

হরদাস। [বিস্মিত ভাবে] তুমি এলে কি করে?

সনৎ। তাইতো, আমি এলাম কি করে!

হরদাস। মঞ্জরী, সনৎ এলো কেমন করে?

মঞ্জরী। কি জানি, আমি তো বুঝতে পারছি না!

হরদাস। তোমরা তো ছেলেমানুষ, তোমরা বুঝবে কেমন করে?

আমিই যে বুঝতে পারছি না!

ললিত ও মণিকার প্রবেশ

মণিকা। এ কী, সনৎবাবু যে!

মঞ্জরী। এ কী, ললিতবাবু যে!

হরদাস। আরে তোমাদের আবার মিল হয়েছে? সুনলাম ঝগড়া করেছ।

ললিত। আজ্ঞে, সে একটা বোম্ববার চুল হ'য়ে গিয়েছিল; মাষ্টার গেলেন কোথায়?

হরদাস। আমি তো বুঝতে পারছি না।

সনৎ। আমিও না।

মঞ্জরী। আমিও না।

মণিকা। আমিও না।

ললিত। আমিও না।

হরদাস। (চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া) দাড়াও, একটু ঠাউরে দেখি। সবই যে গোলমাল লাগছে! সনৎকে বাড়ী আসতে দিই না। অথচ দেখি কিনা মঞ্জরী আর সে দিব্যি ঘরের ভেতর গান করছে!

সনৎ। আজ্ঞে আধ্যাত্মিক গান।

হরদাস। ললিত আর মণিকার বিয়ে ভেঙে গেল, দেখি তারা মনের আনন্দে এক সঙ্গে আছে! বুড়ো দেখে এক মাষ্টার আনলাম—তার দাড়ির একটা চুলও দেখতে পাচ্ছি না। সব ধোঁয়াটে লাগছে। দেখতো, দেখতো ললিত, নাড়িটা ঠিক আছে কিনা?

চাপকোর ভদ্রী করিলেন

পুঁটির চুল দাড়ি লইয়া প্রবেশ

পুঁটি। দিদিমণি, তোমার স্কুরটা এই দেখ কি সব নিয়ে পালাচ্ছিল।

হরদাস। আরে এই যে চুল দাড়ি, কিন্তু মাছঘটা গেল কোথায়?

মঞ্জরী। (হরদাসবাবুর কোলের কাছে পড়িয়া) দাদামশায় মাপ কর। টম্—

হরদাস। কি সর্বনাশ! তোর টম্ শেষকালে মাষ্টারকে খেয়ে ফেললে না কি? আমি বরাবর বলি ওরকম বাধা কুকুর বাড়ীতে রাখি না।

মণিকা। আমি বুঝতে পেরেছি। দাদামশায় মাপ করেন তো বলি।

হরদাস। মাষ্টারকে পেলে যে এখন সকলকেই মাপ করি। সে যে বড় ভাল লোক ছিল, আজ সন্ধ্যায় আমার বক্তৃতা সুনবে বলেছিল।

মণিকা। আপনি ঠেকেছেন দাদামশায়। এই সনৎবাবুই মাষ্টার।

হরদাস। সনৎ মাষ্টার!

মণিকা। হী, সেজে আসতো।

সনৎ। আমাকে মাপ করুন।

হরদাস। এং, আমার যে সব খুলিয়ে যাচ্ছে! তা' ওরকম ক'রে সং সাজতে কেন?

সনৎ। আজ্ঞে আসতে নিষেধ করেছিলেন, তাই—

হরদাস। আরে আমি নিষেধ ক'রব কেন? হর্ষনাথ যে নিষেধ ক'রতে বলত। বাহোক, আচ্ছা ঠকিয়েছ দেখছি। আরে ভায়া, দরজা বন্ধ করে কি পুরুষের পথ বন্ধ করা যায়? যাক ভাই, তোমার উপর অস্ত্রের কুপরাশর্মে অনেক অবিচার করেছে, মনে কিছু করোনা। তোমার আরঞ্জিই বাহাল। এই মঞ্জরী নিয়ে মালা গেঁথে তুমিই গলায় পরে। শীগগিরই একটা দিন ঠিক ক'রতে হচ্ছে। আর হর্ষনাথের চরিত্র যে এমন খারাপ তা

জানতাম না, তার বাড়ীতে হঠাৎ গিয়েছি, দেখি এক সোমন্ত মেয়ে নিয়ে গলা ধ'রে বসে আছে! যাক, তোমরা ব'সো। একসঙ্গে দুটো বিয়ের দিন ঠিক করতে হবে। কিন্তু মঞ্জরী দিদি, এ চুল দাড়িটা ফেলছি না, তুলে রাখবো; বিয়ের সময় এইটি পরে নাত আমাইকে পিড়িতে ব'সতে হবে। আচ্ছা তোমরা বস। আমি জানি কিনা এ যার যা তা হবেই। যে দেশে মনে কর খনা, গাগী, মৈজেরী, লীলাবতী জয়গ্রহণ ক'রেছেন সে দেশেরই তো মেয়ে এরা।

প্রহান

চারিজনকে উপবেশন

মঞ্জরী। মণিকা, তোর হারানিধি পেলি কি করে ভাই ?
মণিকা। ওই যে সোমন্ত মেয়েটির কথা শুনলিনা—ওরই কুপায়।
মঞ্জরী। কিছু যে বুঝিনা স্পষ্ট করে বল।
মণিকা। স্পষ্ট ক'রে পরে বলবো। এখন এইটুকু শুনে রাখ যে সেই মেয়েটি মেয়েই নয়।
মঞ্জরী। পুরুষ। সেই যে কি নাম ? কি শাক যেন—
মণিকা। বলুন না ললিতাবাবু।
ললিত। আর এ'র কথা কেন বলেন ? ইনি পদ্মার আড়ালে লুকিয়ে থেকে পরের কথা শুনে নিয়েছেন।
মঞ্জরী। সে আবার কি ?
মণিকা। পরে হবে এখন। ব্যাপার মন্দ নয়, কেউ দাড়ির আড়ালে, কেউ পদ্মার আড়ালে, কেউ শাড়ীর আড়ালে—
সনৎ। আর ওই যে আসছেন, সর্বনামের আড়ালে।

হর্ষনাথের প্রবেশ

হর্ষনাথ কোন কথা বলিল না। কেবলি দেখিল জুড়ি মিলিয়া গিয়াছে, তাহার হান এখানে নহে, সে একবার চারিদিকে দেখিয়া গমনোন্মুখ হইল

সনৎ। আহুন, আহুন হর্ষনাথবাবু। আমার সেই ঋণের কথাটা মনে করিয়ে দিতে এসেছেন বৃদ্ধি ? তা সেটা শোধ করে ফেলেছি। বিশ্বাস না হয় আপনি আপনার এই ছুটি ক্লায়েটকেই জিজ্ঞাসা ক'রতে পারেন।

মঞ্জরী ও মণিকাকে দেখাইয়া দিল

হর্ষনাথ জহুকিত করিয়া একবার সকলকে দেখিল

ললিত। আর হর্ষনাথবাবু, আপনি তো আমার দানপত্রের কথা সবই জানেন। মণিকা আর আমি ছ'জনেই ছ'জনকে.....
হাত নাড়িয়া সমর্পণের ভঙ্গী করিল

হর্ষনাথ। হাঁ। আচ্ছা।

হর্ষনাথ হন হন করিয়া চলিয়া গেল

সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল

ভজুরার প্রবেশ

ভজুরা। বাবু, আপনি এখানে ? আমি মাসখানেকের ছুটি নিতে এসেছি।

সনৎ। কেন ?

ভজুরা। আজ্ঞে আমার সেই স্যাকরার ধারটা শোধ ক'রতে হবে।

সনৎ। সে আমি শুধে দোবখ'ন।

ভজুরা। আজ্ঞে, সে আপনি শুধতে গেলে হবে না।

সনৎ। কি রকম ?

ভজুরা। আজ্ঞে, পুঁটিকে বিয়ে ক'রতে হবে। পুঁটি স্যাকরার মাসতুতো বোন কি না, শুকে বিয়ে ক'রলেই সব গোল মিটেবে।

সকলের হাত

সনৎ। দেনা শোধের ভাল উপায় বের করেছিল।

ভজুয়া। আজ্ঞে বাবু, এক বাড়ীতে দু'নিয়ম কি ভাল দেখায়?

সনৎ। যা যা, কাম্বিল কোথাকার! এখন বাড়ী যা।

ভজুয়া। 'যে আজ্ঞে' বলিয়া গ্রহণ করিল।

ললিত। তোমার চাকরটি তো বেশ!

মঞ্জরী। বাবুটি কি রকম!

সকলের হাস্য

ললিত। যাক ভাই, আজ এই পরম সুখের সময় তোমরা একটা বেশ রোম্যান্টিক গান গাও। আমি একটা গান রচনা ক'রে এনেছি।

সনৎ। তা বেশ, আমিও স্বর দিয়ে ফেলছি; কিন্তু সকলকে গাইতে হবে।

মণিকা। কিন্তু আমরা যে বেহুৱে।

মঞ্জরী। স্বরপতি বধন এতটা দয়া ক'রেছেন তখন তুচ্ছ গানের স্বরও কি আজ মিলবে না?

সনৎ। আরে না মেলে পরস্পরের কণ্ঠ পাক্কে ধ'রলেই চ'লবে। দাও হে ললিত গানটা দাও—আরে তুমি যে চারখানা কাপি ক'রে এনেছ!

ললিত। ভাই, আমি বস্তুতাত্ত্বিক, হিসেব ক'রে কাজ করি, তোমাদের মত তো আর কল্পনাবিলাসী নই। নাও আরম্ভ কর।

সকলের গান

মণিকা ও ললিত পরস্পরের কাঁধ ধরিয়া দাঁড়াইল, তাহার পার্শ্বে সনৎ ও মঞ্জরী পরস্পরের কাঁধে হাত দিয়া গাহিতে লাগিল।

রূপে ও রূপায়

এই দু' উপায়

প্রেম দেবতার আনাগোনা।

পনির সোনা

হার সে মানায়

তহু দেহে যবে আনে সোনা।

প্রেম আর রূপে

চলে চুপে চুপে

বিশ জুড়িয়া জাল বোনা।

ও গো মন্থ

শোভে তব পথ

অশ্রু হাসির আলপনা!

গান শেষ হইলে হাসিতে হাসিতে ললিত মণিকার দিকে ঘুরিয়া গিয়া তাহার আর একটি হাত ধরিল, মঞ্জরী সনতের দিকে ঘুরিয়া তাহার হাত ধরিল। পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিয়া মুহু মুহু হাসিতেছে এমন সময় ঝড়ের মত স্বরদাসবাবু প্রবেশ করিলেন। স্বরদাস। দেখ ললিত, সনৎ

তখনও উহারা ঐ ভাবে দাঁড়াইয়া। স্বরদাসবাবু

অগ্রসৃত ভাবে চলিয়া বাইতে বাইতে

বলিলেন

ও! আচ্ছা থাক। তোমরা বড় ব্যস্ত, সে পরে বলবো।

ববনিকা

কেন

গৃহিণীর আজ পেয়েছি সকালে চিঠি

পুনশ্চ দিয়ে “চুম্ব নিও” আছে তাতে ;

ছাতের মেয়েটি হাসিয়া চেয়েছে মিটি,

জুতোর পেরেক ঠুকিয়ে নিয়েছি প্রাতে ।

তবু আজ মোর মন কেন খিটি মিটি

—এমন শরদ রাতে !

বিগলিত স্নেহে শরতের চাঁদিনীটি

খোঁচা-গোঁফে মোর আপনা হারায়ে লোটে,

পরমেশ মৃদী ভালই দিয়েছে মিটি

একটিও চোঁয়া ঢেঁকুর ওঠেনি মোটে !

হায় তবু মোর মন কেন খিটি মিটি

—রয়েছি কেন যে চটে’ !

যে শালীটি মোর গৃহিণীর পিঠোপিঠি

তব্বী তরুণী হাবভাবে ঠারেরঠারে

অচিরান্ত যিনি হইবেন এম. এ. বি. টি.

ঠাঁরও চিঠি আজ পেয়েছি কপাল জোরে !

অথচ আমার মন কেন খিটি মিটি

—কে কহিয়া দেবে মোরে !

শরৎ বাবুর ‘সাবিত্রী’ নামে ঝিটি

আসে যদি মোরে ভাবিবে না খুব হেয় ;

শনিবারের চিঠি

৮১

কারণ আজিকে আসিয়াছে ধোপানীটি

ফরসা কাপড়ে সেজেছি কাস্তিকেষু !

অথচ আমার মন কেন খিটি মিটি

—বলিয়া দেবে কি কেহ ?

সহসা ছুঘারে দেখা দিল কাবুলীটি

প্রকাণ্ড দেহ, হস্তে বিশাল ছড়ি !

পোস্ত ভাষায় চোপ্ত সে কাকলীটি,

শুনিয়া বৃষিহু!—উঠিলাম ধড়মড়ি’

নিরুপায় হয়ে চাহিতেছি মিটিমিটি

—হাতে নাই কানা কড়ি !

“বনফুল”

মামা

বাংলা দেশে দুইটি প্রবচন চলিত আছে :—(১) “বাপকো বেটা”, আর (২) “নরনাং মাতুলক্রমঃ”। বাবার বেলায় নিজস্ব মাতুল-ভাষায় * হইল বাপকো বেটা, আর বাবার সম্বন্ধী—মামার বেলায় বিস্তৃত দেবভাষা সংস্কৃতে অর্থাৎ ভাস্কর শ্রীযুক্ত সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ও Dr. Sir George Grierson I. C. S. (Retd.) এর মতামতানুযায়ী আমাদের ‘দিদিমা’-ভাষা দেবনাগরীতে

* বোধ হয় “মা” “বাবার” নিত্য আপনার বলিয়া।

হইল নরাণাং মাতুলক্রমঃ। বাবা ও মামার মধ্যে একরূপ পার্থক্যের কারণ কি? এই প্রশ্ন ছেলেবেলা হইতে এ পর্যন্ত অনেক বার মনে উদয় হইয়াছে; কিন্তু এ পর্যন্ত কখনই তাহার সূচনার সমাধা করিতে পারি নাই, ভবিষ্যতে পারিব কিনা জানি না। কেহ কেহ বলেন যে মামা বাবার আদরের সামগ্রী, সম্বানের পাত্র (বিশেষ করিয়া যদি তিনি ভগিনী অপেক্ষা বয়সে বড় হইয়েন), সেই জন্য বাবার “বড় কুটুম্ব” হিসাবে “মামার” এই মান বা “প্রগতি”। আবার কেহ কেহ বলেন যে পুত্র পিতার সদগুণের ওয়ারিষ-হুজ্রে উত্তরাধিকারী হইয়েন এবং সেই কারণে “বাপকো বেটা” আখ্যা লাভ করিয়া থাকেন; আর মাতুলের অ-গুণের বা অপকীর্তির গুণে ভাগিনেয় বিভূষিত হইয়েন, সে কারণে ভাগিনেয় হইয়েন “নরাণাং মাতুলক্রমঃ”। পিতার গুণাবলি ভাষার পারিপাট্যে ঢাকিবার চেষ্টার আবশ্যকতা নাই; কিন্তু মামার দোষ, (যেহেতু কেহ কষ্ট করিয়া স্পষ্ট ভাষায় দোষ দেখাইবেন না; কানাকে কানা বা খোড়াকে খোড়া বলিবে না ইত্যাদি মহাজনদের উপদেশ) ভাষার, বিশেষ করিয়া “দিদিমা-ভাষার” অঞ্চলে ঢাকা থাকিয়া পরিপুষ্টি পাইয়া সম্পূর্ণ হকদার হইয়াছে। আবার কেহ কেহ ইহার ঠিক উল্টা ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন বাপের দোষ ছেলেতে পায় সে কারণে নিতান্ত আটপোরে চলতি ভাষার “বাপকো বেটা”; আর মাতুলের যাবতীয় গুণ ভাগিনেয়তে সংক্রামিত হয় বলিয়া শুদ্ধ সংস্কৃতে “নরাণাং মাতুলক্রমঃ”। কোন অভিমতটি সঠিক বা বৈতিক তাহা নির্ধারণের ভার পাঠকগণের উপর দিলাম।

—লেখক

এইবারে আমরা “মামা” শব্দের উচ্চারণগত ব্যুৎপত্তি সন্ধান করি। ছেলে ভূমিষ্ট হইবার পর “মা” বলিয়া কানিয়া

উঠে; প্রথমই “মা” “মা” শব্দ উচ্চারণ করিতে শিখে। “বাবা” বলিবার পূর্বে শিশু “মামা” বলিতে শিখে দুইটি বিশেষ কারণে—প্রথম কারণ, “মামা” “মা”র নিকট সম্বন্ধীয়; দ্বিতীয় কারণ শিশুর মাতুলালয়ে (বিশেষ করিয়া যদি সেটি কুলীন সন্তান হইয়েন) বা “মামাবাড়ীতে” জন্ম গ্রহণ। কিন্তু তাই বলিয়া পাঠকগণের মধ্যে কেহ যেন ভুলিয়াও যেন না করেন যে “মামা” “মা”র চেয়ে আপনার বা মিষ্টি সম্বন্ধ। শব্দের দ্বিষ্ট হইলেই যে মিষ্টত্ব বাড়ে না তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হইতেছে মা সরস্বতীর “বর পুত্র” ও সেই মার “বর বর” (লাইনোর বানান) বা “বর্ষর” (সাবেক বানান) পুত্রের পার্থক্য।

“মামা” কিন্তু ভাগিনেয়ের বড় আপনার; অন্ততঃ হিন্দুতে মামা মরিলে জি-রাজ অশৌচ। অপর দিকে ভাগিনেয় কিন্তু মামার তত আপনার নহে। মামার যদি ছেলে মেয়ে না থাকে ত মামী মরিতে না মরিতেই ভাগিনেয় মামার বাড়ীর বিষয় পায়। দায়ভাগের মতে ভাগিনেয় মামার ১২নং ওয়ারিষ। কিন্তু মামার বেলায় তিনি হইতেছেন ভাগিনেয়ের ২৬নং ওয়ারিষ। ইহাই হইতেছে খাতি দায়ভাগের মত। কিন্তু বর্তমানে কলিকাতা হাইকোর্টের সর্ব প্রথম বাঙালী জজ “কালো দোয়ারী”র নজিরের বেলায় ৩৪নং ওয়ারিষ। এইখানে আমরা আশ্চর্যবশত বাঙালী জাতির স্বরণার্থ “কালো দোয়ারী”র সন্দেশে দুই একটি কথা বলিব। কালো দোয়ারীর ভাল নাম ষারিকানাথ মিত্র। বর্তমানেও কলিকাতা হাইকোর্টের একজন জজের নাম ষারিকানাথ মিত্র। ইনি ডি. এল. পাস বলিয়া ডঃ ষারিকানাথ বলিয়া সুপরিচিত। ইনি দেখিতে

খুব সুপুঙ্খ ; রং সাহেবদের চেয়েও ফরসা। কিন্তু “কালো দোয়ারী” দেখিতে খুব কালো ছিলেন। কিন্তু কালো ছিলেন তাহা আমাদের ধারণা হয় না। একদা কালো দোয়ারী ও কৃষ্ণদাস পাল দু জনেই বিভাসাগর মহাশয়ের বৈঠকখানায় উপস্থিত ছিলেন। একজন আধ-পাগলা লোক “জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া উঁহাদের দুই জনকে দেখিতেছিল। বিভাসাগর মহাশয় ঐ পাগলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি দেখিতেছ? পাগলা জবাব দিল, জজ দেখিতেছি। বিভাসাগর মহাশয় প্রশ্ন করিলেন, তুমি কি জজকে চেন? সে উত্তর দিল, না। তখন বিভাসাগর মহাশয় বলিলেন যে এই দুইটি ভক্তলোকের মধ্যে (অর্থাৎ কৃষ্ণদাস পাল ও ষারিকানাথ মিত্রের মধ্যে) যিনি বেশী কালো তিনিই জজ। আর কৃষ্ণদাস পাল/কিন্তু কালো ছিলেন তাহার সত্বেও একটি গল্প আছে। তাহার মৃত্যুর পর কলেজ স্ট্রীটের কাণে তাহার মূরদ স্থাপিত হইবার পর মহারাজা শ্রম যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে প্রশ্ন করা হয়, মূরদটি কি কৃষ্ণদাসের অহরূপ দেখিতে হইয়াছে? মহারাজা উত্তর করেন যে দেখিতে ঠিক হইয়াছে, তবে কালো কষ্টীপাথরের করিলেই রং অবধি দেখিতে পাইতাম।

এই কালো দোয়ারীই সর্ব প্রথম বাঙালী জজ। ইহাকে সর্ব প্রথম বাঙালী জজ বলিতে হয়ত জটিল লেখক আপত্তি তুলিবেন। সেই লেখকের অবগতির জন্ত জানাইতেছি যে ভারতবাসী হইয়া সর্বপ্রথম জজের গদীতে বসেন শচীন পণ্ডিত—তারিখ ২রা ফেব্রুয়ারি ১৮৬০ খৃঃ অব্দে। ইনি শ্রম মহেশ্বর ইক্বাল ও শ্রম তেজবাহাদুর সাক্ষর জাতিভাই, অর্থাৎ কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ, বাঙালী নহেন। আর উক্ত লেখকের গুরু সাহিত্য-পরিশদের অত্যন্ত ব্রজেন বাজুয়ার অবগতির

অন্ত জানাইতেছি যে তাহার সুপরিচিত রাজা রামমোহন রায়ের স্বযোগ্য পুত্র রমাপ্রসাদ রায় হাইকোর্টের সর্বপ্রথম ভারতীয় জজ হইবেন বলিয়া সব ঠিকঠাক হয় বটে, কিন্তু তিনি জজের গদীতে বসিবার পূর্বেই পরলোক গমন করেন। হুতরাং ষারিকানাথ মিত্রই সর্ব প্রথম বাঙালী জজ। ইনি ইংরেজী ১৮৬৭ সালের ১৬ই জুলাই হইতে ১৮৭৪ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত জজের গদী অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ইহার আমাকে ২৬শের পর্য্যায় হইতে ৩৪শের পর্য্যায় নামাইবার হেতু আমরা এই ৩০ বৎসর পরে যতদূর অবগত হইতে পারিয়াছি তাহাতে নিশ্চিত হই যে তিনি বাল্যে সংস্কৃতের পড়া করিতে পারেন নাই বলিয়া তাহার মামা তাঁহাকে মারিয়াছিলেন।

গীহার্য কংগ্রেসী আইন-অমাত্যের দলে তাহার হুত হাইকোর্টের নজীর মানিবেন না। তাহার হুত বলিবেন যে ভাগিনেয় যদি আমার আপনার হয় ত মাথাও ভাগিনেয়ের সমান আপনার হইবে। তাহাদের বিশ্বাসের জন্ত আমরা কেবলমাত্র একটি উদাহরণ দিব। ভায়রাভাইয়ের ভাই আর ভাইয়ের ভায়রাভাই কি সমান আপনার? উভয় সম্পর্কের মধ্যে যে কতখানি প্রভেদ তাহা বোধকরি কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না।

মামাভাগিনেয়ের সম্পর্ক চিরকালই যে এক রকম ছিল, আছে বা থাকিবে তাহা নহে। যুগে যুগে বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে এবং করিবে। সত্যযুগে শনি মামা দেখিবামাত্র গণেশের মুণ্ড উড়িয়া গেল; গণেশকে দয়া জীবন হস্তীমুণ্ড হইয়া থাকিতে হইল। ত্রেতাযুগে রাবণের মামা কালনেমী শতপুত্রপোকাকতার রাবণের ঐ বিপদের সময় হুতমানের সহিত যোগদান করিয়া ‘লভাভাগ’ করিতে বসিল। এখনও ঐক্যের কংসামার কথা কে না জানে? ভাগিনেয়েকে

একবার করতলগত করিতে পারিলে পাথরে আছড়াইয়া শেষ করিতেন। দৈবকীর অপরাপর পুত্রদেরও ঐরূপে শেষ করিয়াছিলেন। একারণ শ্রীকৃষ্ণের জন্মাবধি anti-mama complex ছিল। এবং পালিত- (যেহেতু not a blood-relation) মামা আদান ঘোষের শ্রীরাধিকার ভাগ বসাইয়া “ভাগ-নে” নাম সার্থক করিয়াছিলেন। পালিত-মামার অপর এক variety—গৃহ-পালিত শকুনিমামা দুর্ধোধনকে জন্তু কি না করিয়াছেন! যিনি মহাভারত একবার পাঠ করিয়াছেন তিনি শকুনির কীটিকথা ভুলিতে পারিবেন না; আর যিনি মহাভারত পাঠ করেন নাই, তাহাকে আমরা উহা পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

বর্তমান কলিযুগে ক্রম-বিবর্তনের ফলে মামার অনেক প্রকার variety হইয়াছে। সব রকম variety আমরা জানি না। ছই এক-প্রকার common variety সকলেই দেখিয়াছেন ও জানেন। “মামার দোকান” বাংলায় বিশেষত: কলিকাতায় সুবিখ্যাত। সন্ধ্যার পর মামার ৩খানে কি ভীড়! পূর্বে সাধারণতঃ ধরিয়া মামার আদর অভ্যর্থনা চলিত; কিন্তু হালে পুলিশআইনের কড়াকড়িতে মামাকে রাত্রি ৯ টার মধ্যে দোকান বন্ধ করিতে হয়। মামার একটি ব্যাঙ্কও ছিল—আমরা তখন খুদ কলেজের ছাত্র, লোকমুখে, কাগজে Mama's Bank এর কথা দিন কতক খুব শুনিতাম। তাহার পর কথাটি কিছুদিন চাপা পড়ে। এখন শুনিতেছি নাকি যে মামার ব্যাঙ্ক লালবাতি জ্বলাইয়াছে। মামার ব্যাঙ্কের টিকানাটা জানিয়া রাখিলে ভবিষ্যতের গবেষণাকারীদের সুবিধা হইত। কলিকাতা কর্পোরেশন বদেলী হইবার পর হইতে শুনিতেছি নাকি উহার একটি মামা হইয়াছে। সি, আর, দাশের মৃত্যুর পর তৎসম্বন্ধী এম, এন, হালদার যখন “মামাবাবু” হইলেন তখনই তিনি ইমগ্রু ভমেট ট্রাষ্টের এ্যাসোসার নির্বাচিত হইলেন।

বর্তমানেও নাকি কর্পোরেশনে কি ছোট কি বড় চাকুরী কিংবা কনট্রাক্ট পাইতে হইলে কর্পোরেশনের মাআকে বরণ করিতে হইবে, এবং মামার বরণপদ্ম ছাপ লইয়া আসিতে হইবে। তবে এই মামাকে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়না—ভাই বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন তিনি অশরীরী বা ভূতপূর্ব। * বঙ্গের বাহিরেও মামার প্রভাব কম নহে—মুন্সেয়ে যদি কোন বাঙালী যানেন, ‘মামা’ অবিলম্বে তাহার ফোটো লইবেন। আর মামার সহিত ব্রতচারী নাচের কিরূপ নিকট ও অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ তাহা আমরা কালীঘাট অঞ্চলের একটি ছড়া উদ্ধার করিয়া দেখাইব। মা, দিদিমা কালীঘাটে মাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন, থোকাকে একটি কাঠের পুতুল কিনিয়া দিলেন (‘কালীঘাটের পটের ছাত্র ইহাও শীঘ্র অদ্য ভবিষ্যতে extinct হইয়া যাইবে’) অজিত ঘোষের পট-সংগ্রহের ছাত্র পাঠকগণের মধ্যে বাহারী artist-anthropologist তাহার গোটাকয়েক পুতুল লইয়া গান ধরিল—

“মামা! ধামা বাজাবে?”

কাঠের পুতুল কিনে দিব—

মামী নাচাবে?”

ও সঙ্গে নাচিতে আরম্ভ করিল। গুরুসদয় দত্ত মহাশয় বিলাত হইতে ফেরৎ আসিলে তাহাকে এই বিষয়ে অবহিত হইতে বলিব।

শ্রীশচীন্দ্রকুমার বসু

* প্রবাসীর মামাবাবুকে লেখক বাদ দিয়াছেন—শ. চি. স.

সংক্ষিপ্ত-সার

সাধ এবং সাধ্য এই দুইটি বস্তুর সমন্বয় ঘটিলে মানুষ সাধারণত যাঁহা বাঁহা করিয়া থাকে সাময়িক-পত্র বাহির করা তাহাদের মধ্যে অন্ততম। আমি একদা একখানি সাপ্তাহিক পত্র বাহির করিয়াছিলাম। এটা আমি নিঃসন্দেহে বুঝিয়াছিলাম যে ইহার ভিতর সাধ ও সাধ্যের অংশ যতটুকুই থাক, সাধনার অংশ না থাকিলেও চলে।

কাগজখানি জনপ্রিয় করিবার জন্ত চেষ্টার ত্রুটি করি নাই। তাহাতে একটা প্রমোত্তর বিভাগ খুলিয়াছিলাম। এই অধ্যায়ের মুখ-বন্ধে লিখিয়া দিয়াছিলাম—শুধু বহির্জগতের সংসার নহে, কোন বিষয়ে বিপদে পড়িলেও যথাসাধ্য সহুপদেশ দেওয়া হয়। যোল পৃষ্ঠার কাগজের আট পৃষ্ঠাই এই অধ্যায়টি অধিকার করিত—এবং বিক্রির দিক দিয়া ইহাতে ফল ফলিয়াছিল।

প্রমোত্তর বিভাগে একদিন একখানি চিঠি ছাপি। একটি মেয়ে জানিতে চায় তাহার কি করা উচিত। তাহার মাতা তাহাকে বিবাহ দিবার জন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি যে পাত্রটিকে ঠিক করিয়াছেন—তাহাকে সে চেনে; তাহার সন্দেহ যেটুকু জানে তাহাতে সে বৃত্তিতে পারিষাছে এ বিবাহে সে স্বীকৃতি হইতে পারিবে না। এখন তাহার কি করা উচিত? মায়ের কথা রাখা উচিত কি নিজের বৃত্তিতে চলা উচিত।

কাগজে তাহার উত্তরে লিখিলাম—মায়ের মনে কষ্ট দিয়া নিজের বৃত্তিতে চলা প্রারণ হইলেও—এ ক্ষেত্রে বিবাহ না করাই ভাল।

ইহার পর তাহার নিবট হইতে ব্যক্তিগতভাবে চিঠি পাই। লিখিয়াছে, আমার বৃত্তিই যে অসম্ভব তাহা কেমন করিয়া বুঝিব?

উত্তরে লিখিলাম—বিবাহ দৈব ঘটনা—মানুষের উহাতে কোন হাত নাই। সুতরাং তাহার সঙ্গে আপনার বিবাহ যদি দেবতার অভিপ্রেত হয় তাহা হইলে কেহ তাহা রোধ করিতে পারিবে না—সুতরাং নিজের বৃত্তিতে চলায় আপত্তি কি?

সে লিখিল, মায়ের ইচ্ছায় চলি বা নিজের ইচ্ছায় চলি, বিবাহ দৈব-নির্দিষ্ট হইয়া থাকিলে তাহা যখন রোধ করা যাইবে না তখন মায়ের ইচ্ছায় চলিলে আপত্তি কি?

আমি প্রশ্নটার একটিদিকমাত্র দেখিয়াছিলাম, অন্যদিকটা শ্রীমতী পরিতৃপ্তি দেখিল। আসলে সে উভয় দিকই দেখিল। বুঝিলাম মেয়েটি বুদ্ধিমতী।

তাহার সঙ্গে যে সব চিঠির আদানপ্রদান হইয়াছিল তাহার কতগুলির সারাংশ উদ্ধৃত করিলাম।

আমার চিঠি—আপনি একটি সমস্তার সৃষ্টি করিয়াছেন।—বাস্তবিক ব্যাপারটা দুইদিক হইতেই বিবেচনা করা যাউতে পারে। কিন্তু কোন দিকটা ঠিক তাহা কিছু দিন ভাবিয়া আপনাকে জানাইব।

তাহার চিঠি—ইহা সমস্তা নহে। দেখিতে হইবে এই যে আমাদের মধ্যে ভালবাসা হইতে পারে কিনা।

আমার চিঠি—সেটা পূর্ণেই কেহ গণনা করিয়া বলিতে পারে না। এমন ত দেখা যায় যাহারা পরস্পর পরিচিত নয় তাহাদের বিবাহ হয় এবং সে বিবাহ বেশ সুখের হয়।

দুই সপ্তাহ চিঠি আদানপ্রদানের পর আমাদের দেখা হয় এবং মুখে তাহাকে সমস্ত বুঝাইয়া দিই। সে আমার কথা সমস্তই মানিয়া লয়। পুরুষের বুদ্ধির কাছে উহারা চিরদিনই হার মানিয়া আসিয়াছে। ইহার পর এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। পরিতৃপ্তির বিবাহ নিবন্ধিত

স্পর হইয়াছে। সে খুব সুখেই আছে। অল্প কয়েকদিন হইল
দামাদের মধ্যে যে চিঠি চলিয়াছে তাহার সারাংশ এই—

তাহার চিঠি—থোকা ভাল আছে, মা তোমাকে একবার দেখিতে
যা, অবিলম্বে চলিয়া আসিবে। আমার চিঠি—কালই যাইতেছি।

আর সবই ঠিক আছে কেবল কাগজ চালাইয়া যে টাকাটা নষ্ট
রিতে চাহিয়াছিলাম, কাগজ বন্ধ করিয়া দিয়া সে টাকায় এখন
সার চালাইতেছি।

পৃথিবীর পাগলামি

তিমি মাছের মত এত বিরাট জন্তু আজ পর্যন্ত জন্মায়নি।
ধরের যুগের বিরাটকায় দিনোসর, যার দৈর্ঘ্য বাইশ মিটার
বা চুয়াল্লিশ হাত), তার কঙ্কাল দেখে ধারণা হয় যে, আধুনিক
বাজন্ত সব অতি ক্ষুদ্রাকার। কঙ্কালের গঠনের ভিত্তি ধরে অনেকটা
শস্ত্রতার সঙ্গে ঠিক করা হয়েছে যে, এই প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর ওজন
ল পয়ত্রিশ হাজার কিলোগ্রাম, * অর্থাৎ পয়ত্রিশটা হুটপুট বলদের
জন।

আধুনিক খুব মোটাসোটা ধরনের একটা তিমি মাছ দৈর্ঘ্যে
যেই একত্রিশ মিটার (বাষটি হাত) হয়। তার মাংস কাজে লাগান
বলে তার ওজন অতি সহজেই ঠিক করা যায়। এর ওজন একলক্ষ

পঞ্চাশ হাজার কিলোগ্রাম পর্যন্ত উঠতে পারে। অর্থাৎ হুটপুট
দেড়শটা বলদের বা দুহাজার লোকের ওজন। এই হচ্ছে সেই জন্তুর।
বিবরণ।

এই সমস্ত জীবন্ত সম্পদ ধরবার জন্তে মেরুদেশে নানারকম
expeditions অর্গানাইজ করা হয়। এবং এজচ্ছই উত্তর মেরুর চির-
তুষারাচ্ছাদিত বীপসমূহে শীতের বিরুদ্ধে সর্বদাই সংগ্রাম চলে।
তিমি মাছের সঙ্গে যে লড়াই করা হয়, তার সমস্ত ব্যাপারই আধুনিক।
এই বিরাটকায় মনস্তাত্ত্বিক সম্পূর্ণরূপে লোপ করবার অহরহ চেষ্টা
চলছে, যদিও এটা ঠিক করা হয়েছে যে একবছর শিকার করা বন্ধ
থাকবে।

এখুণে তিমি শিকার করা হয় এরোপ্লেনে চড়ে। অচ্ছাচ্ছ
যন্ত্রপ্রকারের ক্রীড়াকৌতুক আছে, এ শিকার তাদের মধ্যে সবচেয়ে
উত্তেজনাপ্রদ। তবে এটা বলতে হবে যে, এ কাজের জন্ত যে সব
সরঞ্জামের ব্যবহার হয়, তা প্রায় খুঁতহীন অবস্থায় এসে পড়েছে।

আগে আগে একজন vigie (lookout man) আকাশের সীমান্ত-
রেখার দিকে সর্বদাই দৃষ্টি রেখে থাকত এবং যে মুহূর্তেই সে একটা
তিমি দেখতে পেত, অমনি চীৎকার করে জানাত, “Blow ah
blo-o-o-ow”। একমিনিট পরেই জাহাজ থেকে তিমি শিকারের সব
নৌকা জলে নামান হোত এবং লোকে তাতে চড়ে তিমির কাছে
এগিয়ে যেত। বল্লমধারী তখন তার দড়ি দিয়ে বাঁধা বল্লম (harpoon)
ছুঁড়ে তাকে বিধত; কিছুদিন আগেও হাতে করে বল্লম ছোড়ার বদলে
কামানের সাহায্যে একাজ করা হোত।

যাই হোক, এর পরই ভীষণ কাণ্ড ঘটত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে
তিমি নৌকাটিকে তার পিছু পিছু টেনে নিয়ে বেড়াত। তখনকার

* যত কিলো, প্রায় তত দেয়। এক কিলোগ্রাম=২২ পাউণ্ড।

ব্যাপার বাস্তবিকই রোমাঞ্চকর ছিল। প্রায়ই তিনি তার লেজের বাড়ী দিয়ে নৌকাশানা চুববার করে দিত, অথবা কখনও কখনও দড়ির অল্পতাহেতু তিমির টানের চোটে নৌকা উল্টে যেত। এ সাগ্রাম ঘন্টার পর ঘন্টা, কখনও বা দিনের পর দিন চলত; সর্বদাই ভয় থাকত, দড়ি বৃষ্টি হিঁড়ে যায়, তিনি বৃষ্টি পালায়।

বেশী দিনের কথা নয়, গত বৎসরেই আমেরিকার উত্তর উপকূলে একটা তিমি শিকার করা হয়েছিল, যার গায়ে পঞ্চাশ বছর আগেকার Montezuma বলে এক জাহাজের নাম লেখা এক হাপূর্ন গাঁথা ছিল। এ ঘটনা থেকে বোঝা যায় তিনি কতদিন বাচতে পারে; আরো বোঝা যায় যে, তিনি শিকারের প্রাচীন পদ্ধতি এই বিরাট জানোয়ারের কাছে কতই অকেজো ছিল।

আর আজ? যে স্থানে তিনি সন্ধান করা হয়, তার উপর এরোগেনে উড়ে বেড়ান হয়। এরোগেনে থেকে অনেক দূরের সীমারেখা দৃষ্ট হয়। এরোগেনের স্পীড খুব দ্রুতগামী জাহাজের অন্ততঃ দশগুণ। তিমির সন্ধানের জন্য আগে যেমন সময়, তথা অর্থের দরকার হোত, এখনকার কালে সে সব কোন হাদ্যমাই নেই। একজন পাইলট, একজন রেডিও টেলিগ্রাফিস্ট ও একজন অবজারভার, এই তিনজন নিয়েই সাধারণতঃ একটা এরোগেনের সাজ। পূর্ণাপেক্ষা অনেক সহজেই তিনি খুঁজে বের করা যায়, কারণ উঁচু থেকে ডুব-মেরে-খাকা তিমিও বেশ দৃষ্টিগোচর হয়।

একটা তিমি মাছ তার বিরাট কৃষ্ণকৃষ্ণ পূর্ণ করে জিশ থেকে য়াট মিনিট পর্যন্ত নিশাস না নিয়ে জলের তলায় ডুবে থাকতে পারে। কাজেই, আগেকারের look-out-man কর্তৃক তিমির তল্লাস অনেকটা বৈবের উপরই নির্ভর করত।

এভিয়েটার বেতারের সাহায্যে জানিয়ে দেয় তিনি কোণ স্থানে আছে এবং জাহাজকে সেইদিকে পরিচালিত করে। তিনি ধরার নৌকাও এই এভিয়েটার কর্তৃক কার্যস্থানে নীত হয়।

আধুনিক পদ্ধতিতে ক্রমাগত হত হয়ে হয়ে তিমির। এখন একটু সন্দ্বিষ্ট হয়ে পড়েছে; তাদের এখন খুব কমই দেখা যায়। এখন কৌশল ও দ্রুতগামিতার সাহায্য ভিন্ন তাদের হঠাৎ ধরে ফেলার অল্প কোন পন্থাই নেই। এজন্য জাহাজের সব নৌকায় যে সব মোটর বসান থাকে, সবই অতি দ্রুতগামী, অথচ তা থেকে কোন শব্দই হয় না। তাছাড়া হাপূর্ন ছোড়ারও বিভিন্নতা হয়েছে। এখন হাপূর্ন নৈক মধ্যে হয় কোন explosive না হয় electricity চার্জ করা হয়, এবং তিমিও এই কাণদায় বস্মিত হয়ে তৎক্ষণাৎ কাবু হয়।

কিন্তু কখনও কখনও এসব উপায়েও কোন ফল হয় না। হয়ত বোমা ঠিক মত ফাটল না, বা যে বৈদ্যুতিক শক্তি পাঠান হোল তার অল্পতাহেতু দৈত্যাকার জানোয়ার মরল না। তখন?—তখন আবার আকাশে উড়ে তিমির দিকে নজর রাখার জন্য ক্রমাগত বৃত্তাকারে ঘোরা হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না দৈত্য আবার জলের উপর ভেসে ওঠে। অবজারভার তৎক্ষণাৎ ককপিট থেকে বিরাট ব্যাসের দৃঢ়চোঙালা মেশিনগান সেদিকে ঠিক করে। এর সমস্ত গুলি খুব বেশী রকম explosive। যে মুহূর্তেই তিমি নিঃশ্বাসের জন্য উপরে ভেসে ওঠে, অমনি তাকে অভ্যর্থনা করা হয় এই গুলি দিয়ে, যার ব্যবহার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, এমনকি দৈত্যের পক্ষেও অতিশয় সঙ্গীন। চারিদিকে রক্তের বহা ছুটতে থাকে। সমস্ত রক্তাকার ধারণ করে; তারপরেই দৈত্য চিং হয়ে ভাসতে থাকে। কুড়ি মিনিট যন্ত্রণার পরই সব শেষ।

একটা লোক তারপর দক্ষ হস্তে এই cetacean পেট চিরে ফেলে এক বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে, এবং সেই গর্তের মধ্যে একটা ধাতব flexible টিউব বসান হয়। তারপরেই পাম্পের কাজ আরম্ভ হয়ে তিমির পেট বাতাসে পূর্ণ করা হয়, কারণ এ করলে আর তিমির জলের মধ্যে ডুবে ঘাবার কোন ভয় থাকেনা। বড় বড় মোটা মোটা ইম্পাতের তারের সাহায্যে এটাকে তখন জাহাজের কাছে টেনে আনা হয় এবং টুকরো করে কাটা হয়। এই হচ্ছে আধুনিক কালের তিমি শিকার পদ্ধতি।

প্রতি বৎসর চল্লিশ হাজার তিমি হাপুনে করে শিকার করা হয়। নরওয়ে একাই বাৎসরিক আট লক্ষ পিপে তিমির তেল উৎপাদন করে। সমস্ত পৃথিবীর উৎপাদন হচ্ছে মাত্র পনের লক্ষ। প্রতি পিপেতে দুশো লিটার * তেল ধরে। তেল ছাড়াও অসংখ্য অনেক কাজই তিমির দ্বারা পাওয়া যায়। সে সব ধ'রে একটা তিমির মূল্য হয় প্রায় চুয়ান্ন হাজার ফ্রাঙ্ক (প্রায় সাড়ে সাত হাজার টাকা)। কাজেই, একাজ এবং সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞ শিকারীর মাইনেও উত্তরোত্তর অস্বস্তিকরকমেই বেড়ে চলেছে। এবং এই সমুদয় তিমিময় স্থান হাতে রাখবার জন্য যে সংগ্রামের আবশ্যক, তারও কোন অভাব নেই।

এ বছর তিমি শিকার বন্ধ থাকবে, কারণ এই সময়টা নতুন নতুন স্থানের সন্ধানে এবং নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবনে ব্যয়িত হবে, যাতে তিমিময় আরও দ্রুত এবং আরও নিশ্চিতভাবে মারা যায় অতএব, কয়েক বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর বৃহত্তম জন্তু আর ধরাধামে থাকবে না। এ যুগের অস্বস্তিকরকমের ইণ্ডাস্ট্রিয় সম্বন্ধে এই হচ্ছে কয়েকটি বিশেষ কথা।

* এক লিটার প্রায় পৌনে দু পাইট।

লেখক যে জাহাজে ছিলেন, তার তিমি ধরা নৌকার দল ও দুটে এরোগেন্নে নিয়ে, সেটায় দুশো তেইশ জন লোকলব্ধ ছিল। জাহাজের তৈলচালিত বয়লার এতে বড় ছিল যে, তার মধ্যে একটা গোটা তিমি পর্যন্ত রান্না করা যায়। হাড়ের mill, একরকম খুব চটচটে আঠা তৈরী করার এবং whale bone-এর ফ্যাক্টরি প্রভৃতির অভাব নেই সেই জাহাজের উপর। জাহাজের নাম Goeta III। তার পিছনটা ফেরীঘাটের মত খোলা এবং সেই খোলাস্থানের উপর সব ধাতব তক্তা এমনভাবে সাজান যে, সেগুলো বক্রভাবে জল পর্যন্ত নেমে গেছে। এখানে সব মোটা মোটা শিকল, হাপুন, হাতের মত পুরু তার প্রভৃতি সাজান; এই সব তারের সাহায্যে তক্তার উপর দিয়ে মৃত তিমিটাকে ব্রিজ পর্যন্ত হিচড়ে টেনে তোলা হয়। সেখানে ঘূর্ণায়মান করাতের সাহায্যে তার মাথা, হাড়গোড় প্রভৃতি কাটা হয়। লম্বা লম্বা ছুরির সাহায্যে চর্বি কেটে rolling carpet-এর উপর ফেলা হয় এবং এই কার্পেটই কলচালিত হয়ে আপনা আপনি সেই চর্বিগুলো বয়লারের মধ্যে নিয়ে আসে। এক কথায় বলতে গেলে জাহাজখানি একরকম সত্যিকারের ডাসহান ওয়ার্কশপ।

ব্রিজের উপর বিশেষ রকমের জেন দেখা যায়, যার সাহায্যে এরোগেন্নেকে আকাশে চড়বার সুবিধে দেওয়া হয়। আবার ক্যাটাপুল্টও আছে, যার ব্যবহার হয় ঝড়বৃষ্টিতে, যখন জেনের দ্বারা কাজ হয় না। পরিকার ঝকঝকে সব ক্যাবিন, খাজ সামগ্রী সর্বদাই পরিবর্তনশীল, অর্থাৎ একঘেয়ে রকমের থাকে না, 'যত পার খাও' এই নীতির অমূল্য এবং উচ্চ মাইনের সব চাকরী। তবুও, প্রথম কয়েক সপ্তাহ সেই ভারী তেলের বদ গন্ধে প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

এই সব জাহাজ, অর্থাৎ যাতে তিমি মাছ শিকারের সব সরঞ্জাম বহন করা হয়, তারা এ সব সমুদ্রে এক বছর তো অভিযান করেই, কখনো কখনো বা তার বেশিও। যতদিন না সমস্ত পিপেগুলো তিমির তেলে পূর্ণ হয়, ততদিন থাকাই নিয়ম।

শিকার স্থানের তন্মাসে যারা এরোগ্রেনে চড়ল, লেখকও তাদের সঙ্গে চললেন। এই হচ্ছে তাঁর প্রথম তিমি শিকার। নিয়ে চিরত্বার-ময় গ্রীনল্যান্ড বিস্তৃত। আকটিক ওশানের কালো জলের উপর আইসবার্গ সব ভাসছে এবং নীল আর শাদা রং তাদের গা থেকে প্রতিফলিত হচ্ছে। যতদূর দৃষ্টি চলে কেবল শূন্য, কেবল নিশ্চলতা; মনে বেশ একটা অপরূপ অহুতি জাগে। কিছুদিন আগে, এখানেই Professor Wegener-এর জমা মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া যায়। ফেনিল উজ্জ্বলে তরঙ্গ সকল বরফের ভাসমান পাহাড়ের গায়ে ক্রমাগত সজোরে আঘাত করছে।

রেডিওটেলিগ্রাফিষ্ট Kleksero তার রাইগ্রাসের মধ্যে দিয়ে সমুদ্র জল পরীক্ষা করতে লাগল। এরোগ্রেনকে আরও একটু নীচে নামান হোল। এই ভাবে ঘণ্টাখানেক কেটে গেল।

দূরে দেখা গেল, ঘোর ধূসর রঙের একটা কি যেন জল কেটে জলের উপর চেটে তুলে ভেসে চলেছে। এরোগ্রেন সেই দিকে পরিচালিত করা হোল। সেটা একটা তিমি। উঁচু থেকে ছোটাই মনে হয় বটে, কিন্তু কাছ থেকে দৈখলে সে ধারণা বদলে যায়। একটা কোয়ারা ছুটল, তিমি নিশ্বাস নিচ্ছে।

আরো নিকটে নামা হোল। জলের গতি ও জানোয়ারের পরিকার পার্যদেশ দেখা গেল। Kleksero জন্তর অবস্থান ও তার ক্রত-

গামিতার খবর দিয়ে জাহাজে জানালে, এটা একটা বৃহৎ তিমিই বটে, অন্ততঃ ত্রিশ মিটার লম্বা। সকলের দৃষ্টি শিকারের দিকেই আবদ্ধ রইল। হঠাৎ তিমি ডুব মারল। কিছুক্ষণের মত আর নড়নচড়ন নেই। পিছনে জাহাজের ফানেল দেখা গেল এবং তার সঙ্গে তিমিধরা ছোট মোটর বোটটিও।

এ বোটে পাঁচজন লোক—যে হাপূর্ন ছোঁড়ে সে, একজন পাইলট, একজন টেলিগ্রাফিষ্ট ও দুজন সাধারণ নাবিক। এরোগ্রেন থেকে বোটে সংবাদ পাঠিয়ে তাকে চালনা করা হোল। এ বোটের স্পীড তিমির ছোট্টার শক্তির প্রায় দ্বিগুণ। শিকার এখনও অদৃশ্য।

এটাকে কি শিকার বলা চলে? না, হত্যা বলা হবে আধুনিক এই সব শাস্ত্রসরঞ্জামের কাছে?

ইতিমধ্যে সকলেই তৈরী। তিমি ভেসে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গেই মুহূর্তের মধ্যে সেই বোট তার গায়ে ভিড়ল। একাজটা এত সত্তরই সমাধা হোল যে লেখক উপর থেকে বোঝবার পর্য্যন্ত সময় পেলেন না। বোট ভেড়ার পচেই বোঝা গেল যে এ জানোয়ার কত বিরাট এবং এর তুলনায় মানুষ কতই ক্ষুদ্র। কেবলযুক্ত হাপূর্ন এবার সরল পথে তিমির দিকে ছুটল। Harpoon man, যে এ কাজের চ্যাম্পিয়ন একজন, উপযুক্ত অবসর ও স্পীড বোঝার ঠার একজন, তার ছোট কামানের সাহায্যে হাপূর্ন ইতিমধ্যেই ছুঁড়ে বসে আছে। হাপূর্ন ছোঁড়ার যে ভীষণ কামান গর্জন হোল, উপর থেকে তা শোনা গেল না। উপর থেকে থালি দেখা গেল, কেমন করে, হাপূর্ন জন্তর মাংসের মধ্যে গেঁথে গেল এবং তার মধ্যে একটা বোমা ফাটিয়ে দিলে। এই বোমা জন্তর vital partএ আঘাত করল। কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা আবার ডুব মারল এবং তার পিছনে রক্তের দাগ রেখে

ছুটে পালাতে লাগল। ব্যাক করার জন্তে মোটর বোটের এঞ্জিন পূর্ণজোরে চালান সবেশে তিমি সেটাকে এত দ্রুত টেনে নিয়ে চলল যে, সেটা না দেখলে বিশ্বাসই হয় না। এরোপ্লেন আরও নীচে নামল। এবং যেখানে তিমির জলে ভেসে ওঠার সম্ভাবনা, সেই স্থানের উপর উড়তে লাগল। কুড়ি মিনিট বাদে সেই কৃষ্ণকায় বিরাট জন্তটি জলে ভেসে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গেই তার মাথার মধ্যে চার হাজার মেশিন গানের গুলি প্রবেশ করল। তিন মিনিটের মধ্যেই তিমিটা মরে গেল। আগে যেমন পুরো একটা দিন এ জানোয়ারকে যন্ত্রণা সহ করতে হোত, এখন তার কিছুই নেই, পনের মিনিটের মধ্যে সব শেষ। উন্নতির পরাকাষ্ঠাই বটে!

প্রথম বার ধারা এই হত্যাকাণ্ড দেখেন তাঁদের পক্ষে এ ব্যাপার অতি ভয়ঙ্করই মনে হয়।

(ক্রমশঃ)

বল হরি হরি বোল

“বল হরি হরি বোল”

নৈশ গগন মুখরিত করিয়া আমরা কয়জন প্রাণী চলিয়াছি। হঠাৎ রমেশবাবু আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “আপনার নিশ্চয় খুব রাগ হচ্ছে আমার উপর!”

আমি বলিলাম—“না,—কিছুমাত্র না!”

রমেশবাবু বলিতে লাগিলেন—“না হওয়াটাই আশ্চর্য। আজ

বিকলে আপনি আমার বাড়ীতে অতিথি হলেন। রাজে আপনাকে মড়া বইতে নিয়ে যাওয়াটা ভ্রোচিৎ নয়। কিন্তু লোক জুটল না—কি করি বলুন।”

আমি বলিলাম—“আহা, ওর জন্তে আপনি এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? কলেজে পড়ার সময় মড়া পোড়ানটাও আমাদের কোর্সের মধ্যেই ছিল প্রায়। প্রায়ই এ কার্য করতে হত।” হরেন্দ্রবাবু তখন বলিয়া উঠিলেন, “ওসব ব্যঞ্জে ভদ্রতা ছেড়ে এখন কেউ একটা মিঠে গোছের প্রেমের গল্প বলুন দেখি—সময়টা যাতে কাটে। এখনও বেশ কিছু দূরে হেঁটে যেতে হবে। শ্রামবাবু, আপনি বলুন।”

শ্রামবাবু আমাদের মধ্যে একটু বয়স্ক লোক। তিনি বলিলেন—“আরে বাপু—হু একটা প্রেম যা জীবনে করেছি তা’ কি আর এখন মনে আছে? আমাকে এখন অ্যালজারার ফর্মুলা জিগোস করাও যা প্রেমের গল্প বলতে বলাও তাই। এককালে করেছি সব। কিন্তু কিছুই ভাল মনে নেই। এখন আমার প্রধান চিন্তা, তোমাদের পাল্লায় পড়ে এলাম ত—বাতটা না বাড়ে।”

“বল হরি হরি বোল—”

হরেন্দ্র তখন শ্রামবাবুকে ছাড়িয়া চন্দ্রবাবুকে ধরিয়া পড়িলেন। “আপনি ত চন্দ্র দা এককালে খুব উড়েছিলেন। বলুন না হু একটা গল্প—সময়টা কাটুক।

“বল হরি হরি বোল”

চন্দ্রবাবু বলিলেন—“উড়েছিলাম বটে। কিন্তু ঠিক যে প্রেম করেছিলাম তাতে বলতে পারি না। কারণ each time, I had to pay for my love either in coins or in kinds। হৃতরায় তার যথেষ্ট বিশেষ কোন কবিত্ব নেই মনের মধ্যে। রাগী, হাবি, বিনোদিনী,

নয়নতারা সব একাকার হয়ে গেছে। Distinguish করা শক্ত।”

“বল হরি হরি বোল।”

হরেন্দ্রবাবু রমেশবাবুকে তখন বলিলেন—“আপনার ঠিকে কিছু আছে নাকি রমেশ দা? বলুন না।”

রমেশবাবু হাসিয়া উঠিলেন—“আমি ভাই ইঞ্চলে পড়ামুশ্বর বরেন্দ্র একজামি পাস করাটাই পরমার্থ মনে করতাম। স্বতরাং ছাত্রজীবনে পরীক্ষা পাস করা ছাড়া আর কিছু করি নি। বিয়ে করে জ্বর প্রেমে পড়েছিলাম। ফলে চারটি মেয়ে হয়েছে দেখতে পাচ্ছি।”

“বল হরি হরি বোল”

একটু খামিয়া রমেশবাবু আবার বলিলেন—“এইবার একটা প্রেম করব মনে করছি। কিন্তু ফুসে কই? সকাল থেকে উঠে আগিস হাওয়ার তাড়া। সন্ধ্য বেলা ফিরে এসে মনে হয় চাট্টি খেয়ে শুতে পারলে বাচি। তোমার নিজের কিছু থাকে ত বল না ভায়া। অপরকে জালাতন কর কেন?”

“বল হরি হরি বোল”

হরেন্দ্রবাবু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন—“ডাক্তারেরা যেদিন থেকে আশঙ্কা করলেন যে আমার বুকের দোষ আছে—সেদিন থেকে নিজের জীবনকে আর কারুর সঙ্গে জড়াতে সাহস পাই না। তা ছাড়া আমার মত মুখে বসন্তের দাগ—একচোখকানা লোককে কোন্ মেয়ে ভালবাসবে বলুন! কিন্তু প্রেমের গল্প শুনে আমার ভারি ইচ্ছে। বলুন না আপনারা কেউ একটা।”

“বল হরি হরি বোল”

তারপর হঠাৎ আমার দিকে ফিরিয়া হরেন্দ্রবাবু বলিলেন, “কিছু

মনে করবেন না মশাই। আপনি অপরিচিত লোক। জীবনে যদি যাঁটে থাকে কিছু, বলুন না। এ সময়ে বেশ লাগবে।”

“বল হরি হরি বোল”

আমার জীবনে-যে রমণীর আবির্ভাব ঘটে নাই তাহা নয়। কিন্তু তাহা বলিতে লজ্জা করে। স্বতরাং কথাটা ঘূষাইয়া বলিলাম, “এখন কি ওসব ভাল লাগবে? তার চেয়ে বরং ভূতের গল্প বলুন কেউ।”

বয়স্হ শ্রামবাবু বলিলেন—“প্রেমের গল্প আর ভূতের গল্প ও আমার কাছে দুইই সমান। আপনি প্রেমের গল্পই বলুন।”

“বল হরি হরি বোল”

বলিতে লাগিলাম।

“তখন সব আমি এম. এ. পাস করেছি। এই বছরখানেক আগেকার কথা। আমার বাড়ী বেড়াতে গেলাম। হঠাৎ সেখানে এক অশিক্ষিতা চাকরানীকে ভাল লেগে গেল। বয়স কম। কিন্তু ভারি স্বন্দর। খোজ করে শুনলাম মেয়েটি বিধবা। কিন্তু অমন বিনিশ্চাপ মুষ্টি আমি কখনো দেখিনি।”

“বল হরি হরি বোল”

তারপর কমশ: যেমন হয়। একদিন আড়ালে পেয়ে তাকে প্রেম নিবেদন করলাম। মেয়েটি শুধু বলিল—“তা কি হয়?”

আমি তাকে বুঝিয়ে দিলাম “খুব হয়”। বলে একটা আখুলি বার করে তার হাতে দিতে গেলাম। সে কিছুতে নিলে না।”

“বল হরি হরি বোল”

“এমনি করে কিছুদিন যায়। বতরিন মামার বাড়ীতে ছিলাম তার আশেপাশে ঘুরছি। কিন্তু কিছুই সুবিধা করে উঠতে পারি নি। মামা, মামী, বাড়ীস্থ লোকজন। একদিন লুবিঘে তার বাড়ী

গেলাম। সেখানেও দেখি এক খাণ্ডার মাসী রয়েছে।—কি করি
ভাবছি। হঠাৎ একদিন সুযোগ পেয়ে গেলাম। মুক্কেদের বাড়ী
মামামামী বাড়ীস্থ লোকের নেমস্তম্ব হল। ফাঁকা বাড়ী। কুহুমকে
সেদিন একা পেলাম।”

হরেন্দ্রাবু চীৎকার করিয়া উঠিলেন— “বল হরি হরি বোল”

“সেই দিনই বুলায়, কুহুমও আমাকে ভালবাসে। সেইদিন
তার সেই চকিত্ত চাহনি আর ঠোঁটের কাপন দেখে আমি বুঝেছিলাম
যে আমার স্বপ্ন সফল হয়েছে। সেদিন তাকে আমি যা-ইচ্ছা তাই
করতে পারতাম। কিন্তু কেন জানি না কিছু করতে পারলাম না।
শুধু একটু চুম খেললাম।”

“বল হরি হরি বোল”

আমার আর কিছু বলিবার ছিল না।

হরেন্দ্রাবু বলিলেন, “তারপর?”

“তারপর? তারপর আর কিছু নেই। জানাজানি হয়ে যাওয়ার
ভয়ে আমি পালিয়ে এলাম। কুহুমের আর দেখা পাই নি, শুনেছিলাম
আমি চলে আসার পর সে আমার বাড়ীর চাহুরি ছেড়ে দিয়েছে।”

“বল হরি হরি বোল”

দ্রশ্যানে আসিয়া পড়িয়াছিলাম। শব নামান হইল। চিত্তা সাজান
হইল। শবের দেহাবরণ পুলিয়া তাহাকে চিত্তায় তুলিবার সময় বলিয়া
উঠিলাম—

“ধামুন—ধামুন—ধামুন—এ আপনার বাসায় কি করে এলো
রমেশাবু?”

রমেশাবু বলিলেন—“অহুহু হয়ে এই মেয়েটি দুদিন আগে
আমাদের গোয়ালঘরে আশ্রয় নিয়েছিল। বলেছিল কাকে খুঁজতে
সে বেরিয়েছে। তাড়ান অত প্রহর করার অবসর ছিল কোথা
বেচারা মারাই গেল। কেন বলুনত?”

শুধু হইয়া রহিলাম।

“বনফুল”

“বিজ্ঞান সার সংগ্রহ”

বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের ইতিহাস লইয়া অনেক অনেকস্থলে অল্প-
বিস্তার আলোচনা করিয়াছেন; এক খানি বৃহৎ গ্রন্থও মুদ্রিত
হইয়াছে। অধুনা শ্রীযুক্ত ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দেশীয়
সাময়িক পত্রের ইতিহাস সঙ্কলনে চেষ্টা পাইতেছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য
পরিষৎ পত্রিকায় এই সম্বন্ধে তাঁহার কয়েকটি ধারাবাহিক প্রবন্ধও
মুদ্রিত হইয়াছে।

এক জনের পক্ষে এই ইতিহাস নিখুঁত ভাবে সঙ্কলন করা সম্ভবপর
নহে। পুরাতন সংবাদপত্রের ফাইল থাঁহাদের সংগ্রহে আছে তাঁহারা
তাঁহাদের সংগৃহীত সংবাদপত্রাদির পরিচয় সাধারণকে জানাইলে
ইতিহাস সঙ্কলনের পক্ষে সুবিধা হইবে।

বর্তমান সংক্ষিপ্ত আলোচনায় “বিজ্ঞান সার সংগ্রহ” নামক
একখানি সাময়িক পত্রের পরিচয় দিতে প্রয়াস পাইব। * ইহা
১৩৩৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম পক্ষে প্রকাশিত হয়। প্রথম
এই পত্রিকাখানি পাক্ষিক রূপেই প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু পরবৎসর
ইহা মাসিকে পরিণত হয়। আলোচ্য পত্রিকায় ১ম বর্ষের ৫ম সংখ্যা
[নবেম্বর, ১৮৩৩ ইং] ও দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম ও তৃতীয় সংখ্যা
[নবপর্ধ্যায় জাহ্নবীরী ও মার্চ, ১৮৩৪,] শোভাবাজার রাজবাড়ীর

* শ্রীযুক্ত ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য পরিষদের প্রবন্ধে “বিজ্ঞান সার
সংগ্রহের” উল্লেখ করিয়াছেন। [১৩৩৮। ৪র্থ সংখ্যা, পৃঃ ২৮৭ প্রভৃতি] কিন্তু ইহার
সঠিক প্রকাশ কাল উল্লেখ করিতে পারেন নাই। তাঁহার অসুস্থান “১৮৩৩ সনের আগষ্ট
(?) মাসে ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়।”

শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ দেব মহাশয়ের সৌজ্ঞেয় তাঁহাদের গ্রন্থাগারে দেখিবার সুযোগ হইয়াছে। ১ম বর্ষের ৬ষ্ঠ সংখ্যা শ্রীহট্টের জমিদার স্বহস্তর শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের সংগ্রহে আছে।

বিজ্ঞান সার সংগ্রহ দ্বিভাষিক পত্রিকা। ইহা ইংরাজী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষায় প্রকাশিত হইত। প্রতিপৃষ্ঠায় প্রথমার্দ্ধ ইংরাজী ও দ্বিতীয়ার্দ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় মুদ্রিত হইত। প্রথম বৎসরের প্রতি সংখ্যায় ১৬ পৃষ্ঠা ও দ্বিতীয় বৎসরের প্রতি সংখ্যায় ৩২ পৃষ্ঠা থাকিত।

১৮৩৪ খ্রীঃ জাহুয়ারীর নবপর্ধ্যায় প্রথম সংখ্যার বিজ্ঞাপনে তিন জন সম্পাদকের নাম আছে—(১) উলষ্টন (২) গদাচরণ সেন, (৩) নবকুমার চক্রবর্তী। উক্ত সংখ্যার আখ্যাপত্রে—“References to be made to M. W. Woollaston, Hindu College” বলিয়া উল্লেখ রহিয়াছে।

বিজ্ঞান সার সংগ্রহের ইংরাজী নাম Manual of Literature and Science.” নবপর্ধ্যায়ের আখ্যাপত্রে ইহাতে “Hindu Manual of Literature and Science,” বলিয়া বিশেষিত করা হইয়াছে। আলোচ্য পত্রিকায় কি কি প্রবন্ধ থাকিত জানা মন্দ নহে। শোভাবাজারে রক্ষিত ২ সংখ্যার প্রবন্ধ তালিকা দেওয়া হইল।

৩০.1.1. November 1833, No. 5.

1. Life of Galileo—গেলিলিও সাহেবের উপাখ্যান

2. Constitution, Government, and Laws of the Ancient Britons—ইতিহাস পূর্বকালীন ইঙ্গলণ্ডীয় পুরোহিতদের রাজ্য শাসন ও তাহার রীতি এবং ব্যবস্থাদির বিবরণ। • New-Series, January, 1834, No. 1,

1. First Discourse on the Worship of God, delivered

at the Brumha Sobha; by Ramchunder Surma, Expounder of the Vedas, প্রথম প্রকরণ, পরমাত্মার উপাসনা ব্রাহ্মসমাজ কলিকাতা বৃধবার ৬ ভাদ্র শকাব্দা: ১৭৫০ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র শর্ম্মার কৃত।

2. Second Discourse on Do, দ্বিতীয় প্রকরণ। ব্রাহ্মসমাজ কলিকাতা বৃধবার ১৩ ভাদ্র শকাব্দা: ১৭৫০ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র শর্ম্মার কৃত।

3. Extracts from the life of Henry Martyn, হেনরি মার্টিন সাহেবের জীবনোপাখ্যান হইতে সংক্ষেপে গৃহীত।

4. On the Advantages of having Free Communication between Man and Man, ভিন্ন ২ জাতীয় লোকদিগের পর পর সারল্য রূপে সহজ কথোপকথনের যে লাভ তাহার বিষয়।

5. Adversity, দরিদ্রতা

6. of Parents and Children, মাতা পিতা ও পুত্র।

No. 3,—March, 1834, New Series,

Third Discourse on the Spiritual Worship of God, delivered by Sree Ramchundra Surma, Expounder of the Vedas at the Brumha Sobha,—পরমেশ্বরের উপাসনা বিষয়ে তৃতীয় ব্যাখ্যান শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্মা কত্থক ব্রাহ্ম সমাজ কলিকাতা বৃধবার ২০ ভাদ্র শকাব্দা: ১৭৫০।

2. Prejudices—পক্ষপাত।

3. Constitution, Government, and Laws of the Ancient Britons, ইতিহাস পূর্বকালীন ইঙ্গলণ্ডীয় পুরোহিতদের রাজ্যশাসন ও তাহার রীতি এবং ব্যবস্থাদির অবশিষ্ট বিবরণ।

৪. Science—বিজ্ঞানশাস্ত্র।

৫. Anecdote of Frederick the Great, ফ্রেড্রিক দি গ্রেট নামক রাজার উপাখ্যান।

৬. Solon and Croesus—সোলন এবং ক্রিশসের জীবনোপাখ্যান।

৭. Commerce বাণিজ্য।

আলোচ্য পত্রিকাখানি মূলতঃ যুরোপীয় সাহিত্যে ও বিজ্ঞান এদেশবাসীদের মধ্যে প্রচারের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বর্ষ হইতে ইহার উদ্দেশ্যের কিঞ্চিৎ সংস্কার সাধন করা হয়। যুরোপীয় গ্রাহকদের নিকট ইহা অধিকতর গ্রহণযোগ্য করিবার উদ্দেশ্যে ইহাতে নানা উপাদেয় সংস্কৃত ও বাঙ্গালা প্রবন্ধাদির অন্তর্ভুক্তি থাকিত। উপরোক্ত নবপত্রাখ্যের ১ম সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধটিই তাহার নিদর্শন।

আলোচ্য পত্রিকায় “To be continued” এর স্থলে “ইহার অবশিষ্ট পশ্চাৎ হইবে”—বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

পাদরি লং তাঁহার তালিকায় ইহাকে ভ্রমবশতঃ “বিজ্ঞানসাগর সংগ্রহ” বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে ইহা ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তিনি Periodicals শাখাকে Almanacs, Encyclopaedias ও Magazines, Newspapers প্রভৃতি ৪ শাখায় বিভক্ত করিয়া আলোচ্য পত্রিকাখানি Magazine শাখাতে উল্লেখ করিয়াছেন। Magazine শাখাতে প্রধানতঃ মাসিক পত্রিকারই উল্লেখ রহিয়াছে। বিজ্ঞান সার সংগ্রহ ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে প্রথম পাকিক রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল সত্য; কিন্তু ইহার নবপত্রাখ্য ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস হইতে মাসিক রূপেই প্রকাশিত হয়।

এই হিসাবে আমরা তাঁহার “১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত”, মন্তব্যটিকে সমর্থন করিতে পারি।

আলোচ্য পত্রিকা হইতে ভাষার নমুনা স্বরূপ অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হইল:—

Of Parents and Chidren.

The joys of parents are secret, and so are their griefs and fears; they cannot utter the one, and they will not utter the other. Children sweeten labours, but they make misfortunes more bitter; they increase the cares of life, but they mitigate the remembrance of death.

The difference in affection of parents towards their several children is many times unequal, and sometimes unworthy, especially in the mother, as Solomon saith, a wise son rejoiceth the father, but an ungracious son shames the mother.

মাতা পিতা ও পুত্র।

মাতা পিতার আল্লাদ সর্বদাই গোপনীয় থাকে, এবং দুঃখ ও ভয় ও এইরূপ তাঁহার ইহাও প্রকাশ করিতে পারেন না, উহাও প্রকাশ করিতে পারেন না, মাতাপিতার পরিশ্রমেতে পুত্রকে স্বপূজনক করে এবং তাহাদের দুঃখকে অভিশ্রিত করে পুত্র সখে পিতা মাতার জীবিকার চিন্তা অধিক হয় কিন্তু মৃত্যু সংস্কারকে অতি ক্ষীণ করে।

পিতামাতার স্নেহ সকল পুত্রের প্রতি সর্বদা সমান থাকে না, কখনও অসুখপুত্র পুত্রের প্রতি অধিক স্নেহ হয়, বিশেষতঃ মাতার,

যেমন সোলমন নামক কোন ব্যক্তি কহেন যে, পণ্ডিত পুত্র পিতাকে আহ্বাদিত করে, আর মূর্থ পুত্র মাতাকে লজ্জিত করে।

New Series, Jan. 1834, pp. 32.

পত্রিকাখানি ব্যাপ্টিষ্ট মিশন প্রেসে মুদ্রিত হইত।

—ঐযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য

সম্পাদকীয় মন্তব্য। একজনের পক্ষে দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস সঞ্চলন করা সম্ভবপর নহে ইহা সত্য কিন্তু ঐযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অন্ততঃ ‘বিজ্ঞানসার সংগ্রহ’ সঞ্চলন বিষয়ে প্রবন্ধ লেখক অপেক্ষা একটু বেশী সংগ্রহ করিয়াছেন। পাদটীকায় লেখক যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা ব্রজেন্দ্রবাবুর ১৩৩৮ সালে প্রকাশিত প্রবন্ধের উপর, তাহার পর ৪ বৎসর অতীত হইয়াছে। ইতিমধ্যে বিজ্ঞানসার সংগ্রহ সম্বন্ধে ব্রজেন্দ্রবাবুও অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন ও তাহা তাঁহার ‘সাময়িক পত্রের ইতিহাস’ নামক পুস্তকে ছাপা হইয়া গিয়াছে। পুস্তকখানি সীগ্রহই রত্নন প্রকাশালয় হইতে প্রকাশিত হইবে।

সংবাদ-সাহিত্য

শরৎচন্দ্র সম্প্রতি গণনাকার্যে মন দিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু এতকাল পরে ‘সেদিন’ হঠাৎ গুনিলেন কেন? এতদিন কি দৃষ্টি নিজেই ছাড়াইয়া যাইতে পারে নাই? আমাদের ত মনে হয় বাহারী সাহিত্যে নাম (যেহেতুই হউক) করিয়াছেন তাঁহাদের উচিত প্রতি সন্তোষে একবার করিয়া অন্ত্যস্ত সাহিত্যিকদের সংখ্যা গণনা করা।

কিন্তু শরৎবাবুর সেক্ষেপ সময় হাতে ছিল না। “দেশের জন্ত বাহারী প্রাপণ” করিয়া বসিয়াছেন, তাঁহাদের গুনিবার সময় কই? তাই যখন যখন যাটের কোঠায়, মন যখন বিষয়কর্ম হইতে ছুটি লইতে প্রায় চাহিতেছে, এমন সময় কোথা হইতে দক্ষিণা হাওয়ার একটা আচমকা আন্দোলনে মনের ভিতর পাটীগণিতের হ্র খেলিয়া গেল।

তাই শরৎবাবু ‘সেদিন’ গুনিয়া দেখিলেন—

সত্যিকারের সাহিত্য সাধনা বাহারী করেন, সাহিত্য বাঁদের শুধু বিলাস নয়, সাহিত্য বাঁদের জীবনের একমাত্র ব্রত, বাংলাদেশে তাঁরা কখনই বা, সংখ্যা তাঁদের আঙুলে গোনায়।

গুনিয়া আশ্চর্য হওয়া গেল। সাহিত্য বাঁহাদের বিলাস নয়, অর্থাৎ ব্যবসা তাঁহাদের সংখ্যা বাংলাদেশে কম। আমাদেরও মত ঠিক ইহাই। বিলাস ও ব্যবসা দুইটি শব্দ ইংরেজিতে যথাক্রমে hobby ও profession। বাংলাদেশ সাহিত্য-hobbyর দেশ—hobby-ওযাদাদের সংখ্যা অগণিত, গুনিতে চাহিলে শরৎচন্দ্রের একা আঙুলে কুলাইত না। কাজেই তিনি বিলাসীদের ছাড়িয়া প্রফেশনালদের গুনিয়াছেন। এই সাহিত্যব্রতী সাহিত্যব্যবসায়ী, বাহারী বই বেচিয়া বাড়ি গাড়ি করিয়াছেন, সত্যই ত তাঁহাদের সংখ্যা আর কতই হইবে?

কিন্তু সাহিত্যব্যবসায়ীগণ মাড়োয়ারী নহেন। মাড়োয়ারীদের মধ্যে ব্যবসাগত যত প্রতিযোগিতাই থাকুক, কেহ যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে অল্প মাড়োয়ারীগণ টাকা দিয়া তাহার ব্যবসায় সাহায্য করে। কিন্তু আমাদের দেশের সাহিত্যব্যবসায়ীর সে-প্রবৃত্তি

নাই। যিনি এই ব্যবসায়ে ধনী হইয়াছেন, দরিদ্র সাহিত্যিকের জন্ত তাঁহার দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত হয় না। যদি হয়, সে হস্তে পশ্চিম টাকা মূল্যের একটি ফাউন্টেন পেন থাকে এবং তাহারই সাহায্যে তিনি কাঁদিয়া আকুল হন।

শরৎচন্দ্র সাহিত্যবিলাসী। তিনিও চিরদরিদ্র, তাহার ললাটও কলঙ্কলাঙ্কিত। তিনি “প্রকৃত ধনসম্পত্তি অর্জন করে বিত্তগাণী ধনবান হ’তে চান না”—এমন কি বৈরাগ্য চান। তাই তাহার কথা আমরা উড়াইয়া দিতে পারিতেছি না। তিনি বলিতেছেন—

এই যে সব সাহিত্যিক দেশের জন্ত প্রাণপণ করেছেন,

তাঁদের হয়েছে শুধু লাঞ্ছনা আর দারিদ্র্য।

শরৎচন্দ্রের লাঞ্ছনার অভিজ্ঞতা ইহাই নূতন নহে। তিনি অল্প ব্যাপারেও একবার সত্যই দেশের জন্ত প্রাণপণ করিয়াছিলেন—এমন কি কংগ্রেসের কাজও করিয়াছিলেন, কিন্তু সেখানেও ঐ লাঞ্ছনা আর দারিদ্র্য। পোড়া দেশে কোনো দিকে পা ফেলিবার উপায় নাই।

শরৎচন্দ্র বাড়ি করিতে যে খরচ করিয়াছেন, শুনিয়াছি তাহার বোল আনাই বিদেশ হইতে আসিয়াছে। যুক্ত রাজ্যের প্রেসিডেন্ট কিছু, জাপান সম্রাট কিছু, মুসোলিনি কিছু এবং বাদবাকী আবিসিনিয়ার সম্রাট মনিঅর্ডার যোগে পাঠাইয়া দিয়াছেন। তাই বড় দুঃখে শরৎচন্দ্র বলিতেছেন—

দেশের লোক তাঁদের (সাহিত্যিকদের) দেয় না কিছু;

অথচ তাঁদের কাছ থেকে চায় অনেক।

শরৎচন্দ্রের অশ্রু যে সব দরিদ্র সাহিত্যিকের উপর বর্ষিত হইয়াছে

তাহারা প্রকাশে ভাল না লিখিলেও গোপনে সত্যই খুব ভাল লিখিতে পারে—কেবল বিনিময়ে তাহারা কিছু টাকা চায়। পৃথিবীর বড় বড় সাহিত্যকৃষ্টির মূলে রহিয়াছে টাকা। দরিদ্র হইয়া জন্মিয়াছিলেন বলিয়া ইংরেজি সাহিত্যে ডিকেন্স খারাপ লেখা লিখিলেন, বায়রন যতদিন গৃহে ছিলেন স্পষ্টা কাব্য লিখিয়াছিলেন, কিন্তু গৃহত্যাগী নিঃশ্ব হইয়া আর কিছুই লিখিতে পারেন নাই। শেলী ইটালীতে ব্যবসা করিয়া কোটিপতি হইয়া তবে ভাল লিখিলেন! গোবিন্দচন্দ্র রবার্ট বার্নস প্রভৃতি ছিলেন কয়লার খনির মালিক। ব্রটে তগিনীগণ গর্ভমেট হইতে জায়গীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শেক্সপীয়ারের কথা বলা হয় নাই। তিনি এক এক থানা বই বেচিয়া এক একটি বড় ফ্যাক্টরি গড়িয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণদাস উঠয়েভিস্কি, আয়ের সম্পত্তির অর্দ্ধেক পাইয়াছিলেন—গার্কি তো বিখ্যাত ধনী বলিয়াই ধনীদেব চরিত্র তাহার লেখার বেশি ফুটিয়াছে—দরিদ্রের চরিত্র আঁকিতে পারেন নাই।

শরৎচন্দ্রের প্রিয় সাহিত্যিকগণও টাকা না পাওয়াতে খারাপ লিখিতেছে। তিনি বলিতেছেন—

সম্প্রতি একটা কথা শুনিছি, ভাললেখা তাঁরা (লেখকরা) লিখছেন না। কেন লিখছেন না আমাকে যদি কেউ প্রশ্ন করেন ত আমি বলব—শক্তি বীদের কাছে অর্থের অভাবে দারিদ্র্যের তাড়নায় আজ তাঁরা এমন নিস্পেষিত যে ভাল কিছু লিখবার ইচ্ছা থাকলেও অবসর বা স্পৃহা তাঁদের নেই।

বিশ্লেষণের কি আশ্চর্য্য কৌশল! সাহিত্যিকেরা হাতে থাকিল, অথচ তাহাদিগকে একটি পয়সাও ভিক্ষা দিতে হইল না। সাহিত্যে

অন্ত নহে, কিছু জানিবার অন্ত নহে, চিত্তরঞ্জনর অন্ত নহে—ভাবোন্মত্ত হইবার অন্ত পড়িবে। ধর্মের অচ্ছাননের সহিত সাহিত্য, রাজনীতি, দেহভঙ্গ প্রভৃতি মিলাইয়া সাধারণ বাংলা সংবাদপত্রে যে সমস্ত উজ্জ্বল দেখিতে পাই তাহা অন্ত কোনো দেশে বা ভাষায় সম্ভব নহে।

কালি, কালি, মহাকালি—মহাঘোরা রজনীর মধ্যমাগ্নে শাশক এই মহামন্ত্র উচ্চারণ করিলেন, বলিলেন তুমোময়ী হেরজনী, নিভ্রাময়ী, মৃত্যুময়ী তোমার রহস্তের স্ববনিকা একবার এই মহা অমাবস্তার অবসরে উন্মোচন কর—
• •
মা দয়াময়ী, স্নেহময়ী এবং দয়াময়ী-স্নেহময়ী বলিয়াই ভৈরবী এবং ভয়ঙ্করী—অতি বিস্তার বদনা, স্ফিরাললন ভীষণা.....

কাল-দণ্ডের চরুণে সকলকে গ্রাস করিতেছেন.....মা নাচিতেছেন.....তাঁথে তাঁথে ত্রিমি ত্রিমি ত্রং ত্রং.....এ ভয় ভাবিতে চাইবে মা—প্রতিপদে এই যে মৃত্যুর তাড়না—এ ভয় ভাবিতে হইবে মা এসো মা এলোকেশী, মুক্ত অসি লইয়া জাগ্রত হও, আমার সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া দাও, তোমার নৃত্য তালে আমার হৃদয় নাচিয়া উঠুক। মহাকাল দেবতার অস্তরের দ্বন মা তোমার ঐ যে রাঙ্গা পা দুখানি ও পায়ের নৃপুরধ্বনি যার কানে গিয়াছে, সে কি আর মরণের ভয় করে মা! • •

এই জাতীয় ক্রন্দনেই বাঙালী কোনো দিকে উন্নতি করিতে পারিতেছে না। কাহারো জীবনী লিখিতেই বহুক বা ঐতিহাসিক গবেষণাই করুক বাঙালী স্পর্শযোগ্য স্পষ্ট কিছুই দেখিতে পায় না, কাহাকে দেখাইতেও পারে না। কার্যক্ষেত্রেও কোনো স্পষ্ট নির্দেশ নাই, আছে শুধু মা-মা-মা!

কালি-মন্দিরে যাহা শোভা পায়, সাধারণ সাপ্তাহিক পত্রে তাহার কোনো সার্থকতাই থাকিতে পারে না; কেননা সাপ্তাহিক পত্র কালিমন্দির নহে। ইহা যদি কাহারো ব্যক্তিগত প্রার্থনা হয় তাহা হইলে তাহা ব্যক্তিতেই নিবন্ধ থাকা উচিত। বাঙালী-জাতির ইহা প্রার্থনা হইতে পারে না : “এসো মা এলোকেশী, মুক্ত অসি লইয়া জাগ্রত হও, আমার সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া দাও।” এ প্রার্থনা তিনিই করিতে পারেন বাহার বয়স সত্তর পার হইয়াছে—যিনি বাতব্যাধিতে কষ্ট পাইতেছেন এবং যিনি বধাসম্ভব শীঘ্র সকল বন্ধন হইতে মুক্তি লাভের জন্য ছটফট করিতেছেন।

কিন্তু বাঙালী-জাতি এরূপ মুক্তি চাহেনা। সে ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে চায়, লিমিটেড কম্পানি করিয়া সাময়িক পত্র বাহির করিয়া লাভ করিতে চায়, ব্যাংক কিছু টাকা জমাইতে চায় ইত্যাদি ইত্যাদি। মৃত্যুভয় হইতে মাহুয খেন কোনো দিনই মুক্ত না হয়। মৃত্যুভয় আছে বলিয়াই মাহুযের নানা অসুবিধা সবেও জীবন এত মধুর হইয়া উঠিয়াছে—মৃত্যুভয় না থাকিলে সব খুঁী কিংবা ডাকাত হইত।

জৈনক ‘আধুনিক’ কবির ভাষাবিষয়ে আধুনিকতা সবেও আমাদের মনে একটি দুঃখ রহিয়া গেল। কবি বলিতেছেন—

তোমারে বাসিয়া ভালো স্বপ্ন দেখি বৃহৎ পৃথিবী
মেকর সোনালি সন্ধ্যা উপকালে উজ্জল আকাশ
বসন্তের বর্ষ দীপ দৃষ্টি হতে যায় নাক নিভি
তোমার শাড়ীর মতো নভোবায়ু স্থনীল আকাশ,

• • তোমার ভুকের মতো দিগন্তের বীকা চাঁদ আগে
সমুদ্রের ঢেউ গুলি। • •

দুঃখ বাঁকা চাঁদের জন্ম নহে, ক্রুর জন্ম। ক্রও বোধ করি চাঁদেরা মতই শাদা। ইহাই দুঃখ।

উপায়ান্তরহীন হইয়া আমরা একটি গল্পের পৃথটা উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না—সারাংশ দিতেছি; লেখকের ভাষায় হৃদয়ঙ্গপ করা হয় নাই।

শেষরাত্রে সীতেশ বাড়ী ফিরিল। পরিভ্রান্ত দেহটিকে কোন রকমে খাটের উপর মেলিয়া দিয়া গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হইল। (ভোর হইল—পাখীর কাকুলী (sic) আরম্ভ হইয়াছে) রাতের কথাটা এখন বড় বেহুুরো বাজে। তার ভীষণ অধঃপতন.....শিক্ষিত সমাজে তাহার মর্যাদা আছে কিঙ্ক.... (চিঠি আসিল)।

পূজনীয় সীতেশদা—তোমার কি হয়েছে বলত? আজ একমাস কোন খবর নেই।.....কবে আসবে? প্রশাস নিও। ইতি রেখা—(সীতেশের হিম্মোল প্রভৃতি। সে ভাবিতে লাগিল ইচ্ছা করিয়াই সে রেখার সহিত দেখা করিতে যায় নাই। অভাগী রেখা...অর্থাৎ রেখা বিধবা)

বিকলে সীতেশ রেখার ওখানে বাইবার জন্ত প্রস্তুত হইতেছে এমন সময় অল্পম আসিল। অল্পম তাহার ছাত্র। প্রিয় ছাত্র মেধাবী উদীয়মান।

সীতেশ বলিল, চল অল্পম তোমার সঙ্গে একজনের আলাপ করিয়ে দেব। সাহিত্য দর্শন নিয়ে কত পার তর্ক করতে আজ দেখব।

(রেখা হইবার পর)—আজ্ঞা সীতেশদা এই ভবঘুরে হয়ে আর কতদিন কাটাতে বলতো? (সীতেশ হাসিয়া)।

এ জুড়াবনা তোমার কবে থেকে হল রেখা? রেখা বলে— অনেকদিন। (সীতেশ বিদেশে গাইবে, বলিবার পর) সন্দেশে সীতেশ তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলিল—ছিঃ রেখা কাঁদছ কেন?.....মাসখানেক পরে আবার ফিরব.....লক্ষী—ইত্যাদি। (রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় সীতেশ রেখার বই ফিরাইয়া দিতে গেল—সীতেশ ডাবলিন হইতে ডাক্তার হইয়া ফিরিয়াছে—সে রেখার বই ধার করিয়া পড়িত। রেখার জানালার ধারে লুকাইয়া দেখিতে চাহিল রেখা রাত্রি ৯০ টার সময় কি করে।)

এমন সময় ঘরের ভিতর হইতে একটা স্বর কানে আসিল. শোন রেখা.....

না রেখার মা তো নয়। তবে এত রাত্রে রেখার ঘরে কে? (বুঝিল অল্পম—অর্থাৎ প্রিয় ছাত্র).....

তাহার শিষ্য অল্পম, তাহার বন্ধু অল্পম আজ বিশ্বাসঘাতক।

গল্পের মর্যাদা: গুরু স্বয়ং যে-বিধবার প্রতি মনোযোগ দিয়াছেন, অন্তঃপ্রবৃত্ত হইয়া কোনো শিষ্যকে তিনি যেন তাহার সহিত আলাপ করাইয়া না দেন।

যে-সংখ্যা দেশ হইতে কিছুপূর্বে “কালি কালি মহাকালি”—উদ্ধৃত হইয়াছে সেই সংখ্যাত্তেই “মাঠেঃ” নামক আর একটি দ্বৈতত্ব বিষয়ক লেখা দেখিয়া আমরা খুশী হইলাম। কিন্তু এদিকে বেশে যে পরিমাণ বে-আইনি মদ সরবরাহ হইয়াছে বলিয়া শুনিতেছি তাহাতে কিছু সন্দেহ এবং আশঙ্কাও যে না হইয়াছে তাহা নহে। মাঠেঃ—

নেশায় বৃন্দ হইলে খুশী মন। একেরই ভাবনা শুধন ঝলমল আর সব পাতালের অষ্টে জলে।

ঐ অমনই ঘটে—খেলার নেশায় শৈশবে, পাঠক তাড়নায বাল্যে, বোবনে তরুণীর বিদ্যাব্যবাহারে, প্রৌঢ়ত্বে বাৎসল্যের টানে, আর ধনের কামনা ও মানের কামায় বাক্তিকে। নেশা—নিছক জ্বর নেশা।

বিন্দুমাত্র সন্দেহ করিখাছি কি?

প্রবন্ধটির আর একদিকে—

দাঁড়ায় মূর্খ দাঁড়া একটু—ততক্ষণ মধু পান করিয়া লই।……টলে গা, টলে পা, কণ্ঠের হয় আংশিক রোধ, বদখেয়ালী পিছু থাকে—‘মাতাল’। কিন্তু মন যে করে মাতামাতি ধারণাধানে নিরিখাসনে, মন মাতাল বেতালের সাজে মাতাইয়া দেয় ছনিয়া ছুটে বে-পরোয়া……সত্যই খাইব কি? সুল বুদ্ধিতে খুব ভাল লাগে যাহা খাইতে চাই তাহাই, পরিচয় চুখনে। কিন্তু প্রকৃতই কি ভক্ষণ করিতে সাধ ব্রহ্মময়ীকে?……কিন্তু আছে বাধা ও বিয় ক্রটি ও বিচ্যুতি অশেষ। প্রধান কথা—ঘরের মোহশাশ ছেদন।……কিসের প্রলোভন? রূপ-রসাদির ভোগস্পৃহা। কুঠারের আঘাত ঘেন পারি দিতে তাহাতে—ইত্যাদি।

ঐ একই কথা। ভোগস্পৃহায় কুঠারঘাত করিতে বাসনা। কিন্তু প্যারালিসিস আসন্ন কি না, বয়স নব্বইএর কোঠায় কি না, অথবা বে-আইনির রূপা কি না, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

সমস্ত দেশটা আখড়ার পরিণত হইতে চলিল! সকলেরই মুখে দেহতত্ত্ব। সাময়িক কাগজগুলি এই সব আখড়ার মূখপত্র। কিন্তু ইহারই মধ্যে একখানি নবপ্রকাশিত মাসিক বলিতেছেন—

প্রতিবৎসর মাদুর্গার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই মাছুষ আনন্দে যেতে উঠে এবং তাঁর অন্তর্জ্ঞানে হ’য়ে পড়ে বিষাদিত। মহিষ মন্দীনি। আমাদের বাহতে শক্তি দাও—মনে বল দাও, প্রাণে দিল্পী দাও।

কিন্তু মাতার নিকট হইতে কিরূপ শক্তি লাভ করিলেন তাহার মনুনা ছই পৃষ্ঠা পরেই পাওয়া যাইবে—

“আমি যে কুমারী যাব তার সামনে আবরণ উন্মোচন করলে যে আমার কৌমার্য্য ভঙ্গ হবে।”……‘নারীত্ব—সত্যীত্ব?’—ও একটা বাহ্যিক আবরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। কথাগুলো একেবারে বাজে ধার করা সাধা চোখকে ধাঁধা লাগাবার একটা ভীষণ অস্ত্র। আচ্ছা……তোমাদের বাধা নিম্ন অঙ্গসারে—দেহ দিয়ে স্পৃষ্ট হলেই নারীত্ব সত্যীত্ব সব জাহায়ে যায়—নয়? কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে পারি কি যে মন দিয়ে অস্ত্রের (পুরুষের) দেহ ও মন ছুটেকেই মনে মনে স্পর্শ করলে কি তোমাদের ‘সত্যীত্ব’ ‘নারীত্ব’ বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না?

তরুণদিগের নিকট হইতে এই যুক্তি কয়েক বৎসর ধরিয়া শুনা যাইতেছে। কিন্তু তবুও অবস্থার কিছু উন্নতি হয় নাই। কিন্তু এই-জাতীয় লেখকদিগের পৃষ্ঠদেশে বাহারা মনে মনে গো-বৃক নিদ্রিত বস্ত্রবিশেষ ছিন্ন করিয়া থাকেন তাহারা সত্যসত্যই যদি হাতেকলমে উক্ত কার্য্যটি করিতেন তাহা হইলে কিছু পার্থক্য হইত বৈকি! এই লেখকদিগকে কি মনোমনের ও হাতেকলমের পার্থক্যটি আজ পর্য্যন্ত কেহ বুঝাইয়া দিতে পারিল না?

দেশের যুবকদের মধ্যে কল্লনাশক্তি একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে—যেটুকু অবশিষ্ট আছে তাহা অতি লজ্জাকর। তাহা ধারা তাহারা কিছুর অঙ্কুরণও করিতে পারে না। ইহারায় যখন সাহিত্য রচনা করিতে যায় তখন এই দীনতা ধরা পড়ে। বিদেশী শত শত সাময়িক-পত্র এবং তাহাতে শত শত গল্প রহিয়াছে, এইগুলি চুরি করিলেও

শিক্ষানবিশী চলিতে পারিত। চুরি করিতে করিতে হৃত গল্পের টেকনিকও আয়ত্ত হওয়া অসম্ভব ছিল না—অস্বস্ত ভেটা সন্ধাপেক্ষা প্রয়োজনীয়—অর্থায় ছাপার অক্ষরে নাম দেখা—সেটা ভদ্রভাবে চলিতে পারিত, কিন্তু এক কি? একটি গল্পে দেখিতেছি—

শিপ্রার বেশের বর্ণনা করতে যাওয়া বুঝা। এর গায়ে হাতা-কাটা ব্রাউস সম্প্রথের দিকের প্রায় সবটাই দেখা যায়। কাধ পর্যন্ত সমাপ্ত; ভদ্রভাবে হাত উঠাইলেই বগল দেখা যায়।

এই-জাতীয় বগল-দেখা তরুণরাই শেষ পর্যন্ত ডুবিয়া বা বিষ খাইয়া মরে। ভালই করে!

—

কেহ যদি পবনের কাগজে এই মর্মে বিজ্ঞাপন দেয় যে তাহার নিকট এক বোতল হইলি আছে, কোনো উপযুক্ত লোক খাইতে চাহিলে তাহাকে বিনামূল্যে উহা দেওয়া যাইবে, এবং তাহার উত্তরে যদি মহাত্মা গান্ধী লেখেন যে আমি সম্প্রতি মদ ধরিয়াছি, আমাকে পাঠাইতে পার; তাহা হইলে ব্যাপারটি সংবাদহিসাবে কাহারো কাহারো নিকট কৌতুককর অথবা আশঙ্কাজনক বোধ হইতে পারে। কিন্তু যদি কেহ কত্কা বিবাহ দিবেন বলিয়া পাত্র-প্রার্থী হইয়া বিজ্ঞাপন দেন, এবং কোনো ভদ্রলোক যদি বিবাহেছু হইয়া আবেদন পাঠান (ভদ্রলোক আবেদন করিবেন আশা করিয়াই সম্ভবত বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়) তাহা হইলে তাহাও যে কৌতুককর সংবাদ হিসাবে কোনো দলবিশেষের দৃষ্টবিকাশের সাহায্য করিতে পারে তাহা এত দিনে বৃষ্টিতে পারিলাম।

—

সম্প্রতি এইরূপ একটি ঘটনা ঘটিয়াছে। এক গ্র্যাজুয়েট-কন্সার জন্ত কোনো প্রতিনিয়াল এক্সিকিউটিভ অফিসার কাম্ব-পাত্র চাহিয়া বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন। তাহার উত্তরে জনৈক শিক্ষিত ভদ্রলোক (বয়স ৪২ : পূর্বে বিবাহ হয় নাই : বিজ্ঞাপনে মেয়ের বয়সের উল্লেখ নাই) আবেদন করিয়াছিলেন। কিন্তু যেহেতু উক্ত ভদ্রলোক

গান্ধীজির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত এবং অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির বেতনভোগী সেক্রেটারী, সেইহেতু ঐ আবেদনপত্রখানা বিজ্ঞাপনদাতার হস্তচ্যুত হইয়া একেবারে সাপ্তাহিক কাগজের আড্ডায় আসিয়া পড়িল, তাহা হইতে ব্রক প্রস্তুত হইল (পাছে কেহ সন্দেহ করে যে সংবাদটি বানানো) এবং সেই চিঠির ব্রক ছাপাইয়া গল্পে পক্ষে রসিকতার ফোয়ারা ছুটিল।

—

মনে হয় যেন এটি কাগজ বিজ্ঞাপনদাতার অত্যন্ত পরিচিত। সেট স্বযোগ গ্রহণ করিয়াই ইহার একবার আবেদনকারীকে শিক্ষা দিবেন বলিয়া কোমর বাধিয়াছেন। ইহাদের কেন যেন মনে হইয়াছে (বাংলা দেশের মেয়েদের ভাগ্য!) বিজ্ঞাপিত মেয়েটি, এক বোতল হইলি; এবং আবেদনকারী, মহাত্মা গান্ধী। শুধু তাহাই নয়, আবেদনকারীর আবেদন অপরাধ প্রমাণিত হইয়াছে। অর্থাৎ তিনি “৪২ বৎসর কৌমাৰ্য্যব্রত পালন” করিয়াছেন। ইহা বাঙালী গ্র্যাজুয়েট-মেয়েকে বিবাহ করিবার পক্ষে কম অপরাধ নহে। কন্সার প্রতি কন্সার অভিভাবকের কি অসীম শ্রদ্ধা!

—

কতকগুলি অধ্বশিক্ষিতের মুখে হাসির লহর তুলিয়া কাগজ পপুলার করিবার জন্ত যে সমস্ত শিক্ষিত বর্ষর এই জঘন্য হীনতার আশ্রয় লইতে পারে তাহাদের দ্বারাষ্ট যুগে যুগে দেশের অকল্যাণ হইয়া আসিতেছে। কিন্তু আবেদনকারীর চিঠিখানার ফোটা ছাপাইয়া রসিকগণ তাঁহার উপকারই করিয়াছেন। এই চিঠিখানা না দেখিলে সমালোচকদের কথা অনেকে বিশ্বাস করিতেন। ভদ্রভাষায় লিখিত, বিজ্ঞাপনদাতার আহৃত কোনো ভদ্রলোকের চিঠি লইয়া যে রসিকতা করা যায় না তাহার প্রমাণ ঐ চিঠি খানি। কিন্তু নোংরা মির ও একটা সীমা থাকা উচিত।

—

জগন্নাথের মন্দির ও আগার তাজমহল ইত্যাদি দেখিয়া জনৈক দর্শক খুব একটা আশ্চর্য্য কোশলে তাঁহার দর্শনাভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

ভুবনেশ্বরের অথবা জগন্নাথের মন্দির শক্তির প্রাচুর্য্য আর সৌন্দর্যের গাভীরা দিয়ে আমাদের চিত্তকে অভিভূত করে, যেন নায়াগ্রার জলপ্রপাত ; তাজমহল অথবা মতি মসজিদ আমাদের চিত্তকে মাধুর্য্য দিয়ে মুগ্ধ করে—রূপের প্রভাব বিস্তৃত করে—যেন বনের মধ্যে প্রশান্ত নদীর অপূর্ণ কান্তি। ভুবনেশ্বরের মন্দিরের সম্মুখে যখন দাঁড়িয়েছি তখন মনে হয়েছে রামায়ণের কথা, মহাভারতের কথা ; তাজমহলের সম্মুখে যখন দাঁড়িয়েছি তখন মনে হয়েছে চণ্ডীমাসের কবিতার কথা ; জগন্নাথের মন্দিরের সম্মুখে যখন দাঁড়িয়েছি তখন মনে হয়েছে সেক্সপীয়রের নাটক পড়ছি ; মতি মসজিদের সামনে গিয়ে মনে হয়েছে—কীটসের গীতি কবিতা পড়ছি।

কিন্তু বাহারা কেবল উপমেয়গুলি অর্থাৎ ভুবনেশ্বর বা জগন্নাথের মন্দির এবং তাজমহল ইত্যাদি দেখিচ্ছে অথচ নায়াগ্রা প্রপাত দেখে নাই, রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডীমাসের কবিতা, সেক্সপীয়রের নাটক, কীটসের কাব্য পাঠ করে নাই, তাহাদিগকে অন্যথাসে এই কৌশল দ্বারা ঐ ঐ বস্তুবিষয়ে ধারণা জন্মাইয়া দেওয়া যায়।

তখন ব্যাপারটি হইবে এইরূপ :—নায়াগ্রা প্রপাত দেখিয়া মনে হইল জগন্নাথের মন্দির দেখিতেছি ; বনের মধ্যে প্রশান্ত নদীর অপূর্ণ কান্তি দেখিয়া মনে হইল যেন মতি মসজিদ দেখিতেছি ; মহাভারত পড়িয়া মনে হইল যেন ভুবনেশ্বরের মন্দির দেখিতেছি, চণ্ডীমাসের কাব্য পড়িয়া মনে হইল তাজমহল দেখিতেছি, সেক্সপীয়রের নাটক পড়িয়া মনে হইল জগন্নাথের মন্দির দেখিতেছি ইত্যাদি।

কিন্তু লেখক অল্পজ্ঞ আমাদিগকে ভাবাইয়া তুলিয়াছেন—

ভুবনেশ্বরের অথবা জগন্নাথের মন্দিরের সৌন্দর্য্যকে ঠিক ঠিক উপলব্ধি করতে হ'লে হিন্দুর চোখ দিয়ে সবটাকে দেখতে হবে। বিদেশী কালচারের ছাঁচে ঢালা মন নিয়ে

হিন্দু মন্দিরের আটকে আমরা ঠিকমত উপলব্ধি করতে পারবো না। যুক্তির কটিপাথরে হিন্দু আটের মূল্য যাচাই করতে গেলে ভুল হবে...দুর্গাপূজার আরতির সময় যিনি দেবমন্দিরে সকলের মধ্যে আসন নিয়েছেন—তিনি জানেন, সমস্ত হিন্দুজাতির মন একত্বের বাঁধা। সেই স্বর হচ্ছে তক্তি আর বিশ্বাসের স্বর—যা আর সকল স্বরকে ডবিয়ে দিয়েছে। ভুবনেশ্বরের মন্দির যদি নায়াগ্রা প্রপাতের অহরূপ হয় তাহা হইলে সেই মন্দিরকে শুদ্ধমাত্র হিন্দুর চোখ দিয়া দেখিতে হইবে কেন ? তক্তি ও বিশ্বাসের চোখে না দেখিলে বাহার সৌন্দর্য্য দেখা যায় না তাহার সৌন্দর্য্য নায়াগ্রার সৌন্দর্য্যের সঙ্গে কি করিয়া মিলিল ? বিদেশী কালচারের ছাঁচে-ঢালা মন অন্তত লেখকের যেন নহে একথা লেখক নিজেই প্রমাণ করিয়াছেন। কেননা জগন্নাথের মন্দিরকে সেক্সপীয়রের নাটক মনে হইয়াছে। বিশুদ্ধ তক্তি ও হিন্দু দৃষ্টিতে ইহা সম্ভব হইয়াছে। আট বৃত্তাইবার চমৎকার পদ্ধতি ! জয় মা কালী !

ইটালি-আবিসীনিয়ার যুদ্ধ উপলক্ষে বাংলা সাময়িক পত্রে একটি নূতন ধরনের যুদ্ধ-সহিত্য গাড়িয়া উঠিতেছে। ইটালির উপর রাগ এবং আবিসীনিয়ার প্রান্ত অহুরাগবশত বাঙালী লেখকগণ কেহ বিচারক, কেহ ভবিষ্যদ্বক্তা, কেহ বা বিশ্লেষক সাজিয়া বসিয়াছেন। ইহাতে আপত্তির কিছু নাই, কিন্তু তাহারা সত্যসত্যই কি বলিতে চাহেন, তাহা আমাদের জানা দরকার। যুদ্ধের সংবাদে সহজ ভাষার বর্ণনা বাংলা ভাষায় পাওয়া দুর্ঘট হইয়া পড়িয়াছে। কেহ লিখিতেছেন, নটরাজের লীলা ; কেহ লিখিতেছেন, নাচো কালী নাচো ; আবার কেহ লিখিতেছেন, তাণ্ডব নৃত্য। ইংরেজি কোনো কাগজে Devil Dance বা Divine Manifestation-জাতীয় কোনো হেঁডলাইন পড়িয়াছি বলিয়া মনে পড়েন। যুদ্ধকে Frolic বা Sportও কেহ বলে নাই, কিন্তু বাংলাদেশে সহজ কথায় কেহ কিছু বলিতেও পারেনা, বলিলেও তাহা কাহারো মনে ধরে না।

যুদ্ধের সংবাদ লেখা বা এ সংক্ষেপে কোনো মন্তব্য করা অত্যন্ত কঠিন। বিশেষত, দুই একপানি কাগজের সংবাদের উপর মাত্র নির্ভর করিয়া যুদ্ধ ব্যাপারে মন্তব্য প্রকাশ করিতে গেলে তাহার প্রমাদ ঘটবার সম্ভাবনাই বেশি। স্বতরাং বক্তব্যটুকু সাধা ভাষায়, সরল ভঙ্গিতে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সহিত বলা উচিত। ইহা করিতে না পারিলে, চূপ করিয়া থাকাই শোভনীয়। কিন্তু বাঙালী লেখক চূপ করিয়া থাকিবে কেন? তাহার প্রাণের মধ্যে মহাকালী নৃত্য করিতেছে—সে কি শুধু ভুল হইবার ভয়ে ধামিষা থাকিবে? তাহার লেখা পড়িয়া সাধারণ পাঠক ভুল শিখিবে, সাধারণ বুদ্ধিভারা কোনো জিনিস যে বস্তু হইতে পারে এ ধারণা তাহার মন হইতে ক্রমশঃ লোপ পাইবে, কিন্তু তবুও লেখা ধামান হইবে না। নটরাজ যে তাণ্ডব নৃত্য করিয়াছেন, মহাকালী যে নৃত্য করিতেছেন, দানবীয় লীলা যে অচলিত হইতেছে—চূপ করিয়া কি থাকা যায়?

চট করিয়া বাঙালী লেখক লিখিল—

হাবসীরা আদোয়া হারাইয়াছে, আকসাম হারাইয়াছে, যেরূপ মনে হইতেছে রাজধানী আদিস আবাবাও সম্ভবত সত্বরই ইটালীর দ্বারা অধিকৃত হইবে।

অর্থাৎ এই লেখকের যেরূপ মনে হইতেছে তাহাতে! অথচ মজা

এই, যে-সকল ইংরেজি সংবাদ পত্র পড়িয়া ইহা লেখা—তথ্য একরূপ সত্যিহীন উদ্ভ্রাণের প্রলাপ কেহ কখনো উচ্চারণ করে নাই।

—

একদিন-না-একদিন ইংরেজ রাজ্যের পতন হইবে এবং ভারত স্বাধীন হইবে, এই সাস্ত্রনাবাক্য ক্রমাগত প্রতিবেশীকে শুনাইয়া শুনাইয়া বাঙালী ভবিষ্যৎ সফলতা-সম্বন্ধে (যত শতাব্দী পরেই হউক) একরূপ অপ্টিমিস্ট হইয়াছে যে এই সাস্ত্রনাবাক্য সে যে-কোনো উপলক্ষেই উচ্চারণ করিতেছে। যথা—

আজ হউক, কিংবা কিছুদিন বিলম্বে হউক আদিস আবাবারও পতন হইবে, ইহা অসম্ভব নহে—[নিজের

মতবাদে কি অসীম বিশ্বাস।] কিন্তু হাবসীরা যদি স্বাধীনতার মর্যাদা রক্ষার জন্য মরণকে বরণ করিতে ভীত না হয়, তাহা হইলে পাখিবে এই ক্ষণিকের পরাজয় তাহাদের আদর্শকে পরিমান করিতে সক্ষম হইবে না—সে আদর্শ তাহাদের মাতৃভূমিকে মহত্তর মর্যাদায় স্বপ্রতিষ্ঠিত করিবে।

পরম্পরাগতীর মদগর্ভী কিংবা মিথ্যাময়ী বাণী স্বদেশ-প্রেমিকের শোণিত নিষেককে ব্যর্থ করিতে সক্ষম হইবে না। [আমরা ভৌতিক সীমা বহুক্ষণ ছাড়িয়া আসিয়াছি—শ. চি. স.] ভাগীর একবিন্দু রুধির হইতে শত শত স্বার্থভাগীঘীর উদ্ভব হইবে [রূপকথার রাজ্যে প্রবেশ করিলাম—শ. চি. স.] সভ্য রাষ্ট্রনীতিকদের সমস্ত বাকবিত্তকে অভিতুত করিয়া তাহাদের প্রচণ্ড শৌর্য্য প্রাচীর ললাটট প্রদীপ্ত করিয়া তুলিবে। আদোয়ার আত্মদান ব্যর্থ হইবে না।

লেখক ইহাকালের সমস্ত নিকাশ করিয়া আবিসীনিধাকে একেবারে পরলোকে লইয়া হাঙ্গির করাইয়াছেন। তত্বপরি আধ্যাত্মিক Good wishes!—নাচো কালী নাচো।

—

চিত্রশিল্প আমাদের দেশে যে কত উন্নত হইয়াছে তাহা দেখিতে চাইলে কান্তিকের ভারতবর্ষের প্রথম চিত্র গণেশজননী দেখা আবশ্যক। শিল্পের নামে এরূপ জঘন্য কচি এবং ক্লাবের পরিচয় ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশেও পাওয়া যায় না। যিনি ড্রইং জানেন না তিনি আধ্যাত্মিক শিল্পী। যিনি অল্প ড্রইং শিখিয়াছেন তিনি কাঠের মিস্ত্রী না হইয়া তুলি লইয়া বসিয়াছেন। শিল্পী হইতে হইলে কিঞ্চিৎ সাধনা আবশ্যক। দাড়ি-কামানো পেশোয়ারীর মাথার সহিত চিংপুরের কোনো বারবানিতার অর্দ্ধ উল্লম্ব দেহ সংযুক্ত করিয়া দিলেই যদি গণেশজননী হইত তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ চক্রবর্তীও শিল্পী হইতেন।

—

শ্রীকৃষ্ণ প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর 'মাটির দেবতা'ও শেষ পর্যন্ত হেয়ালী হইয়া উঠিল! ইহা ভাষার অধঃপতনে ঘটিল না বৈক্যতের

অধঃপতনে ধটল তাহা আমরা কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না।
ঘটনাটি এই—

অধঃপতন কথাটা যত সোজা বাস্তবিক কাজে তা না
হলে মানুষ অধঃপতনের পথে নামলে আর তাকে টেনে
তোলা মুশ্কিল। মেরুদণ্ড যার নেই, তাকে যতই সোজা কর
সে গুটিয়ে যায়। সৈকতেরও সেই অবস্থা।

সৈকতের পক্ষে দাঁড়াইয়া থাকা ভাল কি গুটাইয়া যাওয়া ভাল তাহাই
বা কে বলিয়া দিবে ?

কাজিকের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেক্ষকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়
জনৈক “উদীয়মান চিত্র শিল্পীর” প্রচারের ভার গ্রহণ করিয়া কথা-
প্রসঙ্গে বলিতেছেন—

আধুনিকতার অতি প্রগতির দাপে, অনেক শিক্ষানবীশ
শিল্পীরা মনে করেন, যে, সাধারণ ভাবে বাঙালী হিন্দুরা
প্রাচীন পৌরাণিক ভাবধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পান্ডিত্য
ভাবের প্রভাবে ভারতের প্রাচীন পুরাণে বর্ণিত কৃষ্টির জগতে
আমরা (?) সম্পূর্ণ ভাবে বিশ্বাস হারিয়েছি।

ইহা হইত ‘পৌরাণিক’ ভাবধারা সম্পর্ক দুঃখের, কিন্তু ‘পুরাতন’ শিল্প-
সমালোচকের উপর লোকে যদি এই ভাবে বিশ্বাস হারাইত তাহা
হইলে হয়ত তাহা অহুতাগযোগ্য হইত না। (ভাষার জন্তও বটে।)

এরূপ অহুমান করিবার কারণ উক্ত প্রবন্ধেই নিহিত রহিয়াছে।
অর্দ্ধেক্ষবাবু বলিতেছেন—

নন্দলালের পর পৌরাণিক চিত্রে নতুন ভাব ও রসের
প্রবর্তনা করা বোধ হয় অসাধ্য সাধন। তথাপি, আমার
মনে হয় রামেশ্বরের প্রচেষ্টার মধ্যে অনেকটা আশার বীজ
নিহিত আছে। তাহার অন্তরের মধ্যে পৌরাণিক বস্ত-
সাধনার উপযোগী একটা স্বাভাবিক প্রেরণা আছে কি না তা
অহুসন্ধান করবার সুযোগ আমার ঘটে নি।

শিল্পমালোচনা, ছাড়াইয়া “উদীয়মান শিল্পী” বিষয়ে ব্যক্তিগত
টেস্টিমোনিয়াল দেওয়া স্বাভাবিক নহে, কিন্তু প্রবাসী-পক্ষে এরূপ
বস্তু ছাপা হয় ইহাই অস্বাভাবিক। (কিংবা স্বাভাবিক।)

বহু জিনিসে আমরা আশার বীজ নিহিত দেখি, উপযুক্ত পরিবেশও
দেখি কিন্তু পরে অসুখ দেখি না। হুতরাং বীজ দেখিয়া উল্লসিত
হই না। শ্রীযুক্ত রামেশ্বর চট্টোপাধ্যায় হইত ভবিষ্যতে খ্যাতনামা শিল্পী
হইবেন, ইহাতে আমাদের বিম্বমাজ আপত্তি নাই, কিন্তু শিল্পীর
স্বাভাবিক প্রেরণা আছে কি না শিল্পকার্য হইতে যিনি তাহা ধরিতে
পারেন নাই, আছে কি না, তাহা অহুসন্ধান করিবার সুযোগও
বাহার হয় নাই, এবং যিনি শেষে এমন কথাও বলিয়াছেন—

নবীন শিল্পী এমন একটু শক্তির পরিচয় দিবেছেন যাতে
ক’রে মনে হয়, যে তাঁর নিজস্ব সাধনা তাকে জয়যাত্রার
পথে চালিত করেছে।...অনেক সময় মনে হয় সিদ্ধির প্রয়াস
সিদ্ধিলাভ হ’তে বড়।

উাহাকে কি বলিব ? অর্থাৎ যুরাইয়া ফিরাইয়া লেখক ইহাই বলিতে
চাহেন যে ভবিষ্যতে কি হইবে তাহা মা গঙ্গা জানেন ; বর্তমানে
আশার বীজ দেখা যায় কিন্তু শিল্পীর স্বাভাবিক প্রেরণা আছে কি না
তাহা অহুসন্ধান করিয়া সময় নষ্ট করি নাই ; তবে সিদ্ধিলাভ সম্ভ-
জনক হইলেও সিদ্ধির চেষ্টাই আসল।

কিন্তু অর্দ্ধেক্ষবাবু এরূপ রসিকতা করিলেন কেন ? (প্রবাসীতে
ছাপা হইল কেন সে প্রশ্ন আর করিব না।) ইহার কারণ আছে।
লেখক নিজেই তাহা বলিয়াছেন—

যে পরিবারে এই যুবক-শিল্পী জন্ম নিয়েছেন সেই

পরিবারে আতিথা গ্রহণ করবার সৌভাগ্য আমার ঘটেছিল।

বৃদ্ধিহাঙ্গি, আর বলিতে হইবে না।

ঢাকার পূর্বাচল থে.বাংলাদেশকে জীয়াঙে দীক্ষিত করিবে বলিয়া মনস্থ করিয়াছে তাহা নিতান্ত অসম্ভব নহে। প্রমাণ—

তার নাচুনি ছন্দের হাটন আর চোখবিচুনি চাওন
বেশ চমক লাগায়।

চোখ বিচুনি চাওন! অদ্ভুত। এখন ওঠ বিচুনি হাসি, কষ্ট বিচুনি
গান এবং দস্ত বিচুনি কথার অপেক্ষায় রহিলাম।

বর্তমান সংখ্যার 'বিজ্ঞান সার সংগ্রহ' নামক লেখার শ্রীযুক্ত
ত্রেজেন্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত উত্তর আগামী বারে প্রকাশিত হইবে।

প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন

গত বৎসর কলিকাতায় প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের স্বাধন অধিবেশনে হির
হইয়াছিল যে ১৩৪২ সালের জ্যৈষ্ঠ অধিবেশন বড়দিনের ছুটির সময় কাশীধামে অনুষ্ঠিত
হইবে। কিন্তু কয়েকটা অপ্রত্যাশিত কারণ বশত এ বৎসরের অধিবেশন সেখানে সম্ভবপর
হইল না।

এক্ষেপে হির হইয়াছে যে উক্ত অধিবেশন আগামী বড়দিনের ছুটির সময় নিউদিলিতে
অনুষ্ঠিত হইবে।

শ্রীপরমল গোস্বামী এম-এ কর্তৃক সম্পাদিত। ২২২, মোহনবাগান রো, শনিরঞ্জন প্রেস
হইতে শ্রীপ্রবোধ নান কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



বাঙালী হাসে কি না

কয়েক মাস পূর্বে শনিবারের চিঠিতে 'হাসির বাধা' নামক প্রবন্ধের
লেখক প্রমাণ করিয়াছিলেন, বাঙালী হাসে না। অর্থাৎ তাহার
হাসিবার স্বযোগ কখনই জোটে না। শুনিয়া মনে হয়, উক্ত বাধা
কাটিয়া গেলেই বাঙালী হাসিবে। চোখে একরূপ দৃষ্টির বাধা
জমিতে থাকে, চক্ষুচিকিৎসক যথাসময়ে চুরিঘারা সেই বাধা কাটিয়া
দূর করিয়া দিলে দৃষ্টি ফিরিয়া আসে। কিন্তু বাঙালীর হাসির
বাধা সেরূপ গুরুতর নহে, এ বাধা অচলও নহে, ইহা পথেঘাটে খুরিয়া
বেড়ায়, একটু চেঁচা করিলে দূর করিয়া দেওয়া অসম্ভব নহে। লেখকের
বলিবার বিষয় অনেকটা এইরূপ। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস অল্প প্রকার।

আমাদের মতে বাঙালী অত্যন্ত হাস্যপ্রবণ এবং হাসিই বাঙালী-
চরিত্রের বিশেষত্ব। যে হাসি মতিধের মধ্যাহ্নতায় জন্মে সে হাসি

হইতে বাঙালী বঞ্চিত বটে, কিন্তু যে হাসি মস্তিষ্কের সারাংশকে লেশমাত্র স্পর্শ না করিয়া শুদ্ধমাত্র প্রবৃত্তি হইতে জন্মে সে হাসি একমাত্র বাঙালীরই নিজস্ব। উক্ত প্রবন্ধে সম্পাদক-মহাশয় মন্তব্য করিয়াছিলেন, হস্তবিমুখতার প্রতিকারস্বরূপ বিস্তারিতভাবে লাক্ষি গ্যাস ব্যবহার করিলে স্বফল ফলিতে পারে। কিন্তু এরূপ মন্তব্যে চাতুর্ঘ্যের পরিচয় পাওয়া যায় না। হাসির জন্ম প্রত্যহ পয়সা খরচ করিয়া গ্যাস কিনিতে হইবে, দরিদ্র দেশে ইহা অস্ব্যুক্তি নহে। তদুপরি গ্যাসের ব্যবহার যুদ্ধক্ষেত্রেই নিষিদ্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। স্তত্রায় সমাজেও যে উহা অচল হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই। উক্ত প্রবন্ধকার পয়সা খরচ করিয়া সিনেমায় গিয়া হাসিবাব চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু হাসিতে পারেন নাই। অর্থব্যয় স্বভাবতই হাসির প্রতিবন্ধক, স্তত্রায় এরূপ বাধতা অতুতাপ-যোগ্য নহে।

সম্প্রতি আম্মুজমেটের উপর ট্যাক্স বসাতে সিনেমায় বসিয়া হাসা স্বভাবতই কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে, ছেলে-কাঁদা বাজে কৈকিৎ। সিনেমায় 'কমিক' ছবি দেখিতে বা অজ্ঞ কোনো ছবি দেখিতে বাঙালী যদি কখনো হাসিয়া থাকে তাহা হইলে ছেলে-কাঁদা উপলক্ষ করিয়াই হাসিয়াছে। ছেলের মাতাকে কোনো রসিক দর্শক সর্সদাই এমন একটি হাস্য-রসাত্মক কথা চোঁচাইয়া বলিয়াছে যাহাতে সমগ্র বাঙালী-দর্শক সমবেত ভাবে না হাসিয়া পারে নাই। কথাটি বলিতে কোনো খরচ নাই, অথচ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সকলেরই মনের বগলে স্বস্তিস্থিতি লাগিতে বাধ্য। এমন কি দর্শকদের মধ্যে ছুঁচাচারিটি হিপো-পটোমাস থাকিলে (থাকিলে কেন, থাকেই) তাহারাও সেই মুহূর্তে পাখীর মত লম্বু হইয়া উড়িবার চেষ্টা করিয়া থাকে।

উচ্চদের হাস্যরসের একটি স্ববিধা এই যে উহা সৃষ্টি করিতে

লেশমাত্র পরিশ্রম করিতে হয় না—জিহ্বা হইতে অতিক্রান্ত রসবাণী স্থলিত হইয়া যায়।

এ বাণী মস্তিষ্কের সৃষ্টি নহে বলিয়াই ইহার প্রাণশক্তি বেশী। ইহার ক্রিয়া ওঠেই মিলাইয়া যায় না, বরঞ্চ অধিকাংশ সময়ে ইহা ওঠের সম্পর্শেই আসে না—শব্দযন্ত্র হইতে সোজা উৎসুক মুখগহ্বর দিয়া বাহির হইয়া আসে। আধুনিক শিক্ষাই হাস্যরসকে অনেকখানি হজম করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু তথাপি আধুনিক শিক্ষাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া যে হাস্যরসের সৃষ্টি তাহা আমরা অহরহ ব্রততর দেখিতে পাইতেছি।

মাত্রয় প্রতিনিয়ত নানারূপ পরিবর্তনের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। কিন্তু এই বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্যেও এমন একটি বস্তু আছে যাহার পরিবর্তন হয় না। ইহাই মাহুষের স্বরূপ। যে শিক্ষা আমরা বাহির হইতে পাই, তাহা বাহিরেই থাকিয়া যায়, ইহা আমাদের রুচিকে পরিবর্তন করিতে পারে না। আমাদের প্রাণধর্ম, এই বাহিরের জিনিসকে একেবারে হজম করিয়া নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিতে চায়, না পারিলে পরিত্যাগ করে। শিক্ষা অজ্ঞাত দেশে মাহুষের স্বরূপ ফুটাইয়া তুলিতে ব্যস্ত, কিন্তু আমাদের দেশে ইহার ব্যবহার অজ্ঞরূপ। তাই স্বযোগ উপস্থিত হইলেই আমরা শিক্ষা বন্ধ করিয়া দিতে চাই; এমন কি স্বরাজ পাওয়া উপলক্ষেও এই প্রস্তাব করি। শিক্ষা সম্পূর্ণ বাহিরের জিনিষ বলিয়াই এরূপ সম্ভব হয়। এবং এই জন্মই হাস্যরস সৃষ্টি বা উপভোগের সময় শিক্ষার কৃত্রিম মুখোশ আমাদের মুখ হইতে আচঞ্চিতে খুলিয়া পড়ে। অতএব যিনি বলেন বাঙালী হাসে না, তিনি শিক্ষা-জঙ্ঘরিত প্রাণহীন বাঙালীর কথাই বলেন।

শিক্ষায় যাহাদের রুচিবিকার ঘটে নাই তাহাদের কথা বলি।

আমরা যাহাকে নিষ্ঠুরতা বলি তাহার ঘরাই ইহার হস্ত্রস সৃষ্টি করে এবং হাসে। রেস খেলিয়া যে সহস্র সহস্র টাকা উড়ায় সে বস্ত্রাঘ সাহায্যার্থী উৎসাহী স্কুলের ছেলেকে রিক্তহস্তে বিদায় দিয়া পারিষদ-বর্গের সহিত একচোট হাসিয়া লয়। নূতন জামাইএর ভাতের ভিতর বাটি চুকাইয়া, কিংবা পানের মধ্যে আরসোলা পুরিয়া যে হস্ত্রস সৃষ্টি করা হয় তাহার মধ্যেও এই নিষ্ঠুরতার অংশ রহিয়াছে। আমার পাঠ্য লেজের দিকে কাটিবার অধিকার আমার আছে (রাম শর্মা কমা করিবেন)—এ কথা সত্য। কিন্তু ইহাও নিষ্ঠুর সত্য। এই জাতীয় সরস উপমাঘারা আমরা আমাদের বক্তব্য স্পষ্টতর করিয়া তুলি। যাত্রা থিয়েটার বা সিনেমায় আমরা যে অভিনয় দেখি তাহার মধ্যকার যে সরস-অংশটুকু উপভোগ করিতে বৃদ্ধি খরচ করিতে হয় না তাহাই আমাদের কাছে হস্ত্রসুধর করে বেশি। রাত্রি চোখে দেখে না একরূপ জামাইয়ের পশুরবাড়িতে রাত্রি পেট বাথা করিয়া উঠিল—কিন্তু চোখে দেখে না বলিয়া উঠিবার উপায় নাই; কাজেই ইহা অতিশয় উপভোগ্য। বহু বর্ষ ধরিয়া এই অভিনয় বাঙালীকে খুশী করিতেছে, কিন্তু বৈষ্ণবের খাতার মত নাটক প্রায় অচল। কেননা উহা উপভোগ করিতে বৃদ্ধির প্রয়োজন।

সাহিত্যে যাহা কোনোমতেই স্থান পাইতে পারে না, অথচ যাহা প্রতিনিয়ত বাঙালী উচ্চারণ করিতেছে—সেইসব হস্ত্রসাস্বাদক প্রবাদবাক্য বা জ্ঞানগর্ভ অভিজ্ঞতার বাণী যদি ভবিষ্যতে বাঙালী আর উচ্চারণ না করে তাহা হইলে তাহার ভাষার তেজ নষ্ট হইয়া যাইবে। ইংরেজির অহুকরণে আমরা সেইসব কথার ব্যবহার সাহিত্যে হইতে তুলিয়া দিয়াছি—কিন্তু ইংরেজের চোখে মতই অশ্লীল হউক, আমাদের মধ্যে যিনি দার্শনিক এবং সজ্জন বলিয়া খ্যাত তিনিও

তাহা অজ্ঞানবদনে সর্বসমক্ষে উচ্চারণ করিয়া থাকেন। অস্বস্থ্যপশ্যা জ্রীলোকও তাহা গুরুত্বের নিকট উচ্চারণ করিতে পারেন। ইংরেজি The dog in the manger-এর অতুল্য বাংলায় যে দৈহিক নির্গমনবিষয়ক একটি রসাত্মক বাক্য আছে তাহা আপনারা স্মরণ করুন। ভয় পাইলেই লোকে “কাপড়ে-চোপেরে—” যাহা করে বলিয়া বাঙালী জানে, তাহাতে আর যাহাই অস্ববিধা হউক, তাহার হাসি কেহ রোধ করিতে পারে না। একটু অশ্লীল না হইলে ভাষা মুখরোচক হয় না। অশ্লীলতার পরিমাণ যে-পরিমাণ বৃদ্ধি হইবে হস্ত্রসের মাত্রাও সেই-পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। বহুকাল পূর্বে একখানি নাটক দেখিয়াছিলাম, তাহার কল-বিক্রেত্রী নায়িকাকে জটনক অসং লোক এক স্থানে বলিতেছে, ওগো ছোটো ডালিম দেবে গা? ইহার ইঙ্গিত অতি স্পষ্ট, এবং বক্তার উচ্চারণের সঙ্গে ছুই হাতের ভঙ্গিতে তাহা আরো স্পষ্ট, সুতরাং ইহাতে শ্রোতামাজেই বরাবর উচ্চ হাস্য করিয়াছে। টেনের শোচাগারে যে-জাতীয় ছবি এবং লেখা দেখা যায় তাহা বাঙালীর একটি বিশিষ্ট হিউমর। পরজীকে ফুঁসলাইয়া হাত করিতে হইবে, ইহার জ্ঞান দালাল বা কুটনি নিযুক্ত করা হইতেছে প্রথম যুগের হস্ত্রসাস্বাদক বাংলা সাহিত্যের ইহাই বিষয়বস্তু। গোপাল ভাঁড়ের সহিত আমরা সকলেই পরিচিত। সেই পুরাতন ধারাই আজ পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। আমি বলিতে চাহি না যে চেহারা র কিছু পরিবর্তন হয় নাই; পরিবর্তন হইয়াছে, কিন্তু উন্নত হয় নাই। তাহার প্রমাণ, শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে জগত্তারিণী স্বর্ণ-পদক পাইবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হন নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিচারককে হাসাইতে হইলে হৃদয়মার্গ ত্যাগ করিয়া স্কলমার্গ অবলম্বন করা আবশ্যক। কারণ যাহারা আগে বিচার করিয়া

পরে হাসেন তাহারিগকে হাশ্বরসের বিচারক করিলে অশ্রুপাত অবশ্যস্বাবী। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিচারকগণ যদি প্রমথবাবুর লেখার পূর্বেই হাসিতেন, তাহা হইলে অবশ্যই তাহা তাহার। এতদিন গোপন রাখিতে পারিতেন না।

শিক্ষা-বিভাগে হাসি চিরকালের জন্ত লুপ্ত হইয়া আছে। প্রাথমিক শিক্ষাবিভাগে ব্যক্তিদের পরিবর্তে বেত ব্যবহৃত হয়—এরূপ অবস্থার বেত্রধারী হাসিতে পারে না, এবং শিক্ষার্থীরা যদি হাসে (অথবা হাসে বলিয়াই) গুরুমহাশয় সেই বেত দ্বারা তাহাদের পৃষ্ঠদেশে স্পর্শ করিয়া থাকেন। ফলে ছাত্রেরা স্বাভাবিক হাসি ভুলিয়া গিয়া বিরুদ্ধ বিষয়ে হাসির অহুসন্ধান করিয়া বেড়ায়।

কিন্তু কলেজের প্রফেসর ও ছাত্রের সম্পর্ক এরূপ নহে। এখানে লেকচার হলগুলি প্রশান্তর এবং বাহিরের স্বাধীন হাওয়া প্রবেশ করিবার পথ একেবারে রুদ্ধ নহে। কিন্তু শিক্ষা-দান বিষয়টিই এরূপ গুরুদায়িত্বপূর্ণ যে ইহাতে হাসির অবকাশ নাই। প্রফেসরের বিশ্লেষণে যে-কোনো হাশ্বরস তিক্তরসে পরিণত হয়, এবং ফলে পরীক্ষায় অত্যন্ত কম নম্বর পাইয়া ছাত্রেরা হয়ত একবার পরস্পরের দিকে চাহিয়া হাসে। (অবশ্য যে কলেজে পরীক্ষায় নকল করিবার প্রথা প্রচলিত তথায় কম নম্বরের প্রশ্ন উঠে না।) এইরূপে পাঠশালা হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষা পর্যন্ত সকল পরীক্ষার প্রশ্নই জীবনের শেষ-প্রশ্ন মনে করিয়া করিয়া অকালে ছাত্রের মূখে বান্ধকের গভীর ছাপ অঙ্কিত হইয়া যায়। অবশ্য আমি বলিতে চাহি না যে প্রফেসর-গণ অকালবৃদ্ধ ছাত্রদের মধ্যে তরুণ সাজিয়া বসিয়া ক্রমাগত মনেক আমন্দে শিস্ দিতে থাকেন। এরূপ ইঙ্গিত কখনো করি নাই। কারণ তাহাদের অবস্থা অধিকতর শোচনীয়। একথা ভুলিলে চলিবে:

না যে তাহার।ও এককালে ছাত্র ছিলেন। এই প্রসঙ্গে আরো একটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত। অনেক কলেজে কো-এডুকেশন চলিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়েও পোটগ্যাজুয়েট কো-এডুকেশন চলিতেছে। প্রফেসরগণ যে-সময়ে অবহিত হইলেন, পড়াইবার সময় অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং সহজভাবে হাসিতে হাসিতে এবং গল্প করিতে করিতে পড়াইলে, পড়ায় ছাত্রদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়, ঠিক সেই মুহূর্ত্ত হইতে কো-এডুকেশন প্রচলিত হইয়া প্রফেসরদের পক্ষে ক্লাসে বসিয়া হাসি প্রায় নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। পূর্বে হাসেন নাই, এখন ছাত্রীদের সম্মুখে কেমন করিয়া হাসিবেন? ছাত্রীরা টিক-বুঝিলেও, ছাত্রেরা ভুল বুঝিতে পারে; এবং এরূপ আশঙ্কা স্বাভাবিক নহে। আমার ত মনে হয় ভারতবর্ষে যত পাথর আছে তাহা এদেশের পাঠশালা হইতে আরম্ভ করিয়া কলেজের যাবতীয় শিক্ষকদেরই একটা allotropic modification. দেশে প্রতি বৎসর পাথর বৃদ্ধি হইতেছে।

অবস্থা যেরূপই হউক তবু একথা মানিতে হইবে যে শিক্ষাবিভাগে হাসির বাধা থাকাতে তথায় অস্বস্ত মৈত্রিক চিন্তার রক্ষা হইয়াছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় দেশে প্রফেসর বেশি নাই; কিন্তু ছাত্রের সংখ্যা অগণিত। এই ছাত্রেরা মাঝে মাঝে ভুল করিয়া, দেশের যে সমস্ত ঘটনায় লজ্জিত হওয়া উচিত সেই সকল ঘটনা উপলক্ষে হাসিতে আরম্ভ করে। এইখানেই শিক্ষিত-অশিক্ষিতের পার্থক্য অস্বস্ত কিছু সময়ের জন্ত ঘুচিয়া যায়। স্বতরাং বর্তমান-বাঙালী জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নতির যত বড়াই-ই করুক, সে যে তাহার পূর্বপুরুষের দ্বারাটিকেই নিষ্ঠুর সহিত রক্ষা করিতে চাহে, ইহাতে সন্দেহ নাই। বালাদেশে কাপড়ের কল হইয়াছে; বাঙালী নিজে কাপড় নিজে প্রস্তুত করিতেছে বলিয়া গর্বও আছে। স্বদেশী আন্দোলন উপলক্ষে “মায়ের দেওয়া

মোট কাপড় মাথায় তুলে নেবে ভাই" গানও বাঙালী বুক ফুলাইয়া গাহিয়াছে; কিন্তু হাসিবার সময় সেই বস্ত্র অঙ্ক হইতে সরাইয়া না ফেলিলে তাহার চলে না। হাস্যরস এবং কল্পনাস একই বস্তুর এপিঠ আর ওপিঠ। তাই আমাদের 'তরুণ'-লেখকগণ সর্বক্ষেত্রে এই বিবস্ত্রীকরণ বিদ্যা অভ্যাস করিতেছে, ফলে তাহাদের কল্পনাতা বীভৎসরূপে প্রকট হইয়া উঠিল।

পূর্বেই বলিয়াছি, হাসিবার জ্ঞান বুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিয়া বাঙালী হাসিতে পারিয়াছে। যাত্রার দলের বয়স্য দেখিয়া বাঙালী হাসে। যদিও নানা কারণে বয়সাই যাত্রার পালার মধ্যে অন্ত্য human বলিয়া তাহাকে দেখিয়া লোকের আনন্দ হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু আসল কারণ, সে পেটে বালিস বাঁধে। সীতা-উদ্ধার পালায় যখন কোনো মানব সন্তান প্রকাণ্ড লেজ লাগাইয়া হুহুমান সাজিয়া লাফাইতে থাকে তখন তাহা দেখিয়াও বাঙালী হাসে।

কিন্তু এইসব সচল খটনায় যদি একটু বুদ্ধি পরচ করিয়া হাসিতে হইত, তাহা হইলে বাঙালীর মুখে হাসি দেখা যাইত কিনা সন্দেহ। যে বাদর আমরা যাত্রার আসরে দেখিয়া হাসি তাহার লেজই হাস্যরসের বিষয়। কিন্তু লেজ না লাগাইয়া যাহারা বাদর সাজে তাহাদের দেখিয়া আমরা হাসি না, কারণ লেজ না থাকিলে আমরা বাদরকে বাদর বলিয়া চিনিতে পারিনা। কখনো বাঙালীর বিবাহের প্রসেশন দেখিয়াছেন? যাত্রার দলের রাজার পোষাক ভাড়া করিয়া যে মানব-সন্তান দুইঘণ্টার জ্ঞান বাদর সাজিয়া বিবাহ করিতে যায়, তাহার লাদুলীনতাই আমাদের মনে হাসির পরিবর্তে বিষয় জাগাইয়া থাকে। যে বাদরগণ সাহিত্যে, শিল্পে, অনধিকার প্রবেশ করিয়া নিরন্তর হপ্প হপ্প করিতেছে তাহাদের দেখিয়াও আমরা হাসি না। কারণ লাদুল যেখানে অদৃশ্য, সেখানে

লাদুল কল্পনা করিয়া হাস্য অপেক্ষাকৃত কঠিন। কাজেই এরূপ হাসি আমাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিতে বাধ্য।

আইন করিয়া হাসি অবশ্যই স্থানবিশেষে বন্ধ করা হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে জাতিগতভাবে বাঙালীর হাসি ধামে নাই। মেয়েদের উচ্চহাস্য শুনিয়া পাশের বাড়ির যে ভ্রমলোক মুহুমুহি শিহরিয়া উঠিতেছিলেন, তিনি আজ হাসিয়া আকুল হইতেছেন। কারণ, পাশের বাড়ির মেয়েকে গুণ্ডা হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে তাহার রসিকতার উৎস খুলিয়া গিয়াছে—সবাক্ষবে দিবারাজ হাসিতেছেন এবং নানারূপ উপদেশ আলোচনা করিতেছেন।

বালা-ভাষায় প্রতিমাসে অগণিত কবিতা ও গল্পের বই প্রকাশিত হইতেছে। ইহাদের মধ্যে শতকরা নিরানন্দ ইথানা আমাদের হাসিবার গোরাক জোগাইতে পারে। কিছু কিছু পড়িয়া দেখিয়াছি। দুই একখানা মাত্র পড়িয়া মন পাগল হইয়াছিল, কিন্তু সংখ্যার বাছল্য দেখিয়া মন থোলাসা হইয়াছে। লেখকদের উদ্দেশ্য বৃত্তিতে পারিয়াছি। ইহার মূর্থ, অথবা লিখিতে জানে না, ইহা ঠিক নহে। প্রকৃত ব্যাপার এই : ইহারা প্রত্যেকেই ক্ষণজন্ম কবি বা গল্পকার। বিষয়বস্ত্র ভাষা বা ভঙ্গি প্রত্যেকটিতে তাহাদের আশ্রয় দখল। কিন্তু এই গুণগুলি পৃথক-রচনায় প্রকাশ হইয়া পড়িলে পাছে "আজগ-ভুখী বাঙালী" অন্নচিন্তা ছাড়িয়া কবিতা বা গল্প-উপন্যাসে মাত্তিয়া উঠে, সেই জ্ঞান কৌশলী দেশহিতৈষী লেখকগণ ইচ্ছা করিয়া ভাষা বিকৃত করে এবং প্রকাশ-ভঙ্গিতে এমন একটা বিশেষত্ব যোগ করিয়া দেয় যাহাতে তাহা পড়িমাত্র বুদ্ধিমান লোকে কিছুক্ষণের জ্ঞানও অন্তত হাসিতে পারে। কবিতায় ছন্দ ঠিক থাকে না, ভাবের গুরুতর অসামঞ্জস্য ঘটে এবং কেন যে উহা দেখা হইল তাহা সহসা কেহ বুঝিতে পারে না। গল্পের

বেলাতে দেখি, আর সবই আছে কেবল ভাষা এবং গল্পটি নাই। সুতরাং সমগ্র বাঙালী-জাতির মধ্যে কতক অংশ যে এই লেখকদের লেখা পড়িয়া হাসে ইহাতে সন্দেহ নাই। পূর্বে পাঠকের মুখে হাসি ফুটাইবার জন্ত কোনো কোনো বাঙালী লেখক সঙ্গদয় চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু বাঙালীর পক্ষে অত্র উপায়ে হাত্ত এতই সহজ যে, কোনো লেখা আর এখন বড়-একটা পড়িবার দরকারই হয় না। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের নাম সাধারণ বাঙালীদের নিকট অপরিচিত। ইহার কারণ এই যে, কোনো লেখকের সঙ্গদয় চেষ্টার দ্বারা কোনো কাজ হয় না, কাজ হয় কৌশলে, এবং পূর্বেই বলিয়াছি আধুনিক লেখকগণ এই কৌশল অন্বেষণ করিয়াছেন। ত্রৈলোক্যনাথ তাহা পারেন নাই। স্বরেন্দ্রনাথ মজুমদারকে বাঙালী প্রায় অগ্রাহ্যই করিয়াছে। যাহা পড়িয়া ফস্ করিয়া কাঁদা যায় না তাহা যেমন বাঙালী পড়ে না, তেমনি পড়িবামাত্র তাহাতে হাসা যায় না তাহাও বাঙালীর কাছে অগ্রাহ্য। কিন্তু ইহা জানা সত্ত্বেও বৈজ্ঞানিক বা ঐতিহাসিক গবেষণামূলক প্রবন্ধের লেখকও লোক হাসাইবার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। কি অসীম আত্মত্যাগ, কি মনোহর দেশ-প্রেম ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে তাহা ভাবিলে ইহাদের প্রতি স্বতই প্রশংসা শির নত হয়। কারণ ইহারা কোনো-না-কোনদিন বাঙালীর মুখে বুদ্ধিজাত হাসি ফুটাইয়া তুলিবেন বলিয়া আশা করেন।

রাজা রামমোহন রায়ের জগদাত্মিক লাইয়া এইরূপ হান্তরস সৃষ্টির চেষ্টা আমরা দুই বৎসর পূর্বে দেখিয়াছি। বাল্যকালে একথানা শিশুপাঠ্য কবিতার বইতে একটি ছবি দেখিয়াছিলাম। একটি ছোট চেষ্টে তাহার পিতৃ-ব্যবহার্য্য জামা জুতা ও চশমা পরিয়া পাড়াইয়া আছে। ইহা দেখিয়া তখন হাসিয়াছিলাম।

গবেষকগণ রামমোহনকে লইয়া প্রায় সেইরূপ করিয়াছেন। অপ্রামাণ্য ভিত্ত-যাওয়া প্রমাণ করিতে গিয়া তাহার প্রামাণ্য বয়স বাড়াইয়া দেওয়া অবশ্যই খুব রসের পরিচায়ক হইয়াছিল। সেই সময় রামমোহন, পড়িয়া-পাওয়া উদ্ভূত দুইটি বৎসর স্বল্পদেশে স্থাপন করিয়া এই চিরশিশুর দেশকে যথেষ্ট আমোদ দিয়াছিলেন।

আমরা জানি বাংলায় হাসির গান ভেমন জমে না। স্বগৌড়া দ্বিজেন্দ্রলাল হাসির গান লিখিয়াছেন বটে কিন্তু তাহা জনপ্রিয় হয় নাই। সেই জন্ত অত্র উপায়ে আমরা তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছি। আমরা যাবতীয় আটমিউজিককেই একটি হাসির ব্যাপার করিয়া তুলিয়াছি। তথাপি বাঙালী যে-ভাবে সঙ্গীতের ভিতর হইতে স্বর ও তালকে বাদ দিয়া তাহার উৎকর্ষ সাধন করিয়াছে তাহাতে তাহা যে পরিমাণে হান্তকর হইয়া উঠিয়াছে, সে পরিমাণে লোককে হাসাইতেছে না। কারণ এ বিষয়ে একটু বোধশক্তি না থাকিলে আধুনিক-সাহিত্যের বেলায় যেমন, তেমনি তাহাতে বাঙালী হাসিতে বিলম্ব করিবে। কিন্তু আমরা সংবাদ পাইয়াছি, অত্র প্রদেশের লোক বাঙালীর আধুনিক সঙ্গীতে ইতিমধ্যেই হাসিতে আরম্ভ করিয়াছে। অপরপক্ষে ইহার ক্ষতিপূরণরূপ আমরাও ওস্তাদি গানে সর্বদাই হাসিয়া আকুল হইতেছি।

শুনিয়াছি স্বাস্থ্য ভাল থাকিলে লোকে অধিক হাসিতে পারে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও, কেন হাসিবে ইহা একটি সমস্যা। কাহারো মৃত্যুতে শোকাক্ত আত্মীয়স্বজন দল বাঁধিয়া কাঁদিতে পারে—এইরূপ দেশস্বজ লোকও কোনো মহাত্মার মৃত্যুতে একসঙ্গে কাঁদিতে পারে। কিন্তু দল বাঁধিয়া কাঁদিতে গেলেও কাহারো আবির্ভাবে বা কাহারো রোগ-মুক্তিতে বা অত্র কোনো উপলক্ষে দল বাঁধিয়া লোক সারাদিন হো হো

করিয়া হাসিতেছে একরূপ বড় একটা দেখা যায় না। একরূপ হাসা পরিশ্রমসাপেক্ষ, সেই জন্ত লোকে আনন্দ প্রকাশের বেলায় অচ্ছ কোনো বস্তুর সাহায্য লয়। ঢাক বাজায়, কীসরগণ্টা বাজায়, বাজি পুড়ায়, কিংবা নৃত্য করে। ইহার প্রত্যেকটিই হাসির অহুকল্প; হাসির বিকল্পও বলা যাইতে পারে।

উপরোক্ত দ্রব্যগুলি মিউজিকের অন্তর্গত হিসাবে গণ্য। ঢাকের ডিভর যে মিউজিক ছিল তাহা আবিষ্কার হইবার পর হিন্দু মুসলমানের মিলন সম্ভবপর হইয়াছে সত্য, কিন্তু ইহা ছাড়া আরো একটি মহত্তর জিনিষ হইয়াছে। এই মিউজিকের রূপায় বিদেশীর মুখে হাসি ফুটিয়াছে। এই মিউজিকের অচ্ছ বিভাগ—থিয়েটার বা সিনেমা। প্রথমটায় অর্থাৎ ঢাকের সাহায্যে আমরা আনন্দ প্রকাশ করি এবং শেষেরটিতে অর্থাৎ থিয়েটার বা সিনেমায়ায় আমরা আনন্দ গ্রহণ করি। পূর্বেই বলিয়াছি, হাঙ্গরস এবং কর্ণরস একই বস্তুর এপিঠ আর ওপিঠ; তাই ব্যক্তিগত রুচি হিসাবে আমরা কেহবা কাদিতে কেহবা হাসিতে থিয়েটার বা সিনেমায়া যাই।

আমাদের মধ্যে যাহারা কাদিতে যায় তাহারা কিছুকণ পর চাইতেই অভিনয় আর দেখিতে পায় না, সমস্ত অশ্রুবাপে স্বাপসা দেখে। আবার যাহারা হাসিতে যায় তাহারা নিজে হাসিয়া শুধু নিজে নহে, অচ্ছ কাহাকেও কিছু শুনিতে বা দেখিতে দেয় না। কিন্তু তাহারা সব সময়ই যে ঠিক ঠিক জায়গায় কাদে বা হাসে তাহা নহে। যে স্থানে কাদা উচিত, না বৃষ্টিয়া সেখানে হাসে, এবং হাঙ্গরকর ঘটনা-সংযোগ অনেক সময় বৃষ্টিতে না পারিয়া ট্রাজেডিবোধে কাদিয়া ফেলে। বৃষ্টিমার্গ এতই কঠিন। কিন্তু বিশেষ করিয়া হাস্যের ব্যাপারে যদি প্রতিনিধির ব্যবস্থা করা যায় তাহা হইলে

অবস্থার উন্নতি হইতে পারে। ধরুন একজন লোক আবিষ্কার করিলাম যিনি একাধারে রসিক এবং রসজ্ঞ; যিনি উপযুক্ত জায়গায় হাসিতে জানেন, অন্ততঃ যিনি হাসি এবং কান্নার মধ্যকার সূক্ষ্ম পার্থক্যটি ধরিতে পারেন; অভিনয় দেখা বা অচ্ছ কোন রসগ্রহণ ব্যাপারে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া চলিলাম। অভিনয়কালে আমরা অভিনয়ের দিকে না চাহিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলাম, তিনি যে মুহূর্ত্তে হাসিতে আরম্ভ করিলেন, আমরাও সেই মুহূর্ত্তে হাসিতে আরম্ভ করিলাম, তিনি থামিলেন আমরাও থামিলাম। সম্ভবত এইরূপ ব্যবস্থাই মুক্তিদায়ক।

আমি একজন লোককে জানি যিনি প্রতিনিধি হইবার উপযুক্ত। যদি কোনো ঘটনা তাঁহার মস্তিষ্কের হাস্য-কেন্দ্রে একবার উসকাইয়া দিতে পারে তাহা হইলে তিনি মুহূর্ত্তের মধ্যে জানহারা হইয়া পাশের লোককে ঘূষি মাঝিরা, কামড়াইয়া, চেয়ার-টেবিল উল্টাইয়া, অবশেষে নিজে মাটিতে গড়াইতে থাকেন। এই ভক্তলোকের বয়স প্রায় পঞ্চাশ এবং রসোপলব্ধি বিষয়ে ইহার দক্ষতা অসাধারণ। আমার মনে হয় এই-জাতীয় হাঙ্গপ্রবণ লোক বাঙালীর মধ্যে অধিক পরিমাণে থাকিলে বাঙালী শুদ্ধমাত্র হাসির জন্ত বিশ্ববিখ্যাত হইয়া থাকিত।

চিকিৎসা-ব্যবসায়ের উপর বাঙালী যে রূপ বিস্তারিতভাবে রসিকতা আরম্ভ করিয়াছে, তাহা অল্পবিস্তর সকলেরই জানা আছে। অচ্ছ দেশে (হয়ত কিছু কিছু আমাদের দেশেও) বৈজ্ঞানিকেরা এক-একটি রোগের প্রতিকার বা remedy আবিষ্কার করিবার জন্ত প্রাণপাত করিতেছেন। চিকিৎসা-বিজ্ঞান, ব্যাধির পরিমাণ-হিসাবে অতি অল্পই অগ্রসর হইয়াছে, এবং বৈজ্ঞানিকেরা নানারূপ গবেষণা এবং পরীক্ষা করিয়াও জ্ঞাত কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। কিন্তু খবরের

কাগজের বিজ্ঞাপন-পৃষ্ঠার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যাইবে আমাদের যত ব্যাধি আছে তাহার চেয়ে আমাদের অব্যর্থ ঔষধের সংখ্যা অস্তুত তিন গুণ। ইহা ছাড়া প্রায় পঞ্চাশ প্রকার মাদুলি আছে। অব্যর্থ ঔষধে যখন আর কুলায় না, তখন মাদুলি আধ্যাত্মিক-শক্তি বিস্তার করিয়া ব্যাধির মূলে কুঠারাঘাত করে। সুতরাং এই সকল অব্যর্থ ঔষধ এবং মাদুলি মিলাইলে যে-পরিমাণ আধিভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক ব্যাধি-প্রতিকার-শক্তি লাভ হয় তাহাতে বাংলাদেশের যাবতীয় রোগের মূলাচ্ছেদ করিয়াও আমরা বৃহত্তর ভারতের ব্যাধির দিকে মনোযোগ দিতে পারি। ইহাতে পূর্বে চীন, এবং পশ্চিমে পারস্য পর্য্যন্ত আমাদের এই প্রাতিকারিক প্রভূত বিস্তৃত হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু ধরুন, ইহা যদি রসিকতা হয়, তাহা হইলে কি মারাত্মক রসিকতা! অব্যর্থ ঔষধের দ্বারা রসিকতা! ইহা অল্প কোনো দেশে সম্ভব নহে। বিজ্ঞানের যুগে বাস করিয়া বিজ্ঞান লইয়া রসিকতা নূতন জামাইয়ের সঙ্গে শালীদের রসিকতা অপেক্ষাও মনোহর। ইহা বাংলাদেশেই সম্ভব হইয়াছে। ইচ্ছা করিলেই ইহাতে আমরা হাসিতে পারি।

সুতরাং কি সমাজে, কি সাহিত্যে, কি শিল্পে, কি বিজ্ঞানে, বাঙালী একদিকে যেমন হান্তরস সৃষ্টি করিতেছে অন্মদিকে তেমনি হাসিতেছে। এক শিক্ষাবিভাগ এবং অন্মদ ছাড়া হাসি কোথাও নিষিদ্ধ নহে। এমন কি যত দিন যাইতেছে তত আমাদের হাস্যপ্রবণতা বাড়িয়া যাইতেছে। বাস্তবের সঙ্গে এই হাসির কোন সম্পর্ক আছে বলিয়া বোধ হয়না। বরঞ্চ স্বাস্থ্যহীনতাই বাঙালীর পক্ষে হাসির উৎকর্ষ-বৃদ্ধির সহায়ক হইয়াছে।

কিন্তু এত যে হাসি, আমরা কি কখনো কাদি না? এ প্রশ্ন সম্পূর্ণ

অনাবশ্যক, কেননা আমরা যে হাসিয়া থাকি তাহা প্রমাণ করিবার জুড়ই এতটা লিখিতে হইল। কাদি কিনা ইহা লইয়া কোনো প্রশ্নও উঠেনা, এবং ইহা প্রমাণ করিতে কাহারো উৎসাহও হয় না। তবে খুলিয়াই বলি, আমরা কেবল কাদিয়াই থাকি, হাসি না। যে লেখকের বিরুদ্ধে এত কথা বলিলাম, তাহার প্রত্যেকটি কথাই সত্য এবং এত সত্য যে “আমরা হাসি না” এ কথা পড়িতে পড়িতেই হয়ত অনেকে ইতিপূর্বে গুমরিয়া গুনরিয়া কাদিয়াছেন।

আমরা দুঃখের কাহিনী শুনিতে এত ভালবাসি (বিশেষত নিজেদের দুঃখের কথা) যে কেবল এই জুড়ই আমরা স্বরাজ পাইলাম না। সভ্যগমিতিতে কেবল এই কথাই শুনিতে চাহিলাম যে আমরা হতভাগ্য, আমরা নিঃস্ব ভিক্ষুকের জাতি, আমরা অত্যাচারিত, অক্ষম, দুর্বল, এবং স্বরাজ্যলাভ করিবার পর সুবিধামত আমরা আমাদের যাবতীয় মানি ধুইয়া ফেলিব। আমরা সভ্য বসিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাদিলাম, এবং কাগজে লিখিলাম, আমরা সর্বহারা—আমরা দাসস্ত্র দাস এবং—ইত্যাদি। সেই কান্নার ধারা, সেই অশ্রুর স্রোত আজিও আমাদের তপস্রা নাই, সাধনা নাই; কান্না সেজ্ঞত নহে, আমরা কাদি magic নাই, miracle নাই বলিয়া। সুতরাং এ কান্নার কি কখনো শেষ হইবে?

হিতোপদেশ

যুক্তি-হিসাবে অর্দ্ধ সত্য, অর্দ্ধ ইষ্টকথণ্ডের মতই প্রবল। ইহা বহু
দূরে নিক্ষেপ করা যায়; পূর্বা ইট বেশি দূরে যায় না।

শুনিতে পাই, সততাই ইংরেজ রাজনীতির বিশেষত্ব; দুর্ভাগ্যের
বিষয়, আমাদের (আমেরিকার) রাজনীতি সেরূপ নহে। উভয়ের
পার্থক্য এই যে আমাদের রাজনীতিকগণ টাকা লইয়া বিনিময়ে
সব কিছুই করিতে পারেন, কিন্তু ইংরেজ রাজনীতিকগণ তাহা পারেন
না। তাহার কারণ শুধু টাকাই লন।

দৈর্ঘ্যই যে কৃতকার্যতার মূল একথা সকলেই বলিয়া থাকেন।
ব্যক্তিগত ভাবে আমি ইহাই বলিতে চাহি যে একপাশে কোনো মূল্য
নাই। এবং আমার মনে হয় ইহার বিপরীত কথাটিই সত্য।

একটি প্রাচীন উক্তি এই: "If at first you don't succeed,
try, try again". বাজে কথা। যথার্থ কথাটি হওয়া উচিত:
"If at first you don't succeed, quit, quit, at once."

—টিফেন লীক।

নীলাবানের প্রতি

উজ্জ্বল চাতকী সম তব পত্র-কোমলীর আশে
বসিয়া আছিহু ক্ষিপ্র দ্বিতলের বাতায়ন-পাশে।
বাহিরে প্রথর সূর্য্য, চিত্তে হায় বিরহ-শরীরী।
রাজবাস্ত্র কোলাহল রিক্ষা টাম মোটর ঘঘরি
চলিতেছে আশ্রবেগে, যেন কার'তীত কথ্যধাতে।
সজীব নিজ্জীব সবে আজিকার এ শুভ প্রভাতে
করে যেন আশ্তিনাদ—উঠিয়াছে ক্রন্দনের ঝড়।
তারি মাঝে বাতায়নে বসে আছি একান্ত অনড়
উৎকণ্ঠার দীপখানি জ্বালাইয়া অতি সাবধানে,
খানমগ্ন চিতে সখা বসেছিহু চাহি পথপানে।
সহসা পিয়ন-চন্দ্র সমুদিল গলিটির মোড়ে।
সমস্ত আগ্রহ মম পুঞ্জীভূত হল যেন তোড়ে
যুগ-জঙ্ঘা-পেশী 'পরে,—প্রবাহ বহিল বৈদ্যুতিক,
দীর্ঘ এক লক্ষ দিয়া সোপান বাহিয়া সখা ঠিক
যাইব যেমনি হায় ঘোর নাদে ফঙ্গাইয়া পদ
দাক্ষণ পড়িয়া গেহু;—ছিদ্র হল চিত্ত কোকনদ।
উটীলাম কোনক্রমে উন্মোচিয়া কপাটের ধিল,
পিণ্ডনের হস্ত হতে লইলাম কাপড়ের 'বিল'।
ওরিতে চলিয়া এসে—পত্র তব চাহিনাক আর
চলে এস অবিলম্বে জাহ্ন-অস্তি হয়েছে ত্র্যাক্ষর।

—নীলাবতী

অনাদির তৃষ্ণা

অনাদি জন্মিয়াই যখন হাঁ করিয়া রহিল, কান্দিতে পারিল না, তখন মুখে দুই কোটা জল দিয়া তাহাকে বাঁচাইতে হইয়াছিল।

বলা বাহুল্য, অনাদি একটা গভীর তৃষ্ণা লইয়াই ভূমিষ্ট হইয়াছিল।

এই তৃষ্ণা যেমন শৈশবে, তেমনই কৈশোরে। মন তাহার কি যেন চাহ; বাহ্য পায় তাহাতে খুশী হয় না; আরও কিছু চাই, অল্প কিছু চাই বলিয়া তাহার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠে।

বিষ-প্রকৃতিতে রস নাই, নদীর জলে রস নাই, ফুলের গন্ধে রস নাই, চাঁদের আলোয় রস নাই—অনাদি সর্বত্র রস খুঁজিল, কোথায়ও মিলিল না। কিশোর-অনাদির মন পৃথিবী ছাড়িয়া বহু দূরে চলিয়া যায়।

স্বদূরের তৃষ্ণা—অতি প্রবল, অতি দুর্দ্দমনীয়। ভূমার তৃষ্ণা, দুঃসহ, কঠিন, নির্মম।

অনাদির পিতা, পুত্রের তৃষ্ণায় সন্দেহ করিলেন। অনাদি স্থলের পরীক্ষায় বাবতীয় বিষয়ে শূন্য পাইয়া মুহূর্ত্তে প্রমাণ করিয়া দিল, সন্দেহের অবকাশ নাই। সত্য বিনা-আড়খন্ডের প্রকাশ পাইল।

রস কোথায়? ইতিহাসে নাই, ভূগোলে নাই, অন্ধে নাই, বিজ্ঞান-রীডারে নাই, আছে আরও কোথায়ও, অল্প কোথায়ও।

পিতা তাহাকে ধরিয়া প্রহার দিলেন। বলিলেন, হারামজাদা, দূর হ বাড়ি থেকে।—পিতার ষষ্ঠীয়বারের সন্দেহ।

অনাদি বাড়ি হইতে এক পা নড়িল না; তাহার মন যে বহু

পূর্বেই গৃহত্যাগ করিয়াছে, জড়-দেহটা অনর্থক প্রহার খাইল। সে স্বাগুবৎ পড়িয়া থাকিয়া ষষ্ঠীয়বার প্রমাণ করিল, পিতার সন্দেহ অমূলক।

কৈশোর উত্তীর্ণ হইয়া অনাদি যৌবনের সীমানায় পদার্পণ করিল। তাহার সকল তৃষ্ণা আশ্বিন হইয়া জলিয়া উঠিল। সেই আশ্বিনে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী, সকলেই পুড়িতে আরম্ভ করিল। তাহার উগ্র তেজে বৃক্ষলতা, ফুলফল, কীট পতঙ্গ, মানুষ অমাহুষ, ছাই হইয়া গেল। পিতা ব্যাকুল হইলেন।—পিতার তৃতীয়-বারের সন্দেহ।

অনাদি পিতার লোহার সিঁদুক ভাঙিয়া, কিছু অর্থ হস্তগত করিয়া গোপনে গৃহত্যাগের দ্বারা প্রমাণ করিল, পিতার সন্দেহের কোনও অর্থ নাই।

পাঁচ বৎসর পরে পিতা, পুত্রের সাক্ষাৎ পাইলেন। তাহারই গৃহের সম্মুখে ড্রেনের নিকট। অনাদি অর্ধচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া ছিল। শোকাহত পিতা, পুত্রকে জাগাইয়া প্রশ্ন করিলেন, বাবা, তৃষ্ণা মিটল?

অনাদি জড়িত স্বরে বলিল, হাঁ।

পিতা প্রশ্ন করিলেন, কিসে বাবা?

—হইস্বিলে।

ট্রেনে

ট্রেনে এক বৃদ্ধ চলিয়াছেন। বৃদ্ধ হইলেও লোকটি যে এককালে সৌধীন ছিলেন তাহা বেশ বোঝা যায়। মাথার চুল হইতে আরম্ভ করিয়া পায়ের মোজাটা পর্য্যন্ত তাঁহার বিগত-যৌবনের কচির পরিচয় দিতেছে। হাতে একটি মোটা বন্দা চুরট। পবরের কাগজে নিবন্ধদৃষ্টি।

তিনি কামরাটিতে এতক্ষণ একাই ছিলেন। কিউল ষ্টেপনে ট্রেন থামিতে একটি উনিশ-কুড়ি বৎসর বয়সের যুবক আসিয়া সেই কামরায় উঠিল।

যুবকটির ঘাড়ের চুল চাছা,—চোখে একটা শশা দামের খেলো নীল চশমা—গোঁফ ছাটা—বুক-খোলা জামার নীচে একটা অর্ধছিন্ন মাফলার—মাফলারের ছিদ্র দিয়া একটি ময়লা গেঞ্জি উঁকি দিতেছে। যুবকটির মুখে বিড়ি; বগলে একটি মাসিক পত্র। আসিয়াই বেকি বাজাইয়া গান ধরিয়া দিল—“কে বিদেশী মন উদাসী বাশের বাঁশী বাজাও বনে—”। তারপর বৃদ্ধের দিকে তাকাইয়া বিড়িটা ধরাইতে ধরাইতে একমুখ হাসিয়া প্রশ্ন করিল—“আপনার কতদূর যাওয়া হবে স্ত্রর—”

বলা বাহুল্য, বৃদ্ধ বিরক্ত হইয়াছিলেন। তিনি সংযতকণ্ঠে তথ্যপি উত্তর দিলেন—“দানাপুর যাব। আপনি ?”

“তবেত বেশ ভালই হল—আমিও দানাপুরেই যাব। তাহলে আমার স্ত্রর এই পুঁটুলি আর বইটা রইল। আমি চট্ ক’রে এক কাপ চা খেয়ে আসি। আর বিড়িও এক বাঙালি ধানি।”

অনিবারের চিঠি

১৪২

অল্পক্ষণ পরেই যুবক ফিরিয়া আসিল। মুখে বিড়ি। কিছুক্ষণ কোন কথা-বার্তা নাই। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি হাতের পবরের কাগজটা নামাইতেই যুবকটি হাত বাড়াইল—“কাগজটা একবার পেতে পারি স্ত্রর—”

“হ্যা—হ্যা—নিন্ না !”

একটু পরেই যুবকটি বলিয়া উঠিল—“ইস্—একটি ছোকরা আত্মহত্যা করেছে দেখছি আজ—”

বৃদ্ধ ভদ্রলোক যেন ৩৭ পাতিয়া বসিয়া ছিলেন। সশেষ ঝাল ঝাড়িয়া দিলেন—“আজকালকার এই গোঁফ-ছাটা ছোঁড়াগুলোকে দেখলে রাগ ধরে।”

যুবকটি কিছুমাত্র না চটিয়া পানের ছোপ-ধরা দাঁত বাহির করিয়া হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল—“আপনাদের ছোকরা কালে কি আপনারা প্রেম করেন নি ? সব যুগিটির ছিলেন ?”

বৃদ্ধ বলিলেন—“যুগিটির হয়ত ছিলাম না। কিন্তু বেয়াদপ ছিলাম না। বুড়ো লোকের সন্ধান রেখে কথা কইতাম—”।

ছোকরা দমিবার নহে। আবার হি হি করিয়া হাসিয়া বলিল, “আপনারাও প্রেম কর্তেন তাহলে—”

“বৃদ্ধ জুকুফিত করিয়া রহিলেন। খানিকক্ষণ পরে বলিলেন, “আপনার হাতে ওখানা কি কাগজ ? দেখি একবার—”

“হা ই়া স্ত্রর দেখুন। ওতে বেশ একটা ভাল গল্প আছে, পড়ে দেখুন। ‘মগডালে’ পড়ে দেখুন—।”

বৃদ্ধ মাসিকটির আছোপাশ্চ উন্টাইয়া “মগডালে” পড়িতে হুক করিলেন। লেখকের নাম নাই। বৃদ্ধ পড়িতে পড়িতে বন্দাতে ছোটো টান দিয়া বুঝিলেন—ধরাইতে হইবে। দেশলাইটা কোথা গেল ?

এ পকেট সে পকেট খুঁজিতেছেন এমন সময় যুবকটি চট্ করিয়া নিজের বেশলাইটা হইতে ফস্ করিয়া একটা কাঠি জালাইয়া বলিল—

“এই যে আশ্বিন স্তর—”

“Thanks”

“কেমন লাগছে স্তর গল্পটা—?”

“একেবারে ট্র্যাশ মনে হচ্ছে যেন। শেষ হলে বাঁচি।”

“পেয়ের দিকটা দেখবেন—রস আছে।”

“দেখা যাক—”

“বাগানে দৃশ্টা কেমন লাগল?”

“বেশ অদ্ভুত। তবে কোন জিনিসই শেষ পর্যন্ত না পড়ে কিছু বলা যায় না—”

যুবক কিছু না বলিয়া আর একটি বিড়ি ধরাইয়া গান ধরিল—

ফুল বাগানে সুলবি যদি আয়

এই ভরা জ্যোছনায়—

বৃদ্ধ পড়িয়া চলিয়াছেন—। বাহিরে জ্যোৎস্নায় ফিনিক্ ফুটিতেছে ॥

গল্প শেষ হইলে বৃদ্ধ বলিলেন—“একেবারে বাজে—”। যুবক বলিয়া

উঠিল—“কেন শেষ কালটায়—যেখানে মণিমালা কদম গাছের মগডালে

উঠে বসে আছে। আর নাথক ভুলে মনে করছে যে সে তালপুকুরে

ডুবে গেছে—আর সেই ভেবে ক্রমাগত ডুব-সাঁতার দিয়ে খুঁজছে ॥

সেখানটা ভাল লাগল না আপনার?”

“রাবিশ—! আজকাল ছেলেরা বোধ হয় সত্যিকার মেয়েমাছের

সন্ধান পায় না—”

“তার মানে?”

“তা না হলে ওই রকম গল্প লেখে কেউ! এই সত্যি কথাটা কেউ

বুঝে না যে যাকে স্বর্গের দেবী বলে বলে সবাই অস্থির হচ্ছে—she can be easily bought।”

“সেটা কি সব ক্ষেত্রে সম্ভব—”

“প্রায় ক্ষেত্রেই—অন্ততঃ আমার ত তাই ধারণা।”

“কি রকম বলুন না—”

“এই ধর একটা concrete example। আমারই ছেলেবেলায় প্রায় বছর কুড়ি আগে সৈরতি বলে একটি মেয়ের সঙ্গে প্রেম হল—তার গর্তে একটা ছেলেরও হল! ছেলেরা যখন মাস দুয়েকের, তখন বাস, সৈরতি একদিন উধাও। সুনলাম রামেশ্বরপুরের এক জমিদার তার প্রেমে পড়েছেন! আমি আর ও নিয়ে বিশেষ কোন মথাই ঘামালাম না। I had another.—Girls were so cheap in those days.” যুবক মুখ হইতে বিড়িটা ফেলিয়া দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

খানিকক্ষণ চুপচাপ।

তাহার পর যুবক বিনীত স্বরে বলিল—“আমায় মাপ করবেন। না কেনে হয়ত আপনার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করছি।”

“তার মানে—”

“তার মানে সৈরতি আমারই মা—তিনি এখনও রামেশ্বরপুর জমিদার বাড়ীতে চাকুরাণী আছেন। আপনি আমার বাবা—”

এই বলিয়া সে প্রণত হইয়া বৃদ্ধের পদধূলি লইল।

তাহার পর হঠাৎ বলিল—“আচ্ছা আপনার নাম কি হারাধন বশাক?”

“আমার নাম রমেশ সেন—”

“ও, যাক। তবে আপনি নন। মায়ের মুখে শুনেছি আমার বাবার নাম হারাধন বশাক। তাহলে আপনার একটা চুকট দিন স্তর। আমার বিড়ি গেছে ফুরিয়ে—বাচ্চা:লন আপনি।”

বলিয়া ছোঁকরা হি হি করিয়া হাসিতে লাগিল।

—বনমূল

পারী-সহরে—

হৃদয় বাংলাদেশের শিকিত বাঙালীর অসহায়তার কথা ভাবছি, আর সেই সঙ্গে করাসী-জীবন দেখছি।—দিবা-স্বপ্ন!

ল্য-দোম (Le Dome) মোপার্নাস পাড়ায়—বুল্ভার মোপার্নাস সড়কের উপর একটি পরিচিত ‘কাফে’ (কফিখানা)। অটোয়া, রায়োদিজেনেরিও, হনলুলু, কায়রো, জাঞ্জিবার, পেইপিং, জোহর, পারগোব, বেহরত, বোখাই, জোহান্নেসবার্গ, গোহাটা বা সিডনী—মোসাফির ভূ-প্রান্তের যে-অন্ত থেকেই আগন্তুক হন না কেন, পারী-সহরে যদি মাসাবধি কাটিয়ে থাকেন ত’ মোপার্নাসের কফির আড্ডায় একবার বসেছেন।

আটিষ্ট, কবি, লেখক, নবীন, প্রবীণ, দেশবিদেশের ভবঘুরে, কত চরিত্রের লোকই যে এ আড্ডায় জটলা পাকায়! কেহ হয় ত’ কাকেও চেনে না, কারও হয় ত’ ছ’চারজন জানা শোনা আছে—কাকেও ক’দিন ধরে আসতে দেখে মুখ চেনা পরিচয়ের হাসি হেসে ‘কাফে’র গার্সন পেয়লাটা এগিয়ে দেয়। অথচ এখানে এলে মনে হয় যেন মহামানবের সাগরতীরে এসে দাঁড়িয়েছি। মুহূর্তের জন্ত মনে হয় এদের মধ্যে কে আমার পর!

সেই মুহূর্তে এদেরই মধ্যে কোনও লোক বসে’ আমারই উপরে হয় ত’ অকারণে, নজর রাখছেন!—হৃদয় দেশের এ বিদেশীর কি মতলব কে জানে!

শীতের অবসর অপরাহ্নে সুরসুরে’ তুষার আর কনকনে বাতাসে যখন আলোয়ানের আবরণে বাঙালী-কেতায় কান ছুটি পর্যন্ত ঢেকে

শনিবারের চিঠি

১৫৩

ফেলবার প্রবৃত্তি দুর্দ্দমনীয় হয়ে’ উঠে, তখন ল্য-দোমের সামনের ছাপাখের খোলা জায়গাটি কাচের দেয়াল ঘিরে ছাদ টাকিয়ে গৃহককে রূপান্তরিত করা হয়—আর বড় বড় লোহার উনানে ধূমহীন কোক পোড়ে।

সে আশুন-পোহানোর আশ্বাদ স্নিগ্ধ-স্রামল বাংলার ঘেহনীতে কল্লনাথও আনা যায় না।

তার উপরে বিদেশিনী তরুণীর কত কলা-কুশল-ভঙ্গিমা।

“হু সোম পোলোনেজ্ মঁসিয়! তুত্ লেদ্যো!”—আমরা পোলাও নন্দিনী! ছুজনেই!” সঙ্গে সঙ্গে একটুখানি মুছহাসি।

কাফে দোমে আয়ত-নয়নী ছুটি তরুীর সামিধ্যে শীতের জড়তা জুলিয়ে দ্বাগত মোসাফিরবৃন্দের প্রাণে বহুত হ’তে থাকে—

“এই বহুদার—

মুজিকার পাজখানি পূর্ণ করি বার বার—”

সড়কের অপর পারে সমুখের হৃদ্যশীর্ষে রঙিন ইলেকট্রিক আলোয় ঝিকিঝিকি বিজ্ঞাপন লেখা ফুটে’ দোমের আশ্রিত পাঙ্কে পড়িয়ে ছাড়ছে—

“আমেরিকায় আবার মজ চলিল, আমেরিকায় আবার মজ চলিল—ফ্রান্সের গোলাপ-গন্ধ গোলাপী-মজ!”

চার পাশে তাকিয়ে দেখি—কোথায়? কোনখানে এদের অশান্তি—problem! economic crisis, unemployment!—যে অশান্তির কাহিনী সংবাদ পত্রে পাঠ করে’ উপবাসী দরদী ভারতবাসী অচকুপায় এদের জন্তে অশ্রুপাত করে? দৈবজ্ঞের তৃণাল এখানে কোথায়? হুং যদি নিষ্ঠুর আঘাত নিয়ে এদের ছুয়ারে দাঁড়ায়, এরা বিপ্লব-বহিষ্ঠে, মহাযুদ্ধের দাবানলে দলে দলে ঝাঁপিয়ে পড়ে’

দুঃখের ইতি করে' ছাড়ে।—এদের করি আমরা দার্শনিক অহুৎসাহ! এইফেল (Eiffel) টাওয়ার নাকি পৃথিবীর সর্বোচ্চ মহামেট—উচ্চতায় প্রায় ১০০০ ফুট। ঠিক কত ফুট কত ইঞ্চি, আমাদের তা জেনে লাভ কি! স্পর্ধোন্মত্ত শিরে দাঁড়িয়ে আছে—দুঃখ বাঙালী সম্মান ইলেকট্রিক লিফটের সাহায্যে উপরে চড়ে পারীর দৌধাডুঘর দেখে আসে।

শুল্ক থেকে পারীর দৌধাডুঘরে কল্লনাগ্রিয় বাঙালী ময়দানবের লক্ষ্যপূরীর কল্লনা করতে পারে। বাঙালীর কলকাতায় হাবিশাল চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, এসপ্লানড, চৌরঙ্গীতেই বা তার বাস্তব-স্থান কতটুকু!

কুখ্যা আছে, অথচ অসংস্হানের সামর্থ্য নেই, কিন্তু বাঙালী আজও ভারতের প্রাচীন ধর্ম-দর্শনশাস্ত্রের স্বক্স আলোচনায় মত্ত, আজও বাঙালী যুবকের একমাত্র উচ্চাশা সাময়িকত্ব বার করা আর লজ্জাকর অক্ষম হাতে করিতা আর গল্প রচনা করে করে, নিজের মনের ও দেহের ক্ষমতা নষ্ট করা! তার ওপর, যে-ক্ষেত্রে বৈজ্ঞ-বলের ভিত্তির উপরে ভারতের ব্রাহ্মণ্য উল্লস্কশির হ'তে পেরেছিল, সে ভিত্তি আজ সেখানে নেই, অথচ ব্রাহ্মণ্যের অপদেবতার মায়া আজও আমাদের মুগ্ধ করে' রেখেছে।

কবে এ মোহ দূর হবে!

রবীন্দ্রনাথ একখানি বই-এর ভূমিকায় সেদিন লিখেছেন, বাঙালী যুবকের অসাক্ষ্যের কারণ তার exaggeration of risk।

পারী সহরে দেখি জার্মান, পোলিশ, রুমানিয়ান, রাশিয়ান কত অল্পবয়সী বিদেশী যুবক নানা উপায়ে উপার্জন করছে।

দুঃখ বরণ করা ত' পুরুষের পৌক্ক্য—পরের অহুৎসাহ-ভিখারী

হওয়া নয়। শিক্ষিত বাঙালী যুবক সহজেই এদের দলে যোগ দিতে পারে।

তুনেছি, স্বচম্যানের সঙ্গে ইংরেজ ব্যবসায়-ক্ষেত্রের প্রতিযোগিতায় এঁতে উঠতে পারে না। কারণ স্বসত্য ইংরেজের চেয়ে স্বচম্যানের ব্যক্তিগত 'অভাব' কম।

ইউরোপে শিক্ষিত-বাঙালী যুবকের ও এ advantage রয়েছে।

শুধু বিত্তা আয়ত্ত না করতে গিয়ে শিক্ষিত বাঙালী যুবক যদি ইউরোপে উপার্জন করবার সঙ্কল্প নিয়ে উপস্থিত হয়,—সে অবলীলাক্রমে ওদেশে নিজের স্থান করে' নিতে পারে।

ইংরেজী জানে না—এমন কত পাক্সাবী, সিদ্ধী, ইংল্যান্ডে রেশমের কাপড়ের ব্যবসায় করে' টাকা নিয়ে দেশে ফেরে। সমুদ্রগামী জাহাজের ডেকপ্যাসেঞ্জার হিসাবে এ শ্রেণীর লোক পরিচিত যাত্রী। তারা কেহ হাতে হাতে কাপড় ফেরি করে, কেহবা দোকান খুলেছে।

সাতের-আঠার বৎসর বয়সের গুজরাটী সম্মান পারী সহরে মুঠো মুঠো মুক্তা ফেরি করে' বেড়ায়, সেই সঙ্গে ভবিষ্যতের উন্নতির জঙ্কে হীরক ব্যবসায়ের কাজ শেখে।

বাঙালীও চা চামড়ার ছোট ছোট ব্যবসায় করেছে।

তা' ছাড়া ভাষা শিখিয়ে, অথবা নিজের দেশে পত্রিকার বোঝা না বাড়িয়ে এদেশে গল্প-প্রবন্ধ ছাপিয়ে বাঙালী শিক্ষিত যুবক যত সহজে নিজের অসংস্থান এ দেশে করতে পারে, অবাঙালীর পক্ষে তত সহজ নয়। এখানে বঙ্গ-সম্মানের সহজাত দক্ষতা রয়েছে।

এই ত' বোধায়ে দেখেছি, বাঙালী স্বর্ণকার সৌখীন গহনার ব্যবসায় প্রায় একচেটিয়া করে' বসে আছে—পারী বা ভিয়েনা এ দৃষ্ট দেখতে হচ্ছে করে।

হউরোপের হাটে হাটে ক্রফনগরের মাটির পুতুল চালাতে কি বাঙালী পারে না ?

এবার থেকে পারী সহরের মেম-অঙ্গে শাড়ী উঠেছে—মুশিদাবাদের ছাপানো রেশমী শাড়ী সেখা কে পৌছাবে ! পারী বণিকের পূর্বে কি মুশিদাবাদের ছেলে এ কার্যে নামতে পারে না ?

সত্যি, যৌবনে বাঙালী যদি আজ এমন করে risk exaggerate করে পছন্দ মত বসে না থাকত, জাপানীর মত ভবিষ্যত তার কে আটকাতে পারে ?

রাজস্থান থেকে ধার করা প্রতাপ সিংহের প্রাচীন পৌরুষ নিয়ে বাংলায় বাঙালী কতকাল চালাবে ? দুঃখ বরণ করার আনন্দ আশ্বাদ করে' সে কি ভবিষ্যতের ইতিহাস গড়বে না !

পারী সহরের বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকেরা বিজ্ঞান-দর্শন-জ্ঞানাদি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আলোচনায় নিমগ্ন—কিন্তু সে ব্রাহ্মণ্যের ভিত্তি দেশের স্বচ্ছলতার উপরে। আমাদের ব্রাহ্মণ্য মোহ নিষ্প্রিত-স্বার্থের স্বপ্ন মাত্র। তাই পারী সহরের Concord Square-স্থিত প্রাচ্যদেশ থেকে লুণ্ঠন আহিত শৈলময় Cleopatra's needle দেখে আমাদের প্রস্তুত-বৃত্তির পিপাসা বৃদ্ধি পায়, কিন্তু সে needle এ প্রাচ্য দেশবাসীর বৃকে শেলের মত বেঁধে না !

—শ্রীকপিলপ্রসাদ ভট্টাচার্য

বিজ্ঞাপন মারিও না

কিছুদিন হইল উপরের এই কথাটি বাড়ির প্রাচীরে প্রাচীরে দেখিতেছি : বিজ্ঞাপন মারিও না ! কথাটি হওয়া উচিত ছিল, বিজ্ঞাপনে মারিও না। কারণ, বিজ্ঞাপন দ্বারা কলিকাতার একটি ব্যবসায়ী সম্প্রদায় কলিকাতাবাসীকে মারিবার মতলব করিয়াছে।

শুনিতে পাই, এবং সম্ভবত বৃদ্ধিতেও পারি যে কলিকাতা শহরে বহু জিনিষ চলে তাহার মধ্যে অধিকাংশই বিজ্ঞাপন না হইলে বিক্রয় হয় না। যে সব দ্রব্য বিনা-বিজ্ঞাপনে চলা উচিত ছিল, সম্প্রতি তাহার জ্ঞাপন বিজ্ঞাপন দিতে হইতেছে।

মাছঘ বাঁচিয়া থাকে নিজের গরজে। এবং বাঁচিয়া থাকিবার জ্ঞান তাহার যে যে দ্রব্য প্রয়োজন তাহা নিজের গরজেই সংগ্রহ করে। বলা বাজ্জল্য, বাঁচিবার জ্ঞান প্রধানতম প্রয়োজন খাদ্য; তারপর, পরিধেয়, এবং তারপর গৃহ। ইহা লইয়া খুব সম্ভব মতভেদ হইয়াছে। কাহারো মতে হয়ত গৃহই সর্বাগ্রে প্রয়োজন, আবার কাহারো মতে পরিধেয়। অবশ্য আহাৰ্য্যকে প্রথম প্রয়োজনীয় মনে করিবার মত লোকেরও অভাব নাই।

সুতরাং আশ্চর্য্যকার জ্ঞান যাহা লোকে আশ্চর্য্যগরজে সংগ্রহ করিত, এখন তাহা আশ্চর্য্যকার পক্ষে অবশ্য-প্রয়োজনীয় কিনা ইহা লইয়া নিশ্চয়ই লোকের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। ফলে আহাৰ্য্য দ্রব্যের বিজ্ঞাপনও দেখা যাইতেছে। শুধু আহাৰ্য্য নহে, পরিধেয় এবং গৃহ এই দুইটি দ্রব্য সম্বন্ধেও বিজ্ঞাপন প্রয়োজন হইয়াছে। লোকের মনে যে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে তাহা শুধু কোনটি প্রথম বা কোনটি পরে

তাহা লইয়া নহে ; এই শ্রমগুলি জীবনধারণের পক্ষে আদৌ প্রয়োজন কিনা ইহা লইয়াই সম্ভেদ ।

ইহাতে একদিক দিয়া ভালই হইয়াছে । কারণ খাওয়া-পরাই যে মানুষের একমাত্র প্রয়োজন ইহা যদি সে ক্ষণকালের জন্তও সম্ভেদের অবকাশে তুলিয়া যাইতে পারে তাহা হইলে মনুষ্যত্বের বিকাশে তাহার আর বাধা থাকে না । খাত্তের বাজার যেরূপ ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে খাত্তের স্থান হয়ত সিনেমাকেই ছাড়িয়া দিতে হইবে । বাজারে খুব সম্ভব এক ডিম ছাড়া অন্য কিছু খাটি মেলে না । সর্বত্র ভেজাল চলিতেছে । খাটি জিনিষ দিয়া বেশি দাম লইবার প্রয়োজন কাহারো নাই, কিসে কন্দামে খারাপ জিনিস বিক্রয় করা যাইবে ইহাই অধিকাংশ ব্যবসায়ীর মূলমন্ত্র । ফলে খাটি সরিষার তৈল, বিস্তৃত নারিকেল তৈল, পবিত্র দ্রব্য, নির্জলা দুধ প্রভৃতির বিজ্ঞাপনে পথঘাট আচ্ছন্ন হইল । একদল খারাপ জিনিস দিয়া মারিতেছে, অল্পদল ভাল জিনিসের বিজ্ঞাপন দিয়া মারিতেছে—পলাইবার পথ নাই ।

বাজার হইতে চাল খাইলে বেরিবারি হয়, কিংবা তেল খাইলে বেরিবারি হয় ইহা আজ পর্যন্ত স্থির হইল না । অথচ ইতিমধ্যে বেরিবারির মহৌষধ বাহির হইয়াছে, এবং বিজ্ঞাপনে দেখিতেছি, কোনো বিশেষ দোকানের সরিষার তেল খাইলে আর বেরিবারি হইবার ভয় নাই । ইহাকেই বলে বিজ্ঞাপনে মারা ।

কিন্তু শুদ্ধমাত্র প্রাচীরে বিজ্ঞাপন লাগাইলে বাঙালীর মৃত্যুভয় ততটা নাই । বিজ্ঞাপনে যদি সত্যই কেহ মরে, সে শহরে থাকে না, তাহার বাড়ি মক্কাশ্বলে । সে পঞ্জিকার বিজ্ঞাপন পড়িয়া এবং বিজ্ঞাপনের খাপ্পায় পড়িয়া ভাল ঘড়ি মনে করিয়া একটাকার নানাবিধ উপহারসহ

টয় ওয়াচ কেনে—তার পর সিংহ-বিজয় লাভ করিবার জন্ত সালসা খায়, গৃহস্থ-ছাপাখানা কেনে, এবং যৌবনের উপাঞ্জিত অর্থ এই ভাবে ব্যয় করিতে করিতে যখন বার্কিকা আসিয়া পড়ে তখনো সে ঐ পঞ্জিকার বিজ্ঞাপন পড়িয়া চিরায় মাছলি এবং যাত্রাগানের বই কিনিয়া চিত্তায় আরোহণ করে । শহরের লোক বেশি দিন ধরিয়া ঠকে না, তাহার ঠকিবারও সময় কম । কাজেই এই বিজ্ঞাপন-মারা ব্যাপারটিকে নেহাৎ মনুষ্য-মারা ব্যাপার মনে না করিয়া ইহার অন্য একটা দিক দেখিবার চেষ্টা করি ।

যাহারা মফঃস্বলে পঞ্জীগ্রামে থাকেন তাহারা নিশ্চয়ই জানেন, বাংলাদেশে একাদিক ঋতু এবং বাংলার মাসে একাদিক পূর্ণ আছে । কলিকাতাবাসীর ইহা উপলব্ধি করিবার স্বযোগ নাই । কিন্তু তথাপি কলিকাতার আকাশেও চাঁদ ওঠে, এবং কলিকাতার চৌহদ্দির ভিতরেও ঋতু-পরিবর্তন হয় । গাছপালা, নদী ইত্যাদি কিছু না থাকায় আমাদের ঋতুপরিবর্তন বুঝিবার পক্ষে যে বাধা ছিল, এই বিজ্ঞাপন-গুলি সে বাধা কিছুপরিমাণে দূর করিয়াছে । এ বেলা যে বিজ্ঞাপন দেখিতেছি ও বেলা সে বিজ্ঞাপন আর দেখি না, খাটি সরিষার তেলের উপর ব্যাঘ্রের চক্কি আসিয়া পড়িল, দেখিতে দেখিতে আসিয়া পড়িল পাল্লাবী শাল এবং তাহার পরেই লেমিঞ্জারেবল্ । নদীর স্রোত কোথায় প্রবাহিত হয় তাহার সংবাদ রাধি না, কিন্তু বিজ্ঞাপনের স্রোত সর্বদা চোখের সম্মুখে প্রবাহিত হইতে দেখিতেছি । ফুল কোথায় ফোটে, মেঘ কখন সূর্য্যাস্তের বর্ণজটায় আকাশ রঙাইয়া ফোলে সে সংবাদ রাধি না—কিন্তু বিজ্ঞাপনের বড়ী কাগজে প্রাচীরের উত্তান এবং আকাশ সর্বদা রঞ্জিত হইতে দেখিতেছি । স্বতরাং বিজ্ঞাপন আমাদের মারিতেছে কি বাচাইয়া রাখিতেছে—তাহাই ভাবিতে হইবে । ফস করিয়া কোনো সিদ্ধান্তই করা উচিত হইবে না ।

—শ্রীপরশর শর্মা

চিঠি

ঐযুক্ত শনিবারের চিঠি সম্পাদক মহাশয়—

ইটালি-আবিসীনিয়ার যুদ্ধ-সংবাদ সম্পর্কে আপনারা কিছু লিখিয়া-
ছিলেন। অবশ্যই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, এই যুদ্ধে আবিসীনিয়া
হইতেও বঙ্গদেশ বিচলিত হইয়াছে বেশি। দেশী কাগজ সমূহে,
আবিসীনিয়ার প্রত্যেকটি পরাজয়, তাহাদের এক একটি stratagem
হিসাবে প্রচার করা হইতেছে এবং সেই সন্দেহ ইটালি, ম্যালেরিয়া
কলেরা এবং বৃষ্টি প্রভৃতি যেকোনো উপলক্ষেই যে চরম দুর্দশাগ্রস্ত
হইতেছে এ বিষয়েও সংবাদপত্রের কোনো সন্দেহ নাই। বাঙালী
আবিসীনিয়ার জ্ঞান কাদিতেছে, কিন্তু সকল বাঙালীই কি কাদিতেছে ?
নিশ্চয় কাদিতেছে। সংবাদপত্রে যাহারা কাদিতেছে তাহাদের সংখ্যা
খুব বেশি নহে, কিন্তু বাহিরে যাহারা কাদিতেছে তাহাদের সংখ্যা
বেশি। যুদ্ধ শীঘ্র থামিয়া গেলে পাটের দর কমিয়া যাইবে বলিয়া
ইহারা কাদিতেছে। প্রতি দিন শত শত লোক নিহত হউক, সহস্র
সহস্র লোক আহত হউক, কিন্তু তবুও যুদ্ধ চলুক, না চলিলে বাঙালীর
আয় কমিয়া যাইবে।—গোপন কথাটা বলিয়া ফেলিলাম।—প্রকাশে
যাহা বলিতে পারি তাহা এই,—ইটালি নিষ্ঠুর, বর্বর, সে নিরীহ
আবিসীনিয়ার উপর বাহা-ইচ্ছা তাহাই করিতেছে। মহাকালের
তাণ্ডব আরম্ভ হইয়াছে—হঁ-হঁ-হঁ-হঁ—নটেশের পদপাতে ধরা টলমল
করিয়া উঠল। ইতি—

শ্রী—

শকুনি

বসে আছে যত লুন্ধ শকুনি

ভাগাড়ে কখন পড়িবে মড়া ;

ক্লষক বসিয়া চাহিছে আশায়

নদীতে কখন পড়িবে চড়া।

নদীর পাঞ্জর বাহির হইবে—পড়িবে পলি,

উঠিবে চাষার অনেক আশার ফল ফলি !

ভাবিছে রাঁধুনি কাঁচা কাঠগুলা উঠিলে জলি,

পেঁয়াজ কলি

কুড়িয়া ভাজিবে পেঁয়াজি বড়া !

বসে আছে যত লুন্ধ শকুনি

ভাগাড়ে কখন পড়িবে মড়া !

ভাবে ডাক্তার অস্থে কখন পড়িবে কেবা,

উকীল ভাবিছে করিব কখন আইন সেবা,

দোতলার ছাদে দাঁড়ায়ে ভাবিছে গণিকা যেবা

—কামিনী, রেবা,

দুয়ারে কখন নড়িবে কড়া !

উড়িয়া উড়িয়া ভাবিছে শকুনি

ভাগাড়ে কখন পড়িবে মড়া !

বড়ে ও চঙেতে চলিয়া পড়িছে প্রবীণা বুড়ী,

মদের বোকারে গান্ধির ছবি টাঙায় শুঁড়ি,

আধ পেটা খেয়ে দিন বাটে যার চিবায়ে মুড়ি

—মুড়ি ও গুড়ই

চক্চকে তার চূড়া ও ধড়া !

মুখে মুহুহাসি ভাবিছে শকুনি

ভাগাড়ে কখন পড়িবে মড়া !

ভূলাতে পাঠক, লেখক বসিয়া লিখিছে যা'তা'

স্নেহ স্বধাতুর জননী চিবায ছেলের মাথা,

দয়ালু জনের ভিজাইতে হায় নয়ন পাতা

—চাঁদার খাতা !

ভিখারী আসিয়া কাটিছে ছড়া !

কাঁদিয়া কাঁদিয়া ভাবিছে শকুনি

ভাগাড়ে কখন পড়িবে মড়া !

হাসে বড়বাবু হেরি কেরানীর প্রতিভা-জ্যোতি

আপিসে কলম না পিষে তাহার কোথায় গতি !

ঘরে ও বাহিরে কুমারী খুঁজিছে আবেগে অতি

শাসাল পতি

—শাস দেখে চাই প্রেমোতে পড়া !

কটাক্ষ হানি' ভাবিছে শকুনি

ভাগাড়ে কখন পড়িবে মড়া !

অজ্ঞায় বাহা স্বপক্ষে তারি লড়িছে বীর,

শোণিতের শোতে ভেসে গেল কত উজ্জ শির !

কত অজুনে ভুলাইল কত উজ্জ শির

নয়ন নীর

হইল শেষটা গহনা গড়া !

ছন্দে ও গীতে গাহিছে শকুনি

ভাগাড়ে কখন পড়িবে মড়া !

দক্ষিণ মত বসে আছে কবি কাব্য-কলে,

করমাস মত কবিতা-কতুয়া বানায়ে চলে !

শিল্পীর সেরা ভিড়েছে কুশলকারের দলে

আটের ছলে

মুষ্টি কেলিয়া গড়িছে ঘড়া !

গুমরি' গুমরি' ভাবিছে শকুনি

ভাগাড়ে কখন পড়িবে মড়া !

পাণ্ডা পুঙ্খ কাটিয়া তিলক রেখেছে টিকি ;

সিনেমা দেখায় যুবক, যুবতী, 'মাউন্ট মিকি'

দালাল বলিছে, 'বলুন না সার আনিব কি কি'

—পাইনা ঠিকই !

এক সাথে সব টনক-নড়া !

ঝরিতেছে লাল—ভাবিছে শকুনি

ভাগাড়ে কখন পড়িবে মড়া !

মহাজন বসে' স্বদের হিসাব কসিছে রোজ ;

গুরুদেব কন, 'ভগবান পারি চোখটা বোজ'

ইয়ার বলিছে 'চিংগুরে আজ জমিবে ভোজ

নে 'অটো রোজ'

ফুলের মালাটা গলাতে জড়া !

উদ্‌গ্রীব হয়ে রয়েছে শকুনি

ভাগাড়ে কখন পড়িবে মড়া !

হস্ত-লিখন বিচার করিছে গণংকার,
টং টং টং উঠিছে টাকার টনংকার,
সমরাদনে উঠিছে অসির ঝনংকার
চমংকার!

সবারই গলায় কাঁসীর দড়া।
অট্ট হাসিয়া কহে মহাকাল
সবাই শকুনি সবাই মড়া!

—“বনফুল”—

আলস্য ও অসাধুতা

ফোর্ড ক্রাসের ছেলেরা যে বিষয়ে এক্সারসাইজ বুক ‘এসে’ লেখে, সে বিষয়ে মাসিক পত্রিকায কিছু লিখিতে যাওয়া হয়ত সমীচীন নয়। কিন্তু বুদ্ধেরাও অনেক বিষয়ে বালকের মত ব্যবহার করেন, এরূপ দেখা গিয়াছে। তাছাড়া জাতি-হিসাবে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ফোর্ড ক্রাসেরও উপযুক্ত আমরা নহি, একথা অনেকে বলেন এবং অনেকে বিশ্বাস করেন। আরো একটা কথা আছে: স্বল্পবুদ্ধি ব্যক্তির যখন কোন রসিকতা শুনিয়া শ্রীত তাহার মর্ম গ্রহণ করিতে না পারিয়া অতিবিলম্বে এবং অসময়ে হাসিয়া উঠেন, সেইরূপ বাল্যকালে শ্রুত এবং অধীত অনেক বিষয়ের প্রকৃত মর্ম গ্রহণ করিয়া হাসিতে বা কাদিতে বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণেরও যৌবন, এমন কি বাদ্ধক্য অতীত হইয়া

শনিবারের চিহ্ন

১৬২

যায়। স্বতরাং আমার এই ‘এসে’ নিত্যন্ত হাস্যকর নাও হইতে পারে।

আলস্য ও অসাধুতা বর্জনীয়—এ উপদেশ আমরা শৈশবেই শুনিয়াছি এবং পড়িয়াছি। কেন বর্জনীয়, তাহা বৃদ্ধিবার সময় তখন ঠিক হয় নাই। পিতরি প্রীতিমাগ্নে যেমন প্রীয়ে সর্গদেবতা, তেমনি আলস্য ও অসাধুতা বর্জন করিলেও প্রীয়ে সর্গদেবতা, এইরূপ একটা ধারণাই সম্ভবত: হইয়া থাকিবে। দেবতার প্রীত হইলে, স্বর্গে গিয়া স্বপভোগ স্বলভ হইবে, অর্থাৎ এক অনায়াস তেতালা বাড়ী হইবে, এক পয়সায় তিনখানা মোটরগাড়ী হইবে এবং বরাকালের পানের মত আদ পয়সায় পাচ-সাত গুণা অপারীর সেবা মিলিবে। এইরূপ একটা পারলৌকিক লোভ আমাদের প্রায় প্রতিকার্যের মূলে প্রেরণা দিয়া থাকে। ইহলোকে আলস্য ও অসাধুতার কি ফল হইতে পারে, ব্যক্তিগত জীবনে বা জাতিগত জীবনে তাহার অহুদান আমরা ভাল করিয়া করি নাই।

প্রথমত: আলস্য সম্বন্ধে একটু চিন্তা করিয়া দেখা যাক। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোক এবং যাহারা আর্দ্র আবহাওয়ার বাস করে, তাহারা স্বভাবত: একটু অলস হইয়া থাকে। আমাদের দেশের আবহাওয়া উষ্ণ এবং আর্দ্র উভয়ই। স্বতরাং আমরা কেন অলস হইব না? প্রাকৃতিক বাধা অতিক্রম করিয়া নিজের ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠাই মাহুষের লক্ষ্য, স্বতরাং আমাদেরকেও গ্রীষ্মাদি প্রাকৃতিক বাধা অতিক্রম করিয়াই নিরলস ও কর্মঠ হইবার চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু তাহা আমরা করিতেছি কি? বাড়ালীর অদিকাংশ পল্লীগামে বাস করে। বর্ষার তিন-চার মাস, তাহাদের অদিকাংশই উদ্ভিদ-জীবন বাপন করিয়া থাকে। সময়-বিশেষের কথা বাদ দিলেও সারা বৎসরই

বহু জী ও পুখর আলক্ষে কালাতিপাত করিয়া থাকে। কিন্তু সে সময়ে সম্ভাবহার করা যাইতে পারে, তৎসম্বন্ধে তাহারা চিন্তাও করে না। শহরের অধিবাসীরা অধিকতর কর্মঠ। কিন্তু তথাপি যে-সকল জ্ঞানি জানে ও কর্ণে উন্নতিলাভ করিয়াছে, তাহাদের তুলনায় অলস ও শ্রম-বিমুখ। অনেক স্থলে গ্রিক অলস ও শ্রম-বিমুখ না হইলেও, আমরা যে মদ্য এবং কষ্ট-অসহিষ্ণু সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহার কারণ হয়ত স্বাস্থ্যহীনতা এবং উপযুক্ত খাদ্যভাব। কিন্তু কারণ যাহাই হউক, ফল সম্বন্ধে মতদ্বৈত নাই। যে-সকল কার্যে শারীরিক পরিশ্রম আবশ্যক, সে-সকল কার্যে আমরা ক্রমাগত বিরূপে অবাঙালী কর্তৃক পরাজিত হইতেছি, তাহার বিশদ বিবরণ অনাবশ্যক। এই ত দেখিতে দেখিতে মোটর-চালকের সমগ্র কার্যই অবাঙালীর হাতে চলিয়া গেল। পবিত্র জল-ভাত-তরকারী খাইয়া ঘৃণিত রুটি-মাংসাহারীর নিকট আমরা সম্পূর্ণ পরাজিত হইয়াছি।

বিশেষ করিয়া উদাহরণ খুঁজিবার আবশ্যক নাই। মোটর উপর আমাদের কর্মজীবনের গতি পৃথিবীর কর্মঠজাতি সমূহের তুলনায় অতিশয় মন্দ। ইউরোপীয়গণের দৈনন্দিন জীবন ও বাঙালীর দৈনন্দিন জীবন পাশাপাশি রাখিলে মোটরকার এবং ঘোড়ার গাড়ীর মতই মনে হইবে। একজনকে মনে হইবে সখল স্বস্থ বেগময় ইঞ্জিন, অশ্রুটি ঘেন-দুর্গন্ধ রূপ মদ্যর অর্থ। আমাদের সব কাজই ধীরে স্বস্থে, হইতেছে—হইবে প্রণালীতে। পল্লীগ্রামের লোকেরা সাধারণতঃ ঘণ্টায় দুই মাইল বেগে হাঁটিয়া থাকে (অবশ্য গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইবার কথা বলিতেছি না)। শহরের লোকে হাটে তিন মাইল বেগে। স্বতন্ত্রাং গড়ে ঘণ্টায় আড়াই মাইল বাঙালীর গতিবেগ ধরিয়া লইলে বিশেষ তুল হইবেনা। গোক প্রায় ঐরূপ বেগে চলিয়া থাকে। স্থল-কলেজের

যুবকদিগের হাঁটা, বিশেষতঃ বিচ্ছালয়ের সীমানার মধ্যে, একটু বেশী করিয়া অদ্ভুত। প্রত্যহই অসংখ্য ছাত্রকে দেখা যায়, তাহারা হাঁটিতেছে, কিন্তু কোথাও যাইতেছে না। এটা যেন তাহাদের জীবনেরই একটি ক্ষুদ্র প্রতিচ্ছায়া। পড়িতেছে, পাস করিতেছে, অথচ কিছুই করিতেছে না। বাঙালীর হাঁটার সঙ্গে একটু মর ও তাল জুড়িয়া দিলে প্রায় নৃত্য বলিয়াই ভ্রম হইবে। কে একজন অবাঙালী একবার বলিয়াছিলেন Bengalees walk like ducks. স্থানকাল-বিশেষে ত্রোগ্রোধ-পরিমণ্ডলা যুবতীর পক্ষে এটা প্রশংসার বিষয় হইলেও পুরুষের পক্ষে ইহা প্রশংসনীয় নহে।

আমরা সকলে প্রায়ই বিলম্বে উঠি, অবসর পাইলেই দুপুরে গড়াগড়ি দেই, অফিসে স্বযোগ পাইলেই স্নানময়ী এবং উপরওয়ালার তিরস্কার না পাইলে এক ঘণ্টার কাজ তিন ঘণ্টায় করি। কথাটা প্রতিমধুর না হইলেও অনেকাংশে সত্য।

বর্তমান যুগে একটু প্রতিক্রিয়া যেন দেখা দিয়াছে। ব্যায়াম-চর্চা, সন্তরণ প্রভৃতির দিকে যুবকদিগের একটা প্রবল ঝোঁক দেখা যাইতেছে। লক্ষণ শুভ। তবে লাঠিখেলা, কুস্তি, পেশীসঞ্চালন, লৌহদণ্ডবক্রীড়, ভারোত্তোলন, মোটরকারের গতিরোধ প্রভৃতি কার্য এবং হলকর্ষণ, মোটরচালন, কূপ হইতে ভূমিতে জলসেচন, যন্ত্রাদি-নিষ্কাশন ও মেলামত প্রভৃতি কার্য সমশ্রেণীর নহে। প্রাতে যিনি দুই এক ঘণ্টা বৃহৎ বৃহৎ ভারসমূহ উত্তোলন করেন, তিনি দিনের বাকী বাইশ ঘণ্টা কি করেন, তাহার উপরই তাহার সামাজিক প্রয়োজনীয়তা নির্ভর করে। দীনীরা বহু পরিশ্রম করিয়া যুগ্মগাদি কার্য করিয়া থাকেন, তাহাতে তাহাদের শ্রম ও কষ্ট সহিষ্ণুতা প্রশংসিত হয়না। প্রফেসর রামমুণ্ডি পেশী সাহায্যে নানাপ্রকার বল-সংক্রান্ত ক্রীড়ায় যে পরিশ্রম

করিয়াছেন, প্রফেসর সার পি. সি. রায় তাঁহার পেশীহীন দেহধারা তাহা অপেক্ষা কম পরিশ্রম করেন নাই। স্বদেশী মেলায় পেশী সকালীন প্রদর্শন উত্তম কার্য। সেই পেশীধারা যদি হাতুড়ীপেটা হইত, তাহা হইলে আরও উত্তম হইত। কেহ কেহ বলেন তড়িগ-সলিলে অতিরিক্ত সন্তরণ করিলে পরে কারণ-সলিলেও সন্তরণ করা আবশ্যিক; এরূপ অবস্থায় সন্তরণকারীর শ্রম ও কষ্ট-সহিষ্ণুতার অকপট প্রশংসা সমাজের পক্ষে কঠিন। কিন্তু শান্তারুদের সম্বন্ধে এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

ভাটিয়ারগণ কিরূপ শ্রমসহিষ্ণু এবং কষ্টব্যপারায়ণ তাহার প্রমাণ আমরা সর্বদাই পাইয়া থাকি। এটাও আমাদের আলস্য-ভ্যাগের দিকে একটি বিশেষ চোঁটা বলিতে হইবে। পূজাপার্বণদি-উপলক্ষে, গঙ্গাবান-উপলক্ষে, প্রদর্শনী প্রভৃতিতে ইহাদের স্বশৃঙ্খল কার্য এবং কষ্টব্যপারায়ণতা বিশেষ প্রশংসাহঁ। জটিল তরুণ কোন কারণবশতঃ একখানি দেশী সিনেমা-ছবি বাইশবার দেখিয়াছিলেন; মার্কজিনীন দুর্গোৎসব, স্বদেশী মেলা প্রভৃতি ব্যাপারে উত্তরূপ কোন কারণ বর্তমান না থাকায় ভাটিয়ারগণের কঠোর কষ্টব্যাজ্ঞান এবং শ্রমশীলতা যে-কোন সমাজের পক্ষেই গৌরবের বিষয়।

কলিকাতার বিভিন্ন অংশে বহু পার্ক নিশ্চিত হওয়ায় কলিকাতা-বাসীর আলস্রভ্যাগের হ্রাসগ বাড়িয়া গিয়াছে (আলস্রপ্রিয়তাও বাড়িয়াছে। শ-চি-স)। সকাল-সন্ধ্যায় বহু নরনারী ঐ সমস্ত পার্কে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। প্রাতে লেকের চারিদিকে মোটরে চড়িয়া হাই তুলিতে তুলিতে অনেককে ভ্রমণ করিতে দেখা যায়। অনেকে হাটেন, অনেকে দৌড়ান, আবার কেহ কেহ শান্তারও কাটেন। এইরূপ ভ্রমণাদিতে আলস্রভ্যাগ এবং স্বাস্থ্যলাভ হইয়া থাকে। লেক, গঙ্গার

ধারে, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কাছে এবং ইন্ডেন গার্ডেনে যাহারা ভ্রমণ করেন, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই অবাঙালী কেন, এ প্রশ্ন কেহ কেহ করিলেও, মোটের উপর আমরা যে ক্রমশঃ শরীর চালনার পক্ষপাতী হইতেছি, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এখন অসাড়তা সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাক। বাঙালীর অধিকাংশই বড় পরিবারে লালিত পালিত। অতি নৈশবেই মিথ্যা জুজ্ব ভয় দিয়া পিতামাতা শিশুকে প্রতারিত করেন। বাড়ী হইতে বাহির হইবার সময়ে শিশুপুত্র বা কন্যা সঙ্গে যাইবার জ্ঞাত অস্বাভাবিক করিলে অধিকাংশ সময়েই মিথ্যা সাহসনা বা মিথ্যা প্রলোভন অনেকেরই দেওয়াই থাকেন। শিশুরা অধিকাংশ স্থলেই তাহা বুঝিতে পারে। পিসিমা লুকাইয়া ছুঁধের সরটুকু রেণুকে দিয়া কাহাকেও বলিতে বারণ করিয়া দিলেন। জেঠাইমা লুকাইয়া বলুকে একটা পয়সা দিয়া শিখাইয়া দিলেন, পয়সাটা জেঠামহাশয় দিয়াছেন। শিশুরা পিতামাতার সদৃশপ্রায় স্বদয়স্বয় করিতে পারুক আর নাই পারুক, মিথ্যাকথা ও মিথ্যাব্যবহার শিখিতে বিলম্ব করেন। তাহারাও স্থূল পলাইয়া ঘুড়ি উড়াইল, অথবা শহরের ছেলে হইলে, আরো কত কি করিল, বাড়ীতে আসিয়া নিরীকারচিত্তে মিথ্যা কথা বলিল।

ছেলে কলেজে উঠিল। প্রক্সি দিতে শিখিল; পরীক্ষায় নকল করিতে শিখিল; অ্যাথলেটিক ক্লাবের সেক্রেটারির হিসাবের গোলাযোগ হইলেও পুনরায় সে-ই সেক্রেটারি নিযুক্ত হইল। প্রক্সি দেওয়া, পরীক্ষায় নকল করা এবং হিসাবে গোলামাল করা ইহাদের পক্ষে নিশ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ অপেক্ষাও সহজ। কোন একটা বিশ্বজিলায়ে ব্যবস্থা আছে যে প্রত্যেক ক্লাসের বাহিরে দরজার নিকট একটি ছোট কাঠের বাক্স স্থান থাকিবে এবং ছাত্রেরা ক্লাসে যাইবার সময়ে

নিজদের নামের কার্ড বা স্লিপ সেই বাক্সে ফেলিয়া যাইবে। পরে বেয়ারা আসিয়া সেগুলি সংগ্রহ করিয়া তদনুসারে রেজিষ্টারে উপস্থিতি ও অহুপস্থিতি লিখিয়া রাখিবে। একথা আমাদের ছেলেদের কাছে বলিলে তাহারা উপরোক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে নিরেট বোকা মনে করিয়া হাসিবে।

অসাপুতা যে শুধু মিথ্যা কথা বা মিথ্যা ব্যবহারেই প্রকাশ পায় তাহা নহে। ইহা নানাপ্রকারে আমাদের জীবনের বিভিন্ন কার্য-কলাপের মধ্যে বিভিন্ন দিক দিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে। ভৃত্যশ্রেণীর লোকের মধ্যে বাঙালীর অসাপু বলিয়া নিন্দা আছে। নিন্দাটা অমূলক বোধ হয় নয়। একজন বহুদর্শী ব্যক্তি বলিয়াছিলেন যে কলিকাতার ব্যাঙ্ক এবং ব্যবসায়ীগণের মধ্যে প্রত্যাহ যে লক্ষ লক্ষ টাকার আদান প্রদান হয় তাহা অবাঙালী দরোয়ান মারফত না হইয়া যদি বাঙালীর মারফত হইত, তাহা হইলে এক সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত ব্যাঙ্কগুলি উঠিয়া যাইত। কথাটি হয়ত অতিরঞ্জিত, হয়ত নয়।

ব্যবসায়িক্ত্রে বাঙালী হ্রবিধা করিতে পারে না। সাধারণতঃ ইহার দুইটি কারণ উল্লিখিত হইয়া থাকে—মূলধনের অভাব এবং গবর্ণমেন্টের ঔদাসীন্ধ্য। এ কারণগুলি ঠিক যুক্তিসঙ্গত কি? এটি যে দেখিতে দেখিতে এলগিন রোড হইতে আরম্ভ করিয়া কালীঘাট পর্যন্ত অসংখ্য দোকান অবাঙালীর হাতে চলিয়া গেল, ইহা কি মূলধনের অভাবে? একটু বিচার করিয়া দেখিলেই ইহার মূল আলস্ত ও অসাপুতা ধরা পড়িবে। লেখক একবার রেভুন্ন যাইতেছিলেন। জাহাজে সাড়ে-বত্রিশ-ভাঙ্গা যাত্রীর মধ্যে একজন ভাটিয়া ব্যবসায়ীর সহিত আলাপ হইল। ভারতের বড় বড় অনেকগুলি শহরে ইহার ব্যবসায় আছে। ইউরোপ হইতে পাইকারী ক্রয় করিয়া এই সকল

ব্রাকে সরবরাহ করিয়া থাকেন। ব্যবসায় উপলক্ষেই ইনি বৎসরের দিনগুলি বিভিন্ন ব্রাকে কাটাইয়া থাকেন। ইনি বলিলেন যে বাংলা-দেশের ব্যবসায়টিই তিনি কঠিন মনে করেন, কেননা ইহার বড় অসাপু। উদাহরণস্বরূপ তিনি একটি specific case বলিলেন, ইনি শ্যামবাজারের জটনৈক ব্যবসায়ীর নিকট টাকা আদায় করিতে গেলে তিনি নিজেই বলিলেন, ‘বাবু এখন কলিকাতায় নাই।’ এরূপ নাকি অল্প কোন প্রদেশ হয় না। যিনি এই গল্প বলিলেন, তিনি নিজে সাপু নাও হইতে পারেন। তবে অল্পপ্রবেশের সঙ্গে তুলনা করিয়া বাঙালীকেই বিশেষ করিয়া হেয় প্রতিপন্ন করিবার কোন কারণ ছিল কি না তাহা জাহাজের তিনদিনের আলাপে নির্ধারণ করিতে পারি নাই।

মুখের কথার কোন মূল্য আমাদের কাছে নাই। সোমবায়ে কোন একটি কাজ করিব এই প্রতিশ্রুতি দিয়া ক্রমাগত দুইটি তিনটি বা ততোধিক সোমবার অতীত হইয়া গেলেও আমার বিন্দুমাত্র লজ্জিত হই না। নিজের ক্ষমতার বাহিরে কোন অজ্ঞাতপূর্ব কারণে বিলম্ব হইলে বলিবার কিছু থাকে না। কিন্তু আমরা অধিকাংশ সময়ে জানিয়া-সুনিয়া ইহা করিয়াই এরূপ বলিয়া থাকি। আমার প্রেসে দৈনিক এক ফর্মার বেশী ছাপিবার ক্ষমতা নাই। ইহা ভালরূপ জানিয়াও পণ্ডিত ফর্মার একখানা বই এক সপ্তাহে ছাপিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দিতে আমার দ্বিধা হয় না। আমি জানি রামবাবুকে চৈত্রমাসের শুরুর তাহার প্রাপ্য টাকা দিতে পারিব না, বা পারিলেও দিব না। তথাপি তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে বলিব, ‘পরন্তু আসিবেন’ এবং ক্রমাগত কুড়ি বায় বা পণ্ডিত বায় ‘পরন্তু আসিবেন’ বলিতে আমার বিন্দুমাত্র লজ্জা-নাই। আমি যাহার নিকট টাকা পাইব,

তিনিও ঠিক ইহাই করিতেছেন; হুতরাং কাহারই কোন চুংখ নাই। কোন ব্যবসায়ীকে পত্র লিখিলে (বিশেষতঃ অর্থাদি সম্বন্ধে) তিনি কখনই উত্তর দিবেন না। কারণ, মুখে সপ্তাহের সাত দিনে সাত প্রকার মিথ্যা কথা বলিতে কোন বাধা নাই; কিন্তু সাত দিনে সাতপ্রকার মিথ্যা কথা পড়ে লেখা ততটা নিরাপদ নহে।

বাঙালী স্বাধিকারী মোটর বাস চালাইতে পারে না। কারণ গুণ্ডার ও ড্রাইভারের চুরি নিবারণ তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। একটি স্বদেশী জামার কম্পানির কথা লেখক জানেন। প্রধানতঃ টিকিট-বিক্রেতৃগণের চুরির জুই উহা উঠিয়া গেল। জটনক ভদ্রলোক সম্প্রতি কলিকাতার দক্ষিণাঞ্চলে একটি দোকান করিয়াছেন। দোকানে থাকিয়া জিনিষ বিক্রয়ের জন্ত একজন লোক খুঁজিতেছেন, কিন্তু বারো ঘণ্টাকাল চুরি না করিয়া আত্মসংবরণ করিয়া থাকিতে পারে একুপ সংঘী একজন লোক এই বুদ্ধ-চৈতন্য-রামকৃষ্ণর দেশে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিতেছেন না।

একজন প্রবীণ ভদ্রলোক বাংলা, বিহার, উড়িষ্যায় বহুস্থানে বাস করিয়াছেন এবং বাঙালী বিহারী ও ওড়িয়া বহু পাচক, চাকর এবং বি নিযুক্ত করিয়াছেন। তাহার মতে, বাঙালী সর্কোপেক্ষা বেশী অসাধু।

লেখক-হইবার দুর্ভাগ্য যাহাদের হইয়াছে, তাহার জানেন, fools write books and wise men publish them.

ক, খ, গ, ঘ—ইহাদের ব্যবসা ভাল চলিতেছে—ইহার অর্থ সাধারণতঃ এই যে ক, খ-কে ঠকাইতেছে; খ, গ-কে ঠকাইতেছে; গ, ঘ-কে ঠকাইতেছে, এবং ঘ, ক-কে ঠকাইতেছে। একজন ব্যবসায়ীর এই মত শুনিয়া আমি বলিলাম, তাহা হইলে বাঙালীর এত ব্যবসা

চলিতেছে কেমন করিয়া? তিনি বলিলেন, জগতে সবই চলে। জুয়ার ব্যবসায়, পকেটমারার ব্যবসায় কি চলিতেছে না? মেকি টাকা কি চলে না? তবে চলিবার প্রকারভেদ আছে। কেহ চলে শ্রেয়ের পথে, উন্নতির পথে; আবার কেহ চলে অবনতির পথে, ধ্বংসের পথে।

তবে কি বাঙালীরাই শুধু অসাধু এবং অজ্ঞ সকলেই সাধু? অবজ্ঞাই নহে। ধন সকলেরই আছে, কিন্তু সকলেই ধনী নহে; রোগ সকলেরই আছে, কিন্তু সকলেই রোগ নহে; কাম ক্রোধ সকলেরই আছে, কিন্তু সকলেই গুণা নহে; মিথ্যাবাদী, জুয়াচোর সকল জাতির মধ্যেই আছে, কিন্তু সকলেই বাঙালী নহে।

আরো একটা কথা আছে। মিথ্যা ও অসাদুতার সীমা থাকে। আবশ্যক। যে মিথ্যা ও অসাদুতায় পরিণামে মঙ্গল ও উন্নতির সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে হয়, তাহাও হয়ত মার্জনীয়, কিন্তু যাহাতে ব্যক্তির ও সমাজের অমঙ্গল ব্যতীত মঙ্গল নাই, সেখানে সতর্কতা আবশ্যক। অবাঙালী মিথ্যা কথা বলিয়া লাভ করে; বাঙালী মিথ্যা কথা বলিয়া লোকসান সহ করে। Policy হিসাবেও অনেকখানি honestyর প্রয়োজন আছে। আমাদের দেশে নীতি-শিক্ষকের অভাব কোন দিনই নাই। শব্দ, বুদ্ধ, চৈতন্য, পরমহংস হইতে আরম্ভ করিয়া রাম শ্রাম যদু যদু বহু মহাজন লোকশিক্ষার্থ অহুগ্রহ করিয়া আমাদের দেশে জগগ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের শিক্ষা সবই পরলোকের হিতার্থে। ইহলোকে দুমুঠা ভাতকাপড় কিরূপে জুটিতে পারে, কিরূপে দ্রোপূজ সম্ভান স্বস্থ সবল কন্দই হইতে পারে, কিরূপে আমরা জাতি হিসাবে ধনী, কর্মী ও জ্ঞানী হইতে পারি, ঐ সকল তুচ্ছ বিষয় লইয়া তাহার আলোচনা করেন নাই। বর্তমানে আমাদের দেশে যাহারা 'গুরু' তাহাদিগকে মুখ্যতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় :

একজন বলেন, সম্রাসী হও, সংসার ত্যাগ কর, ব্রহ্ম লীন হইয়া সব লেঠা চুকাইয়া দাও।' অল্পজন বলেন, 'অতটা পারিবে না। বরঞ্চ সংসারধর্ম কর, যেন তেন প্রকারেণ অধোপার্জন কর, অগণিত সম্ভানের পিতা হও, আমার জন্ম ব্যাকে টাকা, স্বাস্থ্যকর স্থানে অট্টালিকা এবং তোমার স্ত্রী কন্যা ও অল্পজাগণদ্বারা একটু সেবার ব্যবস্থা করিয়া দাও এবং মনকে ব্রহ্মাইয়া দাও যে তুমি ধার্মিক হইয়াছ। তুমি রূপণ, নীচ, মিথ্যাচারী, অসংযত যাহা ইচ্ছা হইতে পার, তাহাতে কিছুই আসে যায় না, কারণ আমি তোমার গুরু—তোমার সকল ধর্ম আমাকেই মনে মনে অর্পণ করিয়াছ। সমাজে তোমার রূপণতা অসংযম ও নীচতা আবৃত করিয়া রাখিবার জন্য গদ্যপদ্য, পুঁজার্কাদি কয়েকটি অভ্যাসই যথেষ্ট। কারণ তোমার প্রতিবাসীরাও তোমারই মত। তাহাদেরও অনেকেরই গুরু আছে।' দেশের এই আবহাওয়ার মধ্যে ব্যক্তির ঐহিক স্বপ্নের জন্ম, জাতির ঐহিক মঙ্গলের জন্য চিন্তা করেন একরূপ মহাপুরুষের অভাব অস্বাভাবিক নহে। ঐহিক লাভের জন্যও যে সংঘম ও সভ্য-নিষ্ঠার মূল্য আছে, তাহা আমরা সহজে বুঝিতে চাই না।

আত্মপ্রশংসার ছায় আত্মনিন্দাও দূরীয়। হুতরাং বাঙালী সম্বন্ধে এই আলোচনা করিয়া লেখক তৃপ্তিলাভ করিতেছেন না। পল্লীগ্রামে একটা কথা আছে, উপরের দিকে থুতু কেলিলে নিজের গায়ে আসিয়া পড়ে।' বাঙালী সম্বন্ধে কোন আলোচনা—লেখকেরই প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন এবং লেখকেরই সম্ভান-সম্ভতির আলোচনা। মাঝে মাঝে একরূপ আলোচনা আবশ্যক। ঘরের জটিল সম্বন্ধে ঘরের লোকের সহিত আলোচনায় লাভ আছে মনে করিয়াই ঐরূপ লিখিতে সাহসী হইয়াছি। হয় কাঠে ঘুণ ধরিয়াছে, তাহাকে শুধু পালিশের দ্বারা

মজবুত ও কাঁচাকরী করিয়া তোলা সম্ভব নয়। বাহাতে ঘুণ না ধরে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যে জাতির অস্থিমজ্জায় আলস্য ও অসামুত্তর ঘুণ ধরিয়াছে, তাহাকে শুধু বাহিরের শিক্ষা, বক্তৃতাতির দ্বারা উন্নত করা যাইবে না।

স্বপ্নের বিষয়, এ দিকেও বাঙালী কমশঃ ঠেকিয়া শিখিতেছে। ব্যবসার ক্ষেত্রেও বহু বাঙালী ব্যবসার জন্মই সত্যপথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু প্রয়োজনের অহুপাতে চেষ্টার মাত্রা যথেষ্ট নহে। জটিল সংশোধন করিয়া প্রপ্রতিষ্ঠ হইবার পূর্বেই বাঙালীর অর্থনৈতিক জীবন সম্পূর্ণরূপে অবাঙালীর করায়ত্ত হইবার যথেষ্ট আশঙ্কা আছে। এবং পরলোকে গিয়া যতই স্বপ্নভোগ ভাগ্যে থাকুক, ইহলোকে বাংলার অর্থ অবাঙালীর করায়ত্ত হইলে, বাঙালীর সামাজিক, পারিবারিক এবং উৎকর্ষগত বৈশিষ্ট্য লুপ্ত হইতে বিলম্ব হইবে না। ইহার লক্ষণ এখনই দেখা দিয়াছে।

বাহিরের শিক্ষায় জাতিগত অভ্যাস সহজে দূর হয় না তাহার একটি উদাহরণ দিয়াই এ প্রসঙ্গের শেষ করিব। আমাদের দেশের অতি উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যেও একটি অভ্যাস প্রবল দেখা যায়—কাহারও নিকট ইহাতে পুস্তক পড়িতে (বা না পড়িতে) লইয়া উঠা ক্ষেত্র না দেওয়া (বা দিতে ভুলিয়া যাওয়া) এবং প্রতিশ্রুত ঠান্ডা না দেওয়া (বা দিতে ভুলিয়া যাওয়া)। কথাটা শুনিতে যত বাজে কথাই হউক, ইহা ব্যক্তিগত আলস্য ও অসামুত্তর লক্ষণ। পায়ের কোন স্থান হঠাৎ একটু ফুলিয়া উঠা গুরুতর বিষয় নহে, কিন্তু উহা যে-রোগের লক্ষণ তাহা একেবারেই উপেক্ষণীয় নহে।

পৃথিবীর পাগলামি

এীনল্যান্ডের দক্ষিণ পয়েন্টের প্রায় কাছে, Cape Trolle-এর সামনে তিমিধরা বোট নব্বয় করা ছিল। তিন দিন ধরে সমুদ্রে ভীষণ তুফান; বড় বড় তরঙ্গ তীব্র পর্যাপ্ত উঠে বরফের স্তূপ ভাঙতে লাগল এবং কালির মত কালো জল তুষারের এক পাহাড়ে থাকে মেরে খোঁদল করতে লাগল। তুষার-শৃঙ্গ হয়ে থানিকটা ভূমির অংশ, সমুদ্র ঠাণ্ডা হওয়ার পর, তার শান্ত জলের উপর স্বীপের মত শোভা পেতে লাগল। এখানেই লেখকদের চোখের সামনে একটি বিচ্ছেদ নাটকের অভিনয় হইয়াছিল।

তুফানের উৎপাতে একটা বড় তিমি, বাধ্য হয়ে সমুদ্রতটের অনতিগভীর জলে আশ্রয় নেয়। জল হটে গেলে, এ জন্তুটি চরে অল্প জলে আটকে যায়। তিমি যদিও amphibious Mammal, তথাপি এই চরে আটকান প্রাণীটির দম অল্প অল্প করে বন্ধ হয়ে যেতে লাগল। চল্লিশ মিটার দীর্ঘ কৃষ্ণ নীল এই eelacean-এর গভীর জলে বাওয়ার চেষ্টা করার দৃশ্য বড়ই কল্পন। সমুদ্র তাকে তার বক্ষে স্থান দিতে রাজি হোলনা এবং সে প্রাণীরও নিরাপদ হওয়ার ক্ষমতা যত শক্তি প্রয়োগ করার দরকার তার ক্ষমতা ছিল না। মাটির উপর তিমি তার কয়েক টন ওজনের Flank তুলতে পারে না, কেবল জলে যখন থাকে তখন জল তাকে ভেসে থাকতে সাহায্য করে বলেই, সে তার ফুসফুস ফোলাতে পারে। অতএব, এ ক্ষেত্রে তার নিজেই ভীষণ ওজনই তাকে পিষতে লাগল এবং তার পার্শ্বদেশে ক্রমশঃ চাপ

দিয়ে নিশ্বাস তার বন্ধ করে দিতে লাগল। এর নড়নচড়ন ক্রমশঃই শিথিল এবং প্রতি মুহূর্তেই এই প্রাণী দুর্বলতর হতে লাগল। Larsenson তখন একটি বোমা ছুঁড়ে মারলে এবং তাতেই কাজ হলো, সব যন্ত্রণা মিটে গেল। তিন ঘণ্টা ধরে বোট তার 'কেবল'এর সাহায্যে এই ধরা-জন্তুটিকে জলে নামাবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু 'ভীজেল' ইঞ্জিন অপারগ হোল; তখন Goetar জন্তে অপেক্ষা না করা ছাড়া আর গত্যন্তর রইল না।

আজ লেখকদের দল একটা তিমি দলের সামনে পড়লেন; এ দলে খালি মা শু ছা। তিনশ মিটার উঁচুতে এরোপ্লেনে চড়ে এঁরা দেখতে পেলেন, একটা তিমি তার দুই বাচ্চাকে শুন দিতে দিতে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

এই মৎস্যজাতির বংশবৃদ্ধি অতি মহুর গতিতে চলে। কেমন করে এরা সন্তান প্রসব করে, এ প্রশ্নের উত্তর চিরদিনই একটা রহস্য রূপে হয়ে আছে। বৈজ্ঞানিকেরা কেবল এইটুকু জানেন যে, জন্মের পর একটা তিমি-শাবকের দীর্ঘতা সাত আট মিটার পর্যাপ্ত হয় এবং মা তার শাবককে অনেক মাস ধরেই গুত্রদান করে।

যে দুটো শাবক এই ঘটনায় দেখা গেল, তারা যে খুবই অল্প বয়সী তা এর থেকে বেশ বোঝা যায়।

Klekero জাহাজকে এদের সংবাদবার্তা জানালে, হঠাৎ সমুদ্র-জল ভীষণ তোলাপাড় হয়ে উঠল। একটা ভীষণ সংগ্রামের ব্যাপার সকলেই চাক্ষুষ দেখলেন। তিমি দলের প্রায় পঞ্চাশ মিটার উঁচুতে এরোপ্লেন নামল। নোট এক যুদ্ধ বাধল; 'টাইটান'দের যুদ্ধ।

তারপর কোথা থেকে এল এই ‘সাগরের নেকড়ে’ দল—এই করাত মাছ; এরা তিমিদের অতি ভয়ঙ্কর শত্রু। এরা ন’মিটার লম্বা এবং অতিদীর্ঘ দন্তযুক্ত; সাধারণতঃ এরা দলবদ্ধ হয়ে থাকে। এ দলে যে কতগুলো ছিল, তা গণ্য গেল না। এদের জনকুড়ি হঠাৎ মা ও ছার নিকটস্থ একটা তিমি দলের উপর পড়ল। আক্রান্ত তিমির আক্রমণকারীদের চেয়ে তিন-চার গুণ বড় হলেও, এক লেজের ভীষণ বাড়ী ছাড়া অল্প কিছু দিয়ে নিজেদের রক্ষা করবার মত কিছু নেই। পূর্ন কথিত মা-তিমি ও তার দুই শাবককে তিনটে করাত মাছ (espadon) হঠাৎ ঘিরে ফেলে। মার অল্প থেকে, এদের একজন, একতাল মাংস ছিঁড়ে ফেলে, আর বাকী দুজন বাচ্চা দুটোর ঘাড়ে পড়ল। জল তোলপাড়ে ফেনিল হয়ে উঠে হঠাৎ রক্তবর্ণ ধারণ করল; বাচ্চা দুটোর আর কোন চিহ্ন দেখা গেল না; আর তাদের মা, ছুটে পালাতে লাগল, পিছনে রক্তরেখা রেখে, এবং সঙ্গে সঙ্গে অস্বস্তি তিমি যে যেখানে ছিল সে দলে, সকলেই।

Larsenon বললে যে এই করাত মৎস্যদল তিমি মাছের স্ফিঙ্গা-ভক্ষণের লোভে ব্যগ্র হয়ে ছুটে আসে, টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে তাই খায়।

বত ক্রত সম্ভব, তত ক্রতই দলের মোটা দলপতি ছুটে পালাল, কাউকেই আর দেখা গেল না; কেবল জাহাদের অতি নিকটেই, এক ধূসরবর্ণ প্রাণী ভেসে উঠল; সেটা একটা তিমি, সম্ভবতঃ শাবক দুটির মা, বাকি করাত মাছেরা শেব করে গেছে।

Klekerson অশ্রুটধরে বল্লেন, “কতগুলো হাপুন বেঁচে গেল আর কি!”

চারদিন বাদে, Goeta একটা করাত-মাছ ধরেছিল, পাঁচ মিটার লম্বা; এর পাকস্থলীতে চোদ্দটা ছোট সীলমাছ ছিল এবং পনেরটা তখনও গলায় আটকান ছিল। এই মাংসের দলা তার মুখের গ্রাস থেকে বেশ একটু বেশী বড় ছিল বলেই দমবদ্ধ হয়ে এই লোভী জানোয়ারের প্রাণ যায়। সম্ভাব্য এ স্থানের aquatic fauna-র সম্বন্ধেই আলোচনা হচ্ছিল।

মৎস্যজাতির মধ্যে নিঃসন্দেহেই এই করাতমাছ-জাতীয় প্রাণী (espadon) সর্ঙ্গাপেক্ষা ভয়ঙ্কর; তিমি মাছের কথা ছেড়ে দিলে, সর্ঙ্গাপেক্ষা বৃহৎ মৎস্য হচ্ছে Sperm Whale; মাছের দৈর্ঘ্য কখনও কখনও পঁচিশ মিটার পর্যন্ত হয়, এদের দাঁত আছে, তিমির মত whalebone নেই। এই একই বংশে আর এক রকম প্রাণী আছে যার নাম dolphin কিন্তু এরা কখনও দুই তিন মিটারের বেশী বড় হয় না।

বড়ো Sperms বা (Cachalots) মাঝামাঝি করতে খুব ভালবাসে। বিরাট মাথা দিয়ে এরা প্রায়ই শিকারের নৌকা উলটে দেয়; এদের মাথা একটা কিউবের মত, সত্যিকারের পাখরের মত শক্ত; কখনও কখনও মাথা তিন মিটার পর্যন্ত উঁচু হয়।

এই ‘কাশালো’দের মধ্যে একটা, তার সাহস ও ফন্দির জগ্গে আজও বিখ্যাত হয়ে আছে। এর নাম দেওয়া হয়েছিল New-Sealand Tom এ এত বিখ্যাত হয়েছিল যে এর নামে ‘লেজেন্ডের’ সৃষ্টি পর্যন্ত হয়েছিল। এর এত বৃদ্ধি ছিল যে, যে রকমেই আক্রমণ হোক না কেন, সে নিজেই তার থেকে বাঁচাতে জানত এবং পশ্চাদ্ধাবনের জগ্গে যে সব নৌকা পাঠান হোত, সে সব সর্ঙ্গদাই এ প্রাণী ধ্বংস করে দিত। কেবল দশ বছর আগেকার কথা,—জাহাজ Adonis কতগুলো অল্প নৌকা সঙ্গে নিয়ে সকলের সববেত চেঁচায় এই

'কাশালো'-টিকে ধরবার চেষ্টা করে; কিন্তু এদের পূর্বেই, বুড়ো কাশালো এদেরই আক্রমণ করে বসে। কিছুক্ষণের মধ্যে, এ জীবটি ন'থানি নৌকা চূর্ণ করে চারজন লোককে মেরে ফেলে; বাধ্য হয়ে বাকী সব নৌকাকে পালাতে হয়।

সেকালে তবু সংগ্রামটা চলত; 'কাশালো'র জিতবার তবু দু'একটা সুযোগ ছিল, অন্তত: থানিকটে প্রতিরোধ করতে পারত। আর, একালে?—এরোপেন, মেশিন গানের—বিপক্ষে, বোমা বা বৈদ্যুতিক হাণ্ড'নের বিরুদ্ধে, কি করতে পারে সে? এমুণে তিমি শিকার মানে নিরীহ হত্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। বড় রকমের একটা ইণ্ডাস্ট্রি বটে তবে নিষ্ঠুরতার কাজ ছাড়া আর কিছুই নয় এটা; তাছাড়া এটা intransigent, এবং এর স্থায়িত্ব খুবই অল্প দিন, কেননা কয়েক বছরের মধ্যে, না তিমি না 'কাশালো' গ্রীনল্যাণ্ডেই হোক আর দক্ষিণ সাগর সমূহেই হোক, কোথাও থাকবে না। জাহাজের বহলারের ঠাণ্ডা হবার উপায় নেই, এবং কলচালান, rolling-carpetকে সর্কদাই ঘুরিয়ে তার উপর দিয়ে মৃতজন্তু বয়ে নিয়ে যেতে হবে।

মেশিনে মানুষকে খেতে আরম্ভ করেছে; তাই আজ দেড় থেকে দু'একটি লোক কর্মহীন আর এদেশে সাগরের দৈত্যসমূহকেও ধ্বংস করা আরম্ভ করেছে; বছরে চল্লিশ হাজার।

নরওয়ের এই বিরাতাকায় মৎশিকারের সর্কশ্রেষ্ঠ সোসাইটির ডিরেক্টার লেখককে বলেছিলেন, "আমাদের দেশের প্রাধান্ত বজায় রাখবার জন্তে এবং যেসব মূলধন আমাদের একাজে লাগান হয়েছে, আজ কয়েক বছর ধরে, তার ভালরকম ফল আদায়ের জন্ত, আমাদের একারই বছরে পঞ্চাশ হাজার তিমি শিকার করা উচিত।"

এটা সামুদ্রিক জীবনের romance কি?—না, এভাবে এই তিমিশিকার বস্তুটিকে ধরলে চলবে না, কারণ এটা ঠিক অত্যাচার ইণ্ডাস্ট্রির মতই একটি, যাতে মাইনের নামে ভাগ্যা লাভ করা matadors, যাতে এত এরোপেন, এত কলকারখানা, যাতে কেবল মেশিন আর, মেশিন, যাতে বিশেষজ্ঞের দল...

গ্রীনল্যাণ্ডের বরফের ওপর যে সব মেশিন, তা Detroit এর Fordএর কারখানার কম যায় না। মেশিনেরই রাজ্য; আমেরিকা ইউরোপ, এশিয়ার মতই, এমনকি অষ্ট্রেলিয়ার মতই এই উত্তর মহাসমুদ্র প্রদেশ সমূহে mass production এর দেখাচারিত।

অষ্ট্রেলিয়ার অধিবাসীরা, তাদের সংখ্যার অল্পতা ও স্থানের দেশের বিশালতা সত্ত্বেও, পৃথিবীর অত্যাচার অংশের জনতার মতই, নানান কদম্যভায় ভুগছে; শৌভনীতে, বালিনের মতই লোকে না খেয়ে মারা যায়। এবং অষ্ট্রেলিয়াতেও তিমিহত্যার মত নিরীহ জন্তুহত্যার অভাব নেই।

দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ার জাতীয় সম্পদ কিরূপ ভাবে গঠিত, কয়েক হপ্তা ধরে লেখক তা লক্ষ্য করেছিলেন।

অষ্ট্রেলিয়ার দক্ষিণে, গ্রীষ্মকালে, নদী সব শুকিয়ে যায়, গাছপালা সব মরে যায়, এবং জমি অতিরিক্ত উত্তপ্ত হয়। হলদে রক্তবর্ণ প্রাণের স্বর্ধ্য নির্দ্বয়ভাবে সে দেশ পুড়িয়ে দেয় এবং শত শত মাইল ধরে, মনে হয় যেন সব মৃত। গ্রীষ্মের এইরকমই এক অভ্যুত্থান দিনে, লেখক একস্থানে গিয়েছিলেন সেখানে এক জলা ভূমি কৃত্রিমভাবে তৈরী করা হয়েছে। এখানে ত্রিশ সেটিমিটার (প্রায় একফুট) পরিমাণ জল আছে

তাও লবণাক্ত। এই জলাভূমি বুনা খরগোশ আকৃষ্ট করবার জন্মেই স্বজিত।

এস্থান ভারের জালের বেড়া দিয়ে ঘেরা; স্থানে স্থানে, অবস্থা নিছারিত দূরত্বে, শানিকটে করে ফাঁক, ঠিক খেন চূঙ্গীর মত। এই সব চূঙ্গীর দ্বারাই, বড় খাঁচার কাজ করা হয়। *

রাত্রিকালে খরগোশদের স্থান হতে স্থানান্তরে জলসন্ধানে গমনের সূত্রপাত হয়। অতি দূর থেকে, এই প্রাণীরা জুটে এই জলাভূমির দিকে আসে। প্রথমে একটি একটি, পরে দলে দলে এরা আসতে থাকে; ভীষণ তৃষ্ণায় এরা আত্মজ্ঞান হারিয়ে ফেলে। লেখক যেখানে লুকিয়ে ছিলেন, তার এত কাছ দিয়ে এরা যাচ্ছিল যে, তিনি ইচ্ছা করলেই হাতে করে ছুটো চারটে ধরতে পারতেন। এদের দল ক্রমশঃ ঘন সন্নিবিষ্ট হতে লাগল। হাজার হাজার পায়ের খস খস শব্দ ক্রমশঃই বেশ বোধগম্য হতে লাগল।

কাছাকাছি একটা খেঁকশিয়ালী দেখা গেল; এরা ভয় পেয়ে চীৎকার করে উঠল, কিন্তু ভণ্ড জলের দিকে দাঁড়ায় বিরাম নেই। একজন রক্ষক শেয়ালটাকে মেরে ফেললে এবং কিছুক্ষণ মধ্যেই একটা ক্যাঙ্কারকেও তাড়িয়ে দিতে বাধ্য হোল, কারণ সেটা বেড়া ভাঙবার

* তেলচালা চূঙ্গীর যেমন প্রবেশদ্বার অনেক বানি ফাঁক, কিন্তু ক্রমশঃই সঙ্গ হয়ে গেছে, তেমনি এই খরগোশ-ধরা খাঁচার মুখ হয়ে ক্রমশঃ এত সঙ্গ হয়ে গেছে, যে একটিকে করে গিন্নি তারা সেই জলাশয়ে প্রবেশ করতে পারে না; আর একবার প্রবেশ করলে পূরে, ভয়ে তারা এত দিশেহারা হয়ে পড়ে যে, সেই অতি সঙ্কীর্ণ পালাবার পথ খুঁজে পায় না।

নাশার নীচে শিরদাঁড়ার উপর হাতের সজোর বাড়ি বা একটুকরো কাঠের বাড়ি দিয়েই এই কাজ করা হয়। ইতি। অসুবাদক।

চেষ্টা করছিল। এই সময়ের মধ্যে দেখা গেল যে খরগোশদের যেন একটা বিরট নদী বয়ে চলেছে। হাজারে হাজারে ইতিমধ্যেই সেই বেড়া উপরে ভিতরে ঢুকছে।

ভোরের বেলায়, সেই জলের গর্ভ ত্যাগ করে পালাবার চেষ্টা করেও এরা পথ পায় না। মাত্র ছুটো সঙ্কীর্ণ মেঠো পথ হাঙ্গার পর্যন্ত যায়; কাজেই সেই হাঙ্গারের নীচেই অশান্তিদ্বয়ে সেই প্রাণীর দল জড় হয়ে রইল। স্বযোগ্যে এদের হত্যা করার সঙ্কেত হোল।

যখন এরা বেরুবার পথ সন্ধান করছে, তখন চারজন 'গার্ড' সেই ফাঁদে প্রবেশ করে, তাদের ধরে শিরদাঁড়া ভাঙতে আরম্ভ করল। তারপরে ছুড়ে বাইরে ফেলে দিতে লাগল। যে সব trappers বাইরে ছিল, তারা মৃত জন্তুগুলি জড় করে, ছাল ছাড়াতে লাগল। এই হত্যাকাণ্ড, যেকোন বড় ইণ্ডাস্ট্রীর মতই well organised। একজন বিশেষজ্ঞ ঘটায় দেড়গো থেকে দুগো ছাল ছাড়াতে পারে, কানের নীচে একটা ছুরিকাঘাত, আর একটা নীচে থেকে উপর পর্যন্ত বাস,—এ করতে, আঠার থেকে বিশ সেকেন্ডের বেশী লাগে না। Dirk konney যার বাড়ী Lowersএ, ঘটায় চারশো ছালছাড়ানর রেকর্ড রাখে। এ ব্যক্তি অনেক অর্থই রোজগার করে।

প্রথম দলের ছালছাড়ান কাজ যখন চলতে থাকে, তখন প্রথম হাঙ্গার খালি হয়ে গেছে। কাজেই হত্যাকারীরা তখন দ্বিতীয়টিতে প্রবেশ করে, এবং হতজন্তুর সংখ্যা প্রথম খাঁচাতেই পূর্ণ হতে থাকে। হত্যাকাণ্ড ঘটান পর ঘটনা ধরে চলতে থাকে। গণনা করে দেখা গেল যে, এই এক রাতেই চৌদশ' জীব ধরা হয়েছে। ছাল ছাড়িয়ে অবশিষ্ট যা কিছু তা একটা গর্তের মধ্যে ঢেলে বন্ধ জন্তুর থোরাক নিক্ষেপ করা হয়; এদের মাংস সহজে গিয়ে বিক্রী করা পোষায় না।

যে দুহপ্তা লেখক এখানে এসেছেন, তার মধ্যে, Meniubee জেলায় এই রকম ভাবে এক লক্ষ চোদ্দ হাজার ধরা হয়েছে। এই ধরণের শিকার বা এই 'মেকানিকাল' হত্যাকাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়াতে খরগোসদের বংশ ধ্বংস করতে পারে না। এদের চামড়া, দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করে।

১২১১ সাল থেকে আজ পর্যন্ত New Wales রাজ্য এই চামড়ার দৌলতে প্রায় দুকোটি পাউণ্ডে ধনী হয়েছে। মার্চ থেকে অক্টোবর পর্যন্ত, প্রাতি হপ্তায়, দশটা মালগাড়ী ভিন্ন কুলোয়না, এত চামড়া; সিডনী বন্দর থেকে পৃথিবীর সব বেশেই রপ্তানী হয়। এই মহাদেশের যা কিছু রপ্তানী, চামড়া রপ্তানী তার বিশভাগের একভাগ স্থান অধিকার করেছে। কোনও টুপীর কারখানা, তা সে যত দূরেই থাকুক না কেন, অষ্ট্রেলিয়ান এই চামড়া ছাড়া চলতে পারেনা।

অবশ্য গ্রীষ্মকাল ছাড়া খরগোসদের জলের লোভ দেখিয়ে ধরা সম্ভবপর হয়না, কেননা, ইউরোপীয় জীববিশেষের মত, শীতকালে এদেরও জলপানের এমন কিছু বিশেষ ইচ্ছে থাকেনা। তখন এদের ফাঁস দিয়ে ধরা হয়, কিন্তু তাও দৈনিক দেড়শো দুশোর বেশী ধরা যায়না। বাই হোক তখন এদের চামড়ার দাম অনেক বেশীও হয়, কারণ তখন এদের গায়ে শীতকালের লোম থাকে।

'Tasmanic'তে, এখন পাঁচহাজার 'একর' জমিতে খরগোসের ফাশিং হয়।

অষ্ট্রেলিয়ার অস্বাভাবিক অংশে, অনেক পুরস্কার ঘোষণা করে এদের ধ্বংসের ব্যবস্থা চলছে, কারণ ১৮৫২ সালে, যখন এ জাতীয় জীবকে ইংলও থেকে প্রথম আমদানী করা হয়, তখন থেকে আজ পর্যন্ত এরা বংশে এমন আশ্চর্যভাবে বেড়ে উঠেছে যে, সকলের

ধারণা, অষ্ট্রেলিয়াতে এদের ছাড়া আর কারুই বাস করবার মত স্থান নেই।

কেবল এক রাত্রিতে পনেরশো খরগোস মারা হয় এবং এই কার্য অস্বতঃ তিনটি মাস ধরে চলে; তবুও এ জীব এর দক্ষ লুপ্ত না হয়ে যেন ক্রমাগতই বেড়ে চলেছে। New Wales এর আয়ের একটা প্রধান উপায় এরা, কিন্তু অস্বাভাবিক রাজ্য এদের দক্ষ মারা যেতে বসেছে। মেঘ পালন এদের উপায়ে একরকম কঠিন হয়ে যাচ্ছে, কারণ যা কিছু গাছপালা সবই এদের উদরে যায়। এই মহাদেশও যেমন বিরাট ও অস্বতঃ, এখানে যা কিছুই দেখাশোনা যায়, দেশের অস্থাপত্যে ও অস্থায়ী, তারাও তেন্নি বিরাটাকায় ও অস্বতঃ।

মনে তো হয়, এদের সংখ্যার শেষ নেই। প্রায় সমস্ত 'টাসমানি' দেশ এরা অধিকার করেছে; Pessimistরা বলেন যে, এদের আক্রমণের হাত থেকে পৃথিবীর এই অংশের কোন স্থানই বাদ থাকবেনা, এরা অষ্ট্রেলিয়াকে মরুভূমিতে পরিণত না করে ছাড়বেনা। পূর্বাঞ্চলে, ফাদপেতে বারা এই শিকার ধরে, তারা তাদের এই হত্যাকাণ্ডকে নিষ্ঠুরত করবার জগে, নতুন নতুন উপায়োদ্ভাবনের চিন্তা ছাড়া অজ্ঞ কোন চিন্তাই মনে আনেনা। Multon-breederদের যেটা সমূহ বিপদের বস্তু, এদের সেটা ভাগ্যগঠনের এক পন্থা ছাড়া কিছুই নয়।

এই পৃথিবীর মধ্যে কি একটুকরো এমন স্থান নেই যেখানে একটু শান্তি পাওয়া যায়, যেখানকার স্বচ্ছ নীলাকাশ মাছুষকে পৃথিবীর এই সীমাহীন হট্টগোলের কথা ভুলিয়ে দেয়? যেখানে মোটরের শব্দ শোনা যায়না এবং যেখানে মাছুষ তাদের ভীষণ দরকারী কাজের

পিছনে পাগলের মত না ছোটে?—অনেকেই একধা লেখককে 'জিজ্ঞাসা' করেছেন এবং প্রতি নতুন নতুন voyage-এর সঙ্গে লেখক নিজে নিজেই এই প্রশ্নের উত্তর চেয়েছেন।

কোনও স্থানেই কি একটু শান্তি নেই?

১৯২৯ সালে, লেখক সামান্য কিছুদিন বিশ্রামের স্বযোগ পেয়েছিলেন। ইনি সানফ্রানসিস্কোতে একটি মহিলাকে খুঁজে পান, যাকে ইনি অনেক দিন থেকেই ভালবাসতেন এবং যাকে দেখবার জেতে ইনি বড়ই উৎসুক হয়েছিলেন। যে স্বপ্নজাল এদের মধ্যে রচিত ছিল, তা সার্থক হয়েছিল এখানেই এবং এঁরা একসঙ্গে দক্ষিণ সমুদ্রে যাত্রা করেন।

পাটকিলে গাং শালিকের তীক্ষ্ণ চিঠি এবং সামুদ্রিক টগলের আহ্বান ধ্বনি শোনা যেতে লাগল। রক্তবর্ণ বকজাতীয় পক্ষী (aigrette) তীরে স্বর্গক্ষে পদক্ষেপ কচ্ছে; রৌপ্যস্তম্ভ মস্তম্বল লাকাচ্ছে; চোখ ধাঁধান তীব্র আলো lagoon পর্য্যন্ত প্রসারিত। কয়েক হস্তার শান্তি, তার পরেই লৌহের পর্ত্ত; এসব পাছাড় ঘেন মর্চে ধরা রাখের; স্ব-উচ্চ চূড়ায় মেঘসকল বাধা পায়, কাজেই এখানে সর্বদাই মূলধারে বৃষ্টি।

Eluia উপসাগরে, Ariane জাহাজ নঙ্গর করলে।

মধ্যম সম বিহৃত অরণ্যের মধ্যে মধ্যে, শত শত স্থানে ফাঁকা। রক্তবর্ণ মাটি সে সব ফাঁকের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে গাছপালাহীন হয়ে উল্লঙ্ঘ্য ধারণ করেছে। খেতকাষরা এখানে তামা, রূপা ও সোনার সন্ধানে এসে সমস্ত অরণ্যই তোলপাড় করেছে, তাই স্থানে স্থানে এই অরণ্য-মধ্যমলে ছিল।

এদেশীয় অধিবাসীরা সর্বপ্রাথমিক খেতকার মানবদের ছায়া থেকে

অতি আশ্রয় ভাবেই দূরে থাকতে চায় কারণ এদের তাতে কোন স্বার্থই নেই; দূরে থেকে যদি exploitation-এর হাত থেকে বাঁচে—এই ভাব আর কি?

প্রায়ই লেখকরা কাছিম শিকারে এদের সঙ্গে যোগ দিতেন; Tahitianরা বড় বড় তালগাছে-বানরের-মত আঁকড়ে উঠত এবং ভীষণ উত্তপ্ত পাখরের উপর বসে তাদের ভোজন করত।

জীবন বেশ হেসে খেলে, আনন্দে ও মুক্তভাবেই কেটে যাক্ছিল। কখনও কখনও পর্ত্তে চড়ে দেখা হোত যে যেসব খনি নিঃস্র করা হয়ে গেছে, তাদের সব চিমনীগুলো এখনো তাদের কাজের নিরীক্ষিত সাক্ষ্য দিচ্ছে। আগুন লেগে পুড়ে-যাওয়া কুটারসকল এবং অত্যাচারের হাতে বিপর্য্যস্ত আবাদসকল পড়ে আছে। একটা উপত্যকার উপর থেকে দেখা যেত যে, তার কিনারা দূরে, কুম্বাসায় মিলিয়ে গেছে। জমি সেখানে ক্রমবর্ধ, যেন ভয়ে ঢাকা। এতদিন ধরে কেবল সাগর আর বাতাসে দোলা তালফুল। অসংখ্য শ্রোতবৃত্তী, বিরাটাকায় চিহ্নবিচিহ্ন প্রজাপতি আর মূল্যবান হীরকাদি প্রস্তরের মত নানারঙে রং করা সব সুন্দর সুন্দর ছোট ছোট পাখী, ইত্যাদি দেখে লেখকের নিশ্চয়ই অকুচি ধরে গিয়েছিল, তাই তিনি সবাদ্বন্দ্বী মক্কুমির মধ্যে ঘুরে বেড়িয়ে দিনগুলোর একঘেয়েমি কাটাতেও কল্পন্ব করেন নি।

একটা হ্রদ, তার জল সীসের মত ধোঁয়াটে; চারিধারে লোহা তার মর্চে ধরা রং ছড়িয়ে দিয়েছে। লোহার বড় বড় রক ও ক্রোমের চাপড়ও সব তীরের উপর ছড়ান। শোনা যায় পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা মূল্যবান খনির স্তর এখানে পাওয়া যায়, কিন্তু হলে হবে কি, এস্থানের দূরত্বেই সব মাটি করে দিয়েছে।

প্রসঙ্গ কথা

শনিবারের চিঠির আধিন ও কান্তিক সংখ্যায় ঋণ কৃত্য—নামক নাটক সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে, (নাটকখানি পৃথক পুস্তকাকারেও বাহির হইল)। অভিনয়ের জ্ঞান আমাদের রঙ্গালয়সমূহে নিয়মিতরূপে নূতন নূতন নাটক পাওয়া যায় না, এরূপ শুনা যায়। তাই নিরুপায় হইয়া রঙ্গালয়-কর্তৃপক্ষগণ পুরাতন নাটক বা পুরাতন গল্পের নূতন নাট্যরূপে স্টেজে অভিনয় করাইয়া থাকেন। ইহার কারণ, অভিনয়-উপযোগী নূতন নাটক লেখার লোক বাংলাদেশে বেশি নাই। উপন্যাস-ক্ষেত্রে বাহারী নাম করিয়াছেন, এবং বাহাদের স্ব-সাহিত্য সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা আছে, তাহার সাধারণত নাটক লেখেন না। ইচ্ছা করিয়া লেখেন না, ঠিক তাহা নহে; নাটক লিখিবার বিজ্ঞা তাহাদের নাই বলিয়াই লেখেন না। হয়ত এমন লেখকও দুই একজন আছেন বাহারী ইচ্ছা করিলে সত্যই লিখিতে পারেন, কিন্তু ইচ্ছা করেন না। তাহার কারণ এই যে, নাটক লিখিলে উপন্যাসের মত সাধারণে তাহা বিক্রয় হয় না, স্বতরাং তাহার অভিনয়-মূল্য পাইবার জ্ঞান বিশেষ করিয়া রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষগণের উপর নির্ভর করিতে হয়। এইরূপ নির্ভরতার অর্থ, অহনয়, বিনয়, ভিক্ষা, তিত্তীকা, খোসামোদ প্রভৃতি।

গ্রন্থকার এতগুলি সঙ্গুণের রীতিমত উৎকর্ষ সাধন করিলে তবে হয়ত তাহার নাটক অভিনয়ের জ্ঞান গৃহীত হইতে পারে। আমি অবশ্য উৎকৃষ্ট নাটকের সম্পর্কেই বলিতেছি। নাটকের টেকনিক,

কর্ম এবং ভাষা বাহ দিয়া নাটক অনেকের লিখিতে পারেন এবং লিখিয়াও থাকেন। এই ধরণের বই চাটুকারের যাবতীয় গুণে মণ্ডিত হইয়া প্রতিনিয়তই রঙ্গালয়-কর্তৃপক্ষের পদতলে নুত্তিত হইতেছে, এবং মাঝে মাঝে তাহা পাদদেশ হইতে পাদপ্রদীপের দেশেও উত্তীর্ণ হইতেছে, কিন্তু বঙ্গরঙ্গমঞ্চ তাহাতে গৌরবমণ্ডিত হইতে পারিতেছে না।

নিয়ন্ত্রণের স্থলরসাত্মক এবং সাধারণ-গ্রাহ্য বহু নাটক বঙ্গরঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়, এবং তাহাতে বেশ আয়ও হয়। অপরপক্ষে অতি উচ্চাঙ্গের এবং একমাত্র রসিকজনগ্রাহ্য নাটক কদাচিৎ অভিনীত হয়, কারণ এরূপ অভিনয়ের দর্শকসংখ্যা অতি অল্প, তাহাতে অভিনয়ের মজুরী পোঁষায় না। ডাকঘর, গৃহ-প্রবেশ, রক্তকরবী, প্রভৃতি এই শ্রেণীর। ইহার এক ধাপ নীচে আসিয়াছে চিরকুমার সভা, শেষরক্ষা প্রভৃতি। এই জ্ঞান এই নাটকগুলি অভিনয় হিসাবে অপেক্ষাকৃত অধিকতর সাফল্য লাভ করিয়াছে। কিন্তু নূতন নাটকের অভাবে স্টেজে ইহাদেরও মূল্য অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে। একই জিনিষের পুনরাবৃত্তি বেশি দিন চলে না। দর্শক ইহাতে বিরক্ত হয়। জীবনের অগ্ৰাচ্ছ ক্ষেত্রে যেমন, অভিনয়ের ক্ষেত্রেও তেমনই বৈচিত্র্য না থাকিলে কোন বস্তুরই যথার্থ মূল্য আমরা দিতে পারি না।

বাংলা ভাষায় সাধারণত যে সব নাটক লেখা হয়, প্রায় সর্ব ক্ষেত্রেই তাহার মধ্যে প্রুট এবং ঘটনাবৈচিত্র্যই লেখকদের একমাত্র অবলম্বন। কথোপকথনের ভাষার ভিতর কোনো বিশেষ রস তাহাতে থাকে না এবং অভিনেতার কণ্ঠের স্বরগ্রামের উপর তাহার সমস্ত সার্থকতা নির্ভর করে।

সুতরাং অভিনয় না দেখিয়া শুদ্ধমাত্র বইখানা পড়িয়া গেলে কোন রসিকই তাহাতে মুগ্ধ হইতে পারেন না। নাটক যে দৃশ্য-কথা, ইহা অদ্বন্দ্বিত। অভিনেতার কিবা অভিনেত্রীর উচ্চারণের ভঙ্গির উপর দৃশ্যকাব্যের কলাকল অনেকখানিই নির্ভর করে একথা সত্য, কিন্তু তাহার ভাষার মধ্যে যদি এক বিন্দু রস না থাকে তাহা হইলে সে ভাষার নাটক, (নাটকে প্রচুর ঘটনাবৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও) রসিক সমাজে অচল বলা চলে।

অভিনয় আরম্ভ হইতে না হইতে ফৌস ফৌস করিয়া দর্শক কাদিতে পারে, কিবা চীৎকার করিয়া হাসিয়া কাহাকেও কিছু শুনিতে না দিতে পারে, কিবা তালি দিয়া কান ঝালাপালা করিয়া দিতে পারে, কিন্তু তথাপি নাটকের বার্থ বিচার তাহাতে হয় না। অভিনয়ের ভিতর কল্পাদায়গ্রস্ত পিতা আত্মহত্যা করিল, তাহা দেখিয়া কল্পার মাতা আত্মহত্যা করিল, পুত্রেরা আত্মহত্যা করিল, এবং অবশেষে কল্পা আত্মহত্যা করিল, ইহা দেখিয়া শোকে কোনো দর্শকও আত্মহত্যা করিতে পারে। কিবা বারাদনা একটি সচ্চরিত্র যুবককে প্রলুব্ধ করিতে আসিয়াছে—যুবক তাহা বুঝিতে পারিয়া “মা,—সন্তানকে ক্ষমা কর” বলিয়া ঠেঙে হাটু গাড়িয়া বসিলে দর্শকগণ হাততালি দিয়া রত্নমঞ্চ কাঁপাইয়া দিতে পারে। ইহা শব্দা সেক্সিমেন্ট। কোনো ক্ষমতাবান লেখকই এরূপ প্রট বা ভাষাধারা তাহার নাটককে কলঙ্কিত করিতে সাজি হইবেন না।

আধুনিক বঙ্গরত্নমঞ্চের উপযুক্ত নাট্যকার এক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরেই নাম করিতে হয় রবীন্দ্রনাথ মৈত্রেয়। তাহার ‘মানময়ী

গার্লস্‌ স্কুল’ নামক নাটকখানি ১৩৩৯ সালের আশ্বিন ও কাশিক সংখ্যা শনিবারের চিঠিতে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই নাটকে আমরা সুদীর্ঘকাল পরে প্রকৃত হিউমারের সাক্ষাৎ পাই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বৈকুণ্ঠের খাতার বৈকুণ্ঠের চরিত্রে এবং চিরকুমার সভার চন্দ্রনাথের চরিত্রে যে গুণ থাকায় এই নাটকগুলি প্রকৃত হিউমারের পথ্যায়ে স্থান পাইয়াছে, রবীন্দ্রনাথ মৈত্রেয় মানময়ী গার্লস্‌ স্কুলের নায়ক-নায়িকার চরিত্রেও সেই গুণ সংযোগে মানময়ী গার্লস্‌ স্কুল আধুনিক যুগের একখানি শ্রেষ্ঠ হাস্যরসাত্মক নাটক হিসাবে পরিগণিত হইতে পারিয়াছে। নাটকখানি কন্ম, টেকনিক, বিষয়বস্তু এবং ভাষা, সকল দিক হইতেই সার্থকতা লাভ করিয়াছে। শিক্ষিত কচির পক্ষে ইহা অপেক্ষা বেশী আর কিছু প্রয়োজন নাই। শরৎচন্দ্রের দত্তা নামক উপন্যাসে প্রচুর নাটকীয় গুণ ছিল বলিয়া ‘বিজয়া’ নাটক সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু ইহার রুচি সর্বত্র খুব মাজ্জিত নহে। ইহার অর্থ ইহা নহে যে ইহার ভিতর অশ্লীলতা আছে। অশ্লীলতা কিছুই নাই, ভাল্গারও কিছু নাই, কিন্তু ইহার ভিতরকার অনেক যুক্তিমূলক কথাবার্তা শিক্ষিত মনকে স্পর্শ করে না। ইহা বিশেষ করিয়া নিম্ন শ্রেণীর দর্শকদের জ্ঞান রচিত। বিলাস যেক্ষণ বার্থ, শেষ দৃশ্যের বিবাহের ব্যাপারটিও তেমনি একেবারেই বার্থ। বিজয়া ও নরেন্দ্রকে গোপনে বিবাহ দিয়া তাহাদের সমস্ত স্বাদীন এবং তেজস্বী প্রকৃতিতে অপমানিত করা হইয়াছে। তদুপরি ত্রাণ বিবাহ বড় কি হিন্দু বিবাহ বড়, এইরূপ একটি তুলনামূলক অবাস্তব যুক্তিহীন বক্তৃতা শুধু যে হাস্যকর তাহা নহে, ইহা লেখকের রুচি ও পরিমাণ-জ্ঞানের উপর দর্শকের সন্দেহ জন্মাইয়া দেয়।

অশিক্ষিত গ্রাম্য লোক যে-জাতীয় যুক্তি ঠেঙে শুনিতে ভালবাসে শরৎচন্দ্রের এই বক্তৃতা সেই জাতীয়। মানময়ী গার্লস স্কুলের নাথক যদি হিন্দুধর্ম বড় কি খ্রীষ্টানধর্ম বড়, অথবা হিন্দুবিবাহ বড় কি খ্রীষ্টানবিবাহ বড় এইরূপ বক্তৃতা দিত, তাহাতে হয়ত তাহাদের মিলন আরও সুবিধাজনক ভাবে ঘটিতে পারিত অথবা উক্তরূপ মর্যাল লেকচার দ্বারা দর্শকের চমক লাগানো যাইত। কিন্তু দত্তার লেখক এবং মানময়ী গার্লস স্কুলের লেখক একব্যক্তি নহেন; এবং এই থানেই নাটকের গুণের পার্থক্য এবং লেখকের ক্ষমতার বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে।

শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ বিশ্বীর প্লগং কৃদ্বা—রসের বিচারে আধুনিক যুগের একখানি শ্রেষ্ঠ নাটক বলিয়া বিবেচিত হইবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্লগং কৃদ্বা ট্রাজিক চরিত্র আছে বটে কিন্তু সে ট্রাজেডি জীবন-সংগ্রামের ট্রাজেডি নহে। বৃদ্ধ সুরদাসবাবুর বক্তৃতা শুনাইবার যৌক, এবং সে বক্তৃতা শুনিবার লোকাভাব, আমাদের মনে বেশি না হইলেও কিছুপরিমাণ অহুকপ্পা জাগায়। মানময়ী গার্লস স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত বেকার যুবক-যুবতী অসমসত্তা সমাধানের জ্ঞান মরীয়া হইয়া যে প্রথায চাকরি গ্রহণে রাজি হইল তাহার ভিতর রহিয়াছে বাঙালীর জীবন-সংগ্রামের একটি করুণ চিত্র। মানময়ীর হাস্যরস করুণরসেরই একটি দিক। এখানে বাস্তব জীবনই শিল্পের বিষয় এবং শিল্পীর প্রেরণা। মানময়ীর সহিত প্লগং কৃদ্বার পার্থক্য এইখানে। কিন্তু প্লগং কৃদ্বার প্রেরণা বিশুদ্ধ শিল্পহস্তির প্রেরণা। শিল্পীর আঁট এখানে মানবচরিত্রকে আশ্রয় করিয়া বিকশিত হইয়াছে। প্রেমের (ও কিছুপরিমাণ ঋণের) সমস্তা ছাড়া অজ্ঞ কোনো সমস্তা ইহাতে নাই। স্তবরাং প্লগংকৃদ্বা—

রসের দিক দিয়া চিরকুমার সভা, বৈকুণ্ঠের খাতা বা শেষরক্ষার সহিত তুলনীয়।

এই নাটকে, প্লগং শোধের একটি অভিনব কৌশল শিখাইবার জ্ঞান একটি স্কুলের দৃষ্ট লিখিত হইয়াছে। সমগ্র নাটকখানির পক্ষে এই স্কুলটি অত্যাশঙ্ক না হইলেও বাহাতে সনৎকুমারের চরিত্রের একটি দিক অস্তুত এই স্কুলটির সম্পর্কে প্রকাশ পাইতে পারে সেই ভাবে ইহা স্থাপিত। নানাদেশের দেউলিয়া, ব্যাক-মার, এবং খাতক এই স্কুলের ছাত্র। এই দৃষ্টটির পরিকল্পনায় লেখক অদ্ভুত চাতুর্যের পরিচয় দিয়াছেন। তবে সমগ্র বই সঞ্চদে যেমন, এই দৃষ্টটিতেও তেমন, পাঠক বা শ্রোতা বা দর্শক হাসিবেন কিনা বলা শক্ত। চিরকুমার সভা বা শেষ রক্ষায় বাহারা একবার হাসিয়াছেন, তাহারাই যে হাসিবার জ্ঞান এই বই অভিনীত হইলে পুনরায় দেখিতে আসিবেন, তাহা জোর করিয়া বলা যায় না। আবার অভিনয়ের অপেক্ষা না করিয়া বাহারা রসসাহিত্য হিসাবে পাঠ করিবেন তাহাদের হাসিবার প্রবৃত্তি ঠিক কিসে জন্মে তাহাও জানি না। আমাদের শুধু ইহাই বক্তব্য যে প্লগং কৃদ্বা বঙ্গরঙ্গমকের পক্ষে একখানি মূল্যবান নাটক এবং মানময়ী গার্লস স্কুলের পরে একরূপ বই আর বঙ্গভাষায় বাহির হয় নাই।

এই মাত্র আনন্দবাজার পত্রিকায় যে সংবাদটি পাঠ করিলাম, তাহা এই—

সুনীতিবাবুর নামে জুয়াচুরির চেষ্টা

নাটোরের মহারাজাকে টেলিফোন

এরূপ জানা গেল যে, কিছুদিন যাবৎ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নাম করিয়া কলিকাতার কে বা

কাহারও সহরের বড় বড় ধনী ব্যক্তির নিকট আর্থিক সাহায্য চাহিয়া ফিরিতেছে। গত ১৯শে নবেম্বর একত্র এক জুম্মাচোর নাটোরের মহারাজার নিকট দুইবার টেলিফোনযোগে সুনীতিবাবুর নাম করিয়া আর্থিক সাহায্য চাহিয়াছিল। প্রকাশ যে কেবল টেলিফোনে নহে, একজন লোক সশরীরে নাটোরের মহারাজার নিকট গিয়া উপস্থিত হইয়াছিল; লোকটি দেখিতে হিন্দুস্থানী নিম্নশ্রেণীর মত। তাহার নিকট এক কাগজের টুকরায় সুনীতিবাবুর নামীয় আর্থিক সাহায্যের আবেদন ছিল। কিন্তু মহারাজার সন্দেহ হওয়ায় তিনি সুনীতিবাবুর নিকট সংবাদ লইয়া জানিতে পারেন যে, ব্যাপারটা সম্পূর্ণ জুয়াচুরি মূলক; তিনি কোনও লোককে কাহারও নিকট টাকা চাহিবার জ্ঞান পত্র দেন নাই কিংবা কোনপ্রকার অহরোধ করেন নাই। শ্রীযুক্ত সুনীতিসুয়ার চট্টোপাধ্যায় অতঃপর এই বিজ্ঞপ্তির দ্বারা সকলকে অহরোধ করিতেছেন যে, কেহ তাহার নাম করিয়া টাকা চাইলে যেন তৎক্ষণাৎ পুলিশে সংবাদ দেওয়া হয়।

হয়ত জুয়াচুরি। হয়ত সুনীতিবাবুর জবানিতে নিজের সার্টফিকেট নিজেই লিখিয়া লইয়াছে। কিন্তু এমনও হইতে পারে যে সত্যই কোনো মহাপুরুষ সুনীতিবাবুর আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি করিবার জ্ঞান আন্তরিক ভাবে এই চেষ্টা করিতেছেন। টাকা সংগ্রহীত হইলে উক্ত মহাপুরুষ বা তাহার সন্তান হয়ত সে টাকা আত্মসাৎ না করিয়া সত্যই সুনীতিবাবুর হাতেই দিবেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, উক্ত মহাত্মা সুনীতিবাবু সম্বন্ধে কিছু ভুল করিয়াছেন। সুনীতিবাবু যে ঠিক সাহিত্য-জীবী নহেন, বিজ্ঞানজীবী, তাহা তাহার জ্ঞান উচিত ছিল।

সাহিত্যিকেরাই আমাদের দেশে দুঃস্থ, মহারাজারিগের নিকট হইতে যদি কিছু সংগ্রহ করিতে হয়, তাহাদের জ্ঞানই করা উচিত, বিজ্ঞানজীবীর জ্ঞান নহে।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রকাশ সভায় বলিয়াছেন, সাহিত্যিকেরা দারিদ্র্যে নিপেষিত। সুনীতিবাবু ঋণহীন জুম্মাচোর বলিয়াছেন, এবং আমরা ঋণহীন মহাপুরুষ বলিতেছি, তিনি নিশ্চয়ই সেই সভায় বসিয়া শরৎচন্দ্রের বক্তৃতা শুনিয়াছেন। তাই এই দরদ। কিন্তু উক্ত মহাত্মন এত প্যাঁতনামা ব্যক্তি থাকিতে সুনীতিবাবুকেই বাছিয়া লইলেন কেন? মনে হয়, অজ্ঞের নিকট যে সব সাহিত্যিক বার বার চাঁদা চাহিয়াছেন, বা অন্য উপায়ে অর্থসংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাদের নাম করিলে বিশেষ সুবিধা হইত না, ধনী ব্যক্তিমাঝেই তাহাদিগকে চেনেন। বোধ হয় প্রার্থী হিসাবে কিংবা প্রার্থীর টেপ্টিমোনিয়ালদাতা হিসাবে সুনীতিবাবুর নাম এখনও কলঙ্কিত হয় নাই বলিয়াই তাহার নামের 'গুডউইল' আছে, এবং দেখা যাইতেছে সেটা এ বাজারেও বিক্রয় করা চলে।

জাপান হইতে কবি যোনেজিরো নোগুচি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বানে কলিকাতা আসিয়াছেন। এদেশে পদার্পণ করিয়া তিনি সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদিগকে বলেন, “আমি শিথিতে আসিয়াছি, শিখাইতে আসি নাই। সন্তান তাহার মাতাকে শিখাইতে পারে না।”—(প্রবাসী, অগ্রহায়ণ) একথায় মাতা লজ্জিত হইবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষের কবি রবীন্দ্রনাথ, এবং শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ বৌদ্ধ সংস্কৃতির মতই এদেশে বিশেষ কোনো প্রভাব বিস্তার করিতে পারিলেন না। যে অক্ষমের দল ইহাদিগকে

অহুসরণ করিল, তাহাদিগকে যথাসময়ে বিভাঙিত করিতে পারিলে হয়ত সফল ফলিতে পারিত, কিন্তু সাহিত্যে এবং শিল্পে অহিংসা ধর্মের দ্বারা কোনো ফলই আশা করা যায় না। রবীন্দ্র-অবনীন্দ্রের পরবর্তী যুগ বৌদ্ধতান্ত্রিকের যুগ—অনাচারের যুগ; অথচ বুদ্ধগণ স্বয়ং জীবিত থাকিতে ইহা সম্ভব হইল। স্তত্রায় নোঙতি, বুদ্ধগয়ার মন্দির দেখিয়া যে শিক্ষা লাভ করিবেন, রবীন্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথকে দেখিয়াও সেই শিক্ষাই লাভ করিবেন। অর্থাৎ কোনো শিক্ষাই লাভ করিবেন না, শুধু বিশ্বব্যবস্থার দৃষ্টিতে দেখিবেন মাত্র। ইহারা যুগের বিশ্বব্যবস্থার শিক্ষক নহেন।

সৌন্দর্য এবং প্রকৃতি-পূজা, শিল্পরচনা, আতিথেয়তা, বিনয়, সৌজত্ব, সকল দিক দিয়াই জাপান ভারতবর্ষ হইতে বড়। (কবির সম্পর্কে বাণিজ্যের প্রশ্ন তুলিলাম না।) তাহা হইলে, কবি কি শিখিবেন বলিয়া আশা করেন? বাংলাদেশে ধাঁহারা বর্তমানে কবি-প্রসিদ্ধি লাভ করিতে চাহিতেছেন, তাহারা ভাঙা-চন্মে, অবোধ্য ভাষায়, বিদেশী কবিতা অহুসরণ করিতেছেন, আর কিছুই করিতেছেন না। শিল্পীগণ সাধারণ ডুইং-এর মূলতত্ত্ব কিছুমাত্র না জানিয়া মাসিক পত্রের আশ্রয়ে শিল্পী নামে বিজ্ঞাপিত হইতেছেন। প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া কোনো-রকমে একটি অর্ধ-নগ্ন নারীমূর্তি খাড়া করিয়া রবীন্দ্রনাথের কবিতার কোনো একটি ছত্র তাহার নীচে বসাইয়া দিতে পারিলেই পরিশ্রম সার্থক মনে করিতেছেন। প্রকৃতি-পূজার প্রকাশ হইতেছে, সিনেমায়। ছবির মধ্যে কোনো একটি স্থানে প্রাকৃতিক দৃশ্য থাকিলেই চটাপট হাততালি দিয়া সৌন্দর্য-জ্ঞানের পরিচয় দিতেছে। ইহা হইতে কবি যদি কিছু শিক্ষা গ্রহণ

করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাকে আমরা কবি না বলিয়া বীর বলিব।

সম্প্রতি 'বৃহত্তর' বিশেষণটি ভারতবর্ষ ও বঙ্গদেশ নামক বিশেষত্ব সহিত যুক্ত হওয়াতে কিছু গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছে। ভারতবর্ষের কথা ছাড়িয়াই দিলাম। বঙ্গদেশের সম্পর্কে 'বৃহৎ' বিশেষণটি ব্যবহৃত হয় না, অথচ একটি-খাপ বাদ দিয়া বঙ্গদেশ, বৃহত্তর বঙ্গে পরিণত হইল কি উপায়ে তাহা বুঝা কঠিন। খুব সম্ভব, বৃহৎ হইতে বৃহত্তর না পৌছিয়া, বৃহত্তর হইতে বৃহতে পৌছিবার কৌশল ইহাতে আছে। কিন্তু যাহাই থাকুক, শব্দটি যদি বিশেষ্য করিয়া বিশেষণ হিসাবেই ব্যবহৃত হইত, তাহা হইলে কোনও ক্ষতি ছিল না; কিন্তু যদি কখনও শব্দটির অর্থ কার্য্যত উপলব্ধি করিতে হয়, এবং বঙ্গের বাহিরে যেখানে যেখানে বাঙালী আছে, বা বাঙালীর কীর্তি আছে, সেই স্থান সমূহকে যদি যথার্থই বৃহত্তর বঙ্গ বলিয়া বিশ্বাস জন্মে, তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত পুরাতন, 'প্রবাসী'-নামক বিশেষণটিকে বাদ দিতে হয়। বর্তমানে বঙ্গের বাহিরের বাঙালী, প্রবাসী-বাঙালী নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। কিন্তু 'বৃহত্তর'কে মানিতে গেলে 'প্রবাসী'র অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়। স্তত্রায় আমাদের পক্ষে 'প্রবাসী'কে উপেক্ষা করিয়া 'বৃহত্তর'-এর পক্ষপাতী হওয়াই বাঞ্ছনীয়। বঙ্গদেশ যদি বঙ্গদেশের বাহিরেও থাকে, যেমন বিহারে যদি বঙ্গদেশ থাকে, কিংবা যুক্তপ্রদেশে যদি বঙ্গদেশ থাকে, তাহা হইলে তত্ত্ব স্বানের বাঙালীগণ প্রবাসী-বাঙালী কিরূপে হইতে পারেন, তাহা বুঝিতে পারি না। বৃহত্তর বাঙাল্য বৃহত্তর বাঙালী থাকিবেন, প্রবাসী-বাঙালী থাকিবেন না। অথচ দেখা যায়, প্রবাসী-বাঙালীই থাকেন। ইহাতে প্রমাণ

হয়, বাংলাদেশের বাহিরে বাংলাদেশের অস্তিত্ব কেহই স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন।

কিন্তু আমরা বঙ্গদেশের বাহিরে বঙ্গদেশ থাকা সম্ভব বলিয়া বিশ্বাস করি, হুতরাং বৃহত্তর বাঙালীর অস্তিত্বও মানি। কিন্তু এত স্পষ্ট একটি ঘটনাকে বিশ্বাস করা ইহার জ্ঞাত বৃহত্তর বঙ্গ নামক প্রতিষ্ঠান বা সমিতি গঠন করার মতলব সত্ত্বেও ঐ স্থানের বাঙালীগণ প্রবাসী-বাঙালী হইয়াই রহিলেন, এবং ঐ নামের জোরেই আদি বঙ্গদেশের কানে-কানে আপনার প্রবাস-ব্যথা নিবেদন করিয়া কিঞ্চিৎ অসুস্থকম্পাও আকঙ্ক্ষা করিতে লাগিলেন। বৃহত্তর বাঙালীর পক্ষে ইহা বড়ই লজ্জাকর। মনে হয়, ইহার জ্ঞাত দায়ী শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। তিনিই প্রবাসী নামক মাসিকপত্র প্রচার করিয়া এমন ইচ্ছিত করিলেন যে শুধু-যে বঙ্গদেশের বাহিরের বাঙালীই প্রবাসী তাহা নহে। আদি বঙ্গবাসীও প্রবাসী। রামানন্দবাবু হিতবাদী হইতে পারেন, কিন্তু তাহার বাক্য মনোহারী নহে। কারণ বঙ্গবাসীমাজেই প্রবাসী হইলে দেশে তাহার স্থান স্ভাব্যতাই থাকে না। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে বাঙালী মাজেই প্রবাসী-ধর্মে দীক্ষিত হইয়া তথাকথিত প্রবাসী-বাঙালীর সহিত কুটুম্বিতা কামনা করিতেছে।

তাহা হইলে কলিকাতা-বাসী ঢাকা শহরে বাস করিয়া “প্রবাসী কলিকাতাই” কিংবা ঢাকার লোক কলিকাতা বাস করিয়া “প্রবাসী-ঢাকাই” নামও গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু ইহাতে কিছু লাভ নাই। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন বঙ্গবিভাগ হয়, তখন বাঙালীর মধ্যে একবার একত্ববোধ জাগিয়াছিল। বাঙালী এবং বাংলা দেশ যে এক, ইহাকে

যে পৃথক করা যায় না, ইহা ত তখন আমরাই প্রচার করিয়াছিলাম। কিন্তু প্রচার করিবার পূর্বে সত্যই যে এক ছিল তাহা নহে। পশ্চিম-বঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের মধ্যকার পার্থক্য বহুপূর্বে হইতেই রহিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের লোক, পূর্ববঙ্গের লোককে বাঙাল বলেন; এবং পূর্ব-বঙ্গের লোক, পশ্চিমবঙ্গবাসীকে বাঙাল বলেন। কিন্তু ইহার কোনটারই কোনও অর্থ নাই। নেহাৎ না বলিলে চলে না তাই যে কোনও একটা শব্দকে বাছিয়া লওয়া হইয়াছে।

ভাড়া-বাংলা জোড়া লাগিয়াছে, কিন্তু পদ্মার প্রশান্ততা কিছুমাত্র কমে নাই। মাঝখানে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ভাড়া-জিনিসকে ভাঙিতে গিয়া অপ্রস্তুত হইয়াছেন।

কিন্তু লর্ড কার্জন যাহা করিতে পারেন নাই, বাঙালী নিজেই তাহা পরিপাটীরূপে সম্পন্ন করিয়াছে। পূর্ববঙ্গের লেখকগণের (যাহারা লেখেন তাঁহারাই লেখক) কেহ-কেহ বাংলা ভাষাকেও দুইভাগে ভাগ করিতেছেন, এবং ব্যবসায়ীগণ তাঁহাদের সহকারীরূপে কলিকাতার পথে পথে “ঈষ্টবেঙ্গল” নাম দিয়া নানা রকম দোকান খুলিতেছেন। ঈষ্টবেঙ্গল খাবারের দোকান, ঈষ্টবেঙ্গল কাপড়ের দোকান, ঈষ্টবেঙ্গল ষ্টেশনারি দোকান!

মনে হয়, বাঙালী বঙ্গ-ভঙ্গ রদ করিবার জ্ঞাত যে আন্দোলন করিয়াছিল তাহার মধ্যে একটি ছিল। E. B. Railway (পূর্বে E. B. S. R.)-এর মধ্যে গভর্নমেন্ট কৌশলে পূর্ববঙ্গের নামটি রক্ষা করিলেন, বাঙালী তখন সে দিকে জুক্ষেপও করিল না, ফলে ‘ঈষ্টার্ন বেঙ্গল’, ঈষ্টবেঙ্গলকে প্রকৃতপক্ষে পৃথক করিয়াই রাখিল।

ইহার পরিণাম অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে। বর্তমানের ঈষ্টবেঙ্গল শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতেই আরম্ভ! অর্থাৎ এই চরিত্র পরগণা জেলার একটি বিশিষ্ট অংশ এখন পূর্ববঙ্গের অধীন। বাহারা শিয়ালদহ ষ্টেশন হইয়া বাড়ী যান, তাঁহারা যে সকলেই বাঙাল নামে পরিচিত একথা সকলেই জানেন।

কিন্তু ‘প্রবাসী’-বাঙালীর এরূপ কোনো উচ্চাশা এখনও প্রকট হইয়া উঠে নাই, বরঞ্চ তাঁহারা যে-কোনও একটা উপলক্ষ পাইলেই আদি ভূমির সহিত মিলিত হইবার জন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠেন, এবং সাহিত্য-সম্মিলন এই মিলনের সেতু বাঁধিয়া দেয়। কিন্তু এই প্রকার সম্মিলনের নাম সাহিত্য-সম্মিলন কেন হইল তাহা বুঝা যায় না! ভাষা-সম্মিলন বলিলে বোধ হয় অধিকতর শোভন হইত। সমস্ত বাঙালীকে এক করিতে পারে ভাষা, তা সে ভাষায় বিজ্ঞানই আলোচিত হউক আর ইতিহাসই আলোচিত হউক। বাঙালীর পক্ষে ভাষার বন্ধন ছিন্ন করিয়া যাওয়া যে কি ভয়াবহ তাহা বৃহত্তর বঙ্গে বাস করিয়া বাঙালী বুঝিতে পারিয়াছে। চাটুজ্জে যখন চাটুরজা হইয়া সঙ্গীক হঁকা টানিতে থাকেন, তখন উক্ত মানব-দম্পতীর পক্ষে তাহা যতই আয়ামদায়ক হউক, বাঙালীর কালচারের পক্ষে তাহা মারাত্মক! দোক্তাই বাঙালী স্ত্রীলোকের কালচার, হঁকা নহে; এবং বৃহত্তর বাঙালী তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন বলিয়াই ভাষাগত একা বজায় রাখিবার জন্ত এত ব্যগ্র। এই ভাষা-সম্মিলনের নামই বোধকরি সাহিত্য-সম্মিলন। কিন্তু এই নামের আরও একটি কারণ অহুমান করি।

বাঙালী জীবনের একটি প্রধান আকাঙ্ক্ষা সাহিত্যিক হওয়া। তাই, এই সুযোগে বৎসরে অন্তত একবারও বৃহত্তর বাঙালী-সমাজের ঐতিহাসিক, অর্থনীতিক, দার্শনিক, গাণিতিক, ঐচ্ছনীয়ার, চিত্রকর, ডাক্তার, রাসায়নিক, পদার্থ-বৈজ্ঞানিক, সকলে মিলিয়া সাহিত্যিক নামে পরিচিত হইতে পারেন। রবীন্দ্রনাথ একবার প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনে নানা বিভাগের বহু ব্যবসায়ীকে উপস্থিত দেখিয়া ভয়মিশ্রিত লজ্জায় বলিয়াছিলেন, দল বাঁধিয়া সাহিত্য সৃষ্টি হয় না। কারণ, এই-জাতীয় সম্মিলনে ডাক্তার বেরিবেলের উপর প্রবন্ধ পড়িয়া সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক মহেঞ্জোদারোর উপর প্রবন্ধ পড়িয়া সাহিত্যিক, অর্থনীতিক স্বর্ণ-রপ্তানির ফলাফলের উপর প্রবন্ধ লিখিয়া সাহিত্যিক— ইত্যাদি। ইহা নিন্দ্যার নহে, বরঞ্চ চিন্তাশীল বৃহত্তর বাঙালীমাত্রেই যে বৎসরে অন্তত একবার করিয়া সাহিত্য-সম্মিলনরূপ masquerade-এ যোগ দিয়া থাকেন, ইহাতে তাঁহাদের প্রাণধর্মেরই পরিচয় মেলে। কিন্তু একটি পরিতাপের বিষয় এই যে, বৃহত্তর বাঙালীর মনে inferiority complex ঢুকিয়াছে। তাঁহারা যখনই নিজেদের বাঙালী বঙ্গদেশকে স্বরণ করাইবার উদ্যোগ করেন তখনই ইহা প্রকাশ হইয়া পড়ে। আরও দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহারা-যে বাঙালী তাহা নিজেদেরই মাঝে মাঝে স্বরণ করিতে হয়। এ অভ্যাগতি অবস্থা আদি বঙ্গদেশ হইতে প্রাপ্ত, কারণ আমরা বঙ্গদেশে বাস করিয়াও কোনও দিন জোর করিয়া বিশ্বাস করিতে পারিলাম না যে আমরা বাঙালী। “পঞ্জাব-সিন্ধু-গুজরাট-মারাঠা-দ্রাবিড়-উৎকল-বঙ্গ” যখন একই মহাসম্রাজ্যের নামে জাগে, এবং একই স্থান হইতে আশিস্তি জিকা করে তখন মহুর্জের জন্ত হয়ত আমরা সকল প্রদেশের সঙ্গে একাত্মতা অহুভব করি; এবং পাছে এই একাত্মতার অহুভূতি অন্তরে স্থায়ী

চিহ্ন আঁকিয়া যায়, তাই গান শেষ হইলেই আমরা বাঙালী হইতে চেষ্টা করি। তখন নেতাকে বলিতে হয়,—“হে বাঙালী, ভুলিও না তুমি বাঙালী।” কিন্তু উপদেশ পাওয়া সত্ত্বেও বাঙালী যখন বিহারে বা অন্য কোনও প্রদেশে চাকরি পাইবার চেষ্টা করে তখন পুনরায় তাহার আত্মবিশ্বাস নষ্টে। চাকরি যখন মেলে না মাত্র তখনই সে কোথাকার অধিবাসী তাহা মনে পড়ে।

আমরা বাংলাদেশ হইতে হয়ত কোনও ভিন্ন-প্রদেশবাসীকে, হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া তাহার স্বপ্রদেশে পৌছাইয়া দিতে গেলাম; তাহাকে বলিলাম, Bengal for Bengalis, এবং ফিরিবার পথে সেই প্রদেশে একটু চাকরির চেষ্টা করিয়া আসিলাম। ইহা অজ্ঞান্য নহে, কারণ বাঙালী হইলেও মাহুয তো!

কিন্তু ইহা আদি বাঙালীর কথা। বৃহত্তর বাঙালী সম্পর্কে একদম কোনও কথা বলা চলে না। তাঁহাদের একমাত্র অপরাধ, তাঁহারা নিজেদিগকে হীন মনে করিতেছেন। ‘প্রবাসী’ কথাটির ভিতরেই অল্পকম্পা-প্রার্থীর মনোভাব রহিয়াছে। স্তবরাং প্রবাসী বিশেষণটি অবিলম্বে বর্জন করা উচিত। ইহার স্থানে বৃহত্তর বঙ্গের অধিবাসী হিসাবে “বৃহত্তর বাঙালী” ভাল। আমি “মহত্তর বাঙালী” বলিতেও রাজি আছি। ইহার স্বপক্ষে কয়েকটি যুক্তি দেখাইতেছি। বৃহত্তর বাঙালীর স্বাস্থ্য ভাল, হজমশক্তি বেশি, সংগ্রামের ক্ষমতা বেশি, পরকে আপন করিবার ক্ষমতা বেশি, এবং মনে হয় বাক্য-সংঘের ক্ষমতাও বেশি। স্বাস্থ্য ভাল; কারণ, ম্যালেরিয়া-ভোগের মাত্রা কম। হজমশক্তি বেশি; কারণ খি-কটি এবং অড়হর ডালের সঙ্গে কিছুটা

বফা করিতে হইয়াছে। পরকে আপন করিবার ক্ষমতা বেশি; কারণ বঙ্গদেশ হইতে দূরে গিয়া নূতন পরিবেষ্টনীতে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করিতে হইয়াছে। সংগ্রামের ক্ষমতা বেশি; কারণ, পাকযন্ত্রের ক্ষমতার সহিত ইহার নিত্য সংগ্রাম। বাক্যসংঘের ক্ষমতা বেশি; প্রমাণ, মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রের বাহুল্য নাই।

অপর পক্ষে আমাদের এই সব ক্ষমতার কোনটাই নাই। আমাদের অজ্ঞাত নানাক্রম ক্ষমতা আছে, কিন্তু সেগুলির আলোচনা বর্তমানে নিম্নয়োজন।

অতএব ইহা এক প্রকার স্থির যে আমরাই ভবিষ্যতে একদিন বাংলাদেশ হইতে বিদায় লইয়া বৃহত্তর বাঙালী হইতে চেষ্টা করিব। সে ভবিষ্যৎ সূদূর নহে, ক্রমশই আসন্ন হইয়া উঠিতেছে। বর্তমানে যাহারা প্রবাসী-বাঙালী নামে পরিচিত তাঁহাদেরই আশ্রয় প্রার্থনা করিয়া আমরা দিগকে বাচিতে হইবে। যে দেশে ‘বাঙাল’ এবং ‘ঘটি’ এক দেহে লীন হইয়াছে, সেই বৃহত্তর বঙ্গদেশই আমাদের ভবিষ্যৎ স্বদেশ। কিন্তু এই দিকে বৃহত্তর বাঙালীর বৃহৎ দৃষ্টি এতদিন আকৃষ্ট হয় নাই; তাই তাঁহারা এখনও বঙ্গদেশ হইতে প্রসাদ-ভিক্ষা করিতেছেন। ইহাতে এক আত্মপ্রসাদ ছাড়া বঙ্গদেশের আর কোনও লাভ নাই, কিন্তু বৃহত্তর বঙ্গের পক্ষে ইহা সমূহ ক্ষতিকর। বৃহত্তর বাঙালীর মধ্যে আমরা মহত্তর বাঙালীকেই দেখিতে চাহি, স্তবরাং তাঁহারা যেন কোনও বিষয়ে আপনাদের মহৎ আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট না হন, ইহাই প্রার্থনা।

দেশী ও বিদেশী

১

একটি ইংরেজি গল্প পড়িয়াছিলাম। গল্পটি এইরূপ—

জীবনে নানারূপ অ্যাডভেঞ্চার করিয়াছেন বলিয়া জনৈক ভদ্রলোকের বড়ই গর্ব ছিল। দশবারোটি মাত্র অ্যাডভেঞ্চারের গল্প ছিল তাঁহার সঞ্চয়। তিনি ইহারই কোনো না কোনো একটার দ্বারা সর্বত্র মজলিস জমাইতেন। সিংহ-শিকার হইতে প্রেম করা, এবং সিংহ-শিকার হইতে প্রেম করার মধ্যবর্তী কয়েকটি পর্য্যায় ছিল তাঁহার অ্যাডভেঞ্চারের বিষয়। একদিন তিনি তাঁহার এক বন্ধুর বাড়িতে কয়েকজন নবাবগত ব্যক্তিকে লইয়া আসার জমাইয়া বসিয়াছেন। বিশ্বয়-বিমুগ্ধ শ্রোতাগণকে তিনি বলিয়া যাইতেছেন—“মনে করুন, একা আমি সেই গভীর জঙ্গলে, হাতে একটা মাত্র বন্দুক! আফ্রিকার জঙ্গল! কিছুক্ষণ অহুসঙ্কানের পরেই আমার প্রাণিতের দেখা পেলাম। প্রকাণ্ড সিংহ! সঙ্গে সঙ্গে গুলি। গুলি খেয়ে সিংহটা থোর গর্জন করে লাফিয়ে পড়ল আমার ঘাড়ে—”

গল্পটি এই পর্য্যন্ত বলা হইয়াছে এমন সময় ভৃত্তা আসিয়া সংবাদ দিল, তাঁহাকে তাঁহার বাড়ি হইতে টেলিফোনে ডাকিতেছে। ভদ্রলোক চুই করিয়া উঠিয়া গেলেন। শ্রোতাগণ আকুল আগ্রহে তাঁহার প্রত্যাগমনের অপেক্ষা করিতে লাগিল।

মিনিট তিনেক পরে ভদ্রলোক ফিরিয়া আসিলেন। ফিরিয়া

শনিবারের চিঠি

২০৫

আসা মাত্র সকলে ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করিল—“তার পর কি হল?” কিন্তু ভদ্রলোক কোন গল্পটি করিতেছিলেন তাহা ইতিমধ্যে ভুলিয়া গিয়া প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, “তার পর তাকে চুপন করলাম এবং বিদায় নিয়ে ট্যান্সিতে বাড়ি ফিরে এলাম!”

২

দেশী গল্পটি গল্প নহে, একটি মর্মান্তিক সত্য ঘটনা। বাঙালী মেয়েরা এত সেটিমেন্টালও হইতে পারে! থিয়েটার-বায়েস্কোপ তাহাদের না দেখাই ভাল। বিশেষ করিয়া ছাত্রীদের। পরীক্ষা আসন্ন জানিয়াও তাঁহার সপ্তাহে অন্তত একবার সিনেমা দেখিবেন এবং মাসে দুইবার থিয়েটার! কোনোদিক দিয়াই নিজেদের মনের উপর নিজের কোনো প্রভাব নাই—মনটা টেলিগ্রাফ-যন্ত্রের শব্দের মত দিব্যরাত্রি টকা টকা করিতেছে।

এমন ছাত্রীর কথাও জানি, যিনি পরীক্ষার তিন দিন আগেও সিনেমার কোনো একটি বিশেষ ছবি দেখিয়া সর্বসাকুল্যে বিংশতিতম সংখ্যা-পূরণের গর্বে আত্মহারা হইয়াছেন।

মিস্ ব্যানার্জি বিশ্ববিদ্যালয়ে হিষ্টরি পড়েন। ফিল্ম-ইয়ার। তাঁহার লেখা একটি হিষ্টরির প্রশ্নের উত্তর আমি দেখিয়াছি। দৈবক্রমে দেখিয়াছি। দেখা অস্বাভাবিক জানিয়াও দেখিয়াছি। কিন্তু এ বিষয়ে আমার চেয়েও, যিনি দেখাইয়াছেন তাঁহার অস্বাভাবিক বেশি। মিস্ ব্যানার্জি নাট্যমন্দিরে “বিজয়” এবং “চন্দ্রগুপ্ত” নাটক যে একাধিক-

বার দেখিযাচ্ছেন তাহা। তাঁহার এই লেখাতেই প্রকাশ পাইবে। প্রফেসরের দেওয়া প্রশ্ন, এবং মিস্ বানার্জির দেওয়া উত্তর দুইটিই দিলাম। বলা বাহুল্য, দুইটিই ইংরেজি হইতে অনুবাদ এবং ইহাতে যদি কোনো ভুল থাকে সেজন্য আমি দায়ী নহি।

প্রশ্ন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে চন্দ্রগুপ্তের স্থান কোথায়?

উত্তর। “ভারতবর্ষ” এই একটি মাত্র নামের দ্বারা এত বড় দেশকে এক কল্পনা করিয়াছিলেন কবি ও রাষ্ট্রনৈতিকগণ। এই কল্পনা আংশিকভাবে প্রথম কার্যে পরিণত করেন চন্দ্রগুপ্ত। তাঁহার রাজত্বকালে আমরা শাসনের যে একটি সর্বাঙ্গসুন্দর পদ্ধতি দেখিতে পাই তাহার পরিপূর্ণতা হঠাৎ একটিমাত্র সম্রাটের হাতেই কিরূপে সাধিত হইল ইহা অমুগন্ধিস্বরের নিকট বিশ্বয়কর হইলেও তাঁহার পূর্ববর্তী কালের সঠিক বিবরণ, তথা, বা ইতিহাস না পাওয়াতে ধরিয়া লইতে হইবে যে সম্রাট চন্দ্রগুপ্তই নিজের অসাধারণ ক্ষমতা এবং প্রতিভাবলে একটি সম্পূর্ণ অভিনব শাসনপদ্ধতি এবং পূর্বাঙ্গ বিধি-ব্যবস্থার উদ্ভাবন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকাল পর্য্যন্ত (ব্রাত্য রাজা দিগের কথা ছাড়িয়া দিলে) আমরা অর্থাৎ রাজাদিগকেই দেখি এবং চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালের পূর্ব পর্য্যন্ত অজ্ঞ কোনো বড় অনার্থ্য রাজাকে দেখি না। সুতরাং যতদূর জানিতে পারা যায় চন্দ্রগুপ্তই ভারতবর্ষের সত্যকার প্রথম অনার্থ্য সম্রাট। কিন্তু এতৎসম্পর্কে একটি কথা বলা আবশ্যক। রাজা যিনিই হউন, রাজ্যপরিচালনা-কার্যে মন্ত্রণাদান চিরকাল ব্রাহ্মণেই করিয়াছেন। চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রণাদাতা ছিলেন ব্রাহ্মণ চাণক্য। চন্দ্রগুপ্ত এই চাণক্যের হাতে-গড়া রাজা। গ্রীকদের হইতে দেশের সম্মান এবং স্বাধীনতা রক্ষাকার্যে প্রতিভাবান যুবক-চন্দ্রগুপ্তকে

ব্রাহ্মণ চাণক্য কিরূপ সফলতার সহিত ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহাও আমরা চন্দ্রগুপ্তের সময়ে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি।

“অর্থশাস্ত্রের” বিষয়বস্ত্ত দেখিয়া যদিও ইহা প্রমাণ হয় না যে একমাত্র চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বই সমাজনীতি এবং রাজনীতির চরম উন্নতি হইয়াছিল, কারণ চন্দ্রগুপ্তের সময়ের পূর্ব হইতে ইহার অস্তিত্ব না থাকিলে “বৃহস্পতী পুণ্ড্রসম” হঠাৎ ইহার পূর্ণ বিকাশ হইতে পারে না, তথাপি একথাও স্বীকার্য যে কোটিল্যের অর্থশাস্ত্র চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব-কালে রচিত এইরূপ ঐতিহ্য থাকায় ইহা বেশ বুঝা যায় যে রাজনীতি ইত্যাদি পূর্ব হইতেই থাকিলে, হয় ঐ শাস্ত্রগুলি চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে উন্নতি লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছিল, কারণ বড় রাজত্বের জন্মই ব্যাপকতর রাজনীতিরও প্রয়োজন অহুভূত হইয়াছিল। অথবা যদি ইহা পরবর্তী কালে রচিত হইয়া থাকে তাহা হইলে চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক বলিয়া প্রচারিত হওয়ায় ইহাই প্রমাণ হয় যে চন্দ্রগুপ্ত বড় রাজা ছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত মোটের উপর ভালই লাগিল। শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাট্টা চাণক্যের ভূমিকায় যেরূপ দক্ষতা দেখাইয়াছেন তাঁহার সহকর্মীগণ সেরূপ পারেন নাই। বিশেষত চন্দ্রগুপ্তের ভূমিকায় যিনি নামিয়াছিলেন, তিনি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ চন্দ্রগুপ্তকে অত্যন্ত ষাটো করিয়া ফেলিয়াছেন। চাণক্যেরই আর একটি রূপ দেখিলাম আমরা রাগবিহারীর চরিত্রে। কদাবতী, বিজয়ার ভূমিকায় অদ্ভুত অভিনয় করিয়াছেন। তাঁহার হাবভাব, চালচলন, কথাবার্তা ভঙ্গি, সমস্তই অত্যন্ত সুসজ্জিত। বিজয়ায় ইহাকেই দেখিব বলিয়া পুনরায় গিয়াছিলাম, কিন্তু নিরাশ হইয়াছি। নরেনের ভূমিকাতেও অল্প লোক—বিশনাথ ভাট্টা নাই। কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া আসিলাম। দিদি, তুমি আসিলে আর একবার দেখিবার ইচ্ছা রহিল, কিন্তু কে কোন ভূমিকায়

নামিবেন পূর্বে ঠিক-ঠিক না জানিয়া কিছুতেই বাইব না। মনের মত না হইলে, সিনেমায় যাইব। আশা করি থোকাথুকীরা ভাল আছে।

জীবন-দর্শন

জীবন ?—সে তো অরূপ রূপের মায়া—

মরণ তাহার চরম পরিণতি ;

শূন্য মোহন স্বপ্ন ধরে কায়া—

অলৌক তাহা ;—তাহায় করি নতি ।

জীবন ?—সে তো দীপ্ত মরীচিকা,

তৃপ্তিবিহীন তৃষ্ণা অনির্মাণ ।

মহান তাহার দাহনময়ী শিখা,—

সর্বনাশা ঝুট শনির দান !

জীবন ?—জানি, সত্য সে নয় নয় ;—

মেঘের মেঘে অন্ত-রবির কাগ ।

মূহুর্ত্তেকে বিলুপ্ত সে হয় ;—

—প্রিয়দার গালে সরম-রাঙা রাগ !

মিথ্যা ! তবু বেদনা সম্পাতে

রঙীন মোহ জড়ায় আঁধি পাতে ।

—“বায়রণ”

চলচ্চিত্র

চিত্রে বাঙালী

আমাদের জাতীয় ঔৎসুক্য



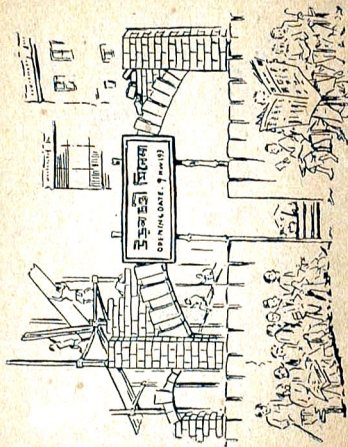
—কেজা বের হ'ল বাবু—

চিত্রে বাঙালী
আমাদের গোড়াপত্তন



—ওরে নবীন, ওরে আমার কাটা—

চিত্রে বাঙালী
আমাদের জাতীয় ধর্ম



—আছে শুধু পাখা, আছে মহা নতুন অঙ্গন—



“আলোর কথা”

“LEAD KINDLY LIGHT—”

দিনটা সকাল হইতেই মেঘাবৃত ছিল। ভাল করিয়া রোদ্দ উঠে নাই। মনটাও সেজন্ত যেন কেমন ডাম্প হইয়া গিয়াছিল। আমি স্থ্যালোকিত দিন ভালবাসি; বিশেষতঃ আজকাল এই শীতের প্রভাতে সুন্দর সোনালি রোদ্দ জানালার ফাঁক দিয়া পশ্চিমের দেওয়ালে হাসিয়া না উঠিলে লেপ ছাড়িয়া বাহির হইতে ইচ্ছা করে না। অথচ আজ সাড়ে আটটার সময় বিছানা হইতে উঠিয়াও মনে হইতেছে এখনও যেন সকালই হয় নাই।

কিছুই করিতে ভাল লাগিতেছিল না। টেবিলের উপর কাগজ মাসের “বিজলী” ছিল; অগ্রযন্থভাবে তাহার পাতা উন্টাইতে-ছিলাম। বিশেষ কিছুই পড়িবার মত ছিল না,—কারণ ঐ সংখ্যায় আমার কোনও লেখা ছিল না। (আমি যে সকল কাগজে লিখিয়া থাকি—তাহাদের যে-সংখ্যায় আমার লেখা থাকে না তাহাতে পড়িবার মত আর কি-ই বা থাকে!) এমন সময়ে একটি প্রবন্ধের শিরোনামায় দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল—“আলোর কথা”। বড়ই আনন্দ হইল। এই মেঘলা শীতের সকালে নিরুৎসাহ চিত্ত যখন স্থ্যালোকের অন্ধ উৎস্বক হইয়া উঠিয়াছিল,—তখন “আলোর” কথা যেন দেবতার আশীর্বাদের মত মনে হইল। বুঝিতে পারিলাম—উপনিষদের ঋষি কি আনন্দে প্রার্থনা করিয়াছেন—“তমসো মা জ্যোতির্গময়”; অহুভব করিলাম—মহাকবি গোটে কি ব্যাকুলতায় শেষ মুহূর্ত্তে বলিয়া উঠিয়াছিলেন—

"Light and more Light!" আগ্রহের সহিত প্রবন্ধটি পাঠ করিতে আরম্ভ করিলাম।

কিন্তু প্রথম প্যারা পড়িতেই মন বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। ইহাই কি বিজ্ঞানে ডক্টর উপাধিধারী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপকের লেখা? ইহা যে নিত্যন্ত কাঁচা হাতের রচনা! মনে করিলাম, হইতেও পারে! হয়ত অধ্যাপক মহাশয়ের কোনও নবীন ছাত্র ইহা তাঁহার নির্দেশ ক্রমে লিখিয়াছে, এবং গুরুদক্ষিণা স্বরূপ তাঁহার নামটি প্রবন্ধে বসাইয়া দিয়াছে। এরূপ তো কতই হয় বলিয়া শুনিতে পাই। নিশ্চয়ই তাহাই!

আর তেমন আগ্রহ রহিল না। নিরুৎসাহ ভাবে পাতা উন্টাইতে উন্টাইতে প্রবন্ধের শেষে দৃষ্টি পড়িল—"বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন";—অর্থাৎ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে প্রবন্ধটি পঠিত হইয়াছে। তবে? নিশ্চয়ই যিনি পাঠ করিয়াছেন—তাঁহারই নামেই ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। নিশ্চয়ই একজন বাজে লোক (lay-man) প্রবন্ধটি সাহিত্য সম্মেলনে পাঠ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত অধ্যাপকের নামে কাগজে প্রকাশিত করিতে সাহস করিবে না। কোতূহল হইল। বৈজ্ঞানিক অধ্যাপকের রচনা! ভাল করিয়া পড়িয়াই দেখি না, কিছু শিথিতে পারিবই!

অদ্বায়িত চিত্তে পুনরায় পাঠ আরম্ভ করিলাম। কয়েক লাইন পড়িয়াই আটকাইয়া গেল। অধ্যাপক মহাশয় লিখিয়াছেন:—

"সেই স্তম্ভই দর্শনশাস্ত্রের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যাপারটা প্রকৃতি-বিজ্ঞানের অন্তর্গত না হইয়া উহা অন্তর্গত হইয়াছে জীবন্ত ও মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞানের।"

"দর্শনশাস্ত্রের সহিত যোগাযোগের ব্যাপারটায়" কেমন যেন

গোলযোগে পড়িয়া গেলাম; "প্রকৃতি-বিজ্ঞান" জিনিষটা কি তাহাও স্থির করিতে পারিলাম না। বুঝিলাম, ইহা প্রকৃতি ও বিজ্ঞান শব্দ-দুইটির সমাস—কিন্তু কি সমাস, তাহার অর্থ কি, কিছুতেই স্থির করিতে পারিলাম না। যাঁহা হউক—ইহা ভূমিকা মনে করিয়া—আর বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া অগ্রসর হইয়া গেলাম।

কিন্তু দ্বিতীয় প্যারায় প্রথমেই আবার হোঁচোট খাইলাম: "জগতের আদিকাল হইতেই মানবের পরিচয় হইয়াছে—তাহাদের চন্দ্রসুখের সঙ্গে গ্রহভ্রমণের সঙ্গে।"

"জগতের আদিকাল হইতেই!" জগতের আদিকালে মানুষ ছিল কোথায়? জগৎ শব্দটির দ্বারা দুইটি জিনিস বুঝান হইয়া থাকে—এক সমস্ত বিশ্ব; অপর, পৃথিবী; এ'দুইটির কোনওটিরই আদিকালে মানুষ থাকিবার কথা নহে। পৃথিবীতে মানুষের লীলা মাত্র কয়েক লক্ষ বৎসর, এবং পৃথিবীর আদিকাল—অস্তুত: দুইশত কোটি বৎসরের পূর্বে। আর বিশ্বের আদিকাল যে কেবল তাহা আমরা কেহই জানি না। তবে? নিশ্চয়ই জগৎ বলিতে অধ্যাপক মহাশয় অপর কিছু বুঝাইয়াছেন! কিন্তু তাহা কি? বড় গোল পড়িলাম।

যাহা হউক ইহাও ভূমিকার অন্তর্গত! তৃতীয় প্যারা হইতে আসল প্রবন্ধ আরম্ভ হইয়াছে। একেবারে নিঃজলা খাটি বৈজ্ঞানিক তথ্য—ইহার মধ্যে আর ভেজাল চলিবে না। নির্ভয়ে অগ্রসর হইলাম—কিন্তু হায়! অদৃষ্ট ছাড়া পথ নাই। প্রথম বাক্যেই একেবারে ফাঁট হইয়া পড়িলাম।

"যন্ত্র বিজ্ঞানে আলো সম্বন্ধে সর্বপ্রথমে এক মহাত্মা জানা গেল যে, আলো এক নির্দিষ্ট গতিতে চল,..."

"যন্ত্র বিজ্ঞানে"—অর্থাৎ mechanics-এ আলো সম্বন্ধে সর্বপ্রথমে—

এক মহাত্ম্য জানা গেল। নিজের চোথকে বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হইল না। আলোর বেগ যন্ত্র-বিজ্ঞানের ব্যাপার নহে; এমন কি কোনও মেকানিকও উহা সর্বপ্রথমে আবিষ্কার করে নাই (তাহার পক্ষে সম্ভবও নয়)। যে কোনও ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেই তো অধ্যাপক মহাশয় জানিতে পারিতেন, যে আলোর বেগের অন্তিম সর্বপ্রথম ধরা পড়িয়াছিল জ্যোতিষশাস্ত্রে। ড্যানিশ জ্যোতির্বিদ রোয়েমার ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে বৃহস্পতির উপগ্রহের গ্রহণে মাঝে মাঝে পূর্ব-নির্দিষ্ট সময়ের পার্থক্য ঘটে—দেখিয়াই ইহার অন্তিম প্রথম অনুমান করেন—এবং এই সময়ের পার্থক্য ও পৃথিবীর কক্ষের ব্যাস হইতে ইহা মোটামুটি ভাবে হিসাব করিয়া বাহির করেন। আধুনিক লব্ধ ফলের সহিত তাঁহার প্রাপ্ত ফলের আশ্চর্য্য সাদৃশ্য আছে।

মাথা ঘুরিতেছিল। পড়িয়া চলিলাম; কিন্তু কিছুই যেন ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। “এই তথ্য জানা মাত্রই ভাবনা শুরু হইয়া গেল,—কি সে জিনিস যাহা আকাশ ও ফাঁকা জায়গার (vacuum) মধ্যস্থিত এত দ্রুত গতিতে চলে—সেকেন্ডে ১৮৬০০০ মাইল?” আকাশ তাহা হইলে ফাঁকা জায়গা নয়? না বাঙলা ভাষা তুলিয়া গিয়াছি?

“যদিও সেই পুরাতন কালে এমন অনেক জিনিস জানা ছিল যাহা উদ্ভট কল্পনার সাহায্যে কিছুতেই বোঝা যাইত না,...” ইহাও কি বাঙলা ভাষা?

বড়ই দুঃখ হইল। এমনই ছুরবস্থা ঘটিয়াছে যে মাতৃভাষাটাও তুলিয়া গেলাম! যাহা হউক কয়েক লাইন পরেই একটি শব্দের প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই আশাশ্রিত হইয়া উঠিলাম—“হাইজিন”! আলোর কথাই হাইজিন! নিশ্চয়ই আলোকের সহিত আনন্দের

সুত্তরাং স্বাস্থ্যের যে নিগূঢ় সম্পর্ক রহিয়াছে—অধ্যাপক মহাশয় তাহাই বিবৃত করিয়াছেন। বড়ই আনন্দ হইল। ইহা যে আমার চিরদিনের অতি প্রিয় অভিমত! স্থানে স্থানে সময়ে সময়ে আমি ইহা প্রায়ই প্রচার করিয়া থাকি! এই স্থানটি ভাল করিয়া পড়িতে হইবে।

—আবার নিম্নম আধাত! “ক্রিস্টিয়ান হাইজিন (Haygens)” (sic) তাহা হইলে হাইজিন (hygiene) নয়! “হাইজিন”—স্বাস্থ্য-তত্ত্ব নহে; বিখ্যাত ডাচ বৈজ্ঞানিক ক্রিস্টিয়ান হায়গেন্স (Huygens)! হায় ভগবান! বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উক্ত উপাধিধারী অধ্যাপক—নিউটনের সমসাময়িক বিশিষ্ট প্রতিভাশালী বৈজ্ঞানিক, যাহাকে আলোক-বিজ্ঞানের জগদাতা বলিলেও চলে—তাঁহার নামটাও ঠিক জানেন না!

আর পড়িবার স্পৃহা ছিল না। বিশেষতঃ হায়গেন্স-প্রোতাপ্ত। “হাইজিন” রূপে বারংবার আবির্ভূত হইয়া উদ্ভ্রান্ত করিয়া দিতেছিল। তাহার উপর “একই দিকে প্রবাহিত দুইটি তরঙ্গ এমন করিয়া মিশিতে পারে যে একটি চেউয়ের মাথা অপর চেউয়ের পেটের সঙ্গে মিশিয়া যাওয়ার ফলে—” “পরীক্ষার ফলে তিনি নিজেই কিন্তু এই মতে যোগ দিলেন” “উহার সৃষ্টি যে আলো উৎপাদনী বস্তুর কম্পনের গতিতেই হয়”—জাতীয় ভাষায় যেটুকু চিন্তাশক্তি ছিল—তাহাও লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছিল।

লঘুভাবে চোখ বুলাইতে বুলাইতে আবার এক জায়গায় আটকাইয়া গেলাম—“আলোর তরঙ্গ ধ্বন আমাদের চক্ষে আসিয়া পড়ে, তখন এই ইন্দ্রিয়দ্বারা এমন একটা নাড়াচাড়া পড়ে যে—তাহারই ফলে আমরা দৃষ্টিশক্তি লাভ করি” ভাষার কথা যাহাই হউক—অধ্যাপক

এ কি বলিতেছেন? ভাবিতে লাগিলাম—যখন আমাদের জিহ্বার উপরে রসগোলা নাই তখন কি আমাদের আশ্বাদ-শক্তিও থাকে না? এবং যখন কথা কহিতেছি না তখন কি বাকশক্তি বিলুপ্ত? স্থির করিলাম, কোনও বিশিষ্ট জীব-তত্ত্ববিদের সহিত এ বিষয়ে পত্রালাপ করিতে হইবে।

ইহার পরেই আবার পাইলাম—“হাইজিনের জিতিবার প্রধান কারণ হইল যন্ত্র-বিজ্ঞানে আলো সম্বন্ধে এক নূতন তথ্যের আবিষ্কার। যন্ত্র সাহায্যে দেখা গেল যে,—” এতক্ষণে ব্যাপার পরিষ্কার হইল। যন্ত্র সাহায্যে যাহা করা যায় বা দেখা যায়—তাহা যন্ত্র-বিজ্ঞানের (mechanics) অন্তর্গত! ডাক্তার ষ্টেথোস্কোপ নামক যন্ত্র সহযোগে রোগীর বক্ষ পরীক্ষা করিয়া যাহা জানিতে পারেন—তাহা যন্ত্র-বিজ্ঞানের কোনও গুণ তত্ত্ব। আমি মস্তিষ্করূপ যন্ত্রদ্বারা চিন্তা করিয়া লেখনীরূপ যন্ত্রদ্বারা যাহা লিখিতেছি—তাহাও যন্ত্র-বিজ্ঞানেরই অন্তর্গত! আমার বৃদ্ধিবার ভুল হইয়াছিল। এখন সব ক্রমশঃ বৃদ্ধিতে পারিতেছি। বিশেষতঃ—

“তখন দেখা দিলেন মহামতি ক্লার্ক মেক্সওয়েল” পরেই ব্রাকেটের ভিতর (Clerk Maxwell)! বৃদ্ধিযাছি আর বলিতে হইবে না। অন্ততঃ ভাষার বিচার আর করিব না।

এবার অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া আবার অগ্রসর হইলাম। “কিন্তু তথাপি মেক্সওয়েলের এই অদ্ভুত কল্পনার মূল্য খুব বেশী।” ম্যাক্সওয়েল যে আলোক সম্বন্ধে কোনও কল্পনা করিয়াছেন—তাহা মনে পড়িল না। জানিতাম, ম্যাক্সওয়েল গাণিতিক প্রমাণের দ্বারা তাড়িত-চৌম্বক তরঙ্গ ও আলোকের সমজাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইহাই তাহার বিখ্যাত Electro-magnetic Theory

of Light নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এখন জানিতে পারিলাম—ইহা গণিতের দ্বারা স্বপ্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব নহে; “মেক্সওয়েলের অদ্ভুত কল্পনা” মাত্র! এষ্ট ধাঙ্গা ৬০ বৎসরেরও অধিককাল বৈজ্ঞানিক জগতে নির্বিশ্বাসে চলিয়া আসিয়াছে,—কেহই ধরিতে পারে নাই!

পুনরায়—“মেক্সওয়েল গণিতের সাহায্যে যাহা ধরিয়া লইলেন—” হায়, আজীবন বিজ্ঞান-সাধক বুদ্ধ লর্ড কেলভিন! তুমি বুধাই তোমার ছাত্রগণকে বলিয়াছিলে—“জ্ঞানের উন্মেষ হইতে মানব যে গণিত শাস্ত্রে অস্বাস্ত বলিয়া স্বীকার করিয়া আসিয়াছে—তাহাকে কখনও অবিশ্বাস করিও না।” এবং বুধাই গাণিতিক সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়া নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতে দ্বিধা কর নাই। কারণ গণিতের সাহায্যে যে সত্যে উপনীত হওয়া যায়—তাহা “ধরিয়া লওয়া” মাত্র—ইহা তুমি জানিতে না।

ভাষা সম্বন্ধে আর কিছুই বিচার করিব না স্থির করিয়াছি। অতএব রোটগেণ রশ্মি বা অজাত রশ্মি (X-Ray) কে রঞ্জন রশ্মিতে পরিণত হইতে দেখিলেও আপত্তি করিব না,—হউক না বৈজ্ঞানিক অধ্যাপকের লেখা! কিন্তু—

“কাজেই আলো বলিয়া বৈজ্ঞানিক জগতে যাহা বোঝা যায়, তাহা যে শুধু দৃষ্টিশক্তি উৎপাদনকারী বর্ণ সমন্বিত আলো তাহা নয়। বৈজ্ঞানিক ভাষায় আলোর অপর নাম বিকীর্ণিত তেজ (Radiant energy)”—ইহা কি ঠিক? স্পষ্টই বুঝা যায়—লেখক বলিতে চাহেন আধুনিক বিজ্ঞানে সর্বপ্রকার “Radiant energy” বা electro-magnetic disturbanceএর সাধারণ নাম—আলো অর্থাৎ Light! অর্থাৎ Heat, infra-red rays, ultra-violet rays,

x-rays, gamma rays, wireless wave, electro-magnetic wave—ইহাদের সকলেই বিজ্ঞান সাহিত্যে light বলিয়া অভিহিত করা হয়। দুঃখের বিষয়—তাহা নয়। প্রধানতঃ visible radiant energyকেই (যদিও ইহাও electro-magnetic disturbanceএরই অন্তর্গত) light বা আলো বলা হয়। বাকীগুলি উপরোক্ত বিভিন্ন নামেই এতাবৎ পরিচিত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু—what is there in a name? অতএব নাম লইয়া বিতর্ক না করাই ভাল। বিশেষতঃ যখন নজীর রহিয়াছে—ভাষাঘটিত মারপ্যাচ ছাড়িয়া দাও। বৈজ্ঞানিকের তথ্য ও সত্য লইয়া কারবার।

বেশ! কিন্তু সাত লাইন পরেই একি? “কম্পন সংখ্যা আরও বাড়িলে ক্রমে ultra-violet, রঞ্জন (sic) আলো এবং সর্বশেষে গামা আলো পাওয়া যায়।” অর্থাৎ গামারশ্মি অপেক্ষা অধিকতর ক্রততা সম্পন্ন ও ক্রততর তরঙ্গদ্বার সম্পন্ন রশ্মি আর কিছু নাই! অধ্যাপক মহাশয় নিশ্চয়ই জানেন—গামা-রশ্মি অপেক্ষা প্রায় ত্রিশ গুণ ক্রততা-সম্পন্ন একটি রশ্মি আছে, যাহার penetrating power তীক্ষ্ণতম গামা-রশ্মির প্রায় বিশ গুণ। এই রশ্মির নাম cosmic rays, ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ইহার অস্তিত্বের কথা জানিতে পারা যায়; এবং গত কয়েক বৎসরই ইহা লইয়া বৈজ্ঞানিক মহলে বিশেষরূপ গবেষণা ও আলোচনা চলিয়াছে।

অধ্যাপক মহাশয় লিখিয়াছেন—“পঁচিশ বৎসর পূর্বে আলো সম্বন্ধে কোনও রচনা লিখিতে বসিলে—এখানেই শেষ করিতে হইত।” পরমাস্ত্রের বিষয় পঁচিশ বৎসর পরে এই রূপকথা লিখিতে বসিয়াও তিনি পঁচিশ বৎসর পূর্বেই তাহা শেষ করিয়াছেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে যে তীব্র শক্তিশালী রশ্মির কথা বৈজ্ঞানিকগণ জানিতে

পারিয়াছেন—যাহার উৎপত্তিস্থল মহাশূন্যে, এবং যাহার সান্ত্বা কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া মহাশূন্যে পরমাণু কিংবা ইলেকট্রন স্বতঃ উৎপন্ন এবং ধ্বংস হইতেছে বলিয়া বৈজ্ঞানিকগণ অনুমান করিতেছেন—তাহার উল্লেখ মাত্র তিনি করেন নাই; এবং গামা রশ্মিকেই সর্বশেষ ও সর্বাধিক ক্রততা সম্পন্ন ‘আলো’ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ইহার কারণ কি?

দুইটি কারণ হওয়া সম্ভব। এক লেখক cosmic-rayএর কথা জানেন না; অথবা জানিয়াও একটি অসম্পূর্ণ (অসত্য) তথ্য দিয়া বাঙালী সাধারণ পাঠককে ভুলাইয়াছেন,—কারণ তাহারা ইহা ধরিতে পারিবে না। ইহার ভিতর কোনটি সত্য হইলে তাহার পক্ষে কম অপযশকর হইবে তাহা ভাবিতেছি।

ভাষার কথা আর বলিব না-ই স্থির করিয়াছি। কারণ, “মেক্স-ওয়েলের বৈদ্যুতিক ও চুম্বক শক্তিসম্পন্ন আন্দোলন কল্পনা, সূক্ষ্ম গণিত-শাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত; কাজেই ইহার কোনও মার নাই। কিন্তু এই আন্দোলনের বিস্তার যে তরঙ্গ প্রবাহের মত হাইজিনের এই কল্পনা বুঝি আর টেকে না। এমন অনেক জিনিস জানা গিয়াছে, যাহাতে হাইজিনের কল্পনার ভিত্তি পথান্ত টলায়মান হইয়াছে। পড়িয়া মস্তক টলায়মান হইয়া উঠিয়াছে। এবং যখন দেখিলাম,

“আলোর মূল (source) যখন বহু দূরে—জ্যোতিঃ যখন খুবই কম—” তখন বুঝিলাম, শুধু আলোর মূল নহে, বঙ্গভাষারও মূলোৎপাটন হইয়াছে। কেবল দেখিতেছি যে,—

“মনে হয় আলোকিত্তি বুঝি একটা বস্তা-বীধাই রকমের, বস্তা বস্তা হিসাবে চলাফেরা করে। যত দূরেই যাক না কেন, বস্তা-বীধাই তেজ—”

“আলোর মূল বস্তু দুইই থাক না কেন, শক্তির কিছু কমতি হয় না।”

“দূরেই থাকুক আর সামনেই থাকুক (পিছনে পড়িয়া থাকিলে চলিবে না) বস্তায় অবস্থিত একই তেজ উহার সংগ্রহ করে।”

আমেন! আর কিছুই বলিব না। কিছু বলিবার শক্তিও নাই। কেবল এক জায়গায় ড্যানিশ বৈজ্ঞানিক নীলসবোর ‘বর’ সাক্ষিয়া একটা ‘বিচিত্র ধরণের কল্পনা’ করিতেছেন দেখিয়া পুনরায় তাজা বোধ করিতেছি।

আর কিছুই বলিব না, বলিলাম বটে;—কিন্তু কয়েক লাইন পরেই যাহা দেখিলাম তাহাতে সঙ্কল্প রক্ষা করাও কঠিন।

“...প্রোটনের (Proton) চারিদিকেও ইলেকট্রনগুলি সেই রকম ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এবং ঠিক সৌরজগতের নিয়মেই বাধা হইয়া”। বোরের ‘পরমাণু-গঠন-তত্ত্বের’ অদৃষ্টে পরবর্তী কালে যাহাই ঘটিয়া থাকুক—পরমাণুর ভিতরে ইলেকট্রন যে প্রোটনকে ঠিক সৌরজগতের নিয়মে প্রদক্ষিণ করে ইহা অধ্যাপক মহাশয় কি করিয়া বলিলেন? বোর নিজেও তো এমন কথা কখনও বলেন নাই। বলা তাঁহার পক্ষে সম্ভবও নয়; কারণ, সৌরজগৎ ক্লাসিক গতি বিজ্ঞানের নিয়মে চলে; কিন্তু বোর-কল্পিত পরমাণুর গঠন কোয়ান্টাম তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। সৌরজগতে গ্রহের কক্ষের আকৃতির কোনও বাধাধরা নিয়ম নাই, তাহা যে-কোনও আকৃতির হইতে পারে। কিন্তু বোরের পরমাণুতে ইলেকট্রন প্রোটনের চতুর্দিকে কয়েকটি নির্দিষ্ট কক্ষেই মাত্র আবর্তন করিতে পারে যাহাদের ব্যাস ১, ৪, ৯... ইত্যাদি অল্পপাতে ছাড়া কিছুতেই হইতে পারে না। ইহা বাস্তবিক বোরের পরমাণুতে an electron occasionally jumps from one

orbit to another without going through space। বলা বাহুল্য সৌরজগতে কোনও গ্রহ এরূপ লক্ষ্য প্রদান করে না। ইহা এতই আশ্চর্য যে বাহ্যিক সৌরজগতের গতি বিজ্ঞানের সহিত পরিচিত, তাঁহাদের পক্ষে কল্পনা করাও অসম্ভব। বোরের পরমাণুর সহিত সৌরজগতের তুলনা হৃদয়ীর মুখের সহিত চক্রে তুলনার জায় নিছক উপমা মাত্র।

কিন্তু ইহাও অবাস্তব। আসল কথা বোরের পরমাণুর গঠন পরিকল্পনা বিজ্ঞান জগতে আর সুপ্রতিষ্ঠিত আছে কি? ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে বোর এই পরমাণু-পরিকল্পনা প্রথম প্রচার করেন। তাহার পরে গদ্বার পুলের তলা দিয়া অনেক জল বহিয়া গিয়াছে। দেখা গিয়াছে বোরের পরিকল্পনায় সকল বৈজ্ঞানিক তথ্যের মীমাংসা হয় নাই। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে, লুই দ্য’ ব্রলি, হাইজেনবের্গ, ডিরাক, শ্রোডিংগার প্রভৃতির মনীষায় Wave mechanics ও নব Quantum Theory উদ্ভাবিত ও পরিবর্তিত হইয়াছে; এবং শ্রোডিংগারের কল্পিত তরঙ্গ-রূপী তড়িতাবেশ সম্পন্ন আশ্চর্য পরমাণু বোর-পরমাণুকে স্থানচ্যুত করিয়াছে। তাহার পরে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে হাইজেনবের্গ তড়িতাব্যবসায় সম্পর্কে Principle of Indeterminacy প্রচার করিয়াছেন। সে সব অনেক কথা। কেবল মাত্র এই সম্পর্কে আর আর্য্য এড্ভিটন ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের গিফোর্ড লেকচার্স-এ যাহা বলিয়াছিলেন—তাহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—

In Bohr's semi-classical model of the hydrogen atom there is an electron describing a circular or elliptic orbit. This is only a model; the real atom contains nothing of the sort. The real atom contains something which

it has not entered into the mind of man to conceive, which has, however, been described symbolically by Schrodinger. This "something" is spread about in a manner by no means comparable to an electron describing an orbit..."

১৯১৩ খৃষ্টাব্দের পরে atomic physics এ যে সকল নূতন তথ্য ও মতবাদ অবিরাক্ত হইয়াছে—তাহার সংবাদ অধ্যাপক মহাশয় রাখেন না এমন নহে। কিন্তু পাছে টাটকা খাটি বৈজ্ঞানিক তথ্য বাঙ্গালী পাঠকদের পেটে সঞ্চার হয়, সেজন্য তিনি বিশেষ সতর্কতার সহিত তাহাতে জল মিশাইয়াছেন।

আর কিছুই বলিব না স্থির করিয়াছিলাম। বলা ভালও দেখায় না। কারণ মূল প্রবন্ধ হইতে সমালোচনা বড় হইয়া যাইতেছে। কিন্তু "সৃষ্টির পর উহা হাইজিনকল্লিত তরঙ্গের মত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া ক্রমশঃ তেজঃশূন্য হইয়া আসে, কিংবা একটি নির্দিষ্ট দিকে বিনাক্ষয়ে প্রসারিত হয় কিনা তাহার সঠিক কিনারা আজও হয় নাই" তে পৌছিয়া আবার আটকাইয়া গেলাম। একি? আলোক তরঙ্গ অথবা কণা (সম্ভবতঃ দুইই) এবিষয়ে কোনও নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে বৈজ্ঞানিকগণ আজও পৌছাইতে পারেন নাই বটে,—কিন্তু Light Quantum যে নির্দিষ্ট শক্তি লইয়া বিনাক্ষয়ে বিস্তার লাভ করে—দীর্ঘপথ ভ্রমণ করিয়াও যে তাহার শক্তির কিছুমাত্র হ্রাস হয় না—ইহাই তো আধুনিক আলোক বিজ্ঞানের সর্বাঙ্গের আশ্চর্য্য রহস্য। এবং ইহার কথা অধ্যাপক মহাশয়ও তো কিছু পুঙ্খানুপুঙ্খ বলিয়াছেন। তবে? নাঃ, কিছুই আর বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

সম্প্রদেয় বাক্যে পৌছিয়া বড় আনন্দ অনুভব করিলাম। সমস্ত প্রবন্ধটির সংক্ষিপ্তসার এই বাক্যটির মধ্যে পাইলাম।—"কিন্তু কে জানে

আবার নূতনের পর নূতন সমস্ত আসিয়া বিজ্ঞানকে অনন্তকালের জন্য চিরনবীন ও অজ্ঞান করিয়া রাখিবে না?"—বিজ্ঞান যে প্রকৃত পক্ষে অজ্ঞানতারই নামান্তর—তাহা আর অস্বীকার করিবার উপায় রহিল না।

অধ্যাপক ডাক্তার দত্ত স্নেহময়। তিনি জানেন—বাঙলা ভাষা পিতৃমাতৃহীন এবং বাঙালী পাঠক নাবালক। ইহাদের প্রতি মমত্ববশত তিনি ভাষাকে চমৎকার সজ্জায় সজ্জিত করিয়াছেন, এবং পাঠককে diluted জ্ঞান (অজ্ঞান?) পরিবেশন করিয়াছেন।

—কিন্তু কখন বেলা দুইপ্রহর অতিক্রান্ত হইয়াছে—জানিতে পারি নাই। মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে; এতক্ষণ ধরিয়া অশ্রুমনস্ত ভাবে কি লিখিতে কি লিখিয়াছি জানি না। সব কেমন ওলোট পালোট হইয়া যাইতেছে। যাহা হউক স্বস্তিবচন উচ্চারণ করিয়া বিদায় লইঃ—

"জ্যোতিষো মা তমর্গময়।"

"হে প্রভু, আমাদেরিগকে আলোক হইতে অন্ধকারে লইয়া যাও!"

Manager: "Why do you hold your pen in the ink so long?"

Office Boy (who has applied for an increase of wages):

"To cool the nib, sir."

তৃত্ব

সকালে উঠিতে একটু আমার বিলম্বই হয়। সেদিনও হইয়াছিল। উঠিয়া দেখি, সমস্ত বাড়ীটা নিশুম। কোথাও কারো সাড়া-শব্দ নাই। শুধু একটা জলের কল রাজে বন্ধ করা হয় নাই; সেইটা দিয়া ক্রমাগত জল পড়িতেছিল। ভাতুপুত্র কানাই খুব সকালে উঠিয়া পড়াশুনা করে। তাহাকে ডাকিলাম, ‘কানাই, এখনো উঠিস্ নি?’

উত্তর আসিল,

‘কেন কাকা কর রাগ, জানত আমার।
গেছিছ দেখিতে সব, শিশির ভাঙুড়ী,
কঙ্কাবতী সাহ আর—বিচিত্র নাটক—’

বলিলাম, ‘ধাম্; ভারি জেঠা হয়েছিস্, কাজিল কোথাকার; ফের যদি—’

কানাই ধামিল। ডান হাতে খন্দের চাদরটা কতকটা মেলিয়া ধরিল, শরীরটা ডান দিকে একটু হেলাইয়া আমার দিকে কটমট করিয়া তাকাইল এবং সহসা কোমড়ে একটা স্বাকানি দিয়া ১২০ ডিগ্রীর একটা পাক মারিয়া নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিল। একটু অবাক হইলাম। চাকরকে ডাকিলাম, ‘রামা! দেখ ত, খবরের কাগজ দিয়ে গেছে নাকি?’

রামা ঢুলিতে ঢুলিতে বাহিরের ঘরে ঢুকিল এবং ফিরিয়া আসিয়া বলিল,

‘অমৃতবাজার শুধু রয়েছে পড়িয়া,
দেখনি এখনো বাবু আনন্দবাজার।’

‘আবার অমিত্রাকর! ব্যাপার কি? খবরের কাগজটা হাতে করিয়া আদোষা, আদিগ্রাত, উয়াল উয়াল প্রভৃতি মৃৎস্থ করিতেছি, কারণ সান্দ্য অভ্যাস ইতালী-আবিসিনিয়ার যুদ্ধের authoritative বিবরণের ও ব্যাখ্যা করিবার ভার আমার উপর; তাহাতে ক্রটি হইলে আমার dyspeptic বন্ধুদের রাজে আহার বা নিদ্রা কিছুই হইবে না। কাগজ হাতে করিয়াই হাকিলাম, ‘উহুন ধরেছে? চায়ের জল চড়িয়েছিস?’ ঝির কাংশ্ কণ্ঠের উত্তর আসিল,

‘ঘুটে ত ধরেছে বাবু, ধরেনি কয়লা।’

সঙ্গে সঙ্গে রামার গলা শুনা গেল,

‘ঠাকুর, ঘটিটা দাও—গয়লা এসেছে।’

একি! অমিত্রাকর-বাদ্যিটাও সংক্রামক নাকি? রামাত খিয়েটার দেখিতে যায় নাই। চিন্তিত হইলাম। ইতিমধ্যে থুকাটা খাট হইতে নামিয়া আসিয়া খবরের কাগজ হইতে ঠিক আবিসিনিয়ার ছবিখানা হিঁড়িয়া ফেলিল; চটয়া এবং আদর করিয়া বলিলাম, ‘দাও, গাড়ীতে বেড়িয়ে এস।’ উত্তর আসিল,

‘গায়ীতে দাব না বাবা, দাব ধীর তোলে।’

সর্বনাশ! থুকাটাও! মৃৎখের সিগারেটটা ঘন-ঘন টানিতে লাগিলাম। ছাই ফেলিব, দেখি আমার রূপার অ্যাশ্-ট্রেটা নাই। বিবাহের যৌতুক—বড় আদরের জিনিস। পূর্বদিন চা দেবার সময় ঠাকুরটা ঘেন গটার প্রতি লুক দৃষ্টি দিয়াছিল বলিয়া মনে হইল; মনে হইতেই সন্দেহ হইল; সন্দেহ হইতেই ডাকিলাম, ‘ঠাকুর, আমার অ্যাশ্-ট্রে কোথায় রেখেছ, শীঘ্র বল।’ ঠাকুর কম্পিত কণ্ঠে বলিল,

‘কিমিতি জানিবি মই, জানে জগড়নাথ।’

মাথাটা ঘুরিয়া উঠিল। গঞ্জিয়া উঠিলাম, 'ওগো, শুনছ! শীগগির আমার হুটকেনটা গুছিয়ে দাও। এ ভূতের বাড়ীতে আর একদণ্ডও না।' গৃহিণী ধড়মড় করিয়া খাটের উপর উঠিয়া বসিলেন, এবং আলু-খালু বেশে কবরী আবৃত করিতে করিতে বলিলেন,

'কেন নাথ হেন মতি প্রত্যুবে তোমার ?

কোন অপরাধে বল দাসী অপরাধী ?

দীর্ঘ দশ বর্ষ পরে হয়ত অকচি

হয়েছে আমার প্রতি ; কিন্তু খুকীটার

কথা কি পড়ে না মনে ? কেমনে রহিবে—

বল—কেমনে রহিবে তার আধ আধ

'বাবা' ডাক না শুনিয়া কানে ? বল নাথ—'

মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলাম। একি স্বপ্ন, না মায়া, না মন্তিলম ! নিজের হাতের নাড়ী পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, ঠিক আছে। ডান হাতের তুর্জ্জনী দিয়া নাকের অগ্রভাগ স্পর্শ করিয়া দেখিলাম, ঠিকই আছে। আমি ঠিক আছি। অথচ বাড়ীহুজ্জ সব অমিত্রাক্ষর—বড়ই চিন্তায় পড়িলাম। রাগ কমিল, হৃদিস্তা বাড়িল। সার নীলরতনকে একটা কল দিব নাকি ? কিন্তু চৌষটি টাকা ! আচ্ছা উদ্ভার যোগের ঔষধটা কোয়াটার ডোজে দিয়া দেখিলে হয়—কিন্তু পেটেন্ট ঔষধ, আদ্যক্ষে দেওয়া ঠিক নয়। তাহাতে হিতে বিপরীত হইতে পারে। হয়ত পয়ার ছাড়িয়া জিপদী আরম্ভ হইবে।…… গিরীনবাবুকে ফোন করিলে কেমন হয় ? না ; তিনি হয়ত বলিবেন, সবাইকে শীগগিরই একটা করিয়া বিবাহ দিন ; কিন্তু নিভাস্ত ভার্গব-কুলার, আধুনিক আলোক-বক্তিতা গৃহিণী যদি রাজী না হন !…… হঠাৎ মহাশ্রদ্ধীকে স্মরণ হইল। তাহার প্রেসক্রিপশনটা টাই করিলে

শনিবারের চিঠি

মন্দ হয় না। কোন খরচ নাই, কোন রিস্ক নাই, বরং……। মন স্থির করিয়া খবরের কাগজটা হাতে করিয়া সিগারেট মুখে দিয়া ঈজিচেয়ারে গিয়া বসিলাম এবং গৃহিণীকে বলিলাম,

'এনে দাও মোরে তব হাতবান্ন-চাবি।'

উত্তর আসিল,

'সহসা তুমি কেন এমন অদ্ভুত ?'

গঞ্জিয়া উঠিলাম,

'শীঘ্র দাও ! অত্থাথ—নাহি হবে ভাল।'

চাবিছড়া কোমরে গুজিলাম। বাড়ীর বাহিরে যাইবার দ্বারগুলিতে চাবি লাগাইলাম। কিছুক্ষণ পরেই গৃহিণী আসিয়া বলিলেন,

'দাও চাবি যাবে রান্না করিতে বাজার।'

বলিলাম,

'হবে না বাজার আজি, না হবে রন্ধন।'

গৃহিণী বলিলেন,

'ওমা ! সেকি ! খুকীও কি রহিবে উপোসী ?'

উত্তর দিলাম,

'ব্র্যাক্সো গুলিয়া দাও, গিলুক হবেলা।'

দিন গেল। বৈকাল আসিল। গৃহিণী বলিলেন,

'উত্তন ধরাবে নাকি ! চা-পান করিবে ?'

উত্তর দিলাম, 'পানাহার বন্ধ সব, জনমের মত।'

গৃহিণী। 'একি অসম্ভব পণ ! পাগল হইলে ?'

আমি। 'সরে যাও, সরে যাও, জালায়ে না আর।'

গৃহিণী। 'গলা যে শুকায়ে গেল, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা !'

আমি। 'আছে জল চৌবাচ্চায়, কর—গিয়া—পান।'

রাজি কাটিল, প্রভাত হইল। সকলেরই আজ অতি প্রত্যুষে ঘুম ভাঙিয়াছে। কেহ কেহ হয়ত একেবারেই ঘুমায় নাই। রাত্রে মধ্যে মধ্যে চৌবাচ্চা হইতে জল তুলিবার শব্দ শুনা গিয়াছিল। অনাহার-জনিত দুর্বলতায় সকলেই অবসন্ন, কেহই নড়িতে চায় না। একটু পরে, আমার গাত্ৰোত্থানের সাড়া পাইয়া ঝি-টি ধীরে ধীরে কাছে আসিল এবং স্তম্ভন কাংক্ষ্যকণ্ঠে বলিল, ‘বাবু, তোমাকে কোলে পিঠে করে মাছষ করেছি, তোমার অনেক নিমক থেয়েছি, তাই কাল কিছু বলিনি। এমন করে বাড়ীর ভেতর পুরে না খাইয়ে মারবার তুমি কে? এটা কি মগের মূলুক নাকি! এখনি যদি খাবার ব্যবস্থা না কর আর আমার মাইনে চুকিয়ে না দাও, তবে চেঁচিয়ে পাড়ার লোক জড় করব।’

বাঃ, এ যে সরল গল্প! মহাজ্ঞাজীকে প্রণাম! গৃহিণীকে ডাকিয়া চাবির গোছাটা ছুঁড়িয়া দিলাম এবং বলিলাম, ‘ঈগগির এক কাপ চা কর—আর সঙ্গে থান দুই নিমকি।’

জীবন আবার গল্পময় হইয়াছে।

চিঠি

শ্রীযুক্ত শনিবারের চিঠি সম্পাদক মহাশয়,—

বীমা-বিষয়ক একটি বাংলা লেখা নিঃশেষে পড়িতে পড়িতে হঠাৎ একটি শব্দে আটকাইয়া গেলাম। শব্দটি “উদ্ধৃত পত্র”। বুলিলাম, ইংরেজী “Balance sheet” কথাটাই বাংলায় এই রূপ পরিগ্রহ

করিয়াছে। কিন্তু Balance sheet-এর বাংলা কি “উদ্ধৃত পত্র”? অভিধানে দেখিলাম, “উদ্ধৃত” মানে “অবশিষ্ট” বা remainder বা residue। কিন্তু Balance sheet কথায় তাহা বুঝায় না! যে অর্থে balance, নিক্তি বা তুল্যদণ্ড, শুধু সেই অর্থেই কথাটি প্রযোজ্য। হুতরাং উদ্ধৃত পত্র বা উদ্ধৃত পত্র ঠিক নহে। সাধারণত Balance sheetকে বাংলায় আয়-ব্যয়ের হিসাব বলা হয়, আরও একটি অসাধারণ শব্দ আছে—“নিকাশী রেওয়া” অথবা “রেওয়া মিলানি”। ইহা অপেক্ষা যদি আরও উপযুক্ত কোনও প্রতিশব্দ থাকে তাহা জানাইয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীঅধিলানন্দ আইচ।

সম্পাদকের উত্তর: আমাদের মতে Balance

sheet-এর একমাত্র বাংলা প্রতিশব্দ “ব্যালান্স শীট”। লেখক “আয়-ব্যয়ের হিসাব” পছন্দ করিয়াছেন, কিন্তু ইংরেজির প্রতিশব্দ অত সহজ হইলে লোকে পছন্দ করিবে না। হুতরাং আরও একটি প্রতিশব্দের কথা উল্লেখ করি। বাঙালী সাধা অসাধা অনেক কিছুই করে, কিন্তু কোনো কিছুতেই ব্যালান্স রক্ষা করিতে পারে না। বাঙালীর দড়ির খেলা দেখিয়াছি, ব্যালান্স দেখি নাই; টাকার খেলা দেখিয়াছি, ব্যালান্স দেখি নাই; হুতরাং অল্পবাদেও ব্যালান্স দেখিব, এক্ষণে আশা করি না। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেও আয়-ব্যয়ের যে হিসাব দেখি তাহাতে ফাজিল অক ছাড়া আর কিছু দেখি না। হুতরাং Balance sheet-এর প্রতিশব্দ হিসাবে যদি কেহ “ফাজলামি” শব্দটি ব্যবহার করে তাহা হইলেও বিস্তৃত হইব না।

প্রাক্তনী ও লীনায়িতা *

প্রাক্তনী প্রাক্তনী গ্রন্থে শকুন্তলা, মহাশ্বতা, পত্র লেখা, বসন্তসেনা প্রভৃতি কয়েকটি প্রাক্তনী নারী-মহীয়সীর উপরে দীর্ঘ কবিতা আছে। কবিতাগুলির মধ্যে অনেককয়টিই সাময়িক পত্রে ইতিপূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে।

হুশীলবাবু পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত, কবি-খ্যাতিও তাঁহার সামান্য নহে। আলোচ্য গ্রন্থে তাঁহার পাণ্ডিত্যের ও কবিত্বের সমন্বয় দৃষ্টিগোচর। দীর্ঘকাল শাস্ত্র আলোচনার কলে মনের জড়তা কাটিয়া গিয়া যে ভাবের আবির্ভাব ঘটে এই কাব্যের ভাষায় ও ছন্দে তাহারই অব্যাহত দৃষ্ট হয়। বঙ্গ সাহিত্যের বর্তমান অরাজকতার যুগে ইহার মূল্য অসামান্য, শ্রেষ্ঠ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বাঙালীর জাতীয় জীবনে একটি যথেষ্টাচারের ভাব আছে। এ জাতির ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ সকল কর্তব্য ও চিন্তা যেন বিনাস্ত্যায় গাঁথা মালা; একটু নাড়া পাইলেই আলগা হইয়া থগিয়া পড়ে। এই শৈথিল্য বাঙালীর সাহিত্যে যেমন চোখে পড়ে, এমন আর কোথাও নহে। একদল লোক এই শৈথিল্যকেই জাতীয় সম্পদ বলিয়া প্রচার করিতেছেন। তাঁহাদের মতে ইহাতেই নাকি বাঙালী জাতির বৈশিষ্ট্য। ইহাতে যে বাঙালী অস্বাস্থ্যের অপেক্ষা বিশিষ্ট হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই, তবে বড় হয় নাই। ছুঁথের বিষয়, বাঙালীর আধুনিক সাহিত্য এই

শনিবারের চিঠি

২৩৩

যথেষ্টাচারের দ্বারা একান্তভাবে পীড়িত। এই যথেষ্টাচারের নূলে মনঃপ্রবর্তনের অভাব, ইচ্ছাশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করিবার অভাব, পাণ্ডিত্য ও অহুশীলনের অভাব; প্রতিভার অভাবের কথা নাই তুলিলাম।

এই যথেষ্টাচারের চোরাবালির দেশে হুশীলবাবুর প্রাক্তনী শাশ্বত স্মরণীয় মর্ম্মর-বেদীর মত দৃঢ় ও উজ্জ্বল, যথেষ্টাচার-স্বাক্ষর বাঙালী পাঠক যে ক্ষণকালের জ্ঞান এখানে স্বদৃঢ় আশ্রয় পাইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। শব্দবিজ্ঞানে, ছন্দলালিত্যে, felicity of phrase-এ, একটি বিশেষণের মধ্যে অভূতপূর্ণ ভাবের সঞ্চারে, এবং সংস্কৃত কাব্যের classical-জগতের ঐশ্বর্য্যকে চোখের সমুখে আনয়নে হুশীলবাবুর দোহর নাই। কাব্যধার্ম্মিক যদি আদর না হয় তাহা হইলে নিশ্চিন্ত হইব। বুদ্ধিব হুশীলবাবু লোকোক্তার কবি, কাজেই লোকে তাঁহাকে বুদ্ধিতে পারিল না। আমরা জানি, হুশীলবাবুও জানেন, বাঙালী পাঠকের বর্ত্তমানে যাহা দশা, তাহাতে স্ব-কাব্য তাহার পড়িবে না, পড়িলেও বুদ্ধিবে না। তবে যদি কোনো পথজ্ঞান পাঠক অকস্মাৎ এই রূপকথার অপকল্প জগতে পদার্পণ করে তবে সে দেখিতে পাইবে বঙ্গসাহিত্যের দুত্তর সমুদ্রপারে কাব্যের একধারি magic casement রসপিপাসুর জ্ঞান চিরকাল উন্মুগ্ন হইয়া আছে। কবিকে জিজ্ঞাসা করি, ইহার অপেক্ষা বড় সাহসনা আর কি কিছু আছে?

লীনায়িতা কতকগুলি সংস্কৃত কবিতাকবীর অহুবার।

ভারত-সরকার প্রাচীন ঐতিহাসিক কীষ্টি রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সেগুলিকে কেহ নষ্ট করিলে সে আইন-অহুসারে দণ্ডিত হয়। ঐতিহাসিক কীষ্টি বলিতে প্রাচীন প্রাসাদ, মিনার, স্তম্ভ প্রভৃতি বুঝায়। আমাদের মনে হয়, এই আইনের অর্থকে আরও ব্যাপকতর করিয়া তদাধো প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য সমূহকেও ফেলা উচিত।

* হুশীলবাবুর দে প্রণীত, শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরী, ২-৪, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা কর্তৃক প্রকাশিত।

মনে বন্ধন, কেহ যদি বিজ্ঞমাদিত্যের কোনো শিলালিপি নষ্ট করে তবে সে দণ্ডিত হয়, কিন্তু কেহ কালিদাসের কাব্যকে নষ্ট করিলে কেন যে বেকশ্বর বাঁচিয়া যাইবে তাহার কারণ বুঝিয়া পাই না।

সম্প্রতি বাংলা সাহিত্যে অহুবাদের ধুম পড়িয়া গিয়াছে। সত্যেন্দ্রনাথ সাহিত্যিক-প্রেরণা হইতে অহুবাদ করিতেন। কিন্তু আধুনিক অহুবাদের প্রেরণা ব্যবসায়িক। বাজারে যাহা কাটে, সেই জাতীয় সাহিত্যের অহুবাদ হয়। একটু রংদার না হইলে বাজারে বই কাটে না, কাজেই সাকী-মার্ক। ওমর খৈয়াম, নিতিনী-মার্ক। গীত-গোবিন্দ, গীরিত্তি-মার্ক। চণ্ডীদাস, শিরাজী-মার্ক। আরব্যোপদ্রাস, সুড়ঙ্গ-মার্ক। বিভাসুন্দর বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু আরো যে চাই। কাজেই অল্প কোনো ব্যক্তিকে লে-লে-লে ভর পিয়লা মার্ক। মেঘদূতের এক বাংলা অহুবাদ বাহির করিতে হয়। ভারত-বর্ষের অল্পতম শ্রেষ্ঠ কবিকে এতবড় অপমান আর কেহ করে নাই; বোধকরি ভারতবর্ষ ছাড়া অন্য দেশে ইহা সম্ভব হইত না।

ভারতীয় দণ্ড-বিধিতে Defamation-এর আইন আছে। সে আইন অহুসারে প্রায়ই লোকে দণ্ডিত হয়। এই-জাতীয় অহুবাদের কথা কালিদাসের বহুকালস্থায়ী কবিখ্যাতিকে অপমান করাতে কেন যে দণ্ডিত হইল না বুঝিয়া পাই না। কালিদাসের গুয়ারিশ কেহ নাই সত্য, কিন্তু যাহা লইয়া সকলেই গৌরব করে, তাহার অপমানে দেশবাসীর বাদী হইয়া নালিশ করা উচিত ছিল। কিন্তু যে কৃতজ্ঞ-দেশবাসী—এই অহুবাদ লুকভাবে পাঠ করে তাহারাই করিবে নালিশ! হতভাগ্যেরা পিটুলিগোলা জল-পান করিয়া দুহুপানের সাধ মিটায়! এই সকল অহুবাদ পাঠ করিয়া কালিদাসের রস গ্রহণ করে।

লীলায়িতার অহুবাদের মত এমন সরস, যথার্থ অহুবাদ দেখি নাই। ইহাতে মূল কবিতার স্বাদ আছে, তদুপরি অহুবাদের রুচিও আছে। মূল কবিকে উপলক্ষ করিয়া অহুবাদক বাহাদুরী দেখান নাই। মূলের formকে এমন সুন্দর ভাবে বজায় রাখিয়া সংস্কৃত কবিতার এমন সরস অহুবাদ দেখি নাই। যাহারা কাব্য-অহুবাদ করিতে চান তাঁহাদের পক্ষে এ গ্রন্থ দৃষ্টান্তস্বরূপ। রসিকের পক্ষে ইহা অবসর-বিনোদনের শ্রেষ্ঠ উপায়।

উপরি-উক্ত দুইখানি গ্রন্থের জন্তই হুশীলবাবু বাঙালী কাব্যরসিকের কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

‘বিজ্ঞানসারসংগ্রহ’ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিজ্ঞপ্তি

কার্তিক সংখ্যা ‘শনিবারের চিঠিতে’ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য ‘বিজ্ঞানসারসংগ্রহ’ সম্বন্ধে যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত করিয়াছেন, সে-সম্বন্ধে আমার কোন বক্তব্য আছে কিনা সম্পাদক মহাশয় তাহা জানিতে চাহিয়াছেন। বক্তব্য কিছুই নাই, কারণ তিনি নিজেই আমার যন্ত্রস্থ পুস্তকের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তবে এই স্থযোগে আমার পুস্তকে ‘বিজ্ঞানসারসংগ্রহ’ সম্বন্ধে যাহা আছে তাহার প্রতি যতীন্দ্রবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

‘বিজ্ঞানসারসংগ্রহ’ সম্বন্ধে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় আমার যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় তাহা ১৩০৮ সালে লেখা। তখনও আমি উহার কোন সংখ্যা দেখি নাই, ১৮৩৩ সনের ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখের ‘সমাচার দর্পণে’ ‘বিজ্ঞানসারসংগ্রহ’র সমালোচনা দেখিয়া অতুমান করিয়াছিলাম উহা ১৮৩৩ সনের আগষ্ট মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। তাহার পর আমি ‘বিজ্ঞানসারসংগ্রহ’র প্রথম দ্বিতীয় ও অন্ত্যান্ত অনেকগুলি সংখ্যা বিভিন্ন স্থানে দেখিয়াছি ও উহার বলে প্রকাশকাল-সম্বন্ধে বতীন্দ্রবাবু যে অতুমান করিয়াছেন তাহা ঠিক বলিয়াই বিবেচনা করিতেছি।

বিবেচনা করিতেছি বলিলাম এই জন্ত যে প্রথম সংখ্যা ‘বিজ্ঞানসারসংগ্রহে’ কোন তারিখ নাই। তবে উহা যখন পাক্ষিকপত্র এবং উহার দ্বিতীয় সংখ্যা যখন সেপ্টেম্বর মাসে এবং পঞ্চম সংখ্যা যখন নবেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়, তখন উহার প্রথম সংখ্যা সেপ্টেম্বর মাসেই প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া ধরিয়া লওয়া সম্ভব। তাহা ছাড়া ১-৩৩ সনের ২৮এ সেপ্টেম্বর তারিখে “দি ক্যালকাটা কুরিয়ার” নামক ইংরেজী সংবাদপত্রের নিয়োক্ত অংশ পাঠ করিলেও বুঝা যায় যে সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম পক্ষেই ‘বিজ্ঞানসারসংগ্রহ’ প্রকাশিত হইয়াছিল :—

“We have received the two first numbers of the Begyana Sar Sungwho, or Hindu Manual of Literature and Science...” (Supplement to the Calcutta Courier for Sep. 28, 1833.)

যতীন্দ্রবাবু এই পত্রিকাখানির প্রথম সংখ্যা দেখেন নাই বলিয়া উহার ইংরেজী নাম সম্বন্ধে একটু ভুল করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে ‘বিজ্ঞানসারসংগ্রহ’র ইংরেজী নাম প্রথমে ‘Manual of Literature and Science’ ছিল, দ্বিতীয় পর্ধ্যায় হইতে ‘Hindu

Manual of Literature and Science’ হয়। ইহা ঠিক নহে, কারণ প্রথম হইতেই ‘বিজ্ঞানসারসংগ্রহ’র ইংরেজী নাম যে ‘The Hindu Manual of Literature and Science’ ছিল তাহা উপরে উদ্ধৃত ‘ক্যালকাটা কুরিয়ার’র সংবাদ ও প্রথম সংখ্যার গোড়ায় উহার যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা হইতেই বোঝা যায়। বিজ্ঞপ্তিটি এই—

PROSPECTUS

The undersigned purpose to conduct a Literary and Scientific Journal, in Bengalee and English, to be entitled “The Hindoo Manual of Literature and Science,” or বিজ্ঞান সার সংগ্রহ.

পরিণেয়ে বলি, যতীন্দ্রবাবু যে বলিয়াছেন, সংবাদপত্রের ইতিহাস সম্বলন কোন এক ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়, উহা খুবই যথার্থ। পুরাতন বাংলা সংবাদপত্র ৩ বই সম্বন্ধে বহু বৎসর ধরিয়া গবেষণা করিয়াও ‘বিজ্ঞানসারসংগ্রহ’র প্রথম দুই খণ্ড যে বন্ধীয়-সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাগারে আছে তাহা তাঁহার চোখে পড়ে নাই। আবার তিনি এমন অনেক সংবাদ হয়ত প্রকাশ করিতে পারেন যাহা আমার পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই। এইরূপ সকলের সমবেত চেষ্টায় যদি বাংলা-সাহিত্যের অসম্পূর্ণ ইতিহাস সম্পূর্ণ হইয়া উঠে, তাহা হইলে অতিশয় আনন্দের বিষয় হইবে।

শ্রীত্রেজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সংবাদ-সাহিত্য

শক হন দল, পাঠান মোগল, এই ভারতবর্ষের দেহে জীন হইয়াছে কিনা জানিনা কিন্তু “ভারতবর্ষ” নামক কাগজে হইয়াছে। একই দেহে নানা-জাতীয় রক্ত প্রবাহিত হইতে থাকিলে কখন কোন জাতীয় কালচার চাগাড় দিয়া উঠে তাহা বলা শক্ত। যেখানে প্রাচীন অতীতের সন্ধান চলিতেছে, সেখানে হঠাৎ অতি-আধুনিক মাটির দেবতারও পূজা হয়, আবার একদিকে অতীত আয়ুর্ষেদের ইতিহাস খুঁজিতে খুঁজিতে আধুনিক বালভাবিতঃ “রোমা” দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইতে থাকে।

—

আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর স্মরণ্য আগতপ্রায়। আমরা জানি, সংখ্যা-শাস্ত্রে মধ্যপন্থাই গণনার শ্রেষ্ঠ পন্থা বলিয়া স্বীকৃত হয়। দার্শনিকগণও বিখ্যাত নির্ণয়কালে এই মধ্যপন্থা ধরিয়াই অগ্রসর হন। কিন্তু সাহিত্য-ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা চলে না। বাংলাদেশের সাহিত্যিকগণ সকলেই শেষ পর্য্যন্ত চরমপন্থা আশ্রয় করিতেছেন। চরমপন্থা শ্রেষ্ঠ পন্থা না হইলেও চরম পন্থা ইহাতে সন্দেহ নাই। ইহা উপায় নহে, নিরুপায়ের অবলম্বন। ইহা পৌছাইয়া দেয় না, পথেই ঘুতাইয়া মারে এবং শেষ পর্য্যন্ত পথে বসায়। সাহিত্য এবং সৌন্দর্য্যকে মারিবার পক্ষে এই পন্থা প্রশস্ত। ঘুরিতে ঘুরিতে হাত পা ছুঁড়িয়া একাধা করা যায়—এ পন্থের আরম্ভও নাই, শেষও নাই, এবং ইহা এতই প্রশস্ত যে বঙ্গদেশের বহু সাহিত্যপন্থী এই পথে পা রেওয়া সত্ত্বেও স্থানাভাব ঘটে নাই।

—

এমন কি বাঁহারা পল্লীর সর্দার ক্ষেত্রে, নিরালস্য বসিয়া সাহিত্য-রচনা করিতেন বলিয়া জানিতাম, তাঁহারাও শেষে এই পন্থা ধরিয়াছেন। বোবী-সরস্বতীর দোষ নাই, স্বয়ং সরস্বতী দেবী এই পন্থা অহুমোদন করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। অভিশম্পাত দূরের কথা, পথিকগণের শিরে আশীর্বাদ বর্ষণ করিতে করিতেই তাঁহার জীবন শেষ হইয়া আসিল।

—

কিন্তু আমরা শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দেবীর কথা বলিতেছিলাম। তিনি যে ইন্দ্রনীলকে খাড়া করিয়াছেন সে আজ বিশ বৎসর হইল বাংলা গল্প-সাহিত্যের নাথকরূপে দেখা দিয়াছে। বহু স্থান হইতে প্রহার খাইয়া খাইয়া ইহার পিঠে কড়া পড়িয়া গিয়াছে, তবু দরদীজনের মেহের আতিশয্যে আজিও তাহার মৃত্যু হয় নাই। ইহার একই চরিত্র। কোথায়ও ইহার পরিবর্তন হয় নাই, কিন্তু তথাপি ইহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে না পারিলে গল্প জমিবে না, গল্পের মুখরোচকতা নষ্ট হইবে, এবং কেহ তাহা পড়িবে না, এক কথায় গল্পের মৃত্যু হইবে।

—

ইন্দ্রনীল যখন বলে—

“একটা কিছু করতে গেলে অনেক বাধা আসে, বিয় আসে, তাইতে ভয় পেয়ে পেছিয়ে গেলে কি চলে? বয়ঃ বল—প্রতিজ্ঞা কর—আমরা এগিয়ে চলব, আমরা তো সমাজে বাস করিনে সৈকত, আমাদের ভয় কি? আমরা কোন বাঁধনে জড়াইনি, ভেসে চলেছি মুক্ত-পক্ষ বিহীনমের মত। আমাদের বাঁধবে কে—আটকাবে কে? দুনিয়া

হুনিয়াই থাক, সে শুধু চোখে মোহের আঁজন লাগিয়ে স্বপ্নকে সফল করে তুলতে চাই—আমরা মিছে বাসর-ঘব না গড়ে সত্যিকার ইট কাঠে তৈরী প্রাসাদ গড়তে চাই—এসো।”

তখন অক্সাচীন পাঠকের সত্যকারের ইটকাঠে তৈরী বাড়িপানা নিশ্চয়ই স্বপ্নরূপে তাহার চারিদিকে ছলিতে থাকে—মুহুর্তের অল্প সেও ইন্দ্রনীলে রূপান্তরিত হইয়া, শেষ পর্য্যন্ত চারি আনা পরয়া খরচ করিয়া সিনেমা দেখিয়া আসে।

কিন্তু তথাপি ইন্দ্রনীল সর্বত্র হযত নিজের ভাষায় কথা বলে নাই। একস্থানে দেখিতেছি—

এ হচ্ছে ঠাণ্ডা প্রদীপের আলো, স্বাভাবিক, তাই চমৎকার। এতে চোখ জলে না, কেবল চোখই ঠাণ্ডা করে না, মনও ঠাণ্ডা করে। (?)

পৃথিবীতে বা পৃথিবীর বাহিরে কোথায়ও অস্বাভাবিক আলো আছে কি না আমরা জানি না। বোধ হয় প্রদীপের আলো-ছাড়া অল্প সব আলোই অস্বাভাবিক। অন্তত খরচের দিক দিয়া।

অগ্রহায়ণের ভারতবর্ষে “ছ’চাকার সওয়ার” নামক প্রবন্ধে একটি ছবি আছে। ছবির নাম “ফেরার পথে বাহনের অবস্থা।”—কিন্তু ইহার রকট উল্টা করিয়া না ছাপিলেও আমরা বাহনের অবস্থা বুঝিতে পারিতাম। আপাতত রকের অবস্থাটাই বেশি করিয়া চোখে লাগিতেছে।

“রিয়ালিষ্টিক গল্প” বলিয়া একটা কথা শুনা যাইত। কথাটি খুব বেশি শুনি না, কিন্তু এরূপ গল্প দুই একটি মাঝে মাঝে দেখি। গল্প কখন রিয়ালিষ্টিক হয় তাহা বুঝিতে পারি, কিন্তু রিয়ালিষ্টিক বিষয় হইলেই যে তাহা গল্প হয় না তাহা কে বুঝিবে? দ্বিধারা নামক একটি ‘গল্প’ দেখিতেছি। ইহার ঘটনাটি গল্প নহে, সমস্ত গল্পটাই একটা ঘটনা। অর্থাৎ সংবাদ। এমন কি নিছক সংবাদ। দৈনিক কাগজে এত বড় সংবাদ ছাপা যায় না, মাসিকে যায়। কিন্তু তবুও একটি গুরুতর পার্থক্য থাকে। সংবাদপত্রের সংবাদ সত্য বলিয়া লোকে গ্রহণ করিয়া পড়ে, কিন্তু মাসিকে ঘরোয়া সংবাদ ছাপা হইলে তাহা লোকে সত্য বলিয়া মনে নাও করিতে পারে। কাজেই তাহাকে গল্পের পোষাকে বাহির করিতে হয়। কিন্তু গল্পের নামে বা চেহারায় যে গল্পই দিতে হইবে তাহার কোন অর্থ নাই। বাজারে নীরস সংবাদের বড় অভাব, এমন কি মিথ্যা সংবাদও সহজে মিলে না। সরস সত্য সংবাদের প্রাচুর্য্যে দ্বিধারার মত সংবাদ ক্রমশই দুর্মূল্য হইয়া উঠিতেছে।

জনৈক কথা, খর ও স্বরলিপিকার লিখিতেছেন—

উদার প্রাণের নীলিমা

আখির মুকুরে উঠিছে ভাসিয়া—

চোখের লেন্স যে ভাবে অবস্থিত তাহাতে প্রাণের নীলিমা তাহাতে ভাসিয়া উঠিতে পারে কি না তাহা জানি না, কিন্তু সময়-বিশেষে পিস্তের হলুদিয়া ভাসিয়া উঠে ইহা জানি। কিন্তু চোখ যখন মুকুর হয় তখন সেই মুকুরে বাহির হইতেই কিছু প্রতিফলিত হইতে পারে—ভিতর হইতে ভাসিয়া উঠিতে পারে না, কারণ মুকুরের পশ্চাদ্দেশে পারা মাথান থাকে।

প্রবর্তকের ‘উপাসনা-মন্দিরে’ যে গবেষণা করা হইয়াছে তাহাতে আমরা বিচলিত হইয়াছি।

পুরুষের কাম জ্বদয়ে, নারীর কাম নয়নে। পুরুষের কাম অন্তরে, নারীর কাম বাহিরে। পুরুষের চেয়ে নারীকে কামমুক্ত করা সহজ।

কাম-ক্ষেত্র বিশেষ বহুকাল পূর্বে বাস্তবায়ন করিয়াছেন; আমরা কোন উপাসনা মন্দিরে অবগ্রহীতাহার একটা প্রতিধ্বনি শুনিব বলিয়া আশা করি নাই। কামশাস্ত্র মনোহর সন্দেহ নাই, কিন্তু অঙ্গের কোন অংশে কামের নিবাস ইহা জানিয়া কামকে স্থানচ্যুত কেহ করিতে পারিবে কি না সন্দেহ। আর ইহাই যদি সাধনার উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে সে সাধনার ফল কি হইবে তাহা আমরা জানি।

পরিচয়ের এক মাথাবিনী-মুগ্ধ কবি বলিতেছেন—

আমি ছিলুম ফাউন্ট-এর মতো; জানাঙ্কনের প্রথরতাপে
চিত্ত ছিল শুক

রুদ্ধ ভীত, যেন চৈত্রশেষের মরুভূমি।

তাতে আমার অতৃপ্তি ছিল না, এগিয়ে চলার কল্পবেগেই
পেয়েছিলুম আপন স্থিতি।

মধুর রসের আশ্বাদ? তাও পেয়েছি

তিথ্যাক্তাবে, বুদ্ধি দিয়ে;

কেন-না সে-মাধুর্যের

উৎসমূলে ছিল না কোনো শরীরিণী নারী; ছিল একটা
আব্যবষ্টাব্দ

আইডিয়া, ইনটেলেকচুয়াল বিউটি, যাকে আমি

ভজনা করেছি শেলীর

মতো, শব্দে স্বপনে নিদ্রা জাগরণে জীবনের হাটে

মরণের সমাধিতে।

কতদিন পথ চলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে গাড়ী-

মোটরের তোড়-কে আবশ্রিত

করেছি, তারি ক্ষণিক আভাসে বিমুগ্ধ হয়ে।

প্রায় শেলীর মতই মনে হইতেছে। শেলীর ইন্টেলেকচুয়াল বিউটি অবগ্রহীত প্রাইভেট গাড়িতে, ট্যাক্সিতে, রিকশায়, বাস-এ অথবা ট্রামে ঘুরিয়া বেড়াইত। আব্যবষ্টাব্দ বস্তুমাত্রই এইরূপে ঘুরিয়া বেড়ায়,

কেহ মিড-ডের শব্দ ভাড়াই, কেহবা মাথলি টিকিটে। কিন্তু কল্পবেগের সঞ্চার করিল কে? জানাঙ্কনের স্পৃহা?

যাহাই হউক, কাব্য-সরস্বতী নবজন্ম লাভ করিলেন। নূতন-রূপে তিনি কবির সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন—হাতে তোলাটাক খৈনি, মুখে চল্লিশ ইঞ্চি গৌর। দোস্ত হইতে দেবী হইল না। কারণ—

“টিকলো না এ স্থিতি; উঠলো ঝড়,

কাল বৈশাখী, হুরু হোল প্রবৃত্তির

তাওব নর্সন, এতদিনকার মুঢ় বঞ্চনার

প্রতিরুদ্ধ প্রতিঘাত।

উবে গেল জ্ঞানস্পৃহা। আকাশমুখী

অভীপ্সা; মাটি, পূল কালো

মাটি, তখন আমার পায়েয় তলার একমাত্র

নির্ভর—দি ওনলি রিয়ালিটি!

মিশে গেলুম মাটির সঙ্গে মাটি হয়ে; ক্লেদাক্ত

কদমই

তখন পরমায়ের প্রতিভূ।

এমন সময় ভূমি এলে—বর্ষার জ্বাল মেঘ

জানি না কোন ডিপ্রেশনে তোমার জন্ম,...

ডিপ্রেশনে নয়, রিপ্রেশনে।

উপরি-উক্ত কবির মাত্র জ্ঞানস্পৃহা উবিঘাছে, কিন্তু পরিচয়ে আর একজন আধুনিক কবি স্বয়ং উবিত্তেছেন।—

আজ আমি ডুবে যাবো, আজ আমি উবে যাবো,

আজ আমি তলাব অতলে।

আপত্তি নাই, কিন্তু সন্দেহ যেন কবিতার পাণ্ডুলিপিগুলি যাকে।

শিক্ষারতী নামক নব প্রকাশিত শিক্ষাবিষয়ক মাসিকপত্র “পাঠ্যপুস্তক নিরীক্ষাচন” নামক প্রবন্ধটিতে যাহা আলোচিত হইয়াছে

সে সখ্যে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। লেখক পাঠ্যপুস্তক প্রকাশকের দুরবস্থা আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, স্থলে নির্বাচনের জন্ত প্রকাশকগণ প্রতি বৎসর যে সব বই পাঠান, তাহা নির্বাচিত না হইলে স্থলের উচিত সেই সব বই ফেরৎ দেওয়া। আমাদের মতে, ফেরৎ দেওয়া উচিত নহে; অস্বস্ত ফেরৎ না দিলে স্থলের বিরুদ্ধে কিছুই বলা উচিত নহে। বহুলাল হইতেই লক্ষ্য করিতেছি, স্থলের উপকার হউক বা না হউক, পাঠ্যপুস্তক লিখিয়া বা ছাপাইয়া ব্যবসা করাটাই লেখক এবং প্রকাশকদের একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়া পড়িয়াছে। ফলে অপাঠ্য বই এত প্রকাশিত হইতেছে যে প্রতিযোগিতা না করিলে কোনক্রমেই চলিতেছে না। যেখানে প্রতিযোগিতা প্রবল, সেখানে লাভ কম হইতে বাধ্য। প্রতিযোগিতাও করিতে হইবে, অথচ গায়ে আঁচড়টিও লাগিবে না, ইহা বড়ই আশ্চর্য্য।

স্থলের শিক্ষক নিশ্চয়ই প্রকাশকদের নিকট হইতে বিনামূল্যে বই পাইবার জন্ত সাধ্যসাধনা করেন না, প্রকাশক নিজের গরজে বই পাঠান, খোশামোদ করেন, এবং বার বার দালাল পাঠাইয়া তাছর করিতে থাকেন। এদিকে টেক্সট বুক কমিটি বাধ্য হইয়া নির্বিচারে বই approve করিয়া বসেন, ফলে প্রকাশকগণও প্রায় পাইয়া অতিরিক্ত লাভের আশায় বইএর পর বই ছাপাইতে থাকেন। বাজারে যে কোনো ব্যক্তি পাঠ্যপুস্তক লিখিতেছেন, এবং তাহাতে এমন সব বিষয় ছাপা হইতেছে যে সখ্যে গ্রন্থকারের প্রচুর জ্ঞান নাই। বেত হাতে থাকিলেই যেমন শিক্ষকতা করা যায়, কলম হাতে থাকিলেও তেমন পাঠ্যপুস্তক লেখা যায়। আমাদের দেশে কোনো স্বেচ্ছাই অধিকার-অধিকার ভেদ নাই, যাহার বাহা খুশী করিতেছে। কাজেই

প্রকাশকদের জন্ত দুঃখ না করিয়া (কারণ তাহারা ঠিকিবার জন্ত প্রস্তুত হইয়াই কার্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন) নিরুপ্ত শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক কেন অমুমোদিত হয় তাহার জন্তই দুঃখ করা উচিত।

টেক্সটবুক এবং তাহার অর্থপুস্তক ছেলেরা কেনে এবং মুখস্থ করে। শিক্ষকের নিজের কৃত্তি ইহাতে কতখানি আছে তাহা বুঝা যায় না। কারণ, বাজারে কোনখানা ভাল বই, এবং কোন খানা পড়িলে ছেলেরা উপকৃত হইবে তাহা না দেখিয়া যদি অম্বুরোধে পড়িয়া পাঠ্য নির্বাচন করিতে হয় তাহা হইলে ধরিয়া লইতে হইবে শিক্ষকের স্বার্থ নষ্ট হইয়াছে। স্বার্থ নষ্ট না হইলে বাজারে এত বই বাহির হয় কিসের জোরে? উৎকৃষ্ট বই বেশি থাকিতে পারে না, এবং যদি সকল স্থলেই একমাত্র উৎকৃষ্ট বইই নির্বাচিত হয়, তাহা হইলে প্রকাশকের ব্যবসা-প্রবৃত্তি কিছু পরিমাণ দমিত হইতে পারে। যাহাদের বই উৎকৃষ্ট নহে তাহারা বিনামূল্যে বই পাঠাইবার জন্ত লালায়িত হয়। ইহা ছাড়া ইহার আর কি অর্থ হইতে পারে? কিন্তু পাঠ্য নির্বাচনে যেন স্থলের কোনই গরজ নাই—যেন তাহাদের বই না হইলেও চলে—এইরূপ একটা ভাব তাহারা দেখায়। যেন বই বিক্রয় এবং বই পড়নের একমাত্র গরজ প্রকাশকদের। শিক্ষকের মনোবৃত্তি যাহাদের তাহাদের জন্ত দুঃখ করিয়া কোনো লাভ নাই। প্রকাশকের আত্মসম্মান বোধ থাকিলে এরূপ হইতে পারিত না।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার জন্ত নির্বাচিত একখানি “হাইস্কীনে”র পুস্তকের ভাষা দেখিবার সুযোগ হইয়াছে। ফাইলেরিয়া প্যারাগ্রাফে লেখক বলিতেছেন—

Filaria Sangrinis Hominis, যটুক বা বাতশিরার জরের জমি। ম্লীপদ (গোদ), কুরণ্ড, দুধের মত প্রস্রাব হওয়া (chyle in urine), শীত করিয়া জ্বর আসার সঙ্গে বীচি ফোলা—

ছেলেমেয়েরা ইহা নির্দিষ্টারে পড়িতেছে। লেখক “বীচি ফোলা” ছাড়া অন্য কোনো ভদ্র ভাষা জানেন না। স্থূলপাঠো একরূপ অশ্লীলতা মার্জনীয় নহে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। বিজ্ঞানের নামে যে কোনো আবর্জনা পঠাপুস্তকে চালাইবার চুঃসাহস এদেশের লেখকের আছে।

শিক্ষাত্রতীর একটি রসিকতায় আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। আমেরিকার কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবাহ-বিজ্ঞান শিক্ষাদান সম্পর্কে লেখক বলিতেছেন—

আমেরিকায় হাঁচি, কাসি, নাক ডাকা, মনোমত ক্যাশানের পোষাক না পরা, প্রভৃতি কারণে সাধারণত বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটয়া থাকে। আমাদের দেশেও এই কারণগুলির অভাব নাই, যদিও ফলে বিচ্ছেদ ঘটে না। কিন্তু যেরূপ দ্রুত গতিতে আমরা “সভ্যতার আলোক” পাইতেছি, তাহাতে হয়ত শীঘ্রই এদেশেও এই সকল কারণে বিবাহ বিচ্ছেদের স্রোত আসিয়া পড়িবে। Prevention is better than cure—ভুলরায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এখন হইতেই এই বিষয়ের জন্য একখানি “চেয়ারের” বন্দোবস্ত করিলে বোধ হয় ভাল হয়।

সভ্যতার আলোক (বিজ্ঞপে, “আলোক”) না থাকায় আমাদের

দেশে যে সব কারণে স্ত্রীর পিঠের হাড় ভাঙে ঠিক সেই সব কারণে ও দেশে বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়। ইহার কোনটা ভাল তাহা অবশ্য আমরা এখনও হিসাব করিয়া দেখি নাই, কিন্তু বিবাহ-বিচ্ছেদ যেখানে আবশ্যক সেখানে উহা হওয়াই প্রয়োজন মনে করি।

বিবাহ-বিচ্ছেদ বর্তমান সভ্যতার একটি অপরিহার্য অঙ্গ— ইহাকে বাদ দিয়া কোনো মহাশয়ই স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে দেশকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে পারিবেন না। এমন কি বিক্রপ করা সঙ্গো না।

আন্তরিকতা এবং সরলতাই কবিতার শ্রেষ্ঠ গুণ। তাই, জয়শ্রীর কবিকে আমরা প্রশংসা করিতেছি।

শুভ লগনেতে নহে নহে মোর যাত্রার আয়োজন

অশুভ লগনে বিবাদের রাতে চলা মোর প্রয়োজন।

কবিতাটি অবশ্যই প্রয়োজনের তাগিদে লেখা।

শ্রীমূলতিকা পাল বলিতেছেন—

পৃথিবীর ইতিহাসের কথা জানি না, তবে পৃথিবীর ইতিহাস সঞ্চয়ে ঐহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন, একরূপ দৃষ্টান্ত (রাজার রাজ্য ভাগের) এক মাত্র ভারতবর্ষেই পাওয়া যায়। এ দেশেরই জনক রাজা সমস্ত রাজ্য কার্য করার অন্তরালে তাঁহারই স্বরণ লইয়াছিলেন।... আমাদের কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সকল কার্যের মধ্যেই পরম পিতাকে আশ্রয় করিয়াছেন।

এ সম্বন্ধে যথং রবীন্দ্রনাথের কোনো মত আছে কি না তাহা আমরা জানি না।

বাংলা দেশে কোনো কিছুই বেশি দিন স্থায়ী হয় না। সকীভ মৃত্যুমুখী, সাহিত্য মৃতকল্প, সমাজ মৃত, ধর্মের তো অস্তিত্বই পাওয়া যায় না। কিন্তু দুইটি জিনিস বোধ হয় টিকিয়া গেল। দিলীপকুমার রায়ের অস্টিমিডম্ এবং ভাওয়াল সম্মাসীর মোকদ্দমা।

হৃদুভি বলিতেছেন—

এ দিকে আটও ঢুকে পড়েছে বস্তার মত অন্দের বাহিরে।
মেয়েদের কাপড় পরায় আট, চুল বাঁধায় আট। তাদের
চলাবলাও আটটিষ্টক। ফ্যাশানের পর ফ্যাশান বদলাচ্ছে
জুতো আমার ক্রম পরিবর্তন, কথায় স্বর, থাওয়ায় ছন্দ।
সাহিত্যে আট, বক্তৃতায় আট, খিয়েটারে আট, চিত্রে আট—
আবার নামকরণেও আট। আট গ্যালারী, আট থিয়েটার
আট রেটেইরেট। এই এপিডেমিকের পূর্ক ইতিহাস যাই
হোক—বিজ্ঞান ও আট একই সময়ে দুই ভাই বোনের মত
পরস্পর মিশে গেল।

দুই ভাই বোন পরস্পর কিরূপ ভাবে মিশিয়া যায় তাহা লক্ষ্য
করিবার সৌভাগ্য আমাদের হয় নাই, কিন্তু আটের প্রভাবে উক্ত
সাম্প্রতিকস্থান কিরূপ অসহায় হইয়া পড়িয়াছেন তাহা দেখিতেছি।
মলাটের উপর হলিউডের কোনো অভিনেত্রীর কোটো এই অসহায়তার
সাক্ষ্য দিতেছে।

বিচিত্রায় শ্রীনীলিমা দাস “প্রথম রাত্রি”র পরিচয় দিয়াছেন।

নমুনা—

ক্ষণেক দাঁড়াও আজ মুক্ত ওই বাতায়ন পাশে,
বাতাস মরিয়া যাক তোমাদের তত্ত্বর স্বাশ্বাসে
উঠুক উথলি বৃকে উত্তরোল বাসনা জোয়ার
আজিকার রাত পরম চমৎকার!

চরম প্রতীক্ষা শেষে পরম স্বন্দর এই রাত,
অনেক আশার শেষে ছায়ায় বন্ধুর করাঘাত!

জোছানায় মধুকরে, বাতাসে সুরভি আসে ভাসি
দুটি প্রাণ যাপে পরম পৌর্ণমাসী!

জীবনে প্রথম স্বাদ, বাসনার সফল স্বপন;
নয়নের নভে ইন্দ্রধনুর রাগ!

অতনু লভিবে তনু—এলো তার পরম লগন!

দুজনের বৃকে উথলে প্রেম সোহাগ।

আশা করি দ্বিতীয় রাতে ছন্দের আরও উন্নতি হইবে।

বাঙালী যখন ইংরেজী বলিতে বা লিখিতে ভুল করে তখন তাহার
কৈফিয়ৎ স্বরূপ এই কথা শুনা যায় যে পরের ভাষা নিতুল ভাবে শিখিয়া
লাভ কি? ঠিক ইংরেজের মত ইংরেজী শিখিয়া মহামূল্য সময় নষ্ট
করিবারই বা কি সার্থকতা আছে? উহা দাস-মনোভাবের পরিচায়ক,
অতএব লজ্জিত হইবার কিছু নাই। অর্থাৎ অক্ষমতাকে সময়বিশেষে
গর্বের বিষয় করিয়া না তুলিতে পারিলে আমাদের আত্মসম্মানে আঘাত
লাগে। কিন্তু ইহাতে অল্প একটি স্থিতি আছে। বিদেশী ভাষা

শিবিবার লঙ্কা কর মানি হইতে মুক্ত হইয়া আমরা মাতৃভাষাটা নিভুল ভাবে শিখিতে পারিয়াছি। একখানি নব প্রকাশিত সাপ্তাহিক কাগজের ভাষা দেখিয়া এই কথাগুলি মনে পড়িল। ভাষার নমুনা—

যদি কুমারী চন্দনা সত্যই শারীরি হন... যে অদৈর্ঘ্যতা তিনি ভাষার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেছেন... কারণ কোনও কুমারী মেয়ে অতটা ব্যাপিকা হ'তে পারে না।

পরের ভাষা না শিবিবার গৌরব এবং নিজের পাঠায় যে কোনো স্থান কাটিবার অধিকার—এ দুইই আমাদের আছে।



ইংরেজি ভাষা জবাই করিলেও যে আমাদের ধনজন হৃৎসমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইবার পক্ষে কোনো বাধাই থাকে না, তাহার প্রমাণ অমৃতবাজার পত্রিকা। পত্রিকার ইংরেজিতে ইংরেজদের লজ্জিত না হইবারই কথা, কারণ তাঁহারা বাঙালীকে চেনেন। কিন্তু উহাতে বাঙালী লজ্জিত হয়, কারণ কীষ্টিটা বাঙালীর।



ছেলেদের কাগজেও ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। একখানি কাগজে দেখিতেছি—

বারোঘারী পুজায় তাহারা “তামসা” করিবে। ছেলের দলের নায়ক গোপাল পাটনীর ছেলে কহিল,—“আজ্ঞা তোমরা যাও, সময় মত জ্ঞানান যাইবে। তোমরা কি “তামসা” করিবে?”

—“রাম ভট্টাচার্য্য হুয়মান সাজিবে। ফেলু সাজিবে জাপুয়ান, কবরুয় রাবণ সাজিবে। যুদ্ধ হইবে। আর ফটিক ‘গারো’ সাজিয়া গান দিবে ও নক্সা দেখাইবে!”

যে ছেলেদের বাঙাল হইবার সৌভাগ্য হয় নাই, তাহারা এই তামসা উপভোগ করিবে কি না জানি না। কিন্তু সে চিন্তা না করিয়া লেখক নিজেই যদি নিজের লেখা উপভোগ করিয়া থাকেন তাহা হইলেই ছেলেরা কৃতার্থ হইবে।



দেশের ‘কাবোর রূপ’ দেখিয়া মুগ্ধ না হইয়া উপায় নাই। “অহু-ভূতি খেপানে নাই, স্থষ্টিও সেখানে নাই” যে লেখক বলেন, সেই লেখক বিশুদ্ধ অহুভূতির দ্বারা এরূপ দীর্ঘ একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন কি করিয়া? অহুভূতি মাত্রই যে স্থষ্টি নহে, এবং essay নহে, এবং explanation নহে, তাহা তিনি জানেন না। কাবোর রূপ দেখাইতে গিয়া নিজের কষ্টকল্পিত কতকগুলি উপমার নমুনা দেখাইয়াছেন। নিজেই কবি-কর্মে মত্ত হইয়া উঠিলে অস্ত্রের রূপ দেখাইবার ক্ষমতা আর থাকে না, কারণ তখন নিজেরই রূপ ব্যক্ত হইতে থাকে।



কাবোর রূপ, অথবা বিজ্ঞানের রূপ দেখাইতে গেলে, যাহা আবশ্যক তাহা উজ্জ্বল নহে; তাহার কারণ এই যে উজ্জ্বল কখনই কোনো সংবাদ বহন করে না, ইহা ব্যক্তিকে ছাড়াইয়াও যাইতে পারে না; কাজেই শ্রোতার বা পাঠকের বোধশক্তিকে তাহা স্পর্শ করে না। উজ্জ্বল যাহারা শোনে, তাহারা হয় কাঁদে, না হয় লাফায়। স্ত্রী সি. ভি. রমন যদি আলোর রূপ বুঝাইবার জন্য খোল-করতাল লইয়া কীর্তন গাহিতে থাকেন, তাহা হইলে আলো দূরের কথা, যাবতীয় চক্ষু অশ্র-বাপে ভারাক্রান্ত হইয়া চারি দিকে শুধু অন্ধকারই দেখিবে, আলো দেখিবে না।

ইহা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের বহু-ব্যবহৃত কতকগুলি উপমার অহুভূতির

স্বাধাও কাব্যের রূপ ব্যক্ত করিবার মত সাহস লেখকের আছে। “জীবনে বেজে উঠলো ছুটির বাশি”, “মুখ ভুলে চাইলে উপেক্ষিতা প্রকৃতির দিকে”, “জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে তারার সঙ্গে চলেছে ফুলের চোখে চোখে কথা”, পুষ্পের ললাটে চুখনের স্পর্শ, “সবুজ ঘাসের কোমল গালিচার উপর”, “অহুত্বের সোনার কাঠি”, “আটের অমরাবতীতে” “প্রাণের বীণায়”, “কুন্তবীণা”, “শিশির-কলমল”—ইত্যাদি। —ওঘাওয়ারফুল!

প্রাপ্তি স্বীকার ও অভিমত

লীলান্বিতা : শ্রীশীলকুমার দে প্রণীত। প্রকাশক শ্রীশুরলাইব্রেরি। ২০৪ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট কলিকাতা। মূল্য একটাকা।

প্রাক্তনী : শ্রীশীলকুমার দে প্রণীত। প্রকাশক ক্রি। সমালোচনা অঙ্কুর প্রকাশিত হইল।

অবসর : গল্পের বই, লেখক শ্রীরবীন্দ্রকুমার বহু। প্রকাশক শ্রীপেন্দ্র নাথায়ণ সেন গুপ্ত, ৫৭ এ, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা। ১২৪ পৃঃ মূল্য ১।০। চারিটি গল্পের সমষ্টি। গল্প রচনা করিতে কোন কোন অবস্থায় নায়ক বা নায়িকা বা অঙ্কুর চরিত্রকে প্রকাশ করিতে হইবে অথবা সেই সেই অবস্থায় তাহারা কিরূপ ব্যবহার করিবে কিরূপ কথা বলিবে তাহা লেখকের জ্ঞান নাই। লেখক তাহারিগকে দিয়া জোর করিয়া যাহা করা ইচ্ছাছেন তাহারা তাহাই করিয়াছে—ইহাতে গল্পের সৌন্দর্য্য ক্ষুণ্ণ হইয়াছে—প্রটের দিক দিয়াও কোথাও কোনো বিশেষত্ব দেখিতে পাইলাম না।

শ্রীজগন্নাথবল্লভ নাটকম্ : শ্রীল রামানন্দ রায় প্রণীতম-রায়োপাধিকেন শ্রীজ্যোতিষক্স শর্দনা সম্পাদিত-মহাবাদিতক। প্রকাশক শ্রীনির্মলকুমার রায়। ৩৮ নং জামাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা। সমালোচনা পরে প্রকাশিত হইবে।

“বঙ্গী ভিকিৎসা” : শ্রীঅপরূপক্স চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক, গুপ্তকালয়, হোমিও কেমিষ্ট, বুক পাবলিশার এন্ড পেপার মার্চ্যাণ্ট, রাঁচি। সমালোচনা পরে প্রকাশিত হইবে।

সুজনেনী : শ্রীমতিলাল রায় প্রণীত। প্রকাশক প্রবর্তক পাব্লিশিং হাউস, ১১, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১।০। সমালোচনা পরে প্রকাশিত হইবে।

সুজনের কবর : শ্রীবাসুদেবজনাথ ঠাকুর প্রণীত, মূল্য এক টাকা। কবিতার বই। তরুণ কবির ইহা প্রথম গ্রন্থ। স্বতরাং স্বরের কবর ইহা নহে। স্বর ঠিক আছে তবে ইহাতে যে কিছু কিছু কাল্পনিক অভিজ্ঞতার অনাবশ্যক উগ্রতা আছে তাহারই কবর দিতে পারিলে কবি নিজের ক্ষমতার বিষয়ে সচেতন হইবেন। স্বরের কবর নহে, স্বরার কবর চাই। ক্ষমতাবিশয়ে সন্দেহান হওয়াতে এই বিভ্রান্ত ঘটিয়াছে। কবির সহজ কবিত্ব শক্তি আছে, তাহাকে তিনি এত অবহেলা করিতেছেন কেন?

প্রেম ও নিরহ : শ্রীশিবচন্দ্র বিজ্ঞাবিনোদ প্রণীত। প্রকাশক, বেঙ্গল পাবলিশিং হোম। ৫ নং মহম্মদ লেন, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা। সমালোচনা পরে প্রকাশিত হইবে।

২৫৫ কত্ৰা ১ শ্রীপ্রমথনাথ বিলী প্রণীত। প্রকাশক, রজন
প্রকাশালয়। ২৫১২ মোহন বাগান রো, কলিকাতা। মূল্য
এক টাকা। “প্রসঙ্গ-কথায়” আলোচিত হইল।

রবীন্দ্র মৈত্রেয় উদ্দেশ্যে চিঠি

শ্রীচরণে,

তুমি মরিয়াছ। কিন্তু তোমার ভাইটি বাঁচিয়া আছে।

তুমি মরিয়া ভালই করিয়াছ। কারণ তুমি মরিয়া বাঁচিয়াছ।

তুমি বাঁচিয়া থাকিতে তোমার ভাইটির আবির্ভাব হইলে তুমি বাঁচিয়া
মরিতে।

তোমার জীবনাশ্তে তোমার ভাইটি যে তোমার সঙ্গে দাদা-সম্পর্ক
পাতাইয়াছে তাহা তোমার সৌভাগ্যের কথা। কারণ, পরিচয় দিবার
সময় বহুজনে ইহাও বলিয়া থাকে যে আমি অমূকের “শালা”;—ইহার
তুরি তুরি উদ্বাহরণও আছে। (সম্প্রতি শ্রালীরাও আমি অমূকের
শালা বলিয়া পরিচয় দিতেছে (ন)। আর তোমার ভাইটি যে
একেবারে “স্বাদত শালা” (শনিবারের চিঠির নূতন পরিভাষা অচুযায়ী)
এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। তোমার সৌভাগ্য আর একটি
কারণে। তোমার ভাইটি যে-সে নহে—একেবারে প্রসাদ; নৈবেদ্য
নহে। তুমি ভাষা-জননী, তথা বাংলা মায়েয় পায়ের কাছে নৈবেদ্য
সাজাইতে আরম্ভ করিয়াছিলে—তোমার ভাইটি আসিয়া তাহা

একেবারে প্রসাদ করিয়া দিয়াছে। বিতরণও অনেক দিন আরম্ভ
হইয়াছে।

তুমি মরিবার পর তোমার নবপ্রকাশিত নাটকে সে তোমার তুর্পণ
ও পিণ্ডদান করিয়াছে। আশা করি তুমি স্বর্গে গিয়াছ। যদি গিয়া
থাক তাহা হইলে তোমার ভাইয়েরই কল্যাণে; ইহা স্বর্গে বসিয়াও
মান্ন মাঞ্ছ মনে করিও।

তুমি মরিবার আগে নাকি তাহাকে বলিয়াছিলে যেন তাহার
লেখনী হইতে দরজের বাখা জন্মন প্রকাশ পায়, পৃথিবীর সুখ-
সৌন্দর্যের উৎসের দিকে দাবিত হয়; ইহা সে নিজেই স্বীকার করে,
অর্থাৎ বলে ও বলিয়া বেড়াই। কিন্তু তুমি, তুমিই যে গোড়াতে ভুল
করিয়াছিলে। তুমি বাস্তবিকা লিখিয়াছিলে। তখন হয়ত ভাবিতেও
পার নাই যে তোমারই অপোগণ্ড এক ভাই বাস্তবের দিকে তাহার
পদুম মনকে দৌড়াইয়া লইয়া গিয়া ছ-চার পৃষ্ঠা লিখিয়া ফেলিবে।

তুমি মরিয়া ভালই করিয়াছ। তা না হইলে হয়ত তোমাকেও
তোমার ভাইয়ের দাদামহাশয়ের মত তাহার সাহিত্য সম্বন্ধে অভিমত
দিতে হইত যে ইহাতে তুমি intellectualism-এর গন্ধ পাইতেছ।
তোমার সৌভাগ্য!

তুমি নাই। তাই তোমার নামের সহিত তাহার নামের সংযোগ
করিতে সাহস পায়।

তুমি মরিয়াছ। কিন্তু বাংলার খবরের কাগজ-ওয়ালারা মরে নাই,
বাংলার প্রেসওয়ালারা মরে নাই। কলিকাতার অলি-গলিতে প্রেস
গল্লাইয়া উঠিতেছে। ছ একটা টাকা-ওয়াল লোক মোটা মোটা হুঁড়ি
ও ততোধিক মোটা বুদ্ধি লইয়া প্রত্যহ প্রকাশক সাজিয়া বসিতেছে।
তাহারই দৌলতে তোমার ভাই বই ছাপাইতেছে, আর বিজ্ঞাপন

দিতেছে—“যে বই যুগান্তর আনিয়াছে”; “শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ, অপূর্ণ সাহিত্য”। ব্যঙ্গ সত্যই সে করিয়াছে। কিন্তু কাহাকে তাহা সে জানে না। হায়রে মূৰ্খ!

তুমি মরিয়া বোধ হয় থারাপ কর নাই। কারণ নাট্যনিকেতনের বিজ্ঞাপনে দেখিতে পাইতেছি যে তোমার ভাইয়ের নাটক অভিনীত হইতেছে। তাহারা যে বাংলার রসপিপাসুদের জন্য এই অত্যদ্বুত হাস্যরসের রূপ দান করিল তাহার জন্য তাহারা ধন্যবাদার্থ। ধন্য এই বাংলার রঙ্গালয়! ধন্য বাঙালী!—তুমি মরিয়া ধন্য হইলে। তোমার ভাইয়ের কল্যাণেই তোমার খ্যাতি লাভ ছিল দেখিতেছি।

তোমার অকাল মৃত্যুতে লোকে শোক প্রকাশ করিয়াছে। Mirabeau সম্বন্ধে একটি কথা আছে—He did everything at the right moment and he died at the right moment. তোমারও তাই। জীবন্মৃত থাকা অপেক্ষা অকাল মরণ ভাল।

তুমি মরিয়াছ। তাই বলিতেছিলাম—তুমি মরিয়া বাঁচিয়া গিয়াছ।

ম. চ. স.

শ্রীপ্রবল গোখামী এম-এ কর্তৃক সম্পাদিত। ২৫২, মোহনবাগান রো, শনিরঞ্জন গ্রেস
হইতে শ্রীপ্রবোধ নান কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা পিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি



৮ম বর্ষ]

পৌষ, ১৩৪২

[৩য় সংখ্যা

লক্ষ্য ও উপায়

প্রায়ই দেখা যায়, মানুষ কোনো একটা লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য যে উপায় অবলম্বন করে, কিছুকাল পরে সেই উপায়টিই প্রধান লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াই এবং আদি লক্ষ্যটি দৃষ্টিপথ হইতে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যায় তাহার সম্ভান পাওয়া যায় না। কিন্তু যাহাতে মানুষ এক্রপ ভ্রম না করে, যাহাতে সে লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়, যাহাতে সে কৰ্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া দিশাহারা হইয়া না পড়ে, সে-জন্য চিন্তাশীল ব্যক্তিমাঝেই মানুষকে সতর্ক করিয়া দিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। অর্থাৎ মানুষের পক্ষে লক্ষ্য বিস্তৃত হওয়া এবং লক্ষ্যচ্যুত হওয়া এতই স্বাভাবিক, এবং লক্ষ্যের উপায়টিও সর্বদা লক্ষ্য-রূপান্তরিত হইবার পক্ষে এতই উপযোগী যে অনেক সময় ইহারই প্রতিবিধানকল্পে এক-একটি মিথ্যা লক্ষ্য কল্পনা করিয়া লইতে হয়। স্থখে থাকিবার জন্য, বাঁচিয়া থাকিবার

জ্ঞান, আমরা অর্থ উপার্জন করি। স্বপ্নে থাক। অথবা স্বপ্নে বাঁচিয়া থাক। লক্ষ্য, অর্থটি উপায়। এখানে লক্ষ্যটি মিথ্যা নহে। এমন নহে যে ইহা দ্বারা বাঁচিয়া-থাকারূপ একটা কাল্পনিক লক্ষ্য সৃষ্টি করিয়া বাহ্যতে আমরা অর্থ-উপার্জনে মনোযোগ রাখিতে পারি সেই ফন্সী করা হইয়াছে। কারণ, এমন দেখা গিয়াছে যে অর্থ-উপার্জন না করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার সুবিধা থাকিলে মানুষ অর্থ-উপার্জন করিতে চাহে না।

কিন্তু ফুটবলের মরশুমে আমরা ইহার বিপরীত জিনিসটি লক্ষ্য করি। গোলদেওয়াটা খেলার প্রকৃত লক্ষ্য কখনই হইতে পারে না, খেলার দ্বারা স্বাস্থ্যরক্ষাই লক্ষ্য। কিন্তু গোলদেওয়া-রূপ একটি মিথ্যা লক্ষ্য খাড়া না করিলে কেহই ফুটবল খেলাদ্বারা স্বাস্থ্যচর্চায় মনোযোগী হয় না। এখানে স্বাস্থ্যচর্চাই লক্ষ্য, খেলা এবং গোলদেওয়াটা অর্থাৎ খেলায় জয়লাভ করাটা তাহার একটি উপায়। উপায়টি অত্যন্ত সোভনীয় এবং সেইজন্য ইহাকে লক্ষ্যরূপে ধরিয়া লওয়া সহজ হইয়াছে।

অর্থ-উপার্জনের খেলা খেলিতে যদি এইরূপ বাঁচিয়া থাকার বিজ্ঞাটো চর্চা করা বাইত তবে অর্থ আমাদের লক্ষ্য হইলে ক্ষতি ছিল না, কিন্তু অর্থ বাঁচিয়া থাকিবার উপায় বলিয়াই মানুষের অনিচ্ছাসত্ত্বেও অর্থ লক্ষ্যে রূপান্তরিত হইয়া যায়। ইহার কোনো প্রতিকার নাই। সকল ক্ষেত্রেই এই রূপান্তর—উপায়ের লক্ষ্যে রূপান্তর—ঘটিতেছে। তাই আমাদের মনে হয়, এই রূপান্তর-ঘটনার ক্রিয়াটি বিজ্ঞানসম্মত। ইহার জ্ঞান মানুষকে সতর্ক করিয়া লাভ নাই। উপায় একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত উপায় থাকে, তাহার পরেই লক্ষ্যে পরিণত হয়। বৈজ্ঞানিকগণ হয়ত এই সত্যটি উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

ইহার-তরঙ্গের বৈধা যেমন একটা বিশেষ মাত্রা পর্যন্ত আমাদের চোখে বর্ণ বলিয়া প্রতিভাত হয় এবং সেই মাত্রা ছাড়াইয়া গেলেই অবর্ণনীয় হইয়া উঠে, উপায়ও সেইরূপ। উপায়েরও ঠিক তেমনি একটা মাত্রা আছে। পূর্বেই বলিয়াছি, বাঁচিবার উপায় অর্থ। জীবনের উপর যতদিন লোভ থাকে ততদিন বাঁচিয়া থাক। টাই যে লক্ষ্য এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি একবার প্রাণের মায়া ত্যাগ করিতে পারি, তাহা হইলে কোনরূপ ব্যতিক্রম না হইয়া টাকাটাই আমার লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইবে। অল্প কথায়, টাকাটাই লক্ষ্য হইলে বাঁচাটা সেই টাকা-উপার্জনের উপায় হইতে বাধ্য।

যাহারা বেতনের নির্দিষ্ট টাকাকে অগ্রাহ্য করিয়া অনির্দিষ্ট-পরিমাণ টাকা উপার্জনের পথ আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহারা যে টাকা-উপার্জন-কেই লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন একথা বলাই বাহুল্য। দালালি করিয়া বা রেস খেলিয়া যাহারা একবার অতি-উপার্জনের স্বাদ পাইয়াছেন, তাহাদিগকে পাখি কোন শক্তিই আর উক্ত পথ হইতে ফিরাইয়া আনিতে পারিবে না। বহু লোককে দেখিয়াছি, যাহারা টাকার মায়ায় জীবনের মায়া বিসর্জন দিয়াছেন।

বহুদিন পূর্বে শুনিয়াছিলাম, স্বরাজ্যলাভ আমাদের জাতীয় জীবনের একটা উদ্দেশ্য। স্বরাজ্যরূপ লক্ষ্যে পৌঁছিবার জ্ঞান বাঙালী নানারূপ উপায়ও অবলম্বন করিয়াছিল, কিন্তু আজ দেখিতেছি, উপায়গুলিই লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফলে স্বরাজ্যও দৃষ্টিপথ হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে। ইহার জ্ঞান যতগুলি উপায় উন্মুক্ত বলিয়া মনে হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশই উপযুক্ততার পরীক্ষায় বাতিল হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তথাপি সেই বাতিল-হওয়া উপায়গুলিকে আমরা আর কোনক্রমেই ত্যাগ করিতে পারিতেছি না। কি উপায়ে জ্ঞাত স্বরাজ্য লাভ হয় ইহা লইয়া

বহুদেশে একবার দুই দলে বিবাদ হইয়াছিল, এখন সেই বিবাদটিই স্থায়ী লক্ষ্যে রূপান্তরিত হইয়াছে। এবং যদিও লোকে এখন বুঝিয়াছে, চরকাই স্বরাজ হইবে না (কথা ছিল, চরকাই স্বরাজ হইবে) কিন্তু স্বরাজ হয় নাই, তবুও চরকাটি রহিয়া গিয়াছে।

সাহিত্য-সৃষ্টি, মত-প্রচার, সমাজ-সেবা, বা অন্য একটা-কোনো উদ্দেশ্য লইয়া এককালে সাময়িক পত্রাদি বাহির হইত। ইহার জিল উপায়স্বরূপ, লক্ষ্য ছিল পৃথক। কিন্তু বহুদিন হইল লোকে লক্ষ্যটি ভুলিয়া গিয়াছে, সেইজন্য এদেশে কেবল কাগজই বাহির হইতেছে, এবং নিত্য নূতন কাগজ বাহির করাই বাঙালীর একমাত্র লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কাহারই কোন মত নাই, কেন কাগজ বাহির করিতেছে তাহাও অনেকে জানে না, অথচ দিনের পর দিন কাগজ বাহির করিয়া চলিয়াছে।

অজ্ঞাত জাতির মত বাঙালীদের মধ্যেও, যাহারা চাকরি করে, তাহারা বৎসরে কতকগুলি ছুটি পায়। কার্যস্থান হইতে বাহিরে গেলে অনেক সময় ছুটির আনন্দ উপভোগ করিবার বেশি সুবিধা হয়। এখানে আনন্দটাই লক্ষ্য, বাহিরে যাওয়াটা তাহার উপায়। কিন্তু এই উপায়টিও লক্ষ্যে রূপান্তরিত হইয়াছে। এখন ছুটি হইলেই বাঙালী ট্রেনে চাপিয়া বসে। গাড়ীতে ভিড়ের পর ভিড় জমিতে থাকে, শেষে দাঁড়াইবারও জায়গা পাওয়া যায় না। লটবহর, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা প্রভৃতি লইয়া চরমতম চাপে ভোগ করিতে করিতে বাঙালী বাহিরে যায়। মান-সম্মত বিসর্জন দিয়া, পুত্র মত দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া, অনাহারে, অনিদ্রায়, জামা-কাপড় ছিড়িয়া, টাকাকড়ি হারাইয়া, বাঙালী বাহিরে যায়। আমাদের জীবনের যেট চরম লক্ষ্য, অর্থাৎ ধর্ম, তাহাও আমরা উপার্জন করিতে বিদেশে যাই। সমগ্র বাঙালীর জাতীয় জীবনে ইহার চেয়ে লজ্জাকর আর কিছুই নাই। কিন্তু অনিবার্যকে কে নিবারণ করিবে?

শিল্পে, সাহিত্যে, ধর্মে, কর্মে, ব্যবসায়, বাণিজ্যে, শিক্ষায়, দীক্ষায়, সমাজে, রাষ্ট্রে, উৎসবে, বাসনে, সর্বত্র আমরা লক্ষ্যটাকে দূর করিয়া দিয়াছি। এবং দূর-করিয়া দিয়া তাহার স্থানে উপায়গুলিকে লক্ষ্য হিসাবে বসাইয়াছি। লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলে মৃত্যু অনিবার্য জানিয়াও আমরা নিশ্চিন্ত আরামেই ত দিন কাটাইতেছি! কোনো লক্ষ্যই যখন আমাদের নাই, তখন উপায়গুলিকেই লক্ষ্য মনে করিয়া যদি দুইটি দিনও আরামে কাটাইতে পারি তবে আর গোলমাল করিয়া লাভ কি? মৃত্যু যদি আসে তবে তাহাকে রোধ করিবে কে? মৃত্যু কি কাহাকেও খাতির করে?

এক কলম

ঘোড়ার আগে গাড়ী

ইংরেজী প্রবাদে, ঘোড়ার আগে গাড়ী জুড়িবার অপবাদ আছে। কিন্তু ঘোড়ার আগে গাড়ীই আদর্শ, সব দর্শনশাস্ত্রেই বলে। বই-এর আগে ভূমিকা। ভূমিকা লেখা হয় সকলের শেষে, বসে সকলের আগে। বইয়ে যথা ভাষিত, ভূমিকায় তাহার আভাস। বইয়ে প্রমাদলঙ্ঘন, আর ভূমিকায় অসুমানলঙ্ঘন সত্য। তথ্যের আগে সত্য; সত্য আসে পরে কিন্তু বসে আগে।

রামের সত্যের নাম রামায়ণ; তাই লোকের কল্পনা, রামায়ণ-রচনার কাল-নির্দেশ করিয়াছে রামের জন্মের আগে। মাছুষের জন্মের পরে

দেওয়া হয় নামটা, মৃত্যুর পরেও সেটা থাকিয়া যায়, কারণ নামটাই সত্য। এই নামরূপ শব্দ; এই শব্দসত্তা বস্তুর চেয়ে বড়, তাই সকল সৃষ্টির প্রারম্ভে ছিল শব্দ, যার অপর নাম ব্রহ্ম।

বিজ্ঞাপন মারিও

প্রাচীরের গায়ে প্রায়ই দেখি, মোটা কালির অক্ষরে ক্রকুটি করিয়া আছে 'বিজ্ঞাপন মারিও না।' ইচ্ছা করে, আমার বাড়ীর দেয়ালে (বর্তমানে বাড়ী নাই) লিখিয়া রাখি, 'বিজ্ঞাপন মারিও।' ইহার প্রধান অন্তরায় একপানি বাড়ী তোলা; তাই মনে হয়, রাতারাতি শালা চূণের পোচে 'না'-অক্ষরগুলির নেতি-জন্মের ব্যর্থতা ঘুচাইয়া দিই।

বিজ্ঞাপন মারিও; কেবল একটি অম্লরোধ, বিজ্ঞাপনের কাগজগুলি সোজাভাবে মারিও না। যে ভাবেই দেখ, ইহাতে বিজ্ঞাপনের সার্থকতা। যে-লেখা দেখামাত্র পড়া যায়, তাহা কেহ পড়ে না। মিশরের চিত্রাকর-বর্ণমালাকে তখনকার লোকে নিশ্চয়ই দেখিয়াও দেখিত না; আর আমাদের তাহা দেখিয়াও আশা মেটে না; ইহার প্রধান কারণ, আমরা সে ভাষা ভুলিয়া গিয়াছি; সত্য কথা বলিতে কি, ওই অক্ষরগুলি আজ আর শুধু অক্ষর নয়, চিত্রাকর। এবং ইহাও নিশ্চয় জানি, আমাদের এই বর্ণ-বৈচিত্র্যহীন বর্ণমালার প্রতি, পাঁচহাজার-বছর পূর্বের মানুষ বিম্বিত ঔৎসুক্যের সঙ্গে তাকাইয়া কত-কি প্রাগৈতিহাসিক জন্ত-জানোয়ারের ছবি দেখিতে থাকিবে। কাজেই বিজ্ঞাপন যদি উল্টা করিয়া মারা হয়, তবে উৎসুক পৃথিক-পাঠককে 'সরিষার তৈলের' তৈল পর্যন্ত পৌছাইতেই হইবে, কারণ তখন আরন্ত হইবে তৈল দিয়া।

আর যদি প্রয়োজনের কথা ছাড়িয়া শিল্প-সৌন্দর্যের কথা ওঠে, তবে ইহার চেয়ে বড় শিল্প আর কি আছে! 'সরিষার তৈলের' রঙীন বিজ্ঞাপন উল্টা করিয়া মারিলে তাহাতে সরিষার ক্ষেতের শোভা ধরিবে, অনবধান পাঠকের কাছে অন্ততঃ সরিষার ফুলের, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এ ভাষা বিম্বত হইতে অনেক দেৱী; কিন্তু যাহারা এ ভাষা শেখে নাই তাহাদের প্রাচীরের বিজ্ঞাপনের চেয়ে বড় বিম্বয় কিছু আছে কি? তুমি বিদ্বান, যেখানে সালসার বিজ্ঞাপন পড়িয়া নিরর্থক শ্রম পান করিবার জন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিতেছ, সেখানে ওই সৌভাগ্যবান মূর্খ বিনাপয়সায়ে কেমন সিংহ-মাছুষে সার্কাসের খেলা দেখিয়া লইতেছে। হায় হতভাগ্য পণ্ডিত! ওই সহস্রবিদ্যুৎ-দীপের জ্বলা ও নেভাতে কেবল দেখিতেছ টাইগার ত্র্যাণ্ড কাগজ কিম্বা মদের বিজ্ঞাপন; আর যে পড়িতে জানে না, সে দেখিতেছে সহস্রচক্ষু-ইন্দ্র শতীর সহিত চোক ঠারিয়া না জানি কি দৈববাণী শুনাইতেছেন। এ সব যদি দেখিতে চাও, এখনো আশা আছে। বিজ্ঞাপন মারিও—কেবল তাহা উল্টা করিয়া।

ইচ্ছা আছে আমার বাড়ীটায় (এজাতীয় বাড়ী ইংলেণ্ডে করা সহজ, সেখানে ইহার নাম আকাশ-প্রসাদ) দেয়ালে পয়সা দিয়া বিজ্ঞাপন মারিব। উল্টা-ভাবে জ্বাকুহুম তৈলের বিজ্ঞাপন, স্নানরতা মহিলাটির নিম্নমুখী চিত্র। হঠাৎ রাত্রে জাগিয়া উঠিয়া চাঁদের আলায় ওঠে দৃশ্য দেখিয়া মনে হইবে একটি অসহায় নারী গভীর জলে নিমজ্জনমান। তখন আর-সব ভুলিয়া তাকে বাঁচাইবার জন্ত জানালা দিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িব—ঠিক ফুটপাথের উপরে। তার পরে কি হইবে জানি। তখন জ্বাকুহুমের বিজ্ঞাপন ছাড়িয়া জাথাকের বিজ্ঞাপন থোজ করিব (অবশ্য যদি জ্ঞান থাকে)। কিন্তু ইহাও তো মিথ্যা নয় যে মূর্খের জন্তও যথার্থ স্বথ পাইয়াছিলাম, একটি অসহায় নারীকে রক্ষা করিবার। তুমি বলিবে, তাহা কণিকের। আমি বলি, কণিকের বলিয়াই তাহা স্বথ। হীরার টুকরা ছোটই হয়।

শ্রী অমিত রায়

পরিচয়

আমার পিস্তৃত পুত্রের ভাইয়ের ছোট শালার মেজ ছেলেটি পল্লীগ্রাম হইতে চাকুরীর চেষ্টায় কলিকাতায় আসিয়াছে। ইচ্ছা করিলে সে কোন মেসে বা হোটেলে উঠিতে পারিত, কিন্তু একজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় কলিকাতায় থাকিতে অস্বস্তি গিয়া উঠিলে, পাছে আমি অসন্তুষ্ট হই, এই আশঙ্কায় সে আমার বাসাতেই উঠিয়াছে। ইতিপূর্বে সে কখনও কলিকাতায় আসে নাই, সুতরাং কয়েকদিন সঙ্গে করিয়া লইয়া কিরূপে বাসে উঠিতে হয়, কিরূপে রান্না পায় হইতে হয়, ইত্যাদি শিক্ষা দিবার পর একথানা অল্-সেক্শন মাসিক টিকিট কিনিয়া দিলাম। সে উহা লইয়া নানাস্থানে ঘুরিয়া চাকুরির সন্ধান করিতে লাগিল। কয়েকদিনের মধ্যেই লক্ষ্য করিলাম, তাহার মাফঃদলিক জড়তা দূর হইয়াছে এবং বেশ স্মার্ট হইয়া উঠিয়াছে। কলিকাতার পথঘাট প্রভৃতি কেমন চিনিয়াছে, তাহা একটু পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে একদিন তাহাকে কতকগুলি প্রশ্ন করি। তাহাতে যে উত্তর পাইয়াছি, তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

প্র। চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ হইতে হাওড়ার পুল পর্য্যন্ত—এ অঞ্চলকে কি বলে?

উ। মাড়োয়ার নগর।

প্র। লালবাজার হইতে চোরঙ্গী পর্য্যন্ত—এ স্থানটাকে কি বলে?

উ। চুচুগঞ্জ।

প্র। ধর্মতলা হইতে এলগিন রোড পর্য্যন্ত।

শনিবারের চিঠি

২৩৫

উ। লণ্ডনতলা।

প্র। এলগিন রোড হইতে কালিঘাট পর্য্যন্ত?

উ। এর খানিকটা আয়ারপট এবং বাকিটা খালসাপুর।

প্র। কালিঘাট হইতে বালিগঞ্জ স্টেশন পর্য্যন্ত যে প্রশস্ত পথ গিয়াছে, উহার নাম কি?

উ। পার ডেজু অ্যাভেনিউ।

প্র। ওখান হইতে যে ছোট গলিটা লেকের দিকে গিয়াছে, উহার নাম?

উ। সব লেন।

প্র। আচ্ছা, ও অঞ্চলটা কর্পোরেশনের কোন ওয়ার্ডে, বলিতে পার?

উ। হা, ওটা মর্গেজ ওয়ার্ড;

প্র। মধ্যবিত্ত বাঙালীদের ঘোঁক কোন দিকে বেশী?

উ। নিমতলা ঘাট স্ট্রীট এবং কেওডাতলা ঘাট রোড।

উত্তর শুনিয়া মনে হইল, আত্মীয়টি ফুল মার্কস পাইবার উপযুক্ত।

সেস্টিমেন্ট

গত অগ্রহায়ণ-সংখ্যা শনিবারের চিঠিতে দেশী ও বিদেশী নামক কাহিনীতে আপনারা মেয়েদের 'সেস্টিমেন্টালিটি'র উপর কটাক্ষ করিয়াছেন। কাহিনীটি আপনাদের মতে "মধ্যাস্থিক সত্য ঘটনা" হওয়া সবেও উহা যে আপনাদের মস্তিজ্ঞাত "সত্য ঘটনা" এ বিষয়ে আমার

সন্দেহ নাই—অন্ততঃগক্ষে উহার সত্যতার প্রমাণ আপনারা কিছুতেই দেখাইতে পারিবেন না ইহা ঠিক। আমি যুনিভার্সিটিতে পড়ি না, কিন্তু দৈবক্রমে আমার নামটিও মিস্ ব্যানার্জি হওয়ায় আমার সেই অচেনা বন্ধুর (আপনাদেরই কাল্পনিক মিস্ ব্যানার্জির) সমস্ত গ্লানি আমি নিজের গায়ে মাথিয়া লইয়া আপনাদের সঙ্গে বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইয়াছি।

আমি পুর্কেই ধরিয়া লইতেছি, বাঙালী মেয়েরা অত্যন্ত ভাবপ্রবণ (সেটিমেন্টালের বাংলা জানি না)। শুধু বাঙালী মেয়েরা কেন, পৃথিবীর সকল মেয়েই অল্পবিস্তর ভাবপ্রবণ একথা আপনারা অবশ্যই জানেন। শ্রেলতা যেদিন মন-কণ্ঠে আগুনে পুড়িয়া আত্মহত্যা করিল, সে দিন কাগজ-কাগজে বাহারা তাহার নামে কবিতা লিখিল, বাহারা উচ্ছ্বাসপূর্ণ প্রবন্ধ, সম্পাদকীয় প্রভৃতি লিখিয়া সভাসমিতি করিয়া স্নেহ-লতাকে আত্মত্যাগিনী দেবীর আসনে বসাইল, তাহারা অবশ্যই সেটি-মেটাল নহে, কারণ তাহারা পুরুষ। আবার বাহারা মেয়েদের স্থল-কলেজে পড়া উপলক্ষে তাহাদের কোমল বৃত্তি, সেটিমেন্ট প্রভৃতি নষ্ট হইয়া যাইতেছে বলিয়া চীৎকারে আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া তুলিতেছে তাহারাও সেটিমেটাল নহে, কারণ তাহারাও পুরুষ।

নারীকে মানবী না বলিয়া পুরুষে দেবী বলিয়া থাকে, ইহা নিশ্চয়ই সেটিমেন্ট নহে, ইহা বৈষয়িক-বুদ্ধিজাত একটি চতুর বিশেষণ মাত্র। কারণ এই দেবীকে বিবাহ করিবার সময় তাহার দাঁতের সংখ্যা, চুলের দৈর্ঘ্য, গায়ের রং প্রভৃতি তত্ত্ব তত্ত্ব করিয়া পরীক্ষার ব্যবস্থাও পুরুষে করিয়াছে। দেবী নরকের দ্বার, দেবীকে এবং রাজকুলকে বিশ্বাস করিও না, দেবীবুদ্ধি প্রলয়ধরী ইত্যাদিরূপ মস্তিজিজ্ঞাত হিতোপদেশ

পুরুষ দিতে পারে বলিয়াই মেয়েদের সেটিমেন্ট লইয়া তাহারা বিভ্রম করে।

আমি ত বলি, বাঙালী স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে পুরুষেরাই অধিকতর উচ্ছ্বাসপ্রবণ। বাঙালী পুরুষেরা রাজনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্য, শিল্প—প্রত্যেকটি বিষয়ে অত্যধিক উচ্ছ্বাসপ্রবণ বলিয়াই প্রতি মুহূর্ত্তে তাহারা ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত দোল খাইতেছে। পেণ্ডুলাম কোনো দিকে অগ্রসর হয় না, যতটা হয় ঠিক ততটাই পিছাইয়া আসে। অর্থাৎ বাঙালী পুরুষকে যে যখন যাহা বলিতেছে সে তাহাই বিশ্বাস করিয়া কর্মক্ষেত্রের একই স্থানে ক্রমাগত লাকাইতেছে। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে কত রূপান্তর যে তাহার দেখিলাম তাহার ইয়ত্তা নাই। দলে দলে স্থল কলেজ ছাড়িল, আবার ফিরিয়া গেল; দলে দলে সিগারেট ছাড়িয়া বিড়ি ধরিল, আবার বিড়ি ছাড়িয়া সিগারেট ধরিয়াছে; দলে দলে বুকিয়া ফেলিল, education may wait, but Swaraj cannot, আবার দলে দলে নিক্ষেপ সাম্রাজ্য একুশেশন লাভ করিতেছে। দল বাধিয়া হরিজনকে ম্পর্শ করিতে গেল, আবার দল বাধিয়া মহাত্মা গান্ধীকে নিন্দা করিতেছে! কিন্তু ইহাও ঠিক যে তাহার চরিত্র যে-ভাবে গঠিত তাহাতে ইহার বেশী সে আর কিছুই করিতে পারে না। সব চেয়ে যাহাতে তাহার ক্রুদ্ধ বেশী ফুটিয়াছে সেটা আর কিছুতে নহে, সাহিত্যে। সে নাকি সেটিমেটাল নহে! সত্যই সেটিমেট ইহাকে বলে না। আবেগ এবং উচ্ছ্বাস এবং কাঙালপনা কখনই সেটি মেট নহে। মেয়েদের প্রতি অর্থাৎ দেবীদের প্রতি (এখন অবশ্য আর ভাবাবেগেও মেয়েদিগকে সে দেবী বলিয়া কল্পনা করে না) যে কুৎসিত মনোভাব সে ফুটাইয়া তুলিতেছে তাহা ভাবিলেও লজ্জায় শির নত হয়।

আমি গোড়াতেই বলিযাছি, মেঘেরা যে ভাবপ্রবণ, তাহার দৃষ্টান্ত অল্প মিলিলেও পরীকার প্রণের উত্তর লিখিতে ঘরকন্নার কথা লিখিয়া দৃষ্টান্ত স্থাপ্তি করে না। কিন্তু পুঙ্খমে সাহিত্য রচনা করিতে গিয়া; যে বৃত্তির পরিচয় দিতেছে তাহার দৃষ্টান্ত আপনাদের শনিবারের চিঠিতে গত আট বৎসর ধরিয়া আপনাদেই উদ্ধৃত করিয়া আসিতেছেন। আপনাদে একবার লিখিয়াছিলেন, এই সাহিত্যের বিরুদ্ধে মেঘেদের কিছু বলা উচিত। কারণ, তাহাদের নামে এই সব ইত্তরজনোচিত গল্প এবং কবিতা বাহারা লেখে তাহাদের জানা উচিত যে মেঘেরা উহাতে লজ্জিত হয়।

কিন্তু মেঘেদের পক্ষ হইতে এক্ষণ কোনো প্রতিবাদ হওয়া সম্ভব নহে। প্রতিবাদ করিতে গেলেই অভদ্র লেখক-(নামধারী)গণ আশ্বাস পাইয়া যাইবে; মনে করিবে, উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। কারণ, এই সব লেখার প্রতিবাদ করিতে হইলে এগুলি পড়া দরকার। সুতরাং শুধু এই জন্তই প্রতিবাদ করা উচিত নহে, কারণ উহা পড়া উচিত নহে।

সংসারে লঘু প্রকৃতির অনেক ছেলে আছে বাহাদের সাহিত্যিক নিষ্ঠা নাই। সাহিত্য যে সাধনার বস্তু, সাহিত্য যে স্বপ্নেরই প্রকাশ তাহা তাহারা জানে না, কারণ তাহারা মুখ। লঘু প্রকৃতির মেয়েও সংসারে আছে; তাহারা অবশ্য সাহিত্য রচনা করে না, কারণ তাহাদের সে ছঃসাহস নাই। ছেলেদের এই ছঃসাহস আছে। তাহারা অপেক্ষাকৃত স্বাধীন, তাই খরচ করিয়া লেখা ছাপাইতেও পারে। সুতরাং এই-প্রকৃতির মুখেরা বাহা লেখে তাহা যথার্থ শিক্ষিত সমাজে অচল হইলেও মুখ নিক্ষেপ শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের নিকট অচল নহে। মুদ্রায়ত্ত এবং মুদ্রিত লেখা বাহাদের কাছে বিশ্বাসের বস্তু, তাহাদের নিকট সাহিত্য এবং

অসাহিত্যের মধ্যকার ভেদ ধরা পড়ে না, এমনকি তাহারা কল্পনাও করিতে পারে না যে সাহিত্যের আবার জাতিভেদ থাকিতে পারে। যে মুখদিগকে আশ্রয় করিয়া এই সাহিত্য গড়িয়া উঠিতেছে তাহাদের একটি দল আছে এবং সে দল নিতান্ত নগণ্য নহে। ইহাদের যে মনোবৃত্তি তাহার নাম কদাপি সেটিমেণ্ট নহে। সেটিমেণ্ট মেঘেদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, উহা তাহাদের অগোরব নহে, কিন্তু ছেলেদের মনের এই ভাবকে আপনাদে কি বলিবেন? যে মনোবৃত্তিতে তাহারা তাহাদের দেশের মেঘদিগকে অপমান করিতে প্রলুব্ধ হয় এবং বাহাদুরী তাহারা নিজেদিগকেই অপমান করে (মুখগণ যদিও ইহা বুঝিতে পারে না) সেই মনোভাবের নাম ইত্তরামি ছাড়া আর কিছু নহে।

মেঘেদের অনেক দোষ আছে স্বীকার করি, কিন্তু তাহারা দল বাধিয়া নিজেদের দোষটাকেই কাগজে ছাপাইয়া ইত্তর লোকের আমোদ বৃদ্ধি করিতে উৎসাহিত হয় না। বাহারা জন্ত তাহার লজ্জা পাওয়া উচিত, তাহা লইয়া সাহিত্য স্থাপ্তি করিবার স্পৃহা করে না—অন্ততঃ এটুকু বৈশিষ্ট্য সে শত দোষ সত্ত্বেও বজায় রাখিয়াছে। দেশের পুঙ্খদের চরিত্র নাই। ইহার অর্থ ইহা নহে যে তাহারা লম্পট। চরিত্র আমি সে অর্থে ব্যবহার করিতেছি না। চরিত্রের দৃঢ়তা বাহারা নাই, তাহারই চরিত্র নাই। জীবনের সকল ক্ষেত্রে যে ফাঁকি-দিয়া আসিতেছে, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সে ফাঁকি দিতে প্রলুব্ধ হয়। তপস্শ্রার দ্বারা বাহা লাভ করিব তাহারই অংশ অপরকে দিব, ফাঁকি দিয়া চাতুরীর পথে বাহা লাভ হয়, তাহা কখনই আপনাদে হয় না, সুতরাং তাহা অপরকে দেওয়াও যায় না। সত্য দান করিব, অসত্য দান করিব না, পুঙ্খের চরিত্রে এই determination নাই বলিয়াই তাহার চরিত্র নাই।

জানি, এই সব কথাতে অনেকের দৃষ্ট বিকশিত হইবে—এবং সঙ্গে সঙ্গে নারী জাতির উপর তাহাদের যে বিজ্ঞপধারণাও বসিত হইবে এ বিষয়েও সন্দেহ নাই। বিজ্ঞপের ধারা বলিলাম এই হিসাবে যে স্বদেশীয় নারীদের শীর্ষে এই বিজ্ঞপ বর্ষার সৃষ্টির মতই বসিত হয়—সময়-অসময় নিঃশিখেষে। আমার অভিযোগ সেই সব অক্ষম তরুণনামধারী পুরুষদের বিরুদ্ধে যাহারা শিল্প ও সাহিত্যের নামে নারীদিগকে অপমান এবং বিজ্ঞপ করিয়াই জীবন কাটায়। চরিত্রের সবল প্রকাশ তাহাদের কোনো দিকেই নাই। সমাজে যে-নারীর সহায় নাই, যাহারা নিরক্ষা, যাহারা মানব-পশুর হাতে নিরন্তর লাঞ্চিত হয়; তাহাদিগকে ইহারা রক্ষা করিতে পারে না—ইহারা স্বকীয় চতুর উপায়ে তাহাদিগকে গুণ্ডাদের পদ্ধতিতেই নিপীড়িত করিতে চাহে।

পুরুষদের ভিতর দুইটি স্তর আছে। এক স্তর শিক্ষিত, ভদ্র, মার্জিতকৃচি, প্রকর্মমণা; এই স্তর নিরন্তর হইতে বহু উর্দ্ধে থাকে—এবং এই স্তরের লোকসংখ্যাও খুব কম। (দুই স্তরের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান।) অল্প স্তরটির স্থূলতা যেমন বেশি, ব্যাপকতাও তেমনি বেশি। নিরক্ষর হইতে আরম্ভ করিয়া এই স্তরের মধ্যে যাহার শিক্ষার গুরু আছে সে—একই দরের লোক। কৃচিগত পার্থক্য ইহাদের মধ্যে নাই বলিলেই চলে। ইহারা ই ভালমন্দের বিচার করিতে পারে না, সাহিত্য অসাহিত্যের ভিতরকার পার্থক্য ধরিতে পারে না—ইহাদের নিষ্কণ্ড কোনো মত নাই, প্রবৃত্তিই ইহাদের জীবনের একমাত্র সত্য। ইহারা চাক্ষুশিল্প বুদ্ধিতে পারে না, কাব্য বুদ্ধিতে পারে না, ইহাদের কিছু দৃষ্টি করিবার ক্ষমতা নাই, ইহাদের প্রবৃত্তিকে যাহারা উদ্ধায়া দিতে পারে তাহারা ইহাদের চালক। ইহারা চিন্তায় পদ্ধ, শস্তা জিনিস ইত্যাদিগকে প্রলুব্ধ করে, উচ্চশ্রেণীর কোনো জিনিসেরই ইহারা মূল্য নিষ্কণণ করিতে পারে না। এই অর্ধশিক্ষিত বর্ষারদের হাতে দেশের নারীর লাঞ্ছনা যেমন অশঙ্ক্যাবী, তেমনি অবশঙ্ক্যাবী সাহিত্যের এবং শিল্পের। ইহাদের সেন্টিমেন্ট নাই বলিয়াই ইহারা অমাতুল,

ইহারা বর্ষার বলিয়াই বঙ্গ-জননীকে নথ এবং দাঁত দিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ছিড়িয়া থাইতেছে।

শিল্পের নামে ইহারা নারীজাতিকে কিরূপ লাঞ্চিত করিতেছে তাহা যে-কোনো মাসিকের পৃষ্ঠা খুলিলেই প্রমাণিত হইবে। শিল্পীর ধ্যানকে, সাধনাকে, সৃষ্টিকে আঘাত নমস্কার করি, কিন্তু এই সব (শিল্পী নামধারী) বর্ষারদিগকে আমি শ্রদ্ধা করিতে পারি না, কারণ ইহাদের মহৎ কল্পনা নাই, ধ্যান নাই, গভীর দৃষ্টি নাই, অথচ দেশের এমনি দুর্ভাগ্য যে ইহারা ই শিল্পী নামে পরিচিত হইতেছে।

যিনি বাঙালীকে দিয়া ‘বন্দেমাতরম্’ উচ্চারণ করাইতে চাহিয়াছিলেন, তিনি জানিতেন না যে বাঙালী মাতৃরূপে দেশকে কখনও কল্পনা করিতে পারিবে না। তিনি জানিতেন না যে পূজার পাত্রকে বাঙালী পূজা করিতে কখনই শিখিবে না—তাহাকে পদাঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিয়া নিষ্কণ্ডের প্রবৃত্তি-পূজাকেই সকলের উচ্ছেদ আসন দিবে। আন্তরিকতা না থাকিলে পূজা হয় না; বাঙালী তরুণের মন হইতে আন্তরিকতা দূর হইয়াছে, কপটতাই এখন তাহার একমাত্র বৃত্তি।

কোনো দিকে আশার আলো দেখিতে পাই না—চিন্তা করিতে গেলেই নিরাশায় মন ভাঙিয়া পড়ে। কিন্তু তথাপি মনে হয়, এ অবস্থার পরিবর্তন করিতেই হইবে। নারীর অমর্যাদার প্রতিকার নারীকেই করিতে হইবে—আর কেহ করিবে না। যে দিন নারী আপন ক্ষমতাবিশয়ে সচেতন হইবে সেই দিন এই ক্ষণপ্রাণ বর্ষারগণ ভীত হইয়া গর্ভে মুখ লুকাইবে। নারীর সম্মান আজ চিতার আগুনের মত অশ্রানে জলিতেছে—তাই তাহার চারিদিকে এই ভূতপ্রেতের তাণ্ডবনৃত্য। কিন্তু আগুন যদি জলিয়া থাকে তবে তাহা হইতে যেন ভূতপ্রেতগণ নিকৃতি না পায়। মনে হয়, ইহারা মরিবার জন্তই এই বহির উৎসব আরম্ভ করিয়াছে—প্রার্থনা করি, উহাদের মৃত্যুতেই যেন এ উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটে;

শ্রীতপতী দেবী

ব্যাধি

রামকানাইকে না চেনেন এমন লোক হাতীবাগানে কমই আছেন। আমার কাহিনীটি তাহারই সঞ্চক্ষে। সিনেমার চারি আনার টিকিট কিনিতে তাহার মত নিপুণ শিল্পী হাতীবাগানে আর নাই। সকালে হাফ-প্যাণ্ট পরিয়া যে ছেলেটি একঘণ্টা টিকিটঘরের সম্মুখে খুলিয়া দুইতিনশত বোহুলামান লোককে অগ্রাহ করিয়া প্রত্যহ প্রথম পাইকারী-হিসাবে টিকিট কেনে, তাহারই নাম রামকানাই।

সে আজ চারি বৎসর ধরিয়া ম্যাট্রিক ফেল করিয়া আসিতেছে। পিতার তিরস্কার এবং অশ্রুপূর্ণ অক্ষিপমাত্র না করিয়াই ত সে তাহার নিদিষ্ট জীবনধারাটিকে কুন্সু শব্দে প্রবাহিত করিয়া চলিয়াছিল! কিন্তু হঠাৎ তাহার জীবনে একটি পরিবর্তন আসিয়াছে।— কিছুদিন হইল পিতা পুত্রের সহিত সিভিল ডিসওবীডিয়েন্স আরম্ভ করিয়াছেন। ফলে রামকানাইয়ের এই পরিবর্তন। রামকানাই কর্তৃক হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ঘরে বসিয়া এখন কেবল কবিতা লিখিতেছে। পাড়ায় গুজব, রামকানাই প্রেমে পড়িয়াছে। কাল কয়েকবানা টিকিট কিনাইবার জন্ম তাহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিল। গিয়া দেখি, সে চেহারা আর তাহার নাই, শুকাইয়া অর্ধেক হইয়া গিয়াছে।

দেখা হইতেই কবিতায় কথা বলিতে লাগিল। অনেক বুঝাইলাম, কোনো ফল হইল না। বোধ হইল, যেন কোনো সিনেমা-অভিনেত্রীর প্রেমে পড়িয়াছে। কিছুই খুলিয়া বলিল না। ভাঙা ছন্দের প্রেমের কবিতা শুনিয়া চলিয়া আসিলাম।

আজ হঠাৎ শুনিলাম, তিনদিন তাহাকে বাইতে দেওয়া হয় নাই এবং তাহারই ফলে এই পরিবর্তন!

বাঁকা চাঁদ

মাঝে মাঝে কবিতা লিখি বটে, কিন্তু কবি-খ্যাতি কখনও পাই নাই। বাংলাদেশের সম্পাদকেরাই পাগল না আমি পাগল তাহাও বুঝি না। আমার অধিকাংশ কবিতাই কেহ ছাপে না, ফিরাইয়া দেয়। মনে করিয়াছি, কবিতার পাণ্ডুলিপিগুলি (যাহা প্রীতি ঋতুতেই বাড়িয়া যাইতেছে) নষ্ট করিব না, বাৎসবন্দী করিয়া রাখিয়া দিব, ভবিষ্যতে মূল্য বাড়িবে। আমি আমার প্রত্যেক খাতায় একটি করিয়া ভূমিকা লিখিয়া রাখিতেছি। দুইশত বৎসর পরে যদি কোনও গবেষক এগুলি উদ্ধার করেন তাহা হইলে তখনকার কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে এগুলি একেবারে 'পাঠ্যের' কৌলিঙ্গ লাভ করিয়া ধন্য হইবে। কলেজের ছাত্রেরা পড়িবে। (তখন মেয়েরা কলেজে পড়িবে কিনা জানিনা, যদি পড়ে তবে তাহারও আমার কাব্য পাঠ করিয়া আমার আত্মার তৃপ্তিবিধান করিবে।)

আমি ভূমিকায় লিখিতেছি—“বর্তমানে বাংলা সাহিত্যে শব্দা কাব্যের ছড়াছড়ি। যে ব্যক্তি ছাতার সঙ্গে মাথা, ফুলের সঙ্গে ছল, দাহুরীয় সঙ্গে ভাড়াড়ী কিংবা বাঁশীর সঙ্গে থালী মিলাইতে পারে সেই কবি এবং তাহার কবিতা মাসিকে ও সাপ্তাহিকে ছাপা হয়। এ বাজারে আমার কবিতা ছাপিয়া কবিতার অপমান করিব না। কারণ আমার মধ্যে কৃত্রিমতা নাই। আমার গজল গান গুলি প্রকৃত স্বরের ব্যথায় লেখা, আমার বৈষ্ণব কবিতাগুলি সত্যকার বৈষ্ণবীর প্রেমে রচিত, আমার ফুলের কাব্য বচটাকা খরচ করিয়া ফুলবাগান প্রস্তুত

করিয়া তাহার মধ্যে বসিয়া লেখা। কবিতায় এক্সপ বাস্তবতা—বিশুদ্ধ বাস্তববিলাসী ছাড়া আর কাহারও হাতে সম্ভব নহে।

কবি কালিদাস যাহা বলিয়াছেন তাহা ঠিক নহে। দরিদ্র হইলে গুণ নাশ হয় না। গুণ প্রকাশ করা কঠিন হয় মাত্র। গুণ অর্থে কবিতা। আমার সামান্য যাহা কিছু সম্ভব ছিল, কবিতার প্রেরণালাভের বন্দোবস্ত করিতেই তাহা খরচ হইয়া গিয়াছে। স্তুত্যাং এখন দারিদ্র্যদোষে গুণরাশি প্রকাশ হইতেছে না। গুণরাশি দুইটি বৃহৎ ট্রাকে বন্ধ করিয়া রাখিলাম। আশা করি নাশ হইবে না।

কথাটা বলিলাম এই জগৎ যে হাতে প্রচুর অর্থ থাকিলে মাসিকপত্রে বা সাপ্তাহিকে কবিতা প্রকাশ করা যায়, ইহা আমি জানি। যে-কোনো নামকরা কবিকে টাকা দিয়া লিখাইয়া লইলেই হইল। কিন্তু আমি নিজের ক্ষমতাবিশয়ে নিঃসন্দেহ এবং এ বিষয়েও আমার সন্দেহ নাই যে বর্তমান বাঙালী-সম্পাদকগণ কবিতার ভালমন্দ বুঝিতে পারে না।

কিন্তু বাঙালী যে জন্ম-কবি। বাংলা সাহিত্যে গল্পের ইতিহাস আছে কিন্তু কবিতার ইতিহাস নাই। কারণ, কবিতা অর্থাৎ বাঙালীর আদি ভাষা কোন সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছিল তাহা কেহই বলিতে পারে না। স্তুত্যাং বাঙালীর কবিতাকে যে-সম্পাদকগণ অগ্রাহ্য করিতে পারে, তাহাদিগকে দিক। কবিতা-হিসাবে যাহা ইহাদের গ্রাহ্য, তাহা প্রকৃত কবিতা নহে—এবং কবিতা হইতে যে রচনা যতদূরে সরিয়া যাইবে, সে রচনা ততই মাসিক পত্রের মনের মত হইবে। ইহাই এই পৃথিবীর নিয়ম। নিয়মটি কবিতার ক্ষেত্র হইতে দেনার ক্ষেত্রে সরিয়া দেখিয়াছি—কোনো ব্যতিক্রম হয় নাই। গুণ গ্রহণ বাঙালীর জন্মগত শিক্ষা। বাঙালীর চরম মহাজ্ঞান কাবুলিওয়ালা। গুণ কর এবং পরে কাবুলিওয়ালার নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাও—

দেখিবে তোমার বুদ্ধি প্রশংসিত হইতেছে। কিন্তু এই শব্দা প্রশংসার মোহে পড়িয়া কত বাঙালীর মেরুদণ্ড ও হাত পা ভাঙিতে দেখিয়াছি। আমি এই স্থূলভ প্রশংসা চাহি না। মহাকালকে আমি ভ্রূদ্ধা করি। আমার ভালমন্দের বিচারের ভার তাঁহার হাতেই ছাড়িয়া দিলাম।

বর্তমানে আমার আর্থিক দেনা, বুদ্ধির মুখে। কিন্তু মর্যাদা দেনায় যে আমি ডুবিয়া গিয়াছি, আমাকে জীবন দিয়াও সে দেনা শোধ করিতে হইবে। প্রেমের দেনাও ত কম নহে। যাহার প্রেমে পড়িয়াছি, কথা ছিল, আজ সকালে তাহাকে পাইব—কিন্তু তাহার বাড়ি গিয়া দেখিলাম, তাহার একজোড়া জুতা পড়িয়া আছে—সে নাই। না পাওয়ার ব্যাথা কবিতা জাগে। হৃদয়ের গভীর প্রদেশ হইতে ছন্দ ঝরগার ধারায় মত বাহির হইয়া আসে—

হে দেবী, শুধুই জুতা দেখাইলে আজিকে সকালে,
নিজে দিলে নাকো দেখা—মিছিমিছি আমারে ঠকালে।

প্যারট কোরা নহি, নহি আমি ল্যাডকোর কালী,
নিজেরে ঘমিয়া দিয়া দিব আমি আপনারে ভালি,
সে পথও রাখনি দেবী, দরজায় মারিয়াছ তালী—
উফ আশা ঠাণ্ডা ক'রে ঠাণ্ডা শিরে ধরাইলে জালী।

মাত্র ছয় ছত্র উদ্ধৃত করিলাম। মোট একশত ছয় ছত্র লিখিয়াছি। আজ তিনচারিজন পাণ্ডনাদার আসিবে, এদিকে দেবী প্রতারণা করিলেন! মনটা দমিয়া আছে।

সন্ধ্যায় বাগানে গিয়া বসিলাম। তৃতীয়ার চাঁদ আকাশে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ক্ষীণ এবং বাক। হঠাৎ এই চাঁদ আমাকে উত্তলা করিল। প্রাণের ভিতর গজল সুরের একটা নাচনি-আলো বিদ্যুতের রেখার মত আক্সিয়া বাকিয়া খেলিয়া গেল।

হে বাঁকা চাঁদ, মুচকি হেসে, ঠারিস নে রে চোখ—

লিখিবার মত আলো বা কাগজ পেন্সিল হাতে বা কাছে ছিল না। একটি লাইনই বার বার গাহিতে লাগিলাম এবং “চোখের” সঙ্গে কি মিলাইব ত্রিক করিতে লাগিলাম। একবার গাহিয়া পুনরায় যেমন ‘হে বাঁকা চাঁদ’ পঞ্চম উচ্চারণ করিয়াছি এমন সময় কাহার পদশব্দে চমকাইয়া উঠিলাম। মুখ হইতে পুনরায় আপনা-আপনি উচ্চারিত হইল—হে বাঁকা চাঁদ—

আগন্তুক বলিল, “আজ্ঞে না, বাকী চাঁদ।”

হঠাৎ সব স্পষ্ট হইয়া গেল। আগন্তুক পাড়ার একটি ছেলে। সরস্বতী পূজার বাকী চাঁদা আদায় করিতে আসিয়াছিল, কাল আট আনা দিয়াছি, আরও আট আনা আজ দিবার কথা। বলিলাম, “আজ নয়, কাল সকালে।”

গজলটা অন্ধুরেই বিনষ্ট হইল। বাঁকা চাঁদও বাকী চাঁদার দুর্ভাবনা ছুঁবিয়া গেল।

পৃথিবীর পাগলামি

অজানা ঘৌপপুঞ্জও পরিভ্রমণ বাকী রইলনা। দক্ষিণ সাগর সমূহের এইরূপ এক ঘৌপের ব্রজের মত গায়েব রংওয়ালা অধিবাসীবৃন্দকে একটা চীনে, ‘ব্যবসাবাড়ী’ সেলাইয়ের কল, alcohol নিউইয়র্ক-প্রস্তুত পোষাক পরিচ্ছদ এবং ইউরোপে যে সব বস্তুর আর চল নেই, সে সব বস্তুর ফিরি করেছে।

দক্ষিণের সাগরসমূহ! সেখানে বেতারের স্টেশন ও মুক্তার ডুবুরী যাদের ফুসফুস প্রায়ই ফাটে, সেখানে Copra-র planter-রা, যারা ত্রিশবছর ধরে বা রোজগার করেছিল, তা একদিনের মধ্যেই হারিয়েছে, কারণ কণ্ঠহীনদের ‘মার্গারিন’ কেনবার অবস্থা আর নেই, কারণ লক্ষ লক্ষ লোকে হতাশায় জলে আজ শুকনো রুটি খাওয়াই সম্বল করেছে এবং সে কারণে মার্গাইয়ে, বাজার পড়ে যাওয়ার ভয়ে আমদানী ও বন্ধ—!

পৃথিবী যেন এক বিরাট চাকার মত; একটা ‘গিয়ার’ (gear) বদলি আজ ভেঙে যায়, পৃথিবীর অল্প যেখানে যেসব চাকাই থাক্‌না, সব বন্ধ হয়ে যায়, এমনকি এই হৃদয় দক্ষিণ সাগরেও।

উত্তরাকলেও কি লোকের যন্ত্রপাভোগের কষ্টের আছেন? “আলাস্কা” জমে যাওয়া মরুভূমির মত জনহীন স্থান সমূহও কি ‘মোটর’ ও ব্যাকের অভাব আছে? সেখানেও কি অর্থনৈতিক সমস্যা ও ক্ষুধার জালা কম?

‘হাডসন বের’ উপর যেখানে গিল্‌জা গিয়ে পড়েছে, সেখানে যেতকায়রা তাদের ‘কোট চার্কহিল’ খাড়া করেছে; এত উত্তরে যে, অল্প কোন সরকারের কোনও ‘পোষ্ট’ই অত উত্তরে যেতে পারে নি। কয়েক মাইল দূরে, এই আর্কটিক প্রদেশের ‘blizzard’ সহ করেও, বুতাকারে কতকগুলো গাছ দাঁড়িয়ে আছে এবং তারপরেই কানাডিয়ান এক্সিমোদের বিস্তৃত রাজ্য।

সমুদ্রতীরে, হ্রদের চারিদিকে, নদীর কিনারাঘ কিনারাঘ, এই ধূ ধূ প্রসারিত রাজ্যের যেখানে সেখানে ছড়িয়ে পড়ে এই এক্সিমোরা, প্রাগৈতিহাসিক যুগের নিদ্বয় সংগ্রামের মধ্যে, প্রকৃতি থেকে

জীবননির্ধারের অধিকার ছিনিয়ে নেবার সত্ত্বই চেষ্টা করছে। বছরের দশমাস ধরে, জমি ও জল এক হয়ে বরফে জমে থেকে, এ রাজ্য কেবল থা থা করে; তখন এখানে ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ ডিগ্রী পর্যন্ত ঠাণ্ডা বিরাজ করে। কোন পাখীই এখানে বাঁচতে পারে না; জীবন ধারণের জল পর্যন্ত যোগাড় করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এসব সত্ত্বেও, এরা তাদের এই পৃথক পৃথিবীতে বাস করে, সমস্ত সভ্যতা থেকেই দূরে থাকে। এদের অসভ্য বর্ষের বলা চলবে কি?

লেথকের গাইড হচ্ছে এক Lapon; এর পা থেকে মাথা পর্যন্ত rein-deer-এর লোমশ চামড়ায় আচ্ছাদিত, এবং সঙ্গে সঙ্গে লেথক ও তাঁর সঙ্গীরাও ঐ একই পোষাকে ভূষিত; দম যেন বন্ধ হয়ে আসে। এই গাইডের গলায় ঝোলান ব্যাগে 'চেকের' তাড়া; ক্যানাডার সরকারকে সত্তর হাজার 'রেনভিয়ার' অল্প অল্প করে বিক্রী ক'রে আজ এ বড়লোক। এর কাজ হচ্ছে, মধ্যে থেকে এস্তিমোদের ইউরোপীয়ান সভ্যতার পরিচয় করান, যে সভ্যতা আজ Lapon দের ধনী করেছে বটে কিন্তু অসুখীও করতে ছাড়েনি।

এদের সঙ্গে, কাঁচা ও জমান হরিণ-মাংস। কাঁচা কেননা বেশী পুষ্টিকর। এবং জমান, কেননা সহজ পরিপাচ্য।

এস্তিমোদের রাজ্যে, এক কুটীর থেকে অল্প কুটীরের দূরত্ব কল্পনাভীত; ক্ষুধার জ্বালা, শীত ও ঝড়, নেকড়ে বাঘ ও মেকদেশীয় ভালুকের শত্রুতার চেয়ে বেশীই কষ্টকর। জীবন ধারণের আইন কাহন যে খালি শীত ও ক্ষুধার উপর নির্ভর করে, তা নয়, অনেকটা শিকার যোগাড়ের অদ্ভুত উপরও নির্ভর করে। প্রত্যেক 'ট্রাইবের' নিজ নিজ রাজ্য; সেখানে সে দলের পরিবারদের নিজ নিজ অংশ। কেবল ছুটিজের সময়ই প্রতিবাদী রাজ্যে গিয়ে শিকার সন্ধান

করার অধিকার এদের আছে। নিজের প্রাণ নিজে বাঁচান নীতিই সেদেশে চলিত, কারণ সেখানে এমন কোন কর্তৃত্বশীল ব্যক্তি নেই যে এদের বিচার করে শাস্তি দিতে পারে। তবে ধর্মসম্বন্ধীয় বা কিছু, সে সবই এদের যাদুকর (sorcerer) কর্তৃক ধাৰ্য্য হয়।

এদের বিশ্বাস যে ছুটিব্যক্তির, তাদের মৃত্যুর পর, শাস্তি পেয়ে শৃঙ্খলের এমন স্থানে পরিক্রমণ করে বেড়াতে বাধ্য হয়, যেখানে অসামান্য ঠাণ্ডা। এদের কাছে স্বর্গ এক বস্তু যেটা পাতালে এবং যেখানে সর্বদাই আগুন জ্বলে।

নভেম্বর মাসে, Ross Welcome এ তাঁবু গাড়া হল। সে সময়ে, উপসাগরের উত্তর, fjord সমূহ ইতিমধ্যেই বরফের সেরে ঢাকা পড়েছিল; কাজেই লেথকের দক্ষিণ-পানে যাওয়ার কোন বাধা ছিল না। দুজন এস্তিমো যুবক সঙ্গী; এদের একজনের প্রেমপাত্রী Chesterfield Bayর কাছে বাস করত, যুবক তার সঙ্গে দেখা করতে উৎসুক ছিল, কারণ সে মেয়েটাকে খুবই ভালবাসত। তবে সে এ বিষয়ে বড় একটা নিজেই দ্বিধা দিত না, কারণ সেদেশে 'সেটিমেট' জানানটা ঠিক ভ্রমভ্রান্তমূলক নয়। খাই হোক, যুবকের ইচ্ছে ছিল জানার, যুবতী তাকে বিয়ে করতে রাজী কিনা।

এস্তিমোদের রাজ্যে, যুবক যুবতীদের বিবাহ তাদের বাপমারাই ঘটায়। ঘোল সত্তের বছর বয়সে যুবতী একটা 'ফারের' নতুন পোষাক এবং তার সঙ্গে একটা 'amante' অর্থাৎ একটা ধলে বা ভবিষ্যতে পুটে সম্ভাবন বহনের কাজে লাগবে, —উপহার পায়। এই amante গ্রহণ করা মানে fiancée' কে জানান যে, সে এবার তার fiancée কে নিজের ঘরে নিয়ে আসতে পারে। যদি প্রেরক

বেশী দিন এ কাজ করতে দেয়ী করে, অথবা তা'র বিবাহের বয়সের সময় তখনও না হয়, নেহাৎ ছেলোমাহু বলে, তবে সেই fiancée ততদিন আর একটা কাউকে যোগাড় করে নিয়ে, তার সঙ্গেই থাকে। এই সাময়িক মিলনসম্বৃত সন্তানসম্ভাবিত্ব—তাদের মা'র সঙ্গে আসে, যখন সে তার নির্দিষ্ট স্বামীর ঘর করতে আসে।

Rolli Cart-এর তাঁবুতে যুবক সংবাদ পেল যে তার হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী ইতিমধ্যেই একটা 'amante' বহন করছে। একাই যাত্রা করে fiancée'-র কুটীর যেখানে সেপান থেকে যে সব কুটীর দূরে দূরে অবস্থিত সে সব কুটীর থেকেই দেখা আরম্ভ করাই রীতি; যুবক তাই প্রতি কুটীরের লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা কহিতে লাগল; এগ্রামে আসার তার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি না-জানিয়ে বা কোনরকম অধৈর্য বা উৎকণ্ঠা প্রকাশ না করে, অল্প সব কথাই সে কহিলে। ভবিষ্যৎ জীবন igloo • তে এসে, কর্তব্য হচ্ছে, জী ছাড়া, সেই পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে কথাবার্তা কওয়া এবং সংস্কার অহুয়ী নির্ধারিত কিয়ৎকালের জন্য fiancée কে দেখেও না দেখা,—যুবক তার কোন নিয়মই পালন করতে বাকী রাখলে না। এদের নিয়ম হচ্ছে, পাণিগ্রহণ প্রার্থনার পর দীর্ঘ কাল এমন কথোপকথন করা, বার থেকে মনে হবে যে, কথাবার্তা বিশেষ বাধার মধ্যে দিয়েই এগুচ্ছে এবং তারপরেই কোনরকম ঢাকাঢাকি না করে জীবন স্বামীর সঙ্গে চলে যাওয়া।

লেখক ভবিষ্যৎ স্বামীর অর্থাৎ যুবকের আসার আগেই এসে, তার fiancée কে দেখেছিলেন। মেয়েটি হৃদয়ী ও কর্ণপরায়াণ বটে; দাঁত

দিয়ে চিবিয়ে চামড়া 'ট্যান' করতে, জুতো তৈরী, পোষাক কাটা বা নৌকা প্রস্তুত করার কাজও জানে এ মেয়ে। 'কাযাকের' (kayak) • পোষাক তৈরী করার দায়িত্ব বড় কম নয়, কারণ পোষাক যদি সত্যিকারের সব বিষয়ে দুর্ভেজ না হয়, অর্থাৎ বরফ জল ঠাণ্ডা প্রভৃতি 'প্রফ' না হয় তো শিকারীর জীবন বিপন্ন হতে পারে।

লেখকরা—যখন সেখানে আসেন, তখন একজন অপরিচিত ব্যক্তিও সেখানে এসে মেয়েটির পাণিপ্রার্থনা করে। যতদিন নিয়ম তার বেশীও, মেয়েটি এই প্রস্তাবে বাধা দিয়েছিল, কিন্তু তিনদিনের দিন তার নতুন fiancée'-র সঙ্গে তার ঘর করতে যেতে সে বাধ্য হয়। চতুর্থ দিনে, লেখকের সঙ্গী, সেই যুবক, সেই প্রথম ও সত্যিকারের fiancée আসে এবং সমস্ত ব্যাপার জেনে অতি যত্নভাবে বললে, "Mamianad kloni, আমি মনে বড়ই কষ্ট পেলুম।" বলার সঙ্গে সঙ্গেই, পিছন দিকে একবারও দৃষ্টিক্ষেপ না করে, কিরে যাবার পথ সে নিলে। এখন তাকে, তার অধিকার ফিরে পাবার জন্তে, পুরো একটি বছর অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু এ সময়ের মধ্যে কি করবে সে? সেও কি একটা সাময়িক জী জুটিয়ে নেবে না এবং যখন সে তার আগেকার ভালবাসার দন ফিরে পাবে, তখনও পর্য্যন্ত এই দ্বিতীয় বস্তুটিকে নিজের করে রাখবে না? প্রায়ই দেখা যায় যে, পুরুষদের অনেকগুলো করে জী এবং জীদের অনেকগুলো পুরুষ আছে। সকলেই একসঙ্গে বেশ মিলে মিশে বাস করে, কোন স্বগডাঝিটি হয়না এবং সতীনে সতীনে যে ভাব অন্যান্য দেশে দেখা যায়, তার চিহ্নও এখানে নেই।

যখন কোন পুরুষ হৃদয়ের শিকারে যায়, এবং কোন কারণে জীবে-
সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে না, তখন সে তার যাত্রার এক সঙ্গিনী যোগাড়
করে নেয়; কেবল করার হচ্ছে এই যে এই সঙ্গিনীকে সুস্থদেহে ও
সুস্থ চিন্তে সে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে বাধ্য।

অমণ চলতে লাগল; Tassiajormunt টাইবের অনেকেই যোগ
দিয়ে দল পুরু হোল। প্রথম ইউরোপীয়ান, Leden এদেশ অমণ করে
যে মন্তব্য করেছিলেন সেই মতে সায দিয়ে লেখক বলতে চান যে,
এক্সিমো বর্কর হলেও, তার মধ্যে আশ্চর্য্য ছটো গুণের পরিচয় পাওয়া
যায়, যথা, sensibility ও finesse।

অনেকরকম শিকারই পথের সামনে পড়তে লাগল, কাজেই অস্ততঃ
না খেয়ে মরার ভয়টা অস্থহিত হল; কিন্তু দলের গাইড, Illait-nok
যা দেখে তাই গুলি করে আর বলে, “যে সব ‘গেম’ আমরা দেখছি,
পূর্ষ পুরুষদের প্রেতাত্মারাই সে সব পাঠাচ্ছে; আমরা যদি তাদের না
মারি তো পূর্ষপুরুষদের অসন্তুষ্ট করা হবে।” মৃতজন্তুদের হাড়গোড়,
ও জিত নিয়ে, বাকী যা কিছু, বিশেষ করে তাদের চোখ দুটি
অতি সহজে সে পুঁততে লাগল; চোখগুলো ভাল করে ঢাকার উদ্দেশ্য,
বাত্তে এই জন্তুদের আত্মারা দেখতে না পায় কেমন করে এদের উপর
নেকড়েরা লাফিয়ে পড়ে।

অস্ত্রাভ্যাস দলে, এঁদের সব খাবার নিমজ্ঞণ করতে লাগল; কিন্তু রীতি
যা আছে তা ভাঙলে চলবে না। যথা, একই ভোজে মাছ ও মাংস
খাওয়া এদের মানা; igloo পর্য্যন্ত এ দুটো জিনিষ, এমন কি একই
রাস্তা দিয়ে নিয়ে আসারও নিয়ম নেই। এদের বিশ্বাস যে, অতি
প্রাচীন কাল থেকেই, হলচর ও জলচর জন্তুদের মধ্যে বিবাদ চলছে,

কাজেই আত্মরক্ষার স্বযোগ না দিয়ে—দুটি শত্রুকে এক করার মত
পাপ আর কিছু নেই—!

তিনমাস এদের দেশে কেটে গেল। প্রায়ই হুচারটে ‘ফ্যামিলি’
দেখা যেত, যারা সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে কোন কিছু শিকার খুঁজে
পায় নি। তবুও নিমজ্ঞণ রক্ষা করতেই হবে, নৈলে গৃহস্থ তথা
অতিথিসেবকের অপমান হয়।

একবার বরফের কুটীর নির্মাণ শেষ হবার পূর্বেই সন্ধ্যা হচ্ছে
উঠল; লেখকরা রাত কাটাবার জন্তে একটা iglooতে নিমন্ত্রিত হলেন,
এই igloo টিতিমথোই আটশ জনের আশ্রয় দিয়েছে! গৃহকর্তা বরফের
উপর চামড়া বিছিয়ে শুয়ে লেখকের জন্তে তার ‘ফারের’ বস্তার
উপর তার দুই জ্বরী মাঝখানে জায়গা করে দিল। এক্সিমোর
উল্লং হয়েই শুতে যায়, এ মেয়েদুটিও তাই; একটু সরে এরা
লেখককে জায়গা দিলে। এ ধরণের অতিথিসেবা সময়ে সময়ে
অতিথিকে বড়ই delicacyর মধ্যে ফেলে, যদিও এখন স্প্যানিভিয়ার
এক্সিমোর। তাদের অতিথিদের এই রকম মুগ্ধিল থেকে বাঁচতে
শিখেছে। এ কুটীরেও, লেখকের সঙ্গীর মত, এরা সব তাদের ‘ফারের’
নীচে চেকের তাড়া বহন করে।

ইউরোপীয়ান এক্সিমোরা সব বড়লোক; এদের প্রায়ই কয়েক হাজার
করে ‘রেন ডিয়ার’ থাকে, যার এক একটার দাম, দুশো সুইডিশ ক্রোঁন
(প্রায় এগার পাউণ্ড পাচ শিলিং)। এরা ঠিক উত্তর আমেরিকার
‘লালচামড়ার’ রেডইণ্ডিয়ানদেরই মত; ধনসম্পদে উন্নতি করছে
বটে, কিন্তু ‘সভ্যতা’ বোঝবার মত অস্ত্রধর এখনও এগোয় নি।
এরা খড়্গজল, তুবারপাত, ক্ষুধা, বহুজন্তু প্রভৃতির উপর জয়লাভ করেছে

বটে কিন্তু আর্থিক উন্নতি এদের চরিত্রকে দুর্বল করে ফেলেছে। একথা স্বয়ং লেখকের সঙ্গী Lapon বলেছিল, যখন এরা Fort Churchhill পরিভ্রমণ করে, আমেরিকান 'ট্যাপার'দের সঙ্গে যাত্রা শুরু করেন।

পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে বেড়িয়ে, উন্নতি ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। অথচ, হঠাৎ এই প্রচীন ইউরোপীয় ভূখণ্ডেই 'প্রিমিটিভ' এক স্থানের সন্ধান পাওয়া গেল। সেটা হচ্ছে কমানিয়াতে।

Babadag ও Taltscha র মধ্যবর্তীস্থানে দানিযুব নদ ও কৃষ্ণ সাগরের জল কর্তৃক দ্বীপ উপদ্বীপের Razim হ্রদের তীরে, তুর্কীদেশীয় একদল জেলে বাস করে। একরকম বেতের বৃহন্নীর কাঠামোর উপর বড়ের ছাউনী দেওয়া কুটারে এদের বাস; এ কুটার দেখতে ষ্টিক মোচাকের মত এবং আফ্রিকার অধিবাসীদের বাসস্থানের সঙ্গে এসব কুটারের কোন পার্থক্যই নেই।

এ সব ঘাই হোক না কেন, সবচেয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করে এদের মাছধরা পদ্ধতিতে; মাছভার আমলে, এদেরই কোন পুষ্করক্ষেে মাছধরা যে উপায় বার করেছিল, সে উপায় হাজার হাজার বছর হয়ে গেছে, এদের অন্ত্যন্ত স্বদেশবাসী তা ভুললেও, এরা ভোলে নি; কেবল জাপানের কোন কোন ধর্মগ্রন্থে উপলক্ষে, এই প্রণালীর কিছু বৃত্তিচ্ছিন্ন এখনও পাওয়া যায় বটে।

Razim হ্রদে, ছোট ছোট দ্বীপ ছড়িয়ে আছে; কেবল পান্নীরই বাস সেন্সব স্থানে। দূরে ডাঙার দিকে, রক্তবর্ণের পর্বতশ্রেণী যেন আকাশের কোলের সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে। তীরের উপর বক সূহ সগর্বে পায়চারী করছে, আর বুনা হাঁস সব এধার ওধার উড়ে

বেড়াচ্ছে, আর aigrette জাতীয় পাখী রূপের তীরের মত চোখের সামনে ভেসে যাচ্ছে। এই দানিযুবের ব-দ্বীপেই পাখীদের স্বর্গের আরম্ভ বলা চলে।

শরের আগুন ঘিরে, রাজির অপেক্ষা করা হল। ধীরে ধীরে জ্বাধার নেমে আবছাওয়ার সৃষ্টি করলে; গাংশালিকের ও বুনা হাঁসের চীংকার একে একে থামতে লাগল। শরের বন কেটে 'ক্যানাল' সব প্রবাহিত; এই রকম একটা 'ক্যানালে' জেলেরা, ছুঁচোল মাথাওয়ালা আলকাতরা মাথান এক নৌকা নামালে এবং রক্তবর্ণ 'এংগ্রেং'দের প্রিয় এক জল্ল সাফ-করা স্থানে সেটাকে চালিয়ে নিয়ে গেল। গাঢ় অন্ধকার নেমে এল।

ক্যানালের উপর ইতিমধ্যেই পাঁচ খানা নৌকা ভাসছে; তাদের উপর কাঠের কয়লা ভর্তি চুল্লী। আগুন জ্বালান হল এবং তার আলোকে লেখক দেখতে পেলেন কি অদ্ভুত ধরণের সব জীব নৌকায় তোলা হয়েছে; দেখলেন যে, নৌকায় স্থচাল কিন্তু হৃৎ স্টোঁটওয়ালা ভারী ধরণের সব জানোয়ার, পানকৌড়ি-জাতীয় পক্ষী। কেমন করে এই সব 'ফর্মোরান্ট'দের এই হ্রদের উপর আনা হল, এরা তো সাধারণত: পাহাড়ের ধারে বাস করে?—না, জেলেরা এদের এনেছে; পিতলের এক মোটা বলয় এদের গলায় চড়ান এবং এদের পা দড়ির সাহায্যে বাঁধা; এমনভাবে জেলেরা তাদের এই ক্রীতদাসদের ধরে রাখে।

কর্কশ চীংকার করে এসব পাখী জলে লাফিয়ে পড়ল এবং নৌকার সামনে সঁতার দিয়ে স্টোঁটের সাহায্যে অবিরাম জল খুঁজতে লাগল। হাজারে হাজারে, ছোটবড় মাছ, আগুনের আকর্ষণে নৌকার সামনে জমা; পানকৌড়ির মত জীবগুলি একধার থেকে সব মুখে নিতে আরম্ভ করলে। এসময় লোভে এদের গোল গোল চোখ জলছিল; এরা সব সময়ে কুড়িতে মাছ পর্যাপ্ত একসঙ্গে ধরতে পারে। কিন্তু ঐ যে ওদের গলায় রিং চড়ান, এর ফলে ওরা খালি মাছগুলো মুখেই রাখতে পারে, কিন্তু গিলতে পারে না। যতক্ষণ পর্যাপ্ত না রিং প্রায়

বৃক পধ্যস্ত নামে, ভক্তকণ অপেক্ষা করা হল—এবং তারপরে এদের দড়ির সাহায্যে হিচড়ে টেনে, এদের গলা টিপে মাছগুলো, তখনো জীবন্ত বার করে একটা টুকরীতে রাখা হল এবং তার পরে এদের ছেড়ে দেওয়া হোল।

অদ্ভুত চিত্রই বটে; দোহুল্যমান আলোক, ক্ষুধিত 'করমোরাণ্ট'দের গলাভাঙা চীৎকার, কালো নৌকার অগ্নি অগ্নি দোলা এবং বিকৃত সব মুখাকৃতি; অনতিদূরেই শরের বনের মধ্যে দিয়ে বাতাসের সন্ সন্ শব্দ,—অদ্ভুত এক রাত্রি, এই ইউরোপে,—কি আশ্চর্য্য বৈশাদৃশ্য! বৃকারেই থেকে এরোপ্সেনে তিনঘণ্টার পথে, দানিয়ুবের ব-দ্বীপে, জেলেনের পানীর সাহায্যে মাছ ধরা,—এমন এক প্রণালীতে যার ব্যবহার, আজ হাজার বছর হল, Gifer তেও পূর্বাঞ্চলের আরো হাজার স্থানে চলতী ছিল!

Braila শহর এই বৃদ থেকে কয়েক ঘণ্টার পথ মাত্র; Braila বিংশশতাব্দীর এক শহর, যেখানে শত শত অটো, বড় বড় 'Sils' এবং যেটা শস্ত সঞ্চয়, ইউরোপের একটা বড় বাণিজ্য-কেন্দ্র। অথচ, লেখক যখন এই শহরের বৃন্তান্ত বর্ণনা করতে লাগলেন, তখন 'করমোরাণ্টের' সাহায্যে মাছ ধরা জেলে আহম্মক যে সব বিখ্যাসই করতে চাইল না।

এই ইউরোপেরই মধ্যে, এখনও বুনো ঘোড়ার অভাব নেই; বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়া থেকে কয়েক ঘণ্টার পথে, বুনো ঘোড়া দলে দলে দেখা যায়।

Shipkar সর্কার গিরিসম্বট দিয়ে Philipopoli র দিকে যেতে, birch এর বনের মধ্যে দিয়ে পথ; এই সব birch গাছের গুঁড়ি এত মোটা যে, ছুজন লোক হাত বাড়িয়ে তা ঘিরতে পারে না; এখান দিয়ে এলে এমন এমন একটা পর্বতময় স্থানে পড়া যায়, যার সৌন্দর্য্য নর্থ আমেরিকার Colorador, Canyon এর কথা মনে করিয়ে দেয়। এখানে একটা 'auto strade' * তৈরী হচ্ছে, এবং এ ভীষণ কাজের জন্তে, হাজার হাজার সৈন্ত নিযুক্ত। কিন্তু এখনও এদেশে অনন্ত

* মোটর গাড়ী চলার উপযুক্ত রাস্তা।

বিস্তৃত জনমানববাসহীন, শান্ত বন্য জমির অভাব নেই; উজ্জল রংএর সব পর্বতের গা কেটে প্রপাত; যে সব এখন বারিহীন, শুকনো, ষটখটে; gorges যত নীচে নেমেছে, ততই বেশী চাটাল হয়ে ক্রমে ক্রমে নীচের অনন্তস্থল প্রকৃতিদত্ত পশুপালনক্ষেত্রের সঙ্গে মিশেছে। এখানেই এখনও বন্যঘোটকের অস্তিত্ব পাওয়া যায়।

এরা কোথা থেকে এখানে এসেছে বা কেমন করে এখানে এখনও আছে এ-প্রশ্নের উত্তর কেহই দিতে পারে না। স্পেনে, বেশী দিন নয় বুনো উটের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে: কিন্তু সেখানেও যেমন তাদের উপপত্তি সম্বন্ধে সকলেই অজ্ঞ, এখানেও তাই।

সর্কার এক উপত্যকার উপর তাঁবু খাটান হল এবং খুব এক বড় আগুন জালান হলো, কারণ এই বলকানদেশীয় পর্বতপুঞ্জ অতিরিক্ত ঠাণ্ডা। এই রোমান্টিক ক্যাম্পের একটা 'কোটো' তোলবার জন্তে লেখক এবং সর্কা পাহাড়ের এক promontory র উপর উঠলেন এবং একারণেই সকলের জীবনও বাঁচল।

দূরে, ধূলির এক ঘূর্ণি ক্রমশ: ক্যাম্পের দিকে ছুটে আসছে, এটা তিনি দেখতে পেলেন; তাঁর সু-উচ্চ স্থান থেকে তিনি বুঝতে পারলেন যে, সেটা একদল ঘোড়া; ভীষণ হেয়াননি ও শত শত ঘুরের খট খট ধ্বনি সকলের কানেই বেজে উঠল। বোলতার কামড়ের জালায় জলতে জলতে, রাগে অধীর হয়ে, সামনে যা পাচ্ছে তাই পদতলে দলিত করে দ্রুত ছুটে পালাচ্ছে।

একটা মিনিটও নষ্ট করবার সময় ছিল না। যা কিছু তল্লাতমা ছিল, সে সব অটোয় দ্রুত চাপিয়েই ছুট। লেখক এখানে মস্তব্য করছেন যে যদি তাঁরা তাঁদের মেজাজ ঠাণ্ডা রাখতেন (sang-froid) তাঁদের এরকম পালাবার দরকার হত না, কারণ, না পালিয়ে পাহাড়ের ফাটলে বা বড় বড় পাথরের পিছনে লুকোলে অনেক কিছু মজাই দেখা যেত; কিন্তু উপায় ছিল না, সেই সব জন্তর ঘর্ম্মাক্ত দেহ, বর্ধর ত্রুয়া এবং সেই একত্রোৎপন্ন স্বাভাবিক ভীষণ কোলাহল, তাঁদের ভয় পাইয়ে দিয়েছিল।

ঘণ্টায় ষাট কিলোমিটার বেগে অটো ছুটতে লাগল, শুকনো এক

নদীগত এই বেগেই পেরোন হোল, অটোতে ভীষণ ঝাঁকি, তবুও ছোট্টার নিবৃত্তি নেই, কারণ এঁদের পিছনে সেই ঘোড়ার দল; সর্বদাই সজ্জা সেই ঘোড়ার দলে, অন্ধের মত, পাগলের মত ছুটে আসছে। হুধের বিষয়, অটোর কোন টায়ারই ফাটে নি বা কোন 'এ্যাক্সল'ই ভাঙে নি।

অবশেষে পাশের এক ছোট উপত্যকায় এসে ক্ষান্ত হওয়া গেল। কয়েক মিনিট বাদে সামনে দিয়ে, ঠিক যেন waterspout-এর মত, ঘোড়ার দল ছুটে গেল; লম্বা কেশর-ওয়ালা হৃন্দর হৃন্দর প্রাণী ধুলির ঘূর্ণি উড়িয়ে তাদের দিশেহারা দৌড়-পথে, ছোট ছোট পাথর পদাঘাতে নিক্ষেপ করে, ছুটে চলেছে। একটা সাদা মন্দাঘোড়া, শতাধিক ঘোড়ার দলপতি হয়ে, আগে আগে চলেছে।

এ ঘটনার পরে, ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে, নিরীহভাবে আহার চর্কণ নিরন্ত অনেক বুনো ঘোড়ার দলই দেখা, লেখকের স্বযোগে ঘটেছিল।

অধুনা, এদের ধরে কাজ লাগান আরম্ভ হয়েছে, যেমন বুলগেরিয়ার ঠিক বুনোর উপর স্থিত এই পর্ত্তময়, বন্ধুর বন্ধ, অজানা প্রদেশ Philipopolis অনন্তহৃন্দর canous প্রতৃত্তিকেও উপকারে লাগান হচ্ছে।

বিভিন্ন মিশ্রণ-যুক্ত 'ট্র্যাঙ্কিক' এই ইউরোপের, লক্ষ লক্ষ অধিবাসী-পূর্ণ বড় বড় শহরে, যে সব শহর আজ modern, civilised, যথা Berlin, Vienna, Budapest প্রতৃত্তিতে,—আজ লোকে হতাশার ত্যাগনাশ জলছে। প্রতিদিন কত কত লোকে না ধৈর্যে মারা যাচ্ছে ও। না ধৈর্যে মরা, ১৯৩২ সালে,—কেউ কি বলে দিতে পারে, কেন? ক্যানাভাতে কয়লার বদলে ইঞ্জিনে গম পোড়ান হচ্ছে, ব্রেজিলে কাফী সমুদ্রের জলে ছুঁড়ে ফেলা হচ্ছে, আর এখানে অনাহারে লোকের মৃত্যু!—এর প্রতিকার কোথায়?

(ক্রমশ)

(লেখক, জিস্কা; অনুবাদক, ব্রীতরূপ ঘোষাল)

বিরক্তিকর ব্যাপার

মনের মানুষ মনেতে থাক,

বাহিরে তাহার বৃথাই খোজ,

নাগাল তাহার পাইলে হয়

দেখিবি হয়তো চ্যাণ্টা nose!

দেখিবি মানস-প্রতিমা, তার

রক্ত-মাংস-অস্তি-সার!

ঘোড়াবড়ি ষাড়া উচ্ছে পুঁই,

ঘুরিয়া ফিরিয়া বারম্বার!

বাহিরে তাহারে চাস্ না আর.

তাহারে চাস্ তো নয়ন বোজ!

দাত বার করে পশ্চাৎ কয়,

“রয়েছে আমার প্রচুর লোভ,

আমি তো খুজিব ছনিয়াময়

নাহলে আমার মেটে না ক্ষোভ!

এ কি ছোক্ ছোক্—কি নিস্পিস,

সুখার জালায় অহনিশ!

এ সাধ মিটায়ে মরিতে চাই,

হোক সে অমিয় হোক সে বিষ!

চাদের কিরণ, গ্রামার শিশ,

মনের সায়ের ফেলিছে টোপ!

দেবতা এবং অস্থর হায়

ঝগড়া করিছে চিরটা কাল,
তবুও ফুল তো ফুটিতে চায়

চাঁচিতে চাই যে কামান গাল !
আমি যে প্রেমিক গোবর শুই,
হৃদয় বলতো কোথায় থুই ?

বিছানা ভরেছে ছারপোকায়,
স্বপনের আশে তাতেই শুই !
খোড়বড়ি খাড়া উচ্ছে পুঁই,

সবাই আমারে করিছে ঘাল !

কোথায় কাহার ভাগর চোখ,
কোথায় কাহার দোহুল ছল,
অমনি হায় রে আমি না-হক্
করিয়া ফেলি যে হিসাব তুল !

কোথায় কখন কলতলায়,
কাহার কণ্ঠ কলকলায়,
অমনি হায় রে চিত্ত মোর
মাগুরের মত থলবলায় !
নয়ন দুটিও ছলছলায়,
ছাঁটিয়া ফেলি যে ঘাড়ের চুল !”

বলিছ তাহারে, “সামলে চল,
বড়ই তোার যে বেড়েছে বাড়,

প্রেমের পথ যে খুব পিছল,
পিছলে গেলেই খাবি আছাড় !

ভাঙিবে হাড় ও ভাঙিবে মন,
খুঁজিবি তখন অহুঙ্কণ,
কোথায় আফিং, কোথায় লেক,
কোথা ডাক্তার—কোথায় ‘ফোন’ !

আমার গোপন যুক্তি শোন,
মানস প্রতিমা টুতিমা ছাড় !”

ভাবিলাম বৃষ্টি এ বিজুপ
তনিয়া যা হোক থামিল চোর,
বদল হইল মুখের রূপ
ঝরিতে লাগিল নয়ন লোর !

হঠাৎ থামিল কলেজ ‘বাস’,
অমনি আবার সর্পনাশ,
বাহির করিয়া দস্ত সব,
দেখিছ ফেলিছে দীর্ঘশ্বাস !
ইচ্ছা করিছে একটি ঠাস
চড়েতে তাহার ভাঙাই ঘোর !
“বনফুল”

বাঙালী জাতির ভবিষ্যৎ

[অমৃতবাাজারের কলাপে হঠাৎ একদিন জানিতে পারিলাম যে পাটনার কোন এক সভায় আমি নাকি একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছি—“the theme of which was that if Bengalees do not take resort to self-determination they will be effaced from this work.” কথাটি বিস্ময় হইতেছিল না। কিন্তু আনন্দবাাজারের পৃষ্ঠা উটাইতে উটাইতে যখন দেখিতে পাইলাম যে আমি সভাসতাই একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছি—“বাহার মর্শ্বার্থ এই যে বাঙালী আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা না করিলে তাহার অস্তিত্ব লোপ পাইবে” তখন মনে হইল যে দুই-তুইটি (বিশেষ করিয়া বাংলার শ্রেষ্ঠ দুইটি) সম্বাদপত্র ভুল করিতে পারে না। ভুল হয়ত আমিই করিয়াছি বা করিতেছি। ভুল শোধরাইবার জন্তই সেই মর্মেই এই প্রবন্ধের অবতারণা—]

স্মৃতি বন্ধিমচন্দ্র বলিয়া গেলেন—“বাঙালী আত্মবিশ্বস্ত জাতি।” বাঙালীর মাথার টনক নড়িল। অতি-বিশ্বস্ত অতীতকৈ বর্তমানে আনিবার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা চলিতে লাগিল! সফলও প্রায় হইয়া আসিয়াছে। এমন সময় কে বা কাহারো ধূয়া ধরিল—বাঙালী-জাতির অবনতি ঘটয়াছে। প্রকণ্ডে রামানন্দবাবু সেইদিন হইতে আজ পর্যন্ত এক যুগ ধরিয়া কাগজে-কলমে দেখাইয়া আসিতেছেন যে পুঙ্খানুপুঙ্খ উক্তির কোন ভিত্তি নাই। বাঙালী প্রায় আশুত হইয়া আসিয়াছে এমন সময় শ্রদ্ধাঙ্গদ নীরদচন্দ্র চৌধুরী জানাইলেন—বাঙালীর কোন দিন কিছু ছিল না—এখনও নাই। বাঙালী স্তম্ভিত। গত বৎসর কলিকাতায় প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন হইয়া গেল। প্রবাস হইতে সুবিমলচন্দ্র সরকার স্বদেশবাসীদের আপনার অভিভাষণে শুনাইলেন—ভয় নাই, বাঙালী এখন মহা জাতি তো বটেই, মহাপ্রাণিকও—জগতের

সহিত পাঞ্জা দিয়া সে একই রাস্তা দিয়া অনন্তের দিকে চলিয়াছে। কথটিতে ভয় নাই সত্য—কিন্তু সরল বাংলা অর্থে ভয় যথেষ্টই। সুবিমলবাবু কি ব্যঙ্গ করিয়া ইহাই জানাইতে চাহিয়াছেন যে বাঙালী-জাতি, ইহুদী বা বেদে হইয়া উঠিয়াছে বা উঠিতেছে। কে জানে? এদিকে সুবিমলবাবু যে শহর হইতে আসিয়াছিলেন সেই শহরে সেই সময়েই ডক্টর রাধাকমল আসিয়া বলিয়া গেলেন—ম্যালেরিয়া দেশের (অর্থাৎ বাংলার) দুই-তৃতীয়াংশ ছাইয়া ফেলিয়াছে, মৃত্যুর হার দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে এবং অদূর ভবিষ্যতে, এমন কি পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে, যে জায়গা ছিল বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল তাহা প্রশ্রানে পরিণত হইবে। হয়ত। কিন্তু মুন্সিল বাধিয়াছে চুনোপুঁচীদের—তাহারা কোন দিকে মুখ ফিরাইবে ভাবিয়া পায় না।

কবি গাহিলেন—“সুজলা হুফলা, শস্যছায়ালা—”। চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল শরতের পাড় নীল আকাশ, তাহার উপরে শুভ্র লঘু মেঘখণ্ড ইতঃস্ততঃ ভ্রাম্যমান; শ্রামল ধানের ক্ষেত, মুহূর্ত্তে বাতাসে দোল খাইয়া আকাশে বাতাসে মুহূর্ত্তে গুলিয়া কল্লোলকের সৃষ্টি করিয়াছে; শেতশুল কাশগুলি সগর্বে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। মানসচক্ষে ঘেঁষিতে পাইলাম, বাঙালীর গোলাভরা ধান, একান্তবস্ত্রী পরিবার। নৃতিপটে ফুটিয়া উঠিল, স্বস্থ, সবল, হাস্যমুখ বাঙালী। ঔপন্যাসিক আসিয়া লিখিলেন পল্লীসমাজের কথা। সে উপন্যাস বায়কোপের পর্দার ফুটিয়া উঠিল। শিক্তি আত্মাভিমাত্রী (আত্মপ্রতিষ্ঠিতও নয় কি?) বাঙালী যুবক আসিয়া কহিল, “বইটা দেখে পাড়ার সখদে বৈশ একটা idea হয়ে গেল যাহোক।” রাজ্যে আহ্বারের পর সিগারেটের ধূমে ফুটিয়া উঠিল—আত্মকলহ, গৃহবিবাদ, পরশ্রীকাতরতা, নীচাশ্রয়তা—আরও কত কি? দৃষ্টি কান দিকে দিব?

জ্ঞতগামী সীমার, রেল, তারের লাইন সংবাদ বহন করিয়া আনিল, বাংলার ঘরে ঘরে দৃষ্টিক, চতুর্দিকে বহু, পল্লীগ্রাম ছায়েথারে বাইতেছে। ঘরে ঘরে চিতাধূম উঠিয়াছে। বাংলা মহাশ্মশানে পরিণত হইতে চলিয়াছে। তা ঘাউক। পথে পথে তীত্র বৈদ্যাতিক আলো জলিয়া উঠিয়াছে। বায়স্কোপে-বায়স্কোপে হাসির হিলোল উঠিয়াছে। দোকানে-দোকানে বিভিন্ন পসরার রূপ পথচারী পথিকের মন চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। করুক। কিন্তু সমস্তা—চাহিব কোন দিকে?

বাংলার দিকপালগণ একপা বাড়াইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। কোন দিকে দেখিব? সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বিজ্ঞানে জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, ব্যবসায়ে রাজেন্দ্রনাথ, সকলেই সেই একই। আর কোন দিকে দেখিব—কলায়, শিল্পে, রাজনীতিতে...সেই একই কথা।

কিন্তু তাহার পর?—তাহার পর? নিরুদ্ধ, অন্ধকার। দূরে কীণ চিত্তারশ্মি হইতে নির্গত কীণ ধূমরেখা আকাশমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলিয়াছে। শৃগালেরা কি যেন লইয়া কোলাহল করিতেছে—বোধহয় অর্দ্ধদণ্ড মাংসপিণ্ড। পৃথিবীর গলদেশ হইতে কাটার মত বাঙালী জাতিটাকে তুলিয়া ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। মেজর গুপ্তের অপারেশন সাক্সেসফুল হইয়াছে। “জাগো; শকরী, জাগো!”

ধুম ভাঙিয়াছে। বিজ্ঞানায় বসিয়া-বসিয়া চা খাইতে খাইতে হঠাৎ চোখ পড়িল টেবিলের তলয়—গাঁজার কলিকাটি ভাঙিয়া রহিয়াছে।

ম. চ. স.

তিমিঙ্গিল

তিমি মংস্তই যে পৃথিবীর বৃহত্তম জীব, এ বিষয়ে জানী ব্যক্তিরা একমত। আমি কিন্তু নিতান্ত অজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও বলিতে পারি যে, তিমিঙ্গিল নামধারী আর একটি অতি বৃহদায়তন জীব আছে যাহারা তিমি মংস্তকে গিলিয়া খায়। বিশ্বাস না হয়, অভিধান দেখুন।

অপিচ, তিমিঙ্গিল যদি থাকিতে পারে, তবে তিমিঙ্গিল-গিল (যাহারা তিমিঙ্গিলকে গিলিয়া খায়) থাকিবে না কেন? এবং তিমিঙ্গিল-গিল থাকা যদি সম্ভবপর হয় তবে তিমিঙ্গিল-গিল-গিল থাকিতেই বা বাধা কি?

এই ভাবে প্রশ্নটাকে অনন্তের পথে চৈলিয়া লইয়া যাওয়া চলিতে পারে। কিন্তু তাহাতে অনর্থক কতকগুলো গিল-গিল-গিল বাড়িয়া যাওয়া ছাড়া আর কোনই লাভ হইবে না। আমাদের প্রতিপাত্ত এই যে, জগতে সর্বত্রই বৃহৎক বৃহত্তর গ্রাস করিয়া থাকে। অর্থাৎ—বীরভোগ্যা বহুদ্রা।

শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত গুপ্ত মহাশয় বিজ্ঞানায় চিং হইয়া হইয়া চিন্তা করিতেছিলেন। রাজি এগারোটা বাজিতে সাতাশ মিনিট সময়ে তিনি হঠাৎ তড়াক করিয়া শয্যা উঠিয়া বসিলেন। ঘরে আর কেহ থাকিলে মনে করিত, নিশিকান্তবাবু বৃদ্ধি বৈদ্যাতিক ‘শক’ খাইয়াছেন। হইয়া-ছিলও তাই। তাহার মস্তিষ্কের ভিতর দিয়া চল্লিশ হাজার ভোটের প্রচণ্ড একটি আইডীয়া খেলিয়া গিয়াছিল।

নিশিকান্তবাবু একজন লক্ষপ্রতিষ্ঠ দালাল; ব্যবসা-সম্পর্কীয় সকল

বিভার হনরী। তাঁহার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। ক্রয়-বিক্রয় তেজী-মন্দা বাজার-জ্ঞান সখাচ্ছে তাঁহার সমকক্ষ কলিকাতা শহরে বড় কেহ ছিল না। এই সূক্ষ্ম বাজার-জ্ঞানের ফলে গত পঁচিশ বৎসরে তিনি কত লক্ষ টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহা তিনি ও ইন্সপিরিয়াল ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ ছাড়া আর কেহ জানিত না। বাহারা কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে তাঁহার চমৎকার সুসজ্জিত দোতারা বাড়ীখানা দেখিত, তাহারাহা সহিংসভাবে অহমান করিত মাত্র।

কিন্তু গত কয়েক বৎসর ধরিয়া বাজারের এমন অবস্থা হইয়াছে যে, নিশিকান্তবাবুর চিন্তে স্থখ নাই। কাজকর্ম প্রায় বন্ধ আছে। কারণ, কাজ করিতে গেলেও লাভের মাত্রা এত কম হস্তগত হয় যে খরচা পোষায় না। ব্যবসার জগৎটা যেন ধীরে ধীরে প্রলয়পয়োদ্বিজলে ডুবিয়া যাইতেছে।

নিশিকান্তবাবুর অবস্থা অর্থোপার্জনের কোনও প্রয়োজন নাই; ব্যাঙ্ক হইতে ছয় মাস অন্তর যে স্ত্রদ বাহির করেন তাহাতে তাঁহার পাচটা হাতী পুমিলেও ব্যয়সঙ্কোচ করিতে হয় না। কিন্তু নিশিকান্ত কর্ত্তী পুরুষ, অর্থোপার্জনের নেশা তিনি পঁচিশ বৎসর ধরিয়া অভ্যাস করিয়াছেন। তাই, আফিমের মোতাতের মত উপার্জনের মোহই তাঁহাকে বেশী করিয়া চাপিয়া ধরিয়াছে। অথচ দারুণ পরিতাপের বিষয় এই যে, বর্ত্তমান মন্দার বাজারে উপার্জন একেবারেই নাই।

নিশিকান্ত জগদ্বাপী অবসাদের মধ্যে কোথাও একটু আশার আলো দেখিতে পাইতেছিলেন না, এমন সময়ে রাজি এগারোটা বাজিতে সাতাশ মিনিটে তাঁহার মাথায় চল্লিশ হাজার ভোটের বিদ্যায় খেলিয়া গেল।

আলোক-বিভাস্তের মত নিশিকান্ত কিছুক্ষণ বিভ্রানায় জড়বৎ বসিয়া রহিলেন। তাঁহার মাথায় ঘুরিতে লাগিল,—মোমবাতি! হারিকেন লঠন!!

হাত বাড়াইয়া তিনি বেড্-হুইচ্ টিপিলেন; রক্ত বর্ণ নৈশ দীপ মাথার উপর জলিয়া উঠিল। নিশিকান্ত প্রায় দশ মিনিট মুগ্ধ তন্দ্রায় ভাবে সেই দিকে তাকাইয়া রহিলেন; তারপর ধীরে ধীরে আবার শয়ন করিলেন।

বালিশের পাশে তাঁহার নোটবুক ও পেন্সিল থাকিত। নিশিকান্ত বকের তলায় বালিশ দিয়া উপুড় হইয়া শুইলেন, তারপর নোটবকের পাতা উন্টাইতে লাগিলেন। নোটবকের অবোধা ইন্দ্রিতে তাঁহার ব্যবসা সংক্রান্ত যাবতীয় গুপ্ত কথা লেখা ছিল, তিনি সেইগুলি পড়িতে পড়িতে মনে মনে হিসাব করিতে লাগিলেন। প্রথমে হিসাব করিলেন, কত টাকা তিনি ইচ্ছা করিলেই ব্যাঙ্ক ও অগ্ৰাচ্ স্থান হইতে বাহির করিতে পারেন। হিসাব বোধ করি বেশ মনোমত হইল, কারণ তিনি পরিতোষের নিখাস ত্যাগ করিলেন।

অতঃপর তিনি নোটবকের পাতায় পেন্সিল দিয়া আর এক-জাতীয় অঙ্ক করিতে আরম্ভ করিলেন। বোধ হয় এটা খরচের হিসাব। সমস্ত যোগ করিয়া পাঁচ লক্ষ টাকার কিছু বেশী হইল। নিশিকান্ত খাতা হইতে মুখ তুলিয়া বিড় বিড় করিয়া কি বলিলেন, তারপর নোটবহি বন্ধ করিয়া বালিশের পাশে রাখিয়া দিলেন। তাঁহার মুণ্ডিত মুখে দশ হাজার দীপশক্তির যে হাসিটি ফুটিয়া উঠিল তাহার কাছে রক্তবর্ণ নৈশ দীপের প্রভা একেবারে ম্লান হইয়া গেল।

তিনি মনে মনে বলিলেন,—‘তিনি দিনে বাহান্তর হাজার টাকা! মানে—চাঁচ কল্লিশ হাজার’

নিশিকান্তবাবুর জী পাশের ঘরে শয়ন করিতেন, মাথের দরজায় পদ্দার ব্যবধান। নিশিকান্ত বাবুর দ্বিতীয় পক্ষ—তবে ভাষ্যাটি নেহাৎ তরুণী নয়, বয়স বত্রিশ তেরিশ। তিনি অত্যন্ত সৌখিন এবং বক্ষ্যা, এই কথা বাংলা সাহিত্যে তাঁহার প্রবল অহরাগ। প্রায়ই মাসিক পত্রিকা কবিতা লেখেন।

নিশিকান্তবাবু ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন, পদ্দার নীচে দিয়া আলো দেখা যাইতেছে। বুঝিলেন, গৃহিণী এখনো মাসিক পত্র শেষ করেন নাই। জিজ্ঞাসা করিলেন,—‘হ্যাগা, জেগে আছ?’

পাশের ঘর হইতে হ্যাগা উত্তর দিলেন,—‘হঁ’

আলুখালু বস্ত্র কোমরে জড়াইয়া নিশিকান্ত জীর ঘরে গেলেন। জী পিঠে বালিশ দিয়া অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় শয্যায় দেহ প্রসারিত করিয়াছিলেন, মাথার শিয়রে একটা ত্রিপদের শীর্ষে বৈদ্যুতিক ল্যাম্প জলিতেছিল। জী কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া নিশিকান্তবাবুর চেহারা দেখিয়া ঈষৎ ক্রুদ্ধি করিলেন।

নিশিকান্ত আলোর নিকটে গিয়া স্থিচ টিপিয়া আলো নিবাইয়া দিলেন; আবার জালিলেন, আবার নিবাইয়া দিলেন।

বিরক্তভাবে গৃহিণী বলিলেন,—‘ও কি হচ্ছে?’

নিশিকান্ত বলিলেন,—‘বেশ—না? এই ইলেক্ট্রিক বাতি। স্থিচ টিপিলেই নিবে যায় আবার স্থিচ টিপিলেই জলে ওঠে।’

জী ধমক দিয়া বলিলেন,—‘এত রাজে হল কি তোমার?’

নিশিকান্ত জীর শয্যার পাশে আসিয়া বসিলেন; একটু বেন অঙ্গ-মনস্ত ভাবে বলিলেন,—‘আমি ভাবছি একটা ছাপাখানা করতে কত খরচ লাগে।’

জীর হাত হইতে মাসিক পত্র পড়িয়া গেল। তিনি সচকিতে উঠিয়া

বসিলেন। বহুদিন হইতে তাঁহার বাসনা নিজের ছাপাখানা করিয়া একটি মাসিক পত্রিকা বাহির করেন; মাসিক পত্রে কেবল কবিতা ছাপা হইবে। পত্রিকার নাম হইবে—‘মন-কুহুম’—সম্পাদিকা হইবেন স্বয়ং শ্রীমাদুরী দেবী!

স্বামীকে এই স্বপ্নের পরিকল্পনার কথা বলিয়াছিলেন। কবিতার মাসিক পত্র কিরূপ চলিবে সে-বিষয়ে নিশিকান্তবাবুর মনে কোনো মোহ ছিল না। অথচ জীর একটা সখ মিটাইবার ইচ্ছা তাঁহার যে একেবারেই ছিল না, তাহাও নয়। কিন্তু বাজার মন্দা বলিয়া নিশিকান্ত গা করেন নাই।

মাদুরী দেবী এক নিখাসে বলিলেন,—‘সত্যি কিনেবে?—আমার কতদিন থেকে যে সখ। ‘মন-কুহুম’—কেমন নামটি হবে বল ত? নীচে লেখা থাকবে—সম্পাদিকা শ্রীমাদুরী দেবী!—থরচ এমন কিছু নয়; সেদিন ‘নীলকান্ত প্রেসের’ মালিক আমার কাছে এসেছিল। তারা প্রেস বিক্রি করতে চায়, কোথা থেকে শুনেছে আমি কিনতে পারি। খুব বড় প্রেস—ইংরেজী বাংলা সব আছে; নতুন দাম মাতাশ হাজার টাকা। বলছিল, আঠার হাজার পেলেই বিক্রি করবে। তা—কয়ামাজা করলে হয়ত কিছু কমেও দিতে পারে।’

নিশিকান্ত ঈষৎ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—‘খবর নিও, যদি বারো হাজারে ছাড়ো ত নিতে পারি।’

মাদুরী দেবী বলিলেন,—‘অত কমে দেবে কি? আচ্ছা—’

নিশিকান্ত শয্যাশ্রান্ত হইতে উঠিলেন। মাদুরী দেবী (তাঁহার হাত টানিয়া ধরিয়া তরল কর্তে) বলিলেন,—‘এখনি শুতে চললে?’

নিশিকান্ত আলস্ত ভাঙিয়া বলিলেন,—‘হ্যাঁ আর দ্যাখ, কাল ছাটিন ভাল স্কোরাসিন তেল আর গোটা দশেক হ্যারিকেন লণ্ডন কিনে

আনিও। আর পাঁচ বাণ্ডিল মোমবাতি।' বলিয়া নিগূঢ় ভাবে হাস্ত করিতে করিতে তিনি নিজের শয্যা গিয়া শয়ন করিলেন।

অতঃপর সাতদিন ধরিয়া নিশিকান্তবাবুর ভোমরা রঙের ছোট্ট সিঁতান-বড়ির গাড়িখানি মধু-সঞ্চয়ী মৌমাছির মত কলিকাতার পথে পথে গুলন করিয়া উড়িয়া বেড়াইল। নিশিকান্তবাবু কোথায় কোথায় গেলেন ও কাহার সহিত নিভূতে কি কথা বলিলেন তাহা ব্যক্ত করা আমাদের সাধ্য নয়—সাধ্য হইলেও বলিতাম না। পরের গুহ্য কথা প্রকাশ করিয়া দিতে আমরা ভালবাসি না। এই সব যাতায়াতের ফলে নিশিকান্তবাবুর ব্যাক হইতে লক্ষাধিক টাকা অপস্থত হইয়া কোন মৌচাকে সঞ্চিত হইল তাহাও বলিব না। ঘুমির পুংলিখে যে-শব্দ উৎপন্ন হয় তাহাকে আমরা অত্যন্ত ঘৃণা করি।

তারপর মাল খরিদ আরম্ভ হইল। নিশিকান্তবাবু যে যে মাল খরিদ করিয়া বাজার কোণঠাসা করিলেন তাহার ফিরিতি দিবার প্রয়োজন নাই; তিনি বাজার উজাড় করিয়া গুদামজাত করিলেন। বড় বড় দেশী বিলাতী ব্যবসায়ীরা বিস্ময়ে ক্র জুলিল, মনে মনে হাসিল,—কিন্তু অকপট আনন্দে হাত ঘষিতে ঘষিতে মাল সরবরাহ করিল। কেবল নিশিকান্তবাবু কেরাসিন তেলের দিকে গেলেন না; অনেক মূলধন চাই, লাগে কুলাইবেনা। অগ্রসর চিত্তে তিনি মনে মনে বলিলেন—'করে নিক্ ব্যাটার কিছু লাভ।'।

দশদিনের দিন নিশিকান্তবাবুর সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হইল। তিনি গুদামে গিয়া মাল পরিদর্শন করিলেন, অফিসে বসিয়া পাতাপত্র তদারক করিলেন; তারপর চেয়ারে তৈয়্যার দিয়া একটি স্থলকায় সিংগার ধরাইয়া বলিলেন,—'এইবার।'।

সেইদিন রাত্রে সাতটার সময় কলিকাতা শহরের সমস্ত বিদ্যুৎবা

নিবিয়া গেল। রাজি দশটার সময় রাস্তার গ্যাস বাতিও হঠাৎ কয়েকবার দপদপ করিয়া চক্ষু মুদিল—তিনদিনের মধ্যে আর জ্বলিল না।

আলোকহীন মহানগরীর বর্ণনা আমরা করিব না। অন্ধকারের যে একটা রূপ আছে—কালিমা লইয়া যাহাদের কারবার তাহারা সে রূপ নয়ন ভরিয়া দেখুন এবং বর্ণনা করুন। নিশিকান্তবাবুর মত আমরা আলোর কারবারী।

রাস্তা এবং ঘর অন্ধকার; ট্রাম বন্ধ। হারিকেন লঠন ও মোমবাতির দর ব্যাঙের মত লাফাইয়া লাফাইয়া চড়িতে লাগিল। অথচ এই দুইটি দ্রব্য নিশিকান্তবাবুর গুদামে বন্ধ। তিনি অগ্নে অগ্নে ছাড়িতে আরম্ভ করিলেন।

দ্বিতীয় রাজ্যেও যখন আলো জ্বলিল না, তখন চারিদিকে বিরাট হৈ হৈ পড়িয়া গেল। আশ্চর্য্য দৈব ছুঁটনায় গ্যাস ও ইলেকট্রিক যন্ত্র এমন ধারাপ হইয়া গিয়াছে যে কিছুতেই মেয়ামৎ হইতেছে না। কিন্তু গৃহস্থের আলো চাই। লঠন ও মোমবাতির দাম এমন একটা কোঠায় গিয়া উঠিল যে কল্পনা করাও কঠিন। নিশিকান্তবাবু মাল ছাড়িতে লাগিলেন, এবং ব্যাঙ্কে টাকা পাঠাইতে লাগিলেন। যে সব বড় বড় ব্যবসাদার একগাল হাসিয়া নিশিকান্তকে মাল বিক্রয় করিয়াছিল, তাহারা হাত কামড়াইতে লাগিল।

দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যার সময় নিশিকান্তবাবু হিসাব করিয়া দেখিলেন, তাহার মূলধন উঠিয়া বারো হাজার টাকা উদ্ভূত হইয়াছে। তাছাড়া এখনো ষাট হাজার টাকার মাল গুদামে মজুত।

বারো হাজার টাকা পকেটে লইয়া নিশিকান্তবাবু অফিস হইতে বাড়ী ফিরিলেন। স্ত্রী তিনটা লঠন জালিয়া স্বামীর গুহ্য স্বহস্তে চা

তৈয়ার করিতেছিলেন, তাঁহার কোলে নোটের ভাড়া ফেলিয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—‘এই নাও !’

মাদুরী দেবী একমুখ হাসিয়া স্বামীকে অভ্যর্থনা করিলেন—‘আজ সরকারকে বাজারে খোঁজ নিতে পাঠিয়েছিলুম; একটা হারিকেনের দাম পাঁচটাকা!—হ্যাঁগা, আর ক’দিন?’

তৃতীয় দিন সন্ধ্যার সময় নিশিকান্তবাবুর গুদাম খালি হইয়া গেল। শেষ কিস্তির ষাট হাজার টাকা ব্যাঙ্কে পাঠাইবার সময় ছিল না। এই টাকাটাই নিশিকান্তবাবুর মূল লভ্যাংশ। এত টাকা এখন কোথায় রাখিবেন—নিশিকান্ত একটু চিন্তা করিলেন। অফিসের লোহার সিঁদুকে রাখিয়া গেলেও চলে, কিন্তু—‘হু’একটা সংবাদ নিশিকান্তের শ্রবণ হইল। অঙ্ককারের সুযোগ লইয়া চোর ও গুণ্ডার দল খালি অফিস-বাড়ী ইত্যাদি ভাঙিয়া লুণ্ঠ করিতেছে—বড় বড় দুই তিনটা অফিসে এইরূপ ব্যাপার হইয়া গিয়াছে। নিশিকান্ত নোটের গোছা পকেটে পুরিয়া লইলেন। বাড়ীতে রাখিলেই সব চেয়ে নিরাপদ হইবে। বাড়ীতে পাঁচটা গুণ্ডা দরওয়ান, দশটা চাকর আছে; তাহার উপর আবার দু’জন কনেটবলকে খরচা দিয়া পাহারা দিবার জন্ত নিয়োগ করা হইয়াছে।

নিশিকান্ত অফিস হইতে বাহির হইয়া যখন মোটরে চড়িলেন, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। মোটরের কাচের ভিতর দিয়া ছ’দারি রাস্তার চেহারা সকোভুকে দেখিতে দেখিতে চলিলেন। কলিকাতা যেন রাজিযোগে ভৌতিক শহরে পরিণত হইয়াছে। বড় বড় দোকানের বিদ্যুৎ-দণ্ড বিকশিত হাসি আর নাই, অধিকাংশই বন্ধ। বেগুনি খোলা আছে তাহাতে মোমবাতি ও লণ্ঠন জলিতেছে। পথে

গাড়ী মোটরের চলাচলও কম। মাহুয বাহারা যাতায়াত করিতেছে তাহাদের নিশাচর প্রেত বলিয়া ভ্রম হয়।

কলেজস্ট্রীট বাজারের নিকটে পৌছিয়া নিশিকান্তবাবুর ভারি কৌতূহল হইল। কোনও একটা বড় কাজ করিয়া সাধারণের মতামত জানিবার ইচ্ছা স্বাভাবিক। তিনি মোটর হইতে নামিলেন। একটা ক্ষুদ্র দোকানে আলো জলিতেছিল, তাহার সম্মুখীন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—‘মোমবাতি আছে?’

দোকানদার বলিল,—‘আজ্ঞে আছে, তিনটাকা বাঙিল।’

নিশিকান্ত পকেট হইতে তিনটাকা বাহির করিয়া দিয়া ছদ্ম বিরক্তির কণ্ঠে বলিলেন, দিন এক বাঙিল। যত সব চোরের পাঞ্জায় পড়া গেছে। ইংরেজিতে যাকে বলে ‘শার্ক’ এই ব্যবসাদারওয়ালা হচ্ছে তাই!’

দোকানদার নেহাৎ অশিক্ষিত নয়, একটু রসিক; বলিল, ‘শার্ক’ ত পদে আছে মশাই, ব্যবসাদারেরা যাকে বলে তিমি মাছ—তাই! আশু গিলে থায়। নিন এক বাঙিল।’

নিশিকান্ত দোকানদারের কথাগুলি চাখিয়া চাখিয়া উপভোগ করিলেন; তিনি নিজেই যে তিমিমাছ, দোকানদার তাহা জানে না—অজ্ঞাতসারেই প্রশংসা করিতেছে। তাঁহার ছদ্ম বিরক্তির ভিতর দিয়া একটু হাসি খেলিয়া গেল। তিনি মোমবাতির বাঙিল লইয়া মোটরের দিকে কিরিলেন।

মোটরে উঠিতে যাইবেন. এমন সময়—

তিমিঙ্গিল!

নিশিকান্ত হঠাৎ বৃষ্টিতে পারিলেন, তাঁহার চারিপাশে কয়েকজন লোক নিঃশব্দে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তিনি সচকিতে চারিদিকে চাহিলেন; অস্পষ্ট আলোয় মুখমণ্ডলী ভাল দেখা গেল না।

একজন তাঁহার পেটের উপর ছোয়ার অগ্রভাগে রাখিয়া চাপা গলায় বলিল—‘চিল্লাও মং!’

আর একজন তাঁহার কোটের ভিতর পকেটে হাত পুরিয়া নোটের তাড়া বাহির করিয়া লইল। নিশিকান্তবাবু হতভম্ব হইয়া রহিলেন। ভিমিলিলের দল ছায়ার মত অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল।

তাহারা চলিয়া যাইবার মিনিটখানেক পরে নিশিকান্ত উদ্ভাসকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—‘পুলিস পুলিস! আমার বাট হাজার টাকা—’

নিশিকান্ত থানায় গেলেন।

থানার দারোগা বলিলেন,—‘লিখে নিচ্ছি। কিন্তু টাকা আর পাবেন না। এই আলোর গোলমাল হয়ে অবধি শহরটা চোর-বন্দমায়েসের আড্ডা হয়েছে।’

বাড়ী ফিরিতে ফিরিতে নিশিকান্তবাবুর বিভ্রান্ত চিন্তে একটি ক্ষীণ সান্ত্বনা জাগিতে লাগিল—‘যাক তবু বারো হাজার টাকা লাভ রইল।’

রাত্রি আটটার সময় তিনি বাড়ী পৌঁছিলেন। মাধুরী দেবী অধীরভাবে তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি প্রবেশ করিতেই ছুটিয়া গিয়া বলিলেন, ‘ওগো, ভারি স্বপ্নবর!! নীলকান্ত প্রেস কিনে নিয়েছি। বারো হাজারেই রাক্ষস হয়ে গেল।’

নিশিকান্ত বসিয়া পড়িলেন; তাঁহার গলা দিয়া একপ্রকার ঘড় ঘড় শব্দ বাহির হইল। ঘরের মধ্যেও যে ভিমিলিল বসিয়া আছে তাহা কে জানিত!

এই সময়, যেন নিশিকান্তকে বিজ্ঞপ্তি করিয়া, কলিকাতার ইলেকট্রিক বাতি আবার জলিয়া উঠিল। বাকাল বন্ধ এতদিনে ঠিক হইয়া গিয়াছে!

শ্রীশরদ্দিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

টাইফয়েড

রাত্রি কত হইয়াছে আন্দাজ করা শক্ত।

একটি থার্ড ক্লাস কামরার জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া আনন্দ ঠিক করিবার চেষ্টা করিতেছিল ট্রেনটা হঠাৎ থামিয়া গেল কেন। সোঁ সোঁ শব্দ ছাড়া আর অন্য কিছু শোনা যাইতেছে না।—কিছুদূরে আকাশের গায়ে লাল আলো। আনন্দ বিশেষ কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া আবার শুইয়া পড়িল। ঘুমটা ভাঙিয়া যাওয়াতে বিরক্ত হইল।

শুইবামাত্র ‘হুইস্‌ল’ দিয়া ট্রেনটা ছাড়িল এবং ছাড়িবার সময় ‘বচাং’ করিয়া সমস্ত গাড়ীটাকে এমন একটা নাড়া দিল যে সামনের বেক হইতে একটি ভদ্রমহিলা পড়িয়া যাইতে যাইতে সামলাইয়া লইলেন।

মহিলাটির সঙ্গে যিনি অভিভাবক ছিলেন তিনি শশব্যস্ত হইয়া বাক হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, “লাগল না কি?”

মহিলাটি একটু অপ্রস্তুত হইয়াছিলেন—যুহু হাসিয়া মাথা নাড়িয়া উত্তর দিলেন যে লাগে নাই।

মহিলাটির অভিভাবক-ভদ্রলোক কোনরূপে বাকের উপর একটু জায়গা করিয়া লইয়া তাহার মধ্যেই নাক ডাকাইতেছিলেন। মহিলাটির শুইবার স্থান ছিল না। তিনি বসিয়া বসিয়া ঢুলিতে লাগিলেন।

আনন্দের ঘুম আসিতেছিল না। সে সফল হইতে একটানা বেশ বানিকটা ঘুমাইয়া লইয়াছে। সে শুইয়া শুইয়া লক্ষ্য করিতে লাগিল যে ভদ্রমহিলাটি ক্রমাগত ঢুলিতেছেন।

হঠাৎ আনন্দের মনে হইল কাজটা অভদ্র হইতেছে।

সে উঠিয়া বসিল এবং একটু ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে বলিল, “আমি আর ঘুমোব না। আপনি এসে না হয় আমার এই বেকটাতে শুয়ে পড়ুন।” বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। বাতের উপর হইতে ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি হল?”

আনন্দ বলিল, “আমার ঘুম হয়ে গেছে। ইচ্ছে করলে উনি আমার বেকটাতে শুতে পারেন। বসে চুলছেন কি না!”

মহিলাটি একটু লজ্জিত হইয়া মাথা নত করিলেন।

“দত্তবাদ!—বেশ তো,—অহু শুয়ে পড় তুই। কতক্ষণ আর বসে থাকবি!”

আনন্দ স্থান করিয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

অহু অর্থাৎ অল্পপমা সসকোচে শয়ন করিলেন।

ভাল করিয়া লক্ষ্য করিতে আনন্দ দেখিল, যাহাকে সে ‘মহিলা’ বলিয়া মনে করিতেছিল আসলে সে একটি ছিপছিপে রোগা-গোছের মেয়ে—বয়স বড়জোর উনিশ কি কুড়ি!

দীর মন্থর গতিতে ট্রেন ঠেগনে প্রবেশ করিল।

কিউল।

চায়ের সন্ধানে গলা বাড়াইতেই বাক হইতে অভিভাবক-ভদ্রলোকটি—অবিনাশবাবু—আনন্দকে বলিলেন, “আমার জ্বছেও এককাপ নিন তো!” বলিয়া তিনি বাক হইতে নামিয়া বসিলেন।

চা পান করিতে করিতে বা হাতের আঙুল দিয়া মাথার রগ টিপিতে টিপিতে অবিনাশবাবু বলিলেন, “মাথাটা ভারি ধরেছে।”

সর্দাঙ্গে বালাপোষ মুড়ি দিয়া এক বুদ্ধ কোণে বসিয়া ছিলেন। তিনি অযাচিত ভাবে বলিয়া উঠিলেন, “মাথা ধরেছে তো? পায়ের

ছুটো বুড়ো আঙুলে বেশ করে কসকসিয়ে দড়ি বেঁধে রাখুন তো—একুনি ছেড়ে যাবে।”

অবিনাশবাবু বলিলেন, “তাই না কি?”

“কতদূর যাবেন আপনারা?”

অবিনাশবাবু উত্তর করিলেন, “সাহেবগঞ্জ।”

আনন্দ যেন অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া উঠিল—“সাহেবগঞ্জ? আমার বাড়ী যে সেখানে। আমি তো সেখানেই যাচ্ছি। সাহেবগঞ্জে কোন জায়গাটার যাবেন আপনি?”

“হররামবাবুর বাড়ী। চেনেন আপনি?”

“চিনি মানে? ঠিক সামনাসামনি বাড়ী আমাদের—একই গলিতে। কিন্তু তাঁরা তো ওখানে কেউ নেই আজকাল—তাঁরা—”

“গিরিভিতে। বাড়ীটা বালি আছে বলেই না যাচ্ছি। ছুটি পেলাম। একটু বেড়িয়ে যাওয়া যাক। হররাম আমার সখদ্বী।”

অকারণে আনন্দ বলিয়া ফেলিল, “বেশ করেছেন।” কিছুক্ষণ চুপচাপ। আনন্দ বইটা মনোযোগ দিয়া পড়িবার চেষ্টা করিল। আবার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইল, “আপনার সঙ্গে আর কে কে আছেন?”

“আজ এক চাকর ছাড়া আর কেউ নেই। কাল আমার ছেলে এসে পৌঁছবে। কলেজের ছুটি হবে কাল তার। অহু আমার মেয়ে। বছর দুই হল জ্বী মারা গেছেন। তাই ছেলে-মেয়েদের ছুটি হলেই বেরিয়ে পড়ি কোথাও না কোথাও।”

আনন্দ কোন উত্তর দিল না। জানালা দিয়া সে দেখিতে

লাগিল পাহাড়ের ওপারের আকাশটায় কে-যেন মুঠামুঠা আঁকি ছড়াইতেছে।

অল্প-বয়স্ক মেঘমালা, আলোক স্বপ্নাচ্ছন্ন।

বেলা প্রায় আটটা বাজে। সাহেবগঞ্জ আসিল বলিয়া!

অবিনাশবাবু বাক হইতে নামিয়া বসিয়াছেন।

আনন্দের সহিত নানা বিষয়ে গল্প চলিতেছে।

অল্পমার গল্পে যোগদান করে নাই। সে জাগিয়া অবধি জানালার বাহিরে মুখ বাহির করিয়া দেখিয়া চলিয়াছে।

কি যে এত দেখিতেছে—সেই জানে!

সাহেবগঞ্জ! ট্রেন থামিলেই অবিনাশবাবু বলিলেন, “আমার তিনটে কুলী লাগবে। অহ মা—দেখো কুঁজোটা না ভাঙে! আনন্দবাবু দেখুন”—

হঠাৎ আনন্দ বলিল, “দেখুন, আপনি আমার পিতৃতুল্য! আমাকে ‘আপনি’ বলে আর লজ্জা দেবেন না। আপনার ছেলে আমার সহপাঠী—না হয় ভিন্ন কলেজেই পড়ি আমরা।”

“আচ্ছা, আচ্ছা—তা সে—মানে” অবিনাশবাবু কি বলিবেন ঠিক করিতে না পারিয়া বলিয়া ফেলিলেন, “আচ্ছা, চারটে কুলীই ডাকো তাহলে।”—

ঠেগনে নামিতেই দীর্ঘ স্বচ্ছন্দে বলিষ্ঠ এবং সুদর্শন একটি যুবক আসিয়া আনন্দকে সম্ভাষণ করিল, “কোথায় গিয়েছিলি তুই আনন্দ! আমি রোজ তোমার খোঁজ করছি।”

আনন্দ বলিল, “কালী বেড়িয়ে এলাম।”

শনিবারের চিঠি

মৃণাল গলার স্বর একটু খাটো করিয়া বলিল, “আজ ছটার সময় পাহাড়তলীতে আমরা meet করব!”

আনন্দ বলিল, “কেন?”

“ভুলে গেলে? বেশ ছেলে!”

“ও—সেই ব্যাপার! আচ্ছা!”

আনন্দের মুখে কণিকের জন্ত চিন্তার ছায়া পড়িল। সে আবার বলিল, “তুই যা এখন। যাব আমি।”

“মনে থাকে যেন”—বলিয়া মৃণাল চলিয়া গেল।

পথে আসিতে আসিতে অবিনাশবাবু বলিলেন, “বাঃ—চমৎকার পাহাড় তো!—এখান থেকে কতদূর!”

আনন্দ উত্তর দিল, “বেশী দূর নয়। এই রেললাইনগুলো পেরিয়ে একটা মাঠ—আমাদের ফুটবল খেলা হয় সেখানে—সেই মাঠটা পেরিয়ে একটু গেলেই পাহাড়—ওই যে এই বড় পাহাড়টার ওপর একটা গাছ দেখছেন, ওটা একটা তেঁতুল গাছ—আমরা সব নিজেদের নাম খোদাই করে এসেছি ওর গায়ে।”

অল্পমার চক্ষু দুইটি কৌতুহলে ভাষাময় হইয়া উঠিল।

অবিনাশবাবু বলিলেন, “এখানকার রাস্তাঘাটগুলিও বেশ স্বরস্বরে!—এই রাস্তাটা সোজা বৃষ্টি গঙ্গার ধারে গেছে?” বলিয়া তিনি একটি লাল কাকরের পরিচ্ছন্ন রাস্তার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন। চমৎকার রাস্তাটি! দুধারে গাছের সারি। গাছের কান্ধে কান্ধে আকাশ দেখা বাইতেছে। লাল রাস্তার উপর আলো-ছায়ার ছবি আঁকা। রাস্তার দুইপাশে প্রায় একই ধরনের পরিষ্কার শাকাবাড়ী। প্রায় প্রত্যেকটিরই সম্মুখে ছোট বাগান।

‘আনন্দ’ বলিল, “হ্যাঁ এই রাস্তাটা সোজা গদ্যার ধারের দিকে গেছে—চার্জ হয়ে!”

তাহার পর ‘আনন্দ’ দেখাইতে দেখাইতে চলিল, “এটা ইষ্টল, এট ডাক্তারখানা, এইটে মিউনিসিপ্যাল অফিস, এইটে গার্ড-বাউল—ওগুলো রেলওয়ে কোয়ার্টার—

বেশ পরিচ্ছন্ন ছোট শহর।

অল্পমণা বলিল, “আজ আমরা একটু পরে বেড়াতে বেরোব, কি বল বাবা?”

“আজ বাক। শরীরটার তেমন যুৎ নেই!”

২

ভালো ছেলে বলিতে যাহা বুঝায়, শ্রীমান ‘আনন্দমোহন’ রায় তাহাই। এ অঞ্চলে নাম-করা ছেলে। স্কুলের সে ভাল ছেলে ছিল—কলেজেও ভাল লেখাপড়া করিতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষায় যদিও সে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেয় নাই—কিন্তু কৌশলীমান যে-কোন ছাত্র অপেক্ষা তাহার জ্ঞানের পরিধি ছোট নয়। চরিত্রবান হুঁহু অমায়িক যুগল। পরোপকারী। এই সাহেবগণেরই যে-কোন বাড়িতে অস্থগবিস্থ করিলে ‘আনন্দ’ই ছিল সকলের ভরসা-স্থল। তাহার একদল ভক্ত ছিল—সেই ভক্তেরা অধিকাংশই স্কুলের ছাত্র। তাহারা ‘আনন্দের’ জন্ত সমস্ত করিতে প্রস্তুত।

আহারাদির পর ‘আনন্দ’ নিজের ঘরে শুইয়া থবরের কাগজে মনো-যোগ রিয়াছে এমন সময় বৌদিদি দর্শন দিলেন—

“কি ঠাকুরপো, কেমন দেখে এলে কানী?”

“বেশ ভালই!”

“কোথায় উঠেছিল?”

“আমার এক বন্ধুর বাসায়।”

“ভাগ্যে ঠিকানা দিয়ে যাওনি। তা হলে বিপদে পড়ে যেতে!”

“কেন?”

“টেলিগ্রাম যেত।”

“কেন?”—‘আনন্দ’ উঠিয়া বলিল।

“কেন দেখ তাহলে!” বলিয়া হাস্যমুখী বৌদিদি উঠিয়া গেলেন এবং ফর্গপরে একটি ‘ফোটা’ হস্তে ফিরিয়া আসিলেন।

“কেন, এই দেখ!”

‘আনন্দ’ দেখিল। বলিল, “কানীতে থাকে বুঝি?”

“কুষ্টি প্রভৃতির সব মিল—এখন মেয়ে পছন্দ হলেই হয়।”

‘আনন্দ’ বলিল, “আচ্ছা কেন তোমরা সবাই মিলে এমন করে উঠে-পড়ে লেগেছ বল দেখি!”

“তবে কি বলতে চাও বিয়ে করবে না! পঁচিশ বছর বয়স হতে চলল। আর কেন?”

‘এখনতো তোমার উৎসাহের অন্ত নেই—কিন্তু বিয়ের পর তখন তুমিই নানারকম খুঁৎ বার করে একটা ঝগড়ার সৃষ্টি করবে। বেশ তো আছি। তোমাদের এত মাথাব্যথা কেন?”

“হিৎস করে!” বলিয়া বৌদিদি মুখ টিপিয়া হাসিলেন।

“আমি বিয়ে করে তোমাদের মত ত্রাতা-জোবড়া হয়ে থাকতে চাই না!”

“তোমার এত পরাশ-গণ্ডা হাদ্যামা পোয়াবে কে বলতো? ঘন ঘন চা চাই! পাওয়া নাওয়ার ঠিক নেই। সেবক-সমিতির পাণ্ডাগিরি করে রাজে বারোটার সময় আর দিনে ছোটর সময় বাড়ী ফিরবে—কে তোমার জন্তে রোজ রোজ বসে থাকবে!”

“কেন, তুমি! অনর্থক বাড়ীতে নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করার কোন হেতু দেখতে পাচ্ছি না। তুমিতো একাই স্বচ্ছন্দে বেশ ম্যানেজ করছ।”

“পারবো না আমি।”

“আচ্ছা এখন অপারগ হবে তখন দামার আর একটা না হয় বিয়ে দেওয়া যাবে। তোমাকে তখন পেনশন্ দিয়ে কান্না পাঠিয়ে দিলেই হবে।”

“ইস—তাই বৈ কি! দাদা তোমার কক্থোনো বিয়ে কর্বে না। আমি মরে গেলেও না।”

আনন্দ খানিকক্ষণ বৌদিদির দিকে চাহিয়া রহিল। নিজের দাদাকে সে ভাল করিয়াই চিনিতে। বৌদিদির ভুলটা আর ভাঙাইতে ইচ্ছা করিল না। সরল বেচারী!

বলিল, “ও: ভারি অহঙ্কার তো তোমার! আচ্ছা, যতদিন পার ততদিন তো ম্যানেজ কর! তারপর দেখা যাবে।”

ফোটোখানি ভুলিয়া বৌদিদি বলিলেন, “কেন মেয়েটিতো দিবা দেখতে। স্বন্দর চোখটুটি!”

“আমিতো বলিনি দেখতে খারাপ।”

নৌচে গলি হইতে ডাক আসিল, “আনন্দদা—”

জানালার নিকট আনন্দ উঠিয়া গেল—“কে, কিশোর? কিরে—কি খবর?”

“আজ আমাদের ‘বি’ টিম আর ‘সি’ টিম হকি ম্যাচ হবে, আপনাকে রেফরি হতে হবে।”

“কাল সারা রাত ট্রেনে এসেছি। বশীদাকে বল না।—”

“তিনি ভারি পার্শিয়ালিটি করেন! সেবার আমাদের মিছিমিছি একটা পেনালটি দিয়ে দিলেন।”

“হাঃ—তোরা কাউল করেছিলি। আমি ছিলাম তো।”

“না, আনন্দদা, আপনিই হোন—”

কিশোরের কিশোর মুখে আবারের আভাস দেখিয়া আনন্দ হাসিয়া বলিল, “আচ্ছা। কটার সময়?”

“সাড়ে চারটে—”

“কটা বেঞ্চেছে এখন?”

“আড়াইটে বোধ হয়—”

আমার হইল নেই কিন্তু, একটা নিয়ে যাস।”

“আচ্ছা।” কিশোর চলিয়া যাইতেই সামনের বাড়ীর জানালার দিকে আনন্দের নজর পড়িল। দেখিল, অল্পপমা পাড়াইয়া ছিল—তাহার দৃষ্টি পড়িতেই সরিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে অবিনাশবাবু আসিয়া পাড়াইলেন।

আনন্দ জিজ্ঞাসা করিল, “কেমন লাগছে? সব গুছিয়ে-টুছিয়ে নিয়েছেন তো? কোন কিছু দরকার হলে বলবেন আমাকে।”

অবিনাশবাবু বলিলেন, “হ্যাঁ, গোছান প্রায় শেষ হয়ে গেছে। তবে শরীরটা তেমন ভাল নেই। কেমন যেন মাথাটা ধরে আছে। অহু, চা হল মা?”

আনন্দ বলিল, “চা না হয় আজ আমরাই পাঠিয়ে দিই। ওবেলা আমাদের এখানেই না হয় খাবেন।”

অবিনাশবাবু বলিলেন, “না, না—সে সব ঠিক আছে। অহু আমার কলেজে-পড়া মেয়ে হলে কি হয়—সব জানে! তা ছাড়া, আমার এই বুড়ো চাকর মধুয়া—একেবারে পাকা গিন্নী!”

বলিতে বলিতেই অহু এক পেয়লা চা অনিয়া অবিনাশবাবুকে দিল।

আনন্দ দেবিল, চা দিয়া অহু বা হাতে আঙুলগুলাতে ফুঁ দিতেছে।
অবিনাশবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি হল।”

“ও কিছু নয়। একটু পুড়ে গেছে।”

শুনবামাত্র আনন্দ বলিয়া ফেলিল, “ভাই নাকি! আমার কাছে ফাট্ট এড-এর পেই আছে। ওখু একটা দিলে হয়” বলিয়া উত্তরের অপেক্ষামাত্র না করিয়া সে নামিয়া গেল। হস্তে একটা শিশি।

খেলা সবে শেষ হইয়াছে।

কিশোরদের টিমু জিতিয়াছে।

তাহাদের দল আনন্দের চারিদিক ঘিরিয়া কলরব করিতেছে।

ক্রমে ক্রমে ভিড় কমিতে লাগিল।

তুইচারিজন লোক—এদিকে ওদিকে পদচারণা করিতে করিতে আপন আপন গন্তব্যপথ ধরিল।

আনন্দের গায়ের ঘামটা মরিতেই সে-ও বাড়ীর উদ্দেশ্যে যাইতে-ছিল। এমন সময় মুগাল দেখা দিল।

আসিয়াই বলিল, “পোনো ছটা হয়েছে। চল আস্তে আস্তে যাওয়া বাক্ তাহলে।”

আনন্দ বলিল—“হ্যাঁ চল।”

মুগাল ভীষণদৃষ্টিতে আনন্দের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, “এত অল্পমনস্ত কেন বল দেখি। কি ভাবছি তুই?”

“কি আবার ভাবব।”

“এত অল্পমনস্ত তা হলে কেন?”

“অল্পমনস্ত?—কই না।”

তাহারা দীরে দীরে পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হইল।

৩

পরদিন সকালে উঠিয়া আনন্দ খবর পাইল, অবিনাশবাবুর কাল রাত্রে একটু জ্বর-ভাব হইয়াছিল। সকালেও ৯৯ আছে—একেবারে ছাড়িয়া যায় নাই। মধুয়া খবর আনিয়াছিল।—সে উপসংহারে বলিল, থোকাবাবুর আজ আসিবার কথা ছিল—কিন্তু তিনি না আসিতে দিদিমণি যাবড়াইয়া গিয়াছেন।

আনন্দ বলিল, “আমি যাচ্ছি এফুনি। ভয় কি?” মধুয়া চলিয়া গেলে আনন্দের দাদা বৈঠকখানার দরজায় উকি দিলেন। তাহার কানে পৈতা জড়ান, হাতে গাড়।

“ও বাড়ীতে কারা এসেছে রে?”

আনন্দ বলিল, “অবিনাশবাবু। হরেরামবাবুর ভগ্নীপতি।”

“তুই চিনিস্না কি?”

“না। গাড়ীতে আসবার সময় আলাপ হল।”

জরুকিত করিয়া তিনি কথাগুলি শুনিলেন। তাহার পর কিছু না বলিয়া ঘরে চুকিয়া জানালাতে কুকিয়া শশঙ্কে নাকটা ঝাড়িয়া ফেলিলেন।

যাইবার মুখে কেবলমাত্র বলিয়া গেলেন, “ভগ্নীপতি কোথেকে জুটল আবার।”

আনন্দ কিছু বলিল না। হস্তস্থিত চায়ের খালি-পেয়ালাটি টেবিলে রাখিয়া বাহির হইয়া গেল।

ঘণ্টাখানেক পরে নবীনভক্তার অবিনাশবাবুর বাড়ীতে দেখা দিলেন। সঙ্গে আনন্দ।

ডাক্তার, নামে নবীন হইলেও—বয়সে প্রবীণ। মরণের নানা যুষ্টি দেখিয়া এবং নিজের জীবনেও বারকয়েক শোক পাইয়া নবীনবাবু কেমন যেন একটু ভীতু ধরণের হইয়া গিয়াছিলেন। অথচ এ অঞ্চলে নবীনবাবুর নাম ডাক খুব। লোক অত্যন্ত ভাল। কিন্তু সর্দারদাই যেন ঘাবড়াইয়া আছেন—এই ভাব। অস্থখের কথা শুনিয়াই আনন্দকে তিনি বলিলেন, “জ্যা—বল কি—জর আর মাথাধরা ছাড়ছে না? সারলে দেখছি।” অবিনাশবাবুর বাড়ী আসিয়া তাঁহাকে যথারীতি পরীক্ষা করিয়া নবীনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—“আপনার থাকেন কোথায়?”

“লাহোরে—”

“লাহোরে? ম্যালেরিয়া ও অঞ্চলে হয় না কি?”

“হয়। তবে খুব যে বেশী তা’ নয়।”

“আপনার জিবটা দেখি।” অবিনাশবাবু জিব দেখাইলেন, আবার একবার পালস-টা শুনিলেন। পরে বলিলেন—

“শীত করে জর এসেছিল?”

“আজ্ঞে না। মাথা ধরেছিল—এখনো ধরে আছে।”

“হু।”

নবীন-ডাক্তার প্রেসক্রিপশন লিখিলেন, কুইনাইন মিস্কার। বলিলেন, “আজ একটা-ডোজ ক্যাস্টর অয়েল খেয়ে ফেলুন এখনি। তার পর এই ওষুধ তিনদাগ করে—দিন-তিনেক খেয়ে দেখুন। ম্যালেরিয়া হলে কমে যাবে।”

বলিয়া তিনি উঠিতে গেলেন। অবিনাশবাবু ফী দিতে গেলে নবীনবাবু বলিলেন, “না, না—আনন্দের কাছ থেকে আমি ফী নিই না। কি? আজ্ঞা ও আমাকে জালাচ্ছে। ওর বয়স যখন বছরখানেক

তখনই একবার নিমোনিয়া হয়ে ভুগিয়েছিল আমাকে, তারপর সমস্ত ছেলেবেলাটা ওর নানা ব্যারামে কেটেছে! একটু বড় হবার পর থেকেই সেবা-সমিতিতে পাণ্ডাগিরি শুরু করলে! কোথায় কার কলেরা—কোথায় বসন্ত—কোথায় জলে ডোবা—ডাক নবীন-ডাক্তারকে! ফী নিয়ে আর কি করব ওর কাছ থেকে—দেবে তো ও সেই সেবা-সমিতির ফণ থেকে! আমাকে আবার করে দিয়েছে তার প্রেসিডেন্ট! কম জালায় ও আমাকে! আপনারা জানেন না।”

অবিনাশবাবু হাসিয়া বলিলেন, “না, এ ফী আমি নিজে থেকে দিচ্ছি।” নবীন ডাক্তার দমিবার পাত্র নহেন।

“বেশ তাহলে আমাদের সেবা-সমিতি ফণে জমা করে দিন। আর দেখুন, আপনি ঘুরে ঘুরে বেড়াবেন না। চূপচাপ শুয়ে থাকুন। যাবেন বালি।”

নবীনবাবু যাইবার সময় আনন্দকে বলিয়া গেলেন, “দেখো হে এরা বিদেশী মানুষ—কোন অস্থবিধা যেন না হয়। আমি চলি তাহলে। আমাকে এখনি একবার মিরজাচৌকি যেতে হবে।”

নবীনবাবু চলিয়া গেলে আনন্দও চলিয়া যাইতেছিল। সিঁড়িতে কিছুদূর নামিয়াছে এমন সময় পিছন হইতে ডাক আসিল—

“—শুভন।”

আনন্দ ফিরিয়া দেখিল—অল্পম।

“কি?”

“বাবা বলেন, এই টাকা ছুটো নিয়ে যান আপনার সেবা-সমিতি কাণ্ডে জমা করে দেবেন।”

আনন্দ হাত বাড়াইয়া বলিল, “দিন—”

অল্পম। তাহার হাতে টাকা দিতেই আনন্দ বলিল—“উ: আপনার

আড়লগুলো তো ভারি ঠাণ্ডা! সকাল থেকে জল ঘাটছেন বুঝি? কালকে আড়ল যে পুড়েছিল, কেমন আছে, দেখি?”

অল্পমা মাথা নত করিয়া বলিল, “ভাল হয়ে গেছে!” বলিয়াই সে ভিতরে চলিয়া গেল।

আনন্দ সেকেণ্ড-হুই সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া থাকিয়া নীচে নামিয়া গেল।

নীচে নামিয়াই দাদার সহিত মুখোমুখি।

দাদার কানে তখনো পৈতা। বৃন্দাবনবাবু সকালে উঠিয়া কানে গৈতা জড়ান এবং স্নান করিবার সময় নামান। কৌণ্ডার টেপটা গায়ে জড়ান। আনন্দকে দেখিয়াই বলিলেন, “ওরে তুই পরের অহুখে মাথা ঘামিয়ে বেড়াচ্ছিস—এদিকে বুঁচকিটার যে ছ দিন থেকে পেটের অহুখ, তার খবর রাখিস?”

“কৈ না—বৌদি কিছু বলেন নি তো।”

সে প্রসঙ্গ ছাড়িয়া বৃন্দাবনবাবু আবার বলিলেন, “ভোঁদার পড়া-শোনাটাও ত একবার দেখতে পারিস। জিওমেট্রি ও একেবারে কিছু বুঝতে পাচ্ছে না।”

বলিয়া বৃন্দাবনবাবু কুন্ধ-কটাক্ষে সামনের বাড়ীর দোতলাটার পানে চাহিয়া দেখিলেন।

“আচ্ছা, দেখছি,” বলিয়া আনন্দ পাশ কাটাইল।

ফলপরে দেখা গেল আনন্দ ভোঁদাকে জিওমেট্রি পড়াইতেছে: “বুঝলি—? Two sides of a triangle are together greater than the third side—বুঝলি? Together—মানে থাকে যেন!”

ভোঁদা বলিল, “হ্যাঁ বুঝেছি। ও বাড়ীতে কারা এসেছে কাকা? ওই যে দেখ না—”

“কই?”

জানাল দিয়া দেখিল, অল্পমা ছাদে কাপড় শুকাইতে দিতেছে সত্তা স্নান করিয়া—টুকটকে লাল-পাড় একটি কাপড় পরিয়াছে। সূর্যের আলো সেই কাপড়ে প্রতিফলিত হইয়া হঠাৎ আনন্দের মনে রঙ ধরাইরা দিল।

“ওরা অরিনাশবাবুর বাড়ীর। নে পড়! আচ্ছা—এটা বুঝিচি? আচ্ছা বলত straight line-এর definition কি?”

“Straight line is not curved” চাই করিয়া ভোঁদা বলিয়া ফেলিল।

“ও ঠিক হল না! তুই ডেফিনিশন্স একটাও পড়িস্ নি?”

এইত রয়েছে—“A straight line is the shortest distance between any two points—”

ভিতর হইতে বৌদিদি হাঁক দিলেন—“ঠাকুর পো, চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, থাকে এসো—”

আনন্দ ভিতরে গেল।

গিয়া দেখিল, বৌদিদি বুঁচকিকে কোলে করিয়া বসিয়া আছেন।

“বৌদি, বুঁচকির কি পেট খারাপ নাকি?”

“পরশু দিন একটু হয়েছিল। আজ ভাল আছে।”

“কেন?”

“এমনই! সাবধানে রেখে। চারদিকে অহুখবিস্তৃতা।”

এই বলিয়া সে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিল।

চতুর্দিকে আগুন লাগিয়াছে। চারিদিক লালে লাল! নীল আকাশটাও যেন দাউ দাউ করিয়া জলিতেছে। লাল আগুনের লক্কে রক্তশিখায় চতুর্দিক উত্তপ্ত।

জল চাই!—জলও যে লাল! লেলিহান আগুনের দীপ্ত আভায় কালো জল পর্যন্ত রাঙা—যেন রক্ত।”

আনন্দের দিবানিত্রা ভগ্ন হইল। অদ্ভুত স্বপ্ন তো।

উট্টিয়া জানালাটা খুলিয়া দিতেই চোখে পড়িল আবার লাল! অহ জানালায় দাঁড়াইয়া আছে, লালপাড় শাড়ীর পাড়ে আগুন জলিতেছে! সে জানালা বন্ধ করিয়া দিল। চোখ বুজিয়া আবার ঘুমাইবার চেষ্টা করিল। ঘুম কিন্তু আসিল না!

“আনন্দ দা—”

নীচে নামিয়া গেল। দেখিল কিশোর আসিয়াছে। হাতে একখানি খামের চিঠি। কিশোর বলিল, “মৃণালদা—আপনাকে এইটে দিতে বলেছে। তিনি আজ টেনে কোথায় গেলেন।” বলিয়া চিঠি দিয়া কিশোর চলিয়া গেল।

আনন্দ চিঠি খুলিয়া পড়িল, “এখন কিছুদিন আমি এখানে থাকুবো না। তোমাকে আমার সঙ্গে আসতেই হবে। আগামী মাসের বুধবার দিন অমাবস্তা পড়েছে। সেই দিন তোমার কাছে আসব। গভীর রাত্রে প্রস্তুত থেকো।”

পাগল নাকি মৃণালটা? মাথায় তাহার কি খেয়াল ঢুকিয়াছে! ভাবিতে ভাবিতে আনন্দ কাহাকেও কিছু না বলিয়া বাহির হইয়া গেল। শহর ছাড়াইয়া মাঠ পড়িল। অত্মমনস্ক হইয়া সে মাঠের পর মাঠ ভ্রমিয়া চলিল।

সন্ধ্যার পর ফিরিয়া শুনিল, অবিনাশবাবুর টেম্পারেচার বাড়িয়াছে। তাহারও সারা মনে অস্বস্তি।

৪

দিনতিনেক পরে।

সমস্ত ব্যাপার আত্মোপাত্ত শুনিয়া নবীন ডাক্তার বলিলেন, “সারলে বেধছি! এতো টাইফয়েডে দাঁড়াবে বলে মনে হচ্ছে।”

আনন্দ কেবল বলিল, “আপনি বশন যাচ্ছেন? আজ একবার ঘাপনার যাওয়া দরকার।”

“বিকেলের দিকে যাব এখন।”

আনন্দ ফিরিয়া আসিতেই দেখিল, মধু দাঁড়াইয়া আছে।

“বাবু, আপনাকে একবার ডাকছেন।”

“চল।”

অবিনাশবাবুর জর—আজ সকালেই ১০২ ডিগ্রী আছে। একবারও ঘাড়ে নাই। আনন্দকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, “বাবা, তোমাকে যেনক কষ্ট দিচ্ছি। কিছু মনে কোরো না। কালকে অহুকে দেখতে যিনি ভক্তলোক আসবেন এখানে—আগে থাকতেই কথা হয়ে আছে। অশোক আজও কেন-বে এল না বৃষ্টিতে পারছি না।” অশোক অবিনাশবাবুর পুত্র। কলিকাতায় এম্-এ পড়ে। আনন্দ জিজ্ঞাসা করিল, “কোন চিঠিপত্র পেয়েছেন তাঁর?”

“কিছু না। সে অবশ্য চিঠিপত্র কমই লেখে। যাক, কাল-নাগাদ না এসে পৌছলে একটা ‘তার’ করতে হবে। হ্যাঁ, যে-কথা বলছিলাম, গল ছটি ভক্তলোক আসবেন অহুকে দেখতে, তুমি বাকি একটু দেখাবার

বন্দোবস্ত করো। তাঁরা আসছেন অনেক দূর থেকে—এখন মানা করাণ
ব্যয় না।”

“বেশ তো, সব ব্যবস্থা করব। সকালের ট্রেনে আসবেন ত?”

“হ্যাঁ, নবদ্বীপ থেকে আসছেন তাঁরা।”

“আচ্ছা, সব ব্যবস্থা আমি করব এখন।”

অম্বুপমা এক পেয়লা চা আনিয়া আনন্দের হাতে দিতেই আনন্দ
বলিয়া ফেলিল, “আপনি অবিনাশবাবুর কাছ থেকে বার বার উঠে
যাচ্ছেন কেন? আপনাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা না হয়—”

অম্বুপমা অকারণে লজ্জা পাইয়া গেল।

অবিনাশবাবু কেবল বলিলেন, “হয়ে যাচ্ছে একরকম করে। মেয়েটা
দুঃখিত রাত্রি ঘুমতে না পেরে রোগা হয়ে গেল। কাল আবার
দেখতে আসবে ওকে। ভগবান যা করেন তাই হবে।”

আনন্দ বলিল, “না-না, ঠুঁর রোজ রোজ রাতজাগা ঠিক হচ্ছে
না। আজ রাত্তিরে আমি অপর ব্যবস্থা করব। কোন জীলোক-নাগ
বদী না পাই—পাওয়া শক্ত—আমরাই কেউ না-হয় আসব। আপনাদের
এতে আপত্তি নেই তো?”

“না, কিছুমাত্র না। তবে তুমিই এসো বাবা। অচেনা লোক
এলে—বুঝলে কি না—”

“আচ্ছা বেশ। তবে বাই এখন। ডাক্তারবাবু বিকেলে
আসবেন।”

দূর হইতে বাহির হইয়া আনন্দ দৈর্ঘলি, অম্বুপমা বারান্দায় দাঁড়াইয়া
আছে। তাহার চোখে আনন্দ কি দেখিল তাহা সে-ই জানে। কিন্তু
সহসা নির্ভয়ে তাহার কাছে গিয়া বলিল, “রাজে কপাটটা বুলে
রেখো তাহলে তুমি।”

“আচ্ছা।”

হঠাৎ সে অম্বুপমাকে ‘তুমি’ বলিল কেন তাহা সে নিজেও জানে
না। রাজি প্রায় এগারটা হইবে।

অবিনাশবাবু ঘুমাইতেছেন। অম্বুপমা ঘরের কোণে একটি চেয়ারে
বসিয়া আছে। একখানি বই লইয়া পড়িবার চেষ্টা করিতেছে। পড়া
কিছু হইতেছে না। নানা কথা মনে হইতেছে। এইবার তাহার
আই-এ পরীক্ষা দিবার কথা। অথচ পড়াশোনা তো কিছুই হয় নাই।
এখানে আসিয়া নিজেই পড়িবে মনে করিয়াছিল—কিন্তু বাবার অস
হইয়া সব মাটি হইয়া গেল। দাদাও আসিতেছে না কেন? আনন্দ-
বাবু না থাকিলে কি মুক্তিগেই না সে পড়িত তাহার বাবাকে লইয়া।
হৃদয়ের ছেলে এই আনন্দবাবু। পদশব্দ শুনিয়া সে চকিত হইয়া উঠিল।

“কে?”

অতি মুহূর্তের আনন্দ বলিল, “আমি। অবিনাশবাবু কি
ঘুমিয়েছেন?”

অম্বুপমার বুকটা অকারণে কাঁপিতে লাগিল।

“হ্যাঁ”—বলিয়া আলোটা কমাইয়া অম্বুপমা বাহিরে আসিল।
বাহিরে মানে, দালানে। সেখানেও একটা শুষ্কপোষ, একখানি
চেয়ার। টেবিলে একটি বাতি জলিতেছিল।

আনন্দ গিয়া চেয়ারটাতে বসিল।

অম্বুপমা জিজ্ঞাসা করিল, “নীচে থিল দিয়ে এসেছেন তো?”

“না, ভুলে গেছি। থামুন, দিয়ে আসি।”

“আপনি বসুন। আমি দিয়ে আসছি।”—বলিয়া অম্বুপমা নীচে
নামিয়া গেল। একা বসিয়া অকারণ পুলকে আনন্দের সমস্ত অন্তর
যেন পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সহসা তাহার মনে হইল, এই চেয়ারটাতেই

তো অল্পপমা সকালে বসিয়াছিল—তাহার স্পর্শ যেন ইহাতে লাগিয়া আছে। ওই যে আলনাতে কোঁচান কাপড়গুলি ঝুলিতেছে—ওই যে শেলফে বইগুলি সাজান—সবই ত অল্পপমার!

অল্পপমা ফিরিয়া আসিতেই আনন্দ বলিল, “আপনি শুতে যান।”

অল্পপমা স্বভাবতঃই একটু গম্ভীর প্রকৃতির। আনন্দের কথা শুনিয়া তাহার গম্ভীর মুখে একটু হাসির রেখা দেখা দিল।

আনন্দ জিজ্ঞাসা করিল, “হাসলেন যে?”

“আপনি কখনও আমাকে ‘আপনি’ বলছেন—কখনও ‘তুমি’ বলছেন। একটা যা-হয় ঠিক করে ফেলুন।”

আনন্দ একটু অপ্রতিভ হইল। বলিল, “‘তুমি’টা বলতে লোভ হচ্ছে—কিন্তু স্বাভাবিক ভঙ্গিতে ‘আপনি’ বেরিয়ে পড়ছে। ‘তুমি’ বললে আপনি কিছু মনে করবেন না তো?”

“মনে করবার কি আছে? আমি বয়সে কত ছোট! আপনি আমার দাদার ক্লাস-মেট।”

“বেশ, তাহলে শুয়ে পড়—রাত হয়েছে।”

অল্প বলিল, “ঘুম আসছে না।”

“তবু চেষ্টা করা উচিত। তাছাড়া কাল দুজন ভ্রতলোক দেখতে আসবেন—রাজি জেগে থাকটা—”

“ভারি ব্যয়ে গেছে আমার। পছন্দ না হলেই বাচি—”

বলিয়া হঠাৎ সে লজ্জায় মুখ ফিরাইয়া ঘরের ভিতর চলিয়া গেল।

আনন্দ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। একটু পরেই অল্পপমা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, “বাবা আজ বেশ ঘুমুচ্ছেন। কাল-পরশু মোটে ঘুম হয় নি রাজে!”

“ভাত্তারবাবু ঘুমের গুণ দিচ্ছেন আজ—!”

কিছুক্ষণ দুইজনই চুপচাপ।

মিনিটখানেক পরে আনন্দ বলিল, “কাল বাবা আসছেন—তাঁরা পাঞ্জের কে হন?”

“পাঞ্জ স্বয়ং আর তাঁর বন্ধু!”

“পাঞ্জ স্বয়ং? কি করেন তিনি?”

“দালালি।” বলিয়া অল্প চুপ করিয়া গেল। তাহার পর বলিল, “আমি সব কথা ঠিক জানি না।”

আনন্দের হঠাৎ মনে হইল, অল্পপমার কণ্ঠস্বরে কেমন যেন একটা অসহায় ভাব ফুটিয়া উঠিল।

“পাঞ্জটি শুনলাম নাকি দোজবরে?”

চকিত হইয়া অল্পপমা বলিল, “তুনেছি তাই। কে বলল আপনাকে?”

“আপনার বাবাট আজ বিকেলে বলছিলেন। তিনি আপনার বিয়ে দেবার জন্য ভারি ব্যস্ত হয়েছেন, অথচ মনোমত পাঞ্জ ফুটছে না।”

অল্পপমা কিছু না বলিয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল।

আনন্দ বসিয়া ভাবিতে লাগিল, এদেশে যেয়ে হইয়া জন্মান কি দুঃখের! পদে পদে অপমানিত হইতে হয়। লেখাপড়া শিখিয়া ভ্রতভাবে জীবনযাপন করা আরও দুঃখ! ভ্রতভাবে চাকরি করা মুশ্কিল, বন্ধু করা মুশ্কিল, বিবাহ করা আরও মুশ্কিল। আমাদের মনটা সত্যত কিশোরী-মুখী। অথচ লেখাপড়া শিখিতে গেলেই বয়স বাড়িবে! তখন কোন অল্পবয়স্ক যুবক তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিবে না। ইতরাং অধিক বয়সের লোক চাই। সে লোকটাও কিশোরী-আহরণে বার্ষমনোরথ হইয়া তবে আসে! এই ভ্রতলোক দ্বিতীয়পক্ষে

বিবাহ করিবেন তাহাও আবার নিলজের মত নিজে দেখিতে আসিতেছেন!

অহুপমা ফিরিয়া আসিল। বলিল, “ওই কোণে হুঁজোতে জল আছে।”

আনন্দ বলিল, “শোন—”

“কি—”

“বল তো এ বিয়ে আমি পণ্ড করে দিতে পারি। তোমার কি মত আছে এ বিয়েতে?”

“আমার আবার মতামত কি! বাবার মতেই আমার মত!”

“তাহলে কাল যদি উনি পছন্দ করে যান, এবং পছন্দ করবেনই সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—তাহলে তুমি ওই দোজবরেটাকে বিয়ে করবে নাকি?”

কিছু না বলিয়া অহু শুইতে গেল। একা বিছানায় শুইয়া আনন্দের কথাগুলি তাহার কানে ঘেন গান গাহিয়া ফিরিতে লাগিল—“ওহা তোমায় পছন্দ করবেই, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই!” অহুপমা শুইয়া শুইয়া আশা এবং আশঙ্কা করিতে লাগিল, কাল যদি আনন্দবাবু উহাদের সহিত একটা অনর্থ বাধাইয়া বসেন! বলা তো যায় না!—

আনন্দ বসিয়া আছে। চতুর্দিক নীরব। দূরে একটা ঘড়িতে টং টং করিয়া বায়োটা বাজিল। টেবিলে হাত বাড়াইয়া আনন্দ একটা বই লইল। Coming of Arthur. দুইচারি পাতা উন্টাইয়া ভাল লাগিল না।

সে স্যারেন্স-টুডেন্ট—কবিতার ধার ধারে না।

কিন্তু মনে যে কবিতা জাগিতেছে—!

“অহু—মা”—অবিনাশবাবুর ঘুম ভাঙিয়াছে।

আনন্দ তাড়াতাড়ি গিয়া বলিল, “অহু ওঘরে ঘুমুচ্ছে। কি চাই!”

“একটু জল—!”

আনন্দ জল দিল।

টেম্পারেচার লইল, ১০০ ডিগ্রী।

টিক এই সময় মৃণাল স্কলতানগঞ্জের ঘাটে নৌকা করিয়া গল্প। পার হইতেছে! তমসাজ্জন্ম গল্প!

তাহার পর দিন দুইজন আসিলেন না, আসিলেন একজন। পাজ নিজে। লোকটিকে দেখিলে নিতান্ত ধারাপ লোক বলিয়া মনে হয় না, একটু-যা-ধারাপ লাগে তাহা এই যে তিনি যুবক না হইয়াও বৃদ্ধ-জেনোচিত ব্যবহার করিতে ব্যগ্র! একটু অস্বাভাবিক-রকম চুপটে। কামাইয়া কামাইয়া গওদেশ গওরচক্ষের মত—তাহার উপর ক্রীম, পাউডার! ওয়েষ্টকোট-পর। চুল-ছাঁটা ঘাড়, হাতে-বাধা বড়ি, এবং ঠোটে-চাপা সিগারেট দিয়া তিনি যুবক সাজিতে চান। কিন্তু তাহার চোখ-মুখ নীরবে সকলকে বলিয়া দিতেছে, “বয়স পয়তাল্লিশের কম নয়!” ভাবগতিক দেখিয়া আন্দের ইচ্ছা করিতেছিল—মেয়ে না-দেখাইয়া লোকটাকে বিদায় করিয়া দিতে। কিন্তু তাহা অসম্ভব। তাহারই বাড়ীতে অতিথি তিনি। ওই জন্মই আসিযাছেন!

একটা রেকাবীতে নিমকি, কচুরি প্রভৃতি কতকগুলি খাবার এবং

এক পেয়ালা চা দিয়া আনন্দ গুম হইয়া বসিয়া ছিল। ভক্তলোক বাইতেছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে শিস্ দিতেছিলেন।

আনন্দ ঈষৎ জু-কুঞ্চিত করিয়া নিকটেই একটি বেঞ্চ বসিয়া ভাবিতেছে—চা-খাওয়া শেষ হইলে সে কি করিবে। এখনি কি দেখিতে চাহিবে?

এমন সময় নবীন-ডাক্তার দেখা দিলেন।

“কেমন আছে হে আনন্দ তোমার রোগী আজ? চা আছে নাকি বেশী! দাও তো এক পেয়ালা! ভোর বেলা বেরিয়েছি এখনও বাড়ী ফেরা হয়নি!”

এক পেয়ালা চা লইয়া নবীনবাবু আনন্দের পাশেই বসিতে বসিয়া পড়িলেন।

“কাল রাতে অর ১০০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠেছিল। এখন ১০২ ডিগ্রী আছে। পেটটাও একটু খারাপ হয়েছে।”

“সারলে দেখছি।” বলিয়া তিনি খামখা চিবুকের নীচেটা চুলকাইতে লাগিলেন! তাহার পর বলিলেন, “নাসিংএর ব্যবস্থা কি হয়েছে?”

“ওটাই তো আসল! লাহোর থেকে এসে ভক্তলোক—সারলে দেখছি!”

“কাল রাতে আমি ছিলাম। দিনের বেলা আমাদের সেবা-সমিতির তিনটি ছেলেকে সর্বদা থাকতে বলেছি। তিনজন-তিনজন করে থাকবে। একজন রোগীর বিছানার পাশে থাকবে—আর বাকী দু'জন ‘অন ডিউটি’ বাইরে থাকবে যদি কোন দরকার হয়। কিশোরকে ‘ইনচার্জ’ করে দিয়েছি।”

—“কে কিশোর?”

“হালদারদের কিশোর। সেই যে ওবছর যার নিমোনিয়া হয়েছিল।”

“ও হ্যাঁ হ্যাঁ। সে ছোকরা বেশ ছেলে। এইবার ম্যাট্রিক হবে না?”

“না, আসছে বছর। বেশ ছেলে। ক্রাসে ফাষ্ট হয়—সব দিকে চোকাই।”

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, “তোরাই তো সব চেলা!—চল অবিনাশ-বাবুকে দেখে আসি।—দেবী হয়ে যাচ্ছে!”

আনন্দ আগন্তুক-ভক্তলোককে বলিল, “আপনি বহন—একুনি আসছি।”

পথে নামিয়া নবীনডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, “এই বুঝি আবুহোসেন সাজবে? মন্দ মানাবে না।”

আনন্দ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “আবুহোসেন সাজবে, মানে?”

নবীনডাক্তার বলিলেন, “ভেলিপাড়ার ভারতী-নাট্যসমাজ আবুহোসেন করবে যে! জানিস্ না? কোলকাতা থেকে একজন ভাল আবুহোসেন আসার কথা। আমি ভাবলাম সেই বুঝি!”

“ইনি অবিনাশবাবুর মেয়েকে দেখতে এসেছেন।”

“অবিনাশবাবুর মেয়ের বিয়ে হয়নি নাকি এখনও?”

“না। উনি আই-এ পড়ছেন।”

“তাই নাকি?—সারলে দেখছি।”

উভয়ে উপরে উঠিয়া দেখিলেন, অবিনাশবাবু চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শুইয়া আছেন। পাশে কিশোর বসিয়া—মাথায় জলপটি লাগাইতেছে। অল্পমদা দালানে কলের রস করিতেছে।

তিনবার ডাকবার পর অবিনাশবাবু চক্ষু ঈষৎ খুলিয়া বলিলেন,
“এসেছেন আপনারা? বহন। ওরে অহু!”

“আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমরা ঠিক করে নিচ্ছি।”

নবীনবাবু রোগী দেখিতে লাগিলেন। অবিনাশবাবু আবার চক্ষু মুদ্রিত করিলেন—কেমন যেন একটা অসাড় অবসন্ন ভাব। জ্ঞান আছে অথচ কথার উত্তর দিতে দেরী হইতেছে—যেন বেশী কথা বলিতে নারাজ। বটে কি জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন, “মাথাটা একটুও ছাড়ে নি। বড় যন্ত্রণা!”

বাহির হইয়া ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, “আজ কদিন হল?”

আনন্দ বলিল, “আজ সেভেন্‌থ্ ডে।”

নবীনবাবু চলিয়া গেলেন। আনন্দ অস্থপমাকে বলিল, “এইবার কাপড়-চোপড় পরে নাও—ভদ্রলোককে নিয়ে আসি—”

অস্থপমা উত্তর দিল না। একবার যেন অধরদুটি কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু কিছু না বলিয়া সে আঙুলগুলিকে লইয়া কেবলই নিঙ্ড়াইতে লাগিল।

আনন্দ বাহিরে চলিয়া গেল।

আনন্দ আসিয়া দেখিল, ভদ্রলোক বসিয়া একটু-যেন উসখুস করিতেছেন।

অধিক ভূমিকা না করিয়া আনন্দ বলিল, “আপনি এখনি কি মেয়ে দেখতে চান?”

“বেশ তো! আমার আর আপত্তি কি?”

“কিন্তু আপনাকে এমন ভাবে মেয়ে দেখতে হবে যেন মেয়ে তা জানতে না পারে।”

“তার মানে?”

“তার মানে, আপনি যেন অবিনাশবাবুকে দেখতে গেছেন এইভাবে সেখানে যাবেন। সেখানে যে-মেয়েটিকে দেখবেন, সেইটি বৃন্দেবন অস্থপমা। অল্প কোন মেয়ে ও বাড়ীতে নেই।”

“এরকম লুকোচুরি করে দেখার অর্থ কি?”

“অর্থ এই-যে এই অস্থপের বাড়ীতে আয়োজন করে মেয়ে দেখাবার লোকাভাব। মেয়ে এখন তার অস্থপ বাবার সেবা করবে, না সাক্ষীগোজ করবে—বলুন!”

“আচ্ছা-আচ্ছা—তাই করুন। সাক্ষীগোজ করে দেখাটা আমি পছন্দও করি না!”

মেয়ে-দেখা কাণ্ড শেষ হইয়াছে। আনন্দ ও সেই ভদ্রলোক নীচের ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

আনন্দ আসিয়াই বলিল, “আপনার কি আর এক প্লেট খাবার চাই?”

“কেন?”

আনন্দ হাসিয়া বলিল, “মেয়ে দেখার পর এক প্লেট খাবারের দাবী যে-কোন বাড়ালী করতে পারে!”

“না-না—থাক! বরং আর এক কাপ চা হলে মন্দ হত না।”

“বেশ। ওরে ভোঁদা, দু-পেয়ালা চা করতে বল।”

আনন্দ বলিল, “এইবার আসল কথা পাড়া যাক—মেয়ে আপনাদের

পছন্দ হল কি না সেটা ভো অবিনাশবাবু জানতে চাইবেন। কি বলব তাঁকে? সাধারণতঃ লোকে বলে থাকে, 'গিয়ে চিঠি লিখে জানাব'। আপনিও কি তাই বলবেন?"

ভদ্রলোক একটু খতমত খাইয়া গেলেন। তাহার পর বলিলেন, "মেয়েটির বয়স কত হবে, বলতে পারেন?"

"ঠিক বলা শক্ত। তবে উনিশ-কুড়ি হবে নিশ্চয়ই। আই-এ বর্ষন পড়ছেন; এর কম নয়।"

"তাহলে বয়স খুব বেশী। অবিনাশবাবু আমাকে আইডিয়া দিয়েছিলেন, ষোল-সতেরো।"

"কল্লাদায়গ্রস্ত বাপেরা মেয়ের বয়স পড়াবতই লুকোতে চায়। আপনার বয়স কত?"

এরূপ প্রশ্নের জন্ত ভদ্রলোক প্রস্তুত ছিলেন না। বলিলেন, "সাইক্রিশ।"

আনন্দ হাসিয়া বলিল, "কল্লাদায়গ্রস্ত বাপেরা মেয়ের বয়স যেমন লুকোয়, দ্বিতীয়বার ঝাঁরা বিয়ে করছেন তাঁরাও নিজেদের বয়স একটু হাতে রেখে বলেন। এইটেই রেওয়াজ হয়ে গেছে। অবশ্য আপনার কথা বলছি না, তবে অনেক করেন।"

ভদ্রলোক উত্তর দিলেন, "বলেন কি? বাংলা দেশে আবার মেয়ের অভাব! এ দেশে বিয়ে করবার জন্তে বয়স লুকোতে হয় নাকি পুরুষ-মামুষকে? You can get any number of girls educated or otherwise, provided you have money। আমার তা আছে, সুতরাং আমার বয়স লুকোবার দরকার কি? তা ছাড়া, আমাকে দেখে কি বুড়ো বলে মনে হয় না কি?"

আনন্দ বলিল, "আপনি যদি রাগ না করেন তো বলি। আমার মনে হয়েছিল, আপনার বয়স পয়তাল্লিশ।"

বাপুছাড়া রকম হাসি হাসিয়া ভদ্রলোক বলিলেন, "তাই নাকি?"

আনন্দ বলিল, "তাহলে অবিনাশবাবু যদি জিজ্ঞেস করেন, কি বলব?"

"আপনার কথা-বার্তা শুনে মনে হয়, আপনি ট্রেট-করোয়ার্ড। আপনাকে স্পষ্ট বলাই ভাল, মেয়ে আমার পছন্দ হয় নি। অত বেশী বয়সের মেয়েকে আমি বিয়ে করবো না। তা ছাড়া মেয়েটি ভারি 'সিক্লি'।"

আনন্দ মুচের মত বসিয়া রহিল। অপমানটা তাহার নিজের গায়ে যেন লাগিল। পছন্দ হইল না? আশ্চর্য্য!

ইহাতে আনন্দ খুশী হইল, না দুঃখিত হইল, সে নিজেই বুঝিতে পারিল না। শুধু সে মনে মনে বলিতে লাগিল—"পছন্দ হল না? অথাক কাণ্ড!"

বেলা বায়েটার টেনে ভদ্রলোক বিদায় লইলেন।

আনন্দ অশোকের নামে টেলিগ্রাম করিল—

Come sharp father seriously ill—Anu.

৬

আনন্দ একা বসিয়া ছিল।

শহরের বাহিরে রেল-লাইনের ধারে একটি পুলের উপর অন্ধকার-নিজ্জনে বসিয়া সে ভাবিতেছিল, তাহার জীবনে অতকর্তিতভাবে

যে তরুণীর আবির্ভাব ঘটনাছে তাহাকে লইয়া স্বে ক্রিবে! বিশেষ কিছুই ঘটে নাই, অথচ মনের মধ্যে এ কি আন্দোলন! মধুর, অথচ বেদনাময়। নিজেকে তাহার দিক্কার দিতে ইচ্ছা হইল। এত দুর্দল সে? সামান্য একটা নারীর সান্নিধ্যে তাহার এতদিনের সংযমের প্রাসাদ ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে? অসম্ভব! হইতে পারে না!

আনন্দমোহন রায়েচর চরিত্রে আজিও কলঙ্কের রেখা পড়ে নাই। পড়িবেও না!

তাই বলিয়া সে কি আজীবন ব্রহ্মচর্য পালন করিবে? তাহাও তো সম্ভব নয়। বিবাহ তাহাকে করিতেই হইবে—আজ না হোক কাল।

অল্পমাকে বিবাহ করা সম্ভব কি?

ব্রাহ্মণ—কায়স্থ। বাধা দুত্তর হইবে। অল্পমা এ বিষয়ে কিছু ভাবে কি? জিজ্ঞাসা করিতে লজ্জা হয়। কোতুহলের কিছু অন্ত নাই!

সমাজ ও সংসারের নিয়ম জটিল। মনের নিয়ম কিছু সরল ও সহজ—পুরুষ নারীকে কামনা করে।

দূরে পাহাড়ের গায়ে সাবুই ঘাসে আগুন লাগিয়াছে।

রাজে আনন্দ যখন বাড়ী ফিরিল, তখন রাজি দশটা হইবে। আসিয়াই শুনিল, অবিনাশবাবু দুই-তিন বার তাহার খোজ করিয়াছেন। সকাল বেলা মেয়ে দেখানর পর হইতে আনন্দ আর অবিনাশবাবুর বাড়ী যায় নাই। অল্পমাকে অপছন্দ করিয়া গিয়াছে—এই অতি দ্রুত সংবাদটা সে অল্পমাকে অবিনাশবাবুকে দিতে ইতস্তত করিতেছিল। অথচ—

সেবক-সমিতির একটি ছেলে আসিয়া বলিল, “আনন্দদা, আপনি

একবার আসুন। অবিনাশবাবুর অব ১০৪ ডিগ্রী হবেছে। আমরা ডাক্তারবাবুকে খবর দিয়েছিলাম। তিনি বলেন, ‘বাধ’ দিতে।”

“আচ্ছা,—তোরা গরম জল তৈরি কর, আমি আসছি।” বলিয়া সে ভিতরে চলিয়া গেল।

গিয়া দেখিল, বৌদিদি তাহার অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। —“কিছু আকেল নেই তোমার! কটা বাজে বল তো?”

অপ্রস্তুত আনন্দ বলিল, “আমার ভাত ঢাকা-দিয়ে তোমরা খেয়ে নিলেই পার! দাও, তবে বেশী দিও না, কিধে নেই!”

বৌদিদি বলিলেন, “আজকাল ঠাণ্ডারপোর কিদে-তেটা সবই কমে গেছে দেখছি! ও-বাড়ীর মেয়েটি বেশ,—না?”

আনন্দ কিছু বলিল না। আসনটা পাতিয়া বসিল। তাহার পর বলিল, “ছি বৌদি, ভত্নলোকের মেয়েকে নিয়ে রসিকতা করা ঠিক নয়, বিশেষতঃ তার অসাক্ষাতে।”

আনন্দ বৌদিদির মুখে ও-বাড়ীর মেয়েটির সম্বন্ধে ইঙ্গিত শুনিয়া চটিয়া উঠিয়াছিল। ভয়ও পাইয়াছিল।

বৌদিদি হাসিয়া বলিলেন, “না-না, রসিকতা নয়—সত্যি মেয়েটি বেশ ভালই। ভালকে ভাল বলব না? ওরা যদি ব্রাহ্মণ হত তাহলে বেশ হত!”

আনন্দ জিনিসটাকে লঘু করিবার অভিপ্রায়ে বলিল, “আমি ভাবছি তুমি যদি বোবা হতে বেশ হত! দাদা কোথায়?”

“তিনি সন্ধ্যাবেলাই খেয়ে কোথায় বেড়িয়েছেন। বোধ হয় তাসের আজ্যায়।”

অবিনাশবাবু মাঝে মাঝে দুই-একটা তুল বকিতেছেন। রাজি দুইটা হইবে।

আনন্দ বসিয়া একখানি বই পড়িতেছে।

ঘরে অল্পপমা নাই।

অবিনাশবাবু হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, “রেখে দাও তোমার গান্ধী!”

আনন্দ জল-পটি বদলাইয়া হাওয়া করিতে লাগিল। খানিকক্ষণ হাওয়া করিবার পর অবিনাশবাবুর যেন একটু ঘুম আসিল। আনন্দ আবার পুস্তকে মনোযোগ দিল।

মনোযোগ স্থায়ী হইল না। বইটা সে রাখিয়া দিল।

তাহার পর নিঃশব্দ পদসঞ্চারে যে দালানে গেল। দালানে গিয়া ধীরে ধীরে পাশের ঘরের দিকে অগ্রসর হইল। কিন্তু বেশী দূর নয়।

অর্দ্ধ-মুক্ত জানালা দিয়া সে দেখিল, অল্পপমা ঘুমাইতেছে।

শাড়ীর পাড়টুকু ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। তেমনি নিঃশব্দ-পথে আবার সে ফিরিয়া আসিল।

‘টং’—ঘড়িতে আড়াইটা বাজিল।

আর একটি ছেলে নীচে শুইয়া অঘোরে ঘুমাইতেছিল।

সেবক-সমিতির একটি ভলাটিয়ার। আনন্দ তাহাকে জাগাইল।

“ওরে তুই একটু ভঠ। আমি ষ্টেশনে যাব একবার, এই গাড়ীতে বরফ আসার কথা আছে। ঘুমিয়ে পড়বি না তো?”

“নাঃ”—বালক উঠিয়া বসিল।

আনন্দ এখন বাহির হইয়া যাইতে চায়। নিজের উপর আস্থা সে ক্রমেই হারাইয়া ফেলিতেছে। ট্রেন আসিতে এখনও প্রায় ঘণ্টাখানেক দেরী আছে। থাকুক!—সে বরং রাষ্ট্রায়-রাষ্ট্রায় ঘুরিয়া বেড়াইবে। এখানে থাকার ঠিক নয়।

“—কোথা যাচ্ছেন?”

আনন্দ পিছন ফিরিয়া দেখিল—অল্পপমা! “একি, তুমি ঘুমওনি!”

“ঘুমিয়েছিলাম। ঘুমটা ভেঙে গেল!—কোথা যাচ্ছেন আপনি? বাবা এখন কেমন আছেন?”

“সেই রকমই। আমি ষ্টেশনে বাজি বরফ আনতে।”

বলিয়া সে নামিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ অল্পপমা বলিল “বাইরে ঠাণ্ডা। আপনি বরং একটা কিছু গায়ে দিয়ে যান।”

বলিয়া সে নিজের ব্যাপারটা আনিয়া দিল।

ষ্টেশনের ‘গভারত্রিঙ্গে’ দাঁড়াইয়া অল্পপমার ব্যাপারটা সর্ব্বাঙ্গে তড়াইয়া আনন্দ অল্পপমাকেই তুলিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল।

দূরে ‘সাইডিং’এ একটা এঞ্জিন একটান; শব্দ করিয়া চলিয়াছে—সসসস—।

ট্রেন আসিল।

আনন্দ নামিয়া গেল। প্রত্যেক কামরায় খোজ করিল। কই, কামালপুর হইতে বরফ লইয়া কেহ আসে নাই তো!

এই শীতকালে বরফ পাওয়া মুসলি ব্যাপার। কি করা যায়? বেশা যাক—কাল আটটার ট্রেনটাতে যদি আসে।

—“কি হে আনন্দ—কোথা যাচ্ছ!”

দেখিল, রেলের এক চেনা বাবু। গোল-লঠন হাতে। রূপোলি বড় বড় বোতাম লাগান গলা-বন্ধ কোট। কাঁধের উপর রেল কম্পানির লেবেল মাথা T. T. C.!

“কোথায় যাব আবার! বরফ আসার কথা ছিল।—কই দেখতে তো পাচ্ছি না কাউকে!”

“বরফ কেন?”

“এক ভ্রমলোকের টাইফয়েড হয়েছে—তারি জন্মে!”

“ও বুঝছি বুঝছি। বৃন্দাবনদা বলছিলেন বটে আজ ক্লাবে। ভ্রমলোকের বুঝি এক মেয়ে আছে!”

আনন্দ বলিল—“হ্যাঁ। কেন?”

“না, এমন। বৃন্দাবনদা বলছিলেন কিনা, মস্ত মাগী, অথচ বিয়ে হয়নি। বিয়ে দিলে অ্যান্ডিন—” তাহার পর হঠাৎ থামিয়া আনন্দের পিঠটা চাপড়াইয়া দিয়া বলিল, “বেড়ে আছে তুমি আনন্দ!—”

টেনে ছাড়িয়া দিল। চলতি-টেনে টি-টি-সি লাফাইয়া উঠিলেন। উঠিয়া টুপিটা খুলিয়া আনন্দকে গুডবাই করিয়া বলিলেন, “চলি। Wish you good luck.”

তাঁহার বিকশিত দম্ভগুলি আনন্দকে যেন কামড়াইয়া দিয়া অন্ধকারে অদৃশ হইয়া গেল!

গায়ে গলা-বন্ধ কোট। পায়ে ফিতা-বিহীন শ্লিংএর জুতা— পরনে থান-কাপড়। কদমছাঁট চুল। কানে খড়কে গৌড়া এবং দক্ষিণ হস্তের তর্জনীতে একটি অষ্ট-ধাতুর অঙ্গুরীয়। হস্তে পানের বোটায়ে কিঞ্চিৎ চুন। পান চিবাইতে চিবাইতে শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনমোহন রায় আপিসে যাইতেছেন। আনন্দের বৈমাত্রেয় দাদা বৃন্দাবনবাবুর প্রবীণ-মহলে নিষ্ঠাবান বলিয়া খাত্তির আছে। আর্থিক না করিয়া জল-গ্রহণ করেন না। মাছ-মাংস খাওয়ার বিরোধী,—হিন্দুরাই যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম জাতি ইহা নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করেন এবং হিন্দু স্বয়ং রান্নাতে সাধ্যমত চেষ্টাও করেন। আপিসে পিপাসা পাইলে

তিনি মৈথিল ব্রাহ্মণ চাপরাশিকে দিয়া লোটা মাজাইয়া সমুখস্থ কূপ হইতে জল উত্তোলন করাইয়া, জুতা খুলিয়া—আলগোছে তাহা পান করেন,—ইহা আপিসস্থ সকলেই জানে। আপিসের সাহেবেয়া বৃন্দাবনবাবুকে উপযুক্ত কণ্ঠচরী বলিয়াই মনে করেন এবং তদনুযায়ী তাঁহাকে খাত্তিরও করেন। বৃন্দাবনবাবু যদিও সমুখে গদগদ হইয়া তাঁহাদের সেলাম করিতে পাইলে কৃতার্থ হইয়া যাইতেন, আড়ালে কিছু তিনি তাঁহাদের সম্বন্ধে যে ভাষা ব্যবহার করিতেন তাহা ভ্রুকচি বিগহিত। “গোখানক রেজ্জ ব্যাটারা”—ইহাই ছিল তাঁহার বৃহত্তম সম্ভাষণ।—অবশ্য আড়ালে।

এই সব কারণে প্রবীণ বিজ্ঞ মহলে বৃন্দাবনবাবুর একটি শ্রদ্ধার আসন ছিল।

যাহারা অপেক্ষাকৃত কম বিজ্ঞ, তাহারা কিন্তু বৃন্দাবনবাবুকে এতখানি শ্রদ্ধা করিত না। এমন কি, ছুইচারিজন অপরিসৃতমস্তিষ্ক যুবক তাঁহাকে “বাস্তব যুগ্ম” আখ্যা দিতেও ঘিঁধা করে নাই। পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই কিন্তু ছুইচারিজন এমন সন্দেহও করিত যে প্রত্যহ সন্ধ্যায় ত্যাস খেলিবার অফিসায় বৃন্দাবনবাবু যে-গৃহে বাতায়ত করেন, এবং যে কারণে, বাতায়ত করেন তাহার মূলে সেই গৃহের বিধবা পুরুষবৃট্ট। কুলোকে নানারূপ গুণব রটাইয়া থাকে— তাহার উল্লেখ আর না-ই করিলাম।

বৃন্দাবনবাবু আপিস যাইতেছিলেন এমন সময় গলির মোড়ে আনন্দের সহিত তাঁহার দেখা হইয়া গেল। আনন্দ সাধ্যপক্ষে তাহার দাদার সম্মুখীন হইত না। এবং দৈবাৎ দেখা হইলে পাশ কাটাইবার চেষ্টা করিত। আজ কিন্তু সে সক্ষম হইল না।

বৃন্দাবনবাবু পানের বোটাটায় একটা কামড় দিয়া বলিলেন, “ওরে

শোন। একটা দরকারী কথা আছে”— বলিয়া তিনি পকেট হইতে পোষ্টকার্ড একখানি ও চশমার খোলটি বাহির করিলেন। “কালী থেকে পরেশবাবুর চিঠি এসেছে। তুই, বেড়াতে যাচ্ছি বলে কালী গিয়ে বসে রইলি, অথচ আমাকে একটা ঠিকানা পর্য্যন্ত দিয়ে গেলি না! আবার খরচ করে যেতে হবে তো?”

আনন্দ প্রমাদ গণিল। মরীয়া হইয়া বলিয়া ফেলিল, “এখন ওসব কথা থাক। পড়াশোনা করতে করতে এখন বিয়ে করাটা ঠিক নয়।”

বুন্দাবন বলিলেন, “আহা, তুমি ঠিক নয় বললেই তো চলবে না! শুদিকে মেয়ের বয়স যে ছয় শবে বেড়ে চলছে। পরেশবাবু হিন্দু ব্রাহ্মণ—তার মুখে অন্ন কচছে না। তিনি লিখেছেনও তাই।”—বলিয়া বুন্দাবনবাবু চশমাটি পরিধান করিয়া পোষ্টকার্ডখানি তুলিয়া ধরিয়া পড়িলেন, “কি বলি ব বুন্দাবনবাবু, মেয়ের বয়স তেরো পার হইয়া চৌদ্দতে পড়িল—আমার রাজে নিভ্রা ও দিনে আহাৰ খুঁজিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। আজকাল যা দিনকাল পড়িয়াছে, আমার সহদম্পিনী সর্ষদা ভয়ে কাঁটা হইয়া থাকেন, কখন কি অনর্থ ঘটিয়া যায়!” এখন শুনলে ত? এ অবস্থায় আর দেৱী করা ঠিক নয়। আমি তো মনে করছি আগামী মাঘমাসেই—”

আনন্দ বর্তমান সবটকা এড়াইবার জন্ত বলিল, “আচ্ছা, একটু ভেবে দেখি।”

“এতে আর ভাবা-ভাবি কি আছে? আজকাল ওই হয়েছে তোমাদের এক দস্তুর—‘ভেবে দেখি!’ তাছাড়া তোমার ভাবার আছে কি?—আমি যতদিন বেঁচে আছি—”

আনন্দ তর্ক না করিয়া কেবল বলিল, “তবু একটু ভেবে দেখি।”

“আরে কি মুন্সি! আমি তাদের কথা দিয়ে রেখেছি গেল যাহিনে। ভদ্রলোক টাকাও প্রায় হাজারখানেক অগ্রিম দিয়ে রেখেছেন”—বলিয়া তিনি কোটা খুলিয়া কপ-করিয়া এক থিলি পান খুঁ ফেলিয়া দিলেন!

আনন্দ শুভিত হইয়া গেল! হাজারখানেক টাকা অগ্রিম লওয়া হইয়া গিয়াছে! সে কি একটা পণ্য-দ্রব্য? থরিদার পূর্ হইতে বাহন দিয়া গিয়াছে!

বুন্দাবনবাবু বলিলেন, “তাহলে একটা দিন-স্থির—”

আনন্দ হঠাৎ বলিয়া বলিল, “টাকা ফেরৎ দিন। ওখানে আমি বিয়ে করবো না।” বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া গেল!

বুন্দাবনবাবুর বিস্মিত কণ্ঠ হইতে বাহির হইল, “মানে?” কিন্তু তাহা তিনি-ছাড়া আর কেহ শুনি ন!

বুন্দাবনবাবু আপিস চলিয়া গেলেন। আনন্দ বাড়ীতে আসিয়া নিম্নের ঘরে থিল দিল! দাদার কাণে দেখিয়া সে বিচলিত হইয়াছিল, কিন্তু বিস্মিত হয় নাই। স্বার্থের জ্ঞান দাদা সবই করিতে পারেন। যাক সে কথা। আনন্দ অল্পপমার কথা ভাবিতে লাগিল। জীবনে কোন ক্রীলোকের সখ্বে তাহার একরূপ মনোভাব কখনও হয় নাই। দুই চারি দিন মাত্র আলাপ, অথচ অল্পপমার চিন্তাই তো সে সারাক্ষণ করিতেছে! অল্পপমার দাদা অশোক কেমন লোক? সে তো টেলিগ্রাম করা সখেও আসিয়া পৌঁছিল না! ব্যাপার কি কিছুই বোঝা যাইতেছে না। অবিশেষবাবুর জর খুব বাড়াবাড়ি—১০৩ হইতে ১০৪, কখনও বা ১০৫ পঞ্চাশ উঠিতেছে। নবীনবাবু বলিলেন, বুকেও নাকি সন্দি বসিয়াছে।

বেশ প্রলাপ বকিতেছেন। হঠাৎ তাহার মনে হইল, জামালপুর হইতে বরফ কিছু আসিয়াছে বটে—কিন্তু তাহাতে কুলাইবে না। জামালপুরে একজন ডলটিয়ারকেই পাঠাইতে হইবে। খানিকটা ভাল টিকার ডিভিটেলিসও আনাইতে হইবে—নবীনবাবু বলিয়াছেন। কাহাকে পাঠানো যায় আনন্দ ভাবিতে লাগিল।

আর এক উপদ্রব আসিয়া জুটিয়াছে, তেলিপাড়া ভারতী নাট্য-সমাজ। তাহার আনন্দকে আসিয়া ধরিয়াছে, ষ্টেজ ম্যানেজমেন্টের তার তাহাকে লইতে হইবে। দুইচারিজন ডলটিয়ারও তাহাদের চাই। স্থলের ছেলেরা থিয়েটার লইয়া বেশী মাতামাতি করে, ইহা আনন্দের ইচ্ছা নয়। তথাপি কিছু-একটা রফা করিতে হইবে। কারণ, তেলিপাড়ার বাবুরা সেবক-সমিতির প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং লোকও ভাল। একটু থিয়েটার-প্রবণ এই যা'। এই সময় মুগলটা কোথা গেল! তাহাকে ভিড়াইয়া দিলেই সব গোল চুকিয়া যাইত! মুগলও তাহার জীবনে একটা সমস্তা হইয়া দাঁড়াইয়াছে! লবণ-আইন-অমাস্ত করার দরুন জেল খাটিয়া মুগল যেন বদলাইয়া গিয়াছে। সর্বদাই কি যেন ভাবে। মাঝে মাঝে তাহাকে শুধু বলে, “আমার আদর্শ বদলাইয়াছে।” হঠাৎ আনন্দ আবিষ্কার করিল যে এত চিন্তার মধ্যেও অস্ত্র:সলিলা যন্ত্রর মত অল্পপমার চিন্তা তাহার মনে সমানে বহিয়া চলিয়াছে। দুয়ারে ধাক্কা পড়িল—কপাট খুলিয়া দেখি বৌদিদি!

বৌদিদি একটু মুচকি হাসিয়া বলিলেন, “ঘরে খিল দিয়ে কি হচ্ছে? ও বাড়ী থেকে তোমাকে ডাকতে এসেছে! চা খেয়ে তবে যাও।” বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

আনন্দ বাহরে গিয়া দেখিল, মধুয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া মধুয়া বলিল, “কলকাতা থেকে চিঠি এসেছে।

রিমির্মি আপনাকে একবার ডাকছেন! সময় হবে কি আপনার এখন!”

আনন্দ বলিল, “আমি চা খেয়েই যাচ্ছি।”

ভিতরে যাইতেই বৌদিদি বলিল, “এত বেলায় চা আর না-ই খেলে! ভাত তো রান্না হয়ে গেছে।”

আনন্দ বলিল, “ভূমিও বৌদি পেছনে লাগলে! Thou too Brutus! স'সারের নানাবিধ জালা-যন্ত্রণার মধ্যে তুমিই একমাত্র লোক আছ যেখানে—”

বৌদিদি বলিলেন, “ধাক ধাক্—বোঝা গেছে! সেদিন সামান্য একটা জামার ছিট এনে দিতে বললাম, বলা হল, এখন সময় নেই! ভোঁদাকে দিয়ে আনাতে হল! সে বিচ্ছিন্নি এনেছে!”

আনন্দ গম্ভীর মুখে বলিল, “একটা লোক টাইফয়েডে ভুগছে। নিতান্ত অসহায়—বিদেগে একা। তার কাজটা আগে করা উচিত, না তোমার ছিট খুঁজে বেড়ান উচিত? বল! আচ্ছা—আজই তোমার ছিট এনে দিচ্ছি! ব্রাউসের তো? কি ধরণের চাই?”

আগল কথা, বৌদিদিও ছিটের আর প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু সাধারণতঃ বৌদিদি-জাতীয় মহিলাদের এ সম্বন্ধে মাথার ছিট আছে, তাই তিনি বলিলেন, “ওই ও-বাড়ীর মেয়েটি একটি জামা পরে বেড়ায়—দেখনি তুমি?”

“কোন বাড়ীর মেয়েটি?”

“আহা, কিছু যেন ব্যস্ত পারছেন না! ওই তোমার অল্পপমা গো—! সেই যে কাল বিকেলে পরেছিল—চকোলেট রংএর উপর লাইট হলুদ রঙের ফুট-ফুট দাগ—”

আনন্দ গম্ভীর হইয়া বলিল, “বেশ। আজ খুঁজে আনব।”

অন্তমনস্ত হইয়া আনন্দ চা শেষ করিয়া উঠিতে বাইতেছিল, এমন সময় বৌদিদি আবার বলিলেন, “দেখ, ভবল বহর যদি হয়, তাহলে এক গজ আর সিংগল বহর হলে’ কিন্তু দেড় গজ লাগবে।”

আনন্দ অন্তমনস্ত ভাবেই উত্তর দিল, “আচ্ছা।”

বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

বৌদিদি ছিটের স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন।

অবিনাশবাবু বাড়ী গিয়া আনন্দ অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িল। গিয়া দেখিল, অন্ন কাদিতেছে।

“কি হল? কাদছ যে!”

অন্নপমা একটি পত্র আনন্দের হাতে দিল। পত্রে লেখা—

অন্ন দেবী,

আপনার টেলিগ্রাম বখাসময়ে এসেছে। কিন্তু ছঃখের সহিত আপনাকে জানাচ্ছি—অশোকবাবুকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে। পলিটিক্যাল সাস্পেন্ডে—এই অজুহাতে। যদি আপনারা প্রয়োজন মনে করেন, আমি যেতে পারি। টেলিগ্রাম করবেন তাহলে!

বিমান।

আনন্দ জিজ্ঞাসা করিল, “বিমান কে?”

“দাদার একজন বন্ধু—”

“তোমার সঙ্গে আলাপ আছে না কি?”

“হ্যাঁ খুব। আমাদের বাড়ীতে সেবার সমস্ত পুজা ডেকেশানটা কাটিয়ে এসেছেন।”

আনন্দের মুখটা অকারণে অন্ধকার হইয়া উঠিল।

অন্নপমা কহিল, “বিমানবাবুকে কি টেলিগ্রাম করব—আসতে?”

“সেটা আমি কি করে বলব। তুমি যা ভাল বোঝ কর। তোমার যখন এমন বিশেষ বন্ধু—তখন বিপদের সময় ডাকা উচিত। এখন কোন কাজ নেই তো?—চললাম।”

বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া আনন্দ বাহিরে চলিয়া গেল। এমন আকস্মিকভাবে আনন্দ কোন দিন চলিয়া যায় নাই। আজ হঠাৎ এমন করিয়া চলিয়া গেলেন কেন বিশ্লেষণ করিতে গিয়া অন্নপমার অধরে অতি-ক্ষীণ একটি হাঙ্গরোখা ফুটিয়া উঠিল।

ছানার জল করিতে হইবে।

অন্নপমা ঠোঙ জালিতে বসিল।

ঠোঙে স্পিরিট ঢালিয়া দেশলাই জালিয়া বসিয়া-বসিয়া স্বচ্ছ নীল নিখাটি দেখিতে দেখিতে অন্নপমা ভাবিতে লাগিল, বিমানবাবুর চিঠি দেখিয়া আনন্দবাবু এমন করিয়া হঠাৎ চলিয়া গেলেন কেন?

তাহার অধরে ক্ষীণ হাঙ্গরোখাটি আবার ফুটি ফুটি করিতে লাগিল।

৮

আনন্দ তাহার প্রত্যাশার অগ্রদূত এড়াইয়া চলিতেছে। আপিস হইতে ফিরিয়া তিনি আনন্দের খোজ লইয়াছিলেন, আনন্দ ত্রিসীমানায় ছিল না! সন্ধ্যাহিক, আহাৰাদি প্রভৃতি সারিয়া যখন তিনি তাগের আড্ডায়, বাইবার আয়োজন করিতেছেন—তখনও তিনি আর একবার আনন্দের সন্ধান করিলেন, কিন্তু পাইলেন না। তঁোদা আসিয়া বলিল যে অবিনাশবাবুর বাড়ীতেও আনন্দ নাই—তাহারা

বলিল, চারিটার পর হইতে সে আর ও-বাড়ীতে যায় নাই। মলিদার কক্ষরটারটা গলায়, কানে এবং মাথায় বেশ করিয়া বাঁধিতে বাঁধিতে বৃন্দাবনবাবু খবরটা শুনিলেন। তাহার পর ভোঁদাকে বলিলেন, “তোর মাকে ডাক।”

ভোঁদার মা আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “আনন্দ কোথায় গেছে জান গা?”

“বলতে পারিনা তো—”

“রাত্রে যখন খেতে আসবে, বলো তো যে আমার সঙ্গে কাল সকালে দেখা না করে যেন কোথাও না বেরোয়।—বুঝলে?”

“আচ্ছা।”

কোণ হইতে লাঠিটা তুলিয়া লইয়া বৃন্দাবনবাবু নৈশভ্রমণে বাহির হইলেন।

ধানিকটা ছিট বগলে করিয়া আনন্দ রাজি নটা-নাগাদ বাড়ী ফিরিল। ছিট দেখিয়া বৌদি উল্লসিতা! বৌদিদির যাহা কিছু সখের সামগ্রী আনন্দই তাহা চিরকাল আনিয়া দিয়াছে, হয় নিজের জ্বলারশিপের টাকা দিয়া, না হয় নিজের হাতখরচ হইতে পরগা বাঁচাইয়া। বৃন্দাবনমোহন এই সব বিলাসিতার সমর্থন করিতেন না। কিন্তু রোধও করিতেন না। আপিসে যেমন তাঁহার সহিত বড়-সাহেবের সম্পর্ক, বাড়ীতে তাঁহার নিজের সহিত জ্ঞার সম্পর্ক অবিকল সেইরূপ ছিল। বড়সাহেব যেমন নিরন্তর কর্ণচারীদের তুচ্ছ দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করেন, গৃহস্থালির বড় সাহেব বৃন্দাবনবাবু তেমনই এইসব সামান্য বিলাস-প্রিয়তা প্রভৃতি ছোটখাটো অপরাধ দেখিয়াও দোষিতেন না। এ বিষয়ে তাঁহার মহৎ ছিল স্বীকার করিতেই হইবে।

তাঁহার ছোটটি বিষয়ে কড়া নজর ছিল—জ্ঞার সত্য ও গৃহকর্মনিপুণতা! জ্ঞার সহিত তিনি কথাবার্তা কমই বলিতেন—কিন্তু যখনই বলিতেন উপবোক্ত ছোটটি বিষয় লইয়াই বলিতেন। বাজে-কথা—বিশেষতঃ জ্ঞা-জ্ঞতির সহিত—বৃন্দাবনবাবু একেবারেই পছন্দ করিতেন না। লোকে কিন্তু—যাক্ সেকথা!

আনন্দ বৌদিদির মারফৎ দাদার আদেশ শুনিয়া বলিল, “তুমি দাদাকে বলে দিও—এ বিষয়ে আমি কিছুতে করতে পারব না! তিনি যেন আমাকে মাফ করেন!”

“বেশ তো বাবু, তুমি নিজেই বলো। আমার এসব বিষয় নিয়ে তোমার দাদার সঙ্গে কথা কইতে ভয় করে!”

“ন, আমি আর এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করব না!”

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বৌদিদি জিজ্ঞাসা করিলেন, “আজও তুমি যাবে না কি ও-বাড়ীতে?”

“দেখি—!”

আহারাদি শেষ করিয়া আনন্দ বাহির হইয়া গেল।

৯

আনন্দ বাড়ী হইতে বাহির হইল বটে—কিন্তু কোথায় যাইবে ঠিক ছিল না। অবিনাশবাবুর চিকিৎসা ও সেবা ঠিকই চলিতেছে, সেবা-সমিতির বালকগণ ঘড়ির কাঁটার মত কাজ করিয়া যাইতেছে। তাহার বার-বার না গেলেও চল। বস্তুতঃ অকারণে যাওয়াটা তাহার

নিজেরই যেন নিজের কাছে থারাপ লাগিতেছে। সে নিজের কপটাচরণ নিজেই যেন ধরিয়া ফেলিয়াছে—সে সহসা আবিষ্কার করিয়াছে যে অবিনাশবাবুর অহুধের ছুতা করিয়া আসলে সে বার-বার অহুধমার কাছেই বাইতে চায়। আবিষ্কার করিয়া অবধি সে মনে মনে কৃত্তিত হইয়া আছে। ঠিক করিয়াছে, বিনা প্রয়োজনে সে আর অবিনাশবাবুর বাসায় বাইবে না। অস্ত্রায় হইতেছে।

রেল লাইন পার হইয়া সে মাঠের দিকে অগ্রসর হইল। অন্ধকার মাঠ। জনপ্রাণীশূণ্য!—মাঠের প্রান্তে দূরে একটা পাকা বাড়ী আছে বটে, কিন্তু এই শীতে কপট জানালা সব বন্ধ।

একাকী অন্ধকারে আনন্দ প্রেতের মতন মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কত কথা মনে হইল। এই মাঠে কত খেলায় সে জিতিয়াছে ও হারিয়াছে। কত আঘাত পাইয়াছে ও দিয়াছে। আশৈশবের ক্রীড়াভূমি এই মাঠ—অন্ধকারে জননীর মত তাহার আঁর্জ মনে যেন সাস্বনা বহন করিয়া আনিল!

কত বন্ধুবান্ধবের কথা মনে হইল। কে কোথায় ছড়াইয়া গিয়াছে। স্কুলের সংপাঠী রামদেও, হরেন, নন্দকিশোর, ললিত—কোথায় তাহার এখন! নিতাই কি এখনও বাঁচিয়া আছে? স্কুল-জীবনে নিতাই ছিল তাহার ধ্যান, জ্ঞান। নিতাই যদি মেয়ে হইত তাহাকে ঠিক সে বিবাহ করিত। নিতাই এখন কোথায়?—যাহাকে না হইলে একদণ্ড চলিত না—তাহার কথা এখন আর কই মনেও পড়ে না তো!

কোথায় সেই রসিকলাল? তাহার টিকি লইয়া অহরহ সকলে ঠাট্টা করিত! বেচারীকে ভাল-মাহুৎ পাইয়া একদিন সকলে তাহার টিকিটা কাটিয়া পর্য্যন্ত দিয়াছিল! রসিকলাল বেচারী কাদিয়া

ফেলিয়াছিল। কোথায় সে এখন। বাল্যকালের বিন্দুতপ্রায় সঙ্গীদল এই অন্ধকার মাঠে যেন তাহাকে ঘেরিয়া পরিল! থাকিবার মধ্যে আছে এক মুণাল! এই একমাত্র লোক যে তাহার আশৈশব সহচর। কিন্তু সম্প্রতি কিছুদিন হইতে মুণালের একি খেলায় হইয়াছে তাহা সে বৃত্তিতে পারে না। মুণালের বহু বক্তৃতা সে বহু গোপন স্থানে বসিয়া শুনিয়াছে—কিন্তু আজও সে বৃত্তিতে পারে নাই—কি ব্যাপারে সে লিপ্ত আছে। অথচ মুণাল খুলিয়া কিছু বলে না। আভাসে-ইন্দ্রিতে সে বলে, কার্ধ্যটি দুক্লহ। বুধবারে সে সব খুলিয়া বলিবে বলিয়াছে—দেখা যাক!

আশ্চর্য্য ছেলে এই মুণাল! যেমন শরীর—তেমন বুদ্ধি! মুণাল তাহাকে বারবার বলিয়াছে যে কার্ধ্যে সে ত্রুতী তাহাতে আনন্দের সাহায্য সে চায়। অথচ কি সে কার্ধ্য তাহা খুলিয়া বলিবে না। আগেই সে প্রতিশ্রুতি চায়! আনন্দের সাহায্য তাহার চাইই! তাহারও পাত্তা নাই। কোথায় সে?

হঠাৎ কাছে শৃগাল ডাকিয়া উঠিতেই আনন্দের চমক ভাঙিল! কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে! এ যে একেবারে পাহাড়ের কাছাকাছি!

ফিরিয়া যাওয়া দরকার। ফিরিতে ফিরিতে সে আবার ভাবিতে লাগিল। দেখিল তাহার এত এলোমেলো চিন্তার মধ্যেও একটি চিন্তা তাহার মনের মধ্যে অটুট আছে তাহা অহুধমার। তাহার সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ করিয়া দিয়া অহুধমার মুখখানি তাহার মনের মধ্যে জাগিয়া আছে। আশ্চর্য্য!

হঠাৎ তাহার মনে হইল, অবিনাশবাবুর অহুধ যদি বুদ্ধি পাইয়া থাকে!—সে তো কাহাকেও কিছু বলিয়া আসে নাই, যদি প্রয়োজন হয় তাহা হইলে তাহাকে তো কেহ খুঁজিয়া পাইবে না!

যতদূর সম্ভব দ্রুতগতিতে সে ফিরিতে লাগিল। অন্ধকারে তাড়াতাড়ি রেল-লাইন পার হইতে গিয়া সে হোচট খাইয়া পড়িয়া গেল। হাঁটুটা বোধহয় ছড়িয়া গেল।

গলিটার মোড়ে আসিয়া সে একবার ধমকিয়া দাঁড়াইল। মিউনি-সিপালিটির বাতিটা হেলিয়া-পড়া পোষ্টের উপর হইতে ষৎসামান্য আলোক বিকীর্ণ করিতেছে। সামনের একটা বাড়ীর পাকা বায়াণ্ডায় একটা কুকুর কুণ্ডলী-পাকাইয়া শুইয়া আছে। পদ-শব্দ পাইয়া কতকগুলো ছুঁচা কিচকিচ করিয়া সরিয়া পড়িল। চতুর্দিক নিস্তক।

অতি ধীরে ধীরে চোরের মতন, আনন্দ অবিনাশবাবু বাড়ীটার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। অবিনাশবাবুর ঘরে আলো জলিতেছে। তাহার পাশের ঘরের জানালায় মনে হইল যেন অল্পপমা দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া সরিয়া গেল।

আনন্দ একবার নিজেদের বাড়ীটার দিকে চাহিয়া দেখিল। সমস্ত চূপচাপ। তখন সে ধীরে ধীরে ডাকিল, “বিনয়।”

“বাই”—বলিয়া একটি বালক আসিয়া বাতায়নে দাঁড়াইল।

“কপাটটা খুল দিবে যা—”

“বাই”—বলিয়া বিনয় নামিয়া আসিল। আসিয়া বলিল, “বাবু কপাটটা তো খোলা রয়েছে। আমি যে বন্ধ করে গেলাম! খুললে কে?”

আনন্দ ভিতরে প্রবেশ করিতে করিতে মুহূর্তের জিজ্ঞাসা করিল, “কেমন আছেন অবিনাশবাবু এ বেলা—”

“ভাল না। জর একটু আগে দেখেছিলাম ১০৪ ডিগ্রী। সর্ব্বদাই বিড় বিড় করে কি বন্ধে—আর বিছানায় কি যেন খুঁজছেন।”

“অল্পপমা জেগে আছেন না কি?”

“একুনি তো জেগে ছিলেন।”

আনন্দ আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিল। উঠিয়া দেখিল, আপাদ মস্তক ঢাকা দিয়া অল্পপমা ঘুমাইতেছে। কে বলিবে এখনি বাগিয়াছিল!

আনন্দ অবিনাশবাবুকে দেখিয়া ধীরে ধীরে আবার নামিয়া চলিয়া গেল। ভারতী নাট্যসমাজে একবার যাওয়া দরকার! অনেক করিয়া তাহার বলিয়া গিয়াছে।

বাইতে বাইতে তাহার মনে হইল, অল্পপমা কি সত্য ঘুমাইতেছে?

১০

পরদিন আনন্দের উঠিতে বেলা হইল। শুইতে অনেক রাজি হইয়াছিল। উঠিয়াই বৃন্দাবনমোহনের সহিত দেখা হইয়া গেল। কানে পৈত-জড়ান বৃন্দাবন আনন্দকে দেখিয়া বলিলেন, “বেলা আটটা পর্য্যন্ত শুয়েই থাক্‌বি না কি? উঠে পড়।”

আনন্দ উঠিয়া পড়িল। পলাইতে পারিল না।

বৃন্দাবনমোহন বলিলেন, “কাশীর ব্যাপারটা আমি মিটিয়ে ফেলতে চাই। ও সব ছেলেমানুষী ছাড়—”

আনন্দ চূপ করিয়া রহিল।

বৃন্দাবনমোহন ছাড়িবার পাজ নহেন। বলিলেন, “চূপ করে থেকো লাভটা কি বল! ‘হা’ ‘না’ একটা কিছু বলতেই তো হবে। এ ক্ষেত্রে যখন ‘না’ বলার পথটা বন্ধ, তখন ‘হা’ বলাটাই ভাল! শুনেছি মেয়েটি দেখতে বেশ সুন্দরী—তাকে যা-তা একটা ধরে দিতে চাই না!”

আনন্দ উপস্থিত-বিপদটা এড়াইয়া যাইবার জন্ত বলিল, “তার চেয়ে আপনি নিজে একবার দেখে আসুন।”

“তুই বাপু নিজেই যা না।”

“না, আমি যাব না।”

“এই শীতে আমাকে আবার কাশীপধ্যন্ত দৌড়তে হবে! আচ্ছা বেশ তাই হবে।”

আনন্দ রেহাই পাইয়া হাঁক ছাড়িল।

প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া সে যখন বৌদিদির কাছে চা পান করিতে গেল, তখন বৌদিদি একটি খবরের মতন খবর দিলেন।

“ও-বাড়ীর মেয়েটি এসেছিল একটু আগে! বেশ সুন্দর কথা বার্তা।”

আনন্দ আশ্চর্য হইয়া গেল।

“হঠাৎ আমাদের বাড়ীতে কেন?”

“চায়ের দূধ নিতে এসেছিল। তোমার সেবক-সমিতির ছেলেরা সব ঘুমুচ্ছে। মধুয়া বাজারে গেছে। নিজেই এসেছিল বেচারী।”

“তার বাবা কেমন আছেন?”

“ভাল নয়। বাচবে তো? মেয়েটির মুখখানি ভারী শুকনো!”

“ভগবান জ্ঞানেন”—বলিয়া আনন্দ চায়ের বাটিতে চুমুক দিল। তাহার মনে মনে নিজের অজ্ঞাতসারেই একটা আফশোষ ঘনাইয়া উঠিতেছিল। অহা অহু আসিয়াছিল, অথচ সে গাধার মত শুইয়া ঘুমাইতেছিল!

নীচবে চায়ের বাটিটা শেষ করিয়া আনন্দ উঠিতে যাইবে এমন সময় বৌদিদির কোল হইতে বুঁচকি বলিয়া উঠিল, “তা-তা।”

“তনু ছাড়া পো, তোমাকে ডাকছে! একটু কোলে নাও

বেচারীকে! অবিনাশবাবুরা এসে-থেকে এদের আর ছোঁওনি তুমি!”

আনন্দ হস্ত-প্রসারণ করিতেই বুঁচকি ঝাপাইয়া কোলে আসিল। আনন্দ তাহাকে লইয়া বাহির হইয়া গেল। বাহিরের ঘরে আসিয়া দেখিল, থানার দাবোয়া বিনোদবাবু আসিয়া বসিয়া আছেন।

“নমস্কার বিনোদবাবু! খবর কি?”

বিনোদবাবু ও আনন্দ পরস্পর পরিচিত। বিনোদবাবু আনন্দকে যথেষ্ট খাতির করিতেন। বিনোদবাবু বলিলেন, “আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে, প্রাইভেটে।”

“খুকীটাকে দিয়ে আসি তাহলে।”

খুকীকে দিয়া আনন্দ ফিরিয়া আসিল। কহিল, “চলুন বেরোন যাক।” পথে চলিতে চলিতে বিনোদবাবু বলিলেন, “আপনাদের বাড়ীর সামনে যে ভদ্রলোকেরা এসেছেন, চেনেন আপনি তাঁদের?”

“আগে আলাপ ছিল না, টোনে আলাপ হয়েছিল। তারপর এসেই অস্থগে পড়েছেন সেই স্বজ্ঞে একটু ঘনিষ্ঠতা হয়েছে।”

“কে কে আছেন ও বাড়ীতে?”

“অবিনাশবাবু আর তাঁর এক মেয়ে। তাঁর এক ছেলে—”

“ওই ছেলেই তো যত গোল করেছে মশাই! কলকাতায় পলিটিক্যাল সাসপেক্ট বলে তাকে ধরেছে! আমার উপর হুকুম এসেছে বাড়ী সার্চ করতে। সুনলাম, আপনার সঙ্গে আলাপ—তাই আপনাকে একবার প্রাইভেটেলি—”

আনন্দ ভয় পাইয়া গেল।

“বাড়ী সার্চ? সে তো অসম্ভব! অবিনাশবাবুর টাইফয়েড, নবীনবাবু বলছেন সীরিস্‌ ব্যাপার। এ অবস্থায় সার্চ করা—”

বিনোদবাবু লোকটি ভাল। দেখিলে মনে হয় না তিনি কোন নিহর কার্য্য করিতে পারেন। ধপধপে কুর্সী রঙ। নাকের ডান পাশে একটি কালো আঁচিল—এই আঁচিলটাই ছিল তাঁহার মুখের মধ্যে একটু খুঁৎ তাহা না হইলে বিনোদবাবুকে স্থপুরুষই বলা চলে। তিনি বলিলেন, “সার্জ তো করতেই হবে। তবে অবিনাশবাবুর যাতে কোন কষ্ট না হয় সেটা আমরা দেখব। ভাছাড়া আপনি যখন রয়েছেন এ ব্যাপারে—কোন রকম—সে কথা বলাই বাহুল্য। বুঝলেন কি না আমাদের চাকরি! কিছু মনে করবেন না! চলুন তাহলে।”

আনন্দ বিম্বিত হইয়া বলিল, “এখনি?”

“হ্যাঁ—সেরেই ফেলা যাক—”

বলিয়া বিনোদবাবু ফিরিলেন। আনন্দও সঙ্গে সঙ্গে ফিরিল।

সার্জ করিয়া বিশেষ কিছু বাহির হইল না।

বিনোদবাবু কার্য্য-সমাধা করিয়া চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় বারম্বার কমা-প্রার্থনা করিয়া গেলেন। সত্যি লোকটি ভাল।

কিছুক্ষণ পরে নবীনবাবু আসিলেন।

সব কথা শুনিয়া তিনি অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। উত্তেজনায় চোটে টোথোস্কাপটা বার-দুই তাঁহার হাত হইতে পড়িয়া গেল।

—“তার মানে? পুলিশ এসেছিল?—আমাদের বিনোদ-দারোগা! ডেভারাস লোক তো! মুচকি মুচকি হাসে, দেখলে মনে হয় খুব ভালমাসুষ! পেশেন্টের বিছানার নীচেও সার্জ করেছে? সারলে দেখছি। টাইকয়েড রুগী—সৌরিয়স কেস! সটান এসে রুগীটাকে ভিষ্টার্ব করে গেল! তার কি এটা জ্ঞান নেই যে এসব রুগীর নড়াচড়া একেবারে বারণ! হঠাৎ একটা ব্লাফ আলগা হয়ে গেলেই তো বাস—খতম।—সাবলে দেখছি! আজ কদিন হল?”

আনন্দ বলিল, “আজ তেরো দিন!”

“কাল রাতে কেমন ছিলেন?”

আনন্দ বলিল, “এই বিনয়, বল।”

বিনয় একটা খাতা দেখিয়া মুখস্থ করার মত বলিয়া গেল, “কাল সন্ধ্যার নটায় টেম্পারেচার ১০৩.৪, বারটাখ ১০৩.৬, তিনটের সময় ১০৩, ছটার সময় ১০২.৮ এখন ১০৩.২। ইউরিন মাত্র একবার হয়েছিল।” কাকারবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভুল বকছিলেন?”

“হ্যাঁ! বিড়-বিড় করে—”

নবীনবাবু জরুজিত করিয়া সব শুনিলেন। রোগী দেখিলেন। ঘাড়ার পর বাহিরে আসিয়া বলিলেন, “স্ববিরোধ নয়!—আনন্দ বেশ এ ছেলেগুলো যেন ভাল করে হাত-টাতে ধোয়। এদের কারো হলেই তো গেছি!”

আনন্দ বলিল, “আচ্ছা।”

টেলিগ্রাম করিতে হয় নাই।

শতঃপ্রযুক্ত হইয়া বিমানবাবু পরদিন আসিয়া উপস্থিত হইলেন—পশ্চাতে কুলী। কুলীর মাথায় থাকি ওয়াড়-দেওয়া চামড়ার হুটকেস। শুধুরি একটি হোল্ডল। ভদ্রলোকের গলায় মাফলার জড়ান—গায়ে হালকাশানের চেটারফিল্ড, চেটারফিল্ডের দুই পকেটে ভক্তি কমলা-লেবু। হস্তে নেভিকাটের টিন—বগলে একটি বিলাতী মাসিক-পত্র, চক্ষে ঘোয়াইট গোল্ডের ফ্রেম-দেওয়া চশমা। মুখে নিখুঁৎ ভদ্র-ভাব। গায়-দাড়ি কামান।

কুলী বলিল, “এহি হরোরামবাবুকা বাসা।”

আনন্দ, নবীন-ভক্তারের নিকট হইতে ফিরিতেছিল।

আগন্তক ভদ্রলোককে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কাকে খুঁজছেন?”

“অবিনাশবাবু বলে একজন ভদ্রলোক—”

“হ্যা—ওইটেই! তবে পচা, কপাটটা গুলে দিয়ে যা।”

‘অন-ভিউটি’ পচা আসিয়া ধার খুলিয়া দিল।

“থ্যাক্স”—বলিয়া বিমানবাবু ভিতরে চলিয়া যাইতেছিলেন এমন সময় আনন্দ জিজ্ঞাসা করিল, “আপনার নাম কি বিমানবাবু?”

স্মিতমুখে ভদ্রলোক বলিলেন, “হ্যা—।”

“টেলিগ্রাম পেয়ে আসছেন বন্ধি?”

“না। কোন খবর পাই নি। তাই চলে এলাম”—বলিয়া তিনি ফিরিয়া বলিলেন, “আচ্ছা যাই—নমস্কার—!”

“নমস্কার। আমিও আসছি একটু পরে—”

আনন্দ পাড়াইয়া দেখিল, পরিদার—পরিচ্ছন্ন একটি আধুনিক যুবক ভিতরে অল্পপমার কাছে চলিয়া গেল। নিজের অর্ধ-মলিন বন্ধরের পাঞ্জাবীটাকে তাহার দিকার দিতে ইচ্ছা করিল! হঠাৎ উপরের দিকে চাহিয়া দেখিল, অল্পপমা জানালায় পাড়াইয়া আছে! মনে হইল যেন সে আনন্দের চোখের দিকে চোখ তুলিয়া কণকাল চাহিয়া রহিল। কণকালমাত্র! তাহার পর সে সরিয়া গেল। হয়ত মনের ভুল কিঙ্ক আনন্দের মনে হইল, দৃষ্টিটুকু যেন মিনতি-ভরা।

আনন্দ আর উপরের দিকে না চাহিয়া সোজা নিজের বাড়ীর ভিতর চলিয়া গিয়া বৌদিদিকে জিজ্ঞাসা করিল, “বৌদিদি, উত্তন খালি আছে না কি?”

মৃদু হাসিয়া বৌদিদি বলিলেন, “চা চাই তো! তোমার সাড়া পেয়েই জল চড়িয়েছি।”

“ও থ্যাক্স”—বলিয়া আনন্দ রাত্রাঘরের দাওয়াতেই একটা পিঁড়ি

শনিবারের চিঠি

৩৫৭

লইয়া বসিয়া পড়িল। বলিল, “দু’ পেয়ালা চা তৈরী কর। এক কাপ বিমানবাবুকে পাঠিয়ে দিহ।”

“বিমানবাবু কে আবার?”

“এইমাত্র কলকাতা থেকে এলেন ভদ্রলোক। অল্পপমার দাদার ক্রাস-মেট—”

বৌদিদির বন্ধিমচন্দ্র পড়া ছিল। হাসিয়া তিনি বলিলেন, “অর্থাৎ

‘সুমনের আবির্ভাব হল!’”

আনন্দ শুধু বলিল, “কি যে বল পাগলের মত। কেউ শুনে কেললে কি হবে বল তো? তোমাদের ওই এক চিন্তা—”

বৌদিদি বলিলেন, “ওদের বাড়ীতে পুলিশ এসেছিল না কি—সার্চ করতে?”

“হ্যা। অবিনাশবাবুর ছেলেকেও পুলিশে ধরেছে কলকাতায়! মুন্সিলে পড়েছেন ভদ্রলোক!—”

বৌদিদি শঙ্কিত-কণ্ঠে বলিলেন, “তুমি মিশোনা বাপু ওদের সঙ্গে, কোণা থেকে কি হয় বলা যায় না।”

আনন্দ একটু হাসিল মাত্র। তাহার পর বলিল, “দেখা যাক—অদৃষ্টে যা থাকে সে হবে! চা হল?”

চা লইয়া গিয়া আনন্দ দেখিল, দালানে বসিয়া অল্পপমা ও বিমান কণা কহিতেছে। বোধহয় অশোকের অ্যাংগেট-হওয়া সন্দেহেই কোন কথা হইতেছিল, আনন্দকে দেখিয়া তাহার বামিয়া গেল।

“আপনার জন্তে চা নিয়ে এলাম।”

“So very kind of you. Thanks. বহুদ। অল্পপমা কহে

সব স্তন ছিলাম। ওর তো ধারণা দেখছি—আপনি মাহুয় নন, দেবতা!”

“তাই না কি? এরকম ভাবে আমাকে গালাগালি দেবার অর্থ? আমার ঋটা নেই,—তিনটে চোখ, চারটে হাত, পাঁচটা মাথা, ছটা আনন, কিছুই তো নেই। যানের মধ্যে মাঝে মাঝে বাইক চড়ি। বোর্ড, ময়ূর কিংবা ইটুর-চড়া আমার পক্ষে অসম্ভব! হঠাৎ আমাকে দেবতা বলে’ অপদস্থ করবার মানে কি?”

“না, না, ঠাট্টা নয়! অহু সত্যিই খুব প্রশংসা করছিল আপনার—”

“কি যে বলছ তুমি বিমানদা! না আনন্দবাবু, আমি বিশেষ কিছু বলিনি—” বলিয়া লজ্জিতা অহুপমা উঠিয়া গেল।

আনন্দ জিজ্ঞাসা করিল, “অবিশাশবাবুকে দেখেছেন?”

“হ্যাঁ, দেখলাম। খুব সীরিয়স্ বলেই তো মনে হচ্ছে? নবীনবাবু বেশ ভাল ডাক্তার তো? I mean, যদি দরকার হয় কলকাতা থেকে ডক্টর সেনকে আনাতে পারি!”

“নবীনবাবু এ অঞ্চলের মধ্যে বড় ডাক্তার। প্রবীণ লোক। সদাশয় ব্যক্তি। আমরা তো ছেলেবেলা থেকে ডাক্তার মানে নবীনবাবুকেই বুঝি।”

“বুড়ো ডাক্তারেরা একটু সেকেলে ধরণের হন কি না। আর—কালকার আপ-টু-ভেটু সব চিকিৎসা—”

আনন্দ জিজ্ঞাসা করিল, “কলকাতায় আপ-টু-ভেটু চিকিৎসা করে টাইফয়েড-রোগী কি আর মরছে না আজকাল?”

“না তা’ নয়—তবে—”

“তবে?”

“তবে অহুর হয় তো একটু স্যাটিসফ্যাকশন হত।”

অহুপমা বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, “না—না। নবীনবাবুর হাতেই চিকিৎসা থাক। বড় খত্ব করে দেখেন উনি। বিমানদা এসে—অবদি ডাক্তার সেন—ডাক্তার সেন করছেন। নবীনবাবুকে আমার তো খুব বিশ্বাস হয়।”

“একটা কিছু যদি হয়ে যায়, তখন বলো না যেন যে বিমানদা কিছু করলে না। অশোক অহুপস্থিত, এ অবস্থায় কোন ক্রটি যেন না হয়, ষয়চের ভয় করি না।”

বলিয়া তিনি বিলাতী কায়দায় ‘shrug’ করিলেন।

অহু বলিল, “না—ওসব থাক—”

আনন্দ বলিল, “বেশ তো, নবীনবাবু তো আজ বিকেলে আসবেন, তখন তাঁকে বললেই হবে। তিনি যদি দরকার বোঝেন, তখন ব্যবস্থা করলেই হবে।”

বিমানবাবু বলিলেন, “হ্যাঁ—সেই বেশ।”

আনন্দ জিজ্ঞাসা করিল, “খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা—”

অহুপমা বলিল, “সে সব হয়েছে।—আপনি আজ আসবেন তো রাত্তিরে? কষ্ট হয়তো থাক—”

আনন্দকে বলিতে হইল, “না, কষ্ট কি? আসুব আজ।”

বৈকালে আনন্দ অবিশাশবাবুর বাড়ী যাইতে পারে নাই। তাহার স্পোর্টিং ক্লাবের মীটিং ছিল। মীটিং শেষ হইবার পর সে অবিশাশবাবুর বাড়ীতে গিয়া বিমানদার সহিত মুখোমুখি বসিয়া গল্প করিতে ইচ্ছা করিতেছিল না।

“—কে আনন্দ না কি? শুনেছ?”

আনন্দ কিরিয়া দেখিল, জীবনদা।

“কি শুনব ?”

“মৃণাল মায়া গেছে—”

“আ—সে কি! কি করে? কোথায়?”

“মুন্সেরে—রেলে কাটা পড়েছে!”

আনন্দের হঠাৎ মনে হইল আজই তো বুধবার—অমাবস্তা। আজই তো তাহার আসিবার কথা ছিল। মৃণালের কত কথা যে বলিবার ছিল!—অকথিত রহিয়া গেল চিরদিনের মত। একি সত্য?

আনন্দ নিরীক হইয়া ঝাড়াইয়া রহিল!

সেই মাঠ! আনন্দ একা আবার অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মৃণাল মায়া গিয়াছে? বিশ্বাস হয় না।

বলি-বলি করিয়াও কি কথা সে না বলিয়া সহসা চলিয়া গেল। সেই তেজস্বী মৃণাল!—লোকের বিপদে কি প্রাণ দিয়াই না সেবা করিত! এই সেবক-সমিতি তো তাহারই প্রতিষ্ঠান! সম্প্রতি সে কেমন যেন উন্নত হইয়া ঘুরিত!—জিজ্ঞাসা করিলে বলিত বৃহত্তর সত্যের সন্ধান সে পাইয়াছে। কি সে সত্য? তাহার সন্ধান সে তো আনন্দকে দিয়া গেল না! মৃণালের জীবনের কত ছোট-খাটো ঘটনাটি তাহার মনে পড়িতে লাগিল! ভারি অভিমাত্রী ছিল সে। আনন্দ কাহারও সহিত বেশী ভাব করিলে মৃণাল মনে মনে চটয়া যাইত। আনন্দ তাহার একার বন্ধু থাকিবে—কোন তৃতীয় ব্যক্তির স্থান সেখানে নাই!—দ্বিবা তাহাকে ফেলিয়া চলিয়া গেল তো! সত্যই কি মৃণাল মরিয়াছে? আর আসিবে না!

আনন্দের চোখে অশ্রু জমিয়া উঠিল।—হঠাৎ তাহার মনে হইল, অল্পমা তাহার জীবনে সহসা আবিস্কৃত হইয়াছে—তাই কি মৃণাল চলিয়া গেল? অভিমাত্রী মৃণাল!

অল্পমা? কোথাকার কে! অথচ সারা মনটা জুড়িয়া বসিয়া আছে। আজ বিমানের কাছে তাহার প্রশংসা করিয়াছে। শুনিয়া-অবধি আনন্দের মন আকাশে-আকাশে উড়িয়া বেড়াইতেছে। আজ রাতে সেখানে যাইতে হইবে। বিমান আসিয়াছে—ঘাইবার আর দরকার কি? কিন্তু তাহার অন্তরতম মন বলিল, আসিয়াছে বলিয়াই ঘাইবার দরকার আছে। তাহা ছাড়া, অল্পমা নিজমুখে আসিতে বলিয়াছে এবং সে প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিয়াছে।

—ঘাইবে বই কি!

বিমান আর অল্প কি এক ঘরে শুইবে? সেটা ঠিক হইবে না। উপরে তো ছুখনি ঘরও নাই। এই শীতে বিমানবাবু কি দালানে শুইতে রাজী হইবেন? দালানও তো ঘর। একই ঘরে দুইজনের শোয়াটা—আনন্দ অল্পমা-সমস্তায় মগ্ন হইয়া গেল।

বিচিত্র মাতৃয়ের মন! আটশবের সহচর মৃণালের মৃত্যুশোক জুলিয়া আনন্দ কোথাকার অচেনা অল্পমার পদ দেখিতেছে জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে।

অবিনাশবাবুর খবর লইবার জন্ত আনন্দ আবার নবীন-ডাক্তারের বাড়ী গেল। এবার দেখা হইল।

ডাক্তারবাবু বলিলেন, “কল্লিকেশন এসেছে।”

শঙ্কিত-কণ্ঠে আনন্দ জিজ্ঞাসা করিল, “এ বেলা কি অবিনাশবাবুর অবস্থা খারাপ দেখলেন না কি?”

“অবস্থা তো খারাপই। ভীষণ টকসীমিয়া—তার ওপর এক ফোড়নদার ছোকরা এসে জুটেছে। সারলে দেখছি!”

“বিমানবাবু কিছু বললেন না কি?”

“বললে, রক্ত দেওয়ার যদি দরকার মনে করেন—আমি রক্ত দিতে পারি সজ্জ্বে। আজকাল কলকাতায় রক্ত-দেওয়া একটা ফ্যাশান হয়েছে কি না!”

আনন্দ তাহার পর বলিল, “কলকাতা থেকে ডাক্তার-আনাবার কথা কিছু হল না কি!”

“হ্যাঁ। বলছিল ওই ছোকরা। আমি বললাম, একটা কেন, দশটা ডাক্তার তোমরা আনতে পার! মেয়েটি কিন্তু বাইরে থেকে কাউকে আনাতে রাজী নয় দেখলাম—”

অস্বাভাবিক আনন্দ বলিল, “মেয়েটি বেশ ভাল।”

নবীনবাবু একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, “মৃণালের খবর কতেনিহি?”

“জেনেছি।”

“উঃ—বড় লোকসান হয়ে গেল একটা! এমন ছেলে এ তল্লাটে আর হবে না। তোরা দুটিতে মাণিকজোড় ছিলি।”

“চল্লাম!”—মৃণালের কথা মনে করিয়া হঠাৎ তাহার বুকের ভিতরটা কেমন যেন মূচড়াইয়া উঠিল!

বাড়ী ফিরিয়া দেখিল, একখানি টেলিগ্রাম আসিয়াছে—তিন-পাহাড় হইতে। সেখানে তাহার ছোট বোন বীণার অবস্থা সঙ্গী। দুই দিন হইতে প্রসব-বেদনা, ছেলে এখনও হয় নাই। বীণার স্বামী

তিনপাহাড়ে ষ্টেশনে কাজ করেন। তিনি আনন্দকে যাইবার জন্য টেলিগ্রাম করিয়াছেন।

আনন্দ আবার নবীন-ডাক্তারের বাড়ী ছুটিল। তিনি বারকয়েক ‘সারলে দেখছি’ বলিয়া শেষটা ঠিক করিলেন যে হাসপাতালের খাতাটিকে লইয়া অবিলম্বে আনন্দ চলিয়া যাক—তাহার পর দরকার যদি হয়, তিনি যাইবেন।

নিজের ভয়ীর অস্থখ। যাইতেই হইবে। কিন্তু কি আশ্চর্য, আনন্দ মনে মনে যেন একটু বিরক্তই হইল! আজ রাতে সে যেন এখানে থাকিতে পাইলে বস্ত্রিযা যাইত। যাইবার পূর্বে সে একবার অবিনাশবাবুর বাড়ী গেল। ‘দেখিল ছবি আঁকিয়া বিমানবাবু ‘টেলি-ভিশনের’ তথ্য অল্পমাকে বুঝাইতেছে এবং বু’কিয়া পড়িয়া অল্পপমা তাহা দেখিতেছে। তাহার আগমন তাহার জানিতে পারিল না। তাহারও জানাইতে প্রবৃত্তি হইল না—দীরে দীরে সে নামিয়া গেল।

১৩

তিন দিন পরে।

রাত দুইটা হইবে। অন্ধকার ভেদ করিয়া ট্রেন ছুটিয়া চলিয়াছে। একটি ইন্টার-ক্লাস কামরায় আনন্দ একা বসিয়া আছে। যমে-মাহুবে টানাটানি করিয়া মাহুয এবার জয়ী হইয়াছে—বীণা বাঁচিয়াছে। আনন্দ সাহেবগঞ্জে ফিরিয়া চলিয়াছে। তিন দিন সে অল্পপমার কোন খবর পায় নাই।

এই তিন দিন আনন্দ যাহা ভাবিয়াছে তাহা বর্ণনা করিবার নহে। অল্পভব করিবার। এ অল্পভূতির ভাষা নাই!

সাহেবগঞ্জে যখন সে পৌঁছিল—তখন শেষ-রাত্রি। টেশনে চেনা-কাহারো সহিত দেখা হইল না।—টেশনের বাহিরে আসিয়া দেখিল শুকতারটা জল-জল করিয়া জলিতেছে! অত্যাঙ্কল শুক-গ্রহ!

তাহার সমস্ত অন্তর কানায় কানায় পরিপূর্ণ!

—দীপে দীপে সে গলির মোড়ে আসিয়া দাঁড়াইল।

মিউনিসিপালিটির বাতি নিভিয়া গিয়াছে।

চতুর্দিক নিস্তব্ধ।

গলির ভিতরে প্রবেশ করিয়া অবিনাশবাবুর বাড়ীর দিকে সে তাকাইয়া দেখিল।—অন্ধকার। অবিনাশবাবুর ঘরে-পর্দাঙ্ক আলো জলিতেছে না। ইহার মানে কি?

“বিনয়—কিশোর—”

কাহারো সাড়া নাই। ইহার দুমাইয়া পড়িল না কি? দেখিল, কপাটটা খোলা! ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, গাঢ় অন্ধকার; হাত বাড়াইয়া হাতড়াইয়া সিঁড়ি দিয়া সে উপরে উঠিতে লাগিল।

উপরেও অন্ধকার। কল্পিত কণ্ঠে সে ডাকিল, “অহু—অহুপমা—”

কেহ নাই। অবিনাশবাবুর শয্যা শূন্য!

নীচে নামিয়া গিয়া নিজেদের বাড়ীর দরজায় সে সজোরে কড়াঘাত করিতে লাগিল। বৌদিদি আসিয়া ঘর খুলিয়া দিয়া বলিলেন, “অবিনাশবাবু কাল সকালে মারা গেছেন। গুঁরা সব চলে গেছেন—কালই সন্ধ্যা বেলা।” একটু থামিয়া বৌদিদি আবার বলিলেন, “উনিও

ফিরেছেন কাল কাশী থেকে। ১৭ই মাঘ দিন স্থির হয়েছে।”

আনন্দ বিমূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

তাহার মুখে কথা জোঁগাইল না।

বৌদিদি বলিলেন, “ভেতরে এসো। বাঁধা কেমন আছে?”

“ভাল।”

বলিয়া সে তাত্তাভাডি নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিল। আলোটা জলিতেই চোখে পড়িল মৃণালের ফোটোথানা।

মৃণাল তাহার দিকে চাহিয়া মুহু মুহু হাসিতেছে!

হিন্দু-বাংলা ও মুসলমান-বাংলা

বাংলাভাষা হিন্দুবাংলা হইবে না মুসলমানবাংলা হইবে ইহা লইয়া তর্ক উঠিয়াছে। প্রাথমিক বিজ্ঞালয় গুলি পাঠশালা হইবে না মন্ডব হইবে ইহাও প্রশ্ন। এ প্রশ্নের উত্তর এই যে দুই রকমই হউক। বাংলাভাষা রাষ্ট্রভাষা হইলে পঞ্চাশ রকম বাংলা হইবে—তাহার চেয়ে দুই রকম ভাল। হিন্দুর লেখা বই হিন্দুরা পড়িবে, মুসলমানের লেখা বই মুসলমানে পড়িবে। ভাষা-বিভাগ হইলে, লেখক ও পাঠক বিভাগও চাই। অনর্থক তর্ক করিয়া কালক্ষেপ করা সমীচীন নহে—ভাষা সধক্ষে এবং প্রাথমিক বিজ্ঞালয় সধক্ষে ইহা যদি শেষ কথা না হয় তাহা হইলে সাম্প্রদায়িক ঘন্ড কখনও মিটিবেনা, যদি মেটে, দাঙ্গায় অথবা যুদ্ধে। ইহার কোনোটা ই ভাষার পক্ষে সুবিধাজনক নহে।

সংবাদ সাহিত্য

বিংশ শতাব্দীর প্রায় আরম্ভ হইতেই আমাদের দেশে শস্তা জাপানী খেলনা ও নানা মনিহারী দ্রব্যের যে প্রকার অবাধ আমদানী শুরু হইয়াছিল এবং এগুলি যে-ভাবে অচিরকাল মধ্যে আমাদের সম্মুখ ও বাহির ছাইয়া ফেলিয়াছিল, তাহাতে বহুবিধ হুবিধা সবেও জাপানী মালের প্রতি আমরা অন্ধা হারাইয়াছিলাম। অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইয়াছিল যে জাপানী কোনও বস্ত্র বলিতে আমরা তাহার শতামি-বিষয়ে বেক্ষপ ভীত হইয়া উঠিতাম, তেমনি দুইখানি হাত অতি সরল ভাবে পকেটে ঢুকাইয়া যতগুলি পরসা একবারে দুই মুঠায় উঠে ঠিক ততগুলি পরসাই খরচ করিয়া নানাবিধ দ্রব্য কিনিয়া গৃহিণী এবং পুত্রকন্ডার মুখে হাসি ফুটাইবার বন্দোবস্ত করিতাম। ফলে আর বাহাই হউক একটি জ্ঞান লাভ করিয়াছি এই যে এতদিন যে শস্তার মাত্র তিনটি অবস্থা ছিল বলিয়া জানিতাম, এখন স্বচক্ষে দেখিলাম, অবস্থা তিনটি নহে, বহু।

কিন্তু এ সম্বন্ধে যেটুকু দুঃখের সেটুকু চাপা দিয়া সুখের দিকটাই উদ্ঘাটিত করি। জাপানী শস্তা মালে দেশের ছেলেমেয়েদের মুখে হাসি ফুটিয়াছে এই কথাটিই আসল, অভিভাবকের পরসা গিধাছে তাহাতে ক্ষতি নাই।

সম্প্রতি জাপানী কবি নোগুচি কলিকাতা আসা উপলক্ষে হঠাৎ জাপানী বস্ত্র সম্বন্ধে এই সব পুরাতন কথাগুলি মনে পড়িয়া গেল। মনে পড়িবার বিশেষ কারণ এই যে কোনো দেশেরই উৎকৃষ্ট দ্রব্য আমরা

লই না, নিক্কটের দিকেই আমাদের দৃষ্টি। আপানে যাহা অচল, জাপানীরা তাহা ভারতবর্ষে পাঠায়, আমানিতে যাহা অচল, আমানিগণ তাহা এদেশে বিক্রয় করে। আমাদের আর কিছুই বক্তব্য নাই, লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন ঠকাইয়া না যায়।

মৈত্র মহাশয় জাপানী-কবিতার এজেন্ট হইয়া যে-মাল বঙ্গদেশের বাজারে চালাইতে চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতে আমরা বিশেষ শঙ্কান্বিত হইয়াছি। এগুলি যে খেলনা হইতেও শস্তা মনে হইতেছে! মাসিক ও সাপ্তাহিক যদি এই শস্তামালে পৃষ্ঠা সাজাইতে বসে তবে বাংলাদেশের লক্ষ্যিক কবি মুহুর্তে বেকার হইয়া পড়িবে। কবিতা-আমদানির উপরে কি “ডিউটি” বসানো যায় না?

সিনেমার প্রভাবে আমাদের দেশের ছুধের বাচ্চাদের কি সর্বনাশই যে হইতেছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। শুনা যায়, এক বাড়ির একটি শিশুকে হঠাৎ একসময় খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছিল না। শিশুর মাতা ও পিতা সন্তানহারা হইয়া পাগলের মত হইলেন। বাড়ির অন্ত্যস্ত লোকেরা খুঁজিতে বাহির হইল। এক বেলা খুঁজিবার পর অবশেষে শিশুকে পাওয়া গেল এক সিনেমাঘরের বারান্দায়। সে তখনও হাঁটিতে শেখে নাই, হামাগুড়ি দিয়াই চলিয়া আসিয়াছে! অহুসদ্ধানকারীগণ অবাক হইয়া দেবিল, ছেলেটি সিনেমার এক অভিনেত্রীর ছবি সন্মুখে করিয়া বুকিৎ অফিসের নিকট বসিয়া আছে!

গল্পটি বিশ্বাস করা শক্ত, কিন্তু অবস্থা বেক্ষপ দেখিতেছি, তাহাতে বিশ্বাস না করিয়া উপায় নাই। সিনেমার আওতাধ একজাতীয় ‘তরুণ’

বন্ধিত হইতেছে; সিনেমার অভিনেত্রীই ইহাদের ধ্যান এবং জ্ঞান।
 রাজ্যে ইহার সিনেমা-অভিনেত্রীর স্বপ্ন দেখে এবং দিনের বেলা
 তাহাদের ফোটো-পোষ্টকার্ড কিনিয়া বেড়ায়। আবার সাপ্তাহিক
 কাগজগুলিও ইহাদের পথ চাহিয়া বসিয়া থাকে—কারণ ইনাইয়া
 বিনাইয়া অভিনেত্রীর ফোটাগ্রাফের রূপ বর্ণনা আর কেহ করিতে
 জানে না। যে-কোনো অভিনেত্রী ইহাদিগের বুক ছুরি মারিয়া যায়;
 একদিন ছবি দেখে, আর সাতদিন বিহ্বল হইয়া পড়িয়া থাকে। এই
 লেখকরূপী বৃহন্নলা-সম্প্রদায়কে প্রশংসা করিতেই হইবে—কেননা
 ইহারাই মথার ত্যাগী। পৃথিবীর প্রবল জাতিসমূহ জীবন উপভোগ
 করে—বাণিজ্য দ্বারা এ দেশ হইতে পয়সা লুটিয়া লয়—আর ইহার
 তাহাদের চতুর অভিনয়ের ছবি-মাত্র দেখিয়াই আধমরা হইয়া পড়ে।
 স্বাস্থ্য নাই, তাই চোখে ঘুমও নাই। ক্ষমতা নাই, তাই অভিনেত্রীদের
 অদৃশ্য চরণে শির লুটাইয়াই পড়িয়া থাকে। বলিবার ভাষা নাই, তাই
 নামজপ করিতে করিতে মুখে ফেনা উঠিয়া যায়।

তবু আমরা এই সম্প্রদায়কে তারিফ করিতেছি। আর যাহাই
 হউক, ইহাদের অধ্যবসায় প্রশংসনীয়।

একজন বলিতেছেন—

...চোখ কখন জড়িয়ে এসেছিল জানি না—এক সময় প্রশান্ত
 মহাসাগর সঁাতরে উঠলুম। চারিদিকে শান্তি! শান্তি! আনন্দে
 উৎফুল্ল আমি—কী স্বপ্ন দেখলুম—আমি বন্ধনবাসী নই, তা নয়ত
 'আহা কী হেরিলাম' বলে তিন পাতা লিখে ফেলতাম।

তা যখন নই তাই যা দেখেছিলাম সেই কথাই বলছি—মারলে
 গুয়েরন এসেছে কলকাতায়। বড়দিনের বাজারে সহরে রঙ বেরঙ

গাছের মেলা—মেটোতে এসেছে ছবি দেখতে—উঃ কী ভীড়! চাপে
 বেশলাইয়ের কাঠি হয়ে যাবার যোগাড়! টুপি, ষ্টাট, সাড়ি, লথা
 সুলওয়াল কোট—কিছুর অভাব নেই...আমি এগিয়ে চলেছি, মারলে
 দেখব বলে, মারলে! মারলে! সে যে আমার স্বপ্ন। সে যে আমার
 মত এই কলকাতারি মাছুয়...সেই মারলে এসেছে কলকাতায়।
 মারলে! মারলে! ওই তো মারলে! কাকে ডাকছে! আমায়
 না!—হ্যাঁ আমায়ই তো!—মারলে আমার সামনে...হাত ধরে জিজ্ঞেস
 করলে কী চাই; আমি বলুম অটোগ্রাফ। মারলে আবার হাসলে,
 বলে, আর কিছু না? হুঁহা কেমন জানি না—আমার মুখে কে মধু
 ঢেলে দিলে।...

হায় এমন করেই 'মারলে'! স্বপ্ন-মারলে লেখকের মুখের ভিতর
 বাক্য-স্বধা 'ঢাললে'? একেবারে উন্মাদ না হইলে প্রেম! প্রলাপ না
 হইলে স্বপ্ন! হায় বঙ্গবীর, এই মারলে হইতে তোমাকে কে বাঁচাইবে!

এদিকে আমাদের ঢাকা যে কলিকাতাকে টেকা মারিয়া আগাইয়া
 চলিয়াছে নানা গোলমালে আমরা তাহা লক্ষ্যই করি নাই। ঢাকার
 তরুণীর পরিচয়, নায়ক-নায়িকার প্রথম সাক্ষাৎ-কৌশল, মিলন, বিরহ,
 সমুদ্রই একেবারে নূতন রূপ লইয়া দেখা দিয়াছে।

তরুণীর স্বরূপ—

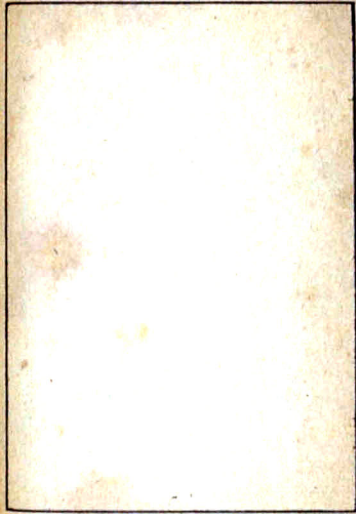
একটি তরুণী একটা দোকান থেকে সওদা হাতে বেয়ে
 বার ছই ট্যাক্সি বলে হেঁকে, ট্রামের অপেক্ষায় ফুটপাথে
 পায়চারী করছিল।

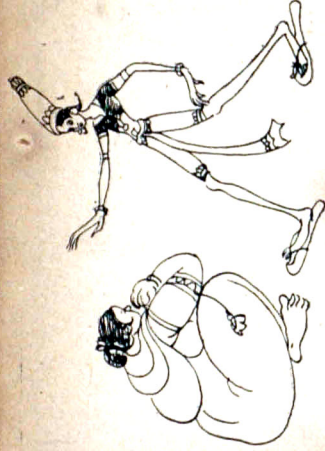
মহাশুদ্ধে ট্যাক্সি বলিয়া হাঁকা এবং না পাইয়া ট্রামের জন্ত অপেক্ষা
 করার মধ্য দিয়া লেখক বোধহয় তরুণীর পরিচয় ফুটাইয়াছেন। তাহা
 এই যে তরুণী, জীবনে এই প্রথম ঢাকা হইতে কলিকাতা পৌছিয়াছে।



বাংলা সাময়িক পত্রের সম্পাদকসংস্থা

লোক ও পাঠকের ব্যালান্স





এদিকে শায়কের সঙ্গে মিলনও আসন্ন হইয়া আসিয়াছে। ঢাকাই কৌশলে মিলন ঘটিল। নায়ক শিক্ত অথচ ফেরিওয়াল এবং তরুণ।—

এমন সুদর্শন তরুণটিকে খবরের কাগজ ফিরি করতে দেখে কৌতূহলী হয়ে সে বার হুই তার পানে চাইল। তার পর তার হাত থেকে সব রকম কাগজের এক একখানা নিয়ে হাজি ব্যাগ থেকে দাম দিয়ে পাতা ওলটাতে লাগল।

দীপক (তরুণ নায়ক) তা পকেটে রাখবার সময় লক্ষ্য করল একটি পয়সা অত্যন্ত উজ্জ্বল। ভাল করে দেখে বুঝল, তরুণী তুল করে পয়সার বদলে একটা গিনি দিয়েছে।

সে তরুণীর কাছে গিয়ে বলে “দেখুন আগনি তুল করে...”

“তাই নাকি?” বলে মনে মনে ফিরিওয়ালার সাধুতার অজ্ঞতা প্রশংসা করে, তরুণী বলে, “এই যে বাকী দাম।”

“এবে টাকা দিলেন মোটে এক পয়সা দেবেন।”

“এবারে তুল করিনি।”

“কিন্তু আগনি তা দেবেন কেন?”

“আমি দিলুম—

হায় কলিকাতা ট্রামওয়ে কম্পানি! তোমার অনিয়মিত ট্রাম ছাড়াক রূপায় পথের মোড়ে মোড়ে গল্প বাঁচত হইতেছে, সে সংবাদ তুমি রাখ না।

তরুণী একতরফ পয়ে ট্রাম পাইয়া চলিয়া গেল। ট্যাক্সির কথা আর তাহার মনেই পড়িল না। কিন্তু তেরো লক্ষ লোকের মধ্যেও অপরিচিত নায়ক-নায়িকার পুনর্মিলন হইতে আটকান না। ইচ্ছা করিলেই হইল।

শতা বেসের যে খুপরীতে দীপক কদম খেয়ে বাস করত সেখানে তুলেও আলো বাতাসের গতি বিধি ছিল না। তাই অনেক রাত অবধি সে গোলদীঘির একটা বেঞ্চে বসে কাগজ পড়ত ও ভাবত।

সে দিনও সে বসেছিল। ওপরে নিবহারা চাঁদ স্বপ্ন পারাবারের দেখা বেয়ে চলেছে...সেই দিকে চেয়ে চেয়ে দীপক আনমনা হয়ে পড়েছিল।

তার তন্ময়তা ভাঙল দূরে মেয়ে গলার আর্তিশ্বর শুনে। শব্দের অস্বয়রণ করে গিয়ে সে দেখল, যে তরুণী সেদিন তাকে ...পাশের গলিতে এক গুণ্ডা তার পথ আগলে সোনার রিট-ক্যাচ কেড়ে নেবার উপক্রম করচে। বোধ করি তরুণী সিনেমা থেকে ফিরছিল পথে এই ছুঁইব!

দীপক এক লাফে গুণ্ডার ঘাড়ের উপর ঝেঁয়ে পড়ল।

তরুণী আকুল হয়ে পড়েছিল। দীপককে দেখে হাঁপ ছেড়ে বললে, “আগনি?—বাঁচলুম।”...বিপাক দেখে গুণ্ডাটা দৌড়ে পালাল।

দীপক অনেক রাত পর্যন্ত পুলিশ আইন অগ্রাহ্য করিয়া গোলদীঘিতে বসিয়া থাকিত। বোধ হয় তরুণীটি সিনেমা দেখিয়া ছবিঘর কিংবা আলফ্রেড বিঘেটার হইতে রাত বায়োটাঘ ফিরিতেছিল। একা! গোলদীঘির পাশেব গলি দিয়া!

আবার তরুণ-তরুণীর মিলন (বোধহয়) কলেজ স্টাটেই।—

“কি কি কাগজ আছে?”

দীপক দিল। কিন্তু তরুণী দাম বিতে গেলে দীপক হাত গুটিয়ে নিয়ে বলে, “না না...”

“কাগজ নেওয়া হল না তা হ’লে।”

পথের মাঝে কথা কাটাকাটি করে তরুণীর মধ্যাহ্ন হানি ঘটানোর ভয়ে দাম নিতে হ’ল।

নিরালা ব্যক্তিতে পার্কের বেঞ্চিতে বসে দীপক বহুক্ষণ ...দেখল। এত দামী নোট তৈরী হয় এর আগে সে জানত না—এ দিয়ে যে একটা সাম্রাজ্য তৈরী করা চলে।

অথচ এমন তরুণীকেও বায়োজোপ দেখিয়া একা ফিরিতে হয় এবং স্বাত্ত বাবোটাও এবং পায়ে টাটিয়া!—শুধু ইহাই নহে। দীপক মোটর-চাপা পড়িয়া হাসপাতালে গেল—এবং জ্ঞান হইতেই দেবিল, তরুণী নাস করিতেছে।

লেখক বি. এস-লি উপাদিধারী। বন্ধায় নহে, কারণ বিজ্ঞানে নিষ্ঠা না থাকিলে এরূপ প্রত কল্পনা করা যায় না। তত্স্থপরি এরূপ গল্প লিখিয়া যদি কিঞ্চিৎ টাকা পাওয়া যায় তবে ত আমাদের বলিবার কিছুই নাই। অতএব দাদা, মূখ্য সম্পাদকদের ঠিকাইয়া যাহা পার উপাধীন করিয়া লও, দিনসময় বড় খরাপ। অল্প কোনো দিকে সুবিধা না হইলেই গল্প লিখিবে, এবং লিখিলেই সুবিধা হইবে। ইহার চেয়েও মৌলিক প্রত এদেশে চলিতেছে, লক্ষ্য করিও না।

—

স্বীকার করিতেই হইল, রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপাইবার পৌরব একমাত্র বিচিত্রারই প্রাপ্য। আমরা বুঝাই সিবোলিনের প্রবন্ধকে গাল দিলাম! এখন ভাবিতেছি, ঈহার পর বিচিত্রার কি হইবে। রবীন্দ্রনাথের বয়স চূড়ান্তর পার হইয়া গিয়াছে, বিচিত্রার যে সবে নয়! হায় সম্পাদক, নিজের নামের একখানা চিঠিও জুটিলনা, পরের চিঠি ছাপাইয়া বিচিত্রার কান মলিলে!

—

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক ও সাহিত্যসাগর আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ প্রণীত “আরকান রাজসভার দাদালা সাহিত্য” সম্বন্ধে “পনি ঠাকুর” নামক লেখক যাহা জানাইয়াছেন তাহা বাংলাভাষার উপর অত্যাচারের একটি নিদর্শন। তিনি লিখিতেছেন—

“কুমিকায় শ্রীযুক্ত ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় গ্রন্থকারস্বয়ং ভ্রোণার্জুন সদৃশ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। অত্যাঙ্কি নহে নিশ্চয়ই, কিন্তু অতীব পরিতাপের বিষয় এই যে শুকশিষ্য ভ্রোণার্জুন-লিখিত পাণ্ডিত্যপূর্ণ এই পুস্তকে বিস্তর রচনাশ্রমাদ (মুদ্রাকর শ্রমাদ নহে) স্থান পাইয়াছে।

—

পৃ: ৩৭:—“স্বীকার করি মুসলমান না হইলে [?] বাংলাভাষা ও সাহিত্য কৃষক বড়ই কুটিয়া উঠিত……কিন্তু ভক্তসমাজে সমাদৃত হইত না।”

পৃ: ২২—পংক্তি—১৫:—“কয়েকটি পত্র হারিয়া গিয়াছে” বড় সমস্তায় পড়িয়াছিলাম। “হারিয়া” অর্থ সোজা কথায় পরাজিত হইয়া। কিন্তু তাহাতে কোন ভাল অর্থ হয় না। আমাদের ভাদ্রবস্ত্র বিজ্ঞাতাবে কহিল, ছাপার তুলে “জ” স্থানে “ব” বসিয়াছে। হাজিয়া হইলে অবশ্য অর্থ একপ্রকার হয়। তবে লোকের হাত পা-ই হাজিয়া গিয়া থাকে। কাগজপত্র হাজিয়া যায় এরূপ কথা কুজাপি শোনা যায় নাই। আর তা ছাড়া শুদ্ধি পত্রেরও সেরূপ কোন কিছুই উল্লেখ দেখিলাম না। অবশ্য ‘হারাইয়া’ হইলে আর কোন গোল থাকে না।

২২ পৃ: ১২ পংক্তি,—“ইহা একপ্রকার পদভ্রম; পাথের গোড়ালির দিকে আটকাইয়া……পাতার দিকে ফুলাইয়া রাখিতে হয়।”……লিখিতে যে যুদ্ধ গ্রন্থকারের কাহারও কলমে “আটকাইল না” ইহাই আশ্চর্য।

পৃ: ১০—“মুসলমান রমণীরা কপালে সিন্দুর বিন্দু পরিধান করিতেন।”——কবে হয়ত শনিব আজকাল মেয়েরা কপালে খয়েরের দোটা “পরিধান” করেন। গ্রন্থকারস্বয়ং হঠাৎ সিন্দুরের প্রতি এতটা স্নেহমপূর্ণ হইয়া উঠিলেন কেন? অথচ সিন্দুর ব্যবহার-কারিণীদের

প্রতি তাদের এরূপ ভাব দেখা যায় না। নহিলে "ইহা মেয়েলোকেরা বন্ধ আবর্তিত করিবার জন্য ব্যবহার করিতেন।" (পৃ: ১০১)—এহেন ভাষা গুরুশিগ্গ কাহারও কলমে "আউতাইল না"। এখানে "মেয়েলোকেরা" বন্ধ আবর্তিত করিয়া ভাষা এবং নারীর প্রতি গ্রন্থকারের যেরূপ অসৌজন্য প্রকাশ করিয়াছেন বন্ধ আবর্তিত না করিলেও ততটা প্রকাশ পাইত না।

পূর্ণবঙ্গভুলভ ভ্রমগ্রন্থাদিরও অগ্রতুলন নাই। পৃ: ১০১—"বাংলা দিয়া "জড়ী" কাজ করা হইত।"

পৃ: ২৩;—পংক্তি—১৮;—"গোলাপ কলিকাতাকে অকালে ঝড়িয়া পড়িতে বাধ্য না করিলে—"

"জড়ী" কোন জাতীয় পদার্থ তাহা আমাদের জানা নাই। পূর্ণ-বঙ্গভাষা কোন ভাষা হইতে পারে। তবে জরি অবশ্য আমাদের পরিচিত বস্তুই।

"ঝড়িয়া" শব্দটির অর্থ বহু চেষ্টাতেও বাহির করিতে না পারিয়া ভীড়বস্ত্র বলিয়াছিল, সম্ভবত: ক্রিয়া পদে ঝড় হইতে "ঝড়িয়া" হইয়াছে। হইতেও পারে। অসম্ভব নয়। কারণ চট্টগ্রাম সমুদ্রের ধারে: বন্দোপসাগর হইতে নিম্নতই ঝোড়ো বাতাস চট্টগ্রামে বহিতেছে।

কথা বলিবার সময় কাহারও কাহারও মুদ্রারোষ দেখা যায়। লেখক-ম্বরের লেখাতেও সেরূপ মুদ্রারোষ দেখিতে পাইতেছি। ১০২ পৃষ্ঠার পুস্তকে কমপক্ষে চমিশ বার "এ হেন" শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে—যদিও অনেক স্থলেই উহার ব্যবহার শুই হয় নাই।

অর একটি শব্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করিয়া আমবা নিবৃত্তিশয় শব্দিত হইয়া উঠিতেছি। গ্রাম্য কথায় "উপরি দোদ" হওয়া অর্থে ভূতপ্রেত-গ্রস্ত হওয়া বুঝাইয়া থাকে। "উপরি" শব্দটীও যেন গ্রন্থকারেরই কৃত্রিম মত পাইয়া বসিয়াছে। স্থানে অস্থানে উপরি শব্দ যোগে— "উপযুক্ত," "উপযোগীভূত," "উপযুক্ত," "উপযোগীভূত" ইত্যাদি কৃত্রিম সমাবেশ করা হইয়াছে। সময়ে সতর্ক না হইলে "এ হেন"র মত "উপরি"ও মুদ্রারোষে পরিণত হইবে।

শনিয়াজি ডাক্তারসাহেব অক্ষীতর সত্বে মৌলিক প্রবন্ধ লিখিয়া পি, এইচ, ডি, ডিগ্রী পাইয়াছেন, ভাল। তবে সম্ভবত: প্রবন্ধটি বাংলা ভাষায় লিখেন নাই।

—
অমৃতবাজার পত্রিকায় কিছু দিন পূর্বে একটি বিজ্ঞাপন দেখিয়াছিলাম, তখনিক ভ্রূলোক মেয়েদের সঙ্গে intellectual basis-এ আলোচনা করিতে চাহেন। আমাদের ইন্টেলেক্ট নাই, শুধুই ইমোশন আছে, এইরূপ একটি অপবাদ বহুদিন হইতে শনিয়া আসিতেছিলাম। উক্ত বিজ্ঞাপনদাতা-ভ্রূলোকটি বোধহয় ভারতীয় চরিত্রের কলঙ্ক খুঁচাইয়া এই প্রথম ইন্টেলেক্টের ক্ষেত্রে পা বাড়াইলেন। বিজ্ঞাপনটি মেয়েদের সঙ্গে লোভনীয় হইবে কিনা জানি না, কারণ জীজাতির, ইন্টেলেক্ট এবং ইমোশন এই দুইয়েরই অজিজ্ঞাতা আছে। তবে তাহার বিজ্ঞাপন দিয়া অজিজ্ঞাতা সফল করে নাই—কারণ বাজারে পুরুষের ইন্টেলেক্ট এবং ইমোশনের কণ্ঠফল প্রত্যেক কপুরুষের দোকানেই পাওয়া যায়। মেয়েদের কণ্ঠিও কিছু কিছু আছে; তাহাও উক্ত স্থান-সমূহে প্রাপ্য। এ বাজারে স্ত্রী হউক, পুরুষ হউক, যাহারই ইন্টেলেক্ট বা ইমোশন আছে সেই এক বা একাধিক গ্রন্থ রচনা করিয়া বাজারে ছাড়িয়াছে, কেহই উহা লইয়া অস্থিরালে বসিয়া রহে নাই। অতএব বিজ্ঞাপনদাতা বিজ্ঞাপনের সাহায্যে ইন্টেলেকচুয়াল বেসিস-এ কিছু গড়িয়া তুলিবার পূর্বে পুস্তকের বাজার অস্থিস্থান ককন।

—
অমৃতবাজারের গত ১২ শে ডিসেম্বরের একটি বিজ্ঞাপন, বিজ্ঞাপন-হিসাবে সত্যই অভিনব বলিয়া বোধ হইতেছে। পুরুষ যে অস্থগ্রহ করিয়া পুরুষ-বিবাহ না করিয়া জীলোক-বিবাহ করে, এবং এইরূপ বিবাহ যে জীর পক্ষে অনেকটা চাকরি-পাওয়ারই সামিল, ইহা এই বিজ্ঞাপনদাতা খুলিয়া বলিয়াই ফেলিয়াছেন। বিজ্ঞাপনটির মর্ম এই—

GOLDEN OPPORTUNITY FOR A LADY GRADUATE

Wanted a Hindu Graduate.....of sound health and willing to proceed to Great Britain after marriage with her husband for teaching diploma for a 33 years [?] healthy rich Vaish Zeminder widower and a 1st class M. Sc. L. T. having two daughters and one son etc.

ইহা স্ববর্ণস্থযোগ নিশ্চয়ই, কারণ স্ববর্ণের মূল্য বর্তমানে প্রতি তোলা ৩৪৫০।

—

বৈশম্পায়ণ-জন্মেজয় নহে, যত্ন এবং মধু। স্থান মহাভারত নহে, ভারতবর্ষ। মধু জিজ্ঞাসা করিল, হে যত্ন, গল্প লিখিতে হইলে, কি কি গুণ থাকা প্রয়োজন? যত্ন উত্তর করিল, হে মধু, কিছু কাগজ আর পেন্সিল প্রয়োজন। মধু জানাইল, এ সমস্ত তাহার আছে, কিন্তু তথাপি গল্প লেখা বাইতেছে না। যত্ন বলিল, আর দরকার একখানা হাত। মধু আলোয়ানের ভিতর হইতে লম্বা দুইখানা হাত বাহির করিয়া বলিল, এই দেখ, একখানা নহে দুই খানা আছে—তবু গল্প লিখিতে পারিতেছি না। যত্ন বলিল, হে মধু, আর প্রয়োজন, কিঞ্চিৎ কৌশল। মধু বলিল, তাও হাজার রকম জানি! যত্ন বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তবু গল্প হয় না? মধু লজ্জিত ভাবে স্বীকার করিল, হয় না। কিন্তু ইহা ছাড়া আর কি প্রয়োজন যত্ন ভাবিয়া পায় না। ভাবিতে ভাবিতে সহসা তাহার মনে পড়িল, ভাষার কথাটা তাহার বলা হয় নাই। ঠিক ত, গল্প লিখিতে ভাষাও যে চাই! মধুকে বলিল, হে মধু, আর প্রয়োজন, ভাষা।

মধু তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, না,—ভাষার কোন দরকারই নাই, এই দেখ, বলিয়া সে ঘর হইতে পৌয়ের ভারতবর্ষখানা বাহির করিয়া যত্নের সম্মুখে খুলিয়া ধরিল। যত্ন দেখিল—

“প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত সে ত’ প্রকৃতির নয় দেখের একটি অভরণ মাত্র।...স্বর্গাদেব যখন পশ্চিম নীলাকাশে পদাবত করেন সৌন্দর্য্যের শেষ রত্নাভ্যুক্ত মেঘের স্তরে, পাহাড়ের চূড়ায় বন-বনানীর উচ্চ শিরে আলিম্পনা করেন,...চিমণীর ধূসর ধোঁয়াগুলি কুণ্ডলী পাকিয়ে লতিয়ে লতিয়ে ডগনিখার মত অনন্তে মিশে আবার আড়খর বৃদ্ধিই করে।...স্পিরিটে যদি আগুন ধরে, স্পিরিট অসীম থাকুক, আগুন অতি অল্প থাকিলেও ধক্ ধক্ করে সব পুড়ে শেষ হয়ে যায় যদি বাতাসের সহযোগিতা থাকে।...বাতের মত এত বড় শহর...কোথায় বা এর উত্থান, কোথায় বা এর পতন!...দুর্গাবাদকে হঠাৎ পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে লালকে লালময় করে দেয়। চুপে চুপে অগ্নিশিখার মত লাল ও উত্তপ্ত করে দিয়েছিলো।...বিকট কদম গাছটা...কচি কোমল সবুজ পাতাগুলির ফাঁকে ফাঁকে বের হয়ে থাকে [ফোটা কদমের বর্ণনা।] লালের ওপর সাদা শির-তোলা পাশড়ী, কে বলবে যে এগুলো ফুলের রেণু। দূর থেকে মনে হয় যেন শত শত, সহস্র সহস্র ফুলের তোড়া স্তরে স্তরে সজ্জিত হয়ে আছে। সমস্ত তোড়া নিয়ে একটা মস্ত বড় তোড়া, এই তোড়ার ওপর শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের কোলে মাথা রেখে শুয়ে থাকতেন আর শ্রীকৃষ্ণ রাশের বাঁশী বাজিয়ে শ্রীরাধাকে

প্রেমমোহে আচ্ছন্ন করে স্বপ্নমুগ্ধ কলোলে ভাসিয়ে দিতেন। [ডালপাতাস্বচ্ছ সমস্ত কদম গাছটাই শ্রীকৃষ্ণের চেয়ার কিংবা শ্রীরাধার বালিশ!]

এক নিঃশ্বাসে শেষ কর। গেল না, হুতরাং একটু বিশ্রাম লইয়া মধু পড়িতে লাগিল—

পাঁচটি দীর্ঘ বৎসরে জীবনের গতি একঘেয়ের মতো এসে ঠেকে পাড়ালো।... প্রমত্ত প্রেমিকদল যুবতীদের স্তনিযে স্তনিযে গান ধরে, প্রেমের গান বহু রাগিণীতে বিস্ত্রীত্রৈক্যতানের সৃষ্টি করে। ছোট ছেলেমেয়েরা কেমন ছি-ছি-বি-বি করে ছোটো-বিরক্তি ধরে গেছে, বিতৃষ্ণা হয়ে গেছে... মাতালের ফণী রক্ত চক্ষু দেখে...

যত্ন লজ্জিত হইয়া বলিল, ভাষা দরকার নাই, কিঞ্চিৎ সাহস দরকার।

কোনো কোনো দৈনিক সাপ্তাহিক কিংবা মাসিকপত্র পুস্তক-সমালোচনার একটি বিভাগ থাকে। আমাদেরও আছে। নিজেদের কথা খুলিয়া বলিব না, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই যে পুস্তক না পড়িয়া সমালোচনা লেখা হয় ইহা ঠিক। না পড়িয়া লেখার অনেকগুলি অবিধা আছে—(এ অবিধা গ্রন্থকার এবং সমালোচক উভয়ের পক্ষেই সমান)—প্রথমত, বই পড়িবার দায় হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত, প্রশংসা কারবার পক্ষে কোনো বাধা থাকে না এবং প্রশংসা করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ হয় না। পড়িয়া লিখিতে গেলেই নানারূপ

গোলমাল চোখে পড়ে, বিবেক পথ রোধ করিয়া পাড়ায় এবং আরও কত কি।

আমাদের জনৈক বিশিষ্ট বন্ধু-সম্পাদক কিছু বই না পড়িয়া সমালোচনা লেখায় একবার বিব্রত হইয়াছিলেন। বই-খানির নাম আচার্য্য জগদীশচন্দ্র। বন্ধুবর জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানসাধনা এবং আধিকারের কথা দ্বারা ভূমিকা করিয়া বইখানির উজ্জ্বলিত প্রশংসা লিখিয়া প্রেসে দিয়াছেন। প্রথম প্রফ পড়া হইয়া গিয়াছে—তাহা সংশোধন হইতেছে এমন সময় সংশোধনকারী-কম্পোজিটর আসিয়া সম্পাদক মহাশয়কে বলিল, স্তব, আপনি বোধ হয় ভুল করেছেন, ইনি জগদীশ বহু নন, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র, আমাদের গুরুদেব; ইনি একজন সাধু!—সাধুর কথা শুনিয়া সম্পাদক সাবধান হইয়া গিয়াছেন। ইহার পর হইতে, সমালোচনা লিখিবার পূর্বে তিনি বইখানি অন্তত স্পর্শ করিয়া দেখিয়া থাকেন।

অল্পদিন হইল একখানি দৈনিক কাগজে এই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি হইয়াছে। উহাতে একখানি অহুবাদ-পুস্তক সন্দেহ খুব প্রশংসা করিয়া বলা হইয়াছে—“অহুবাদের সঙ্গে মূল থাকিলে আরও ভাল হইত।” অথচ উক্ত পুস্তক প্রত্যেক পৃষ্ঠা অহুবাদের পূর্ণপৃষ্ঠায় মূল ছাপা আছে। স্পষ্টই বাবুতে পারিতেছি, সমালোচক শুধু যে মূলে ভুল করিয়াছেন তাহা নহে, অহুবাদও দেখেন নাই। ফলে সাতদিন পরে ঐ পুস্তকের দ্বিতীয়বার সমালোচনা বাহির করিতে হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্বীকার ও সমালোচনা

ত্ৰিভুল নন্দীর কুল। শ্রীকান্তনী সুবোধাধার্য্য প্রণীত। প্রকাশক শ্রীতারাদাস সুবোধাধার্য্য ১১, -আরপুলি লেন, কলিকাতা। মূল্য ১০ আনা। সমালোচনা পরে প্রকাশিত হইবে।

পল্লব (কবিতার বই)

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্তী ও শ্রীশান্ততোষ সান্মাল প্রণীত।

একখানি ছোট কবিতার বই, দুইজন কবির রচনা। রাধাচরণবাবু পবীণ কবি, আশুবারু নবীন। রাধাচরণ বাবুর 'ঐচ্ছ' কবিতাটি খুব ভাল লাগিল! আশু বাবুর সনেট গুলিতে স্বকীর্ততার গাভীরা আছে। এ বইখানি সঞ্চদে এখন এইটুকু বলিতে পারি। ভবিষ্যতে উচ্চতর প্রশংসা করিবার জন্ম আমরা প্রাপ্ত হইয়া রহিলাম।

হারমোনিয়ম কিনিতে হইলে

ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়মই কেনা উচিত

৫০ বৎসর ধরিয়া ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়ম সুরের মাধুর্য গঠন,

স্বায়িত্ব ও অদ্বাদ্য গুণের জন্ম সর্বশ্রেষ্ঠ

বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। অল্প

হারমোনিয়ম কিনিবার পূর্বে একবার

ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়ম সঞ্চদে খোঁজ

করিবেন। নব-প্রকাশিত সচিত্র মূল্য-

তালিকার জন্ম আজই পত্র লিখুন।

সোনেরা ডবল-রীড বন্ধ-হারমোনিয়ম, ৩ অক্টেভ, ৫ ষ্টপ বাক্সসহ ৩০ টাকা।

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন

১১নং এসপ্লেনেড, কলিকাতা

শ্রীপরিমল গোস্বামী এম-এ কর্তৃক সম্পাদিত। ২৫২; মোহনবাগান রো, শনিরঞ্জন এসে
হইতে শ্রীপ্রবোধ দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



২৮ বর্ষ]

মাস, ১৩৪২

[৪র্থ সংখ্যা]

মাইকেলের সনেট

দুইটি চরম আকাঙ্ক্ষা মাইকেলের জীবনকে মেরুদণ্ডের মত খাড়া
করিয়া রাখিয়াছে : মহাকবি-পাতিরা আশা ও বিলাত গমনের ইচ্ছা।
দুই হইলেও ইহারা অভিন্ন। ইংলণ্ড ও কবিপাতি তাহার কল্পনায়
স্ববিচ্ছেদ। মেঘনাদবধের প্রশংসা করিয়া একজন বন্ধু তাহাকে
চাউল, মিটন ও কালিদাসের সহিত তুলনা করিয়া এক চিঠি লেখেন ;
মাইকেল উত্তরে লিখিলেন, ভার্জিল বা কালিদাস হওয়া তাহার পক্ষে
সম্ভব, কিন্তু মিটন! অসম্ভব। মাইকেলের কাব্যের আদর্শ মিটনের
মহাকাব্য; মিটনের জন্মভূমি ইংলণ্ড। এই সুরে কবিপাতি ও
ইংলণ্ড অচ্ছেদ্য ভাবে প্রথিত।

মাইকেলের জীবন সঞ্চদে তাহার বন্ধুবান্ধব অনেক স্মৃতি, শ্রুতি

ও লিপি রাখিয়া গিয়াছেন। বাল্যকাল হইতেই তাহার জীবনে এই দুটি আকাঙ্ক্ষা দৃষ্ট হয়, এবং যতদিন না এই আকাঙ্ক্ষা সফল হইয়াছে ততদিন মাইকেল বীরোচিত শক্তিতে খাটিয়া গিয়াছেন নিরন্তর হন নাই। তাহার মন্থই ছিল মন্থ বা সাধয়েৎ শরীর বা পাতয়েৎ। বাড়ালী অবস্থার দাস, মধুসূদন অবস্থার উপরে প্রভুত্ব করিয়া গিয়াছেন।

বিলাত যাইবার ইচ্ছা আমাদের দেশে ভুল ভ নয়; সে ইচ্ছা মূল্যবানও বটে, কারণ তাহাতে সাংসারিক মূল্য বাড়াইবার আশাই সচরাচর দৃষ্ট হয়। কিন্তু মধুর বিলাত গমনের ইচ্ছা অমূল্য, কারণ তাহার সহিত মাইকেলের অন্তর্লোকের তৃষ্ণা জড়িত। এই ইচ্ছাকে তৃষ্ণ করিয়া দেওয়া চলে না। এই ইচ্ছার মূল না বুঝিলে তাহাকে ভুল বুঝিবার আশঙ্কা।

একবার তিনি তমলুক গিয়া বন্ধু গৌরদাসকে একখানা চিঠি লেখেন; তাহার ভাবানুবাদ এই রকম—“বন্ধু কাল তোমার সহিত দেখা হইবে না, তবু আমার মনে এক সাধনা আছে। আমি সেই সমুদ্রের কাছে আসিয়াছি, যে সমুদ্রের বক্ষে জাহাজে চাপিয়া একদিন,—আশা করি, সে দিন বেশি দূর নয়, আমি ইংলণ্ডের গৌরবময় তীরভূমির দিকে যাত্রা করিব। সমুদ্র এখান হইতে অধিক দূরে নয়।” তার পরেই যেন একটা দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত বলিতেছেন—“আঃ, কত না জাহাজ আমি ইংলণ্ডে যাইতে দেখিয়াছি।” সমুদ্র, জাহাজ সমস্তই তাহাকে ইংলণ্ডের কথা মনে করাইয়া দেয়, যে-ইংলণ্ড মিল্টনের জন্মভূমি, যে-মিল্টন তাহার কাব্যের আদর্শ! এ ইংলণ্ড তাহার Land of heart's desire, তাহার city of the soul।

মারের রচিত বায়রনের জীবন-চরিত পড়িয়া মধু পূর্ণোক্ত বন্ধুকে লিপিতেছেন—“কি চমৎকার গ্রন্থ! আমার ইচ্ছা ভূমি আমার জীবনী

রচনা কর, যদি আমি মহাকবি হইতে পারি, অবশ্যই আমি মহাকবি হইতে পারি।” তার পরে আবার সেই দীর্ঘনিশ্বাসিত উক্তি, “হায় যদি কেবল একবার ইংলণ্ড যাইতে পারি!”

মাইকেলের রচিত একটা ইংরেজি গানে আছে, “আমার আকাঙ্ক্ষা ইংলণ্ডের স্বপ্নের তীর-ভূমির জন্ম।” তারপরে বাহা আছে তাহা ভবিষ্যতে এমন অক্ষরে অক্ষরে ও মধ্যস্থিত রূপে ফলিয়াছিল যে মধুসূদনের মধুরের শনিগ্রহ এই আকস্মিক সঙ্গীত উচ্ছ্বাসে নিশ্চয় হস্ত সংবরণ করিতে পারে নাই—“যদিও সেখানে আমার বন্ধুবান্ধব কেহ নাই, তবু আমার আকাঙ্ক্ষা আটলান্টিকের তরঙ্গমালা অতিক্রম করিবার, হয় ব্যতি নয় ব্যতিবিহীন সমাধির।”

তিনি কৈশোরে শনিগ্রহের উপরে এক কবিতা রচনা করেন, কবির বাস শনিগ্রহে। পৃথিবী হইতে দূরবর্তী এখান শনিগ্রহ নয়, ইহা মধুসূদনের কল্পনার স্বর্গ, ইহাকে আমরা ইংলণ্ড বলিতে পারি। আবার ইহাকে তাহার অদৃষ্টাকাশের শনিগ্রহ বলিলেও ভুল হইবে না। ইহাতে এক স্থানে আছে, “হায় হতভাগ্য পৃথিবীর পুত্র সব।” এ হতভাগ্য কাহার জ্ঞানেন? বাংলাদেশের প্রাত্যহিক সংসারনিবাসী আমাদের প্রতি মধুর এই অবজ্ঞামিশ্রিত করুণার হস্ত। আবার এক স্থানে আছে—“পশ্চিম হইতে ছয়টি উজ্জল চন্দ্র উদিত হইল।” এ ছয়টি চন্দ্র কাহার জ্ঞানি না, তবে ইহাদের উজ্জলতমটি যে মিল্টন নহেন, এমন শপথ আমরা করিতে পারি না, বোধকরি কবিরও সে সাহস ছিল না।

মাইকেলের ষষ্ঠ-দশ গ্রন্থে সপক্ষে নানা তর্ক আছে। তিনি যে দূরবর্তী কালে ষষ্ঠদশে অবিশ্বাস করিতেন তাহা কেহ বলিতে পারে না। তবে একথা ঠিক, তিনি দীক্ষার সময়ে ষষ্ঠদশে না ছিলেন অচরিত, না

জানিতেন সে বিষয়ে বেশি কিছু। তিনি কি অব্যক্তনীয় বিবাহ-সম্বন্ধ হইতে নিষ্কৃতি লাভের জ্ঞাত একজ্ঞ করিয়াছিলেন? তিনি কি বহুবাহিত ইংলণ্ড গমনের জ্ঞাত এই চাল দিয়াছিলেন? ছুইটাই সম্ভব। কিন্তু আরো একটা কারণ থাকিবে অসম্ভব নয়। জাহাজ দেখিলে যাহার ইংলণ্ডের কথা মনে পড়ে, সমুদ্র যাহার কানে ইংলণ্ডের বাণী আনিয়া দেয়, বাস্তব অপেক্ষা কল্পনা যাহার নিকটে বড়, তমলুক গিয়া যিনি মনে করেন ইংলণ্ডের কাছে আসিয়াছেন, মাহাজ পলায়নের মধ্যে যাহার ইংলণ্ডের পথে এক ধাপ অগ্রসর হইয়া থাকার উদ্দেশ্য, তিনি যে দায়ে, টাসো, বায়রন, বিশেষ, মিল্টনের দর্শন গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের সহিত ধানিকটা একাত্মতা অহুভব করিবেন, তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। তাঁহার খৃষ্টধর্ম গ্রহণের অনেকগুলি কারণের মধ্যে ইহা একতম নয় তাহা কেহ জোর করিয়া বলিতে পারেন না।

মাইকেলের এই ছুইটি আকাঙ্ক্ষার মধ্যে একটি এদেশে থাকিয়াই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। মহাকাব্য লিখিতে তাঁহাকে ইংলণ্ডে যাইতে হয় নাই। যে ইংলণ্ডের জ্ঞাত তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ছিল, তাহার স্থান আটলান্টিকের পারে নয়, মানস স্রোতের তীরে। সে land of heart's desire হুয়েই। মিল্টনের স্পর্শ এদেশে বসিয়াই তিনি পাইয়াছিলেন। তাঁহার যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ রচনা, তাহা বিলাত গমনের পূর্বে, কেবল সনেটগুলি বিলাতগমনের পরে লিখিত। অপর আকাঙ্ক্ষাটি, যাহাকে আমরা স্বপ্নের প্রতি টান বলিতে পারি, তাঁহার কাব্যকে আশ্রয় করিয়াছে। ক্যাপটিভ লেডির কাহিনী ভারতীয়, ভাষা ইংরেজি। মেঘনাদ বধের ভাষা ভারতীয়; ভাব, অলঙ্কার, আদর্শ বিদেশীয়। এই দ্বিধা তাঁহার কাব্য ও জীবনে প্রায় সর্বত্র। এ দেশে থাকিতে বিদেশের প্রতি তাঁর আকর্ষণ—

শনিবারের চিঠি

৩৮৯

I sigh for distant Albion's shore, 'আবার বিদেশে গিয়া
বপোতাক নদকে স্মরণ করিয়া—

"সত্য, হে নদ! তুমি পড় মোর মনে।

সত্য তোমার কথা ভাবি এ বিরলে;

এ প্রবাসে মজি প্রেম-ভাবে

লইছে যে তব নাম বদলের সঙ্গীতে।"

২

এত আকাঙ্ক্ষা সবেও মাইকেল বিদেশে গিয়া বড় কোনো কাব্য লিখিতে পারিলেন না কেন! অবস্থার প্রতিকূলতা, অস্বাস্থ্য, ক্ষণ? ইহা আর যাহার পক্ষেই সত্য হউক, মাইকেলের মত দৈত্যশিশু যাহার মগ্ন শরীর বা পাতয়েৎ কার্য বা সাধয়েৎ, তাঁহার পক্ষে সত্য নয়। তিনি বেশ বড় কাব্য লিখিতে পারেন নাই তাহা নয়, অনেকগুলি কাব্য লিখিতে আরম্ভ করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন।

তাঁহার জীবনীলেখক বলেন—"সীতা কাব্য ভিন্ন কতকগুলি ইংরাজি খণ্ড-কবিতাও তিনি যুরোপ প্রবাস কালে রচনা করিয়াছিলেন। এবং বাঙ্গালা ভাষাতেও স্বভদ্রাহরণ ও শ্রোপদীস্বয়ম্বর নামক দুইখানি নৃতন কাব্য আরম্ভ করিয়াছিলেন।" ইহার কোনটাই সমাপ্ত হয় নাই। আমার বক্তব্য তাঁহার অবস্থা প্রতিকূল না হইয়া অহুকুল হইলেও তিনি আর দীর্ঘ কাব্য রচনা করিতে পারিতেন না। দেশে ফিরিয়া প্রথম দুই বৎসর; সাংসারিক অবস্থা বেশ ভালই ছিল, সে রকম স্বচ্ছলতা তাঁহার

ভাগ্যে আর কখনো ঘটে নাই। কিন্তু সে সময়ে তাহার উল্লেখযোগ্য রচনা কি? কিছুই নয়। কেন এমন ঘটিল?

উচ্চ শ্রেণীর কাব্য রচনার পক্ষে মানসিক একটা সংযম আবশ্যক। নৈতিক সংযমের কথা বলিতেছি না। মনোবৃত্তি, দেহবৃত্তি, সাংসারিক প্রবৃত্তি কায়মনোবাক্য একটি কেন্দ্রে আসিয়া একীভূত হইলে তবেই বড় কাব্য রচনার অল্পকূল অবস্থা ঘটে। ইহা সমস্ত ইঙ্গিতের পক্ষে এমন একটি অতিশয় শ্রমসাধ্য ব্যাপার, যে এমন অষ্টগ্রহের সংযোগ কদাচিৎ ঘটে এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। ইহা ব্যক্তিগত ও জাতিগত উভয় জীবন সম্বন্ধেই সত্য। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের কিছুকাল পরে বাংলা দেশে এমন একটি গানের গোপুলিঙ্গ আসিয়াছিল, সেই দেশবাসী শুভলয়ে বাঙ্গালী কবি কথা বলিলেই সন্দ্বীত ধ্রুনিত হইয়া উঠিত। এলডোরডোর পথে ছেলেরা সোনার গুলি লইয়া খেলা করে। আর সে দিন বাঙালী কবির অজস্রধারে পদাবলীর হরিরলুট দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সে কোটালের বজা চলিয়া গেল, বাঙালী কবির আবার পল্লীমাতার গোয়ালে ফিরিয়া ছড়া ও জাবনা কাটিতে আরম্ভ করিল।

বিদেশের সাহিত্যেও ইহার তুল্য উদাহরণ বিরল নহে। যদ্যপি কবি গায়টের জীবন দেখা যাক। বৈজ্ঞানিক গায়টো ও শিল্পী গায়টো, একদিকে তিনি সভাসদ ও মহী, অতীতকালে তিনি কবি ও ঋষি; এই দ্বিত্ব তাহার কাব্যকে দ্বিধাগ্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে। মাঝে মাঝে স্বপ্নের শুভলঙ্গ আসিয়াছে, তখন অমর কাব্যের অজস্র বর্ষণ। আবার সেই দ্বিধা—তাঁহার অনেক অসমাপ্ত কাব্য এই জীবনব্যাপী দ্বিধার চিহ্ন।

মাইকেলের জীবনেও এমন একটি ভুল'ভ অবসর আসিয়াছিল, তাহার মাত্রাজ হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে ও বিলাত গমনের পূর্বে। বঙ্গস্বায়ী পাঁচ-ছয়টি বৎসর। যে-প্রবল আকাঙ্ক্ষাকে তিনি পৈল

হইতে আশ্রয় করিয়াছিলেন, শেষে যে-আকাঙ্ক্ষা তাঁহার অস্তিত্বের সহিত অবিলম্বে হইয়া গিয়াছিল, তাহার চরম পরিণামে মধুসূদন যেন নিজের অস্তিত্বের পরিণাম লাভ করিয়াছিলেন। মহাকাব্য-রচনার এই আকাঙ্ক্ষার নাম ছিল মধুসূদন, তাহা যখন চরিতার্থতা লাভ করিল তখন যেন সেই সঙ্গে মধুসূদনেরও নির্দাণলাভ ঘটিল। অচরিতার্থ আকাঙ্ক্ষাই ভূতের মত রূপগ্রহ করিবার জন্ত ঘুরিয়া বেড়ায়। এই সময়টাতে মহাকাব্য রচনার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার তৃপ্ত হইয়াছিল, বাকি যে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, ইংলও গমনের, প্রকৃত প্রস্তাবে যাহার আর কোনো প্রয়োজন ছিল না, কারণ মহাকাব্য তিনি দেশে বসিয়াই রচনা করিয়া ফেলিলেন, সেই অতৃপ্ত অচরিতার্থ আকাঙ্ক্ষা তাঁহার মনে ভূতের মত ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, অবশেষে তাহাকে টানিয়া লইয়া গিয়াছে স্বদূরে। আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, মধুসূদনের কবিপ্রকৃতি বিদেশে গিয়া হতাশ হইয়াছিল। কাব্য রচনার পূর্বে বিদেশে গেলে এমন হতাশ তিনি হইতেন না। সেখানে গিয়া দেখিলেন কৃষ্ণ-বিরহিত পাখের মত গাণ্ডীব তুলিবার শক্তি পর্যাপ্ত তাঁহার নাই।

৩

আমরা বলিয়াছি, মানসিক একটা বিশেষ লগ্ন অতিক্রম করিবার জন্ত মাইকেলের কাব্য গঠনের শক্তি লুপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু কবিত্ব শক্তির অভাব ঘটে নাই। কবিত্ব শক্তি এক-পদার্থ; কিন্তু সেই শক্তির সাহায্যে বড় একটা কাব্য গড়িয়া তুলিবার ক্ষমতা স্বতন্ত্র; ইহাকে কাব্যের ভাস্কর্যশিল্প বলা যাইতে পারে। মাইকেল কবি ছিলেন, কিন্তু তারো চেয়ে বড় কথা, তিনি কবিভাস্কর ছিলেন। বিলাত

গমনের সময়ে মানসিক অরাজকতায় এই শক্তিই তাহার নষ্ট হইয়াছিল। কবিত্ব শক্তি যে অব্যাহত ছিল, তাহার প্রমাণ চতুর্দশপদী কবিতাবলী।

অট্টালিকা ও ইটের মধ্যে যে সখ্য, ত্রিক সেই সখ্য তাহার অলিখিত কাব্য ও এই সনেটগুলির মধ্যে। এ ইটের সৌন্দর্য্য ও দূতপিনক গঠন দেখিলে চুং হুং যে ইহাতে অট্টালিকা গঠিত হইলে কি অমর কীষ্টিই না নিশ্চিত হইত! কিন্তু কারিকরের সেই সমগ্রতার দৃষ্টি, সমগ্রতার বোধ আর ছিল না; ইট গড়িবার শক্তি থাকিলেও তাহাকে অট্টালিকার অগুণতা দানের শক্তি তাহার লোপ পাইয়াছিল। মাইকেলের সনেট-গুলির বিস্তৃত আলোচনা করিলে, আশা করি আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

মাইকেলের সনেট নিম্নলিখিতরূপে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য অল্পসারে চারিভাগে বিভক্ত হইতে পারে। (ক) কবি ও কবি খ্যাতি (খ) পৌরাণিকী (গ) দেশের স্বাতি (ঘ) বিবিধ।

(ক)

এই বিভাগে একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে। দেশী, বিদেশী অনেক কবির বিষয় তিনি কবিতা লিখিয়াছেন, কিন্তু যাহারা তাহার সর্বাঙ্গপেক্ষা প্রিয় ছিল, বিদেশী যে-সব কবির নিকটে তিনি সম্বন্ধ স্থাপী, সেই হোমার, ভার্জিল, টাসো, ওভিড এর কোনো উল্লেখ নাই। যে-মিল্টন তাহার কবির আদর্শ; যে-বায়রনের জীবনী পড়িয়া মনে হয়, তিনি বড় কবি হইবেন; ইংলণ্ডে গমন যাহাদের দেশে গমনের নামাস্তর মাত্র; তাহাদের কোনো উল্লেখ নাই। বিদেশ হইতে লিপিত চিঠিপত্রে মিল্টনের কথা দৃষ্ট হয় না।

সাহিত্য জীবন নহে, জীবনের ছায়াও নহে, সাহিত্য না-জীবন; সাহিত্য ও জীবন পরস্পর পরিপূরক। জীবনে যে-আশা সফল হয় না, সাহিত্যের কল্পতরুতে তাহাই ফল-প্রসব করে। দেশে থাকিতে এইসব বিদেশী কবিদের স্পর্শ তাহার কাব্যশৃঙ্গির সার্থকতায় চরম চরিতার্থতা লাভ করিয়াছিল। এইসব কবিদের সফলীভূত আকাঙ্ক্ষা আর কাব্যের সামগ্রী ছিল না। কিন্তু কবিখ্যাতির আশা তাহার মোটে নাই বলিয়াই সে সখ্যে অনেকগুলি সনেট আছে।

অবশ্য দাস্তুর বিষয়ে একটি সনেট আছে, কিন্তু ইহাকে দাস্তুর অপেক্ষা দাস্তুর জ্ঞানতিথির উৎসব উপলক্ষে রচিত বলা উচিত। এই সনেটটিকে অল্পবাদ করিয়া কবি ইটালিরাঞ্জের নিকটে প্রেরণ করিয়াছিলেন, এই প্রেরণের মধ্যে যেন একটি চমৎকার উৎপাদনের চেষ্টা আছে। এই চেষ্টা মধুসূদনের চরিত্রের অজ্ঞতম বৈশিষ্ট্য। তাহার মধ্যে একটি snob বরাবর প্রচ্ছন্ন ছিল। যে-মনোবৃত্তিতে তিনি এক মোহর খরচে চুল ছাটিয়া গর্গ করিতেন, চলিশহাজার টাকার কমে ভ্রলোকের চলা উচিত নয় মনে করিতেন, রাজমোহন দস্তুর পুত্র গুনিয়া টাকা দান করে না বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেন, ফরাসী সম্রাট লুই নেপোলিয়ানকে দেখিয়া সম্রাট দীর্ঘজীবী হউন বলিয়া ফরাসী ভাষায় টাংকার করিয়া উঠিতেন, সেই মনোবৃত্তিতেই তাহার এ সনেট প্রেরণ, দাস্তুর উৎসব উপলক্ষে ইটালিরাঞ্জের নিকটে। এই প্রেরণার মূলে কবি-মধুসূদন নহে, snob-মাইকেল, রাজমোহন দস্তুর পুত্র। যে-চোরবাগানের নগণ্যদের তিনি অবজ্ঞা করিতেন, এখানে তিনি তাহাদের সগোত্র। জীবিত কবিদের মধ্যে টেনিসন ও ভিক্টর হুগোর বিষয়ে দুইটি সনেট আছে। একজন রাজকবি, অজ্ঞান তৎকালীন যুরোপের সর্বাশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া পরিচিত। এ ছুটি কবিতা ইংরেজী ও ফরাসী-ভাষায় অহুদিত

হইয়া যথাস্থানে প্রেরিত হইয়াছিল কিনা, না জানা পৰ্য্যন্ত ইহাদের মধ্যেও যে এমন একটা স্তম্ভর বাস্তবতা নাই তাহা বলা যায় না।

দেশীয় কবিদের মধ্যে বাম্ণীকি, বাস, কালিদাস, জয়দেব, রুত্তিবাস, কালিদাস আছে। মাইকেল দেশে ফিরিয়া বড় দরের কাব্য লিখিবার আধ্যাত্মিক স্বযোগ পাইলে কি রকম কাব্য লিখিতেন, কেহ বলিতে পারে না। এই সব অতৃপ্ত-আকাঙ্ক্ষা-কবির নাম দেখিয়া মনে হয়, তাহার কাব্যশিল্প অধিকতর ভাবে ভারতীয় রূপ গ্রহণ করিত। একদা যেমন তিনি ভারতীয় ভাষায় লিখিবার জন্ত ইংরেজী ভাষা ত্যাগ করিয়াছিলেন, তেমনি স্বযোগ পাইলে কাব্যকে অধিকতর ভারতীয় রূপ দিবার জন্ত পূর্বলিখিত কাব্যের পন্থা তিনি খুব সম্ভব পরিত্যাগ করিতেন। তাহার যে কাব্য আমরা পাইয়াছি তাহা শিক্ষানবিশী-পর্ষের রচনা; মাইকেলের প্রকৃত কাব্য অরচিত রহিয়া গিয়াছে।

(খ)

মধুসূদন নবতর উজ্জম কাব্যরচনার স্বযোগ পাইলে, সে কাব্য যে পৌরাণিক ভিত্তিতে গঠিত হইত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই অসমাপ্ত গীতির খণ্ডিত তান ছিন্নবিছিন্ন হইয়া পৌরাণিক সনেটগুলির সৃষ্টি করিয়াছে। মধুসূদন অনেকগুলি পৌরাণিক কাব্য অসমাপ্ত রাখিয়া গিয়াছেন; স্বভদ্রাহরণ, দ্রৌপদী স্বয়ম্বর, সীতাকাব্য, বীরাদনা কাব্যের অসমাপ্ত কয়েকখানি পত্রিকা; ইহা ছাড়া তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের একটি নূতন সংস্করণ করিবার ইচ্ছা তাহার ছিল। এই সনেটগুলিকে আবার ভিন ভাগ করা চলে। রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী, ব্রজবৃত্তান্ত ও বাংলা পুরাণের কথা।

রামায়ণ-মহাভারত অর্থাৎ ভারতীয় পুরাণের কাহিনী লইয়া তিনি অনেক কথখানি সমাপ্ত ও অসমাপ্ত কাব্য রচনা করিয়াছেন। ব্রজ-বৃত্তান্ত বিষয়ে তাহার রচনা ব্রজাঙ্গনা কাব্য। কিন্তু বাংলা পুরাণ লইয়া তিনি কোনো কাব্য ইতিপূর্বে রচনা করেন নাই। কমলে কামিনী, অন্নপূর্ণার ঝাঁপ, ঈশ্বরীপাটনী, শ্রীমন্তের চৌপদ প্রভৃতি সনেট, এবং অসমাপ্ত সিংহল-বিজয় কাব্য তাহার মনোজগতে নূতন দিগ্‌দর্শন সূচনা করে। আমরা আগে বলিয়াছি তাহার পক্ষে বড় কাব্য রচনা সম্ভব হইলে তাহা অধিকতররূপে ভারতীয় রূপ গ্রহণ করিত, এখন এই সনেটগুলি দেখিয়া মনে হইতেছে, খুব সম্ভবত, সে কাব্যের বিষয়বস্তু বাংলা পুরাণ হইতে সংগৃহীত হইত।

বাংলা কোন পুরাণের ঘটনা অবলম্বনে তিনি কাব্য লিখিতেন? উপরের কবিতাগুলি হইতে তিনটি বিষয়বস্তুর নির্দেশ পাওয়া যায়, অন্নদামঙ্গল, ধনপতি সদাগরের কাহিনী ও বিজয় সিংহের সিংহল-বিজয়। মেঘনাদবধ কাব্যেও একবার লঙ্কা বা সিংহল সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন। দেখা যাইতেছে, মাইকেলের সিংহলের প্রতি একটা অন্ধ আকর্ষণ ছিল। ইহা কি একেবারেই অকারণ? সমুদ্রপারবর্তী ঐশ্ব্যময় ক্ষুদ্র সিংহল দ্বীপ কি তাহার মগ্নচৈতন্যলোকে সমুদ্রপারবর্তী সম্পদের লীলাভূমি আর একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের কোনো অহরণ ধনিত করিত না? কে বলিতে পারে? সম্ভবত তিনি ধনপতি সদাগরের সিংহলযাত্রা কিংবা বিজয় সিংহের সিংহলজয় বৃত্তান্ত লইয়া কাব্য রচনা করিতেন, এ ক্ষেত্রে সমুদ্র ও সিংহল তাহার কবিচিত্তকে আকর্ষণ করিত। অন্নদামঙ্গল কাহিনী লইয়াও কাব্য রচনা অসম্ভব ছিল না। পূর্বগামী বঙ্গীয় কবিদের মধ্যে এক ভারতচন্দ্রকেই তিনি স্বাক্ষররূপ মনে করিতেন। রুত্তিবাস কাশীদাস বড়, কিন্তু তাহার বাস বাম্ণীকির পদাঙ্কানুসরণ

করিয়া লোকোত্তর, তাঁহাদের মধ্যে লৌকিক কবিদের তুলনা চলে না। লৌকিক কবিদের মধ্যে ভারতচন্দ্র শ্রেষ্ঠ। লোকেও তাঁহাকে ভারতচন্দ্রের সঙ্গেই তুলনা করিত। মেঘনাদবধ প্রকাশের পরে বিজ্ঞাসাগর-মহাশয় বলিয়াছিলেন, তুমি খুব করিয়াছ, কিন্তু ভারতচন্দ্রকে ছাড়াইতে পারিয়াছ মনে হয় না। যিনি কালিদাসের সমকক্ষ হইবার আকাঙ্ক্ষা রাখেন, বলা বাহুল্য, তাঁহার কাছে একথা মুখরোচক হয় নাই। কবির নিজের কল্পনাতেও ভারতচন্দ্রের স্মৃতি বারংবার জাগিয়া উঠিত। একদিন তিনি ও কৃষ্ণনগরের রাজা একসঙ্গে যাইতেছিলেন, হঠাৎ মধুসূদন বলিয়া উঠিলেন, আমি কল্পনায় দেখিতেছি কৃষ্ণচন্দ্রের পিছনে ভারতচন্দ্র চলিয়াছেন। ভারতচন্দ্রের এই স্মৃতি তাঁহাকে টানিত। সে-টান ঈর্ষার নহে, কারণ মধুসূদন জীবনে ও সাহিত্যে ঈর্ষ্যা কাহাকে বলে জানিতেন না। এই আকর্ষণকে স্বস্ত্র ও অহরূপ মনের প্রতিযোগিতার আত্মবল বলা যাইতে পারে। এহেন ভারতচন্দ্রের কাব্যের বিষয়বস্তু লইয়া তিনিও যে একখানি কাব্য লিখিবেন, তাহাতে বিশ্বয়ের এমন কি আছে ?

(গ)

এই পর্য্যায়ের সনেটগুলির মূলে দেশের স্মৃতি। দেশে থাকিতে বিদেশে কিরূপে তাঁহাকে টানিয়া ছিল, তাহা দেখিয়াছি। এবারে বিদেশে গিয়া দেশের প্রতি টান। বিদেশে গেলে অনেককেই দেশ টানিয়া থাকে, কিন্তু মাইকেল দেশে থাকিতেও খানিকটা পরিমাণে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। ধর্মমতে তিনি খৃষ্টান, কিন্তু তাঁহার কাব্যবস্তু হিন্দু-জীবন ও ঐতিহ্য; এই দুটির মাঝে একটি বিচ্ছেদের অবকাশ। বিদেশে

গিয়া এই বিচ্ছেদ বড় করণ ভাবে তাঁহার চোখে পড়িয়াছে। এই দ্বিধার স্বিত্ত, দেশ ও হিন্দুজীবন, তাঁহার অনেকগুলি সনেটে বৈচিত্র্য দান করিয়াছে। কপোতাক্ষ নদ, নিশাকালে নদীতীরে বটবৃক্ষমূলে শিবমন্দির, নদীতীরে প্রাচীন দ্বাদশমন্দির প্রভৃতিতে বিচ্ছিন্ন দেশের স্মৃতি। আবার, শ্রীপঞ্চমী, আশ্বিন মাস, বিজয়া দশমী, কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা প্রভৃতি সনেটে বিচ্ছিন্ন হিন্দুজীবনের (যে হিন্দুজীবন তাঁহার কাব্যের উপজীব্য) আকর্ষণ। মাইকেল খৃষ্টান হইলেও তাঁহার কবিপ্রকৃতি প্রকৃত কাব্যসামগ্রীর দিকে তাঁহাকে সবলে টানিয়া রাখিয়াছে; সেইজন্য নানা বাধা সত্ত্বেও তাঁহাকে কখনো কাব্যসামগ্রীর অভাবে, বা 'ফুলে, দ্বিধাগ্রস্ত হইতে দেখা যায় না।

(ঘ)

বিবিধ পর্য্যায়ের সনেটগুলির মধ্যে দুইটি, ভারতভূমি ও আমরা। এছাড়া দেশপ্রেমের কবিতা। প্রাচীন ভারতের জ্ঞান গৌরব, আধুনিক ভারতের দুর্দশার জ্ঞান দুঃখ, ভারতভূমির দুরবস্থার জ্ঞান আক্ষেপ।

অন্য কয়েকটি সনেটে কবির ব্যক্তিগত জীবনের নৈরাশ্র ও ব্যর্থতার বিলাপ। তিনি বিলাতবাসীর পূর্বে বায়রনের অহঙ্করণে 'রেখে মা দাসের মনে' বিখ্যাত কবিতাটি লিখিয়াছিলেন। ইহার প্রারম্ভে বায়রনের "My Native Land good night" ছত্রটি উদ্ধৃত। মাইকেলের মধ্যে snobbery ও নিষ্ঠা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। না তাহার অপেক্ষা বেশি; তাহা তাঁহার আন্তরিক নিষ্ঠা। এই নিষ্ঠা এতই প্রবল যে snobberyতে যে ভাবের জন্ম, নিষ্ঠার প্রভাবে কবির

অজ্ঞাতসারে তাহার প্রকাশ অসামাজ্যতা লাভ করিয়াছে। এই কবিতা ও আত্মবিলাপে যে আক্ষেপের স্বর, এই সনেটগুলিতেও তাহাই ধ্বনিত।

‘কোনো এক পুস্তকের ভূমিকা পড়িয়া’ শীর্ষক সনেটে তিনি বলিয়াছেন,—

“চাঁড়ালের হাত দিয়া পোড়াও পুস্তকে,”—ইচ্ছা করে এই সনেটটি আধুনিক সরস্বতীর মন্দিরদ্বারে খোদিত করিয়া দিই। কিন্তু বোধহয় একটু বাধা আছে, আজকালকার সাহিত্যিকরা সেই ভণ্ড গায়ে মাখিয়া সগৌরবে সাহিত্যিক-সহীদ হইয়া উঠিবেন। আর ভণ্ড মাখিলে যে চেলাব অভাব আমাদের দেশে হয় না, ইহা তো প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করিতেছি।

মাইকেলের জীবনে যে অসংখ্য ছিল সাহিত্যে তাহার কোনো চিহ্ন নাই। সেইজন্যই তাহার কবিপ্রকৃতি এত বিশ্ব উত্তীর্ণ হইয়াও বাড়িতে পারিয়াছিল। তাহার সাংসারিক জীবনে snobbery প্রচুর ছিল, কিন্তু ঘে-অস্থঃপূরে কবিপ্রকৃতি লালিত হয়, সেখানে এ সকলের প্রবেশ ছিল না। কখনো-কখনো যে ইহারা দ্বারে আসিয়া অনধিকার-প্রবেশের চেষ্টা করে নাই, তাহা নহে, তবে তাহা লক্ষণ ও বিজীযণের মত ছদ্মবেশে আসিয়াছে। সেখানে তাহার কবিপ্রকৃতি আহত-যজ্ঞ মেঘনাদের মত অজ্ঞেয়, মুহূর্তের মধ্যে তাহাদিগকে সবলে বহিস্কার করিয়া দিয়াছে। কাবোর এই অমোঘ নিয়মশৃঙ্খলা মাইকেলের প্রতি-সনেটে দৃষ্ট হয়। নিয়মের এই অমোঘতা পরবর্তী কবিদের হাতে অনেক পরিমাণে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কোনোরকমে চৌদ্দটা ছত্র জোড়া দিলেই আজকাল সনেট হয়। কিন্তু মাইকেল জীবনে যাহাই করুন, সাহিত্যে জোড়া-তাড়ার পক্ষপাতী ছিলেন না। সে হিসাবেও, মাইকেলের কবিজীবনের শৃঙ্খলা ও নিষ্ঠার হিসাবে, এই সনেটগুলি বিশেষ মূল্যবান। আমরা

পূর্বে বলিয়াছি, সাহিত্য-জীবন বা তাহার ছায়া নহে, সাহিত্য না-জীবন, অর্থাৎ জীবনে যাহা ঘটে না, সাহিত্যে তাহার ঘটনা। মাইকেলের জীবনে যে নিষ্ঠা ও নিয়মচর্যাজাত শাস্তি কাম্য ছিল, এই অমোঘ শৃঙ্খলিত পরিণত সনেটগুলিতে তাহাই রূপ পাইয়াছে।*

* তথাগুলি নগেন্দ্রনাথ সোমের মধুসূতি ও যোগীনাথ বহুর মাইকেল মধুসূদন বসুর জীবন চরিত হইতে সংগৃহীত।

“সেণ্টিমেন্ট”

(প্রতিবাদ নহে, প্রতিক্রিয়া)

আমি নারী। সত্যই নারী এবং আমিও (ভূতপূর্ব) মিস ব্যানার্জি! বিগত পৌষসংখ্যা শনিবারের চিঠিতে ‘সেণ্টিমেন্ট’ নামক নিবন্ধটি পাঠ করিয়া আমার প্রথম কথা যাহা মনে হইয়াছে তাহা এই যে শ্রীমতী তপতী দেবী (নিবন্ধের লেখিকা) কোন ছদ্মবেশী পুরুষ। আজকাল প্রায়ই দেখিতে পাই, স্ত্রীনারীর ছদ্মবেশে বহু পুরুষ-লেখক মাসিকসাহিত্যের আসরে প্রবেশলাভ করিতেছেন। ট্রামে, বাসে, ট্রেনে স্ত্রীলোকদিগকে সর্বাগ্রে স্থান করিয়া দিবার আগ্রহ অনেক ভ্রলোকের মনে জাগে। ফরসা-কাপড়-চোপড় পরিহিতা কোন স্ত্রীলোক দেখিলেই তাহারা সমস্তমুখে আসন ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়ান। এই মনোভাবের সুযোগ লইয়া, আশঙ্কা করিতেছি, অনেক পুরুষও এইবার হয়ত স্ত্রীলোক সাজিয়া ট্রামে বাসে চড়িবেন কিম্বা চড়িতেছেন।

‘আজকাল ‘মেক আপ’-এর যুগ। যে-কোন পুরুষ অনায়াসেই স্ত্রীলোক সাজিয়া ভীড়ের মধ্যে স্থান করিয়া লইতে পারেন—সাহিত্যের বাজারে যেমন অহরহ করিতেছেন। ‘অনিলা দেবী’র ছদ্মবেশে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কেও সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। তাঁহার গোফ-দাড়ী পরে দেখা গেল।

শ্রীমতী তপতী দেবী যে পুরুষমাছুষ এ সংক্ষে আমার নিঃসন্দেহ হইবার কারণ এই যে আমার দারণা, এ দেশের কোন স্ত্রীলোকই এমন ভাবে লিখিতে পারেন না। এমন তীব্রভাবে পুরুষমাছুষকে সাহিত্যিক ব্যঙ্গ করার ক্ষমতা কোন স্ত্রীলোকের আছে বলিয়া বিশ্বাস করি না। আমরা পুরুষদের আঘাত করি। কিন্তু সে অস্ত্র-উপায়ে। সমাজনী, চোখের জল, আত্মহত্যা, পলায়ন—এইগুলিই অত্যাধিক কোন-না-কোন আকারে আমরা পুরুষদের বিরুদ্ধে অস্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করিতেছি। এরকম সাহিত্যিক ব্যঙ্গ করা আমাদের সাধ্যাতীত। এত কথা বলিতে পারিতেছি তাহার কারণ, আমি নিজে নারী কিনা—আমাদের আসল রূপ আমরাই ভাল জানি। স্তত্রাং আমাকে ঠকান শক্ত।

‘আমি ছদ্মবেশী তপতী দেবীকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই—ভগিনী, এতই যদি তোমার কলমের জোব, এতদিন লুকাইয়া ছিলে কি করিয়া? পুরুষমাছুষেরা যে পাখও তাহা ত কলমের জোরে প্রমাণ করিয়াছ। কিন্তু তাহা পত্রস্থ করিতে পুরুষ সম্পাদকেরই দ্বারস্থ হইলে কোন লজ্জায়? সম্পাদকমহাশয় পুরুষ মাছুষ। তিনি নিজেদের সংক্ষে এই কঠোর গালাগালিগুলি ছাপিয়া সেক্টিমেণ্টেরই পরিচয় দিয়াছেন স্বীকার করি। কিন্তু সে ‘সেক্টিমেণ্ট’ কি জাতীয় তাহা কি তলাইয়া দেখিয়াছ? “মেয়ে মাছুষ” ভারি দুর্বল—বেশীক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিলে তাহার পা টনটন করে—আহা তাহাকে বসিতে দাও!” এই অচ্যুত-বর্ণনের মধ্যে

কতখানি তীব্র ব্যঙ্গ নিহিত আছে তাহা যদি বুঝিয়া দেখিতে! আমরা ‘শিভাল্‌রি’ দেখিলেই তন্ময় হইয়া পড়ি এবং মনে মনে ‘Shiva ও chivalry, আকাঙ্ক্ষা করি। এই আকাঙ্ক্ষা করিয়াই যদি ক্ষান্ত হইতাম—তাহা হইলে কিছু বলিবার থাকিত না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমরা পুরুষদের সমকক্ষতাও আকাঙ্ক্ষা করি। আদা এবং কাচকলার সমন্বয় নিশ্চয়ই হান্তকর।

আমরা মনে মনে বর্ষের পুরুষের সোহাগ ও অচ্যুতপ্রার্থী। একথা স্বীকার করিবে কি? স্তত্রাং পুরুষরা স্নেহলতার মৃত্যুতে উজ্জ্বলের বজা বহাইয়া দিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? আমরা যে সেই বজায় ভাসিতে চাই বলিয়াই বজা আসে। আধুনিক যে-সব উপজাস ও সিনেমায়া পুরুষের পাশবিক মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে ও পাইতেছে তাহার মূলে আমাদের কিঞ্চিৎ চাহিদা আছে। যে-সব কুংসিত সেক্টিমেণ্টের জন্ত পুরুষকে দায়ী করিয়াছ, তাহার প্রেরণা তাহারা আমাদের নিকট হইতেই পায়। জৈবিক নিয়ম অমুসারে পুরুষেরা স্ত্রীলোকদিগের সম্বন্ধি-বিধান করিতে বাধ্য। যাহাদের আমরা নিম্নস্তরের জীব বলি—অর্থাৎ গোন্ধ, ভেড়া, ছাগল, পাখী ইত্যাদি—ইহাদের সে বিষয় একটা বাধাদান দরশ আছে, তাহাই তাহারা চিরকাল পালন করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু মাছুষ উচ্চতম স্তরের জীব। মহাশয়সমাজে সেই কারণেই বোধহয় এক-যেয়ে কিছু চলে না। বহু সহস্র বৎসর পূর্বে পুরুষ যে-সব আচরণ করিলে স্ত্রীলোকেরা খুশী থাকিতেন সে-সব আচরণ এমুণে অচল। স্তত্রাং তাহারা এমুণে নিম্নলিখিত জিনিষগুলির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিজেদের হান্তকর করিয়া তুলিতেছে—

(১) কাপড় ও কলম

(২) রং ও তুলি

- (৩) সিনেমা
- (৪) ছাটা গৌফ
- (৫) জুলফি
- (৬) বাবরি
- (৭) ৪৮" বহরের কাপড়
- (৮) কাছা ও কৌচার মারপাচ
- (৯) কৃত্রিম কণ্ঠস্বর
- (১০) গান

কিন্তু আসলে তাহারা জৈবিক-নিয়মামুসারে আমাদেরই খুশী করিতে চাহিতেছে। কেবল পারিয়া উঠিতেছে না। সেজন্য আমার মনে হয়, পুরুষদের এবস্থিৎ আচরণ পরিবর্তন করিতে হইলে আমাদের উচিত, আমাদের চাহিদার একটা আভাস পুরুষদের দেওয়া, কারণ পুরুষেরা আমাদেরই খুশী করিবার জন্য পাগল। কি ভাবে কি করিলে আমরা খুশী হইব তাহা বেচারারা বুদ্ধিতে পারিতেছে না। আঁকু-পাকু করিতেছে মাত্র। হয়ত ভিক্টোরিয়া যুগের মহিলাগণ এই-জাতীয় উচ্চাঙ্গ ও অল্পকম্পাবরণে খুশী হইতেন তাই পুরুষেরা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া সোমসাহে তাহাই করিয়া চলিতেছেন—কিন্তু তোমার নিবন্ধটি পাঠ করিয়া বুঝিলাম আমাদের চাহিদা বদলাইয়াছে। পুরুষদের সেটি জ্ঞানান দরকার। কিন্তু ইহাও তোমাকে জ্ঞানান দরকার যে আজ পর্যন্ত স্ত্রীজাতিরা ঠিক কি চায় তাহা পুরুষদের ভাঙিয়া বলে নাই। বহুবার আয়োজন করিয়াছে মাত্র। ভগিনী, তোমার লেখার হাত আছে—তুমি পুরুষদের গালাগালি না দিয়া সেই আয়োজনই কর।

বেলা প্রায় চারিটা বাজে। ওর আপিস হইতে ফিরিবার সময় হইল। এক গোছা পরোটা করিতে হইবে।—স্বতরাং এইবার থামি।

শ্রীলীলাবতী দেবী

দুপুরে

মাথা পালি, খাতা পালি, যা' তা পালি ভাবি অনর্থক,
মাথামুণ্ডহীন যত ছন্দোহীন কবন্ধ আবেগ;
দূরে ভোবাটার ধারে বসে আছে দু'চারিটি বক,
পশ্চিম-আকাশে আছে শু'পাকারে ধানিকটা মেঘ।

সহসা দেখিছ চেয়ে, সাড়া-শব্দ নাই ঘড়িটার,
দম দিতে তুলিয়াছি!—উঠানেতে গজায়েছে ঘাস,
কাগজে যুদ্ধের কথা ভাল মোটে লাগেনাক' আর,
পথ দিয়া চলিয়াছে পরিপূর্ণ একগাড়ী বাঁশ।

আকাশে উড়িছে ঘুড়ি, পাড়েজি পড়িছে রামায়ণ,
তুলসীদাসের দৌহা পশিতেছে অলস করণে,
কস্তুর বিবাহ দিব,—কিছুতেই জুটিছে না পণ,
সেই কথা মাঝে মাঝে ভাবিতেছি নানান ধরণে!

কীটস ও শেলির কথা অকারণে যাইতেছে মিশে,
চাল-ভাল-ধোপা-দুধ অহুতের সমস্তার সাথে—
'পলিসি' করেছে 'ল্যাপ্স'!—বুঝি না যে শান্তি পাই কিসে,
ও বাড়ীর মেয়েটিও দেখিতেছি উঠিয়াছে ছাতে।

জানালা করিয়া বন্ধ পুন আসি করিছ শয়ন,
ভাবিছ আবার মনে, জানালাটা বন্ধ-করা মিছে;

উঠিয়া খুলিয়া দিয়া দেখিলাম তুলিয়া নয়ন,
ছাতের মেয়েটি নাই,—হয়ত নামিয়া গেছে নীচে।

গৃহিণী বাপের বাড়ী—হাই তুলি' তিন চার বার
প্রবন্ধ লিখিব বসি—“বাঙালীর যৌথ কারবার।”
“বনফুল”

সনাতনপুরের অধিবাসীবৃন্দ

[এক]

প্রবীণ মোক্তার শৈলেশ্বরবাবু হঠাৎ নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছেন। ইহাই যথেষ্ট উত্তেজনার কারণ। খবরের কাগজে ছবি ছাপাইয়া, সভা-সমিতি করিয়া, কবিতা লিখাইয়া, সর্ববিধ উপায়ে সনাতনপুরের অধিবাসীবৃন্দ অন্যায়সে তাহাদের উত্তেজনা প্রকাশ করিতে পারিত। কিন্তু তাহাদের বর্তমানে এ-সব কিছুই করিবার উপায় নাই। নিরুপায় হইয়া তাহারা শুধু ফুস-ফুস গুজ-গুজ করিতেছে মাত্র। কারণ আর কিছুই নহে—গ্রাম্য নারী ধোপানিটিও সঙ্গে-সঙ্গে অস্তহিতা হইয়াছে।

বাহারা প্রবীণ এবং শৈলেশ্বরের হিতৈষী তাহারা বাহিরে কথাটাকে সাধামত চাপা দিবার চেষ্টা করিতেছেন। হালদার-মহাশয় সর্বত্র প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন, শৈলেশ্বর একটা মোকদ্দমার তথ্য করিতে খুলনা গিয়াছেন। বাইবার সময় তাহার সহিত দেখা হইয়াছিল।

কথাটা সর্বৈব মিথ্যা, যদিও প্রবীণ হালদার-মহাশয় প্রবলভাবে ইহা প্রচার করিতেছেন। এই হালদার-মহাশয়ের সহিতই কিন্তু আবার যখন প্রবীণ ভাড়াডী-মহাশয়ের সাক্ষাৎকার ঘটিল তখন হালদার-মহাশয় নিম্নপরে বলিলেন, “ছি-ছি, শৈলেশ কি কেলঙ্কারিটাই করলে। রাম রাম!”

এতৎপ্রসঙ্গে ভাড়াডী-মহাশয় য-কলা আকার ব্যবহার করিয়া ঘৃণা-প্রকাশের দরগটা অধিকতর মন্থাস্তিক করিয়া বলিলেন,—আরে ছা-ছা-ছা-ছা—!”

পরমুহুর্তেই কিন্তু ভাড়াডী সেংসায়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আচ্ছা, কোন ধোপানিটা বলত হে।”

দেখা গেল, হালদার-মহাশয় বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানেন। তিনি উক্ত রজকিনীর আবাস-স্থান, চেহারা, বয়স এবং স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়া উপসংহারে বলিলেন, “শৈলেশ যে ভেতরে-ভেতরে এতখানি জড়িয়ে পড়েছে কে জানত? অত বড় ছেলে, অত বড় মেয়ে—”

ভাড়াডী-মহাশয় শুধু বলিলেন, “ছা-ছা! লোক হাসালে!”

ধোঁড়া মল্লিক-মহাশয় কৌশলে খবর সংগ্রহ করিলেন যে গ্রাম্য ধোপানি পলাইবার আগের দিন তাহার স্বামী পিরু-ধোপার নিকট মার বাইয়াছিল। মল্লিক-মহাশয় শৈলেশ্বরের হিতাকাঙ্ক্ষী। তিনি পিরু-ধোপাকে বলিলেন, “কথাটা আর কারো কাছে প্রকাশ করিস নি, বুকলি?”

বিস্মিত পিরু জিজ্ঞাসা করিল, “কোন কথাটা?” মল্লিক-মহাশয় খতমত খাইয়া কোন সহজত্তর দিতে না পারিয়া ধোঁড়াইতে ধোঁড়াইতে নিজের দলের মধ্যে ফিরিয়া গিয়া পিরু-ঘটিত ব্যাপার প্রকাশ করিলেন।

করিবামাত্র সকলে মিলিয়া মল্লিককেই বকিতে লাগিলেন!—কেন সে পিরু-দোপার নিকট গিয়াছিল? এ কি আশাশ্রমিক!

সুতরাং মল্লিক-মহাশয়ের এই কাচা কাজটি সামলাইতে পাকাবুদ্ধি মুকুঞ্জো-মহাশয়কে অত্যন্তরূপে হইয়া পিরুর বাড়ীতে যাইতে হইল এবং নিরীহ মল্লিকের নামে মিথ্যা দোষারোপ করিয়া বলিতে হইল, “মল্লিকের কথায় কিছু মনে করিসনি। সিদ্ধির ঝোঁকে যা-তা বলেছে!”

এবারও বিস্মিত পিরু কহিল, “মানে? কি বলেছেন?” মুকুঞ্জো দাঁত বাহির করিয়া বলিলেন, “মানে? ও কিছু নয়! বুঝলি?” বলিয়া তিনি সরিয়া পড়িলেন এবং নিজের দলে আসিয়া সংবাদ দিলেন, “পিরু একেবারে ক্ষেপে আছে হে! মল্লিক একেবারে সাপের ঘাড়ের পা দিয়েছে!”

তখন সকলে চটয়া মল্লিকের উপর খড়গহস্ত! বেচারি মল্লিক দলছাড়া হইয়া একা একা ঘুরিতে লাগিলেন। পিরুর দল দূর হইতে মল্লিককে যখনই দেখিল, তখনই ভাবিল এবং হাসিল—মল্লিক-মহাশয় আজকাল সিদ্ধি পাইতেছেন!

যাই হোক শৈলেশ্বরবাবুর বন্ধুবর্গ—মিত্র, হালদার, মুকুঞ্জো প্রভৃতি প্রবীণ মহাশয়গণ একজোট হইয়া একবাক্যে শৈলেশ্বরবাবুর খুলনা-গমন সমর্থন করিতে লাগিলেন। ভিতরে-ভিতরে অবশ্য ভাড়া হইলেন কৌতুহলী, মুকুঞ্জো উত্তেজিত, হালদার বিস্মিত এবং মল্লিক ক্ষুব্ধ!

ইহা হইল শৈলেশ্বরের হিতৈষীবর্গের মনোভাব। কিন্তু সনাতনপুর গ্রামটি নেহাৎ ছোট নয়। অনেকগুলি বনিয়াদি ভদ্রপুংহস্তের সেখানে বসবাস। গোটা-দুই চত্বরীমণ্ডপ সেখানে আছে। সুতরাং শৈলেশ্বরবাবুর বিপক্ষদলও একটি ছিল, এবং যেহেতু শৈলেশ্বরবাবু বড়লোক, পরোপকারী, কর্মনিষ্ঠ এবং সত্যবাদী ছিলেন, সেই হেতু তাঁহার বিপক্ষ-

দলটি বেশ ভারিও ছিল। তাহার স্বযোগ পাইলেন। শৈলেশ্বর-বন্ধকিনী-প্রসঙ্গটা তাহার বেশ-একটু রঙ চড়াইয়া বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

একজন আসিয়া খবর দিল, “হালদার-মশাই বলে বেড়াচ্ছেন যে শৈলেশ্বরবাবু নাকি খুলনা গেছেন!”

হঁকাতে দুইটি টান মারিয়া রায়-মহাশয় বলিলেন, “হালদারকে বলে দিও হে স্বধা আজকাল পশ্চিমেই ওঠে—তা আমরা সবাই জানি! বত সব—”

মাথা নাড়িয়া মুচকি হাসিয়া লাহিড়ী বলিলেন—“আহা চট কেন! একথা হালদার বলবে না তা কে বলবে বল। ওই দলটার সব কটা পাজী। বুড়া মিত্রেরটা সেদিন দেখি লুকিয়ে তাড়ি খেয়ে ফিরছে। উনি যাবার মাষ্টারি করেন!”

“ভাড়াইই বা কি কম! রোজ ওর ময়নাদীঘির ধারে বেড়াতে যাওয়াটার অর্থ কি?”

বৃদ্ধ গোস্বামী-মহাশয় এতক্ষণ কিছু বলেন নাই।

তিনি এইবার সংক্ষেপে বলিলেন,—“সব ঘুষু!”

“পাড়-ঘুঘুটি এইবার ফাদে পড়েছেন!” এই বলিয়া রায়-মহাশয় হঁকাটি গোস্বামীর হস্তে দিলেন।

[দুই]

ফলে অচিরকাল মধ্যে শৈলেশ্বরবাবুকে কেন্দ্র করিয়া ভাড়াই-মহাশয়ের বিরুদ্ধে রায়-মহাশয়, রায়-মহাশয়ের বিরুদ্ধে মুকুঞ্জো-মহাশয়, মুকুঞ্জো-মহাশয়ের বিরুদ্ধে গাঙ্গুলি-মহাশয় উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়া

গেলেন। শৈলেশ্বরবাবুর সম্পর্কে অসম্ভব-রকম সব গুজব রটিতে লাগিল। অধিকাংশ লোকের মতে তিনি কলিকাতায় গিয়াছেন। কিন্তু এই কলিকাতা-সম্পর্কিত মতবাদের বিরুদ্ধে আর একটি জনমত জন্মঃ গঠিত হইতেছিল। তাহা এই যে ট্রেনে করিয়া তিনি কোথাও যান নাই—কারণ স্টেশনের কর্মচারীরা কেহ তাঁহাকে ট্রেনে যাইতে দেখেন নাই। স্বতরাং তিনি পদ্মভেই কোথাও গিয়া স-রজকিনী আশ্বগোপন করিতেছেন! একজন প্রত্যক্ষদর্শী জোর-গলায় বলিতে লাগিলেন, “আমি স্বচক্ষে দেখেছি, শৈলেশ্বরবাবু ধোপানিটাকে কাঁধে তুলে নিয়ে মাঠমাঠি দৌড়ছেন!”

[তিন]

শৈলেশ্বরবাবুর পত্নী সপুত্রকন্যা পিত্রাণ্ডে গিয়াছিলেন। শৈলেশ্বরবাবুর পলায়নের গুজবটা এত ব্যাপকভাবে রটিয়াছিল যে ভীত-চকিত শৈলেশ্বর-গৃহিণী স্বয়ং একদিন আসিয়া উপস্থিত হইলেন! আসিয়া কিন্তু তিনি আরও অকুল পাথারে পড়িলেন। তাহার সমবয়স্ক গৃহিণীগণ বেশ রসান দিয়া নানা কথা তাঁহাকে শুনাইল। কেহ কহিল, “ওমা কি ঘেমার কথা, শুনে লজ্জায় বাঁচি না—!” বলিয়া গালে হাত দিল এবং মাড় কাৎ করিল।

গাঙ্গুলী-গৃহিণী বলিলেন, “পুরুষমাহুষকে কিছু বিশ্বাস নেই বোন, কিছু বিশ্বাস নেই!—একবার চোখের আড়াল হয়েছে কি বাস!” হালদার-গৃহিণী একটু সহানুভূতির স্বর দিয়া বলিলেন, “উনিও বলছিলেন শৈলেশ্বরবাবু খুলা গেছেন—”

মুখোপাধ্যায়-গৃহিণী স্বাক্ষর দিয়া বলিলেন, “ধাম লো ধাম! আমার

কস্তাটিও ওই দলে! সব চোরে-চোরে মাস্ততো ভাই! বলে দিয়েছি এবার পট করে যে ওদব দলে আর মিশতে পাবে না। থাকে-দাবে রাম্মাঘরের দাওয়াটিতে চূপ করে বসে থাকবে। বুড়ো মিনঘের অত আড্ডা দেওয়া কেন?”

মুখোপাধ্যায়-গৃহিণীর ফাদি-নথ ঘন-ঘন আন্দোলিত হইতে লাগিল। মরীয়া হইয়া শৈলেশ্বরবাবুর স্ত্রী বলিলেন, “কোনদিন কিন্তু ওঁকে শ্রামা-ধোপানির সংসর্বে দেখিনি। আমাদের কাপড় ধোয় ছিঁকু ধোপা। শ্রামা ত কোনদিন আসেও নি আমাদের বাড়ী!—”

মুখোপাধ্যায়-গৃহিণী বলিয়া উঠিলেন, “এই বুদ্ধি নাহলে তোমার স্বামী যাবে কেন বোন! তারা যা করবে তা কি তোমাকে সাক্ষী রেখে করবে না কি? শৈলেশ্বরবাবু হলেন একটা ঘাগি মোজার! তার সঙ্গে চালাকি! পুরুষমাহুষদের বেশে রাখবার একমাত্র উপায় হচ্ছে—নজরবন্দী করে রাখা। চোখে-চোখে রাখা। বা বল্লেন আমাদের গাঙ্গুলিদিদি; চোখের আড়াল হয়েছে কি বাস!”

[চার]

শৈলেশ্বরবাবুর ছই পুত্র মাধব ও যাদব। মাধব বি. এ. পাস করিয়াছে। যাদব আই. এ. পড়িতেছে। তাহারা পূজনীয় পিতার সম্পর্কে এই দুঃপনয়ে কলঙ্কের কথা শুনিয়া নির্দ্বাক হইয়া গেল। কি করিবে! তাহাদের বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যেও সকলে নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করিতেছিল যে শৈলেশ্বরবাবু প্রকৃতই একটি বুনা-ভণ্ড—এতদিনে দিবালোকে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যেও অবশ্য কয়েকজন ছোঁকরা মাধব ও যাদবের পক্ষ অবলম্বন করিল এবং মৌখিক সহানুভূতি

জানাইতে লাগিল। এদিকে বৃদ্ধদের দুই পক্ষের মধ্যে ব্যাপার অনেকদূর গড়াইয়াছিল। হালদার-মহাশয়ের উপর ধনী রায়-মহাশয় এতদূর চটিয়াছিলেন যে তিনি তাঁহার নামে ডাব-চুরির অপবাদ দিয়া নালিশ ঠুকিয়া দিয়াছেন। ভাতুড়ী-মহাশয় মাণিক পোদ্দারের নিকট হাওনেট লিখিয়া কিছু টাকা লইয়াছিলেন, গাঙ্গুলি-মহাশয়ের উস্কানিতে পোদ্দারের পো ভাতুড়ী-মহাশয়কে চাপ দিতে স্বরূপ করিয়াছে। মল্লিক-মহাশয় হোমিওপ্যাথি ডাক্তারি করেন। তিনি বিপক্ষদের কাহারো বাড়ী আর চিকিৎসা করিবেন না বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন। ফলে গোস্বামী-মহাশয় কলিকাতা হইতে “সরল হোমিওপ্যাথি শিক্ষা” নামক পুস্তক ক্রয় করিয়া হোমিওপ্যাথি শিখিতে লাগিয়া গিয়াছেন।

শৈলেশ্বরবাবুর নামে দুই-চারি থানি চিঠি আসিয়াছিল। চিঠিগুলি ফি করিয়া বিপক্ষদের হস্তগত হইল। এই ব্যাপারে ক্ষেপিয়া স্বদের কয়েকজন পাণ্ডা, স্থানীয় পোষ্টমাষ্টারের বিরুদ্ধে এক প্রকাণ্ড দরখাস্ত দিয়া ফেলিলেন।

পোষ্টমাষ্টার বেচারি এই আকস্মিক বিপদে সকলের দ্বারস্থ হইয়া ব্যাপারটা মিটাইয়া ফেলিবার জন্ত সকাহতরে অহরোধ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। গ্রামের উকিল আশুবাৰু, টেবিল চাপড়াইয়া তাঁহাকে বলিয়া দিলেন—“Everything is fair in love and fight। শেষ পর্যন্ত লড়ে দেখব—তবে ছাড়ব।”

[পাচ]

সনাতনপুরে ঘোর চাঞ্চল্য। সকলেরই রসনা সবেগে চলিতেছে। এমন-সময় গ্রামে দুইটি ঘটনা ঘটিল।

—হঠাৎ শ্রামা দোপনি কোথা হইতে ফিরিয়া আসিল। সে নাকি মামার বাড়ী গিয়াছিল। দেখা গেল, পিরুর সহিত তাহার কোন কলহ নাই। দুইজনে গাধার পিঠে মোট চাপাইয়া বেশ স্বচ্ছন্দে ঘোরা-ফেরা করিতে লাগিল—যেন কিছুই হয় নাই। প্রবীণের দল প্রথমটা হতভম্ব হইয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। তাহার পর অবশ্য তাহারা ব্যাপারটা বুঝিয়া ফেলিলেন, “ভুতের কাছে মামদোবাজী! মামার বাড়ী! পিরু-ব্যাটা টাকা খেয়েছে নিশ্চয়। মাধব ছেলেটা ঘড়েল আছে ত!”

শৈলেশ্বর-মোক্তার আর ফিরিলেন না। কারণ, তিনি মারা গিয়াছিলেন। প্রেমে পড়িয়া নয়—কুপে পড়িয়া। গ্রামেই একটা অব্যবহৃত এঁদো মেড়া কুয়া ছিল। তাহারই ভিতর হইতে তাঁহার গলিত শবদেহটা কিছুদিন পরে বাহির হইল।

মল্লিক-মহাশয় আবিষ্কার করিলেন।

“বনফুল”

নৃত্যময়ী

প্রথম দৃশ্য

হুকুমারের বসিবার ঘর

তাহার বামধক্ষায় একটী এসরাজ, দক্ষিণ হস্তে ছড়টি ধরিয়া

বিধর ভাবে সে বসিয়া আছে।

হুকুমার। না, লয়-জ্ঞান আমার এ জন্মে হ'ল না! আজ পাঁচবছর-
কাল ধরে ঘসছি, একটা গুণও তাতে বাজাতে পারলাম না!
ওস্তাদজী বলে দিয়েছিলেন, পায়ে তাল দিয়ে আগে স্বরটা মুখে
ভেঁজে নেবে, এই ত বেহাগ গংটা :—

	।	॥	।	।		।	॥	।	।		+
নি	সা	গা	মা	পা	নিধা	নি	সা				

হর করিয়া পায়ে তাল দিবার বার্ষ চেষ্টা

হরের দিকে নজর দিলেই পা থামল, আর পায়ের দিকে
লোক দিলেই স্বর কসকাল!

বিরক্তভাবে ছড়টি নিক্ষেপ করিয়া

কি দরকার ছিল বাবা এত হাঙ্গামা করবার! কেন,
স্বর জিনিষটা কি অসীম নয়? তবে কেন তাকে তাল দিয়ে
বেধে মারবার চেষ্টা?

উদ্ভ্রাণ পড়িয়া অস্থিরভাবে পাদচারণা

না, আমার প্রাণ যেন খাবি-খেয়ে উঠছে, স্বরকে আমি সীমার
মধ্যে মরতে দেব না! তার চিরন্তনী আর্গুনাদ আমাকে আবুল

করে তুলছে—ডুগি-তবলার পিঁজরা ভেঙে আমি তাকে বার করে
আনব, এনে তাকে আমার হৃদয়ের হৃন্দরবনে ছেঁড়ে দেব, সে
ইচ্ছামত চরে বেড়াবে।

হুকুমারের কনিষ্ঠা ভগিনী ফোর্প-ইয়ারের ছাত্রী কালিন্দীর প্রবেশ

কালিন্দী। দাদা, এখন তোমার কোনো কাজ আছে?

হুকুমার করণ ভাবে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল

কালিন্দী। একেবারে ভাব লেগে গেল যে! বলি এখন তোমার হাতে
কোনো কাজ আছে?

হুকুমার। (উম্মার সহিত) আমার কাজ থাক না থাক, তোর
তাতে কি?

কালিন্দী। ও বাবা! মারবে নাকি?

হুকুমার। দেখ, আমার বাজে কথা বলবার সময় নেই, আমি একটা
গুরুতর বিষয় নিয়ে চিন্তা করছি, এখন বিরক্ত করিসনি।

কালিন্দী। গুরুতর বিষয় ত ঢেকি! স্বচ্ছন্দে গিয়ে ফ্যাশান হাউস
থেকে আমার জামা ক'টা নিয়ে আসতে পার; আমায় যেতে
হ'লে পড়ার ক্ষতি হবে, পরীক্ষাটা এসে পড়েছে, তাই বলছি।
তাতো ভূমি যাবে না—সেই আমাকেই যেতে হবে, তোমাকে
কোনো কথা বলতে আসা যানে আমারই সময় নষ্ট কর।

হুকুমার। আমি কি তোর চাকর যে কেবলই আমাকে হুকুম করতে
আসিস! হুঁ, পড়ার ক্ষতি হবে! পড়ে ত মেয়ে আমার
রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ হবেন। তবু যদি না পার্ড ডিভিশনে আই-এ
পাস করতিস!

কালিন্দী। দেখ দাদা, অনধিকার চর্চা করো না বলছি! আমি তো

তবু পাস করেছে, আর তুমি? তিন তিন বার আই-এ ফেল করে আমাদের খোঁটা দিতে লঙ্কা করে না?

হুম্মার। ফেল করেছে বেশ করেছে, তুই বলবার কে? যত বড় মুখ নয় ততবড় কথা! বেরো এখান থেকে বলছি, নইলে—

এসবাজের ছড় উত্তোলন

কালিন্দী। (চোখে আঁচল চাপা দিয়া) দাদা, তুমি আমাকে অপমান করবে! মাকে বলে আমি একুনি হাট্টেলে চলে যাব।

প্রস্থান

হুম্মার। ওঃ কি gross এই নারী-জাতটা! কোন বিষয়ে হুম্ম অহুভূতি যদি কিছুমাত্র আছে! এতদিন ধরে কানের পাশে দিবারাত্রি বিস্কন্ধ রাগ-রাগিণীর চর্চা চলেছে, আজ পর্যন্ত মা আর কালিন্দীর মনের মধ্যে কি সঙ্গীতের প্রতি একটু প্রভাব ভাব জাগাতে পারলাম? বলে অষ্ট-প্রহর ঘানর ঘানর শব্দে বাড়ীহুন্দ লোক নাকি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে! বনের পশুরও এদের চেয়ে প্রাণ আছে, তারা সঙ্গীতের মধ্ব বোঝে।

আকাশের মিক চাহিয়া

বৈজ্ঞ মহম্মদ ঘোঁস, নায়ক গোপাল! হে মহা অতীতের জ্যোতিষ্মান দিকপালগণ! তোমরা ত বুকেছিলে স্বরের এই বাধা! তবে কেন এমন করে তার পায়ে তালের শৃঙ্খল পরিয়ে দিতে গেলে? শৃঙ্খলিত স্বরের অবরোধবয়স্কা যে আমি আর সইতে পারছি না। ওঃ, যদি এক সঙ্গে ভারতের সব তবল্‌চিগুলোর মাথা এক মুঠাখাতে চূর্ণ করতে পারতাম, হুর-পাখাগীর পাখাঘজ্ঞা খুঁচে যেত! আমি দেখিয়ে

দিতাম তবলার প্রাণে প্রতাহ বা নয় তবল্‌চির প্রাণ তার কতটুকু সইতে পারে!

হুরেশের প্রবেশ,—হুরেশ হুম্মারের অঙ্ক ভক্ত

হুম্মার। এস হুরেশ।

হুরেশ হুম্মারকে প্রণাম করিয়া বসিল

হুম্মার। তার পর, কি খবর?

হুরেশ। একটুর জন্মে আজ বড় সামলে গেছি ওস্তাদজী!

হুম্মার। কেন, কি হয়েছিল?

হুরেশ। সেদিন আপনি গোলাপ ঘোষের ওখানে বাজাতে গেছিলেন না? মিনিটখানেক আপনার সঙ্গে বাজিয়ে রামধন মিশ্র তবলা ছেড়ে দিয়ে বললে, হাম্মে নেহি হোগা! আপনি হাসতে হাসতে মোবারক হোসেনকে বাজাতে বললেন, সে হাত জোড় করে বললে—মাফ কিজিয়ে! কোন ব্যাটাই তবলা ধরতে সাহস করলে না, একে একে সব উঠে পালাল,—রইলুম কেবল আপনি আর আমি! আজ ওদের ওখানে গেছলাম—ব্যাটারা বলে কি না—উঃ, আজ বড় সামলে গেছি!

হুম্মার। ওদের বলতে দাও হুরেশ, ওরা পায়ও!

হুরেশ। ওরা পাঁচ সাত জন, আর আমি একা! তা'হলেও আপনার আশীর্বাদে আমি ওদের একেবারে ঠাণ্ডা করে দিতাম, (যুসি পাকাইল) ব্যাটারা বলে কিনা—আপনি বে-তাল! ব্যাটা হিন্দুস্থানী চাড়া! উঃ, আজ বড় সামলে গেছি!

হুম্মার। হুরেশ, শুনতে পাচ্ছ কি?

হুরেশ। কি ওস্তাদজী?

হুম্মার। কাদা, সহস্র বৎসরের কাদা! রাগিণীরা কাপছে, আর

আমার পায়ে ধরে বলছে, প্রিয়! আমাদের তুমি বাঁচাও। তালের পাষণ্ড কারায় আমরা পচে মলাম, লয়ের ক্ষমাহীন সতর্ক দৃষ্টির সম্মুখে আমরা শুকিয়ে গেলাম, তেহাই'এর বিষম চপেটাঘাতে আমাদের অঙ্গ জঙ্করিত হ'ল, আমাদের বাঁচাও প্রিয়তম! হরেশ, শুনতে পাচ্ছ কি?

হরেশ আগ্রহে কান পাতিয়া রহিল। হুম্মারের মাতা
হুম্মার দেবার প্রবেশ

হুম্মার। হুম্মার।

হুম্মার ও হরেশ চমকিয়া উঠিল

হুম্মার। তুমি কালিন্দীকে কি বলেছিস? সে কাদছে আর বলছে, আমার বই-পত্র গুছিয়ে দাও, আমি এক্ষুনি হাট্টেলে চলে যাব।

হুম্মার। কি আবার বলব। তোমরাই আমার দিয়ে ওর মাথাটা খেয়েছ, নইলে আমি তার বড় ভাই, আমায় বলে কি না—

হুম্মার। কি বলেছে সে?

হুম্মার। যাক, সে কথায় কাজ নেই; যেতে দাও না হাট্টেলে, ঘানি বুঝবেন ছা'দিনেই! সেখানে ও সব বেলেম্মাগিরি দেখলে জুপারিটেগেট কানে ধরে দূর করে দেবে।

হুম্মার। দেখ হুম্মার! সংসারের কোনো কাজে তুমি নেই, এতখানি বয়স হ'ল, এখনও রাজপারের চেষ্টা দেখলে না, কেবল তানপুরো বাজিয়ে—

হুম্মার। তানপুরো নয়, এসরাজ।

হুম্মার। চুলায় যাকগে, যাই হোক। এই ত উনি ছুঃখ করে বলছিলেন, পেনশন নিতে আর এক বছর বাকী, তার পর আমাকে আর কালিন্দীকে নিয়ে কোন তীথে গিয়ে থাকবেন, তখন তোমার

ছদ্দশাটা কি হবে, একবার ভেবে দেখছ কি? সারেদি বাজিয়েই পেট চলবে ত?

হুম্মার। সারেদি নয়, এসরাজ। সারেদি বাইজীদের সঙ্গে বাজায়।

হুম্মার। ছি ছি, লজ্জা করে না তোমার ছোট বোনের সঙ্গে লাগতে? সে বেচারী পরীক্ষার জন্ত প্রাণপাত করছে, কোথায় তাকে ছুঁটো মিষ্টি কথা বলে একটু উৎসাহ দেবে, না দিনরাত তাকে চোখের জলে ভাসাচ্ছে! এটা কি তোমার ভাইয়ের মত ব্যবহার?

হুম্মার। আমি তাকে ভাসাইনি, সে নিজেই ভাসছে।

হুম্মার। তোমার সঙ্গে আমি তর্ক করতে আসিনি, এখনি গিয়ে যদি কালিন্দীকে বুঝিয়ে স্থিরিয়ে তাকে ঘরে না রাখতে পার, কাল থেকে তুমিও কোন মেসে গিয়ে বাসা করো।

গ্রহান

হরেশ। ওঃ এত অপমান! ওস্তাদজী, আজই আপনি আমাদের বাড়ী চলুন, দেখি আপনাকে কোন—

বলিতে বলিতে সামলাইয়া গেল

হুম্মার। (গম্ভীরভাবে) হঁ, নির্জনই আমার প্রয়োজন। তোমার বাড়ীতে কে কে আছেন?

হরেশ। জ্যাঠামশাই জ্যাঠাইমা ত দেওঘর চলে গেছেন, থাকার মতো আমি, মন্দাকিনী, আর আমার মামাতো ভাই অন্তাচল।

হুম্মার। মন্দাকিনী কে?

হরেশ। আমার ছোটবোন, কলেজে এবার নাচে কাষ্ট হয়েছে। আমি

তাকে আপনার কথা অনেকবার বলেছি, তার ভারী উৎসাহ,
একদিন আপনার বাজনা শুনতে চায়, আর বলে—

সুকুমার। কি বলে ?

সুরেশ। বলে, আপনি যদি তার নাচের সঙ্গে বাজাতে রাজী হন,
সে wonders create করতে পারবে, কেবল ভাল বাজনার
অভাবে তার প্রতিভা এখনও ঠিক খুলছে না।

সুকুমার। হঁ।

সুরেশ। আপনার সেই জোনপুরী গাংটা সেদিন আমি সুরে গাচ্ছিলাম,
মন্দা তার সঙ্গে এমন একটা নাচের অভিব্যক্তি দেখালে যে
জোনপুরীর রূপটা যেন চোখের উপর স্পষ্ট ভেসে উঠল।

সুকুমার। হঁ।

সুরেশ। আমার ঘরের সম্মুখে বারান্দায় যে ক্যাম্পাটটা আছে
তাইতে আমি শোব, আর আমার ঘরে আপনি থাকবেন,
আপনার সাধনার কোন বিষ হবে না, কেউ টু শব্দটি করলেই
তার টুটি চেপে ধরব। কেমন ?

সুকুমার। হঁ।

(কালিন্দীকে সঙ্গে লইয়া সুরভিবেদীর প্রবেশ। কালিন্দী কান্নায় ফুলিতেছে।)

কালিন্দী। না মা, আমায় ছেড়ে দাও, আমি আর একতিল এবাড়ীতে
থাকতে পারব না!

সুরভি। সুকুমার, বল তোমার দোষ হয়েছে, ওর হাত ধরে ওকে
থাকতে অন্তরোধ কর।

সুকুমার অসহায়ভাবে সুরেশের দিকে ডাছিল।

সুরেশ। ওস্তাদজী, আপনার বিছানাপত্র গুছিয়ে নেব কি ?

সুরভি। হ্যাঁ, তাই নাও,—ও যদি ওর বেয়াদবির জ্ঞান অহুতপ্ত না হয়,
ওর এখানে থাকা চলবে না।

সুরেশ সুকুমারের বিছানা গুছাইয়া মাথায় তুলিল

সুরেশ। আপনার এসরাজটা ?

সুকুমার। হঁ, আমি নিছি।

সুরেশ ও সুকুমারের প্রস্থান

কালিন্দী। মা, কেন তুমি দাদাকে যেতে বললে, দাদা হয়ত আর কিয়ে
আসবে না।

সুরভি। ধাম বাপু, তখন মানের কান্নায় টিকতে দিলি না, এখনই
এর বিহিত কর, নইলে হঠাৎ চলে যাব! এখন আবার দাদার
জ্ঞান দরদ উথলে উঠল, কেন তুই আমার মাথা গরম করে দিলি,
নইলে আমি ত ওকে বেরিয়ে যেতে বলতাম না।

কালিন্দী। মা, আমার দোষ হ'য়ে গেছে, এখন বাবাকে বল দাদাকে
ফিরিয়ে আনতে—

নেপথ্যে—“কইগে, কোথায় গেলে, এয়া কি সব তপিক্তেয় বসেছে নাকি গো”—

বলিতে বলিতে সুকুমারের পিতা ব্যোমকেশবাবুর প্রবেশ

ব্যোমকেশ। কি ব্যাপার! সব এখানে যে ?

কালিন্দী। (ভারী গলায়) মা বকেছিল, দাদা তাই পালিয়ে গেছে।

ব্যোমকেশ। সেকি! কোথায় গেল ?

সুরভি। আর জ্বাকামি করিসনি কালি! ওদের হ'ল ঝগড়া; আর
আমি হলুম নিমিত্তের ভাগী।

প্রস্থান

ব্যোমকেশ। কি যত্নপায় পড়েছি বাবা! সাহেবকে বলে কয়ে একটা
চাকরির যোগাড় করলাম হতভাগার জন্তে, সন্ধ্যাবেলা দেখা

করবার কথা,—সব চুলোয় গেল, এখন কোথায় খুঁজতে বেরোই বল দেখি !

কালিন্দী। (লজ্জিতভাবে) দাদা, বোধহয় সুরেশদের বাড়ী গেছে।
ব্যোমকেশ। এখন এককাপ চা এনে দিবি, না তাও দোকানে গিয়ে
খেতে হবে ?

কালিন্দী। আমি এফুনি চা তৈরী করে আনছি, তুমি হাতমুখ ধুয়ে
এস।

গ্রহান

ব্যোমকেশ। আর হাতমুখ ধোয়া ! লম্বীছাড়াটার দেখা পাই, তবেই।
একাউন্ট্যান্ট বেটা তাঁর জামাইটার জুজু টেকে বসে আছে,
এতক্ষণ গিয়ে হাজির হ'ল বোধহয়। ওসব বরাত !

গ্রহান

কালিন্দীর কলেজের নবীন অধ্যাপক জগদবরণের প্রবেশ

জলদ। মেয়েটাকে ছোর করে ইংরিজিতে 'অনাস' নেওয়ালুম আমিই।
হেভি কোর্স, একটু আধটু হেল্প না করলে পেয়ে উঠবে
কেন ? কই, কাউকে তো দেখছি না, কার্ডটা পাঠাই কার
হাতে !

চায়ের পেয়ালা হস্তে কালিন্দীর প্রবেশ, জগদবরণকে নমস্কার করিতে গিয়া

কাপড়ে চা পড়িয়া গেল

জলদ। আহা, করলে কি—পা-টা পুড়ে গেল বোধহয়, চা না হয়
পরেই আনতে, ব্যাণ্ড হবার কি ছিল ? একটু ভিনিগার—
কিংবা একটু মেথিলেটেড স্পিরিট পোড়া-জায়গাটায়, না না
অগ্রাহ্য করে। না, আপাততঃ—

পকেট হইতে রুমাল বাহির করিল

শনিবারের চিঠি

৪২১

কালিন্দী। না না, আপনি বসুন, ও কিছু নয়, ওতে আমার—

জলদ। পাগলা মেয়ে ! লজ্জার কথা নয়, আমি না হয় তোমার, কি
বলে, ইয়ে—এই রুমালখানা দিয়ে তোমার পা-টা মুছে ফেল—

অগ্রসর হইল

কালিন্দী। (মুখ লাল করিয়া) আপনি চা ধরুন, আমি পা মুছে
আসছি।

জলদ। (চায়ের পেয়ালা লইয়া) অমনি Princess খানাও নিয়ে এস,
একটু পড়িয়ে দিয়ে যাব।

জলদ। (চায়ে চুমুক দিয়া) Ah, this is life ! Princess এর
কোন জায়গাটা ধরব—The splendour falls on the castle
walls ?

সংস্কৃতের অধ্যাপক কমলাক্ষের প্রবেশ

কমলাক্ষ। কি জলদবাবু যে ! এখানে কি মনে করে ?

জলদ। আরে ! কমলাক্ষ বাবু যে ! তারপর, হঠাৎ এখানে ?

কমলাক্ষ। না, তা এমন কিছু নয়, এই দিক দিয়ে যাচ্ছিলুম,
ভাবলুম—কালিন্দী সংস্কৃতটা কি রকম পড়ছে একবার দেখে
যাই, বড্ড কাঁচা আছে কিনা, একটু কোচ করা দরকার,—
তাই—

চায়ের পেয়ালা হস্তে কালিন্দীর প্রবেশ

কমলাক্ষ। বাঃ, in right time !

কালিন্দীর হস্ত হইতে পেয়ালা গ্রহণ

কালিন্দী। (নমস্কার করিয়া) আপনারা বসুন, আমি এখনি আসছি।

কমলাক্ষ। আর দেখ, মেঘদূতখানাও অমনি নিয়ে আসবে, সেদিনকার
সেই গ্লোবটা—

কালিন্দীর প্রস্থান

কালিন্দীর সহপাঠী নিখিলের প্রবেশ এবং অধ্যাপকদ্বয়কে দেখিয়া

অপ্রস্তুত ভাব।

জলদ। কি হে নিখিল নাকি! এখানে কি মনে করে?

নিখিল। আজ্ঞে না, তেমন বিশেষ কিছু নয়, এঁর কাছে ইকনমিস্টের

নোটখানা একবার—

জলদ। কেন, তোমার নোট নেই?

নিখিল। আজ্ঞে—ক্লাসের লেকচার-নোট আমি রাখিনি।

জলদ। কেন রাখনি?

নিখিল নাক চুলকাইতে লাগিল

জলদ। You ought to suffer for it, আমি কালিন্দী দেবীকে

নিষেধ করে দেব—যেন তাঁর নোট তোমায না দেন।

নিখিল। আজ্ঞে, ওর নোটই আমি বরাবর পড়ে আসছি,—ইন্টার-

মীডিয়েট ক্লাস থেকে—

জলদ। বটে!

কালিন্দীর প্রবেশ—হস্তে চায়ের পেয়ালা

কালিন্দী। (নিখিলের দিকে চাহিয়া ও হাসিয়া)—এই যে!

নিখিল অগ্রসর হইয়া পেয়ালা ধরিয়া লইল।

বোমকেশবাবুর প্রবেশ।

বোমকেশ। কইরে—চা কই?

কালিন্দী। বাবা, তুমি একটু বোস, আমি আর এক কাপ চায়ের মত

জল চাপিয়ে দিচ্ছি একুনি।

বোমকেশ। (সকলকে নিরীক্ষণ করিয়া) হঁ, আমি বাইরে গিয়ে

থেয়ে নেব, তুমি তোমার কাজ করগে।

কালিন্দীর গ্রহণ।

বোমকেশ। তারপর, হ্যা, আপনারা একটু বসুন তাহ'লে, আমাকেও

যে আবার—ঐ যাঃ, মাকলারটা ফেলে এসেছি।

গ্রহণ।

নেপথ্যে—“ভক্তলোকরা বহন না একটু ভুই পড়ার ঘরে যা আমি

মিরে এসে কথা কইব এখন।”

জলদ। (ঘড়ি দেখিয়া) নাঃ, আমাকে এইবার উঠতে হয়, একবার

এনটালি যেতে হবে—

কমলাক্ষ। আমারও একটু বিশেষ কাজ আছে, আমিও না হয়—

অনিচ্ছাসত্ত্বেও পরম্পরের দৃষ্টি বিনিময় এবং গ্রহণ।

নিখিল। নোট দিতে বারণ করে দেবেন!—বাবা! একাদিক্রমে

বারবছর কো-এডুকেশন করে আসছি,—

নেপথ্যে বোমকেশবাবুর জুতার শব্দ সদর দরজা পার হইয়া

মিলাইয়া গেল।

যাক বাঁচা গেল—এইবার চুটে কথা বলবার সময় পার।

বুড়ে মেয়ের গায়ে মাছিটি পর্য্যন্ত বসতে দেবে না! বাবা!

কালিন্দীর প্রবেশ।

কালিন্দী। (হাসিয়া) কেমন জঙ্গ! ছ'দিকে ছ'জন জাঁদরেল প্রফেসর,

ভাঙায় বাঘ আর জলে কুমীর!

নিখিল। বাঃ, তাই বুঝি? আমি যে আগে থেকেই যাচ্ছে চড়ে বসে

আছি!

কালিন্দী। পূর্কজন্মের অভ্যাসটা এখনও যায়নি কি না।

নিখিল। কি করে জানলে? পূর্কজন্মেও তুমি আমায় চিনতে নাকি?

কালিন্দী। এই জন্মেই যে চিনেছি, তাই বা বুঝলে কি করে?

নিখিল। এই তোমার বড় দোষ, একটা প্রশ্নের উত্তরে আর একটা প্রশ্ন

করে বস!

কালিন্দী। (হাসিয়া) আচ্ছা, আর করব না। এখন মহাশয়ের কি হুকুম শুনতে পারি কি ?

নিখিল। আল্‌বাং ! ইকনমিস্টের নোটের খাতাটা একবার চাই—এই মুহূর্তে, এক সেকেন্ড দেবী হ'লে চলবে না।

কালিন্দী। ওইটি মাফ করতে হ'ল, খাতার মার্জিনে গান লেখবার জন্ম আমি আমার নোট স্পেশ্যার করতে পারব না, বিশেষতঃ পরীক্ষার সময়।

নিখিল। সেটা কি আমার দোষ ? কালিন্দী দেবীর লেখা পড়লে কেন কেবলই আমার গান পায় ? কেন মনে হয়—হরফগুলো এক-একটা ফুলের পাপড়ি—

কালিন্দী। (কপট রোষের সহিত) যাও, আমার বাজে কথা শুনবার সময় নেই, এতক্ষণ অল্প কয়েক আমার কাজ হ'ত !

নিখিল। (অভিনয়ের ভঙ্গিতে) O heavy lightness ! Serious vanity ! Misshapen chaos of well-seeming forms !

কালিন্দী চলিয়া যাইতে উদ্ভত।

নিখিল। যেও না, যাবার আগে অস্থতঃ আমার একটা কথার জবাব দিয়ে যাও।

কালিন্দী। কি ?

নিখিল। আচ্ছা ধর যদি পরীক্ষার হলে ঢুকেই শোন, নিখিল চট্টোপাধ্যায় হঠাৎ পথে মোটরচাপা পড়ে মারা গেছে, কি কর তুমি ? নিষ্করিকার চিত্তে 'আনসার-গুলো লিখতে বসে যাও—না। গাভ'কে ডেকে বল—(স্বর করিয়া) আমার মাথা কেমন কচ্ছে, একটা গাভী ডাকিয়ে দিন—আমি বাড়ী যাব—

কালিন্দী পুনরায় চলিয়া যাইতে উদ্ভত।

নিখিল। নানা, তুমি যেয়ে না, তুমি আগে চলে যাবে—সে আমি সইতে পারব না, বরং আমি আগে যাই, তুমি দাঁড়িয়ে দেখ—তোমার নার্ভ খুব ষ্ট্রং আছে।

যাইতে উদ্ভত

কালিন্দী। আর নোট থানা পৌঁছে দেবে কে ? আমি বুঝি ? আমার বয়ে গেছে, উনি ফেল করলে আমারই মাথাটা কাটা যাবে আর কি !

নিখিল। (কপট ব্যস্ততার সহিত) ওহো, ঠিক বটে ! দেবী ! তুমি যাবে পাশ করে চলি'—

কালিন্দী। আবার !

নিখিল। না না, ভুল হয়ে গেছে। কই নোট, কোথায় নোট ?

কালিন্দী। বা রে ! আমি কি সপ্নে করে এনেছি নাকি,—আমার পড়ার ঘরে আছে।

নিখিল। তবে উপায় ?

কালিন্দী। আমি নিয়ে আসছি,—কিন্তু তর সইবে কি ?

নিখিল। কেন—সেকি বহুদূর—উজ্জয়িনীর পথপ্রাপ্তে ? শিপ্রানদীর তটে ? তবু আমি অপেক্ষা করব—জন্মজন্মান্তর—

কালিন্দী। নাঃ, আমি চললুম—একদিকে তোমার কাব্য আর একদিকে দাদার সন্দ্বীতসাধনা—আমার প্রিপারেশনের গলা টিপে ধরেছে।

নিখিল। (অহুতপ্ত স্বরে) ভুলে গিয়েছিলাম, আমি আর তোমার এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করতে চাই না, এক্ষুনি চলে যাব—দাও নোট থানা দাও—কই দিলে না ?

কালিন্দী। আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না ? ছ'জনে একটু কনসান্ট করে পড়লে—

নিখিল। চমৎকার! আমার কঠিন জায়গাগুলো তুমি বুঝিয়ে দেবে, আর তোমার কঠিনতা আমি দূর করে দেব!
কালিন্দী। (ইঙ্গিত বুঝিতে না পারিবার ভান করিয়া) বেশত! তাহ'লে দু'জনেরই কাজ হবে,—এই ত লক্ষ্মীছেলের মতন কথা! (নেপথ্যে লক্ষ্য করিয়া)—ওমা—আমার পড়ার ঘরে দু' পেয়লা চা পাঠিয়ে দিয়ে তো।

উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

মন্দাকিনীর নাচ ঘর। অন্তরাল হারমোনিয়ামে সুর দিতেছে, নীলাঞ্জন স্বরোদ বাঁধিতেছে, মোসাকের খা তবলা বাঁধিতেছে—একটি বড় আয়নার সমুখে মন্দাকিনী নৃত্যের বেশে সজ্জিত হইয়া আজিকার নৃত্যের রূপ সাধনা করিতেছে। মন্দাকিনীর নাচের সমগ্রতার প্রদোত পাকড়াশি, বার-এটল,—তাহার দিকে মুগ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে।

নীলাঞ্জন। (মোসাকের থাকে)—আউর জ্যাডাসে চচা দিজিয়ে।

মোসাকের। কাহে, সুরমে নেহি রাখেগে?

নীলাঞ্জন। নেহি, কেদার রাগ বাজায়েগে, বাদী সুরকে সাথ মিলানেসে তবলেকা আওয়াজ ঠিকসে নিকালতি হ্যায়, মধ্যম তক উঠাইয়ে।

মোসাকের হাতুড়ি দিয়া তবলার চতুষ্পাখে জোর পিটিতে লাগিল।

মন্দাকিনী। (হঠাৎ ফিরিয়া) দেখুন নীলাঞ্জনবাবু—সুরগুলোর মধ্যে আজ একটু বিভিন্ন রসের সঞ্চার করতে হবে। আমি আজ প্রথমেই “অখমেদ” নৃত্য করব। একেবারে ওরিয়েণ্টাল অ্যাটমস্ফিয়ারটি সৃষ্টি করা চাই,—তীব্র হোম-গন্ধ, শ্মশিরুলের স্বস্তি-বচন, সমবেত রাজকুলবর্গের রথের ঘর্ঘর-ধ্বনি, ঘন ঘন হুয়ারব—সব সুরের মধ্যে ফুটে উঠা চাই, তবে আমি নাচের মধ্যে তা ব্যক্ত করতে পারব।

প্রস্তোত। What a marvellous idea!

মন্দা। তার পর হবে “শক্তিশেল” নৃত্য। লক্ষণের অসহ যন্ত্রণা, রামচন্দ্রের মর্মবিদারক খেদোক্তি, বিশালকর্ণগীর জ্ঞাত হৃদমানের অসাধ্যসাধনের আকাঙ্ক্ষা—সব একে একে বাজিয়ে যেতে হবে। ছায়াশব্দ, ইমনকল্যাণ, আশাবরী—পর পর চলতে পারবে।

প্রস্তোত। A prodigy, a prodigy!

মন্দা। এর পর নাচব—“অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন।” পাথের তুফী ভাব, মোহ এবং অবসাদ, ক্রোধের বৃথা আশ্বাসবাণী, অবশেষে কথায় কার্য উদ্ধার না হওয়ায় ব্রীক্লেফের নিজমূর্তি ধারণ। ভয়ের প্রকোপে অর্জুনের অন্তরাশ্মা প্রবাহিত, তৎসহ গাণ্ডীবে টকার, মস্ত্রে মস্ত্রে চতুর্দিকে অস্ত্রের অনন্যকার। প্রথমটা একটু ল্যান্ডুইশিং এয়ার, একটা করণ হতাশার সুর, তার পর সেটা একটু ইমপ্রফ করবে, কিন্তু যেন এক্ষেত্রে ক্রিয়েট করেও করতে পারছে না! আর ঠিক তার পরই হঠাৎ সুরের মধ্যে একটা বিশাল এবং ভয়ঙ্কর ভাব জেগে উঠবে। এইখানে দরবারি কানোড়া আর মালকৌশ এক সঙ্গে লাগিয়ে দিলে মন্দ হবে না, কিন্তু শেষটা খুব ছন্দ লয়ে

বাজবে, চৌতুন, আটতুন যোলতুন, এই সময় আমি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের চিত্রটি উন্মুক্ত করে দেখাব।

প্রজ্ঞাত। সিম্প্রি গ্র্যাও! ট্রেমেণ্ডাস! আনবেয়ারেবল্!

নীলাঞ্জন। কেন মশায় তবে খামাখা বেঘার কচ্ছেন? উঠে যান না, আপনিও বাচেন আর আমিও বাঁচি!

মন্দা। (শাসনের ভঙ্গিতে) মিষ্টার পাকড়াশি! কীপ কোয়ায়েট।

এর পর হবে “দান্ড ছেদন” নৃত্য। শীতের মিষ্টি রোদ, শত্রুপূর্ণ বনুছরা, ক্লবক-মনে শান্তি ও সাক্ষ্যাজনিত আনন্দ, অবিরাম কান্তের ঘ্যাচাঘ্যাচ শব্দ, তার পর দানকাটা নিয়ে দুই পক্ষের মারপিট, খুন জখম ও কৌজদারী—সব দেখাব, যে সময়ের যে ছুরটি ঠিক লাগাতে পারবেন ত?

প্রজ্ঞাত। কেন পারবেন না—

নীলাঞ্জন। আঃ চূপ করুন না মশায়! হ্যা, তা দেখুন—আমি চেষ্টা করব, তবে ওসব যা বলছেন ইংরিজী সুরের মধ্যে হ’লে অনেক ঝোপ ছিল, আপনি তার চেয়ে এক-একটা সুরের ভাব নিয়ে নৃত্য করুন না, সেই সুরের রূপটি—

মন্দা। ওইখানেই ত আপনার সঙ্গে আমার মত মেলে না নীলাঞ্জনবাবু!

নাচতে নাচতেও ঠিক প্রেরণাটির অভাবে আমার পা থেমে যায়।

আপনি আপনার স্ববিধা খুঁজছেন, কিন্তু—

প্রজ্ঞাত। ঠিক কথা, নীলাঞ্জনবাবুই ভুল বলছেন—

নীলাঞ্জন। আপনি থামুন মশায়, যা বোঝেন না, তা নিয়ে কথা বলতে আসবেন না। বেশ, আমি চেষ্টা করছি, তবে—

প্রজ্ঞাত। তবে আবার কি?

নীলাঞ্জন। কি আপদ! (মন্দার প্রতি) আমার মনে হয় এ অসাধ্য সাধন।

প্রজ্ঞাত। মারভার কেসের আসামীকে খালাস করার চেয়ে?

নীলাঞ্জন। দেখুন মশায়, বার বার যদি বিরক্ত করবেন, আমি বাজাতে পারব না—আপনিই বাজাবেন।

মন্দা। (নীলায়িত ভঙ্গিতে প্রজ্ঞাতের দিকে হস্ত প্রসারণ করিয়া) মিঃ পাকড়াশি! (বাম হস্তের তর্জনী ওঠে স্পর্শ করিয়া) চূপ—একবারে চূপ। (নীলাঞ্জনের প্রতি) আচ্ছা আপনি আরও করুন, অশ্বমেধের বাজনা, প্রথমেই হয় ও হোতার আগমন। (বাজনা আরম্ভ হইবার পূর্বেই অদভঙ্গি সুর করিল।)

নীলাঞ্জন (স্ব)—কি যে পাশ বাজাই। আচ্ছা ল্যাঠায় পড়েছি যাহোক, রোজ রোজ আর ভাল লাগে না। (স্বরোদটি তুলিয়া দেশ সুরের একটি টান দিবামাত্র মন্দাকিনী থমকিয়া দাঁড়াইল।)

মন্দা। একেবারে মাটি করে দিলেন—এমন একটা অসঙ্গত সুর লাগালেন যে আইডীয়াটা ভেঙে’লপ করবার আর চান্স রইল না। আচ্ছা, বাজনা এখন থাক। প্রথমে নাচটা দেখুন—তার পর বাজনা হবে। (ঘরের কোণে গিয়া দাঁড়াইয়া) এই দেখুন অশ্বমেধের অশ্ব আসছে, সকলের মনে একটা উত্তেজনার ভাব—

বিছানার মোট মাথার লইয়া সুরেশ ও পশ্চাতে এসরাজ হস্তে হুকুমারের প্রবেশ।

সুরেশ। (বিছানার মোট ফরাসের উপর ফেলিয়া দিয়া) মন্দা! ইনিই আমার গুপ্তদল্লী! কানাইলাল দেড়ির পরে আর এমন এসরাজি জন্মায় নি ভারতবর্ষে, আমি বাজি রেখে বলতে পারি, ওঁর একটা বাজনা শুনলেই সকলের চোখে ধুম আসবে! অনেক সাধি-সাধনা করে তবে ওঁকে এখানে আনতে পেরেছি।

মন্দা। নমস্কার। বহুদূর! ছোটনাকে কতদিন ধরে বলছি একবার আপনাকে নিয়ে আসবার জ্ঞাত!

স্বরেশ। একবার কেন, এইবার দিনরাত ওঁকে তুমি পাবে, উনি আর এখান থেকে যাবেন না। আমি কি সে ব্যবস্থা না করে এসেছি মনে কর!

সকলে গিজাহ-দুষ্টিতে পুরেশের মুখের দিকে চাহিল। স্বকুমার হঠাৎ

মোসাকের পাক দেখিয়া ভূত দেখিবার মত

চমকিয়া উঠিল।

স্বকুমার। (ভীতভাবে) স্বরেশ, উনি কি তবলা বাজান?

স্বরেশ। তা জানেন না বৃষ্টি? উনি হচ্ছেন ওস্তাদ মোসাকের খাঁ, বিখ্যাত নিয়ামত খাঁর ছাত্র, খানদানী লোক! তবলা থেকে নানান রকম স্বর বার করতে পারেন। কখনো ব্যাঘ্রা, কখনো স্নেতার, কখনো জলতরঙ্গ! আবার কখনো মনে হবে ফুল-স্পীডে দাঙ্কিলিং মেল ছুটেছে—অর্থাৎ গাড়ীতে বসে প্যাসেঞ্জারের মনে যেমন একটা বিশ্বয় ও আতঙ্কের ভাব জাগে—তেমনি।

স্বকুমার শিহরিয়া উঠিল।

নীলাঞ্জন। আশ্চর্য্য ভোগযোগ্য! তাহ'লে ত এঁদের সঙ্গ শুনে উঠে শুয়ে ঘুমুচি মনে হবে, বাজান, আমি অন্ততঃ প্রস্তুত। (ফরাসের উপর লগ্না হইয়া পড়িল।)

মোসাকের। কব্‌সে হাম তবলা বাঁধকে তৈয়ার হায়া, ইন লোকোনে সুটমুট বাত বানাতেহে, বাজানেকো ফিকির নেহি হায়া, আজ মজ্জেমে একঠো লাগাইয়ে তো সাহাব—দেখিয়ে হাম কেইসে জমা দে!

তবলায় টাটি মারিতে শুরু করিল।

মন্দা। আপনি দয়া করে একখানা বাজান তাহ'লে, কি স্বর বাজাবেন?
(অন্তাচলকে) দাদা, “অখমেধ” নাচের সঙ্গে কি স্বর খাপ খাবে—বলে দাও না!

অন্তাচল। হ্যা, তা হিন্দোল, শ্রী কিংবা সোহিনী—

মোসাকের। হাম উমকো নেহি সমঝতেহে, কোন তাল হোগা।
সোহি বাতলাইয়ে দিমা, ইয়া যৎ, ইয়া আড়া ঠেকা?

পুনরায় তবলায় টাটি মারিল।

স্বকুমার। স্বরেশ, আমার শরীরটা আজ ভাল বোধ হচ্ছে না, একটু বিশ্রাম করব, আমার বিছানাটা করে দাও—ওদিকে বল আর একদিন না হয় দেখা যাবে, আজকে পেরে উঠব না।

উঠিয়া প্রস্থান

স্বরেশ। শুনগেন ত! উনি কারো কথায় বাজান না। ইনস্পিরেশন না এলে হবে না, আপনার অপেক্ষা করুন, ঠিক সময়ে আমি—

বলিতে বলিতে বিছানার মোট তুলিয়া লইয়া দ্রুত স্বকুমারের

পশ্চাদ্ভাবন

মন্দা। নাহ, আজকের আসরটাই মাটি হ'ল। আমারও সমস্ত প্রেরণা নষ্ট হয়ে গেছে, আজ আর কোন নাচের ভাব ফোটাতে পারব না। (হতাশ ভাবে সোফায় বসিয়া পড়িল।)

নীলাঞ্জন। (স্বরোদট তুলিয়া লইয়া) আজ আমিও উঠি তাহ'লে, আমারও বিশেষ কাজ আছে, ইয়া আর দেখ অন্তাচল, আমি কয়েকদিন বোধ হয় আসতে পারব না। (স্ব) এক কর্মভোগ আর সম্ভ হয় না। তখনই অন্তাচলকে বলেছিলুম, এতে কোন পক্ষের সুবিধা হবে না। বললে, একবার ট্রায়াল দিতে ক্ষতি কি? ট্রায়াল ত দু'রে কথা, জেলখাটারও বেহন্দ হয়েছে!

টিগ, চন্দন ও বুলবুল নামী তিনটি মেয়ের প্রবেশ, — ইহার।

মন্দাকিনীর নাচের ছাত্রী।

টিয়া। মন্দাকিনী-দিদি, আমাকে “কীচক-বধ” নাচটা একবার দেখিয়ে দাও না, দু’এক জায়গায় মনে পড়ছে না।

চন্দন। আমাকে “কাধা-সেলাই” এর নাচটা—

বুলবুল। আমাকে “পটোল-ভাজার” নাচটা—

মন্দা। থাম! কতদিন বলে দিয়েছি না, ঘরে ঢোকবার সময় কালকের শেখা নাচটি দেখিয়ে আসবে, বেরোবার সময় আজকের শেখা নাচটি দেখিয়ে যাবে,—তা না হ’লে কিছু হবে না, সব সময় নাচের মুড চাই; যাও! তোমরা হোপলেস! আজ আমি কিছুই দেখাতে পারব না।

টিয়া ও চন্দনের নাচিতে নাচিতে প্রস্থান। বুলবুলের নৃত্য ও বাহির

হইবার পথে বেগে ব্রহ্মারের প্রবেশ, উভয়ের দ্বন্দ্ব এবং পতন।

বুলবুলের উঠা প্রস্থান।

হুকুমার। (গায়ের ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে) দেখুন, আমার একটা বিশেষ কথা আছে! সঙ্গীতের যে নিদারুণ বাধা আমার প্রাণে জেগেছে,—আপনাকে নাচের মধ্যে সেইটি বাক্য করতে হবে। আপনি পারবেন। অত্যাচারে, অপমানে জর্জরিত সঙ্গীত! সে আজ মুক্তি চায়, সময়ের দাসত্ব থেকে মুক্তি, তবলার বন্ধন থেকে মুক্তি, “তেরেকিটি” আজ সহস্র কীটের মত তার অঙ্গ ছেয়ে ফেলেছে, তার কাছায় আমি চোখে জল রাখতে পারছি না। আপনি পারবেন, it is a crusade, আপনাকে আমার চাই! আমি স্বরগুলোকে জগতের মধ্যে উন্মুক্ত করে ছেড়ে দেব, কোন বাধা মানব না। আপনি শুধু নাচের মধ্যে

তাতে শিক্ষা ও সংস্কারের দাসত্ব নেই। চের হয়েছে। এখন মানে মানে সবে পড়তে পারলে ঠিক।

অন্তাচল। বাচ্চ তাহ’লে, চল আমিও—মানে আমার তোমাকে কিছু বলবার আছে—

মোসাফের। আরে ঠাহরিয়ে সাহাব, হামডি চলতেই, বৈঠকে ক্যা করেদে? হি’য়া ওগাজকা ভি মোকা নেহি মিলতা হায়।

নীলগুন, ও অন্তাচল ও মোসাফের বীর প্রস্থান

মন্দাকিনী অলসভাবে উঠিয়া আয়নার সম্মুখে ঝাঁড়াইয়া চুলের

বিছানি ধুঁসিতে লাগিল।

প্রজ্ঞোত। (অ) প্রজ্ঞোত! আর কতদিন খঞ্জোতের মত অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াবি? আজই একটা হেতুনেত্ব করে নে—এম্পার কি এম্পার। প্রজ্ঞোত পাকড়াশি! Take heart, now or never! (দীর্ঘে দীর্ঘে মন্দাকিনীর পিছনে আসিয়া)—মন্দাকিনী দেবী! আর কতদিন আশায় থাকব?

মন্দা। (ফিরিয়া) দেখুন মিষ্টার পাকড়াশি, হঠাৎ একটা আইডীয়া আমার মাথায় এসেছে। Le Quesue এর সেই চিত্রটা দেখেছেন, The Disarranged Toilet? বনদেবীরা প্রসাধনের সময় মাকড়সার জালে জড়িয়ে পড়েছে, সহচরীরা এসে বললে, আগন্তুক আসছে। কেমন একটা ভয়বাহুলিত ভাব সকলকার মুখে দৃটে উঠল! অথচ মাকড়সার জাল নাগ-পাশের মত ঘিরে ধরেছে, পালাবার উপায় নেই! চমৎকার সাবজেক্ট নয়? আমি এখন নাচের মধ্যে আইডীয়াটা work out করব, নামটা ধরুন “ভ্রষ্ট প্রসাধন” (চুল খুলিতে খুলিতে নৃত্য আরম্ভ, প্রজ্ঞোত হতাশভাবে চাহিয়া রহিল।)

সেই উপর মঞ্জির মহাশয় ছুটিয়ে তুলুন, জগৎবাসী চোখ মেলে দেখতে পাবে—বান্দনহারা ললিতকলার মূর্তি!

গোপাইতে গোপাইতে হুরেশের প্রবেশ।

হুরেশ। ওস্তাদজী! বাইরের ঘরে আপনার বাবা এসে বসে আছেন, বলছেন—পাটের গুদামে আপনার চাকরি ঠিক করেছেন, এখনি যেতে হবে!

হুম্মার। হ্যা! চাকরি! পাটের গুদাম! চল হুরেশ, তোমাদের খিড়কি দরজা দিয়ে আমরা জগতের এমন কোন প্রান্তে পালিয়ে যাই, যেখানে মা নেই, বাবা নেই, চাকরি নেই, পাটের আড়ত নেই, তবলা নেই, তেহাই নেই—আছে শুধু হুর—অজ্ঞেয়, অশ্রদ্ধ, অপরাধ, অবিভাজ্য, অনতিক্রমা, অনির্দেশ্য—

নেপথ্যে বোমকেশবাবুর কঠম্বর—“হুম্মার শীগগির এস।”

হুরেশ। ওস্তাদজী, আপনার বিছানাটা?

হুম্মার। হঁ, বেঁধে নাও।

উত্তরের প্রস্থান

মন্দা। (স্ব) সাবজেক্টটা মন্দ নয়, নাচের মধ্যে ফোটাতে পারব। আচ্ছা, টিয়া না হয় তবলা-নৃত্য করবে, চন্দনা ঝাপতাল-নৃত্য, বলবুল—তেহাই নৃত্য,—আর আমি,—কিন্তু পাটের গুদামটা কি ভাবে দেখান যাবে?

ভূতোর প্রবেশ।

ভূতা। দিদিমণি, খাবার দেওয়া হয়েছে।

প্রস্থান্ত। আমিও তাহ'লে—(টুপি-গ্রহণ।)

মন্দা। আহা, এতক্ষণ রইলেন, আর একটু বসে যান। থেয়ে এসে

আমি সোফার উপর মিনিট-পাচেক গড়িয়ে নেব, তারপর উঠে-পড়েই আমার “স্বপ্ন-ভঙ্গ” নাচটা একবার—প্রস্থান্ত। যথেষ্ট হয়েছে, good-night!

প্রস্থান

নাচিতে নাচিতে মল্লিকিনীর ভূতোর অধুগমন।

যবনিক!

পৃথিবীর পাগলামি

কয়েক মাস পূর্বে, লণ্ডনের এক ক্লাবে, জনকুড়ি যুবক মিলে এই আলোচনাই হচ্ছিল। নিউ ইয়র্ক থেকে ফিরে এসে এক ইংরেজ ব্যাঙ্কারের পুত্র এই সভা আহ্বান করেছিলেন। ইংরেজ যুবক বললেন, “নর্থ আমেরিকার শক্তিশালী financier-দের অগ্রতম পয়তাল্লিশ জন, যাদের কারো বা চুলে পাক ধরেছে, কারো বা ঘোঁবন এখনও অল্পস্তীর্ণ, এবং যাদের সকলেরই মূলধন সমষ্টি করলে ত্রিশ মিলিয়র্ড ডলারের বেশী হয়, তাঁরাই—এক প্রস্তাব-আলোচনা করছিলেন, যার দ্বারা তাঁরা—রাশিয়ার ‘quinquennial plan’-এর মতই একটা কিছু আমেরিকার জন্মে করতে চান।” একথার পর যুবক বললেন, “আমেরিকার যা প্রয়োজন, সমস্ত জগতেরই স্বাক্ষর তাই প্রয়োজন।” এই প্রয়োজন কথাটির উপর বিশেষ জোরে দির্ঘেতিনি বলতে লাগলেন যে, জগতের এই দুর্ববস্থা থেকে জগৎকে উদ্ধার করা অতীব প্রয়োজনীয়—তা সে একটা international

revolution এর সাহায্যেই হোক বা পৃথিবীব্যাপী এক বিরাট যুদ্ধের সৃষ্টি করেই হোক; যে করেই হোক, কথা হচ্ছে এই, সাবেক social order এর সম্পূর্ণ ধ্বংস করে, তার উপর জীবনের এক নতুন কাঠামো রচনার প্রয়োজন। এই ইংরেজ লক্ষপতি যুবক যে মত ব্যক্ত করেছিলেন, সেই মতের সঙ্গে যাদের মত একেবারেই মিলত না, তাঁদের সঙ্গে ইদানীং আলোচনা করে লেখক বুঝতে পেরেছেন যে আজ এ বিষয়ে সকলেই একমত। এই অত্যাধুনিকতা, কেউ বা ডাইনের দিক থেকে উল্টাতে চান, কেউ বা বায়ের দিক থেকে, তবে যাদেরই একটু দূর-দৃষ্টি আছে তারা সকলেই এই আধুনিক অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তনের জঙ্ক পড়েছেন। এ-বিষয়ে, জাফানির চেয়ে বড় উদাহরণ আর কিছু নেই; হিটলারের দলের প্রোগ্রামের চল্লিশটে আর্টিকল দেখলেই বোঝা যাবে যে কমিউনিস্টদের নীতি সবদেখেই এক পহাবলম্বী।*

লেবার গভর্ণমেন্টের সাবেক মন্ত্রীরা একদিন লওনে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, “কি চায় এ-সব লোক?” সত্যিই কি লোকে কিছু চায়, আজকের দিনে? কে জানে?

এই আলোচনার কিছুকাল পূর্বে, পৃথিবীর বিখ্যাততম ডিক্টেটর মুসোলিনী লেখককে বলেছিলেন, “people একথার মানে কি? জীবনহীন এই যে জনসাধারণের কথা লোকে আমায় বলে, সে জিনিষটো কি? হাত দিয়ে যা স্পর্শ করা যায় না, চোখ দিয়ে যা দেখা যায় না, এমন বস্তুর অস্তিত্ব নেই আমার কাছে। আমি জনসাধারণকে অতি কঠিন কথাই বলি, আমি তাদের হাততালির ভিখিরী নই। জনসাধারণ?

এ-কথার ভাংপড়া এই যে, হিটলার ও তাঁর দল যদিও কমিউনিস্টদের স্বপ্ন নন, তবুও তাঁদের দলের প্রোগ্রামের নব্বইটে ‘আর্টিকেল’ মধ্যে চল্লিশটে এমন যে, কমিউনিস্টদের প্রোগ্রামের সঙ্গে খুব মিলে যায়।

—নোংরা, মূর্থ তারা, উপযুক্ত পরিমাণ খাটে না; তারা সিনেমাতে কয়েকটা নাট্য দেখার কাড়াল। জনসাধারণের কুসৃত্বা হচ্ছে আদেশ-মেনে চলা; এ-রকম জনসাধারণ যদি হয়, তবেই তাঁদের স্বার্থ বজায় রাখার চেষ্টা করা উচিত।”

ব্যাঙ্কার-যুবক একথার সঙ্গে যোগ দিলেন, “ষ্ট্যালিন তো জনসাধারণকে এ ব্যাপার আরো ভাল করেই বুঝিয়ে দিয়েছে।” এর পর রাশিয়া সম্বন্ধে আলোচনা চলতে লাগল।

ক্লাবরুমের অনেকেই তো চটে উঠলেন, যখন তাঁরা জানতে পারলেন যে যে-দেশলাই দিয়ে তাঁরা তাঁদের সিগার জ্বালান, সে সব সোভিয়েট রাশিয়াতেই তৈরী। অথচ এই একই ক্লাবে, বড় বড় নামজাদা অনেক উত্তরাধিকারীই আছেন, সোভিয়েট পার্টির খুব বড় রকমের enthusiasts। রাশিয়ান সরকারের কর্তাদের প্রতি কি এরা ঘৃণা পরিপোষণ করেন না ঠিক উল্টো,—অর্থাৎ তাঁদের ‘শ্রদ্ধার চোখেই’ দেখেন? মনে হয় তো, U. S. S. R. এর এই ‘গবর্ণমেন্টাল মেথড’ বা ইটালীর dictatorship-এর মত জিনিষেই, আধুনিক এই chaos থেকে পরিজ্ঞাপ্য পাবার একমাত্র উপায়, একথা অনেকেই বিশ্বাস করেন।

খুব চাড়ের সঙ্গে বলা হলেও, এই সব অমীমাংসিত ও অশাস্ত কথাবার্তা, লেখক যখন এক্সপ্রেসে চড়ে, ছাঁবছরের মধ্যে পঞ্চমবার, জাফানি ভেদ করে রাশিয়া যাচ্ছিলেন, তখন মনে মনে আলোচনা করতে লাগলেন। ১৯৩০ সালের ডিসেম্বরে লেখক ইণ্ডাস্ট্রী সম্বন্ধে এক আদালতীয় ব্যাপারে যোগ দেবার জন্তে মস্কোতে প্রেরিত হন। সেদিন যা তিনি দেখেছিলেন, তার কথা জীবনে ভোলার নয়; শীতের একটি দিন, আকাশ ভারী, মেঘে ঢাকা। তিন চারশ লোক, অধিকাংশই

বুদ্ধ ও স্বীলোক, একটা ক্ষুণ্ণ কারখানার সামনে 'কিউ' আকারে দাঁড়িয়ে আছে ভীষণ দুর্ভোগ সত্ত্বেও; মেক্সিকোয় ভীষণ বাতাস তাদের তুষার-বৃষ্টিতে আচ্ছাদিত করেছে। এই লম্বা 'কিউ' লাইন, দু'রে মিলিয়ে গেছে। এই রাস্তার মোড় ফিরলেই দেখা যায়, প্রাচীন aristocracyর সাক্ষাৎরূপ বিরাট রাজপ্রাসাদ এখনও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

লেখক প্রবেশ করলেন। দ্বারের ছদিকে ছুঁজন রক্তবর্ণের পোষাক-পরা প্রহরী দাঁড়িয়ে। বাইরের দেওয়াল ধোঁয়াটে, ঠাণ্ডা। অবশেষে একটা দরজা খুলে গেল এবং লেখক আদালতের চোখদাঁধান আলোর সামনে উপস্থিত। এখানেই আটজন মস্তিষ্কবান ব্যক্তির বিচার হচ্ছে, counter-revolution-এর জ্ঞাত, বিদেশের সঙ্গে যড়যন্ত্র করার জ্ঞাত, sabotage এর জ্ঞাত।

প্রোজেক্টরের চম্‌চম্‌ শব্দ। * তামাক সিগারেটের ধোঁয়ার মেঘ 'কেবলের' pell-mell † প্রভৃতির মধ্যে একজন আসামী বলে উঠল, "আমি কেবল আপনাদের দুটো সংখ্যা দিয়ে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিচ্ছি—সোভিয়েটিক প্র্যান যদি সফল হয় এবং রাশিয়া যদি 'আজ জয়ী' হয়ে থাকে, তবে ইউরোপের তিনশো সত্তর মিলিয়ন অধিবাসীই এমন এক ভয়ঙ্কর গণ্ডগোলের মধ্যে পড়বে, যার ফলে, সমস্ত ইউরোপে রক্ত ছুটবে; এক-কারণে আমি যড়যন্ত্র করেছি এবং এই হচ্ছে আমার প্রথম সংখ্যা। আর দ্বিতীয় হচ্ছে—যদি প্র্যান বিফল হয় এবং রাশিয়ার সোভিয়েট সরকারের পতন হয়, তবে একশো পঁচাত্তর মিলিয়ন রাশিয়ান ক্ষুধার তাড়নায় নরককুণ্ডের মত মারামারি করে মরবে। এই হচ্ছে দুটো

† এ প্রোজেক্টরে কার্বন পোড়ান হয়, টিক সিনেমা প্রোজেক্টরের মতই, কিন্তু এগুলো পালি আলো। আলান কাজে নিযুক্ত, সিনেমার সঙ্গে কোন সংঘর্ষ নেই।

+ চারদিকেরই সব বৈজ্ঞানিক তার এমন ভাবে চড়ান যে, জড়পুঁটিকি বাঁধার মত।

পরিণাম, এ দুটোর যে-কোন একটা hecatombই হোক না কেন, রক্তের সমুদ্র বইবে এবং কোটা কোটা লোক যত্নামুখে পড়বে। আমি একজন রাশিয়ান; আমি বুঝছি যে অজ্ঞ কোন উপায়েই এই রক্তপ্লাবন বন্ধ করা চলবে না, কারণ বড়ই বিলম্ব হয়ে পড়েছে; তাই আমি দেশের এই regime-এর বিপক্ষে যড়যন্ত্র করতে বাধ্য হয়েছি।"

এবারেই, এই ১৯৩২ সালে, রাশিয়ার পূর্বাঞ্চলের নতুন 'ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সাম্রাজ্য' সাইবীরিয়ার চারিদিকে লেখক ঘুরে বেরিয়েছিলেন। সাইবীরিয়া এখন লৌহ ও কয়লা উৎপাদনের ও রাসায়নিক enterprises-এর বিরাট কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যখন ইনি এই মতলবেই যাত্রা করেন, যখন তাঁর ট্রেন জাখানির একঘেয়ে দৃষ্টাবলী ক্রমাগত পিছনে ঠেলে এগুতে লাগল, সেই জাখানিরই যার পর্য্যটক মিলিয়ন লোক আজ অনাহারে মরতে বসেছে এবং যারা আজ টিক আমেরিকার মত দুটো জিনিষেই বিশ্বাস করে, হয় একটা যুদ্ধ, না হয় একটা 'পলিটিকাল' revolution,—তখন তাঁর প্রাণে, অন্তরে, ক্রমাগত বাজছিল, ইংলণ্ডের সর্বোচ্চ অভিজাত সম্প্রদায়েরই এক বংশের দ্বিতীয় পুত্র, আন্তর্জাতিকতার 'চ্যাম্পিয়ন,' realist politician ও দোস্তোয়েভস্কি, বার্ট্রাণ্ড রাসেলের গলার মুহূর্ত শাস্ত কথা, "রাশিয়ায় টেকনিকাল উন্নতি ছাড়া, তারা কি আর করছে? এবং এই সব বৈজ্ঞানিক ও 'মরাল' জয়লাভেরই বা মানে কি, যদি এই বিংশ শতাব্দীতে সে সর্বের ফল লক্ষ লক্ষ মানুষকে পরিশ্রান্ত হৃদস্পর্শ করে' যত্নামুখে নিষ্ক্ষেপ করার যে প্রধান সহযোগী, সেই industrialisation-এর পিছনে যাওয়ার পাগলামি না হয়? Humanity এ চায়না যে, তার

অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে, তার মহিমা ক্ষয়িত হয়ে উঠুক বা উৎপাদনা শক্তি জন্মে উঠুক। বরং তার দরকার দেহের ও আত্মার একটু বিশ্রাম, কারণ এই শাস্তি দিয়েই তবে সৌভাগ্য চিনতে পারা যায়।”

এই দার্শনিকের যুক্তিই কি ঠিক? অথবা তাঁদের, যারা সাইবীরিয়ার মরুভূমিতেও industrial শহরের পত্তন করছেন এবং এশিয়া মহাদেশকে mechanised করার চেষ্টায় আছেন?

ইউরোপ-আমেরিকার মতে, সাইবীরিয়া, সে একটা বিরাট সাম্রাজ্য, মরুভূমির মত পড়ে আছে, সেখানে রাজনৈতিক বা চুরিছাকাতি খুন-খারাপী কাজে কঠিন পরিশ্রমের সাজ পাওয়া কয়েদীরা কোনরকমে দিন-গত পাপক্ষয় করে। এই দারণার কোন ভিত্তিই নেই। আজকের সাইবীরিয়া একটা বিরাট industrial region-এ পরিণত, যাকে প্রায় নিশ্চয় বলা চলে, যার শক্তি কল্পনাতীত। সাইবীরিয়ার প্রায় সমস্ত অংশই আজ mechanised, এবং শীঘ্রই এর সমস্ত এশিয়ার কলকারখানার কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াবার পর্থাস্ত স্বযোগ আছে।

১৯২৮ সালে স্ট্যালিন এক ঘোষণা জারি করেন, যাতে তিনি উরাল পর্বতের খনিজ বস্তুর Solikamsk-এর পঁটাসিয়ামের এবং পশ্চিম সাইবীরিয়ার Kusnetzk প্রদেশের কয়লার খনির উৎপাদন-এর উপর ভিত্তি করে ওরিয়েন্টাল এক নতুন industrial territory সৃষ্টি করার আদেশ দেন। বিরাট রকমের এক experiment-এর চেষ্টা করবার আদেশ তিনি এভাবেই দিয়েছিলেন।

চৌদ্দ শ ইঞ্জিনীয়ার মহা মহা পণ্ডিতলোক, প্রাকটিক্যাল এক্সপার্ট ও

theoretician মিলে এক প্রান খাড়া করেন। আমেরিকান ও জার্মান কার্ফ মস, সে সব ‘ষ্টেপী’ প্রদেশে কারখানার পত্তন আরম্ভ করে যে সব প্রদেশ কালে পৃথিবীর সর্গপ্রধান সম্পদশালী স্থানে দাঁড়াবে।

নতুন আর এক industrial region, অতি বিরাট এক স্থান জুড়ে রাশিয়ায় occidental frontier থেকে চার হাজার কিলোমিটার দূরে মাথা পাড়া করেছে। সেখানে নানারকমের খনি, কয়লার সব বড় বড় খাদ, নানান সব locks, বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করবার কেন্দ্র, কারখানা এবং মেশিন তৈরী করার বড় বড় workshop সবই সেখানে উঠেছে; Railway ও রাস্তার, উত্তর এশিয়ার Tandras পর্থাস্ত চিরে যাওয়ারও বাকী নেই।

কেবল একটি লোকের আদেশে অতি-আধুনিক প্রণালীর কল্পনাযুগ্মী বিরাট বিরাট সব কারখানা এগিভাবে তৈরী হয়েছে যে, সে-সব মাত্র বিশদিনের মধ্যেই যুদ্ধের সরঞ্জাম প্রস্তুতের কারখানাতে পরিণত করা যায়। রাশিয়ার সীমানার কোলে-কোলেই অর্থাৎ আফগানিস্তান, তুর্কীস্থান, মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি দেশে রাশিয়ার প্রস্তুত হ্রব্যের বিরাট সব বাজার গোলা পড়ে আছে। বিনা গোলমালে এদেশে যা অল্প অল্প করে এগিয়ে চলেছে, সম্ভবত; তাই বিশ শতাব্দীর সর্গপ্রধান ঘটনা হয়ে দাঁড়াবে, Industrialisation of Asia।

Industrialisation-এর ক্রমোন্নতি যদি কারো দেখতে ইচ্ছে হয়, তাঁকে ত্রিশ হাজার কিলোমিটার ভ্রমণের জন্ত প্রস্তুত থাকতে হবে। লেখক নিজে এই দূরত্ব ভ্রমণ করেছেন। তিনি প্রথমে Moscow থেকে বৈকাল হ্রদ পর্থাস্ত Trans-Siberian এ যান। পরে কখনও বা ঘোড়া বা অস্ত্র কোন জন্তজোড়া গাড়ীতে, কখনো বা আলতাই

পর্যন্ত চূড়ার উপর দিয়ে কয়লার বনির কেন্দ্রস্থল Knsnetzkt এ আসতে এরোপেনে চড়েছেন। Turkish Siberia's Novo-Sibirsk থেকে, strategic railway হস্তায় চারখান ট্রেন নিয়ে ১৯২৭ সালে পোলা হয়েছিল সেই রেলের এক্সপ্রেস ট্রেন আজ দিনে ছবার ছেড়ে Bamaul পন্যস্থ যায়। Bamaul হচ্ছে একটা রেলের টার্মিনাস; এই রেল ঠিক Trans-Siberien রেলের সঙ্গে 'প্যারালেল' এবং কেবল মালবহন-কাধেই রেলের ব্যবহার।

Tasehkent এ Kasakslant-এর বড় copper-mines এ আসতে হলে, Turk-Siberia ঘুরে Bamaul থেকে Alma Ater হয়ে আসতে হয়। Orenburg, Samora ও দেখা আবশ্যিক। এই ইণ্ডাস্ট্রিয়াল মার্কেল'র যা কিছু তা এখন প্রতি হপ্তাতেই বদলে যাচ্ছে এবং আগে যারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে একই হালচালাে জীবন কাটিয়ে এসেছে, রাতারাতি আজ তারা জীবনসংগ্রামে পাগল হয়ে, কারণানায় মজুরের কাজে নিযুক্ত।

এ ব্যাপার মন্তোতেই ইতিমধ্যে দেখা গেছে।

Metropole Hotel এর vestibule এ Mounts Altai, Cakontes republic এবং অল্প সমস্ত Russian States এর ব্যক্তিত্ব জড় হয়েছে। সব মুখ বেশ মন্থন, হলদে এবং চোখ চঞ্চল। এদের অধিকাংশই 'wydwsienietz', অর্থাৎ যুবক, যারা তাদের রাজনৈতিক প্রতিভার গুণে মাথা তুলতে সক্ষম হয়েছে এবং বাদেদের সঙ্গে 'অথরিটি'র। বেশ সহজেই দেখা করে: অধিকাংশ সময়েই এরা G. P. U.* র বিশ্বাসের পাত্র এবং এক 'প্রোফেশান' থেকে সম্পূর্ণ অচ্ছ এক অবস্থায়, এদেরই পরিবর্তিত করা হয়, কেবল অভিজ্ঞতা অর্জনের নিমিত্ত।

* রাশিয়ার গুপ্তচর বিভাগের (Secret Service) নাম।

একজন বুদ্ধিমান কৃষক ছ'মাসের কোর্সের পর প্রোফেসার হয়: একজন শোকার, ঐ সময়ের পরে, একজন প্রচারক হতে পারে। আজ যে সময়পক্ষে বাস করছে, কাল সে Solitramsk এ; অপর একজনকে Novosibirsk থেকে মন্তোয় পাঠান হোল। এম্বিভাবেই administrations এ সর্কদাই যাওয়া আসা চলছে।

এই সব মন্তোল, তাতার, যাকুত, যুবক ও কাসাকাতানের (Kasakatan) লোকদের মধ্যে লেখক এক অনেকদিনের পরিচিত লোককে দেখতে পান। মন্তোলিয়ায় জন্ম এঁর এবং Aldan এ ইনি একটা বীসার বনির অধিকার পান। যনিও ইনি বড়লোক ছিলেন, কিন্তু যাকুতের সোভিয়েট রিপাব্লিকের মন্ত্রী হবার খেয়ালটা ত্যাগ করেননি; হয়েছিলেনও। আশ্চর্য্য লোক বটে; কিছুদিন হ'ল, সবে তিনি জেল থেকে বেরিয়েছেন। আমায় বলেন, "ও একটা ভুলবশতঃই এ ব্যাপার ঘটেছিল।" এঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল এই যে, ইনি বাকী কৃষকদের মধ্যে কোনরকম গুণগোলের সৃষ্টি করছিলেন। ছ'মাসের জেল, কোন রকমে মরণের স্পর্শ থেকে বেঁচে গেছেন। কিন্তু তা হলেও যুবকের মুখে হাসি আবার নতুন করে দেখা দিল এবং ইনি তাঁর নানা রকমের ফন্দীর কথা পাড়লেন। সাইবীরিয়ার সমস্ত উত্তরাঞ্চলেই এঁর ইচ্ছে একটা নতুন উপনিবেশ স্থাপন করা, এবং আলভান প্রদেশে ক্ষেত্র কর্ষণাচ্ছপযোগী তাইগার কেন্দ্রে শস্যোৎপাদনের যোগ্য এবং সম্পদশালী রাজ্যের সৃষ্টি করা। এঁর মতে, এদেশীয় 'ষ্টেঙ্গী' অতীব স্বফলা, তবে ব্যবহার জানা চাই।

লেখক, জিসক।

(ক্রমশঃ)

“ক্যাবলাদা”

মহুমেন্টের দ্বারে দাঁড়াইয়া কত কথাই না ভাবিতেছিলাম! অতীত দিনের কত স্মৃতি—কতক করণ, কতক অকরণ, মনে একে একে ভাসিয়া আসিতেছিল।

স্বর্ঘ্যা বেচারী সারাদিন বেগার পাটিয়া হযরান হইয়া সবে মাত্র ডুব মরিয়াছে। শহর ভরিয়া গিয়াছে বিজলী বাতিতে। পাশাপাশি নৌরবে দাঁড়াইয়া মহুমেন্ট আর আমি।—

হাওয়া পাইতেছিলাম,—থাওয়ার জিনিষের মধ্যে এ জিনিষটাই শস্তাতম বলিয়া। হাওয়া পাইতেছিলাম, আর ভাবিতেছিলাম অতীত দিনের কথা।

হঠাৎ অতি মধুর এতটা গানের স্বর কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল। গলাটা অনেকটা ক্যাবলাদার মত লাগিল। কিন্তু ক্যাবলাদার এমন তৈরী গলা? এ যে জ্ঞান গৌসাইকেও হার মানায়! কাছে গিয়া দেখি ইয়া, ক্যাবলাদাই তো বটে! আশ্চর্য্য ব্যাপার! গান শুনিয়া আস্তে আস্তে লোকে ভিড় জমাইতেছে। ক্যাবলাদার সেদিকে জ্ঞপ্তি নাই। ঘাসের উপর ওস্তাদী কায়দায় বসিয়া দুই হাত ও মাথা কালোয়াতী ধরণে নাড়িয়া, ক্যাবলাদা বেপারোয়াভাবে গাহিতেছে,

“কোন দরদী এলে আমার

মনের কিমারায়?

টেউ জেগেছে তাই তো আমার

গানের দরিয়ায়।

চিন্তে যে স্বর নিতা দোলে,

স্বপন মায়া জাগিয়ে তোলে,

গানের কাদে সে স্বর কাদে

প্রাণের বাগিচায়।.....”

গান থামিল। ভিড়-জমানো লোকগুলি কতকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল এই আশায় যে হয় তো আরেকথানা গান শুরু হইবে। কিন্তু শুরু আর হইল না। ক্যাবলাদা একবার পিছন ফিরিয়া দেখিল দিবা ভিড় জমিয়াছে। এতক্ষণ ক্যাবলাদা আমার দিকে নজরই দেয় নাই। এবারে বলিল “কিরে গোকা, দাড়িয়ে আছিস এতক্ষণ খেয়াল করি নি। ‘আয়, তোর সঙ্গে কথা আছে।’”

ক্যাবলাদার কাছে গিয়া বসিলাম। বলিলাম, “ক’বছর যাবৎ যে তোমার খোঁজই নেই। কি ব্যাপার বলো তো? কোথায় ছিলে ‘আদ্বিন’?”

“নানান জায়গায়—লক্ষৌ, গোয়ালিয়ার, রামপুর, আগ্রা ইত্যাদি। মানে ভারতীয় সঙ্গীতের যতগুলো কেন্দ্র আছে সবগুলোতেই ঘুরে এসেছি। দেখা শোনা হয়েছে ঢের লোকের সঙ্গে—পণ্ডিত ভাতখণ্ডে প্রফেসর শ্রীকৃষ্ণরতন জহর, পণ্ডিত বিষ্ণুদিগধর—সে অনেক কথা রে।”

এখানে ক্যাবলাদার কথা কিছু বলা দরকার। বি-এ পরীক্ষায় hat trick করিয়া ক্যাবলাদা হঠাৎ একদিন বাড়ী ছাড়িয়া কোথায় উড়াও হইয়া গিয়াছিল। সে প্রায় ছয় বৎসর আগেকার কথা। ক্যাবলাদা যে ছাত্র খারাপ ছিল তাহা নহে। কিন্তু বি-এ ক্লাসে ভর্তি হওয়ার পর হইতেই তার ভারতীয় সঙ্গীতের দিকে এত ঝোঁক চাপিল যে গোপনে

পড়ার বই বিক্রী করিয়া সে একটা হারমোনিয়াম কিনিয়া রোজ ভোরে ও বিকালে সা-রে-গা-মা সাদিতে লাগিল। পাড়ার লোক জ্বালাতন হইয়া উঠিল কিন্তু ক্যাবলাদার গায়ের জোর ও মিলিটারী মেজাজ সকলেরি জানা ছিল—কেহ কিছু বলিতে সাহস করিল না। ক্যাবলাদার না অনেকদিন আগেই ভবনদী পাড়ি দিয়াছিলেন। তখন ক্যাবলাদা শিশু। সেই হইতে ক্যাবলাদার বাবা একমাত্র বংশধরকে খুব আদরে ও যত্নে বহিত করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু উপরোক্ত hat trick এর পর তার দৈর্ঘ্য আর রহিল না। তিনি ক্যাবলাদাকে বেশ কড়া করিয়াই শুনাইয়া দিলেন, “তোমার খাঁড়র মতো চ্যাচানি শ্রেফ বন্ধ করে দিতে হবে। বার বার তুমি ফেল্ করবে আর তোমার পড়ার খরচ জুগিয়ে মরবো আমি সে আর হবে না।”

ইহার পরের ঘটনা :—পঁচাত্তর পারসেন্ট লোকসান দিয়া ক্যাবলাদার হারমোনিয়াম বিক্রী ও উদ্ধাও হওয়া। শবরের কাগজে অনেকদিন ধরিয়া সাড়ে তিন হাজার টাকার “খোঁজ দিতে পারিলে এক হাজার টাকা পুরস্কার” ও “ক্যাবল কিরে এসো” ছাপাইয়াও কোন ফল হইল না। মনের দুখে ক্যাবলাদার বাবা কৃতান্তবানু দিনে চারবারের বদলে মাত্র তিনবার খাইতে লাগিলেন এবং ক্যাবলাদার ঠাকুরমা প্রতাহ প্রাতে গনরো মিনিট এবং বিকালে আধ ঘণ্টা করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

বলিলাম, “এই ক’বছরের ভেতরে এত marvellous গলা কি করে তৈরী করলে বলো তো ক্যাবলাদা। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির চাইতেও এমন তৈরী গলার দাম চের বেশী।”

ক্যাবলাদার মুখে খুশীর হাসি দেখা দিল। ক্যাবলাদা বলিতে

লাগিল কি করে এমন গলা তৈরী হল তা পরে বলবো। এখন বললে তোর হয় তো বিশ্বাস হবে না। বলবি, হয় আমার মাথা ধরাপ হয়ে গেছে আর না হয় তো তোকে দাঙ্গা দিচ্ছি। আমার ভ্রমণ কাহিনী একটু শোন। পালিয়েই তো প্রথম গেলাম লক্ষ্মীতে ‘মরিস্ কলেজ অব হিন্দুস্তানী মিউজিক্’ এ। ভক্তি হয়ে গেলাম। এক বছরে সা-রে-গা-মা-ই কায়দায় আনতে পাবলাম না। প্রিন্সিপাল রতন জ্বর বললেন সঙ্গীত-সরস্বতীর আমার ওপর রূপা হওয়ার আশা অত্যন্ত অল্প। তখন লক্ষ্মী ছেড়ে গেলাম রামপুর। সেখানেও ঐ রকম ব্যাপার হল। গোয়ালিয়ারেও তাই। যেখানেই যাই সেইখানেই ঐ ব্যাপার। তারপর বোধের বিখ্যাত খেয়ালী প্রোফেসর আবদুলকরিম খান কাছে গেলাম। গাইয়ে বটে একজন! বুড়ো মানুষ—ভারী অমায়িক লোক। অনেক আলাপ হল তাঁর সঙ্গে। বললেন, হিন্দীতে অবশ্য—‘বাচ্চা, তোমার গান শেখার খুব আগ্রহ দেখছি, কিন্তু ছুংখের বিষয় খোদা তোমাকে তেমন গলা দেন নি। তবু চেষ্টা করো, খোদা হয়তো কোনো দিন মোহেরবাণী করুতে পারেন।’ তারপর অনেক গল্প হল। তানসেনের সমাধির ওপর যে গাছের পাতা পড়ে শুকিয়ে থাকে সে পাতা নাকি অনেক গায়ক খেয়ে ফেলেন, গলা ভাল হবে বলে। এ কথাটা শুনেই আমার মনে একটা আইভীয়া ঢুকলো।

তার পরে তিন বছর প্রাণপণে গবেষণা করেছি, আর তারি ফলে—থাক্, এখন আর বলবো না। কাল দুপুরবেলা আমার বাড়ীতে ঘাস, সব বলবো। আর সব তোকে দেখাবো—ভুই একেবারে অবাক হয়ে যাবি।”

“আজ্ঞা ক্যাবলাদা, এত জায়গা ঘুরলে কি করে বেলো তো! এত খরচা—” “আরে বোকা, সঙ্গে যথেষ্ট রেশন নিয়েই বেরিয়েছিলাম। আমার

নাম কাবলা বলে আমি কি সত্যি সত্যিই কাবলা নাকি? আচ্ছা এবারে তাহলে চলি। অনেক জায়গায় যেতে হবে। গিরিজাবাবুর কাছে সাতটার আগেই যাবার কথা। তার পর জ্ঞানবাবু, তাদের জ্ঞান গোসাইয়ে, তারপর কেটবাবুর ওখানেও একবার যাবো। তুই কাল বাস তাহলে—কেমন?

আমি তাহাকে প্রতিশ্রুতি দিলাম। কাবলাদা এসপ্লান্ডের কাছে আসিয়া একটা বাসে উঠিল।

পরদিন কথামত কাবলাদার বাড়ী গেলাম বেলা বারোটায়। কাবলাদা তখন মাথার উপরে বিজলী পাখা ছাড়িয়া দিয়া গৌড়সারং গাহিতেছে। হাতে একটা ছোট শিশি—তাহার ভিতরে ছোট ছোট কতকগুলি পিল, এবং উপরে একটা ছোট লেবেলে লেখা “গৌড়সারং”।

জিজ্ঞাসা করিলাম, “এ কি কাবলাদা? শিশিটার ভিতর কি?”

গান থামাইয়া কাবলাদা বলিল, “বোস্ না, সব বলছি।”

বসিলাম। কাবলাদা বলিল, “একটা গান গাইবি?”

“বল কি কাবলাদা, জীবনে কোনোদিন গুনগুন করেছি বলেও মনে পড়ে না, গান গাওয়া তো দূরের কথা! আমি গাইবো গান?”

“আচ্ছা পাড়া। বলিয়া কাবলাদা একধারে একটা টেবিলের উপরে Accounting machine এর মত একটা যন্ত্রের সামনে গিয়া পাড়াইল। তারপর ছোট্ট এক শীট কাগজ নিয়া একটা লম্বা সরু ফাঁকের ভিতর দিয়া যন্ত্রের মধ্যে ঢুকাইয়া দিয়া বলিল, “তুই তো প্রেমের গান ভারী পছন্দ করিস, না?”

আমার উত্তর দিবার সময় না দিয়াই ঘটর ঘটর করিয়া কাবলাদা

কতকগুলি চাবি খুরাইয়া দিল, তার পর একটা হাতল ধরিয়া মোচড় দিতেই সেই কাগজের টুকরাটা বাহির হইয়া আসিল, তাহাতে একটা গান লেখা—

“হায় সজনী দিন রজনী

নয়ন আমার ঝরে;

কেন শুদরে লুকিয়ে আছে,

মন যে কেমন করে।

আজকে আমার গানের মায়ায়

দাও গো দরা স্বরের ছায়ায়,

নিবিড় করে বাধো আমায়

প্রেমের ফুল-ডোরে।.....”

অবাক হইয়া কহিলাম “এ কি ভুতুড়ে ব্যাপার?”

মুহু হাসিয়া কাবলাদা “বাগেশী”-লেবেল ওয়ালা একটা শিশি হইতে একটা পিল বাহির করিয়া টপ করিয়া আমার মুখের ভিতর ফেলিয়া দিল। (আমি অবাক হইয়া ইা করিয়া ছিলাম!) বলিল, “থেকে ফ্যাল।” পিলটা বেশ মিষ্টি। চুমিয়া গিলিয়া ফেলিলাম।

“এইবারে এই মেমারি ট্যাবলেটটা খেয়ে ফ্যাল।” বলিয়া কাবলাদা আমাকে আরেকটা পিল পাইতে দিল। পাইলাম।

“এইবারে এ গানটাকে বাগেশী রাগিণীতে পাইতে পারিঙ্গ কি না দেখ একবার।” বলিয়া কাবলাদা গানের কাগজটা আমার হাতে দিল। কি আশ্চর্য! গানটার উপর একটাবার মাত্র চোখ বুলাইতেই গানটা অদ্ভুত রকম সুখস্থ হইয়া গেল।

তারপর চেষ্টা করিতে না করিতেই দেখি বাগেশী রাগিণীতে গানটি গাহিয়া চলিয়াছি। তখনকার মনের ভাব যে কি হইল তাহা ভাষায়

বর্ণনা করা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। ভগবান হঠাৎ না বলিয়া কহিয়া হঠাৎ এক ভদ্রলোকের উপর ভগবানগিরি অর্পণ করিয়া দিলে সেই ভদ্রলোকের যেমন অবস্থা হওয়া সম্ভব আমার বোধ হয় তখন প্রায় সেই অবস্থাই হইয়াছিল।

গান থামিলে অবাধ হইয়া ক্যাবলাদার দিকে চাহিলাম। সে চাহনিতে “ব্যাপার কি?”—এই প্রশ্নটি মুগ্ধ হইয়া উঠিল। ক্যাবলাদা কহিল, “বুঝতে পারলি নি? এ হলো ঐ বাগেশী ট্যাবলেটের গুণ। গানের কথাগুলো পাছে ভুলে যাস সেই জন্তে একটা মেমারি ট্যাবলেটও থাইয়ে দিযেছিলুম। যখন যে রাগিণী গাইতে ইচ্ছে হবে তখন সে রাগিণীর একখানা ট্যাবলেট খেলেই বাস।” অদ্ভুত আবিষ্কার নয়?”

শ্রদ্ধায় তৎক্ষণাৎ ক্যাবলাদাকে টিপ করিয়া একটা প্রণাম করিয়া কেলিলাম। কহিলাম, “এমন অদ্ভুত আবিষ্কার মাহুষ কখনো করতে পারেনি ক্যাবলাদা। এ যে কেউ হঠাৎ বিশ্বাসই করতে চাইবে না।”

ক্যাবলাদা কহিল, “There are more things in heaven nad earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy। এ অনেক মাথা-দামানোর ফল রে, অনেক গবেষণার ফল। গান জিনিষটা কি সোজা হয়ে গেল দেখলি? বিনা সাধনায় সিদ্ধি।”

তারপর কতকগুলি শিশি দেখাইতে দেখাইতে—“এই দেখ, সব রকম রাগিণীর ট্যাবলেট আছে। দরবারী কানাড়া, মালকোম, আড়ানা, বাহার, যোগিয়া, ভীমপলশ্রী, ইমন, ভূপালী—যা চাইবি তাই পাবি।”

প্রশ্ন করিলাম, “বলো তো ক্যাবলাদা, কি করে এগুলো তৈরী করলে?”

ক্যাবলাদা কহিল, “ট্রেড সীক্রেট ফাঁস করবো না ভাই। তোর

সাহিত্যের নেশা ঘেরকম জোরালো, তাতে তোর কাছে বলা মানেই বাংলার পাঠক মহলের সবাইকে বলা। আর তাহলেই আমার ব্যবসা মাটি। তবে, মোটামুটি তোকে বলছি ব্যাপারটা। Poponoff-এর sound vibration theory জ্ঞানিস তো? সেই theory টাকেই আমি কাজে খাটিয়েছি। প্রত্যেকটি স্বরের আলাদা রকম ভাইব্রেশন হয়, আর এই যে ট্যাবলেটগুলো, এ সব হচ্ছে খুব sound sensitive বা শব্দগ্রাহী পদার্থ দিয়ে তৈরী। এ গুলোকে liquid etherএ বেশ ভালো করে ভিজিয়ে নিয়ে তারপর রোদে শুকিয়েছি। তারপর, কোন কোন রাগিণীতে কি কি স্বর দরকার হয় এগুলো জেনে নিয়ে থাক আর নয়।

“আর এই যে গান রচনার যন্ত্র দেখছিস, এটার ভিত্তি হচ্ছে আমারি নিজস্ব একটা থিওরির ওপর। ওসব তুই হয়তো বুঝবি না, বুঝলেও তুই গোপন রাখতে পারবি না, সবাইকে জানিয়ে দিয়ে আমার ব্যবসা মাটি করবি।”

তারপর দুজনে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া ঠিক হইল চৌরঙ্গীতে একটা বড় ঘর ভাড়া করিয়া মহা সমারোহে ব্যবসা আরম্ভ করিতে হইবে। তাতে আমিও একজন অংশীদার থাকিব। আমার মন খুশীতে ভরিয়া উঠিল। এমন একটা যুগান্তকারী ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত থাকা কম কথা নয়।

চৌরঙ্গী রোডে মস্ত একটা ষ্টল ভাড়া করা হইল। তারি সারে শোভা পাইতে লাগিল একটা মস্ত বড় সাইনবোর্ড, তাতে লেখা “Wonder Tablet Company.”

কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন পড়িয়া দেশের লোক থ হইয়া গেল। সবাই স্থানিল, রাতারাতি কালোয়াং হইবার সোজাতম উপায় বাহির হইয়াছে,

কিন্তু অনেকেই সহসা বিশ্বাস করিতে রাজী হইল না। শেষকালে বিশ্বাস করিতে হইল সকলকেই। দোকানে অসম্ভব ভিড় হইতে লাগিল, ট্যাবলেট বিক্রি করিতে করিতে ক্যাবলাদা হযরান হইতে লাগিল, আর আমি গান রচনার যন্ত্রটাকে গরম করিয়া সঙ্গে সঙ্গে নিজেও ঘামিয়া উঠিতে লাগিলাম। রাত্তার ট্রাফিক পুলিশের কাজ বিষম বাড়িয়া গেল এবং সারা শহর রাগিনীমুখরিত হইয়া উঠিল। একদিনের মধ্যে ছ হাজার সাতশো তিপান্ন জন গায়ক তৈরী হইল এবং পনেরো হাজার একাশী খানা গান লেখা হইয়া গেল। দশ ক্যাবলাদার ট্যাবলেট—দশ গান রচনার যন্ত্র!

বোলপুরের বিখ্যাত গীত-রচয়িতা কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় খবর পাইয়া চিন্তিত হইলেন। কাজী নজরুল প্রমুখ কলিকাতার গান লিখিয়েরাও একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন।

কটন মিলের আগমনে প্রথমে তত্ত্বাবয়দের যেমন অবস্থা হইয়াছিল ইহাদের অবস্থাও প্রায় তেমনি হইল। নানা রেকভিং কম্পানি হইতে গানের জ্ঞা এদের সঙ্গে যে সব কন্ট্রাক্ট ছিল সব ক্যাপেল হইয়া গেল—অর্ডার আনিতে লাগিল ক্যাবলাদার কম্পানিতে। কারণ, মেশীনে তৈরী গানের যেমন চমৎকার ফিনিশ তেমনি সস্তা দর।

বড় বড় গায়কদের অনেকেই মন্তক বিগড়াইয়া গেল এবং শীঘ্রই খবর পাওয়া গেল, তানপুরা, তবলা, বায়া ইত্যাদি মাটির দরে বিক্রয় হইতেছে।

ক্যাবলাদার কম্পানির রূপায় বাংলাদেশ কালাঘাতে ভরিয়া উঠিল। ঝাড়দার ও ঝাড়দারগীরা প্রত্যয়ে ভৈরো গাহিতে গাহিতে পথ ঝাঁট দিতে বাহির হয় “ভৈরো ট্যাবলেট” রাইয়া। একটু রোদ উঠিলেই ভৈরবী ট্যাবলেট খায়, আর ভৈরবী গাহিতে গাহিতে ঝাড় চালায়।

গাড়োয়ানরা দুপুরবেলা গোড়সারং, বৃন্দাবনী সারং গাহিতে গাহিতে গাড়ী চালায়। দুপুর রাতে দরবারী কানাদা, অর্ডিনারি, বাগেশ্রী, কেদারা, ইত্যাদিতে আকাশ বাতাস ভরিয়া উঠে। সোজা কথা ও সংক্ষেপে বলিতে গেলে নতুন-প্রেম-পড়া তরুণ যেমন প্রেমের নেশায় মশগুল হইয়া থাকে, তেমনি সারা বাংলাকে গানের নেশায় পাইয়া বসিল। ক্যাবলাদার যশ হ হ করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল, এবং ট্যাবলেট ও গান বিক্রির টাকায় ক্যাবলাদার ব্যান্ড-ব্যালান্স হ হ করিয়া বাড়িয়া চলিল। ক্রমে সারা ভারতবর্ষে ক্যাবলাদার ট্যাবলেট ছড়াইয়া পড়িল। ওস্তাদমহল প্রমাদ গণিলেন। তাহাদের এতদিনের সাধনার ফলে তাহারা বাহা পাইয়াছেন, ক্যাবলাদার অসুত ট্যাবলেটগুলি তাহা জনসাধারণের পক্ষে একেবারে অনায়াসলভ্য করিয়া দিয়াছে। অতঃপর ওস্তাদ-শিরোমণিগণ বড়লাট বাহাদুরের নিকট এক ডেপুটেশন পাঠাইলেন :
উদ্দেশ্য—কোন নতুন অর্ডিনান্স দ্বারা ক্যাবলাদার এই অসুত ওস্তাদমারা ব্যবসা বন্ধ করা যায় কি না। কিন্তু ডেপুটেশন পাঠাইয়াও কোন সফল হইল না। উন্টা ফল হইল এই যে ক্যাবলাদা স্কেপিয়া গিয়া জলের দরে (অর্থাৎ খুব শস্তায়) ট্যাবলেট বিক্রি করিতে লাগিল। কহিল, “গানে গানে ছেয়ে ফেলবো সারা দেশটাকে। ওস্তাদগুলোকে ভাতে মারবো।”

অবস্থা প্রায় তেমনি দাঁড়াইল। আজীবন যাহারা সঙ্গীতের চর্চাই করিয়া আসিয়াছেন, তাহারা হঠাৎ অজ্ঞ কাজে হুবিধা পাইলেন না। বহু ওস্তাদ জীবন-বীমা, পাটের দালালী, চানাচুর বিক্রী, প্রাইভেট ট্রাইশ্ব ইত্যাদি করিতে গিয়া অকৃতকার্য হইয়া হাল ছাড়িয়া দিলেন এবং ক্যাবলাদাকে অভিশাপ-বাণে জর্জরিত করিতে লাগিলেন। গোপনে গোপনে তাহারা যড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন, কি ভাবে

ক্যাবলাদাকে ভব-নদী পার করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। চান্দা তুলিয়া তাঁহার একদল গুণ্ডা ভাড়া করিলেন, এই মহৎ উদ্দেশ্যে।

একদিন আমি ও ক্যাবলাদা রাত বারোটায় ফিরিতেছি বায়ত্বোপ দেখিয়া। তাড়াতাড়ি ফিরিবার জন্ত একটা গলির ভিতর ঢুকিলাম। সুরু গলি—কোনরকমে দুজন সুরু লোক পাশাপাশি চলিতে পারে। হঠাৎ দুমণ চেহারার দুটি লোক আগাইয়া আসিয়া সেলাম ঠুকিয়া ক্যাবলাদাকে কহিল, “নামোশ্কার, কেবল। এইটুকু টুকু করিয়ে গিলিয়া ফেলান তো।” বলিয়া একটা লোক একটা :ছোট শিশি বাহির করিল। হঠাৎ একটা অচেনা অজানা লোকের এইরূপ সাধা শুভা খাওয়াইবার আগ্রহ দেখিয়া ক্যাবলাদা বেশ একটু ভাবাচাঁকা পাইয়া গেল। আমিও ঘাবড়াইয়া গেলাম, বিশেষ যখন দেখিলাম দুটি লোকের হাতেই ধারালো ছোরা গলির মিটমিটে আলোতেও ঝকঝক করিতেছে।

একটু সামলাইয়া লইয়া ক্যাবলাদা কহিল “বাড়ীসে ভরপেট থাকে বাহার চয়া ভাইয়া—ক্ষমা একদম নেই ছায়। কিছু পানেকা ক্ষমতা ছায় নেই। তুম ইসকো থা লেও।”

“খাইতে হোবে—ওঝোজো খাইতে হোবে” শিশি হাতে লোকটা বলিল।

তাহার সঙ্গীট কহিল, “জরুর থানে হোগা বাবুসাব। নেহি তো—” বলিয়া ঝকঝকে ছোরাটি তুলিয়া দেখাইল।

বাহাদুর বলিতে হইবে ক্যাবলাদাকে। আমি যখন ভয়ে কাঁপিতেছি ও ঘামিয়া উঠিতেছি তখন সে দিবা উহাদের সঙ্গে আলাপ জুড়িয়া দিয়াছে। কথাবার্তা জানা গেল, ওস্তাদমহল হইতে ইহার নগদ এক হাজার টাকা পাইয়া ক্যাবলাদাকে পুথিবী হইতে সরাইবার ভার নিয়াছে।

এ কাজটা সহজে সারিবার জ্ঞাই ইহার। পটাসিয়াম মায়ানাইড আনিয়াছে। তাহার। শুনিয়াছে, তরুণ প্রেমিকেরা আজকাল এই জিনিষটা খুব ব্যবহার করিতেছে। ইহাতে কাজ না হইলে ছোরা তো আছেই—অগত্যা সেটাই ব্যবহার করিতে হইবে।

ক্যাবলাদা কহিল, ওঃ! এই ব্যাপার? তা ছাধো ভাইয়ারা! রূপেয়া তো তুমকো মিল গিয়া? এখন হামকো খুন করলেও যা না করলেও ওহি ছায়—তুমলোককো কোনো লাভ লোকগান নেহি ছায়। কাজেই হামকো মারনেসে তুমকো ক্যা লাভ হোগা?”

গুণ্ডাঘয় কহিল, “আওর তুশো রূপেয়া মিলে গা।”

ক্যাবলাদা পকেট হইতে তৎক্ষণাৎ পাচশো টাকা বাহির করিয়া দিয়া কহিল, “হাম আভি তুমকো পানশো দেতা। আউর পানশো দেগা কাল। হামকো ছোড় দেও।”

বলা বাহুল্য, গুণ্ডাঘয় ক্যাবলাদার এই সন্তটাকেই পছন্দ করিল। ঠিক হইল, পরদিন রাত্রে ক্যাবলাদা দারোয়ান দিয়া বাকী পাচশো টাকা একটা কোঁটায় ভরিয়া ঠিক এই জায়গায় পাঠাইয়া দিলেই উহার। প্রয়োগ বুঝিয়া সেটা লইয়া যাইবে।

এই ব্যাপারের পর ক্যাবলাদার উৎসাহ আরো বাড়িয়া গেল। ওস্তাদদের উপর আগে ছিল সামান্য বিদ্বেষ, এবারে হইল নিদামণ রাগ। টাবলেটের দাম আরো ঢের কমানো হইল। গানে গানে সারাটা দেশ আকুল হইয়া উঠিল।

এদিকে মেমারি টাবলেট খাইয়া ধূলকলেজের ছাত্রদের স্বশিক্ষিত এমন অদ্ভুত রকম বাড়িয়া গেল যে যে যা পড়ে তাই মনে থাকিয়া যায়, চেষ্টা করিয়াও ভুলিতে পারে না। ফলে পরীক্ষায় সকলেই পাস হইতে লাগিল। মুনিভাষি’টির কর্তৃপক্ষ প্রমাদ গণিলেন। সব ছাত্রই যে পাস

করিয়া যায়, উপায় কি? সিগারেটে মীটিং এর পর মীটিং হইতে লাগিল।...

শেষকালে অবস্থা এই দাঁড়াইল যে শ্রোতা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, সবাই গায়ক। গানের জালায় লোক অস্থির হইয়া উঠিল। সঙ্গীত-রস অবিরাম পান করিতে করিতে সারা দেশের অন্তর-জঠর ক্ষীত হইয়া উঠিল। আর জায়গা রহিল না।

ক্যাবলাদা কহিল, “আর না ভাই। আমার কাজ শেষ হয়েছে। এবার আমি বিদায় নেবো।”

আমি কহিলাম, “কেন ক্যাবলাদা। তোমার মেমারি ট্যাবলেট এখনো চলবে। গানের ট্যাবলেট বিক্রি কয়েকমাস বন্ধ রাখ।”

ক্যাবলাদা কহিল, “আর না ভাই। এবার হৃদয়ের ভেতর যথার্থ সত্য আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি। রাখণ যে স্বর্ণে যাবার সিঁড়ি তৈরী করে যেতে পারে নি সেজন্য তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।”

এই আলাপের কয়েকদিন পরই ক্যাবলাদার বাড়ী গিয়া খবর পাইলাম, মাত্র হাজার কয়েক টাকা ক্যাবলাদার বাবার নামে এবং বাকী সমস্ত টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উইল করিয়া দিয়া ক্যাবলাদা যথারীতি হার্টফেল করিয়া মারা গিয়াছে।

শ্রী অকুব

স্বর্ণ-জয়ন্তী

সামান্য পয়সা-লোভে হাফ-প্যাট পরি' বন্ধরের,

হস্তে বহি কাগজ-নিশান,

শীতান্ত শিশুর দল আর্ন্তনাদ করে পথে পথে

পথিকের বালা-পালা কান!

চীৎকার করিছে হায় ভাড়া-করা শিশু ক'টি শুধু।

—চক্ষে দৃষ্টি দ্রুত শশকের,

জীর্ণ অঙ্গে মলিনতা শীর্ণ মুখে লোলুপতা মাথা

ক্ষীণ-প্রাণ ক্ষুদ্র মশকের!

একটি চপেটাঘাতে শুদ্ধ হয় বাণী যাহাদের

তারা আজ বাণী-বার্তাবহ!

হাচিলে কাসিলে জ্বোরে শিবনেত্র হয় যাহাদের,

তারা কহে, “ভয় কিবা কহ”!

পূরান চাঁকার জল শ্রামপেনের করে অভিনয়!

হেলে চাহে হইতে গোক্ষুর,

আজও হায় দাঁড়কাক ময়ূরের দেখিছে স্বপন!

ক্রান্তি নাই কল্পনা চকুর!

দলে দলে সারি সারি মাতিয়াছে দেশ-প্রেমে সব

আত্মহারা, যতেক উৎসবী,

“বিত্রোহ বাচিয়া থাক”—চাঁৎকারিছে ভীতকণ্ঠে হায়

শিশু যত লজ্জাখুস্-লোভী !

সুনিতৈছি জয় জয়—জয় রবে গগন মূখর

জয়নাথে সার্থক জীবন,

পক্ষাশ বছর দরি রাগিয়াছি টি কাইয়া মোরা

ছিন্ন-কথা করিয়া সৌবন !

সেই ছিন্ন কথা দিয়া আবারি রেখেছে হায় আজও

শব-দেহ—জীবিত সে নয় !

“বল হরি হরি বোল”—প্রাণ ধরে পারেনা! বলিতে

অর্ন্তিকণ্ঠে করে জয় জয় ।

প্রসঙ্গ কথা

শনিবারের চিঠির বর্ষ শেষ হয় আশ্বিন মাসে; বাংলা বৎসর শেষ হয় চৈত্র মাসে; ইংরেজি শেষ হয় ডিসেম্বরে। বারো মাসে এই তিনটি বৎসরান্তের ভিতর দিয়া আমরাগিকে বাহির হইয়া আসিতে হয়। মাসিকপত্রের বর্ষশেষে মাসিকপত্র-পরিচালকবর্গের স্বভাবতই জড়তা ভঙ্গ হয়, কারণ তাহার কয়েকদিন পরেই নববর্ষের বাষিক চাঁদা আদায়ের সময় আসে। অনেকগুলি টাকা একসঙ্গে পাইবার আশা সহজেই মনকে পুলকিত করে, কিন্তু ইংরেজী ডিসেম্বর এবং বাংলা চৈত্র

আমাদিগকে অল্প কোন নূতন আশায় অস্থপ্রাণিত করে কিনা তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত। যে-সব মাসিকপত্রের চৈত্র মাসে বর্ষশেষ হয়, কিংবা ডিসেম্বরে বর্ষশেষ হয়, তাহারা বৎসরে তিনটির পরিবর্তে দুইটিমাত্র বর্ষশেষ পাইয়া থাকে, আমাদের বর্ষশেষ আশ্বিনমাসে হওয়াতে আমরা তিনটি পাই। এখন দেখিতে হইবে, ইহাতে আমাদেরই সুবিধা বেশি, না তাহাদেরই সুবিধা বেশি।

প্রশ্নটি আর একটা দিক হইতে উত্থাপিত করা যাইতে পারে। অর্থাৎ নূতন কোনো কাগজ বাহির করিতে হইলে তাহার বৎসর কোন মাস হইতে আরম্ভ হওয়া উচিত? বর্ষারম্ভের উপরেই বর্ষশেষ নির্ভর করে, সুতরাং বিশেষরূপে চিন্তা না করিয়া যে কোনো মাসে কাগজ বাহির করা উচিত নহে। ডিসেম্বরে যাহাদের বর্ষশেষ তাহাদের কতকগুলি অস্থবিধা আছে। মনে রাখিতে হইবে, বর্ষশেষ হইলেই বর্ষারম্ভের চিন্তায় মন ব্যাকুল হয়। বর্ষারম্ভের কাগজ ঠিক সময়ে বাহির না করিলে গ্রাহক ক্ষুব্ধ হন, ফলে টাকা পাইতে যে শুধু বিলম্ব হয় তাহা নহে, অনেক সময় টাকা পাওয়াই যায় না। অথচ ডিসেম্বর মাসে শহরের পতিত জমিগুলি একে একে নন্দনকাননে পরিণত হয়, ভাল ভাল সার্কাস ডিসেম্বরেই আসে; সিনেমা, থিয়েটার, ম্যাজিক, একজিভিশন, কার্ণিভালের অস্থ থাকে না, সুতরাং এ সময়ে কাগজের আরম্ভ বা শেষ হওয়া উচিত নহে। সার্কাস দেখা এবং রচনা লেখা একসঙ্গে চলে না। তদুপরি জাহ্নয়ারি মাস ইংরেজিমােস হইলেও নববর্ষের আনন্দ আমরা একমাত্র এইমাসেই উপভোগ করিতে পারি। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের নিকট হইতে নিমন্ত্রণ কিছু কিছু পাওয়া যায়, রঙীন সচিত্র কাঁড়ও যে ছই একখানি না পাওয়া যায় তাহা নহে। কিন্তু বৈশাখে? বৈশাখে কোন বন্ধু যদি

নয়া করিয়া বিবাহ করেন তবেই নিঃস্বার্থ নিমন্ত্রণ জ্যোটে, ইহা ছাড়া রঙীন কার্ড যাহা পাওয়া যায় তাহা শুভ বিবাহের নহে, শুভ হাল খাতার। নববর্ষে পা দিয়াই আমরা দেনাপাওনার খাতা খুলিয়া বসি— আনন্দের স্বযোগ কোথায়? স্বতরাং কোনো কাগজেরই ডিসেম্বরে বর্ষশেষ এবং জাহ্নয়ারিতে বর্ষারম্ভ হওয়া উচিত নহে। বৈশাখে হওয়ায় বাধা নাই, কিন্তু আমাদের মতে আশ্বিন মাসই বর্ষশেষের শ্রেষ্ঠ সময়। কারণ, এই সময় দীর্ঘ ছুটি পাওয়া যায়। কাগজ বাহির হইলে, নিজে কার্যক্ষেত্রের বাহিরে চলিয়া যাওয়া যায়। কলিকাতা শহরে কোনো মারাত্মক আকর্ষণ থাকে না, অশ্লিষ্ট পূজার বাজারে যে সব অনিবার্য্য দেনা করিতে হয়, বর্ষান্তের লক্ষ টাকায় সে দেনা স্বাভাবিক কৌশলেই শোধ করিয়া দেওয়া যায়। এ দিকে পূজা-সংখ্যা কাগজেও কিছু বিশেষত্ব থাকে, পাঠকগণ তাড়াতাড়ি পরবর্ত্তী সংখ্যা পাইবার জন্য ব্যাকুল হন না; কারণ, পূজার ছুটিতে তাহারা অত্র জিনিসের জন্য ব্যাকুল থাকেন।

একটা কিছু শেষ হইয়া গেলেই আর একটা কিছু আরম্ভ আসন্ন হইয়া উঠে, আমাদের মনে সাধারণত এইরূপ একটি ধারণা আছে। কিন্তু ইহার বিপরীত সত্যটা মাসিকপত্র পরিচালকের নিকট স্পষ্ট নহে। কারণ, তাহারা মাসিকপত্র চালাইতে আরম্ভ করিয়া দিয়া কখনই মনে করিতে পারেন না যে ইহার কখনো শেষ হইবে। অর্থাৎ মাসিকপত্রের বর্ষই শেষ হয়, প্রকাশের শেষ হয় না। সাধারণত কোনো কিছুর শেষ না হইলে তাহার মাধুর্য্য চলিয়া যায়; একটানা একঘেয়ে জীবনও ভাল লাগে না, তাই জীবনের স্বাদ বৃদ্ধি করিবার জন্য মৃত্যু সর্বদা ঘরে অপেক্ষা করিতেছে। মাসিকপত্রের জীবনে যদি মৃত্যু

না ঘটিলে তাহা হইলে অন্তত তাহার পাঠক বাঁচিয়া থাকিতে পারিত না।

মাছঘের জীবনে মোটামুটি একটা বিস্তার-সীমা আছে, সেই সীমায় পৌঁছিলেই তাহার মৃত্যু। কিন্তু ইহারই মধ্যে মাছঘ বারংবার মরিতেছে; একই মাছঘের ভিতর আমরা কত পরিবর্তন দেখিতেছি; সে এই পরিবর্তনের ভিতর দিয়াই নব নব রূপে জন্মলাভ করিয়া বৈচিত্র্য রক্ষা করিতেছে। নীতিবাগীশ রামচরণ চূরির দায়ে জেল খাটিয়া নবরূপে আমাদের তৃপ্তি দিতেছে, স্বদেশ-প্রেমিক শ্রীমাশঙ্কর পরস্কীর প্রেমের দায়ে প্রহার খাইয়া হাসপাতালে জীবনের বৈচিত্র্য প্রকাশ করিতেছে, আবার বিখ্যাত পকেট-মার যশীচরণ বর্ন্তমানে উর্দ্ধবাহু-সাধু হইবার সাধনায় নিমুক্ত থাকিয়া আমাদের পুনর্জন্ম করিতেছে। ইহাই জীবন এবং তাহার রূপান্তরের কাহিনী। কিন্তু মাসিকের জীবনের ইতিহাস স্বতন্ত্র। প্রত্যেক মাসে নিয়মিতরূপে ইহার একটি করিয়া আরম্ভ এবং শেষ। ইহার মাসিক-মৃত্যু এবং মাসিক-জন্ম একটা অনিন্দিত পদ্ধতির মধ্যে পড়িয়া দ্রুত-বৈচিত্র্য হইয়া পড়িয়াছে। ইহার প্রমাণ, মাসিকের মাস-শেষ অথবা মাস-আরম্ভ, বাংলাদেশের কোনো কবিকেই কবিতা-লেখায় উদ্বুদ্ধ করে না। অথচ দেখা যায়, বর্ষশেষ এবং বর্ষারম্ভে বাংলাদেশের কবীগণ যে শুধু কাব্যে অল্পপ্রাণিত হয় তাহা নহে, এই উপলক্ষে বাংলাদেশের যাবতীয় লোক কবি হইয়া উঠে। কিন্তু ইহাতে দমিবার কিছু নাই, কারণ, একটু লক্ষ্য করিলেই ইহার ভিতর হইতে একটি সত্য উদ্গাটিত হইবে।

সে সত্যটি এই যে কোনো একটা বড় জিনিসের তিরোধান বা আবির্ভাব আসন্ন হইলেই কবি অকবি সকলেরই একটা মানসিক চাকলাও আসন্ন হইয়া উঠে। যাহা সাধারণ লোককেও কবিকণ্ঠে উৎসাহিত করে তাহা কখনো সাধারণ নহে, এবং সেই জন্মই মাসান্তে নহে, একমাত্র বর্ষান্তেই আমাদের নৈতিক বা আত্মিক লাভ ঘটিতে পারে। এ কারণ, যে সব মানসিক চৈত্র বা ডিসেম্বরে নিজের বর্ষ শেষ করিয়া বসে তাহাদের কর্মপ্রেরণা বা নৈতিক চাকলা বৎসরে মাত্র দুইবার ঘটে, আমাদের ঘটে তিনবার। এই প্রেরণা বা চাকল্যের অভাবই মৃত্যু—মাসিক-পরিচালকের মানসিক মৃত্যু। কিন্তু তবুও কাগজ চলে, কারণ তিনটি না হইলেও প্রত্যেক মাসিকের জীবনে অন্তত দুইটি করিয়া বর্ষান্ত বাধাই আছে—ডিসেম্বরে এবং চৈত্রে। এই দুইটি অন্ত ছাড়া আর কি-কি প্রকার অন্তের সাক্ষ্য আমরা সমগ্র বৎসরে পাইয়া থাকি তাহার হিসাব লওয়া কঠিন হইবে না। মনে রাখিতে হইবে, এই অন্তই আমাদের রুদ্ধ অন্তরকে অনন্তমুখী করিয়া দেয়।

একথা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই যে যতই দিন যাইতেছে ততই বাঙালীর জীবন হইতে কোনো-না-কোনো একটি বৃত্তির অন্ত ঘটিতেছে। সাহিত্যে, শিল্পে, দর্শনে, বিজ্ঞানে, রাজনীতিতে, সর্বোপরি, জীবিকাঙ্জনে, সর্বত্রই তাহার পরাজয়। এই পরাজয়ের মূলে বিহার-বাসী, উৎকল-বাসী, ডাচিরা, মাড়োয়ারী বা ইংরেজ ইহাদের কেহ-না-কেহ রহিয়াছে। বাঙালী যে ব্যবসায়ে সফলতালাভ করিতে পারে না, পরিশ্রমে ভীত হয়, তাহার কারণ অল্পসঙ্কন করিতে গেলে দেখা যাইবে, বাংলাদেশে এই-সব অবাঙালী রহিয়াছে বলিয়াই এরূপ হইতেছে। অর্থাৎ উহারাই আমাদের প্রায় সকলপ্রকার অসাকল্যের মূলীভূত কারণ।

কেবল একটি ব্যাপারে আমরা মাড়োয়ারী বা ডাচিরা বা অল্প কাহাকেও দোষী করিতে পারি নাই—কিন্তু পারিলে বাচিয়া যাইতাম। যদি উহাদের কেহ ক্রমাগত প্রবন্ধ, গল্প ইত্যাদি লিখিত অথবা এদেশে বাংলা মাসিক পত্র চালাইত তাহা হইলে বাঙালীর সাহিত্য-জ্ঞানহীনতার কলঙ্ক মুহূর্ত্তেই দূর হইয়া যাইত। আমরা তখন পরম নিশ্চিন্তে আমাদের সাহিত্যের অধিকার-হরণের জন্ত অবাঙালীর চৌদ্দপুরুষের শ্রাদ্ধ করিতাম এবং অবাঙালী কর্তৃক বাংলাদেশে যাহাতে সাহিত্যচর্চা না হইতে পারে তাহার জন্ত চীৎকার করিয়া, কাদিয়া, সভা-সমিতি করিয়া আমাদের জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি করিতাম।

স্বরাজ-আন্দোলনের মূলেও এই মনোবৃত্তি খানিকটা রহিয়াছে। ভারতবর্ষ পরাদীন থাকাতে নগরে রাস করিয়াও আমরা নাগরিক হইতে পারিতেছি না। যে পরিচ্ছন্নতা আমরা ইংরেজ পাড়ায় দেখি, আমাদের পাড়ায় তাহা দেখি না, কারণ আমরা স্বরাজ পাই নাই। পরাদীন বলিয়া আমরা বাড়ির সকল রকম আবর্জনা সর্বদা পথের উপর পথিকশিরে বর্ষণ করিয়া থাকি। স্বরাজের অভাবে আমরা পরস্পরকে প্রতারণা করি, কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করি না, শিক্ষালাভ করিতে কলেজে গিয়া কেবলই নোট মুখস্থ করি, ইতিহাস-ভূগোল শিখি না, বিজ্ঞান শিখিতে ইচ্ছা করি না, মাদুলি পরি এবং পরিশেষে রেস-কোর্সে গিয়া আধিভৌতিক উন্নতির পরাকাষ্ঠা দেখাই। স্বতরাং অবাঙালী এবং পরাদীনতাই যে আমাদের উন্নতির অন্তরায় এ বিষয়ে সন্দেহ কোথায়?

বড়বাজারে মাড়োয়ারী থাকিলে শ্রামবাজারের বাঙালী অসাদু হইতে বাধ্য। এক মাড়োয়ারীর ব্যবসার ক্ষতি হইলে অল্প মাড়োয়ারী

তাহার আর্থিক সাহায্য করে, এ সংবাদ যখন বাঙালী-বাবসায়ী শোনে তখনই সে আর এক বাঙালী-বাবসায়ীর ক্ষতিতে খুশী হইয়া উঠে। বড়বাজারের মাড়োয়ারীর বাবসায়-নিষ্ঠ। দেখিলেই শ্রামবাজারের বাঙালী-বাবসায়ীর চুরি করিবার প্রবৃত্তি অদমা হইয়া উঠে। আমাদের অবাঙালী-বিশেষের ইহাই মূল কারণ। এবং ঠিক এই কারণেই ইংরেজ-পাড়ার পরিচ্ছন্নতা দেখিলে আমাদের নোংরামির প্রবৃত্তি জাগে, ইংরেজের কর্মসাদনা দেখিলেই আমাদের মনে দুগ্ধাস্তরের অলসতা জাগ্রত হইয়া উঠে, ইংরেজের সাধুতা দেখিলে আমরা অসাধু হই, ইংরেজ দোকানীর ভদ্রতা দেখিবামাত্র আমাদের দোকানীরা ক্রেতার নিকট নবাবী-মেজাজ দেখাইতে আরম্ভ করে; হুতরাং উপায় কি?

* * *

তালিকা বাড়াইয়া লাভ নাই, কারণ স্পষ্টই দেখা যাইতেছে অবাঙালীকে বাংলাদেশ হইতে তাড়াইতে পারিলে এমন একটি বিষয় নাই যাহার উৎকর্ষসাধন আমরা না করিতে পারিতাম। অল্প কথায়, উহার আঁছে বলিয়াই একে একে আমাদের জীবনের সকল বৃত্তিরই অন্ত ঘটিতেছে। ইহারই নাম প্রাণান্ত। কিন্তু এই মহামৃত্যুকে আমরা সর্বদা স্বরণ করিতে পারি না। ইহারই অন্তরালে আমরা অল্প-পরিসরের ভিতর বৎসরে তিনবার করিয়া বর্ষশেষ এবং নববর্ষ লাভ করিয়া জীবনের বৈচিত্র্য উপভোগ করিতেছি। ইংরেজী বৎসর শেষ হইয়া নববর্ষ আরম্ভ হইল। নববর্ষের উপকূলে বসিয়া ঘন তমসাজ্জয় কালসাগরের ঢেউয়ের শব্দ শুনিতেছি। অন্ধকার গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়া উঠিতেছে, ভবিষ্যৎকে স্বাগতম করিবার সাহস নাই, অতীতের স্মৃতিভার লইয়া পিছন ফিরিয়া বসিয়া আছি মাত্র। ইহার বেশী আর কিছুই করিবার নাই।

* * *

ইহারই মধ্যে কংগ্রেসের স্বর্ণ-জয়ন্তী হইয়া গেল। কংগ্রেস যখন আছে, তখন তাহার জয়ন্তী-উৎসবও থাকিবে ইহা নিশ্চয়। পঞ্চাশ বৎসর হইল কংগ্রেসের গোড়াপত্তন হইয়াছে, কিন্তু এই পঞ্চাশ বৎসরের স্মৃতিপূজা করিতে গিয়া আমরা সত্যই কি আনন্দ করিবার মত কিছু পাইলাম? পাইলাম বলিয়া বোধ হয় না। আমরা শুধু দেখিলাম, পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে এ দেশ যেখানে ছিল, পঞ্চাশ বৎসর পরেও ঠিক সেইখানেই আছে, এক পা ও অগ্রসর হয় নাই, বরঞ্চ অনেক বিষয়ে আরও পিছাইয়া গিয়াছে! যে একতাবোধের উপর জাতীয় জীবনের ভিত্তি, সেই একতাবোধ জাতীয় জীবন হইতে দূর হইয়া গিয়াছে। আসলে এই পঞ্চাশ বৎসরে এদেশে জাতীয়তাবোধ জাগ্রতই হয় নাই। তৎপরিবর্তে ব্যক্তিবোধই ক্রমশ তীব্র হইয়া উঠিতেছে। ব্যক্তিত্ব নাই, অথচ ব্যক্তিবোধ আছে ইহা বড় ভয়ানক। ব্যক্তিত্বহীন ব্যক্তি আপনার উর্দ্ধে অস্ত্র কিছুই অস্তিত্ব স্বীকার করিতে চাহে না। আত্মপূজায় এবং আত্মপ্রেমে দেশসেবার মূলনীতিতে পদাঘাত করিয়া ইহার দেশের স্বাধীনতা আনিতে চায়, এতই ইহাদের স্পৃহা। বিদেশী শাসকের উপর অভিমান করিয়া তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে চাহিলেই তাহা রাজনৈতিক অধিকার চাওয়ার সমতুল্য হইয়া উঠে না। যাহারা বলে স্বাধীনতা বা অধিকার কেহ চাহিয়া পায় না, তাহারা ই কাঁধ্যক্ষেত্রে দেখি দেখি রবে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করিয়া তুলিতেছে। যোগ্যতার হিসাব নাই, চারিত্রিক কিরূপ অধঃপতনে দেশ পরাধীন হইয়াছে তাহার হিসাব নাই, অথচ রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভিক্ষা করিবার প্রবৃত্তিটুকু আছে!

* * *

এ দেশে সব কিছুই সম্ভব। মাছুষকে যাহারা যুগ করে, যাহারা অশিক্ষার অপমান যুগ যুগ দরিয়া সহ করে, যাহারা দেশের এই

অসহায় অবস্থা ইচ্ছা করিলেই দূর করিতে পারে অথচ করে না, তাহার রাজনৈতিক নেতা হইবার জন্ত অকাতরে পরস্পর চরিত্রেছে! ইহার জন্ত প্রতিযোগিতা এবং স্বপ্নের অন্ত নাই। যে উৎসাহ এবং অর্থ দেশের মধ্যে শিক্ষাপ্রচারে ব্যয় হইলে দেশ যথার্থ স্বরাজ লাভের পথে অগ্রসর হইতে পারে সেই উৎসাহ এবং অর্থ এখন কেবল ভোট সংগ্রহে ব্যয় হইতেছে! স্বাধীনতা! স্বাধীনতা বা স্বরাজ কারখানা প্রস্তুত জিনিস, আবেদন-নিবেদন এবং অভিমান করিলেই উহা ইংলও হইতে পারেন। হইয়া আসিবে! হায় দুর্ভাগ্য দেশ, ভাড়া-গাড়ী মৃত ঘোড়াকে কবে টানিয়া লইবে এই আশায় নিজের যাত্রা, কিছু সম্পদ এবং সংহতি মুঠা মুঠা শুল্ক ছড়াইয়া দিতেছে! যে দেশের লোক আত্ম পঞ্চাশ বৎসরের কংগ্রেস-জীবনেও একজন আর একজনকে বিশ্বাস করিতে শিখিল না, এবং বিশ্বাস করিলেই অসাপুত্র্য দ্বারা সে বিশ্বাস ভঙ্গ করিতে শিখিল, সেই দেশের কংগ্রেসের স্বর্ণ জয়ন্তী একটা বিরাট বিক্রমের মতই বোধ হইবে।

স্বাধীনতালাভের প্রয়াস নীতিহিসাবে মহৎ। যাহারা ব্যক্তিগত স্বথশান্তি বিসর্জন দিয়া অথবা অধিকতর স্বথস্ববিধার আশায় স্বাধীনতালাভের প্রয়াসকে জীবনের প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন তাহাদিগকে শুধু এই কথাই বলিবার আছে যে তাহারা তাহাদের এই ব্যক্তিগত বিশ্বাস বা নীতি সমগ্র দেশের নীতি বা বিশ্বাস হিসাবে প্রচারিত করিতে পারেন নাই। কারণ, তাহারা যে দেশকে আন্তরিকতার সহিত ভালবাসেন এ প্রমাণ দেখাইতে পারেন নাই। অবশ্য সভাসমিতি এবং উলটিয়ার-সংগ্রহদ্বারা স্বাধীনতা পাওয়া যাইবার পরেও দেশকে ভালবাসা যায়, কিন্তু তাহা সম্ভব

নহে, কারণ উক্ত উপায়ে স্বাধীনতালাভ সম্ভব নহে। স্বাধীনতালাভ আন্দোলনে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হইতেছে, অথচ আন্দোলনকারীগণ ভাল করিয়াই জানেন যে ইহাতে শাসকসম্প্রদায়ের নীতির প্রতিবাদ করা ছাড়া আর কোন লাভ নাই। জাতীয় কংগ্রেস একজাতীয় সাহিত্য সম্মিলন। বাংলার যত ভাষায় এবং বাগ্মিতায় অধিকার তিনি তত স্পষ্টর পাই। এই সাহিত্য-সম্মিলনে হিন্দু-মুসলমানের বিচ্ছেদ-মিলনের গান এবং ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের প্রতি অভিমান প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই প্রকাশ হয় না।

দেশের যথার্থ দুঃখের মূল যদি শাসকসম্প্রদায় থাকে তবে গৌণ ভাবে আছে। মুখ্য ভাবে যাহা আছে তাহা ম্যালেরিয়া প্রভৃতি ব্যাধি এবং শিক্ষার অভাব। শিক্ষার অভাবের জন্ত দেশের লোক পরস্পর পরস্পরকে চেনে না, তাহাদের দুঃখের মূল কারণ কি তাহা জানে না, মানুষকে পশুর অধিক যত্ন করা তাহাকে দূরে ঠেলিয়া রাখে। ম্যালেরিয়া এবং যক্ষ্মা প্রভৃতি ব্যাধিতে ভারতবাসী অধর্মমত, অথচ ইহার প্রতিকার-পদ্ধতি তাহার জ্ঞান নাই। স্বাধীনতালাভ করিবার পর এই দুর্বস্থা হইতে দেশকে মুক্ত করা যায়। কিন্তু স্বাধীনতালাভ সহজে হয় না, তাহার জন্ত যোগ্যতা চাই, সে যোগ্যতা আন্দোলনের দ্বারা লাভ করিতে গেলে যুগ কাটিয়া যায়। কিন্তু দেশকে আন্তরিকভাবে ভালবাসিলে, কংগ্রেসের সাহায্যে নীতিপ্রচার দ্বারা স্বাধীনতালাভ করিবার পর তবে দেশের দুর্দশা ঘুচাইব, এতখানি মানসিক ঐশ্বর্য কোনো দেশপ্রেমিকের চিত্তেই থাকিতে পারে না। আমরা পূর্ণ স্বরাজ চাই, কি ভৌরীনিয়ন টেস্টাস চাই, কি ফেডারেশন চাই ইহা ভাবিবার যথেষ্ট সময় আছে, কারণ কাল নিরবধি। কাল নিরবধি এবং আয়

স্বল্প। এই মুহুর্তে আমার দেশের সহস্র সহস্র লোক নিবারণ-যোগ্য ব্যাধিতে মারা যাইতেছে; সমগ্র দেশ-নেতা যদি একমাত্র এমন একটা সিদ্ধি প্রকাশ করেন যে আমরা দেশ হইতে নিবারণ-যোগ্য ব্যাধিগুলির মূলাচ্ছেদ করিব, এবং একমাত্র ইহারই জ্ঞাত চাচা ডুলিব এবং ভলাটিয়ার প্রস্তুত করিব এবং ইহাই আমাদের স্বরাজ আন্দোলনের প্রথম আন্দোলন হইবে, তাহা হইলে অনেক দেশ-নেতা এবং ভলাটিয়ার জেলে বাগ্‌য়ার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইবেন বটে কিন্তু দেশকে ব্যাধির অধীনতা হইতে মুক্তি দিতে পারিবেন। কিন্তু আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি, কোনো দেশ-নেতাই এরূপ সিদ্ধি করিবেন না, কারণ ইহাতে প্রচুর উত্তেজনা নাই, কাহারো সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই। ইংরেজ এদেশে উপস্থিত থাকিতে আমাদের প্রচণ্ড কংগ্রেসীয় শক্তিদ্বারা ইংরেজ দূর করিবার চেষ্টা না করিয়া মালেরিয়া দূর করিবার চেষ্টা করিব ইহা অবশ্যই দেশ-নেতার পক্ষে হাস্যকর।

মাড়োঘারী বা ডাটিয়া থাকিতে আমরা বাবমায়ে উন্নতি করিতে পারিতেছি না ইহাও যেমন মিথ্যা, ইংরেজের অধীন থাকিয়া দেশের উন্নতি করিতে পারিতেছি না ইহাও তেমন মিথ্যা। অন্তত ইহা অর্দ্ধ-সত্য—এবং অর্দ্ধ-সত্য মিথ্যার চেয়ে বেশি মারাত্মক। অবিকৃত মুখে পদে পদে প্রহার খাওয়ার মধ্যে একজাতীয় বীরত্ব আছে; এই বীরত্বের মধ্যে মহত্ব না থাকিলেও ইহার মূল্য কম নহে। কিন্তু এই মূল্য স্বাধীনতা লাভ হয় না। আন্তরিক দেশপ্রেম এবং স্বাধীনতা পৃথক নহে। আজ আমাদের মধ্যে যতখানি দেশপ্রেম আছে ঠিক ততখানি স্বাধীনতাই আমরা পাইয়াছি। যদি কিছুই না পাইয়া থাকি তবে বৃষ্টিতে হইবে শিক্ষিত-শ্রেণী যাহারা স্বাধীনতা-আন্দোলন চালাইতেছেন তাহাদের মধ্যে

শনিবারের চিঠি

দেশপ্রেম নাই। আজ যদি আমরা সমবেত ভাবে দেশ হইতে মালেরিয়া তাড়াইতে পারিতাম তাহা হইলে অনেকখানি স্বাধীনতা লাভ হইত। যদি সমগ্র শক্তি প্রয়োগে দেশের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করিতাম তাহা হইলে স্বাধীনতার পথে আরো পানিকটা অগ্রসর হইতে পারিতাম। কিন্তু এই উগ্র স্বার্থ-লোলুপের দেশে, অর্দ্ধশিক্ষিতের দেশে, ইহার কোনটাই আশা করা যায় না। এদেশের কংগ্রেস এদেশের গৌরব নহে, লজ্জা। অন্তত আজ পর্যন্ত ইহা হইতে আশা করিবার মত কিছুই পাই নাই।

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার নব প্রবর্তিত 'সাহিত্য বার্তা' নামক অংশটি মূল্যবান হইয়াছে। বাংলা ভাষায় সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান বিষয়ে যে সমস্ত মৌলিক আলোচনা হইয়া থাকে তাহার এবং বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে অল্প ভাষায় প্রকাশিত মৌলিক গ্রন্থ ও নিবন্ধের সবিস্তর তালিকা এই অংশে বিশেষ যত্নসহকারে সন্ধান করিয়া পত্রিকাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয় বহু সাহিত্যাহুরাঙ্গী ব্যক্তিমাত্রেরই রুতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। এই অংশকে পূর্ণাঙ্গ করিতে সাহায্য করিবার জ্ঞাত তিনি সাহিত্যিকবর্গকে যে অনুরোধ (ইহা অল্প প্রকাশিত হইল) করিয়াছেন, আশা করি, বাংলার সাহিত্যিক মণ্ডলী সাগ্রহে তাহার সে অনুরোধ পূর্ণ করিতে ক্রটি করিবেন না। সম্ভবতঃ নূতন সম্পাদক শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী মহাশয়ের সম্পাদকতায় পরিষৎ পত্রিকার যে হইখণ্ড এ যাবৎ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে পরিষৎ সদস্যবর্গের আশাধিত হইবার কারণ আছে। প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি স্বনির্বাচিত, স্বসম্পাদিত ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। পাণ্ডিত্য বহুল হইলেও এগুলি চিত্তাকর্ষক।

INFLUENCE

আপ-টু-ডেট ইঙ্গ-বঙ্গ পরিবার।

‘ব্রেক-ফাস্ট’ চলছে।...কথাবাস্তাও চলছে।

যিনি ‘কর্তা, তিনি অস্থিরভাবে মাথা নেড়ে বললেন, “তা হলে, আর আশা নেই?”

কর্তার বড় ছেলে চায়ের মধ্যে ধীরে ধীরে চামচ ঘোরাতে ঘোরাতে নৈরাশ্যবাক্যক স্বরে বলল, “দেখছি না তো!”

মেজ ছেলে উদ্বিগ্নভাবে বলে উঠল, “I say, dad, it's simply horrible;”

সেজ ছেলে সাহা দিলে, “ঠিক তাই; ভাবলেও heart-beat বেড়ে যায়, নীতিশ—our dear নীতিশ marrying such a—”

কথাটা শেষ করবার আর দরকার-বোধ হল না—সে সকলকার মুখের দিকে চোখ বুলিয়ে নিলে।

বড় বৌ বললে, লিপি সেন বড় আশা করেছিল আমাদের ঘরের বৌ হবে!”

মেজ বৌ বললে, “ইলা গুপ্তার মত মেয়েকে ঠাকুরপো’র মনে দরল না—আর্চ্য! এম্পায়ারে ওর নাচ দেখবার পর সোসাইটির ছেলেরা কি-রকম হত্থে হয়ে উঠেছে—তবু ইলা ঠাকুরপো’র জুড়ে—”

সেজে শৌ বললে, “আমার মনে হয় বোমকেশবাবুরা নিশ্চয় কোনো তুচ্ছ করেছেন, নইলে ঠাকুরপো’র taste—”

মেজ ছেলে বললে, “কিন্তু বোধহয় ব্যাপারটার মধ্যে কোথায় একটু

শনিবারের চিঠি

৪৭১

ইয়ে আছে—নীতিশের এখন বিয়ে করবারই ইচ্ছে নেই, ‘আমরা নেহাৎ তাড়াছড়া করছি তাই রাগ করে’—”

বড়ছেলে চায়ের কাপটা নামিয়ে রাখতে রাখতে নিলিখভাবে মন্তব্য করলে, “নীতিশ, I think, is rather a hardened bachelor.”

সেজ বৌ বিশ্বয় প্রকাশ করলে, “Rot! এই ছাষিশেই—!”

কর্তা নড়ে বসে বললেন, “এখন তর্ক করবার সময় নয়। আসল কথা হচ্ছে এ ধরণের বিয়ে বন্ধ করা যায় কি না?”

নিরুত্তর।

কর্তা নিজেই বললেন, “যায়।”

সকলে সাগ্রহে তাঁর মুখের দিকে তাকালে।

কর্তা বললেন, “নীতিশকে ভয় দেপানো হোক—I mean, let him be warned যে, ও যদি এই বিয়ে সম্বন্ধে মত পরিবর্তন না করে তো—তো ওকে ‘তাজাপুত্র’ করা হবে।”

“Hear hear!” ছেলেরা বললে।

“Oh dear!” মেয়েরা বললে।

কর্তা গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন; হৃদয় মূগ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল।

ধানিকণ পরে বড় ছেলে বললে, “তাতে হিতে বিপরীতও হতে পারে—নীতিশ অভঙ্গ গো—I mean, obstinate.”

মেজ ছেলে বললে, “তার চেয়ে বিয়েটা আস্তে আস্তে চুকিয়ে দিয়ে ওকে ভবানীপুরের বাড়ী পানা ছেড়ে দেওয়া হোক—”

তার কথাটা লুফে নিয়ে সেজ ছেলে বললে, “বিলক্ষণ! না’র কথাটা ভুলে যাচ্ছি!”

সকলে সচেতন হল।

বড় ছেলে হঠাৎ যেন কিনারা পেয়ে বললে, "There you are ! নীতিশকে নাচাচ্ছে মা—কারণ এ পর্যন্ত মা'কে কোনো উচ্চবাচ্য করতে তুলনু না !"

মেজ ছেলে বললে, "That's logic !...সরলা !...মা কোথায় ?"

সরলা আয়া। সে এসে বললে, "মা'র এখনো আঙ্গিক সারা হয়নি।"

"আঙ্গিক ?...ওঃ !" ছ'দল সমন্বরে বলে উঠল।

কণ্ঠা নিরীকার।...

'ক্রি-ং ক্রি-রিং !'

তারপর জুতার খট-খট শব্দ।...মিঃ সোম।

সোমকে দেখেই ছেলেরা টেচিয়ে উঠল, "আপনি ঠিক সময়ে এসেছেন, কাকা !"

টেবিলের উপরকার নিঃশেষিতপ্রায় খাবারগুলার দিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে সোম হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন, কেন, আমি কোন দিন অসময়ে এসে তোমাদের উপর বে-আইনী অত্যাচার করে' গেছি যে আজ এ ধরনের সম্ভাষণ ? পুরো ছ'মাস অস্থপস্থিতির পর—"

"সে সব নয় !...একটা ভয়ানক বিপদ ঘটেছে—"

"ঐ্যা—অথচ তোমরা সবাই—"

"মানে, নীতিশ বিয়ে করতে চায়।"

"Thank goodness !...তাতে বিপদের কি আছে ? যেরে অম্মাভাব না স্থানাভাব ?"

"অভাব common sense এর।"

"Botheration ! খুলেই বল বাপু।"

"নীতিশ বিয়ে করতে চায় আমাদের সোসাইটির বাইরে—"

"Call it strange ?...এ রকম তো হামেশাই হচ্ছে !...নীতিশের বয়স কত হল ?"

"এই ছাব্বিশ।"

"হঁ ; মেয়েটি কেমন ?"

সকলে নিরুত্তর।...কণ্ঠা বললেন, "তা-না স্বন্দরী বলা যায়।"

"দেবে-খোবে কেমন ?"

বড় ছেলে বললে, "সে-কথা হচ্ছে না।"

"তবে ?"

"সমস্তা হচ্ছে মেয়েটির সোসাইটি, বয়স, আর লেখাপড়া নিয়ে।"

"কি রকম ?"

"বয়স মোটে তেরো বছর, লেখাপড়ায় ইংরিজির নামগন্ধ নেই, আর স্বজাতি হলেও সোসাইটি—quite an obsolete type—আমাদের নাম ডোবাবে।"

সোম বিস্মিত হলেন, বললেন, "বল কি !...ওরকমের মেয়ে...নীতিশ নিজের choice করেছে ?"

"তাই তো দেখছি।...কিন্তু মনে হচ্ছে কোনো third party র influenceও আছে।"

"কে এই third party ?"

"হয় ঘটক, নয় তো মা।"

"তাই তো, তাই তো !" সোম গানিকণ মাথা চুলকালেন ; তারপর বললেন, "কিন্তু নীতিশের মত স্বাধীনচেতা ছেলে—তাকে ও রকম third party influence করে—"

সোম দাড়ী চুলকাতে লাগলেন। শেষে হতাশ ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, "ছোকরা উপস্থিত করছে কি ?"

কর্ত্তা হাত নেড়ে, মুণ বিকৃত করে' বললেন, "জানোই তো, ছেলেটার কি রকম বেখাঙ্গা রুচি! বেঙ্গলীতে এম-এ পাস করলে—এখন 'ডক্টরেট'র জন্তে বৈষ্ণব সাহিত্য নিয়ে 'থীসিস' লিখছে!"

সোমের মুখচোখ উজ্জল হয়ে উঠল; তিনি সোম্লাসে বলে উঠলেন, "আর আশা নেই, ভায়া; ও ছেলে শ্রেফ বেঙ্গলীই হয়ে যাবে—এ বৈষ্ণব সাহিত্যের influence! আমার কথা শোন, মিথ্যা সোসাইটির ভয়ে মন ধারাপ করো না—শুভ্র শীঘ্র! আর, ছোট-বোমার' গয়নাগাঠির মধ্যে ছুঁজোড়া মল অবশ্যই দেবে—কারণ মল না থাকলে বৈষ্ণব সাহিত্যের স্বর জমে না!"

—বি-কু-বড়াল—

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ

বাংলা তথা সমগ্র ভারতের ইতিহাসের দিক হইতে বিশেষ মূল্যবান বহু সামগ্রী বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাগার, পুথিখানা ও চিত্রশালায় সংগৃহীত ও সুরক্ষিত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু ছুংখের বিষয়, বিশেষজ্ঞ ছুইচারি জন ছাড়া তাহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কোনও গবর সাধারণে জানে না এবং জ্ঞানিবার তেমন কোন উপায়ও নাই। বঙ্গ-সংগ্রহই পরিষদের একমাত্র কর্তব্য নহে, সংগৃহীত বস্তুর যে-সকল বৈশিষ্ট্য আছে বিবরণগ্রন্থ প্রকাশের দ্বারা সেগুলির প্রাতি, অল্পসঙ্কিৎ ব্যক্তি মাজের দৃষ্টি-আকর্ষণ করা ও এই উপায়ে জ্ঞান-বিস্তারের সাহায্য করা পরিষদের

মুখা উদ্দেশ্য। উপযুক্ত অর্থের অভাবে পরিষৎ এই বিশেষ প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য কর্তব্যে ক্রত অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না, ইহা বিশেষ পরিতাপের বিষয়। তবে ধীরে ধীরে পরিষৎ এই সম্পর্কে যে-কাহ্য করিতেছেন তাহা বিশেষ মূল্যবান। সম্প্রতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিত্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয় স্বদীর্ঘ পাঁচ বৎসরের যত্নে পরিষদের সংগৃহীত (কিন্তু সাধারণের অজ্ঞাত, প্রায় দুই সহস্র প্রাচীন সংস্কৃত পুথির বিস্তৃত বিবরণ সন্ধান ও প্রকাশ করিয়া পরিষদের এক অতি মূল্যবান সংগ্রহের আভাস দিয়াছেন। তাহার এই গ্রন্থ এবং ইহার বিস্তৃত ইংরেজী ভূমিকা হইতে বহু অজ্ঞাতপূর্ব ও বিশেষ প্রয়োজনীয় সংস্কৃত গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলা ও বাংলার বাহিরের পণ্ডিতমণ্ডলী এইগুলি আলোচনা করিলে অনেক নূতন তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিবেন এবং চক্রবর্তী মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্ত তাহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবেন। সাধারণের সহায়ভূক্তি ও অর্থ-সাহায্য পাইলে পরিষদের অজ্ঞাত মূল্যবান সংগ্রহের বিবরণও এইরূপ সাধারণের গোচর করিতে পারিবেন, বর্তমানে এরূপ কর্মীর অভাব পরিষদে নাই। আমরা এ বিষয়ে বদাচ্ছ ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

গল্প-কবিতা

(না গল্প না কবিতা ছন্দে)

এখন থেকে যা লিখবো সে হবে না কবিতা,—

হবে গল্প-কবিতা ।

অর্থাৎ কাঁঠালের আমসত্ত্ব আর কি ;

পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় বলা চলে, “হোনার পিতলা কলস ।”

জিজ্ঞাসা করচো, কেন লিখবো ?

আরে...তার হুবিধা কত—

ছন্দের দার দারতে হয় না,

মিলের জন্তে হাতড়ে মরতে হয় না ভুলে-ভরা বাংলা অভিধান,

হয় না মোটে ভাবতে,

যা খুশী তাই লিখে গেলেই চলে এবং দিবি চলে ;—

এই যেমন লিখে চলেছি আমি—

শুধু থাকা চাই কলমে কালি ।

আরও যা হুবিধা—

সম্পাদকের সাধ্য কি ভাল-মন্দ করেন তার বিচার,

কাজেই ছাপা তা'তো হতেই হবে,

নইলে দেখিয়ে দেব নজির অমনি—

ডি. এইচ. লরেন্স প্রমুখ...

কারণ, লরেন্সের আগে কেউ কবিতা যে লিখতেই পারেনি,

সে কথা তো বলা চলে জোর ক'রেই ।

‘পুনশ্চ’—আরও যা হুবিধা...

নজির রয়েছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ,

অবশ্য, শ্রীহীন হওয়ার আগের নম্ব,

পরের রবীন্দ্রনাথ ।

কবিতায় আমার—না, না, গল্প কবিতায় আমার

থাকবে কি শুনতে চাও ?

থাকবে—এলোচুল...

কার ? দাড়াও, ভাবি একটু, কোন্ মেয়েটিকে পাড়ার

জানানো দরকার যে আমি লিপি

এবং যা খুশী তাই লিপি ।

আরও থাকবে—ভাসা ভাসা চোখ ভাগর-ভোগর ;

মোনালি জোংলা—রূপালি নয়,

একটু মিঠে সিরাজি...

না, না, পয়সা কোথায়, তার চেয়ে ভাল

সামান্য একটু গন্ধ—

অগত্যা মেথিলেটেড...

আর পায় কে—

লিখে চ'লেচি তো চ'লেইচি,

কবিতা নয় কিন্তু, গল্প নয় কিন্তু,—

গল্প কবিতা ।

কি, গালে যে চড় মারলে বড় ?

বেড়েচে তোমার আশ্পর্ক,

বড় বেড়েচে দেখতে পাই ।

উঃ মেরে দিলে: কিনা গালে একটা চড়,
যা আমার বাবা-মা'ও (মা অর্থে বাবা-মা,
যেমন কবিতা অর্থে গল্প কবিতা)
কোনদিন সাহস ক'রে বা স্নেহাঙ্ক হ'য়েও
পারেন নি :—

আর তুমি কিনা স্বামী-স্ত্রী (স্ত্রী অর্থে) হ'য়ে অনায়াসে,
বিশেষকরে আরও, যখন লিখচি গল্প কবিতা ।
গুর মুখে তখন হাসি বেকলো ফিকি দিয়ে ;
বললে, “কি, কি, গল্প কবিতা ? হা, হা, হা, ...
কবে না জানি আবার আমাদের বলবে
নারী নয় শুধু—নর-নারী বা পুরুষ-নারী,
হি, হি, হা, হা, ... হাসালে বটে !

তোমরা তখন হবে বুদ্ধি
নারী-নর ? হা, হা, হা, হাতে বুদ্ধি কাজ নাই কিছু ?
তার চেয়ে এসো বরং ব'সে ব'সে চুমা খাও

আর তা নয় তো alternative, মাথা খাও ।”

শ্রীরামগ শর্মা

চলচ্চিত্র

বাঁচিবার ইঙ্গিত



জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণা-ধারায় এস ।

সাবধানতার ইঙ্গিত



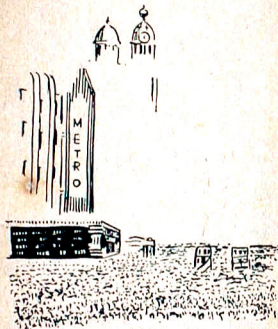
সাইকেলে হইলে মাঝমে হইবে না কেন ?

উন্নতির ইঙ্গিত



ছন্দোবোধের জ্ঞাতরূপ কবিগণ এই প্রক্রিয়া করিবেন ?

উন্নততা নিবারণের ইঙ্গিত



মারগারেট স্কাফারের উপদেশ শুনিলে ক্ষতি কি ?

বিজ্ঞাপন মারিব না কেন ?

“বিজ্ঞাপন মারিও না” এবং “বিজ্ঞাপন মারিও” ইহা লইয়া একটা মানসিক দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছে। যিনি প্রাচীরের গায়ে লিখিয়াছেন, “বিজ্ঞাপন মারিও না”—তিনি অন্তত নিজে উক্ত বিজ্ঞাপনটি মারিয়াছেন। বিজ্ঞাপন না মারিয়া উপায় কি ?

আমরা প্রত্যহ যে কারণে সংবাদপত্র পাঠ করি, যে কারণে পৃথিবীর সকল জায়গার উন্নতি-অবনতির কথা জানিতে ব্যগ্র হই, ঠিক সেই কারণেই প্রাচীর-গাত্রে বিজ্ঞাপনও পাঠ করিয়া থাকি। কলিকাতা শহরে কোথায় কি প্রস্তুত হইতেছে, কোন জিনিস নতুন আমদানি হইল, তাহার শেষ খবর আমরা একমাত্র প্রাচীরগাজ হইতেই সংগ্রহ করিতে পারি। কলিকাতার পথে রাত্রে আলো না থাকিলে পথিকের নিকট তাহা যেরূপ ভয়াবহ বোধ হইবে, কলিকাতার পথঘাট জনশূন্য হইলে তাহা যেমন শশানভূম্য বোধ হইবে, প্রাচীরগাত্রে বিজ্ঞাপন না থাকিলেও ভেতনি শহরকে শহর বলিয়া চেনা যাইবে না। তখন আমরা শহর বলিতে যাহা বুঝি তাহা আর বুঝিব না। শহর জনাকীর্ণ, শহর শব্দমুখর, শহর অতি-আলোকিত, শহর বিজ্ঞাপন-আচ্ছন্ন, শহর সদা-চঞ্চল, সেই জন্মই আমরা শহর ছাড়িয়া বিজ্ঞাপনহীন, শব্দহীন, আলোহীন, শান্ত পল্লীতে গিয়া মাঝে মাঝে মন জুড়াইতে পারি। যদি কেহ বলে, শহরে গাড়ি চলিতে পারিবে না, রাজপথের উপর ফুলবাগান প্রস্তুত করিতে হইবে, তবে তাহা যেরূপ অশোভন হইবে, তেমনি যদি কেহ বলে, বিজ্ঞাপন মারিও না, তাহা হইলে

তাহাও তেমনি অশোভন হইবে। অতএব বিজ্ঞাপন মারিতে দাও, এবং যাহারা বিজ্ঞাপন মারে তাহাদিগকে মারিও না।

শহরে বাস করিয়া যাহারা শহরের অসদ্বৃতি ঘটাইতে সাহস করে তাহারা অমাত্য। তাহাদের মন শিল্পী-মন নহে, তাহারা কৃত্রিমতাকে ভালবাসে। সত্য রূঢ় হইলেও তাহা সত্য, সত্যের অঙ্কহানি করিয়া সত্যকে মোলায়েম করা যায় না। কালীপূজা মানিলে জীবহত্যাও মানিতে হইবে—জীবহত্যা রুদ্ধ করিলে কালীপূজাও বন্ধ করা উচিত। অসদ্বৃতি ঘটাইতে পারিল না বলিয়াই পোশিয়ার নিকট শাইলককে ঠকিতে হইল। রক্তপাত না করিয়া সে ব্যাসানিওর দেহ হইতে এক পাউণ্ড মাংস লইতে পারিল না। সামন্তস্ববোধ যখন চলিয়া যায় তখন বুকিতে হইবে জীবন গল্পময় হইয়া উঠিয়াছে, তখন বিজ্ঞাপন মারা বন্ধ না করিয়া নিষ্কের বিরুদ্ধে বোধশক্তিকে মারা উচিত। কলিকাতা শহরে হাজার হাজার ব্যবসায়ী প্রাচীরে বিজ্ঞাপন দিতেছে—শহরের স্বরের সঙ্গে তাহা অঙ্গাদ্বীভাবে মিলিয়া গিয়াছে, হঠাৎ ইহার মধ্যে “বিজ্ঞাপন মারিও না”র স্পর্ধা-জনিত টাংকার সমস্ত স্বরকে মলিন করিতেছে।

অতএব ব্যবসায়ীগণ, তোমরা নির্দিকারচিত্রে প্রাচীরে প্রাচীরে বিজ্ঞাপন মারিও—কাহারো কথায় কর্ণপাত করিও না। তোমাদের বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া আমরা কলিকাতা শহরের পরিচয় লাভ করিতেছি—ইহা হইতে আমাদেরকে বঞ্চিত করিও না। হে প্রাচীর-অধিকারী নাগরিক, বিজ্ঞাপন মারিতে দাও, সবার স্বরে স্বর মিলাইয়া চল, বিজ্ঞাপন যাহারা মারে তাহাদিগকে আদর কর, দেখিবে তোমার জীবনের হারানো স্বর কিরিয়া আসিয়াছে।

চিঠি

শ্রীযুক্ত শনিবারের চিঠি সম্পাদক মহাশয়—

গত পৌষ-সংখ্যা শনিবারের চিঠিতে শ্রীযুক্তা তপস্বী দেবী লিখিত ‘সেক্টিমেন্ট’ নামক লেখাটি পড়িলাম। তিনি তত্ত্বদ্বিগকে যে ভাবে অক্রমণ করিয়াছেন তাহা ঠিক হইয়াছে কিনা সে বিচার না করিয়া এ সংক্ষেপে আমার যাহা বক্তব্য আছে তাহাই বলিতেছি। রবীন্দ্রনাথ বাহাদিগকে “ওরে নবীন, ওরে আমার, কাঁচা” বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন তাহাদিগকে এরূপ নির্দমভাবে আঘাত দেওয়া অস্বস্ত আমার মতে উচিত নহে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা এদেশে ব্যর্থ হইয়াছে ইহাই ছাপ। বঙ্গদেশ ছোট নহে, এবং তাহার লোক-সংখ্যাও প্রচুর। সমস্ত দেশে শিক্ষাবিস্তার হইলে ভবিষ্যতে বঙ্গদেশের তত্ত্ব মাত্রই পুঙ্খ বাহির করিয়া নৃত্য করিবে, কিনা বলা শক্ত। আমার ত মনে হয়, তাহা করিবে না। যাহারা বর্তমানে তত্ত্ব নামে অতি-পরিচিত হইয়াছে তাহারা সমস্ত দেশের তুলনায় অতি নগণ্য। ইংরেজী সভ্যতার দাক্ষ্য এখনও আমরা সামলাইয়া উঠিতে পারি নাই। আমাদের নিজস্ব ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি (তাঁহা যতটুকুই থাক) তাহা হইতে দেশের শিক্ষিত-নামধারীগণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা শুল্লো ভাসিয়া বেড়াইতেছে। কোথাও দাঁড়াইবার তাহাদের স্থান নাই, তাই আমিবা নামক প্রাথমিক জীবের মত তাহারা তাহাদের সমস্ত দেহটাকে সর্বত্রা পিঁচাইয়া বেড়াইতেছে। ইহা যে কেবল তত্ত্বগেরাই করিতেছে তাহা নহে, তত্ত্বদের পিতারাও

করিতেছে। এদেশে শিক্ষিত-নামধারীগণ দুইটি প্রধান দলে বিভক্ত। এক সাহিত্যিক, অল্প রাজনীতিক। প্রথম দলের নাম তরুণ, দ্বিতীয় দলের নাম প্রবীণ। ব্যবহারক্ষেত্রে এই দুই দলের মধ্যে কোনো বিভিন্নতা নাই। তরুণেরা নিজেদিগকে প্রকাশ করিতেছে সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রের পৃষ্ঠায়, এবং প্রবীণেরা আত্মপ্রকাশ করিতেছেন দৈনিক কাগজের পৃষ্ঠায়। Art for Arts Sake নামক সত্যটিকে নতুন একটি message হিসাবে প্রচার করার দ্বারা যদি ইহার কোনো নতুন অর্থ বাহির হইয়া থাকে তাহা হইলে সেই অর্থ ইহার জীবনে গ্রহণ করিয়াছে। পৃথিবীতে আট চিরকাল আটের খাঁতিরই রহিয়াছে, তবে ইহা দ্বারা যদি কোশলে অল্প কাজ করাইয়া লওয়া যায় তাহাতে কাহারও ক্ষতি হয় না। কিন্তু হঠাৎ যদি কেহ চাঁৎকার করিয়া বলে, আট আটের জন্মই, তাহা হইলে স্বতই সন্দেহ হয় তাহা হইলে বৃষ্টি আট আটের জন্ম নহে। এবং এ সন্দেহ যতই বাড়ি ততই আট যে আটের জন্মই এই মতটি প্রচারের বাসনা তীব্র হইয়া উঠে। এইরূপ বিবাদে শেষ পর্যন্ত লোকে আটের অর্থই কুলিয়া যায়। বঙ্গদেশে টিক তাহাই হইয়াছে। দেখা যাইতেছে, তরুণেরা এবং প্রবীণেরা আটের অর্থ বিস্মৃত হইয়াছেন। তরুণেরা যাহা-খুশী লিখিতেছে এবং মনে করিতেছে লেখার ত কোনো উদ্দেশ্য থাকা উচিত নহে, ইহা আট। এবং প্রবীণেরা রাজনীতির নাম করিয়া যাহা-খুশী করিতেছেন এবং মনে করিতেছেন, ইহারও কোনো উদ্দেশ্য থাকা উচিত নহে, কারণ রাজনীতিও আট। রাজনীতির প্রিন্সিপটাই বড়—প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রিন্সিপ—দেশ-সেবার নহে। তরুণেরা মেয়েদিগকে অপমানিত এবং লজ্জিত করিয়া কবিতা গল্প লেখে, প্রবীণেরা মেয়েদিগকে পাঠাইয়া ভোট সংগ্রহ করে।

এদেশের ব্যবসায়ী-সম্প্রদায়কে কখনই তরুণ নামে অভিহিত করা চলে না, অথচ দেখা যায় তাহার বিজ্ঞেয় বস্তুর বিজ্ঞাপন দিবার সময় অর্জুনগ্র নারীদেহ প্রায় সর্বত্র ব্যবহার করিয়া থাকে। শুধু ইহাই নহে, যেসব কথা বা ভাষা ভদ্র-সমাজে অচল, ইহার নিষ্কিঁকার-চিত্তে তাহা বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করিতেছে। এদেশের সাময়িক পত্রে এই সব ছাপা হয়—ইহা দ্বারা কি শুধু মেয়েরাই লজ্জা বোধ করে? পুরুষ কি লজ্জিত হয় না? আমার ত মনে হয়, ভদ্র ব্যক্তি মাঝেই—কি পুরুষ কি নারী সকলেই লজ্জা পায়। স্মৃতিরাজ "তরুণ"-চিহ্নে একটা সম্প্রদায়কে চিহ্নিত করিয়া দিলেও আসলে দুইটি দল আছে, এক দল ভদ্র অপর দল অভদ্র। দেশে শিক্ষা বিস্তার দ্বারা যদি এই অভদ্রের সংখ্যা কমাইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলেই শিক্ষার সার্থকতা হইবে। এ যুগটা যে চঞ্চলতার যুগ, ইহা খানিকটা মানিতেই হইবে। ইহা সাধনার পরিপন্থী। কঠোর-চরিত্র না হইলে তাহার দ্বারা মহৎ কিছুই এ যুগে হইতে পারে না। ইউরোপে চারিত্রিক কঠোরতা আছে তাই সেখানে সৃষ্টিক্রিয়া অবিরাম চলিতেছে। এই কারণেই তথায় সাহিত্যে, শিল্পে এবং বিজ্ঞানে এই সৃষ্টির দ্বারা প্রবহমান রহিয়াছে। বড় কিছু করিতে পারিব না বলিয়াই যে অভদ্র হইতে হইবে ইহা গ্রায়েসদত্ত নহে। আমাদের দেশে বড় কোনো কাজ আমাদের পূর্বপুরুষদের দ্বারাও হয় নাই। যাহাদের দ্বারা হইয়াছিল তাহাদের সঙ্গে আমাদের কোনোই যোগপুত্র নাই। স্মৃতিরাজ অতীতের গর্ভ আমাদের সাজে না। যদি করিতেই হয় তাহা হইলে মিশর, আরব, পারস্য, গ্রীস, রোম, চীন প্রভৃতি সব দেশের অতীত লইয়াই আমাদের গর্ভ করা উচিত। যেখানে যাহা কিছু মহৎ তাহাই আমাদের মনে স্ফূর্ত্ত উদ্বেক করিবে। বর্তমান ইউরোপ মহৎ। যাহাদের প্রাণ আছে তাহারাই মহৎ।

মহৎ দেখাইতে গিয়া আমরা তাহাদের দোষটাকেই বড় করিয়া দেখাইব না।

আমাদের দেশেও তরুণদের (তরুণ-মার্কী নহে) ভিতর মহত্বের অভাব নাই। কিন্তু তরুণদের দ্বারা কখনই কোনো মহৎ সৃষ্টি হয় না। তরুণেরা ভাগ্যের দিক দিয়া মহৎ, কোনোকিছু গড়িয়া তুলিবার দিক দিয়া নহে। তরুণেরা কোনো দেশেই চালক নহে, চালিত। আমাদের দেশে বাহারা তরুণছাপদারী তাহারা চালিত হইতে চায় না, চালক হইতে চায়। এই কারণেই তাহাদের মধ্যে না আছে ভাগ্যের মহত্ব, না আছে কর্ত্ত্বের গৌরব। কিন্তু আমি পূর্বেই বলিয়াছি, ইহারা অতি তুচ্ছ এবং সংখ্যায় নগণ্য। সুতরাং শ্রীযুক্ত তপনী দেবীর আশঙ্কা যথার্থ কারণে হইলেও এই সব অভ্যন্তর দ্বারা ব্যাপক ভাবে কোনো অনিষ্ট হইতে পারে না। কালচারের অভাব যাহাদের মধ্যে রহিয়াছে তাহারা অভ্যন্তর হইবে ইহা বিশ্বাসের নহে। —শ্রীপরশুরাম শঙ্খা।

শ্রীযুক্ত শনিবার চিঠি সম্পাদক মহোদয় সমীপে,—

মহাশয়, আপনাদের শনিবারের চিঠিতে একটি নূতন পরিভাষা আপনারা বাহির করিয়াছেন এবং শনিবারের চিঠি পড়িয়াই ই পরিভাষাটি শিক্ষা করিলাম। কিন্তু কথাটি ব্যবহার করিয়া আমার কত ক্ষতি হইয়া গেল, আপনারা তাহার কি কোনও খবর রাখেন? দয়া করিয়া যদি আমার ভ্রুণের কাহিনিটি শোনে, তাহা হইলে অতিশয় বাধিত হইব এবং আশা হয়, তাহাতে আমার মানসিক কষ্ট অনেক কমিয়া যাইবে।

স্কুলের পূজার ছুটি শেষ হইতে আর এক-আধদিন বাকী আছে, আমি দেওঘর হইতে বাড়ী ফিরিতেছিলাম। একটা গালি সেকেরও

ক্লাস কামরায় (আজকালকার প্রথাচুযায়ী) উঠিয়া একটা বেঞ্চে পা ছড়াইয়া দিয়া আরামে বসিয়া পড়িলাম। টেন ছাড়ে ছাড়ে, এমন সময় এক ভদ্রলোক একটি স্টুটকেশ-হাতে তাড়াতাড়ি কামরায় ঢুকিয়া, স্টুটকেশটা ধপ করিয়া নামাইয়া আমার পায়ের উপর বসিয়া পড়িলেন। আমি বিরক্তি সহকারে পা সরাইয়া লইলাম। ভদ্রলোক অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, “কিছু মনে করবেন না মহাশয়, তাড়াতাড়িতে হ’য়ে গেছে, মাপ করবেন।”

“থাক মহাশয়, জতো মেরে গোরুদান কেন?”

ভদ্রলোক অপদস্থ হইয়া চূপ করিয়া গেলেন।

অনেকক্ষণ পর ভদ্রলোক কথা কহিলেন, “যদি কিছু মনে না করেন...”

আমি অল্প পথেই বাধা দিয়া কহিলাম—“না, না, কি বলুন...”

বাড়ী পৌঁছিবার পরদিন স্কুল খুলিল। সন্ধ্যা-আগত শনিবারের চিঠিটি লইয়া স্কুলে গেলাম, সেখানে মেকের পীরিয়ডে সেই প্রবন্ধটি পড়িতেছিলাম। এমন সময়, হেডমাষ্টার-মহাশয় সেই ভদ্রলোককে লইয়া ক্লাসে ঢুকিয়া বলিলেন, “ইনি তোমাদের আজ হ’তে অঙ্ক কমাবেন, ইনি তোমাদের নূতন জ্যামিটিয়াস্ট হেডমাষ্টার।”

হেডমাষ্টার-মহাশয় চলিয়া গেলেন। আমি ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম—তাহার চক্ষুতে সেই মাষ্টারী চাহনি। তিনি আমার হাত হইতে শনিবারের চিঠিটি কাড়িয়া লইলেন। সন্ধ্যা-পরিভাষাটি মনে মনে ব্যবহার করিলাম, কিন্তু কখন জানিনা সেটি মুখ হইতে আমার অজান্তেই বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তারপরেই বেতের মায়ে পিঠে রক্ত জমিয়া গেল।

স, কৃ, ব,

সংবাদ সাহিত্য

পৌষের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ্র, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজারাম রায় সম্পর্কিত ছয় বৎসরের বিস্তৃতপ্রায় আলোচনাটিকে পুনরায় লোকচক্ষুর গোচরে আনিয়া ভাল করিয়াছেন। ব্রজেন্দ্রবাবু শুধুই প্রমাণের জোরে যে সব উক্তি করিয়াছেন তাহা আমাদের এতদিন কোনমতেই বিশ্বাস হয় নাই। আমাদের মনে কেবলই একটা সন্দেহ জাগিতেছিল যে না-না, ইহা হইতে পারে না। রমাপ্রসাদবাবুর এই আলোচনা পড়িয়া আমাদের সন্দেহ দূর হইল। ব্রজেন্দ্রবাবু যাহুকরের মত এক গেলাস ভূমি এক গেলাস জলে পরিণত করিয়াছিলেন। এখন দেখা গেল উহা আমাদের দৃষ্টিভ্রম—ভূমিকেই আমরা জল মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু ব্রজেন্দ্রবাবু যাহা সত্যই করিয়াছেন তাহা ইহা অপেক্ষাও কঠিন। তিনি একহাতে রাজারামকে ঠেজের উপর ধরিয়া বলিয়াছেন, ওয়ান, টু, থ্রী—অমনি রাজারাম শেখ বক্সতে রূপান্তরিত হইয়াছে। আবার শেখ বক্সকে ধরিয়া বলিয়াছেন, ওয়ান, টু, থ্রী—চক্ষের পলকে শেখ বক্স রাজারামে রূপান্তরিত হইয়াছে। আমরা এই বৃজককিতে বিশ্বাস করি না।

আমরা এখনই প্রমাণ করিয়া দিতেছি যে দুই ব্যক্তি এক হইতে পারে না এবং এক ব্যক্তি দুই হইতে পারে না। রমাপ্রসাদবাবু যে কয়েকটা যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা কাল্পনিক হইলেও সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য। আমরা কেবল তাঁহার বাস্তব

যুক্তিগুলি বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদের যাহা মনে হয় পূর্ণে তাহাই বলি। রমাপ্রসাদবাবু বলেন, রাজারাম রায় রামমোহন রায়ের পালিত পুত্র। ব্রজেন্দ্রবাবু বলেন, শেখ বক্স রামমোহন রায়ের মুসলমান প্রণয়িনীর পুত্র, এবং শেখ বক্সই রাজারাম। প্রথম দাঁড়াইল পাঁচটি। ১ রাজারাম। ২ পালিত পুত্র। ৩ শেখ বক্স। ৪ আপন পুত্র। ৫ শেখ বক্সই রাজারাম। ইহার প্রথম দুইটি রমাপ্রসাদবাবুর এবং শেষের তিনটি ব্রজেন্দ্রবাবুর।

পক্ষপাতশূন্যতা দেখাইবার জ্ঞান যদি আমরা ব্রজেন্দ্রবাবুর নিকট হইতে পাঁচ নম্বর প্রশ্নটি কাড়িয়া লই, তাহা হইলে যাহা থাকে তাহা উভয়ের মধ্যে বন্টন করিয়া দিলে কি দাঁড়ায় তাহা দেখা যাক। তাহা হইলে দাঁড়ায়—

- ১। রাজারাম আপন পুত্র
- ২। শেখ বক্স পালিত পুত্র

কিংবা—

- ১। রাজারাম পালিত পুত্র
- ২। শেখ বক্স আপন পুত্র

কিংবা—

- ১। পালিত পুত্র আপন পুত্র
- ২। শেখ বক্স রাজারাম

কিন্তু এই তিনটির কোনটাই রমাপ্রসাদবাবুর গ্রাহ্যনহে কিন্তু শেষেরটি ব্রজেন্দ্রবাবুর মত সমর্থন করে বলিয়া ব্রজেন্দ্রবাবুর গ্রাহ্য। কিন্তু আমরা একপক্ষে বন্টন করিব না।

রমাপ্রসাদবাবু লিখিতেছেন—

“দ্বন্দ্বসংস্থাপনাকাজ্জী” নাম দারণ করিয়া কালীনাথ তর্ক-
পঞ্চানন রামমোহন রায়কে চারিটা প্রশ্ন করিয়াছিলেন।
ব্রজেন্দ্রবাবুর মতে চতুর্থ প্রশ্ন ছিল, “লজ্জা ও দ্বন্দ্বভয় পরিত্যাগ
করিয়া যাহারা বুঝা কেশচ্ছেদন, হুঁরাপান ও ব্যভিচার করেন,
তাহারা বিকৃতকারী কি না?” ...৪র্থ প্রশ্নের এই পাঠে
“যাহারা” শব্দটা লক্ষ্য করিবার বিষয়। এই শব্দটা উপেক্ষা
করিয়া, ব্রজেন্দ্রবাবু কোনপ্রকার দ্বিধা না করিয়া লিখিয়াছেন,
“তর্কপঞ্চাননের আক্রমণ রামমোহনকে উপলক্ষ্য করিয়া।”
...“যাহারা” বহুবচন। রামমোহন রায় যে এই বহুর
অন্তর্গত স্বতন্ত্র প্রমাণ না পাইলে তাহা জোর করিয়া বলা
যায় না।

যাহারা রাজারামকে শেখ বক্তৃত্তে কপাস্থরিত করিয়া বৃজ্জকি
দেখাইতে পারেন তাহাদের কথাই স্বতন্ত্র। বহুবচন দেখিয়াও যাহারা
তাহার মধ্যে একটিমাত্র ব্যক্তির প্রতি ইঙ্গিত দেখিতে পান তাহাদের
ঐতিহাসিক নিষ্ঠা যে কতখানি তাহাও বিবেচ্য। আমরা যে বহুবচনে
“যাহারা” ব্যবহার করিয়া ঐতিহাসিকলিপিকে গাল দিতেছি, ব্রজেন্দ্রবাবু
নিশ্চয়ই মনে করিবেন ইহাতে তাহার প্রতি ইঙ্গিত আছে। কিন্তু
আমরা যদি বলিতাম, “যে সব প্রত্নতাত্ত্বিক নিজ নিজ বিষয় ছাড়িয়া
অস্ত্রের বিষয়ে অধিকার চর্চা করিতে আসে তাহারা হয় নিকোঁধ, না হয়
মূর্থ” তাহা হইলে রমাপ্রসাদবাবু বাহ্যচরিত্র করিয়া তাহার মধ্যে নিজে
আবিষ্কার করিতেন না। ব্যাকরণের বচনের অধাৰ্য্য যাহাদের পড়া
আছে তাহারা একপ তুল করে না।

রমাপ্রসাদবাবুর একটি মুক্তি আমাদের মধ্যস্পর্শ করিয়াছে। অশা-
করি ব্রজেন্দ্রবাবু অতঃপর নীরব হইবেন। মুক্তিটি এই—

এদেশে তৎকালে ভাষাসহ বেদান্ত দর্শনের পঠন পাঠন
ছিল না। কাজেই বিরোধী পক্ষ রামমোহন রায়ের বাঙ্লা
বিবরণ সহ “বেদান্ত গদ্যের” মতামত গ্রন্থকর্তার স্বকপোল-
কল্পিত বলিতে সাহস করিয়াছিলেন। বেদান্তে পারদর্শী
অধ্যাপক না থাকায় অহুবাদ কাণ্ডে রামমোহন রায়কে গুরুতর
পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। উপনিষদ সকলের অহুবাদেও
তাহাকে সেইরূপ পরিশ্রমই করিতে হইয়াছিল। যিনি এই
প্রকার বহু শ্রমসাধ্য শাস্ত্র চর্চায় এবং তৎকালে অভাবনীয়
দ্বন্দ্বসংস্কার, সমাজ সংস্কার, শিক্ষাসংস্কার প্রভৃতি কাণ্ডে আত্ম-
নিয়োগ করেন, তাহার পক্ষে প্রণয়িনীর প্রণয়পাশে আবদ্ধ
হওয়া বা শৈব বিবাহ কতটা সম্ভব, তাহা নিরপেক্ষ হৃদীজনের
বিবেচ্য।

রমাপ্রসাদ বাবুর মতে (এবং আমাদের মতে) ঠিক এই সময়টায়
ইহা সম্ভব নহে। ইহার অসম্ভবিত পূর্বে বা পরে প্রণয় চর্চা করিলেও
করা যাইতে পারে, কিন্তু গুরুতর কাজ হাতে থাকা কালীন করা যায় না।
ব্রজেন্দ্রবাবু বিষয়টি ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। যাহারা ব্যবসা
করে, প্রণয় চর্চা করিবার সময় তাহারা ব্যবসা বন্ধ করিয়া ধৈর্য; যাহারা
চাকরি করে, তাহারা চাকরি ছাড়িয়া দেয় কিংবা sick-report করে।
প্রণয় জিনিসটি যতটা সহজ মনে করা যায় ঠিক ততটা সহজ নহে।

উক্তরায় কবি কালিদাস রায় মহাশয় কবিতায় ভয়টি প্রশ্ন করিয়াছেন,
“আমরা যথাসাধ্য তাহার উত্তর দিতেছি।

১। বনের পাখীরা খাঁচায় বাঁচায়ে শুনিয়া তাহার গান
জুড়ায় কাহার কান ?

উঃ। গানে যদি তাল না কাটে তাহা হইলে সকলেরই কান
জুড়াইবার কথা। কিন্তু যদি নাও জুড়ায় তবু হুমিমা যাওয়া ঠিক নহে,
কারণ কেহই গান শুনিবার জন্ত খাঁচায় পাখী পোষে না, দেখিবার জন্ত
শোষে।

২। গৃহে বসি তালবৃক্ষ বাজনে মিলে কতু অনাবিল
মুক্ত মলয়ানিল ?

মুক্ত মলয়ানিল মিলিবে বলিয়া কেহই তালপাতার পাখা ব্যবহার
করে না, যেমন সন্দেশের স্বাদ পাওয়া যাইবে আশা করিয়া কেহই আলু-
ভাজা খায় না। তবে অনাবিল হাওয়া একমাত্র তালপাতার পাখাতেই
পাওয়া যায়—বাহিরে যে হাওয়া বয় তাহাতে ধূলার ভাগই বেশি।

৩। ছত্র ছায়ায় মিলে কতু বটপত্র ছায়াব গ্রন্থ ?
জুড়ায় তাপিত বুক ?

বটগাছ সর্বত্র বহন করা যায় না বলিয়া লোকে ছাতা ব্যবহার
করে। ছাতা বটগাছ নহে বলিয়া কেহ দুঃখ করে না। তাপিত বুক
জুড়ায় কি না ইহার উত্তর নির্ভর করিতেছে—বুক কিসে তাপিত হইয়াছে
তাহার উপর। বিরহে তাপিত হইলে বটপত্রে বুক জুড়ায় না, প্রেমপত্রে
জুড়াইতে পারে।

৪। কৃপাবারি ঢালি কলসী কলসী মিলে কতু শ্রবিমল
গঙ্গা গাহন ফল ?

“শ্রবিমল” বিশেষণটি কিসের ? গঙ্গারও নহে, ফলেরও নহে। গঙ্গা
দেখিয়াছি, এবং তাহাতে স্নানও করিয়াছি, এবং সেই জন্তই জোর
করিয়া একথা বলিতেছি। গঙ্গান্নানে পরলোকের জন্ত কোনো ফল

সংগৃহীত হয় কি না জানি না, কিন্তু কৃপাবারি, স্নানের পক্ষে মন্দ কি ?

৫। অন্ধ যে উপনেত্র পরিলে আঁখি-শোভা বাড়ে তার,
দৃষ্টি কি ফিরে আর ?

এই প্রশ্নটি সম্পূর্ণ অর্থহীন, কারণ কোনো অন্ধই চশমা পরে না।

৬। সোনার সীতায় যতনে মাথালে মণির অঙ্গরাগ
পূর্ণ কি কতু যাগ ?

বিংশ শতাব্দীতে বসিয়া একপ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না, কবি
নিজেও দিতে পারিবেন না। আমরা স্বভাবতই সোনার উপর কিছু
মাথাইবার পক্ষপাতী নহি।

কুম্ভরজনের অমৃতলোকের প্রতি আমাদের একটি প্রশ্ন আছে—

বুক করেছে চন্দন যে

উপরে কিসের জন্ত

বাঁধলে যে ‘না’ হিজল গাছে

শক্তি তাহার দগ্ধ।

ইহা কি চন্দন-ব্যবসায়ীর কথা ? চন্দন যে book করিয়াছে সে উরিয়া
যায় না ? না চন্দনের মত যে বুক ঘষিতে পারে ইহা তাহারই কথা ?
চুইটি অর্থই সমান মনে হইতেছে।

কবিতা নামক একখানি নতুন ত্রৈমাসিক পত্রিকা বাহির হইয়াছে।
জনৈক বন্ধুর রূপায় তাহার দ্বিতীয় সংখ্যাবানি দেখিয়াছি। শুধুই
কবিতায় একখানি পত্রিকা চালানো বাংলাদেশে যে কতবড় দুঃসাহসের
কাজ তাহা পত্রিকা-চালকদের অবিস্মৃত নাই। সম্ভবত সেইজন্য সম্পা-
দক সংখ্যা তিনজন। দ্বিতীয় সংখ্যা খানিতে ৩২ পৃষ্ঠা কেবলই কবিতায়

পূর্ণ। স্তত্রাং তিনজন সম্পাদকের প্রয়োজনীয়তা সহজেই স্বীকৃত হইবে। ইহাতে পুস্তক-সমালোচনাও স্থান পাইয়াছে, কিন্তু তাহা কবিতায় লেখা নহে। পূর্বে বলিয়াছি, নিছক কবিতাধারা বাংলাদেশে পত্রিকা চালানো দুঃসাহসের কাজ; যাহারা এতদুপায়ে হস্তক্ষেপ করিবেন তাহারা যে নিছক কাব্য-প্রীতির জন্যই ইহা করিবেন ইহা নিঃসন্দেহ, কেননা ইহাধারা আর্থিক লাভ দূরের কথা আর্থিক ক্ষতি হওয়াটাই নিশ্চিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, উক্ত কবিতা-দ্বৈমাসিকের সম্পাদক-সংখ্যা বহুবচনে থাকিলেও তাহারা যে পত্রিকা বাহির করিতে ক্রিষ্ণু হইয়া পড়িয়াছেন তাহারই প্রমাণ বইখানিতে মিলিল। তাহারা ইহার কবিতা-অংশেও সবগুলি কবিতা দিতে সাহস করেন নাই, এমন কি, সম্পাদকদের এমনও হয়ত মনে হইয়াছে যে কবিতার লোকসান তাহারা বহিতে পারিবেন না।

‘কবিতা’র সম্পাদক লিপিতেছেন—

বর্ত দিন যাচ্ছে, ততই স্পষ্ট করে উপলব্ধি করছি যে কাব্য ও সাহিত্য সম্বন্ধে আমার ধারণা কিছু সেকেলে। কেননা এখনো আমি কাব্য বিচার করি নিতান্তই আমার ভালো-লাগা মন্দ-লাগা দিয়ে, এবং ঈশ্বর যদি সহায় হন, বাকী জীবন তাই করব।

এই কথাগুলির ভিতর কিছু বাহ্যিক প্রকাশের চেষ্টা আছে। যেন ‘সেকেলে’ বলিয়া পরিচয় দিলে লোকের চমক লাগিবে—যেন আধুনিক যুগের লোকের পক্ষে এতখানি সাহস বড়ই বিস্ময়কর! কিন্তু মোটেই তাহা নহে। ধারণা যদি সত্যই “সেকেলে” হইয়া থাকে অস্বস্ত লেখক “সেকেলে” দ্বারা যাহা বুঝাইতে চাহিয়াছেন তাহা হইলে লেখকের যে

কাব্য “বিচারের” অধিকার নাই সে কথা বলাই বাহুল্য। সেকালের লোকেই সাহিত্যদর্পণ কাব্যদর্শন, কাব্য-নির্ণয় প্রভৃতি রূপ পুস্তক লিখিয়া কাব্য-বিচারের কতগুলি মাপকাঠি (তাহার মূল্য যাহাই হউক) প্রস্তুত করিয়াছেন, কারণ সেকালের লোক অর্ধাচীন ছিল না। যে কোনো ব্যক্তিগত ভাললাগা মন্দলাগা দিয়া কাব্য “বিচার” হয় না, বিশেষ-ব্যক্তিগত ভাললাগা মন্দলাগা দিয়া হয়। এই বিশেষ ব্যক্তি বিচারের কৌশল আয়ত্ত করিয়াছেন। বিচারের বেলায় দেখিতে হইবে এই কৌশল ব্যক্তির আয়ত্ত কি না। সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত, সমস্তই ভাললাগা দ্বারা বিচার হয় কিন্তু ভাল কেন লাগিল তাহার কৈফিয়ৎ দিতে না পারিলে বিচার স্পষ্টতা বা মূর্ততার নামাস্তর হয় মাত্র। যেন একালের লোকে আর ভাললাগা দ্বারা কাব্য বিচার করে না—যন্ত্রদ্বারা করে! একালের সম্বন্ধে লেখকের কি অপরিমীম জ্ঞান!

উক্ত লেখক বলিতেছেন—

কবিতার পক্ষে তাই, আধুনিক হওয়াটাই বড় কথা নয়, ভালো হওয়াটাই আসল কথা।

ঠিক যেন সৈববাণী! ভাল হওয়াটাই আসল যদি হয় তাহা হইলে ভাল অপেক্ষা আরো ভাল আছে, তাহার চেয়েও ভাল আছে—কোটাকে মানিবে? আসলে লেখক কি বলিতে চান তাহা নিজেই জানেন না। কবিতার সম্পাদক কি না! যাহা হউক আমাদের মতে কবিতা কবিতা হইল কি না ইহাই বিচার্য। ভাল মন্দের বিচার পরে। লেখক বলিতে চান, “কবিতা এক, যুগে যুগে তার রূপের অঙ্গল বদল হয় মাত্র।” ইহাও ঠিক নহে। আমাদের মতে যেটুকু রূপ অর্থাৎ প্রকাশ সেইটুকুই কবিতা এবং যুগে যুগে সেই কবিতার পরিবর্তন হইতে

পারে। নতুন যুগের অভিজ্ঞতা পুরাতন যুগের অভিজ্ঞতা হইতে ভিন্ন হওয়া সম্ভব, কারণ জীবন সম্বন্ধে ধারণা একেবারে বদলাইয়া যাইতে পারে। স্তত্রাং যুগে যুগে কবিতা সত্য হইতে পারে, কবিতার প্রেরণা সত্য হইতে পারে কিন্তু কবিতা এক হইতে পারে না।

আমাদের শুধু রবীন্দ্রনাথের জগৎ ছুং হইতেছে। প্রশংসার কাঙাল কবি সেদিন নেহাৎ সাগরপারের নোবেল-মালোর গরবেই কবি-অভিনন্দন-কামী নিরীহ বাঙালী সন্তানদিগকে শাস্তিনিকেতন হইতে অপমানিত করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিলেন! আজ সেই কবি একটু প্রশংসা পাইবার লোভে কি হীনতাই না সত্ত্ব করিতেছেন! চিড়িয়াখানাঘ দেখিয়াছি, অল্লাহারশীর্ণ প্রকাণ্ড হাতী সামান্য ছুইচারি দানা ছোলা পাইবার আশায় কোঁহুলী দর্শককর্তৃক নিক্ষিপ্ত এক-এক খণ্ড ছুঁআনি শুঁড় দিয়া দর্শকের হাতে তুলিয়া দিতেছে। হাতীর দুর্দশা দেখিয়া সেদিন মন পীড়িত হইয়াছিল। আজ রবীন্দ্রনাথের দুর্দশা দেখিয়াও তেমন পীড়া অচুত্ব করিতেছি।

দীর্ঘ জীবনের সাধনায় তিনি যাহা গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাহার মূল্যও কি আজ তাহার নিকট তুচ্ছ হইয়া গেল? এতদিনে তাহার যে অভিজ্ঞতা লাভ হইবার কথা, সে অভিজ্ঞতা দ্বারা কি তিনি ইহাই বুঝিলেন যে সাহিত্যের বিকার এবং সাহিত্য এক জিনিস? মূল এবং তাহার travestyর মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই? যে অচকরণ করিবে, তাহারই প্রতি পুষ্পপাতিল আসিবে? ইহা কি অন্ধ স্নেহ? কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ত দেশের সম্পর্কে এখন আর ব্যক্তিমায়া নহেন যে তিনি যেকূলে ইচ্ছা স্নেহ দেখাইতে পারেন! সাহিত্যদর্শী,

সাহিত্যারসিক, সাহিত্য্যপন্থা রবীন্দ্রনাথ আজ সমগ্র দেশের নিকট এখন আর ব্যক্তিমায়া নহেন, রবীন্দ্রনাথ একটি আইডিয়া, একটি রূপ। এই রূপ ভেদ করিয়া আজ যদি একটি ক্ষুদ্রাত্ম উদ্ভব এবং লোলুপ রসনা বাহির হইয়া আসে তবে কাহাকে দোষী করিব জ্ঞানি না। রবীন্দ্রনাথের যে পরিচয় কল্পনামুখি সমগ্র দেশের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে তাহাকে তিনি আজ একরূপ নিখম ভাবে কলঙ্কিত করিতেছেন কেন তাহা আমরা কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিব না।

স্নেহ যদি নিতান্তই ব্যক্তিগত হয় তাহা হইলে স্নেহাস্পদকে নিজের কাছে লইয়া আদর করা চলিতে পারে; কিন্তু সাহিত্যের বিচারক সাজিয়া স্নেহের কোনো লিখিত-সম্ভাষণ তিনি কাহাকেও দিতে পারেন না। যে স্নেহ-সম্ভাষণ স্নেহাস্পদদ্বারা মুদ্রিত হয় এবং বিজ্ঞাপন-হিসাবে ব্যবহৃত হয় তাহা লিপিবার সময় বিশেষ বিবেচনা করিয়াই লেখা উচিত। স্নেহপ্রবণ রবীন্দ্রনাথের এইটুকু অবগতই বুঝা উচিত ছিল যে সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাহার দায়িত্ব একটা বিশেষ বয়সে আনিয়া শেষ হইয়া যাইতে পারে না। সৃষ্টির দিক দিয়া বয়স-বর্ধিত যাহা স্বভাবতই শেষ হয় তাহার জগৎ কেহ ছুং করে না, কিন্তু সৃষ্টি রক্ষার একটি দায়িত্ব আছে তাহা কখনো শেষ হয় না। কোনো কোনো প্রাণীর মধ্যে আপন সন্তানকে মারিয়া ফেলা বা খাওয়া ফেলার রীতি আছে, কিন্তু মানুষের মধ্যে এই রীতিটি দেখিতে কেহই আশা করে না। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সৃষ্টিবিনাশে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তিনি যে vicious circleএ পড়িয়াছেন তাহা হইতে তাহাকে এবং তাহার সৃষ্টিকে রক্ষা করিতে পারে এমন ব্যক্তি কে আছে?

ভারতবর্ষে 'রাজগীর' নামক দশপৃষ্ঠাব্যাপী ভ্রমণবৃত্তান্তে লেখক যে দয়া করিয়া রাজগীর সথক্ষে ও চুইচারি ছত্র লিখিয়াছেন, ইহাতে রেলওয়ে গাইড বুক এবং ভারতবর্ষ অবশ্যই কৃতজ্ঞ হইয়াছে। ইহা ছাড়া অসম্ভাব্য যে সব মূল্যবান তথ্য এবং ফোটোগ্রাফ ইহাতে স্থান পাইয়াছে তাহার জন্ম বাংলাদেশ কৃতজ্ঞ থাকিবে। তথাগুলি প্রায় গবেষণার সীমানায় পৌঁছিয়াছে। যথা—“দেবার সঙ্গে ছিলেন আমার সেজমামা ও মামী, মিসেস পাল ও তার মেজ ভাই (আমার প্রিয় জ্ঞানক) বব।” “বাবার জ্ঞানক ও আমার জ্ঞানক দুজনেই দারোগার অস্বস্ত ক্রমতা দেখে অবাক! আমার পত্নীকে গম্ভীর মুখে বসে থাকতে দেখে আমি বল্লুম, কিগো দারোগানী...।” “আহা কি শুযোগই হয়েছিল, এক সঙ্গে পাঁচটা বিধবা হত...।” “আভারাগী, খুঁড়ি মিসেস বোস এতক্ষণ গম্ভীর হয়ে বসে ছিলেন, এবার তাঁর মুখে গররাজির ভাষা ছুটলো, আমি কিন্তু কিছুতেই থাকবোনা। সে দুর্জয় পণের মুখে তার দাদাদের (ফুলকাদা ও ভোখল), প্রিয় জামাইবাবুর (অর্থাৎ লেখকের), ছোটকাকার বন্ধু ভূপেনবাবুর, এমন কি রেবুদি ও মিসেস ব্যানাজির সকল অমুরোপ উপরোধই প্রতিহত হয়ে গেল।” “এবার সবাই নিজেদের পরিকার করে নিন, অর্থাৎ অত্যাবশ্যকীয় প্রতিক্রিয়া শেষ করে নিন। সকলেই দার দার নিরবিলি স্থান খুঁজে অত্যাবশ্যকীয় কাজটা অস্বস্তকার থাকতে থাকতেই সেরে নিলুম।”

এতগুলি স্তীলোক সঙ্গে লইয়া কখনো একপ হুঁসাধা ভ্রমণ করি নাই—ব্রতরাং ভ্রমণকালে চক্ষু এবং চিত্র এবং ইন্দ্রিয়াদি কোন দিকে নিবদ্ধ থাকে তাহাও বুঝি না। জয় রঙ্গকৃষ্ণের!

—

বিচিত্রায় “রমণীর মুখ” নামক একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আছে। ইহাতে কবি কালিদাস রমণীর মুখ সথক্ষে বাহা বলেন তাহা আছে; আর আছে বিধাতার কথা। সৃষ্টির প্রারম্ভে বিধাতা এমন রূপ সৃষ্টি করিতে চাহিলেন “দিনে রাতে সর্ষক্ষণ যাতে চোপ জুড়িয়ে যাবে। তাই সব শেষে তিনি সৃষ্টি করলেন রমণীর মুখ—কমলের মত রাতে যা মুদিত হবে না, চন্দ্রের মত দিনের বেলা যাবে না স্নান হয়ে।”

তাহার পরে “নারীই চা প্রস্তুত করে, চা তৈয়ারীর সমস্ত খুঁটিনাটির প্রতি তারই সজাগ দৃষ্টি থাকে। চা পানের নিত্যকার অচুড়ানের তত্ত্বারক সেই করে। তার এ অচুড়ানের কর্তৃত্ব করবার অধিকার নিয়ে কোনো তর্ক ওঠে না। সত্যকথা বলতে কি নারীর হাতের স্পর্শ বিনা, চায়ের আকর্ষণ অনেকখানিই কমে যায়।”

তাহার পর, “ব্রাউনিং বলেছেন—‘একটুখানি বেশী হলে কতখানি আর একটু কম হলে কত রাজ্যের তফাৎ।’ চায়ের নিত্যকার অচুড়ান সার্থক বা পণ করার পক্ষে একথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।”

কিন্তু আমরা বলি, ব্রাউনিং-এর ঐ কথাটি জুতার মাপ সম্পর্কেও সত্য, এবং আরো অনেক বিষয়ে সত্য। কিন্তু চা প্রস্তুতের সময় রমণীর হাতের স্পর্শ অত্যাবশ্যক হয় বলিয়ার কালিদাস রমণীর মুখ সথক্ষে কি বলেন বা না বলেন, তাহা আলোচনার প্রয়োজন আছে। অর্থাৎ রমণীর মুখই সংসারে শ্রেষ্ঠ ধন, এবং ভোমরা চা খাও।

—

এখন প্রশ্ন এই, ভবিষ্যতে সাময়িকপত্রের লেখক হইবে কাহারো? বাবসাঘীর মাল সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখিবার জন্ম ভাড়াটিয়া লোকেরাই

লিখিবে। লেখককে পয়সা দিতে হইবে না, কারণ পয়সা ব্যবসায়ীরা দিবে, উপরন্তু পয়সা পাওয়া যাইবে।

ভয়দূত, বাঙালীর পোষাক-বৈশিষ্ট্য নাই এজ্ঞা ভ্রম করিয়াছেন।—

বাঙালী একে একে তার সকল বৈশিষ্ট্যই বিদেশীর অনুকরণ মোহে বিসর্জন দিতেছে। বাঙালী-জীবনে আদর্শ এবং আদ্যচেতনা বলিতে যে কিছুই নাই তাহার প্রমাণ প্রত্যহ পাওয়া যাইতেছে।

আমরা কিন্তু ইহার উল্টাটাই লক্ষ্য করিতেছি। পোষাক সম্বন্ধে ইহাই বলিতে পারি যে বাঙালীর নিজস্ব কোনো পোষাক কোনো কালেই ছিল না। খালি গায়ে দূতির উপর একখানি গামছা বা চাদর বাঁধিয়া চলাফেরা করাই তাহার রীতি ছিল। মুসলমান রাজত্বকালে মুসলমান-চাপকান বাঙালীর ভিন্ন পোষাক হয়। কয়েক পুঙ্খ দরিদ্র বাঙালী ইহা পরিয়াছে। এখনও কেহ কেহ পরে। তাহার পর আমিল ইংরেজ। সাত সাত বৎসরের মুসলমান-পোষাক ইংরেজের প্রভাবে আমাদের বদলাইতে হইল। বর্তমানে ইংরেজ-রাজত্ব। সুতরাং ইংরেজি পোষাকই আমাদের বর্তমান ভিন্ন পোষাক। যদি ইহা বদলাইতেই হয়, তবে এখন তাহা সম্ভব নহে। স্বরাষ্ট্র পাওয়া পণ্য আমাদেরকে অপেক্ষা করিতেই হইবে। শুধু বাঙালী নহে, ভারতবর্ষের কোনো শিকিত লোকেরই জাতীয় 'পোষাক' নাই।

আনন্দ বাজার (২৪শে পৌষ) পত্রিকায় নিম্নলিখিত সংবাদটি পাঠ করিয়া উদ্ভিগ্ন হইলাম—

...চিকিৎসকগণ মনে করেন যে মহাত্মা গান্ধীর কয়েকটি

দাঁতের অবস্থা ভাল না থাকার জন্যই সম্ভবত তাহার রক্তের চাপ কমিতেছে না। সেই হেতু তাহার 'আগামী কলা তাহার দুইটি দাঁত তুলিয়া ফেলিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

এখন ভাবিতেছি সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয় কি করিবেন!

'দেশ' ইটালীয়দের প্রতি বড়ই বিরূপ হইয়াছেন। যথা—

মানবতার অভাব না বর্ধিত? হাবসীদের আক্রমণের আশঙ্কা করিয়া ইতালি 'আণ্ড' বাড়াইয়া আবিসিনিয়ার সম্প্রতি বীরবিক্রম দেখাইয়াছে। তাহার উত্তর আবিসিনিয়ার প্রধান শহর 'দেশী'র উপর ২ খানা বিমানপাত [?] লইয়া প্রচণ্ড ভাবে ছই ছই বার বোমা বর্ষণ করিয়াছে! আমেরিকান রেড ক্রস হাসপাতালও এই বোমাবর্ষণ হইতে বাদ পড়ে নাই। রেডক্রস হাসপাতালের উপর প্রকাণ্ড "ক্রুশ" চিহ্ন অঙ্কিত ছিল, তাহা সম্বন্ধে হাসপাতালের উপর বোমাবৃষ্টি হইয়াছে।

ইতালি একসঙ্গে অনেকগুলি অনায়াসকার্য করিয়াছে। প্রথমত আবিসিনিয়ানদের তরফ হইতে আক্রমণের আশঙ্কা করাটা তাহাদের পক্ষে অনায়াস। কারণ, যুদ্ধক্ষেত্রে নামিয়া শত্রুপক্ষের আক্রমণের আশঙ্কা কখনো করা উচিত নহে।' করিলেও চূপ করিয়া একই স্থানে বসিয়া থাকা উচিত। যদি বসিয়া থাকা নিতান্তই অসম্ভব হয়, অর্থাৎ যদি সংঘর্ষের অভাব ঘটে তাহা হইলে মলয়ানিলের মত অত্যন্ত লঘুভাবে অগ্রসর হওয়া উচিত, বীরবিক্রমে 'অগ্রসর হওয়া', (অশ্রুত বীরবিক্রম দেখানো) কোন মতেই উচিত নহে। তাহার পর বিমান হইতে যদি বোমা ফেলিতেই হয় তাহা হইলে সূতা বাঁধিয়া বোমাগুলি অত্যন্ত দীর্ঘ দীর্ঘে জমির উপর নামাইয়া দেওয়া উচিত। এজ্ঞা এরূপ বিমান প্রস্তুত

করা চাই যাহা শূন্যে একই স্থানে অনেকক্ষণ ভাসিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু ইটালীয়গণ তাহা করে নাই—বোমা অতি প্রচণ্ডভাবে ফেলিয়াছে। তাহাও আবার এক বার নহে, দুই দুইবার। তত্বপরি হাসপাতালের উপরেও ফেলিয়াছে, কিন্তু 'দেশের' বিবেচনায় উপরোক্ত পদ্ধতিগুলির সবগুলিই বর্ধিতাশুচক। কেবল যুদ্ধ করাটা সম্ভ্যাত।

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ভারতবর্ষে লিখিতেছেন—

জাগ! জাগ! উঠ, নটরাজ।

উপেক্ষা জড়ের দখল দেবতায় লাভ।

কবি প্রথম ছুরে যাহা বলিয়াছেন, আমরাও সেইরূপ চাহিতেছি। নটরাজ যদি নিঃস্রাম্য হইয়া থাকেন তবে অবিলম্বে জাগুন, এবং জাগিয়াই দ্বিতীয় ছুরের অশ্বয় ককন।

ভারতবর্ষের একটি গল্পে একটি সনাতন রীতির যুবজনোচিত কথ্য বেখিয়া মুদ্র হইলাম।

...গেটের সামনে এসে খামল একখানি ট্যাক্সি, ট্যাক্সি থেকে স্ট্রটেকশ [কেশ] হাতে যে আগেরাই নামল সে যুবক। যুবকটি বিশেষ কোন সম্ভ্রান্ত বংশের অস্তু কৃষ্ণ বা অস্তুনিহিত। বাড়ীর ঠিক সামনেই খানিকটা জমি, তাকে দ্বিধা বিভক্ত করে একটি রাজ্য পথ বাড়ীর গায়ে...গিয়ে ঠেকেছে।...সোপান-গুলি পেরিয়ে সে উপরে উঠল। বাইরে তিনখানি ঘর, কিন্তু জন প্রাপ্তি নেই, এমন কি আশেপাশে একটা চাকরকেও দেখতে পাওয়া গেল না। এই অবস্থায় সকলে যা করে যুবকটি তাই করল। সটান সামনের ঘরটায় ঢুকে স্ট্রটেকশটা

টেবিলের উপর রেখে সশব্দে চেয়ারটা টেনে বসে পা ছুটো টেবিলের তলায় যতখানি যায় প্রসারিত করে দিল!

সকলেই এক্সপ অবস্থায় ইহা করিয়া থাকে, কেবল ভাবিতেছি, টেবিলের তলায় পা ঢুকাইবার মত অবকাশ না থাকিলে কি করে?

আমরা কোনো নাটকে চৌকিদারের ভূমিকা দেখিলেও চৌকিদারের উক্তি বড় বেশি থাকিতে দেখি নাই—বিশেষত চৌকিদারকে কখনো স্বগতোক্তি করিতে দেখি নাই। ভারত নামক সাপ্তাহিকে ছেলেদের জন্য লেখা একটি প্রহসনে দেখিলাম, জনৈক চৌকিদার স্বগতোক্তি করিতেছে। দেখিয়া বিম্বিত হইলাম!

শিবনাথ। দেপতো বাবা, এরা আমার টাকার বাস্ক সরিয়েছে। ফল-ফুলারি থাকে, তা না—টাকার বাস্ক নষ্ট করেছে।

চৌকিদার। সে কি! সত্যি সত্যি চুরি! (স্বগত) যত বদমায়েদের পাড়ী! চুরি করেছে! আচ্ছা আমি এখনই খানায় খবর দিইগে। ঠাকুর মশায় দেখবেন যেন আবার পালিয়ে না যায়।

অভিনয়ের পক্ষে আদর্শ চৌকিদার সম্ভেদ নাই।

কিন্তু শুধু চৌকিদার নয়, প্রহরীরাও নূতন রূপে দেখা দিয়াছে। পৌষের বিচিত্রায় মুসাকিরের ডায়রী নামক লেখায় ইহার পরিচয় মিলিল।

নিরীক্ষা নিম্নরূপ আনন্দের মধ্যে ডুব দিবে যখন প্রকৃতির সেই রূপরাজ্যের মধ্যে মন পথ হারিয়ে বসেছে তখন মোটির বাসের গতি বীরে বীরে লুপ্ত হয়ে এসেছে, শিলংএর সীমানায়

আমরা এসে পড়েছি দূরে ডাঃ রবার্টের হাসপাতালের লাল
চূড়া বেন গ্রহরীর মত যাত্রীদের স্বাগত অভিবাদন জানাচ্ছে।
গ্রহরীর এই স্বাগত অভিবাদন জানানো রূপ কণ্ঠবাণী নূতন।

স্বত্বশেখর উপাধ্যায় বিচার্যর পাতায় যাত্রা করিচ্ছিলেন, আশা করি
তাহা আর পুনরায় করিবেন না। কারণ প্রত্যেক জিনিসেরই এক-
একটি পৃথক ব্যবহার-বিধি আছে, তাহা অত সহজে উল্টাইয়া দেওয়া
চলে না।—

সেই পুরান ছিলামটা ধরালেম আবার কুঁদিয়ে।

চোখ বুজে চুঁকা টানি,

কল্লোলিত হয় তোমার অছপ্রেরণা,

আবার উঁতি বসে গিয়ে সেই উঁতে।

চাঁকার সহিত এ ছিলামের সঙ্গতি নাই, উঠা করপুটে ধরিয়া টানিতে
হয়।

কোনো কোনো কবি কি চান তাহা বুঝিতে না পারিয়া কবিতা
লেখেন এবং কবিতায় মনের কথা প্রকাশ করেন। অনেক সময়
আমাদিগকে ইহা লইয়া ভাবিতে হয়। কিছু বলিতেও হয়।

“ভবিষ্যতে”র এইরূপ একটি কথার উদ্ভব দিতেছি। কবি বলিতেছেন,

...এই চুপ নিশি অবসান

কবে হবে? কত আর গেয়ে যাব বেদনার গান?

করিছে রোদন বৃকে উপবাসী অব্ধ যৌবন;

কিছু নয়; শুধু এক জীবন সঙ্গিনী প্রয়োজন

আর কিছু নয়; চাই চাই তারে, বাঁচিবার তরে

সেই দিতে পারে বাসনার পাজ পূর্ণ করে

স্বাস্থ্য আয়ু পরিচরিত; মিলনের মে অমৃত স্বাদ
মস্তেয়ার মাথায় এক বিতরিয়া দেহের প্রসাদ
আমারে বাঁচাতে পারে, আরো অনেকেরে, মোর মতো
নিঃসঙ্গ শয্যার মাঝে জর্জরিত ক্ষুধায় বিকত।

কিন্তু চুপের অবসান ইহাতে হইবে না, চুপের গোড়াপত্তন হইবে
মাত্র। আসলে যাহা পাইলে কবির বাঁচিবার পথ প্রশস্ত হইবে, তাহা
পাড়ার যাবতীয় ক্ষুধায় বিকত [গাষ্ট্রিক আলস্যের?] বন্ধুদের এবং
কবির নিজের জ্ঞাত সংগৃহীত কোনো common-মাছষী নহে—তাহা
যে-কোনো অকিসে একটি চাকরি। কবি অতঃপর কবিতা না লিখিয়া
সরল গঞ্জে চাকরির জ্ঞাত দরখাস্ত লিখুন। সফল হইলে আমাদের আর
কিছু বলিবার থাকিবে না।

সম্প্রতি “বিনবিনিয়া” নামক একটি অজ্ঞাত রোগ কলিকাতা আক্রমণ
করিয়াছে। বন্ধুর বাড়ীতে একটি ছোট মেয়ে সেদিন দোতালার
জানালা হইতে জনৈক পথচারীর এই রোগে আক্রান্ত হইতে স্বয়ং
দেখিয়া আনন্দে উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছে। সে যাহাকে পাইতেছে
তাহাকেই বলিতেছে, “আমি বিনবিনিয়া দেখেছি—কি মজা!”—
সেদিন আমার এক বন্ধু, হাতের আঙুল চুলকাইয়া উঠিতেই অত্যন্ত
অস্থির হইয়া পড়িয়া ঝটিতি পাঁচপের বরফ আনাইয়া বসিলেন!—
সকলেরই প্রাণে যে একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে একথা বলাই
বাহুল্য। কোনো কোনো ডাক্তার বলেন, যাহারা অতিরিক্ত মগ্ধগান করে
তাহাদের মধ্যে একরূপ লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া আশ্চর্য্য নহে, কেহ বলেন
ইহা আয়োপেপেক্সি—এরূপ নানা গুণ্ডব ক্রমশঃ রটিতেছে। “ভয়দূত”
নামক সাপ্তাহিক লিখিতেছেন, “রোগটি বেশ রোমাঞ্চিক। পত্নী বা

প্রিয়ার মন পরীক্ষা করিবার পক্ষে চমৎকার অস্ত্র।"—কিন্তু প্রেমসৌ
প্রিয়তমের বিপদে বরফ কিনিবে কিনা ইহা পরীক্ষা করিয়া লাভ কি?—
আমাদের মনে হয়, মাছুষের মধ্যে যে নাচিবার একটি জন্মজাত প্রবৃত্তি
আছে তাহারই রিপ্রেসনের ফলে এই রোগ দেখা দিচ্ছে। বহুদিন
দৈনিক নাচ বন্ধ, তাই এখন মাংস এবং স্নায়ু নাচিতেছে।

ভয়দূতের কবির জন্য দুঃখ হইতেছে। তিনি লিখিয়াছেন—

ওরে প্রেম নাই, নাই ভালোবাসা-বন্ধন,

ওরে সত্য নাই, সত্য শুধু মিছে ছলনা,

কোনো নীতি নাই, নীতি নিরাশার ক্রন্দন;

শুধু আছে নর, লালসা এবং ললনা।

কিন্তু আমরা বুঝিতেছি অন্ধরূপ—

হাতে টাকা নাই, টাকা-ছাড়া ঈশ্বা-ক্রন্দন

শুধু ধাঁধা আছে—দূরে সরে গেছে ললনা।

ভবিষ্যতের কবির খুব সম্ভব কিনকিনিয়া রোগ হইয়াছিল। স্বতরাং
বরফের চাপ হইতে উত্তীর্ণ তিনি যে বায়না ধরিয়াছেন তাহাতে কল্যাণ
হইবে বলিয়া মনে করি না।—

ভয় নেই ওগো নারী, ভয় নেই,

এ-গৃহের ক্ষুদ্রতম ছিন্ন রুদ্ধ কোরে

এসো মোরা এক হই,

সমর্পণে দ্বিধা হই শরীরের গভীর আধারে

মুগ্ধরিত করি এসো, স্বর্ধা-প্রেম বিরহিত জীবনের

সে-স্বর্ধামুখীরে

নীরব গুহন আর ইন্দ্রিয়ের মধুবৃত্তে, অপাখিব
শৃঙ্গার দৌরভে।

“গরম হই” পদ্যান্ত বলিলে মাত্রা রক্ষা হইত, কিন্তু “শিষ্ণু হই”—
একটু বাড়াবাড়ি হইয়া গিয়াছে! বরফের ত্রি-অ্যাকশন।

প্রাপ্তিস্বীকার ও অভিমত

সাত সাগরের পানে। কুমারী অমলা নন্দী প্রণীত
ইউরোপ ভ্রমণ কাহিনী। প্রকাশক শ্রীঅশোক নন্দী, ইকনমিক
জুয়েলারি ওয়ার্কস্, ১০ চৌরঙ্গী, কলিকাতা। বইখানি রয়্যাল
অক্টোভো সাইজ, ১২০ পৃষ্ঠা, মলাট সুদৃশ্য, বহু চিত্র শোভিত,
মূল্য দুই টাকা।

দ্বাদশ বর্ষীয়া বাঙালী বালিকার পক্ষে ইউরোপ যাত্রা
সম্ভবপর হইয়াছে তাহার পিতার জ্ঞা। শ্রীমতী অমলা পৌণে
দু বৎসর ইউরোপের নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া যে সমস্ত জিনিস
দেখিয়াছেন এবং যাহাদের সঙ্গে মিশিয়াছেন তাহাই খুব সহজ
কথায় বর্ণনা করিয়াছেন। অল্পবয়স্কা বালিকার দৃষ্টিতে যতটুকু
দেখা সম্ভব এবং যে ভাবে দেখা সম্ভব, এই গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয়
তাহাই। বর্ণনার মধ্যে অনেক চপলতা আছে, থাকাই স্বাভাবিক,
কিন্তু সেকারণে বর্ণনার মূল্য কমে নাই, বরঞ্চ সেই কারণেই
আরও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। বইখানির ছাপা এবং বাধাই
সুস্বচির পরিচায়ক।

আকাশ রহস্য। শ্রীজিতেন্দ্রকুমার গুহ এবং শ্রীতাপসবালা দেবী প্রণীত গ্রহনক্ষত্র বিষয়ক গ্রন্থ। প্রকাশক শ্রীব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত, ষ্টেডেন্টস লাইব্রেরি ৭৭১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা। জাউন অক্টোবো সাইজ ১৪৪ পৃষ্ঠা, মূল্য দেড় টাকা।

আমাদের দেশে একমাত্র গল্প-উপন্যাস পাঠেই সাধারণের উৎসাহ দেখা যায়, জগৎ-বিষয়ক কোনোকিছুর সম্পর্কে কিছু জানিবার আকাঙ্ক্ষা বা উৎসাহ দেখা যায় না। একদিকে জানিবার কৌতূহলের অভাব, অতীতকালে গল্প-উপন্যাসে মোহগস্ত হইয়া থাকিবার প্রবৃত্তি, এই দুইটির সম্মিলনে পঠনকর্ম বাঙালী ক্রমশই সর্ববিষয়ে হীন হইয়া পড়িতেছে। সেই জগৎই এদেশে প্রবন্ধ-পুস্তক বেশি প্রকাশিত হইতে পারে না, কারণ কেহ উহা পড়িতে চাহে না, অথচ ইহা নিশ্চিত যে ঠিক এই কারণেই বাংলা ভাষাতে আধুনিক বিজ্ঞানবিষয়ক সংবাদ ঠিক মত প্রকাশ করা সম্ভব হইতেছে না। পাঠক না থাকিলে লেখক লিখিতে উৎসাহিত হন না, এবং যদি কেহ ক্ষতি স্বীকার করিয়া একপু কোনো গ্রন্থ লেখেন তবে তাহার ভাষা পাঠকের নিকট তুর্লোভ্য রহিয়া যায়। যে ভাষার সহিত পরিচয় নাই, তাহা বুঝা সম্ভবতই কঠিন। তাই মনে হয় যত পরিভাষাই প্রস্তুত হউক বাংলাভাষা একমাত্র গল্প-উপন্যাস এবং কাব্য-রচনার ভাষা হইয়া রহিবে, বিজ্ঞান-বিষয়ক রচনার ভাষা হইবে না। একপু ক্ষেত্রে যিনি আধিক্য কবিতার আশঙ্কা জানিয়াও বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ রচনা বা প্রকাশে উৎসাহী হন তাহাকে আমরা প্রশংসা না করিয়া পারি না।

আলোচ্য গ্রন্থখানি যে দুইজনে মিলিতভাবে লিখিয়াছেন,

তাহাদের একজন মহিলা। ইহা বিজ্ঞান-সাহিত্যের শুভ সূচিত করিতেছে। ইহারা ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত পুস্তক হইতে গ্রন্থের বিষয়বস্তু সংগ্রহ করিয়াছেন। এই সঙ্গে কোনো মানমন্দিরের সহায়তায় ইহাদের যদি দূরবীক্ষণ-যন্ত্রাদিগণিত জগতের সহিত চাক্ষুষ পরিচয় থাকিত তাহা হইলে আরও আনন্দের বিষয় হইত। তাহা আছে কিনা গ্রন্থে উল্লেখ নাই। কেহ যদি জীবাণু সম্বন্ধে কোনো গ্রন্থ রচনা করেন তাহা হইলে তাহার অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে জীবাণু জগতের সহিত কিছু পরিচয় যেমন আমরা আশা করি, গ্রহনক্ষত্রের বেলাতেও তেমনি কিছু চাক্ষুষ পরিচয় আশা করি, যদিও ইহা প্রাথমিক বই লিখিবার পক্ষে নিতান্ত অপরিহার্য নহে। অবশ্য চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা না থাকিলেও, ইংরেজি ভাষায় যে-বই আছে বাংলা ভাষায় সে-বই অনায়াসে প্রস্তুত করা যায় এবং প্রথম অবস্থায় এরূপ না করিলে চলিবেও না।

আকাশ-রহস্য গ্রন্থখানি যথাসম্ভব সরল ভাষায় লেখা—তবে সামান্য কয়েকটা স্থানে জ্ঞান বিষয় ঠিকমত প্রকাশ হয় নাই। যথা—“প্রস্তরযন্ত্রের ঘনত্ব তুল্য অপেক্ষা বেশী। দেহজ প্রস্তরের ওজন তুল্য অপেক্ষা অধিক।” শেষের বাক্যটি গুরুপভাবে লেখা ঠিক হয় নাই। ঘনত্ব আকাশপাতাল তফাৎ হইলেও প্রস্তরের ওজন তুল্য অপেক্ষা অধিক বলা চলে না। যাহা হউক এইরূপ সামান্য দুই একটি ত্রুটি সবেও বইখানি পাঠোপযোগী হইয়াছে—এবং পাঠে অনেক তথ্য এই বাংলাভাষায় লেখা বইখানি হইতেই লিখিতে পারা যাইবে। লেখক এবং লেখিকা যে সব ইংরেজি আয়ত্তনমি-বিষয়ক বই হইতে সাহায্য লইয়াছেন, তন্মধ্যে

Sir J. Jeans এর The Universe Around Us (1929)

সর্গাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

ইলেক্ট্রো। আয়ুর্বেদিক কাশ্মীর নিকট হইতে একখানি নূতন
বৎসরের স্বদৃশ্য ক্যালেন্ডার পাইয়া ধন্যবাদ জানাইতেছি।

হারমোনিয়ম কিনিতে হইলে ডোয়াকিনের হারমোনিয়মই কেনা উচিত

৫০ বৎসর ধরিয়া ডোয়াকিনের হারমোনিয়ম সুরের মাধুর্য্য গঠন,

স্বাদিষ্ঠ ও অচ্ছাদ গুণের জন্ম সর্বশ্রেষ্ঠ
বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। অচ্ছ
হারমোনিয়ম কিনিবার পূর্বে একবার
ডোয়াকিনের হারমোনিয়ম সখন্ধে খোজ
করিবেন। নব-প্রকাশিত সচিহ্ন মূল্য-



তালিকার জন্ম আজই পত্র লিখন।

সোনারা ডবল-রীড বক্স হারমোনিয়ম ৩ অক্টেভ, ৫ ষ্টপ বায়সহ
৩০ টাকা।

ডোয়াকিন এণ্ড সন্স

১১নং এম্পেনেড, কলিকাতা।

শ্রীপরমল গোপালী এম.এ কর্তৃক সম্পাদিত। ২৫/২, মোহনবাগান রো, শনিরঞ্জন গেস
হইতে শ্রীগোবিন্দ নান কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রী ২২১ নং চৌধুরী রোড, ১৩, এ
(কো.২২১) ১৩.৫২



৮ম বর্গ]

ফাল্গুন, ১৩৪২

[৫ম সংখ্যা

জীবনচরিত

ব্যক্তিবিশেষের জীবনের ইতিহাস লইয়া যে সাহিত্য রচিত হয়
সাধারণতঃ তাহাকেই আমরা জীবনচরিত বলি। ব্যক্তিবিশেষের না
হইয়া যদি সমাজের বা দেশের ও দেশের জীবনের বিবরণ লেখা হয়
তাহা হইলে তাহাকে জীবনচরিত বলা চলে না। ইতিহাস বা সত্য-
ঘটনার যথাযথ বিবরণ না হইয়া যদি কল্পিত বা বিকৃত ঘটনা অবলম্বন
করিয়া ব্যক্তিবিশেষের জীবনী লেখা হয় তাহাকেও জীবনচরিত বলা
চলে না। আবার ব্যক্তির জীবনের সত্য ঘটনা লইয়া যে গ্রন্থ রচিত
হইল তাহা যদি সাহিত্য বা আর্ট-এর দরবারে না পৌঁছে তাহা হইলে
তাহাকেও জীবনচরিত বলিব না। যেমন-তেমন করিয়া কতকগুলি
তথ্য বা বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলেই তাহা সাহিত্য হইয়া ওঠেনা।
বিচ্ছিন্ন বিষয় ও বিক্ষিপ্ত ঘটনাবলী একটা গঠন-নৈপুণ্যের অপেক্ষা

করে। নিপুণ শিল্পীর হাতে সেগুলি রূপ পায়, সুন্দর হইয়া গড়িয়া ওঠে। জীবনচরিতকার একজন রূপদক্ষ। যাহার জীবনী তিনি রচনা করিতেছেন সেই ব্যক্তি জীবন্ত হইয়া দেখা দেন। কোন একটা কিছু যে পড়িতেছি তাহা জুলিয়া যাইতে হয়, যেন একটি প্রাণবান ব্যক্তির স্পষ্ট নিঃশ্বাস অহুভব করিতেছি, উষ্ণ স্পর্শ লাভ করিতেছি। যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি যে রক্তমাংসে গড়া সজীব মানুষটি বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়া একটি অনিবার্য পরিণতির দিকে অগ্রসর হইতেছেন। জীবনের বিচিত্র ধারা অবিরল প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, কখনও আলো, কখনও ছায়া তাহার উপর পড়িয়াছে। মুগ্ধ নয়নে তাহাই দেখিতে দেখিতে জুলিয়া যাইতে হয় যে একটা রচনা পড়িতেছি! এইখানে জীবনচরিত আর শুধু ঘটনা-সম্ভব বা তথ্যসঙ্কলন হইয়াই রহিল না, ইহা হইয়া উঠিল সাহিত্য। যে-মানুষ বাস্তবিকই জীবিত ছিলেন, কিংবা এখনও আছেন, ভাষায় তাহার জীবন্ত মূর্তি গড়িয়া তোলাই জীবনী-লেখকের কাজ।

১

ব্যক্তিত্ব, ঐতিহাসিকত্ব ও সাহিত্য এই তিনের সম্মিলিত দাবী মিটাইতে না পারিলে জীবনচরিত লেখা হয় না। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের রামভদ্র লাহিড়ীর জীবনচরিত খাটি জীবনচরিত নহে। “তৎকালীন বঙ্গীয় সমাজ”-ও লেখক-মহাশয়ের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিতখানি সম-সাময়িক বহুপ্রকার তথ্যের গুরুভারে ভারাক্রান্ত। ইংরেজী ভাষায় বহু জীবনচরিত লেখা হইয়াছে। “Life and-times” ধরণের জীবনীর

সংখ্যাও অনেক। এগুলিকে খাটি জীবনচরিত বলা চলে না, এমন কি David Masson-এর Milton-কেও বিশুদ্ধ জীবনচরিত বলা কঠিন। কারণ John Miltonকে ছাপাইয়া সমসাময়িক ঘটনা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার বর্ণনাই এখানে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

এক-একজন লেখক আছেন যিনি অপরের কথা বলিতে গিয়া নিজের কথাই বেশী করিয়া বলেন। ইংরেজীতে Izak Walton-এর লেখাগুলি এই দোষে দুষ্ট। এই-শ্রেণীর লেখক তাহাদের নিজের বিষয়, নিজের মতামত, নিজের রুচি-অরুচির কথা লইয়া এতই ব্যস্ত হইয়া পড়েন যে অপরের স্বরূপনির্ণয় বা তাহার যথাযথ প্রকাশ প্রতিপদে বাধা পায়। এবং জীবনচরিত ব্যক্তিবিশেষের জীবন্ত ছবি না হইয়া ছুটি ব্যক্তির অসম্পূর্ণ ও খণ্ডিত রূপের বিকৃত পরিচয় বহন করে। বসু-মহাশয়ের মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ-স্থল।

যাহারা একটা অভিমত প্রচার করার জন্তই ব্যস্ত তাহারা ব্যক্তির জীবনকে একটা বিশিষ্ট ভাবের দৃষ্টান্তরূপেই দেখিয়া থাকেন। রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও রামমোহন রায়েদের যে-সমস্ত জীবনী লেখা হইয়াছে সেগুলি পড়িতে পড়িতে মনে হয় যে “ধর্ম সংস্থাপনার্থ্য সম্ভবামি যুগে যুগে” ইত্যাদি বাণীর সার্থকতা প্রমাণ করার জন্তই এ বইগুলি লেখা হইয়াছে। ইহার অতিমানব, ঈশ্বরের অবতারস্বরূপ—এই কথাই প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত শোনা যায়। মাইকেল মধুসূদনের জীবনচরিত পড়িতে পড়িতে মনে হয় যে বসু-মহাশয়ের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল পাপের প্রায়শ্চিত্ত চিত্রিত করা, “যেমন কর্ম তেমনি ফল” এই সনাতন বাক্যটি সপ্রমাণ করা। তিনি মনে করেন কবিবরের জীবনের অধিকাংশ ছুটনা ও দুঃখভোগ “তাহার ঈশ্বরীয় গ্রহণের ফল”

(১৩১ পৃষ্ঠা) মধুসূদনের জীবন “অশান্তিময়, কলঙ্কময় কবিজীবনের প্রকৃষ্ট উদাহরণস্বরূপ” (১৫৩ পৃ.)—ইহাই গ্রন্থকারের প্রতিপাদ্য বিষয়। এবং এই উদাহরণের সাহায্যে তিনি যে শিক্ষা প্রচার করিতে চাহিয়াছিলেন তাহা এই: “প্রতিভা যতই সমৃদ্ধ হউক, আত্মসংযম না থাকিলে তাহার পরিণাম শোচনীয় হইবে।” “ধর্মভাব-ব্যতীত জগতে শাস্তির প্রত্যাশা নাই।” “প্রতিভার অভিমানে ধর্মের ও নীতির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলে শোচনীয় পরিণাম হয়। তরুণ বয়সে নীতিশিক্ষা ও সত্বপ্ৰদর্শনের অভাবে আমাদের দেশের প্রতিভাবান যুবকগণ চরিত্রহীন ও আচারব্রষ্ট হইয়া ভীষণ দুর্দশাগ্রস্ত হন।” (৬৩৪ পৃষ্ঠা)। গ্রন্থকারের আশা ছিল যে “মধুসূদনের ভয়ঙ্কর প্রায়শ্চিত্ত তাঁহার উদ্যোগগামী বদেশীয়গণের উপকার করিবে” ইত্যাদি।

এই ধরনের লেখা যে সম্পূর্ণ নিরর্থক তাহা বলিতেছি না। ইহার মূল্য থাকিতে পারে, প্রয়োজনও হয়ত আছে। এগুলি যে প্রকৃত জীবনচরিত নহে ইহাই শুধু বলিতেছি। জীবনচরিত অতি-মানবের স্তব নহে, অসংযমীর নিন্দায় পঞ্চমুখ হওয়া, বা অপরিণাম-দর্শীর যন্ত্রণায় উল্লাসপ্রকাশও নহে। ইহা মানববিশেষের জীবন্ত চিত্র, চরিত্রের বিশ্লেষণ, ও ব্যক্তিপুঙ্খের প্রত্যক্ষপ্রকাশ মাত্র। সমাজের ও পারিবারিক ঘটনা ও লোকজন লইয়া অত্যন্ত মাতিয়া উঠিলে, নিজের বিষয় লইয়া বাড়াবাড়ি করিলে, এবং স্বকীয় মতবাদের প্রতিষ্ঠাকল্পে কিংবা প্রচলিত কোন নীতিবাক্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্ত অপরের জীবনকে শুধু একটা দৃষ্টান্তে পরিণত করিলে গ্রন্থকার হওয়া যায় কিন্তু জীবনচরিতকার হওয়া যায় না।

ঐতিহাসিকের দাবী মেটানোই বোধহয় সবচেয়ে কঠিন সমস্যা। অধিকাংশ জীবনী স্মৃতির পূজা। স্মৃতির সত্যের তিরোধান এবং কল্পনার আবির্ভাব অবশ্যস্বাবী হইয়া পড়ে। মৃতের সম্পর্কে ভ্রম ব্যক্তির মনোভাব স্বভাবতই কিছু স্বকুমার ও ক্ষমাপ্রবণ হইয়া থাকে। কাজেই চরিত্রবিশেষের মধ্যে ক্ষুদ্র বা কর্কশ কিছু থাকিলে লেখকের স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাহা কমনীয় হইয়া ওঠে। সত্যনিষ্ঠা মানে শুধু মিথ্যাভাষণ হইতে বিরত হওয়াই নয়; তথ্যের অপসারণও সত্যের অপলাপ। মাছুষ যত বড়ই হউক সে সীমাবদ্ধ জীব। তাহার মধ্যে দোষগুণ ভালমন্দ দুইই থাকে। নিরঞ্জন অকলঙ্ক আদর্শ মহাপুরুষ আমাদের ভক্তির পাত্র সম্ভব নাই, কিন্তু সে চিত্র বিশ্বাসযোগ্য না হইতেও পারে। মর্ত্যের মাটি দেবতাদেরও অগ্নান রাখে না। অবুদ্ধ মানবহৃদয় তাহা মানিতে চায় না। তাই মহৎ ব্যক্তির কথা লিখিতে গিয়া শুধু মহত্ব ছাড়া আর কিছু দিকে দৃষ্টি দিতে ইচ্ছা করে না। ফলে hero worship এর ছড়াছড়ি হয়। বিশুদ্ধ জীবনচরিত লেখা হয় না।

ব্যক্তির চরিত্রে যাহা কিছু সত্য, তাহার জীবনে যে সমস্ত ঘটনা সত্যই ঘটিয়াছে তাহা গোপন না করিয়া, ‘extenuating nothing, nor setting down aught in malice’ কোন কিছু বাড়াইয়া না বলিয়া বা কোন কিছু লঘু-প্রতিপন্ন না করিয়া যদি লেখা যায় তবেই সত্যের মর্যাদা রক্ষিত হয়। আমাদের সাহিত্যে যে-সমস্ত জীবনচরিত লেখা হইয়াছে তাহাদের মৌলিক ত্রুটি সত্যের অপলাপে। অবশ্য কলানৈপুণ্যের দিক দিয়া দেখিলে বহুতর ও প্রবলতর ত্রুটি ধরা পড়ে। কিন্তু যে বস্তুটি আধুনিক পাঠকসমাজে কৌতুক উদ্রেক করে—তাহা হইতেছে “to clean the dirt from

them (great men) and place them on their proper pedestal" (Carlyle). Hero-worship-এর যুগ ইহা নয়। মানুষকে মানুষ বলিয়া জানার মধ্যেই এখনকার মন যথেষ্ট কৌতূহল অন্বেষণ করে। ভালয় মন্দে, দোষে গুণে, ধোঁয়ায় মন্দাদোষে জড়িত যে মানবচরিত্র তারই বিশ্লেষণে আমাদের অকুরন্ত আনন্দ। মানব-হৃদয় সম্পর্কে সত্য কথা কি তাহাই জানিবার জন্য আমাদের অদম্য আকাঙ্ক্ষা। অন্তরের গভীরে যে রহস্য লুক্কায়িত তাহারই উন্মোচনে আমাদের সজাগ দৃষ্টি নিরন্তর নিযুক্ত। কল্পনার অঞ্জন নয়ন হইতে মুছিয়া ফেলিয়া অবিকৃত দৃষ্টিতে বস্তুর ও ব্যক্তির স্বরূপ আবিষ্কার করাই এ যুগের সাধনা। তাই যখন দেখিতে পাই জীবন-চরিত্রের পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ছাপাইয়া দয়ার বা বিচার অসীম সমুদ্র উত্থলিয়া উঠিতেছে, তখন অসীম আলোড়নের আড়ালে সীমাবদ্ধ মানবটিকে হারাইয়া ফেলি। বিচার কি সব? দয়া ছাড়াও ত আরও কিছু থাকিতে পারে। স্নেহ মায়া প্রেম ঈর্ষা মোহ ক্রোধ এসব কি কিছুই না? যিনি অজ্ঞেয় পৌরুষের বলে সকলপ্রকার বাধা-বিপত্তি তুচ্ছ করিয়াছেন তাহার কি কোন দুর্বলতাই ছিল না? কোন কারণেই কি তাহার কোন সঙ্কল্পই টলে নাই? কোন দ্বিধা, কোন সন্দেহ, কোন অজানা আশঙ্কা কোন দিনই তাহাকে ব্যাকুল করে নাই? বিচাঙ্গাগরের যে জীবনী আমরা পাঠ করি তাহা মুগ্ধ ভক্তের শ্রদ্ধাঞ্জলি। দেবতাকে বাড়াইতে গিয়া ভক্তি এমনই গগনম্পর্কী হইয়াছে যে পৃথক দেবতা যদি চাহিয়া দেখিতেন বোধহয় শিরিয়া উঠিতেন।

সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথের জীবনী বাহির হইয়াছে। বইখানি মূল্যবান। ইহা বহুবিধ তথ্যে পরিপূর্ণ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিপুরুষ কি-

প্রত্যক্ষগোচর হইল? তিনি কি করিলেন, কোথায় গেলেন, কি লিখিলেন তাহার তালিকা পাওয়া গেল। কিন্তু এই যে 'তিনি', তাঁর রূপটি ত জীবন্ত হইয়া উঠিল না। টেনিসনের জীবনী পাঠ করিয়া কবি স্বয়ং দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়াছিলেন। আমাদেরও আজ সেই দশা। বোধহয় তদপেক্ষাও শোচনীয়। কবি কাব্যে, জীবনে, চিত্রে, গানে, প্রবন্ধে, কুর্মে নিজেকে বিচিত্র ধারায় প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার ব্যক্তিপুরুষ আমাদের কাছে অনেকটাই জ্বলন্ত। প্রভাতরাবুর পুস্তকে সেই সমস্ত জ্বলন্ত দিকগুলিও অস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে নাই। একটা খুব সাধারণ দৃষ্টান্ত ধরা যাক। প্রেমের বিচিত্র রূপ রবীন্দ্রনাথের কাব্যের পাতায় পাতায় পরিস্ফুট। নারীরূপের ও নারীপ্রেমের অনির্বচনীয় সৌন্দর্য্য তাহার উপমাগুলিকে রূপ দিয়াছে, তাহার ভাষাকে অভিযুক্ত করিয়াছে, তাহার কল্পনাকে ও চিন্তাধারাকে বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত করিয়াছে। প্রভাতরাবু রবীন্দ্রনাথের যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহার মধ্যে কবিত্বের এই অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক দিকটি মোটেই ফুটিয়া ওঠে নাই। রবীন্দ্রনাথ জীবনে বহু কাজ করিয়াছেন, কিন্তু কখনও ভালবাসেন নাই! অবশ্য কবির বিবাহ হইয়াছিল। এবং সে সম্পর্কে যে যৎসামান্য উক্তি লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহা উক্ত পুস্তকের ১৫০ পৃষ্ঠায় স্তব্ধ। প্রেমের সাক্ষ্য উপলব্ধি বা বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কোনপ্রকার আভাস না দিবার জন্য গ্রন্থকার যেন বন্ধপরিকর হইয়াছিলেন। ফলে তাহার চিত্রটি অথও সত্যের দাবী মিটাইতে পারে না।

প্রাসঙ্গিক তথ্যের অভাবে চরিত্রচিত্রণ অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। একটা কখনও লেখকের ইচ্ছাকৃত, কখনও বা অনিচ্ছাকৃত। লেখকের জ্ঞাতসারে বা ইচ্ছাহীনসারে যখন তথ্যের অপসারণ ঘটে তখন দেখা যায়

হয় লেখকের কোন একটা প্রতিপাত্ত তব আছে, না হয় বৈজ্ঞানিক মনোভাবের অভাব আছে, যদি কোন ব্যক্তিকে যুগমানব, বিশ্বমানব বা অতিমানব; ঋষি, মহর্ষি বা দেবর্ষি; দয়া বা বিজ্ঞা কিংবা অজ্ঞ কিছুই সাগর; দেশবদ্ধ, দেশপ্রিয় বা দেশপুজা ইত্যাদি কিছু একটা প্রতিপন্ন করা লেখকের উদ্দেশ্য থাকে; অথবা যদি পুণ্যের পুরস্কার এবং পাণের প্রায়শ্চিত্ত নির্ধারণ করা লেখকের অন্ততম উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে জীবনচরিতের মধ্যে কল্পনার আবির্ভাব এবং সত্যের তিরোধান অবশ্যস্বাবী। ইহা ছাড়া শুধু অবৈজ্ঞানিক মনোভাবের জ্ঞাত ও সত্যের অপলাপ ঘটে। নির্দম বিশ্লেষণ বা নিক্সিকার দৃষ্টি সত্যাত্মসম্মানের গোড়ার কথা। বহুকাল পূর্বে Heraclitus বলিয়াছেন, "Dry light is ever the best". কিন্তু মানুষ যে আলোয় সাধারণতঃ দেখিয়া থাকে তাহা "ever infused and drenched in his affections and customs" (Bacon)। অন্ধভক্তি, বিষম শ্রদ্ধা, দ্বিধাজড়িত স্ফোট—কতই তা বাধা আছে। এসব বাধা জীবনচরিতকারের অতিক্রম করা দরকার। যদি ব্যক্তির জীবদ্দশার বা মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তাঁহার চরিত্র বিশ্লেষণ এই সব বাধার দ্বারা খণ্ডিত হয়, সত্যকথা বলা যদি অশোভন মনে হয়, তাহা হইলে অসম্পূর্ণ বা প্রমাদপূর্ণ চিত্র আঁকা অপেক্ষা উপযুক্ত সময়ের প্রতীক্ষা করাই ভাল।

যে সব ক্রুটি লেখকের অজ্ঞাতসারে ঘটিয়া থাকে, সত্যের যে অপলাপ অনিচ্ছাকৃত সৈদিক চাহিলে দেখা যায় মূলে রহিয়াছে আলস্য বা নিষ্ঠার অভাব। গবেষণার অভ্যাস দীর্ঘে দীর্ঘে আমাদের মধ্যে প্রবেশলাভ করিতেছে। তথা সংগ্রহের অভ্যাস প্রসারলাভ করার সঙ্গে সঙ্গে এই দিককার ক্রুটি সংশোধিত হইতে পারে। এই প্রসঙ্গে

ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিরলস সাধনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অল্পসম্মানের ফলে তিনি যে সব তথ্য আবিষ্কার করিতেছেন সেগুলি ভবিষ্যৎ জীবনচরিতকারের পক্ষে মহামূল্য উপাদান হইয়া রহিবে।

৩

প্রশ্ন উঠিতে পারে ব্যক্তির জীবনে যাহা কিছু ঘটিয়াছে, তৎসম্পর্কে যতকিছু তথ্য আছে সে সমস্তই কি জীবনচরিতের পৃষ্ঠায় সাজাইতে হইবে? আর যদি তাই হেঁ সে অনন্ত সমুদ্রের স্থান সঙ্কলন হইবে কোথায়, কি ভাবে?

এইখানে পূর্বোক্ত তৃতীয় দাবীর বিষয়টি আলোচনা করা যাইতে পারে। ব্যক্তির চরিত্রচিত্রণ ও ঐতিহাসিক বা স্বকপোলকল্পিত আভাস-ইন্দ্রিতের পরিবর্তনই সব নয়। জীবনচরিতকার একজন artist, এবং জীবনচরিত সাহিত্য বা art হওয়া আবশ্যক। শিল্পীর স্বাধীনতা তাঁহার প্রাপ্য। উপকরণ অসংখ্য হইতে পারে, কিন্তু নির্দোষ-পরিবর্তনের দায়িত্ব শিল্পীর। এখানে তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি বা অন্তর্নিহিত সামঞ্জস্যবোধ ও স্বল্প সৌন্দর্য্যবোধের দ্বারাই তিনি চালিত হইবেন। জীবন্ত চিত্র আঁকিতে হইলে, ব্যক্তিকে প্রকাশ করিতে হইলে, কোন তথ্য প্রাসঙ্গিক, কোন তথ্য অবাস্তব, বিভিন্ন ঘটনার আপেক্ষিক গুরুত্ব কতটুকু, কোন উপাদান কি প্রণালীতে সাজাইতে হইবে এ নির্ধারণ মুক্তির বহিরের জিনিস। শিল্পী আপনার অন্তরের স্বাধীন আলোতেই সে পথের সন্ধান পাইবেন। Lytton Strachey তাঁহার Eminent Victorians পুস্তকের ভূমিকায় যাহা

বলিয়াছেন এই প্রসঙ্গে তাহা প্রাধান্যযোগ্য : “To preserve a becoming brevity—a brevity which excludes everything that is redundant and nothing that is significant—that, surely, is the first duty of the biographer. The second, no less surely, is to maintain his own freedom of spirit. It is not his business to be complimentary ; it is his business to lay bare the facts of the case, as he understands them,……dispassionately, impartially and without ulterior intentions.”

কথাসাহিত্যে, অর্থাৎ উপন্যাস বা নাটকে, যখন ব্যক্তির জীবন্ত চরিত্র চিত্রিত হয় তখন শিল্পী আপন শিল্পগত প্রয়োজন অল্পসারে তথ্য সন্নিবেশ করিয়া থাকেন। ব্যক্তির জীবনের প্রতিদিনের প্রতি-মুহূর্তের প্রত্যেকটি ঘটনাই সৃষ্টির প্রয়োজনে প্রাসঙ্গিক নহে। কোন বস্তু ব্যক্তিব্যবহৃৎ আর কোন বস্তু অপ্ৰাসঙ্গিক বা প্রয়োজনাতিরিক্ত সেই বোধের দ্বারা চালিত হইয়া উপন্যাস বা নাটকে তিনি নরনারীর চরিত্র আঁকিয়া থাকেন। জীবনচরিতকারের পক্ষেও সেই একই কথা। প্রভেদ এই যে কথাসাহিত্যী অপেক্ষা জীবনী-লেখকের স্বাধীনতা একদিক দিয়া কিছু কম এবং সেই অল্পপাতে তাহার সমগ্রাণ্ড গুণতর। কথাসাহিত্যী সৃষ্টচরিত্রের পক্ষে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা। প্রতিবেশ বা আবেষ্টন, ঘটনা, দোষগুণ, যা কিছু উপকরণ সমস্তই তিনি নিজ কল্পনার সাহায্যেই সৃষ্টি করিয়া চলেন। জীবনচরিতকার উপাদান সৃষ্টি করিতে পারেন না, সংগ্রহ বা সঙ্কলন করিতে পারেন ; ঐতিহাসিক উপন্যাস বা নাটক রচয়িতার সহিত তাহার কতকটা তুলনা হইতে পারে। ব্যক্তির জীবনের যে সমস্ত উপাদান ইতিহাসের সামগ্রী হইয়া গিয়াছে

ঐতিহাসিক-উপন্যাস রচয়িতাকে বা জীবনচরিতকারকে সে সমস্ত মানিয়া লইতে হয় ; এবং জীবন্ত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ চিত্র আঁকিবার প্রয়োজনে নিখুঁত কলাকৌশলের বিধান অল্পসারে নির্দোষ পরিবর্তন প্রক্রিয়া দ্বারা সেগুলিকে সাজাইয়া গুছাইয়া লইতে হয়।

৪

প্রশ্ন উঠিতে পারে যেখানে নির্দোষ-পরিবর্তনের স্বাধীনতা আছে সেখানে বাস্তবসত্যের সম্যক মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রহিবার সম্ভাবনা কোথায় ? মানিলাম যে নীতিবাদ বা স্বত্তিবাদ জীবনচরিত নয়। ইহাও মানিলাম যে প্রতিপাত্ত কোন তত্ত্ব বা thesis-এর খাতিরে বাস্তব তথ্য ভাঙিয়া নোয়াইয়া, বাড়াইয়া, কমাইয়া, সংশোধন পরিবর্তন করিয়া লইলে খাটি জীবনচরিত হয় না। কিন্তু জীবনচরিতকারকে অন্ততঃ দৃষ্টিভঙ্গীর স্বাধীনতা ত ছাড়িয়া দিতেই হইবে। বহু উপকরণ হইতে বাছিয়া যদি একটি একা গড়িয়া তুলিতে হয় তাহা হইলে একটা বিশেষ মনোভাব, বা দৃষ্টিভঙ্গী বা অন্ততঃ একটা point of view না থাকিয়া পারে না। সুতরাং সৃষ্ট চরিত্র সৃষ্টির অন্তরের আলোতেই উদ্ভাসিত হইবে। বাস্তব জগতের অধিবাসী যে ব্যক্তি তাহাকে দেখিব না, শিল্পীর চিত্তমুকুরে যে প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে তাহাকেই দেখিব। এবং বিভিন্ন জীবনচরিতকারের অঙ্কিত চিত্র বিভিন্নরূপেই দেখিতে পাইব। সুতরাং বাস্তব সত্যের ও শিল্পগত সত্যের এই পরস্পর-বিরোধী দাবী মিটাইবে কোন জীবনচরিতকার ?

বোধ হয় এ প্রশ্নের ইহাই শেষ প্রশ্ন। অবিশিষ্ট বাস্তব সত্যের স্বরূপ কে জানিতে পারে ? সব সত্যই বোধ হয় আপেক্ষিক, সব জানাই

বোধ হয় আপেক্ষিক। কোন কিছুকে যখন আমরা জানি তখন কি জানি? বোধ হয় নিজের এই জানাকেই জানি, আর কিছুই জানি না। বস্তুর স্বরূপ ত জানিতে পারি না, আমার চিত্তমুগ্ধের, অহুত্বিতে বা চেতনায় বস্তুর যে ছবি প্রতিফলিত হয় তাই ত জানি। শিল্পী যদি বা কোন অসম্ভব miracle এর বশে, কোন আশ্চর্য্য দিব্যদৃষ্টিতে ব্যক্তির স্বরূপ দেখিতে পান এবং তাহা ভাষায় ফুটাইয়া তোলেন, সেই দিব্য দৃষ্টি, সেই miracle এর সাহায্য যে আমারও আয়ত্তাধীন হইবে তাই বা কেমন করিয়া মনে করা যায়? আমার অহুত্বিতে, আমার চেতনায়, ব্যক্তির সেই স্বরূপ যে অবিকৃত ভাবে প্রতিবিম্বিত হইবে তাহারই বা কি নিশ্চয়তা আছে?

এ সব প্রশ্নের মীমাংসা বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদের হাতে আপাততঃ ছাড়িয়া দেওয়া যাক। বস্তু বা ব্যক্তির স্বরূপ নির্ধারণ তাঁরাই করুন। শিল্পীর কারবার রূপ হইয়া। বহুর মধ্যে এককে উপলব্ধি করিয়া, তাহারই জীবন্ত মুক্তি প্রত্যক্ষ গোচর করাইয়াই তিনি খুসী। ব্যক্তির জীবনের বিক্ষিপ্ত তথ্যগুলির অস্তর হইতে যে ব্যক্তি-পুরুষকে তিনি সত্য বলিয়া প্রত্যক্ষ করিলেন তাহাকেই রূপ দেওয়া তাহার কাজ। তাহার সত্য আর এক জনের সত্য হইতে ভিন্ন হইতে পারে। সাহিত্যের বা শিল্পের দরবারে এই আপেক্ষিক সত্যই স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। এবং এই সত্যের সুন্দর প্রকাশকেই—

More real than living man, Nurslings of immortality !
বলা হইতেছে। Boswell এর Life of Johnson কিংবা Lockhart এর Life of Scott পড়িতে পড়িতে মনে হয় ইহাদের সাহিত্যিক উদ্দেশ্য ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। কোন মতবাদের প্রতিষ্ঠা করা, কোন তত্ত্ব প্রতিপন্ন করা, বা মহতের উপাসনা করা তাহাদের

উদ্দেশ্য ছিল না। ব্যক্তি-পুরুষকে প্রত্যক্ষগোচর করাই তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়। তথ্যের ব্যাখ্য সমাবেশ ও ঘটনার স্থি-পূর্ণ-বিচ্ছাসের মধ্য দিয়া একটি বিশিষ্ট মানবচরিত্র দেখিতে দেখিতে স্পষ্ট ও জীবন্ত হইয়া উঠিল। পাঠকের মন বলিল, হাঁ, দেখিলাম, তর্কে যে সব প্রশ্নের মীমাংসা খুঁজিয়া পাওয়া গেল না, প্রতিভাবান শিল্পীর দৃষ্টির সম্মুখে তাহা নীরব হইয়া যাইতে পারে।

৫

উপসংহারে বক্তব্য এই যে বাংলা ভাষায় এখনও খাটি জীবন চরিত্র লিখিত হয় নাই। জীবনচরিত্র যে একটা আর্ট এ মনোভাব এতদিন আমাদের মধ্যে আসে নাই। যে সমস্ত জীবনী লেখা হইয়াছে তাহার মধ্যে অনেকগুলিই মূল্যবান গ্রন্থ। বহু তথ্যে সেগুলি পূর্ণ। পুস্তক হিসাবে তাহাদের স্থান উচ্চ। কিন্তু উপরে যে আধুনিক আদর্শের আলোচনা করা হইল তদনুসারে সেগুলিকে বিশুদ্ধ জীবনচরিত্র বলা চলে না। এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে এক একখানি জীবনচরিত্র লইয়া বিস্তারিত আলোচনা করিবার অবকাশ নাই। মোটামুটি বলা যাইতে পারে যে আমাদের এই কর্তৃত্বজ্ঞার দেশে মহা পরাশর চাপকা শাসিত সমাজে সাহিত্যিক মনোভাবের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা বড়ই কঠিন। সাহিত্যকে নীতি, ধর্ম, স্তব, স্তুতি হইতে পৃথক করিয়া দেখা, বৈজ্ঞানিক মনোভাব লইয়া সত্যাসত্যের বিচার করা অল্পসংখ্যক লোকের কাছেই সমাদর লাভ করিতেছে। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, ও শরৎচন্দ্রের দ্বায় প্রতিভাশালী শিল্পী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া বাংলার কাব্য ও উপন্যাস শিল্পের স্তরে উন্নীত হইয়াছে। এই সমস্ত মনীষীদের আবির্ভাবের পূর্বে কাব্য

উপভ্রাস কি ছিল আর এখন কি হইয়াছে তাহা ভাবিলেই স্বীকার করা সহজ হইবে যে বন্দ সাহিত্যে ঠাঁটি জীবনচরিতের অভাবের অল্পতম হেতু এই যে এই তিন জনের কেহই জীবনচরিত রচনায হাত দেন নাই। যদি দিতেন তাহা হইলে হয়ত তাঁহাদের হাতে জীবনচরিত একটা আর্ট হইয়া উঠিত। তাছাড়া আমাদের প্রাচ্য মনোভাব ভগবান, পরজন্ম, নিত্য সত্য ইত্যাদি বিষয়ে যে পরিমাণ উৎসাহ পায় বা দেখায়, ঐহিক সত্য চরিত্রের জটিলতা, অহুত্বের বিচিত্রতা, অভিজ্ঞতার বিশিষ্টতা প্রভৃতির বিশ্লেষণে সে পরিমাণে উৎসাহ পায় না। হাওয়া অনেকটা বদলাইতে শুরু করিয়াছে। ভবিষ্যতে ফল-ফল অগ্ররূপ হইতেও পারে। সে যাহাই হউক বাংলার সাহিত্য প্রাঙ্গণে Boswell, Lockhart, Strachey, Andre Maurois যে আজও দেখা দেন নাই ইহা ভুলিলে চলিবে না।

পুণ্য ফল

কুচ্ছুরতে পুণ্য যদি বাড়ে

মোদের তবে কে বলে মহাপাপী ?

মোদের মত বল ত কার ঘাড়ে

চেপেছে বোঝা বিদ্যাচল ছাপি !

কোথায় আছে এমনস্তর গাধা

বস্তা এত বয়েছে গাদা-গাদা ?

এসেছে মগ মারাঠি নানা জাতি

ভেঙেছে দাত, মেরেছে ঘুঘি নাকে ;

পাঠান এসে মারিয়া পেটে লাথি,

কর্ণ ছুটি মলেছে পাকে পাকে ;

মোগল দাদা হাসিয়া ফিকি ফিকি

কাটিয়া নিল সাবেক যত টিকি।

ইংরেজেরে বলিতে নারি কিছু

মাগরপারী সাহেব জাতি শাদা

(ফিরিছে সদা পুলিশ পিছু পিছু

বলিয়া কিছু কাজ কি বল দাদা !)

তাহারা শুধু উঠিয়া বসি' ঘাড়ে

মনের স্থপে চরণ ছুটি নাড়ে।

মোদ্ধা কথা পুণ্য হল জমা

কুতুবশাহী মিনার সম উচা।

তাহার তলে মুর্জিমান গমা

স্থখেই আছি নন্দমারি ছুঁচা।

পুণ্যভারে চাপটা হয়ে তবু

ধৈর্য মোরা হারাইনিকো কতু।

কদলীপাতে থেয়েছি কচু-পোড়া

অশ্বে যবে মেরেছে ননী-ছানা,

শাকড়া দিয়ে ঢেকেছি তহু খোড়া

পড়শী সবে পরেছে সোনাদানা।

নিতধেতে বুটের দাগা লাগে

হেসেছি তবু প্রভুর অহুরাগে।

রাগিয়া কতু হয়েছি দিশেহারা
 এমন কথা বলিতে পারে কেউ ?
 কলের গুঁতা মেরেছে পেটে যারা
 তাদের পায়ে কৈদেছি ভেউ ভেউ ।
 কলসী-কানা মেরেছে যারা ছুঁড়ে
 দিয়েছি প্রেম তাদের ঘুরে ঘুরে ।

স্বর্গে যাব মন্দ ইথে নাহি
 মরিতে শুধু যে-কটা দিন বাকি,
 তাহার পরে পুণ্য ছালা বাহি
 যমদূতেরে বেবাক দিব ফাঁকি ।
 একেবারে হাজির হব গিয়া
 ইন্দ্র-ধামে পুণ্য-ঝুলি নিয়া ।

গুলিয়া ঝুলি বলিব—“জাথ জাথ,
 স্বকৃতি কত করেছি জমা সেথা
 পুণ্যফল জমেছে লাখে লাখে
 এবার মজা লুটিব শুধু হেথা ।
 অনেক গালি শুনেছি দাদা ছ' ছ'
 কোকিল এবে ডাকুক কুহ কুহ ।

“অপরাধীরা নাচুক মৃদু মৃদু,
 পরিব মালা—লে আও পারিজাতে ;
 বাহির কর বোতল-ভরা সৌধ
 ইন্দ্র, আঞ্জি তুলিব তোমা জাতে ।
 উর্ধ্বশীরে আমার চাই আস—
 মেনকা আদি খাটিবে ফরাস ।”

অমনি যত অপরাধীরা এসে
 আমারে লয়ে করিবে কাড়াকাড়ি,
 কেহবা স্বধা পিয়াবে ভালবেসে
 কেহবা গলা জড়াবে তাড়াতাড়ি ।
 বসিয়া রব চরণ দুটি এলে
 দম্ভভাঙ বদনখানি মেলে ।

মোজে কাটি' যাইবে দিবারাতি
 হোজে নামি করিব জলকেলি ;
 হেথায় নাহি মারিবে কেহ লাগি
 জুতার ঘায়ে ফাটাবে নাকে। বেলি ।
 করিয়াছিল মস্তে এসব যারা
 নরক-নামা গন্তে পচে তারা ।

কুস্তীপাকে ঘুরিছে এবে তারা
 রৌরবেতে হতেছে রুটি-সেঁকা ;
 এদিকে আমি লাগায় গোঁফে চাড়া
 শচীর পানে চাউনি হানি বেঁকা ।
 তাদের কথা পড়িলে মনে—হি হি—
 হাসিয়া উঠি হরষে চি'হি চি'হি ।

নির্ভয়েতে বসিব সভা-মাঝে
 ইন্দ্রে দিব উড়ায়ে মেরে তুড়ি,
 চন্দ্র যদি আসিয়া বসে কাছে
 তাহার দিব কানেতে স্বড়স্বড়ি ।
 যেথায় খুলী ফেলিব পিক-গুড়
 শনির পেটে লাগাব কাতকুড় ।

গরম হবে চড়িবে কত শিরে
 উর্কশীর ঝাড়িব ঘুমি নাকে,
 লেন্সি মারি' ফেলিব ঘুতাতীরে
 বিছনি ধরি' টানিব মেনকাকে !
 পুরুষ-রাগে হইয়া দিশাহারা
 স্বপ্নটারে করিব খাচা-ছাড়া ।

ষাণ্টি মেরে রয়েছি আপাতত
 মুখটি বুজে স্বর্গপানে চেয়ে ;
 সাগাও জুতা কোংকা লাঠি যত
 একটি কথা বলিব না তা থেয়ে ।
 এগন শুধু করিয়া যাব ক্ষমা
 পূণ্যফল করিব খালি জমা ।

কুজু করি' কালিমা-মাথা দেহে
 রহিব ষাঁচি' পারিব যতকাল,
 তাহার পরে—তাহার পরে—হে হে
 একটি কোপে করিব সবে খাল ।
 তখন তোরা করিবি কিবা ওরে !
 ছুড়ং করে যখন যাব মরে ?

—চন্দ্রহাস

সাবিত্রীর স্বয়ম্বরের ভূমিকা

পুরাণ পুরাতন নহে

সাবিত্রীর স্বয়ম্বর সম্বন্ধে ইহাই আমার ধারণা। পুরাণ-কাহিনীর বিষয়ে একটা কথা অমরা তুলিয়া যাই যে এক সময়ে ইহা নূতন ছিল। ক্রিষ্টা তাহারা অপেক্ষা আর একটা গুরুতর কথা আছে, যাহা আমরা কল্পনাই করিতে পারি না, এ সব কাহিনী মোটেই পুরাতন নহে বলিয়াই এগুলি পুরাণ নামে প্রচলিত। এ যেন পরিবারের নবজাত শিশুটির বুড়ি নামকরণ। এসব কাহিনী পুরাতন নহে বলিলে যথেষ্ট বলা হইল না। ইহার নূতন ব্যাখ্যা-সহ; ইহাই এগুলির চিরনবীনতার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ। চিরনূতন ও চিরপুরাতন এক স্থানে আসিয়া মিলিয়াছে, ওই চিরস্থের মধ্যে। আবার চিরনূতন ও নূতন এক জিনিস নহে; শুধু-নূতন বিশেষ একটা কালের মধ্যে নূতন, আর চিরনূতন চিরপুরাতনের সগোত্র, কারণ সে বিশেষ-কালের দাবী ছাড়িয়াছে। পুরাণ-কাহিনীগুলি চিরনূতন, এগুলি পুরাতনের সগোত্র বলিয়া, পুরাণ নামে পরিজ্ঞাত।

কোন বিশেষ যুগের নহে বলিয়াই এসব গল্প নানা যুগের হস্তচিহ্ন বহন করিতেছে। সেই জন্ত ভারতীয় পুরাণগুলিতে নানাংকম অসামঞ্জস্য দৃষ্ট হয়। এই অসম্ময় ইহার দীর্ঘজীবিতার পরিচয়। নিক্কিতাতা গণেশের কথা ধরা যাক। এই স্থলকায় লিপিকুশল দেবতাটির মধ্যে বহু যুগের কল্পনা গুপ্ত রহিয়াছে। গণেশ পার্বতীর পুত্র। পরবর্তী যুগ তাহার স্বন্ধে প্রাকৃত মুণ্ড পসাইয়া লইয়া হস্তীমূৰ তুলিয়া দিয়াছে।

হাতীর বিশাল বপুতে স্বপ্ন বৃদ্ধির সম্মিলন যেন sublime ও ridiculous-
পাশাপাশি বর্তমান।

যে বহু কল্পনা প্রথমে হাতীকে নির্দোষ ভাবিয়াছে ও পরে দেখিয়াছে
হাতী স্বপ্নবৃদ্ধির অধিকারী, তাহারাই নিজের ইষ্টদেবতার স্বপ্নে সগর্বে
এই পশু-মুণ্ড তুলিয়া দিয়াছে। খুব সম্ভব গণেশ প্রথম-আমলে পার্শ্বাতীত
পুত্র ছিল না, পরবর্তী যুগে যখন শিব-পার্শ্বাতীকে লইয়া গৃহস্থাত্ম্য গড়িয়া
উঠিতেছিল, তখন গণেশ আসিয়া ইহাদের পুত্রের স্থান লাভ করিয়াছে।
আবার গণেশের লিপিকুশলতা এমন একটা যুগের কথা মনে করাইয়া
দেয় যখন সকলে লিখিতে জানিত না, ইহা একটা দৈব-ক্ষমতা বলিয়া
পরিগণিত হইত। সেই জন্ম মহাকবি ব্যাসও মহাভারত না লিখিয়া
আবৃত্তি করিয়া যাইতেছিল, গণেশ তাহার লেখক। সর্বশেষে গণেশ
আজ সিদ্ধিদাতা, কিন্তু প্রথমে সে বিষয়কারক ছিল। শেষে তাহাকেই
সিদ্ধির ভার দেওয়া হইল, এ যেন চোরকে পাহারার কাজ দিয়া সমস্যার
সরলীকরণ। আসল কথা, বনবাসী লোকদের কাছে বহুহতী প্রথমে
হঠাৎ বিশ্বের মত ছিল, সে আসিয়া ক্ষেত-খামার নষ্ট করিয়া, বাড়ী-ঘর
ভাঙিয়া, মাছ মাড়িয়া একাকার করিয়া দিত। কিন্তু সেই হাতীকে
মানুষের যখন বশ করিতে শিখিল, পোষা হাতী মানুষের প্রচুর কল্যাণের
হেতু হইয়া পড়িল, তখন যে-ছিল বিষয়কারক সে-ই হইল সিদ্ধিদাতা,
কাজেই হতীমুণ্ড-গণেশ যে প্রথমে বিষয়কারক ও পরে সিদ্ধিদাতা হইবে
তাহাতে আর বিস্ময় কি! তাহা হইলে দেখা গেল, গণেশের আইডিয়াতে
নানা যুগের চিন্তা ও কল্পনার স্তর রহিয়াছে। এই-রকম সব পুরাণ
কাহিনীতেই দৃষ্ট হইবে।

প্রত্যেক যুগ নিজের চিন্তা ও সংস্কৃতিকে মূর্তি দিতে চাহিয়াছে;
হাতের কাছে সে যে মাল-মশলা পাইয়াছে তাহাই লইয়া কাজ

সারিয়াছে। নূতন উদ্ভাবন অপেক্ষা নূতন ভাবনা ও ব্যাখ্যার দিকেই
তাহার বেশি নজর ছিল। যেমন শেখপীরের নিজের কল্পনাকে মূর্তি দিবার
জন্ম প্রাচীন কাহিনী লইয়া কাজ চালাইয়াছেন।

দকন, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, প্রথমে তিন ভিন্ন বিরুদ্ধ-শক্তি ছিল,
পরস্পরের মধ্যে সংঘাত ঘটিত, এবং একে অপরকে একঘরে করিয়াছিল।
কিন্তু কালক্রমে শাক্ত-শৈব-বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন ঘটিয়াছে এবং
তাহার প্রমাণ-স্বরূপ শিব চূর্ণার স্বামী হইয়াছে, এবং বিষ্ণু হইয়াছে
তাহাদের জামাতা।

ইহা বাঙলা দেশের কল্পনা। এই তিন বিরুদ্ধ-দেবতা বাঙলা দেশে
আসিয়া যেক্ষণ এক-পরিবারভুক্ত হইয়াছে, ভারতবর্ষের অত্যাশ
প্রদেশে এমন হয় নাই; বাঙালীর মধ্যে নানা স্তরের বিভিন্ন মূর্তির
সংস্কৃতিকে আত্মসাৎ করিয়া লইবার যে ক্ষমতা আছে তাহা
ভুল ভ বস্তু।

এখন, অতীতের বিভিন্ন যুগ যদি নিজের জীবন-ধারণ অল্পসারে
পুরাণ-কাহিনী ভাঙিয়া গড়িতে পারে, তবে আমরাই বা পারিব না
কেন? করিব না কেন? যদি নূতন ব্যাখ্যা-সহ পুরাণকে আমরা নূতন
ব্যাখ্যা না দিতে পারি, তবে বৃষ্টিতে হইবে আমরা মরিয়াছি। পঞ্চাশ
বৎসর পূর্বে স্থানে হরিশ্চন্দ্র যেমন চাঁৎকার করিয়াছিল, বিদ্বাং, আর
এক বার! বিদ্বাং, আর এক বার! আর পঞ্চাশ বৎসর পরেও সে যদি
আজ্ঞও সেই পুরাতন চাঁৎকার করিতে থাকে, তবে আমাকে অগত্যা
বাধা হইয়া চাঁৎকার করিতে হইবে, বজ্র, আর একবার! বজ্র, আর
একবার! প্রথমে থিয়েটারের ম্যানেজারের মাথা, তারপরে সমস্ত
বাঙালী জাতির মস্তকে। অন্ধক-হেডমাষ্টার অন্ধক-বিশ্বামিত্রের
শিশুশূলভ কল্পনার দিন চলিয়া গিয়াছে।

সাবিত্রী অতি-আধুনিক নারী

না, সাবিত্রী-সত্যবানের কাহিনীর নতুন রূপ দিবার সময় আসিয়াছে।
কিন্তু সেই পুরাতন রূপ এ যুগের পক্ষে উপযোগী হইয়া দাঁড়াইয়াছে।
কোথায় সেই উপযোজ্যতা একবার দেখা যাক।

সাবিত্রীর কাহিনী হইতে পাই—

- (১) সাবিত্রী সত্যবানের অপেক্ষা বয়সে বড়।
- (২) সাবিত্রী অনিচ্ছুক-সত্যবানকে জোর করিয়া বিবাহ করিয়াছিল।
- (৩) সাবিত্রী পিতার মতের বিরুদ্ধে সত্যবানকে বিবাহ করিয়াছিল।

এখন, ইহা পূরণ হইতে পারে কিন্তু পুরাতন নহে, একেবারে খটি
নতুন, একেবারে অতি-আধুনিক। সাবিত্রী অতি প্রাচীন modern
woman। এ সাবিত্রী যে মাসিকপত্র সম্পাদন করিত না, এবং জীবন
বীমার দালালী করিত না, ইহাই যেন বিশ্বাস হয় না।

উপরের মত-তিনটি হইতে একটি উপমত অনিবার্য হইয়া দাঁড়ায়,
সাবিত্রী অত বেশী বয়স পর্য্যন্ত কি করিত? বিশেষ তাহার কথাবার্তা।
ও মতামত শুনিয়া মনে হয় সে পাঠশালায় পড়িত এবং পাঠ সমাধা না
করিয়া বিবাহ করিবে না এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে গিয়াই বেশী বয়সে
বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

সাবিত্রী ও কলেজী মেয়ে

এখনকার কালের কলেজী মেয়েদের সঙ্গে সাবিত্রীর প্রভেদ কোথায়?
(সাবিত্রী গাছে চড়িয়াছে, তাহার মোটরে চাপে)। পড়িতে পড়িতে
উভয়েরই বয়স পঁচিশে গিয়া ঠেকে, স্বাধীন বুদ্ধি কাহারো জাগে না,
স্বাধীন হইবার ইচ্ছামাত্র জাগে। এবং ফলে বিবাহ সর্বপ্রধান সমস্যা
হইয়া দাঁড়ায়। বিশ বছর আগেও মেয়েদের বিবাহের বয়স পনেরো

ছিল, এখন তাহা বাড়িয়া পঁচিশ হইয়াছে। পর্য্যাপ্ত যদি
মেয়েদের সম্মানোৎপাদনের শক্তির সীমা ধরা যায়, তবে তাহাদের প্রকৃত
গার্হস্থ্য জীবন বিশ বৎসর, অনেক ক্ষেত্রে আরো কম। এই অল্পকালের
সমস্ত্রাকে সরলতর করিবার জন্য ব্যাপকভাবে বার্থ-কন্ট্রোলের আন্দোলন
চলিতেছে। জন্মনিয়ন্ত্রণের আন্দোলন হোক বা না হোক, স্বভাবতই
আধুনিক শিক্ষিত নারীজীবনে জন্মনিয়ন্ত্রণ শিক্ষাও সময়াভাববশত
আপনিই ঘটিতেছে। কিন্তু যেখানে বিবাহ হয় চোদ্দ-পনেরায়, শিক্ষা
যেখানে নাই, সময় যেখানে প্রচুর, সেখানে এই আন্দোলনের তরঙ্গমাত্র
প্রবেশ করে নাই, করিবার উপায় নাই। এইরূপ অইতুক আন্দোলন
অধুনাশিক্ষার পরিচয়। স্বাধীন বুদ্ধি ইহার কর্তা নহে, স্বাধীন হইবার
অন্ধ আকাঙ্ক্ষা। এখানেও কলেজী মেয়েদের সঙ্গে সাবিত্রীর মিল
আছে, অস্তুত থাকিতে পারিত। সাবিত্রী এই-জাতীয় আন্দোলনে
নিশ্চয় যোগদান করিত।

ভারতীয় বিবাহ

আজকাল বিবাহ যে প্রকাণ্ড একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে
তাহার মূলে আছে শিথিল চিন্তা। দুইটি ভিন্ন-গোত্র ভাবকে আমরা
এক করিয়া ফেলিয়া বিপদের সৃষ্টি করিয়াছি। বৈবাহিক প্রেম ও
রোমাঞ্চিক প্রেম এক পদার্থ নহে। এই রোমাঞ্চিক প্রেমের নিকটতম
বাঙলা প্রতিশব্দ পূর্ণরাগ। পূর্ণরাগ ও বিবাহে যে-ভালবাসা দম্পতীর
নির্ভর তাহা এক জিনিষ নয়, হইতে পারে না, হওয়া উচিত নয়।
আমাদের কারো পূর্ণরাগ আছে, জীবনেও আছে, কিন্তু বিবাহের
সহিত তাহাকে মিছামিছি জড়াইয়া ফেলা হয় নাই। কিন্তু তাই
বলিয়া ভারতবর্ষে যে বিবাহের এক্সপেরিমেন্ট হয় নাই, তাহা নয়।

এ দেশের সভ্যতা ও সমাজ যখন পূর্ণরূপ গ্রহণ করে নাই, জাতি-মিশ্রণ ঘটিতেছিল তখন ভারতবর্ষীয় বিবাহে উদারতা ছিল। কিন্তু তখনও পূর্সরাগকে বিবাহের সহিত মিশাইয়া ফেলা হয় নাই, তাহাকে পূর্সরাগ নাম দিয়া বিশেষভাবে স্বতন্ত্র করিয়া রাখা হইয়াছিল। ভারতবর্ষীয় বিবাহের ওকালতি করা আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু যে-ইউরোপীয় বিবাহের দোহাই আমরা সর্বদা পাড়ি, তাহারও এক্সপেরিমেন্ট হইতেছে। একটি পরীক্ষা হইতে অপর পরীক্ষাকে ভালো মনে করিবার কি কারণ থাকিতে পারে! বিশেষ-যখন সে-দেশের লোকের মধ্যেও এ সত্বে মতবৈধ আছে, জীবনেও অশান্তির ভাব নাই। যদি ভারতবর্ষীয় বিবাহকে আমরা স্রাস্ত্র মনে করি, তবে স্বরণ রাখা উচিত ইউরোপীয় বিবাহও সমান স্রাস্ত্র। আসল কথা, নিয়ম করিয়া সমস্কার সমাধান করা যায়, মানুষ এমন অজ্ঞ ছিল জীব নয়। মানুষ যদি, ব্যক্তি হিসাবে নয়, সমগ্র জাতি হিসাবে উন্নত না হয়, তবে ইহার মুক্তি নাই, শাস্তি নাই, কোনও সমাধান নাই। বিবাহচ্ছেদের দ্বারা যে সমস্কার সমাধান তাহা এতই খণ্ড, ক্ষুদ্র ও বালকোচিত যে তাহাকে নিয়ম বলা চলে না, তাহা-ব্যক্তিগত বিধান মাত্র। ইহার মূলে কোন তত্ত্ব নাই, কুচি মাত্র। আবার ইহার পন্থাও যে খুব দুর্বল তাহা নয়, হয় মদ, নয় বাড়িচার। স্বভাবতই লোকের ঝোঁক ওই দিকে, পরিত্যক্তা বিবাহ-বন্ধন হইতে মুক্তির ভ্রম যে মানুষে ও-ভূটার একতরের (অনেকক্ষেত্রেই উভয়ের) সাহায্য লইবে তাহাতে আর আশঙ্ক্যের কি আছে? আমরা বৈজ্ঞানিক যুগের লোক কিনা, তাই অতি-প্রাকৃত ব্যাপারকে হাসিয়া উড়াইয়া দিই। কিন্তু বিবাহচ্ছেদের মুক্তির এই উপায় অপেক্ষা পুরাকালের অপ্রাপ্য কন কেন যে হস্ত-কর তাহা ভাবিয়া পাই না। আমার তো মনে হয়, বিবাহচ্ছেদ

থাকুক, কিন্তু তাহার পরিবর্তন হোক। মদ ও বাড়িচারও থাকুক। দ্বারা বাক নিয়ম হইল বিবাহচ্ছেদ করিতে হইলে প্রমাণ করিতে হইবে যে প্রার্থী একমাস মদ স্পর্শ করে নাই, বা পনেরো দিনের মধ্যে বাড়িচার করে নাই, তবেই বুঝি যে প্রার্থিত বিষয়ের জ্ঞান তাহার আগ্রহ আছে। তখন প্রার্থনা মঞ্জুর হইবে। রেল স্টেশনে 'পকেটমার হইতে সাবধান হউন' বলিয়া পকেটমারার যে রঙীন চিহ্ন দেওয়া হয় তাহা মুগ্ধভাবে দেখিতে গিয়া যে কত জনের পকেটমারা গিয়াছে তাহার হিসাব কে রাখে! বিশেষ এই সচিহ্ন পকেটমারা দেখিয়া নিরীহেরা-দুঃখ পকেট মারিতে শেখে; সেই রকম বিবাহচ্ছেদের সরস পন্থা দুটি থাকায় লোকে মগ্নপান ও বাড়িচার করিতে প্রলুব্ধ হইতেছে, বিবাহচ্ছেদ তো বাড়িয়া যাইবেই।

ইহা Puritanদের যুগ

আসলে এ যুগটা Puritan-দের যুগ। বিবাহ করিয়াই ছেদন করিবার নামাস্তর, বিবাহ না করিবার ইচ্ছা। ইউরোপীয় মধ্যযুগকে আমরা কুচ্ছ সাধনের যুগ বলি; তখন জীবনধারণের নিয়মগুলি কত কঠোর ছিল। কিন্তু এই কঠোরতার প্রাচীর অত উচ্চ করিয়া গাঁথা হইয়াছিল তাহা হইতে ইহাই কি প্রমাণ হয় না যে তৎকালে ভোগের জোয়ারের জল অত্যন্ত পৃথগ্গ উঠিয়াছিল! নহিলে কঠোরতার কোন প্রয়োজন ছিল? আর আজ মানুষের মন ভিতরে বাহিরে শুক হইয়া গিয়াছে বলিয়াই না এত আয়োজন! মুসোলিনি বিবাহ করিবার জ্ঞান যুগকে উপহারের রঙীন কাগজে মুড়িয়া দিতেছেন। হিটলার ঠেঙাইয়া বিবাহ দিতেছেন। রাশিয়াতে বিবাহের সব দ্বার মুক্ত, তবু বাছারা বিবাহ করুক। আর ভারতীয় সারিজী ও সত্যাবানরা বিবাহ করিয়াও

বিবাহ করে নাই মনে রাখিবার জ্ঞত জন্মনিয়ন্ত্রণ করে নাই। এই Puritanদের যুগে আনন্দকে আনন্দ বলিয়া দিলে কেহ গ্রহণ করিবে না। তাহাকে কর্তব্যের আবরণে মুড়িয়া দিতে হইবে। সেইজন্ম বাণীভ শ তপ্ত-চিমটা হাতে করিয়া মাছুষকে তাড়া করিয়া লইয়া চলিয়াছেন, কোথায়? তিন শতাব্দী ব্যাপী আদর্শ মানবজীবনের দিকে। তিনি মানবজীবনকে আনন্দের মনে করেন বলিয়াই দীর্ঘতর করিয়া কল্পনা করিয়াছেন। এত অল্পদিনের মধ্যে মরিয়া গেলে ইহার কিছুই উপভোগ করা গেল না। অর্থাৎ আমাদের সমস্তটা জন্ম নিয়ন্ত্রণ নহে, মৃত্যু নিয়ন্ত্রণ।

কবি ও কবিরাজ

কবি ও কবিরাজ মূলত এক, উভয়ের ঐক্য হিংসায়। কবি সমবাসসায়ীকে হিংসা করে, সেটা মানসিক। আর কবিরাজ করে (যাহার বৈজ্ঞানিক সংস্কার ডাক্তার) রোগীকে; হিংসা মানে হনন করিবার ইচ্ছা; ইহা সম্পূর্ণ দৈহিক। এ নাটকে একজন কবি আছেন, একজন কবিরাজ। কালভৈরব ও ধনুষ্টির। কবি জদয়হীন হইলে নিজে মরে, চিকিৎসক মারে অঙ্ককে।

আধুনিক ডাক্তারেরা স্বভাবতই জদয়হীন হইয়া পড়ে। রোগীকে তাহার। এক্সপেরিমেন্টের সামগ্রী মনে করে। তাহাদের কর্তব্য যেন রোগী বাচানো নয়, রোগনির্গম। তাহার। বলেন, ভবিষ্যতে অনেক রোগী বাচাইবার জন্ম একটি রোগী মরিতে ক্ষতি নাই। কিন্তু সেই হতভাগ্য কেন অনেককে বাচাইবার জন্ম মরিতে যাইবে! তাহার কি প্রয়োজন? অনেক ভাবী অপরাধীকে সাবধান করিবার জন্ম

যে একজনকে প্রাণদণ্ড দেওয়া অর্থাৎ এমন তর্ক আছে, সেই তর্ক কেন রোগীকে বেলায় পাটিবে না?

তার পরে ডাক্তারের। একাধারে চোর ও থুনী। থুন করে রোগীকে, চুরি করে তাহার অভিব্যক্তির সর্বস্ব। আসল কথা, গর্ভমেন্ট ডাক্তারদের সার্টিফিকেট ও বিদ্যা (কি বিদ্যা এবং কতখানি?) দিয়া ছাড়িয়া দেয়, কিন্তু এই মুক্ত পাগলের দল (বন্ধ পাগলের। তো গারদে থাকে। তাহাদের খারাপ কাজ করিবার শক্তি সীমাবদ্ধ।) যে কি কাণ্ড করিয়া বেড়ায় তাহার খোজ রাখে না। এই বৈজ্ঞানিক জ্ঞানীদের উপরে গর্ভমেন্টের আরো কড়া শাসন রাখা আবশ্যক।

সাবিজীর স্বয়ংস্ব

মন্ত্ররাজ স্বয়ংস্বের কথা সাবিজীর স্বয়ংস্ব সভা। বেশবিশেষ হইতে রাজস্বগণ আনিয়াছে, কিন্তু রাজস্বের সভায় আসিতে নিষেধ হইতেছে। সকলে উত্তরিয়া হইয়া উঠিয়াছে।

সেনাপতি। আমি আগেই বলেছিলাম।

মন্ত্রী। পাঠশালায় তো কত জনেই যায়; এমন যে হবে কে জানত!

সেনাপতি। তাহ'লে স্বীকার করলেন যে জানতেন না! তবু ভাল।

বিপদে না পড়লে মাছুষ সত্য কথা বলে না।

মন্ত্রী। সেনাপতি, রাজস্ব যদি সত্যই স্বয়ংস্ব সভায় আসতে অস্বীকার করেন, তবে যে শুধু মন্ত্ররাজের বিপদ তা ভেবো না। মন্ত্রী, সেনাপতি, অন্যতা কেউ বাদ যাবে না।

সেনাপতি। কিন্তু মন্ত্রী, আমার বিপদ সকলের আগে। বিদেশী রাজাদের সৈন্য নগরের বাইরে শিবির-স্থাপন করে আছে। রাজার।

এমন ভাবে অপমানিত হলে দ্বিতীয় কুরুক্ষেত্র না বাপিয়ে ছাড়বে না!

মন্ত্রী। তার কি খুব-ই সম্ভাবনা?

সেনাপতি। সম্ভাবনা! ভারতীয় রাজাদের জানেন তো! কত সহজে তারা ব্যক্তিগত স্বার্থকে ধর্মযুদ্ধে পরিণত করতে পারেন!

মন্ত্রী। সেনাপতি, ওকেই তো বলে রাজনীতি। আর আমাদের এ সনাতন দেশে লোককে ক্ষেপিয়ে তুলতে হলে ধর্মের দোহাই দেওয়া চাই! কিন্তু রাজারা কি সত্যি—

সেনাপতি। জানো তো, কাকী এবং কোশলরাজ অনেকদিন ধরে ময়ূরাজের উপরে ষ্টম্পাপরায়ণ।

মন্ত্রী। চন্দ্রনের বনটার জঙ্ঘ—

সেনাপতি। মন্ত্রী, এখনও তোমার দিবাদুষ্টি লাভ হয় নি। তুচ্ছ চন্দ্রনের জঙ্ঘ কি যুদ্ধ করা সম্ভব? ওই বনে যে-সমস্ত কীরাত থাকে, তাদের সভা করে তোলবার জঙ্ঘই কাকী এবং কোশল-রাজের শিরপীড়া উপস্থিত হয়েছে।

মন্ত্রী। কেন, তাদের তো আমরা যথাসাধ্য স্বপ্নে রাখতে চেষ্টা করি! আর তুচ্ছ ওই কটা লোকের জঙ্ঘ যুদ্ধ—

সেনাপতি। লোক ক'টা তুচ্ছ বটে কিন্তু হাজার ক্রোশ ব্যাপী চন্দ্রনের বনটা তুচ্ছ নয়;—ওই যে দেখুন, কাকী এবং কোশল কেমন বদ্ধ-ভাবে আলাপন করছেন!

মন্ত্রী। একতাই বল! কি বল সেনাপতি?

সেনাপতি। চলো দূরে যাওয়া যাক। কিন্তু মহারাজের উচিত ছিল একবার এসে রাজাদের সাক্ষাৎ দিয়ে যাওয়া।

মন্ত্রী। সকাল থেকে এতবার তিনি সাক্ষাৎ দিয়েছেন যে ক্রমে সেটা

হাস্যকর হয়ে উঠছে। এখন তিনি রাজকন্যাকে নিয়ে পড়েছেন।

সেনাপতি। সাবিত্রী বলেন কি?

মন্ত্রী। তিনি নাকি রাজাদের বিয়ে করবেন না।

সেনাপতি। কি সর্বনাশ! কিন্তু তাকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না, রাজাদের বৈবাহিক ইতিহাস তো বড় স্বথের নয়!

মন্ত্রী। আর নয়, চল! কাকী এবং কোশল এদিকে আসছেন।

উভয়ের প্রস্থান

কাকী ও কোশলরাজের প্রবেশ

কোশল। ওহে কাকী, এত বিলম্ব কিসের!

কাকী। রাজকুমারীর প্রসাধন চলছে।

কোশল। আমার তো মনে হয়, প্রসাধন ছেড়ে এখন সাধন আরম্ভ হয়েছে। বোধ হয় তিনি সভায় আসতে রাজি নন।

কাকী। রাজকুমারীর ব্যাপারটাই ঠাকি নয় তো! ময়ূরাজের অনেক দিন থেকে আমাদের উপরে রাগ। বিয়ের লোভ দেখিয়ে ডেকে এনে শেষে কি—!

কোশল। সৈন্ত তো আমাদেরও প্রস্তুত! কিন্তু ভয় নেই, রাজকন্যা ঠাকি নন।

কাকী। ভয় যেন এখানে নেই। কিন্তু রাজধানীতে ফিরে?

কোশল। আমি তো সেই ভয়ে মহিষীকে পিতৃভয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি!

কাকী। আমিও তাকে পিতৃগৃহে পাঠিয়ে দিয়েছি। যাক তা হলে ছুই বোনে অঙ্গদেশে ভালই থাকবে। কিন্তু রাজধানী ত্যাগ করলে কি বলে?

কোশল। মুগয়াই ছিলে!

কাকী। মুগয়াই বটে!

কোশল। আর তুমি?

কাকী। তীর্থ দর্শনে।

কোশল। তবু এখনো দর্শনই পেনে না! কিন্তু ভাবছি, রাজকন্যা যদি

বরমালা পেন, তবে কিরে গিয়ে মহিষীর সঙ্গে গোলমাল বাধবে।

কাকী। ছুঁজনের বাধবে না, এই যা শাস্ত্রনা। আর আমার তো বোধ হচ্ছে রাজকন্যাটাই ফাঁকি।

কোশল। কিন্তু কিরাত-পত্তনের চন্দনের বনটা তো মিথ্যা নয়।

কাকী। ওই যে শ্বেতদ্বীপের রাজা এদিকে আসছে। বেটার শরীর কি! দেখলে হিংস হয়।

কোশল। হবে না কেন, শালা যা মদ পায়!

কাকী। ব্রুবকটার সাহস কম নয়, এসেছে রাজকন্যার লোভে!

শ্বেত-রাজের প্রবেশ

কাকী। শ্বেতরাজ, তার পরে সব কুশল তো।

শ্বেতরাজ। কুশল বটে! আপনাদের?

কাকী ও কোশল। দশ জনের অনিচ্ছাসত্ত্বেও টিকে আছি।

শ্বেতরাজ। আপনারা বেশ সরল দেখছি। মনে আর মুখে গরমিল নেই। কিন্তু যাই বলেন, আপনাদের ঋমিরা বিবাহ-সম্বন্ধে বেশ উদারতা দেখিয়ে গিয়েছেন। যত-খুশী বিয়ে করে যাও, কোন বাধা নেই; নারীর মূল্য তারা জানতেন বটে।

কাকী। নারীর নিজের কোনো মূল্য নেই, পতির বামে বসলেই তার মূল্য বেড়ে যায়।

শ্বেতরাজ। যেমন যায় সংখ্যার মূল্য বেড়ে, পাশে তার শৃঙ্গ জুড়ে দিলে। আমাদের শাস্ত্রকারেরা কি ভুলই না করে' গিয়েছেন, একসঙ্গে একটার বেশি বিয়ে করবার নিয়ম নেই।

কোশল। আপনাদের বিবাহ একাত্তী শরের মত। একসঙ্গে একজনের বেশি বিয়ে করবার উপায় নেই।

শ্বেতরাজ। যা বলেছেন। একাত্তী শরই বটে, একজন না মরা পর্য্যন্ত আর একজন বেকার।

কাকী। বিবাহচ্ছেদের আর কি কোন পন্থা নেই! মৃত্যু তো পন্থা নয়, পন্থাহীনতা।

শ্বেতরাজ। আছে বই কি! একজনকে হয় মাতাল হ'তে হবে, নয় বাড়িচার করতে হবে।

কাকী। শ্বেতরাজ আপনারাই স্বথী। অপ্রিয় বিবাহবন্ধন থেকে মুক্তিলাভের এমন সরস পন্থা প্রায়ই দেখা যায় না।

কোশল। আমাদের পত্নী অনিবার্য কন্দম্বলের মত পিছনে লেগেই থাকবে।

কাকী। শ্বেতরাজ, আমি ভেবেছিলাম বিবাহ থেকে মুক্তির জন্ম হয় তো সপ্ততাল ভেদ করতে হয়, নয় তো শত জনপদ দান করতে হয়, ও সব কিছুই নয়? আশ্চর্য্য!

কোশল। আপনি যে বিবাহ-সভায় এসেছেন, আপনি কি চিরকুমার? শ্বেতরাজ। আরে রাম।

কাকী। বিবাহচ্ছেদ করেছেন? কোন পন্থায়? মদ না বাড়িচার? শ্বেতরাজ। হাজারবার বাড়িচার করবো, তবু মদ নয়।

কাকী। বলাই বাহুল্য। কে করবে না বলুন!

শ্বেতরাজ। আমার পত্নী ছিলেন। তিনি অনেক দিন হল পাগিয়েছেন।

কাঞ্চী। বিবাহচ্ছেদের এও একটা পন্থা বুঝি?

শ্বেতরাজ। না কাঞ্চীরাজ, এ পন্থায় বিচ্ছেদ হয় কিন্তু বিবাহচ্ছেদ হয় না।

কোশল। সর্বনাশ!

কাঞ্চী। তবে এসেছেন কোন ভরসায়?

শ্বেতরাজ। বারো বছর হ'ল তিনি পালিয়েছেন। বারো বছরে পাকা দলিল তামাদি হয়, আর বিবাহ-সম্বন্ধ কি অটুট থাকবে?

কাঞ্চী। কিন্তু হঠাৎ যদি তার দেখা পান?

শ্বেতরাজ। সে কথা ভাবতেও শরীর শিউরে উঠছে।

কাঞ্চী। তবে ওসব অপ্রিয় কথা থাক। কিন্তু যাই বলুন শ্বেতরাজ, আপনাদের মুক্তির পন্থার সরসতার কথা ভুলতে পারছি না।

শ্বেতরাজ। তবু তো মায়াবাজ্যের পান্থবিবাহের কথা এখনো শোনেন নি।

কোশল। সেটা আবার কি?

শ্বেতরাজ। ওটার পুরো নাম হচ্ছে পান্থশালায় বিবাহ। পান্থশালায় যেমন ছ'চারদিন থেকে ইচ্ছামত চলে যাওয়া যায়, কোন দায়িত্ব নেই, এ বিবাহ তেমনি। যতদিন খুশী একত্র থেকে বসিবনাও না হ'লে ছেড়ে চলে যাওয়া যায়।

কোশল। তবে তো ওদেশে ব্যক্তিচারের কথাই ওঠে না!

শ্বেতরাজ। যেমন ওঠে না ব্যক্তিগত সম্পত্তি না থাকলে চুরির প্রশ্ন।

কোশল। কিন্তু ঐ পান্থবিবাহের পান্থশালায় যদি পুত্রকন্ডা জন্মে?

শ্বেতরাজ। পুত্রকন্ডার দায়িত্ব সে দেশে তো পিতামাতার নয়, রাজার।

কাঞ্চী। বাস, সব গোল মিটে গেল।

শ্বেতরাজ। শুধু তাই নয়। সকলের পিতামাতার নাম এক হওয়াতে

সবাই জাতীয়-এক্য খুব ঘনিষ্ঠভাবে বন্ধুতে পারে। তাদের সঙ্গে পারেন কে?

কাঞ্চী। কোশলরাজ, এতদিন হিন্দুধর্মীদের বিধানকে চরম বলে

মানতাম, এখন দেখছি ওসব দেশের ঋষিদের তুলনায় এরা শিশু।

শ্বেতরাজ। কিন্তু আপনারা যে স্বয়ংস্বর সভায় এসেছেন, দরুন যদি সফল হন, তবে রাজকুমারীকে নিয়ে গেলে ব্রাহ্মণী কিছু বলবেন না?

কাঞ্চী। কিছু কিছু বলবেন বই কি। তবে ছ'দিনে সয়ে যাবে। আসল

কথা কি জানেন, বিধান কঠিন হ'লে তার ব্যতিক্রমের

উপায় করে রাখতে হয়। আমাদের বিবাহ হচ্ছে শাবলীবনের

মেঘাদ, তাই তার মধ্যে হাত-পা নাড়বার ব্যবস্থা ঋষিরা

করে রেখেছেন।

শ্বেতরাজ। কি রকম?

কাঞ্চী। দম্পত্যী আমাদের একজনই। যাকে বলি প্রধানা মহিষী বা

পাটরাণী। কিন্তু শুধু দম্প নিয়ে তো মাছুষ বাঁচেনা; তাই

আছে আমাদের কন্ডসহচরী, নন্ডসহচরী, এ ছাড়া তো সখীর দল

আছেই।

শ্বেতরাজ। এঁতে কিছু গোলমাল হয় না?

কাঞ্চী। কিছু না। আপনাদের আর আমাদের বিবাহের মূল নীতিটা

একই। এক বারে এক জন। তবে আপনাদের বারটা হয় তো

বারো বছর, আমাদের পক্ষে একরাজি।

শ্বেতরাজ। তা বটে।

কাঞ্চী। দেখুন না কেন, যে জগৎ হিন্দুধর্ম একেশ্বর থেকে বহু-ঈশ্বরবাদী

হ'ল, ঠিক সেই জগৎই আমাদের পৃথিবীর সংখ্যা এক থেকে অনেকে

দাড়িয়েছে। মানুষের প্রয়োজন বহুখণী, বৃষ্টির জগৎ ইন্দ্র, জলের

জন্ম বরণ, বাবুর জন্ম মরুৎ, আঙনের জন্ম অগ্নি, এঁরা সবাই মূল ভগবানের প্রতিনিধি। সেই রকম আমাদের কল্পবনের জন্ম একজন; জলকেলির জন্ম একজন; ধরুন, আমাদের দোলা-উৎসবের দিন পাটরাণীকে যদি দোলায় উঠতে হত! কি বিপদ বলুন তো!

শেতরাজ। কেন?

কাঞ্চী। বহু ক্ষীর-নবনী ভোজন করে তাঁর ওজন অন্তত পাঁচ আড়াই মণ হয়েছে! সে-দোলা দোলাবে কে?

কোশল। তা ছাড়া বয়স বেড়ে যায়। পুরুষের বয়স শামুকের মত গড়িয়ে গড়িয়ে চলে, প্রত্যেকটি বছরের দাগ রেখে যায়। মেয়েদের বয়স চলে বানরের মত লাফিয়ে, এই ষোল, এই চব্বিশ, এই ছত্রিশ, বাস পঞ্চাশ। নেশা জমতে না জমতে বয়স যায় বেড়ে। পঞ্চাশকে নিয়ে ধর্মকাথ্য করা চলে, কিন্তু জীবন-দোলায় দোলা! অসম্ভব।

শেতরাজ। কিন্তু তারা রূপের ক্ষতি সহ্য করে কোন্ সাহসনায়।

কোশল। কেন? তারা রূপের আশ্রয়ত্যাগে পায় পুত্র, পরিজন, সংসার। সে কি প্রেমের নেশার চেয়ে কম?

শেতরাজ। কোশলরাজ, আমার কি মনে হয় জানেন, দুই-ই তুল। আমাদের এক বিবাহও যেমন তুল, আপনাদের অনেক বিবাহও তেমনি তুল। মাছুয় এমন বিচিত্র আর জটিল যে যে-কোনো নিয়মের দ্বারা তাকে আবিষ্ট করতে চান, তাকে সম্পূর্ণ ভাবে পাবেন না।

কোশল। তবে উপায়?

শেতরাজ। মাছুয়ে যদি জ্ঞাত হিসাবে ভালো হয়, তবেই এর সমাধান

হবে। এত নিয়মও লাগবে না, আর তাঁর এত ব্যতিক্রমেরও প্রয়োজন হবে না।

কাঞ্চী। সে তো হল, কিন্তু রাজকুমারীর সংবাদ কি? সকাল থেকেই শুনিছি তিনি আসছেন। লক্ষণ তো ভাল নয়।

কোশল। তবু নাস্তি-মাতুলের চেয়ে অন্ধ-মাতুল ভালো। রাজকুমারীর বদলে উনি আসছেন।

শেতরাজ। উনি কে?

কোশল। মন্ত্ররাজের সভাকবি।

শেতরাজ। নাম কি?

কোশল। কালভৈরব।

শেতরাজ। কি কাব্য উনি রচনা করেছেন?

কোশল। বিদগ্ধ কল্পবল্লরী।

শেতরাজ। কবির ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি আছে বটে।

কোশল। কেন?

শেতরাজ। ভবিষ্যতে ঠিক কাব্যের যে দশা ঘটবে, পূর্বেই সেই রকম নামকরণ করে রেখেছেন। ওহো সার্থকনামা কাব্য।

মন্ত্ররাজ-সভাকবি কালভৈরবের প্রবেশ।

কবি নাস্তিধর্ম, কৃষ্ণধর্ম, চক্ৰ ছিট রক্তাভ, কেশে মালতীর মালা, স্বপ্নে ওন্দ্র উত্তরীয়।
কথা কিছু উচ্চবরে বলিয়া থাকেন।

কবি। রাজগণ স্বাগত হোন্।

কাঞ্চী। সকাল থেকেই তো স্বাগত হচ্ছে, এখন বিদায় করবার ব্যবস্থা করুন।

কবি। রাজার বিদায় কি অমনি হয়! সাবিত্রী-দক্ষিণার ব্যবস্থাও হবে।

কাঞ্চী। সে তো সকলের ভাগ্যে হবে না। অল্পদের কি বন্দোবস্ত? কবি। মিষ্টান্নম্।

কাঞ্চী। তবে তারই ব্যবস্থা করুন না কেন?

কবি। আজ্ঞে, আমি আসছি।

কবির প্রস্থান

শ্বেতরাজ। রাজকুমারী যতক্ষণ না আসছেন, একটু কাব্যলাপ করা যাক কবির সঙ্গে।

কাঞ্চী। শ্বেতরাজ, আপনাদের দেশে কবি নেই বুঝতে পারছি, নইলে এত বড় দুঃসাহস আপনার হত না।

শ্বেতরাজ। কেন?

কাঞ্চী। আমরা যে যুদ্ধ করি তার উদ্দেশ্য খুব মহৎ না হলেও স্পষ্ট। এদের ঈর্ষার না আছে মহত্ত্ব, না আছে তার কারণ।

শ্বেতরাজ। কল্পিত কি হিংসা?

কাঞ্চী। না, ঈর্ষাপরায়ণ। হিংসায় থাকে হিংসা করা যায় সে জলে মরে ঈর্ষায়, জলে মরে নিজে। এরা প্রেমের বাণী প্রচার করে বটে, কিন্তু নিজেরা ভালবাসতে পারে না। যেন প্রদীপ-বিক্রেতার নিজের বাতীটাই অন্ধকার।

শ্বেতরাজ। ওই যে কবি আসছেন।

কবির প্রবেশ

শ্বেতরাজ। কবি, যতক্ষণ না মিষ্টান্ন আসছে আসুন একটু কাব্যলাপ করা যাক।

কবি। বেশতো! স্বয়ম্বর-সভা, প্রেমের কবিতা এখানে বিসদৃশ হবে না।

কাঞ্চী। কবি ওটা তোমার ভুল। প্রেম আর বিবাহ দুটো ভিন্ন গোত্রের জিনিষ।

কবি। কি রকম?

কাঞ্চী। প্রেম বন্ধা, আর বিবাহ বাধ। প্রেমটা নেশা, আর বিবাহ খাদ্য। তাই প্রেমের দেবতা মদন আর বিবাহের অপিনেতা প্রজাপতি ব্রহ্মা। ছোটোর তব সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

কবি। তবে বিবাহে কি প্রেম নেই?

কাঞ্চী। থাকতে পারে। গোড়াতে প্রায়ই থাকে; যেটাকে তোমরা বল পূর্বরাগ। বিবাহের হোমানল পূর্বরাগের চিত্তানল।

কবি। তবে এ ছোটোর মধ্যে সম্বন্ধ কি?

কাঞ্চী। প্রেম কালনিক, বিবাহ সাংসারিক। প্রত্যহের বিয়িত জগতে প্রেমকে চালাতে গেলে তার আকাশমুখী ডানায় কিছু ভার বেধে দেওয়া দরকার, সেই ভারটার নাম উদ্বাহ-বন্ধন।

কবি। তাহলে আপনি বলতে চান কারো আমরা যে প্রেম দেখি বিবাহিত প্রেম সে জিনিষ নয়?

কাঞ্চী। নিশ্চয়ই নয়।

কবি। কোনটা ছোট কোনটা বড়?

কাঞ্চী। ছোটো এতই স্বতন্ত্র যে তুলনার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। নিজের নিজের স্থানে ছোটোই বড়। কিন্তু আমরা ভুল করি কোথায় জানো, একটাকে যখন অল্পটার সঙ্গে মিশিয়ে ফেলি; পূর্বরাগকে যখন বিবাহের গভীরে বাধতে চাই। আবার বিবাহের সম্বন্ধের মধ্যে পেতে ইচ্ছা করি পূর্বরাগের দীপ্তি।

শেতরাজ। কাকীরাজ, আমাদের দেশে পূর্নরাগের পালা উদ্‌যাপন করে বিবাহ করবার রীতি আছে।

কাকী। সেই জন্ত তোমাদের দেশে বিবাহচ্ছেদের নিয়ম থাকা আবশ্যক।

শেতরাজ। কেন?

কাকী। এ তো সহজ কথা! পূর্নরাগের উষালোকে যে রূপরহস্য চোখে পড়ে মাছুষ যখন তা বিবাহের পরে আশা করে, আর পায় না, তখন তার মনে বিব্রোহের ভাব জাগা স্বাভাবিক। বিবাহচ্ছেদের দরজা দিয়ে এই ভাবের নিষ্করণ পক্ষ।

কবি। তবে আমাদের ভারতীয় বিবাহে এই প্রেমের স্থান নেই?

কাকী। হা। নেই। এবং থাকাও উচিত নয়। বিবাহ স্থায়ী, প্রেম অস্থায়ী। এ দুটোকে জড়াতে চেষ্টা না। করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

কবি। বিবাহ হলোই কি প্রেম চলে যাবে?

কাকী। ছ'চার দিন থাকতে পারে, কিন্তু অবশেষে যাবেই। সেই জন্তই তো হিন্দু-বিবাহে একাধিক বিবাহের ব্যবস্থা আছে। এক জনের প্রেম চলে যেতে না যেতে আর এক জনকে বিবাহ।

কবি। প্রেম আর বিবাহকে স্বতন্ত্র করে ফেললেন। কথাটা আমার ভালো লাগলো না।

কাকী। কবি, তুমি বিবাহ করনি বুঝতে পারছি।

কবি। বলেন কি রাজন! বিবাহটা জীবনে এত আগে সেরে নিয়েছি, যে সংসারের রাজকীয় সম্বলতা থাকলে এতদিনে পঞ্চাশটা বিবাহ করে উদ্‌বাহের স্বর্ণ-জয়ন্তী করতে পারতাম।

কাকী। তবে তুমি কখনো ভালবাসনি।

কবি। আমি? আমি রূপতান্ত্রিক, দেহের কাপালিক।

কাকী। কখনো নতুন করে বিবাহ করতে ইচ্ছা হয় না?

কবি। না।

কাকী। তবে ভালবাসা কাকে বলে, তুমি তা জানো না।

কবি। আমি?

শেতরাজ। ওসব অপ্রিয় আলোচনা থাক। এস কবি, একটু কাব্যলাপ করা যাক। কবিসম্রাটের কাব্য খানিকটা আবৃত্তি কর।

কবি। কবিসম্রাট কে?

শেতরাজ। জানো না?

কবি। কবিসম্রাট বলতে তো সমুদ্রগুপ্তকে বুঝি, কারণ তিনি কবিতাও লিখতেন, সাম্রাজ্যের অধিকারীও ছিলেন।

শেতরাজ। আচ্ছা, তাকে না হয় কবিসম্রাট নাই বললাম, কবি-চক্রবর্তীতে তো আপত্তি নেই?

কবি। চক্রবর্তী! তার ক'খানা রথ ছিল?

শেতরাজ। রথ!

কবি। চক্রের উপরে যে বস্তুমান, সেই তো চক্রবর্তী! তেমন কবি কে আছে?

শেতরাজ। বিশেষণ পড়ে'-মজ্ঞগে। তুমি বাম্বাকির কবিতা একটু আবৃত্তি কর, বড় মধুর কাব্য।

অজ্ঞের কবিতা মধুর অনিব্যাহিত কবির মুখে চোখে ভীষণ পরিবর্তন লক্ষিত হইল। চকু রক্তবর্ণ হইল, মুখ দিয়া ফেনা পড়িতে লাগিল, চিংশ বায়ু শিকারের উপরে লাফাইয়া গড়িবার পূর্বে যেমন পিচাইয়া গিয়া বেহ সঙ্কটিত করিয়া লয়, কবি তেমনি ভাব করিল।

কবি। কি, এত বড় কথা। তার কবিতা মধুর! আমার ছাড়া আর

কারও কাব্য পাঠ! কোথায় সেই হতভাগা, তাকে ছিড়ে ফেলবো, থেয়ে ফেলবো, এই নথ দিয়ে তার পেট চিরে নাড়ি-তুড়ি বের করে ফেলবো।

শেতরাজ। সে কি কবি! বাস্তবিক যে অনেকদিন মারা গেছেন!

কবি। যাবেই তো, যাবেই তো! বেশ হয়েছে। তার কাব্য যখন তোর ভাল লেগেছে, তাকে ছিড়ে ফেলবো। ওরে রে পাখও, একে তো তুই আমার কাব্য পড়িসনি, তার উপরে আমার অস্ত্রের কাব্য তোর ভাল লাগে।

কাফী। ওহে কোশল, চল সরে পড়ি।

কবি। সরবি কোথায়? তোরাতও সন্দোহে রোষী। তিনজনকেই ছিড়ে ফেলবো।

কবি সবগে একলাফে তিন জনের খাড়ে লাফাইয়া পড়িল। কবিকৈশিক চারজন সভাতলে গড়াইতে লাগিল। তিন রাজার ইচ্ছা, কালভৈরবের কবল ছাড়াইয়া ওঠে, কবির ইচ্ছা তিনজনকে চাপিয়া রাখিয়া কাব্য সম্বন্ধে কিছু কঠোর শিক্ষা দেয়, সভায়গে সে এক হৈ হৈ শব্দ। অস্ত্র কেহ ছাড়াইতে অগ্রসর হয় না, বোধ হয় তাহার কালভৈরবের কতাব জানে।

এমন সময়ে শম্ভু দণ্ডা, তুরী ভেরী বাজিয়া উঠিল। রাজকুমারী সার্বিজী তাপুল-করকবাহিনী সখীর সহিত দ্বন্দ্বধর-সভায় প্রবেশ করিল। রাজকুমারীকে দেখিয়া বহল জিশ মনে হয়। তবে থোকে নাড়ি না থাকায় কিছু জোর করিয়া বলা যায় না। মাথার চুল ঘাড় পর্যন্ত ছোট করিয়া ছাঁটা; শাড়ী ষাঁটমাট করিয়া পরা, পায়ে পাছুকা। গালে অনেকগুলি শুক ব্রণচিহ্ন। কাফী, কোশল, শেতরাজ, কবি সম্মুখ ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল।

সার্বিজী। সমাগত রাজহর্গণ, আমি আপনাদের কাউকে বিয়ে করবো না। তবে একেবারে নিরাশ করতে চাইনে। আমার এই সখী দ্বন্দ্বধর তা হবেন। আপনারা সবাই আসন পরিগ্রহ করুন। ইনি বরমালা দান করবেন।

সখী সমগ্রভিত্ত ভাবে অগ্রসর হইয়া বিপুলবপু-শেতরাজের কণ্ঠে মালা দান করিল। শেতরাজ অস্ত্রমনর ছিল, হঠাৎ গলায় মালা পড়ায় সখীকে দেখিয়া সম্বন্ধে অজান হইয়া পড়িল।

কাফী। কি হ'ল কি হ'ল শেতরাজ।

শেতরাজ। গৌ—গৌ—

কোশল। কি হ'ল শেতরাজ?

শেতরাজ। আর হবে কি! উনি আমার সেই বারো বছর আগেকার হারানো দর্শপত্নী।

কবি। আমার কাব্যকে নিন্দা করবার ফল ভোগ কর।

শেতরাজ। কবি, আমি তো তোমার কাব্যকে নিন্দা করিনি, অস্ত্রকে প্রশংসা করেছি মাত্র।

কবি। অস্ত্রের প্রশংসা করাও আমার নিন্দা করার প্রকারভেদ। এইবার ঠেলা বোঝ।

কাফী। ভয় কিসের শেতরাজ। বিবাহচ্ছেদের যে দুটো পন্থা আছে তার আশ্রয় নাও না কেন?

শেতরাজ। ঠিক কথা। দেবী, আমি বাড়িচারী।

সখী। দেব, আমিও বাড়িচারিণী। কাজেই আগেকার সম্বন্ধ তুদিক থেকেই বাতিল। আবার নূতন করে সম্বন্ধ স্থাপিত হোক।

শেতরাজ গৌ গৌ শব্দে অজান হইয়া পড়িল।

কবি। যেমন কর্ম তেমন ফল। অস্ত্রের কাব্যের প্রশংসা আমার সম্মুখে!

কাফী। কোশলরাজ, আর বিলম্ব নয়, সেনাপতিদের ডাক, বলপূর্বক অস্ত্রপূরে প্রবেশ করতে হবে। এত বড় অপমান!

সখীর দ্বন্দ্বধর তা হওয়াতে পুনরায় শম্ভুদণ্ডা, তুরীভেরী বাজিয়া সভায়ল মুগ্ধিত হইয়া উঠিল।

প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত

দ্বিতীয় অঙ্ক

অন্তঃপুরের উদ্যান। ফুল-ফুলিবার জন্ত সত্যবান বকুল গাছে উঠিয়াছে, তাহার বহু বারো চোন্ধর বেশি নয়। সাবিত্রী গাছের ডাল ধরিয়া নাড়া দিতেছে, ডাল কাপিতেছে, সত্যবান পড়িবার ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিতেছে।

সত্যবান। কেন আমাকে বিরক্ত করছ ?

সাবিত্রী। নেমে এস বলছি।

সত্যবান। নামব না, আমার ফুল তোলা হয় নি।

সাবিত্রী। ফুলে দরকার নাই তুমি নামো।

সত্যবান। নামব না। তোমার ভয়েই আমি গাছে উঠেছি। সারাদিন কি যে বল।

সাবিত্রী। বটে, আমার ভয়েই তুমি গাছে উঠেছ ! আমি উঠব নাকি ?

সত্যবান। ঠঠ, ডাল ভেঙে পড়ে গিয়ে হাত-পা ভাঙবে।

সাবিত্রী। তবে তুমি নামো।

সত্যবান। কেন বল তো ?

সাবিত্রী। তোমাকে বিয়ে করবো।

সত্যবান। ওই আবার সেই পুরান কথা। আমি তোমাকে বিয়ে করবো না, করবো না, করবো না। তিন সতি, যাও এবার।

সাবিত্রী। ইস, পাঠার ইচ্ছায় নাকি যাড়ে কোপ হয় ! আমি তোমাকে বিয়ে করবো, করবো, করবো। তিন সতি। যদি আমি পতি-প্রভা হই, তবে তোমাকে বিয়ে করবোই।

সত্যবান। বিয়ে না করতেই পতিপ্রভা ?

সাবিত্রী। মস্তের বিয়ে হয় নি বটে, মনের বিয়ে হয়েছে।

শনিবারের চিঠি

৫৫৫

সত্যবান। যেখানে হয়েছে সেখানে যাও। আমার দিদিমার বয়সী, ওকে আবার করবে বিয়ে !

সাবিত্রী। বটে। এইবার দেখ।

গাছের ডাল নাড়িতে লাগিল
সত্যবান। বাবা, গায়ে জোর আছে বটে। গাছটাহুড় উপড়ে পড়বে।

সাবিত্রী। কিন্তু কেন বিয়ে করবে না তুমি ?

সত্যবান। প্রথম, তুমি আমার চেয়ে বয়সে বড় ; দ্বিতীয়, তুমি রাজার মেয়ে, আমি গরীবের ছেলে।

সাবিত্রী। সেই জেই তো আরো বেশি করে বিয়ে করা দরকার। তোমার টাকা নেই, আমার আছে। তোমার বয়স বারো, আমার ত্রিশ, দুজনের মিলে বিয়াল্লিশ। দুই দিয়ে তাকে ভাগ দাও এক-একজনের ভাগে পড়বে একশ।

সত্যবান। পাঠশালায় না পড়লে এমন বুদ্ধি হয় ! ওতেই তোমার মাথা পেয়েছে।

সাবিত্রী। তা ছাড়া দেখ, আমি যে-কোন রাজাকে বিয়ে করতে পারতাম, সে লোভ তোমার জন্তই ছেড়ে দিলাম।

সত্যবান। তার ঠেলা আগে সামলাও। বাইরে গোলমাল শুনছ না ? রাজারা সব ফেপে উঠেছে।

সাবিত্রী। উঠুকগে। আমি যাকে-খুশী বিয়ে করবো।

সত্যবান। আমারও সেই কথা। যাকে-খুশী বিয়ে করবো। তুমি যাও।

সাবিত্রী। বড় আশ্পদ্ধা।

সত্যবান। সর বলছি।

সাবিত্রী। বল বিয়ে করবে, নয় তো গাছ থেকে দেব ফেলে।

সত্যবান। দাও ফেলে। মরলে অন্তত তোমার হাত থেকে বাঁচতে পারবো।

সাবিত্রী। না, তা পারবে না। যমরাজ আমার পূজায় সম্বষ্ট হয়ে বর দিয়েছেন যে আমি স্মরণ করলে তিনি উপস্থিত হবেন, এবং যে বর প্রার্থনা করবো, দেবেন। তুমি মরলে তোমাকে বাঁচিয়ে তুলে বিয়ে করবো।

সত্যবান। ওঃ বাবা!

হতভাষ হইয়া গাছের ডালে বসিয়া পড়িল।

সাবিত্রী। এবার তো হল?

সত্যবান। আচ্ছা আমাকেই বিয়ে করবার জ্ঞান এত মাথাব্যথা কেন?

সাবিত্রী। যে বয়সটা আমি পাঠশালায় অল্পমনস্ক ভাবে পার হয়ে এসেছি, সে বয়সটা আজও তোমার সম্মুখে। তোমাকে বিয়ে করে সেই বয়সের মাধুঘাটাকে খানিকটা উপভোগ করবো।

সত্যবান। আর আমি বিনা-দোষে তোমার ওই রূপ-শুকানো প্রৌঢ় বয়সের ছিবড়ে চর্কণ করি! নাঃ, ও আমার দ্বারা হবে না।

সাবিত্রী। নিশ্চয় হবে। ভবিষ্যতে যখন মেয়েরা দলে দলে পাঠশালায় যাবে, পাঠশালা থেকে বেরিয়ে আসতে তাদের বয়স যখন ত্রিশের কোঠায় গিয়ে ঠেকবে, তখন তারা কাঁচা বয়সের তুল শোধরাবার জ্ঞান কাঁচা বয়সের ছেলে বিয়ে করতে আরম্ভ করবে।

সত্যবান। আমি-বুঝি সেই হতভাগাদেও প্রথম বলি?

সাবিত্রী। যা মনে কর তাই। কিন্তু নামো।

সত্যবান। না—য—বো—না।

সাবিত্রী। তবে আমি উঠলাম।

সাবিত্রী গাছে উঠিয়া সত্যবানকে তড়া করিয়া ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

সত্যবান পলাইতে পলাইতে একবার পা পিছলাইয়া মাটিতে পড়িয়া অজ্ঞান হইল।

সাবিত্রী লাফাইয়া নাহিল।

সাবিত্রী। সত্যবান, সত্যবান। একি, সাড়া নেই! কি সর্বনাশ!

মঞ্জীর প্রবেশ

মঞ্জী। রাজকুমারী, মহারাজ বললেন অসম্বষ্ট রাজারা ক্ষেপে উঠেছে, তুমি যদি কাউকে বরণ না কর তবে রাজধানী রক্ষা করা কঠিন হবে।

সাবিত্রী। আমি যাকে বিয়ে করবো, দেখ তার কি দশা!

মঞ্জী। সেই বালকটি বুঝি!

সাবিত্রী। যাও শীঘ্র রাজবৈদ্য দ্বন্দ্বস্তরিকে ডেকে আন।

মঞ্জী। যে আদেশ।

প্রস্থান

সাবিত্রী। রাজবৈদ্য বাঁচাতে না পারলে যমরাজকে স্মরণ করবো।

দ্বন্দ্বস্তরী ও মঞ্জীর প্রবেশ

দ্বন্দ্বস্তরী। ব্যাধিটা কি?

সাবিত্রী। তা নির্ণয় করবার জ্ঞানই তো তোমাকে ডাকা!

দ্বন্দ্বস্তরী রোগীকে দেখিয়া

হঁ, বড় কঠিন ব্যাধি।

সাবিত্রী। নাম কি?

দ্বন্দ্বস্তরী। আপনারা সংস্কৃত জানেন?

সাবিত্রী। ওটা মৃত ভাষা বলে শিখিনি।

মঞ্জী। তুমি নির্ভয়ে বলে যাও, আমি সম্পূর্ণ তুলে গিয়েছি।

দ্বন্দ্বস্তরী। এ ব্যাধির নাম হচ্ছে নৈমজ্যাপরাপত্তি ব্রহ্মবৈর্যবাদ।

সাবিত্রী। এর মানে কি?

দ্বন্দ্বস্তরী। তাহলে আবার সংস্কৃত বলতে হ'ল দেখছি।

সাবিত্রী। শোভা কথায় বল না।

ধনস্তরি। তাই বলি। মানব শরীরের আপাদমস্তক হৃৎস্রাতিহৃৎস্র স্রাযু-
জ্বালে আচ্ছন্ন। সেই স্রাযুজ্বালে সহস্রা আঘাত প্রাপ্ত হওয়াতে
উচ্চস্বরে বাঁধা বীণাতন্ত্রী যেমন কঠিন আঘাতে ছিন্ন হয়, তেমন
ছিন্নতা প্রাপ্ত হয়েছে। মানবদেহের বাম অঙ্গের স্রাযুজ্বাল
হৃৎস্রাকে অবলম্বন করে দক্ষিণ মূর্দ্ধায় এবং দক্ষিণ অঙ্গের স্রাযু-
জ্বাল হৃৎস্রাপথে বামমূর্দ্ধায় মিলিত হয়েছে। বুঝলেন?

সাবিত্রী। ওটা তো সংস্কৃত হ'ল!

মন্ত্রী। কোন ভয় নেই ধনস্তরি, একবর্ণও বুঝতে পারিনি।

সাবিত্রী। আর বুঝে দরকার নেই, এবার রুগীকে সারাও।

ধনস্তরি। দাঁড়াও রাজকুমারী, আগে ব্যাধি নির্ণয় করে নিই।

সাবিত্রী। ব্যাধি নির্ণয় করতে করতে রুগী মারা যাবে যে!

ধনস্তরি। তা গেলে কি করবো! তাই বলে তো বাস্তবতা করে রোগ
অমীমাংসিত রাখতে পারিনা।

সাবিত্রী। আগে রুগী বাঁচাও, পরে রোগ চিনো।

ধনস্তরি। সেটা কেমন করে সম্ভব হয় রাজকুমারী? রুগী বেঁচে গেলে
রোগ অস্তহিত তো হবেই। •

সাবিত্রী। তবে কি রুগীকে মেরে ফেলে রোগ চিনবে নাকি?

ধনস্তরি। অনেক সময় তার প্রয়োজন হয় বৈকি।

সাবিত্রী। কি সর্বনাশ!

ধনস্তরি। একটি রোগীর মৃত্যু দিয়ে আমরা কত রোগী-জীবনের পথে
প্রবেশ করি।

সাবিত্রী। সে প'ড়ে-মরুকগে। এখন এর কি করা যায় বল?

মন্ত্রী। যা বলবে তা ভাষায় বলা।

সাবিত্রী। যেমন ভাষায় বললে এর আগে, সে ভাষায় নয় কিন্তু।

ধনস্তরি। এর বাম মূর্দ্ধায় আঘাত লেগেছে। যদি এর দক্ষিণ মূর্দ্ধায়
আঘাত লাগতো বাঁচাতে পারতাম। বাম মূর্দ্ধায় আঘাত স্বয়ং
শিবের অসাধ্য।

সাবিত্রী। তা হলে বাঁচাতে পারবে না বলছ?

ধনস্তরি। আমি কিছুই বলছি না। আমার বিজ্ঞানে যা বলে তাই
বললাম।

তখন সাবিত্রী নতজানু হইয়া যমরাজকে স্মরণ করিল। এক দিক দিয়া যমরাজের,
অজ দিক দিয়া বিজয়া কাকী, কোশল, সপত্নী শেতরাজের প্রবেশ। রাজগণ বাপার
বৃষ্টিতে না পারিয়া নীরব হইয়া রহিল।

যমরাজ। বৎসে, কি জন্ম আমায় স্মরণ করছে?

সাবিত্রী। প্রভু, এই হতভাগ্যকে জীবন দান কর। রাজবৈবস্ব একে
বাঁচাতে অসমর্থ।

যম। কি গো দূত, তুমি পারলে না?

উপস্থিত সকলে (সমস্বরে)। দূত! ধনস্তরি বৈবস্ব, যমদূত!

ধনস্তরি। মহারাজ, আমাদের স্মৃষ্টতা প্রকাশ করে দিলেন? লোকে
কি আর আমাকে ডাকবে?

যম। চুরি হলে যদি কোটালকে ডাকে, তবে মাছ মরলে তোমাকে
কেন না ডাকবে?

ধনস্তরি। আপাতত মরে পড়ি, সকলেই বিচলিত হ'য়ে পড়েছেন।

প্রস্থান

যম। বৎসে, একে অবশ্যই বাঁচিয়ে দিতে পারি, কিন্তু এর স্থলে স্বেচ্ছায়
এক জনকে মরতে হবে।

শেতরাজ। প্রভু, আমি, আমি, আমি মরবো।

খেতরাজপত্নী। তবে আমাকেও মারো প্রভু। দু'জনে পরলোকে গিয়ে সংসার পাতি।

খেতরাজ। তবে ওকেই নাও প্রভু। আমি বেচে থাকি।

খেতরাজপত্নী। তবে আমিও মরবো না। তোমাকে ছেড়ে আমি স্বর্গেও যেতে রাজি নই।

খেতরাজ। ভয় নেই মহিষী, আমাদের যে ইতিহাস, তা'তে দু'জনের সম্মিলিত চেষ্টাতেও স্বর্গে যেতে হবে না।

যম। আচ্ছা, তোমাদের কাউকে মরতে হবে না। ওকে বাঁচিয়ে দিচ্ছি। ওঠ বৎস!

সত্যবানের সংজ্ঞা প্রাপ্তি। ধনুস্তরির প্রবেশ

ধনুস্তরি। এ কি, ছোকরা বাঁচলো কি ক'রে? আমার শাস্ত্র বলছে, এ রোগে বাঁচা অসম্ভব।

সাবিত্রী। তবে তোমার শাস্ত্র ভুল।

ধনুস্তরি। 'আমার শাস্ত্র ভুল? শাস্ত্রকে লঙ্ঘন করে ওর বাঁচাই ভুল। এরকম ক'রে সবাই যদি শাস্ত্র লঙ্ঘন করতে থাকে তবে সমাজ রক্ষা হয় কি ক'রে? আমি যাচ্ছি রাজার কাছে বিচারের জ্ঞা।

সাবিত্রী। তার চেয়ে তোমার শাস্ত্র বদলে ফেল।

ধনুস্তরি। শাস্ত্র বদলাবো! কথনো না। বরঞ্চ আজ থেকে টীকা-টীপনী, গ্রন্থ, ভাষ্য লিখে প্রমাণ করবো যে শাস্ত্রের বিধান লঙ্ঘন ক'রে ওর বাঁচা অসম্ভব হয়েছে, ঘোরতর অসম্ভব। একদিন ছিল যখন শাস্ত্রের বিধানের সত্যতা প্রমাণের জ্ঞা এদেশের লোক মরতে পারতো। আর আজ! হায় হায়।

সত্যবান। ধনুস্তরি, বৃথা তুমি চুংথ করছ। আমিতো মরিনি, দম বন্ধ করে পড়ে ছিলাম।

ধনুস্তরি। (উল্লাসের সহিত) জয় চিকিৎসা শাস্ত্রের! জয় চরক ব্রহ্মসূত্রের! তাই বলি, শাস্ত্র কখনো মিথ্যা হয়! রাজকুমারী, আমি যে একে বাঁচাতে পারিনি, তার একমাত্র কারণ এ মরেনি। একবার সত্যি মরুক, আমি বাঁচিয়ে দিচ্ছি।

সত্যবান। বাঁচিয়েই যদি দিলে তো মরে লাভ কি?

খেতরাজ। আমি মরতে রাজি আছি, যদি আর না বাঁচাও।

যম। বৎস, তুমি এত মরতে উৎসুক কেন?

সত্যবান। তুমি কি বুঝবে ধর্মরাজ! তুমিতো শুধু মৃত্যু জানো, কিন্তু জীবন্মৃত্যুর সংবাদ রাগো কি? মানুষ মরে একবার, কিন্তু জীবন্মৃত হয়ে থাকে অর্ধেক জীবন। তার স্বপ্ন নাই, শান্তি নাই, আশা নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই, জীবনে কোনো বৈচিত্র্য নাই, জন্মের দিগন্ত থেকে মৃত্যুর দিকচক্র পর্যন্ত কেবল শীতমন্ডলের নিষ্কণ্টক শুভ্রতা। লোকে শুনেছে পৃথিবীর যত স্বর্ণ ঘূর্ণন-বেগে গিয়ে সঞ্চিত উভয় মৈত্রীর শীর্ষে, সেই লোভে ধারা ওই দিকে ধায়। কেউ সোনা পেয়েছে, আজ পর্যন্ত শুনি নি; হতভাগাদের শীর্ণ কঙ্কালে এই দুঃখের পথের পদাবলী রচিত। আমি হতভাগ্য সেই শোকের রামায়ণের আর একটি শ্লোক। না, না, আমি এই জীবনব্যাপী মৃত্যু চাই না, একমুহূর্তের মৃত্যু চাই।

যম। বৎস, জীবনব্যাপী মৃত্যু কাকে বলছ?

সত্যবান। বি—বা—হ।

খেতরাজ। প্রভু, আমিও।

খেতরাজপত্নী। চূপ কর।

বেতরাজ। শুনছো তো প্রভু ?

সত্যবান। আমি তবে আসি।

সাবিত্রী। (জোর করিয়া হাত ধরিয়া) দাঁড়াও।

সত্যবান। দেখছো তো প্রভু ?

সেনাপতির প্রবেশ

সেনাপতি। (কোশল ও কাকীকে) মহারাজ, রাজধানী জয় করেছি,

এখন কি আদেশ ?

কাকী। এখন সৈন্যদের এ নগর ছেড়ে দেশে যাত্রা করতে বল, এখন।

কোশল। এই মুহুর্তে।

সেনাপতি। মহারাজদের জন্ত ?

কাকী। রথ প্রস্তুত কর গে। শীঘ্র।

সেনাপতির প্রস্থান

কোশল। কাকী, আর বিবাহের সখ আছে ?

কাকী। সর্বনাশ ! যাতায়াতের খরচটাই বুখা গেল।

কোশল। একেবারে বুখা নয়, শিফাও হল অনেক।

উভয়ের প্রস্থান

বেতরাজ। কাকী, কোশল, আমাকে ছেড়ে চললে কোথায় ?

বেতরাজপত্নী। চূপ কর।

সাবিত্রী, সত্যবান, বেতরাজ ও বেতরাজপত্নী ছাড়া সকলের প্রস্থান

বেতরাজ। ছাড়ো বলছি।

বেতরাজপত্নী। দাঁড়াও।

সাবিত্রী। কোথায় যাচ্ছ ? নরকে ?

সত্যবান। সেখানেই তো আছি।

বেতরাজ ও সত্যবানের পলাইবার চেষ্টা। সাবিত্রী ও বেতরাজপত্নীর তড়া।

ক্রমে বেতরাজ ও সত্যবান নিপুঞ্জ হইয়া মুখিত হইল

সাবিত্রী। সখী, পুঙ্খবলো নিপুঞ্জ না হ'লে বশ হয় না।

বেতরাজপত্নী। মরবে তো না।

সাবিত্রী। আরে না। এই অবসরে আমি ওর গলায় মালাটি দিই।

সত্যবানের কণ্ঠে মালারান

সত্যবান। (মুচ্ছার ঘোরে) সাপ ! সাপ !

সাবিত্রী। সখী, চল এবার এদের নিয়ে বিবাহের যজ্ঞস্থলে দুই জনে যাওয়া যাক। সবাই অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করে আছে।

বেতরাজপত্নী। বেশ তো। আর বিলম্ব কেন ?

তখন উভয়ে নিজ নিজ মনোনীত ধর্মীকে অনায়াসে আড়কোলা করিয়া লইয়া প্রস্থান করিল। বিবাহ মণ্ডপ হইতে শব্দ ঘণ্টা ও হুগুমনি।

সমাপ্ত

আমি ও রমা

রমার সঙ্গে আমার আলাপ প্রথমে হয় একটা দোতলা মোটর বাসের একতলায়। এইভাবে—

কণ্ডাক্টর ভাড়া চাহিলে রমা মনিব্যাগ্ হইতে তাহার মধ্যস্থিত একমাত্র মুন্ডাটি বাহির করিলে পর দেখা গেল সেটা একটা আধুলি—এবং অচল। কণ্ডাক্টর সেটা ফিরাইয়া দিয়া আরেকটি—এবং সচল—মুন্ডা চাহিতেই রমার মুখ লাল হইয়া উঠিল। পরোপকার করিতে করিতে আমার হাত পাকিয়া গিয়াছিল। রমার অবস্থা দেখিয়া

তৎক্ষণাৎ আমার মনিব্যাগ হইতে পয়সা বাহির করিয়া ভাড়া চুকাইয়া দিলাম।

রমা কহিল, “থাক্‌স্‌। কী উপকারই যে করলেন আপনি।”

আমি কহিলাম, “এ আর উপকার কি? তাছাড়া এ ধরণের ইয়ে করা আমার একটা মন্ত বদ্‌ অভ্যাস।”

রমা হাসিল। কহিল, “ভাগিস্‌ আপনি fellow passenger ছিলেন! আধুলিটা যে এরকম সেটা জানা ছিল না। এর পর বাড়ী থেকে বেরোবার সময় পয়সা কাড়ি সব বাজিয়ে দেখে নেবো। তা যাক—আপনার addressটা কি বলুন তো?” পকেট হইতে কাউন্টেন পেন ও নোটবুক বাহির হইল। ঠিকানা ইত্যাদি দিলাম—কেননা জানিতাম যে দিতেই হইবে, স্তরং দেবী করিয়া লাভ নাই—কিন্তু বলিলাম, “কেন?”

“আপনার ঋণটা শোধ করে আসতে হবে তো?”

“ও, এইজ্ঞ!” এমনভাবে বলিলাম যেন এটা আমার জানা ছিল না—যদিও প্রকৃতপক্ষে এই উত্তরটাই আমি আশা করিয়াছিলাম।

আরো বলিলাম, “এ সামান্য ঋণ না শোধ করলেও অবশ্য আমি মনে করতাম না কিছু। কিন্তু এই ঋণশোধের ব্যাপারে যে আমার বাড়ীতে আপনি অন্ততঃ একবার পদার্পণ করবেন সেটা আমার পক্ষে কম আনন্দের কথা নয়।”

রমা কহিল, “দেখুন, আজকাল ছুনিয়াটা এমন dishonest হয়ে পড়েছে যে সামান্য ব্যাপারেও কাউকে বিশ্বাস করে নিশ্চিন্ত থাকা যায় না। বন্ধুদের ভিতরেও অনেকে এমন আছে যাদের ধার দিলে তারা মনে করে—‘গ্রহণ করেছি যত ঋণী তত করেছি তোমায়’, এবং এক ফলে তাদের কাছ থেকে সে পয়সা আর আদায় করা সম্ভব হয় না।

আমাকে আপনি কিন্তু এই ধরণের লোকের দলে ফেলবেন না। তাহলে ভারী দুঃখিত হবে।”

বাসের লোকগুলি হাঁ করিয়া যেন আমাদের গিলিতে চাহিতেছিল। আমি কয়েকদিন যাবৎ বেপরোয়ায় শিখিতেছিলাম—ইহাদের এই হাঁ করিয়া থাকাকে কেয়ারই করিলাম না।

কহিলাম, “ছি! ছি! ওরকম আপনাকে আমি মনে করিনি। কথখনো না। হ্যা, by the way, আপনার addressটা please!”

“যদি পাছে এই ঋণটা শোধ না করি?” একটু হাসি।

“ফের আবার ঐ পয়সার কথা? এরকম করবেন জ্ঞানলে আপনাকে আমি help করতুমই না। আপনার addressটা রাখা আমার এইজ্ঞে দরকার, যে আলাপ যখন হল তখন.....”

“হ্যাঁ হ্যাঁ, সে তো ঠিক। I knew you meant that. কিন্তু আপনি আমার address চান তা আমি বুঝেছিলাম আগেই। যেদিন-সুখী যাবেন—you'll be welcome, বুঝলেন?”

“নিশ্চয়।” বলিয়া ঘাড় নাড়িলাম। বাসের লোকগুলি হয় তো ভাবিল, পাতির জমাইবার আগ্রহটা দেখিতেছি অত্যন্ত বেশী! তা ভাবুক। তাতে আমার কি? কে কি ভাবিবে বা ভাবিল তাহা লইয়া মাথা ঘামাইতে গেলে ছুনিয়ার অনেক মহৎ কাজই করা যায় না।

রমা কহিল, “আপনি এখানে আমার পাশেই এসে বসুন না! বেশ আলাপ করতে করতে যাওয়া যাবে। আপনি কোথায় নামবেন?”

“কালীঘাট ডিপোতে।”

“বাঃ! আমিও যে তাই! What a coincidence! হ্যাঁ, আপনি কোন্‌ কলেজে পড়েন? কলেজে পড়েন তো নিশ্চয়ই।” কহিলাম, “তা পড়ি বটে।”

"I guessed right, কোন কলেজে? আপনি আগে এখানে আছেন, তারপর বলবেন।"

রমার পাশে রমার গা ঘেসিয়াই বসিলাম। প্রশ্ন করিলাম, "আপনি কোন কলেজে পড়েন?"

"সিটি কলেজ। সেকেন্ড ইয়ার আর্টস। লজিক, সিভিলিস, ম্যাথম্যাটিক্স—উঃ, ম্যাথম্যাটিক্সটা কি শক্তই যে লাগে! সিভিলিস জিনিয়টা যে এত dull তা আগে জানা ছিল না। আর—যাই বলুন না কেন—লজিকও বড় কম কঠিন নয়।...হ্যাঁ আপনি কোন কলেজ?"

"পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট, সিদ্ধান্ত ইয়ার ইংলিশ—'A' group।"

"উঃ! আপনার চেহারা দেখে কিন্তু কিছুতেই তা মনে হয় না! আচ্ছা, আপনার বয়স কত বলুন তো?"

"তেইশ বছর।"

"কিন্তু আপনার চেহারা দেখে আঠারো বছরের বেশী কেউ মনে করবে না। আমার বয়স কিন্তু এখন সাড়ে যোল বছর।"

"আপনাকে দেখলে মনে হয় আঠারোর কম নয়।"

"তবেই দেখুন, চেহারা দেখে বয়স ঠিক করতে যাওয়ার মতো বোকামী আর নেই। এই যে চিত্রচ্ছায়া। কি বই হচ্ছে? জন ব্যারিমোর ইন দি বিলাভেড রোগ? আচ্ছা, আপনি কি খুব বায়েস্কোপ দেখেন?"

"খুবও নয়, অখুবও নয়।"

That's good! অনেকের কিন্তু বিনী একটা নেশা থাকে। আমাদের ক্লাসের অনিমা রায়কে চেনেন?—না, আপনি কি করে চিনবেন! এই মেয়ে তো হস্তায় ছদ্দিন যাবেই বায়স্কোপে। By the bye কো-এডুকেশন সম্বন্ধে আপনার মত কি? আমাদের..."

এই কো-এডুকেশন জিনিয়টাকে আমি বরাবর পছন্দ করিয়া আসিতেছি। আমি যে-কলেজ হইতে বি-এ পাস করি সেখানে কো-এডুকেশন প্রচলিত ছিল, আছে এবং থাকিবেও বোধ হয়। সহ-শিক্ষার একটা বিশেষ ফল আমি লক্ষ্য করিয়াছি; সেটা এই যে তাহা আছে বলিয়াই বহু ছেলে ক্লাসে থাকে—না থাকিলে ইহাদের হয় প্রকৃতির সাহায্য নেওয়া দরকার হইত, অথবা percentage নষ্ট করিতে হইত।

চট করিয়া বলিয়া উঠিলাম, "আমি এ জিনিয়টা খুবই পছন্দ করি। আপনি?"

"আমিও। কো-এডুকেশন-ওয়ালা কলেজে ভর্তি হয়েছি। Co-education, co-travelling ইত্যাদি নানাভাবে আমরা co-operate যদি না করতে পারি, তা হলে as a nation আমাদের অনেক পেছিয়ে পড়তে হবে অস্বাভাবিক নেশনগুলোর তুলনায়। কি বলেন?"

আমি মাথা নাড়িয়া বলিলাম, "আমিও তাই বলি।"

রমা বলিল "As a nation জাপান কিন্তু ভারী উঠে গেল, কি বলেন? জিনিয়পত্র যা শস্তা দিচ্ছে! উঃ!"

হঠাৎ চমকাইয়া উঠিলাম। রমা কি হঠাৎ বাথা পাইল? পরে বুঝিলাম এই 'উঃ' ব্যথার আর্ন্তনাদ নহে—জাপানের অভ্যাসার্থ্য শস্তায় জিনিয়পত্র বিক্রী করার বিষয়-প্রকাশক অব্যয়।

রমা বলিতে লাগিল, "কিন্তু জাপানীরা ভালো গায়ে সেবার সাবান এখনো দিতে পারলে না বাজারে। আমি বিলিতি use করি, আপনি?"

সাবান আমি ব্যবহার করি না। আমার গায়ের রং এত পাকা যে সাবান ব্যবহার করা বুঝা। তবু বলিলাম, "আমিও তাই।"

“বাঃ!” রমা বলিল। “গন্ধটা মন্দ নয়। কি বলেন?”

“কিসের গন্ধ মন্দ নয়?”

“বিলিতি সাবানের! আচ্ছা-লোক যাহোক আপনি।”

রমা হাসিয়া উঠিল। আমি অপ্রস্তুত হইলাম—অর্থাৎ হইতাম, কিন্তু—এ যে একটু আগেই বলিয়াছি—কিছুদিন যাবৎ বেপরোয়ায় অভ্যাস করিতেছিলাম। বাসের লোকগুলির মুখের দিকে একবার তাকাইয়া দেখিলাম। সবাই যেন আমাদের আলাপ উপভোগ করিতেছে মনে হইল। তা করুক। তাই বলিয়া আলাপ বন্ধ করিব নাকি?

“বাড়ীতে আমি কিন্তু জাপানী চটিজুতো use করি—রবারের সোল, ভেলভেটের কাপড়ের ছাউনি” রমা বলিল, “এত আরাম লাগে যে শোবার সময়ও ঐ চটি পায়ে দিয়েই শুতে ইচ্ছা করে। আপনি?”

“আমি কি?”

“বাড়ীতে কি রকম জুতো পরেন?”

“বাড়ীতে জুতো পরি না।” থোলাখুলিই বলিলাম। ভাবিলাম, মিথ্যার বোঝা বুঝা বাড়িয়া লাভ নাই।

“বলেন কি? আমাদের বাড়ীতে সবাই পরে। আমার ছোট ভাই জীবন—পাঁচ বছর বয়স—সেও আমার মতন জাপানী চটি পরে। আমার পরতে দেখে ওরও মথ চাপলো পরতে—বাবা দিলেন কিনে।”

ইহার পর আমার কি বলা উচিত ঠিক বুঝিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। রমার গায়ে দামী আতরের মন-মাতানো গন্ধ—এটা আগে অতটা খেয়াল করি নাই, এবারে করিলাম। তাহার বা হাতের সর্ক ফর্সা কঙ্কীতে একটা কঙ্কী-ঘড়ি, সেটার দিকে খানিকক্ষণ তাকাইয়া

রহিলাম। মোটর-বাস আপন মনে এসপ্যান্ডেড ছাড়াইয়া হু হু করিয়া চলিয়াছে। মন্দ লাগিতেছিল না।...

কালীঘাট ডিপোতে আসিয়া হুজনেই নামিলাম।

রমা কহিল, “কি এক মজার উপায়ে দুজনে আলাপ হয়ে গেল বলুন তো! একথা অনেক দিন মনে থাকবে।”

একটু হাসিয়া বলিলাম, “চিরদিন মনে রাখলেই বা ক্ষতি কি?”

“মোটাই না।” রমা বলিল। “মনের ট্রেজারে পুঁজি করে রাখবার মত এ একটা ট্রেজার। আপনার এই উপকারটুকুর monetary value অবশ্য হু’ আনা মাত্র, কিন্তু এর রীয়ায় ভালু তার চাইতে ঢের বেশী। আচ্ছা, এবারে তাহলে নমস্কার। বাড়ীতে আবার একটা টি-পার্টি আছে কি না! কাল মরনিঙেই আপনার ওখানে যাবো। গুড বাই।”

পরদিন ভোর বেলা এক বেটে হিন্দুস্থানী চাকর আসিয়া আমার নামলেখা একখানা থাম দিয়া গেল। খুলিয়া পাইলাম একখানা ছোট চিঠি এবং একটা হু’-আনি।

চিঠিখানা এই :—

মাই ডিয়ার মিষ্টার বোস,

কালকে আমার যে উপকার করেছিলেন, তার জন্য আবার আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভেবেছিলাম আজ ভোরে আমি নিজেই যাবো। কিন্তু লজিকের নোট নিয়ে busy হয়ে পড়ায় যেতে পারলুম না, এজ্যে মাপ করবেন, হু’ আনা এই সঙ্গে দিলুম। ইতি। বিনীত

শ্রীরমাকান্ত বটব্যাল।

কিছুক্ষণ পরে বুঝিতে পারিলাম, হু’ আনিটি সীসার।

(শ্রীঅরুণ)

পৃথিবীর পাগলামি

একসঙ্গেই Tachkent-এর দিকে যাত্রা করা হল; লেখক Turk-Sib-এর ট্রেনের যে ক্লাসে চড়লেন, তাকে 'কঠিন' ক্লাস বলা চলে; এ ক্লাসে খালি রাশিয়ানরাই ভ্রমণ করে থাকে, কদাচিৎ কোন বিদেশীই এতে চড়ে। রাশিয়ান ট্রেনের প্রতি কম্পার্টমেন্টে চার জন লোকের স্থান; প্রতিজনের জন্যে একটা লম্বা বেঞ্চ, সেটা বিছানারও কাজ করে। দুই কব্জি * দিলে prowodnik অর্থাৎ গাড়ীর কন্ডাক্টরীর কাছ থেকে তিন রাজের মত একটা তোষক, একটা বিছানার চাদর, একটা লেপ (বা ঐ ধরনের একটা কিছু), একখান ভোয়ালে এবং একটা বালিশের খোল *। Prowodnik এসব জিনিষ সীল করা খেলের মধ্যেই পায়, কাজেই এসব জিনিষ যে পরিচ্ছন্ন ও অব্যবহৃত, এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই; কিন্তু হলে হয় কি, ছাফখলিনের গন্ধে প্রাণ জাহি জাহি করে। সর্বত্রই, রেলের স্টেশন সমূহে, গরম জল পাওয়া যায়, কাজেই দিনে দশবার চা পান করা দিবা চলে। ছ'দিন ধরে এই ভ্রমণ পর্যায় চলে, তাই গাড়ীর মধ্যেই বাড়ী করে নিতে হয়।

গাড়ীতে যখন চড়া হল তখন সেটাতে ছ'টি মহিলা আগেই উঠে বসে আছে। এদের একজন যুবতী, শিক্ষয়িত্রী আরল সাগরের কাছে কোনস্থানে কাজে যাচ্ছে, আর একটা Alma Atar এক কৃষক রমণী। এই রমণী লেখকদের ওঠবার সময় কাপড় ছাড়ছিল, কোনও রকম লজ্জা না করে। গরম হচ্ছিল, তাই।

* এক কব্জির দাম, দশ রু। অর্থাৎ প্রায় দেড় টাকা।

+ বালিশ ধরে নিয়ে বেড়াতে হয় না, গাড়ীর মধ্যেই তা থাকে, বেকের ওপরে। তবে ওঘাড় দিয়ে নেওয়াই ভাল।

প্রতি কম্পার্টমেন্টেই মেয়ে পুরুষ একসঙ্গে যেশান। এ বিষয়ে কেউই কিছু সমালোচনা করে না। লেখক এক গাড়ী থেকে অন্য গাড়ী (গদি ওয়ালা গাড়ী—padded class, অর্থাৎ wagon lits, যাতে সাধারণতঃ বিদেশীরাই ভ্রমণ করে) পর্যন্ত গেছেন, সেই সময়ে এক গোলমাল শুনেতে পেলেন। একজন আমেরিকানকে একটা কম্পার্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে, যাতে একটি রাশিয়ান যুবতী ছাড়ীও আছে। যুবতীর এতে কোন আপত্তি নেই, কিন্তু আমেরিকান চায় একটা পুরুষকে যাত্রার সঙ্গী করতে।

ট্রেনের গার্ড অনেক বোঝাতে লাগল, যে মেয়ে পুরুষে কোন পাখ কা নেই; মেয়েকে আলাদা রক্ষা করবার কোন দরকারই নেই, কারণ মেয়ে স্বাভাবিক করতে জানে এবং প্রতি মধ্যবিন্ত লোকই যথেষ্ট পরিমাণে ভয়। কাজেই, মেয়ে যদিও এক ঘরে থাকে, তার অত্যাচারিত হবার কোন ভয় নেই, অতএব মেয়ে-পুরুষ পৃথক করার কি দরকার? কিন্তু চোর না শোনে ধর্মের কাহিনী, সব বাক্যব্যয়ই বুধা হল; আমেরিকান, মহিলার বদলে একটি পুরুষের সঙ্গে থাকতে চায় একথা ছাত্রীর সামনে স্পষ্টই বলেলে। ছাত্রীর পক্ষে এ ব্যাপার বড়ই বিরক্তিকর। Militia man-এর দরকার এই গোলমাল থামাতে, সমস্ত গাড়ীময় যেন revolution ভীষণ গোলমাল। অবশেষে সব ঠাণ্ডা! আমেরিকান রাশিয়ান যুবতীর সঙ্গে থাকতে বাধ্য হল। স্বন্দরী যুবতী তো বনবিড়ালের মত তীব্র দৃষ্টি দিয়ে আমেরিকানকে দৃষ্ট করতে লাগল। তার কাছে আমেরিকানের এই ব্যবহার বাস্তবিকই দুর্বোধ্য।

লেখকের কম্পার্টমেন্টের শিক্ষয়িত্রী তার বিছানার উপর অর্ধশায়িত; পাখজামার কোট তার যৌবনোদ্ভূত বক্ষের উপর খোলা। চুপীর মত

হৃদয় ঠোটটুকু অর্ধমুক্ত; নারী স্বাধীনতা এবং হৃদয়। দেখে মনে হল যে যুবতী যেন একটু nervous, যেন কোন প্রেমের উপভাসই তার এই চকলতার কারণ। কিন্তু তাতো নয়, রাজনীতিই তার এই মানসিক চাকল্যের কারণ। যুবতী যে বই পড়ছে তার নাম হচ্ছে, Union of the Proletariats of the West with the Oppressed People of the East."

কৃষক রমণী সামনেই নিমিত্রিতা, জাহুর উপর পর্যাপ্ত অনাচ্ছাদিত তার দেহ এবং খুব জোরে জোরেই তার নিখাস-প্রশাসের ক্রিয়া চলছে। শিক্ষয়িত্রী কৃষকরমণীর দিকে তাকিয়ে, সে কোন গ্রামে আগে কাজ করত তাই বললে। গ্রামের নাম উগুদাই; সেখানে তার কাজ ছিল, ঐ কৃষকরমণীর মত আরো শত শত গ্রাম্য নারীর সঙ্গে সংগ্রাম করে বুঝিয়ে দেওয়া, যে তার উপর বিশ্বাস করে তারা তাদের সম্ভাবনার স্থলে পাঠানোর জন্য অনায়াসেই ছেড়ে দিতে পারে। শিক্ষয়িত্রী দীর্ঘ নিখাস ছেড়ে জানালে, কেমন করে একদিন 'লোকাল সোভিয়েট' এক গ্রাম্য গাঁড়িতে তাকে তিন দিন ধরে 'ষ্টেপী' পেরোতে এবং গ্রামের প্রবেশ-পথে ঘোড়ার এক চামড়া, (গ্রামবাসীদের যা fetish,) তাই অভিমান করতে বাধ্য করেছিল।

খুবই বন্ধুত্ব হল সেই শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে লেখকের, যিনি দশ বছর জার্মালিজম করে সমস্ত enthusiasm, ideal, বিশ্বাস প্রভৃতি হারিয়ে ফেলেছেন। প্রেম বলা চলে কি? না, এই এসিয়াটিক রাশিয়ার কমিউনিষ্ট যুবতীরা এ খাতে তৈরী হয়নি, এদের প্রেম করার সময় নেই। এদের জন্য আলাদা জগতের সৃষ্টি হওয়া দরকার। কখনও

কখনও এদের রক্ত ফুটে ওঠে বটে এবং এরা তাদের টাটকা অস্পষ্ট যৌবনোদ্ভূত দেহ বিলায়ও বটে, কিন্তু এদের হৃদয়, এদের মস্তিষ্ক, এদের স্পিরিট, সবই সেই revolution-এর জন্য সজ্জিত থাকে।

Tachkent-এর administrations সমস্ত মধ্য এশিয়ার উপরই কর্তৃত্ব করে। সেখানে একদিন, তার পরেই আবার Turk-Sib—এখানকার রেলওয়ে টার্মিনাসে আসার আগে অনেকখানি ঘোরা পথেই আসে। Tachkent থেকে Stalinabad-এর সোজা দূরত্ব তিনশো পঞ্চাশ কিলোমিটার *। কিন্তু মাঝে চার হাজার মিটার উঁচু পাহাড়। কাজেই এরোপ্লেনকে অনেকখানি ঘুরতে হয়, যার দূরত্ব হয়ে পড়ে ন'শো ত্রিশ কিলোমিটার; রেলওয়েও তার করতে বাধ্য হয়, কিন্তু তার থাকের দূরত্ব প্রায় ষোল শো কিলোমিটার গিয়ে পড়ে।

কিছুক্ষণ ধরে গাড়ী Tachkent-এর মরুত্বানের পাশ দিয়ে চলল; সমস্ত গাড়ী যুঁই কুলের গন্ধে মাং মাং হয়ে উঠল। এর পরেই আবার যে কে সেই, ধূ ধূ করা মরুভূমি। রেলের ছধারে বোনা খড়ের উঁচু বেড়া, 'ষ্টেপী' বাত্যা থেকে রেলকে রক্ষা করবার জন্য। রেলের ধারে Tourtes সব দাঁড়িয়ে; ষ্টেশনের দিকে যত এগিয়ে যাওয়া যায়, ততই এদের ঘনসমষ্টি দেখা যায়। এসব হচ্ছে নিঃসঙ্গ বেদেদের সাবেক পদ্ধতির কুটীর; কিন্তু এই বেদেরা রেলকে বড়ই ভালবাসে। এরা তাই ছুটে আসে ভেঁড়ার ছধের পানীর বদল করতে, চাঁর সঙ্গে, ষ্টেশনে ষ্টেশনে।

গত হাজার বছর ধরে পৃথিবীর সমস্ত জিনিষই যত গদাইলন্দর

চালে চলছে, আগামী দশ বৎসরে সে সকলের ক্রমোন্নতি তত ক্ষতভাবেই হতে থাকবে।

Turk-Sibএর সব ষ্টেশনই মসজিদের ধরণে তৈরী, রেলের শেষ ষ্টেশন পর্য্যন্ত। এ সব ষ্টেশন শহরের বাইরে বাইরে অবস্থিত; কোন লোকই কষ্ট করে প্রবেশদ্বার দিয়ে ষ্টেশনে ঢোকায় বা বাইরে যাবার পথ দিয়ে বাইরে যাবার আবশ্যক বোধ করে না; সকলে, যার যেমন খুশী, যেখান সেখান দিয়ে ষ্টেশনে ঢেকে এবং ষ্টেশন থেকে বাইরে যায়। আরো মজা এই যে, রাত্তায় চলতে চলতে দেখা যায় লোকে দিবা ভাঙ্গা মুরগী বা ডিম বা ryeএর তাড়ি (Kwas) খেতে খেতে চলছে। আবার দোকানদার যখন তার হাতপাখা অর্থাৎ মাছি-তাড়ানোর বস্তুটি (chasse-mouche) ঘোরাতে থাকে, তখন টুকরীর উপর আপাতদৃষ্টিতে যেটাকে একটা কাল ঢাকনী বলে মনে হয়, সেগুলো উড়ে গিয়ে ধাতব দ্রব্যের মত চকচকে সব ফল, পীঠ, অপেল, চেবী, আপ্রিকট প্রভৃতি দেখা যায়। এমনি মাছির উৎপাত!

ষ্টেশনের সর্ষপেক্ষা নিকট বাড়ী প্রায় সর্বদাই একটা সরাইখানা হয়ে থাকে। তার জানালা সর্বদাই খোলা থাকে, কারণ বাইরের ধূলি ও উত্তাপ, ঘরের ভিতরকার ধূলি ও উত্তাপের তুলনায় অনেক কম ও শীতলতর। পাটীলের ধারে ধারে কার্পেট বিছান বসার আস্তানা। তার উপর চাঁৎকার-করে-কথাবার্তা-কওয়া পুঙ্খ, ঘোমটা-দেওয়া রমণী, কাপ-মাথায়-দেওয়া বাচ্ছা ও অসুত্তরকমের সব বৌচকা-বুঁচকি। এদের কথাবার্তা, খাওয়ার ধরণ, চাপান এবং জীবনধারণ অবিকল একটা রাশিয়ান ওয়াগনের ভিতরকার মত। এখানে—এই ঘরে বা এই সরাইখানায় লোকে এগিয়ে চলতে জানে না। এই সমস্ত লোক, যার।

বাইরে তাকিয়া হেলান দিয়ে বসে, রেলের টিকিট বা একখানা টাইমটেবল আগে থেকে কিনে রাখার ধারণাই রাখে না কিংবা ট্রেনের কনস্পনডেনসের কোন খবরই রাখে না। এরা ভাবে, কেবল আল্লাই এ খবর রাখেন, কখন ধাতব ঘোড়া ধুমোদীপ্ত করতে রকতে ধ্বারা পর্য্যন্ত ছুটে আসবে। অদৃষ্টই কেবল বলে দিতে পারে, কোন দিন তাদের টিকিট কাজে লাগবে। কাজেই, চাপান করে অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় কি! ট্রেন আসে, ট্রেন যায়; ঘটার ধ্বনি, হুইলের আওয়াজ শোনা যায়, কিন্তু এই অপেক্ষাকারীদের চকল করতে পারে না। আল্লার কাছে হাজার বৎসর ঠিক একটা দিনের মত; অতএব আর এক হুন্সা দৈর্ঘ্য ধরে থাকায় ক্ষতি কি?

এই অসুত জগৎ থেকে বেরিয়ে, লেখক এরোপ্পেনে, এই ইগাষ্টীয়াল সাম্রাজ্যের অপর সীমা, সৌহ-ইম্পাতের দেশ সেই Swerdlowsk ও Magnitogarskএর দিকে আসেন; এ স্থান সাইবেরিয়ান ইগাষ্টীয়াল ট্রেইস-এর ঠিক হার্টের উপর যার অফিসিয়াল নাম হচ্ছে U. O. K. অর্থাৎ Union Oural Kusnetzki। ট্রান্স-সাইবেরিয়ান লাইনের Ufaর কাছাকাছি থেকেই খনিজ বস্তুর উৎখাদন প্রায় আরম্ভ; Magnitogarsk ও Swerdlowsk এর কেন্দ্র। পাশাপাশি পটাশিয়াম-পূর্ণ জমির উপর এক বিরাট রাসায়নিক ইগাষ্টীর স্থান; এর কেন্দ্র হচ্ছে Solikamsk।

এখান থেকে প্রায় ছ হাজার পাঁচশো কিলোমিটার দূরে, কলয়ার সব খনি দেখা যায়, যাদের কেন্দ্র হচ্ছে Kusnetzki। এই দুই স্থানের অন্তর্ভুক্ত স্থানে বড় বড় পেট্রলের কুপ খোঁড়া হয়েছে; Turk-Sibএর রেলওয়ের ধারে ধারে এমন পিতলের খনির স্তর

পাওয়া গেছে, যার শেষ নেই। রাশিয়ার উত্তর পূর্বাঞ্চলে Wjatkar নিকটে অনেক phosphorus পাওয়া যায়। এই সব স্থানের মধ্য দিয়েই বেগবতী শ্রোতৃবতী সব প্রবাহিতা, যাদের কোটা কোটা কিলো-ওয়াট শক্তি এখনও পর্যন্ত কাজে লাগানোই হয়নি।

জাখানির কুড়ি গুণ বড় বিশাল সাম্রাজ্য নিয়েই U. O. K.র ভিত্তি। রাশিয়ার পণ্ডিতরা বুঝতে পেরেছেন, এই যে এক স্থান থেকে অল্প স্থানের দূরত্ব, এটা দূর করতে হলে নতুন উপায়ে কাজ করতে হবে। এই কারণেই এবং এই অর্থ নৈতিক প্রয়োজনীয়তার জন্মই, এখানে সব strategic রেলওয়ে তৈরী হচ্ছে বা খালি মালগাড়ী যাবার রেল তৈরী হচ্ছে, যার উপর দিয়ে দৈত্যের মত বিরাট ইলেক্ট্রিক ইঞ্জিন-টানা বিশ টনের আমেরিকান ওয়ানগন যাতায়াত করে।

সমস্তটাই ধাতুতে তৈরী এমন সব এরোপ্লেন ধুলার উপর দিয়ে শুষ্ক ও উত্তপ্ত আকাশে উড়ছে; উত্তাপ তখন হয়তো যাট ডিগ্রী হতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও ক্যাবিনে লোমের লাইনিং দেওয়া overalls সব ঠিক ব্যবহারের জন্মে তৈরী, aviator-এর এসব পোষাক বৈদ্যাতিক উত্তাপে উত্তপ্ত হয়। এ সর্বের কারণ হচ্ছে এখানে যাট ডিগ্রী উত্তাপ বটে, কিন্তু উরাল পর্বতে তখন হয়ত শূন্যের ত্রিশ ডিগ্রী নীচে টেম্পারেচার নেমেছে, কে জানে!

সমস্ত রাশিয়াতেই টেম্পারেচারের এই দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থা; কখনও বা উপকাল দেশের উত্তাপ, কখনও বা রাশিয়ান প্রান্তরের হিমকরা স্বভাৱ। এ সমস্তই কেবল একটি দেশের মধ্যেই, যেখানে শতাদিক পৃথক পৃথক জাতি বাস করে।

ঠিক নিয়মমতই এরোপ্লেন টেপীর বা অরণ্যের উপর, পর্বতের বা উচ্চ উপত্যকার উপর দিয়ে ওড়ে। নীচে সবই মরুভূমি; মরু কেবল এরোপ্লেনের ছায়া যা অতি দ্রুতই জমির উপর দিয়ে পিছলে চলে।

এরোপ্লেন নামানো হল, কারণ দুজন নতুন প্যাসেঞ্জার উঠল। একজন নতুন পাইলটও উঠল, যে ব্যক্তি আগের পাইলটের মতই 'লাল' সৈন্যদলের এরোপ্লেন চালক।

নিয়ে পার্শ্বতা প্রদেশ ক্রমশই মরুভূমির মত হতে লাগল। মেঘের স্তর, কুহাটিকা ও শীত দেখা গেল। 'মোটর' আরো উচ্চতে ওঠানো হল, বিপরীত বায়ুর বেগে এরোপ্লেন ছলতে লাগল। লেখকের মনে পড়ল তাঁর প্রথম বায়ু-যাত্রার কথা, যখন তিনি একটা ছোট প্লোটারিং এরোপ্লেন করে চীনদেশে যাচ্ছিলেন, এবং তখন উরাল পর্বতের ভীষণ ঝড়, জল, কুয়াশা, শীতের সঙ্গে তাঁদের কেমন সংগ্রাম করতে হয়েছিল। এ ব্যাপার ঘটেছিল ১৯৩১এর নভেম্বরে, যখন মালুরিয়ায় প্রথম যুদ্ধ বেধে উঠল। সে সময়ে কেবল দৈবক্রমেই! Swerdlowskএর industrial regionএর উপর দিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, এবং তখন এরোপ্লেনকে মৃত্তিকায় বাধা হয়েই অবতরণ করতে হয়েছিল।

আবার এবারেও কুয়াশায় এরোপ্লেন ঢাকা পড়ল, কিন্তু এবারে কোন বিপদের আশঙ্কা নেই; পেট্রলের রিজার্ভ সব ভর্তি, বেতারযন্ত্র সম্ভ্রম। প্রথমবার ভ্রমণের সময়, বেতারযন্ত্র অকাজে হয়ে পড়েছিল, সমস্ত পেট্রলের টিনই খালি হয়ে গিয়েছিল এবং আগেকার এরোপ্লেনের শক্তি এই আজকের 'মোটরের' শক্তির প্রায় এক তৃতীয়াংশ মাত্র ছিল। তাছাড়া পাইলট Banerএর কোন ধারণাই ছিল না, এটা

কোন স্থান। আজ সেই একই স্থানের উপর দিয়ে যাওয়া হচ্ছে; এবং লেখকের মনে পড়ল, কি বিপদের মধ্যে দিয়েই তাদের দিন গেছে প্রথমবার। ঘন কুয়াশা যেন ধোবীখানার (buanderie) মির্গত বাষ্পের মত। দূসর রংয়ের পদ্মার মধ্যে একটু আলোও নেই যে মাটি পর্য্যন্ত নজর চলে; ঠাণ্ডা যেন হাড় পর্য্যন্ত প্রবেশ করছে।

কিন্তু শীঘ্রই এই ছুঁধোঁগের কথা ভোলা গেল; চোখের সাননে আধুনিক প্রণালীতে সজ্জিত নানারকম সংকেতওয়ালা aviation এর জমি ভেসে উঠল। অবতরণ করা হল। Gue'pe'on * —তারপরেই কাগজপত্র পরীক্ষায় কড়াকড়ি। এখন লেখক Trans-Siberie এর Wjatkaতে। এখানকার রাসায়নিক অব্য প্রস্তুতের কারখানা দেখা হল। বিরাট কারখানা, সবে তৈরী হয়েছে। এর পর অটোয় চড়ু ক্ষত ফেরা হল, কারণ ট্রেন ধরতে হবে।

এবারেও সেই একই রেলপথে, যা মস্কোর সঙ্গে চীনদেশকে যুক্ত করেছে।

লেখক, জিস্কা

অনুবাদক, শ্রীতরুণ ঘোষাল, প্যারিস

* অর্থ্যাৎ G. P. U. রাশিয়ার গুপ্তচর-বিভাগ।

পারী-শহরে

পারীতে ঘোড়ার মাংসের দোকান দেখে বুঝলাম, সত্যিই ইউরোপে লোকে ঘোড়া পায়!

দেশে ভাগাড়ে 'ঘোড়া পড়লে শৈশবে মাকে দেখেছি ভীতিবিস্মল হয়ে উঠতে—এবার যত সব শেয়াল-কুকুর ক্ষেপে যাবে। ঘোড়ার মাংস খেয়েই নাকি ওইসব প্রাণী মানুষের আতঙ্কের হাত থেকে মানসিক অব্যাহতি পায়, আর জলাতঙ্কের তাড়নে তারা মানুষকে ভাড়া করে।

মাংসের দোকানের সামনের দেয়ালটা সমস্তই কাচের, সে কাচের আড়ালে বিমুক্ত-চন্দ্র ঘোটক টাঙানো রয়েছে, দলে দলে সাহেব মেম এক এক টুকরা সংগ্রহ করে' গৃহে ফিরছে।

বাগ্ম-ব্যাপারে ইউরোপীয়গণ কি ভীষণ অঘোরপন্থী! ধূলিমলিন বৈশাখী বৈকালে উপাদেয় উপকরণ বোবাজারের পোটলা-বাঁধা ছানা যে-সাব্বিক ব্রাহ্মণের অকৃতিকর হয় না—ঘোড়ার মাংস এমন করে কাচের দেয়ালের আড়ালে টাঙিয়ে রাখতে দেখলে তাঁর বিস্মিত হবারই কথা। লুটজ বলেছিল, ঘোড়ার মাংসের দোকান দেখেই ভূমি বিস্মিত হচ্ছে, মাই গড্! যুদ্ধের সময় জাৰ্মানিতে খরগোস বলে' আমাদের পাতে বেড়ালও চালিয়েছে, রেস্তোরাঁর অর্থগুণ মালিকরা!

যুদ্ধের সময় লুটজ-এর বয়স ছিল বছর ছয় কি সাত। সারা বালা-কৈশোর যে ক্রচ্ছসাধনের পথে তার কেটেছে, যুদ্ধের পরবর্তী

সময় আত্মানির সকলেরই সেই দশা। পরাজয়ের মানি মুছে ফেলতে আত্মানিকে যে-দুঃখ স্বীকার করতে হয়েছে, তার তুলনা হয় না।

বাইশ-তেরিশ বছরের যুবক লুইজ—পিতা তার বালিনের কোন ব্যাকের ডিরেক্টর, লুইজ দেশ ছেড়ে চলে এসেছে পারী শহরে—পিতার সঙ্গে তার জীবনের আদর্শগত মত-বৈষম্য হয়েছে।

পায়ের জুতোজোড়া ছিঁড়ে গিয়েছে, অঙ্গের পরিচ্ছদ ধোয়ানোর অভাবে মলিন, পয়সার অভাবে পেট ভরে' খাওয়াই জোটে না, তবু সে বালিনে ফিরে যাবে না, পারীর ইউনিভার্সিটিতে নাম লিখিয়েছে—একটা ডক্টরেট নিয়ে নেবে, বাকি সময়টা জীবনের আদর্শটির জন্য কাজ করে' চলছে।

ছটি বছর লুইজএর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে,—সেই অস্বাস্থ্য তপস্বী, কোঁকের মাথায় ছদিনের জন্যে কুচ্ছ সাধনা নয়।

লুইজএর কথা এত করে' বলছি, তার কারণ লুইজ একা নয়—ওদেশের ছেলের দলের স্বভাবই এই। এদেরই ছ একজন ছটকে বেরিয়ে এসে আমাদের এখানে 'অবাক করে' দেয়—এভারেস্টে চড়ার চেষ্টা রেখিয়ে অথবা হালকা একটা নৌকায় একা সাত সমুদ্র পার হয়ে এসে। শেষের এরা ধুমকেতুর মত প্রচণ্ড বিস্ময়—কিন্তু এদের অস্তিত্ব লুইজএর মত স্বাধীন জীবনীশক্তি নিয়ে অলস নক্ষত্রের মত দেশস্বত্ব মাহুয়গুলোর মধ্যেই সম্ভব।

ফরাসীরা ব্যাং খায়, ঘোড়াও খায়। দনীরা আদর করে ব্যাং খায়, ব্যাং বড় মহার্য, আর দরিদ্র যারা, মুরগী অথবা ভাল বীক যথেষ্ট কেনবার পয়সা সংস্থান করতে পারে না, তারা ঘোড়ার মাংসকেনে।

রাঁচী অঞ্চলের ভারতবাসীকে মেখেছি ভাগাড়ে-মরা গো-মহিষের মাংস কেটে নিয়ে যাচ্ছে রন্ধন করে' খাবার জুগে। বিহারের মিস্ত্রি-কুলি প্রভৃতির কাজ করে, অল্পস্বল্প লেখাপড়াও জানে এমন অনেক হিন্দুর ছেলে সাপ-ইঁহুর খায়।

সভাতার মাপকাঠি কোন আতি, কোন লোক কি খায় তা' দিয়ে নয়—'কি খাওয়া উচিত' এটা কি ভাবে নির্দিষ্ট করতে পেরেছে, আর সেই আদর্শের পন্থায় কি ভাবে চলছে, তারই বিচারে।

ফরাসীরা প্রচুর মদ খায়—বাঙালীরা যেমন প্রচুর ভাত খায়। যজ্ঞ ও। পানীয় হিসাবেই খায়, দেশের কৃষিজাত আড়ুর থেকে ইতরী। দেশময় কৃটির দামের সঙ্গে মদের দামও বেঁধে দিয়েছে।

বিদেশী মোসাক্ফির যখন পারী শহরের রেল ষ্টেশনে নামে, হাসি-মুখে কুলি তাকে অভ্যর্থনা করুর, মুখে মদের গন্ধ, মেজাজ সত্যত মশগুল। মাতলামি নেই, কাজেও কোন ভুল নেই।

আড়ুরের মীজ্ঞ-এ পাড়াগায়ে চাষারা দেশায় একদম বিভোর—তবু আমাদের দেশের ও শ্রেণীর লোকের মত গাঁজার দমে চণ্ড নয়। সত্যত নিজের কাজ করছে, অযোগ্য পেলেই দল বেঁধে নাচ গান! রাস। অক্ষরস্ব মজের ভাণ্ডার খোলা পেয়েও তারা 'হিন্দু-মুসলমান রায়ট' সৃষ্টি করে' অকারণে মাথা-ফাটাকাটি কমই করে।

পারী শহর তা' ক্ষুদ্রির গদ্বর্ক-রাজ্য—বিশেষতঃ মুন্ড বিদেশী যাজ্ঞীদের কাছে। ফরাসী গভর্ণমেন্ট এ বিষয়ে ভারী চতুর। সর্ক-প্রকার "আম্যাজমেটের" উপর দেবার ট্যাক্স রসিয়েছে—ছলাকলা পটীমসী নটার সীলা দেখতে 'ক্যাজিনো ছ পারী', 'ফলি-রায়জার', প্রভৃতি বিভিন্নতর কলা-নিকেতনে বিদেশীদের কী ভিড়!

সাধারণ মানুষ ইন্ডিয়-বিলাসের জ্ঞাত কল্পনায় যা' ভাবতেই পারে না, পারীর এই সব আড্ডায় তার চরম উৎকর্ষ।

মজা এই যে, আমাদের দেশের ভদ্র বঙ্গলনাও পারী বেড়াতে গিয়ে এ সব স্থানে পদার্পণ করে' আসতে ভুলে যান না। এদেশেও বারাকানা-নিকেতনে গোপনে পুরুষ অনেকে যান, ওদেশে গিয়ে তাঁরা আর অতটা লুকাচুরির প্রয়োজন বোধ করেন না। তবে বঙ্গলনাকে সে-সব স্থানে যেতে দেখলে একটু ন্তনত্ব, ঠেকে। তাঁদের মধ্যে কেহ কেহ এসব স্থানের বিবরণও বাংলা মাসিক পত্রিকায় সম্প্রতি লিখেছেন, যদিও সেই সব স্থানে 'জন ছয়েক' বাঙালী ছেলে দেখে মনঃক্লম হয়েছেন, তাও লিখে ফেলতে ভোলেন নি।

পারী শহরে এই সব বহিজীবনের অন্তরালে ভদ্র ফরাসী গৃহস্থালী দেখলে, তার শাস্ত পবিত্র স্পর্শ পেয়ে বেশ দ্ব্যতনে পারা যায়, জাতির সত্যিকার মেরুদণ্ড কোনখানে। গৃহকর্ম-নিরতা ফরাসী গৃহিণীকে দেখলে মধ্যবিত্ত বাঙালী অন্তঃপুরলক্ষীর কথাই মনে পড়ে, বাইবেল হাতে বর্ম্মায়সী, গঙ্গাঘাটে পট্টবস্ত্রে হিন্দু নারীরই রূপান্তর মাজ।

ফ্রান্স জিয়ান্ দার্কের- (Jeanne d'arc) মত মহীয়সী নারীর জন্মভূমি,—এদেশের নারীর গর্ভে শত শত বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, পণ্ডিত আর সৈনিক জন্মেছেন, পারী শহরের কলুষিত পল্লী মৌমাঠ দেখে ভুললে চলবে কেন?

কলকাতায় এসে চিৎপুরের রাস্তা দেখে যদি কোন জাপানি বা ইরানী বাঙালীদের বিষয় একটা ধারণা দেশে বহন করে নিয়ে যায়, এও তেমনি, কলমের জোর থাকলে, চাই কি মিস্ মেয়োর মাদার ইণ্ডিয়ার মত বইও, পারী শহর সম্বন্ধে লিখে ফেলে নামজাদা হওয়া যায়।

সিনেমা বা সংবাদপত্রে যা প্রকাশিত হয় তা' সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবিক বলই তার মূল্য—এ কথা এদেশের সম্বন্ধেও যেমন পাটে, পারী সম্বন্ধেও তাই।

ভাইভোস' সাধারণ জীবনযাত্রায় আজও নাড়া দেয় সেখানে, তাই ভাইভোসের সংবাদ কাগজে প্রকাশিত হয়। একপতি-গত-প্রাণা রমণীর অভাব ফরাসীদের মধ্যেও নেই। আমাদের যে-সব শ্রেণীর লোকের মধ্যে নিকা বা তালাক স্থপ্রচলিত তাদের প্রাধান্য দিয়ে কি হিন্দুস্থানের সভ্যতার পরিচয় দেওয়া হতে পারে?

দেশে দেশে মানুষ ত' একই—অবস্থা বৈষম্যে যে পার্থক্য সেইটুকুই শুধু তাদের চরিত্রে প্রতিকলিত। দারিদ্র্যের পীড়নে আমাদের দেশে যারা ছুঁতো খেতেই পায় না, তারা নোংরা জীর্ণ কাপড় পরে' থাকে—নির্বোধ ধনী নাক সিঁটকায়,—কি অপরিচ্ছন্ন!

স্বাধীনতা মানুষের, চরিত্র গঠনে স্বাভাবিক ক্ষুরণ এনে—স্বাধীন জাতীয় মানুষের জীবনের, অভিব্যক্তি তাই পরাধীন জাতির মানুষের জীবন থেকে পৃথক। পারীর মানুষ দোষে গুণে কলকাতার মানুষের মত বটে, তবুও স্বাধীনতা তাদের জীবনে যে-সম্পূর্ণতা এনেছে, সেইখানে তারা বড়।

শ্রীকপিলপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

[ছই]

মাত্র দশটি টাকা

[এক]

অপ্রস্তুত হইয়া বিধুবাবু বলিলেন, “আচ্ছা থাক থাক, জাতে কি হয়েছে। হাতে যখন থাকবে তখন দেবেন। বাস্তব কি?”

ততোধিক অপ্রস্তুত হইয়া নিখিলবাবু বলিলেন, “না, বাস্তব হবার কথা বৈ কি! এই নিয়ে আপনাকে তিনবার ঘোরালাম। আজ একেবারে আপনাকে ঠিক দিতাম, কালরাত্রে টাকাটা এনেও রেখেছিলাম। কিন্তু সকালে বোসুজা-মশাই এসে একেবারে নাছোড় হয়ে পড়লেন। বেনারসে তাঁর ছেলের অস্থখ করেছে—তার এসেছে—কিছু টাকা না হলে—”

বিধুবাবু বলিলেন, “তা বেশ করেছেন দিয়েছেন! তার জন্তে আর কি হয়েছে! তিনি ফেরং দিলে আমাকে দেবেন এখন। আজ দেখি যদি বিপিন কিছু ধার দেয়। আমারও আজ টাকা চাই কিছু।” বলিয়া বিধুবাবু উঠিলেন। বিধুবাবু বাহির হইয়া যাইতেই নিখিলবাবুর অপ্রস্তুত ভাবটা কাটিয়া গেল এবং মনে মনে তিনি বলিলেন, “চামার কোথাকার! কটা টাকার জন্তে আর ঘুম হচ্ছে না।”

বাহিরে গিয়া বিধুবাবুরও মুখভাব বদলাইল এবং তিনিও অহচ্ছবরে বলিলেন, “বেটাচ্ছেলে ভোগাবে দেখছি।”

যাভাবিক নিয়ম অনুসারে দিন কাটিতে থাকে। একটি সপ্তাহ কাটিল। বিধুবাবু আবার একদা প্রাতে নিখিলবাবুর বাহিরের ঘরটিতে আসিয়া দেখা দিলেন। প্রায় মাস তিনেক পূর্বে বিধুবাবু নগদ দশটি টাকা নিখিলবাবুকে ধার দিয়াছিলেন এবং “কালই সকালে দিয়ে দেব” এই প্রতিশ্রুতি পাইয়াছিলেন, কিন্তু নিয়তির এমনই পরিহাস যে আপিসের গণ্যমান্য বড়বাবু নিখিলনাথ মিজকে অর্যাপি অধমর্ঘই থাকিতে হইয়াছে—তাঁহাও সামান্য দশটি টাকার জন্ত এবং বিধুচরণ বহুর মত একটা লোফারের নিকট! “হায়রে নিয়তি—তোমাকে গড় করি। নলরাজার মত বিচক্ষণ রাজাকেও তুমি নাকাল করিয়াছিলে, আমি তো সামান্য কেরানি মাত্র—” ইহাই ছিল নিখিলনাথের সাধনা। বাল্যকালে নিখিলনাথ মহাভারতের গল্প শুনিতে ভালবাসিতেন, এইরূপ জনশ্রুতি আছে।

বিধুচরণ আসিতেই নিখিলনাথ মুখে এমন একটা ভাবপ্রকাশ করিলেন, যেন তিনি বিধুচরণের পথ চাহিয়াই উৎকণ্ঠিত ভাবে দিনযাপন করিতেছিলেন। বিধুচরণ আসাতে তাঁহার সে দক্ষণ উৎকণ্ঠা বিদূরিত হইল।

“বাঁচা গেল! আহ্নন বিধুবাবু, আপনার কথা রোজই ভাবি। আজ আমাদের পাড়ায় গণেশ-অপেরা যাত্রা হবে। আসবেন শুনতে? একজন মনোমত সঙ্গী না পেলে এসব জিনিস শুনেনে স্থখ নেই! আহ্নন না।”

যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইয়াছেন, বিধুচরণের মুখমণ্ডলে এইরূপ একটি শ্বানন্দ-জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইল। তিনি উদ্ভাসিত-চক্ষু তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “হ্যাঁ হ্যাঁ, বেশত! কটার সময়—”

“আটটা। সন্ধ্যা আটটা—”

“আসব শুনে।”

এমন সময় নিখিলনাথবাবুর ছয়বৎসরের কন্যা মিষ্টু আসিয়া বলিল, “বাবা, মা বললে চিনি ফুরিয়ে গেছে।” বিধুবাবু মিষ্টুকে ধরিয়া তাহার সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। এত আলাপ তিনি নিজের মেয়ের সহিতও করেন না।

“বাঃ খুকী তোমার ফ্রকটি তো বেশ হুন্দর! মাথার ফিতেও চমৎকার দেখছি তো!”—ইত্যাকার নানাক্রপ আলোচনায় আরও মিনিট দশেক কাটিল।

বিধুচরণবাবুর এখানে আসার মুখা উদ্দেশ্য ছিল দশটি টাকা। কিন্তু মুখ ফুটিয়া তাগাদা করিতে পারিলেন না। নানা ছুতানাতায় কালহরণ করিতে লাগিলেন, যদি নিখিলনাথবাবু কথাটা নিজেই পাড়েন। বিধুচরণ বাবুর চক্ষুলাজ্ঞা প্রবল।

নিখিলনাথবাবুর মহাভারতীয় মন। তিনি ও-দিক দিয়াই গেলেন না। এ বৎসর ফতেপুর সিক্রিতে কি ভীষণ শীত পড়িয়াছে, এবং তজ্জন্ম গরীব লোকদের কি দারুণ কষ্ট হইতেছে, এই সম্পর্কে তিনি নানাভাবে উৎসে প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

ঘড়িতে চং চং করিয়া নয়টা বাজিল। নিখিলনাথবাবু বলিলেন, “এইবার আপিস যাওয়ার যোগাড় করা যাক।”

বিধুচরণ এইবার মরীয়া হইয়া বলিয়া ফেলিলেন, “বোস্জা মশায়ের কাছে টাকাটা ফেরত পেয়েছেন না কি?” নিখিলনাথ যেন আকাশ হইতে পড়িলেন, “ঠিক ঠিক ভুলেই গেছি তো। টাকা আপনার জুড়ে রেখেছি আমি।” বলিয়া তিনি পকেট হাতড়াইতে লাগিলেন।

“আরে গেল যা! চাবিটা ফেললাম কোথা!” সমস্ত পকেটগুলি খুঁজিলেন। টেবিলের নীচে, আলমারীর মাথায় সর্বত্র খুঁজিতে লাগিলেন। আশ্চর্য, চাবি পাওয়া গেল না। বিধুচরণও খুঁজিলেন এবং শেষটা বলিলেন, “আজ্ঞা থাক—বাস্তব কি?”

[তিন]

সন্ধ্যাকালে যথাসময়ে আসিয়া বিধুবাবু দেখিলেন, নিখিলনাথ অল্পপস্থিত। খোজ করিয়া জানিলেন যে, কোন প্রয়োজনীয় কার্যে তিনি বাহিরে গিয়াছেন, কখন ফিরিবেন স্থিরতা নাই। বিধুচরণ একাই বসিয়া যাত্রা শুনিলেন। উত্তরার অভিনয় তাহার বেশ ভাল লাগিল। শরীরের সহিত মনের যে নিগূঢ় সখন্দ আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। প্রমাণও মিলিল। উত্তরার চুপে তিনি খুব বেশী অশ্রুপাত করিয়াছিলেন। পরদিন সকালে উঠিয়া দেখিলেন হৃদয়ের বেদনা গলদেশে আশ্রয় করিয়াছে। টোক গিলিতে কষ্ট হইতেছে এবং টনসিল দুইটি ফুলিয়াছে। এমন কি টেম্পারচার লইয়া দেখিলেন, সামান্য জ্বরও হইয়াছে। সামান্য জ্বর ক্রমশঃ অসামান্য হইয়া উঠিল এবং তখন শয্যাগত বিধুচরণ চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে নিখিলনাথের সঙ্গে দেখা না হইলে তিনি কদাপি যাত্রা শুনিতে যাইতেন না, এবং ইহাও সত্যকথা, যে মূল দশটি টাকা না থাকিলে কেবলমাত্র সম্প্রদায় নিখিলনাথের সহিত তিনি দেখাও করিতে যাইতেন না। এইরূপ বিশ্লেষণ করিবার পরে বিধুচরণ বলিতে বাধ্য হইলেন, “বাটা আমাকে খনে-প্রাণে মারবে দেখছি!”

বিধূচরণ একসপ্তাহ শয্যাশায়ী থাকিলেন এবং চিকিৎসা বাবদ তাঁহার ১৭৮/১৫ পরচ হইল।

[চার]

উক্ত ঘটনার পর একটি মাস কাটিয়াছে। কারণ পৃথিবী বাতালী নহে, নিয়মিতভাবে সে নিজকক্ষে ঘুরিয়া চলিয়াছে, নিয়মিতভাবে দিবা-রাত্রি আসিতেছে এবং যাইতেছে।

সেদিন মাসের ছয় তারিখ। নিখিলনাথ নীচের ঘরটোতে বসিয়া মানসাক্ষ কসিতেছিলেন। আগামী কলা তিনি মাহিনা পাইবেন। কাটিয়া-কুটিয়া ৫৫৮/১০। ইহার মধ্যে বাড়ীভাড়া দিতে হইবে ১৫, মৃদীকে দিতে হইবে ২০, বাকী থাকে ২০৮/১০। সাড়ে সাত আনা ছাড়িয়া দিলে—থাকে কুড়ি টাকা। ইহার ভিতর সমস্ত মাসের তরকারি পরচ, ছেলেমেয়ের স্কুলের মাহিনা, দুধ, কেরোসিন তেল, কাপড়-চোপড়ের বিলু। নাঃ, বিধূচরণবাবুকে দশটা টাকা দেওয়া অসম্ভব!

গৃহিণীর হাতে অবশ্য গোটারকয়েক টাকা আছে। বাজার-পরচ প্রভৃতি হইতে এক-আদর পয়সা করিয়া বাচাইয়া নিখিল-গৃহিণী গোটা কয়েক টাকা জমাইয়াছেন ঠিকই, কিন্তু ঠিক কয়টা টাকা তাহা নিখিলের সঠিক জানা নাই; তাহা ছাড়া এই কয়টি টাকা হইতে শোভাকে বঞ্চিত করিতে নিখিলনাথের মায়া হয়। কি বলিয়া চাহিবে!

বিধুর কাছে সে টাকাটা লইয়াছিল, রেস্ খেলিবার জন্ত। রলাবাংলা, হারিয়াছে। একথা অকপটে স্বীয় নিকট প্রকাশ করিয়া বলিবার মত নহে। নিখিলনাথ ভাবিয়াছিল, কোনরূপে

ম্যানেজ করিয়া টাকাটা সে বিধুকে দিয়া দিবে। কিন্তু প্রতিমাসেই সে একবার করিয়া মানসাক্ষ করিয়া দেখিতেছে, ম্যানেজ করা অসম্ভব। অথচ মিথ্যা অভ্যুহাত দেখাইয়া বিধুকে আর ঠেকাইয়া রাখাও অসম্ভব। প্রত্যেক জিনিসেরই একটা সীমা আছে। নিখিলনাথ কি করিরে ভাবিতেছিল এমন সময় গলির মোড় হইতে হঠাৎ বিধুর কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল, “এই একবার নিখিলবাবুর কাছে যাচ্ছি।”

কিংকর্তব্যবিমূঢ় নিখিলনাথ তাড়াতাড়ি উঠিয়া পশেই একটা চোরকুঠরি ছিল তাহাতে ঢুকিয়া খিল লাগাইয়া দিলেন।

[পাচ]

“নিখিলবাবু।”

মিন্টু আসিয়া কহিল, “বাবা! তো একুনি এখানে বসেছিলেন। বাইরে গেছেন তাহলে।”

“আজ্ঞা। এলে বোলো যে আমি এসেছিলাম।”

“আজ্ঞা।”

বিধুবাবু চলিয়া গেলেন। বিধুবাবু চলিয়া যাইতে না যাইতে “এাপরে বাপ—উঃ উঃ।” করিতে করিতে সবেগে নিখিলনাথ চোর-কুঠরি হইতে বাহির হইলেন। চোর-কুঠরির কোণে একটা বোলতার চাক ছিল। কামড়ের চোটে দ্বিধাদিক জান-শূন্য হইয়া নিখিলনাথ গাড়ু হইতে পানিকটা জল লইয়া চোখে মুখে ঝাপটা দিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে বা চোখটা ফুলিয়া চোখ ঢাকিয়া গেল এবং ডান দিকের গালটার ক্ষীতি মিন্টুর হাত্তোঙ্গের করিল। নিখিলনাথ উপরে গিয়া শুইয়া পড়িলেন।

ঠিক এমন সময় দুইজন লোক ধরাধরি করিয়া বিধুবাবুকে লইয়া হাজির! কি করিয়া নিখিলনাথের কাছে টাকাটা আদায় করা যায় তাহাই ভাবিতে ভাবিতে তিনি এমন অসহনশক্তভাবে পথ চলিতেছিলেন, যে কলার খোসায় পিছুলাইয়া একেবারে সাংঘাতিক রকম পড়িয়া গিয়াছেন। মাথা কাটিয়াছে, হাতও ভাঙিয়াছে। দুইজন পথিকের সহায়তায় অতিকষ্টে তিনি নিখিলনাথের বাড়ী ফিরিয়াছেন। তাঁহার বাড়ী অনেক দূর।

নিখিলনাথ উপরে গিয়া বিছানায় শুইয়াছিলেন। ডাকাডাকিতে নামিয়া আসিয়া দক্ষিণ চক্ষুটি দিয়া দেখিলেন বিধুচরণ আবার ফিরিয়াছে।

উভয়ে উভয়ে দেখিয়া যুগপৎ বলিয়া উঠিলেন, “বাঁচান আমাকে।”

• • •
• • •

আরও তিনমাস কাটিয়াছে।

নিখিলনাথ এখনও টাকা দেন নাই।

বিধুচরণ এখনও ঘোরাকেরা করিতেছেন।

“বনফুল”

পথে চলিতে

১

পথে চলিতে

হলো দেখা যে

যুগ-নয়না,

আধো সরমে

ধীরে সরালে

আঁখি-কলাপী,

ছ’টি কপোলে

দিলো দেখা যে

আভা গোলাপী;

তা’তে কি হলো,—

মিছে উতলা

ভূমি হয়োনা।

২

আমি চাহি না

বেশী কিছু ত

তধু গোপনে

আসি’ হৃদয়ে

চুপি চাহিব

লঘু পুলকে,

মুহু মলয়া

মাখি' হুঁড়ভি

মোরে পরশি' তব অলকে

দোলা আনিবে

কণ স্বপনে।

৩

দীলা দোলনে

চল চপলা

তুমি চলিছো,

তব শাড়ীতে

নেশা ধরানো

ভাষা কুটিরে,

বুকে সে ভাষা

চুপে পড়িতে

আখি লুটিবে ;

তুমি চতুরা,

মুহু হাসিছা

মোরে ছলিছো।

৪

নাম-নাজানা

নব তরুণী

ওগো পথিকা,

আনো ছলনা

রাজা আঁচলে

তুমি- লোটানো ;

কথা না বলে,

চোখে রয়েছে

ভাষা ফোটানো,

আমি নীরবে

পড়ি তাহাতে

প্রেম- কথিকা।

৫

পথে জনতা

তারি মাঝে এ

ছুরি চাতুরী

তুমি ভুলিবে

সেই নিমেঘে

পথ- চারিগী ;

তব ছলনা

গাখি' ফুদছে,

অভি- সারিগী,

আমি অরিব

নিশি স্বপনে

তারি মাদুরী।

—কলেজ বয়

প্রসঙ্গ কথা

ভাষ-রূপ—‘ম্যাট্রিকুলেশন হাইস্কুল’—রামমোহন-রাজারাম

রেল-স্টেশনের চায়ের মত বাংলাভাষাও হিন্দুবাংলা এবং ইসলাম-বাংলায় বিভক্ত হইতে চলিল, এবং এই ভাষাবাবল্লেদ-ক্রিয়াটির নিশ্চয়তা সন্দেহে এখন আর কাহারও মনে কোনও সন্দেহের অবকাশ নাই। এমন কি, রাষ্ট্রক্ষেত্রে হিন্দুমুসলমানের মিলনের আবশ্যকতা যত জোরের সঙ্গে প্রচারিত হইতেছে ইহা তদপেক্ষাও জোরের সহিত সংসদিত হইবে ইহা নিশ্চয়। একেই ত কথাভাষা লেখাভাষা-রূপে চলাতে বঙ্গের প্রদেশে প্রদেশে ভাষাস্বাতন্ত্র্যের সৃষ্টি হইতেছে, তত্পরি বাংলা ভাষার উপরে আরব ও পারস্যদেশের দাবী উপস্থিত হইলে ইহার অবস্থা কিরূপ হইবে তাহা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। বৃদ্ধিতে পারিতেছি, ভবিষ্যৎ-বাঙালী যে ভাষায় কথা কহিবে এবং যে ভাষায় সাহিত্য-রচনা করিবে, বর্তমান বাংলাভাষার সহিত তাহার আত্মীয়তা রক্ষা করা চলিবে না। বহুমুখ্য রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বাঙালী যে ভাষায় সাহিত্য রচনা করিয়াছেন সে ভাষা তখন পৃথকভাবে স্থলে পড়িয়া শিথিল হইবে। বৃদ্ধিতে পারিতেছি, যে ভাষা শৈশবেই প্রাণসম্পদে একরূপ পুষ্ট হইয়া উঠিল তাহার সকল সম্পদ নানা হস্তে লুপ্ত হইয়া তাহার মৃত্যু ঘটাইবে। কিন্তু ইহা শুধু আমরা বৃদ্ধিতেই পারিতেছি, ইহার প্রতিকার আমাদের কাহারও হাতে নাই।

কিন্তু মৃত্যুক আমরা ভয় করিব কেন? ভাষার উপর অত্যাচার হইলেও ভাষা অমর। যে ভাষায় কোটি কোটি লোকের মনোভাব বাক

নবিনবারের চিঠি

৫২৫

হয় সে ভাষা কখনও নীরব হইয়া যাইতে পারে না। কোটি কোটি লোক কোনও একটা বিশেষ অবস্থায় পড়িয়া মুক হইয়া যাইবে ইহা সম্ভব নহে। ভাষার বর্তমান রূপ যদি আর না থাকে তাহা হইলে ছুপের পরিবর্তে আমাদের আনন্দই করা উচিত। কারণ ভাষার বর্তমান রূপ আমরা নিজেরাই পরিবর্তন করিতে চাই।

বাংলাভাষার বর্তমান রূপ আমরা আমাদের সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলির ভিতর দেখিয়াছি। খাটি বাংলাভাষায় নিঃসন্দেহেই এমন অনেক গ্রন্থ রচিত হইয়াছে যাহা সমগ্র বাঙালীর চিত্ত নন্দিত করিয়াছে, যাহার ভিতর বাঙালী আপনার অন্তরের প্রতিফলিত খুঁজিয়া পাইয়াছে। কিন্তু যাহারা এই সাহিত্যকে একদা শিরোধার্য করিয়া লইয়াছিলেন, তাহাদেরই অনেকে এখন কোনো অজ্ঞাত কারণে, যাহারা ভাষায় উচ্ছলতার পক্ষপাতী তাহাদের সঙ্গে যোগ দিয়া তাহাদের সমধর্মী হইয়া উঠিয়াছেন। ভাষার নবনির্মিত রাজপ্রাসাদকে যাহারা ধূলিসাৎ করিয়া আশ্বপ্রসাদ লাভ করিতেছে, সাহিত্যের পুরোধাগণ তাহাদের পিঠ চাপড়াইয়া তাহাদের কন্দের প্রশংসা করিতেছেন।

অতরাং আমাদের পক্ষে ইহা ছুপের নহে, আনন্দের দিন। ভাষার মূলনীতি বলিয়া কোনও একটা বিশেষ বস্তু নাই—ভাষা সহস্র-মূল। যে যে-ভাবে উহা ব্যবহার করে সেই ভাবেই উহাকে মানিয়া লইতে হইবে। এই মানিয়া লইবার ক্ষমতালাভ করাই বর্তমানে আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। কারণ, মানিয়া লইতে না পারিলে আমরা কালের সঙ্গে তাল রাখিতে পারিব না, চিড়িয়াখানায় যাহাদের স্থান তাহাদের অজ্ঞ ছুপ করিতে করিতে আমরা

প্রাচীন এবং জীর্ণ হইয়া জাদুঘরে রক্ষিত হইব। ইহা মৃত্যুর প্রকারভেদ মাত্র। ইহা আমাদের কাম্য নহে।

আমরা যাহাকে সাধুভাষা বলিয়া জানি সেই ভাষা সমগ্র বঙ্গদেশের একমাত্র সাহিত্য-ভাষা। কারণ, বঙ্গদেশ বৃহৎ, তাহার প্রদেশ অনেকগুলি এবং প্রত্যেক প্রদেশের ভাষাও পৃথক। এক প্রান্তে বীরভূম, অল্পপ্রান্তে চট্টগ্রাম। একের কথাভাষা অপরের অকথ্য, এবং অবোধ্য; অথচ সাধুভাষা সকল প্রদেশের পক্ষেই সমান বোধ্য। ইহা লইয়া কোথায়ও কোনও বিরোধ নাই, এবং একথা বলিলে অত্যাধিক হইবে না যে এই সাধুভাষাই বাংলাদেশের সম্পর্কে 'রাষ্ট্রভাষা'। কিন্তু অধুনা আমরা এই সাধুভাষাকেই অসাধুর পর্যায়ে ফেলিতেছি। কিন্তু বাংলাদেশ শুধু যে বৃহৎ তাহা নহে, ইহা বৃহত্তর। অর্থাৎ বাঙালী-মাজেই এখন একটি মিলনক্ষেত্রে আসিয়া আত্মীয়তাকামী। দিল্লীর বাঙালী, মাদ্রাজের বাঙালী এবং বোম্বাইয়ের বাঙালী সকলেই আদি বাঙালীদের সহিত বৎসরান্তে (প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনের মদ্যান্তরায়) অস্থিত একবারও মিলিত হইয়া দেখাইতে চাহেন যে, তাহারও বাঙালী, অর্থাৎ বাংলাভাষায় কথা কহেন। একমাত্র ভাষাই আমাদের এই সত্য প্রমাণ করিতে পারে, তাই মিলনের ভাষা আমাদের কি হইবে, অর্থাৎ কোন ভাষা বাঙালীর "রাষ্ট্রভাষা" হইবে তাহা ভাবিয়া দেখা কর্তব্য।

বঙ্গের সহিত বৃহত্তর বঙ্গ বা প্রবাসীবঙ্গ যুক্ত হওয়াতে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে বাংলাদেশের প্রদেশ-সংখ্যা আরও বাড়িয়া গিয়াছে। প্রতারাং দিল্লীর বাংলা এবং মাদ্রাজের বাংলাও হয়ত

ভবিষ্যতে চট্টগ্রামের বাংলা এবং বীরভূমের বাংলার মতই স্বতন্ত্র হইয়া পড়িবে। কিন্তু আমাদের উদ্বেগ, ঐক্য। ভবিষ্যতে এই ঐক্য ঐক্যধারা প্রমাণিত হইবে না বহু বৈচিত্র্যধারা প্রমাণিত হইবে তাহাই ভাবিবার বিষয়। ইতিমধ্যে আরও একটা বিষয় উপস্থিত হইয়াছে যাহা লইয়াও কিছুক্ষণ ভাবা যায়।

ইহা আর কিছু নহে, বীরবলের এবং উত্তরকালের রবীন্দ্রনাথের ভাষা। ইহারা কলিকাতার কথাভাষা একমাত্র সাহিত্যরচনার ভাষাহিসাবে চালাইবার পক্ষপাতী। যাহারা কোনও একটা পুরাতন রীতি ছাড়িয়া নূতন রীতির পক্ষপাতী হন, তাহাদের নিকট হইতে পক্ষপাতশূন্য বিচার আশা করা যায় না। বীরবল এবং রবীন্দ্রনাথের আধুনিক মতে কথা ও কাহিনীর ভাষা ছাড়িয়া সর্ববিষয়ে শুধু কথার ভাষা চলুক। রবীন্দ্রনাথ ইহার মতো সাধুভাষার সকল গাঙ্গীর্ঘ্যই অবিকৃত থাকে বলিয়া দাবী করেন, এমন কি মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্যখানাও যদি আগাগোড়া কথা অর্থাৎ 'চলতি' ভাষায় পরিবর্তিত করা যায় তাহা হইলেও যে তাহার ধ্বনি এবং ভাব-গাঙ্গীর্ঘ্যের ব্যত্যয় হয় না ইহা প্রমাণ করিয়াও দেখাইয়াছেন। কিন্তু এই প্রমাণ সিদ্ধ হইয়াছে কিনা তাহা আমরা বলিতে পারি না, আমাদের শুধু মনে হয়, বঙ্গদ্বিনের সংস্কার এবং ঐতিহ্যের ভিতর দিয়া কোনও একটা রূপ—তাহা ধ্বনিরূপ হইলেও ক্ষতি নাই—যদি আমাদের মনে একবার দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ হইয়া যায় তবে তাহা কোনও গুরুতর দৈবদুর্ভাগ্যে ধূলিসাৎ না হওয়া পর্য্যন্ত অনর্থক সংস্কারবিলাসের উগ্রতায় তাহার পরিবর্তনসাধন করা সমীচীন নহে। কারণ সংস্কারে যাহারা উগ্র তাহাদের মনে কোনও সংস্কার থাকে না। কিন্তু মাহুসের

মন অনেকখানি সংস্কারে বাঁধা। যে-মন সর্বদা সংস্কারবিলাসী সে-মনকে আমরা সংস্কৃতিসম্পন্ন মন বলি না। প্রমাণ, সংস্কৃত ভাষা। উহার সংস্কার শেষ পর্যন্ত কবে হইয়াছিল তাহা আমাদের স্বরণ নাই। গড়িতে না গড়িতেই সংস্কার, পূজা-মন্দিরের জন্ম ভিত্তিস্থাপন করিয়া অর্দ্ধসমাপ্ত অবস্থাতেই তাহা ভাঙিয়া দিয়া তৎক্ষণাৎ নৃত্যমন্দিরের প্রাণ প্রস্তুত করা সংস্কার নহে। অথচ কার্যক্ষেত্রে দেখিতে পাইতেছি, সাহিত্যের গুরুস্থানীয়গণ 'চলতি'ভাষার উপরে অত্যধিক ঝোঁক দিয়া এইরূপ সংস্কারেরই পক্ষপাতী হইয়াছেন।

কিন্তু ইহাই কি সত্য নহে যে ভাষার এই দুইটি রূপই আমাদের হাতে আসিতে আমরা অজ্ঞাত ভাষাদিকারী হইতে অধিকতর প্রকাশ-যোগ্যতা লাভ করিয়াছি? বস্তুবোধ বিষয়-ভেদে উক্ত দুইটি রূপই কি সমান কার্যকরী হইয়া উঠে নাই? তাহা যদি হয়, তাহা হইলে কেবলমাত্র 'চলতি'ভাষা বা সাধুভাষার পক্ষ সমর্থন করা উচিত হইবে না। কথা বলাতে আমরা যখন সাধুভাষা ব্যবহার করিতে পারিব না, 'চলতি'ভাষাই চালাইব, অপর পক্ষে সাধুভাষায় বিশেষ বিশেষ বিষয়ের প্রকাশযোগ্যতার স্বাদ যখন আমরা পাইয়াছি, তখন অস্বস্ত রচনায় এবং কথাবলায় আমরা কাষ্ঠ্যত দুইটি 'ভাষা'কেই রাখিতে বাধ্য হইতেছি। অবশ্য সাধুভাষার স্বাদ যদি কাহারও মতে স্বপ্নাদ না হয় তাহা হইলে তিনি ইহাকে বর্জন করিতেই উৎসুক হইবেন। কিন্তু 'চলতি'ভাষা যে সমগ্র বাঙালীর সার্বজনীন 'চলতি'ভাষা নহে, একথা পূর্বেই বলিয়াছি। এই 'চলতি'ভাষা কলিকাতার 'চলতি'ভাষা বলা চলে, এবং সকল প্রদেশের 'চলতি'ভাষার মধ্যে যে এইটিই আদর্শ বিষয়েও সন্দেহ নাই। এই ভাষায় লেখা নাটক বাংলাদেশের

সর্বত্র অভিনীত হয়, এই ভাষায় রবীন্দ্রনাথের এবং অজ্ঞাত কবির অনেক কবিতা লেখা হইয়াছে, এবং অজ্ঞ প্রদেশের নিকট তাহা অগ্রাহ্য হয় নাই। বরঞ্চ ঢাকা কিংবা চট্টগ্রামের ভাষায় কোনও কবিতা বা নাটক লিখিত হইলে ঢাকা অথবা চট্টগ্রামের লোকের নিকটেই তাহা হস্তাকর হইবে। কিন্তু তথাপি তর্ক করিতে গেলে কলিকাতার ভাষাকে প্রাদেশিক ভাষা ছাড়া আর কিছু বলা যাইবে না, এবং আমাদের প্রাচীন সংস্কারবশে একথা কখনও স্বীকার করিব না যে 'চলতি'ভাষায় সকল প্রকার রচনাই সাধুভাষার সমকক্ষ অথবা তাহা অপেক্ষা অধিকতর যোগ্য। সুতরাং ভাষার এই দুইটি রূপের কোনটি রাখিব এরূপ অবাস্তব প্রশ্ন না তুলিয়া এই দুইটি রূপ আদৌ বাংলা থাকিবে কি না ইহাই আলোচনা করা উচিত।

সময়ের সঙ্গে ভাষার পরিবর্তন অবশ্যস্বাবী। জ্ঞানবুদ্ধি অথবা জ্ঞানের হ্রাস এই উভয় ঘটনাই ভাষাকে ধীরে ধীরে সমৃদ্ধ অথবা দগ্ধ করে। এবং সময়ের সঙ্গে জ্ঞানবুদ্ধি অথবা জ্ঞানহ্রাসের নিত্যসম্বন্ধ। এই দুইটার একটা হইতে বাধ্য। সুতরাং অবশ্যস্বাবী পরিবর্তন লইয়া কোন কথাই নাই। বর্তমান যুগের আমরা বর্তমান ভাষারূপ মানিয়া লইয়াছি, ভবিষ্যতের লোকে ভবিষ্যতের রূপ মানিয়া লইবে ইহা ত নিশ্চিত। কিন্তু যে পরিবর্তন জীবনের, সে পরিবর্তনের অপেক্ষা না করিয়া ধর্মের বা সম্প্রদায়ের নামে অথবা আধুনিকতার নামে হঠাৎ আমাদের চিন্তার পন্থাতি পথান্ত বদলাইয়া ফেলিতে হইবে ইহা বড়ই বিস্ময়কর। কিন্তু একথাও সত্য যে বদলাইয়া ফেলা যাইবে না, যাহারা এরূপ চেষ্টা করিবে তাহারা আর একটি স্বতন্ত্র ভাষা সৃষ্টি করিবে এবং সে ভাষা ভ্রম সমাজে বা সাহিত্যে চলিবে না, তাহা গোড়া অর্দ্ধশিক্ষিতের

ভাষা হইয়া থাকিবে, এবং তাহার। এই ভাষার আবর্তে পড়িয়া কেবলই ঘুরপাক বাইতে থাকিবে, কখনও ইহার উজ্জ্বল উঠিয়া উচ্চশিক্ষিত হইতে পারিবে না, কারণ সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস সে ভাষায় কখনও লেখা হইবে না। সুতরাং ভাষার বিকৃতীকরণে আমাদের ভয় পাইবার বিশেষ কোনও কারণ আছে বলিয়া মনে করি না।

আমাদের দেশে স্কুলসমূহে যে সব পাঠ্যপুস্তক সাধারণত অল্পমোদিত হয় সে সম্বন্ধে পূর্বে কিছু কিছু আলোচনা করিলেও, বিশেষ কোনও পাঠ্যপুস্তক লইয়া বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিবার সুযোগ আমাদের প্রায় ঘটে না; সম্প্রতি একখানি পাঠ্যপুস্তক দেখিবার সুযোগ আমাদের হইয়াছে। আমাদের পূর্বেকার উক্তি যে কতখানি সত্য তাহা এই পুস্তক আলোচনাপ্রসঙ্গে প্রমাণিত হইবে। পুস্তকখানির নাম “ম্যাট্রিকুলেশন হাইজীন”—লেখক জীরমেশচন্দ্র রায় এল-এম-এস। প্রকাশক হেয়ার ফার্মেসি, ৩৭, আমহাষ্ট স্ট্রীট কলিকাতা। পুস্তকের টাইটল পেজের ললাটে লেখা আছে “কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পাঠ্য, ১৯৩২-৩৬ সাল।” পুস্তকখানির মূল্য দুই টাকা। কিছুদিন পূর্বে এই বইখানি কিনিবার দুর্ভাগ্য হইয়াছিল, এবং পড়িতেও হইয়াছিল। পরীক্ষা দিবার জন্ত নহে, স্বগৃহে পড়াইবার জন্ত। বোধ হয় দৌভাগ্যক্রমেই কিনিয়াছিলাম—কারণ আজ এই উপলক্ষে হযত আগামী ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থীদের কেহ কেহ আসন্ন বিপদের হাত হইতে বাঁচিয়া যাইবে। কারণ আমরা সন্ধান লইয়া জানিতে পারিয়াছি যে অন্ততঃ কলিকাতার কোনো কোনো স্কুলে এই বইখানি পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট আছে।

প্রথমত বইখানির ভাষার নমুনা দেখাইতেছি, যদিও আমরা জানি যে বিজ্ঞানবিষয়ক কিছু শিক্ষা করিতে ভাষার সৌষ্টব মুখ্য নহে। কিন্তু মুখ্য না হইলেও ভাষা বিকৃত হওয়া কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নহে। ‘পূর্ণাভাষ্যে’ লেখক বলিতেছেন,

“যতক্ষণ দেহের প্রত্যেক অংশ এইভাবে চন্দ্রমতে কাজ করিতে থাকে, ততক্ষণ দেহ এত ভাল বোধ হয় যে, দেহের যন্ত্রগুলির কার্য সম্বন্ধে আমরা উদাসীন থাকিতে পারি। কিন্তু, কোথাও এতটুকু পরশুর চন্দ্র ভাঙুক দেখি, তখন, যে যন্ত্র বিগড়াইয়াছে, তাহার প্রতি দৃষ্টি আপনাই আকৃষ্ট হইবে।” “সে সব দেশে ব্যারাম পুর্বই কম, লোকদের স্বাস্থ্য-গরিমা স্মৃহীন, আয় দীর্ঘ...কাজেই উজ্জলিত প্রাণের স্পন্দনে দেশ মূরতি, সম্পদ ও শক্তি তথায় ভারে ভারে ধ্বংসীকৃত।”

ভাষা যাহার আয়ত্ত নহে, তাহার পক্ষে বিজ্ঞান বা ইতিহাস বা ভূগোল কোনো বিষয়েই কিছু লিখিতে যাওয়া বিড়ম্বনা। অথচ বাংলাদেশের এমনই দুর্ভাগ্য যে এইরূপ ভাষায় বই লিগিলেও তাহা পরীক্ষার পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট হয় এবং তাহা পড়িয়া পরীক্ষা দিয়া হযত ছাত্রেরা পাসও করে। কিন্তু ভাষা দূরের কথা যদি কেহ ভূগোল লিখিতে গিয়া বলে যে পৃথিবী চতুষ্কোণ বা সুষ্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে তাহা হইলেও হযত সে বই পাঠ্য তালিকাভুক্ত হইবে—কারণ অবিজ্ঞা আমাদের দেশে বিজ্ঞার ক্ষেত্রে কোনো বাধাই নহে।

এইবার ভাষা ছাড়িয়া আমরা উক্ত “ম্যাট্রিকুলেশন হাইজীন”—এর বিজ্ঞান-অংশটির পরিচয় দিতেছি। ইহাতে গ্রন্থকারের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের পরিচয়ও মিলিবে। “বায়ু” অধ্যায়ে দেখিতেছি—

বাতাস কি?—মাছ যেমন সমুদ্রে বাস করে আমরাও সেই রকম বায়ুসমুদ্রে ডুবিয়া আছি।

অর্থাৎ লেখক বলিতে চাহেন, মাছ যেমন জলের পরিমণ্ডলে অবাধ সাঁতার কাটিয়া বেড়ায়, আমরাও তেমনি বায়ুর পরিমণ্ডলে ভাসিয়া বেড়াইতেছি। কি গভীর বিবেচনাশক্তি!—না হইলে টেক্সট বুক লিখিবার সাধ হয়! তার পরেই দেখিতেছি—

উপরের দিকে এক মাইলেরও বেশী বায়ু আছে।

লেখকের অসীম দয়া! না হইলে তিনি ত অনায়াসে লিখিতে পারিতেন যে পৃথিবীপৃষ্ঠে মোটেই বায়ু নাই। লিখিলে কেহই তাঁহাকে ঠেকাইত না, এমন কি তৎসঙ্গেও বই স্থলপাঠ্যাতালিকায় স্থান পাইত। কিন্তু লেখক এতটা নিষ্ঠুর হইতে পারেন না, তাই অপরিসীম করুণাবশত লিখিয়াছেন, “উপরের দিকে একমাইলেরও বেশী বায়ু আছে।” বায়ুর ভাগ্য।

তারপর দেখিতেছি—

Ozone, O₃ :—অক্সিজেন বহল একটি বাষ্প।

Ozone যাহার সবটুকুই অক্সিজেন এবং যাহা বিশুদ্ধ অক্সিজেন ছাড়া আর কিছুই নহে তাহাকে “অক্সিজেন বহল” বলা অসম্ভব সংসাহসের পরিচয় ইহাতে সন্দেহ নাই। বিশুদ্ধ স্বর্ণকে আমরা স্বর্ণবহল ধাতু বা হীরককে হীরকবহল পাথর বলিতে যে সাহস পাই না, উক্ত লেখক সেই সাহস পাইয়াছেন। বাংলাদেশে একদম দীর আর কয়জন আছে? কিন্তু রসায়ন বিজ্ঞা এইখানেই শেষ নহে। পাঠক নির্ভয়ে অগ্রসর হউন।—

নাইট্রোজেন (N)। এটি মৌলিক পদার্থ (element) নহে; argon,

met-argon, xenon, krypton, helion, neon প্রভৃতি বাষ্পের মিশ্রণে যৌগিক পদার্থ।

নাইট্রোজেন গ্যাসকে যে হতভাগাগণ এতকাল element বা মৌলিক পদার্থ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে তাহাদের যে কাণ্ডজ্ঞান নাই ইহা প্রমাণিত হইল। মৌলিক বলিলেই ত আর কিছু মৌলিক হয় না, প্রমাণ কোথায়? বিশ্ববিদ্যালয়েও ত অনেকে মৌলিক থীসিস লিখিয়া ডক্টরেট লাভ করিয়া থাকেন—পরে প্রমাণ হয় থীসিস মৌলিক নহে। কস্ করিয়া কোনো সিদ্ধান্তই করা ঠিক নহে, বিশেষত বিজ্ঞানবিষয়ে। বিজ্ঞান যতদিন নিজের অসহায়তা প্রচার করিবে ততদিন শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র রায়ের মত সাহসী বৈজ্ঞানিক নাইট্রোজেনকে মৌলিক পদার্থ বলিবেনই। ইহাতে বিজ্ঞানের কিছু প্রমাণিত হইবে না কিন্তু শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র রায়ের সাহস প্রমাণিত হইবে। এই সাহস সাধারণ বাঙালীর নাই। লেখক অক্সিজেনের বেলায় O₂ লিখিয়াছেন, ওজনের বেলায় O₃ লিখিয়াছেন কিন্তু নাইট্রোজেনের বেলায় শুধু N লিখিয়াছেন। ইহাও রসায়ন জ্ঞানের পরিচয়; রসজ্ঞানেরও বটে।।

অতঃপর—

“আমোনিয়া (NH₃)। এটি একটি নাইট্রোজেন-বহল উৎপাদক বাষ্প।”

যে গ্যাসের এক মলিকিউল-প্রমাণ দেহগঠনে এক অ্যাটম নাইট্রোজেন এবং তিন অ্যাটম হাইড্রোজেন প্রয়োজন সেই গ্যাসকে নাইট্রোজেন-বহল বাষ্প বলাতেও লেখকের রুতিয় প্রকাশ পাইয়াছে।

ফাইলেরিয়া অধ্যায়ে দেখিতেছি—

—Filaria Sanguinis Hominis, শটক বা বাতশিরার অরের কৃমি।

শ্রীগণ (গোব) কুণ্ড—হৃদয়ের মত অগ্রবাহ হওয়া (chyle in urine) শীত:

করিয়া অর আসার সঙ্গে বীচি ফেলা [আমরা এই ভাষা সম্বন্ধে পূর্বে মন্বব করিয়াছিলাম—শ চি স] বা “শিতলী নামা” (lymph শিয়ার প্রবাহ) প্রভৃতি যে কুমির জনা হয়, তাহার ছই জাতীয়। এক জাতীয়, দিনের বেলা রক্তে দেখা দেয়, (diurna); অপর জাতীয় গভীর রাত্রে [অগভীর রাত্রে দেখা যায় না ?] রক্তের প্রোতে ভাসিয়া বেড়ায় (nocturna)। ইহার দেখিতে শব্দ, গোলাকৃতি, ৩০ ইঞ্চি লম্বা। যে ব্যক্তির দেহে এই কুমি আছে, তাহারকে বংশন করিয়া, যখন কিছুলক্ষ মশকী কোন হৃৎ লোককে কামড়ায়, তখন শ্বেতক বক্তির রক্তে ইহাঙ্গিকে ছাড়িয়া দেয়।

লেখক এল-এম-এস উপাধিধারী। কেমিষ্টি তিনি হযত তুলিয়া গিয়াছেন, কিংবা কখনও শেখেন নাই; কিন্তু তাহার নিকট হইতে ব্যাবিসম্পর্কিত কোনো তথ্যেরও যথামত জ্ঞান ছাত্রেরা আশা করিতে পারে না? তিনচারি ইঞ্চি লম্বা জীববিশেষ রক্তে ভাসিয়া বেড়ায় লিখিলে হযত সাধারণ লোকে কিছু প্রশ্ন নাও করিতে পারে কারণ তাহার ফাইলেরিয়া রোগীর রক্ত লইয়া পরীক্ষা করে না, কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করিয়া বসে এই জীবগুলি মশককর্তৃক স্থানান্তরিত হয় কি করিয়া, তাহা হইলে কি উত্তর দেওয়া যাইবে? প্রথমত তিনচারি ইঞ্চি লম্বা জীবকে পেটে করিয়া বহন করিবার উপযুক্ত মশা এদেশে দুর্লভ, দ্বিতীয়ত মশক পানী নহে যে জীবগুলিকে কুটার মত মুখে করিয়া উড়িয়া গিয়া অল্প দেহে ছাড়িয়া দিতে পারে। পারিলে মশক জীবন অবশ্য ধর্য হইত, হযত আমরাও ধর্য হইতাম। কিন্তু লেখক কি শাক্ত? বাগীমন্দিরে বাঙালীছাত্ররূপ জীবহত্যা করিয়া পুণ্যসঞ্চয় করিবার বাদনা করিয়াছেন?

লেখক ভূমিকায় দস্তভরে বলিয়াছেন—

...দেশবাসীর এই অবস্থা দেখিয়া উাহাঙ্গিকে এই পান্থ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করিবার মানসে, বচস্ব ধরিয়া আমি বাঙ্গালা ভাষার শ্রেষ্ঠ মাসিক ও দৈনিক

পত্রিকাগুলিতে...প্রবন্ধ লিখিয়া আসিতেছি, এবং বহু সভা সমিতি ও রীতিমত [?] বেতার মারফতে বক্তৃতাও করিয়া আসিতেছি। ছাত্রদিগের জন্য প্রাথমিক শ্রেণী হইতে M. B. ও D. P. H. শ্রেণী পর্যন্ত সকল শ্রেণীরই পান্থ পুস্তক রচনা করিয়াছি। এইখানি উাহাদের [?] মধ্যে অন্যতম।

দেশের ভবিষ্যৎ আশাবল ছাত্রগণের হীনতা লক্ষ্য করিয়া ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে, নিজস্বায়ে...স্কুল শিক্ষার্থীর পান্থ রীতিমত [?] পরীক্ষা করিয়া ফল দেখিয়া তৃপ্তিত হইয়াছিলাম। এবিধে সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে আমিই পথ প্রদর্শক। ...আমি ছই পুণ্ড্র শিক্ষক।

বইখানির পঞ্চম সংস্করণ হইয়াছে। বাংলাদেশ বলিয়াই হইয়াছে। এদেশে শিক্ষক এবং শিক্ষকনিয়োগকারী প্রায় সকলেই সমজাতীয় পণ্ডিত। ছাত্রেরা অসহায়। লেখকের শিক্ষকতা বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খমততার গর্ভে শিক্ষকের উপযুক্তই হইয়াছে, যেমন উপযুক্ত হইয়াছে তাহার এই বইখানা লেখা। এখন ভবিষ্যৎ পরীক্ষার্থীগণকে এই উপযুক্ত পুস্তকখানি হইতে রক্ষা করিবার উপায় বর্তমান শিক্ষকগণ চিন্তা করুন।

আমাদের দেশের লোকের একটা বিশিষ্ট দৃষ্টিরীতি আছে। এই রীতি অত্যন্ত মৌলিক, ইহা অল্প কোনও দেশের সঙ্গে মেলে না। এই বিশেষ দৃষ্টিরীতিতে অত্যন্ত অভ্যস্ত হওয়ার ফলে আমরা দৃষ্টির স্বাভাবিকতা হারািয়া ফেলিয়াছি। ইহারই ফলে আমরা সহজ জিনিসকে আর সহজভাবে দেখিতে পাই না। যাহা অত্যন্ত স্পষ্ট এবং বাহ্যতে লেশমাত্র জটিলতা নাই, তাহা আমরা অত্যন্ত অস্পষ্ট এবং অত্যন্ত জটিল দেখি। অর্থাৎ দেখার সহিত আমাদের প্রাচীনকালের মন আসিয়া যোগ দিয়াছে। সে চোখের উপর কলুষ করিতেছে। চোখে যাহা সুরল বলিয়া মনে হইতেছে মন তাহা অগ্রাহ্য করিয়া তাহাতে জটিলতা

আরোপ করিয়া লইতেছে। সহজ সরল জিনিসে আর আমাদের আস্থা নাই। এমন কি কোয়েটার ভূমিকম্পও আমাদের নিকট ভূমিকম্প বলিয়া মনে হয় না; উহা ভূমিকম্প ছাড়া অল্প যে-কোনো জিনিস, কিম্বা ভূমিকম্প নহে। উহা গোলাবাক্সের আগুন লাগার পরিণাম, অথবা গত যুদ্ধের সময়কার জার্মানি কর্তৃক গোপনে ভূপ্রাণিত মাইন ফাটার ফল; কিম্বা ভূমিকম্প নহে। শিক্ষিত লোকের মুখেও কোয়েটা ধ্বংসের গোপন কাহিনী এইরূপ। আমাদের মনটা এখনও 'প্রিমিটিভ' রহিয়া গিয়াছে। যুরোপীয় বিজ্ঞান সে মনের উপর কোনো ক্রিয়া প্রকাশ করিতে পারে না। আমাদের মনের পরিমণ্ডলে যে বাতাস বহিতেছে তাহাতে অস্ত্রজেনের ভাগ শূন্য, সেখানে বাহিরের আলো প্রবেশ করিলে তাহা জ্বলে না, নিভিয়া যায়। কিম্বা ইহাই আমাদের গর্বের কারণ।

যুরোপীয় প্রণালীতে এবেশে কোনো কিছুই করা যায় না। শিল্প ইতিহাস, বিজ্ঞান সব কিছুতেই আমাদের পথ্য স্বতন্ত্র। জীবনী লিপিতে যেমন আমরা ভক্তিমার্গ অবলম্বন করি, ভক্তিতে আচ্ছন্ন হইয়া মানুষকে সেবতা বানাই—কার্য-সমালোচনার বেলাতেও আমরা অল্পরূপে পথ্যই অবলম্বন করি। কবিতায় কাব্য কতখানি আছে তাহার যাচাই না করিয়া তাহাতে তব্ব কি পরিমাণ আছে তাহারই যাচাই করি এবং কবিকে দার্শনিক কিংবা ক্ষয়ি আখ্যা না দেওয়া পৃথ্যস্থ কবির কিংবা কবির কাব্যবিচারে তৃপ্ত হইতে পারি না।

ঐতিহাসিক গবেষণার ক্ষেত্রেও এই লক্ষ্যকর মনোভাবটি প্রামাণ্য প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। গত সংখ্যায় আমরা শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ্রের রাজারাম সম্পর্কিত গবেষণার উপর কিছু মন্তব্য করিয়াছিলাম।

মাঘের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রত্যালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। রাজা রামমোহন রায় সখ্যে ব্রজেন্দ্রবাবু দীর্ঘকাল ধরিয়া নানারূপে তথ্য সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থ এবং বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার সকল তথ্যই প্রামাণ্য হিসাবে সর্বত্র উল্লেখিত হইয়াছে—কিন্তু রাজারাম সম্পর্কে তথ্যগুলিতে হঠাৎ একরূপ আপত্তি হইবার কারণ কি? কারণ আর কিছুই নহে, নতাত্মসম্বন্ধে অপেক্ষা অল্পভক্তি বড় হইয়া সত্যের পথরোধ করিয়াছে। ভক্তির আতিশয্যে যদি সত্য উল্টাইয়া দেওয়া যায় তাহাতেও কাহারও আপত্তি নাই মনে হইতেছে। সহজ জিনিসকে বিকৃত করিবার অধিকার বাড়ালীর অবশ্যই আছে। কিন্তু মানুষের মহত্ত্বের পরিমাপ কি কেবল ভক্তদের দ্বারাই স্থিরীকৃত হইবে? রামমোহন রায়ের যে দানে দেশ ধনী হইয়াছে তাহার মূলানিরূপণ কখনও ভক্তদের ওকালতি দ্বারা হইতে পারে না। দাতা সত্য তাহা নিজগুণেই সত্য। রামমোহন রায়ের যেটুকু মহত্ত্ব, তাহা ভক্তের রক্ষণাবেক্ষণের দ্বারা টিকিবার অপেক্ষা রাখে নাই, নিম্নকের নিন্দার দ্বারাও তাহার ক্ষতি হয় নাই। স্বতরাং মানুষ-রামমোহনের জীবনের কোনো অজ্ঞাত তথ্য আবিষ্কৃত হইলে তাহা যদি ভক্তের মনোপুত না হয়, তাহা হইলে ক্ষতি যদি কিছু হয় তবে তাহা ভক্তেরই হইবে—রামমোহন রায়ের অথবা তথ্য-আবিষ্কারকের হইবে না।

পাগল পৃথিবী

পাগল পৃথিবী ধায় বেগে ;
 নক্ষত্রমণ্ডল, গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু
 প্রচণ্ড আবেগের খোঁজে হেঁচু,
 জ্বাসে উষ্মা জ্বলে ওঠে জ্বগে ।
 পাগল পৃথিবী ধায় আলোকে আঁধারে
 ঘুরে ঘুরে পথহীন পথে
 অশনি-তাড়িত ক্ষত কোন মায়া রথে
 যেন পলাতক, বিতাড়িত বার্থ অভিমারে ।
 নদনদী, গিরি, গুহা, পর্বত, কন্দর
 বিরাট অরণ্যমালা, দীর্ঘ মরু, জ্বাল প্রদেশ,
 গ্রাম, জনপদ, সব করিয়া নিঃশেষ
 মাতিয়া উঠেছে হের শহর বন্দর ।
 ধরণীর যত ব্যাপি সংক্রামিত মানব সমাজে,
 এক ভূমিকম্পে কাঁপে লক্ষ হিয়া,
 মিষ্টার, মার্শিও, হের, সিঁচির, রাস, পাশা, মিক্সা,
 বাবু, গাড়ু, লুঙ্গী, দ্বিত, পায়জামা ভিন্ন-ভিন্ন সাজে,
 সব কাঁপে এক ভাবে, হাসে, কাঁদে, করে সিংহনাদ,
 বিভিন্ন আওয়াজ, অর্থ একই তবু
 ভিন্ন নামে তরু করে হবু সঙ্গে গদু,
 নানা দেহ, একই কক্ষ, শ্লেষ্মা, পিত্ত, বায়ু, জর, বিশেষাটক, দাদ ।
 ইচ্ছামত ছুটেছে দুনিয়া,
 অনিচ্ছায় জ্ঞাত কিন্তু ইচ্ছামত দুনিয়াবাসীর,

শনিবারের চিঠি

৬০২

সকলেই মা'র ছেলে, খুল্লতাত ভ্রাতৃপুত্র বোনপো মাসীর ;
 কিন্তু হায়, বুঝে না শুনিয়া ।
 অঙ্ক যে শিখেছে
 সে চাহে গাহিতে গান 'স্বর কসি',
 চায়া চাহে ভাঙ্করো হইতে রত শিল্প-বক্ষ চষি',
 মধুকর ভাবে কাব্য অপূর্ণ লিখেছে !

মুসোলিনী করিছে লড়াই,
 বেতারে কামান দেগে
 ইতিহাস লেখে রাত জেগে
 যুদ্ধ জেতে করিয়া বড়াই ।
 আর ঐ হের দূরে আধ্যাকুলনবরবি ছের হিটলার,
 পেডিগীর প্রফেট সে অভিনব
 বলে "মোরা হব, হব
 রাজা দুনিয়ার ।"

আর্থানাম ডুবে গেল ক্রুনের খুনেতে
 আর্থদর্শ যেন হায় কেনেল ক্রাবেরই রীতিনীতি
 বেওয়ারিস আর্থ রাধা আর্থান পীরিতি
 নাচিয়া ত্যজগো কুল—সফেদ জ্বামের কান্দি 'ভয়েচি' চুনেতে ।
 হে ধরণী ঘিরা হও পাগলামি ঈশ্বর তুলিয়া
 অথবা সফেদ হও বর্ণে, মাগি চুন কি চা-খড়ি ।
 অশ্বত সমুদ্র বন নীলাকাশ সহিবে না হিটলেরি ছড়ি
 হৃদয়মণ্ডলের কোন ঘেটো প্রাপ্তে নির্দাসন—আসিবে ছলিয়া ।

শ্রীমধুকরকুমার কাক্সিলাল

“সেণ্টিমেন্ট”

আমিও পুরুষ নহি। সতাই পুরুষ নহি—আমার নাম মিস্ চ্যাটার্জি, যদিও স্বাক্ষর করিবার সময় চ্যাট্‌য়ে লিখিয়া থাকি। শ্রীমতী লীলাবতী এককালে মিস্ ছিলেন বলিয়া মিসেস্ হইয়াও যেমন কলম ধরিয়াছেন, সেই নিয়মে আমি এখনও মিসেস্ হই নাই বলিয়া চ্যাটার্জি হওয়া সম্ভবও কলম ধরিতেছি।

শ্রীমতী তপতী দেবীর ‘সেণ্টিমেন্ট’ পড়িয়া তিনি নারী কি নর এ প্রশ্ন আমার মনে জাগে নাই; কিন্তু গত মাঘসংখ্যা শনিবারের চিঠিতে শ্রীমতী লীলাবতীর ‘সেণ্টিমেন্ট’ পড়িয়া তৎক্ষণাৎ মনে হইয়াছে—দিদিমণি, তোমারও গোফ আছে এবং তুমিও নিয়মিত কাছা দিয়া কাপড় পরিয়া থাক। যেহেতু পরনিন্দা করিবার আগে পরনিন্দা করাকে একটু গালি দিয়া লইলে পরনিন্দা করিবার স্ববিধা হয়, যেহেতু কাহারও প্রশংসা করিয়া সফল হইতে হইলে ভূমিকায় প্রশংসার্থ কোনো ব্যক্তির নিন্দা করা ভালো এবং যেহেতু নর হইয়া নারীর ছদ্মবেশে সমসারে প্রতিষ্ঠা খুঁজিয়া ঘুরিয়া বেড়ানো অতীব অন্তায় বলিয়া তুমি লেখার ভূমিকা করিয়াছ, অতএব দিদি গো, তুমি সতাই নারী নহ।

তুমি যদি নারী হও, এ লেখা পড়িয়া আমার নারীত্বে সন্দেহ করিবে না। সে বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত আছি। নতুবা বলিতে পারো, মেয়ের হাত দিয়া এমন লেখা বাহির হয় নাইতাদি। সেই জন্তই বলিয়া রাখি, নারী হইয়াও পুরুষের সেণ্টিমেন্টের স্ববিধা লইয়া সাহিত্যের আসরে জাঁকিয়া বসিতে লজ্জাবোধ করিয়াছিলাম বলিয়া একদা পুরুষের ছদ্মবেশে দেখানে গিয়া পুরুষদের মাথায় দিবি একচোট

‘তেরেকেটে’ সাধিয়া লইয়াছি। প্রথম প্রথম অস্ববিধা ভোগ করিয়াছি প্রচুর। প্রথম ঘোবনের ভালো ভালো লেখাগুলি সম্পাদক-গণের আন্তরিক চুৎখের বোঝা বহিয়া বারবার হাতে ফিরিয়া আসিয়াছে। ব্যাপি আজিও নানাদিক দিয়া সেজ্ঞন্ত অনেক অস্ববিধা ভোগ করিতেছি এবং যদিও আমি, ছদ্মবেশ খুলিয়া ফেলিলে (বাঙলার পুরুষকে সেণ্টিমেন্টাল বলিয়াই) চারিদিক দিয়া আমার স্ববিধার বান ডাকিয়া যাইবে তথাপি ‘গৌ’ ছাড়ি নাই। আমার মতে ‘গৌ’ নারীর অজ্ঞতম বিশেষত্ব।

শ্রীমতী তপতী দেবীর সকল কথা আমার মতে অপ্রতিবাদযোগ্য না হইলেও একটি কথা খুবই সত্য যে পুরুষকুলই আসলে খাঁটি সেণ্টিমেন্টাল। এবং দিদি, তুমিও একটি কথা বড়ই সঠিক বলিয়াছ যে আমরা প্রীজাতিরা পুরুষের নিকট ঠিক কি চাই তাহা আজও তাহাদিগকে ভাঙিয়া বলি নাই। তুমি বলিয়াছ, তাহা পুরুষদিগকে জানানো দরকার। তুমি যদি সতাই নারী হও ত’ তোমার মুখে একথা শুনিয়া শনিবারের চিঠির ভাষায় আমার মুখমুখ শিহরিয়া ওঠা উচিত। কিন্তু তুমি নারী নও। নারী হইলে এমন ভয়ঙ্কর প্রস্তাব কখনই কবিত্তে পারিতে না। অতএব আপাততঃ আমার শিহরিয়া উঠিবার প্রয়োজন নাই। প্রয়োজন কোনোদিন হইবেও না; কারণ, আমার বিশ্বাস a woman instinctively knows her business। একটি উদাহরণ দিই, যদি সতাই পুরুষ না হও, মধ্য বৃথিতে কষ্ট হইবে না।

আমার এক বান্ধবী, বয়সে আমার চেয়েও ছোট। আমরা আড়ালে তাহাকে ‘কাবলাদা’ বলিয়া ডাকি। একটি ইন্‌করিজিবল্ হাঁদা। ডানদিকের ঠোট ছুটিতে সে এক characteristic কাবলাকান্ত-হাসি

লাসিয়াই আছে। ভালো হোক মন্দ হোক যাহাই কিছু না বলে, পিছন দিকে মাথা হেলাইয়া দাঁত বাহির করিয়া ফেলিবে। বিশ্বাস করা অতিশয় কঠিন, চৌদ্দ বৎসর বয়সেও তাহার বিশ্বাস ছিল কঠোর পথে প্রসব হয়। প্রবোধবাবুর 'কাজলতা' আর কি! একেবারে THE type! এ-হেন ক্যাবলাপারও গত অগ্রহায়ণে এক চিকিৎসকের সঙ্গে বিবাহ হইয়াছে। উক্ত মাসেরই শেষাংশে বাপের বাড়ী ফিরিয়া সে আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিলাম,—

“কি লো কেমন আছিস?”

“ভালো না, অনিষ্টায় বড়ো কষ্ট পাচ্ছি।”

“সে কি লো? ঘুমবারে এইত বরষে! বরকে বলেছিলি?”

“হু-উ-উ!”

“কথা বলতে পারিস বরের সঙ্গে? কি বলি?”

ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল। মাথার উপর দুই হাত তুলিয়া আলস্য-বিজড়িত চক্ষু গা ভাঙিবার ভঙ্গি করিয়া বলিল, “বলুম পোড়া চোখে দিনরাতই ছাই খুম জড়িয়ে থাকে।”

বিশ্বয়ও আনন্দে অভিভূত হইয়া গেলাম। দিদি, সহজাত কবচ সঙ্গে লইয়াই নারী পৃথিবীতে আসে।

দেশী ও বিদেশী লেখক-লেখিকাদের অনেক লেখার সহিত আমার পরিচয় আছে। পুরুষদের লেখা পড়িয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারি, তাহারা থোলাখুলিভাবে লিখিতে ভালবাসে, তাহারা সেক্টিমেণ্টাল, তাহারা সরল। এবং আমার মতে simplicity is a trait of the foolish। মেয়েদের লেখা দেখিয়া সত্যই আনন্দিত হই। তাহারা artful, তাহারা চতুর। অবশ্য একথা সত্য যে এ-দেশের মেয়েদের চেয়ে ও-দেশের মেয়েরা অনেক বেশি স্পষ্ট কথা বলে, কিন্তু সে শুধু

আমাদের চেয়ে তাহারা পুরুষজাতিকে অনেক বেশি-পরিমাণে চিনিতে পারিয়াছে বলিয়া। তাহারাষ্ট ঠিক বুঝিতে পারিয়াছে, পুরুষের নাকের উপর দাঁড়াইয়াও অনায়াসে তাহার উভয় চোখে বড়ো আঙুল চাপা দেওয়া যায়।

নারীরা সেক্টিমেণ্টাল নয়। সেইজন্মই তাহারা কবি হইতে পারে না এবং ইহা অতিশয় আনন্দের কথা। দিদি, সত্যই যদি তোমার ব্লাউস-পরা অভ্যাস থাকে তাহা লইলে নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিতেছ, কবি হওয়া নারীর পক্ষে কতবড় লজ্জার বিষয়। জানি, তুমি এখনই কয়েক-জন মহিলার দিকে আঙুল বাড়াইয়া দিবে। তা পুরুষেরা যাহা বলে বলুক, নারী হইয়াও কি তুমি তাহাদিগকে কবি বলিবে না কি? তবে হাঁ, মেয়েদের কবিতাতেও যেদিন দেখিতে পাওয়া যাইবে,—“নহ পিতা নহ পুত্র,—” বা “দিগন্তে তোমার ধুতি থসে আচম্বিত, জগো অসম্বৃত!” এবং তাহারাও যেদিন “নায়া” লিখিতে শুরু করিবেন, শঙ্কার কথা সেইদিন! কিন্তু সেদিন কোনদিনই আসিবে না; কেননা, মহিলা-কবি equal to ‘হোনার পিতলা কলস’; but by hypothesis it is not। আর এমন অসম্ভবও যদি কোনোদিন সম্ভব হয় তখন দিদি গো, তোমার ঠিকানা পাঠাইও, আমাদের অর্থাৎ স্ত্রীজাতির দুহ্মিনের কথা শ্রবণ করিয়া তোমার সহিত গলাদাধরি করিয়া ডাক ছাড়িয়া একটু কাঁদিয়া আসিব।

তুমি নারী নও। কিন্তু দেশে সত্যকার নারীর অভাব নাই। ইহাই পরম শাস্তনা। যেদিন শুনিলাম, কলিকাতার কোনও কলেজে কোনও গ্যাতনামা লেখক অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইবেন জানিতে পারিয়া সেই কলেজের ছাত্রীরা উক্ত লেখকের লেখা শ্রীলতাবঙ্ধিত এই আঙ্কুহাতে ট্রান্সফার লইবে বলিয়া ভয় দেখাইয়াছে, সেইদিন

আনন্দে ও গৌরবে আত্মহারা হইয়া ভাবিয়াছিলাম, ভগিনীগণ, শতজীবী হইয়া জগতের নারীজাতির মুখরুপ কর। দিদি, বড়ই দুঃখের বিষয় যে, শাড়ী ও সেমিজের সঙ্গে তোমার দৈহিক ঘনিষ্ঠতা নাই, থাকিলে এই প্রসঙ্গে তোমার কানে কানে একটি কথা বলিবার ইচ্ছা ছিল।

আমাদিগকে খুশী করিবার জন্ত পুরুষেরা যে-যে-জিনিষের আশ্রয় গ্রহণ করে বলিয়া তাহার তালিকা দিয়াছ, তাহা পড়িলেই বুঝিতে পারা যায় যে তুমি কোনো কালেই শাড়ী পর নাই। রং ও তুলি বলিয়া তুমি কি বুঝাইতে চাহিয়াছ খুলিয়া লেখ নাই। যদি অর্ধ বা সম্পূর্ণ নগ্ন নারীর ছবি বা শনিবারের চিঠির ভাষায়—আধুনিক ‘গুনকলা’ mean করিয়া থাক তাহা হইলে তুমি ‘ভুল’ বুঝিয়াছ। নিতান্ত ‘ব্যাটাছেলে’ বলিয়াই এমন হাস্যকর ধারণা তোমার দ্বারা সম্ভবপর হইয়াছে। আসলে it is one of their numerous perverted proclivities। তাছাড়া আর কিছুই নহে। তাহাদেরই এক বিশেষ মনোবৃত্তিকে খুশী করিবার জন্ত তাহারা এই অস্বাভাবিক উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। তবে, কি জানি, তাহাদেরই স্বভাভি হইয়া তুমি যখন এমন অদ্ভুত কথা মনে করিয়াছ, তখন কিছুই ঠিক করিয়া বলা যায় না। হয়ত আমরা খুশী হইব ভাবিয়াই তাহার ঐক্যপ করিয়া থাকে—যা মূর্থ তাহারা!

দিদিমণিদাদা, এই ইংরেজি নববর্ষে তোমাকে যদি তোমার বন্ধুরা পুরুষের নানাভঙ্গির (কেহ দাড়ী কামাইতেছে, কেহ গালে হাত দিয়া বাগানে বসিয়া আছে, কেহ জাঙিয়া পরিয়া নৃত্য করিতেছে, কেহ স্নানান্তে একটিমাত্র ভিজা গামছা পরিয়া আছে বলিয়া লঙ্ঘ্য জড়োসড়ো হইয়া পড়িয়াছে, কেহ অর্দ্ধনগ্ন বসে বাতায়নে বসিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতেছে প্রভৃতি) ছবি সম্বলিত ‘calender’ উপহার দিতে আরম্ভ

করে তাহা হইলে তোমার মনের অবস্থা কী হয় একবার ভাবিয়া দেখ দেখি!

তোমার লেখায় আমাদের প্রতি কিছু বিজাতীয় আক্রমণ প্রচ্ছন্নভাবে রাধিবার চেষ্টা পাইয়াছ! পুরুষদের লেখায় এই-জাতীয় জিনিস অহরহ চোখে পড়িয়া থাকে। ইহা স্বাভাবিক। এ-সম্প্রদে আমাদের একটি মুখ টিপিয়া হাসা, ছাড়া আর বিশেষ তেমনকিছু বলিবার নাই।

আমরা পুরুষদের নিকট কি চাই তাহা সেই আদমের যুগ হইতে পুরুষ খুজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছে। আমাদের মনের অন্ধকারে ‘এলোপাতাড়ি’ ঢিল ফেলার আর তাহাদের বিরাম নাই। কখনো-সখনো অবাক হইয়া দেখিতে পাই, একসাধটি ঢিল সঠিক জায়গায় ‘বেলাগ’ আসিয়া লাগে। প্রথম প্রথম একটু nervous হইয়া পড়িতাম, ভাবিতাম, এই রে! কিন্তু যতই পুরুষকে চিনিতে শিখিলাম, ততই বুঝিতে পারিলাম, ভয়ের কারণ নাই। কেননা, সে পুরুষ; তাহার কান কামড়াইয়া আমাদের চাহিদার কথা জানাইলেও সে তাহা বুঝিতে পারিবে না।

দিদি, তোমার নারীকে আমি প্রচুর সন্দেহ করিয়াছি। কারণ, তোমার পুরুষ-হুলভ-বোকামী-লেখায় সে-সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ বর্তমান। যদি সত্যই নারী হও ত’ তোমার মত ‘নিরেট’ বোধহয় আর দ্বিতীয় নাই। যাই হোক কিছু মনে করিও না। যদি কখনো আলাপ হয় ত’ আমরা স্ত্রীজাতির পুরুষদের নিকট ঠিক কোন জিনিসটি চাই তাহা তোমার কানে কানে বলিয়া দিব। বিশ্বাস আছে, যতই-না-কেন বোকা হও, লোকখা শুনিলে আন্তরিক অহুমোদনসূচক কৌতুকহাস্তে নিশ্চয়ই তোমার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।

পরিশেষে তোমাকে একটি ভালো উপদেশ দিয়া যাই। বসন্তকাল আসিয়া পড়িল। তোমার উনি আপিস হইতে ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকে লইয়া সিনেমায় না গিয়া ছাদে উঠিও। সন্ধ্যার অন্ধকারে তিনি যখন তোমার গলা ধরিয়া চাঁদের আলো, মলয় বাতাস, ফুলের গন্ধ এবং কোকিলের ডাকের বিচ্ছিন্ন-বানাইয়া ইনাইয়া বিনাইয়া কানে চালিতে থাকিবেন তখন, “ঐ গো, কড়াটা উঠুন থেকে নাবিয়ে আসতে ভুলে গেছি।” “খামোতো, কে যেন ডাকচে না?” “দেখ, কাল হুটুর মা বলছিল...” “হ্যাঁ গো পাখীরা যে অত জলে ভেজে তা’ ওদের কি ছাই নিমুনিয়া হয় না?” প্রভৃতি নিতান্তই মূল্যহীন কথাগুলি মাকে মাকে প্রয়োগ করিও, আশ্চর্য্য হুকল পাইবে। বৃষ্টিলে?
(মিস্) শ্রামলীয়া চাটুযো

অপমৃত্যু

আজ আমার নিউমোনিয়ার চতুর্দশ দিবস, বোধ হয় আজই মারা যাইব। ঘোর বিকার—কি বলিতেছি কিছুই ঠিক নাই; আত্মীয়-স্বজনদেরা পাশে বসিয়া কেহ মাথায় বরফের ব্যাগ লাগাইতেছে, কেহ হাতেপায়ে গরম সেক দিতেছে, কেহ অক্সিজেনের নল নাকে ধরিয়া আছে। আমার দুইটি ফুসফুসই আক্রান্ত—সমস্ত বুকে অ্যাটিক্‌জিষ্টিন দিয়া কয়েকদিন হইল ব্যাণ্ডেজ বান্ধিয়া দিয়াছে; বেদনায়, নিশ্বাসের কষ্টে, বিকারে আমি সংজ্ঞাহারা; যেকোনো মুহুর্তে জীবনবাযু বাহির হইয়া যাইবে, হুতরাং যাহা বলিবার এখনই বলিয়া ফেলি।

কথা বেশি নহে, বিকার অবস্থাতেও বেশ বলা যাইবে। কত অর্থহীন প্রলাপই ত বকিতেছি, না হয় ঐ সঙ্গে ভাল কথাও একটি বলিলাম! এইমাত্র ত্রাণিঘটিত একটি ঔষধ এবং একটি উত্তেজক ইনজেকশন পড়িয়াছে; প্রাণভরিয়া মিনিটে-পকাশ রেটে অক্সিজেন টানিতেছি; পাল্প, মিনিটে একশত ত্রিশ; টেম্পারেচার ছিয়ানকুই ডিগ্রী; হুতরাং বলিতে বিশেষ কষ্ট হইবে না।

আমি কলেজের ছাত্র, আগামী মার্চ মাসে আমার পরীক্ষা। আই-এ পড়ি। কিছু হায়ের সরস্বতী পূজা! আজ যদি আমার মৃত্যু হয় তাহা হইলে তাহার জগৎ দায়ী এই সরস্বতী পূজা। কিছু আমি মনে করি ইহা আমার মৃত্যু নহে, অপমৃত্যু—এবং এজগৎ দায়ী সরস্বতী পূজা নহে—কি, তাহা বলিতেছি।

সব স্বপ্নের মত মনে হইতেছে। বড় রাস্তার উপরে সেই একটি মাত্র মেয়েদের হস্টেল। জানিতাম, সেইখানেই যাবতীয় সরস্বতী বিশর্জনের প্রেসেশন আসিয়া একত্র ভিড় করিবে, জানিতাম সেখানে খামিয়া তিনচারি ঘটা নানারূপ প্রক্রিয়া করিতে হইবে, ট্রাম বাস বন্ধ হইবে, পুলিশে ক্রমাগত ধাক্কা মারিবে, তবু তাহা অগ্রাহ্য করিয়া সেখানে নাচিতে হইবে, “সরস্বতী মাদ্রিক জয়” বলিয়া চাঁৎকার করিতে হইবে, ক্রমাগত ছেঁড়া কাগজ আকাশে ছুঁড়িতে হইবে, ঘোর শীতের মধ্যে শুধু নাচিয়া নাচিয়া শরীর গরম রাখিতে হইবে। সবই জানিতাম, কারণ ইহাও জানিতাম যে সে নাচ, সে গ্যাস, সে আয়োজন দেখিয়া যাহারা মুগ্ধ হইবে তাহাদের জগৎ প্রাণ-দেওয়াও পুরুষের পক্ষে গৌরবের। আমরা ছাত্র, আমরা দুর্লভের জগৎ সাধনা করি, এবং সেই সাধনায় অর্থ এবং স্বাস্থ্য দুইই আমরা অকাতরে বিসর্জন দিয়া থাকি। কারণ এ দুইটি বস্তুর উপরেই আমাদের সমান উদাসীনতা। স্বাস্থ্য বোপজ্জিত

নাহে, ঈশ্বর দিয়েছেন, ইহার প্রতি কোন মোহ নাই; আর অর্থ?—
উহা প্রতিমাসে পিতা মনিষ্ডারযোগে নিয়মিত পাঠাইয়া থাকেন।

কিন্তু সে কথা থাক। অহুস্থ হইয়া পড়িব এক্ষণ আশঙ্কা
করিয়াছিলাম, কিন্তু এই আশঙ্কা জয় করিতে বিলম্ব হয় নাই, কারণ
বিপদকে বিপদ জানিয়া তাহাতে কাপাইয়া পড়াই মহত্ব্বহ। জানিতাম,
যদি অহুস্থ হইয়া পড়ি তবু সাধনা থাকিবে; জানিতাম, যদি অস্বাভাবিক
নাকে ধরার মত অবস্থা হয় তবু আসিটিলিনের মায়া ছাড়া যাইবে না।

সে কিসের মায়া? সে কিসের সাধনা? যে দশহাজার ছেলে সেদিন
সেই হস্টেলের নিকট জমা হইয়াছিল তাহারা সকলেই এ প্রশ্নের উত্তর
দিতে পারে। আজ কেবল আমি একাই দিলাম।

দূর জানালায় দেখা গেল অস্পষ্ট আবছা মুক্তি। ঘরের আলো
নিবাইয়া তাহারা আমাদের দিকে চাহিয়া আছে। হে দুর্লভ, তোমরা
যে তোমাদের চারিদিকে কি মোহ সৃষ্টি কর তাহা জান না। তোমরা
অন্ধ, আমরা তোমাদিগকে দেখি, কিন্তু তোমরা দেখিতে পাও না।

“সরস্বতী মাস্ট্রিকি জয়” বলিয়া চৈচাইয়া উঠিলাম। দাঁড়াইবার
জায়গা নাই—‘লরি’তে আর প্রেসনকারীদের ভিড়ে কলিকাতা শহরের
শমস্ত উত্তাপ যেন সেইখানে সেই হস্টেলের নীচে আসিয়া জমা হইয়াছে,
শরীর গরম হইয়া উঠিল।

দীর্ঘ তিন ঘণ্টা ধরিয়া চীৎকার করিলাম, নাচিলাম। সরস্বতী-
মুষ্টির মুণের কাছে আলোর পর আলো জ্বলাইয়া দিলাম। হস্টেলের
দূর বাতায়ন হইতে দেবীগণ একটা মোহ বিস্তার করিয়া দশহাজার
ছাত্রকে মুগ্ধ করিয়া রাখিল। আমরা না পারিলাম এক পা অগ্রসর
হইতে, না পারিলাম থামিতে।

বলুন পাঠক,—ইহার জন্ত যদি প্রাণপণ করিতে হয় তবে তাহা

সাধক কি না! বলুন, এক্ষণ মৃত্যুতে স্থখ আছে কি না! কিন্তু পাঠক,
আমার ভাগ্যে স্থখ নাই। মৃত্যু আজ আমার নিকট ভয়ঙ্কর হইয়া
উঠিয়াছে—কারণ আমার অপমৃত্যু ঘটিতেছে। মৃত্যুতে স্থখ হয় কি দুঃখ
হয় ইহা না ভাবিয়া আপনি আমাকে বাঁচাইতে পারেন কি না তাহা
ভাবিলে বোধ হয় বেশি স্থখী হইতাম। ইহার কারণ কি জানেন?
কারণ আমি জানিতে পারিয়াছি, হস্টেলের একটি মেয়েও আমাদের
প্রেসেশন দেখে নাই। তাহারা নিজেরা সেদিন থিয়েটার করিয়া
তাহাতেই মত্ত হইয়া ছিল, এবং আমাদের জন্ম করিবার জন্ত
জানালার ধারে কয়েকটা ‘ডামি’ বসাইয়া রাখিয়াছিল!—পাঠক, এক্ষণ
অপমানমিশ্রিত মৃত্যু ইতিপূর্বে দেখিয়াছেন? অপমানের মৃত্যু, তাই ইহা
অপমৃত্যু, কিন্তু যাক। বেশিক্ষণ আর বাঁচিব না। কেবল, সেদিন
যাহাদের নিকট অপরাধ করিয়াছি, তাহাদের নিকট ক্ষমা চাহিয়া যাই;
মৃত্যু যদি গোরবের হইত তাহা হইলে ক্ষমা চাহিতাম না।

হে ট্রাম-কম্পানি, আমাকে ক্ষমা করিও। তিনঘণ্টা তোমাদের
গাড়ি চলিতে দেই নাই—অনেক লোকসান হইয়াছে—মনে কিছু
করিও না।

হে কলিকাতার অধিবাসীগণ, তোমাদের গাড়ীর পথ এবং পায়ে
চলার পথ বন্ধ করিয়া তোমাদের কাজের ক্ষতি করিয়াছি, আজ সে সব
মনে রাখিও না।

হে রোগীবৃন্দ, তোমাদের কানের কাছে তিনঘণ্টা চীৎকার করিয়া,
ব্যাঙ বাজাইয়া অনেক যাতনা দিয়াছি; প্রার্থনা করি, তোমরা শীঘ্র
আরোগ্যলাভ কর।

—ডাক্তার—ডাক্তার—

চলচ্চিত্র

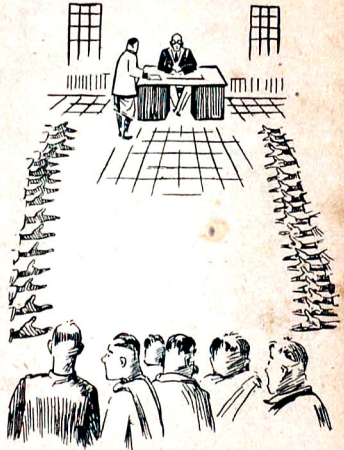
সিনেমা-বন্ধের অর্থ

টিকিট ঘর



দম বন্ধ

চাকরীর পথের গান



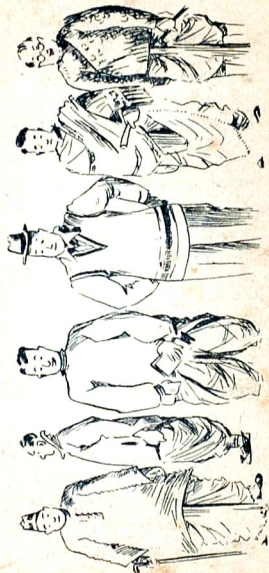
“ওগো, তুমি কিছু দিয়ে যাও……গোপনে গো”—

প্রথম শিক্ষা



এই ত বাবা মক ও পদ্দা!

এক



আমরা সবাই বাঙালী

অনলের গীতা

শুক ক্ষুদ্র বংশধর—বংশী তারে কে করিবে
 রক্ষে রক্ষে তুলিয়া স্বাক্ষর ?
 অমৃতের লাগি হায় মহামৃত্যু কে বরিবে
 তুলি' তুচ্ছ কারণ শঙ্কার ?
 সূচীভেদ্য অন্ধকার ধ্বংস করি' রশ্মিজালে
 কে আনিবে প্রতিভা তুংঘের ?
 কে কহিবে আলোকিত বিলাসের নাট্যশালে
 বজ্রবাণী করাল তুংঘের ?
 বিলাস-লাগসা-ক্লিন্ন ক্ষুদ্রতায় অস্ত্রাজের
 পঙ্কময় নিকর-নিখাস,
 স্বপ্ন দেখি তার মাঝে শতদল পঙ্কজের
 আজও হায় করি যে বিশ্বাস !
 চতুর্দিকে পুতি-গন্ধ মেঘাচ্ছন্ন মহাকাশ
 ঘনায়েছে গাঢ় অন্ধকার,
 তরুর-স্বাপদ-প্রোত জাগাইছে মহাব্রাস
 গৃহে গৃহে দূত বন্ধ দ্বার !
 তারি মাঝে স্বপ্ন দেখি ! শুনি খেন কল্পনায়
 দেবকীর প্রসব জন্মন ;
 স্বামী'র কঙ্কাল বহি' বেহলা চলেছে হায়,
 রাম করে সাগর বন্ধন !

প্রায়শ্চরী কালী করে খড়্গ সঞ্চারণ
 পদতলে দেবতা শঙ্কর,
 অসহায় ক্ষুদ্র তৃণ মুহুরিছে অগণন
 তুচ্ছ করি' উত্তর কবর !
 স্বপ্ন দেখি তাই আজও ! তাইতো আগ্রহ বশে
 আলোয়ানে ভাবি ধ্রুব-তারার,
 আলোকের তৃষা জাগে, অন্ধকারে ডাকি বসে'
 কোথা আছ দাও তুমি সাড়া ।
 কোথা সে পরম বহি জলন্ত পরশ দিয়া
 প্রজ্বলিত করিবে অন্ধার !
 কোথা সেই ভগীরথ প্রাণ-শব্দ বাজাইয়া
 উদ্বোধন করিবে গঙ্গার !
 জড়তা-পাষণ গিরি বিদারণ করি' কবে
 লাভ-স্রাবী অগ্নি দিবে দেখা,
 অন্ধকার শিহরিবে আলোকের জয়-রবে
 তারি আশে জেগে আছি একা !
 জেগে আছি অশ্রুশ্রবণেতে সঙ্গী কেহ নাহি আর
 জলিতেছে সারি সারি চিতা,
 চিত্তালোকে বৃষিতেছি কত গাঢ় অন্ধকার,
 গাহিতেছি 'অনলের গীতা' ।

“বনফুল”

সংবাদ সাহিত্য

ভারতবর্ষে শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায় মানবজীবনের লক্ষ্য ভাগ কি ভোগ, ইহা লইয়া বিবদমান হইয়াছেন। উভয়েই উভয়কে একরূপ মদুরভাবে আক্রমণ করিয়াছেন যাহাতে ভাগই যে মানবজীবনের একমাত্র লক্ষ্য ইহা সহজেই অস্বীকৃত হয়। কিন্তু ভাগ লক্ষ্য হইলেও বাংলাদেশে জন্মিয়া কলম ভাগ করা যায় না—এবং মাসিকপত্রে প্রবন্ধ ছাপার লোভও ভাগ করা যায় না, ইহাই যা মুশ্বিল। একটি গল্প শুনিয়াছিলাম। গার্হস্থ্য বড় কি সম্মান বড় ইহা লইয়া দুই জনের মধ্যে বাজি ধরিয়া তর্ক হয়। অবশেষে যিনি বলেন সম্মান বড়, তিনি জয়লাভ করেন—এবং পঞ্চাশ টাকা বাজি জেতেন। সম্মানসাবাদী গার্হস্থ্যবাদীর নিকট হইতে পঞ্চাশ টাকা লইয়া সম্মানসাধনায় কতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন সে সংবাদ পাই নাই—তবে তখন মনে হইয়াছিল ব্যক্তিগত জীবনে যাহাই আদর্শ থাকুক তর্কক্ষেত্রে একটি পুথক আদর্শ থাকে এবং সে-ক্ষেত্রে ভোগী পরাজিত হন, এবং ভাগী জয়লাভ করেন। হয়ত উভয়েরই উদ্দেশ্য থাকে কিঞ্চিৎ অর্থ উপার্জন, তাহা মাসিকপত্রে প্রবন্ধ বেচিয়া হইলেও বিশ্বয়ের কিছু নাই।

ভাগ্যাদর্শবাদী শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় কাহাকেও ভাগ করিবেন না এবং স্বযোগ পাইলেই ভোগ করিবেন। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের ইতিহাস হইতেও তিনি কিঞ্চিৎ রস উপভোগ করিয়াছেন। জাতিভেদ সত্ত্বে কঠোরতাই যে শ্রীচৈতন্য দেবের

শনিবারের চিঠি

৬২৭

বিশেষর ছিল—এবং জাতিভেদ না মানিলে যে তিনি হিন্দু-সমাজে পণ্ডিত হইয়া থাকিতেন এ-বিষয়ে সন্দেহ কি ?

জনৈক কবির জীবন-পথের কয়েকটা পাখীর সংবাদে বড়ই চিন্তিত হইলাম।—

ভদ্রবৃকের কূলে,

কোন অতীতের সাগর বাহিয়া ঢেউ আসে ছলে ছলে
বহুকাল পরে সেই লিপিতানি কুড়ায়ে এনেছ তুমি,
ওঠ কাঁপে যে বিদায় বেলায় কেস [ম ?] নে তাহারে চুমি !

আখি মোর জলভার,

জীবন পথের পাণিয়া দোদৈল করে এবে হাহাকার।

পড়িয়া অশ্রু সংবরণ করা হুঁসাধা হয়। মনে হয়, কবির জীবনের পথে বহন দোদৈল এবং কোকিলের আর্ন্তনাদ আরম্ভ হইয়াছে তখন নিশ্চয়ই সেখানে কটাস কিংবা শূগাল পরমানন্দে সঙ্গীতচর্চা করিতেছে। যুঁচুরিল বলিয়া !

একটি গল্পে—

মালতী বিষয় মুখে কপির শাক এবং ডাঁটা দিয়ে একটা
তরকারী বনিয়ে রাখছেন.....উম্মনে খাঁচ ধরে উঠেছে,
ডালের হাঁড়িটা বসিয়ে দিয়ে সে যাহোক একটা কিছু তরকারী
বনিয়ে নিতে বসেছে...

ভাষার সহিত একরূপ সহজে বীরভূম-ভঙ্গিতে বনিবনাও করিয়া লইতে পারিলে শ্রীমতী আশালতা সিংহের রচনাও তরকারী কোটার মত সহজ হইয়া আসিবে। কিন্তু তরকারী কোটা সন্দেহই বা একরূপ বৈষ্ণবীয় মনোভাব কেন ? অহিংসা অবশ্যই খারাপ, কিন্তু তরকারীকে কি

আমরা সত্যই হিংসা করি? মিথ্যা হিংসার হাত হইতে বাঁচিতে গিয়া অনর্থক ভাষা-হিংসা করিতে হয়।

“বেঙ্গল এডুকেশন উইক এণ্ড একজিবিশন ১৩৩৬”—উপলক্ষে শিক্ষা-মন্ত্রী মিঃ এম. আজিজুল হক সাহেব জীবনে বোধ হয় এই প্রথম রসিকতা করিলেন। রসিকতা করা অনেকের পক্ষে কঠিন না হইলেও রসিকতার স্বযোগ সর্বদা মেলে না। হক সাহেবের জীবনে এক্ষণ স্বযোগ পূর্বে আসিয়াছে কিনা তাহা আমরা জানি না, কিন্তু “এডুকেশন উইক” যে তাহাকে এ স্বযোগ দিয়াছে ইহাতে আর সন্দেহ নাই।

বাংলাদেশের গ্র্যাজুয়েট অধিকাংশই উপযুক্ত শিক্ষা পায় না এক্ষণা সত্য, তাহাদের উপার্জনক্ষমতা নাই বলিলেও চলে, সর্ব্ব বিষয়ে তাহারা হৃদশাগ্রস্ত এ বিষয়েও সন্দেহ নাই, কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা প্রত্যেকেই এক এক জন বন্ধ উন্মাদ এক্ষণ আমরা মনে করিতে পারি না। হক সাহেব এই গ্র্যাজুয়েটদের বিষয়ে যে মন্তব্য করিয়াছেন এবং তাহাদের অজ্ঞতার যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা যে সত্য নহে তাহা সম্ভবতঃ তিনিও জানেন। তবে ভারতবর্ষের বিকক্ষে বাহারা বিদেশে কুংসা প্রচার করে, হক সাহেবের অভিভাষণ ইংরেজিতে ছাপা হওয়াতে তাহাদের কুংসা প্রচারের দিক হইতে আর একটু সুবিধা হইবে। তবে ইহা আমরা কিছুতেই মনে করিতে পারি না যে হক সাহেব নিজের কোনো সুবিধার জন্ত ভারতের কুংসা প্রচারে বিদেশীয়কে সাহায্য করিতেছেন। ইহা বিশুদ্ধ রসিকতা (অবশ্য হক সাহেবের নিজস্ব ভক্তিতে) এবং রসিকতা ছাড়া আর কিছুই নহে।

কিন্তু রসিকতার অভ্যাস না থাকিলে বাহা হয় এ ব্যাপারেও তাহাই

হইয়াছে। অর্থাৎ ইহা দ্বারা তিনি নিজেকেই চিত্রিত করিয়াছেন। তিনি হেনিং-কলেজ-প্রবেশকামী গ্র্যাজুয়েটদের জ্ঞানের নমুনা দেখাইয়াছেন। তাহার কয়েকটি নমুনা আমরা উদ্ধৃত করিতেছি।—

How high is Mount Everest? 5440 miles.

What do the letters A. D. C stand for?

—Asiatic Dramatic Club.

Who discovered North Pole?

—Rev. Rabindranath Tagore.

What does L. B. W. stand for?—Bachelor
of Law of West Indies.

Name the most famous University
of Ancient India?

—Oxford.

How high can you raise a hockey
stick in hitting the ball?—120 ft.

আমাদের মনে হয় এই ধরণের ঘরোয়া রসিকতা ঘরোয়া ভাষাতেই মনায় ভাল। প্রসঙ্গ কথায় আমরা শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র রায়ের ‘ম্যাটি কুলেশন হাইজীন’ সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছি, ঐ বইখানাও বাংলার লেখা। কিন্তু এইমাত্র উক্ত রমেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের একখানি ইংরেজি হাইজীন হস্তগত হইল। দেপিলাম তাহার নামের নীচে লেখা আছে—
“Examiner of Hygiene and Medical Jurisprudence to the Calcutta University”। ব্যাপারটি আরও লজ্জাকর হইয়া উঠিয়াছে, কারণ ইনি ইংরেজিতেও হাইজীন লিখিয়াছেন। Airএর অধ্যায় স্থলিয়া দেখিলাম—Nitrogen is no longer considered an

element—it is a compound etc, হুতরাং রসিকতা যে আকারেরই হউক ঘরোয়া ভাষায় হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

এই মাঘ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় ‘যদি’ শব্দ দ্বারা যে বাক্যটি রচিত হইয়াছে তাহার ভিতর একটি বড় সত্য লুকাইয়া আছে।—

বাঙ্গলা ও আসামদলের সূচনা ভাল হয় নাই। সূচনার অল্পপাতে এই দল বেশ ভাল রাণ তুলিয়াছে। এই রাণ দেখিয়া মনে হয় যে বাঙ্গলা ও আসামদল হয়ত বা জয়ী হইতে পারে। স্থানীয় দল আরও বেশী রাণ করিতে পারিত যদি না দলের ভাল ব্যাটসম্যানগণ সহজে আউট হইতেন।

কিন্তু স্থানীয় দলের রাণ সম্বন্ধেই যে ইহা সত্য তাহা নহে—দুঃখের বিষয় সকল বিশ্বব্যাপারেই ইহা সত্য। ইহার উল্টা শব্দ, “হয়ত”। নমুনা—

Some mute inglorious Milton here may rest
Some Cromwell guiltless of his country's blood.

গল্পই হউক বা প্রবন্ধই হউক, কি ভাবে আরম্ভ করা যাইবে ইহা অনেকের পক্ষেই একটি বিষয় সমস্যা। ধরুন, গল্প লিখিতে হইবে। নায়ক বসিয়া আছে তাহার ভগিনীর সঙ্গে। একটু পরেই নায়িকা আসিবে। কিন্তু নায়িকা না আসা পর্য্যন্ত নায়ক কি করিবে? ভগিনীর সঙ্গে আলাপ করিবার উপযুক্ত বিষয় নাই। মাত্র এক পেয়ালা চা আছে, লেখকের বুদ্ধি খুলিয়া গেল—ঠিক ত, শুধু চা নয়, চায়ের পেয়ালায় যে জাপানী ছবি আছে উহাতেই কাব্যসিদ্ধি হইবে। জয় মা কালী! গল্প আরম্ভ হইয়া গেল—

কাঁচা সোনার রঙের চা স্বকমকে কাঁচের পেয়ালায় পরিপূর্ণ

হয়ে টলটল করছে, বিজন পেয়ালাটা হাতে নিয়ে নিঃশব্দে চায়ের পেয়ালার গায়ে আঁকা স্বর্ণাঙ্কুরের দৃষ্টের দিকে তাকিয়ে রইল। চুমুক দিয়ে নিঃশেষ করতে যেন মায়া হচ্ছে। সাধ যাচ্ছে—মিনিটের পর মিনিট এর দিকে চেয়ে থাকতে। কিন্তু অবশেষে সৌন্দর্যের পিপাসা কণ্ঠের পিপাসার কাছে হার মানল। বিজন পেয়ালাটা মুখের কাছে তুলে নিয়ে—ইত্যাদি।

কিন্তু পাঠক, ঐ পেয়ালায় যদি কোনো ছবি আঁকা না থাকিত তাহা হইলে বিজন কি করিত? ইহা সমস্যা বটে, কিন্তু সেক্ষেপ হইবে কেন? পেয়ালা কিরূপ হইবে তাহা ত নির্ভর করে লেখকের উপর। কিন্তু পেয়ালা সাদা হইলে কি গল্প লেখা যাইত না? নিশ্চয় যাইত। বিজন তখন আর পেয়ালার দিকে চাহিত না, পত্রপাঠ চায়ে চুমুক দিত এবং মুখ বিকৃত করিয়া বলিত, এঃ চায়ে যে চিনি নাই! ইহাতে অবশ্য নায়িকার সঙ্গে আলাপ জমাইতে তাহার বেগ পাইতে হইত, কেননা চা নায়িকার তৈয়ারী।

কিন্তু সে কথা এখন নহে। কারণ পেয়ালায় ছবি ছিল, এবং ইহাতে নির্দিষ্ট সময়টা নির্মিষেই কাটিল।

এমনি সময়ে উনিশ কুড়ি বছরের একটি অতি হুজী মেয়ে সলজ্জ হাস্যো দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। তার পরনে একখানি আটপোরে বন্ধরের শাড়ী এবং গায়ে হাতকাটা ডিসেন্ট ব্লাউজ। হাতে চারগাছা করে সৰু সোনার চুড়ি ছাড়া আর কোন অলঙ্কার চোখে পড়ে না, তবু খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলে চোখে পড়ে—তার গলায় সোনার হারের একটুখানি চিকচিক করছে। কালো নরম চুলগুলির অগোছালো ঝোঁপা ঘাড়ের উপর খুব

আলতোভাবে ছুঁয়ে রয়েছে; সবিতার স্নেহ-স্বিচ্ছ কণ্ঠের আশ্রানে মেয়েটি ঘরে এসে ঢুকল। বিজন চায়ের পেয়ালা হাতে ওমুখো হয়ে বসেছিল বলে তারা পরস্পর মুখ দেখতে পেলে না—কিন্তু বিজন এই উপস্থিতির প্রত্যেকটি মুহূর্ত অমূল্যব করে প্রথমে কেমন যেন সঙ্কুচিত হয়ে উঠল।

কেমন আশ্চর্য্য কৌশলে নায়ক-নায়িকার প্রথম সাক্ষাৎ ঘটান হইল। নায়কের পিঠের দিকে নায়িকা, দেখিবার উপায় নাই, শুধু অমূল্যব! এবং সঙ্কোচন! কিন্তু পাঠক, নায়ক যদি প্রথমেই নায়িকাকে সামান্যামনি দেখিত তাহা হইলে এই সঙ্কোচন কোথা হইতে আসিত? দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করিলে গলার হার দেখা যায়, কিন্তু দৃষ্টির এমন কোনো অবস্থা থাকিতে পারে না যাহাতে পশ্চাদ্ধিক দেখা যাইতে পারে।

কাজেই—

বিজন দীর্ঘে দীর্ঘে খাড়া ফিরিয়ে একবার মেয়েটির মাথা থেকে পা অবধি দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। সে দেখা নিমিষের জ্ঞান। তথাপি তার মনে হল, এইমাত্র যাকে সে দেখলে তার রূপ আছে, সে হুশ্রী, শুধু এই কথা বললে যেন তার দেহ-সৌন্দর্যের তিলাঙ্ক পরিচয় দেওয়া হয় না। সে দেহ হৃন্দর নয় সে দেহ আশ্চর্য্য। চিরকাল সে নারীকে অবজায় পাশ কাটিয়ে গেছে জীবনে তাদের কোন প্রয়োজন স্বীকার করেনি; কিন্তু আজ এই মুহূর্তে তার বিশ্বয়মুগ্ধ মন বলে উঠল এমন মেয়ের পরম প্রয়োজন হয়তো পুরুষের জীবনে থাকতে পারে—যার দ্বারা সে ফলবান হয় সমৃদ্ধ হয়।...

নারীকে বিজন অবজা করে, কিন্তু যে নারী প্রথমে পিছন দিক

হইতে দেখা দেয়, তাহার উপস্থিতির প্রত্যেকটি মুহূর্ত অমূল্যব করিয়া প্রথমত মন বা দেহ সঙ্কুচিত হয়, এবং দেখামাত্র তৎক্ষণাৎ মনে হয়, না, এমন মেয়ে নিশ্চয়ই পুরুষের দরকার। নারীর প্রতি মনের যে অভ্যন্তর অবজা তাহা দূর করিতে হইলে স্বভাবতই এত তাড়াতাড়ি হয় না। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, সাম্প্রতিক engagement এর সংখ্যা এত বেশি যে নারীবিষয়ে দূর করিবার উপযুক্ত সময় পাওয়া যায় না। এক্ষণ ক্ষেত্রে এই কৌশলটি মন্দ নহে। প্রথমত নারীকে পিছন দিকে অমূল্যব করিতে হইবে। ইহাতে যদি দেহ মন সঙ্কুচিত হয় তাহা হইলে বুঝা যাইবে যে নারী-বিষয়ে দূর হইয়া নারী-প্ৰীতি আরম্ভ হইয়াছে।

ইহার সঙ্গে আর একটি বিষয় যুক্ত হওয়া প্রয়োজন। নায়কের হাতে একখানা Jerome K. Jerome-এর বই থাকিবে। নায়িকা জিজ্ঞাসা করিবে—

আপনি বুঝি জেরোম-কে-জেরোমের (sic) ভক্ত? এই প্রশ্নে নায়ক আহত হইবে। উক্তারণের জ্ঞান নহে, অজ্ঞ কারণে। তাহা এই—

...তার হুশ্রী দেহ, তার কুণ্ডাহীন বাবহার এবং নিঃসঙ্কোচে আলাপের শক্তি তাকে কিছুক্ষণের জ্ঞান ভুলিয়ে রেখেছিল সে নারীবিষয়ে। কিন্তু এই মুহূর্তে মাদবী [নায়িকা] যখন তার সঙ্গে সাহিত্য নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হ'ল তখন অকস্মাৎ তার মনে হল তাই তো আমি যে নিজের অজ্ঞাতেই এই মেয়েটিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে ফেলেছি তার ব্যবহারে প্ৰীত হয়ে।...জেরোম-কে-জেরোম এর ভক্ত? আমি? মোটেই না।

নায়ক প্রথমত নায়িকাকে দেখিমা মনে করিবে—এক্সপ মেয়ের পরম

প্রয়োজন আছে। কিন্তু “জোরাম-কে-জোরাম” শুনিয়া তাহার মনে হইবে যাহা সে করিয়াছে সম্পূর্ণ তাহার অজ্ঞাতসারে।

—

ইহার পরে গল্পের কি হইবে জানি না। ভারতবর্ষের ক্রমশঃ-প্রকাশ। প্রথমটার নমুনা দিলাম। এই প্রসঙ্গে পুরীর হুলিয়াদের কথা মনে পড়িল। তাহারা নিজেদের প্রস্তুত কয়েকখণ্ড জোড়া কাঠের নৌকা সমুদ্রে মাছ ধরে। তীর হইতে সমুদ্রের মধ্যে অনেকটা দূর যাইতে হয়। অনেক দূরে সমুদ্র অনেকটা স্থির। কিন্তু তীরের নিকটের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চেউ পার হইয়া সেখানে যাওয়া প্রাণান্তকর ব্যাপার। প্রথম-চেউগুলি পার হইয়া গেলে তবে মাছ ধরা যায়। আমাদের গল্পলেখক-হুলিয়ারও ত্রিষ্ক সেই অবস্থা। আরম্ভেই চেউএর মধ্যে ভিগবাজী খাইতেছেন, শেষ পর্যন্ত মাছ ধরিতে পারিবেন কি না কে জানে?

—

দেশে শ্রীরামেশ্বর চট্টোপাধ্যায় ‘শিল্পধারা’ নামক প্রবন্ধে অনেক ভাল ভাল কথা বলিয়াছেন—

আট এমন একটা জিনিস যার স্থিতি অস্থিতির দ্বারা ই বোঝা যেতে পারে। আমরা কাগজ বা দেওয়ালের উপর যে সব ছবি দেখি সেগুলিই আট নয়।

আমরা এতদিন এই সংবাদটি জানিতাম না। আমরা এতকাল ছবি কেই আট মনে করিয়া আসিয়াছি। সাহিত্যের বেলাতেও তাই। উপন্যাস বা নাটক বা ছোট গল্পের বইকে সৰ্ব্বদাই মনে হইত আট। এখন অবস্থা তুল ভাঙিল।

—

আট সম্বন্ধে আরও কয়েকটা জ্ঞাতব্য বিষয় আছে—

এক কথায় বলতে শিল্পকলা ও ধর্ম একই বুদ্ধির দুটা শাখা, কারণ দুইয়েরই উৎপত্তি হয় আন্তরিক ভাব বা প্রাণের আবেগ হতে। বাহ্যিক জগতের সহিত এদের সম্পর্ক খুবই অল্প।... আমি আগেই বলেছি ললিতকলা কখনও প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে ফুটতে পারে না। ললিতকলা ও প্রকৃতির সম্বন্ধ যে খুবই ঘনিষ্ঠ। শুধু তাই নয়, ললিতকলার ভিত্তিই হ’ল প্রকৃতি।

এই দুইটি পরস্পর বিরোধী কথার ‘হার্মনি’ই এখানে আট হইয়া উঠিয়াছে।

—

কিন্তু শিল্পসমালোচক আর একটি কথা যাহা বলিয়াছেন তাহা তাহার পাঁচপৃষ্ঠাব্যাপী স্বমধুর পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণার সমস্ত অঙ্গকে ঘায়েল করিয়াছে—

তাই আজকাল দেখা যায় পাশ্চাত্য শিল্পধারা এতকাল “perspective” “light and shade” “anatomy”

ইত্যাদির অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে বর্তমানে বয়ে চলেছে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে—যেখানে নিয়ম কাহ্নন তার বিকাশের বাধা হয় না। আজকাল তাই স্থিতি হয়েছে Impressionism-এর—যাতে না আছে “anatomy” বা “perspective”-এর উৎপাত, না আছে “light and shade”-এর দৌরাণ্ডা। এগুলির স্থিতি নিছক শিল্পীর খেয়ালের বশে।

বিজ্ঞানের আবিষ্কার দেখিয়া গ্রাম্যলোক যেমন তাহাকে বলে “ইংরেজের কল” এবং পরে সে সম্বন্ধে আর কিছু জানিবার আছে বলিয়া মনে করে না—আট সমালোচক মহাশয়েরও অবস্থা সেইরূপ দেখিতেছি।

তিনি কাহার কাছে শুনিয়াছেন, শিল্পক্ষেত্রে impressionism বলিয়া একটা কথা আছে; বাস, অধিক কিছুই জানিবার প্রয়োজন নাই। হুতরাং তিনি আধুনিক বিলাতী ছবি দেখিতেছেন আর বিস্মিত হইয়া বলিতেছেন, “impressionism”! Impressionistic School কাহাকে বলে তাহা জানিলে অবশ্য এক্রপ রসিকতা করা যায় না, ইহাই আমাদের যা সাধনা। কিন্তু ইম্প্রেশনিজ্‌ম শিল্পীর ‘খেয়াল’ কেন? অজ্ঞাত সৃষ্টি কি উদ্দেশ্যমূলক?

বিচিত্রায় ‘কামরূপ’ গল্পে দেখিতেছি—

ছেলেটির মুখের দিকে বার কয়েক ছিন্ন চাহনি ফেলিয়া কহিল, “তোমার কথা যদি না মানি!”—বিপরীত দিকে একবার মুখ ফিরাইল, যেন এক গোপন হাসির ছটায় তাহার মুখটি আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে, যার রশ্মি পাশের ঐ মাছুষটির দিকে ফেলবার নয়।—সব দিয়ে সব মেলে, কিন্তু কিছুই দিয়ে একখণ্ড নারী মেলে না।

লেখক-খণ্ডের বাহাছুরী আছে। কিন্তু বিচিত্রায় সম্পাদক একপঙ পৃষ্ঠায় বলিয়াই কি এক্রপ ভাষার অহমোদন মিলিয়াছে?

দেশের “বসন্ত পঞ্চমীতে” মাধুর্য্য এবং প্রাণরসের বর্ণনা না মিলিয়াছে—

বসন্তের প্রাচুর্য্য-প্রতীক্ষমানা (sic) প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে...

অনন্ত যৌবনের প্রাচুর্য্য-পরিপ্লাবনের তরঙ্গভঞ্জে...এই বিকশমান বসন্তের প্রাচুর্য্য ও মাধুর্য্যের ভিতর দিয়া...প্রাণরসের সেই প্রাচুর্য্য যৌবনের মাধুর্য্যকে উদ্বেলিত করিয়া...ত্যাগীর রক্তসিক্ত ইতিহাস প্রাণশক্তির প্রাচুর্য্যের প্রচণ্ড লীলারই ইতিহাস...আজিকার এই ক্লেবা-পরিগত স্লিষ্ট জীবনে বসন্তের প্রাচুর্য্যের স্পর্শ কিংবা যৌবনের মাধুর্য্য অহুত্বের অবসর কোথায়?...

এত প্রাচুর্য্যেও আমরা দমি নাই, কিন্তু “প্রাণরসে আমার চিত্ত স্পন্দিত হইয়া উঠুক” এ প্রার্থনা পুরাইবে কে? স্পষ্ট দেখিতেছি, প্রাণরসে লেখক ইতিমধ্যেই ঘামিয়া ভিজিয়া উঠিয়াছেন—স্পন্দিত হইবার সময় কোথায়?

সরস্বতী পূজাই হউক কিংবা দুর্গাপূজাই হউক, বাঙালী কোনও অভিজ্ঞানে বাধ্য হইয়া ইহা করে না। পুলিশ আসিয়া লাঠি চার্জ করিতে করিতেও বলে না যে পূজা করা। পূজায় বাজি পোড়ায়, গ্যাস জালায়, আমোদ করে—তাহাও লোকে শোকে মুহমান হইয়া করে না। স্পষ্টই দেখি, আনন্দেরই করিয়া থাকে। কিন্তু তথাপি এক-জাতীয় কাগজ আছে তাহার সম্পাদক ঠিক আনন্দের দিনটিতেই গলা ছাড়িয়া কাদিতে থাকেন। বহু টাকা খরচ করিয়া বহু রং-চঙা ছবিদ্বারা কাগজ সুষোভিত করিয়া সম্পাদকীয় কাম্মা আরম্ভ করেন। দাবতীয় লোক আনন্দে মত্ত, সম্পাদক নিজেও হয়ত কিছু পূর্বে বাড়িতে আমাদের দখলীত ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু করিলে কি হয়? ঠিক সেই দিনই সম্পাদকীয় কলমে অশ্রুর বন্যা বহাইতে হইবে। দুর্গা পূজার সময় বাহা দেখিয়াছি সরস্বতী পূজার সময়ও ঠিক তাহাই দেখিতেছি—(দেখিতেছি ভুল ভাষার প্রলাপ ক্রন্দন)।

নীরব ভারতে আজ ভারতীর বীণা! ভারতের হৃদয় হইতে স্বতঃস্ফূর্ত যে আনন্দরস উচ্ছ্বসিত হইয়া একদিন বিশ্বকে অহুন্নাপিত করিত আজ সে রস শুকাইয়া গিয়াছে। শুকাইয়া গিয়াছে দীর্ঘ পরাধীনতার প্রভাবে বিশ্বভারতীর সম্পদ ভাণ্ডারে ভারতের অবদানের পথ আজ অবরুদ্ধ, অগলিত। ভারতে আজ গীতি নাই, ছন্দ নাই, নাই সে স্বাক্ষর—প্রাণের পুলক প্রসার।

পরবশতার দৈন্ত এবং দুর্দশার চাপে ভারতের দৈনন্দিন জীবন আজ অবসন্ন এবং ম্রিয়মান। অধীন এ ভারতে কে ভারতীর উদ্বোধন করিবে?

কেন, সকলেই করিতেছে। গীতি নাই, ছন্দ নাই, ইহা মিথ্যা কথা। বহু লোক আছে যাহারা উত্তম গান গাহিতে পারে, বহু লোক আছে যাহারা ছন্দ ঠিক রাখিয়া কবিতা লিখিতে পারে—পরাদীনতায় গীতি ও ছন্দের কোন ক্ষতি হয় না! পূজা করায় যদি ক্ষতি হয়, তবে উহা না করাই ভাল! পূজাও করিব অথচ কে পূজা করিবে বলিয়া প্রশ্ন তুলিব, ইহা ভাল নহে।

তাহা হইলে ত প্রতি পদে এ প্রশ্ন তুলিতে হয়। “কে ভাত খাইবে?” বলিয়াও ত প্রশ্ন তোলা যায়, অবশ্য ভাত খাইতে খাইতে। পরাদীন বলিয়া কাপড় পরিব না, স্নান করিব না, আহার করিব না, ঘুমাইব না, ইহাও ত সত্য। কিন্তু এ সবের বেলায় নীরব, আর যত দোষ পূজার বেলায়? পরাদীন অবস্থায় যদি বাঁচিয়া থাকে যায়, যাবতীয় কাজ করা যায়, বিলাসিতা করা যায়, থিয়েটার-বায়স্কোপ দেখা যায়, তাহা হইলে পূজাও করা যায়। ইহার জন্ত জন্মন কেন? তবে পূজা তুলিয়া দেওয়া মন্দ নহে। খরচের দিক দিয়া ইহাতে হুবিধা আছে। পূজায় বিদেশী গ্যাস কিনিতে হয়, বিদেশী বাজু বাজাইতে হয়—কি কাজ এই সব বাজে খরচে? “অধীন যে, বাণীর সাধনা তাহার পক্ষে সম্ভব নহে।”—তবে কি কাগজের স্বত্বাধিকারীগণই চিরকাল বাণীর সাধনা করিবে—কাগজের বেতনভোগী কণ্ঠচারীগণ করিবে না? কেবল প্রফ দেখিবে?

পুষ্পপাত্রের ছই পুষ্টার গল্পের নাম “আগুন”। গল্পের প্রধান বক্তব্যটি এই—

হ্যাঁ আগুন—আগুন, আগুন! রক্তের মত লাল আগুন—জলছে লাল আগুন প্রদীপ্ত আগুন জলছে—অন্ধ প্রত্যক্ষে সেই আগুনের তরল স্রোত—দেহে জলছে আগুন, বুকে জলছে আগুন, মাথায় জলছে আগুন—সারা বিশ্বময় নৃত্য করছে আগুনের লোল জিহ্বা। না না সে আগুনে জালা নেই—আগুনকে ভালবাসি। আপনার বলতে আছে এই আগুন...ছিল ঠিক আগুনের মত...একটা জলন্ত আগুনের শিখার মত...একটা চকল আগুনের শিখার মত...আগুনের নীল শিখাটির মতই...তার দেহের আগুনের ভেতরেও ছিল না কোন দাহিকাশক্তি!...হাসিও ছিল তার অস্ত্রের ঝনঝনানির মত...জ্বেগে উঠত অস্ত্রের সেই ঝনঝনানি...হাসি যার তীক্ষ্ণ অস্ত্রের ঝনঝনানির মত...যৌবনের মদির লাল স্রাব উঠত জলে...তাহার দেহের লাল স্রাব আগুনের মত জলন্ত জীবন্ত স্রাব...

এই আগুন এবং দেহের লাল স্রাব এবং আগুনের মত স্রাবের জন্ত কি লেখক কায়ারত্রিগেড ডাকিলেন? না, সে বিনা কারণে নিবিয়া গেল। তখন কি হইল?

তখন এই বৈশ্বানর-প্রেমিক ভাবিল—

কিন্তু কে জানত সেই ক্ষীণ স্রাবাপাত্র যাবে চুরমার হয়ে আর সেই গলিত জলন্ত স্রাব আগুনের মত বা লাল...চোখের সামনে সমস্তই দেখতে হবে লাল, আগুনের মত লাল। তার...লাল শাড়ী ছিল...তার অকের মতই...পাতলা...তার চকল তহুটিকে সেই রক্তমাখা কাপড় দিয়ে জড়িয়ে, সিঁথিতে লাল সিঁছরের...দাগ কেটে যখন সে সামনে এসে দাঁড়াত তখন মনে হত...আগুন দাউ দাউ করে!—অতুভব করতাম একটা অপ্রকাশ্য তাপ...একটা কি রকম নেশা! বারে বারে তাকে ধরে করতাম চুষন।...ফুল কিনে আনলাম...রক্তের মত লাল যাদের রং—আগুন জলে উঠল। লাল আগুন—রক্তের মত লাল আগুন...সে

তার কাছাকাছি কোন এক বৎসরে রামপ্রসাদের মৃত্যু হইয়া থাকিবে, এরূপ অনুমান করা যায়।

2

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রথম ও প্রধান গুরু একজন ভৈরবী। তাঁহার নাম যজ্ঞেশ্বরী। শ্রীরামকৃষ্ণ ভৈরবীকে যোগমায়ায় অংশ বলিতেন। তিনি অনেক শাস্ত্র জানিতেন, যেমন বিদ্যুৎ ছিলেন তেমন অসামান্য রূপবতীও ছিলেন। তাঁহার বয়স ৩৫ হইতে ৪০ অস্থান করা গেলেও, দেখিতে আরো অল্পবয়স্ক বলিয়া মনে হইত। তাত্ত্বিক সাধনার সমস্ত রহস্য তিনি জ্ঞাতিতেন। ৬৪ থানা তন্ত্র হইতে যত রকমের সাধন আছে, তা সমস্তই একে একে যুবক রামকৃষ্ণকে তিনি শিক্ষা দিয়াছিলেন। বৈষ্ণব-সাধনার অসীমুত যে মধুর ভজন,—তাও ভৈরবীর নিকট হইতেই তিনি পাইয়াছিলেন। তোতাপুরী প্রদত্ত শ্রীরামকৃষ্ণের নিবিকল্প সমাপি ভৈরবীর মনঃপুত হয় নাই; কেন-না তিনি বলিয়াছিলেন—উহাতে ভক্তির হানি হয়। ভক্তিপন্থীদের এই অভিমত প্রাচীন এবং সর্বজনবিদিত।

ভৈরবীর সহিত দক্ষিণেগেগ্রে শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ এক আকস্মিক ঘটনা। ১৮৬১ খৃঃ-এর কথা। তখন শ্রীরামকৃষ্ণের বয়স ২৫ বৎসর মাত্র। প্রথম সাক্ষাতের পরেই ভৈরবী শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার পুরুষ বলিয়া বুঝিতে পারিলেন এবং প্রকাশও করিলেন। ভৈরবী বলিলেন—

—“এই ত গৌরান্দ্র দেব নিতাইয়ের খোলে।”

(रा. भू.—पृ. १६)

শ্রীমথুর, রাণী রাসমণির জামাতা, এ কথা মানিল না। ভৈরবী পণ্ডিতদের ডাকাইতে বলিলেন,—পণ্ডিতেরা আসিয়া সভা করিয়া বসিল। ভৈরবী

যেমন সংস্কৃত ভাষা খুব ভাল জ্ঞানিতেন, তেমন কঠিন শাস্ত্র-বাক্য-সকল ব্যাখ্যা করিতেও অতিশয় নিপুণ ছিলেন। তিনি পণ্ডিতদের চোখে আব্দুল দিয়া—প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিলেন যে রাগাঙ্কিকা ভক্তি-পথে যে মহাভাবের কথা আছে,—সেই মহাভাবের চিহ্নসকল শ্রীরাম-কৃষ্ণের শরীরে বিদ্যমান। ব্রহ্মে এই মহাভাব শ্রীরাধিকার, এবং নবদ্বীপে ব্রীচেন্দ্রদেবের হইয়াছিল। স্বতরাং এই মহাভাবের অপিকারী শ্রীরামকৃষ্ণও অবতার পুরুষ। ইহাট শাস্ত্রের প্রমাণ।

এই ঘটনার ১৪ বৎসর পরে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র এবং পুরা ২০ বৎসর পরে স্বামী বিবেকানন্দ পরমহংসদেবের নিকটে আগমন করেন। ব্রাহ্মকৃষ্ণদেবকে আজও সে-সকল ভক্তেরা ঈশ্বরের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন, এবং তাঁহার কোটো ও তৈলচিত্রাদিকে রীতিমত ভোগ-রাগাদি দিয়া পূজা ও অর্চনা করেন, তাঁহাদের কণ্ঠবা, —বাঙালীর গত শতাব্দীর এই নব্যা নর-পূজার প্রথম প্রবর্তনকারিণী, অতি অদ্বুত ক্ষমতাসালিনী, ভৈরবীর শ্রুতির উদ্দেশ্যে সর্বাগ্রে মন্তক অবনত করা। এই মহীয়সী মহিলার চিরপূজা মহিমাকে, এক স্বামী বিবেকানন্দ বাতীত, অপর কেহ এতাবৎ যথেষ্ট সম্মান দেন নাই। কিন্তু এখন দেওয়া কষ্টবা।

আচার্য্য অদ্বৈত ও যবন হরিদাস যেমন চৈতন্যদেবকে অবতারের সিংহাসনে তহকারে আহ্বান করিয়াছিলেন,—ভৈরবী শ্রীযজ্ঞেশ্বরীও তেমনি সিংহিনীর মতোই পণ্ডিতদের সহিত তর্ক করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণকে, এক সঙ্গে চৈতন্য ও নিত্যানন্দের অবতার বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের ষড়ভূজ মূর্তির প্রকাশে যেমন রামচন্দ্র ও কৃষ্ণের
স্বভাবের শ্রীচৈতন্যে সংক্রামিত ও আরোপিত হইয়াছে তেমনি ভৈরবীও

শ্রীরামকৃষ্ণে যুগপৎ—শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দের অবতারত্ব আরোপ করিয়াছেন। ভৈরবী অর্থে সাধারণতঃ বৃষ্টি তাত্ত্বিক সাধনের সাদিকা—সন্ন্যাসিনী। কিন্তু তিনি শ্রীরামকৃষ্ণে আরোপ করিলেন যে অবতারবাদ তাহা বৈফবীয়। ইহা অতিশয় অদ্ভুত, তার কারণ ভৈরবী অসাধারণ।

বাল্মীকীর ইতিহাসে শ্রীচৈতন্যের পরেই, শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার-পুরুষ বলিয়া গণ্য ও মাছ হইয়াছেন। ঈশ্বর, শ্রীরামকৃষ্ণের দেহ ধারণ করিয়া বাংলাদেশের কামারপুকুর গ্রামে ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে অবতরণ করিয়াছিলেন কি না—এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ কথা নয়। বস্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্র লিখিতে গিয়া বলিয়াছিলেন—ঈশ্বর সর্গশক্তিমান। তবে তিনি ইচ্ছা করিলে মাহুয় হইয়া জন্মিতে পারিবেন না কেন? ববীজনাথ ইহার উত্তরে বলিয়াছিলেন, যেহেতু ঈশ্বর সর্গশক্তিমান, হুতরাং তাহার মাহুয় হইয়া জন্মিবার কোন প্রয়োজনই হয় না। ঈশ্বরের মাহুয়রূপে জন্মগ্রহণ করা সম্পর্কে—বাংলাদেশের ষোড়শ শতাব্দীর সঙ্গে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর বিশেষ প্রভেদ দেখা যাইতেছে না। ইতিহাসের যোগযুক্ত ঠিক আছে, ছিন্ন হয় নাই।

(৩)

কবি রামপ্রসাদের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের একটা যোগের কথা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন আমাদের বলিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিতেন,—ইতিহাস-পথে মহাপুরুষদের আগমনের পূর্বে তার আভাষ পাওয়া যায়। মহাপুরুষেরা যেন রূপ, আর কবির যেন স্বর। স্বর আগে আসে। রূপ পরে আসে। স্বর আসিলেই বুঝিতে হইবে যে রূপ আসিতেছে। চিত্তরঞ্জন

দৃষ্টান্ত দিয়া বলিয়াছেন যেমন দেখ, চণ্ডীদাসে স্বর, তারপরেই শ্রীচৈতন্যে সেই স্বরকে প্রাণময় করিয়া জীবন্ত রূপ। ঠিক তেমনি রামপ্রসাদে স্বর, আর তার পরেই, রামপ্রসাদের স্বরের অম্লযায়ী শ্রীরামকৃষ্ণে রূপ। হুতরাং চিত্তরঞ্জনের সম্প্রদায় অভিমত যে, যাহা রামপ্রসাদে স্বর, তাহাই রামকৃষ্ণে রূপ।

কবিকল্পনার বাহ্য সত্ত্বও, কথাটি ইতিহাস আলোচনার অভিজ্ঞতারূপেই অঙ্কিত হইয়াছিল। কাজেই অবহেলার বস্তু নয়।

(৪)

রামপ্রসাদের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের তুলনার কালে, যেন রাজা রামমোহনকে অতিক্রান্ত অথবা সম্তর্পণে ভিক্ষাওয়া যাওয়া হইল, মনে হইতে পারে। কিন্তু তাহা আমাদের অভিপ্রায় নয়।

রামপ্রসাদের সহিত রামমোহনের একটা যোগ ছিল, ডাঃ দীনেশচন্দ্র যেন একথা প্রথম বলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন,—দীনেশবাবুর কথা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন—কোন যোগ নাই। ইহা লইয়া এককালে অনেক হইয়া গিয়াছে। তা যাক। কিন্তু রামমোহন ব্রজসঙ্গীত লিখিতে বসিয়া, রামপ্রসাদের শ্রামসঙ্গীতকে, বহুস্থানে অম্লকরণ যে করিয়াছেন,—তার প্রমাণ হাতে-হাতেই আছে। রামপ্রসাদ গাহিলেন “অজ্ঞপা হইলে রোধ, তবে জগে তাঁর বোধ।” রামমোহন অম্লকরণে বলিলেন—“অজ্ঞপা হতেছে শেষ, বাড়িল আশা অশেষ” অথবা “অজ্ঞপা হতেছে শেষ, তাজ দস্ত রাগ শেষ।” “অজ্ঞপা” ঠিক আছে। রামপ্রসাদ গাহিলেন—“অদ্য অদ্যে শতাংশে বা অবশ্য মরিতে হবে।” রামমোহন অম্লকরণ করিলেন “অবশ্য তেজিতে হবে কিছু

দিনান্তর”। “অবশ্য” ঠিক আছে। এই রকমের আরো দৃষ্টান্ত খুঁজিলেই পাওয়া যায়।

স্বতরাং দেখা গেল রামমোহন, প্রসাদী-শ্রামাসঙ্গীত অতিশয় অভিনিবেশসহকারেই পাঠ করিয়াছিলেন। “ধাতু পাষণ মাটী মৃষ্টি, কাজ ক্রি়ে তোর সে গঠনে?” রামপ্রসাদের একথাটাও রামমোহন গভীরভাবেই অহুধাবন করিয়াছিলেন। “তারা আমার নিরাকার” প্রসাদীসঙ্গীতে এও ত রামমোহন দেখিয়াছেন? কিন্তু “কালো মেঘ উদয় হ’লো অস্তর অধরে”র সঙ্গে সঙ্গে রামপ্রসাদ যে কালীর “প্রতি-মূর্তিকে মনে কল্পনা করিতেন” এবং “বাহ্যেতেও প্রতিমা নির্মাণ করিয়া” পূজা করিতেন,—ইহাও ত রামমোহন জানিতেন।

মূর্তিপূজা—মানসিকরূপকল্পনা এবং নিরাকার,—এ তিন অবস্থাই যে রামপ্রসাদের “মনোময় যন্ত্রে”—একত্রে বিরাজ করিত, ইহা রামমোহন নিশ্চয় দেখিয়াছিলেন। অতবড় ধর্মবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা,—জগতের বিবিধ, বিচিত্র ধর্মগুলিকে বিশ্লেষণ করিয়া, তাহাদের উচ্চ, নীচ, শ্রেণী-বিভাগ, যিনি সর্বপ্রথম করিলেন, তিনি রামপ্রসাদের মনের ও ধর্মাত্ম-ভূতির তিনটি স্তর অবশ্যই দেখিয়া থাকিবেন। কেননা বিভিন্ন ধর্ম-সকলের শ্রেণীবিভাগে,—এই তিনটি স্তর সর্বত্রই রামমোহন স্পষ্ট করিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। এবং বলিয়াছেন—“বস্তুতঃ (১) কি মানস-মূর্তির অবলম্বন করিয়া (২) কি হস্ত নির্মিত মূর্তির অবলম্বন করিয়া উপাসনা করিলে অবশ্যই সাকার উপাসনা হইবে”। (ব্রাহ্মণ সেবধি) রামমোহন সাকারের পক্ষপাতী নহেন, নিগুণ নিরাকারের পক্ষপাতী। সাধারণ ব্রাহ্মেরা শুণ্ড নিরাকারের উপাসক। কিন্তু কি রামপ্রসাদ, কি শ্রীরাম-কৃষ্ণে নিগুণ নিরাকার উপাসনা প্রচুর থাকা সত্ত্বেও,—তাহাদের কাছে রামমোহনের অভিপ্রায় অহুধায়ী “এসকল কাল্পনিক উপাসনা দ্বিত্বিত্ব হয়

নাই।” এইখানেই প্রভেদ দৃষ্ট হয়। এবং রামপ্রসাদের স্বর—রাম-মোহনে নয়, পরন্তু শ্রীরামকৃষ্ণে রূপ পাইয়া প্রাপ্যময় হইয়া উঠিয়াছে, দেশবদ্ধ চিন্তবস্তুনের সেই কথাই মনে করাইয়া দেয়।

রাজা রামমোহন হইতে,—রামপ্রসাদ ও রামকৃষ্ণে পার্থক্য বুঝা গেল। রামমোহনে, প্রত্যেক ধর্মের নিম্নস্তরগুলিকে বর্জন করিবার উপদেশ আছে। রামপ্রসাদ ও শ্রীরামকৃষ্ণে, ধর্মের নিম্নস্তরগুলি বর্জনের কথা নাই। রামমোহনের ব্রাহ্মধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণের হিন্দুধর্ম বিশ্লেষণ করিয়া,—রামকৃষ্ণদেব ছইজন শানাইদারের দৃষ্টান্ত দিয়া বলিয়া-ছেন,—“একজনে পৌ দরিয়া স্রব দিতে হয়। অপরে রাজায় রাগ-রাগিণী নিচয় ॥ পৌ দরা এ ব্রাহ্মধর্ম একস্রব তায়। হিন্দুয়ানী নানা রাগ-রাগিণী ব্রাহ্মায় ॥” (রা. পু.—পৃ: ২২৪)। বাংলা সাহিত্যে এমনি সহজ উপমা দিয়া কথা বলিবার ধরণ শ্রীরামকৃষ্ণই প্রথম প্রচলন করিয়াছেন।

(৫)

রাজা রামমোহন ও শ্রীরামকৃষ্ণ,—এই দুই মহাপুরুষ হইতে গত শতাব্দীতে বাংলাদেশে দুইটি আধুনিক ধর্মসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে,—ইহা প্রত্যক্ষ। এই দুইটি ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে উপ-দল আছে, স্বতরাং দলাদলিও আছে। কিন্তু তাহা এক্ষণে আমাদের আলোচ্য নয়। রামমোহনের সম্প্রদায় মূর্তিপূজা-বিরোধী, এবং তাহাতে জাতিভেদ নাই। রামকৃষ্ণের সম্প্রদায় মূর্তিপূজক এবং তাহাতে জাতিভেদ আছে। রামকৃষ্ণ-পন্থী-সন্ন্যাসীদের মধ্যে না থাকিলেও গৃহীদের মধ্যে জাতিভেদ আছে। এইখানেই ভেদ বা পার্থক্য অত্যন্ত স্পষ্ট।

কিন্তু রামমোহন ও রামকৃষ্ণে যে এক অতি অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে,

তাহা উভয়েরই ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য। চারিত্র-পূজার দিনে, মহাপুরুষদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের প্রতি মনোযোগী হওয়া আমাদের একান্ত কর্তব্য।

—রাজা রামমোহন, তাঁহার অমাহুয়িক প্রতিভাবলে, জগতের বিবিধ ধর্মগুলিকে পর্যবেক্ষণ করিয়া বিশ্লেষণ করিয়াছেন। পরে তাহাদের মধ্য হইতে সাধারণ মত-বাহির করিয়া, উচ্চ ও নীচ ভেদ করিয়া, ধর্মগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে স্থান নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন। এই হেতু রামমোহনকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতেরা, ধর্মবিজ্ঞানের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া অশেষপ্রকারে সম্মানিত করিয়াছেন। বেদজ্ঞ পণ্ডিত মোক্ষ-মূলারের নাম এই প্রসঙ্গে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

—শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার অতি উগ্র ও তীব্র বিশ্বাসী ধর্মপিপাসা তৃপ্ত করিবার জন্ত, যতগুলি পৃথক পৃথক ধর্ম হাতের কাছে পাইয়াছেন, তার প্রত্যেকটিই নিজ জীবনে, আচার ও অভ্যুত্তি দ্বারা আত্মদান করিয়া গিয়াছেন। নারীভাবেও সাধন করিয়াছেন, হতমান-ভাবেও সাধন করিয়াছেন, এমন কি কণ্ঠভজ্ঞাদের দলে গিয়া মিশিতেও তাঁহার আপত্তি হয় নাই। মুসলমান-ধর্ম সাধনকালে, কোনরূপ মূর্তির কাছ দিয়াও তিনি যান নাই,—দেখা বা পূজা করা ত দূরের কথা। দাড়ি রাখিয়াছেন, কাছা দেন নাই,—মসজিদে গিয়া (ভাগিনেয় ফরযের ভয়ে) লুকাইয়া নমাজ পড়িয়াছেন,—অবশেষে এমন কি সেই অর্ধ-উম্মাদ ব্রাহ্মণ গোমাংস ভক্ষণের জন্ত পুনঃ পুনঃ দারুণ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। মথুরা রাসমণির জামাতা, নানা অভিলাষ তাঁহাকে গোমাংস খাইতে দেন নাই। নতুবা খাইতে তাঁহার কোন আপত্তি ছিল না।

বিভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধে, ছোটটি ভিন্ন দিক হইতে বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জনে রামমোহন ও রামকৃষ্ণ কি সাদৃশ্য নাই?

(৬)

এক্ষণে ধর্মজগতের উন্নত ও আধুনিক মনোভাব হইতেছে, এক ধর্মের লোক অপর ধর্মের প্রতি শুধু সহিষ্ণুতা নয়, সহানুভূতি প্রদর্শন করিবেন। শুধু অপর ধর্মের প্রতি নয়, অপর ধর্মাবলম্বী লোকদের প্রতিও সহানুভূতি দেখাইবেন। মুসলমান হিন্দুর নিকট, ভিন্ন ধর্মাবলম্বী বলিয়া বিভীষিকা উৎপাদন করিবে না। রামমোহনের “প্রার্থনা পত্রের” ছত্রে ছত্রে ইহার উল্লেখ আছে।

অপর ধর্মাবলম্বীদের সম্বন্ধে রামমোহন লিখিতেছেন—“জাত্যভাব আচরণ করা কর্তব্য”—“অতিশয় প্রিয় পাত্র জ্ঞান করা কর্তব্য”—“বিরোদীভাব কর্তব্য নহে” ইত্যাদি। আর শ্রীরামকৃষ্ণদেব সকল ধর্মকেই নমস্কার করিয়া, রামমোহন প্রবর্তিত, দেবেন্দ্র-কেশব পরিচালিত ব্রাহ্মধর্ম সম্বন্ধেও বলিয়া গিয়াছেন—“যতবিধ আছে ধর্ম, সবো নমস্কার ॥ ইদানীর ব্রাহ্মধর্ম যাহা ছড়াছড়ি। ইহাকেও বারবার নমস্কার করি” ॥

(রা. পু.—পৃ: ২২৪)

স্বতরাং রামমোহন ও রামকৃষ্ণ সাদৃশ্য আছে বই কি। নাই বলা চলে না।

(৭)

এম্বের ধর্ম শুধু পারমাণ্বিক ব্যাপার নয়। ঐহিকেরও প্রয়োজন আছে। স্বামী বিবেকানন্দ, শুনি, বলিয়া গিয়াছেন, “যে ভগবান আমাকে পৃথিবীতে খাইতে দিতে পারেন না, তিনি যে পরকালে আমাকে স্বর্গে অনন্ত স্বর্গে রাখিবেন, তা কেমন করিয়া বিশ্বাস করি?” বিশ্বাস করা কঠিন।

শ্রীচতুর্দশদেব (১) মুসলমান (২) নারীজাতি ও (৩) অবনত শ্রেণীকে একত্রে তাঁহার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে টানিয়া আনিয়া উন্নত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবগ্রন্থে তার প্রমাণ আছে। ফলে অনেক খ্যাতনামা মুসলমান বৈষ্ণব হইয়াছিল। নারীজাতি ও অবনত শ্রেণীও বৈষ্ণব হইয়া দগ্ধ হইয়াছিল। মুসলমানের বৈষ্ণব হওয়ার কোনই বাধা ছিল না।

রামমোহনের ব্রাহ্মধর্মে মুসলমান ও অবনতশ্রেণী আসিল না। শ্রীরামকৃষ্ণের নব্য হিন্দুধর্মেও মুসলমান বা অবনতশ্রেণী নাই। এই দুই ধর্মেই একটা পারমাণবিক সহানুভূতি অপর ধর্মের প্রতি থাকিলেও, ব্যবহারিক জগতে তার ফল কিছুই বেশী দেখা যায় নাই।

যদি মুসলমানধর্মাবলম্বী, এবং সেই সঙ্গে হিন্দু অবনত শ্রেণী, ও নারীজাতির প্রতি, শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্ম, নবযুগের জাতীয়তাবোধসম্পন্ন একটা সহানুভূতির ভাব ও তার ফলে জাতীয় একতাবোধ না আনিতে পারে, তবে যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের অত কাছে এবং এত দীর্ঘকাল থাকিবার পরেও, তদীয় ভাগিনেয় হৃদয়ের “কামকান্দন লোভ” দূর হয় নাই, তেমনি ঈশ্বর আমাদের মধ্যে জুলিলেও, আমাদের জাতীয় ভাবে উদ্ধারের আশা স্বদূরপর্যন্ত বলিয়াই ত আশঙ্কা হয়। চারিদিকের অবস্থা কোনমতেই আশাপ্রদ বলিয়া ত মনে হয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব জাতীয় জাগরণের পূর্ণাভাস। স্বামী বিবেকানন্দ এই দিক হইতেই তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন। আমরাও সেই দিক হইতেই তাঁহাকে দেখিব। এ ছাড়া অবতারণাপ্রকৃষকে দেখিবার এ যুগে আর অগ্র পথ নাই।

শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী

আত্মহত্যা

পর পর কয়েকটি আত্মহত্যার সংবাদ পাঠ করিয়া শ্রীমান পল্লব-কুমারের তরুণ হৃদয়টি কাটিয়া চৌচির হইবার উপক্রম হইল। রাজ্জে মেসের ছারপোকা-জর্জরিত থাটে শুইয়া কেবলই চিন্তা করিতে লাগিল, সমাজের এই নিদারুণ অবস্থা কিরূপে পরিবর্তন করা যায়। কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া অগত্যা সওয়া একটার সময় ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন জাগিয়া উঠিয়াও কোন লাভ হইল না। উঠিতে বসিতে স্নান করিতে থাইতে সেই এক চিন্তা। কলেজে যাওয়া হইল না। সমস্ত দিনরাত্রি ভাবিয়া ভাবিয়া শেষে স্থির করিল, যদি সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন করা সম্ভব নাও হয়, অন্ততঃ একটি তরুণীর আত্মহত্যা যদি নিবারণ করিতে পারে, তাহা হইলেও মনকে প্রবোধ দেওয়া যাইতে পারে। পুরুষ মাছ হইয়া যদি এইটুকুও সে না করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার নিজেরও আত্মহত্যাই কর্তব্য। সফল স্থির করিয়া উপায় চিন্তা করিতে আরম্ভ করিল। কে আত্মহত্যা করিতে মনঃস্থ করিয়াছে, তাহা নিরুপণের উপায় এবং তাহা জানিতে পারিলে কিরূপে তাহাকে নিরস্ত করিতে পারা যায় তাহার উপায়, প্রভৃতি চিন্তা করিতে করিতে ঘড়িতে সওয়া একটা বাজিয়া গেল।

দুই দিন পরে আনন্দবাজার পত্রিকায় একটি বিজ্ঞাপন বাহির হইল :—“যদি কোন তরুণী আত্মহত্যা করিতে মনঃস্থ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বন্ধ নং ০০০-তে একখানি পত্র লিখিয়া তাহার উত্তর

না পাওয়া পর্যন্ত আত্মহত্যা স্থগিত রাখিবেন। যে কারণে আত্মহত্যা করিতে সক্ষম করিয়াছেন, তাহার প্রতীকার হয়ত সেই পত্রের উত্তরে পাইবেন।”

বিজ্ঞাপনের উত্তর আসিল অনেক। কেহ লিখিয়াছেন, “মহাশয়, ছই ভরি আফিম সংগ্রহ করিয়াছি। আজই রাজ্যে এ জীবনের শেষ করিব সক্ষম করিয়াছিলাম, কিন্তু আপনার বিজ্ঞাপন দেখিয়া নিরস্ত হইলাম। তিন দিনের মধ্যে উত্তর না পাইলে আমার সমস্ত কার্য্যে পরিণত করিব।”

একজন লিখিয়াছেন, “মড়ার উপর খাড়ার ঘা মারিতে কি আপনার এতটুকু কষ্ট হইল না? দারুণ মনঃকষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া যে নিজেকে এ সংসার হইতে সরাইয়া ফেলিতে চায়, তাহার সহিত কি ইয়ার্কি না করিলে চলিত না?”

একজন লিখিয়াছেন, “আমি যে কারণে আত্মহত্যা করিতে যাইতেছি, তাহার প্রতীকার শিবেরও অসাধ্য, আপনি ত কোন ছার! স্বতরাং বুধা সময় নষ্ট করিয়া কোন লাভ আছে বলিয়া মনে হয় না। তথাপি, আপনি ভক্তলোক, আপনার কথাগুলো আমি অন্ততঃ এক মাস আমার সমস্ত স্থগিত রাখিলাম।”

একজন লিখিয়াছেন, “মানব-মনের সত্যিকার ধর্ম্মের সঙ্গে সামাজিক রীতির যে চিরন্তন দ্বন্দ্ব চলিয়াছে, সেই দ্বন্দ্বের সংঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া আমি এই শেষ পথ অবলম্বন করিতে যাইতেছিলাম। কেন আপনি আমায় বাধা দিলেন? যদি বাধা দিলেনই, তবে যাহাতে এ দ্বন্দ্বের সমাধান করিতে পারি, তাহার পথ বলিয়া দিবেন। ঈহারা বিনাইয়া বিনাইয়া রসাল কথাবার্তা এই দ্বন্দ্বের সঙ্গে আমার পরিচয় করাইয়া দিয়াছেন, তাহারাই ইহার কোন সমাধান বলিয়া দেন নাই।

আগামী মঙ্গলবার বেলা বারটা পর্যন্ত আপনার পত্রের অপেক্ষা করিব।”

একজন লিখিয়াছেন, “অম্মবজ্ঞের অভাব, স্বামীর নিষ্ঠুরতা, শাস্ত্রীর অমাহুষিক নির্ধাতন, অসহ্য রোগ-যন্ত্রণা, পর পর তিনটি সন্তানের শোক, তারপর পিতামাতার অশ্রুজল—এ সকল এতদিন কিরূপে সহ্য ছি, তাহাই আমার নিকট পরমাশ্রয় মনে হইতেছে। আমার বাচিয়া থাকার কোন অর্থ নাই। স্বতরাং আমাকে আর জীবনপথের মরোচিকা দেখাইয়া প্রলুব্ধ করিবেন না। আমি মরিয়াই আছি—শুধু শরীরটা ভক্ষ্মভূত হইতে যেটুকু বিলম্ব।”

একজন লিখিয়াছেন, “সেদিন আমাকে দেখিতে আসিয়া তিনি (বোধ হয় আপনারই কোন বন্ধু) আমার ছোট বোনটিকে পছন্দ করিয়া গেলেন। এ অবস্থায় আমার এ পৃথিবী হইতে বিদায় লওয়া বাতীত আর কি কর্তব্য স্বাক্ষিতে পারে, তাহা অহুগ্রহ করিয়া আমাকে লিখিয়া জানাইবেন।”

একজন লিখিয়াছেন, “গত টেষ্ট পরীক্ষার ম্যাথেম্যাটিক্সে শূন্য পাইবার পর হইতে জীবন শূন্য মনে হইতেছে। পার্থে ‘এক’ জনকে পাইলে হয়ত ‘দশ’ জনের মত এ শূন্য জীবনেরও একটা অর্থ হইত; কিন্তু বাবার মনের যেক্রপ গতি, তাহাতে আমাকে দশ জনের মত একজন করা অপেক্ষা ম্যাথেম্যাটিক্সে এক শতের মধ্যে কিরূপে একশত পাইব, সেইদিকেই তাহার চিন্তা বেষ্টী। স্বতরাং” ইত্যাদি।

একজন লিখিয়াছেন, “সার্কাস শিথিতে গিয়াই আমার এ হৃদশা! আপনি হয়ত ভাবিতেছেন, বাঙালীর মেয়ের এ সখ কেন? কিন্তু আপনি যে সার্কাসের কথা ভাবিতেছেন, আমি সে সার্কাস শিথিতে যাই নাই। কিছুদিন হইতে বাংলা সাহিত্যের মাটারপিসগুলি

পড়িতে আরম্ভ করি। ফলে শরীর ও মন ক্রমে পৃথক রাখা যায় তাহা শিখিবার জন্য ব্যাকুলতা জন্মে এবং বহু চেষ্টায় কৃতকার্যও হই। কিন্তু যে বাড়ীতে আমাকে বাস করিতে হইতেছে, এখানে শরীর ও মন পৃথক রাখিবার মত যথেষ্ট স্থান বা ব্যবস্থা নাই। ফলে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া আসিতেছে। ‘অতএব’ ইত্যাদি।

একজন লিখিয়াছেন, “বাছা, আমি তোমার জেঠাইমার বয়সী। আমাকে এরা নারীনিষেকতনে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। দেখ ত আশ্পর্দা! আমি একা এমন দশটা নিকেতন চালাইতে পারি। সেদিন পাচিল-টপকাইতে গিয়া কোমর ভাঙিয়া গিয়াছে। আমার আর বাঁচিবার সাধ নাই। যদি এর একটা সত্বপায় শীঘ্র না জানাও, তাহা হইলে এখান হইতে বাহির হইয়া তোমার মুণ্ড চিরাইয়া খাইব।”

এইরূপ বহু পত্র পড়িতে পড়িতে পল্লবকুমার ঘামিয়া উঠিল। এত পত্র আসিবে, তাহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। ইহা অপেক্ষা দুই চারিটা আত্মহত্যার সংবাদ বরং সুখীয় ছিল। ‘ভীমকলের চাক্রে ঘা মারিয়া মোটেই ভাল করে নাই। রাত্রে শুইয়া শুইয়া এইরূপ সংবদ্ধ ও অসংবদ্ধ বহু চিন্তা করিতে করিতে যখন ঘুম আসিল, তখন একটা বাজিয়া পনের মিনিট হইয়াছে। ভাগ্যে তাহার সিঙ্গল-সীটেড ঘর, নতুবা যেসের অস্ত্র লোকেরা এই সব পত্র লইয়া একটা হলস্থল বাধাইয়া তুলিত।

পল্লবকুমার ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। উঃ-স্বপ্নের সে কি ভীড়! যেন দশটার বাস্। নানাপ্রকার তরুণীমুষ্টি ত আছেই, তাছাড়া লেক, রেলের লাইন, কেরোসিনের বোতল, মেডিক্যাল কলেজ, কেমিক্যাল লেবরেটরি, সব যেন বায়েস্কেপের ছবির মত আসিতেছে

আর যাইতেছে। সর্বশেষে মনে হইল যেন অবসন্ন হইয়া সে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের রকে শুইয়া পড়িয়াছে।

সকালে উঠিয়া চাকরের হাতে গরম মুড়ি, গরম জিলিপি ও গরম চা দেখিয়া মনের রান্না অনেকটা কাটিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে চারকটা আরো কয়েকখানা পত্র রাখিয়া গেল। নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই যেন সেগুলি এন্ডেলপ হইতে বাহির করিল এবং নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেন সেগুলির উপর চোখ বুলাইতে লাগিল। আত্মহত্যা নিবারণের সাধু সঙ্কল্প ইতিমধ্যেই অনেকটা শিথিল হইয়া আসিয়াছে। একখানা চিঠি পড়িয়া তাহার মুখে যেন একটু প্রসন্নতার ভাব ফুটিয়া উঠিল এবং তখনই চাকরকে ডাকিয়া আর এক কাপ চায়ের অর্ডার দিল।

চিঠিখানি এইরূপ—“আপনার বিজ্ঞাপন দেখিয়া মনে হইতেছে, আপনি বড় ছেলেমানুষ এবং ভারি ছটু। আমার আত্মহত্যা করিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু এই বিজ্ঞাপন পড়িবার পর হইতে মনে হইতেছে, বোধ হয় আত্মহত্যা করাই ভাল। তাই আপনাকে একথা জানাইয়া আপনার পত্রের অপেক্ষায় রহিলাম। আমরা ব্রাহ্মণ। আগামী বৎসর ম্যাট্রিক দিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আত্মহত্যা করিলে আর তাহা দেওয়া হইবে না।

পুং। আমার গায়ের রং উজ্জল শ্রামবর্ণ, চুল মাঝারি। একথা লিখিলাম বলিয়া আমাকে নির্লজ্জ মনে করিবেন না। আত্মহত্যা করিবার প্রাক্কালে কাহারও লজ্জা থাকিতে পারে না।

পুং। পাছে আত্মহত্যার সঙ্কল্প নষ্ট হইয়া যায়, এই ভয়ে আজ দুই দিন আয়নায় মুখ দেখি নাই।

পুং। যদি পত্র লিখিতে ইচ্ছা না করে, তাহা হইলে যে-কোন দিন (রবিবার বাদ) ছুপুরে এখানে আসিবেন। বাবা তখন অফিসে

থাকেন। মাকে বুঝাইতে কষ্ট হইবে না। আপনি না আসা পর্যন্ত
আত্মহত্যা করিব না।

ইতি—বিনোদা মল্লিকা।”

পল্লবকুমার দোকানে গিয়া দাড়ি কামাইল। একটার সময়ে মেস
হইতে যাত্রা করিয়া সওয়া একটার সময়ে মল্লিকার বাড়ী পৌছিল।
কড়া নাড়িতেই মল্লিকার দাদা আসিয়া দরজা খুলিলেন। পল্লবকুমারের
পল্লবিত আশা যেন সহসা সমূলে বিনষ্ট হইল। তাহার শুষ্ক কণ্ঠে কোন
কথাই বাহির হইল না। কিন্তু দাদাটির অমায়িকতায় নির্ভরচিন্তে গৃহের
ভিতরে প্রবিষ্ট হইল এবং মল্লিকার আত্মহত্যা নিবারণের উপায় চিন্তা
করিতে লাগিল।

থাইয়া দাইয়া পান চিবাইতে চিবাইতে যখন পল্লব মেসে ফিরিল
তখন রাত্রি দশটা। বহু চেষ্টা করিয়াও সারা রাত্রি ঘুমাইতে
পারিল না।

কিছুদিন পরে যখন পুনরায় একটি আত্মহত্যার সংবাদ বাহির হইল,
তখন পল্লবকুমার পূর্ক বিজ্ঞাপনের উত্তরগুলি পুনরায় পড়িয়া দেখিতে-
ছিল, এমন সময়ে মল্লিকা আসিয়া বলিল, “আর বিজ্ঞাপন-টিজ্ঞাপন
দিও না কিন্তু।”

“ভাস্কর”

নাতি আধুনিক সাহিত্য

উপন্যাস ও গল্প

শনিবারের চিঠি অতিআধুনিক সাহিত্যের অনাচারে বিরক্ত হইয়া
একটা রব তুলিয়া দিয়াছিল যে আজকাল কেউ কিছু লিখিতে পারে
না। এই মতবাদের বুঝে ফিরিয়া আসিয়া তাহার কাছে পর্যন্ত
পৌছিয়াছে। ঘটোংকচ যখন কুরুকুল চাপিয়া পড়িয়াছিল তাহার
পেয়ে যে দুই চারিজন পাণ্ডবীয় বীর প্রাণ ত্যাগ করে নাই এমন কথা
বলা যায় না। শনিবারের চিঠির স্বপ্রচারিত মতবাদের তলে এমন
কয়েকজন লেখক চাপা পড়িয়াছেন, যাহাদের শনিবারের চিঠি সত্যাকারের
সাহিত্যিক মনে করেন। ইহাকেই বোধ হয় বলে সরস্বতীর
বাধ।

শনিবারের চিঠি এতদিন নেতিমূলক সমালোচনা করিয়া
আসিয়াছে। কোন্টা সাহিত্য নহে, ইহাই তাহার মুখ্য বক্তব্য ছিল;
তাহাতে যেন ভালর অপেক্ষা মন্দই বেশি হইয়াছে। কিন্তু তাহার আর
একটা কর্তব্য আছে, কোন রচনাকে সে সত্যাকারের সাহিত্য মনে করে
তাহাও তাহার বলা উচিত।

নানা কারণে একদল লেখক, সাহিত্য বাহাদের পক্ষে অব্যাপার,
বাঙালী পাঠকের সম্মুখে উদ্ভূত নাসিকা লইয়া বিরাজ করিতেছে,
অথচ বাহাদের রচনায় সরস্বতীর শ্রুতি সম্মতি আছে তাহারা অপেক্ষাকৃত
অল্পরালে পড়িয়াছেন। ইহার প্রধান কারণ বাঙালী পাঠকের মানসিক
আলস্ত; সে এমন কিছু পড়িতে চায় না, যাহাতে চিন্তা করিতে হয়।

ষষ্ঠীয় কারণ, তাহার আত্মসম্মানিতা; সে এমন কিছু পড়িতে চায়, যাহাতে সাহিত্য রস থাকুক আর নাই থাকুক, অথ দশটা বিজ্ঞার বাধা গং কিছু থাকা চাই-ই। তৃতীয়ত, এই সব সাহিত্যিক, নিজেদের সাহিত্যধর্ম সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় নহে বলিয়া আত্মসম্মানজ্ঞানশূন্য, ফলে তাহারা নিজের পায়ে হাঁটিতে ভরসা পায় না; তাহারা পাঠকের সম্মুখে আসিয়া হাজির হইয়াছে একেবারে বিখ্যাত ব্যক্তির সার্টিফিকেটের ঐরাবতে চাপিয়া।

আজকাল লেখকের সংখ্যা বাড়িয়াছে, পাঠকের সংখ্যা বাড়িয়াছে, কিন্তু ভাল লেখকের সংখ্যা বাড়িয়াছে, এমন মনে করিবার কারণ নাই। অকৃতী পুস্তকের বাহুল্যে যে-ছচারগানি ভাল বই বাহির হয়, তাহা চাপা পড়িয়া যায়। সে দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্ত কে কষ্ট করিবে? স্ব-সাহিত্যের প্রতি অবিচার চিরকাল চলিয়া আসিতেছে। কারণ প্রকৃত সাহিত্য কেবলমাত্র আপনার সার্থক অস্তিত্বের উপরে দাঁড়াইতে চেষ্টা করে, বাঁচিবার অথ সে অথ কোন শক্তির সঙ্গে প্যাক্ট করিতে ঘৃণা বোধ করে। কিন্তু অকৃতী রচনার তো আত্মসম্মান নাই, কাজেই সে ধনীর ছয়ারে খ্যাতির ছয়ারে সার্টিফিকেট খুঁজিয়া মরে। মোটরযুক্ত সাহিত্যিককেই বোধ করি মহাসাহিত্যিক বলে।

এই কয়েক বছরের মধ্যে বাঙলা সাহিত্যে-যে কয়খানি উৎকৃষ্ট গল্প, উপন্যাস, নাটক ও কাব্য প্রকাশিত হইয়াছে একে একে আমরা তাহাদের পরিচয় দিব। প্রথমেই পথের পাচালীর লেখক—

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

যাত্রা বদলের

নাম মনে পড়িতেছে।

যাত্রাবদল দশটি ছোট গল্পের সমষ্টি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এগুলি ছোট গল্প নহে, বড় গল্পের অংশ। ছোট গল্প সাধারণতঃ একটি মাত্র ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া দানা বাঁধিয়া ওঠে। বিভূতিবাবুর গল্পের বৈশিষ্ট্য এই যে ইহার কেন্দ্র কোন ঘটনাত্মক নহে, এবং সেইজন্যই ইহার পরিণাম অবগতাবী নাটকীয়তার দিকে নহে। বিভূতিবাবুর গল্পগুলির উপজীব্য স্থিতি। সে-স্থিতিও আবার অধিকাংশ স্থলে শৈশবের বা কৈশোরের।

‘ভুল মামার বাড়ী’তে হেডমাষ্টার তাঁর শৈশব ও কৈশোরের বৃত্তি মন্বন করিয়া অর্ধসমাপ্ত ভুল মামার বাড়ীর কাহিনী বলিতেছেন। ‘উইলের খেয়াল’ গল্পের নায়ক পূর্ববাবু যদিচ বৃদ্ধ, কিন্তু পরিণত বয়সে সম্পত্তির মালিক হইয়া দারিদ্র্যের হৃৎখে অবহেলিত যৌবনকে কিরিয়া পাইবার জন্ত একেবারে মৃত্যুপণ করিয়া বসিয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে ইহা বার্ল্ডকোর কাহিনী নয়। ইহা হারানো যৌবনের মৃত্যুমুখী বহ্নিয়। কাজেই ইহাকেও আমরা অল্প বয়সের স্থতির পর্ধ্যায়ে ফেলিতে পারি। ‘সার্থকতা’র নায়ক ননী হঠাৎ ধনী হইয়া গ্রামে কিরিয়া আসিয়া জীব গ্রামবাসীর প্রাণে একবারের জন্ত যৌবনের আশা ও উত্তম ফিরাইয়া আনিয়াছে। বসন্তের আগমনে যেমন পৃথিবীতে নতন করিয়া আশা ও উৎসাহ ফিরিয়া আসে তেমনি ননীর সঙ্গে যেন গ্রামবাসী বৃদ্ধদের সম্মিলিত যৌবনকালের একটা দিন ঘুরিয়া আসিয়াছে। যৌবনের স্থতির একটি দিন। ‘বাইশ বছর’ গল্পের নায়ক নিজস্বপে তাহার বাইশ বছরের বহুদিন-গত যৌবনের দীর্ঘ নিঃশ্বাসের কাহিনী বলিতেছে। ‘বৈজ্ঞানিক’ একটি ভবঘুরে ছদ্মস্ত ছোকরা। সব দোষ সত্ত্বেও লেখকের যেন তাহার প্রতি সমবেদনার ভাব আছে, কারণ তাহার কোন গুণ না থাকিলেও একটি অমূল্য ঐশ্বর্যের অধিকারী সে,—সম্মুখে

এখনো তাহার কৈশোর ও যৌবন। সতীশ 'ভানপিটে' ছেলে। জীবনের বহু অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া সে ঐশ্বর্যের মুখ দেখিয়াছে। কিন্তু বার্ককে আবার দুটি জিনিষ তাহার কিরিয়া আসিয়াছে। কৈশোরের দারিদ্র্য ও স্বত্তি। গান যেমন 'সম' কিরিয়া আসে; সে-ও তেমনি বৃদ্ধ বয়সে কাশীতে কিরিয়া গিয়াছে, হারানো কৈশোরকে খুঁজিতে। 'ঘাড়া বদল' এই গ্রন্থের শেষ গল্প; এই গল্পের নামেই বইয়ের নামকরণ। নৈনাটি ষ্টেশনে একটি ভঙ্গলোকের যুবতী স্ত্রী বিয়োগ লইয়া গল্পটি। ভঙ্গলোক স্ত্রীকে লইয়া কর্মস্থলে সংসার পাতিতে চলিয়াছিলেন। পক্ষে এই দুর্ঘটনা। অস্বাভাব্য গল্পে দেখিয়াছি লেখকের মুখ অতীতের দিকে, যাহা হইয়া গিয়াছে তাহাই লেখকের উপজীব্য। এ গল্পে পার্থক্য এই যে যাহা হইতে পারিত, তাহাই লেখকের উপজীব্য—লেখকের মুখ ভবিষ্যতের দিকে। বাহিরের এই ভেদসম্বন্ধে উভয় সগোত্র। একটিতে যাহা ঘটিয়াছে তাহার স্বত্তি, অন্যটিতে যাহা ঘটিতে পারিত, তাহার স্বত্তি—উভয়েই স্বত্তিমূলক।

'কনে-দেখা' গল্পটিও একটি লোকের বিগত জীবনের স্মৃতি-স্মরণের স্বত্তি—তবে তাহার মূলে মাহুয় নয়, একটি বিলাতী পাম গাছ। কাজেই ইহাকেও আমরা স্বত্তি পধ্যায়ী কাহিনীর অন্তর্গত মনে করিতে পারি। বিশেষ, বিভূতিবাবু জীবনকে যে দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখিয়া থাকেন, তাহাকে বৃষ্টিতে হইলে এ গল্পটি আমাদের সাহায্য করিবে।

'পেয়ালা' গল্পটির পেয়ালায় সন্দেহ নাথকের বহু মৃত্যুর স্বত্তি জড়িত, কাজেই সে-ও এই পধ্যায়ের অন্তর্গত। কিন্তু শুধু এইটুকু বলিলে যথেষ্ট বলা হইবে না—আমার মতে এই গল্পটি বাংলা সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ। সামান্য কয়েকখানি পাতায় লেখক যে অজ্ঞেয় রহস্যের রস সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা কেবলমাত্র শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের দ্বারাই সম্ভব।

একটি বস্তুকে অবলম্বন করিয়া বাস্তবাতীত রহস্য সৃষ্টিতে এ গল্পটি, অনায়াস প্রভেদ সম্বন্ধে, রবীন্দ্রনাথের ক্ষুদ্রিত পাষাণের সমকক্ষ না হইলেও সগোত্র। ইহা ভূতের গল্প না হইয়াও ভয়াবহ। সেন্সপীয়ার বলিয়াছেন, আমাদের ক্ষুদ্র জীবন বিশাল নিজ্রাবেশ দ্বারা জড়িত। এ গল্পটি সেই জীবনাতীত নিজ্রাবেশকে স্মরণ করাইয়া দেয়। আমরা যে চোখ রাখিয়া উদ্ভূত পুরুষতন্ত্রের দাঁড়াইয়া আছি, চোখ রাখা বলিয়াই তাহা বৃষ্টিতে পারি না। এই 'পেয়ালা'র মত গল্প মাঝে মাঝে আমাদের গণকে এই কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, আমাদের অন্তরাশ্মা কাঁপিয়া ওঠে। শুনিয়াছি বিভূতিবাবু পরলোক তত্ত্বের আলোচনা করেন, তিনি নিজের লেখা এই গল্পটিতে পরলোকের কি রহস্য প্রকাশ পাইতেছে, তাহা একবার ভাবিয়া দেখিবেন কি!

বিভূতিবাবুর গল্পের উপজীব্য স্বত্তি, সে স্বত্তি হয় কৈশোরের নয় শৈশবের। যে-বয়স একদিন আমাদের পক্ষে অভাস্ত সহজ ছিল, কিন্তু আজ যাহা পরমতর দুর্লভ, তাহারই স্বত্তিদ্বারা লেখক আমাদের গণকে ব্যাকুল করিয়া তোলেন। সে স্বত্তির রাজ্যে আর আমাদের ফিরিবার অধিকার নাই, এ কথা সব সময়ে আমাদের মনে থাকে না, তাই ভানপিটে সতীশ কৈশোরের কাশীতে কিরিয়া গিয়াছে, কৈশোরকে কিরিয়া পাইবার জ্ঞাত। তাই 'উইলের খেয়ালের' পূর্ববাবু মরণ পূর্ণ করিয়া বৃদ্ধ বয়সে যুবকের মত আচারব্যবহার করিতেছেন। লেখক ইচ্ছিতে বুঝাইয়া দিয়াছেন পূর্ববাবু আর হারানো যৌবনকে কিরিয়া পাইবেন না, তৎপরিবর্তে তাহার সম্মুখে মৃত্যু, আর কাশী-প্রত্যাগত সতীশের সম্মুখে তরুণকণ্ড ও ভীষণ পরিণাম—নৈরাশ্য। পূর্ববাবু বৃষ্টিতেও পারিলেন না যে তিনি আর যৌবনকাল কিরিয়া পাইবেন না। কিন্তু সতীশ কাশী ফিরিবার দুই দিনের মধ্যেই বৃষ্টিয়া লইয়াছে—'স্বর্গ আর স্বর্গ নহে।'

শুধু সতীশ ও পূর্ণকে নহে, বিভূতিবাবু পাঠকে সেই স্বপ্নের কৈশোর-যৌবনের স্মৃতির কথা স্মরণ করাইয়া ব্যাকুল করিয়া দেন, হঠাৎ আমাদের মনে পড়িয়া যায়, একদিন আমাদেরও বয়স বাইশ বছর ছিল, আর একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস উখিত হইয়া লেখকের ও নায়কদের নিঃশ্বাসের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া সেই হারানো যৌবনের রাজ্যের দিকে সমীর্ণিত হয়। বিভূতিবাবু যদি এ যুগে না জন্মিয়া দুশ বছর আগে বাংলা দেশে জন্মগ্রহণ করিতেন তবে লেখক হিসাবে তাঁহার নাম সেই দলের মধ্যে থাকিত—যাঁহার ঠাকুরমার ঝুলির অমর 'রূপকথা'গুলি লিখিয়াছেন। বয়ঃপ্রাপ্ত মাছঘের হারানো শৈশব যে-রাজ্যে আসিয়া জমা হয় বিভূতিবাবুর লেখনী যেন সেই দেশের ইঙ্গিত জানে, সে দেশের সিংহাসনের সোনায চাৰি, আমাদের মনে হয়, বিভূতিবাবুর কল্পনার মণিকোঠায় গচ্ছিত আছে।

এই তো হইল বিভূতিবাবুর বক্তব্য বিষয়। এবার দেখা যাক, তাঁহার বক্তব্য বস্তু কি? অর্থাৎ কা'দের বিষয়ে তিনি গল্প বলিতে ভালবাসেন? আমরা দেখিয়াছি তাঁর গল্পের নায়ক বালক বা কিশোর, কিম্বা বৃদ্ধ, যখন সে মনে মনে বিগত যৌবনে ফিরিয়া গিয়াছে। আবার 'কনে দেখা' গল্পে দেখিয়াছি গল্পের প্রতিনায়ক একটি বিলাতী পামগাছ। এখন এক হিসাবে শিশু, কিশোর, বৃদ্ধ এবং পামগাছ, বা প্রকৃতির মধ্যে একটি ঐক্য আছে। ইহারা সকলেই খানিকটা পরিমাণে নিষ্ক্রিয়। কঠোর জীবন-সংগ্রামের কেন্দ্রে ইহাদের কারো স্থান নয়, কেহ বা প্রবেশ করে নাই, কেহ বা তাহা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে। বয়ঃপ্রাপ্ত মাছঘের মধ্যে যে দুর্দ্দমনীয় জিয়াপ্রতিক্রিয়াশীল জীবনেক্ষা আছে, ইহাদের মধ্যে তাহা নাই। ইহারা যেন খানিকটা পরিমাণে জীবন-রত্নমঞ্চের দর্শক; কোনদিন অভিনেতা হইতে পারে,

বা ছিল, কিন্তু আজ নহে। জীবনের ঘুম পাড়ানি মাসি পিসির ঘরে ইহাদের স্থান। পূর্ণবয়স্ক জীবন-সংগ্রামে নিরত মাছঘের স্থান বিভূতিবাবুর গল্পের কেন্দ্রে নহে, তাহারা এক-আধ বার আসে যায়, কিন্তু এখানে বাসা বাধিতে পারে না। 'সার্থকতা' গল্পের যুবক নায়ক ননী গ্রামে ফিরিয়া আসিয়াছে, কিন্তু সেখানে বাসা বাধিতে পারে নাই, কারণ গ্রামের জীর্ণ পরিবেশের মধ্যে তাহাকে নিত্যন্ত বেমানান হইত। পামগাছটি শিশু বা বৃদ্ধের মত নিষ্ক্রিয় ও অসহায়, সেইজন্য তাহা বিভূতিবাবুর গল্পের মধ্যে এমন মানাইয়া গিয়াছে। জীবনের যেখানে কঠোর জীবন-সংগ্রাম দুর্দ্দর্শ কোটালের বানের মত উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়া ভাঙিতেছে, চূরিতেছে, যেখানে সজিয়া ইচ্ছা শক্তির সঙ্গে ইচ্ছা শক্তির দ্বন্দ্ব, সেই জীবনের চিরকালব্যাপী কুজক্ষেত্রের মধ্যে বিভূতিবাবুর মন যেন কল্পনায় আশ্রয় খুঁজিয়া পায় না। তাঁহার স্থান এ সবার প্রত্যন্ত প্রদেশে তিনি শৈশবের সীমান্ত প্রদেশের কবি—যে সীমান্তে প্রকৃতি এবং শিশু এবং বৃদ্ধ শিশুর দ্বিতীয় শৈশব আসিয়া মিলিয়াছে।

তারপরে তাঁর গল্পের পরিবেশও তাঁর বক্তব্য বস্তুর অধরূপ। প্রধানত তাহা পাড়াগ্রাম, যেখানে জীবন-সংগ্রাম কঠোর নয়। কলিকাতা শহরেও কয়েকটি গল্পের পরিবেশ বটে, কিন্তু শহর সেখানে উগ্রমুষ্টি নয়। শহরের মধ্যে যে-অংশটাতে খানিকটা পরিমাণে পাড়াগ্রামের আভাস পাওয়া যায়, সেই গলিতে, ছোট রাস্তায় বা বৈঠকখানায় চারাগাছের বাজারের একান্তে।

আবার এই গল্পগুলি বলিবার শুনিবার বা ঘটিবার কালও তাঁহার বক্তব্য বস্তুর অধরূপ। স্মৃতি কথা শুনিবার কাল বর্ষা সন্ধ্যা, বা বর্ষার সন্ধ্যাসম মেঘাচ্ছন্ন দূপুর, বা শীতের সন্ধ্যা ছাড়া আর কি হইতে

পারে! তাঁহার স্মৃতিমূলক অনেক গল্পই বর্ষা সন্ধ্যায় গরম মূড়ির অল্পপান যোগে কথিত।

বিভূতিবাবুর অধিকাংশ গল্প উত্তম পুরুষে কথিত। স্মৃতিকথা ঘটনা নহে, স্বভাবতই ইহা কথিত হইবার যোগ্য। অনেকস্থলে লেখক নিজের কথক, অনেক স্থলে গল্পের নায়ক প্রথম পুরুষে গল্প বলিয়া চলিয়াছেন। যে গল্পে সক্রিয় ইচ্ছাশক্তিমান মানুষ লইয়া কারবার সেখানে উত্তম পুরুষের কথনপদ্ধতি উপযুক্ত না হইতে পারে, কিন্তু যেখানে গল্পের নায়ক, প্রতিনায়ক, অধিনায়ক, উপনায়ক নিক্রিয় ব্যক্তি সেখানে ইহাই যোগ্য পদ্ধতি, লেখক তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। বিশেষ, স্মৃতিকথার পক্ষে ইহা একেবারে অনিবার্য বলিলেই চলে।

বনফুলের তৃণথণ্ড

“বনফুল” এই ছদ্মনামের অন্তরালে লুকাইয়া থাকিয়া জীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় এতদিন ধরিয়া ব্যঙ্গ কবিতার তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করিয়া আসিতেছিলেন। এবার তিনি গল্প লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তৃণথণ্ড তাঁহার লিখিত প্রথম গল্পগ্রন্থ।

ইহা একটি ডাক্তারের জীবনকথা। ডাক্তার এবং উকীল স্বভাবতই এমন কাজ করিয়া থাকেন যাহাতে তাহাদের পক্ষে মানুষের জীবনের অনেক বীভৎস, নৃশংস, স্বার্থপর মনোভাব দেখা অনিবার্য হইয়া পড়ায়। এই সব উপজীব্য লইয়া দুর্দান্ত বাস্তবমূলক গল্প লেখা স্বাভাবিক। কিন্তু এই গ্রন্থে আর একটা দিক আছে যাহা সব ডাক্তারের জীবনে ঘটে না, কারণ সব ডাক্তার কল্পনাবান নহে। বনফুল এক সঙ্গে কবি ও কবিরাজ (ডাক্তার)। ইহাতে একদিকে দুর্দমনীয় বাস্তবের স্রোত, আর তার পাশাপাশি সমান দুর্দমনীয় কল্পনার লীলা। কল্পনা ও

বাস্তবের যুক্ত বেগীর খরস্রোতে মানুষ অসহায়ভাবে তৃণথণ্ডের মত ভাসিয়া চলিয়াছে, ইহাই বোধ করি লেখকের বক্তব্য।

কল্পনা-অংশ ডাক্তারের ব্যক্তিগত জীবনের নিভৃততম কাহিনী, তাহার সঙ্গে বাহিরের ঘটনার কোন যোগ্য নাই। এই অংশের ভাবের বাহন হৃদয়াবেগ; অনেক সময়ে হৃদয়াবেগের প্রাবল্য কবিতার রূপ গ্রহণ করিয়াছে। আবার বাস্তব-অংশের ভাবের বাহন ব্যঙ্গ। কল্পনা ও বাস্তব হৃদয়াবেগ ও ব্যঙ্গের দ্বারা প্রকাশিত। ইহাতেই লেখকের কৃতিত্ব।

ছই নৌকায় পা দিয়া চলা কঠিন, কিন্তু একেবারে অসম্ভব নয়। কিন্তু এক পা বাস্তবের গোবর গাড়িতে, অল্প পা হৃদয়াবেগের আকাশ-চারী এরোপ্লেনে দিয়া চলা, না দেখিলে বিশ্বাস হয় না। বনফুল তাহাতে রক্তকার্ষ্য হইয়াছেন, বিশ্বাস না করিবার আর উপায় নাই।

ইহার প্রধান কারণ কল্পনা ও বাস্তবের বিপরীত ধর্ম লেখকের সমর্থ। ব্যঙ্গ যদি তাঁহার পক্ষে একটি pose মাত্র হইত, তবে পদে পদে বিপদের আশঙ্কা থাকিত। কিন্তু ব্যঙ্গ বনফুলের জন্মগত দৃষ্টি-ভঙ্গি। ব্যঙ্গ আর কিছুই নহে, সত্যের বিপরীত মূর্তি। জলের মধ্যে নিসর্গের যে-ছায়া উল্টাভাবে প্রতিবিম্বিত হয়, তাহা নিসর্গের ব্যঙ্গ। জীবনের ব্যঙ্গরূপ অর্থাৎ বিপরীত রূপ তাহাদেরই কাছে যথার্থ সহজ, যাহাদের অন্তরে জ্বলাশয় আছে, যেখানে জীবনের ব্যঙ্গরূপ প্রতিবিম্বিত। বনফুলের হৃদয়ে কল্পনার সেই সরোবর আছে, যেখানে বাস্তব উল্টা ভাবে প্রতীয়মান। কাজেই তাঁহাকে আর তথাকথিক satirist-এর দ্বায় বাহিরে খুঁজিয়া বেড়াইতে হয় না। বাস্তবিক পক্ষে কল্পনা ও ব্যঙ্গ ছই বিভিন্ন শক্তি নয়, ইহা একই শক্তির বিভিন্ন প্রকাশ। সেই জ্ঞপ্ত দেখা যায় পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ লেখকদের কাছে জীবনের ironyটা

স্বতঃপ্রকাশ। এবং আপাত-পৃথক এই দুই শক্তিই জীবনের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়াছে।

নিছক বাস্তব রচনা আছে, আবার স্বদয়্যাবেগ-প্রধান রচনাও আছে। কিন্তু তুণথণ্ডের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে বাস্তবকে কল্পনার শিখর হইতে দেখা হইয়াছে, এবং কল্পনাকে বাস্তবের রূঢ় মস্ত্যাকুটি হইতে দেখা হইয়াছে। এবং এই বিনিময়-দৃষ্টির সামঞ্জস্যের ফলে ছুটির যথার্থ মুক্তি ধরা পড়িয়াছে। তথাকথিত তরুণগণের বাস্তব গল্প যে অবাস্তব বলিয়া মনে হয়, তাহার কারণ বাস্তব তাহাদের কাছে সত্য নহে। সত্যকে দেখিতে হইলে একটু দূরে দাঁড়াইতে হয়, সে দূরত্ব দেশকালের হইতে পারে; তদভাবে কল্পনার দূরত্ব থাকা প্রয়োজন। যে-বাস্তবকে তাহারা আঁকিতে চাহিয়াছে, নিজেরা সেই বাস্তবেরই অংশ হওয়াতে তাহাকে পৃথক করিয়া দেখিতে পারি নাই। বনফুল নিজের মধ্যে দ্বিধা করিয়া বাস্তবকে কল্পনার ব্যবধান হইতে এবং কল্পনাকে বাস্তবের ব্যবধান হইতে দেখিতে সমর্থ হইয়াছেন। এবং সেইজন্মই তাহার বাস্তব কল্পনাময় এবং কল্পনা বাস্তব হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

শেষ রক্ষা

সুপ্রসিদ্ধ গল্পলেখক অথুজাক্স ভৌমিক অতিশয় চিন্তাগ্রস্ত। বর্তমান বাজারলেখক মাঝেই একটু বিপন্ন। ভাল লেখার সম্বন্ধার নাই, ভাল লেখার বাজার-দর কম এবং ভাল লেখাকে ক্ষত বিক্ষত করিবার জন্ম একদল সমালোচক সর্বদাই সশস্ত্র হইয়া আছেন। ভৌমিক

মহাশয়ের বর্তমান চিন্তার কারণ কিন্তু স্বতন্ত্র। তিনি গত পরশ্ব হইতে একটি গল্প শুরু করিয়াছেন—খুব মনোরম ভাবেই শুরু করিয়াছেন—(লিখিতে লিখিতে নিজেরই তাহার বার কয়েক রোমাঞ্চ হইয়াছে)—কিন্তু কি করিয়া এই বিশ্বয়কর উপাখ্যানটি তিনি শেষ করিবেন তাহা তাহার মাথায় কিছুতেই আসিতেছে না। গল্পের শেষ রক্ষা করা সত্যিই একটি দুর্লভ সমস্যা—গল্পলেখক মাঝেরই তাহা জানা আছে। শেষ-বরাবর আগিয়া ভৌমিক মহাশয় লেখনী সঞ্চরণ করিয়া বসিয়া আছেন। সকাল হইতে চার পেয়লা কড়া চা এবং এক প্যাকেট সিগারেট শেষ হইয়া গিয়াছে—গল্প কিন্তু শেষ হইতে চাহে না।

ভৌমিক মহাশয় বসিয়া আছেন—নির্জন জিতলের ঘরটিতে। ঘরের কপাটটি খোলা ছিল এবং সেই মুক্ত দ্বারপথ দিয়া কিঞ্চিৎ বাতাস, স্বীয় কণ্ঠস্বর, ছেলেমেয়েদের ছড়োমুড়ির শব্দ এবং ছুটি বায়সের চাঁৎকারধ্বনি প্রবেশ করিতেছিল। বাতাসটা মন্দ লাগিতেছিল না—কিন্তু উপরোক্ত শব্দগুলির প্রত্যেকটিই যেন গল্পের প্রটটিকে গলাধাক্কা দিয়া মত্তিক হইতে বিদূরিত করিয়া দিতেছে—ভৌমিক মহাশয়ের এইরূপ মনে হইল। তিনি জ্রু ক্লান্ত করিয়া দ্বার-দেশ অর্গলবদ্ধ করিলেন এবং একটি ভীমকাস্তি সিগার ধরাইয়া হাঁটু নাচাইতে লাগিলেন। এই ভাবে কিছুকণ কাটিল। জাহ্নবুল পরিশ্রান্ত হইল—কিন্তু গল্পের কোন সুরাহা হইল না। ভৌমিক মহাশয় তখন ক্রান্ত হাঁটুকে আর না ঘাঁটাওয়া দক্ষিণ কর্ণটি লইয়া পড়িলেন। একটি দিয়াশালাই কাঠি স্তম্ভপূর্ণে তিনি দক্ষিণ কর্ণ-বিবরে প্রবেশ করাইয়া দক্ষিণ চক্ষু ও গণ্ডদেশ ক্লান্ত করিলেন। গল্পের শেষটা আজ লিখিয়া দিতেই হইবে—কারণ গল্প দেওয়ার আজই শেষ দিন। আজ গল্পটি দিতে না পারিলে “চমৎকারিণী” নামক মাসিক পত্রিকায় তাহার স্থান এ মাসে অন্ততঃ হইবে না। এ

মাসে না হইলে পঁচিশটি টাকা ত মারা যাইবেই—উপরন্তু তিনি গৃহিণী এবং সম্পাদক উভয়েরই নিকট খেলে হইয়া যাইবেন।

সম্পাদককে কথা দিয়াছেন যে একটি বৃহৎ এবং চমকপ্রদ গল্প তিনি পঁচিশ টাকা পাইলে লিখিয়া দিবেন এবং তৎপূর্বে তিনি গৃহিণীর নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, আগামী মাসে তিনি তাঁহাকে পঁচিশ টাকা দিয়া একখানি মুগার শাড়ী খরিদ করিয়া দিবেনই দিবেন। দ্বিতীয় পক্ষের গৃহিণীকে সন্তুষ্ট করিতে হইবে বৈ কি।

গৃহিণীকে সন্তুষ্ট করিতে হইবে বলিয়াই তিনি “চমৎকারিণী” পত্রিকায় আদৌ লিখিতে রাজী হইয়াছেন। তাহা না হইলে তিনি ওরূপ তৃতীয় শ্রেণীর কাগজে উত্তেজক গল্প লিখিতে রাজী হইতেন কি? অধুজ্ঞাপ্ত ভৌমিক একজন নামজাদা রক্ষণশীল লেখক। চিরকাল তিনি তাহার প্রত্যেকটি গল্পে পুণ্যের জয় ও পাপের ক্ষয় দেখাইয়া আসিয়াছেন এবং এই ধরণের গল্প ভৌমিক মহাশয়ের হাতে খোলেও ভাল। তাহার লিপিত “হিন্দু-বৈজ্ঞান্য” গ্রন্থের পাতায় পাতায় উপদেশ। গল্পচ্ছলে নীতিকথা প্রকাশ করিতে তিনি অস্বীকার্য। তাহার ‘বন্ধ-বিষাণ’ নামক গ্রন্থটি প্রত্যেক যুবক-যুবতী, শুধু যুবক-যুবতী কেন, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই পড়িয়া দেখা উচিত। এ হেন ভৌমিক মহাশয় প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমায় উপনীত হইয়া কেবল গৃহিণীর মনোরঞ্জনার্থেই এক ছায়াবলা কাগজের সম্পাদকের ফরমায়েস অমুখ্যায়ী এই ফ্যাসাদে পড়িয়াছেন। নীতিমূলক তাহার একটি স্বন্দর গল্প ছিল। কেমন করিয়া বিলাসপুরের ধর্মাত্মা জমিদার একটি অজাতকুলশীলা রমণীর সত্য রক্ষার নিমিত্ত সর্বস্বান্ত হইয়া পথে দাঁড়াইলেন—কেমন করিয়া ছুরাত্মা ধনী মাধবলাল বজ্রাঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হইল এবং কেমন করিয়া আবার সেই সর্বস্বান্ত জমিদার কেবলমাত্র পুণ্যবলে এক

সন্ন্যাসীর সহায়তায় হস্তচ্যুত জমিদারী পুনরুন্নয় প্রাপ্ত হইলেন—এই সমস্তই স্বন্দর প্রাঞ্জল ভাষায় তিনি তাহার “সতীর আশীর্বাদ” নামক গল্পটিতে লিখিয়াছিলেন। কিন্তু “চমৎকারিণী”র সম্পাদক মহাশয় মাইনাস্থী চশমা পরিধান করিয়া সম্ভবতঃ কন্টিনেন্টাল ভাব-রাজ্যের অলি-গলিতে ঘুরিয়া বেড়ান—তিনি উক্ত গল্পটি পছন্দ করেন নাই এবং কি ধরণের গল্প হইলে তাহার পছন্দ হইতে পারে তাহারও অভাস দিয়াছেন। তরুণী গৃহিণীর অভিমানভরা মিষ্ট মুখখানির খাতিরে “যা থাকে কপালে” বলিয়া পরশ দিন হইতে ভৌমিক মহাশয় কোমর বাধিয়া লাগিয়া পড়িয়াছেন। বদ্বপরিষ্কার হইয়াও বিশেষ কিছু হ্রিধা হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে না। শেষ-পর্যন্ত কানে দিয়াশালাই কাঠিও ঢুকাইতে হইয়াছে।

২

“উঃ” বলিয়া কাঠিটি ভৌমিক মহাশয় কান হইতে বাহির করিলেন। বাতায়ন-পথে চাহিয়া দেখিলেন খোলার বাড়ীর চালে বসিয়া একটি বীর হুম্মান পাত খিচাইতেছে এবং একটি বুদ্ধা তদর্শনে নিজের বড়িগুলি সামালাইতেছেন। ভৌমিক মহাশয় যে গল্প জাদিয়াছেন এই সব অকিঞ্চিৎকর দৃশ্য তাহাতে কাজে লাগিবে না ভাবিয়া তিনি চক্ষু অন্ধরিকৈ ফিরাইলেন। অন্ধরিকৈ মানে ঘরের দেওয়ালের দিকে। কিন্তু ভৌমিক মহাশয়ের ভাড়াটে গৃহের দেওয়ালেও এমন কোন কিছু ছিল না যাহা তাহার “প্রেমের জ্বল” নামক গল্পের শেষরক্ষা করিতে পারে। নিরুপায় হইয়া ভৌমিক চক্ষু মুদ্রিয়া চুকটে একটি টান দিলেন। টান দিয়াই বৃষ্টিলেন চক্ষু খুলিতে হইবে। চুকট নিভিয়াছে, ধরান দরকার। নিপুণভাবে চুকটি তিনি ধরাইলেন। ধরাইয়া ভাবিতে

লাগিলেন এ অবস্থায় কি করা উচিত। নায়ক নায়িকার বাড়ীর পাঁচিল ডিঙাইয়াছেন। অমাবস্তার দ্বিপ্রহর রাত্রি। টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতেছে। নায়ক গুঁড়ি মারিয়া আসিয়া একটি পেয়ারা গাছের তলায় আশ্রয় লইবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু সম্মুখে একটি গরু থাকতে আর অধিকদূর অগ্রসর হইবার সাহস তাঁহার হইতেছে না।

ভৌমিক মহাশয় এই পর্য্যন্ত অবলীলাক্রমে লিখিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু ইহার পর আর কি লিখিলে আট বজায় থাকিবে, নায়ক আর কোন কোন দ্রুত প্রক্রিয়া করিলে তাহা সম্পাদকের মনোহরণ করিতে পারিবে তাহা ভৌমিক মহাশয়ের মাথায় কিছুতেই আসিতেছে না। তিনি চিরকাল পুণ্যের জয় ও পাপের পতন চিত্রিত করিয়া আসিয়াছেন—এই অশ্লীলমনা নায়ককে লইয়া এখন কি করা কর্তব্য তাহা তিনি ভাবিয়াই পাইতেছেন না। ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার ইচ্ছা করিতেছে ‘বেল্লিককে চাবকাইয়া উহার পিঠের ছাল ছাড়াইয়া ফেলি! কিন্তু আট তাহাতে ক্ষুধ হইবে এবং আট ক্ষুধ হইলেই পঁচিশটি টাকা।

উঃ ভগবান, এ কি সমস্যা! তখন তিনি প্রাণপণে ভগবানকেই ডাকিতে লাগিলেন—“ঈশ্বর এ উভয়-সদৃশ হইতে আমাকে বাঁচাও। পাপের চিত্র আমি আঁকিতে পারিব না—অথচ গৃহিণীকেও চটাইতে পারিব না। দয়াময়, দয়া কর।”

ভগবান যেন স্বকর্ণে শুনিলেন।

ছুই মিনিটে সব ঠিক হইয়া গেল।

ভূমিকম্প হইয়া যাইবার পর কম্পাদিতকলেবর ভৌমিক মহাশয় নামিয়া দেখিলেন দেওয়াল চাপা পড়িয়া তাঁহার পত্নী মারা গিয়াছেন। মৃগার শাড়ীর আর দরকার হইবে না।

“বনফুল”

প্রবন্ধের মধ্যে বিজ্ঞাপন

পেটেন্ট ঔষধের গুণগানপূর্ব প্রবন্ধ ছাপা বাংলা সাময়িক পত্র সম্পাদকের রীতি হইয়া পড়িয়াছে। সামান্য অর্থ লোভে যাহারা একপ হীনতা সহ করিতে রাজি হয় তাহাদের বিরুদ্ধে সামাজিক কোনো শাসন নাই। ইহারা সাহিত্য-সমাজে পতিত, অর্থ লোভে ইহারা বাহা ইচ্ছা করিতে পারে—দেশ সেবার নাম করিয়া দেশের ক্ষতি করিতে ইহাদের বাধে না। আমরা বহুদিন ধরিয়াই বলিয়া আসিতেছি, বিজ্ঞাপনে যে সকল অতিশয়োক্তি থাকে তাহা বিজ্ঞাপন-সাহিত্যেরই ভাষা। কেহ তাহা পড়িয়া তাহাকে বৈজ্ঞানিক সত্য হিসাবে গ্রহণ করে না, বিজ্ঞাপন হিসাবেই গ্রহণ করে।

বিজ্ঞাপন দাতা এবং ভাবী ক্রেতার মধ্যে সরল যোগাযোগ। কোনো দেশে সম্পাদক কোথায়ও ঘূষ খাইয়া গুপ্ত কৌশলে কোনো জিনিষের গুণ প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করে না। কিন্তু এ দেশে সবই সম্ভব। এ দেশে সাধারণ কাগজের সম্পাদকদের লেশমাত্র দায়িত্ব জ্ঞান নাই, আভিজাত্য বোধ নাই—ভদ্রতার আদর্শ নাই—বিবেক নাই—টাকার বিনিময়ে (অনেক ক্ষেত্রেই তাহা বংশামাত্র) তাহারা যে-কোনো মুহূর্ত্তে যে-কোনো দ্বেষা করিতে পারে। ছুই চারটি পয়সা দিয়া কেহ জুতা মারিয়া গেলেও সে জুতা শিরোধার্য্য করিতে যাহাদের আশ্বাসম্বানে আঘাত লাগে না—বর্ষেরোচিত হাসির সহিত সেই জুতার ধূলা যাহারা সর্ব্বাঙ্গে আশীর্বাদের মত বহন করিয়া বেড়ায় তাহারা সাহিত্য সমাজ রাজনীতি প্রভৃতিরও বিচার

করে। কেহ এমন ইঙ্গিত করিয়াছেন, আমরা ভয় দেখাইয়া বিজ্ঞাপন আদায়ের চেষ্টা করি। কথাটি সত্য নহে। “সত্য নহে”—ইহার চেয়ে সহজ ভাষায় তাহার উত্তর দিতে পারিলাম না।

কিন্তু যে-বস্তু নিজগুণেই ভাল তাহার বিক্রেতার কাহাকেও ভয় করিতে হয় না। আমরা যে-বিষয়ে অভিজ্ঞ নহি, সে বিষয়ে, পয়সা দিয়া কেহ আমাদের কাগজে প্রবন্ধের সাহায্যে বিজ্ঞাপন প্রচার করিবে এতবড় স্পর্দ্ধা কোনো বিজ্ঞাপন দাতার নাই। আমরা সেইরূপ বিজ্ঞাপন গ্রহণ করি যাহা দ্বারা লোকের প্রতারণিত হইবার সম্ভাবনা কম। যে বিজ্ঞাপন আমরা ছাপি সে বিজ্ঞাপনের আমরা বাহকমাত্র—ইহার ভিতর কোনো কৌশল নাই—ফাকি নাই, পাঠককে ঠকাইবার ফন্দি নাই। আমরা মনস্তত্ত্ব বা কবচ প্রভৃতির বিজ্ঞাপন গ্রহণ করি না। কারণ আমরা উহাতে বিশ্বাস করি না। কেহ যদি কোনো ঔষধের বিজ্ঞাপনে লেখেন “অব্যর্থ ঔষধ” তাহা হইলে তাহা আমরা ছাপি না—কারণ কোনো অব্যর্থ ঔষধ আছে বলিয়া বিশ্বাস করি না।

রাগ কোরো না দাদা

সত্যি কথা বলব কেবল

শপথ করা মিথ্যে,

নিত্য নূতন রঙীন কাছস

জলছে আমার চিত্তে।

বৃথ-ভরা দোকান আমার

ব্যবসা করি ক্ষুণ্ণ

রূপকথারই যোগান দিয়ে

করছি উদর-পুষ্টি।

কল্পনাতে ধোঁয়াচ্ছে শ্বেক,

মিথ্যা গাধা গাধা,

দোহাই তোমার—আর যা কর—

রাগ কোরো না দাদা।

রূপসীদের দেখলে পরে

প্রাণটা করে চুলবুল,

মনের ক্ষেতে ধান খেয়ে যায়

চটুল যত বুলবুল,

তাদের হাসি ভঙ্গিয়া আর

কালো চোখের দৃষ্টি,

নেশার মত মগজে মোর

ঘটায় অনাস্থি।

স্বযোগ পেলেই আড়-নয়নে
তাকাই আধা-আধা
দোহাই তোমার—আর যা কর—
রাগ কোরো না দাদা।

পদতলে ঘুরে বেড়াই
জুতোর তলা ফইয়ে,—
নেহাৎ-দাদা ছাপোমা লোক
মোটর-গাড়ী কৈ হে ?
তাই ত যখন 'রোল্ড' হাকায়
হাম্দো-মুখে মিন্‌সে
বৃকের মাঝে স্বতঃই জাগে
একটুখানি হিংসে।

কটুমটিয়ে তাকাই, দেখি
ছিটিয়ে গেছে কাদা—
দোহাই তোমার—আর যা কর—
রাগ কোরো না দাদা।

দেশোদ্ধারের মীটিং করি
দেশবন্ধু পার্কে—
'বদেশটাকে চিবিয়ে থেলে
মাগরপারী শার্কে—'
এমন সময় কনেটবল !
পালাই মেরে লম্ফ,

ঘরে গিয়ে হাঁপাই, তবু
থামে না স্বকম্প !

রুদ্ধ স্বরে বলি—'শালা
গুণ্ডা হারামজাদা !'
দোহাই তোমার—আর যা কর—
রাগ কোরো না দাদা।

সুইসা শুনে হাস্য কর,
প্রাণটা পরিতুষ্ট।
বিশেষ যদি নারী-কেজা
প্রচার করে ছুট,
এবং তাতে মন্দ মধুর
থাকে 'রসের' গন্ধ—
রসিকতায় হই বেসামাল,
আলগা নীবিবদ্ধ—

আপনা হতে বেরিয়ে থাকে
দস্ত শাদা শাদা
দোহাই তোমার—আর যা কর—
রাগ কোরো না দাদা।
ভাবছ দাদা, লোকটা আমি
লুচা পাঁজি ভণ্ড,
লুক ভীষণ মিথ্যাবাদী—
মারবে শিরে দণ্ড ?

কিন্তু দাদা, তোমায় আমি

প্রভেদ যে একচুল নাই

আমি তোমার মাসভূত ভাই

এতে ত আর ভুল নাই!

চেহারা ঠিক একই রকম

নাকটি খাদা-খাদা

দোহাই তোমার—আর যা কর—

রাগ কোরো না দাদা!

'চন্দ্রহাস'

ডিটেকটিব

[নাটক]

প্রস্তাবনা

একটি হৃদয়ঙ্গিত ড্রাম্‌স্‌ রুম। বেলা আন্দাজ চারটে। খোলা জানালা দিয়া গ্রামা বহিঃসকৃতি দেখা যাইতেছে। গ্রামের জমিদার এবং এই গৃহের মালিক জীমান অনন্ত চৌধুরী জানালার ধারে একটা কোচে বসিয়া বসিয়া অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে একটি ডিটেকটিব উপস্থাপন পড়িতেছে ও মাঝে মাঝে উল্লেখিত ভাবে হাত ছুঁড়িতেছে। তাহার চেহারা ভাল, গৌরবর্ণাধি কামানো, বয়ঃক্রম চল্লিশ বৎসর। একটা নির্দোষ পাইপ তাহার ঠোঁটের কোণ হইতে মুগিতেছে।

ঘরের অন্ত কোণে ছুটি চেয়ারে পাশাপাশি বসিয়া অনন্তর মাতা বিমলা দেবী ও সখা জ্যোতা ভগিনী হরমা মৃদুগর কথোপকথন করিতেছেন। হরমার হাতে সেলাই।

হরমা। এবার অর্থর বিয়ে দাও মা! এম্ এ পাস করলে, চল্লিশ বছর বয়স হল—আর কি। আমাদের ঘরে অভাবড় আইবুড় ছেলে মানায় না। লোকে নানান কথা কইতে আরম্ভ করবে। উনি বলছিলেন, জমিদার-বংশের ছেলে তাড়াতাড়ি বিয়ে না দিলে কোন্‌ দিন কি করে বসবে।

বিমলা। আমি কি তা বুঝি না মা। কিন্তু হলে হবে কি, ছেলে যে আস্ত পাগল। বিয়ের কথা তুললেই হাত পা ছুঁড়তে আরম্ভ করে। জানিস ত ওকে!

হরমা। কি, বলে কি? বিয়ে করবে না-ই বা কেন?

বিমলা। কি যে বলে তার মাথা মুগু আমি কিছুই বুঝতে পারি না। বলে, জীবনে কাজ আছে—শুধু বিয়ে করলেই চলে না।—আমি ত বুঝি না মা এত কাজই বা কিসের! পড়াশুনো করবার ইচ্ছে ছিল, বেশ ত, এম্ এ পাস করলি, এবার বিয়ে থা করে বাপ-পিতামহের সম্পত্তি ভোগ-জাত কর। তানয়—কাজ! আর কি কাজ করবি তাও না হয় খুলে বল। তা বলবে না,—কেবল ঐ বইগুলো রাতদিন মুখ গুঁজে পড়বে। কি যে ওতে আছে আমার পিণ্ডি—

হরমা। ওগুলো ত ডিটেকটিব উপস্থাপন,—কেবল খুনজখম জালজুজুরি এই সব। আজকাল বাংলাতেও বেরিয়েছে। ছাই, আমার একটুও ভাল লাগে না।

বিমলা। ইয়ারে, তা—ওসব বইয়ে কি বিয়ে করতে মানা করেছে? তোরা লেখাপড়া জানিস, বলতে পারিস বাপু।

হরমা। না, তা করবে কেন! তবে ও সব বই বেশী পড়লে মাছুষ থেয়ালী হয়ে পড়ে—আজগুনি ব্যাপার কিনা।

অনন্ত। (নিজমনে উত্তেজিত কণ্ঠে) সাবধান, এক পা যদি এগিয়েছ—
বিমলা। ঐ শোন, নিজের মনেই বকছে। হ্যারে, শেষে গুর মাথা
খারাপ হয়ে যাবে না ত?

হরমা। না মা, বই পড়ে কি তা হয়। অস্ত্র ছেলেবেলা থেকেই ঐ
রকম ভাবপ্রবণ, একটুতে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। একেবারে
ছেলেমাছ মত। কিন্তু এবার গুর বিয়ে দেওয়া দরকার, তা আমি
বলে দিলুম বাপু। বো না হলে আর ঘরদোর মানাচ্ছে না।

বিমলা। আমার কি অসাধ? জয়নগরের জমিদার শশী হালদার ত
মেয়ে নিয়ে মুকিয়ে বসে আছে, মুগের কথা পসাতে যা দেয়ী,
কিন্তু ছেলে যে ও কথায় কানই দেবে না।

হরমা। আমারও সন্ধানে একটি চমৎকার মেয়ে আছে মা। ডানা-কাটা
পরী, বয়স বার বছর কিন্তু বেশ বাড়ন্ত গড়ন। চোদ্দ বছর বলে
স্বচ্ছন্দে চালানো যায়, আইনে বাধে না। আমার খুঁড়ত
দেওরের মেয়ে। জানে ত তারা কি রকম বড় মাছ—এ এক
মেয়ে।

অনন্ত। (হঠাৎ লাফাইয়া উঠিয়া) খবরদার! দিদি, hands up!

হরমা। সে আবার কি?

অনন্ত। কোন কথা নয়, মাথার ওপর হাত তোলা নইলে এখুনি গুলি
ছুঁড়ব। (পাইপ দিয়া বন্দুকের মত নির্দেশ করিল)

হরমা। পাগলামি করিস নি অন্ত্র।

অনন্ত। পাগলামি নয়, শিগ্গির মাথার ওপর হাত রাখো নইলে
নিশ্চিত মৃত্যু। রাখলে না? তবে গেল গেল, ওয়ান—টু—

হরমা। নে বাপু, পারি না তোরা জালায়। (মাথায় হস্ত রাখিয়া)
কি হল এতে?

অনন্ত। এবার সত্যি কথা বল কি ষড়যন্ত্র করছিলে আমার বিরুদ্ধে?
হরমা। ষড়যন্ত্র আবার কি! তোরা এবার বিয়ে দেব, তারই
ব্যবস্থা করছিলুম। বিয়ে না দিলে তুই সত্যিই পাগল হয়ে
যাবি।

অনন্ত। বিয়ে! (হাস্ত) এবার হাত নামাতে পার। দিদি, আজ
পর্যন্ত কখনো দেখেছ ডিটেকটিব বিয়ে করেছে? জগতের
কোনো ভাল ডিটেকটিব কখনও বিয়ে করেনি, তারা চির কুমার।

হরমা। তা হোক না তারা চিরকুমার। তুই ত আর ডিটেকটিব নস,
তুই বিয়ে করবি না কেন?

অনন্ত। আমি ডিটেকটিব নই? দিদি, তুমি জানো না, আমার মতন
দ্বিধাজন্য ডিটেকটিব বাংলাদেশে আর দ্বিতীয় নেই। বলে দেব,
কি দিয়ে আজ তুমি ভাত খেয়েছ? তবে শোনো, মুগের ডাল,
এঁচোড়ের ডালনা, কইমাছ ভাজা, কৈ মাছের ঝাল—

হরমা। আহা কি শক্ত কথাই বললেন। নিজে যা দিয়ে ভাত খেয়েছিল
সেইগুলো আউড়ে গেল।

অনন্ত। আচ্ছ বেশ। তুমি কোন তেল মেখে চুল বেঁধেছ বলে দেব?
(মন্তক আজ্ঞাপূর্বক) জবাবকৃত্তম! এমন এবার হয়েছে? মা,
আমি কি কাজ করব ঠিক করে ফেলেছি।

বিমলা। কি কাজ করবি?

অনন্ত। আমি ডিটেকটিব হব, কলকাতায় মন্ত অফিস করব, তার নাম
হবে (চিন্তা) অনন্ত হৃদিশালয়। হাজার হাজার লোক জটিল
রহস্য নিয়ে আমার কাছে হাজির হবে, আমি তাদের রহস্য
উন্মোচন করে ছেড়ে দেব। যার ছেলে চুরি গেছে তার ছেলে
খুঁজে বার করব, যার টাকা চুরি গেছে তার টাকা উদ্ধার করব।

বাস, মাছ বিপদে পড়লেই অনন্ত চৌধুরী ডিটেকটিবের কাছে ছুটে আসবে—

হুম্মা। আ পোড়া কপাল! এত লেখাপড়া শিখে শেষে এই কাজ করবি? লোকে হাসবে যে।

অনন্ত। (চক্ষু পাকাইয়া) হাসবে! হাসুক ত দেখি কার কতখানি ক্ষমতা! (পরিক্রমণ করিয়া) বলাই! বলাই!

বলাই প্রবেশ করিল। সে বাড়ীর একজন সরকার—অনন্তর অত্যন্ত অমুগত ও শিরপাজ। তাহার বয়স চমিশ, মোটা বেঁটে, মূৰ ভাবলেশনহীন।

বলাই। আজ্ঞে—

অনন্ত। (কটমট করিয়া তাহার পানে তাকাইয়া থাকিয়া) বলাই, আমি ডিটেকটিব হব। তোমার হাসি পাচ্ছে?

বলাই। আজ্ঞে—বৌ বৌ: শব্দে—একটুও হাসি পাচ্ছে না—

অনন্ত। ডিটেকটিবের কাজ হচ্ছে মাছের ছুখ দূর করা—বুদ্ধ যীশুর সঙ্গে তাদের কোনও প্রভেদ নেই। আমি সেই কাজ করতে যাচ্ছি। বুঝতে পারছ?

বলাই। আজ্ঞে পারছি।

অনন্ত। হাসি পাচ্ছে না?

বলাই। আজ্ঞে উহ!

মস্তক সকাল

অনন্ত। বেশ—যাও।

দিদি দেখলে?

হুম্মা। যা ইচ্ছে কর বাপু, আমি আর তোর সঙ্গে পাগলামি করতে পারি না।

উখানোত্তা

বলাইয়ের গ্রন্থান

অনন্ত। হঁ হঁ পাড়াও। তুমি কার জন্তে জামা তৈরী করছ বলে দেব? এক কথাই বলে দিতে পারি—deduction—বুঝলে—deduction!

হুম্মা। আচ্ছা বল ত দেখি।

অনন্ত। (কিছুক্ষণ চক্ষু ফুঙ্কিত করিয়া রহিল, নিজ মস্তকে টোকা মারিল) জামাই বাবুর জন্তে! ঠিক বলেছি কি না?

হুম্মা। (অর্দ্ধ সমাপ্ত লাল রঙের ফ্রক তুলিয়া ধরিয়া) যা বলেছিস। তোর জামাই বাবুর এখন লাল ফ্রক পরবারই ত বয়স।

হাত

অনন্ত। (বিস্মিত ভাবে) জ্যা! ওটা ফ্রক নাকি! সেই জন্তেই মন খুঁৎ খুঁৎ করছিল। আচ্ছা এবার বলে দিচ্ছি—

হুম্মা। আর বলতে হবে না। (বাহিরে মোটরের শব্দ শুনা গেল) কে বুঝি এল। মা, চল আমরা ভেতরে যাই।

অনন্ত। দাঁড়াও, যেতে হবে না—কে এসেছে আমি শুধু মোটরের শব্দ শুনে বলে দিচ্ছি—

চক্ষু মুদ্রিয়া নিজ মনে

আট সিলিঙার গাড়ী—একটা ট্যাপিটের আগুয়াজ হচ্ছে—হুর্গটা সিলভারডেল, বুঝেছি। দিদি, জামাইবাবু তোমাকে দেখতে এসেছেন—

একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক প্রবেশ করিল। পশ্চাতে বলাই।

অনন্ত। (চক্ষু মুদ্রিয়া হস্ত প্রসারণ পূর্বক) আহ্নন জামাইবাবু—

হুম্মা। (তাড়াতাড়ি উঠিয়া অনন্তকে চৈলা দিয়া) দূর হতভাগা! চোখ খুলে চাখ।—আহ্নন কাকা বাবু।

আগন্তুককে প্রণাম করিল। বিমলা ঘোমটা দিয়া গ্রন্থান করিলেন

অনন্ত। (চক্ষু খুলিয়া) তাই ত! এত জামাই বাবু নয়—এ যে জগদীশবাবু। এ হে হে, ডারি ভুল হয়ে গেছে। তাই মনটা খুঁৎ খুঁৎ করছিল! যা হোক কিছু আসে যায় না। জগদীশবাবু বিরাজপুরের জমিদার আর জামাইবাবু লাথরাঙ্গপুরের জমিদার। কাছাকাছি আন্দাজ ত করেছে। বহুদূর কাকাবাবু।

এগাম করিল জগদীশবাবু উপবিষ্ট হইলেন।

স্বরমা। কতদিন পরে কাকাবাবুকে দেখলুম। শরীর বেশ ভাল আছে? কাকিমা ভাল আছেন?

জগদীশ। আর মা, আমাদের আবার ভাল থাকা। আমি ত তবু উঠে হেঁটে বেড়াচ্ছি, তোমার কাকিমা একেবারে শয্যা নিয়েছেন। যতদিন বয়স ছিল ততদিন আশায় বুক বেঁধে ছিলেন; এখন রক্তের জোরও কমে আসছে, মনও ভেঙে পড়ছে। বয়স যত বাড়ে শোকও তত কেটে কেটে বসে কিনা জানো ত সবই তোমরা—

স্বরমা। (দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া) জানি বৈ কি কাকাবাবু।

কিছুক্ষণ সকলে নিমগ্ন রহিলেন

জগদীশ। অনন্ত এম-এ পাস করেছে খবরটা। কয়েকদিন হল পেয়েছি। তুমিও গন্তরবাড়ী থেকে এসেছ শুনলুম। তাই ইচ্ছে হল, তোমাদের একবার দেখে আসি। আজ দাদা বেঁচে থাকলে কত আনন্দ করতেন, জমিদারীতে উৎসবের ঘটা পড়ে যেত; এই উপলক্ষে কত দানখান সংকাধা করতেন,—তার মৃত্যুর পর আমি আর এ বাড়ীতে পদার্পণ করিনি, এই প্রথম এলুম। দাদা কতদিন হল স্বর্গে গেছেন স্বরমা?

স্বরমা। বারো বছর।

জগদীশ। হ্যা—তাই হবে। প্রথমে মেয়েটাকে হারালুম, তারপর বছর-তুই যেতে না যেতেই দাদাও স্বর্গে গেলেন। সংসারে দাদাই ছিলেন আমার একমাত্র বন্ধু। তিনি যাবার পর মনে হল, ভগবান একে একে বাকি আমার সব স্নেহের বন্ধনগুলি কেটে নিচ্ছেন। সেই থেকে কেমন যেন হয়ে গিয়েছি। সংসারের কাঙ্ক্ষা করি বটে, কিন্তু কিছুতেই যেন আঠা নেই—

উহার কঠোর গভীর হতাশার মধ্যে মিলাইয়া গেল

স্বরমা। মহামায়ার কোনো খবরই কি পাওয়া গেল না?

জগদীশ। না মা, কোনো খবরই পাওয়া গেল না। সে ম'রে গেছে এ খবরটাও যদি পেতুম—তবু নিশ্চিত হতে পারতুম।

স্বরমা। না না, ও কথা বলরেন না কাকা। মহামায়ী নিশ্চয় বেঁচে আছে—হয়ত ভাল ভাবেই আছে।

জগদীশ। সেইটেই যে ভরসা করতে পারছি না মা। যদি বেঁচে থাকে হয়ত এমন অবস্থায় আছে যে বাপ হয়ে সে কথা ভাবতেও আমার গা শিউরে ওঠে। তার চেয়ে তার ম'রে যাওয়াই ভাল।

স্বরমা। (ক্ষণ কণ্ঠে) ভগবান কি এমনই করবেন!

জগদীশ। সেই কথাই মাঝে মাঝে ভাবি। জ্ঞানতঃ কখনো কোনো পাপ কাজ করিনি; তবে ভগবান আমাকে এমন শাস্তি দেবেন কেন? ধোঁজবার ওত ত্রুটি করিনি, দেশ তোলপাড় করে ফেলেছি। যে আমার মেয়ে এনে দিনে দিতে পারবে তাকে বিশ হাজার টাকা পুরস্কার দেব বলে ঘোষণা করেছি। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিবার পর উঠি।

এবার তা'হলে উঠি। তোমরা ভাল আছ দেখে বড় খুশী হলাম।—বৌ-ঠাকরুণকে আমার প্রণাম দিও।

নেপথ্যের উদ্দেশে হাত তুলিয়া নমস্কার করিলেন

অনন্ত, বাবা, তোমার প্রতি আমি কোনো কর্তব্যই করতে পারিনি, নিজের শোকেই ডুবে আছি। তুমি লেখাপড়া শিখে কুতী হয়ে বেরিয়েছ, এখন নিজের জমিদারীতে থেকে বাপের মত মর্যাদার সঙ্গে সম্পত্তি ভোগ দখল কর, প্রজাদের স্থখী করবার, উন্নত করবার চেষ্টা কর। এ বুড়োর সাহায্য যখন দরকার হবে তখন তা চাইতে সন্কেচ কোরো না—মনে রেখো তোমার বাবা আমার অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু ছিলেন। আমার ত নিজের আর সন্তান নেই—এখন তোমারাই আমার ছেলে-মেয়ে। আশীর্বাদ করি, দীর্ঘজীবী হও।

প্রহ্নানোভ্যন্ত

অনন্ত। কাকাবাবু, এখনি যাবেন না, আর একটু বসুন। আপনার সঙ্গে ছোটো কথা আছে।

জগদীশ। (উপবেশন করিয়া) বেশ, কি কথা বল।

অনন্ত। (উদ্দীপ্তভাবে) কাকাবাবু আপনার কথা শুনতে শুনতে একটা মহান প্রেরণা আমার প্রাণে এসেছে। আমি আপনার মেয়ে মহামায়াকে খুঁজে বার করব। যেমন করে পারি তাকে আপনার কোলে ফিরিয়ে দেব।

জগদীশ। (কিছুক্ষণ বিস্ময়িত নেত্রে চাহিয়া থাকিবার পর) অনন্ত, তুমি তোমার বংশের উপযুক্ত কথাই বলেছ। কিন্তু এখন আর তা পারবে না বাবা। আমি ত চেষ্টার ক্রটি করি নি, এতদিন

পরে আর তাকে খুঁজে বার করা যাবে না! তুমি ছেলেমানুষ, তোমার প্রাণে উদ্দীপনা আছে—

অনন্ত। পারব পারব পারব। জানেন আমি জীবনের ব্রত গ্রহণ করেছি—ভিটেকটিব হবে। তিন মাসের মধ্যে আমি তাকে খুঁজে বার করব, এই প্রতিজ্ঞা করলুম। যদি না পারি তাহলে—তাহলে—আমার জমিদারী আমি বিলিয়ে দেব।

জগদীশ। অনন্ত, কি বলছিস তুই—

অনন্ত। মরদকা বাৎ হাখীকা দাত। কথার নড়চড় হবে না। তিন মাসের মধ্যে আপনি মেয়ে ফিরে পাবেন। লিখে রেখে দিন।

জগদীশ। অনন্ত, তুই যে আমার প্রাণে আবার আশা জাগিয়ে তুলছিস।

অনন্ত। আলবৎ তুলছি—একশ'বার তুলছি। এবং শেষ পর্যন্ত খাড়া করে রাখব।

জগদীশ। অনন্ত, বাবা—(কাঁদিয়া ফেলিলেন। হুরমাও চোখ মুছিল)

অনন্ত। না না, কান্নাকাটি নয়। আমি ভিটেকটিব, আপনি আমার মক্কেল। Strictly business, এর মধ্যে কান্নাকাটি করলে চলবে না। দিদি, অশ্রু সঞ্চার কর।

জগদীশ। হুরমা, ওকি সতাই পারবে?

হুরমা। পারবে কাকাবাবু। (সগর্বে) অস্ত আজ পর্যন্ত কখনও ফেল হয় নি।

জগদীশ। যদি পারিস অনন্ত, তাহলে—কি আর বলব—আমার যা আছে সব তোর।

অনন্ত। ও চলবে না। Business is business! বিশ হাজার টাকার এক কাগাকড়ি বেশী নয়।—আচ্ছা, এবার তবে কাজের কথা আরম্ভ হোক। মহামায়া যখন হারিয়ে যায়, তখন আমার বয়স

কম—সব কথা ভাল মনে নেই। আপনি গোড়া থেকে সমস্ত ইতিহাস আর একবার বলুন।

নোটবুক ও পেন্সিল বাহির করিয়া বসিল

জগদীশবাবু কপালের উপর দিয়া একবার হস্ত সঞ্চালন করিলেন, তারপর ধীরে ধীরে কহিতে লাগিলেন।

জগদীশ। বলার আর আছে কি? ঘটনা খুবই সংক্ষিপ্ত। কুস্ত মেলায় কলকাতায় গিয়েছিলুম—আমি, আমার স্ত্রী, আর মহামায়া।—স্নানের দিন ঘাটে স্নান করতে গেলুম—

অনন্ত। একটা কথা। কতদিন আগে?

জগদীশ। আজ থেকে চৌদ্দ বছর।

অনন্ত। মহামায়ার তখন বয়স কত?

জগদীশ। চার বছর।

অনন্ত। তাহলে এখন তার বয়স চৌদ্দ আর চারে আঠারো বছর।

জগদীশ। হ্যাঁ, যদি সে বেঁচে থাকে।

অনন্ত। নির্ধাৎ বেঁচে আছে। তারপর বলে যান।

জগদীশ। গাড়ীতে-ক'রে স্নান করতে যাচ্ছিলুম। সঙ্গে কয়জন পেয়াদা ছিল; গাড়ীর মধ্যে ছিলুম, আমরা স্বামী-স্ত্রী, আর মহামায়া। মহামায়ার গায়ে গয়না ছিল। ঘাটের কাছে ডয়ঙ্কর ডিড়—চার দিকে মাছঘের ঠেলাঠেলি। গাড়ী পাড়িয়ে পড়ল। এই সময় কে একজন হঠাৎ হোঁ মেরে মহামায়াকে তার মা'র কোল থেকে তুলে নিয়ে ডিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল, গিন্নী চীৎকার করে উঠলেন; আমার পেয়াদারা গাড়ীর ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ল। চারিদিকে হৈ হৈ পড়ে গেল। পুলিশ আর স্বেচ্ছাসেবকেরা

চতুর্দিকে খুঁজে বেড়ালে। কিন্তু ডিড়ের মধ্যে আর তাকে পাওয়া গেল না।

কিয়ংকাল নীরব থাকিয়া

তারপর কি চেষ্টাই না করেছি তাকে ফিরে পাবার জন্তে। জলের মত টাকা খরচ করেছি; কাগের মুখে খবর পেয়ে ছুটে গিয়েছি দেখতে আমার মেয়ে কিনা,—কিন্তু—

মাথা বাড়িলেন

অনন্ত। বেশ। এখন বলুন ত, মহামায়া স্বন্দর ছিল কিনা।

জগদীশ। খুব স্বন্দর ছিল। আমার দুর্গাপ্রতিমার মত মেয়ে।

অনন্ত। (নোট করিয়া) আচ্ছা তার গায়ে এমন কি কোনো চিহ্ন ছিল যা দেখে তাকে চিনতে পারা যায়?

জগদীশ। চিহ্ন! হ্যাঁ ছিল। তার বাঁ পায়ের চেটোর ওপর একটা আধুলির মত লাল জড়ুল ছিল—ঠিক যেন সিঁদুরের টিপ।

অনন্ত। (নোটবুক বন্ধ করিয়া) বাস, হয়ে গেছে। এবার আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ী যান। কাল আমি কলকাতায় যাবি; তারপর তিনমাসের মধ্যে মহামায়াকে আবিষ্কার কবব।

জগদীশ। অনন্ত, যদি পারিস বাবা, তাহলে আমার যথাস্বর্কষ—

অনন্ত। বাস বাস, ওকথা আর নয়। বিশ হাজার টাকা। Business! তাহলে কাকাবাবু, আপনি এখন আস্থন গিয়ে, আমি ইতিমধ্যে plan of campaignটা ঠিক করে ফেলি।

জগদীশ গ্রহণ করিলেন, হুয়া ঠাহার পুচ্চাতে গেল

অনন্ত। (গভীর জরুটি করিয়া কিছুক্ষণ পাড়াইয়া থাকিয়া) আমার একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট দরকার। সব ডিটেকটিবেরই একজন গণেশ থাকে, যে তার কীষ্টিকলাপ লিপিবদ্ধ করে। আমার গণেশ কৈ?—ঠিক হয়েছে! বলাই। বলাই।

বলাই প্রবেশ করিল

বলাই। আজ্ঞে বিরাজপুরের ছজুর বৌ বৌ শব্দে চলে গেলেন।

অনন্ত। বেশ করেছেন। এখন শোনো, তুমি আমার গণেশ।

বলাই। (বুঝিতে না পারিয়া) আজ্ঞে বৌ বৌ শব্দে—

অনন্ত। কাল তুমি আমার সঙ্গে কলকাতায় যাচ্ছ। সেখানে মস্ত অফিস খুলে বসব, তার নাম “অনন্ত চন্দ্রশালয়”। আমি হব শালক হোমস, আর তুমি হবে আমার ওয়াটসন। বুঝেছ?

বলাই। আজ্ঞে বৌ বৌ শব্দে—আমি কি হব?

অনন্ত। ওয়াটসন। এসো বুঝিয়ে দিচ্ছি—

যবনিকা

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কলিকাতার একটি বাসাবাড়ীর অভ্যন্তর। বাড়ীটি মৃত্যু কিন্তু দুই ভাগে বিভক্ত; প্রতি ভাগে একটি ব্রাহ্ম পরিবার বাস করেন। মধ্যে বাতায়নের পথ আছে। দুই বাড়ীর কড়া কেয়া ও নলিনীর মধ্যে নিবিড় বন্ধুত্ব।

কেয়ার বসিবার ঘর। ঘরের আসবাব সামান্য নয়, কিন্তু বেশ নিপুণ ভাবে সাজানো। কেয়া একটা খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন পড়িতেছে। নলিনী উদাস ভাবে টেবিল হারমোনিয়ম বাজাইয়া গান করিতেছে। বেলা আন্দাজ সাড়ে তিনটা।

গান—

অন্ধকার! হে করুণ অন্ধকার!

যুঁচাও আলোর অরণ্য অন্ধকার।

চকল আঁখি-খঞ্জন, হে তিমির,

বাঁধো অন্ধনে স্থনিবিড়—

স্থপ্তি—ফুল-সমীর ঢালুক গন্ধভার।

দাও বিরাম, হে অভিরাম, কোমল অন্ধকার।

কেয়া। [কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া] কী যে তুই গান গাস নলি, আমার একটুও ভাল লাগে না। অন্ধকার—বলি অন্ধকার! তুই দেখাতে চাস যে তোরা প্রাণে ভারি ছুঁখ। ওটা তোরা একটা ‘পোজ’।

নলিনী। [উদাস চক্ষু ফিরাইয়া] ‘পোজ’! কেয়া, তুই এই কথা বললি? আমার প্রাণের বাখা তুইও বুঝলি না!

কেয়া। ব্যাখ্যাটা কি শুনি!

নলিনী। ব্যাখ্যা কি বলে বোঝানো যায়! গানে তার স্পর্শ লেগে থাকে, দীর্ঘশ্বাসে তার মুষ্টি ফুটে ওঠে। পৃথিবীতে ব্যাখ্যা ছাড়া আর কি আছে? ভেবে জাথ, আমি কে? কোথা থেকে এসেছি? দুদিন পরে আবার কোথায় চলে যাব? জীবনের অস্বচ্ছারিত আশা-আকাঙ্ক্ষা, সবই হয়ত অতৃপ্ত থেকে যাবে—

কেয়া। থাকবে না গো থাকবে না। তোমার কি হয়েছে আমি বুঝেছি।

নলিনী। কি হয়েছে?

কেয়া। তুই মনে মনে প্রেমে পড়েছিস।

নলিনী। প্রেম! [দীর্ঘশ্বাস] কার সঙ্গে?

কেয়া। যিনি এখন আসবেন—সেই সমরেশবাবুর সঙ্গে।

নলিনী। [করুণ হাস্য] সমরেশবাবুর সঙ্গে!—কেয়া, তোমার সঙ্গে কখনো প্রেম হয়?

কেয়া। কেন হবে না? তোৎলা কি মাছুখ নয়! সমরেশবাবুর মতন অমন চমৎকার চেহারা কটা দেখেছিস? আর অমন বিদ্বানই বা কটা পাওয়া যায়! তুই কি মনে করিস, তোৎলা বলে উনি তোর যোগা নন? উনি তোকে কী ভীষণ ভালবাসেন তা জানিস?

নলিনী। কি করে জানব? আস্ত কথা তো কখনো শুনি নি।

কেয়া। কথাই বুঝি সব? এই না বলছিল মনের বাখা কথায় বোঝানো যায় না। ঠিক মনের কথা ভাবে-ইঙ্গিতে বোঝা যায়।

নলিনী। তুই ঠিক ভাব-ইঙ্গিত সব বুঝে নিয়েছিস দেখছি! তা এতই যখন বুঝেছিস তখন তুই-ই সমরেশবাবুকে নে না।

কেয়া। মুখে বলছিস, কিন্তু আমি সমরেশবাবুর দিকে হাত বাড়ালে তুই কি আর রঞ্জে রাখবি? হৃদয় আমার গলা টিপেই শেষ করে দিবি।

নলিনী। কিছু করব না। তোৎলার আমার দরকার নেই।

কেয়া। ইঃ—দরকার নেই। কি বলব নলি, তুই আমার প্রাণের বন্ধ। আর সমরেশবাবুর ওপর আমার একটুও লোভ নেই—তা নইলে তোকে মজা টের পাইয়ে দিতুম।

নলিনী। তোর বুঝি সমরেশবাবুর ওপর লোভ নেই?

কেয়া। নাঃ—আমার এখন খালি টাকার লোভ। কি করে টাকা রোজগার করব সেই হচ্ছে আমার ধ্যান-জ্ঞান।

নলিনী। টাকা রোজগার করে কি করবি?

কেয়া। মা বাবাকে সাহায্য করব। এখন বড় হয়েছে, মা বাবাকে সাহায্য করব না?

নলিনী। [একটু ইতস্ততঃ করিয়া] কেয়া, বাড়ীতে কি টাকার টানাটানি হয়েছে?

কেয়া। টানাটানি নয়। কিন্তু মা বাবা দুজনেরই বয়স হচ্ছে। বাবা হাসপাতালে ভাস্করী করেন, মাকেও স্থলে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করতে হয়। আমি যদি মেয়ে না হয়ে ছেলে হতুম তাহলে ত এতদিনে সংসারের ভার আমাকেই নিতে হত! কিন্তু মেয়ে হয়ে জন্মছি বলে কি কিছুই করব না? তাই ঠিক করেছি চাকরি নেব। তবুত মা বিশ্রাম পাবেন।

নলিনী। কি চাকরি করবি?

কেয়া। তুই তো জানিস শট্‌হাণ্ড টাইপিংয়ের ট্রেনিং নিয়েছি। কোনও কোম্পানি বা অফিসে সেক্রেটারির কাজ স্বচ্ছন্দে করতে পারব।

নলিনী। কিন্তু চাকরি পাবি কোথায়? আজকাল পুরুষরাই চাকরি পাচ্ছে না।

কেয়া। সেই অজ্ঞেই ত রাতদিন কাগজে বিজ্ঞাপন দেখছি। এই জ্ঞাপন না, কালকেতুতে একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছে—একজন ডিটেকটিবের অফিসে টাইপিষ্ট চাই। ভাবছি কাল গিয়ে দেখা করব।

নলিনী। ডিটেকটিবের অফিসে চাকরি করবি?

কেয়া। তাতে কি হয়েছে! ডিটেকটিব কি আমায় খেয়ে ফেলবে?

নলিনী। না—তবে ডিটেকটিব শুনলেই কেমন গা শিরশির করে—

কেয়া। তোর সবতাতেই ওই! সব জিনিসের খারাপ দিকটাই দেখতে পাস।—প্রেমে পড়েছিস তাও হঃ-হতাশ করছিস!

নলিনী। কে প্রেমে পড়েছে?

কেয়া। তুই, আবার কে?

নলিনী। কেয়া, তুই হাসালি। তোংলার সঙ্গে আমার প্রেম।
কেয়া। জাকামি কবিস নি নলি, এমন চুল ধরে টেনে দেব যে টেক
পারি। নে, সমরেশবাবুর আসবার সময় হল, এবার একটা
মিষ্টি দেখে গান ধর, তিনি যেন এসে শুনে পান।

নলিনী। [উঠিয়া] আমি পারব না।

কেয়া। পারবি না? ও—লজ্জা করছে বুঝি! আচ্ছা, তোমার
হয়ে আমিই না হয় গেয়ে দিচ্ছি—

হারমোনিয়ামের সন্মুখে বসিয়া বসিল; যত্ন স্পর্শে
চাবির উপর হাত ঢালাইয়া

কি গাইব? আচ্ছা একটা মিলন সঙ্গীত গাই—

বঁধুয়া মধু রাতে

এলে নন্দন-মধু হাতে।

চম্পকবন গন্ধে বন-বেতসী রঞ্জে

স্বপ্ন কুহরে বাতে—মধু রাতে!

পরশে তব শিহরে তত্ব খানি

নিখিল বেণী সরমে অলুখানি

কণ্ঠে বিবশ বাণী

তজ্রা আঁধি পাতে।

—মধুরাতে।

গান শেষ হইবার পর সমরেশ অবশ করিল

সমরেশ। নুন—নমস্কার!

কেয়া। আগুন সমরেশ বাবু। বহুন। ঐ চেয়ারটাতে বহুন না!

নলিনীর পাশের চেয়ার নির্দেশ করিল

সমরেশ। হা—এই যে (চেয়ারের প্রান্তে উপবেশন করিয়া গলা

থাকারি দিল) গুগান শুনতে পাচ্ছিলুম সিঁড়িতে উঠতে উঠতে,
তাই ভাবলুম আপনারা এই থানেই আছেন! নুননলিনী
দেবী, আপনি গুগাইছিলেন বুঝি?

কেয়া। (তাড়াতাড়ি) হ্যা—আমি বাজাচ্ছিলুম আর ও গাইছিল।

কেমন শুনলেন?

সমরেশ। চচ্চমৎকার! এমন গলা কুকখনো শুনি নি।

কেয়া মূলে কাপড় দিল

নলিনী। (হঠাৎ উঠিয়া) আমি যাই—

কেয়া। (জনান্তিকে) খবরদার নলি, মেরে ফেলব একেবারে। এত
হিংস্রটে তুই! আমার প্রশংসাও সহ্য হয় না? (নলিনী
আবার বসিয়া পড়িল) সমরেশবাবু, আমরা শুনেছি আপনি খুব
ভাল গাইতে জানেন একেবারে গুস্তাদি গান। আজ আপনার
গান আমাদের শোনাতে হবে।

সমরেশ। (ভীতভাবে) আমি গুগুগান গাইব। তার চেয়ে আমার
গলায় ছুছছুরি দিন না।

কেয়া। সত্যি গাইতে জানেন না?

সমরেশ। কখনো চে: চে: চেতা করিনি। কুকথা কওয়াটাই আমার
পক্ষে এমন শশঙ্ক ব্যাপার যে—

হঠাৎ হস্ত সকালন

কেয়া। কেন, আপনি ত চমৎকার কথা বলেন!

সমরেশ। ব-বলি নাকি? কৈ আ-আমি ত ভা লক্ষ্য করিনি। নলিনী

দেবী, আপনি ল-লক্ষ্য করেছেন?

নলিনী নিরন্তর

ঐ দেখুন, নলিনী দেবী ম-মনের কথাটি পষ্ট করে ব-বলতে
পারছেন না।

কেয়া। [মুখ টিপিয়া হাসিয়া] নলিনী দেবী মনের কথা লুকিয়ে রাখতেই ভালবাসেন। তবে সময় উপস্থিত হলে সত্যি কথা আপনি বেরিয়ে পড়বে। সে যাক, আপনি যে আমাদের একদিন বেড়াতে নিয়ে যাবেন বলেছিলেন? তার কি হল, তুলে গেলেন নাকি?

সমরেশ। ত-তুলিনি। তবে উপযুক্ত স-সাহসের অভাবে কথাটা পাড়তে পারছিলাম না। [সাগ্রহে নলিনীকে] য-যাবেন আজকে? চ-চ্-চলুন না।

নলিনী। কেয়া তুই যা, আমার আজ শরীরটা—

কেয়া। বা রে! উনি আমাকে নেমস্তম্ভ পরীক্ষা করলেন না, আমি যাব, আর তোমাকে সাধাসাধি করছেন ভূমি যাবে না? বেশ ব্যবস্থা ত!

সমরেশ। না না—আমি ছ-ছজনকেই সাদরে আত্মন করছি। ম-মানে—অর্থাৎ—আপনারা দুজন না গেলে আমি ব-বড়ই দুঃখিত হব।

কেয়া। নলিনী একলা গেলেও দুঃখিত হবেন?

সমরেশ। ম-মানে [মাথা চুলকাইয়া] ছ-ছজন একটু হবে বৈকি।

কেয়া। [হাসিয়া উঠিল] ওটা লোক-দেখানো ছুঁত। তাহলে নলি, যা শিগগির কাপড় পড়ে আয়।

নলিনী। [উদাসভাবে] আচ্ছ।

এহান

কেয়া। কোথায় যাওয়া হবে?

নলিনীর চেয়ারে বসিল

সমরেশ। যেখ'নে আপনারা ব-বলবেন। - লেকের ধারে খ-খানিক বেড়িয়ে তারপর সন্ধ্যার সময় সিনেমা দেখে—

কেয়া। না, সন্ধ্যার পর বাইরে থাক। মা-বাবা পছন্দ করেন না। সন্ধ্যার আগেই ঘিরব।

সমরেশ। [কেয়ার দিকে হুঁকিয়া] দেখুন, ক-কেয়া দেবী, আপনি বোধ হয় আমার ম-মনের ভাব বুঝতে পেরেছেন—ম-মানে নলিনী দেবীকে আমি—[গলা খাকারি দিয়া রক্তবর্ণ]—আপনার ক-কাছ থেকে আমি কি কিছু সাহায্য প-পেতে পারি না? অর্থাৎ আপনি যদি ম-মান্নে মাঝে—

কেয়া। ঐ বোধ হয় মা আসছেন।—আপনার সঙ্গে এ বিষয়ে পরে কথা হবে—কি বলেন? আজই লেকের ধারে বেড়াতে বেড়াতে হয়ত ঐ যোগ হবে।

হিরণ্ময়ীর প্রবেশ

কেয়া। মা, সমরেশবাবু আমাকে আর নলিকে বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছেন।

সমরেশ। [নমস্কার করিয়া] এই সামান্য একটু এদিক ওদিক—

হিরণ্ময়ী। তা বেশ ত। [উপবেশন করিলেন] তোমার শরীর বেশ ভাল আছে বাবা?

সমরেশ। আজ আমার শরীর ত বরাবরই ড-ভাল থাকে। এই সেদিন মুষ্টিযুদ্ধে একটা গ-গোঁরায়ে কাৎ করেছি। কাজেই স্বাস্থ্য একরকম ভালই ব-বলতে হবে।

হিরণ্ময়ী। কাজ কর্ম বেশ ভাল চলছে?

সমরেশ। আজ, একরকম মন্দ নয়। স-সম্প্রতি একটা বড় কণ্ট্রাস্ট পাওয়া গেছে, তা থেকে কিছু ল-লাভ থাকবে বলে মনে হয়।

হীরেন্দ্রবাবুর প্রবেশ

হীরেন্দ্র। এই যে সমরেশ। ভাল আছ ত ?

সমরেশ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

নমস্কার করিল

কেয়া। বাবা, আমরা ঠিক সন্ধ্যা বেড়াতে যাচ্ছি।

হীরেন্দ্র। তা বেশ। সকাল সকাল ফিরো।

সমরেশ। আজ্ঞে হ্যাঁ, সু-সন্ধ্যার আগেই আমি পৌঁছে দিয়ে যাব।

সাজসজ্জা করিয়া নলিনী প্রবেশ করিল। সাধারণ ভাবে কথা বার্তা হইতে লাগিল।

ইতিমধ্যে কেয়া পাশের ঘরে গিয়া সাজ-পোষাক বদলাইয়া আসিল।

কেয়া। চলুন তাহলে, আর দেরী করে কাজ নেই।

জনান্তিকে

মা, তোমাদের চায়ের সব ব্যবস্থা করে রেখে গেলুম—জলও প্রায় গরম হয়ে গেছে। বাবাকে চা তৈরী করে দিও—বুকে ?
লক্ষ্মীটি।

হিরণ্ময়ী। [সম্মুখে] আচ্ছা গিচী ঠাকুরণ, সেজন্তে তোমাকে ভারতে হবে না।—যাও, বেড়িয়ে এস।

কেয়া। [পিতাকে চুপি চুপি] বাবা, তোমার জন্তে একরকম নতুন খাবার তৈরী করে রেখেছি—মার কাছে চেয়ে নিও।

হীরেন্দ্র। [সহাস্যে] আচ্ছা। তোমারা চা খেলে না ?

কেয়া। আমরা ফিরে এসে খাব।

কেয়া, নলিনী ও সমরেশের প্রস্থান

হীরেন্দ্র। [উৎকণ্ঠিত ভাবে] হ্যাঁগা, সমরেশ-ছোকরা কি কেয়ার জন্তে—?

হিরণ্ময়ী। না—নলিনী।

হীরেন্দ্র। [দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া] ও—যাক। আমার ভয় হয়েছিল।

হিরণ্ময়ী। না—কেয়ার এখনও ওদিকে মন যায়নি।

হীরেন্দ্র। [মুখ আবার মেঘাচ্ছন্ন হইল] কিন্তু একদিন ত ওর মন ওদিকে যাবে। একদিন হঠাৎ এক ছোকরা এসে ওকে আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। তখন আমরা কি করব ?

দুজনই শূন্য হইয়া বসিয়া রহিলেন

দ্বিতীয় দৃশ্য

কলিকাতায় যখনস্তর অফিস—“অনন্ত চন্দ্রশালহা”। আধুনিক নতুন আসবাব দ্বারা সজ্জিত। ছুটি কোঠা আছে। ঘরের এক পাশে ছোট টেবিলে টাইপ-রাইটার। মধ্য-খুলে বড় সেক্রেটারিয়েট টেবিলের সম্মুখে অনন্ত আসীন। পাশে বলাই দাঁড়াইয়া আছে। সময় অপরাহ্ন।

অনন্ত। দেখ বলাই, ছদ্মবেশ না করলে ডিটেকটিব হওয়াই বুধা।

বলাই। আজ্ঞে ঠিক কথা। এমনিতে আপনাকে ডিটেকটিব বলে মনেই হচ্ছে না। কেবলি সন্দেহ হচ্ছে আপনি জমিদার অনন্তবাবু।

অনন্ত। একথাটা আদিনি আমার মাথায় আসেনি, তাই ত মহা-মাথাকে খুঁজে বার করতে পারছি না। আজ সকালে হঠাৎ মাথায় খেলে গেল—ছদ্মবেশ। ছাড়া যে ডিটেকটিব হওয়াই যায় না। ছুনিয়ায় যত বড় বড় ডিটেকটিব জন্মেছে, তারা হরদম ছদ্মবেশ পরে বসে আছে।

বলাই। আজ্ঞে সে ত বটেই। আমি শুনেছি, ভাল ভাল দিগ্গজ ডিটেকটিবরা বৌ বৌ শব্দে ছদ্মবেশ পরেই ভূমিষ্ঠ হয়।

অনন্ত। তা ঠিক বলতে পারি না। যা হোক, যেই কথাটা মনে আসা, সঙ্গে সঙ্গে একসেট ছদ্মবেশ আনিয়ে নিয়েছি। এতদিনে আমার ডিটেকটিব সাজবার সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হল।

বলাই। আজ্ঞে তবে আর কি? এইবার ঐ জমিদারবাঁবুর মেয়ে মহামায়াকে বৌ বৌ শব্দে খুঁজে বার করে ফেলুন।

অনন্ত। নিশ্চয়। মহামায়া ত মহামায়া, ছদ্মবেশের জোরে বড় বড় চোর ডাকাতকে খুঁজে বার করা যায়।

• দেওয়ান হইতে একটা মোড়ক বাহির করিবা

এই হচ্ছে আমার ব্রহ্মস্ব। ছদ্মবেশ করতে হলে কি করতে হয় জানো?

বলাই। আজ্ঞে জানি বৈ কি। মুখে কালি-খুলি মাখতে হয়,—বহরুপীরা ত তাই করে।

অনন্ত! বলাই, তুমি একেবারে আহাম্মক—ঠিক ডাঃ ওয়াটসনের মত। কালি-খুলি কিছুই মাখতে হয় না,—চাই শুধু একজোড়া ইয়া বড় গৌফ, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া তুফ, আর নীল চশমা।

বলাই। আজ্ঞে, শুধু গৌফ আর তুফ?

অনন্ত। শ্রেফ গৌফ আর তুফ—আর নীল চশমা। চেহারা একেবারে বদলে যাবে। এই গু-খ—

ছদ্মবেশ পরিধান

দেখছ? চেহারা বদলে গেছে কি না?

বলাই। [মহাবিশ্বয়ে] আজ্ঞে আপনাকে বৌ বৌ শব্দে ঠিক বুড়ো কর্তব্যবাবুর মত দেখাচ্ছে। তাঁরও অমনি গৌফ আর তুফ ছিল।

অনন্ত। [হঠাৎ] কেমন—বেশ ভারিক্খি গোছের দেখাচ্ছে ত?

বলাই। আজ্ঞে বৌ বৌ শব্দে তিরিশ বছর বয়স বেড়ে গেছে!

অনন্ত। বাস—আজ এই বেশেই মহামায়াকে অহুসন্ধান করতে বেরুব, আজ আর তাকে না ধরে ছাড়ছি না। বলাই, মোটর বার কর।

বলাই। আজ্ঞে, আজ কোন দিকে বৌ বৌ শব্দে অহুসন্ধান করতে যাওয়া হবে?

অনন্ত। [চিন্তা করিয়া] লেকের ধারে যাব। দুর্গাপ্রতিমার মত মেয়ে, পায়ে আলতার মত লাল জড়ুল, আঠারো বছর বয়স,—যদি কোথাও পাওয়া যায় ত লেকের ধারে। ও ইডেন গার্ডেন-ফার্ডেন সব বাজে—মিছে করিন ঘুরে বেড়ালুম। ওদিকে দুর্গাপ্রতিমার মত মেয়ে একটাও নেই।

বলাই। আজ্ঞে দুর্গাপ্রতিমার মত মেয়ে ইডেন গার্ডেনে যেতেই পারে না।

অনন্ত। বাস, তাহলে মোটর বার কর। চারটে বাজে—এই উপযুক্ত সময়।

বলাই। আজ্ঞে।

গ্রহান

অনন্ত। [পাইপ ভরিতে ভরিতে চারিদিকে তাকাইয়া] অফিস ঘরটি দিবা হয়েছে। দোতলার ওপর ঘর, চারদিক খোলা, বাইরে প্রকাণ্ড সাইনবোর্ড টাঙিয়ে দিয়েছি—‘অনন্ত-দুর্গপালয়’। চমৎকার হয়েছে। শার্লক হোমসের দেখলে হিৎসে হত। মজেল যদিও এখনো একটিও আসনি কিন্তু এবার আসতে আরম্ভ করলে-বলে। তখন যত জটিল রহস্য আছে সব একেবারে হড়োছড়ি

লাগিয়ে দেবে। টাইপিষ্ট সেক্রেটারির জন্তে বিজ্ঞাপন ত দিয়েছি; কাল সকালে তারা আসবে ইন্টারভিউ করতে। বেশ একটি আধবয়সী মোটোসোটা ইউরেশিয়ান স্ত্রীলোক দেখে রাখা যাবে। ছুঁড়ি চলবে না, তাদের খালি ইয়াকি দেবার ফন্দি। [নীচে মোটর-হর্ণ বাজিল] ও সব এখানে চলবে না। এখানে শ্রেফ গম্ভীর ব্যাপার—প্রাণ নিয়ে টানাটানি—থুন জ্বখম—

পাইপ ধরাইয়া গ্রহান

তৃতীয় দৃশ্য

লেকের এক অংশ। সমরেশ ও কেয়া পাশাপাশি বেড়াইতেছে।

কেয়া। নলি কোথায় গেল?

সমরেশ। তিনি ঐ গুগাছের নীচে বেকিতে বসেছেন। ম্-মিস কেয়া, এই অবকাশে আমার বৃক্ষবাটা বলে নিই। দেখুন, আমার অবস্থা বড়ই কুকাহিল হয়ে পড়েছে, নলিনী দেবী ছাড়া আর কিছু ভ্রাবতেই পারি না। রাত্রে ঘুম নেই সারারাত প্যাট প্যাট করে চেয়ে থাকি। অথচ তিনি আমার কথা একেবারেই ভাবেন না। অর্থাৎ আমাকে ব্রোথ হয় তিনি ঘৃণা করেন। আপনি আমাকে ঘৃণা করেন না, কিন্তু তিনি—

কেয়া। নলিনী আপনাকে ঘৃণা করে এটা কি করে বুঝলেন?

সমরেশ। মুনানে আমাকে দেখলেই তিনি মুখের ভাব এমন উদ্দাস করে ফেলেন, এত কুম কথা কন যে—

কেয়া। [সহাস্যে] ও দেখে ভয় পাবেন না। নলির ঐ স্বভাব; ও যে জিনিষটি চায় তার প্রতি এমন ভাব দেখায় যেন সেটা ওর ছুঁচকের বিষ।

সমরেশ। ততাই নাকি? ততাহলে কি আমার প্রতি উনি—

কেয়া। মোটেই বিজ্ঞপ নন। কিন্তু আপনারও উচিত মনের ভাব আরো স্পষ্ট করে জানানো।

সমরেশ। [হতাশভাবে] কৃকি করব মিস কেয়া, আমার বাক-যজ্ঞটা এমন বেয়াদা যে যতই প্রাণে আবেগ উপস্থিত হয়, কুকথা ততই বে-এক্টিয়ার হয়ে পড়ে।

কেয়া। বাক-যজ্ঞ ছাড়া পুরুষের অহুরাগ জানাবার আর কি কোনো রাস্তা জানা নেই?

সমরেশ। আর কি করব বলুন?

কেয়া। ওকে বিপদ থেকে উদ্ধারের চেষ্টা ককন; সেকালে নাইটরা কি করত? সমরেশবাবু, আপনি এত বুদ্ধিমান, এত বড় ইঞ্জিনীয়ার আর এই সামান্য বিষ উত্তীর্ণ হতে পারছেন না?

সমরেশ। আপনার কাছে যেটা সামান্য বোধ হচ্ছে—সেটা আমার কাছে যে ব্যা-বাবিলনের হ্যা-হ্যাপিং গার্ডেন তৈরী করার চেয়েও শক্ত। ঐ যে বিপদ থেকে উদ্ধারের কথা বললেন, বিপদ কোথায় যে উদ্ধার করব? একটা সুসহবিধে মত বিপদও যদি ঘটত,—কিন্তু কলকাতা শহরে হঠাৎ বিপদই বা পাওয়া যায় কোথায়?

কথা কহিতে কহিতে দুজনে অবশ্য হইল

পট পরিবর্তন

লেকের অস্ত্র অংশ। রাস্তার ধারে অনন্তর মোটর ধাঁড়াইর আছে।

ছয়বেশী অনন্ত গাড়ী হইতে নামিতেছে।

অনন্ত। বলাই, তুমি গাড়ীতে বসে থাক, আমি এখন অশ্বেষণে
বেকলুম।

বলাই। যে আজ্ঞে।

অনন্ত। আর দাখ, তুমিও রাস্তার দিকে নজর রেপো, দুর্গাপ্রতিমার
মত কেউ যায় কিনা লক্ষ্য করো।

বলাই। যে আজ্ঞে।

অনন্ত। আঠরো বছর বয়স হওয়া চাই মনে থাকে যেন।

বলাই। আজ্ঞে যদি বোঁ বোঁ শব্দে উনিশ বছর বয়স হয়?

অনন্ত। তাহলে লক্ষ্য করবার দরকার নেই।

প্রস্থান

শট গরিবর্তন

লেকের অস্ত্র অংশ। নির্জন বৃক্ষহলে নলিনী একাকিনী

বেষ্টিতে বসিয়া আছে।

নলিনী। ছ'জনে কথা কইতে কইতে চলে গেল। আমি যে এখানে
বসেছি তা লক্ষ্যই করলে না। [দীর্ঘনিশ্বাস] আমার না এলেই
ভাল হত। —একা—একা—পৃথিবীতে আপনার বলতে কেউ
নেই। আত্মীয় বন্ধু নেই। বন্ধু—সে ত ছিল না। ভালবাসা—
সে ত প্রতারণা! [পিচনে অনন্তের আবির্ভাব] এ পৃথিবী
একটা প্রাগৃহীন মক্কভূমি! বাপ নেই—মা নেই—

অনন্ত। সব আছে।

অনন্ত বেকিতে আসিয়া বসিল। নলিনী চমকিত ভাবে একবার

তাকাইয়া একটু দূরে সরিয়া বসিল।

শনিবারের চিঠি

অনন্ত। বাপ মা সব আছে—শুধু কোথায় আছে জানেন না। সে খবর
আমি দিতে পারি।

নিজ বক্ষে টোকা মারিল

নলিনী। (শঙ্কিতভাবে) কে আপনি? কি চান?

অনন্ত। কিছু চাই না। আপনি কে, আমি জানি। আপনার নাম
মহামায়া।

নলিনী। আমার নাম মহামায়া নয় আপনি ভুল করেছেন।

অনন্ত। ভুল! [হাস্য] ভুল আমি করি না। আপনার বয়স আঠারো
বছর কিনা?

নলিনী ব্যাকুলভাবে চারিদিকে তাকাইল

অনন্ত। ভুল হবার জো নেই একেবারে ঠিক ধরেছি।—এখন আপনার
বাঁ পায়ের জুতো খুলুন ত দেখি।

নলিনী। [ধাঁড়াইয়া উঠিয়া ভয়ান্তর] আঁ!—সমরেশ বাবু!
কোথায় গেলেন—সমরেশ বাবু।

সমরেশ। [দূর হইতে] যাচ্ছি।

অনন্ত। তাই ত। গোলমাল ঠেকছে। পুলিশ ডাকবে নাকি?

ছুটিতে ছুটিতে সমরেশ ও কেয়ার প্রবেশ।

সমরেশ। কী হয়েছে?

নলিনী। [সমরেশের হাত চাপিয়া ধরিয়া] ঐ লোকটা খামাকে জুতো
খুলতে বলছে।

সমরেশ। [মুগ্ধ পাকাইয়া সগর্জনে] কী—[অনন্ত পলায়ন করিল]
আজ ব্যাটােকে খুনই করব।

পশ্চাদ্ভাবন

নলিনী। সমরেশবাবু যে চলে গেলেন কেয়া।

কেয়া। চল্ আমরাও ওঁর পেছনে পেছনে যাই।

উভয়ে হাত ধরাধরি করিয়া দৌড়াইতে আরম্ভ করিল

পট পরিবর্তন

অনন্তের মোটর। ফুটবোর্ডে বলাই বসিয়া আছে।

বলাই। আঠারো বছরের দুর্গাপ্রতিমা ত এ অঞ্চলে একটিও নেই দেখছি। পঞ্চাশ বছরের একবানি রঞ্জে-কালীর প্রতিমা একবার গেলেন, তারপর থেকে বোঁ বোঁ শব্দে বসেই আছি।

দৌড়াইতে দৌড়াইতে অনন্তের প্রবেশ

অনন্ত। বলাই শিগ্গির গাড়ী ষ্টার্ট দাও—তাড়া করেছে।

বলাই। কে, দুর্গা প্রতিমা?

অনন্ত। শুধু দুর্গাপ্রতিমা নয়, সঙ্গে প্রকাণ্ড এক মহাদেব আছেন, গঙ্গার মত দুই বাছ ঘোরাতে ঘোরাতে ছুটে আসছেন।

বলাই। তাইত। তাহলে বোঁ বোঁ শব্দে—

মোটরের হাওেল ঘুরাইয়া ষ্টার্ট দিবার চেষ্টা করিল,

কিন্তু গাড়ী ষ্টার্ট লইল না

অনন্ত। ঐ রে, মহাদেব এসে পড়ল! আজ দক্ষদজ্ঞ বাধালে দেখছি।

না, বিনা রণে আর নিস্তার নেই।

বলাই। হুজুর, আমার মাথায় এক বুদ্ধি এসেছে।

অনন্ত। কি বুদ্ধি চটপট বল মহাদেব এসে পড়ল।

বলাই। গৌফ ভুরু আমায় দিন, তাহলে আর বোঁ বোঁ শব্দে আপনাকে চিনতে পারবে না।

অনন্ত। ঠিক বলেছ।

গৌফ ভুরু বুসিয়া বলাইকে ধিল বলাই উঠা পরিধান করিল।

বেগে সমরেশ প্রবেশ করিল, পশ্চাতে মলিনী ও কেয়া

সমরেশ। কুকোনদিকে গেল দেখেছেন?

অনন্ত। কি হয়েছে মশায়?

সমরেশ। একটা লোক লম্বা গৌফ, চোখে নীল চশমা, এদিক দিয়ে যথেষ্ট দেখেছেন?

অনন্ত। কৈ, না, এদিকে ত সেই রকম কেউ আসে নি।

সমরেশ। ত তবে গেল কোথায়?

অনন্ত। তা ত বলতে পারি না। আপনার সঙ্গে মেয়েরা রয়েছেন দেখছি, কোন বিপদ হয় নি ত?

সমরেশ। বৃবিপদ হয়নি কিন্তু শিগ্গির হবে—সেই লোকটার।

চারিদিকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল

মলিনী। [কেয়াকে] জ্বাণ ভাই, ওই লোকটার গৌফ ঠিক সেই রকম। [বলাইকে নির্দেশ]

অনন্ত। [নিকটে গিয়া নমস্কার পূর্বক] অপরাধ নেবেন না। কিন্তু আপনারা কি আমার শোকারকে সন্দেহ করছেন?

কেয়া। ইনি বলছেন যে ওঁর গৌফ ঠিক সেই রকম।

অনন্ত। [বলাইকে ডাকিয়া] বলাই, তোমার গৌফ সেই রকম কেন?

বলাই। আজ্ঞে বোঁ বোঁ শব্দে—আমার গৌফ কি রকম?

অনন্ত। [ধমক দিয়া] যে রকমই হোক, তোমার গৌফ দেখে এদের সন্দেহ হয়েছে।

বলাই। আজ্ঞে, সন্দেহের কোনও কাজই ত বোঁ বোঁ শব্দে আমার গৌফ করে নি।

অনন্ত। না করুক, কিন্তু ছুটি ভক্তমহিলার যখন সন্দেহ হয়েছে তখন ও গৌফ আর রাখা চলবে না। আজই গিয়ে কামিয়ে ফেলবে।

বলাই। যে আজ্ঞে—

কেয়' ও নলিনীর সকেতুক হাত

সমরেশ। [ফিরিয়া আসিয়া] ননাঃ—পালিয়েছে। কিন্তু পালিয়ে
য্যাবে কোথায়! যেখানে পাই খুঁজি বার করব। তারপর—
চলুন। [অনন্তকে] আপনি ত তাহলে দেখেন নি ?

অনন্ত। না।

সমরেশ। নুনমন্ডার।

কেয়' ও নলিনীকে লইয়া প্রস্থান

অনন্ত সেইদিকে তাকাইয় ঠাড়াইয়া রহিল।

যবনিকা

পথ

কবিতা লিখিতে হয়

সে সময়

যে সময়ে শর্ম্ম অচল !

যুমের অঞ্চল দিয়ে টান,

অথবা নিজার ভান,

কিছা অল্প কোন আবরণে ;

পরম্পর প্রতারণা করে সর্ব্বজনে,

যে সময়ে ;

সে সময়ে

শনিবারের চিঠি

কবির লেখনী অল্প

ফেলি ভব্যতার বস্ত্র

প্রশব-বেদনা আন্তর্নাদে

কত ছন্দে কাঁদে !

তখন আকাশে চাঁদ

ফেলি জোছনার ফাঁদ

তারকা ধরিবে আশে ঘোরে ;

ঘটি নিয়ে যায় চোরে

পাশের ঘরেতে

আরন্তলা বাধে বাসা ছুঁধের সরেতে ;

আরও কত কারা

হয়ে আত্মাহারা

এদিকে ওদিকে যায় নিঃশব্দে গোপনে ;

প্রতি কণে

জন্ম, মৃত্যু, প্রেম, অভিশার ;

যে যাহার

কার্ণাণে বাস্ত,

কবি হস্তে আছে ছাপ্ত

অক্লান্ত লেখনী—

কল্পনার খনি—।

অনন্তে ভূতের নৃত্য

ওদিকে জগাই ভূতা—

ইসারায় দিশা হারা

এই ত প্রেমের ধারা !

বলিবার নাই কিছু শাস্ত্রগত বাণী ;
 সবই জানি
 কিছু বলিব না ;
 শুধু চলিব না
 কল্পনার পথ-ছাড়া অচ্য পথে ;
 চড়িয়া পুষ্পক রথে
 খরচ-বর্জিত স্থখে
 উর্ধ্বশীর মুখে
 চূধন আকিয়া
 অমৃতের ভাও হতে কিঞ্চিৎ চাখিয়া,
 গোপনে নিভুতে
 বিনা feeতে
 এ সকল স্থখ অনাবিল ;
 তথা বিনা bill
 আসে শুধু গৃহস্থ জীবনে,
 কাব্যের কদম্ব বনে
 লেখনীর বাশরী বাজায়ে
 কাব্য-কলা-বোটিকে ত্রিরাশা মাজায়ে ।
 বিগতঘোবন কবি
 দেখে ঘোবনের ছবি
 নিজ লেখনীতে,
 কবিতার মাদক ধ্বনিতে
 যত অবৈজান দেশ
 ভুলিয়া গমন-ক্লেশ

যুরে আসে ;
 উঠানের বাসে
 ফুটে উঠে বসোরা গোলাপ ।
 হয়ত জ্বালাপ
 পরে প্রয়োজন হবে ।
 কিন্তু এই ভবে
 সে ভয়েতে ভীত হ'লে, হায়,
 বেঁচে থাকা দায় ।
 স্তবরাং
 মন্ত, কি গল্পিকা, কিথা ভাঙ্গ
 না ধরিলে আর
 চলে না সংসার ।
 কিন্তু তাহে হয় গর্জা
 সে হেতু কবিতা চর্চা
 সর্সাপেক্ষা স্থলভ ঔষধ
 বাস্তবের অত্যাচার রদ
 কবিতার তরে ।
 স্তরে স্তরে
 কল্পনা করিয়া খাড়া
 Fact এর-বিষ দাঁড়া
 ভাঙিয়া, যদি না
 যেতে পারি ইম্পাহান, পারী, রোম অথবা মদিনা,
 তবে এ বাঙালী নাম
 কি এর রহিল দাম

মন্দা এ বাজারে ?
 হাজারে হাজারে
 ইঙ্গ, চঙ্গ, ভীমার্জুন, কুবের, মদন
 গোপিনীর বঙ্গহারী শ্রীমধুসূদন,
 অন্টনি-কি বোনাপাট,
 রিচার্ড দি লায়ন হাট,
 কিধা কামানোভা ডন জুয়ান
 কাব্যক্ষেত্রে পায় প্রাণ।
 শুধু যদি আমি থাকি বাকি,
 গোল পী জীবন হবে থাকি,
 মালকে ফুটিবে শুধু কঁটা,
 দণ্ডক-অরণ্যে রবে পাঠা,

স্বর্ণ মুগ স্থলে !
 ছলে বলে অথবা কৌশলে
 এ crisis পার হতে হবে ;
 Help কর, হে পাঠক সবে,
 চন্দে দ্বাশ কব
 আমি তাই হব ;
 অশীর্ষদ কর ভাই
 করিব আমিও তাই
 তোমার বেলায়
 নয় বাংলায়।

শ্রীমধুকরকুমার কাঞ্চিলাল

“কামার্ভা হি প্রকৃতি-রূপণা—”

পাশের বাড়ীর ওরা অতি চমৎকার লোক। কেন চমৎকার ?
 কেন নয়, তাই জিজ্ঞাসা করি। জীবের মধ্যে সেরা মানুষ, মানুষের
 মধ্যে সেরা বণিক। কেমন ? আর বাণিজ্যের সেরা কি ? প্রকারান্তরে
 কথাটির জবাব দিতেছি। আমি বলি, যাহাকে এ দেশের মেয়েরা
 ঘামীর চেয়ে প্রিয় মনে করে—তাহার বাণিজ্যই শ্রেষ্ঠ। এ দেশের
 বলিলাম, কারণ দেশান্তরে এক-জাতীয় কুকুরের কথা উঠিতে পারে।
 মোটের উপর, উহার বণিক-শ্রেষ্ঠ, এবং লোকও অতি চমৎকার,—
 অন্ততঃ সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

সেদিন ওবাড়ীর বারান্দায় উহাদের বিধবা বধুটি বসি দিতেছিল,
 আমি দেখিতেছিলাম, এবং ভাবিতেছিলাম, অশ্রু আর কিছু নয়, শুধু
 এই কথাটি যে উহার অতি চমৎকার।

“হ্যাগা, জানালায় বাইরে হাঁ করে তাকিয়ে কি দেখছ ?”

কি আশ্চর্য্য! এইমাত্র উনি ত রত্নাশয়ের ছিলেন, এরই মধ্যে
 এখানে কিরূপে! না, জীবন একটা ড্রাজারি! আমতা আমতা
 করিয়া বলিলাম, “ওবাড়ীর ছাদে কি হৃন্দর একটা মাছরাঙ্গা পাখী
 বসেছে দেখ!”

উন মুখ বাকাইয়া বলিলেন, “আহা ওটা বুঝি মাছরাঙ্গা! ওতো
 কাকাতুয়া।”

“আ, কাকাতুয়া! কিন্তু কি হৃন্দর দেখ!”

“ছাই হৃন্দর। কাকাতুয়া যেন কখনো দেখনি আর কি!”

কিন্তু ততক্ষণে সে চলিয়া গিয়াছে,—কাকাতুয়া নয়, সে সমুদ্রিন ওখানে থাকে এবং মোঘের গাড়ীর শব্দ অহঙ্করণ করিয়া ক্যাচ ক্যাচ আওয়াজ করিতে থাকে। কিন্তু সে আর ও বারান্দায় নাই। হয়ত আরও কিছুক্ষণ থাকিত, আরও কয়েক পান্টা ঝাঁট দিত, আর তাহার ঝাঁটার আঘাতে আমার মনের অশোক-কুণ্ড—

“বলি আজ কি নাইতে থেতে হবে না? না, সারাদিন হাঁ করে পার্বীই দেখবে?”

“না, এইবার যাই আর কি।”

“আর দেখ, ও বাড়ীর কন্ঠকে ডেকে একবার বলে দিযো ত, ওদের মেয়েগুলো বড্ড বেহায়া, আমার রান্নাঘরের পাশেই যত জঞ্জাল ফেলবে। এরকম করলে ত আর পেরে ওঠা যায় না।”

শুক-কণ্ঠে কহিলাম, “হঁ, বলে দেব।”

কিন্তু বলা আর হয় নাই, কাজেই জঞ্জালের পুণ্য ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতেছে। কি করিয়া বলি? বাহার বাঁচিবার সাধ আছে সে কি আত্মহত্যা করিতে চায়? ফলতঃ, এ পক্ষের তর্জনগর্জনে যতই বাড়িতে লাগিল, ও পক্ষের ঝাঁটার ধূল্য আমার বাসনার বীজ আকাশে-বাতাসে ততই উড়িতে লাগিল। অনিত্যতা, ইহা বুঝা। বিবাহিত জীবন, বৈধব্য, জাতিভেদ, তাহাদের বারান্দা ও আমাদের জানালা এবং তন্মধ্যবর্তী স্পর্শহীন আকাশ—এতগুলি দুর্গম গিরিসঙ্কট অতিক্রম করিয়া হয়তো কখনও আমাদের মিলন সম্ভব হইবে না, কিন্তু মন কোন যুক্তি মানিত না। মাঝে যেন একগাছা অস্ত্রহীন দড়ি—তাহার একপ্রান্তে আমি, অন্যপ্রান্তে সে। আমি নিরস্তর টান দিতেছি, কিন্তু পথের দূরত্ব সম্পূর্ণ টেনশনটি ঢিলা করিয়া দিতেছে। এপারের আত্মহীন ওপারে

পৌছিতেছে না। পথের অপর পার্শ্বে একটি বিড়িওয়ালা বরং স্থখে আছে, তাহার অনেকটা হুবিধা। স্পষ্ট ঘরের মধ্যে তাহাকে সমস্ত দিন দেখিতে পায় এবং দেখেও। এপাশের বারান্দার প্রান্তভাগ বাতীত আমার কিন্তু কোন উপায় নাই, এবং কালেও তাহার অপাধ-দুষ্টির একটুখানি অস্পষ্ট সঙ্কেত,—অনিশ্চিত, জটিল এবং জলভারাক্রান্ত মেঘের প্রান্তে বিছাৎফুরণের মত অস্থির কিন্তু অগ্নিশ্রাবী!

সেদিন ফাস্তনের শুরু ছাদশীর রাত্রি। প্রেয়সীর নাসিকার শব্দে হঠাৎ শেখরাজে ঘুম ভাঙিয়া গেল। প্রায়ই যায়, তবে অচ্যাক্ত দিন কানে হাত-চাপা দিয়া পড়িয়া থাকি। সেদিন উঠিয়া জানালার ধারে আসিলাম। ও বাড়ীর ছাদের কিনারাঘ চাঁদ চলিয়া পড়িতেছে। ঠিক তাহারই পিছনে একখণ্ড সাদা মেঘ, নিম্পন্দ, নিশ্চল,—চাঁদ যেন তাহার রূপালি আলোকের উত্তরীয়খানি অলসভাবে মেলিয়া ধরিয়াছে। অদূরে কোন এক বৃক্ষশাখায় একটা ঘুমন্ত কোকিল দূর-গলায় গুমরিয়া মরিতেছে। এক ঝলক দক্ষিণের বাতাস আমার চোখেমুখে লাগিল—রূপসী তরুণীর উষ্ণ নিশ্বাসের মত, (কিন্তু নিজের স্ত্রী হইলে কল্পনাটিই মাটি। কাজ কি? উপমাটি পরিবর্তন করিয়া দিতেছি, যথা—) ভূরিভোজনান্তে অবসন্ন রসনাঘ চাঁটনির সোহাগের মত। মনের পর্দা সুহসা উড়িয়া গেল, চাহিয়া দেখি ছবছ পারশ্বের গোলাপকানন,—গন্ধ ও রূপের টেটে খেলিয়া যাইতেছে! কিম্বদন্তীলোকের অশ্রুত সঙ্গীত বাজিতেছে, চিরযৌবনের স্বর্ণা অক্ষয় আনন্দের সুস্বাদু ধারায় ঝরিয়া পড়িতেছে! আর সর্বকথিত যেন এই ফাস্তনের বাতাসে আমার দেহ-ঐরাবতের গলায় পারিজাতের মাল্যের মত ছলিয়া উঠিতেছে!

শুধু যদি এই সময়টিতে সে একবার ও বাড়ীর বারান্দায় ঝাঁটা হাতে করিয়া পাড়াইত! আমি দেখিতাম, দেখিয়া মজিতাম, এবং স্পষ্ট

সে কথা তাহাকে বলিতাম। এমন রাতে কি না বলিয়া থাকা যায়? আপনারাই বলুন না!

কিন্তু ওকি? সত্যি ও বাড়ীর বারান্দায় দাড়াইয়া কে ও? সেই নয়? আমি এই কাল-কলম স্পর্শ করিয়া বলিতেছি নিশ্চয় ও সেই! সেই তপ্তকান্ন বর্ণাভা, সেই আয়ত চক্ষের বাধাতুর দৃষ্টি, সেই নিতম্ব-লম্বী কেশপাশ! হে আমার বসন্ত ঋতু, জীবন-সঙ্গী, প্রাণাধিক! নিশ্চয় তোমার যাদু-দণ্ড তাহার ঘুমের মাঝে স্পর্শ করাইয়াছিলে, নচেৎ, রাজির এই চতুর্থ প্রহরে সে এমন করিয়া আমার নির্দীক প্রেমের নিঃশেষ প্রতিদান দিবার জন্ত বারান্দার বন্ধে তাহার রক্ত-কমল পা ছুঁখানি রাখিয়া দাঁড়াইত না! কিন্তু এ স্বপ্নময় বহিয়া যাইতে দিলে চিরজীবন হাহাকাঙ্ক করিয়া মরিতে হইবে। আজ মনের কথা তাহাকে ফুলিয়া বলিবই, ফলাফল যাহাই হউক, গ্রাহ্য করিব না। না, না, ফান্তনের এ আত্মান মিথ্যা হইতে পারে না! বার দুই গলাটা ঝাড়িয়া লইয়া স্বপ্ন করিলাম—

“আহা, কি সুন্দর রাজি!”

কোন উত্তর নাই!

পুনরায়—“আহা, কি চমৎকার বাতাস!”

তথাপি নিরুত্তর। কানে পাটো নাকি? হইতেও পারে,—যাই হোক, এইবার একটু চেঁচাইয়া বলাই ভাল। কিন্তু ও যেন এইবার বারান্দার প্রান্তে সরিয়া আসিল নয়? যেন নিবিষ্টভাবে আমাকেই দেখিতে লাগিল, যেন আরো কি বলিতে চাই তাহা শনিবার জন্ত উদ্‌গ্রীব, উৎকর্ণ এবং উন্মত্ত হইয়া রহিল! আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম—তাহার চক্ষের রাগ অরুণ, তাহার নিশ্বাস ক্ষত, তাহার রক্তাধরে লজ্জা, হাসি ও ব্যাকুলতা! শুধু তাই নয়, ঐ যে বাসন্তী রঙের

ব্লাউজ সবে ও পূর্ণিমার জোয়ারের মত তাহার বক্ষ ফুলিয়া উঠিতেছে, এবং তাহারই তট-প্রান্তে কুঞ্চিত কালো কেশের রাশি সাগর-তরঙ্গের মত ভাঙিয়া পড়িয়াছে! আমি নিশ্চয়ই ঝাঁপ দিব, দিয়া মরিব, কোন কথা শুনিব না।

এইবার বলি তবে? না আর একটু দেবী করিব? শুভ্র শীতল—বলিয়াই ফেলি, কি বলেন? তবে, কোন ভূমিকা নয়— একেবারে টু দি পয়েন্ট, কারণ বুকের রক্ত অনেকগণ বয়েলিং পয়েন্ট অতিক্রম করিয়াছে। কিন্তু স্বপ্নজটা এমন হাতুড়ি পিটিতেছে কেন? হাত-পা ঝিম ঝিম করিতেছে কেন? এখনই কি সরিষার ফুল জগৎ ছাইয়া ফেলিবে,—অথবা কেহ ধরিয়া শূলে চড়াইবে? ও না-হয় বড় জোর বলিবে—“আমায় ক্ষমা করুন, আমি পারব না!” তাতে এমন ভয়ের কি আছে? হাজার হোক পুরুষ তো,—লজ্জা কিসের? না, না, কোন কথা নয়, এই—এক, দুই, তিন—

“ওগো, আমি, আমি যে পাগল হ’য়ে গেলাম তোমার জন্ত— তা কি তুমি এখনও—”

বজ্রনির্ধোষে উত্তর আসিল, “মশাই, কাকে কি কথা বলছেন!” সঙ্গে সঙ্গে বারান্দায় আলো জলিয়া উঠিল—একি! যা ধরিজী! এ যে ও বাড়ীর কস্তা! কৃষ্ণকায়, পঙ্ক-গুন্দ, বৃহদাসিক, ঘৃণিত-লোচন! চিকচিক টাকের উপর বিদ্যাতের আলো কেরোসিন তৈলের মত গড়াইয়া পড়িতেছে!

“এত রাতে এ বাড়ীর কাকে লক্ষ্য করে এ সব কথা বলছেন মশাই? আপনি না ভক্তলোক, ছিছি, আপনার এই ব্যাভার!”

মাত্রের বিপদ কখনো একাকী আসে না। পৃষ্ঠ উফ্ফ নিশ্বাস লাগিল, প্রেমসী ও উঠিয়া পড়িয়াছেন, শক্তিক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—

“হ্যাগা, এত রাতে কার সঙ্গে ঝগড়া করছ ?”

মূর্খকাল মাত্র। দৃষ্টি উপস্থিত-বুদ্ধি, আসন্ন সময়ে তুমি আমাকে রক্ষা করিতে পার আর নাই পার, তোমার স্থলিত অস্ত্রখানা একবার ধরিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিও।

কড়া করিয়া বলিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কণ্ঠে রোদনের আভাস ফুটিয়া উঠিল—“হ্যা মশাই, আপনাদেরই খুব ভদ্রতা! রোজ রোজ বাড়ীর পাশে জঙ্ঘাল ফেলে এমন করেছেন যে—চুর্গক্ষে ঘরে টেকাই দায় হয়েছে,—আর সে কথা বলতে গেলেই আমি অভদ্র, নয়!”

“চুপ রও উম্মু কীহাকা। ওঃ, অভদ্র বলাটা ভারী অজ্ঞায় হয়েছে! পাজী, বদমায়েস, বেহায়া, লম্পট, শূয়ার—”

“শ্রমদার মশাই, মুখ সামলে কথা বলবেন, নইলে—”

“নইলে কি? আমাকে মারবে? এস না একবার দেখি, জুতো-জোড়াটা খুলেই রেগেছি—”

“কি! এত বড় স্পর্শা!”

কিন্তু আর বলা হইল না, ইনি আমাকে টানিয়া লইয়া সশব্দে জানালা বন্ধ করিয়া দিলেন। কিন্তু জানালা-পারের গালাগালির সাপটে আমার জানালা, দরজা, চৌকাঠ, ঘরবাড়ী এবং আসবাবপত্রসহ স্বয়ং আমি প্রবলবেগে কাঁপিতে লাগিলাম। উনি মনে করিলেন—আমি ক্রোধে কাঁপিতেছি। বলিলেন, “কি হবে ছোটলোকের সঙ্গে ঝগড়া করে, সকালবেলাই একখানা দরপাক্ষ পাঠিয়ে দিয়া না, আপনিই শায়েস্তা হ’য়ে যাবে।”

পুনরায় রক্ত গরম হইয়া উঠিল, কহিলাম, “নাঃ, তুমি আমায় ছেড়ে দাও, আমি ব্যাটাকে দেখে নেব!”

শনিবারের চিঠি

“আহা চুপ কর না, আইন যখন হাতে আছে, কাজ কি ঝগড়া-ঝাটি করে!”

“তবে একঘাস জল দাও—গলাটা বড্ড শুকিয়ে গেছে।” বলিয়াই শয্যা আশ্রয় করিলাম।

উনি আমাকে জল খাওয়াইলেন; সর্কান্দ ঘামিয়া গিয়াছিল,—উনি পাখা করিতে লাগিলেন এবং আঁচল দিয়া কপালের ঘাম মুছিয়া দিলেন।
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ সিংহ

গর্দভ-চরিত

গাধা সারা-জীবন রজক সরকারে কাপড়ের বোঝা বয়ে বুদ্ধ বয়সে পেনশন নিলে।

ধোপা লোকটার দয়ামায়া ছিল। সে তার ‘পোষ্ট’ তার ছেলেকে দিতে চাইলে।

গাধা মাথা নেড়ে বললে—“না ছজুর! আমি সারা জীবন পরের দাসত্ব করেই কাটালাম। ছেলেটাকে আর দাসত্ব করতে দেব না। ওকে আমি লেখাপড়া শিখিয়ে মাহুষ করব।”

অতএব গর্দভ-তনয় ইঙ্গুলে ভর্তি হয়ে লেখাপড়া শিখে মাহুষ হতে লাগল। পিতার উপদেশে সে জাত-ব্যবসার ধার দিয়েও গেল না। এবং সম-ব্যবসায়ীদের ঘৃণা করতে শিখল।

কিন্তু বুদ্ধি-হুজি তার মন্দ ছিল না। পড়াশুনা শেষ করে ডাল ভাবেই পাস করে বেরুল।

গাথা কিন্তু এতেই সম্বৃত্ত হল না। সে ছেলেকে বললে—“মাছুষ তো হয়েছ; এইবারে দস্তুরমত ভঙ্গলোক হতে হবে। শালীনতা যদি না থাকে, তবে বিজ্ঞের মূল্য কি?”

গর্দভ-তনয় ‘বাই নেচার’ ভদ্রই ছিল। ইঞ্চুলের পুঁথিতে ভঙ্গলোকের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি সম্বন্ধে পড়ানোও করেছিল। সে সহজেই ভঙ্গলোক বনে’ গেল। ‘আদব-কায়দা’ শিষ্ট চায়ে একেবারে নিখুঁত।

তার পরেই ক্ষুর হল মুশ্লিল। ঘরে এবং বাইরে;—অর্থাৎ ঘরে বাইরে।

আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, পাড়া প্রতিবেশী, পরিচিত অপরিচিত, ডাক্তার, দালাল, উকিল, ফেরিওয়ালা, মহিলা বাস-যাত্রিণী, অবলা-সংস্কার সেক্রেটারি—সকলকার কাছেই ভঙ্গলোক-বনতে গিয়ে সে অসুবিধায় পড়তে লাগল।

গাথা বলল—“ভঙ্গলোক হওয়ার এত বিপদ তা কে জানত!” কিন্তু ভদ্রতা তাকে ছাড়ল না। “Character of a Gentleman” তার ভাল করেই পড়া ছিল কিনা।

মামীর পিসতুত ভাইয়ের বিধবা শালাজ, যখন পাঁচটি ছেলে-মেয়ে নিয়ে তিন মাসের জ্বর তার ওপরে চড়াও হলেন—সে মুখ ফুটে কিছুই বলতে পারল না। নারীর প্রতি অসৌজন্য দেখায় কি করে?

এবং প্রতিবেশী দালাল এসে যখন তাকে দিয়ে তিনটে ‘কপি ইন্সিওরেন্স’ করিয়ে নিতে চাইলেন, তখন সে এই ‘কপি ইন্সিওরেন্সের’ স্বার্থ সম্বন্ধে প্রথম একটি সংস্কার প্রকাশ করতে চেয়েছিল বটে; কিন্তু বন্ধু উদ্বীপ্ত কণ্ঠে বললেন—“তুমি কি আমার কথা বিশ্বাস করছ না?” এবং তৎক্ষণাৎ সে বিনা বাকবাধে টাকা তিনটি এনে তাঁর হাতে দিলে। প্রতিবেশীকে অবিশ্বাস করাটা কিছু নয়।

এবং এই ঘটনা শুনে, এর পরে যখন জনৈক লজ্জিক-পড়া সহপাঠী নানাবিধ যুক্তিতর্ক অবতারণা করে প্রমাণ করলে—সে একটি আশ্চর্য গর্দভ, তখন (কথাটা সত্যি হলেও) সৌজন্যের খাতিরেই সে প্রতিবাদ করতে পারল না।

এবং বিয়ের রাতে স্বস্তর বাড়ীতে লাল জামা পরা নবছরের স্নিহা-ক্ষীতা শ্রালিকা যখন সভার মধ্যে তার লম্বা কর্ণ ছুটি মোলায়েম ভাবে মর্দন করে দিলে, তখন সে ভয়ানক অপমানিত বোধ করলেও, ভদ্রতার খাতিরে যে শুধু কিছু বললে না তা নয়; ‘হি’ ‘হি’ করে দাঁত বের করে আর সকলের সঙ্গে হাসিতেও যোগ দিলে।

বাইবেও বাপারটা একই রকম ঘটতে লাগল।

আগেই বলেছি, গর্দভ-তনয়ের সহজ-বুদ্ধি মোটামুটি একরকম ছিল; এর ওপরে সে খাটতে পারত ঠিক গাধার মতন। এই দুটি গুণের সমাবেশ মাছুষের ভিতর দেখা গেলে—মাছুষ তাকে ‘জীনিয়াস’ বলে।

‘জীনিয়াস’ গাথা তার এই ‘জীনিয়াস’ত্বের দ্বারা জাগতিক ক্ষেত্রে লীয়েই একটা বড় ‘আর্চাইভমেন্ট’ করে ফেলেছিল। ‘অর্থাৎ, যা’ থেকে প্রচুর অর্থাগম হতে পারে।

কিন্তু নিজের চাক নিজে পিটান ভঙ্গলোকের পক্ষে অশোভন বিধায়, সে এ বিষয়ে রীতিমত ‘প্রোপাগান্ডা’ করেনি। এবং এর পরে যখন প্রেস রিপোর্টার তার এই কৌতুক সম্বন্ধে বিবরণ নিতে এল, তখন যে সে শুধু বিনয়বশতঃ নিজের কুতিত্ব বাড়িয়ে জাহির করেনি, তা নয়; ‘সদা সত্য কথা বলিবে’—এই নীতি অচ্যুতরূপে করে তার অধীনস্থ সহকর্মীদেরও যথাসাধ্য কুতিত্বের অংশ দিয়েছিল।

এ রকম ক্ষেত্রে নিজের কুতিত্ব কয়েকগুণ বাড়িয়ে বলা, এবং সহকর্মীদের কৌতুক আত্মসাৎ করাটাই রীতি। কাজেই প্রেস রিপোর্টার

এবং জনসাধারণ সহজেই বুঝে নিলে কীষ্টিয়ায় গাধার চেয়ে গাধার সহকর্মীদেরই কৃতিত্ব বেশী। এমন কথাও শোনা গেল, যে বাস্তবিক পক্ষে গাধাই তার সহকর্মীদের জিনিষটা নিজের নামে চালাতে চেষ্টা করেছে।

এ বিষয়ে বাদান্ধবাদ যতই বেড়ে চলল, ব্যাপারটা গাধার কাছে ততই নিরর্থক, এবং তার সহকর্মীদের কাছে অর্থপূর্ণ হয়ে উঠতে লাগল।

অবশেষে জেরবার হয়ে গাধা তার স্ত্রীকে এসে বললে—“মাছুয় গুলো যে এমন নিরেট গাধা, তা কে জানত? বিধান করেছে, ‘সদা সত্য কথা বলিবে’। সব সময়ে নিচু সত্যি বললে যে কোনো কথাই আর লোকে বিশ্বাস করে না—এটুকু বুঝবার মত বুদ্ধিও তাদের নেই।”

গদ্য-পদ্যী সংক্ষেপে বললে—“জ্ঞাত ব্যবসা ধর। এ সব তোমার কর্ম নয়।”

ভ্রলোকের পক্ষে দরকারমত অভ্র না হতে পারাটা জীবনের ঘোড়দৌড়ে যে কতবড় ‘হ্যাণ্ডিক্যাপ’ গাধা তা টের পাচ্ছিল। কিন্তু আবাল্যের শিক্ষার প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারল না।

কেন না, এর পরেও দেখা গেল, বন্ধুদের ‘অফার’ না করে সিগারেট খাওয়া চল না বলে, সে প্যাকেট ছেড়ে তিন কিনতে আরম্ভ করেছে: আর টিফিনের সময় সহকর্মীদের চা-খাওয়ানো-রূপ শিষ্টাচার পালন করতে গিয়ে রেষ্টোরাঁয় মোটা দেনার অঙ্ক দাঁড় করিয়ে ফেলেছে।

অবশ্য এই শেষোক্ত ব্যাপারটির আরও একটি কারণ ছিল। সে একদিন শুনেতে পেয়েছিল, রেষ্টোরাঁর মালিক তাকে শুনিযেই আর একজনকে বলছে—“গাধা লোকটি বাস্তবিকই ভ্রলোক। বন্ধু বান্ধবদের

সেখতে পেলে, না থাইয়ে ছাড়ে না। কোথাকার যেন জমিদার ফ্যামিলির ছেলে।”

এমনি করে ঘরবাইরে তার অবস্থা কাহিল হয়ে উঠল।

হয়ত, দেখা গেল, বন্ধু এসে বললে—“বিশেষ প্রয়োজন, ছ’শো টাকা এখনি চাই”—এবং তার নিজের কাছে টাকা না থাকায়, সে ধার করে টাকা জোগাড় করে দিলে। এর পরে বন্ধু চলে গেল।—এবং টাকাও। কারণ কোনও রকম লেখাপড়া করে বন্ধুকে টাকা দেওয়া—অভ্রতার চরম।

ভ্রততার খাতিরে এটাও সে সহ্য করলে।

এটাও সে শীঘ্রই দেখতে পেলে, যে-বিষয়ে সে বিশেষজ্ঞ, সে-বিষয়ে সে ছাড়া আর সকলেই তার চেয়ে বেশী জানে। সে বুঝতে পারলে, বিশেষজ্ঞ হবার অজ্ঞে, বিশেষ বিষয়ে বিশেষ অজ্ঞ হলেও চলে,—যদি গলার জোর বেশী থাকে। গাধার গলার জোর নেহাৎ মন্দ ছিল না। কিন্তু গলার জোর ছিল বলেই—ভব্যতার খাতিরে সে অতিরিক্ত মিহিস্বরে কথা বলতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল।

দীর্ঘকাল পরে, উক্ত বন্ধুর ঠিকানা সংগ্রহ করে, অত্যন্ত প্রয়োজনে গাধা যখন তার কাছে গেল, বন্ধু তখন আর পাঁচজন বন্ধুর সঙ্গে ক্লাশ খেলচে। গাধা যা বলবে মনে করে এসেছিল, তা’ আর বলতে পারলে না। পাঁচজন ভ্রলোকের মাঝখান থেকে বন্ধুকে উঠিয়েই বা নিয়ে যায় কি করে? খানিকক্ষণ উসখুস করে বিদায় নিল।

উঠবার সময় বন্ধু যুঁহ হেসে বললে—“কোনো দরকার ছিল নাকি হে?”

গাধা ভ্রহাসি হেসে বললে—“না; এই দিক দিয়ে যাচ্ছিলুম,—তাই একটু দেখা করে গেলুম।” এমনি তার ভ্রততা।

বেচারী হতাহ হয়ে বাড়ী ফিরছিল। বাসে আর জায়গা ছিল না। বৌবাজারের কাছাকাছি একটি চটকদার সাজ-করা মহিলা বাসে উঠলেন। কণ্ঠকটর 'লেডিজ সীট' ছেড়ে দেবার অস্বরোধ করবার আগেই 'শিভালরাস' গাথা উঠে দাঁড়িয়ে টলতে শুরু করে দিলে। সে মনে মনে একটু বিরক্ত হল; কারণ তার আর দাঁড়াবার ক্ষমতা ছিল না। তবু ভদ্রমহিলার প্রতি—

পরের ঠ্যাঙেই একটি কঁকড়া-চুল যুবক উঠে, তাকে ধাক্কা দিয়ে গিয়ে মহিলাটির পাশে ধপ করে বসে পড়ল। একগাল হেসে বললে—
“এলি, আজকাল আর নজরেই পড়ে না যে।”

গাথা মনে মনে দস্তরমত চটে গেল। যদিও বাকো বা ভাবে ভক্তিতে তা প্রকাশ পেল না।

সম্ভবতঃ এর পরে সে বাড়ী ফিরে দেখতে পাবে,—‘অবলা-সজ্জের’ সাহায্যার্থে বালিকাদের দ্বারা অভিনীত ‘চারিটি-পারফরমেন্সের’ টিকিট বিক্রী করবার জন্মে সজ্জের সেক্রেটারি ‘অচলা-দি’ সদলে অপেক্ষা করচেন। অতঃপ্তলি উন্মুখ রসনাকে নিরস্ত করা তার বর্তমান অবস্থায় সম্ভব হবে না বুঝতে পেরে, হয়ত সে একথানা একটাকার টিকিট কেনবার জন্মে ব্যাগ খুলবে।

একমাত্র দশটাকার নোটখানি বার করবামাত্র অচলাদি যখন ছোঁ মেয়ে সেখানি ব্যাগস্থ করলেন, এবং অত্যন্ত অমায়িক ভাবে হেসে বললেন—“দম্ভবাদ। আপনার মত লোকের কাছে এর-কম আশাই করিনি। এই ছ’খানা পাঁচটাকার রইল। আপনি আর মিসেস—” তখন গাথা প্রায় বিশুদ্ধ মাতৃভাষায় চেঁচিয়ে উঠতে চাইবে।

কিন্তু Character of a Gentleman তর্জিনী তুলে তাকে শাসন

করবে। এবং সে কেবলমাত্র ‘অচলাদি’র গমন পথের দিকে কটমট করে চেয়ে থাকবে।

এর পরে হয়ত সে বলবে—“ভ্রম্ভোর।”

তার পরদিন সকালে দেখা যাবে,—গর্দভ-তনয় দরখাস্ত হাতে রজক-সরকারের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে।

বেচারী গাথা!

“বায়রণ”

জামাই

বাংলা দেশে জামাইএর বিশেষ আদর। জৈষ্ঠ মাসে দশহরার পূর্বের মঙ্গীর দিনে ঘরে ঘরে (অবশ্য যাহাদের জামাই আছে) ‘জামাই বাবুর নিমন্ত্রণ, আদর, অভ্যর্থনা, আপ্যায়ন, ভূরিভোজন ইত্যাদি ইত্যাদি। যাহারা ‘নূতন-জামাই’ তাঁহাদের মনে মনে বিশেষ শ্রদ্ধা—কখন সজ্জার পর নূতন শস্তরবাড়ী গিয়া হাজির হইবেন। এই জামাই মঙ্গীর ব্যাপারে পুরাণে বিশেষ করিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়দের ‘ধারা হারাইলে ১০৭’ স্বন্দ পুরাণে কোন কথা পাওয়া যায় না। এই বৃত্ত গুণ্ডপ্রেস পঞ্জিকায় লিখিত আছে—আচার্য্য জামাতুরচ্চনম। যামাদের মনে হয় স্বন্দ পুরাণ যখন লিখিত হয় তখন জামাইবাবুর একরূপ আদর ছিল না বা একরূপ আদর, অভ্যর্থনা, আপ্যায়ন প্রভৃতির প্রয়োজন ছিল না, বা স্বন্দ পুরাণ বঙ্গদেশের জন্ম লিখিত হয় নাই;

আদিশুরের সময় কাক্কুজ হইতে আগত পঞ্চ ব্রাহ্মণ তাঁহাদের সিদ্ধির স্কোলায় করিয়া ইহা বাংলা দেশে আনিয়াছিলেন। এই “জামাই” শব্দের উৎপত্তি লইয়া ভাষাতত্ত্ববিদ ভাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সহিত সাহিত্যরত্ন শ্রীযুক্ত রামদাস পণ্ডিতের ভীষণ মতভেদ। সুনীতি-বাবু বলেন, ‘জামাই’ জামাতা শব্দের অপভ্রংশ; আর জামাতা শব্দ সংস্কৃত “জামাতৃ” শব্দ হইতে উৎপন্ন। জামাতৃ=জায়া+মা+তৃচ, জায়া পরিমাণ করা হইয়াছে যাহার, অথবা জায়া হইয়াছে মাতৃষষ্ঠ্য যাহার। জামাতৃ কালক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া বা নিত্য ব্যবহারে ঘষিয়া ঘষিয়া জামাতা হইল; এবং জামাতা কালক্রমে তরুণ ‘জামাই’তে পরিণত হইল। রামদাস পণ্ডিত এই মত অগ্রাহ্য করিয়া বলেন যে ইহা আদৌ হইতে পারে না। যাহার “জামাই” সার সেই ব্যক্তি হইতেছে “জামাই”—তা তাহার বিবাহ হউক বা না হউক। আমরা কোন লোককে ফিটকাই সৌগীন বেশযুক্ত দেখিলে বলি—“কি হে জামাইটি যে!” বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য স্ত্রী থাকা। যাহার স্ত্রী নাই বা স্ত্রী ছিল, বর্তমানে নাই, হয় মরিয়া গিয়াছে না হয় পলাইয়া গিয়াছে, তাহাকেও জামাই বলি। এই সম্বন্ধে রামদাস পণ্ডিত মধ্যযুগ ইন্দোর বিজ্ঞান কংগ্রেসে Social Anthropology শাখায় একটি বাহ্যিক পৃষ্ঠা ব্যাপী প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন।

বাংলা দেশে জামাইদের মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক—“ঘর জামাই”, ঐহারা বিবাহের পর হইতে আজীবন স্বশ্রমবাহীতে বসবাস করেন। ইহাদের অজ্ঞাত বিষয়ে বড় আদর হইলেও একটি বিষয়ে কষ্ট। এই জ্ঞাত বাংলা দেশে বাঙালীর নিজস্ব প্রবাদ প্রবচন হইতেছে—“ঘর জামায়ের বড় আদর মাগের লাখি খায়”। অপর ভায়াইটি জামাইএর বিশেষ কোন নামকরণ হয় নাই, আমরা

তাহাদিগকে “স্বগৃহ”—পালিত বলিব। ইহাদের মধ্যে কেহ স্ত্রীর বাধা, অত্যন্ত বাধা, স্ত্রী উঠিতে বলিলে উঠেন, বসিতে বলিলে বসেন; স্ত্রী বাপের বাড়ী মাইলে সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীর বাপের বাড়ীতে যান, এক কথায় ঐহারা আমাদের পল্লীগামের ঠানুরির ভাষায় “ভেজো”। বজী জামাইদের আমরা “বুনো”র কোঠায় ফেলিতে পারি—ইহাদের বড় রাগ। কথায় কথায় রাগ, জামাইঘরীর তত্ত্ব, পূজার তত্ত্ব, শীতের তত্ত্ব একটু জটিল হইলেই রাগিয়া যান। ইহাদের বশ করিতে শাস্ত্রী ঠাকুর শশবাস্ত। আমাদের মনে হয় এই প্রকার জামাইদের ঠাণ্ডা করিবার জ্ঞাত বাংলাদেশের “জামাই ঘরীর” উদ্ভব।

দেবাবিদেব মহাদেব প্রথমবার প্রজাপতি দক্ষের কন্যা সতীশিরোমণি সতীকে বিবাহ করেন। পরে দক্ষযজ্ঞে দক্ষ মহাদেবকে নিমন্ত্রণ না করার ফলে মহাদেব যে দক্ষ-যজ্ঞের বাপার করিলেন এবং দক্ষের ছাগমুণ্ড হইল, সেই হইতেই স্বশ্রমগণ জামাইদের ঠাণ্ডা করিবার উপায় উদ্ভাবনে বাস্তব হইলেন। দক্ষযজ্ঞের স্থান হরিষ্যের নিকটস্থ কন্থলে। ইহাতে মনে হয় দক্ষ ঐ প্রদেশের অধিবাসী এবং ছাত্ত্বক। মহাদেব দ্বিতীয় পক্ষে গিরিরাজ হিমালয়ের কন্যা উমাকে বিবাহ করিয়া কৈলাসে বসবাস করেন। মহাদেব কন্যা-সম্ভ্রদানের জল হাতে লইয়া মাটিতে ফেলিয়া দিলে উহা হইতে ত্রিশোতা বা তিস্তা নদীর উদ্ভব হয়। আর এই তিস্তা বাংলা দেশে। হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ—তা তাহার নাম ইংরেজী মতে মাউন্ট এভারেসটই হউক, নেপালী মতে গৌসইনাথানই হউক, আর আমাদের দেশী মতে গৌরীশঙ্করই হউক বাংলাদেশের উত্তরে। গিরিরাজ হিমালয় কল্পমুষ্টি জামাই মহাদেবকে বশে আনিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। একেবারে গৃহপালিত ‘ঘরজামাইয়ে’ পরিণত করিতে না পারিল, তাহাকে বর্তমানের Economic Nationa-

lism-এর ভাষায় state subsidy দিয়া নিজের বাড়ীর নিকটেই অদূরবর্তী কৈলাসে বসবাস করান। আমরা বাঙালীরা গিরিরাজ হিমালয়ের নিকট-প্রতিবেশী, তাহার নিকট হইতে জামাই-বশের বিচ্ছাটিও বেশ আয়ত্ত করিয়া লইয়াছি। আর হিমালয়ের পরেই যে বাংলা দেশ মা হুগারি বাপের বাড়ীর দেশ, তাহা-মা হুগা বংসরের পর বংসর বাংলা দেশে পূজার সময় আগমন করিয়া প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন।

ভারতবর্ষের অসামান্য প্রদেশে জামাই-বস্তীর তুল্য আর কোন অসুস্থানের বিষয় আমরা অবগত নহি। হুসভা ইংরেজ সমাজে শঙ্ক-বিভীষিকা বিশেষ করিয়া প্রসিদ্ধ। জাপানে জামাইএর যে বিশেষ আদর আছে তাহা মনে হয় না। সুতরাং আমরা জামাইএর আদর বাংলা দেশের বিশেষত্ব বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি।

এইবার আমরা বাংলাদেশের “ঘর জামাইদের” উপবিভাগ বা বিশেষ বিশেষ শ্রেণী লইয়া কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটির উপসংহার করিব। বাংলা দেশের আবালবৃদ্ধবিত্ত সকলের মুখেই একটি সংস্কৃত শ্লোক স্তনিত পাওয়া যায়। উহা হইতেই ঘর জামাইদের চারিটি শ্রেণী সন্নিবেশিত আমরা কিঞ্চিৎ ধারণা করিয়া লইতে পারি। এবং এই চারি শ্রেণীর মধ্যে প্রথমটিকে “হরি” শ্রেণী, দ্বিতীয়টিকে “মাধব” শ্রেণী, তৃতীয়টিকে “পুণ্ডরীকাক্ষ” শ্রেণী ও সর্বশেষ চতুর্থটিকে “ধনঞ্জয়” শ্রেণী বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। এক্ষণে উক্ত শ্লোকটি পাঠকগণের সুবিধার জন্ত নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

“হবিবিনা হরিধাতি বিনা পীঠেন মাধবঃ।

কদম্বে: পুণ্ডরীকাক্ষ: প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ।

ইহা ছাড়া আর এক শ্রেণী আছে; যাহাকে ইংরেজী মতে residuary variety বলে; কিন্তু আমাদের মতে উহা “বেণীমাধব” ভ্যারাইটি। বেণীমাধবের স্ত্রী তাহাকে প্রথমে পদ্মাঘাত, পরে লাঠিঘারা কোমরে আঘাত ও সর্বশেষে থাওয়া বন্ধ করিয়া দিলেও তিনি যন্ত্রণালয় পরিত্যাগ করেন নাই।

বাংলা দেশের শতকরা ৫৫ জন অধিবাসী মুসলমান। সুতরাং যখন আমরা জামাইএর আদরকে বাংলা দেশের বিশেষত্ব বলিয়াছিলাম, আমরা হিন্দু সভার লোক হইলেও মুসলমানকে বাদ দিয়া কিছু বলি নাই। বাংলার মুসলমান সমাজেও “খানে-দামাদ” প্রথা প্রচলিত আছে।

আমাদের এই প্রবন্ধটি ক্ষুদ্র হইলেও বিষয়টি বা বিষয়-বস্তুটি ক্ষুদ্র নহে। যদি কেহ আমাদের এই সামান্য লেখাটি পড়িয়া এই বিষয়ে বিশদ ভাবে বিস্তারিত আলোচনা করেন, তাহা হইলে আমরা আমাদের শ্রম সফল জ্ঞান করিব। ইতি—

শ্রীধর্মদত্ত

শবরী

পথে চলিতে
 অলি গলিতে
 লঘু চরণে,
 ওগো শিকারী
 আধ-নয়নে
 চাহি' আলসে
 মন গোপনে
 ভরি স্বপনে
 রস-লালসে
 কত ফিরিবে
 যুগ-নয়না
 অহুসরণে ?
 তব অধরে
 হেরি হাসিটি
 মন-লোভনা ।
 তুমি ভাবিছ
 মুহু হাসিহা
 তারে ধরিবে ?
 তব শানিত
 আঁখি শায়কে
 বুন্ধি মরিবে

শনিবারের চিঠি

৭২২

ভয় চকিতা
 নব হরিণী
 বন-ভবনা ?
 পথ চারিণী
 চিত-হারিণী
 আঁখি তুলিবে ;
 ছুটি কপোলে
 জানি ফুটিবে
 আভা গোলাপী ;
 বেগী দোলনে
 খেলা করিবে
 অহি কলাপী ;
 রাঙা অধরে
 মুহু চকিত
 হাসি ছলিবে ;
 চল চরণে
 যাবে চলিয়া
 নত লোচনা ;
 তুমি ভাবিবে
 বুন্ধি মেখেটি
 লাজে সরমে
 অতি কাতরা,—
 ব্যথা বাজিবে
 তব মরমে—

ওগো শিকারী

তব আগিবে

অহুশোচনা।

নব-তরুণী

ঈশি তুলিয়া

পুন চাবে না।

আহা সনলা

কিছু জানে না

ছল-চাতুরী!

বুকে কেবলি

ভরা ভীকতা

মধু মাধুরী—

রুচ নয়নে

তারে হেরিলে

ব্যথা পাবে না?

তুমি করিবে

ছেলে মাছঘরী

নানা ধরণে;

হিয়া কাঁপিবে

যেন বেতসী

ধরধরিয়া;

নব-নাগরী

যত স্বপ্নে

যাবে সরিয়া—

তুমি ছুটিবে

তারি পিছনে

ক্ষত চরণে।

মনে ভাবিছ

তুমি শিকারী

বড় জ্বরই!

মিছে চলনা!

ক্রমে বুঝিবে

সখা শিকারী,

তুমি তরুণী

হাসি-করুণা-

কণা ভিখারী

মৃগ নয়না

পথ-চারিণী

তব শব্দে।

“চন্দ্রহাস”

পৃথিবীর পাগলামি

‘ট্রান্স-সাইবেরিয়ানে’র গাড়ী দিনের পর দিন ছুটে চলেছে, কিন্তু মন্থর গতিতে, কারণ রাশিয়ার দশদিক থেকে আগত মালে ভর্তি সব গাড়ী, লাইন ক্রমাগতই বন্ধ করে দিচ্ছে।

‘ইউনিয়নের’ সকল অংশের শ্রমজীবীতে ট্রেন পরিপূর্ণ; তাছাড়া এ ট্রেনে বিশেষজ্ঞের দল ও oudarniks এরও অভাব নেই। ‘উদারনিক’ হচ্ছে একজন লোক যে অল্প সকলকে কাজে এগোবার সাহস দেয়, পথ করে দেয়, তাদের অগ্রসর হতে উত্তেজিত করে বা তাদের ঠেলে দেয় সামনে, অর্থাৎ যাকে বলে, ‘travailleur de choc’।

যদি ধরা যায় যে, একজন ‘উদারনিক’ এর দল আর এক দলের তুলনায় খাট, তখন এ উদারনিকের কর্তব্য, যেমন করে হোক নিজ দলকে অল্প দলের মত তৈরী করা। ‘উদারনিকের’ এরকম ব্রিগেডের সংখ্যা রাশিয়াতে তুলক্ষ এবং এদের লোকসংখ্যা ত্রিশলক্ষ। ‘ফুটবলিষ্ট’ দলেরা যেমন নিজেদের মধ্যে সর্বদার সংগ্রাম করছে, কখনও রেকর্ড রাখবার জন্ত, কখনও বা চ্যাম্পিয়নশিপ পাবার জন্ত, এই উদারনিকদের ব্রিগেড ঠিক তাই করছে সর্বদা। *

• উদারনিকদের এক কণার propagandiste d'elite বলা চলে। এরা হচ্ছে আমাদের দেশের বেঞ্চাসেবক দলের মত, গ্রেট কর্মী; সব কাজেই—নিজেরা খুঁকে পড়ে, সব বিপদই নিজেরা দূক পেতে নেয়, সবসময়েই নিজেরা অগ্রণী—এমনিসাবে দলের অল্প সকলকে তথা জনসাধারণকে উৎসাহিত ও উত্তেজিত করে। সমস্ত বিপদের দাঙ্কা এরাই আগে সজ্ঞ করে বলে, এদের ‘travailleur de choc’ও বলা হয়।

এদের নিজেদের মধ্যে যে সংগ্রাম বা ম্যাচ, তার একটা উদাহরণ দিলেই ব্যাপার

গাড়ীর জানালার সামনে দিয়ে মাঠ, বন আর পাহাড় ছুটে চলেছে; তার যেন শেষ নেই। দুবছর আগেও এসব স্থানে বরফ ও নেকড়ে বাঘের রাজত্ব ছিল। লেখকের গাইড, অথবা অভিভাবক—যিনি লেখকের সঙ্গে Wajtkac-তে পুনর্মিলিত হয়েছিলেন—একটা বড় মাপের উপর খুঁকে পড়ে তার সেই প্রহেলিকাময় ছুঁপিধা রক্ত, নীল সংখ্যা ও চিহ্ন সকল লক্ষ্য করছিলেন। ঠাঠা জানালার দ্বারে এসে লেখককে তিনি বললেন, এখানে এমন একটা কল বসানো হবে, যা ঘণ্টায় চল্লিশ মিলিয়র্ড কিলো ওয়াট শক্তি দিতে পারবে। এই কথা শুনে লেখক বাইরে মুখটা বাড়ালেন, কিন্তু দেখলেন শুধু এক জঙ্গল, যার পাশে পাশে পাহাড়; এই সব পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে স্রোত বয়ে চলেছে। একটা কল নাকি ওখানে বসান হবে, কিন্তু কবে? ট্রেন একটা বাক ফিরল; দেখা গেল, পাথর, মাটি আর গাছের গুড়ির স্তূপ; কানে তাল লাগার মত ভীষণ বিস্ফোরণের কড়কড় শব্দ শোনা গেল। ডিনামাইটের সাহায্যে নদীর ধারের পাহাড় ও বন উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। কাছেই একটা ‘ব্যারেজ’ তৈরী হচ্ছে। এই জনহীন অরণ্যে কিছুদিনের মধ্যে এক কারখানার জন্ম হবে।

কিন্তু দূরে সমতল ক্ষেত্র। লেখকের গাইডের কথার বিরাম নেই,—Kusnetzki region-এর কয়লার সঞ্চয় হচ্ছে ছ’শো মিলিয়র্ড টন;

পরিষ্কার হবে। ধরা যাক, একটা মালাগুড়ী মালে বোঝাই করতে হবে,—গমের বস্তা। সাইবেরিয়ার এক কোণের এক উদারনিকের দলের সে কাজটা করতে ছ’ঘণ্টা লাগল, আগে আগে হ্রত স’দু ঘণ্টা লেগেছে। ‘অমনি চারিধিকে রিপোর্ট’ গেল যে, এরা রেকর্ড স্থাপি করেছে। কিন্তু মন্ডার দল এদের জানাল দেখে, এ কাজ তারা একঘণ্টা পঞ্চাশ মিনিটে করেছে। এই রকম ধরনের রেকর্ড রাখার চেষ্টা সত্যতই এদের মধ্যে দেখা যায়।

উরাল নতুন সোনার খনির সন্ধান পাওয়া গেছে, তাছাড়া প্লাটিনাম ও পিতলের খনিও পাওয়া গেছে; নতুন রকম Blast furnaceএরও আবিষ্কার হয়েছে।

বাইরে কৃষকদের স্বাক্ষর দেওয়া গাড়ীর 'কারাভান' দিগন্তে মিশিয়ে যাচ্ছে। লেখকের মস্তোর গাইড কিন্তু সর্কদাই খালি মের্নি আর মাইন, কয়লা আর অল্প খনিজ বস্তুর কথা বলে চলেছেন। এই নতুন বৈজ্ঞানিক সাম্রাজ্যের অধিবাসীরা এ ব্যাপার কি চোখে দেখবে, কে জানে?

* * *

একদল রাশিয়ান ম'হলা-'ডেলিগেটদের' সঙ্গে লেখক ভ্রমণ করছিলেন; এরা সব মস্তোর কংগ্রেসে যোগ দিতে গিয়েছিল। এসিয়াটিক রাশিয়ার সর্বস্বান থেকেই এদের আগমন হয়েছিল; এ দলে গ্রাম-নির্ধাচিত সভ্য অর্থাৎ 'delektas'; মোটামোটা ধরণের, পুরান পোষাক-চাকা গটিয়ে রমণীই বেশী। এক বৃদ্ধা Kirghize মুরগীর হাড় 'চবোতে চিবোতে বললে, সরকার চাইছেন যে, ছেলেদের আট বছর থেকে স্থূল পাঠাতে হবে। কিন্তু স্থূল থেকে কিরে এসে হবে কি?

একজন তাতার রমণী একথার উত্তর দিয়ে বললে, ছেলেদের যা সরকার, তা হচ্ছে চপেটাখাত (une fessie), স্থূল নয়।

তুর্কীস্থানের এক রমণী জিজ্ঞেস করলে, আচ্ছা, ডাক্তারেরা—হ্যাঁ, কি নাম তাদের?—ভুলে গেছি। আচ্ছা, তারা কি তোমাদের বাড়ীতেও আসে না? সোভিয়েটেরা আমাদের গ্রামে একজন ডাক্তার পাঠিয়েছে, সে তো একটা আদত শয়তান। তার গ্রামে আসার অন্তত্বগেই আমার মেয়ের অস্থখ ধরল; আমার মেয়ে তো গাড়ীর মত

তয়ে রইল—চোখ উলটে, খুব কষ্টে নিখাস নিতে লাগল। ডাক্তার এল, কতকগুলো বাড়ি দিলে, একটা বোতল আরো যেন ধানিকটা কি দিলে। ডাক্তার চলে যাওয়া মাত্রই আমি তো সে সব ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দিলাম। বাছার কপালে ও পায়ের চেটোয় ধানিক জলপড়া দিলাম, বাছা আমার ভাল হয়ে উঠল।

করিডরে এই 'ডেলেক্তা'দের কতকগুলি শিশু বসেছিল; চুল খাট করে ছাঁটা, চোখ বড় বড়; সব কথা বলতে শিখেছে, কিন্তু এর মধ্যেই একখানা ভাঁজ-করা সংবাদপত্রের লাইন বানান করছিল। কেমন একটা অদ্ভুত বৈসাদৃশ্য; বাপমার মন থেকে এখনও পূর্বাশ্রু কুসংস্কার আর প্রাচীন নিয়মকানুন মেনে চলার মোহদূর হয়নি, অথচ তাদেরই ছেলেপিলেরা যেন কোন আশ্চর্য্য দৈবশক্তিতে অল্প রকম লক্ষ্য নিয়ে বেড়ে উঠছে। একটা ট্রান্স্ক্রিপ্ট, একটা অটো, একটা এরোপ্লেন ছেলেদের মন যতটা আকর্ষণ করতে পারে, অল্প কোন জিনিষ তা পারে?

বাস্তবিকই, এই ধরণের তিন কোটি যুবক-যুবতী রাশিয়াতে আছে, যাদের বয়স এমনকি সাতাশ এখনও হয়নি; কাজেকাজেই এরা কমিউনিজম ছাড়া অল্প কোন প্রকার রাজনীতির কথা কখনও শোনেনি, নিরীশ্বরবাদীরা যে ধর্মশক্তি প্রচার করছেন তা ছাড়া অল্প ধর্মের কথা এরা কখনও শোনেনি।

* * *

একটা বড় ষ্টেশন। অনেক কণ্ঠচাষী গাড়ীতে উঠলেন, অধিকাংশই আমেরিকান ও জার্মান এঞ্জিনিয়ার। স্থানাভাব, কাজেই করিডরই ভর্তি হল।

লেখকের কমপার্টমেন্টের সামনে এক এসিয়াটিক যুবক দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তার রোদেপোড়া রঙ, বুকের উপর

কামিজটা ছেঁড়া, এক হাতে সংবাদপত্রের একটুকরো কাগজে জড়ান একটা অর্দ্ধদধ শিগারেট, অস্ত্র হাতে জিয়ুলজির এক বই।

মেয়েরা মেয়েই বসে, কিন্তু সংবাদপত্রে মন-নিবিষ্ট; সমস্ত গাড়ী-গুলিতেই এই ব্যাপার দেখা যায়। Kirghizes et Mongalsদের চোখ ফুটেছে। প্রায় সকলেরই হাতে হয় একখানা বই, না হয় খবরের কাগজ। এরা যে খালি পড়তে শিখেছে তা নয়, এদের মনের বাসনা—যা রাশিয়ার অস্ত্র সর্বত্রই দেখা যায়—কল-কারখানা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ। শ্বেত, পীত সব সমান; জাতিগত কোন বিভিন্নতাই নেই, তা সে মনোভেদেই হোক আর ককেসাসেই হোক। মেশিনের কালচার সকলকে পাগল করেছে; এদের কাছে টেকনিক জিনিষটাই একমাত্র ধর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

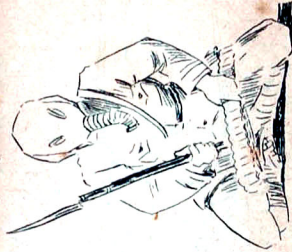
ক্রাশনাল কস্ট্রিউমে ভূষিত এসিয়াটিক,—এদের সাজ-সজ্জা সব কো-অপারেটিভ থেকে প্রাপ্ত। অধিকাংশেরই পায়ে জুতো নেই, কিন্তু সকলেরই মাথায় এক রকমের টুপী।

বে ট্রেনে চড়ে চীনে আসা যায়, তাতে যে অনেক পীত জাতি দেখা যায়, এতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই; খালি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, 'সোভিয়েট ইউনিয়নের' কস্ট্রাবাদীদের স্থান, এই ১৯৩২ সালে, 'Trotsky, Tehitcherine প্রভৃতি টাইপের লোকের বদলে শুধু এসিয়াটিক Tartars, Mongals প্রভৃতি জাতি কর্তৃক দখলীকৃত বা নিকীচিৎ। রাশিয়াতে, সবচেয়ে বড়-বড় পোষ্ট, ষ্ট্যালিনের পোষ্ট থেকে আরম্ভ করে প্রায় সবই এই এসিয়াবাসীদের হাতে। এই ঘটনা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, রাশিয়ার যাকিছু স্বার্থ সবই পূর্ণাঙ্কলে।

ক্রমশঃ

লেখক, জিসকা; অস্থাবাদক, শ্রীতরুণ ঘোষাল, প্যারিস।

চলচ্চিত্র



পুরাতন সিদ্ধিদাতার নতুন মণ্ডি

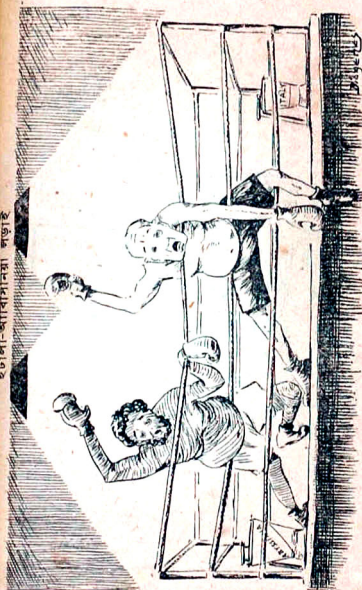
গবেশ ও প্যান-মুখোদ

নতুন নাইটহুডের পুরাতন মূর্তি



আমরা যদি জন্ম নিতাম

ইটালী-আবিসিনিয়া লড়াই



দুই পক্ষই জিতেছে

সেবা ও ব্যবসা



নিখিল বঙ্গ জাতীয় বুদ্ধি

সংবাদ সাহিত্য

বর্তমান সংখ্যায় 'ডিটেকটিব' নামক নাটকের প্রস্তাবনা এবং প্রথম অঙ্ক প্রকাশিত হইল। আগামী সংখ্যায় ইহার দ্বিতীয় ও তৃতীয়, অর্থাৎ শেষ অঙ্ক প্রকাশিত হইবে। ডিটেকটিবের লেখক 'চন্দ্রহাস'। ভ্রমক্রমে ইহা লেখার সঙ্গে মুদ্রিত হয় নাই।

কামরূপে সবই সম্ভব। কিন্তু ভাষা বড় ধাঁধায় ফেলিতেছে—

শুদ্ধ নিশীথে, ততোদিক শুদ্ধ এক পুষ্পবাটিকায় জনহীন
একটি সুরম্য হর্ষে শক্তি প্রবেশ করিল চন্দনকে বৃকে ফেলিয়া।
(বিচিত্রা)।

প্রথম মনে করিয়াছিলাম, চন্দন চান্দর কিংবা গামছা। কাঁধে না ফেলিয়া বৃকে ফেলিয়াছে। দ্বিতীয়বার চিন্তা করিলাম। মনে হইল, শক্তি হুছমান, চন্দন তাহার বাছা। কিন্তু লেখক মনে করেন অগুরুপ। তাহার মতে ইহারা দুইজন সাধক এবং সাধিকা।

কিন্তু পাঁচ অধ্যায়ের প্রথম লাইনেই আমাদের বুঝা উচিত ছিল উহারাকে। লেখক বলিতেছেন—

এক তরুণ রাত্রি অকস্মাৎ নিখর হইয়াছে।

শেষে রাত্রিও 'তরুণ' হইল! বাংলাদেশে জন্মিয়া একবারও তরুণ সাজিল না এমন কি কিছুই নাই? ইহার পরে হয়ত অতি-আধুনিক রাত্রি, ultra modern রাত্রি দেখিতে পাইব। তারুণ্য যেখানে রাত্রির

ধর্ম, নায়িকাকে সেখানে গামছার মত কাঁধে বা বুকে ফেলিয়া চল।
বিশ্বকর নহে।

শক্তি চন্দনকে বলিতেছে—

“বুঝতে পারছেন না? আমার যে-রূপে আপনি চুমুক
দিচ্ছেন সে-রূপ আপনারই!”

“তোমার ভিতর আমি?”

“নিশ্চয়ই! নইলে যেয়েমাহু হুয়ে আমি আপনার পানো
চেয়ে রই?”

যুক্তির সারবস্তা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। চুমুক দিতে
আমরাও দেখিয়াছি, কিন্তু এ সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন উঠিতে দেখি নাই।

কিন্তু চিত্র-রচনায় লেখক প্রকৃত শিল্পী-দম্ভী। অর্ধেক প্রকাশ
করিয়াছেন, অর্ধেক ইঙ্গিত করিয়াছেন।

এইবার সে কক্ষে প্রবেশ করিল—চোখে পানীর কলরব,
মুখে উষার আলো, সর্দান্ন উড়াইয়া প্রভাত সমীরণ!

চিত্রটি পরিপূর্ণ করিতে হইলে ইহার পরে বলিতে হয়—কানো
কাগজের হকার—গলায় হোস-পাইপ—চুলে প্রথম ট্রাম—পায়ে
তরকারীর গাড়ি।

আর একটিমাত্র চিত্র আছে—সেটিও ছাড়া গেল না—

দেখিতে দেখিতে এক বিরাট নারী-বাহিনীর আবির্ভাব
হইল—তাহাদের প্রত্যেকেরই একসেহ করিয়া রূপ, একমুখ করিয়া
গান, একচোখ করিয়া চাহনি—হাতে একসাজি করিয়া ফুল।

দেহ মুখ প্রত্যেকের একটি করিয়াই থাকে—কিন্তু সাধারণত চোখ
একটি থাকে না। কিন্তু ভাবাবেগ নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনায়
এক-দেহের সঙ্গে এক-চোখ রাখিতে হইয়াছে। একরূপ আরও বলা
হাইত, যথা—এককান করিয়া শ্রবণযন্ত্র—একনাক করিয়া শ্রাণেন্দ্রিয়—
একদাত করিয়া ক্রচিকৌমুদী, এক আঙুল করিয়া চম্পককলি, একহাত
করিয়া মুণাল—ইত্যাদি।

‘আজকে তুমি এলে একি বেশে’ নামক প্রশ্নের উত্তরে বিচিত্রায়
কবিকে শুধু ইহাই বলিতে চাহি যে তিনি যে-বেশেই আহ্নন, কবিতা
লিখিবার কোনো প্রয়োজন ছিল না। কারণ, ইনশিওর্যান্স-এজেন্টের
উপযুক্ত বেশটাই সর্বদা প্রার্থনীয় নহে, অন্তত এখন তিনি যে-বেশে
আসিয়াছেন, তাহাতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে বিবাহাদি করিয়া ঘরসংসার
করা যাইতে পারে। ইহা কবিতা লেখার চেষ্টা হইতে অনেক ভাল।

অপর কবি গাহিতেছেন—

ডরিল বৃদ্ধ তরু

শুকনো ডালে ফুল কলিতে!

কে এলে হান্তমধুর

‘আগ্রে মম মন ছলিতে?’

‘আগ্রে’ পর ‘কমা’ নাই দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। ‘কমা’টা কি
‘মম’র পর? কিন্তু মন জুলাইবার জন্ত কোনো বস্তুকে একেবারে মুখের
মধ্যে আসিতে হয় কিনা তাহা আমাদের জানা ছিল না। আমাদের
ধারণা ছিল, মন জুলাইবার বস্তু বাহির হইতেই মন জুলায়—কিন্তু কবি

তাহাকে একেবারে পাঁতে চাপিয়া ধরিয়া কবিতা লিখিতেছেন! কবি
নিজের মন নিজে 'ছলিতেছেন' না ত ?

শ্রীযুক্ত চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বামিনীরায়ের চিত্র-বিষয়ে যে
মন্তব্য করিয়াছেন তাহার সহিত আমরা একমত হইতে পারিলাম না।
বামিনীবাবুর শিল্প-পরিকল্পনা কি প্রাণকেটছারী কালিঘাটের পটের
প্রেতাত্মা আমদানিতেই পর্যাবেশিত ? তাহার মত শক্তিশালী চিত্রকর
কাহাকে তুলাইবার জ্ঞাত এই সহজ পথটি অবলম্বন করিয়াছেন ?
কাহাকেও তুলাইবার প্রয়োজন তিনি আদৌ কেন অহুভব করিয়াছেন
এ-বিষয়ে লেখকের বক্তব্য আরও স্পষ্ট হইলে ভাল হইত।

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রভূষণ গুপ্তের 'সিংহল বিজয়' চিত্রখানি কলম্বুসের
আমেরিকা আবিষ্কারের প্রাচীন চিত্রখানি হইতে এইটুকু তফাৎ যে এ
চিত্রের নায়কের দক্ষিণহস্তখানি অকারণ বামহস্ত হইতে খাটো এবং
ছবিখানির নাম সিংহল আবিষ্কার নহে—সিংহল বিজয়। যুদ্ধ হইতেছে
সমুদ্রতীরের হাওয়ার সঙ্গে।

চা পান বিষয়ানন্তলা একথা বৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন। কিন্তু একথায়
লোকে ভয় পায় না, কারণ পৃথিবীতে বেশির ভাগ লোকেই পয়সা দিয়া
বিষ কিনিয়া খাইতে প্রলুব্ধ হয়। যাহারা বিষ খায় না এবং যাহারা
খায় এই উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরই শেষ পর্য্যন্ত মৃত্যু হয়। সুতরাং
না খাইলে লাভ কোথায় ? মদ, তামাক, আফিং, সিদ্ধি, কোকেন,
চণ্ড, চরস, চা—এ সবই বিষ। কিন্তু বিষ ছইপ্রকার, যাহা খাইবামাত্র
মৃত্যু হয়, এবং যাহা খাইলে তৎক্ষণাৎ কিছুই হয় না। শেষোক্ত বিষকে

বিষ আখ্যা দিলে লোকে সে-কথা শোনে না—অনর্থক চীৎকার করাই
সার হয়। সম্প্রতি চা খাওয়ার পক্ষে খুব প্রচার চলিতেছে। চা যদি বিষ
হইত তাহা হইলে প্রচারকারীকে পুলিশে ধরিত। চা-কে একসময়ে
কুলীর রক্ত বলা হইয়াছিল। দেখা গেল পানীয় হিসাবে কুলীর রক্তও
বাজারে বেশ চলে। সুতরাং চা বিষ বা চা রক্ত, অতএব চা
খাইও না—এরূপ যুক্তি হয়ুক্তি নহে। চা খাইও না, ইহার পক্ষে অল্প
যুক্তি আছে।

চা চীনদেশ হইতে আমদানী। কিন্তু শুধু সেই জন্মই ইহা অচল
হওয়া উচিত নহে। আসলকথা চায়ের ব্যবসা ভারতবাসীর অধীন
নহে। তাহা যদি হইত তাহা হইলে চা খাওয়ায় ভারতবাসীর লাভ
হইত। কিন্তু লাভ হইতেছে না। যাহাতে ভারতবাসীর লাভ নাই
এমন কোনো বাস্তু বা পানীয় যদি খাইতেই হয় তাহা হইলে চা ছাড়াও
অল্প জিনিস আছে। আমাদের মতে সিদ্ধির পাতা চায়ের মত প্রস্তুত
করিয়া পাইলে আমাদের দৈহিক ও নৈতিক উন্নতি হইবার সম্ভাবনা। ইহা
সম্পূর্ণ স্বদেশী, ইহার জন্ম শুধু গভর্ণমেণ্টকেই টাক্স দিতে হয়—বিদেশী
বণিকের অত্যাচারপ্রার্থী হইতে হয় না। সিদ্ধির নেশা চায়ের নেশার
চেয়ে অধিকতর কার্যকরী। ইহার দাম কম—এবং খাইতেও হয়
সামান্য। ইহাও চায়ের মতই বিষ, সুতরাং ইহা খাইলে আর অতিরিক্ত
বিষ খাইবার প্রয়োজন নাই।

কবি কাউপারের বহু-পরিচিত লাইন "A cup that cheers but
not inebriates"—এর বাংলা অহুবাদ প্রায় প্রত্যেক চায়ের ঠেলে লেখা

ধাকে। ইহাকে তখন একটু পরিবর্তিত করিয়া “A cup that inebriates and even cheers” কথাটি ব্যবহার করিতে হইবে।

রবীন্দ্রনাথ ‘এডুকেশন উইকে’ বলিয়াছেন, আমাদের দেশে শিক্ষিত-দের সঙ্গে সাধারণের কোনো যোগ নাই। ইহাতে ‘অগ্রগতি’ বড়ই দুঃখিত হইয়াছেন। ‘সাধারণ’কে একরূপ ভাবে একমুখ করিয়া রবীন্দ্রনাথের বড়ই অস্বস্তি। অগ্রগতি অবশ্য নিজেকে ‘সাধারণ’ শ্রেণীর বলিয়া গর্বও করিয়াছেন।

‘শিক্ষিত’ শব্দের সঙ্গে ‘অশিক্ষিত’ কথাটি জুড়িয়া দিলে বোধ হয় উহার অর্থবোধ আরও সহজ হইত। কিন্তু শিক্ষিতের সঙ্গে পার্থক্য বুঝাইবার জন্ত ‘সাধারণ’ কথাটি কি বড় বেশি দুর্বোধ্য হইয়াছে?

এদেশে যাহারা শিক্ষিত নামে পরিচিত তাহাদের অধিকাংশই অর্ধশিক্ষিত। ইহারাই সাধারণ। যাহারা কলেজে সাহিত্য বিষয়ে সকল রকম আলোচনা পাঠ করে, যাহারা ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলির সহিত পরিচিত হয় এবং সে সম্বন্ধে পড়িয়া এবং লিখিয়া পাস করিয়া বাহির হয় তাহারা আর ঐ ঐ বিষয় পরে বৃত্তিতে পারে না। কোথায়ও এ সব বিষয়ে আলোচনা হইলে তাহা পড়ে না, তখন তাহারা মাসিক পত্রে খোঁজে গল্প, সংবাদ পত্রে খোঁজে কুংসা এবং সাপ্তাহিক কাগজে খোঁজে সিনেমা-সংবাদ। ইহার বেশি একদাপও উপরে উঠিতে পারে না। ইহারাই সাধারণ। শিক্ষিতদের-সঙ্গে ইহাদের যোগস্থ হয়, রাগিয়া লাভ কি?

শ্রীযুক্ত প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর জন্ত দুঃখ হইতেছে। সাপ্তাহিক কাগজ সম্পাদনায় কোনো মহিলার নাম যুক্ত না হওয়াই ভাল। তাহার শ্রীলেখার ‘প্রদীপ’ যেরূপ জলিয়া উঠিয়াছে তাহাতে আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। পথে নামিলে গায়ে ধূলালাগা অনিবার্য, কিন্তু ধূলা লাগিবে এই লোভেই পথে নামা স্ববুদ্ধির কাজ নহে। অন্তত “তদুত্তীর্ণের বেলা-ভূমি পরে সে কি মহা আলোড়ন” ইহা ছাপিবার লোভটুকু ত্যাগ করাই উচিত ছিল।

দোলার সময় ভিন্নধর্মাবলম্বীর মনে আঘাত দেওয়া হিন্দুর পক্ষে ক্রায়সঙ্গত নহে। মধুসূদন দত্ত ঐষ্টান ছিলেন কিন্তু তাই বলিয়া তিনি-যে ভারতবর্ষের সন্তান, এ কথা ভুলেন নাই। অন্তত শুধু এই কারণেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করা উচিত। কিন্তু দেখিতেছি “দেশ” তাহা না করিয়া তাঁহাকে “দোল-লীলা” উপলক্ষে প্রথমেই আঘাত করিয়া বসিয়াছেন। মধুসূদনের “বন অতিরমিত হইল ফুল ফুটনে”—দেশের হাতে পড়িয়া “বন অতিরমিত হইল ফুল ফুটনে” হইয়া উঠিয়াছে। তাহার পরেই “দেশ” বলিতেছেন—

খেলা চলিতেই ছিল, তোমার চোখে আজ তুমি দেখিতেছ বলিয়া মনে করিও না উহা আধুনিক। উহা আধুনিক নহে, এখনকার নয়-উহা সনাতন। বসন্তের বাতাসের মহিমায় গুল্লীলা ব্যস্ত হইতেছে।

লিখিতে লিখিতে উচ্ছ্বাসের মাধ্যম লেখকের ভোটের মরশুমের কথা মনে পড়িয়াছে। এ সময়ে গুল্লীলা ছাড়া অন্য কিছু ব্যস্ত হয় না।

কিন্তু এত কেছা প্রচার সম্বন্ধে ভোটপ্রার্থী ভোটারকে বলে—

এসো এসো, এসো আমার প্রিয়, এসো আমার দয়িত,
আমাদের আদরের ধন [লক্ষী সোনা মাণিক আমার এসো,]
এসো আমার বৃকে ছুটিয়া আইস। আমাকে না পাইলে যে
তোমার শক্তি নাই, তৃপ্তি নাই, ভুষ্টি নাই। আবার তোমাকে
না পাইলেও আমার শক্তি নাই, তৃপ্তি নাই—নিরবধি রাই লো
তোমার অহুরাগে নাহি খাই অন্ন পানি বুলি বনভাগে।
তুমি এসো, তুমি এসো।

ইহাই দেশের দোল-লীলার শুভ কথা।

—

‘মাতৃভাষা মায়েরই মত পবিত্র!’—হাক ছাড়িয়া এবং সে হাকে
নিজেই অবাক (‘আচর্য্যবোধক চিহ্ন দ্রষ্টব্য’) হইয়া বাতায়ন সম্পাদক,
কাজি নজরুল ইসলামকে ভারি লজ্জা দিয়াছেন। কাজি নজরুল ইসলাম
যে বিবৃতি দিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ (কাজি পরে ইহার প্রতিবাদ
করিয়া জানাইয়াছেন, তিনি কোনো বিবৃতি দেন নাই)—তাহা সত্য
হইলে তাহা অবশ্যই প্রতিবাদযোগ্য, অবশ্য যদি প্রতিবাদকারীর কথায়
বল থাকে এবং তাহার এ বিষয়ে বলিবার কিছু অধিকার থাকে।
শ্রীযুক্ত অবিনাশ ঘোষাল মনে করিয়াছেন, তাহার ভাষা বিষয়ে কিছু
বলিবার অধিকার আছে; কিন্তু কেন তাহার এরূপ মনে হইয়াছে তাহা
আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

—

বাংলা ভাষা সম্বন্ধে তাহার প্রধান বক্তব্য, “সংস্কৃতই হচ্ছে
বাংলা ভাষার জননী।”—এইরূপ উক্তি দ্বারা ঘোষাল মহাশয় প্রথমেই
বাংলা ভাষার কুল বিষয়ে তাহার জ্ঞানের পরিচয় দিয়া পাঠককে বাঁচাইয়া

দিয়াছেন। ইহার পর আর অগ্রসর হইবার দরকার ছিল না—কিন্তু
লেখকের বিশেষ অহুরোধে (টাইপ করা লাল কাগজের অহুরোধ)
লেখাটার সবটাই পড়িতে হইল। বাঙালী হইয়া বাঙালীকে রক্ষা করা
উচিত ছিল, কিন্তু পারিলাম না। কারণ ইতিমধ্যে শ্রীযুক্ত অবনী রায়
প্রমুখ পাঠক এ প্রবন্ধে মুগ্ধ হইয়াছেন এরূপ দেখা গেল।

—

মুগ্ধ আমরাও হইয়াছি। না হইয়া উপায় ছিল না। কারণ বাংলা
ভাষা গোত্রের বাহিরে মেলামেশা করার দরুন যে-সব ভিন্ন গোত্রীয়
ভাষা বাংলা ভাষায় আসিয়া মিশিয়াছে তাহার মধ্যে “প্রাকৃতিক” ভাষা
নাকি অস্বাভাবিক “ঘোষাল”কে আমরা দেখিয়াছি। সে
নেশা করিত কি না জোর করিয়া বলা যায় না, কিন্তু তাহার বানাইয়া
গল্প বলিবার মধ্যে একটা নিপুণতা ছিল। স্বতরাং এ ঘোষাল বীরবলের
মোমাংসার সহিত তুলনীয় নহে। বুদ্ধির তুলতাই ইহার “প্রাকৃতিক”
বিশেষত্ব।

—

‘দুন্দুভি’ নামক সাম্প্রদায়িক কাজি নজরুল ইসলামের একটি চিঠি
বাহির হইয়াছে। চিঠিখানি আমাদের ভাল লাগিয়াছে। কিন্তু এ
চিঠি ‘প্রতিবাদ’ হইলেও উপরি-উক্ত অনধিকারীর কটুক্তির উত্তর নহে।
ইহা ‘দুন্দুভি’র প্রতিবাদ। কাজি লিখিয়াছেন—

বাঙালী সাহিত্যে আমি আরবী ফার্সী শব্দ ব্যবহার
করেছি—বজ্রস্থলে হস্ত মাজা ছাড়িয়ে গেছে—সে আমার
অক্ষমতা বা রচনার অভাব যা ইচ্ছা বলতে পারেন, তাই বলে
আমার লেখার চেয়েও আমার যারা জ্ঞানেন—তাঁরা কখনো
বলতে পারবেন না, আমার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার এতটুকু

বিষ আছে। যদি কেউ বলেন, তাঁকে সৌজন্মের সীমা অতিক্রম করে মিথ্যাবাদী বলতে বাধ্য হব।

—

শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু 'শ্রীলেখা'র অভিলাষ নামক কবিতায় বলিতেছেন—

তুমি হ'য়ে জামা মোর
আমি হব স্বামী,
প্রেমে হবো দুজনের
দোহে অহুগামী।

কবিতার ভিতর একরূপ হিসাব এবং বৈষয়িক বুদ্ধি সচরাচর দেখা যায় না। তবে লেকের ধারে ছোক ছোক করিয়া সুরিয়া বেড়ানোর চেয়ে ইহা ভাল।

—

আর একটি কবিতায়—

পৃথিবীর হৃৎকোণে যবে ছিহু কুসুম কলিকা
ছিহু যবে উচ্চকিত প্রদীপের শিখা :

হৃৎ-কোণ পৃথিবী-জিভুজের কোণায় অবস্থিত তাহা জানি না; আমরা কয়েকটি কোণের সংবাদ জানি, তন্মধ্যে 'হৃৎ' নহে, নৈ-স্কৃত কোণ অল্পতম। কবিতার নীচে লেখা আছে, "চলন্তিকার দ্বিতীয় অধিবেশনে পঠিত", চলন্তিকার দ্বিতীয় সংস্করণে কিন্তু একরূপ শব্দ মুদ্রিত হয় নাই।

—

শ্রীযুক্ত শ্রুতিশেখর উপাধ্যায়ের 'বন্দাবনের (পুষ্পপাত্র) একটি উপমা খুব ভাল লাগিল—

বুড়ো? সে ত লাঠির ডগায় কাক-তাড়ানো পোড়া হাড়ি—
কিন্তু ইহার পরেই স্বর হাড়ি ভাঙিয়া গিয়াছে।

—

শ্রীকল্পনা দেবী "নিশীথে"র কথা (অর্চনা ফাল্গুন) বাহা ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা বাঙালী গৃহস্থবাড়ির রাত্রির কথা বলিয়া মানিয়া লইতে ইতস্তত করিতেছি—

প্লাটিনাম আংটিটা থোয়ালে ত ওথানেই!
বলছিল অঞ্জলি
ওর বোন,—তাই বলি,
আঙ্গুলে না উঠিতেই লোপাট সে নিমেষেই!
কীয়ে হাসো! বৃ-সরম ইড়িয়ট হাসি ওই!
লজ্জা কি নেই মোটে?
কপালে আমারি জোটে
'ইমর্যাল', 'ভালগার' যত সব 'উড়ো থই'।

বড়ই দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। মর্যাল এবং ড্রীসেট একটাও জুটিল না! ইহার পরে কবি লিখিতেছেন, "ছুটমী শুরু হ'ল? থোপাতে যে লাগে টান!"—কিন্তু একবার পরেও যে-স্বামী (অবশ্য যদি স্বামী হয়) একরূপ ভাবে ছুটামি করিতে পারে, সে হয় অত্যন্ত নীরেট না হয় অত্যন্ত যুগু।

—

অর্চনার 'বসন্ত' নানক চিত্রখানি নানা কারণে আমাদের ভাল লাগিয়াছে। তাহার মধ্যে প্রধানতম কারণ এই যে—চিত্রে কাশফুলের রাশি, প্রস্ফুটিত পদ্মের অর্ঘ্য এবং নীল আকাশে শাদা মেঘ চিত্রিত

হইয়াছে। আমরা আশা করিতেছি এই চিত্রই ভবিষ্যতে 'গ্রীষ্ম', 'বর্ষা', এমন কি 'শরৎ' নামে অর্জনায় মুদ্রিত হইবে।

—

ভারতবর্ষের 'বাড়ীর পথে' চিত্রখানিতে একটি জীলোক পথে চলিতেছে বটে, কিন্তু কি মদ্রুত ড্রইং আর কি প্রেরণা! জীলোকের দৈর্ঘ্য সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি—কিন্তু তাহার পা হইতে উপরের দিকের তিন-ইঞ্চি দশবৎসরের খুঁকীর, তারপরে এক ইঞ্চি পকাশ বৎসরের এবং মাথাটি চল্লিশবৎসরের জীলোকের; বাম হস্ত দক্ষিণ হস্তের অর্ধেক এবং হাতে মাথায় নাকে মুখে গহনা গোঁজা। মোটের উপর এই পাকা জীলোকটি পিগমি-জাতীয়। অন্ধকারীর নামের পূর্বে "শিল্পী" বিশেষণটি যুক্ত হইয়াছে। ভাবিতেছি, ওনং রেগুলেশনের ব্যবহারটা যদি আরও ব্যাপক হইত!

—

শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় দীর্ঘজীবী এবং তাহার একটি কারণ এই যে তিনি সংযমী। সংযম সেকালের লোকের প্রধান বিশেষত্ব। আমাদের কালে লোকের আয় কমিয়া গিয়াছে—এবং সংযমের অভাবই যে তাহার কারণ এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। 'স্বত্বিতর্পণ' নামক ভারতবর্ষে প্রকাশিত একটি নিবন্ধে শ্রীযুক্ত জলধর সেন সংযমের একটি শ্রেষ্ঠ নমুনা দেখাইয়াছেন। শ্রেষ্ঠ বলিলাম এইজন্য যে এক্ষণে আত্মসংযম আমাদের কাহারও দ্বারা সম্ভব হইত না। নিজের ঢাক নিজে পিটাইয়া বেড়ানো যে-দেশে রীতি সেই দেশে ঢাক বহুতে ফুটি করিয়া রাখা যেন অবিশ্বাস্য বলিয়া বোধ হয়। জীলোকেরা অবজ্ঞা কোনো কথাই গোপন রাখিতে পারে না, এবং পারে না বলিয়াই ডিটেকটিব উপক্লাস লেখা তাহাদের পক্ষে শক্ত। হত্যাকারীর নাম

তাহারা প্রথম অধ্যায়ের গোড়াতেই প্রকাশ করিয়া বসে একথা ইংরেজরা বলে। কিন্তু জীলোক দূরে যাক, আমাদের দেশের আধুনিক যুগের পুরুষেরা চরিত্রের সংযম হারাইয়া ফেলিতেছে। শ্রীযুক্ত জলধর সেনের লেখাটি পড়িয়া আমাদের এই কথাগুলি মনে আসিল। তিনি লিখিয়াছেন—

হিমালয়ের বনজঙ্গলের মধ্যে অনেক সাধু সন্ন্যাসীরও দর্শনলাভ হয়েছে। তাঁদের কারো কারো বিশেষ ক্ষমতাও দেখেছি। এমনও দেখেছি, কোন সন্ন্যাসী কোন একটা গাছের পাতা দিয়ে মুমূর্ষু রোগীর জীবন ফিরিয়ে এনেছেন। তাঁর কাছে সে পাতার সন্ধানও নিয়েছি। সেদিন স্বামী বিবেকানন্দকে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখে এবং তাঁর চিকিৎসার কোনো সুবিধাই নাই দেখে আমার সে গাছের কথা মনে হয়েছিল। আমি তখন তাড়াতাড়ি কুটার থেকে বেরিয়ে এসে সেই প্রাণাধিকারে গন্ধার বালুকাময় চড়ায় সেই গাছের অস্থসন্ধান করে সৌভাগ্যক্রমে অনতিদূরেই সেই গাছ পাই! তারি ২৩টি পাতা এনে হাতে রগড়ে রস বের করে স্বামীজির মুখে দিলাম। দেখিই না কেন—সন্ন্যাসীর এ গাছ ফলপ্রসূ হয় কিনা। তারপরে ঔষধের ফলাফল দেখবার জন্য কুটারের বাইরে বালুকার আসনে বসে রইলাম।

প্রায় আধঘণ্টা পরে স্বামীজি চৈতন্যলাভ করলেন। তাঁর সঙ্গীরা তখন কুটারের ভিতরে ছিলেন। স্বামীজি ধীরে ধীরে বলেন—তোরা ভয় পাচ্ছিস কেন আমি মরব না—আমার অনেক কাজ আছে। আমি ছুয়ারের কাছ থেকে এই কথা শুনে

ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রণাম করে আমার সদাত্মে এসে উপস্থিত হলাম।

এই যে আমাদের সেদিনকার এত আনন্দ—এর মধ্যে কিন্তু ঘৃণাক্ষরেও হ্রবীক্শে আমার সেই অভাবনীয় বা অপ্রত্যাশিতভাবে স্বামীজির দর্শনলাভের কথা উল্লেখ করিনি।... সম্পূর্ণ আত্মবিশ্রুত হয়ে স্বামীজির পরলোকগমন উপলক্ষে একদিন মাত্র টাউনহলের শোকসভায় হৃদয়ের আবেগ সংবরণ করতে না পেরে হ্রবীক্শের ঘটনার সামান্য উল্লেখমাত্র করেছিলাম। আজ তাঁর স্মৃতির তর্পণ-প্রসঙ্গে কথাটা এতদিন পরে উল্লেখ না করে থাকতে পারলাম না।

এই-জাতীয় ঘটনা সম্ভবত শ্রীরামকৃষ্ণ দেব সম্পর্কেও ঘটিয়া থাকিতে পারে—কিন্তু অজ্ঞাবধি তাহা কেহ প্রকাশ করেন নাই। আমরা কিন্তু অশা করিয়া রহিলাম।

আর একটি কথা। যে-গাছের সন্ধান সন্ধান সময়ও পাওয়া যায়—সে গাছের নাম নিশ্চয়ই সেন মহাশয়ের জানা আছে। হৃদয়-আবেগে ঘটনা প্রকাশের সঙ্গে গাছের নামটাও প্রকাশ করিয়া দিলে আরও ভাল হইত। আর ইতিমধ্যে যদি কোনো কবিরাজের সঙ্গে বন্দোবস্ত হইয়া গিয়া থাকে তাহা হইলে সেই কবিরাজের নামটা আমরা জানিতে চাই।

চিঠি

শ্রীযুক্ত শনিবারের চিঠি সম্পাদক মহাশয়,

আপনার কি সেক্টিমেন্ট লইয়া আরও আলোচনা করিবেন?—করিতে পারেন, কিন্তু আমরা আর ইহার মধ্যে নাই। কারণ আমাদের পরস্পর দেখা হইয়াছে এবং দেখা হইয়া আমরা সকলেই খুব খুশী হইয়াছি। কি করিয়া দেখা হইল সে এক ভাবি মজা। কিন্তু সে মজা প্রকাশ করিলাম না। আমরা পরিচয় পাইবামাত্র এত হাসিয়াছিলাম যে আমাদের প্রত্যেকেরই বুক বাধা ধরিয়া গিয়াছিল। শেষে চুল ধরিয়া টানাটানি! অবশ্য ঝগড়া করিয়া নহে, হাসিতে হাসিতে।

আমাদের ভিতরকার একজনের চুল সাড়ে তিন ফুট—তাহারই কতি হইয়াছে বেশি। নিজেদের কথা নিজেরাই প্রকাশ করিলাম। আর সেক্টিমেন্ট নহে, আমরা এখন সারাদিন রঙ্গ-রহস্য করিতেছি। প্রায় পাশাপাশি বাড়িতেই থাকি এবং এক গলিতে। এখন কিছুদিন শান্তিতে থাকিতে চাই, পরে ইচ্ছা হইলে আবার লিখিব। নমস্কার জানিবেন। ইতি

শ্রীতপতী দেবী

শ্রীলীলাবতী দেবী

শ্রীকামলিয়া দেবী

‘শৈনিক’ মহাশয় সমীপে,

আমার খতদ্বয় মনে পড়িতেছে (ক্যাবলাদার মেমারি ট্যাবলেট থাইব নাকি?) কয়েক মাস পূর্বে আপনারা প্রবাসী বাঙালী তথা প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন লইয়া কিংকি আলোচনা করিয়াছিলেন।

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন লইয়া অনেক কিছু আলোচনা হইয়া গেল ও হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবেও। আপনারাও করিয়াছেন। সেই ভরসাতেই এই ধৃষ্টতা।

দিল্লীর লাজুর আশ্বাদ কিরূপ তাহা খুব কম লোকেই জানে। যে পাইয়াছে সেও পত্তাইয়াছে—যে পায় নাই সেও। আপনারা খুব সম্ভবতঃ পান নাই, না পাইয়াই “পত্তায়া হ্যায়”। (অথচ আপনাদের অভিজ্ঞতা নাই, একথাও বলিবার সাহস নাই)। আমি গত X’masএর ছুটিতে উহা আশ্বাদন করিয়াছি, এবং হুলপ করিয়া বলিতে পারি শ্বমি-বাক্য বিফল হয় নাই। লেখনী ধরিবার ইহাও একটি কারণ বটে।

আর একটি নিগূঢ় কারণ আছে। আপনারা যাহাদের মহত্তর বাঙালী বলিয়াছেন আমি তাহাদেরই অন্ততম। সেইজন্য মনে মনে খুশী হইয়া পড়িয়াছি। আপনাদিগকে দণ্ডবাদ।

প্রথমই নাম সমস্তা। প্রচলিত কথাটি প্রবাসী বাঙালী। ইহার অর্থ এইরূপও দাঁড়াইতে পারে যে বাঙালী দুই প্রকার—এক, বাঙালী; অল্প, প্রবাসী। এ যেন দেশী গাই ও বিলাতী গাই (বিলাতী গাজী বলাই সম্ভব—কারণ তাহা হইলে পূর্ণ মর্যাদা দেওয়া হইবে)। এতকাল জানিতাম তিন প্রকার বাঙালী আছে—বান্দাল, বাঙালী আর ইঙ্গ-বঙ্গ। এবার আর একটি বাড়িল!

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন বলিলে কি ইহাই বুঝায় না (অসম্ভবতঃ

আমার নিকট বুঝায়) যে বঙ্গ সাহিত্য দুই বা ততোধিক প্রকারের—অর্থাৎ বাঙালীরা যে-সাহিত্যের চর্চা করে বা রসগ্রহণ করিয়া থাকে তাহা বাংলার বাহিরের বাঙালীদের সাহিত্য হইতে বিভিন্ন।

তবে ভাষা যখন মোসলেম বাংলা ও হিন্দু বাংলা পর্য্যন্ত পৌছিয়াছে তখন প্রবাসী বাঙালায় উঠিতে বোধ হয় কাহারও আপত্তি থাকিবে না।

বৃহত্তর কথাটিতেও আমার আপত্তি আছে (অবশ্য আমার আপত্তিতে কিছুই যায় আসে না। বাংলাকে বাদ দিয়া বৃহত্তর বঙ্গ গড়িয়া উঠিতে পারে না, মাতৃভূমির সহিত ওতপ্রোতভাবে সংশ্লব না থাকিলে (বাংলা সাহিত্য, ভাষা নয়, বাদ দিলে অল্প আর একটি মাত্র সংশ্লব বাকী থাকে; সেটি বিবাহ) বৃহত্তরের কল্পনা অসম্ভব। অথচ বাংলাদেশ তথা বাঙালীই যদি যোগদান করিল তবে তো সেটা বাঙালী বা বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন হইয়া গেল। বৃহত্তরের সার্থকতা বা প্রয়োজনীয়তা রহিল না।

আবার ইহা প্রবাসী বলিয়া বাংলার বাঙালীরা মুগ্ধ ফিরাইয়া রহিলেন অথচ যেটি বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন নামে অভিহিত সেটির অস্তিত্ব নাই। ইহা আশ্চর্য্য ও অজ্ঞায়।

বৃহত্তর কথাটির যে সার্থকতা নাই তাহাও বলিতে পারি না। বাঙালী “হতভাগা মেড়ো”র উপরে উঠিতে না পারিলেও বেহারীরা “শালা বাঙালী” পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। মনে হয় তাহারা শনিবারের চিঠি পড়িয়া থাকে। আবার ছাতুটা এখনও বাঙালী রপ্ত করিতে পারে নাই, তদ্রূচ বেহারীরা মাছ খাওয়া আর লম্বা কৌচা দোলান আশ্রয় করিয়া লইয়াছে। আমরা ইংরেজদের গুণগুলিকে বর্জন করিয়া দোষগুলি গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকেই গালাগালি দিই। এদেশবাসীরা এসব বিষয়ে বাঙালীদিগকেই মহাজন পাকড়াইয়াছে। আমরা যেমন

ইংরেজী প্রবন্ধাদির অস্থবাদের নীচে স্বাক্ষর করিয়া নিজদের মৌলিকতাকে ধর্ম বা অস্বীকার করিতে চাহি না, সেইরূপ ইহারাও বাংলা রচনা বেমানম গায়েব করিয়া বাঙালীদেরই পদাঙ্ক অমুন্নয়ন করিয়া থাকে।

সুতরাং সাহিত্য সম্মেলন কথাটি যদি রাখিতেই হয়, তবে 'প্রবাসী' কথাটি বাদ দেওয়া কর্তব্য, অগ্রাধায় বাংলা (বা বঙ্গ) শব্দটাই উড়াইয়া দেওয়া উচিত। অবশ্য কালির আঁচড়েই বা কলমেয় খোঁচায়।

আপনারা সাহিত্য-সম্মেলন স্থানে ভাষাসম্মেলন ব্যবহার করিবার পক্ষপাতী। এবং কথাটি সব দিক দিয়াই ঠিক। তবে সেটিও কি প্রবাসী হইবে? এই সূত্রে আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতার কিছু কিছু বর্ণনা করিবার ইচ্ছা আছে। এবং ভরসা আছে যে আপনারা আমার উনিশ টাকা তিন আনার অভিজ্ঞতার কিছু মূল্য অবশ্যই দিবেন কারণ ঐ টাকাটা আমার বাতায়াতে খরচ হইয়াছে।

এই-জাতীয় সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য কি তাহা বুঝিয়া ওঠা দুষ্কর। সাহিত্যচর্চা নিশ্চয় নহে। কারণ রবীন্দ্রনাথের নজীর রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ—হয়ত দেখা গেল সাহিত্যবিভাগের অগ্র মাত্র দুই ঘণ্টা নির্দিষ্ট রহিয়াছে। সভা আরম্ভ হইতেই পনেরো মিনিট কাটিয়া গেল। সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পড়িতে পড়িতে দেড় ঘণ্টা কাটাওয়া দিলেন। বাকী পনেরো মিনিট। তখন দুইতিনটি প্রবন্ধের চুচার লাইন করিয়া পড়িতে দিয়া, অস্থপস্থিত ভক্তমহোদয়গণের লেখাগুলি বাস্তবাক্ত করিয়া, অগ্রাঙ্ক লেখাগুলিকে পঠিত বলিয়া গৃহীত করা ছাড়া গতান্তর রহিল না। যে ভক্তলোক হয়ত সারা বৎসর ধরিয়া এই দিনটির অপেক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন—হতবাক হইয়া

রহিলেন। কোন একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ মন দিয়া শুনিতেছি—ঘণ্টা বাজিয়া উঠল, সময় হইয়াছে।

সভাগৃহের ভিতরে ঢুকিতে চান—প্রবেশপত্র দেখান। বাহিরে আসিতে চান—পদে পদে কোট-প্যাঁট শোভিত ভক্ত পুস্তকদের (এবং তাহারা বাঙালীই) সহিত গাত্রস্পর্শের বা তাহার আশঙ্কামাজেই ক্ষমা প্রার্থনার প্রয়োজন হইবে। ঘরেবাহিরে সর্বত্রই অতিবাস্তব স্বেচ্ছা-সেবিকাদের দেখিলে বুঝিতে পারিবেন না যে তাঁহারা কেন এবং কি কাজে সেখানে উপস্থিত আছেন। (কথাটা রূঢ় হইলে তাঁহারা আশাকরি নিজগুণে মার্জনা করিবেন)।

এই গেল সাধারণভাবে যে-কোন সম্মেলনের কথা। এসব কথা সকলেই জানেন—অন্ততঃ জানিবার কথা এবং জানা উচিত। এবং ইহাতে হতাশ হইবার বা নিরাশ হইবার প্রয়োজন নাই।

আর একদিন সভামণ্ডপ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সামনের রাস্তায় বেড়াইতেছি এমন সময় একটি বাঙালী ভক্তলোক আসিয়া করুণস্বরে বলিলেন, 'ভিতরে ঢুকতে টিকিট নিচ্ছে, না?' ভক্তলোকের অপরাধ—তিনি দরিদ্র। তিনিও বাঙালী। তবে এ-জাতীয় সম্মেলনের সার্থকতা কি?

শুনিয়াছি কিছুকাল পূর্বে স্বেচ্ছাসেবকদের তামাক সাজিবার হুকুম পর্যন্ত দেওয়া হইত। ভাগ্যে সিগারেট আসিয়াছে!

হয়ত বিজ্ঞান শাখার অধিবেশন হইতেছে। দেখা গেল শ্রোতার অভাব—কেবলমাত্র সভাপতি মহাশয় ও বাহারা প্রবন্ধাদি লিখিয়া আনিয়াছেন তাঁহারাই আছেন। এমন কি অগ্রাঙ্ক বিভাগীয় সভাপতিগণ অস্থপস্থিত। কিংবা মূল সভার অধিবেশনের সময় উপস্থিত। দলে দলে মহিলারা আসিতেছেন। উঠিয়া পালানো বা চেয়ার ছাড়িয়া দেওয়া (অর্থাৎ পালানো) ছাড়া উপায় নাই।

যাক।—আপনারা বাংলার বাহিরের বাঙালীদের মহত্তর বলিতে প্রস্তুত
আছেন। আমার এতটা ঔদার্য্য নাই বলিয়াই প্রতিবাদ করিতেছি।
প্রবাসী বাঙালীর বাকসংঘম নাই—ছাপান পত্রিকা না থাকিলেও
লেখকের অভাব নাই, হাতে-লেখা পত্রিকার অভাব নাই। ছাপান
পত্রিকা না থাকিবার কারণ ইহাই যে প্রবাসী বাঙালীর enterprise
নাই। ইহার আর একটি প্রমাণ যে প্রবাসী বাঙালী পরিচালিত
কলকারখানা প্রভৃতি কমই আছে। যে কাজ পূর্বে বৃদ্ধি আর গানের
জোরে হইত, এখন প্রবাসী বাঙালীরা তাহাই—অর্থাৎ চাকরি—
কাম্বার জোরে পাইতে চেষ্টা করিতেছে।

পনেরো বছর অন্তর্ব্বের পর প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের
দেড়শত সভা হয় নাই। ইহাও কি মহত্তর লক্ষণ?

প্রবাসী বাঙালী মহত্তর হইতে পারে না। প্রমাণ—বেরিবেরি।
দেখিয়া, শুনিয়া, ভাবিয়া আমার মনে হয় যে এই ধরনের
সম্মেলন যদি করিতেই হয়—অল্প যদি ‘সম্মেলন’ কথাটি বজায় রাখিতেই
হয়—তবে প্রবাসী, বৃহত্তর, মহত্তর কথাগুলি তো বাদ দিতেই হইবে,
তাহার উপর সাহিত্য কথাটিও উড়াইয়া দিতে হইবে। অর্থাৎ কিনা
নাম হইবে “বাঙালী সম্মেলন”। অল্প কিছু নহে।

মনে হইতেছে আপনার অনেকক্ষণ সময় লইয়াছি। সুতরাং
নমস্কার। তবে আমার কথাগুলির কিছু মূল্য দিবেন কি? অন্ততপক্ষে
পড়িয়া দেখিবেন—ইহাই অহরোধ।

আর একটি অহরোধ—বাংলার তথা বাঙালীর, বাঙালীর ভাষা তথা
সাহিত্য, সব কিছুই শব্দব্যবচ্ছেদ হইতে আপনারা দিবেন না—অর্থাৎ
কিনা allow করিবেন না। ইতি—

বিনীত

ম. চ. স.

পুস্তক প্রসঙ্গ

স্মরণ ও সঙ্গতি—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীধৃষ্টিপ্রসাদ
মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ভারতীভবন—২৪৫ এ, কলেজ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা। ১০২ পৃষ্ঠা—মূল্য এক টাকা।

সঙ্গীত সম্বন্ধে ধৃষ্টিপ্রসাদ রবীন্দ্রনাথের সহিত কয়েকটি পত্র-বিনিময় করিয়াছিলেন—
বইখিনি তাহারই সংগ্রহ। এই পত্র-বিনিময়ের ইতিহাস ধৃষ্টিবাবু তাঁহার উপসংহারে
সাক্ষিপ্তভাবে বলিয়াছেন। ধৃষ্টিবাবু হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের একজন অমুরাগসম্পন্ন এবং
অতি উচ্চ স্তরের শ্রোতা। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সার্থকতা এবং ললিতকলা হিসাবে তাহার
শ্রেষ্ঠ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ঔরাসিদ্ধ ভাবিবার জুই যেন ধৃষ্টিবাবু তাঁহার অমুগ্ধ এবং
মুক্তির সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া রবীন্দ্রনাথকে এই আলোচনায় আহ্বান করিয়াছেন।
ঔপু তাঁহার অমুগ্ধতার গভীরতা এবং মুক্তির সারবত্তাই যে রবীন্দ্রনাথকে এই আলোচনায়
প্রবৃত্ত করিতে পারিয়াছে তাহা নহে, তাঁহার আশ্রয়নের আত্মরিক শ্রদ্ধাও তাঁহাকে বিচলিত
করিয়াছে। তিনি যে তাঁহার শেষ পত্র কয়টির মধ্যে কতকটা acquiescenceএর ভাব
বোঝাইয়াছেন, তাহা ধৃষ্টিবাবুর ধারণাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিবারই নামান্তর বলা
যাইতে পারে। “অর্জুন শিতামহ ভীষ্মের প্রতি মনের মধ্যে সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখে দরদ
হেঁদে শর-সম্মান করেছিলেন”—ধৃষ্টিবাবুর মুক্তির প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি
মধ্যে তাঁহার স্বীকারোক্তির মধ্যেই ইঙ্গিত আছে।

ধৃষ্টিবাবুর দীর্ঘতম পত্রখানি অতিশয় প্রাণবান এবং চিন্তা-উদ্ভীপক। সব পত্রগুলি
পড়িয়া শেষ করিবার পর বেশ প্রতীক্ষমান হয় যে রবীন্দ্রনাথ স্তম্ভিত এবং হৃদয়ঙ্গম
হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের প্রশংসায় একবারে পঞ্চমুগ্ধ হইতে না পারিলেও—তাঁহার প্রধান
আপত্তি স্তম্ভিতকলিতাহীন নির্জলা গুণাবিরহি বিরুদ্ধে। কিন্তু ধৃষ্টিবাবু মূলতঃ যে বস্তুর
বিচারে প্রবৃত্ত, অর্থাৎ রাগ-আলাপের শ্রেষ্ঠ “বিকাশ ও বিবর্তন”—সেখানে বোধহয়
উভয়ের গরমিলটা অগ্রাহ্য করা চলে। শেষকালে রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করিতেছেন—
“তথ্যপি ভাষো তো লাগে।” কবি গুণদাসগুণার্ঘ এককালে বলিয়াছিলেন—যদি
কাহারও রচনা কখনও ভাল লাগিয়া থাকে, তবে যখন তাঁহার অল্প রচনা ভালো
লগিবে না তখন “it is useful...to give him so much credit for this one

composition as may induce us to review what has displeased us with more care than we otherwise have bestowed on it.” রবীন্দ্রনাথের ছায় রস-শ্রেষ্ঠা এবং রসজ্ঞের নিকট সেই জয়যানতা আশা করা যে অবশ্যই সম্ভব—তাহা ধূর্তচিত্তবানু সমাক উপলব্ধি করিয়াছেন। মানুষের শক্তির প্রকাশ যে সর্বপক্ষে চূড়ান্ত হইবে—তাহা আশা করা যায় না। যখন একাদিকবার আনন্দ পাইয়াছি কিন্তু ততোবিকবার পাই নাই—তখন অপেক্ষা করিয়া থাকাকাইই মনুষ্য এবং আর্টিষ্টের প্রতি বিশ্বাস ও সহানুভূতির পরিচায়ক।

রবীন্দ্রনাথ আটের মধ্যে যে সমাপ্তির আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন—তাহা আলাপের ক্ষেত্রে অনেকটা অবাস্তব, দেখা তিনিও একপ্রকারে বলিয়াছেন। ইহা ব্যক্তি-বিশেষের ক্ষমতার উপরই নির্ভর করে। তিনি যে পর্য্যন্ত রস-সঙ্গার পথ্যাণ্ড রাখিতে পারিবেন—ততক্ষণ রসগ্রাহীর নিকট সময়ের দীর্ঘতা অথবা অজ্ঞতার বোধ থাকে না। কথাটি ধূর্তচিত্তবানু অতি নিষিষ্টভাবে উচ্চািহা বলিয়াছেন।

তথাপি, আলাপের কথায় রবীন্দ্রনাথের বাকসংগম এবং কতকটা grudging compliment—অনেকের নিকট প্রাথমিক বোধ না হইলেও—ইহা অর্থহীন নহে। তিনি জগতের একজন শ্রেষ্ঠ কবি এবং ভাষা তাঁহার বাহন। ভাষার মধ্যে তিনি বাহা বলিয়াছেন এবং বাহা বলিতে চাহিয়াছেন—গ্রীক সেই জিনিষটিই যদি তিনি হরের সাহায্যে বিবয়ার চেষ্টা করিতেন—তিনি হয়ত একজন শ্রেষ্ঠ গায়ক হইতেন, শ্রেষ্ঠ কবি হইতেন না। প্রত্যেক শিল্পীই নিজের শিল্পকে তাঁহার ভাব-প্রকাশের উৎকৃষ্ট উপাদান মনে করেন—করাই প্রাথমিক এবং তাঁহার পক্ষে বাস্তবীয়ও বটে। রবীন্দ্রনাথ কোন প্রতিভাবান হর-শিল্পীর রাগ-আলাপে যতই মুগ্ধ হন না কেন, তাঁহার কাব্যকে আশ্রয় করিয়া তিনি যে ছবি আঁকিতে চাহিয়াছেন—তাঁহার অসামান্যতা কোন মুগ্ধের ভুলিয়া থাকা তাঁহার পক্ষে হুতর। সেজন্ত সঙ্গীতে বাঙালীর “বৈশিষ্ট্যের” কথা বলিয়া বাণী ও হরের মধ্যে যে সোলোনার কথা তিনি বলিয়াছেন—তাঁহারও অন্তরালে বোধহয় ব্যস্তির শ্রেষ্ঠত্বের একটা অব্যক্ত ইঙ্গিত আছে। ৮৭ পৃষ্ঠায়:—“বা কিছু বলবার, আগেভাগে তা ভাষা দিয়েই বলে দিলে, ভৈরবী রাগিণীর হাতে খুব বেশী কাজ রইল না। বাঙালীর এই বভাব নিয়েই তাকে গান গাইতে হবে।” অবশ্য বাঙালীর পক্ষে হরের সাধনার রবীন্দ্রনাথের এই ধরনের কথা যথেষ্ট উৎসাহের সঙ্গার করে না—তবে ইহাও যে

তাঁহার শেষ কথা নহে—তাহা মনে করিবার মত যথেষ্ট আভাস তাঁহার লেপাতেই পাওয়া যায়। একজ্ঞ বিশেষ করিয়া যন্ত্র-সঙ্গীতের কথাটা মনে হয়। যন্ত্রের ভাষা নাই, হরও ছন্দই আছে। অথচ তাহার appeal একপ্রকারে অস্বীকার্য বলিতে পারা যায়—সেখানে বাঙালীর “বৈশিষ্ট্য” হিন্দুস্থানী সঙ্গীতকে অতিক্রম করিয়া কোন রূপ গ্রহণ করিবে? বাস্তবিকপক্ষে “বৈশিষ্ট্য” বোধহয় ব্যক্তিগত জিনিষ—অর্থাৎ তাহা প্রত্যেক শিল্পশ্রমীরই আছে—তিনি বাঙালীই হোন, মারাঠাই হোন আর হিন্দুস্থানীই হোন। কিন্তু এক একটি প্রদেশের পক্ষে এক একটি জাতীগত বৈশিষ্ট্যের ধারণা—সঙ্গীতের ক্ষেত্রে অনেকটা অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়। ইহার অস্তিত্বও বোধ হয় theoretical. মোটের উপর সৌন্দর্যের প্রকাশই সত্য, তাহার জাতীয়তাবাদের অস্তিত্ব থাকে যদি থাকে—তাহাতে অস্তিত্ব নাই, কিন্তু তাহাকেই শিল্পের মৌলিক বোধ করিয়া একান্ত-ভাবে তাহারই অহুতলন করিতে গেলে,—ওমু যে অনেক সঙ্গীতের অবকাশ ঘটবে তাহাই নহে, সৌন্দর্য-পট্টর পথেও নিরন্তর বাধা ঠেকিবে। শক্তি থাকিলেই বাস্তব্য থাকিবে—ইহা ত জানা কথা। শক্তি যেখানে নাই—সেখানে বৈশিষ্ট্যের বোহাই পাড়িয়াও কান লাভ হইবে না, এবং সে যেখানে আছে সেখানেই সে আপন মহিমায় সর্বত্র আলোকপাত করিবে—বাস্তব্য অন্বেষণ করিয়া গিরিতে হইবে না।

ওমু সঙ্গীত সম্বন্ধে কেন, সব শিল্পকলা সম্বন্ধেই উভয়ের পত্রাবলি সকলের নিকট অতিশয় জয়যাত্রী এবং শিক্ষাগ্রহ হইয়াছে। উভয়েরই উপহার অপর্য্যাপ্ত বিদ্যা নিজের নিজের মতটি অতি হৃদয়ভাবে সাজাইয়াছেন,—ইহাতে অবশ্য তত্বকথার একটু objective ধরনের ইঙ্গিত পড়িচ্ছে, যথা—রাগিণীর বিস্তারের সহিত হৃদয়ী নারীকে অলঙ্কার ও বেশভূষায় সাজাইবার তুলনা,—তথাপি প্রকাশের ভঙ্গি যে অতিশয় সমৃদ্ধ হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। উভয়েরই শিল্পবিশেষণ ব্যাপক, হৃদয়ী এবং বুদ্ধির প্রভাৱ উজ্জল। তবে ধূর্তচিত্তবানু উপসংহারে একটি কথা কৌতুহল উৎসেক করে। তিনি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কেও রবীন্দ্রনাথের সহিত একাসনে বসাইয়া শরৎ বাবুর গান শুনিবার অব্যর্থের মধ্যে “সঙ্গীতে সঙ্গতির হানিশিত ইঙ্গিত” ঘোষণা করিয়াছেন। সঙ্গীতের বড় সমস্কার হিসাবে রবীন্দ্রনাথের সহিত একনিমিত্তে তাঁহার নামোচ্চেষ দেখিয়া মনে হয় ধূর্তচিত্তবানু নিশ্চয় পরোক্ষভাবে শরৎ-প্রতিভার এই দিকটার পরিচয় পাইয়াছেন। আমরা এতদিন তাহা পাই নাই।

আমার গল্প লেখা

সেদিন বন্ধুবর হিরণ্যকুমার আমাকে বলিল, বেকার বসে থাক, কিছু সাহিত্য চর্চা কর না কেন? গল্প লেখ, নভেল লেখ, পদ্ম লেখ, প্রবন্ধ লেখ, তাহাতে মনের উৎকর্ষ সাধন হইবে।" সেই থেকে আমিও ভাবিতেছি, মন্দ কি? তবে "কাজ না থাকিলে কাঁধা সেলাই করার উপদেশ পাওয়া যায়। তাহাতে অন্ততঃ শীতের সময় কিছু কাজ দিতে পারে। কিন্তু গল্প লেখা, বই লেখা—এ সব কেই বা পড়িবে, কেই বা দেখিবে? কবির বলিয়াছিলেন, "হায় মা ভারতী, এ অখ্যাতি রহিবে ভবে" ইত্যাদি। গল্প লেখা বা পদ্ম লেখাতে ত আর পেট ভরিবে না। "অন্ন চিন্তা চমৎকারা কাতরে কবিতা কৃতঃ"।

একএকবার সতাই ভাবি, কি হইবে লিখিয়া? পৃথিবীতে সকলেই সফল কাজ যে কোন-একটা উদ্দেশ্য নিয়ে করে তাহা মনে হয় না। আমারও না হয় এটা নিরুদ্দেশ অভিযানই হইল। কেহ পড়িবে না? এই ত? তা' না হয় নাই পড়িল, লেখার চেষ্টা করিতে দোষ কি? স্বতরাং গল্পই লেখা যাউক। সংবাদপত্রে প্রতি মাসে পাতায় পাতায় ভরা যে সব গল্প ও নভেল বাহির হয় আমি কি তাহার কোন একটার মতও কিছু লিখিতে পারিব না? কে যেন সাহাজাহানের নাটকীয় ভাষায় আমার কানে কানে বলিতেছে, "এ সাহস হারিও না বংশ"!

কিন্তু হায়, প্রট?—এ পোড়া দেশে যে প্রট নাই—প্রট রচনা

করিবার মালমশলা নাই! আচ্ছা, না হয় ধরিয়াই লইলাম, গল্পের প্রটের কোন দরকার নাই, কোন form অথবা shape এরও দরকার নাই। কিন্তু সব জিনিষের মধ্যেই ত একটা দেশ কাল পাত্র সমন্বয় আছে ত! তাহা কল্পনা-করিয়া যোগাড় করি কি ভাবে? ইংরেজী সাহিত্যের একটা স্ববিধা আছে, তাহাতে সান্ত পৃথিবীর সব দেশেই কার্য্যক্ষেত্র করা যায়। আলাদা হইতে আরম্ভ করিয়া, দক্ষিণ আমেরিকার Cape Horn পর্য্যন্ত স্থানের যে কোন একটা নির্দেশ করা যায়। Scope কি বাংলা ভাষাতে আছে? বড় জোড় টেনের কলাণে ভারতবর্ষ কিবা নেহাংপক্ষে বিলাত পর্য্যন্ত সংযোজন করা চলিতে পারে, (অনেক আধুনিক গল্প দ্রষ্টব্য) কিন্তু কেহ যদি Hall Caine এর মত, আবিসীমিয়া কিংবা স্কাণ্ডিনেভিয়াতে পাত্রপাত্রীকে লইয়া বাংলায় গল্প লিখিতে বসেন তবে বঙ্গভাষাসেবী সকলেই তাহাকে রাঁচি পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবেন। বঙ্গ ভাষার এ অসম্পূর্ণতা এখন দূর করা চলিবে না। তারপর ইংরেজী ভাষাতে রেল, মোটর, জাহাজ, এয়ারোপ্লেন প্রভৃতি অনেক প্রকার সরঞ্জাম, ঘটনা, বৈচিত্র্য যোগ দেওয়া যায়। কিন্তু বঙ্গ ভাষার কোন গল্পে তাহা লিখিতে গেলে হয় শুধু বড়লোকদের ইতিবৃত্তই লিখিতে হয়, নচেৎ অসংবদ্ধ plot mind লইয়া একটা অক্ষম প্রয়াস বা খেলা করা চলে। এরূপ যে বঙ্গ সাহিত্যে দেখা না দিয়াছে তাহা বলা যায় না। বিলাতী এবং বৈদেশিক সাহিত্যে সময় ও পাত্রপাত্রীনির্বাচনে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না। কারণ পুরাকালের বিভিন্ন দেশের ইতিহাস আছে। তাহার উপর প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক মৌলিক গবেষণা আছে—দরকার হইলে সবই সংগ্রহ করা যায়।

হাওড়া স্টেশন হইতে সকালে মাত্রাজ মেল ছাড়িতেছে এরূপভাবে

গল্প আরম্ভ করিলে অবশ্য বিশেষ ক্ষতি নাই। কারণ মাস্ত্রাজ মেল সকালে ছাড়ুক বা বিকালে ছাড়ুক, গল্পের আখ্যানবস্তুর তাহাতে যায় আসে না। কিন্তু যদি কেহ লেখেন যে নায়িকাকে উদ্ধার করার জন্ত নায়ক (বাঙালী) জাহাজ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া endurance swimming-এর রেকর্ড ত্রুটি করিয়া সাত দিন সম্ভরণ করিয়া দ্বীপে আসিয়া দেখেন নায়িকা সেখানে বসিয়া স্বচ্ছন্দমনে চুল শুকাইতেছেন, তবে তাহা গল্পহিসাবে উপভোগ্য হইলেও ভাল সাহিত্যে স্থান পাওয়ার উপযুক্ত কেহ বলিবে না। অসি অবশ্য উল্লেখযোগ্য ইহা উল্লেখ করিলাম। মনে হয় গল্প লিখিতে গেলে একরূপ স্থান ও কালের সামঞ্জস্য ও সৌকর্য্য রক্ষা করা কম কথা নয়। অনেক লেখক আছেন যাহাদিগকে বলা যায় “They run away with their character”—লক্ষ্য হয় ত থাকে চরিত্রবিশ্লেষণ কিন্তু তাহা দেখাইতে গিয়া অনেক ঘটনা জোড়াতালি লাগাইতে উদ্বাহা যেন বাধা হ'ন।

শৈশব অবস্থায় আরব্য উপক্ৰাস এবং পারস্য দেশের উপকথা এবং Folk tales গুলি বড় ভাল লাগিত। তাহার প্রধান কারণ এই যে তাহাতে যখন যাহা দরকার, সম্ভব, অসম্ভব, অজ্ঞপ্ত বা যাহা বাস্তব জীবনে প্রমাণ করার এবং প্রত্যক্ষ দেখার কোন উপায় নাই। বতীসাহিত্য এবং অভিজ্ঞতাসাহিত্য—ইহারাও যেন এই রকমের—অর্থাৎ লেখক যে কোন দিন বতীতে বাস করিয়াছেন কিম্বা অভিজ্ঞত (enlightened) সম্প্রদায়ের কেহ একজন ছিলেন বা আছেন তাহা হযত আদৌ নয়, অথচ কল্পনা-বলে তিনি যেন অনেক জিনিষই স্বচক্ষে দেখিয়াছেন এমন ভাবে লিখিয়া যাইতেছেন। পাঠকগণ তাহা স্বচক্ষে দেখিবার অথবা প্রমাণ সংগ্রহ করার কোন উপায়ও খুঁজিয়া পান না, চেষ্টা করিতে গিয়া হযত বিপদেই পড়িবেন। এমন একটা

মহা হুবিধা থাকিতে আমার গল্প লেখার ভাবনা? কিন্তু মনে একটা সন্দেহ জাগে, গল্প অবশ্য নাটকও নয়, ইতিহাসও নয়, কিন্তু তাই বলিয়া গল্পের মধ্যে কিছু গল্পই কি থাকিতে নাই?

কিন্তু তাহা না থাকুক—কেন গল্প লিখিব? বেশ আছি।

শ্রীকালীদাস বাগচী

পুস্তক সমালোচনা

জল্পনা: শ্রীহেমলতা দেবী। প্রকাশক শ্রীকেন্দারনাথ চট্টোপাধ্যায়, ১২০১২, আপার মার্কেটার রোড, কলিকাতা। জন্মদিন অক্টোবর, ১৫৫ পৃ: মূল্য ১০।

লেখিকা স্বয়ং সমাজ-সেবায়, বিশেষ করিয়া নারীজাতির কল্যাণ-কার্যে ব্যাপৃত আছেন। তিনি কার্যক্ষেত্রে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, সেই অভিজ্ঞতার বাণী ছোট ছোট রচনার সাহায্যে ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রত্যেকটি প্রবন্ধ এবং গল্প অতিশয় স্পষ্ট এবং সহজ-বোধ্য। পড়িতে খুব ভাল লাগে এবং শিক্ষা লাভ হয়।

বুদ্ধ ধাত্রীর রোজ নামচা, দ্বিতীয় ভাগ:

শ্রীহৃন্দরীমোহন দাস। প্রকাশক শ্রীপ্রমোদনন্দ, যোগিনন্দ দাস, ৫৭১১ এ, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৬০ আনা।

বুদ্ধ ধাত্রীর রোজ নামচা বুদ্ধ প্রস্থতি-চিকিৎসকের ডায়েরি। ব্যাধি-বর্ণনা নহে মানব-চরিত্রের রহস্য বর্ণনা। ভাষায় বিজ্ঞপের ধার আছে, খোঁচাইয়া অনেককে বিপদগ্রস্ত করা হইয়াছে।

নিমন্ত্রণ প্রাপ্তি

গত সুরস্বতী পূজা উপলক্ষে আমরা নিম্নলিখিত স্থান হইতে নিমন্ত্রণ লিপি পাইয়াছিলাম।—

১। জলি মেডিক্যালস ৩৪, বি, চিত্তরঞ্জন আভিনিউ। ইহারা, শনিবারের চিঠিতে (১৩৪২ বৈশাখ-শ্রাবণ) শ্রীশান্ত দে লিখিত “জয়ী” নামক নাটক অভিনয় করিয়াছিলেন।

২। রামমোহন রায় হষ্টেল, ১০২, আমহাষ্ট স্ট্রীট।

৩। কলিকাতা থ্রিনিভাসিটি ইনষ্টিটিউট।

ইহা ছাড়া—

১। বিবেকানন্দ সোসাইটি, (স্বামী বিবেকানন্দমন্দির ৭৪ বায়িক
অক্সোংসব)

২। শিশিরকুমার ইনষ্টিটিউট, বাগবাজার। ইহারা গত আশ্বিন-
কাষ্ঠিকের শনিবারের চিঠিতে প্রকাশিত শ্রীপ্রমথ বিশী লিখিত 'ঋণ-
কৃত্য'—নামক নাটক অভিনয় করিয়াছিলেন।

৩। Y. M. C. A. কলেজ ব্রাঞ্চ, ৮৬, কলেজ স্ট্রীট (বায়িক ভোজ)
ইহারা 'ঋণ-কৃত্য'—অভিনয় করিয়াছিলেন।

হারমোনিয়ম কিনিতে হইলে

ডোম্বার্কিনের হারমোনিয়মই
কেনা উচিত

৫০ বৎসর ধরিয়া ডোম্বার্কিনের হারমোনিয়ম সুরের মাধুর্য্য গঠন,
স্বাদিষ্ণু ও অস্বাদিষ্ণু গুণের অল্প সর্বশ্রেষ্ঠ
বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। অল্প
হারমোনিয়ম কিনিবার পূর্বে একবার
ডোম্বার্কিনের হারমোনিয়ম সম্বন্ধে খোঁজ
করিবেন। নব-প্রকাশিত সচিত্র মূল্য-



তালিকার অল্প আজই পত্র লিখুন।

সোনোরা ডবল-ট্রীড বক্স হারমোনিয়ম ৩ অক্টেভ, ৫ ষ্টপ বাস্তুসহ
৩০০ টাকা।

ডোম্বার্কিন এণ্ড সন্স

১১নং এম্প্রেনেড, কলিকাতা

শ্রীপরিমল গোষাঈ এম-এ কর্তৃক সম্পাদিত ও রজন পারিশিং হাউসের প্রকাশিকারী
শ্রীকপিলপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীসজনীকান্ত দাসের পক্ষে ২৫২, মোহনবাগান রো,
নবিরঞ্জন গেস হইতে শ্রীপ্রবোধ নাম কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



৮ম বর্ষ]

বৈশাখ, ১৩৪৩

[৭ম সংখ্যা

প্রসঙ্গ কথা

বাংলা বানান—ভুল পাঠ্যপুস্তক—পাঠ্যপুস্তকে হিন্দুভাব

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কেন্দ্রীয় পরিভাষা-সমিতির সম্পাদক
শ্রীযুক্ত চাকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য স্বাক্ষরিত 'বাঙলা বানান' শীর্ষক একখানি পুস্তিক।
আমরা পাইয়াছি, এবং উহাতে যে সব প্রশ্ন করা হইয়াছে তাহার উত্তরও
দিয়াছি। বহু মতের অর্থাৎ বহু ভিন্ন মতের যোগে শেষফল কি
দাঁড়াইবে তাহা আমরা জানি না। কারণ আমাদের ইহাই ধারণা
যে এ দেশে কোনো প্রশ্নেরই উত্তর পাওয়া যায় না, এবং কোনো
আরস্তেরই শেষ হয় না। বঙ্গদেশের শীর্ষস্থানীয় কবি কবিতা-লেখা
শেষ করিবেন বলিয়া শেষের কবিতা লিখিয়াছিলেন, কিন্তু আজিও
তিনি কবিতার শেষ খুঁজিয়া পান নাই। প্রবীণ লেখক শরৎচন্দ্র
প্রমথ্যাকুল মনে শেষ প্রশ্ন লিখিলেন, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাহার সত্তর

কেহ দিল না। কচিং-কদাচিং লেকে দুই একটি আশ্চর্য্যের সংবাদ শোনা যায় বটে কিন্তু এত অল্পে অতবড় প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নহে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ইহা অবশ্য শেষ প্রশ্ন নহে, কারণ ইহাতে লেখক-রিগকে ভয় দেখাইয়া কিছু লেখা হয় নাই, প্রশ্নগুলি অছরোদ্ধমূলক। পুস্তিকার নাম 'প্রথম প্রশ্ন' হইতে পারিত, কিন্তু তাহা না হইয়া নাম হইয়াছে 'বাঙলা বানানের নিয়ম'। নাম দেখিয়া হঠাৎ মনে হয়, বাংলা বানানের একটি নিয়ম আছে, ইহাতে সেই নিয়মগুলিই মুদ্রিত হইয়াছে। কিন্তু সকলেই জানেন, বাংলা বানানের কোনো নিয়ম নাই, সুতরাং 'নিয়ম হওয়া উচিত' এই সদিচ্ছায় স্বয়ং বিশ্ববিদ্যালয় অস্থাপিত হইয়াছেন। বাংলা বানান কি-পদ্ধতিতে চালিত হইবে তাহা যে বিশ্ববিদ্যালয় হইতেও আলোচিত হইতে পারে একপক্ষারণা আমাদের স্বপ্নেরও অতীত ছিল। বহুকাল পূর্বে একবার আমাদের মধ্যে কথা হইয়াছিল বটে যে বানান সম্বন্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিংবা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর একটা কিছু স্থির করা অবিলম্বে কর্তব্য, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই উপলব্ধি করিলাম, এ একেবারে অসম্ভব। এ বিষয়ে যদি কাহারও কোনো অধিকার থাকে তবে সে অধিকার একমাত্র কর্পোরেশনেরই আছে। কলিকাতার বিভিন্ন ওয়ার্ডে বিভিন্ন বানান প্রচলিত। আবার প্রত্যেক ওয়ার্ডের মধ্যেও বানান সম্বন্ধে সকলের একতা নাই। ইহারই জন্ত কাউন্সিলর প্রয়োজন। ওয়ার্ড-বাসীর স্বার্থরক্ষার ইহা একটি উত্তম হযোগ। কর্পোরেশন হইতে বিভিন্ন ওয়ার্ডের বিভিন্ন বানান মানিয়া লইলে ইহারই একটা বা একাদিকটা বন্ধের অসম্ভাব্য জেলায় প্রচলিত হইতে পারিবে।

বানানকে দেশের সমস্যা হিসাবে থাড়া করিতেও কর্পোরেশনের হাত চাই। প্রত্যেক ভোটের সময় একবার করিয়া আমরা স্বরণ করিতে পারিব যে আমাদের বানানের স্বার্থ রক্ষা করা উচিত। ইহার জন্ত প্রতিনিধি নির্বাচন করিব, এবং ভোট-কাল আসন্ন হইলে বিপক্ষীয় কাউন্সিলর পদপ্রার্থীর বানান ভুল বাহির করিয়া হাওবিল বিতরণ করিব। কিন্তু তৎপূর্বে বানান আমাদের সমস্যা, একথা স্বীকার করিব না। যে শব্দের চারি পাচ প্রকার বানান চলিতেছে তাহার মধ্যে একটি নির্দিষ্ট করিয়া দিলেই যে আমরা তাহা মান্য করিয়া চলিব ইহা কাজের কথা নহে। যে শব্দের একটিমাত্র বানান, সেই একটিমাত্র বানানই বা কে মান্য করিতেছে? 'স্বত্ব' শব্দটি আজ পর্য্যন্ত নানা হস্তে অত্যাচারিত হইয়া আসিতেছে। ইহার দ্বিতীয় কোনো বানান হয় না, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত বাংলাভাষায় যতগুলি বই ছাপা হইয়াছে তাহার 'সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত' কদাচিং কেহ করিয়াছেন। এবং তাহাও হয়ত ছাপার ভুলে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লেখক বা প্রকাশক মনের আনন্দে কেহ 'স্বত্ব', কেহ 'সত্ত্ব', কেহবা 'স্বত্ব' রক্ষা করিয়া ব্যবসা করিয়া বেশ ছই পয়সা ঘরে আনিতেছেন। ইহাদের কেহই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সুব্যাপেক্ষী নহেন। কলিকাতার রাজপথসমূহে যতগুলি মশারির দোকান আছে, তথায় সকলেই 'মশারী' শব্দের দ্বারা সাইন-বোর্ড টাঙাইয়াছে। যে বানান বিশ্ববিদ্যালয় অছমোদন করিল না সেই বানান তাহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘরের অংশ ভাড়া লইয়া সেখানে ব্যবহার করিতেছে এবং তদ্বারা ব্যবসা করিয়া থাকিতেছে। কাহারও ইহাতে জ্ঞপ্তি নাই। অর্থাৎ বানান এ দেশের ব্যবসায়ী বা সাহিত্যিক কাহারও সমস্যা নহে।

বিবাহের উপহারে 'ম্বেহাশীশ' ছাপাইয়া পয়সা পাই, কিন্তু যদি সরিষাপ্রাপ্যে দিত হইয়া প্রফটা সংশোধন করিয়া 'ম্বেহাশীশ' করিয়া দেই তাহা হইলে 'শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞানিত আনন্দ হয় বটে কিন্তু পয়সা পাওয়া যায় না। বিশ্ববিদ্যালয় বহু আলোচনা করিয়া বানান নির্দিষ্ট করিতে উৎসাহী হইয়াছেন; ইহাতে বানান ঠিক হইবে বটে কিন্তু বাঙালীকে কে ঠিক করিবে? দোষ বানানে নাই, দোষ রহিয়াছে বাঙালীর চরিত্রে। যে সব স্থলপাঠ্যপুস্তক বাঙালী লিখিতেছেন তাহার অধিকাংশই—শুধু বানান ভুলে নহে—বিষয় এবং বক্তব্যের ভুলে অপাঠ্যপুস্তক হইয়া উঠিতেছে, কিন্তু তথাপি তাহা স্থলপাঠ্য হিসাবে মনোনীত হইতেছে কেন? গত মাসে আমরা শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র রায় লিখিত ম্যাট্রিকুলেশন হাইজীন নামক পুস্তক সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। ঐ পুস্তকে এমন সব অজ্ঞতার পরিচয় আছে যাহাতে ঐ বই কোনো স্থলেই পাঠ্য হইবার উপযুক্ত নহে; যদি বা হইয়াছে, কারণ অজ্ঞতা ধরিবার লোকাভাব, তথাপি আমাদের মন্তব্য এবং আলোচনা প্রকাশ হইবার পর উহার পাঠ স্থলে বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু সংবাদ পাইতেছি যে সেরূপ কিছুই হয় নাই।

* * *

বানান সমস্তার চেয়ে এ সমস্তা গুরুতর। বিশ্ববিদ্যালয় এ বিষয়ে ক্রি করেন, তাহা দেখিবার অপেক্ষা করিতেছি। শ্রীযুক্ত জে, এল, ব্যানার্জি প্রণীত Indian Readers (VI) নামক একখানি স্থলপাঠ্য পুস্তকে একটি রচনায় লিখিত হইয়াছে—

"Everest, Gauri Sankar, the virgin peak of the Himalayas, still remains unconquered."

কিন্তু মাউন্ট এভারেস্ট (২৯০০২ ফুট) এবং গৌরীশঙ্কর (২০৪৪০

ফুট) যে পৃথক উচ্চতাবিশিষ্ট দুইটি পৃথক শৃঙ্গের নাম ইহা জে, এল, ব্যানার্জি মহাশয় না জানিতে পারেন, এবং না জানা হয়ত তাহার পক্ষে নিন্দনীয় নহে, কিন্তু স্থলপাঠ্য পুস্তকে কোনো বিষয়ে কিছু লিখিতে গেলে সে বিষয়ে যথাযথ জ্ঞান না থাকিলে লেখক নিন্দারই অবশ্যই হইবেন। স্থলপাঠ্য পুস্তক লিখিলে প্রচুর লাভ হয় এ কথা সত্য, কিন্তু বিস্মৃত ব্যবসার দিকে নজর রাখিয়া বই লিখিলেও নিতুল সংবাদ একটু চেষ্টা করিলেই সংগ্রহ করা যায় এবং তাহা বইতে লেখাও যায়। নি: জে, এল, ব্যানার্জির এই বইখানি মে: চক্রবর্তী এণ্ড চ্যাটার্জি কোং লি: কর্তৃক প্রকাশিত; বইখানি কলিকাতার কোনো কোনো স্থলে পড়ানো হইয়া থাকে।

* * *

বানান-সমস্তার সমাধান যে বাংলা অক্ষর থাকিতে কিছুতেই হইতে পারে না ইহাই আমাদের মত। ইহার কারণ এই যে বাঙালীর যাহা কিছু আছে তাহাতেই তাহার চরিত্রহীনতার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'ইউনিফর্মিটি' বাঙালীর মধ্যে থাকিতে পারে না, না চেহারা, না পোষাকে। স্বতরাং বাংলা বানানে 'ইউনিফর্মিটি' আশা করা অত্যাশ হইবে। আমরা নির্বিচারে যাহা ইচ্ছা করিতে পারি, ইহাই আমাদের স্বাধরা। সিনেমা-ঘরে গিয়া দেখিয়াছি বাঙালী পাড়ায় যে ছবির দৃশ্য-বিশেষ দেখিয়া বাঙালী দর্শক চীৎকার করে, সাহেব পাড়ায় সেই ছবি দেখিবার সময় বাঙালী দর্শক চুপ করিয়া থাকে। সামান্য কয়েকজন ইউরোপীয়ান উপস্থিত থাকিলেই বাঙালী সভা হইতে বাধ্য হয়। স্বতরাং বাংলা অক্ষর পরিবর্তন করিয়া যদি রোমান অক্ষর প্রচলিত করা যায় তাহা হইলেই বাঙালী লেখক বানানে ইউনিফর্মিটি রক্ষা করিতে বাধ্য হইবে। বাংলা অক্ষর প্রচলিত থাকিতে ইহা সম্ভব

নহে। কাজেই একথা জোর করিয়া বলিতে পারি, বিশ্ববিদ্যালয়ের এ চেষ্টা ফল প্রসব করিবে না। বাঙালী অস্তত বাংলা বানান সম্বন্ধে যে স্বাধীনতা ভোগ করিতেছে তাহা রোমান কংকোয়েস্ট ব্যতীত অন্য কোনো উপায়ে হরণ করা যাইবে না।

ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় আর একটি বৃহত্তর সমস্তার সম্মুখীন হইয়াছেন। ইহা মুসলমানের বাংলা পাঠ্যবিষয় লইয়া। সম্প্রতি হিন্দুভাবপূর্ণ লেখা পড়িয়া পড়িয়া মুসলিম জগদে ক্রমাগত আঘাত লাগাতে তাহা দুর্বল হইয়া পড়িতেছে। ইহার বিরুদ্ধে হিন্দুদের তর্ক এবং উত্তম উত্তম যুক্তি প্রদর্শন করা শুধু যে হাস্যকর তাহা নহে—অজ্ঞায়। হিন্দুদের নিকট যাহা স্মৃতি মনে হইতেছে, মুসলমানদের নিকট তাহা স্মৃতি মনে হইতেছে না। ফলে ক্রমাগত উভয় পক্ষ ক্ষুব্ধ হইতেছেন। ঐষ্টানগণ একেশ্বরবাদী। কিন্তু তাঁহারা সকলদেশের দেবদেবীগণের বিষয় নিশ্চিন্তমনে পাঠ করিয়া থাকেন। সাহিত্য ইতিহাস পাঠ করিতে গেলে ইহা অপরিহার্য, শুধু তাহাই নহে, ইহা পরিহার করিবার প্রশ্ন কোনো শিক্ষিত লোকের মনেই জাগে না। মাইকেল মধুসূদন দত্তও ঐষ্টান ছিলেন। পৃথিবীর সকল দেশের পৌরাণিক দেবতার বিষয় আলোচনা করিয়া এবং সে সম্বন্ধে গ্রন্থ লিখিয়া গ্রন্থ পাঠ করিয়া ঐষ্টানগণ আজিও বাঁচিয়া আছেন। কিন্তু এ যুক্তি মুসলমানদের জগদ-বেদনার প্রতিষেধক নহে। বেদনা তাঁহাদের লাগিবেই। স্তত্রাং অবিলম্বে পাঠ্য-পুস্তক পৃথক হওয়া প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয় যদি হিন্দুমুসলমান বিবাদ ঘুচাইতে চাহেন তাহা হইলে এ ব্যবস্থা তাঁহারা করিবেন, আর যদি উহা বৃদ্ধি করিতে চাহেন তাহা হইলে যুক্তি দেখাইতে থাকুন।

কোনো কবিতা বা গল্প পড়িয়া শুদ্ধমাত্র হিন্দুভাব থাকাতাই যদি তাহা মুসলমানের প্রাণে আঘাত দেয় তাহা হইলে তাঁহাদের দাবী শুনিয়া সেই সব অংশ বাদ দিতে হইবে এক্ষণ ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয় অবগুই করিবেন না। চাকরীর দাবী মিতান সহজ, কেন না মুসলমানগণ ভারতবাসী; যোগ্যতা হিসাবে এমন কি ধর্ম হিসাবেও যদি চাকরি তাঁহারা হিন্দু অপেক্ষা বেশী পান তাহাতে ভারতবর্ষের কোনো ক্ষতি নাই। কারণ চাকরি পাওয়াটাই ভারতবর্ষের সমস্যা নহে। ভারতবর্ষের লোকের মধ্যে কোন সম্প্রদায়ের লোক দুইটি চাকরি বেশি পাইল ইহা লইয়া বিবাদ করাই ক্ষতিজনক। কিন্তু মুসলমানগণ যদি শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁহাদের অশিক্ষাজনিত অজ্ঞায় দাবী উপস্থিত করেন তাহা হইলে শিক্ষার ক্ষেত্রে দুইটি পৃথক বিভাগ করা ছাড়া আর কোনো উপায় নাই। কারণ এক্ষণ দাবীতে বাঙালী হিন্দুর এবং বাঙালী ঐষ্টানের ক্ষতি হইবে। ধর্ম বা সম্প্রদায়ের ক্ষতি নহে—একেবারে শিক্ষার আদর্শের মূলে কুঠারাঘাত করিলে কালচারের যে ক্ষতি সেই ক্ষতি হইবে। হিন্দুগণ ঐষ্টানদের রাইবেল পড়িবার সময় কখনো মনে করেন না যে ভিন্ন “ধর্মের” কিছু শড়িতেছেন। আমরা হিন্দুগণ এবং খৃষ্টানগণ চিরদিনই ভারতীয় পুরাণ, ইউরোপীয় পুরাণ, বেদ উপনিষদ, বাইবেল কোরান পাঠ করিব এবং চিরদিনই ইহাকে আমাদের জ্ঞানবুদ্ধির সহায়ক হিসাবে গণ্য করিব। মুসলমানদিগের জ্ঞান দুঃখ হয় কিন্তু তাঁহারা নিজেরা যদি খুশী থাকেন তাহা হইলে আর আমরা দুঃখ করিব না।

কিন্তু বজ্জনের স্পৃহা যখন তাঁহাদের মধ্যে জাগিয়াছে তখন বাংলা অক্ষরগুলিও তাঁহারা ত্যাগ করিবেন। বাংলা অক্ষর রোমান অক্ষর

হইলেও তাঁহাদের ত্যাগ করা উচিত হইবে। কারণ আমাদের বর্ণমালার অনেকগুলি অক্ষরই কোন না কোন দেবতার নাম। মুসলমানকে (Mussalman) মুছলমান (Muehhalman) লিখিলেই তাহার হাত এড়ানো যাইবে না। আশা করি শীঘ্রই এ সম্বন্ধে মুসলমানদের মধ্যে আন্দোলন দেখা যাইবে।

এবং এই আন্দোলন আরম্ভ হইলেই বানানের নতুন সমস্যা দেখা দিবে। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা কমিটি কোথায় যাইবেন? অধিকাংশ পরিভাষা সংস্কৃত হইতে আহৃত হইতেছে—ইহা অবশ্যই মুসলমানদিগের নিকট আপত্তিকর হইবে। হওয়াই উচিত। কারণ অনেক শব্দের মধ্যেই হিন্দু দেবতার নাম প্রচ্ছন্ন থাকিবে। বস্তুমানে যে সব বাংলা শব্দ মুসলমানকে ব্যবহার করিতে হয় তাহাই ত অধিকাংশ দেবতার নাম। স্বতরাং পরিভাষা কমিটির সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদের পক্ষ হইতে একটি পরিবর্জন কমিটি গঠিত হওয়া একান্ত আবশ্যিক। সর্কাপেক্ষা উত্তম হয়, বাংলাভাষা বর্জন করা। আমাদের মতে উর্দুই তাঁহাদের মাতৃভাষা হওয়া উচিত। উর্দু হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'টেস্টটুক' এর বিষয় লইয়া আর গণ্ডগোল হইবে না—আমরাও এ বিষয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত হইতে পারিব।

সান্ত্বনা

“স্বর্গের ময়দান মহাকাশে
ঘন নীল ঘাসে
শত লক্ষ ফুল ফুটে আছে—”
গিন্নী মাখান ছন মাছে,
কবিতা আরম্ভ শুনে, “আহা মরে-যাই
লিখেছ যা ছাই,
নীল ঘাস কে দেখেছ কবে?”
আমি বলি, “যবে
কাব্য চেপে ধরে টুটি,
বাস্তবের খুঁটি
উপড়িয়ে ফেলি’, হৃদিগরু
মতের গোয়াল ক্ষুদ্র সরু
এক লম্ফে পশ্চাতে ফেলিয়া
কল্পনার পাখা যে মেলিয়া
বাহিরায় জ্বন্দর অনন্ত কাব্য-মাঠে।”
গিন্নী হাই তুলে ঘান ঘাটে
কোটা মাছ তুলে রেখে
কলসি লইয়া একে বেকে
জল আনিবারে;
আমি তারে
অশ্রুপূর্ণ চোখে দেখি আবছায়া
কথা নহে, যেন শুধু মায়া;

দূর হতে আরও দূরে

পুকুরের পথে ঘুরে ঘুরে

পুলান্দিনী

জীবন সঙ্গিনী

খাটো শাড়ী করে নিবারণ কোন মতে—

লজ্জা পে নিতধে। হে কল্লনাগতে!

নাহি হুয়ে লখিত ও তরুবারে

আমি মরি ম্যালেরিয়া জরে,

আমার এ শীর্ণ বক্ষে

কেন যে অলক্ষ্যে

বাঁধিয়াছ বাসা!

অগ্নি কর্শনাশা!

আসেন গৃহিণী

ক'রে রিবিঝিনি

শত গাছি চুড়ি;

ঐ বুড়ি,

ঐ যে করিছে সর্পনাশ

সর্প অভিলাষ

অমরত্ব অভিযান মোর

কল্লনার ঘোর

সব ভেঙে করে ছার খার!

শুধু রাঁধে ভাল—মাশুনা আমার।

শ্রীমধুকরকুমার কাক্সিলাল

ভগবান যা করেন

গতকাল্য বৌদিকে তাঁহার বাপের বাড়ী হইতে শশুড়বাড়ী
আনিতে তাঁহার আত্মযত্নিক অনেক কিছুর ভিতর একটি স্থাটকেস
ঐনে ছাড়িয়া আসিয়াছি। যখন ইহার খোজ হইল তখন it was too
late.

সেই স্থাটকেসে বৌদির অনেক ভাল ভাল দামী শাড়ী ছিল;
সুতরাং ক্ষতির পরিমাণ যে অসহনীয় তাহা বলা বাহুল্য। যখন বাবা
কাকা আমার এই নিদারুণ ভুলের বিষয় অবগত হইলেন, তখন যাহা
হওয়া উচিত সবই হইল,—অর্থাৎ গালাগালির অবিশ্রান্ত বর্ষণ। বাবা
প্রাচীন মাহুয়,—সুতরাং একেবারে গ্রাম্য ভাষায় সোজাসৃজি তাঁহার
ক্রোধ প্রকাশ করিলেন। কাকা আধুনিক-ভাবাপন্ন,—সুতরাং তাঁহার
তিরস্কার চলিল হুঁ-ই-দিতগুক্ত শুদ্ধভাষার বাক্যাবলীতে। বাবা
চুঁচরটা কীল, ঘুসি, লাখি-ইত্যাদি মোটা রকমের প্রহার প্রয়োগ
করিয়াই নিরন্তর হইলেন, কিন্তু কাকা হুঁচের অগ্রভাগে নূন মাথাইয়া
আমার সর্পাঙ্গে অনবরত বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। আমি একেবারে
দণ্ডকাঠবৎ আনত মুখে তাঁহাদের সকল দান গ্রহণ করিয়া ধীর পদক্ষেপে
আপন কক্ষে প্রবেশ করিয়া দরজায় খিল লাগাইলাম। বিছানায় শুইয়া
মোহাবিষ্টের মত আবোল-তাবোল ভাবিতে লাগিলাম। বৃকের ভিতর
টিপ টিপ করিতে লাগিল, এবং মনে হইতে লাগিল, আমার মাথার
চারিদিক দিয়া অনেকগুলি বৈদ্যুতিক প্রবাহ মস্তিষ্কের ভিতর চলাফেরা
করিতেছে। কিছুক্ষণ পর কান্নার ফোঁস ফোঁস শব্দ শুনিতে পাইলাম।
বৃষ্টিতে পারিলাম, বৌদি কাঁদিতেছেন, মা মাশুনা দিতেছেন। হায়রে!

মেয়েদের গহনা আর কাপড়চোপড়, এগুলি বোধকরি উহাদের স্বামী অপেক্ষাও প্রিয়; আর সেই প্রাণাপেক্ষা প্রিয় বস্তুর অধিকার সর্বনাশ আমি করিয়াছি। বৌদির শোকের গভীরতা উপলব্ধি করিবার জন্ত আমাদের সর্বাপেক্ষা প্রিয় পরীক্ষায়—অর্থাৎ বি, এ, পরীক্ষায় যদি ফেল করিতাম তাহা হইলে আমার অবস্থা কিরূপ পাড়াইত তাহাই চিন্তা করিতে গিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। মনে হইল, নেহাৎ তিনি স্বস্তর-বাড়ীতে, তায় নবাগত, তাই ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছেন; নতুবা ডুকরিয়া কাঁদাই বৌদির স্বাভাবিক ছিল।

সারারাত দিন জ্বালাময় অশ্রুতে কাটাইলাম। রাত্রিতে ঘুম হইল না। সারারাত কত প্রকার ভাবিতে লাগিলাম,—আর একবার মালগুলি গণনা করিলে নিশ্চয় তুলটা ধরা পড়িত; গাড়ীর কামরায় যে ভদ্রলোকের সহিত আলাপ করিয়াছিলাম সে ভদ্রলোক যদি আমার মাল-নামানর নিঃশেষতা সন্দেহে আমাকে অবহিত করিত, তবেও হইত; বৌদি যদি একটু কুলির মাথার দিকে নজর দিতেন, তিনি হয়ত ধরিয়া ফেলিতেন।—ইত্যাদি নানাপ্রকার “would-have-been”—মূলক আলোচনায় আমার অশান্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিয়াই চলিলাম। ভোরের দিকে চিন্তা-শক্তি একেবারে আঁশ হইয়া পড়িল। একটু তন্দ্রা আসিল।……আজ সকাল বেলা ঘুম ভাঙিবার সঙ্গে সঙ্গে কানে পৌছিল বাবার এই কয়টি কথা—“ভগবান যা করেন, মঙ্গলের জন্ত।”

গতকল্য বাবা আমাকে রুচ ভাষায় যে গালাগাল দিয়াছিলেন তাহাতে অহুশোচনা হওয়ায় বোধহয় তিনি আমাকে শুনাইয়া ঐ কথাটা বলিলেন। কিন্তু সে যাহাই হউক, ঐ কথা শ্রবণমাত্রে আমি যেন কেমন একটু শান্তি অহুভব করিলাম। কাল সারাদিন সারারাত অশ্রুতর উত্তেজনার পর ভোরবেলা ঐ কথাটা আমার বিক্ষোভিত

মনে এক শীতল সান্থনার প্রলেপ দিয়া গেল। ঐ কথাটা অতি পুরাতন এবং বহুবার বহুজনের মুখে শুনিয়াছি;—মিজেও হয়ত বহুবার বলিয়াছি। কিন্তু আজ যেন উহা নতুন রূপে আমার মনে জাগিয়া উঠিল। মনে হইল, ঐ তুলের উপর, আমার কোনই হাত ছিল না, উহা অনিবার্য। উহাকে ঐ রূপেই আমার মন স্বীকার করিয়া লইল। তাহাতে অহুশোচনা এবং অশ্রুতিও বিদূরিত হইল।

সান্থনা পাইলাম, প্রকৃতিস্থ হইলাম। পাঠক হয়ত হাসিতেছেন, এবং আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছেন—বাঃ মজা মন্দ নয়! ফাঁকা অদৃষ্টের দোহাই দিয়া, অত বড় কেলেক্সারী করিয়াও বেহায়ার মত হাসিয়া থেলিয়া বেড়াইতে চায়। আমি বলি, উহাতে যদি বেহায়া-পনা হইয়া থাকে তবে সে বেহায়া আমি হইব। বেহায়া না হইয়া শুভবুদ্ধি হইতে হইলে এ অবস্থায় আমাকে কি করিতে হইবে?—আমি গভীর হইয়া নিজ কক্ষে অবস্থান করিব, কাহারও সহিত কথা বলিব না, মা আসিয়া সময়ে মাওয়া থাওয়ার জন্ত অহুরোধ উপরোধ করিলে কটুকথা কহিয়া তাঁহার মনে বাধা দিয়া আমার উচ্চাঙ্গের অহুশোচনা প্রকাশ করিব। যেন মাইই সম্পূর্ণ দোষ। ছোট ভাই-বোনের। আমাকে রহস্তময় কিছু মনে করিয়া মাঝে মাঝে দরজার কাছে চোখ লাগাইবে এবং নিজেদের মধ্যে আমার সন্দেহে নিম্ন স্বরে বলাবলি করিবে। এই সকল অবস্থার সৃষ্টি করিয়া লাভ হইবে—অহুস্থতার অশ্রুতি এবং নিদ্রার মাত্রার উৎকর্ষ। নিজে ত হাসিবই না, আবার আমার সাহচর্যে আর দশজন যাহারা আসে তাহাদেরও হাসি নষ্ট করিব। ইহা ঠিক যে সে স্কাটকেন্স আর ফিরিয়া আসিবে না,—অহুশোচনার বাহ্যিক প্রদর্শনও না, হাসিলেও না। যখন হাসি-কান্না উভয়ই সমান, তখন হাসিটুকুর লাভ হইতে বঞ্চিত হই কেন?

সে হাসির মূলে যদি ফাঁকা বিচার-অসহ অদৃষ্টের দোহাই থাকে, থাকুক না। মনকে প্রভারণা করিয়াও যদি মনের শাস্তি আনয়ন করিতে পারি, তবে অবশ্যই সে প্রভারণাকে গ্রহণ করিব। কেননা, সংসারে মনের শাস্তি সব চাইতে বড় লাভ। কিছুদিন পূর্বে একবার অরে ভূগিয়া-ছিলাম। প্রথম দুইদিন দিন শরীরের অস্বস্থতার কথা বাবার নিকট গোপন করিয়া নিজেই সাবধান হইয়াছিলাম। পরে প্রকাশ হইলে, বাবা ঐ গোপন করার জন্ত আমার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বুঝিলেন না, ঐ প্রভারণাটুকুর জন্ত তিনি দুই রাত্রি অনিদ্রার হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। অথচ ঐ প্রভারণার জন্ত তাঁহাকেও কোন ক্ষতি সহ্য করিতে হয় নাই। নিঃশেষ প্রভারণা হইতে যদি লাভ পাওয়া যায় তবে সে প্রভারণা অভিনন্দ্য নয় কি?

বেকার যুবক সারাদিন চাকুরীর খোজে কাটাওয়া চিন্তা-বিস্রত মনে জ-কৃষ্ণিত বদনে বাড়ী কিরিয়া আসিলে তাহার মা যখন তাহাকে সামান্য আহাৰ্য্য দিয়া আশ্বাসের স্বরে বলিলেন,—“ভাবনার কি আছে? জীব দিয়েছেন যিনি, আহাৰ দেবেন তিনি”—তখন ছেলেটির বুকটা জুড়াইয়া গেল, সে রাত্রিতে আরামে ঘুমাইল। যুবক হ্রস্ত শেষ পর্যন্ত চাকুরী পাইল না; কিন্তু হেস্ত-মেস্ত হইবার পূর্বেকার একটা দিনেরও যে মনের শাস্তি তাই কি তার জীবনে কম লাভ? সংসারে অশান্তির অভাব নাই, শাস্তির সুযোগই বড় কম। তাই প্রভারণা-মূলকই হউক, আর সত্য-মূলকই হউক, যেটুকু শাস্তির সুযোগ আমাদের সামনে আসিবে আমরা সেটুকুকে প্রাণ ভরিয়া ভোগ করিয়া লইব। এই মানসিক প্রভারণার সার্থকতা Ibsen তাঁর “The Wild Duck”-নাটকে অতি সুস্পষ্টরূপে দেখাইয়াছেন। নাটক Hjalmar Ekdal যে পত্নীপ্রেম ও পুত্রপ্রেমের সুধাপানে স্বর্গীয় স্থখ-শান্তিতে কালান্তিপাত করিতেছিল

তাহার মূলে ত রহিয়াছে তথাকথিত অসত্য। তথাপি এ ছুনিয়ার কে তাহার সেই অমৃতময় পারিবারিক জীবনের স্থখ কামনা না করে? যখনই বন্ধু Gregers আসিয়া সত্য ও আদর্শের খোঁচা লাগাইল, তখনই Ekdal এর সে স্বপ্নের নীড় ভাঙিয়া চুরিয়া একাকার হইয়া গেল।

সত্যই মনোরাজ্যে যদি প্রভারণার স্থান না থাকিত তবে মানব-জীবন ক্লিস্ম হইয়া উঠিত। মাছুষ যা চায় তার কতটুকু সে পায়? প্রথম যৌবনের যে উদ্দাম আশা ও আকাঙ্ক্ষা আমাদের প্রত্যেকের ভিতর আকুলি বিকুলি করিতে থাকে তাহার কয়টি আমাদের কয়জনার জীবনে চরিতার্থ হয়? তবু প্রভারণামূলক অদৃষ্টের দোহাই আছে বলিয়াই ত আমাদের অনেকখানি কষ্টের লাঘব হইয়াছে।

আজ আমি কতখানি হান্ধা!—বৃকের উপর হইতে ভারী পাথরটা নামিয়া গিয়াছে, মস্তিষ্কের ভিতরকার বৈদ্রাতিক প্রবাহগুলি বাবার ঐ একটি কথাতেই ‘সুইচ অফ’ হইয়া গিয়াছে। আজ আমি গতকল্য অপেক্ষা বেশী করিয়া খাইব, ভাল করিয়া ঘুমাইব; গতকল্য এক বন্ধু আমার খোঁজে আসিয়া, অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া, আমাকে না পাইয়া চলিয়া গিয়াছে। আজ এই এখনই মুখহাত ধুইয়াই সটান তাহার কাছে চলিয়া যাইব,—যাইয়া গলা জুড়াইয়া ধরিব। মনে হইতেছে, বাবার ঐ কথাটি পরম আশীর্বাদরূপে আমার উপর বসিত হইয়াছে।

শ্রীঅমলেন্দু বাগচী

নারী

নিম্নের লেখাটি বিজ্ঞাপন নহে। এখানি জনৈক বন্ধুর ডায়েরি। ইহা পড়িয়া মনে হয় তিনি নিজেই একটি সমগ্রায় পড়িয়াছিলেন। কিন্তু সমগ্রটির নায়ক কে তাহা একমাত্র ভগবান জানেন—আমরা যেটুকু বুঝি তাহাতে মনে হয় জীবন সার্থক করিবার পূর্বে পুরুষের দিক হইতে যে কয়েকটি দার্শনিক তত্ত্ব মনে উদ্ভূত হয় ইহা তাহাদেরই অঙ্গতম। এইভাবে সমগ্রটিকে বেধিতে পারিলে উহার মীমাংসাও যে সহজ হইয়া আসে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। জীবনে এরূপ সমগ্র আসে এবং নানাঞ্জে তাহার নানাভাবে সমাধান করে। ডায়েরি-লেখক কি ভাবে ইহার সমাধান করিয়াছেন বা করিবেন তাহা এখনও জানা যায় নাই। আশা করি তাহার পরবর্ত্তী ডায়েরিও আমাদের হস্তগত হইবে। হুতরাং তথু এই অংশটুকু দেখিয়া আমি নিজে কোনও সিদ্ধান্ত করিব না। ডায়েরির দ্বিতীয় অংশ যথাসময়ে আমি প্রকাশ করিব—এবিষয়ে আপনাদের নিশ্চিন্ত থাকিবেন। ইতি—

—লেখক।

১০ই আশ্বিন, ১৩৩৭—

মাটির রূপ কখনও একরকম থাকে না। বর্ষায় যখন বান আসে তখন নদীর ছই কূল ভেসে যায়। পাড়ের মাটি ভেঙে নদীর আকৃতিও মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বদলাতে থাকে। ভরা বানের পর পাশের মাঠে পলি পড়ে, ভূমিকে উর্বরা ক'রে দেয়, দরবীও ক্রমে শস্ত-শ্রামল হ'য়ে ওঠে।

আমাদের জীবনও ত' এমনই। এক একবার জীবনের উপর দিয়ে যে বহা ব'য়ে গেছে, আমাদের যা কিছু সম্পদ, যা কিছু সমৃদ্ধি সব ত'

শনিবারের চিঠি

৭৮৫

তা' থেকেই লাভ করি। বহুরাজ্যধারাকে মাটি যেমন নিজের সম্পত্তি বলে ভাবতে পারে না, তেমনই হয়ত ঝাঁরাই আমাদের জীবনকে এক এক সময়ে ভ'রে দিয়ে গেছেন, তাঁদেরও আমরা ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে ভাবতে পারি না। কিন্তু মাটি খুঁড়লেই যেমন জল পাওয়া যায়, তেমনই তাঁদের সকলের দেওয়া রসে আমাদের অন্তঃস্থল সিক্ত হ'য়ে আছে। আমাদের জীবনের বাধা ও পরিশ্রমের মধ্যে যে ফসল জন্মায় তা' ত' অন্তরের ঐ রসের দ্বারা পুষ্ট হয়েছে।

নরনারীর মধ্যে যে সখ্যতা' আমার কাছে এমনভাবে মাটি ও জলের সম্পর্কের মত মনে হয়।

কিন্তু সময়ে সময়ে মনে হয়, এমনভাবে পাওয়া কি স্বার্থপরতা নয়?

আবার মনে হয়, তা' হয়ত নয়। কেননা আকাশের বারিধারার সঙ্গে আমাদের সখ্যতা কোথায়? সে যখন নদীর জল হ'য়ে মাটির বুকের উপর প্রাবনের স্বজন করে তখনই তার সার্থকতা। নদীর জলকে পাড়ের বন্ধনের মধ্যে ফেলে মাটিই ত' রূপ দেয়, আকার দেয়। নয়ত তার গভীরতা কোথায় থাকতো?

তেমনি ক'রে, মাঘষের সমস্ত দেহকে সিক্ত ক'রে, অন্তরকে প্রাবিত ক'রে যে রসধারা ব'য়ে যায়, তাকে শ্রামল ও সরস করে রাখে, সেই ত' নারীর প্রকৃত রূপ।

৪ঠা ভাদ্র, ১৩৪১—

অন্তরের জীবনে সহচরী হবার জগা কোনও নারীকে স্বীকৃতি প্রদান করা একান্ত ভুল বলে মনে হয়। কেননা শেষ পর্যন্ত একা চলা ছাড়া গতি নাই। সাহায্যের যে মূল্য নাই তা' নয়। কিন্তু ওপথে অগ্রের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলা যায় না। বিজন পথে আমি একাকী

চলেও আরও অগ্রাঙ্গ লোক যে আমারই মত একাকী চলেছে, এই সংবাদটুকুর বড় দরকার হয়। অপরের চেহারা দেখতে না পেলেও তাদের পাখের শব্দ শুনেই যথেষ্ট হয়। সেইটুকুর কিস্ত দরকার আছে, তাতে মনে বল পাওয়া যায়, উৎসাহ বাড়ে।

জীৱপে কোনও নারী অন্তরলোকের যাত্রাপথে বেশীদূর সাহচর্য ক'রতে পারেন ব'লে মনে হয় না। তিনি নিজের জীবন নিয়ে থাকবেন, আমরা নিজের জীবন নিয়ে থাকবো, এমনই একটা বন্দোবস্ত ভাল। জুজনেরই জীবনে নীচের দিকে, মাটির কাছে, সাহচর্যের দরকার হ'তে পারে। কিন্তু যতই তারা উপরে আকাশের দিকে উঠবে, ততই তাদের একাকী আরও স্পষ্ট, এবং হয়ত আরও রুট হ'য়ে উঠবে।

যারা নিজের জীবনকে হাতের মুঠার মধ্যে নিয়ে ভেঙে ভেঙে গড়তে পারেন, তাদের যদি মাটির উপর কোনও বন্ধন না থাকে, তাহলে বিপদের সম্ভাবনা আছে। নিজের সঙ্কল্পে যারা নিষ্ঠুর, তারা ক্রমে জগতের সাধারণ মানুষের প্রতিও নিষ্ঠুর হয়ে যান। তাদের আলস্য, অবসাদ দেখলে অত্যন্ত অধীর হ'য়ে ওঠেন। তখন বিপদ হয়, পথিকের মনে মানুষের প্রতি যে মমতা, যে প্রেম থাকে, তা' ঐ ক্রোধের আগুনে শুকিয়ে যায়। তখন তারা মানুষ না থেকে শুধু একটি ভাবের দাস হ'য়ে যান। আকাশে কাছয যেমন ভাবে উড়ে বেড়ায়, তাদের অবস্থা তেমনই হয়। বায়ুমণ্ডলের যে-কোনও চেউ তাকে ইতস্ততঃ নিয়ে যেতে পারে। মাটির মানুষ তার উজ্জগতি দেখে আশ্চর্য্যে চেয়ে থাকে, কিন্তু তাদের জীবনের সঙ্গে সেই ভাসমান কাছযের বিদ্যুৎ যোগ থাকে না।

তাই আমরা মাটির সঙ্গে নিজের সঙ্কল্প বিচ্ছিন্ন ক'রতে

চাই না। কোনও নারীর প্রেমের মধ্য দিয়ে আমাদের মাটির যোগকে অক্ষুর রাখতে হয়।

নারীর প্রেম, জীবনপথে তার সাহচর্য্য, সংসারের নিত্য প্রয়োজনীয় কণ্ঠের মধ্যে তার ঘনিষ্ঠতা, মাটির সঙ্গে আমাদের সঙ্কল্পকে অটুট রাখে। হয়ত অন্তরের রাজ্যে এতে বহু উজ্জ্বল ওঠায় বিপত্তি ঘটে, হয়ত উপরের শেষ গতির লোভ মাটির প্রতি মমতায় আমাদের ছেড়ে দিতে হয়।

কিন্তু অনেকের জীবনে এত উজ্জগতি, এত নিঃশেষ সাধনার প্রয়োজনও ত' নাই।

এমনই একজন মানুষের সঙ্গে সম্প্রতি সাক্ষাৎ হয়েছে। তাঁর শুধু প্রয়োজন এমন একজন নারীর যিনি তাঁকে মাটির উপরে ধরে রাখবেন, সেখানে আশ্রয় দেবেন, মাটির রস যার মধ্যে দিয়ে তাঁর জীবনে সঞ্চারিত হবে। এমন একজন নারীর সংস্পর্শের প্রয়োজন আছে যিনি স্বার্থহীন ভাবে তাঁকে ভালবাসতে পারবেন, আমরা এই নূতন বন্ধুটির জীবনকে বর্ধমান বৃক্ষের মত সম্বীত ক'রে তুলবেন। হয়ত একদিন ফলে-পুষ্পে শোভিত হ'য়ে সেই বৃক্ষ সংসারের দশজনের মধ্যে আনন্দ বিতরণ করবেন।

এমনও মানুষ দেখেছি যারা বেছায় উজ্জ্বল বিকাশকে পরিহার করেছেন। শুধু যে নিজের উজ্জ্বল গতিকে গচ্ছিত করেছেন তা' নয়, বরং বটবৃক্ষের মত ভালপালা মেলে, তা' থেকে বার বার মাটির দিকে নূতন শিকড় বিস্তার ক'রে মাটির সঙ্গে তাদের বন্ধনকে আরও নিবিড়, আরও বিস্তৃত ক'রতে চেয়েছেন। আবার এমন কেহ কেহ আছেন যারা উজ্জগামী শালবৃক্ষের মত। মাটির সঙ্গে একটিমাত্র স্পর্শ রেখে, উপরে উপরে, আরও উপরে, কেবল নিজেকে বিস্তীর্ণ হ

ক'রতে চান। ঘন অরণ্যানীর সকল বৃক্ষের সাহচর্য্য পরিহার ক'রতে নীল আকাশের নিমন্ত্রণে তারই দিকে বাহ বিস্তীর্ণ ক'রে দেন।

কিন্তু আমার এই নূতন বন্ধুটি বটবৃক্ষের মতও নয়, শালের মতও নয়। উভয়ের মধ্যে যে অক্ষুণ্ণ শক্তি ও বিপুল বীৰ্য্য আছে, তাঁর মধ্যে তা' নাই। তিনি বহুদিন আকাশমার্গে বন্ধনহীন অবস্থায় ভেসে বেড়িয়েছেন। অনভ্যস্ত পরিশ্রমে তাঁর পাখা ক্লান্ত হ'য়ে গেছে। কিন্তু এখন মাটির আশ্রয় গ্রহণ করতে চান, অরণ্যানীর মধ্যে নবজীবন লাভ ক'রতে চান। বহুজনকে আশ্রয় দেবার ক্ষমতা তাঁর নাই। সে আকাঙ্ক্ষাও তাঁর নাই। তিনি শিউলি গাছের মত নূতন একটি রূপে জন্মান্তর লাভ করতে চান, যে বৃক্ষের ছায়া বেশী নয়, কিন্তু পুষ্পের সম্ভারে যে বনতলকে শোভাযিত করে এইটুকু হওয়াই তাঁর আকাঙ্ক্ষা।

যদি কোনও নারীর কল্যাণ স্পর্শে, প্রেমের সিকনে আমার নবলঙ্কা বন্ধুর জীবন এমনিভাবে নবরূপ লাভ করে, তবেই তিনি সার্থক হতে পারবেন।

নাতি-আধুনিক সাহিত্য

উপন্যাস ও গল্প

অজয়

ইহা ১৩৩৬ সালে প্রকাশিত। এই উপন্যাসখানি অজয় নামক একটি ব্যক্তির শৈশব হইতে যৌবন পর্য্যন্ত ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি-কাহিনী। বইখানি প্রকাশের পরে আজ ছয়-সাত বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, লেখকের জীবন-দৃষ্টিতে ও লিপি-কৌশলে অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে, অনেক উন্নতি হইয়াছে, তৎসত্ত্বেও গ্রন্থখানির মূল্য কিছুমাত্র কম মনে করি না।

অজয় একাধারে কবি ও বিদ্রোহী। কবিতা সে লেখে বটে, কিন্তু কবিতা না লিখিলেও তাহাকে কবি বলিতাম, কারণ কবির দৃষ্টি তাহার স্বাভাবিক। গুলি-মারা বিদ্রোহী নয়, তাহার অপেক্ষা বড় ধরণের সে বিদ্রোহী। বর্তমান জীবনতন্ত্রকে সে মানিয়া লইতে রাজি নয়, সকলের চেয়ে বড় বিদ্রোহের মূল এইখানে। বর্তমান জীবন-তন্ত্রকে সে মানিয়া লইতে রাজি নয়, বর্তমানের ব্যবস্থাকে সে ডিঙাইয়া বাইতে সচেষ্ট, কিন্তু বর্তমানকে এড়ানো তত সহজ নয়। বর্তমানের সঙ্গে ঈশ্বরের ইতিহাসই এই উপন্যাস।

এই উপন্যাসে চারিটি নারী-চরিত্র আছে, ডেজি, ডলি, রেগু, বিমলা। কিন্তু আর একটি নারী আছে চরিত্ররূপে নয়, চিত্ররূপে। মোনালিসার বিখ্যাত ছবি। সমস্ত গল্পটির পটভূমি এই ছবিবন্ধিনী। এই ছবিখানি বাল্যকালে সে পাইয়াছিল; তারপরে বয়স বাড়িবার

সঙ্গে সঙ্গে ইহা তাহাকে অহসরণ করিয়া দেশের বাড়ী হইতে কলিকাতায় মামার বাড়ী পর্য্যন্ত আসিয়াছে। অজ্ঞয়ের মধ্যে নিকটের শৃঙ্খল কাটিয়া দূরে যাইবার যে নেশা আছে তাহার অন্তরায় ওই রহস্যময় মোনালিসার হাসি। সে-হাসি আলোয়ার মত মুগ্ধ পথিককে দূরের দিকেই টানে বটে, কিন্তু দূরে যাইতে দেয় না, একই স্থানে ঘুরাইয়া মারে। অজ্ঞয়ের দৃষ্ণ কোন মাছুষের সঙ্গে নয়, চিরন্তন ওই আইডীয়ার চার সঙ্গে। ডেজি, ডলি, রেণু, বিমলা, ওই আইডীয়ার মূখপাত্র মাত্র।

গ্রন্থের এই নারী-চরিত্র কয়টি অদ্ভুতভাবে প্রত্যক্ষ, অর্থাৎ কিয়ৎ-পরিমাণে রহস্যময়। পুরুষের চরিত্রের মধ্যে ইউক্লিডের ছোঁচ আছে, তাহার মধ্যে যুক্তির অবতারণা এত বেশি যে সেখানে রহস্যের অবসর বড় নাই।

কিন্তু প্রকৃত নারী-চরিত্র বিধাতার গোখুলি-কালের সৃষ্টি। তার মধ্যে খানিকটা প্রকাশ খানিকটা অন্ধকার। আর্টিস্টের সার্থক সৃষ্টির মধ্যে বিধাতার এই গুণ কিয়ৎ পরিমাণে আছে। শ্রেষ্ঠ নারী-চরিত্র কিয়ৎ পরিমাণে অহমানের বিষয়। সুন্দরন্দিনী, স্বর্ষামুখী, রোহিণী, জমর, বিনোদিনী, কমলা, ললিতা, স্তচরিতা, তারাশঙ্করের রাইকরল এবং সজ্জনীকান্তের ডেজি, ডলি, রেণু, বিমলা, মগোজ।

ডেজি, ডলি, রেণু, বিমলা যে কি জন্ম কি করিতেছে তাহা আমরা সব সময়ে বুঝিতে পারি না। কারণ বুদ্ধির আলোকে সংস্কারের ক্রিয়া-কলাপ সব সময়ে ধরা পড়ে না। নারী-চরিত্রে বুদ্ধি অপেক্ষা সংস্কার প্রবল, এবং এ বিষয়ে তাহারা আদিম মানবের এবং মানবের প্রাণীর নিকটতর আত্মীয়। ভারবিনের আগে ক্রয়েড জন্মগ্রহণ করিলে তিনি এই শূন্য নীতিকে অহসরণ করিয়া অভিব্যক্তিবাদ প্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেন।

ডলি যে কেন নিজের চুল ডেজির বলিয়া চালাইয়া দিল, কেন অজ্ঞয়ের কবিতার পাতা দগ্ধ করিল; রেণু যে কেন হাওড়া স্টেশন অবধি আসিয়া ফিরিয়া গেল এবং বিমলা যে মোনালিসার ছবিখানি খুলিয়া লইল তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা হয় না, কারণ বলা যায় না। লেখক নিজেই জ্ঞানেন না, আমাদের বলিবেন কেমন করিয়া! এইখানে সৃষ্ট-চরিত্র স্রষ্টাকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। এমনই হইয়া থাকে। আমি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারি না যে ভগবান, তিনি যত সর্ব-শক্তিমানই হউন না কেন, মাছুষকে সম্পূর্ণরূপেই বুঝিয়া উঠিতে পারেন।

অজ্ঞয় ডেজিকে, ডলিকে, রেণুকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। বিমলাকে লইয়া সে ঘর করিতেছে, কিন্তু বিবাহ করে নাই। ঘর করিতেছে বলিলেও ভুল হয়, তাহাকে লইয়া সে যাত্রা করিয়াছে। সে যাত্রার শেষ এ গ্রন্থে নাই, বোধ হয় জীবনও নাই। সে যাত্রা রহস্যর জীবনের দিকে, কথা তাহাকে মুক্তিও বলা যাইতে পারে।

এইখানেই গ্রন্থের সমাপ্তি। কিন্তু আলোচ্য গল্পটি একটি স্ববৃহৎ গল্পের অংশ মাত্র। লেখক যদি কখনো এ কাহিনী শেষ করেন, তবেই সম্পূর্ণ ভাবে ইহা আলোচনা করিবার মত হইবে।

অজ্ঞয়ের অন্তর্লোক এই কাহিনীর ক্ষেত্র। বাহিরের ঘটনা বড় কিছু নাই। যাহা আছে তাহা ছিন্নবিচ্ছিন্ন ঘটনার টুকরা, নিভৃত পুকুর পাড়ে জনাবালী ও পরী, বিক্ষিপ্ত পাখীর পালক, এই ধরণের। লেখকের কৃতিত্ব এইখানে যে তিনি ইহা হইতে বহির্জগৎকে যত বেশি সম্ভব বাদ দিয়া স্বল্পতম ঘটনায় আনিয়া ফেলিয়াছেন। তাহার উপাদান অজ্ঞয়ের মনস্তত্ত্ব। বাহিরের ঘটনা ততটুকু মাত্র আবশ্যক, যতটুকু না হইলে অজ্ঞয়ের হৃদয়তন্ত্রীতে সুর স্পন্দিত হয় না। একবার যেই সুর

বাজিয়া উঠিল, অমনি লেখকের কাছে আর জগতের প্রয়োজন নাই, তখন তিনি কেবল সেই স্বপ্নের সারথা স্বীকার করিয়া স্বপ্ন রচনায় বাস্তব।

ইহা গতাহগতিক মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস নহে। মনস্তত্ত্ব ছাড়া ইহাতে আর কিছুই নাই। ইহা মনোজগতের উপন্যাস। একবার এই মনোজগতের স্রোতে নামিয়া পড়িলে বহিজ্জগতের মূল্য একেবারে কমিয়া যায়, কিছুক্ষণের জ্ঞান পাঠক বহিজ্জগতকে তুলিয়া দ্বিগুণে বাধা হয়।

এই গ্রন্থের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য—ইহার ঘটনাস্রোতের জড়িত। কাহিনী কোথাও ধামিয়া নাই—ভাব হইতে ভাবান্তরে বন্ধুর তুলিয়া ধাবমান। এই স্রোত এখনো স্বরণ্য মাত্র, তাই তাহার গতিটাই সর্বস্ব, কিত ভবিষ্যতে যখন এই কাহিনী নদীর বিস্তৃতি ও গভীরতা প্রাপ্ত হইবে, আশা করা যায়, তখন ইহার জড়িত ও মন্দ হইয়া আসিবে।

লেখকের ষ্টাইলটি এই জড়তির সঙ্গে বেশ পাপ খাইয়াছে। দীর্ঘ বাক্য, জটিল বাক্য, সমাসবহুল স্থূল পদ বেশি নাই। সব ছোটখাটো বাক্য, অনেক সময় অত্যন্ত নেড়া বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এমন না হইলে গল্পের জড়িতে বিষয় ঘটিত। এবং জড়িতে বিষয় ঘটিলে প্রকাশ্য ব্যাপারেও বাধা হইত। ছোটখাটো চাছাছোলা বাক্যগুলি একস্মিক তীরের মত গল্পের গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে।

গ্রন্থে কয়েকটি কবিতা আছে। সেগুলি অজয়ের লেখা। কবিতাগুলি গ্রন্থের একটি প্রধান ঐশ্বর্য্য। শুধু ঐশ্বর্য্য নয়, গ্রন্থের অঙ্গ। এগুলি বাদ দিলে গ্রন্থ অঙ্গহীন হইত।

বনমন্দির

বিকৃতিবাবু, তারশঙ্করবাবু ও মনোজবাবুর গল্পের উপাদান অনেকটা এক জাতিক, সংক্ষেপে বলা চলে ইহা পল্লীগ্রামের জীবন। কিন্তু এইটুকুতেই মিল; লিপিকৌশল ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যেকের স্বতন্ত্র।

বিকৃতিবাবুর ষ্ঠৌক শৈশব ও কৈশোরের প্রতি; দৃষ্টির দার্শনিকতা তাঁহার বৈশিষ্ট্য। মনোজবাবু বিশেষভাবে পল্লীর দাম্পত্যজীবনকেই যেন অঙ্কিত করিতে চাহেন; তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গি রোমান্টিক। তারশঙ্করবাবুর বিষয় বারান্তরে আলোচনা করিব।

মনোজ বহুর বনমন্দির নয়টি গল্পের সমষ্টি। প্রথম গল্পটি বনমন্দির, ইহারই নামে গ্রন্থের নামকরণ। গ্রন্থখানি ১৩৩২ সালে প্রকাশিত।

আমাদের দাম্পত্যজীবন পৃথিবীর অস্বাভাবিক জাতির দাম্পত্যজীবন হইতে একটু বিশিষ্ট। ইহাতে বিবাহচ্ছেদ নাই, বিধবা-বিবাহ নাই, এমনকি পূর্বরাগ পর্যন্ত নাই। সেইজন্য একদল লোক ইহাকে অত্যন্ত মামুলী ও অ-রোমান্টিক বলিয়া মনে করেন। কিন্তু একটু ভাবিলেই দেখা যাইবে, এই জাতীয় বিবাহ-ই জগতে সর্বাপেক্ষা রোমান্টিক।

ইউরোপীয় বিবাহে রোমান্স নাই, রোমান্সের অবসান আছে। পূর্বরাগের রোমান্সের পঞ্চম রাগ অকস্মাৎ বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ হইয়া পঞ্চম প্রাপ্ত হয়। রোমান্সের অপসৃত্যুতে স্বামী-স্ত্রীর মনে যে হঠাৎ আঘাত সম্ভাবনীয়, তাহা হইতে বাঁচাইবার একটা পন্থা রাখিবার জ্ঞান ইউরোপীয় বিবাহে ডাইডোমের ব্যবস্থা আছে। বাঙালী-বিবাহের পূর্বে রোমান্স নাই, কিন্তু ছুটি সম্পূর্ণ অপরিচিত নরনারী হঠাৎ মিলিত হইয়া পরস্পরকে আবিষ্কার করিতে করিতে জীবনযাত্রা আরম্ভ করে, ইহাতে যে-রোমান্স তাহা ইংরেজি ৬ পেনি সংস্করণের রোমান্সের চেয়ে গভীরতর ও সত্য। বাঙালী পরিবার একাল্পবর্তী ও পদ্ধতিবদ্ধ হওয়াতে নববিবাহিত স্বামী-স্ত্রী ক্রমে ক্রমে পরস্পরকে চিনিতে বাধা হয়; তাহাতেই পরিচয়ের রস রহস্যময় হইয়া উঠিতে থাকে।

বাঙালী দাম্পত্যজীবনের মধ্যে যে এই গুপ্ত রোমান্সের রস আছে তাহা আবিষ্কারের কৃতিত্ব মনোজবাবুর। যে বাঙালী-জীবনকে

আমরা ঘরকুণো ভাবিয়া রূপা করিয়া আসিয়াছি তাহার মধ্যে এমন রোমান্স ছিল তাহা কে ভাবিত! অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের উপজ্ঞানে বিবাহিত জীবনের মধ্যেও প্রচুর রোমান্সের রস দৃষ্ট হয়। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের গল্পের পরিবেশ বর্তমান বাড়লা দেশ নয়; তখনকার বাড়লার সঙ্গে আজিকার বাড়লার অনেক অনেক; বিশেষ করিয়া রোমান্স সৃষ্টি করিবার জ্ঞানই উপজ্ঞানের পরিবেশ উপযুক্ত দেশ-কালে তিনি রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু মনোজবাবুর কথা স্বতন্ত্র। তিনি যেন স্বর্ণলতা গল্পের সংসারের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া এমন একটি রুদ্ধ জানালা আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছেন, যাহার পর্দা সরাইতে স্বপ্নের বনের মর্ম্মর কানে আসিয়া পৌছিল। মোলিয়ায়ের হঠাৎ-নবাব যেমন বলিয়া উঠিয়াছিল—চল্লিশ বছর ধরিয়া গল্প বলিতেছি আর গল্প কি তাই জানিতাম না! আমরা যে এত রোমান্টিক মনোজবাবু তাহা স্বরণ করাইয়া দিয়া আমাদের রুতজতাভাজন হইয়াছেন।

দাম্পত্যজীবনের রোমান্স নানাভাবে তাহার গ্রন্থে অঙ্কিত হইয়াছে।

বনমন্ডর গল্পের বিপত্নীক ডেপুটী রাজারামের গড়ের তদন্ত করিতে আসিয়া একটি বিশ্বয়কর সত্য, স্বপ্নও বলিতে পারি, কারণ রোমান্সে সত্য ও স্বপ্নে প্রভেদ নাই, আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছেন। শঙ্করবাবুর বিপত্নীক জীবনের প্রতিচ্ছবি রাজারামের গড়ের কাহিনীর মধ্যে প্রতি-বিস্তৃত। গড়ের বহু পূর্বেকার মালিক জানকীরাম ও মালতীমালার প্রণয় ও পরবর্ত্তী জীবনের বিচ্ছেদের কাহিনীতে ডেপুটীবাবু নিজের জীবনের ট্রাজেডিই যেন দেখিতে পাইলেন। বাস্তবিক পক্ষে লেখক কৌশলে এই কথাই বলিতে চাহিয়াছেন যে মালতীমালা জানকীরামের ট্রাজেডি, শঙ্কর স্বধারাগীরই ট্রাজেডি। সেইজন্মই এই দুঃখ প্রণয়ীযুগলকে

অতিক্রম করিয়া সার্বজনীন হইয়া উঠিয়াছে। শব্দর দিনের বেলায় গড়ে ডেপুটী হিসাবে ঢুকিয়াছিল, কেবল ভয়সুপ দেখিয়াছে। রাত্রে সে যখন পত্নীবিধুর স্বামীরূপে ঢুকিয়াছে, তখন গড়ের রহস্য তাহার কাছে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছিল বলিয়া সেদিন যেখানে জানকীরাম ভয়জাহ্ন হইয়া পড়িয়াছিল শব্দরও ঠিক সেখানটিতে অশ্ব হইতে পড়িয়া গিয়াছে।

দুই বিগত যুগের দুই ঘটনা ও পরিবেশকে এমন কৌশলে যোজন্য করিতে স্কুদিত পাষণ গল্পের পরে আর কাহাকেও দেখি নাই।

রাজা গল্পে দেখি কিরণ ও ব্রহ্মীর অতৃপ্ত দাম্পত্যজীবনের চিত্র লেখকের করণ তুলিতে অশ্রসঙ্গল হইয়া উঠিয়াছে। ইহা বেকার বিবাহিত জীবনের হইলে হইতে পারিত দাম্পত্য চিত্র।

আমাদের দাম্পত্যজীবনের মধ্যে একটা করণ অংশ এই যে অতি অল্প বয়সে বালিকা বাপ মা ভাই বোনকে ছাড়িয়া স্বামীর ঘর করিতে যায়। অশ্বখামার দিদিতে তাহারই চিত্র। উমা বড় ঘরের বধূ হইয়াছে, একদিন যাত্রায় এক ছোকরাকে অশ্বখামা সাজিতে দেখিয়া হঠাৎ ছোট পেটুক ভাইটিকে তাহার মনে পড়িয়া গেল।

ফাটবুক ও চিত্রাপদ্ম কাহিনীতে প্রৌঢ় ইন্দুল মাষ্টারের স্মৃতির রোমান্স। পত্নী তাহার বাড়ীতে, সে বিদেশে, এই দূরত্বের আকাশ রঞ্জিত করিয়া কৈশোরের স্মৃতির ইন্দ্রধনু। সে একটা অজ্ঞাত বালিকাকে দামী চিত্রাপদ্ম গ্রন্থ উপহার দিয়া ফেলিয়াছিল। আজ অভাবের দিনে, প্রৌঢ় বয়সে হঠাৎ সেই স্মৃতি। তবু তাহা ক্ষণিকের ইন্দ্রধনু মাত্র; শাস্ত জ্যোতিষ্ক তাহার দূরস্থা পত্নী।

প্রেতিনী গল্পে হরিচরণ দোজবর, প্রভা দ্বিতীয় পক্ষের বধূ। উভয়ের আলাপের বিষয় প্রথম পক্ষের বধূ। ইহাও আমাদের বিবাহিত জীবনের

একটা বৈশিষ্ট্য। বধু মরিলে স্বামী দ্বিতীয়বার বিবাহ করে, এবং তাহার সঙ্গে এমন ভাবে ব্যবহার করে যেন সে-ই প্রথম। বধু আনন্দ পায় যে স্বামী পূর্ব পত্নীকে ভুলিয়াছে, কিন্তু লেখক মনে করাইয়া দিয়াছেন, যে সে মরিলেও ঠিক আবার এমনি ঘটবে। তৃতীয় পক্ষের প্রেমের তলায় তাহার স্মৃতি নিঃশেষে চাপা পড়িয়া যাইবে। লেখক গল্পের শেষে বলিয়াছেন, যে বধু মরে না, সে চিরন্তন বধুবেশে শ্মশানঘাটে স্বামীর প্রেমের জগ্ন অপেক্ষা করিয়া থাকে।

উপসংহার গল্পে দাম্পত্য জীবনের আর এক ট্রাজিডি। কাতুর মত মেয়ে নবগোপালকে ভালবাসিয়া বসে, কিন্তু সে কথা কেহ জানিতেও পারে না। আর জানিলেই বা কি? সে তাদের লোহার কারবার জমাইয়া তুলিবার দাদন হিসাবে দোজবর অবিনাশচন্দ্র দত্ত বাবাজীউর সংসার উজ্জল করিতে বাধ্য হন।

পিছনের হাত জানিতে গিরিজাবাবুর হঠাৎ মনে পড়িয়া যায় মনোরমাকে। যাহার সঙ্গে তাঁহার বিবাহের কথা হইয়াছিল, বর্তমানের সংসার তখন ভুজ্জ হইয়া সেই অভূত স্মৃতিটা বড় হইয়া পাড়ায়, কিন্তু যখন মনোরমার স্বামী চাকুরীপ্রার্থী হইয়া ঘারে আসিয়া পাড়ায় তখন আবার বর্তমানেরই জয় হয়, তাহাকে সংক্ষেপে বিদায় করিতে হয়।

মনোজবাবুর ভাষা অতি মধুর। গল্পকে পদের সঙ্গে তুলনা করিলে বলিতে ইচ্ছা করে তাঁহার ভাষা লিরিক। বর্ণনা ও ভাষার নমুনা এমন ভাবে দেওয়া চলে না, যেমন ভাবে চলে লেখকের বক্তব্য বিষয়কে ও গল্পের তরকে।

মানবের প্রতি কুকুর

১

লাবুল কাটিয়াছ—ছাটিয়াছ কর্ণ,

কণ্ঠ বেড়িয়া দেছ শিকলিও শক্ত,

অমাত্য করিলেই কথা এক বর্ণ

চাবুকের চোটে হায় ছুটায়েছ রক্ত।

জঙ্গলে আছিলাম—মোরা অতি বয়,

সভ্যতা শিখিয়াছি তোমাদের জয়,

কৈউ কৈউ হবে কহি 'ধন্য গো ধন্য,'

বেঁড়ে লাজ নেড়ে নেড়ে আছি প্রভুভক্ত।

অমাত্য করিলেই কথা এক বর্ণ

চাবুকের চোটে জানি ছুটাইবে রক্ত।

অনাহারে রাথ নাই, এক বেলা খেতে পাই—

হাড়কাটা মাঝে মাঝে দাও ভগ্নাংশ;

সামান্য কুকুরের এর বেশী কিবা চাই—

হাডুতে লেগেও থাকে মাঝে মাঝে মাংস।

২

'কেনেলের' এক কোণে দেখি বসে স্বপ্ন

কণ্ঠিত লাবুল করি উৎকণ্ঠ,

কবে তুমি ডাক দেবে ভাবি হয়ে মগ্ন,

শিশু দিয়ে করিবে গো কৃতার্থ বিত্ত।

ওগো প্রভু তব গৌরব রক্ষার্থে
রেসেতে ছুটিব কবে—বাঁচাইব আর্থে,
কার টুটি ছিঁড়ে তব রক্ষিব স্বার্থে,

তাহারি স্বপ্ন দেখি বসে বসে নিত্য।
কেনেলের এক কোণে দেখি বসে স্বপ্ন
কণ্ঠিত লালদুল করি উৎকণ্ঠ।

‘বাঘা’, ‘ভূতো’, ‘টম’, ‘বুহ’ বল মোরে যাহা চাপে,
সাথে করে লয়ে যাও সাগরে বা শূন্যে,
কখনো বা কোলে কর—কভু পিঠ চাপড়াও,
সোহাগের মধু খায় কল্লনা-ভূঙ্গে।

৩

বন্দুকধারী তুমি মার পশু-পক্ষী—
মুখে করে তুলে এনে দিই পদপ্রান্তে,
সিন্দুক তব টাকা আমি তার রক্ষী,
বরফের দেশে আছি ‘প্লেজ’ তব টানতে।
কখনও মেডেল দাও—কভু ছাপো চিত্র,
গুণ গাও মোরা অতি বিখ্যাত মিত্র,
কিন্তু কি পোড়া মন হায় রে বিচিত্র—

সাধ যায় রাত্তিরে লুকিয়ে যে কাঁদতে।
সিন্দুক তব টাকা আমি তার রক্ষী,
বরফের দেশে আছি ‘প্লেজ’ তব টানতে।

ক্ষেপে যাই মাঝে মাঝে কামড়াই মনিবেও—
ভূক্ষায় ছাতি ফাটে—তবু জ্বলাতন,
কবিকের পাগলামি! শেষ হয়ে যায় সে-ও
একটি গুলিতে লভি ধরণীর অক্ষ।

“বনফুল”

দড়ি

পথে বাহির হইলেই আমি দড়ি খুঁজি। (পাঠক ভয় করিবেন না, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মধ্যে দড়ির সহিত এককলসী করণ রসের অবতারণার ইচ্ছা আমার নাই।) আমি সেই দড়ি খুঁজি দোকানের কোণে বা অগ্নিশিখা সংযোগে দোঁয়াইতে থাকে। কবি হইলে বলিতাম দড়ির উগায় ছোট একটি আক্ষিমের ফুল বাঁধা; হাস্যরসিক হইলে বলিতাম, লঙ্কাদহনকারী হনুমানের জলন্ত পুচ্ছাগ্র। কিন্তু এসব কিছুই বলিব না, আমি কবিও নই, রসিকও নই, আমি—তাত্ত্বিক-বিলাসী।

শীতের ছপূর বেলা তপ্ত রৌদ্র যখন কলিকাতায় ইট-কাঠের উপরে তাতরসির প্রলেপ বুলাইয়া দেয়, তখন পথের মোড়ে দড়ি হইতে চুফট জ্বলাইতে যে কি আরাম তা বোধহয় কেবল আমিই জানি। আমাকে যদি কখনও বিধাতা অভীষ্ট বর দান করিতে চান তবে বলিতে চাই, হে বিধাতা, আমাকে মারেন্দোর মত যুদ্ধ জয় করিবার সৌভাগ্য দাও। হিন্দুর বিধাতা ইউরোপের ইতিহাস না জানিতেও পারেন, কাজেই বলিব, মেঘদূতের যক্ষ যেমন বলিয়াছিল, হে মেঘ, তোমার যেন কখনও বিদ্যাবিযোগ না ঘটে, তেমনি প্রভু আমার যেন কখনো বিপণি-বিলপিত নিয়মণী অগ্নিশিখার অভাব না হয় এবং যেন নব নব চুফটের ধূমে প্রতাহ হৈমদূত সৃষ্টি করিতে পারি।

পথের পাশের এই সায়িক রজ্জুই নবীন যুগের মিলনক্ষেত্র। শৃষ্টানের জেজ্ঞাষাণ্ড ও হিন্দুর বারাবারীর চেয়েও এই ক্ষেত্র উদার, জাতিধর্ম এবং সময় সময় বয়স নিক্সিশেষে। আমি চুফটটি ধরাইয়া

দড়িটি তুলিয়া দিলাম একজন মুঠের হাতে এবং তার ধরান হইলেই হয়তো তার মাথায় তুলিয়া দিলাম আমায় মোটটি। কিন্তু দোষ কি? যে-পরিচ্ছদের প্রভাবে (কিবা অভাবে) কেউ রাজা—কেউ ভিখারী, সর্বগ্রাসী আগুন কি তাকে গ্রাস করে!

আমার বন্ধু জি. কে. সি. দুঃখ করিয়া বলেন, প্রভুরা যখন ভৃত্যকে মারিত সে সভামুণ এখন চলিয়া গিয়াছে। তাঁর মতে, যার গায়ে হাত তোলা যায় সে এক হিসাবে নিজের সমকক্ষ। আজকালকার প্রভুরা ভৃত্যের চেয়ে নিজেরদের এতই বড় মনে করে যে তাঁর গায়ে হাত তুলিতেও লজ্জিত। সমপদস্থ ব্যক্তিদের মধ্যেই কেবল দ্বন্দ্বযুদ্ধ সম্ভব।

এই দড়ির আগুনে যখন ভূপ্রলোকে চুর্কট ও গরীবকে বিড়ি ধরাইতে দেখি তখন মনে হয়, অদৃষ্টের এ একটা নূতনতর বাদ্য। এতদিন ধনী-দরিদ্রের মধ্যে সশ্রদ্ধ ছিল হয় অগ্নির নয় রজ্জুর; এখন দেখিতেছি, অগ্নিযুক্ত রজ্জুর। এমনি ধারাই হয়; শত্রুতা বিপথগামী মিত্রতা; আলিঙ্গন ও কুত্তির মধ্যে অন্তত আকৃতির সাদৃশ্য আছে। ধনী ও দরিদ্র, সমাজের দুই প্রান্ত বলিয়াই ঘুরিয়া আসিয়া মিশিতে পারে। কিন্তু মধ্যবিত্তের পক্ষে তা সম্ভব নয়। এই মধ্যবিত্তের প্রতীক সিগারেট। কেহ কখনো সিগারেট দড়ির আগুনে ধরাইয়াছে? আর যদিই বা ধরায় তা নিতান্ত অভাবে পড়িয়া!

অতএব ধনী ও দরিদ্রের যে প্রভেদকে আজ আমরা ছুতার বলিয়া মনে করিতেছি তা তত ভয়ের নয় যেমন ভীষণ মধ্যবর্তীদের জ্বয়হীন দূরত্ব। ইহারা বস্তুত এতই ছোট যে ক্ষণকালের জন্ত ছোটর অভিনয় করিতেও ভয় পায়। কাজ কি, ইহারা দেশলাই দিয়া সিগারেট ধরাক, আমার কিন্তু ভাল এই দড়ির আগুনে চুর্কট-ধরানো। এখানে অন্তত কিছুক্ষণের জন্তও তো একবার ধনী-দরিদ্রে হাতে হাতে ধরিতে পায়। তুমি বলিবে তাহা মিলনের অভিনয় মাত্র। কিন্তু কেমন করিয়া জানিলে ব্যক্তি অংশই অভিনয় নয়, আর এইটাই সত্য; জীবনব্যাপী বৃহৎ মিথ্যায় হয়তো এইটাই কণিক নেপথ্যের সত্য। এ অনল যে চিত্তানলের সগোত্র।

অভিসার

এসো	পরীর মত	লঘু	পদক্ষেপে
	ভীক	রাজি-বেলা :	
যবে	যাত্রীবৃক-	চলা-	ক্লাস্তি নামে
সারা	ধরিব্রোতে	নিদ্-	শান্তি নামে,
	যবে	প্রাণের মাঝে	
	মহা	মোনী রাজে,	
যবে	দিবসের	ক্রন্দন	যায় না শোনা
যেন	রাজির	স্পন্দন	যাচ্ছে গোনা ;
যবে	আকাশ রাগী	যায়	মিলন-পথে
	বেয়ে	জ্যোৎস্না-ভেলা—	
এসো	পরীর মত	লঘু	পদক্ষেপে
	দেই	রাজি বেলা।	

২

যবে	নীলিমার	মোনতা	পাচ্ছে বাগী
	কোটি	তারার মুখে,	
যবে	শিথ স্বপন	আসে	জ্যোৎস্না কয়ে,
আর	গন্ধ মদির	হয়	পুষ্পচয়ে,
	যবে	মালতী সাথে	
	বন-	মল্লী মাতে,	

আর গন্ধরাক্ষণ ফুটে
মুহু মলয় আবেশে কাপে
যবে হৃদয় বিধুর হয়
নিশা মিলন স্থখে ;
যবে নীলিমার মোনতা
কোট তারার মখে ;

সেই শুক রাতে তুমি
ওগো স্বপ্নময়ী,
মোর ক্লান্ত চোখে তুমি
মোর শান্ত বুকে তুমি
ভয় নেইকো প্রিয়া,
ভীক শকা নিয়া
কেন মুহুমুহু তুমি
প্রিয় বন্ধুজনে কর
ধর তদীতহু, পর'
লীলা রাজিঙ্গয়ী ;
এসো শুক রাতে মোর
ওগো স্বপ্নময়ী ।

তুমি ৪
বলবে মোরে মহা
বাজে কিসের ব্যাখা,

আপন মনে,
কুঁড়ির বনে,
সঙ্গোপনে
পাছে বাণী

আসতে পার
নামতে পার,
ধামতে পার ;

হচ্ছ ভীত,
সঙ্গ-প্রীত ;
নীলাধরী

স্বপ্ন নীড়ে

বিশ্লোকে

সারা রাজি ভরি' ওই
কোন লুপ্ত গীতি খুঁজে
গৃঢ় অর্থ তারি
আধো বুঝতে পারি,
তাই তারার ভাষা মোরে
আমি থাকতে নারি দেহ-
মোর হৃদয় মনে জাগে
কি যে চঞ্চলতা ;
তুমি বলতে পার সারা
এতো কিসের ব্যাখা ।

৫
মহা বিশ্ব-নভে কেগো
বাধা ঐক্য তানে ?
সারা সৃষ্টিখানি কার
যুরে শূন্য পথে গ্রহ-
কোন প্রেমিক প্রাণে
এই সৃষ্টি টানে,
কোন লক্ষে গিয়ে তারে
কোন দৃষ্টি দিয়ে তারে
সেই আকর্ষণ বল
জাগে আমার প্রাণে ?
মহা বিশ্ব-নভে কেগো
বাধা ঐক্য তানে ?

তারার দলে
শূন্য তলে ;
পাগল করে,
বাধন 'পরে ;
তৃপ্তি হারা
বিশ্ববুকে

ছন্দোলীনা
আকর্ষণে
তারার সনে ;
পৌছতে হবে ?
খুঁজতে হবে,
কেমন করে'

ছন্দোলীনা

৬

এই ধরিজীও যুরে
সে কি লক্ষ্যাহারা ?
তার বক্ষে বাজে শত
তার চক্ষে যুরে কোটি
ধরা কেমন করে'
বল সে স্বর ধরে ?
তার কবির বৃকে দাও
তার কাব্যে রাখ তব
বল ফুটি চলে যার
নিয়ে চন্দ্র তারা,
এই ধরিজীও চলে
নহে লক্ষ্যাহারা ।

তাহার টানে,—

লক্ষ বাণ,
অন্ধ ধাঁধা ;

বিধু-বাণী,
স্পর্শখানি ;
আকর্ষণে

তাহার পানে ;

৭

ওগো স্বপরাণী, চির-
এসো কবির প্রাণে,
এসো শুদ্ধ রাতে তার
চির স্বন্দরে এসো নিয়ে
প্রেম-মদলা গো
জাগো ছন্দে জাগো ।
চির-আকাশ হতে নব
রাখো ধরার নীড়ে তার

স্বর্গ হতে

মানস-লোকে
স্বপন চোখে

বার্তা আনি
স্বপ্নখানি,

ভবি- তব্যাতারে গাথি' কাব্য হারে
কর পূর্ণ তব প্রেম- মঙ্গ দানে ;
এসো স্বপরাণী চির স্বর্গ হতে
এসো কবির প্রাণে ।

—“কলেজ বয়”

ডিটেকটিব দ্বিতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্য

অনন্তর অফিস । বেলা আন্দাজ দশটা । অনন্ত একাকী পরিকল্পনা করিতেছে ।

অনন্ত । আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই মেয়েটাই মহামায়া । নইলে জুতো
থুললে না কেন ? ভেতরে একটা গভীর যড়যন্ত্র আছে । এ
রহস্য উন্মোচন করিতেই হবে । আর সেই মেয়েটি ! কি স্বন্দর
ছট্ট মিভরা মুখ ! কি মিষ্টি হাসি ! পরিচয় জানা হ'ল না ।
সঙ্গে যে দৈত্য ছিল, ভাল করে কথা কইবারই ফুরসৎ দিলে না ।
নাঃ—পরিচয় খুঁজে বার করতে হবে । আমি একজন ডিটেকটিব,
সামান্য একটা ঠিকানা বার করতে পারব না ? আলবৎ
পারব ।

বলাইয়ের প্রবেশ

বলাই । আজ্ঞে তিনি এসেছেন ।

অনন্ত। তিনি! তিনি কে?

বলাই। আজ্ঞে কালকের সেই তোংলা তিনি।

অনন্ত। তোংলা তিনি! ও,—সেই? সেই মহাদেব?

[বলাই সবগে ঘাড় নাড়িল] কি সর্বনাশ! কি

কি চায় শুওটা?

বলাই। তা ত বোঁ বোঁ: শব্দে কিছু বললে না। আমাকে দেখেই চিনেছে। গৌফ নেই দেখে কটমট করে তাকিয়ে বললে, তোমার গৌফ কৈ? আমি বললুম মাঠাকরুণদের সন্দেহ হয়েছিল তাই কামিয়ে ফেলেছি।

অনন্ত। তবে কি বুঝেছে নাকি? বলাই, তুমি বলে দাও আমি বাড়ী নেই কিবা খুম্জি কিবা মারা গেছি—যাহোক একটা বলে তাকে তাড়াও।

বলাই। যে আজ্ঞা—

প্রস্থানোচ্চত

অনন্ত। কিব্ব—লোকটার কাছে সেই মেয়েটির খবর পাওয়া যেত। দেখাই থাক না। যদি চিনে থাকে তাতেই বা কি? বলাই, তাকে ভেঁকে নিয়ে এস।

বলাই। [ইতস্তত করিয়া] আজ্ঞে বোঁ বোঁ: শব্দে—

অনন্ত। হ্যা—তাকে বোঁ বোঁ: শব্দে এখানে হাঙ্গির কর।

বলাই প্রস্থান করিল

লোকটা হয়ত সেই মেয়েটির কোনও আত্মীয়। হয়ত ভাই! ভাই? না—ভায়ের মত চেহারা ত নয়। তাকে কি—?

সমরেশ প্রবেশ করিল

সমরেশ। নুনমস্থার।

অনন্ত। নুনমস্থার—আস্থান।

সমরেশ। আপনি যে ভিভিভিটেকটিব তা কাল বলেননি কেন?

বসিল

অনন্ত। অল্পক্ষণের 'আলাপ' তাই দরকার মনে করিনি। আপনিও ত নিজের পরিচয় দেননি।

সমরেশ। হঁ। আমিও দৃঢ়দরকার মনে করিনি।

অনন্ত। আপনি বোধ হয় সেই মহিলাটির ভাই—না?

সমরেশ। ককোনো মহিলার আমি ভাই নই। ঠ—দের মধ্যে একজন

আমার—থাকগে আমি আপনার কাছে ককাজে এনেছি।

আপনি 'অনন্ত চন্দ্রশা' ডিটেকটিব ত?

অনন্ত। হ্যা।

সমরেশ। তত্বেহলে শুধুন। আমি কাল দুটি মহিলাকে নিয়ে লেলে-লেকের ধারে বেড়াতে গিয়েছিলুম। একটা লোক—শালা বদমায়েস—একটি মহিলার জুতো খুলে নিতে চেয়েছিল। তাকে আমি চাই। আপনি থুঁজে বার করতে পারবেন?

অনন্ত। [চিন্তা করিতে করিতে] তাহলে যে মহিলাটি একলা ছিলেন—অর্থাৎ ঝাঁর জুতো খুলে নেবার চেষ্টা হয়েছিল—তিনিই আপনার—ই?য়ে?

সমরেশ। সুসেখবরে আপনার দরকার কি?

অনন্ত। না না, আমি অমনি জিজ্ঞাসা করছিলুম। ডিটেকটিবদের সব জানা দরকার ত। আর অল্প মহিলাটি—যিনি ফিরোজা রঙের শাড়ী পরেছিলেন—?

সমরেশ। দেখুন, মহিলাদের কথা আপনাকে শশোনাবার জন্তে আসিনি। আমি সেই ব্যারারাসকেলটাকে চাই। আপনি তাকে খুঁজে বার করতে পারবেন কি না স্পষ্ট করে বলুন।

অনন্ত। [গম্ভীর ভাবে] দেখুন মিঃ—

সমরেশ। ননাগ। সমরেশ নাগ।

অনন্ত। দেখুন মিঃ নাগ, এই জুতো চুরিচুরির মত সামান্য ব্যাপার আমি হাতে নিই না—

সমরেশ। [উঠিয়া পাড়াইয়া] স্যামান্য ব্যাপার! একটি মহিলাকে অপমান সামান্য ব্যাপার! আপনি কি রকম ভক্তলোক?

অনন্ত। আচ্ছা, মনে করুন তাকে আমি খুঁজে বার করলাম কিন্তু তাকে নিয়ে আর আপনি করবেন কি?

সমরেশ। কতী করব? প্রথমে তার নুনাকে একটি ঘুমি মেরে নাক ধেবড়ে দেব; তারপর তার পুপেটে একটি ললাষি মারব। তারপর চুল ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে ধ্বনায় নিয়ে যাব।

অনন্ত। [দৃঢ়স্বরে] এসব নৃশংস ব্যাপারে আমি নেই। মাফ করবেন, আমি আপনার কাজ করতে পারব না।

সমরেশ। পপারবে না?

অনন্ত। না।

সমরেশ। তত্বে তুমি কচু ভিটেকটিব। তুমি কনোইবল!

অনন্ত। দেখুন, অপমান করবেন না। আপনি ভাবছেন আপনার গায়ে জোর আছে—

সমরেশ। তুমি চটোকিদার!

ফুডভাবে গহন

অনন্ত। [কিছুক্ষণ পাদচারপূর্বক প্রকৃতিস্থ হইয়া] এর মধ্যে একটা গভীর রহস্য রয়েছে। ঐ তোংলাটা হচ্ছে পালের গোদা। নৈলে মেয়েদের পরিচয় দিলে না কেন? [হাস্য] কি বুদ্ধি! আমারই কাছে এসেছে আমার সন্ধান বার করবার জন্তে! কিন্তু—অন্ত কোনও মংলব নেই ত! [চিন্তা] ওঃ—এতক্ষণে বুকেছি! ঐ তোংলাটা হচ্ছে পাকা জোচ্চোর; আর ঐ মেয়েটা মহামায়া! মহামায়াকে ও বিয়ে করতে চায়, জগদীশ-বাবুর জমিদারীটা হাতাবার ফন্দি! উঃ! কি ভীষণ যড়যন্ত্র! কিন্তু আমার কাছে এসেছিল কেন? নিশ্চয় জানতে পেরেছে যে আমি মহামায়ার খোজ করতে বেরিয়েছি, তাই হলুক-সন্ধান নিতে এসেছিল।—কিন্তু মহামায়ার ঠিকানা ত জানা হলো না; তোংলা শয়তানটা ওদিক দিয়েই গেল না!—সেই মেয়েটির সন্ধানও যদি পেতুম—

বলাই প্রবেশ করিল

বলাই। আজ্ঞে তিনি এসেছেন।

অনন্ত। আবার এসেছে!

বলাই। আজ্ঞে তিনি ন'ন? তাঁর সঙ্গে যে ছুটি মা-ঠাকরুণ ছিলেন তাঁদেরই একটি।

অনন্ত। কোনটি?

বলাই। আজ্ঞে দুটির বেশ মিষ্টি মিষ্টি হাসি—তিনিই। বললেন, চাকরির জন্তে এসেছেন।

অনন্ত। অ্যা! তাই নাকি!—যাও এখন নিয়ে এস।

বলাইয়ের প্রস্থান

একি আশ্চর্য্য ব্যাপার! সেই মেয়েটি এসেছে চাকরির জন্তে! কিন্তু—

এর মধ্যে তোংলার কারসাজি নেই ত? যাহোক, সাবধান হওয়া দরকার।

গম্ভীরভাবে উপবেশন করিয়া কাগজপত্র নাড়িতে লাগিলেন

কেয়া প্রবেশ করিল

কেয়া। নমস্কার!—একি!

অনন্তকে দেখিয়া বিম্বিত

অনন্ত। নমস্কার! বহন—

কাগজপত্র বেখিতে বাণ্ড

কেয়া। আপনিই কি ডিটেকটিব অনন্ত চৌধুরী?

অনন্ত। হ্যাঁ। [কাগজপত্র ভুলিয়া গিয়া] আপনার নামটি কি?

কেয়া। আমার নাম—কেয়া মিত্র। মাক করবেন। কিন্তু আপনিই কি কাল—

অনন্ত। লেকের দারে। ঠিক দরেছেন। কাল আপনাদের সঙ্গে দেখা হবার পরই আপনারা হঠাৎ চলে গেলেন, ভাল করে আলাপ করা হল না—[সামলাইয়া লইয়া] হ্যাঁ—আমি বড় ব্যস্ত। আপনার কি দরকার, সেটা—

কেয়া। আপনি বিজ্ঞাপন দিচ্ছেছিলেন একজন সেক্রেটারি চাই—
তাই—

অনন্ত। ও—ঠিক কথা। মনেই ছিলনা। তা—আপনি কি সেক্রেটারির কাজ করতে চান?

কেয়া। যদি আপনি যোগ্য মনে করেন।

অনন্ত। যোগ্য! বলেন কি? আপনার মত সেক্রেটারি পাওয়া ত—
[সামলাইয়া] অর্থাৎ, বেশ আপনি যখন কাজ করতে চান তখন আমার আপত্তি নেই। থাকুন। কাজ বিশেষ কিছু শক্ত নয়—বেলা দশটা থেকে—

কেয়া। তবে কি আমাকে বাহাল করলেন?

অনন্ত। হ্যাঁ। নিশ্চয়—যদি আপনার আপত্তি না থাকে—

কেয়া। [হাসিয়া] আপত্তি থাকলে আমি আসব কেন? কিন্তু আমার qualification সম্বন্ধে কিছুই ত জিজ্ঞাসা করলেন না!

অনন্ত। [তাড়াতাড়ি] সেটা এখন জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলুম।

[গম্ভীরভাবে] আপনি—লেখাপড়া জানেন?

কেয়া। জানি কিছু কিছু। আই এ পাস করেছে।

অনন্ত। বলেন কি? এত অল্প বয়সে? আপনার ত দেখছি অসাধারণ মেধা!

সম্মতভাবে চাহিয়া চাহিল

কেয়া। [হেঁট মূখে] মেধা আর কি এমন বেশী!

অনন্ত। বেশী নয়! আপনার বয়সে আমি ত ম্যাট্রিক-ক্লাসে রগড়াচ্ছিলুম—[সামলাইয়া] কি কথা হচ্ছিল! হ্যাঁ—আপনি তাহলে লেখাপড়া জানেন। আচ্ছা—[মাথা চুলকাইয়া] শেলাই, রাঙ্গাবাদা জানা আছে ত? গনি গাইতে—

কেয়া। [সবিস্ময়ে] কিন্তু আপনার অফিসে কাজ করতে হলে কি এসব qualification গুলোর দরকার?

অনন্ত। না না। মানে আমি ডিটেকটিব, সব খবর নেওয়া চাই ত। তাহলে আপনি—?

কেয়া। শটহাণ্ড টাইপরাইটিং জানি।

অনন্ত। [কিছুক্ষণ স্তম্ভিত থাকিয়া] আপনি—আপনি ত তাহলে বড় আশ্চর্য্য মেয়ে। আপনাকে যতই দেখছি ততই আমার আকর্ষণ শুড়ুম হয়ে যাচ্ছে। আপনি একটি ক্ষণজন্মা মহিলা!

বলাই। [দ্বারপথে গলা বাড়াইয়া] এক পাল দিশি-বিলাতী মা-
ঠাকরুণরা বৌ বৌ: শব্দে এসে হাজির হয়েছেন।

অনন্ত। তাদের বৌ বৌ: শব্দে বলে দাও যে সেক্রেটারি পাওয়া
গেছে—আর দরকার নেই।

বলাই। যে আজ—

মুও টানিয়া লইল

অনন্ত। হ্যাঁ কি কথা হচ্ছিল। আপনি তাহলে আজ থেকে সেক্রেটারি
নিযুক্ত হলেন। আপনার মাইনেটা অবশ্য—সেটা আমি বিবেচনা
করে পরে আপনাকে জানাব।

কেয়া। মাইনে যাট টাকা—বিজ্ঞাপনেই ত লেখা আছে।

অনন্ত। যাট টাকা! অসম্ভব! যা হোক, ওসব বাজে কথা থাক,—
আপনি বৃষ্টি প্রায়ই লেকের ধারে বেড়াতে যান?

কেয়া। না। কাল সমরেশবাবু আমাকে আর আমার একটি বন্ধুকে
নিয়ে গিয়েছিলেন।

অনন্ত। ও—তা সমরেশবাবু আপনার কে?

কেয়া। কেউ নয়—বন্ধু! আমায় কি কাজ করতে হবে তা বৃষ্টিয়ে
দিলে ভাল হত না?

অনন্ত। কাজ! কাজ কিছুই নয়, ছ' একটা চিঠি টাইপ করা—
এই আর কি। আজ্ঞা, কিছু মনে করবেন না, আপনি
হিন্দু ত?

কেয়া। আমরা ব্রাহ্ম।

অনন্ত। [একটু নীরব থাকিয়া] আমি হিন্দু। কিন্তু হিন্দু আর
ব্রাহ্মতে যে কি তফাৎ তা এখনো বুঝে উঠতে পারলুম না।

কেয়া। আমিও না।

উত্তরের হাত

বলাই। [গলা বাড়াইয়া] ছজুর, সন্ধ্যাইকে বৌ বৌ: শব্দে তাড়িয়েছি।
অনন্ত। বেশ।—এখন বাইরে পাহারা দাও আবার কেউ না আসে।

বলাই অদৃশ হইল

কেয়া। আজ তাহলে উঠি, কাল থেকে কাজে যোগ দেব।

অনন্ত। উঠবেন? তা—আজ্ঞা। কাল নিশ্চয় আসবেন ত?

কেয়া। আসব বৈকি। ঠিক দশটার সময় আসব।

অনন্ত। না না, যদি কষ্ট হয়, অত তাড়াতাড়ি আসবার দরকার নেই।
এগারোটা বারোটা যখন সুবিধে হবে আসবেন।

কেয়া। সে কি কথা! ঠিক সময়েই আসব। কষ্টবো কষ্ট করব
কেন? [উঠিয়া] আজ চললুম—নমস্কার।

অনন্ত। নমস্কার। নিতান্তই যাচ্ছেন তাহলে?

কেয়া। হ্যাঁ—আজ আসি।

গহান

অনন্ত। কি সুন্দর মেয়ে! কি চমৎকার কথা। আমাদের দেশে
এরকম মেয়ে জন্মায় আমি জানতুমই না।—কিন্তু ঐ তোংলাটার
সঙ্গে মেলানোশা করে কেন? ব্রাহ্মদের ঐ দোষ—যার তার
সঙ্গে মেয়েদের—। বন্ধু! পূজ্যমহাশয়ের সঙ্গে এত বন্ধুত্ব
কেন?—বলাই! বলাই!

বলাই। [প্রবেশ করিয়া] আজ বৌ বৌ: শব্দে মহামায়ার সন্ধান
পেলেন?

অনন্ত। মহামায়ার সন্ধান! যা:—কথাটা মনেই ছিল না। আজ্ঞা,
পরে হবে এখন। বলাই, ঘরটা কি বিশ্রী হয়ে আছে দেখছ?
ভাল করে সাজিয়ে গুছিয়ে ফেল। আর বাজার থেকে কিছু
ফুলের তোড়া নিয়ে এস। অর্থাৎ নতুন সেক্রেটারির যাতে

ভাল লাগে তার ব্যবস্থা করতে হবে।—[টাইপিষ্টের চেয়ার টিপিয়া] চেয়ারটা শক্ত; একটা গদিমোড়া চেয়ার আনবে, আর গোটা ছই মথমলের কুশন—বুকেছ?

বলাই। আজ্ঞে বোঁ বোঁ: শব্দে বুকেছি—

দ্বিতীয় দৃশ্য

বিরাজপুরে জগদীশবাবুর গৃহ। জগদীশবাবু একাকী

জগদীশ। মেয়েকে কি ফিরে পাব? এতদিন পরে—, অনন্ত বড় মুখ করে বলে গেছে তিনমাসের মধ্যে খুঁজে বার করবে। পারবে কি? অনন্ত ছেলেটি বড় ভাল। মহামায়া যদি থাকত তাহলে ওর সঙ্গেই ত এতদিন—, দাদার সঙ্গে কথা ত ঠিক হয়েই ছিল। কিন্তু নিয়তির খেলা—মহামায়া আমার কোথায় চলে গেল।—[কিছুক্ষণ নীরবে তামাক টানিলেন] অনন্ত কলকাতায় গিয়ে ত কোনও খবরই দিলে না। হয়ত দেবার মত খবর নেই তাই দেখনি। এদিকে একমাস হয়ে গেল। কি করি? মনটা বড় অস্থির হয়েছে। কলকাতায় একবার যাব? [চিন্তা] না, আপাতত অনন্তকে একটা চিঠি লিখি। তারপর না হয়—

কাগজ কলম টানিয়া চিঠি লিখিতে বসিলেন

তৃতীয় দৃশ্য

নলিনীর বসিবার কক্ষ। বেলা আশ্বেজ সাড়ে নটা। কেয়া ও নলিনী রহিয়াছে।
নলিনী। এতদিন চাকরি করছিস। তোর ডিটেকটিব মনিবের কথা একবারও বলিস না কেন?

কেয়া। কি বলব? বলবার কিছু নেই।
নলিনী। *তবু—বয়স কত হবে?
কেয়া। হবে পঞ্চাশ-ষাট।
নলিনী। সত্যি? দেখতে কেমন?
কেয়া। ছুতের মতন।
নলিনী। ঠাট্টা করছিস!
কেয়া। বিশ্বাস না হয় একদিন গিয়ে দেখে আসিস।
নলিনী। আমার দরকার নেই। তুই যখন বদলি না, তখন আমি শুনতেও চাই না।

মুখ ফিরিয়া বসিল

কেয়া। অমনি রাগ হল? একটু ঠাট্টাও করব না! আচ্ছা, সত্যি কথা বলছি। বয়স চব্বিশ-পঁচিশ, দেখতে মন্দ নয়—সাধারণ ভদ্রলোকের মত। নাকটি বেশ টিকোলো—
নলিনী। [ফিরিয়া] তোর সঙ্গে কিরকম কথাবার্তা হয়?
কেয়া। কথাবার্তা হয় না। তিনিও কাজ করেন আমিও কাজ করি।
নলিনী। একেবারেই কথা হয় না?
কেয়া। একেবারেই না।
নলিনী। লোকটা বুদ্ধি গোমড়া-মুখো?
কেয়া। হঁ—ঠিক প্যাচার মত।
নলিনী। তুই কথা না কয়ে থাকতে পারিস?
কেয়া। কেন পারব না? আমি আজকাল গম্ভীর হয়েছি।
নলিনী। [কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া] সত্যি কেয়া, তুই আজকাল কেমন যেন বদলে গেছিস।
কেয়া। কেন বদলাব না? আজকাল কি আর ছেলেমানুষ আছি?

বড় হয়েছি চাকরি করছি, কত দায়িত্ব আমার যাড়ে! [নিজ মনে হাসিল] এখন তোর খবর কি? সমরেশবাবুর সঙ্গে ভালবাসা কতদূর?

নলিনী। ভালবাসা আবার কিসের?

কেয়া। তবে বুঝি প্রেম?—আজকাল তোদের মধ্যে কি হচ্ছে না হচ্ছে কিছুই জানতে পারি না। সারাদিন অফিসে থাকি, সমরেশবাবু কতদূর এঙলেন খবরই পেলুম না। তুই ত আর বলবি না।

নলিনী। বলবার কিছু নেই। প্রেম একটা মরীচিকা—পিপাসার্ত্ত নরনারী ছুটে যায় কিন্তু কাছে গিয়ে দেখে কিছুই নেই, ধু ধু বাসি—

কেয়া। তুই যদি ফিলজফি আরম্ভ করিস তাহলে আমি চললুম—

নলিনী। চলি? আচ্ছা কেয়া, তুই কখনও প্রেমে পড়িসনি? প্রেম কি রকম বলতে পারিস না?

কেয়া। না। চললুম, আমার অফিসের সময় হল।

প্রহান

নলিনী। কেয়া হঠাৎ অমনভাবে চলে গেল কেন? ওর কি একটা হয়েছে। সত্যিই প্রেমে পড়ল নাকি?—জানি না মাছুষ মাছুষকে ভালবাসে কেন! চেহারা দেখে কি ভালবাসা হয়? কথা শুনে কি ভালবাসা হয়? আমি সমরেশবাবুকে ভালবাসি না, কেয়া মিছিমিছি আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করে যে আমি ভালবাসি। কিন্তু—সমরেশবাবু কি আমাকে ভালবাসেন? বোধহয় বাসেন। সেদিন লেকের ধারে ঐ ব্যাপার হল—ওর

শনিবারের চিঠি

চেহারা দেখে আমারই ভয় করতে লাগল! উনি বোধহয় খুব রাগী—

চিঞ্জাময় অবস্থার ঈষৎ হাসিতে লাগিল

সমরেশ এবেশ করিল

সমরেশ। নুনমস্তার। এদিক দিয়ে যাচ্ছিলুম, ভাবলুম একবার দেখা করে যাই।

নলিনী। বহন।

সমরেশ। বৃষসব না—এখনি এক যায়গায় যেতে হবে। সেই লললোকটার খবর পাবার সম্ভাবনা আছে।

নলিনী। কোন লোকটার?

সমরেশ। সেই যে সপ্তদিন আপনাকে জুতো খুলতে বলেছিল। ততাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। তার ননাক যতক্ষণ না খাবড়া করে দিচ্ছি ততক্ষণ আমার প্রাণে শাস্তি নেই। চললুম—নমস্কার। আপনি সমসাদানে থাকবেন।

প্রহান

নলিনী। আশ্চর্য্য মাছুষ! ভালবাসা কি এইরকম হয়?—কিন্তু তোৎলা যে—

চতুর্থ দৃশ্য

অনন্তর অফিস। অনন্ত পরহস্তে বসিয়া আছে। বেলা আনাজ দশটা।

অনন্ত। নাঃ কর্ত্তব্যো বড় অবহেলা হচ্ছে। একদিন মহামায়ার কোনও খোজই নেওয়া হয়নি। জগদীশবাবু চিঠি লিখেছেন।—কি করা যায়! ঐ মেয়েটা যে মহামায়া তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু তবু

পাকা খবর পাওয়া যায় কি করে? মেয়েটা মিস্ মিজের বন্ধু; মিস্ মিজকে জিজ্ঞাসা করব, তাঁর বন্ধুর পায়ে লাল জড়ুল আছে কিনা? নাঃ—উনি হয়ত মনে করবেন আমি ঠাঁর বন্ধুর প্রতি—। কিন্তু মহামায়া লম্বা একটা কিছু করা দরকার। [মাথার চুলের মধ্যে আঙুল ঢালাইয়া] কি করি? আপাততঃ সাধারণ ভাবে মিস্ মিজের কাছে কিছু খবর সংগ্রহ করবার চেষ্টা করি। কিন্তু তিনি আজ এত দেরী করছেন কেন? [ঘড়ি দেখিয়া] দশটা বেজে পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে, কালও দু'মিনিট দেরী করছিলেন! ভারি অছায়া—দেরী করবেন কেন? অফিসের ডিসপিনিশনের বিকে একটু নজর নেই!

কেয়া প্রবেশ করিল

কেয়া। [হাসিমুখে] নমস্কার!

অনন্ত। [গম্ভীরমুখে] নমস্কার! পাঁচ মিনিট দেরী হয়েছে।

কেয়া। [নিজের হাত-ঘড়ি দেখিয়া] না—বরং তিন মিনিট আগে এসেছি। আপনার ঘড়ি ফাট।

অনন্ত। কথনো নয়। কৈ দেখি আপনার ঘড়ি।

কেয়া। [কাছে গিয়া] এই দেখুন।

অনন্ত কেয়ার হাত ধরিয়া কিয়ৎকাল একত্র দৃষ্টিতে ঘড়ি দেখিল; তার হাতের ঘড়ি কানের কাছে ধরিয়া রাখিল।

অনন্ত। তাই ত! আপনার ঘড়ি ত চলছে দেখছি।

কেয়া। হাত ছাড়ুন।

অনন্ত। [হাত ছাড়িয়া দিয়া] ওঃ—আপনার হাতটা যে ধরে আছি তা মনেই ছিল না। কি একটা ভাবছিলুম।

কেয়া। [নিজস্থানে গিয়া টাইপরাইটার ইত্যাদি থুলিতে থুলিতে] আপনি বড় ভাবেন! অত ভাবা কিন্তু ভাল নয়।

অনন্ত। না ভেবে উপায় কি! ডিটেকটিবদের সদা-সর্বদাই ভাবতে হয়।

কেয়া কাজ আরম্ভ করিল। অনন্ত মুদ্রভাবে সেইদিকে তাকাইয়া রহিল। দুই মিনিট কাটিয়া গেল।

অনন্ত। মিস্ মিজ!

কেয়া। [মুখ তুলিয়া] কি?

অনন্ত। আপনি ওটা কি ছাপছেন?

কেয়া। “ফুটবল রহস্য” কেসের রিপোর্ট তৈরী করছি।

অনন্ত। কোনটা?

কেয়া। ঐ যে যাতে হরিহর বসাক নামে একজন লোক ফুটবল মাঠ দেখতে গিয়েছিল, ভিড়ের মধ্যে তার পকেট থেকে ন'খানা তিন পয়সা চুরি যায়—সেই কেসটা।

অনন্ত। ও—মনে পড়েছে।

কেয়া আবার ছাপিয়া চলিল

অনন্ত। মিস্ মিজ!

কেয়া। কি বলছেন?

অনন্ত। আমার লাল-নীল পেন্সিলটা কোথায় গেল! কেউ কিছু দেখবে না—বড় মুশ্বিল হয়েছে।

কেয়া। [উঠিয়া গিয়া] এই ত সামনে লাল-নীল পেন্সিল রয়েছে। চোখে কি দেখতেও পান না?

অনন্ত। ও! [পেন্সিল তুলিয়া ধরিয়া] আরে এই ত লাল-নীল

পেন্সিল! কি ভুল দেখুন ত! চোখ দুটো অন্ধ দিকে ছিল কিনা তাই দেখতে পাইনি।

কেয়া। পেন্সিল যখন খুঁজবেন তখন টেবিলের দিকে তাকালেই পাবেন। কোথায় ছিল চোখ—কড়িকাঠের দিকে?

অনন্ত। না—অন্তমনশ্চ ভাবে আপনার ওই টাইপরাইটারের দিকে তাকিয়ে ছিলুম।

গল্পের মধ্যে কেয়া মিল আসনে গিয়া বসিল ও টাইপ করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ এই ভাবে কাটিল।

অনন্ত। মিস্ মিত্র!

কেয়া। আবার কি হল? আমাকে কি কাজ করতে দেবেন না?

অনন্ত। কি আশ্চর্য্য! কাজ আপনি করুন না। আমার মনে একটা প্রশ্ন উদয় হল, তাই—

কেয়া। কি প্রশ্ন উদয় হল?

অনন্ত। আচ্ছা সেদিন লেকের ধারে আপনার সঙ্গে আর একটা মহিলা ছিলেন না—তার নামটি কি?

কেয়া। তার নাম নলিনী।

অনন্ত। নলিনী? মহামায়া নয়?

কেয়া। [সবিস্ময়ে চাহিয়া] মহামায়া হতে যাবে কেন?

অনন্ত। না না, তার চেহারাটা ঠিক দুর্গাপ্রতিমার মত কিনা—তাই ভাবছিলুম হয়ত তার নাম মহামায়া! তিনি আপনার খুব বন্ধু—না?

কেয়া। [শুষ্কস্বরে] কেন বলুন দেখি?

অনন্ত। এমন সামান্য কৌতুহল আর কি!

কেয়া। ও—আমি ভেবেছিলুম তার দুর্গাপ্রতিমার মত চেহারা দেখে বৃদ্ধি তাকে ভুলতে পারছেন না।

অনন্ত। কি মুশিল! সে অজ্ঞে নয় মিস্ মিত্র।

কেয়া সবেগে টাইপ করিতে লাগিল

অনন্ত। [আবার কিছুক্ষণ পরে] মিস্ মিত্র!

কেয়া উঠিয়া গিয়া অনন্তর সম্মুখে বসিল

কেয়া। এবার বলুন। আপনার যত প্রশ্ন আছে সব শেষ করে নিন।

অনন্ত। আমি ভাবছিলুম,—আপনার সঙ্গে আমার কতদিন হল আলাপ হয়েছে?

কেয়া। [আঙুলে গুনিয়া] ঠিক এক মাস তিন দিন।

অনন্ত। তাই নাকি? ওঃ! ভাল কথা মনে পড়ল—আপনার মাইনেটা দেওয়া হয়নি।

দেওয়ান হইতে নোট বাহির করিয়া

এই নিন।

কেয়া। এখন রাখুন। যাবার সময় দেবেন।

অনন্ত। না না, এখনি নিয়ে রাখুন। আমার বড় ভুলো মন, হয়ত যাবার সময় মনে থাকবে না।

কেয়া। বেশ দিন। [নোট লইয়া] একি, কত দিলেন?

অনন্ত। তিনশ টাকা।

কেয়া। তিনশ টাকা! সে কি! মাইনে ত যাট টাকা!

অনন্ত। কে বললে? যাট টাকা! হুঁ—অসম্ভব।

কেয়া। কিন্তু বিজ্ঞাপনে যে যাট টাকা লেখা ছিল!

অনন্ত। ও ছাপার ভুল। খবরের কাগজে কি রকম ছাপার ভুল করে জানেন ত?

কেয়া। না মিঃ চৌধুরী, আমি ষাট টাকার বেশী নিতে পারব না।

অনন্ত। কি বিপদ! বলছি ছাপার ভুল।

কেয়া। ছাপার ভুল নয়, কেন মিছেকথা বলছেন? ষাট টাকার বেশী এক পয়সা নিলে আমি মনে শান্তি পাব না। এই নিন।

কতকগুলি নোট ফেরত দিল

অনন্ত। নেবেন না তাহলে?

কেয়া। না।

অনন্ত। নেবেন না?

কেয়া। না।

অনন্ত। বেশ, যা ইচ্ছে করুন। আমার অফিসে আমার লুকুম কেউ মানে না। বেশ ত, এই যদি আপনার ধর্ম হয়—করুন।

উদাস ভাবে টেবিলের উপর পা তুলিয়া দিল।

কেয়া নিজ স্থানে ফিরিয়া গিয়া কাজ করিতে লাগিল।

অনন্ত। [উর্দ্ধ দিকে চাহিয়া] পুরুষমাছের হাতে টাকা থাকলে নানান দুর্ভিক্ষি মাধায় আসে। হয়ত কোনদিন মদ খাবার ইচ্ছে হবে! হয়ত রেস খেলেই সর্বশ্ব উড়িয়ে দেব! সংযত করে রাখে এমন বন্ধু ত কেউ নেই।

কেয়া। [অশ্রুপূর্ণ চোখে] মিঃ চৌধুরী, আমাকে মাফ করুন, ও সব কথা বলবেন না। কিন্তু ষাট টাকার বেশী আমি কিছুতেই নিতে পারব না—তাহলে আমার আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগবে।

অনন্ত। না, তা করবার দরকার কি। আপনার আত্মমর্যাদায় যাতে আঘাত লাগে এমন কাজ আমি করতেই বা বলব কেন?

উদাস গম্ভীর মুখে ভিতরের দিকে এগুন করিল।

কেয়া। কি যে ঠর মনের ভাব কিছুই বুঝতে পারি না। এই দিবিয়া সহজ মাছ, হেসে কথা কইছেন—এই একেবারে রেগে টং! পুরুষমাছের মন পাওয়া ভার। কিন্তু মলিনীর সম্বন্ধে এত কৌতূহল কেন? সেই একবার আশ মিনিটের মধ্যে দেখেছিলেন, আর ভুলতে পারছেন না?—তা বেশ ত, তাই যদি হয় তাতে ক্ষতি কি? কিন্তু উনি হিন্দু, মলিনী ব্রাহ্ম; কি করে কি হবে? যাকগে, ও সব কথা ভেবে আমার লাভ কি? আমি নিজের কর্তব্য করে যাব; আর, জায়া মাইনের বেশী এক পয়সাও নিতে পারব না। উনি বড়-মাছ, সপ করে ডিটেকটিব সেজেছেন,—পয়সা বেশী থাকে অগ্র লোককে বিলিয়ে দিন, আমি নেব কেন?

কেয়া দৃঢ়ভাবে কাজ আরম্ভ করিল। ধীরে ধীরে অনন্ত আসিয়া

তাহার পিছনে ধাঁড়াইল।

অনন্ত। মিস্ মিত্র!

কেয়া। আজ্ঞে।

অনন্ত। আমাকে ক্ষমা করুন। আপনাকে বেশী টাকা দিতে যাওয়া আমার ধুটতা হয়েছে।

কেয়া। না, ধুটতা আর কি! আপনি ত ভাল ভেবেই—

অনন্ত। [কেয়ার স্বন্ধে হাত রাখিয়া] বলুন, আমায় ক্ষমা করলেন।

কেয়া। [উত্তিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়া কম্পিত স্বরে] বেশ, ক্ষমা করলুম।

অনন্ত। আপনি এখনো রাগ করে আছেন।

কেয়া। রাগ আমি করিনি মিঃ চৌধুরী।

অনন্ত। তবে হাসছেন না কেন?

কেহ। [অল্প হাসিয়া] এই ত হাসছি।

অনন্ত। [সাগ্রহে হাত বাড়াইয়া] আত্মন, ভাব করে ফেলুন—আর রাগারাগি নয়।

অনিষ্ট। সবকিছু কেহা হাসিয়া ফেলিল, তারপর হাত বাড়াইয়া অনন্তের গসারিত দুই হস্ত গ্রহণ করিল।

অনন্ত। চলুন—আজ একটা কিছু করা যাক। অফিসে আর ভাল লাগছে না।

কেহা। কি করবেন?

অনন্ত। চলুন, আজ ঈমারে করে বটানিকাল গার্ডেনে বেড়িয়ে আসা যাক।

কেহা। না না—সে যে বড় দেরী হবে।

অনন্ত। কিছু দেরী হবে না। আমি ঠিক চারটের সময় আপনাকে আপনার বাড়ীর দোরে পৌছে দেব। [কেহা তথাপি অনিশ্চিত]
যদি না যান, বুঝব আমাকে এখনো ক্ষমা করেননি।

কেহা। [ক্ষীণ কণ্ঠে] বেশ, চলুন।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কেহার শয়ন কক্ষ। শয়্যার পাশে গালে হাত দিয়া কেহা একাকিনী বসিয়া আছে। বেলা দশটা।

কেহা। কি করি আমি এখন! ঠুর মনের আসল কথাটি বুঝতে পারছি না, স্পষ্ট করে ত কিছু বলেনও না। এ অবস্থায় আমি কোন পথে চলব? কেন ছাই চাকরি করতে গেলুম! চাকরি ছেড়ে দেব? না—তা হয় না—মা তাহলে বিশ্রাম পাবেন না। [নেপথ্যে হিরণ্ময়ী। কেহা, খাবি আয়।]—যাই মা।—কি চান উনি? সত্যিই কি আমাকে?—না নলিনীকে? নলিনীর কথা মাঝে মাঝে আচমকা জিজ্ঞাসা করেন। [অধর দংশন করিয়া] ঠুর মনে কি আছে উনিই জানেন—কিন্তু এদিকে আমার যে মরণ হয়েছে! জানি, মাছুয়ে মাছুয়ে কোন তফাৎ নেই—ব্রাহ্ম হিন্দু সব এক, তবু—না আমি মনকে শক্ত করব। হি, এত চপল আমার মন! ঠুর সঙ্গে আর হেসে কথা কইব না; অফিসে সাধারণ কর্মচারীর মত কাজ করে যাব। উনি মনিব, আমি ঠুর অদীনে কাজ করি—এ ছাড়া আমাদের সম্বন্ধ কি?

হিরণ্ময়ী। [প্রবেশ করিয়া] হাঁরে আজ কি অফিস যাবি না? দশটা যে কখন বেজে গেছে!

কেহা। [উত্তিয়া] এই যে—যাই মা।

হিরণ্ময়ী। তোর আজকাল কি হয়েছে কেহা? ক'দিন থেকে দেবছি

মুখ শুকনো। কাজ কি ভাল লাগছে না? ভাল না লাগে ছেড়ে দে।

কেয়া। সে কি মা, কাজ ভাল লাগে বৈকি।

হিরণ্ময়ী। তবে? ইদানীং যোজাই প্রায় অফিস যেতে দেবী করিস। অফিস-মাটির হয়ত অশস্ত্র হয়।

কেয়া। হোক গে অশস্ত্র!

হিরণ্ময়ী। ও আবার কি কথা! কাজ যতদিন করবি ততদিন ভাল করেই করবি; কর্তব্যে এলাকাড়ি দিতে নেই। নে আয়, ভাত জুড়িয়ে যাচ্ছে। উনিশ বছর বয়স হতে চলল, এখনো ছেলেমাছরী গেল না।

কেয়া। চল। [হিরণ্ময়ীর প্রস্থান] উনিশ বছর বয়স হল; না—আর আমার ছেলেমাছরী শোভা পায় না।

দ্বিতীয় দৃশ্য

অনন্তর অফিস। অনন্ত ও বলাই। বেলা সাড়ে দশটা।

অনন্ত। বলাই, কতদিন হল আমরা কলকাতায় এসেছি?

বলাই। আজ তিনমাস হতে আর দু'তিন দিন বাকি আছে।

অনন্ত। আঁ—বল কি! এখনো যে মহামায়া সন্ধ্যাে কিছুই করা হল না! না—আর ত দেবী করা চলে না, এবার যা হয় একটা করা নিতান্ত দরকার।—পায়ের জুড়ুলটা সন্ধ্যাে নিশ্চয় হওয়া যায় কি করে? আজকালকার মেয়েরা সর্কদাই জুতো পরে আছে—মহা মুন্সিবা! সাড়ে দশটা বেজে গেল এখনো

সেক্রেটারির দেখা নেই; এইজন্ডেই ত কিছু হচ্ছে না। [ঘরের নিকট শব্দ] ঐ বোধহয় এলেন।

কাবুলী ওয়ালা প্রবেশ করিল

অনন্ত। এ আবার কে?

বলাই। আজ্ঞে বৌ বোঁ: শব্দে প্রকাণ্ড কাবুলী ওয়ালা!

অনন্ত। ক্যা মাংতা? আমার এখন শাল দরকার নেই।

কাবুলী নিজ ভাষায় অনেকক্ষণ ধরিয়া কি বলিল। অনন্ত কেবল 'গোয়েন্দা' কথাটা বুঝিতে পারিল।

অনন্ত। গোয়েন্দা? হাম গোয়েন্দা হ্যায়। ক্যা মাংতা?

কাবুলী। [নিজ ভাষায় খানিকটা কথা বলিয়া] বিবি বাগ গিয়া।

অনন্ত। [বলাইকে] কি বলছে?

বলাই। আজ্ঞে বৌ বোঁ: শব্দে কিছু বোকা যাচ্ছে না।

অনন্ত। এই মিয়া, কি বলবে পষ্ট করে বল—নয়ত ভাগো।

কাবুলী। [স্পষ্টভাবে] বিবি বাগ গিয়া, থুপহুং বিবি বাগ গিয়া।

অনন্ত। ও—একজন মেয়েমাছরী তোমাকে ফেলে ভাগ গিয়া?

[কাবুলী সবেগে মন্তক সঞ্চালন করিল।] বুঝি—টাকাকড়ি নিয়ে পালিয়েছে? রূপিয়া লেকে ভাগ গিয়া?

কাবুলী। ছাই—দিলজান কলিজা—[বুকে হাত রাখিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিল।]

বলাই। টাকা নয় জুজুর, একজন স্ত্রীলোক গুর মন চুরি করে নিয়ে বৌ বোঁ: শব্দে পালিয়েছে?

অনন্ত। তা আমি কি করব?

কাবুলী আবেগভরে কিছুক্ষণ নিজ ভাষায় বক্তৃতা দিল

অনন্ত। না, ব্যাপারটা বড় বেলী রহস্যময় হয়ে পড়ছে। মিয়া সাহেব,

হাম আভি বড় বাস্ত হায়—তোমার প্রাণের লোক খুঁজে
বেড়াবার আমার সময় নেই। তুমি পুলিশে যাও।

কাবুলী! পুলিশ!

লাঠি মুঁকিয়া কিছুক্ষণ ঘূষাপূর্ণ বকুতা হিল, তারপর পরদাপ করিতে করিতে
প্রস্থান করিল

অনন্ত। নাঃ—মিছে পণ্ডিত্রম! তিনমাস ধরে অফিস খুলে বসে
আছি, একটা ভাল কেস হাতে এল না। কোথায় ফুটবল মাঠ
দেখতে গিয়ে কার পকেট কাটা গেছে, কোথায় কাবুলীওয়ালার
মন চুরি করে কে পালিয়েছে—এই তরঙ্গ করে বেড়াও। আর
ভাল লাগছে না। বলাই, এবার পাততাড়ি গুটাতে হবে।
কিন্তু তার আগে মহামায়ার অর্থাৎ মলিনীর—

কেয়া প্রবেশ করিল

কেয়া। [শুদ্ধকণ্ঠে] নমস্কার। একটু দেরী হয়ে গেছে, মাফ করবেন।
কাল থেকে ঠিক সময়ে আসব।

নিজস্থানে গিয়া বসিল

অনন্ত। বলাই, তুমি নীচে গিয়ে বস; কাবুলীওয়ালার মত মজেল
হদি আর আসে, নীচে থেকেই তাড়াবে।

বলাই। আজ্ঞে।

প্রস্থান

অনন্ত। মিস্ মিজ, আজ আপনার মুখ অত শুকনো দেখাচ্ছে কেন?

কেয়া। ও কিছু নয়।

অনন্ত। নিশ্চয় কিছু হয়েছে। আচ্ছা আমি বলে দিচ্ছি। আপনার
বন্ধ মলিনীর সঙ্গে একটু ঝগড়া হয়েছে—না?

কেয়া। [সবেগে মাথা নাড়িয়া] না।

অনন্ত। তবে কি হয়েছে?

কেয়া। কিছু হয়নি। মিং চৌধুরী, আমাকে কাজ করতে দিন।

অনন্ত। ও—বেশ ভাল। [কিছুক্ষণ ঘরমধ্য ঘুরিয়া বেড়াইল] মিস্ মিজ,
আমি ভিটেকটিবের কাজ ছেড়ে দিচ্ছি। আর ভাল
লাগছে না।

কেয়া। [চমকিয়া তাকাইয়া—পরে নিকম্ভক কণ্ঠে] তা বেশ। কবে
থেকে ছেড়ে দেবেন?

অনন্ত। আর ছা'তিন দিন অফিস খোলা থাকবে, তারপরই বন্ধ
ক'রে দেব।

কেয়া। তবে আমাকে আগে জানানেন না কেন? আমি অফিস
চাকরি খুঁজে নিতুম! কেন আমার ক্ষতি করলেন?

কেয়ার চক্ষু বাষ্পাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল।

অনন্ত। [কেয়ার পিছনে গিয়া] কেয়া, আমি তোমাকে,—আমি
তোমাকে অফিস চাকরি করতে দেব না। তুমি আমার কাছে—

দৃষ্টে হস্ত রাখিল

কেয়া। [বিদ্বাষ্মে উঠিয়া] আমার গায়ে হাত দেবেন না।

অনন্ত। কেয়া, আমি তোমাকে—

কেয়া। চুপ! মনে রাখবেন আমি মহিলা। কোন অধিকারে
আপনি আমায় অপমান করেন?

অনন্ত। অপমান! [স্তম্ভিত]

কেয়া। অপমান নয় ত কি! আপনি মনে মনে একজনকে—উঃ!
এত ছলনা আপনার মনে? আমি আপনার অধীনে চাকরি
করি বলে—

কাঁদিয়া ফেলিল

অনন্ত। কেয়া, আমি শপথ করে বলছি আমার মনে কোনও ছলনা
নেই।

কেয়া। [কাঁদিতে কাঁদিতে] মিথ্যে কথা বলবেন না। আপনাকে আমি চিনেছি—অসহায়া স্ত্রীলোককে অপমান করাই আপনার স্বভাব। কিন্তু আমি অসহায়া নই—

অনন্ত। কি বলেছি আমি যে তুমি ওরকম করছ ?

কেয়া। কি বলেছেন! আপনি আমাকে যে অপমান করেছেন তার চেয়ে বড় অপমান মেয়েমাছুষের পক্ষে আর হতে পারে না। [চক্ষু মুছিয়া ঘরের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে] আমি আর এখানে থাকব না।

অনন্ত। কেয়া—শোনো—কেয়া—

কেয়া। না আমি থাকব না—আমি থাকতে পারব না। আপনি আমার কাছে আসবেন না।

অনন্ত মূঢ়বৎ ঝাঁড়াইয়া রহিল

জ্ঞত অস্থান

অনন্ত। কি হল! অপমান কখন করলুম? [কিছুক্ষণ চিন্তা] ও বুকেছি—প্রস্তাব করাটাই অপমান! উনি ব্রাহ্ম মহিলা—আর আমি হিন্দু। [অভিভূত ভাবে] এতপানি ব্যবধান ভেতরে ভেতরে ছিল। আমাকে মনে মনে ঘৃণা করে। কিছু বুঝতে পারিনি! নিজের মুখেই বলেছে হিন্দু ব্রাহ্ম সমান, মাছুষে মাছুষে প্রভেদ থাকতে পারে না। [দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া] হাক্, সর চুকে-বুকে গেল। মিথ্যে স্বপ্নের ইমারৎ তৈরী করেছিলুম। এবার নিশ্চিন্ত হয়ে দেশে ফেরা যাক, আর কি! বলাই!

বলাই প্রবেশ করিল

বলাই। আজ বিরাজপুরের ছজুর বৌ বৌ: শবে আসছেন।

অনন্ত। জগদীশবাবু! ও—ঐক ত। মহামায়ার কাজটা যে এখনো

শেষ হয়নি। ভালই হল। আজই যা-হয় একটা হেস্তনেস্ত করে কলিকাতা মহানগরীর কাছে বিদায় নিতে হবে।

জগদীশ প্রবেশ করিলেন

অনন্ত। আস্থান কাকাবাবু!

প্রণাম করিল।

জগদীশ। ভাল আজ বাবা অনন্ত?

অনন্ত। আজ্ঞে আছি একরকম, বহুন।

জগদীশ। [উপবেশন করিয়া] তোমার কাছ থেকে কোনও খবর না পেয়ে মনটা বড় অস্থির হল, তাই চলে এলুম।

অনন্ত। ভালই করেছেন। এখানে কোথায় উঠেছেন?

জগদীশ। সিটি হোটেলে। চিরদিন ওইখানেই উঠি—কি হল বাবা? কোনও খবর পেল কি?

অনন্ত। পেয়েছি। তবে এখনো পাকাপাকি রকম জ্ঞানতে বাকি আছে। আজ রাতে টিক করেছি পাকা খবর নেব।

জগদীশ। পেয়েছিস! সত্যি পেয়েছিস অনন্ত! কোথায় সে, কোথায় আছে মহামায়া?

অনন্ত। সে ভালই আছে, আপনি অদীর হবেন না।

জগদীশ সবগে আক ঝাড়িলেন।

কাকাবাবু, আজ রাত্রি সাড়ে দশটার সময় আপনি আসবেন, তখন আপনাকে মহামায়ার সমস্ত কপা বলব। এখন—এখন দয়া করে আমাকে একটু ভাবতে দিন।

জগদীশ। আজ্ঞা বাবা সাড়ে দশটার সময়েই আসব।

জগদীশ উঠিয়া ঝাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অনন্ত তাঁহাকে ধরিয়া সাবধানে ঘর পৰ্য্যন্ত পৌছাইয়া দিল।

অনন্ত। বৃদ্ধ বড় কাতর হয়ে পড়েছেন!

চুলে আঁতুল ঢালাইয়া

কি আর ভাবব মাথামুণ্ড—ভাবতে পারছি না। আজ অনন্ত ডিটেকটিবের শেষ exploit! রাজে নলিনী যখন খুম্বে তখন তার পা নিশ্চয় খোলা থাকবে, সেই সময় গিয়ে দেখব পায়ে জড়ুল আছে কিনা। থাকে ভালই, না থাকে জগদীশবাবুকে বলে দেব, পারলুম না। বাস—তারপর যেদিকে হোক বেরিয়ে পড়ব। আর ভাল লাগছে না—বিশ্বাদ হয়ে গেছে ছনিয়াটা।

তৃতীয় দৃশ্য

কেয়ারের বাড়ীর পাশে নির্জন গলি। রাজি আলোজ দশটা। বিতলে নলিনীর ঘরের জানালায় আলো বেধা ঘাইতেছে। গানের গনিও ভাসিয়া আসিতেছে। সমরেশ গলির একটা আঁবছায়া স্থানে ঝড়াইয়া শুনিতেছে।

গান

বেণুবনে বাজে বাণী

—‘ভালবাসি—ভালবাসি’—

বঁধুয়া ডাকে মুরলীতে—

‘এস কুহকময় নিশীথে

চূপে চূপে স্নিহুতে—’

মম চিত্তমধুপিয়াসী;

মন না মানে বেণু-গানে

ভালবাসি ভালবাসি।

সমরেশ মূর্খির মত ঝড়াইয়া রহিল। গান থামিয়া ঘাইবার পর অনন্ত পকেটে হাত পুরিয়া নিশ্চয় ভাবে প্রবেশ করিল। উপরে জানালার দাঁশ নিবিয়া গেল।

অনন্ত। ঐ জানলাটা বোধ হয় খোলাই আছে। [চারিদিকে চাহিয়া]
রাস্তাও ত বেশ নিরিবিলি—এ কি!

সমরেশ ছায়াঙ্ককার হইতে বাহির হইয়া আসিল

সমরেশ। সেই ডিভিডিটেকটিবটা না! [অগ্রসর হইয়া] কি হে
- ডিভিডিটেকটিব, এত রাজে এখানে কি মতলবে?

অনন্ত। সে খবরে তোমার দরকার কি?

মস্তর পড়ে গ্রন্থান

সমরেশ সন্দেহপূর্ণ চক্রে চাহিয়া রহিল

সমরেশ। সন্দেহ হচ্ছে—ভূভীষণ সন্দেহ হচ্ছে!—আচ্ছা দেখি—
ওর চ্চাকরটা নিশ্চয় বাড়ীতে আছে। এই ফাঁকে—

সমস্ত গ্রন্থান

চতুর্থ দৃশ্য

রাজি। কেয়ার শয়ন কক্ষ। কেয়া উদ্ভ্রান্তের মত শয্যাগ্রাস্তে বসিয়া আছে।
তাহার হস্তে তাহার পিতামাতার বিবাহের সার্টিফিকেট।

কেয়া। এর মানে কি? এই ত সার্টিফিকেটে লেখা রয়েছে, মা-
বাবার বিয়ে হয়েছে সাতাশে জ্যৈষ্ঠয়ারি ১৯১৯—অর্থাৎ আজ
থেকে সতের বছর আগে। অথচ আমার বয়স উনিশ বছর।
কি কবে হল? সার্টিফিকেট ত মিথ্যা নয়, ঐ পুরোনো
দেরাজের মধ্যে ছিল।—আর ভাবতে পারি না। তবে কি
আমি—উঃ! ভগবান, একমঞ্চে কি এত যন্ত্রণা দিতে হয়!

আর যে আমি পারি না। অপমান আর লাঞ্ছনা—পৃথিবীহুত্ব
*আমাকে অপমান আর লাঞ্ছনা করছে! আমার মা-বাবা—
তারাও জন্মাবধি আমার মূখে এমন করে চুপ-কালি মাথিয়ে
দিচ্ছেন! আমি এখন কি করব? কোথায় যাব?

মাথার হাত রাবির আস্থান। শেলা জানাল বিঃ নিঃশব্দে অনন্ত প্রবেশ করিল।

কেয়া। [মুখ তুলিয়া সভয়ে] একি! কে তুমি?

অনন্ত। আঁ! কেয়া! আমি ভেবেছিলুম—

কেয়া। তুমি! তুমি এসময় আমার ঘরে কেন?

অনন্ত। আমি ভুল করে—, আমি ভেবেছিলুম এটা নলিনীর ঘর—

কেয়া। নলিনীর ঘর মনে করে তুমি আমার ঘরে ঢুকেছিলে?—

[বিদ্রাস্তভাবে তাকাইয়া থাকিয়া] তার ঘরে তোমার কি
দরকার?

অনন্ত নীরব হইয়া রহিল

কেয়া। ও—বুঝেছি। তুমি যে তাকে ভালবাস।

অনন্ত। [ব্যাকুলভাবে] কেয়া, তুমি ভুল বুঝেছ,—আমি অত
কাঁজে—

কেয়া। মিছে কথা বোলো না, তুমি নলিনীকে ভালবাস।

হঠাৎ বিজ্ঞানায় মুখ ওঁড়িয়া ফুঁপাইয়া উঠিল

অনন্ত। [খাটের ধারে নতজাছ হইয়া] কেয়া, আমার অস্থধামী
জ্ঞানেন, আমি তাকে ভালবাসি না।

কেয়া। নিশ্চয় বানো।

অনন্ত। না কেয়া, আমি তোমাকে ভালবাসি।

কেয়া। তবে এই স্বাজে নলিনীর ঘরে এসেছিলে কেন?

অনন্ত। কেয়া, তবে বলি শোনো। আমাদের দেশের এক জমিদারের

মহামায়া নামে এক মেয়ে হারিয়ে যায়, আমি তাকেই খুঁজতে
বেরিয়েছিলুম। তোমার বন্ধু নলিনীকে দেখে আমার সন্দেহ
হয় যে সে মহামায়া।

কেয়া। কেন মিছে রূপকথা তৈরী করছ।

অনন্ত। রূপকথা নয়, আমি প্রমাণ করব যে সত্যি কথা। মহামায়ার
বাবা জগদীশবাবু এসেছেন—

কেয়া। [ধড়মড় করিয়া উঠিয়া] চুপ! কে যেন এদিকে আসছে!
বোধহয় মা কিম্বা বাবা। তারা যদি এসে তোমাকে আমার
ঘরে দেখতে পান, কি মনে ভাববেন?

অনন্ত। আমি যাচ্ছি। কিন্তু কেয়া, বিশ্বাস কোরো আমি তোমাকে
ছাড়া আর কারকে—

কেয়া টোঁটের উপর আঁহ্ন রাখিল

চললুম, কিন্তু কাল তোমার প্রতীক্ষা করব; এসো কেয়া,
তখন সব কথা বলব।

গব্যাকপথে অস্থান

কেয়া। সত্যিমিথো সব গুলিয়ে গেছে; কি বিশ্বাস করব, কি
অবিশ্বাস করব, তাও বুঝতে পারছি না।

‘বৃণতিত’ সার্টিফিকেট তুলিয়া গেল

কিন্তু এতে অবিশ্বাস করবার ত কিছু নেই, এ যে একেবারে স্পষ্ট।

হিরণ্ময়ী প্রবেশ করিলেন

হিরণ্ময়ী। তোর ঘরে যেন কার গলার আওয়াজ শুনতে পেলুম। কেয়া,

কার সঙ্গে কথা কইছিলি? তোর হাতে ও কিসের কাগজ?

কেয়া। মা, বাবা কৈ?

হীরেন্দ্র প্রবেশ করিলেন

এই যে।—বাবা মা, আমার বয়স উনিশ বছর কি না?

হিরেন্দ্র। হ্যা, তা কি হয়েছে? কেয়া, অমন করছিস কেন?

কেয়া। [সার্টিকিট দিয়া] তবে এর মানে কি?

হীরেন্দ্র ঘরে ঘরে বসিয়া পড়িলেন; হিরেন্দ্র কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কেয়া। বাবা, আমি জানতে চাই এর মানে কি? আমি কি

তবে—?

হিরেন্দ্র। না না, কেয়া, তা নয়।

পানী-গ্নী দুজি বিনিময় করিলেন

কেয়া। তবে কি? বাবা, সব কথা বল, আমি আর সহ করতে পারছি না।

হীরেন্দ্র। [ভয়ঙ্করে] সত্যি জ্বা হোক। কেয়া, তুমি আমাদের মেয়ে নও; তোমাকে আমরা কুড়িয়ে পেয়েছিলুম।

কেয়া। কুড়িয়ে পেয়েছিলে? আমি কুড়ানো মেয়ে!

হীরেন্দ্র। হ্যা। আমরা নিঃসন্তান। আমাদের বিবাহের দু'বছর পরে কুস্ত্র মেলার দিন তোমাকে কুড়িয়ে পাই—সে আজ চৌদ্দ বছরের

কথা; তখন তোমার বয়স আন্দাজ চার বৎসর। তোমাকে পেয়েই আমি রেঙ্গুনে চলে যাই, তারপর—

কেয়া। মা, তুমি আমার মা নও! বাবা, তুমিও আমার কেউ নও?

হিরেন্দ্র। [কাবিত্তে কাবিত্তে কেয়াকে জড়াইয়া ধরিয়া] কেয়া, তুই আমাদের সর্গদ্বীপ।

হীরেন্দ্র। নিজের সন্তান কি রকম হয় জানি না, কিন্তু এই চৌদ্দ বছর ধরে তুমিই আমাদের বুক জুড়ে আছ।

কেয়া। কিন্তু তবু আমি তোমাদের কেউ নই—রক্তের বন্ধন নেই।

আমি একা—পৃথিবীতে আত্মীয় নেই—একেবারে একা!

কুড়ানো মেয়ে! [কিছুক্ষণ মূঢ়বৎ থাকিয়া] মা, আমি চললুম।

হিরেন্দ্র। [বাকুল ভাবে] কোথায় যাবি কেয়া?

কেয়া। একজন আমার প্রতীক্ষা করে আছে, তাকে সব কথা বলতে হবে। সে আমাকে চায় কিনা জানি না, কিন্তু তাকে সব কথা না বললেও আমার নিস্তার নেই।

কৃত প্রণয়ন

হিরেন্দ্র। কেয়া—কেয়া! ওগো, তুমি বসে রইলে?

হীরেন্দ্র। কি করব? মিথো দিয়ে ওকে বেঁধে রেখেছিলুম, তাই আজ মিথোর শিকল কেটে উড়ে গেল। [উঠিয়া] কার কাছে গেল?

হিরেন্দ্র। তা ত জানি না।

নলিনী প্রবেশ করিল

নলিনী। কিসের গোলমাল হচ্ছিল! কেয়া কোথায়?

হিরেন্দ্র। সে কোথায় চলে গেল।

নলিনী। চলে গেল!

হিরেন্দ্র। নলিনী, তুই জানিস সে কোথায় গেছে? তাকে ফিরিয়ে আনতে পারিস?

নলিনী। [দাঁতে আঙুল কামড়াইয়া চিন্তা করিল] বোধহয় পারি। বুঝছি সে কার কাছে গেছে। আমার কাছেও লুকিয়েছিল—কিন্তু আমি বুঝছি। আসুন আমার সঙ্গে।

পঞ্চম দৃশ্য

অনন্তর অফিস। রাত্রিকাল। অনন্ত একাকী।

অনন্ত। সাড়ে দশটা ত বাজে; এখনি জগদীশবাবু আসবেন। বলাই! বলাই! [বলাই আসিল না।] কেয়া কি কাল আসবে? সে ভেবেছে আমি নলিনীকে ভালবাসি—তাই—। বোধহয় আমাকে সত্যি ঘুণা করে না। বলাই! বলাই! বলাইটা আবার এত রাত্রে কোথায় গেল!

ঘরের বাহিরে কাতরোক্তি

অনন্ত। ও কিসের শব্দ! কেয়ার গলা না?

ছুটিয়া গ্রহান করিল ও কিয়ংকাল পরে কেয়াকে কোলে লইয়া প্রবেশ করিল

অনন্ত। কেয়া, কি করে পড়ে গেল? পায় কি লেগেছে?

কেয়া। অন্ধকারে সিঁড়িতে উঠতে পা মচকে গেছে।

অনন্ত। [কেয়াকে সোফায় শোয়াইয়া] কোন পা?

কেয়া। বাঁ পা। আমি এই রাত্রে তোমার কাছে এসেছি—

অনন্ত। ও কথা পরে হবে, এখন পা দেখি।

জুতা গুলিতে আবৃত

কেয়া। আমার কেউ নেই—আমি একা। আমি কুড়োনো মেয়ে।

অনন্ত। [জুতা গুলিয়া জড়ুল দেখিয়া] অ্যা! কেয়া, তুমি মহামায়া!

কেয়া। মহামায়া?

অনন্ত। [উত্তেজনায দিশাহারা হইয়া] হ্যাঁ, এই যে জড়ুল! মহামায়া,

তুমি কেয়া! মানে—কেয়া, তুমি মহামায়া!

কেয়া। মহামায়া কে?

অনন্ত। সেই যে—যার কথা তোমায় বলছিলুম—যাকে খুজতে আমি বেরিয়েছি। উঃ! কি সাংঘাতিক ভিটে কটিব আমি! তিন মাস ধরে তোমাকে দেখছি, ভালবাসছি—আর তুমিই যে মহামায়া তা বুঝতে পারিনি!

কেয়া। তাহলে আমাকে খুজতেই তুমি আজ রাত্রে—?

অনন্ত। হ্যাঁ—পায়ের ঐ জড়ুল দেখবার জন্তে।

কেয়া। [সলজ্জ কণ্ঠে] আমি ভেবেছিলুম তুমি নলিনীকে—

অনন্ত। না, না, আমি কেবল এই মেয়েটিকে—

অনন্ত হাটু গাড়িয়া কেয়াকে জড়াইয়া ধরিল

কেয়া। আমি বুঝতে পারিনি। আমার ভুল হয়েছে। মাফ কর।

অনন্তর বৃকে মাথা রাখিল

জগদীশ প্রবেশ করিলেন

অনন্ত। [লাফাইয়া উঠিয়া] কাকাবাবু, এই নিন্ আপনার যেয়ে মহামায়া। ঐ দেখুন পায়ের জড়ুল!

জগদীশ। [কম্পিত স্বরে] মহামায়া!

অনন্ত। কেয়া, ইনি তোমার—মানে—আসল বাবা।

কেয়া। [বিফারিত নেত্রে চাহিয়া থাকিয়া] না না—আমার মা কোথায়—বাবা কোথায়? আমি যে তাঁদের কাছে যাব।

জগদীশ। মহামায়া, বাঁরা তোমায় প্রতিপালন করেছেন—

কেয়া। প্রতিপালন! না না, তাঁরাই আমার সত্যিকার মা-বাবা।

আজ আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলুম, তাঁদের নিষ্ঠুর আঘাত দিয়ে চলে এসেছি। [অনন্তকে] আমাকে তাঁদের কাছে নিয়ে চলুন।

নলিনী, হিরন্ময়ী ও হীরেন্স প্রবেশ করিলেন।

অনন্ত। নিয়ে ঘাবার আর দরকার হল না, ওরা নিজেরাই এসে পড়েছেন। নলিনী দেবীও আছেন দেখছি!

হিরন্ময়ী। কেয়া!

হিরন্ময়ী ছুটিয়া গিয়া কেয়াকে জড়াইয়া ধরিলেন। হীরেন্স কেয়ার মাথায় হাত বরিয়া ধাঁড়াইলেন। নলিনী হাত বরিয়া বসিল। কিয়ৎকাল আরও অশ্রু বিসর্জন চলিল। অবশেষ নিশ্চল মূর্তির মত ধাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন।

অনন্ত। এবার পরিচয়টা করিয়ে দিই। ইনি হচ্ছেন জগদীশবাবু, বিরাজপুরের জমিদার—মহামায়ার অর্থাৎ কেয়ার বাবা।

হিরন্ময়ী সঙ্গে ডাঁহার দিকে তাকাইলেন; হীরেন্স হাত তুলিয়া নমস্কার করিলেন। হীরেন্স। [কণ্ঠস্বর সংযত করিতে করিতে] জগদীশবাবু, মেয়ে আপনার,—কিন্তু—

জগদীশ। [মাথা নাড়িয়া] না, মেয়ে আমার নয়—মেয়ে আপনাদের। আমি ওর জন্মদাতা পিতা বটে, কিন্তু আপনারাই ওর প্রকৃত মা-বাপ। যে ভয়ঙ্কর দুর্গতির পথে ওর নিয়তি ওকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, আপনারা ওকে সেই দুর্নিয়তির হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। এতদিন পরে আমি বাপের দাবীতে যদি ওকে আপনাদের স্নেহের নীড় থেকে ছিনিয়ে নিই, তাহলে ভগবান আমাকে শাস্তা করবেন না। মেয়ে আপনাদেরই থাক। তবে—তবে আপনারা যদি অহমতি দেন, আমি রোজ এসে ওকে দেখব, ছুটো কথা কইব; এখন ও আমাকে চেনে না, ভালবাসে না—পরে হয়ত—

ভাটিয়া পড়িলেন

হীরেন্স জগদীশকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিলেন। তারপর উভয়ে দুই গিয়া বসিয়া রুদ্ধস্বরে কথা কহিতে লাগিলেন। হিরন্ময়ী ডাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন।

নলিনী। [চুপিচুপি] মেয়ে হীরেনবাবুরও নয়, জগদীশবাবুরও নয়। কেয়া, তুই কার আমি জানি।

কেয়া। কার?

নলিনী। ঐ ওর! [অনন্তকে নির্দেশ করিল] লোকটিকে যেন কোথায় দেখেছি! তোর ডিটেকটিব মন্দ নয় ভাই।

কেয়া। তোর তোৎলার চাইতে ভাল।

নলিনী। হুঃ!

বলাইয়ের বাড়ি ধরিয়া সমরেশ প্রবেশ করিল

সমরেশ। ধুধু রেছি!—এ কি! আপনারা সুস্ব এখানে? নলিনী দেবীও রয়েছেন। ব্যাপার কি?

নলিনী। ব্যাপার ভয়ঙ্কর সাম্প্রতিক।

সমরেশ। ক্বিকু দুখতে পারছি না। যাহোক, আপনারা আছেন ভালই হল। আপনাদের সন্মানেই আজ এই ডিভিডিটেকটিব পুস্তকের নাক খাবড়া করব।

নলিনী। কেন—কি করেছেন উনি?

সমরেশ। ও-ই সেদিন আপনার জজুজুতো খুলতে চেয়েছিল। আজ এই চচাকরটার কাছ থেকে বার করেছি।

বলাইকে হুকানি দিল

বলাই। [কক্ষপুর্বে] আজ্ঞে, উনি আমাকে একটা অদ্ভুত গলির মধ্যে ডেকে নিয়ে গিয়ে গলা-টিপুনি দিলেন, তাই বোঁ বোঁ শব্দে বলে ফেলতে হল।

সমরেশ। [বলাইকে ছাড়িয়া দিয়া] ডিভিডিটেকটিব, এবার প্রস্তুত হও! আজ ততোমার অনন্ত-দুর্দশা করব।

আস্তিন গুটাইতে লাগিল

অনন্ত। দেখুন, আজ আমার মনটা ভয়ঙ্কর ভাল আছে, তাই আপনাকে কিছু বলতে চাই না। কিন্তু সাবধান করে দিচ্ছি আমি যুযুৎসু জানি। আমার গায়ে হাত দিলে বিপদে পড়বেন।

সমরেশ। ব্বেশ—দেখা যাক আমার ঘুমির জোর বেশী, না তোমায় ঘুমুৎসুর জোর বেশী!

উভয়ে হুগুৎসু

কেয়া। নলি, তোর সমরেশবাবু যদি আমার—আমার ভিটেকটিবের গায়ে হাত দেয় তাহলে আমি জন্মে তোর সঙ্গে কথা কইব না।

নলিনী। তা আমি কি করব?

কেয়া। তুই তোর সমরেশবাবুকে সামলা।

নলিনী। [উঠিয়া গিয়া] ধামো—আর লড়াই করতে হবে না।

সমরেশ। ক্বেন হবে না?

নলিনী। [হাত ধরিয়া] আমার হুকুম।

সমরেশ। [বিগলিত আনন্দে] তোমার হুকুম?

নলিনী। হ্যাঁ। কেন আমি তোমায় হুকুম করতে পারি না?

সমরেশ। ককে বলে পারো না! ককিছু ওর নাক ধ্যাবড়া করা যে নিতান্ত দরকার।

নলিনী। না, কিছু দরকার নেই। উনি কেয়ার—

কানে কানে কথা বলিল

সমরেশ। আঁ! তুতাই নাকি?

অনন্ত। সমরেশবাবু, স্বীকার করছি যে নলিনী দেবীর জুতো খোলবার প্রস্তাব করা আমার অজ্ঞায় হয়েছিল। আমি ভেবেছিলুম উনিই মহামায়া।

সমরেশ। বুঝতে পারলুম না। কিন্তু যখন আপনি অজ্ঞায় স্বীকার করছেন তখন আর কোনও কথা নেই।

উভয়ে কর্মমর্দন করিল

বলাই। বোঁ বোঁঃ শব্দে সব ভাব হয়ে গেল দেখছি। মাঝ থেকে আমিই কেবল গলা-টিপুনি খেলুম!

অনন্ত। [কেয়ার পাশে বসিয়া] আজকের রাত্রিটা ভারি আশ্চর্য্য! যেন রূপকথার রাত্রি!

নলিনী। কেয়া, তুই একটা গান গা। আজকের রাত্রির সেই হবে সবচেয়ে সুন্দর পরিসমাপ্তি।

কেয়া। আমি পারব না, আমার পা মচকে গেছে। তার চেয়ে তুই গা, তোর গান শুনতে সমরেশবাবু বড্ড ভালবাসেন।

সমরেশ। মুম্ময়ানে?

নলিনী তাহার ঠোটে আঙুল রাখিয়া তাহাকে নিবারণ করিল। তারপর গাহিল—

সুখের মাঝে স্মৃতি বেদনা-ভরা—

আধারে আলা

এই ত ধরা—ওগো এই ত ভাল।

সমরেশকে লকা করিয়া

সরমে মুখে যার কথা না ফুটে,

প্রণয় বৃকে তার গুমরি উঠে—

বিজলী-ছটা নভ-উজ্জল-করা

এই ত ধরা—ওগো এই ত ভাল!

অবশীশকে লক্ষ্য করিয়া

হারায়ে যাওয়া পূন ফিরিয়া পাওয়া,
নিকটে পেয়ে দূরে সরিয়া যাওয়া,
হাসিতে আঁখিজলে ক্ষয়-হরা—
এই ত ধরা—ওগো এই ত ভাল !

যবনিকা

“চন্দ্রহাস”

পৃথিবীর পাগলামি

একদিন লেখকের গাইড লেখককে Swerdlowsk এর এক রেষ্টুরাঁতে নিয়ে যান। একটি খাট মোটা জনমজুরের-নীল-ব্লাউজ-পরা লোকের টেবিলের পাশেই এঁরা দুজনে বসেছিলেন। এ ভ্রমলোকের চুল কপালে পড়েছে এবং এঁর চোঁট-ছটি দুট-সংবদ্ধ, ইনিই হচ্ছেন Jabrob Pawlowitch Ivanychenko, যিনি “Steel-wostok”-এর সভাপতি; ভোজ্ঞানদী থেকে আরম্ভ করে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত সমস্ত স্থানের লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদন কাঁচা ইনিই চালনা করেন। পূর্বে ইনি একজন ‘শোকার’ ছিলেন মাত্র, এখনও এঁর বয়স চল্লিশ হয়নি।

এসিয়াকে বিরাট এক কারখানায় পরিণত করার ভার এঁর উপরেই

দ্রুত; ইনি আশা করেন যে, ১৯৩৭ থেকে প্রতি বছরে বত্রিশ মিলিয়ন টন ইস্পাত তৈরী করা সম্ভব হবে।

তাড়াতাড়ি ধরে নিয়ে এই সভাপতি ভ্রমলোকের অটোয় চড়ে লেখকরা ট্রেন ধরবার জন্তে ছুটে এলেন, উদ্দেশ্য, একটা বিষয় পরিদর্শনে যাওয়া।

অত্যাচ্ছন্ন সোভিয়েট নেতার কথার মধ্যে কেবল Marx আর Stalin অথবা Engol পাচশবার পুনরাবৃত্তি করে থাকেন; কিন্তু ইনি এত কথার মধ্যেও যখন একবারও Marx, Stalin-এর নাম করলেন না তখনই বুঝতে বাকী থাকল না যে, ইনি একটা কেউকেটা লোক নন, এঁর ধারণা সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য। এঁর কথার মধ্যে কেবল সংখ্যা, কেবল কাঁচা প্রণালীর ফন্দী, অল্পত পরিশ্রম-শক্তি, অনন্ত বিশ্বাস এঁর। যে টেপীর মধ্যে এখন এই এক্সপ্রেস ট্রেন দ্রুত-বেগে ছুটে চলেছে, সেখানে অসংখ্য constructionsই তোলা হবে; তিনি সে সবের জায়গা পর্যন্ত দেখিয়ে দিতে লাগলেন, অথচ অচ্ছন্ন মকলে এখনও এ বিষয় কদাচিৎ কল্পনাতে এনেছে। মকড়মির বৃকের উপর, ইনি দেখালেন, এক ‘রিইনফোর্সড কনক্রিটের’ আটতলা বাড়ী; এর কাছাকাছি কোন রাস্তাই নেই, এই নির্জনতায় যেন এ হারিয়ে গেছে। কিন্তু ‘চাঁক’ বুকিয়ে দিলেন, কিছু কালের মধ্যে এই বাড়ীর চারিদিকে চল্লিশ হাজার মজুরের উপযোগী বাসস্থান তোলা হবে।

বৃহৎ চূঙ্গীর মত এক বিরাট গর্তের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় Ivanychenko এঁদের এ সম্বন্ধে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য সংবাদ দিতে লাগলেন; তিনি বললেন যে, এই জমি খনিজ পদার্থে অতীব সম্পদশীল।

এর পরে, Kontradji Swerjowর কথা উঠল, যার বয়স এখন সত্তর এবং যার লম্বা সাধা দাড়ী দেখে একজন পোপ বলেই ভ্রম হয়।

ইনি হচ্ছেন অশিক্ষিত; অথচ সমস্ত পেশাদার ভূগোলিকই, তা সে রাশিয়ায়ই হোক আর রাশিয়ার বাইরের সমস্ত বিদেশ সমূহেই হোক, —সমস্ত 'প্রোফেশনাল'রাই এক বাক্যে স্বীকার করেন যে, উরাল অঞ্চলের mineralogy সম্বন্ধে এত সঠিক জ্ঞান এর মত আর কারো নেই; একজন জিয়লজিষ্ট, যার নাম সমস্ত জগৎই জানে, অথচ যিনি না লিখতে জানেন, না পড়তে জানেন; আশ্চর্য নয় কি?

যাতায়াতের সুবিধের কথা হল। সভাপতি মহাশয় স্বীকার করলেন যে, Swerdlowsk-এর চারিদিকে ভাল রাস্তা নেই, কারণ আমেরিকানদের মত আগে রাস্তা পথে অল্প সব, এ-মত এখানে পালিত হয় না; এখানে আগে constructions, পরে রাস্তার চিন্তা। ইনি আরো স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে, অধিকাংশ অটোই বদ্ রাস্তায় চলার ফলে সর্বদাই মেরামত হচ্ছে।

দৈবক্রমে একটা উদাহরণ চোখের সামনে পড়ল। অতি-আধুনিক ষ্টাইলে তৈরী এক বাড়ীর পাশ দিয়ে গাড়ী যাচ্ছিল। বাড়ীটা হচ্ছে রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতের এক কারখানার পরিচালন-কেন্দ্র; বাড়ীর সামনে প্রাগৈতিহাসিক যুগের ডজন খানেক ছোট ছোট গাড়ী, ঘোড়া জোতা হয়ে দাঁড়িয়ে। এই সব গাড়ী করেই এঞ্জিনিয়াররা মাইন থেকে অফিস, এবং এক স্থান থেকে স্থানান্তরে যান।

রাশিয়ার সর্বত্রই এই এক ভাব। Stalingrad পর্য্যন্ত ইলেক্ট্রিক ট্রেন আছে, টেলিফোনের শত শত মোটা তার নজরে পড়ে, কিন্তু একটা রাস্তারও নামগন্ধ নেই। সর্বত্রই বর্ধরতা ও সভ্যতার অত্যাবশ্যকীয় সংযোজন। চারিদিকেই powerful works, নতুন নতুন সহর, বিরাটভাবে বৈদ্যুতিক শক্তি-সরবরাহ কার্য।

এ সবের সঙ্গে সঙ্গেই চূর্ণদাঁশ কয়েক অবস্থা — খালি সামগ্রীর অভাব, raw materials জোগাড় করার দুর্ভাগ্য, এবং সর্বশেষে latent crisis; এ সবের কারণ কি? 'সোভিয়েটিক মেথডের' গুণেই কি? রাশিয়া চিরকাল ধরে violence-এর সাহায্যেই তার কল্যাণ কার্যে পরিণত করেছে।

এমনিভাবেই অর্থাৎ জোর করেই, রাশিয়ার সর্বপ্রধান সম্রাট Peter the Great অতি অল্প সময়ের মধ্যে একধরনের canalisation তৈরী করিয়েছিলেন, যার মডেল আজ পর্য্যন্ত কাছে লাগে। তিনি যে দেশে এই কাজ করান সে দেশ আজও পর্য্যন্ত কোনরকম টেকনিক্যাল জ্ঞান অল্প থেকে, সেই মধ্যযুগেই পড়ে আছে। Alexander III এর সময়ের রাশিয়া, reactionary হলেও, পিছনে পড়ে থাকলেও, পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা রেলপথ—ট্রান্স-সাইবেরিয়ান—সৃষ্টি করে। আধুনিক সব উন্নতি সম্বন্ধে অতীত এখনও বেঁচে আছে।

উরাল প্রদেশের Magnitogarsk-এর চারিদিকে virgin soil-এর উপর এক নতুন সহর ফুঁড়ে উঠছে। এখানকার এই সব constructions দেখে দৈত্যদানার রাজ্য বলেই ভ্রম হয় বটে, কিন্তু বাসোপযোগী সব গৃহ, তাঁবু ও ব্যারাকের তৈরী ক্যাম্পের মধ্য থেকেই উঠছে। পূর্বে, Moscowতে automobile তৈরী করার যে ছোট কারখানা ব্যাঙ্কার Rjabonchinski কর্তৃক তৈরী হয়, সেটা আজ বিরাট এক ওয়ার্কশপে পরিণত হয়েছে, যার অতি ক্ষুদ্র 'নাটবোর্ড' পর্য্যন্ত অতি আধুনিক। কিন্তু তার পাশাপাশি যা কিছু, সব যেমন ছিল তেমনই আছে, এবং অনেক রাশিয়ানও যেমনটি আগে ছিল তেমনটিই রয়ে গেছে; আবার অনেকেই সম্পূর্ণরূপে বদলে গেছে এবং এ বদলানিতে তাদের লাভ যে কিছুই হয়নি—এ কথা বিদেশীরাই বলেন।

Irkontsk এ যাওয়ার পথে এক বয়স্ক ইংরেজ রমণী ঘণ্টার পর ঘণ্টা লেখকের সঙ্গে এই প্রশ্নের বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। রমণী বিশ বছরে চৌদ্দবার এ-রাস্তায় গেছেন, চৌদ্দবার তিনি ট্রান্স-সাইবেরিয়ানে Warsaw থেকে Manchourieতে গেছেন। না খেয়ে ইনি বলে যেতে লাগলেন, আগে আগে কি টাইপের লোকই এখানে দেখা যেত; সত্যিকারের কৃষক, 'ফারের' পোষাকে এমনভাবে আচ্ছাদিত—যাতে দম বন্ধ হয়ে যেতে পারে, পায়ে ফেণ্টের উঁচু বুট; আর শালা-কাল থেকশিয়ালের চামড়ার পোষাক-পরা রমণী। এখন যা কিছু দেখা যায় সবই যেন বংশগৌরব-হারান, নীচ; সব মুখই আজ রক্তহীন, পীত, চক্ল ও ছুঁমুঁ-মাখা। ষ্টেশনের buffetতে, যাদের টিকিটের * কোন গুণগোল নেই, তাদেরই কেবল তাড়াতাড়ি খেতে দেওয়া হয়। যে সমস্ত দোকানে আগে ভাল ভাল ফাউল, টাকি-হেন, পাই, পেট্রি প্রভৃতি পাওয়া যেত, এখন সে সব দোকানে বিলিভী বেগুন, শশা প্রভৃতি ভীষণ দামে বিক্রী হচ্ছে। মাংসের কথা তো বাদই দাও, কোথাও দেখবার উপায় নেই।

এই ইংরেজ রমণীর কতক কথা সত্যি, কতক বা ঠিক নয়; রমণী বুন্ডা, আর এদেশ হচ্ছে ঘোবনের দেশ। টেনের ভোজনাগারে খেতে গিয়ে, মাংস নেই এটা তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, কিন্তু তিনি এটা লক্ষ্য করতে ভুলেছিলেন যে, অতি গরীব কৃষকের ও বাজীর কাছে ছুটো বড় বড় মাংসে বয়ে-আনা aerial রয়েছে রেডিওর জঙ্গে।

রাশিয়ার ক্ষুদ্রতম গ্রামেও আজকাল বেতারযন্ত্র দেখা যায়।

* টিকিট অর্ধে, রেলের টিকিট নয়, খেতে পাওয়ার একরকম ক্ষমতি পত্র বিশেষ।

রাশিয়াতে পরমা গরত করলেই যে খেতে পাওয়া যাবে তার মানে নেই, যেমন যুদ্ধের সময় শত্রুসৈন্যের অত্যন্ত অভাবে ইউরোপেও এই টিকিটের প্রচলন হয়েছিল।

তাছাড়াও একটা করে Isba-czytalni (অর্থাৎ লেকচার-রুম), একটা 'red-circle' ও একটা নিরীশ্বরবাদীদের মিলবার স্থান দেখা যায়।

লেখক পাঁচ সপ্তাহ industrialised Siberia চতুর্দিকে ঘুরেছেন, কিন্তু এক মুহূর্তের জ্ঞানও মন থেকে তার এই দারগাকে মুছে ফেলতে পারেন নি, যে তিনি এক বিশাল যুদ্ধক্ষেত্র পরিদর্শন করেছেন।

J. O. K.তে বিদেশী প্রোফেশনালদের সংখ্যা হচ্ছে এগার হাজার সাতশো; এর অর্ধেকের বেশী জাৰ্মান ও বাকী প্রায় সব আমেরিকান। এরা সব অতিআধুনিক প্রথায rolling-mill, power-stations বসিয়েছেন এবং super-american সব কারখানা তৈরী করবার প্রায় করেছেন; এরা এমন সব installations তৈরী করিয়েছেন যে, সে সব Pittsburg, Ruhr, Lorraine বা সাইলিসিয়ার উত্তরাঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায় না। মেশিনের বড় বড় রাজপ্রাঙ্গণ তৈরী করা হয়েছে; একখানা টালি বা একবস্তা সিমেন্ট বা একখানা তক্তাও মাথুষের জঙ্গে নেই, সব মেশিনের জঙ্গে লাগান হয়েছে। যে সমস্ত ব্যক্তি এই ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রাজ্যের পত্তন করেছেন, তারা নিজেরা তাঁবুতে বা ব্যারাকে বা পাহাড়ের গুহায় দিনাতিপাত করেন। ইম্পাত উৎপাদনের কেন্দ্র Magnitogorskএর শতকরা সত্তর জন জনমজুর কর্মচারী মাটির তৈরী কুঠীর বাস করে। শীতকালে এখানকার টেমপারেচার পঞ্চাশ (শূন্যের নীচে) পর্যন্ত নামে। এই শীতকালে, যখন হ হ করে ভীষণ ঝড় বইতে ও তুষার পড়তে থাকে তখন সাইবেরিয়ার সর্বত্রই, ব্যারাকে ব্যারাকে ঘুরে বেড়িয়ে তিনি মজুরদের কাছ থেকেই শ্রম শুনেছেন যে, রাশিয়ান সরকারের যে কথা—প্রত্যেক মজুরের একটা করে খাট আছে এবং তাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বিছানা ও পোষাক দেওয়া হয়—সে সব

কথার কোন মূল্য নেই। সর্গদাহি তিনি খবর পেয়েছেন যে, পঞ্চাশ জন মজুরের জন্ম মাত্র ত্রিশটা বিজ্ঞানী আছে। বিজ্ঞানীর সরঞ্জামের যে অভাব ছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই; কিন্তু তাদের বিজ্ঞানাপত্র বেখে বেশই ধারণা করতে পারা যেত যে, সেখানে উকুন, ছারপোকা, আস্থ'লা প্রভৃতিরও অভাব নেই।

কেবল মেশিন আর মেশিন, মানুষের জন্তে সময় নষ্ট করার কাল নেই। কাজেই যখন ব্যারাকে আর স্থান কুলান না, তখন এরা নিজেরাই কাঠের টুকরা ও মাটি দিয়ে কুটার রচনা করে নেয়। এমনিভাবে, শতকরা সম্ভব-আশীজন মজুর বাস করে; এবং বাকী সব কর্মচারীরা, যারা সব দিক দিয়েই কমতাপূর্ণ—বিশেষ করে রাজনীতি-ক্ষেত্রে,—তারা সব আধুনিক স্বচ্ছন্দতামুক্ত নতুন নতুন অট্টালিকায বাস করেন।

এইসব বাড়ীর দরজায় পিতলের escutcheon সব ঝক ঝক করছে। এসব বাড়ী যে architecture-এর উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত তা নয়; ইউরোপের আধুনিক সব বাড়ীর সঙ্গে এদের এখনও তুলনা করা চলে না, কারণ অভাব অনেক জিনিষেরই; কিন্তু কথা হচ্ছে, এই সব কর্মচারীরা, সম্ভবতঃ যারা খুবই কাজের লোক, এখন বলতে পারেন যে, রাস্তায় ও বাধকমণ্ডলা একটা ছোটখাটো ফ্লাট তাদের নিজস্ব সম্পত্তি,—এ ব্যাপার আধুনিক রাশিয়ার পক্ষে একটা আশ্চর্য্য পরিবর্তনই বটে, কারণ পূর্বে, revolution-এর পূর্বে, খুব কম লোকই ফ্লাটের বিষয়ে খবর রাখত। এঁদের জন্ম যে সব শোবার আস্তানা তৈরী হয়েছিল এবং যেখানে এরা মাজুরের উপর বা তত্ত্বাপোষের উপর গড়াতেন, তাই এঁদের কাছে মডার্ন বলে মনে হোত। খাটিয়ে লোকদের, একটু উচ্চশ্রেণীর যারা, তারা যে revolution-এর যুগের

প্রথম অবস্থার মত bourgeoisদের উপযোগী প্রাচীন ফ্লাটে বাস করতে বাধ্য না হয়ে, আরামদায়ক বাসস্থান পাচ্ছেন, এটা রাজনীতির একটা প্রধান বিশেষত্ব। একটা পরিবারের জন্তে রাস্তায় ও বাধকমণ্ডলা একটা গোটো ফ্লাট দেওয়ায় আগেকারের আবহাওয়া বদলে গেছে। প্রথম থেকেই সকলের উন্নতিপথ যে bourgeoisier দিকেই অগ্রসর হচ্ছে, এটা দেখা গিয়েছিল যুদ্ধের পূর্বে; সাধারণ রাশিয়ান শ্রমজীবীদের ‘ম্যেংরা প্রোলেটারিয়েট’ বলে মনে করা হোত; কিন্তু জীবন-ধারণের সেই স্ট্যান্ডার্ড এখন একটু উন্নত হয়েছে, কারণ ভাল লাগুক আর নাই লাগুক, এরা ধাপে ধাপে ছোটখাট bourgeois হয়ে চলতে বাধ্য হচ্ছে, যদিও এই bourgeoisie প্রথার অনেক গুণের মধ্যে এমন অনেক দোষ আছে যা বরদাস্ত করা বড় শক্ত। অর্থের কোন মূল্যই নেই, কারণ তা দিয়ে ইচ্ছামত জুতা-জামা খরচ করা যায় না; কাজেই অর্থ অপেক্ষা বস্তুর উপরই সকলের টান এবং সে কারণেই ঘরবাড়ী সাজানটা একটা খেলা। মন্দাই হোক বা সাইবেরিয়ার অতি দূর প্রদেশই হোক, সকল স্থানের বড় বড় দোকানের সাজান জানালায় অদ্বুত অদ্বুত সব জিনিষ থাকে—দেওয়া, যথা—কৃত্রিম তাল জাতীয় গাছ, কাগজের ফুল, অতীত কালের সব রকমারী পাত্র ও পুরান পোষাক-পরিচ্ছদ, খোদাই-করা সব বস্ত্র ইত্যাদি ইত্যাদি; যা কিছু সবই বদ-পছন্দের উদাহরণ এবং সবই পূর্নি শতাব্দীর জিনিষ; কিন্তু তা সত্ত্বেও বেশই বিক্রি হয় এসব।

ক্রমশঃ

লেখক, জিস্কা

অনুবাদক, শ্রীতরুণ ঘোষাল, প্যারিস

প্রমোদিনীর পার্শ্ব

(১)

টিক তিন বৎসর হইল। কালের পরিমাপ দিয়া অবশ্য কোন ঘটনার দূরত্ব নিরূপণ করা যায় না; আমি তাহা জানি, কারণ আমি ইতিহাসের ছাত্র নই। ঘটনার গুরুত্বও ইহার পরিমাপক নহে। যথা—পাঁচ বৎসর পূর্বে কাহার একপাটি জুতা হারাইয়াছিল অথবা কাহাকে পাগলা কুকুর তাড়া করিয়াছিল—তাহা বিস্তৃত হইয়াছি, কিন্তু তাহারও আগে কোন একদিন তারিখ তুল করিয়া নিমন্ত্রণের পূর্ব-দিবসেই বন্ধুর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছি এবং একথা-সেকথার পর বেলা বারটার সময় দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বাহির হইয়াছি, অথবা কোনদিন আত্মবিস্মতির ক্ষণে পাণ্ডানাদারকে মজল ঠাণ্ডাইয়া তাহার ডাকে সাড়া দিয়া ফেলিয়াছি,—তাহা আজও ভুলি নাই। তথাপি ইতিহাসের শাসন ছনিবার, কাজেই মনের বাধা মনে চাপিয়া অর্থহীন ঘটনার তোরণে শির নত করিতেছি, অথচ তাহার পাদমূলে সবার অলক্ষ্যে যে ফুল ফুটিয়াছিল তাহার জ্ঞান লইয়াছি অথবা যে কাঁটা পায়ের তলায় বিধিয়াছিল তাহার তীব্রতা অহভব করিয়াছি—একথা মুখ ফুটিয়া বলিবার সাহস নাই। হে পানিপথ ও পানহালা, নাদির ও ছত্রসাল—তোমাদের চরণে নমস্কার, কিন্তু হে পুর-স্বন্দরীর নৃপুত্র-নিজগ, হে স্বন্দর স্বানসামার প্রেম-বিধুরা বেগম সাহেবার অবাক স্বন্দর-বাধা, তোমাদিগকে বিদায়-সম্ভাষণ না করিয়াই বিদায়।

তাই বলিতেছি সে আজ তিন বৎসর হইল। ইন্সপেক্ট্রেস অব

শনিবারের চিঠি

৮৫৩

স্কুলস্ মিস্ প্রমোদিনী চাট্টাঙ্কীর বয়স তখন ত্রিশ। একদা নারীশিক্ষা-সম্মেলনের সভানেত্রীর আসন হইতে সে তাহার কুমারী-স্বদয়ের দ্রবীকৃত জালা উদ্গার করিয়া ধরিত্রীর নর-বংশ লোপ করিবার তীব্রতম বাসনা প্রকাশ করিল। ফলে নর-বংশের সম্ভান তাহাকে ছাড়িল না,—শিক্ষা-বিভাগের প্রধান কর্মচারী বলিয়া পাঠাইলেন—সে যেন অবিলম্বে তাহার অতিরিক্ত পুরুষ-দেহী অভিভাষণের মর্ম প্রকাশ্যভাবে প্রত্যাহার করে। প্রমোদিনীর চিন্তায় ইহাতে দ্বিগুণ জলিয়া উঠিল—সে তাঁহাকেও যৎপরোনাস্তি অপমান করিয়া পত্র লিখিল। তাহাতে পুরুষজাতির কোন ক্ষতি হইল না বটে—প্রমোদিনীর চাকরিটা পুড়িয়া ভস্মসাৎ হইল। তাহার বন্ধকের লাইসেন্স ছিল, তৎক্ষণাৎ সে অনেকদিনের পোষা মন্দা কুকুরটাকে গুলি করিয়া মারিল এবং পুরুষ ভৃত্যদের গলা-দাঙ্গা দিয়া দূর করিয়া দিল। পাছে কোন পুরুষের সহিত চোখাচোখি হয় এই ভয়ে সর্বদাই আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। কিন্তু তাহার এই উদ্ভাদনার অর্থ বুঝাইতে হইলে আগেকার ইতিহাসটা সংক্ষিপ্তভাবে বলা দরকার।

প্রমোদিনীর মাতার জীবদ্দশায় তাহার পিতা যখন দ্বিতীয়বার দার-পরগ্রহ করিয়া দ্বিতীয়া স্ত্রীর পিতার হুপারিশে দিল্লী শহরে চাকরিতে নিযুক্ত হন—তখন প্রমোদিনীর বয়স মাত্র একাদশ বৎসর। তাহার মাতা অনুচা কন্ডা ও আর একটি শিশু-পুত্রকে লইয়া দেশের বাটীতে যৎকিঞ্চিৎ জমিজমার উপর এবং আত্মীয়জনদের সাহায্যে অতি কষ্টের সহিত জীবন-ধারণ করিতে লাগিলেন। প্রমোদিনীর গ্রাম-সম্পর্কীয় মাতুল রাধানাথ যৌবনকালে আনন্দের আতিশয্যে সব সম্পত্তি ধোয়াইয়া ফেলিয়াছিলেন, এবং বর্তমানে ভর করিবার জন্ত স্বধায়াসম্মান করিতে-ছিলেন। উজোগামী পুরুষ-সিংহের প্রতি লক্ষ্যের রূপা অচলা। রাধানাথ

প্রমোদিনীর মাতার দ্বারা তাঁহার স্বামীর বিরুদ্ধে খোরাক-পোষাকেরা ডিক্রী করাইয়া আদালতের সাহায্যে নিয়মিত মাসোহারা আদায় করিতে লাগিলেন। তাঁহার পঞ্চ-ধরত, প্রবাসের খোরাকী ও উকীল মোক্তারের ফীর টাকা দিয়া অবশ্য কোন মাসে একপয়সা উদ্ধৃত থাকিত না। তাহা ছাড়া টাকা বাহির করিতে গেলেই রাখানাথ শহরে গিয়া জরে পড়িতেন,—কিরিয়া আসিয়া বলিতেন বোনের উপকার করিতে গিয়া তিনি স্বাস্থ্যটা মাটি করিয়া ফেলিলেন; তা স্বাস্থ্য যায় বাক, তা বলিয়া অসহায়া ছোট বোন ও তাহার পুত্রকণ্ডা যে উপবাসে মারা পড়িবে ইহা তিনি প্রাণ থাকিতে দেখিতে পারিবেন না।

প্রমোদিনীর বিবাহের জন্তও তাহার মাতা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। প্রমোদিনীর চেহার। মোটের উপর ভালই ছিল, রংও বেশ ফর্সা, কিন্তু দোষের মধ্যে তার নাকটি দক্ষিণ দিকে ঈষৎ বক্রভাবাপন্ন। এবং ইহারই ক্ষতিপূরণ ছই হাজার টাকার কম কেহ লইতে স্বীকার করিল না। ফলতঃ প্রমোদিনীর বিবাহ হইল না, পক্ষান্তরে সে দেশের স্কুল হইতে মাইনর পাস করিয়া ছাত্রবৃত্তি স্কলারশিপ প্রাপ্ত হইল। মাতাও পরলোকগতা হইলেন, প্রমোদিনীর পিতা সংবাদ পাইয়া এতদিনে বেশে আসিয়া পুত্রকণ্ডাকে দিল্লী লইয়া গেলেন এবং প্রমোদিনীর বিদ্যাহুরাগ দেখিয়া তাহাকে স্কুলে ভর্তি করিয়া দিলেন। কিন্তু শিকলাভ ও বয়ঃপ্রাপ্তির সহিত তাহার নাসিকার বক্রতাও উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল এবং ইহার ক্ষতিপূরণের দাবী হাজারের পর হাজার চড়িতে লাগিল।

ম্যাটিকুলেশন পরীক্ষায় প্রমোদিনী প্রথম স্থান অধিকার করিল, সকলেই একবারো বলিল, ওহে, সেই নাক-বাঁকা মেয়েটা এবার ফার্স্ট হয়েচে যে! প্রমোদিনীর বিমাতাও এই নাকবাঁকি ব্যতীত

তাহাকে সোধেদন করিবার কোন ভায়া খুঁজিয়া পাইতেন না। তারপর প্রমোদিনীর সে এক জীবনমরণ-সমস্যা—মেয়ে দেখার পালা। যাহারাই আসে—তাহাদের ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটিয়া উঠে এবং প্রমোদিনীর ভিতরটা জ্বালা করিতে থাকে। একবার একজন টার্না-চোথ এবং আর একবার একজন উর্চু-দাঁত তাহাকে দেখিতে আসিল, তাহার অনেক আশা হইল এইবার প্রকৃতির মিলন অবশ্যস্বাবী, কিন্তু তথাপি প্রমোদিনীর কুমারীত্ব ফুটিল না।

কতদিন সে ঘটার পর ঘটা আয়নার সমুখে পাড়াইয়া নানান দিক হইতে তাহার নাকটি পরখ করিয়া দেখিয়াছে, কিন্তু কৈ, ইহা তাহার চোখে ত এমন বিসদৃশ চৈকিত না! কেন তবে লোকে এটাকেই এতবড় করিয়া দেখিতেছে? তাহার অদ্ভুত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্বকুমার ভঙ্গি, এমন টানা টানা চোখ, এমন জমরকৃষ্ণ কেশধাম, প্রতিমার মত তুলিতে আঁকা এমন কমনীয় ঠোট-তুঁথানি—এ সব কি তবে কিছু নয়? কেবল ঐ নাসিকার বক্রতাই সত্য, আর সবই মিথ্যা? মাছঘের একি অবিচার! এই ত, নাকটি হাত দিয়া চাপা দিলে কে বলিবে তাহার মুখখানি ফুটন্ত গোলাপের মত নয়! বেশ, তবে তাই হোক, সবই মিথ্যা হোক, চায় না সে দাম্পত্য-জীবন, চায় না সে সংসার-স্বখ, পুরুষ-জাতির মুখে ছাই,—তাহার বাঁকা নাকেরই জয় হউক।

তাহার পর দাক্ষণ আক্রোশে সে এম-এ পরীক্ষা অবধি সব পুরুষ ছাত্রকে পরাজিত করিয়া প্রথম স্থান অধিকার করিল। ইহার পর আর পিতার অঙ্গ—শুধু পিতা কেন কোন পুরুষের অঙ্গই সে গ্রহণ করিবে না প্রতিজ্ঞা করিল। মনের মত চাকরিও ছুটিয়া গেল, এবং বালিকাবিচ্ছালয় সমূহের শিক্ষকগণ ও অধীন কন্মচারীরা হইতে চাপরাশি পণ্যস্ত সমগ্র পুরুষজাতি প্রমোদিনীর উত্তাপে অহরহঃ জ্বলিতে লাগিল,

যাহারা জালা সহিতে পারিল না, তাহারা সরিয়া পড়িল। তাহার পরের ঘটনা প্রথমের বাক্ত করিয়াছি। প্রমোদিনীর পিতা অবশ্য ইতিমধ্যেই পরলোকগত হইয়াছেন।

এখানে কিন্তু প্রমোদিনীর মনস্তত্ত্বের নিভৃত জায়গাটা আর একটু খোঁজ করা দরকার মনে করিতেছি। প্রমোদিনীর জীবন-যাত্রায় বিলাসের লেশমাত্র ছিল না, তাহার জীবন-ধারণ কৃচ্ছ্রসাধনেরই নামাস্তর। কিন্তু ইহাকে বৈরাগ্য বলিয়া অভিহিত করিলে ভাবীকালের ঐতিহাসিক আমার গলা টিপিয়া ধরিবেন, তাই প্রকৃত ব্যাপারটার একটুখানি আভাস না দিয়া থাকিতে পারিতেছি না। প্রমোদিনী মনে-প্রাণে কখনই অবশ্য একথা স্বীকার করিত না, কিন্তু তাহার এই বক্রমাসিকার উচ্চতম অর্থদণ্ড কত হইতে পারে—তাহা দেখিবার জ্ঞান বোধহয় তাহার চিত্তের অতি অব্যক্ত স্তরের এবং তাহার ক্ষীণতম আলালোকে বসিয়া প্রহর গণিতেছিল। আসল ও স্বদের অল্প যতই বাড়িতেছিল, সেই জীবিত ততই মাথা তুলিয়া প্রমোদিনীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছিল। কিন্তু স্বদের জালা ত তাহার কমে নাই, সে কিন্তু সেই জালা বন্ধে বহিয়া প্রত্যাখ্যানরত লোকসমাজে নিলাম ডাকাডাকি করিবে? কাজটার দুইরূপ যতই চোখে চৈকিতে লাগিল, ততই সে ক্রমশঃ হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া উঠিতে লাগিল। এক্ষেত্রে হিরণ্যকশিপু মনোভাবই স্বাভাবিক, তাই তাহার সমরায়োজন দিন দিন বাড়িতেছিল। সেদিনকার নারীশিক্ষা-সম্মেলনে সে আর থাকিতে পারিল না, একেবারে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া দিল। বলিয়া বসিল—পুরুষ মাজেই অপেক্ষ, কামাসক্ত এবং অতি নম্রার জাত, উহাদের সংসর্গ-সম্প্রতিভাবে ত্যাগ করিতে না পারিলে নারীজাতির কল্যাণ ত দূরের কথা, অস্তিত্বই

বজায় থাকিবে না। কাহারও জীবন-সঙ্গিনী হওয়া অপেক্ষা জীবন-তাগই শ্রেয়। এতদিন মেয়েরা পুরুষদের দাসীপনা করিয়াছে, এইবার মেয়েদের পালা, পুরুষরা কেবলমাত্র তাহাদের দাসজাতি হিসাবে রাখিয়া থাকিতে চায় থাক, নচেৎ উহাদের উচ্ছেদসাধনই কর্তব্য। ইত্যাদি। ফলে চাকরি ত গেলই, ব্যাঙ্কের অফটাও পাণ্যশিলার মত বন্ধে চাপিয়া বসিল এবং কলয়বাসী সেই খাপদটা স্বদয়ের শিরা-উপশিরা টানিয়া ছিঁড়িতে লাগিল। পুরী হইতে কুমারিকা অন্তরীপ, মহাদ্রি পর্বতমালা, পকসিদ্ধ, গঙ্গা-যমুনা আসামের নদীতীরবাসী স্বগভীর অরণ্য—সব দর্শনমাজেই তাহার স্বদয়ের অধ্যাপণ্ডাতে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল।

তারপর একদিন শাওতাল পরগণার এক নিভৃত গ্রামে প্রমোদিনী তার পিসিমার বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পরনে ব্রীচেস, হাটু অবধি বুট আঁটা এবং হাতে বন্দুক দেখিয়া পিসিমা বিস্মিত হইলেন বটে, কিন্তু পরম সমাদরে তাকে স্থান দিলেন। প্রমোদিনী সমস্ত দিন নদীর চরে শিকার অন্বেষণে খুরিয়া বেড়াইত এবং সন্ধ্যার সময় বথন ঘরে ফিরিত তাহার মুখে রক্তের উজ্জ্বল দেখিয়া পিসিমা ভয়ও পাইতেন স্নেহও করিতেন। তাহার এই অস্বাভাবিক নারীস্ববৃত্তি-আচরণে কোতুলী গ্রামবাসীগণ কেহ কেহ তাহার অন্তরঙ্গ প্রস্তুত হইয়াছিল, কিন্তু প্রমোদিনী তাহাদিগকে গুলি করিয়া মারিবে বলিয়া ভয় দেখাইলে তাহারা তাহাকে বন্ধপাগল সাবাস্ত করিয়া ছাড়িয়া দেয়।

একদিন প্রমোদিনী বহুদূর ঘুরিয়াও কোন শিকারের খোঁজ পাইল না। ক্রমশঃ তাহার রাগ সপ্তমে চড়িল। সামনে একটা চিল অথবা কাক দেখিতে পাইলেও সে নিশ্চয় গুলি করিবে—প্রতিজ্ঞা করিল। গ্রীষ্মকালের দ্বিপ্রহর, রোদ স্বা স্ব করিতেছে। তুম্বায় প্রমোদিনীর কর্তৃত্ব ফাটিয়া বাইতেছে, অথচ নদীর জলধারা শুষ্ক, যতদূর

চোখ যায়—শুধু তৃণভক্ষণী বালুকার উদ্দীপ্ত বিস্তার, এক বিন্দু জল কোথাও নাই। প্রমোদিনী মাতালের মত টলিতে টলিতে পথ চলিতেছে—শিকার তাহার চাই-ই। হঠাৎ দূরে একটা বেতের ঝোপ তাহার চোখে পড়িল। নিকটে গিয়া প্রমোদিনী দেখিল ঝোপের ওপারে একটি স্বর্ণপরিসর ঝিল, তাহাতে জল যাহা আছে তাহাও শেওলায় পরিপূর্ণ। রৌদ্রের তাপে শেওলাগুলি যেন সিদ্ধ হইতেছে, এবং গাঢ় সবুজবর্ণ জলের উপর জলীয় বাষ্প কাঁপিয়া কাঁপিয়া আকাশে উঠিতেছে, তাহার অস্বাভাবিক গন্ধ দূর হইতেই নাক লাগে। প্রমোদিনী ভাবিল দূর হোক ছাই—আজ এই জলই আকর্ষণ পান করিয়া সে তৃষ্ণা মিটাইবে। কিন্তু ঝোপের মধ্যে যেন কাহার চাপা নিশ্বাস তাহার কানে লাগিল। প্রমোদিনী নিকটে গিয়া দেখিল এক সাঁওতাল যুবক ঝিলের মধ্যে একদৃষ্টে চাহিয়া শর-সন্ধান করিতেছে—সুগঠিত, নিটোল, মসৃণ ও চিক্চিক্‌রূপ তাহার দেহ। তাহার দৃষ্টি অহুসরণ করিয়া প্রমোদিনী দেখিল একজোড়া পানকোটী ঝিলের জলে ডুবিতেছে ও উঠিতেছে। প্রমোদিনী তৎক্ষণাৎ বন্দুক উচাইয়া ধরিল—শিকারের এ স্বর্ণ স্বযোগ ওই সাঁওতালটাকে ছাড়িয়া দেওয়া চলিতেই পারে না। বহুক্ষণ উভয়েরই লক্ষ্য স্থির, অথচ তীর কিংবা গুলি কোনটাই ছুটিল না। পানকোটী-মৃগল যে স্বামী-স্ত্রী তাহাতে কাহারও সন্দেহ নাই, একজন ডুবিয়া এক-একটি ছোট মাছ ধরিয়া অপরকে খাওয়াইয়া দিতেছে এবং পরমুহূর্ত্তে অপর জন তাহার ঋণ শোধ করিতেছে। তাহাদের চক্ষু, পঙ্কজ এবং সর্পাঙ্গ দিয়া যেন যেহ ঋত্বিয়া পড়িতেছে, মাঝে মাঝে উভয়ে এত বেসাধেসি করিয়া উভয়ের অঙ্গ আবেষ্টন করিতেছে—যেন তাহাদের দুই দেহ এক হইয়া যাইতেছে। প্রমোদিনী বুদ্ধিতে পারিল না ইহা প্রথম স্বাভাবিক অথবা বসন্তের জ্যোৎস্না, ইহা

কাঁটাবেতের ঝোপ অথবা স্বর্গোদ্যান, পার্শ্ববর্তী শিকারী সাঁওতাল যুবক অথবা সে সাক্ষাৎ গাভীবধারী অর্জুন! উভয়ের হাতের অস্ত্র থমিয়া পড়িল এবং উভয়ে পরস্পরের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। প্রমোদিনীর অধরে অনন্ত কালের হাসি এবং শিকারী যুবকের চক্ষে চিরন্তন বিষময়ের প্লক! প্রমোদিনী তুলিয়া গেল—সে কে এবং কোথায়, অথবা ইহা কোন কাল। তাহার অধরের তৃষ্ণা যেন চুষকের মত তাহার প্রতিবেশীকে আকর্ষণ করিতে লাগিল; নিকটে—আরও নিকটে, প্রতিমুহূর্ত্তে সংশয়ের কাল ধনীভূত হইয়া উঠিতেছে, শেষে যেন মাত্র একটি বিন্দু—স্ফিটর অগ্রভাগের ছায় ক্ষীণ অথচ তীক্ষ্ণ, অবশেষে তাহাও মুছিয়া যায় আর কি! সহসা প্রমোদিনীর মনে হইল কিরাত যুবক যেন তাহার নাসিকার প্রতি একাগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে—তাহার বিষয় যেন অপরিসীম বিদেহ। অমনি সহস্র বুদ্ধিক তাহার অণুপরমাণুতে হল ফুটাইয়া দিল,—সে ছুটিল—যেন প্রাণভয়ে ছুটিয়া চলিল, হাতের বন্দুক পড়িয়া রহিল—ফিরিয়াও চাহিল না।

(২)

প্রমোদিনীর ভ্রাতা প্রশান্তকুমার মৃতদার। বিবাহের দুই বৎসর পরে পত্নীবিয়োগ হইলে পরবর্তী দুই বৎসর সে মানসিক চিকিৎসালয়ে কাটাইয়াছিল। বাহির হইয়া অবধি কাহারও সহিত বিশেষ কথাবার্তা করিত না। জীবনে কাহারও সহিত যাচিয়া বন্ধুত্ব করে নাই, কেবল দুইজন প্রৌঢ় ব্যক্তি—সারদা মিত্র ও বরদা পাত্র—কি স্বভেদ প্রশান্ত-কুমারের সহিত তাহাদের প্রথম আলাপ হইয়াছিল তাহা কেহ বলিতে পারে না, নিঃস্মিতরূপে তাহার বৈঠকখানায় আসিত। প্রত্যেক দিন

যে প্রশান্তকুমার তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিত তাহা নহে, বৈঠকখানা ঘরে তাহারা প্রায় একই সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইত এবং যে বাহার নির্দিষ্ট স্থানটিতে বসিয়া থাকিত। ভৃত্য আসিয়া গড়গড়া ফিরাইয়া তামাক সাজিয়া দিত,—যেদিন সারদা মিত্র প্রথম ধরিত সেদিন সে আর ছাড়িত না, কারণ বরদা পাত্র যেদিন ধরিত সেদিন সারদা মিত্রের কথা তাহারও মনে পড়িত না। অথচ কেহ মুখ ফুটিয়া কোন কথা বলিত না, বলাটী অপমানকর বোধ করিত। সারদা মিত্র পুঞ্জীভূত আক্ষেপ বক্ষে চাপিয়া বিরস বদনে ক্যাথিসের জুতাটি পরিতে পরিতে সম্মুখের দেওয়াল লক্ষ্য করিয়া বলিত, না, এইবার ওঠা যাক; বরদা পাত্র তৎপরদিবস অবরুদ্ধ আকোশে ছাতার বাঁটাটা উপযুপরি নিজেয় ঘাড়ে লাগাইয়া টানিতে থাকিত। যেদিন প্রশান্তকুমার বাহিরে আসিত সেদিন সারদা মিত্র হয়ত গলাটা একবার ঝাড়িয়া লইত, বরদা পাত্র নজের ভিবাটি বাহির করিয়া প্রশান্তের দিকে আগাইয়া দিত, কিন্তু অধিকাংশ দিনই কোন কথাবার্তা হইত না। তথাপি তিনজনের মধ্যে তৎকালের জ্ঞান একটা দৃঢ়তার ভাব বিরাজ করিত। যেদিন প্রশান্তকুমার বলিত—আজ বড় শীত পড়েছে অথবা আজকে পেটটা ভাল নেই—সারদা ও বরদা প্রত্যুত্তরে কোন কথা না বলিলেও অল্পভঙ্গি দ্বারা এক্রপ ভাবপ্রকাশ করিত যেন উভয়েই ইহার সম্পূর্ণ অম্বুমোদন করিতেছে।

জাতৃগৃহে প্রমোদিনীর অপ্ৰত্যাশিত আবির্ভাব একটি স্মরণীয় দিন। সেদিন বরদা পাত্র সোৎসাহে সারদা মিত্রকে হঁকা ছাড়িয়া দিয়াছিল এবং সারদা মিত্র প্রত্যাশকার স্বরূপ বরদা পাত্রকে বলিয়াছিল, আপনার মাথায় বোধহয় তুলো লেগে আছে, ঝেড়ে ফেলুন। প্রশান্তর কুকুরটা ভক্তাপোষে উঠিয়া বলিল তাহার মন্তকে সারদা মিত্র এবং ল্যাঞ্জে বরদা পাত্র অনেকক্ষণ একযোগে হাত বুলাইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের

এই অন্তরঙ্গতা স্বাধীভাব ধারণ করিতে পায় নাই, কারণ পরদিবস বরদাপাত্র হঁকা ছাড়িতে তুলিয়া গেল এবং কুকুরটার গায়ে হাত পর্যন্ত দিল না, মনে করিল, ও ব্যাটা হাত বুলাইবে মাথায়, আর আমি ল্যাঞ্জে? কথখনো না! সারদা মিত্র ভাবিল, আমার একারই বা কি দায়টা পড়িয়াছে? ফলতঃ কুকুরটা উভয়ের ঘাড়ের উপর লাফাইয়া এক-একবার চাটিয়া দিয়া পঞ্চারৌ স্বভ্রাতীঘের পশ্চাদগমন করিল।

প্রমোদিনী আসিয়াই ভ্রাতার সহিত নিভৃত্তে অর্ধঘটাকাল কি কথা কহিয়াছিল তাহা জানিতে পারা যায় নাই, তবে খুব সম্ভব উভয়ের মধ্যে এক্রপ ধরণের একটা পাকাপাকি রকম চুক্তি হইয়াছিল যে কেহ কাহারও কাব্য কলাপে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিবে না অথবা কিছুমাত্র কৌতুহল প্রকাশ করিবে না। প্রশান্তকুমারের পক্ষে ইহা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক ছিল, কারণ সে বিনা চুক্তিতেও বোধহয় এই সর্ব পালন করিয়া চলিত। কিন্তু প্রমোদিনী শেষ পর্যন্ত কথার ঠিক রাখিতে পারিয়াছিল কিনা—তাহাই দেখা দরকার।

প্রমোদিনী পত্র লিখিয়া দেশ হইতে তাহার রাধু-মামাকে লইয়া আসিল এবং গোপনে তাহার সহিত বহুক্ষণ ধরিয়া পরামর্শ করিল। ইহার কয়েকদিন পরেই অমৃতবাজার পত্রিকায় নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি বাহির হইল—

Wanted a husband, for a retired Inspectress of schools of medium age and rosy complexion. Decent dowry. Candidate must apply in his own hand with credentials and photograph.

রাধানাথ প্রমোদিনীর নিকট রোজ ছই টাকা ঈমভাড়া লইত, সে প্রজাপতি অফিস হইতে আরম্ভ করিয়া ছোটবড় যত প্রকার ঘটকদের

আজ্ঞা আছে সব তত্ত্ব করিয়া খুঁজিয়া বাহির করিল; এবং সব জায়গায় কিছু কিছু টাকা দান দেওয়া হইল। রাধানাথ সন্ধ্যার সময় ফিরিলে প্রমোদিনী তাহাকে লইয়া অনেকক্ষণ ঘরে থিলবন্ধ করিয়া কথাবাস্তা কহিত এবং আলোচনার শেষে রাধানাথ বলিত, ভাগ্নি, একটা টাকা দাও তো, আজ বড় ঘোরা হয়েছে, গা-হাত এমন ব্যথা করছে যে একটু ওষুধ খেয়ে আসতে হবে, নইলে কাল সকালে বেরোতেই পারব না। রাধানাথ টাকাটি বাজাইয়া লইয়া গ্রন্থান করিত।

প্রমোদিনীর টেবিলে দরখাস্ত ও সার্টিফিকেটের ফাইল গাদা হইয়া উঠিতেছে। একদিন রাধানাথকে ডাকিয়া সে বলিল, রাধু-মামা এইবার ত বাছাবাছি করলেই হয়, কি বল?

রাধানাথ বলিল, তুমি বাস্ত হ'চ্ছ কেন ভাগ্নি, আর ছ'চার দিন দেখাই যাক না। আমি খুঁজছি পচিশের নীচে রয়েম, এ ব্যাটারদের ছরি দেখে বোধ হয় কেউ পঞ্চাশ কেউ যাটের ওপর।

প্রমোদিনী হাসিয়া বলিত, তুমি যা ভাল বোঝ রাধু-মামা—তাই কর, তুমি মাথার ওপর থাকতে আমি আর কি বলব!

রাধানাথ খুশী হইয়া জবাব দিত, সে তোমায় বলতে হবে কেন ভাগ্নি, এ ত আমারই কল্যাণ, যদি একটু দেখে-ভ্রমে না দিতে পারি, এর পর শব্দরথের গিয়ে কষ্ট পাব, আমাকেই মনস্তাপে মরতে হবে।

তারপর সে হাই তুলিয়া তিনবার টসকি দিত এবং বাস্তভাবে বলিত, ঐ যা; চায়ের দোকানে কালকের দামটা বাকী রয়ে গেছে ত! কাল হেঁটে হেঁটে খিদেয় প্রাণ যায় আর কি, সামনের দোকানে উঠে গোটা ছ'দেক চপ আর এককাপ চা খেয়ে তবে—

প্রমোদিনী বাস্ত হইয়া হ্যাওবাগ হইতে টাকা বাহির করিয়া দিত,

রাধানাথ বাজাইয়া লইয়া অগ্রমনস্কভাবে বলিত, হরি হে, সব তোমারই লীলা।

ভিতরের কথাটা যতদূর জানি তাহা এই যে রাধানাথ গোপনে প্রত্যেক দরখাস্তকারীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছে, কিন্তু কেহই তাহার উপযুক্ত দস্তরি দিতে স্বীকার করে নাই।

একদিন রাধানাথ আসিয়া বলিল, ওসব দরখাস্ত ছিড়ে ফেলে দাও ভাগ্নি! আজ যাকে দেখে এলাম, পাত্র নয়ত যেন সোনার চাঁদ! একেবারে বিয়ের দিন পঞ্চাশ টিক করে এসেছি,—তবে পণের টাকাটা আগেই দিতে হবে বলেছে। এবার এদিকের হাটবাজারগুলো সেরে ফেলতে পারলে হয়।

প্রমোদিনী আনন্দের আতিশয্যে কহিল, সব ত ধোমাকেই করতে হবে রাধু-মামা, আমার আর কে আছে বল না!

রাধানাথ কয়েকদিন প্রাণ ভরিয়া বাজার করিল। দেশ হইতে প্রমোদিনীর পিতৃকুলের খোড়া পুরোহিত মহাশয়কেও আনাইল। প্রমোদিনী গরদের শাড়ী পরিয়া গলবস্ত্র হইয়া তাহাকে প্রণাম করিল এবং নিজের গায়ে গঙ্গাজল ছিটাইয়া তাহার আঙ্গিকের যোগাড় করিতে লাগিল।

প্রশান্তকুমারের বৈঠকথানায় এ সব উল্লেখ-আয়োজনের কোন বাস্তা প্রবেশ করিত না। বরদা পাত্র ভাবিত উপরকার ঘরে প্রমোদিনী আছেন, সারদা মিত্রও তাহাই ভাবিত। তিনি আছেন—এই সংজ্ঞা ব্যতীত আর কোন চিন্তা তাহাদের ধুমায়িত মস্তিষ্কে স্থান পাইত না। কেবল রাধানাথ এক-একদিন বাহিরে যাইবার পথে বাস্তসম্মত হইয়া—দিন ত মশাই কল্কেটা একবার—বলিয়া নিজেই গড়গড়ার মাথা হইতে কলিকটি তুলিয়া লইয়া কয়েকটি মারাত্মক রকম টান দিয়া গ্রন্থান

করিত। উভয়েই বৃষ্টিত ইহার পর কলিকার মধ্যে রসাস্বয়ণ করিতে যাওয়া একেবারে নিরর্থক।

(৩)

গোধূলি লগ্নে প্রমোদিনীর বিবাহ। বাড়ীর উঠানে আসুর পাতা হইয়াছে—পাত্র বরাদ্দনে সমাদীন। বরযাত্রীর মধ্যে—একমাত্র নাপিত, সে আবার ভূতাও বটে। বরের চেহারা দেখিয়া বয়স অস্বাভাবিক দৃশ্য। কপালে ও চোখের নীচে বয়সের ভাঁজ পাউডারের ঘনীভূত স্তরে সর্বিশেষ ঢাকা না পড়িলেও, মুখখানি সর্বদাই হাসি-হাসি করিতেছে এবং যৌবন-স্বলভ চপলতা যৌবনের অভাব পূর্ণ করিতেছে। পাত্র একবার পুরোহিত মহাশয় ও একবার রাধানাথের দিকে ফিরিয়া ঠাট্টা-তামাসা করিতেছেন। বরযাত্রীর অভাব ও পাত্রের বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি দেখিয়া প্রমোদিনী প্রথমটা একটু দমিয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু রাধানাথ তাহাকে বুঝাইয়াছে, পাত্র অগাধ টাকার মালিক ও অদ্বিতীয় পণ্ডিত, নিকল্‌য়-চরিত্র ও অতি সরল-স্বভাব। তাহার পিতা অত্যন্ত এক দুঃখপোষা নাবালিকার সহিত তাহার সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিলেন—তাই সে গোপনে পলাইয়া আসিয়াছে—প্রমোদিনীর জায় বিহীন কুমারীর পাণিগ্রহণের আশায়, কারণ যোগ্য যোগ্যে যোগ্যে।

রাধানাথ একাই একশ। ঘন ঘন শাপ বাজাইল, স্ত্রী আচার সম্পন্ন করিল, চন্দন বাটিল, মালা গাঁথিল, কলা ছাড়াইল এবং কত্যা-সম্প্রদান করিবার জন্ত প্রমোদিনীকে উপর হইতে লইয়া আসিল। প্রমোদিনীকেও আজ মানাইয়াছে চমৎকার! লাল চেলি, আবক্ষ

ঘোমটা ও সলজ পদক্ষেপের মধ্যে যে সেদিনকার নারীশিক্ষা-সম্মেলনের অমিশ্রাণী অভিভাষণের নায়িকা সুস্বাদিত রহিয়াছে, তাহা আমি অন্ততঃ কল্পনা করিতেই পারিব না। তাহার এই বধুরূপই যেন চিরকাল-সত্য, এম-এ পাস, চাকরি, বক্তৃতা, কুহুর-বধ ও পাণী-শিকার—সব মিথ্যা। কিন্তু তাই বলিয়া সে প্রথম রজনীতেই তাহার প্রিয়তমের হস্তে আত্মসমর্পণ করিবে না—ইহা সে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল। সে শূঙ্খ অধিমান করিবে, একেবারে পায়ে ধরাইয়া তবে ছাড়িবে,— কেন এত দেরী? এককাল ধরিয়া কেন তাহাকে একরূপ মর্দখ্যাতনা দেওয়া? আর যখন সকল মুকুল ঝরিতে বসিল তখনই বা কেন ডাক দিয়া তাহাকে এমন পাগল করিয়া তোলা? যাহা হউক, শুভকর্ষী একবার ভালোয় ভালোয় হইয়া যাক, তাহার পর সে মজা দেখাইবে!

প্রমোদিনী: আসিয়া বরের পাশে বসিল, পুরোহিত মহাশয় অনর্গল সাহসান্বিত আর্থভাষা প্রয়োগ করিয়া যাইতে লাগিলেন। এইবার উভয়ের হস্ত ধারণ করিয়া একত্র মিলিত করাইবেন। রাধানাথ কিন্তু ক্রমশঃ চকল হইয়া পড়িতেছে এবং দ্বারের প্রতি ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতেছে। এমন সময় দরজার গোড়ায় একটি গাড়ী থামিবার শব্দ এবং বিবাহ-সভায় অকস্মাৎ মহা সোরগোল! তারপর জড়োয়া গহনায় আগাগোড়া ঢাকা একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক ছুটিয়া আসিয়া বরের গলার উত্তরীয় ধরিয়া যে-সব কথা তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতে লাগিল তাহার মধ্যে অনেক বাদসাদ দিলে এইরূপ দাঁড়ায়—

বটে মুখ-পোড়া! তোর পেটে পেটে এত বিদ্যো! ভজলোকেয় মেয়ের কুল মজাতে এখানে এসেছিস! 'তিন দিনের মধ্যেই তোমার হার গড়িয়ে আনছি।' এই তোর তিন দিন? লাথি মেরে মুখ

ভোতা করে দেব জানিস! ভাগ্যে সীধু নাপতে গিয়ে বেলাবেলি আমাকে বলে এল, নইলে ত—(ঝাড়িয়া নাকে এক ঘুসি মারিল)। চল হারামজাদা, তোরা বিয়ে পরে হবে, আগে তোরা বাপের বিয়ে দেব দেখবি চল।

সীধু নাপিত পুর্কেই পলাইয়াছে। বরকে শুধুমাত্র টাগ-অব-ওয়ারের জোরেই টানিয়া লইয়া স্ত্রীলোকটি গাড়ীতে বসিল। গাড়ীর মধ্যে ভীষণ হটপাট এবং রক্ষা কর রক্ষা কর—চীংকার শুরু হইল। কিন্তু গাড়ী চলিয়া গেল।

এদিকে রাধানাথ—হায় হায়, সর্কনাশ হ'ল—বলিয়া মাথাঘ হাত চাপড়াইতে লাগিল এবং প্রমোদিনী ঘোমটার মধ্যে থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

প্রশান্তকুমার, সারদা মিত্র ও বরদা পাত্র তিন জনে নিস্তরঙ্গ ও নিকরিকার হইয়া বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া আছে। রাধানাথ সেখানে গিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল। বরদা পাত্রের পায়ে ধরিয়া সে কি কহিল! আপনি ভুল্ললোকের মেয়ের কুলমান রক্ষা করুন, গায়ে-হলুদ হ'য়ে গেছে, এর পর বিয়ে না হ'লে চোন্দ পুরুষ নরকস্থ হবে! প্রশান্তকুমার অথবা সারদা মিত্র কোন উচ্চবাচ্য করিল না, বরদা পাত্রকে রাধানাথ কোলপাচ্চা করিয়া তুলিয়া আনিয়া একেবারে বরের আসনে বসাইয়া দিল। কি ঘটতেছে অথবা উহার কারণ—বরদাপাত্র কিছুই বুঝিতে পারিল না। যেন তৎকালের জঘ্ন তাহার সব শ্রুতি-শক্তি লোপ পাইয়াছে, এবং মস্তিষ্কের ক্রিয়া একেবারেই বন্ধ। কল্পা-সম্প্রদান হইয়া গেল,—এইবার শুভদৃষ্টি। রাধানাথ অশ্রুজল কণ্ঠে প্রমোদিনীকে কহিল, মা, এইবার মুখ তুলে চাও; ভাল করে দেখে নাও। চিরদিন ঘর করতে হবে, কোন লক্ষ্য কোরো না।

চারি চক্ষের মিলন হইতেই বরদা পাত্রের ত্রেন ছ ছ করিয়া ওয়ার্ক করিয়া গেল, এবং ব্যাপারটি দ্বয়ঙ্গম হওয়ায় রাধানাথ, তোমার মনে এই ছিল!—বলিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল। ধর ধর ধর, কি হ'ল কি হ'ল—শব্দে রাধানাথ ছুটিয়া আসিল।

প্রমোদিনী কাঁদিয়া কহিল, রাধুমামা, শীগ্গির ডাক্তার ডাক, এফুনি যাও, আমি গুর চোখে মুখে জলের আপটা দিচ্ছি।

ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করিয়া কহিলেন, Death of heart-failure। এবং ভিজিট লইয়া প্রস্থান করিলেন।

কথাটা প্রশান্তকুমার ও সারদা মিত্রের কানে গিয়াছিল, রাধানাথ বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া দেখিল তাহারা শুইয়া আছে। সারদা মিত্র ভাবিতেছিল, বরদা পাত্র আর ইহজগতে নাই, আর সে তাহাকে জ্বালাইবে না! কিন্তু ইহাই কি সারদা মিত্র চাহিয়াছিল? হোক না লোকটা পাজী, প্রাণী ত একটা: বটে! ছুইজনে এই ঘরে কতদিন নিঃশব্দে বসিয়া পরস্পরের অস্তিত্ব অহুভব করিয়াছে, এবং মনে মনে উভয়ে উভয়কে গালাগালি দিয়াছে! এইমাত্র বরদা নলটি ধরিয়া বসিয়াছিল, কতক্ষণ টানিত, কে জানে! কিন্তু তাহার তামাক খাওয়া জন্মের মত ফুরাইল! সারদা মিত্র শ্রদ্ধাভরে বরদা পাত্রের স্থানটিতে গিয়া বসিল, এবং সে যেমন ভাবে নলটি ধরিয়া মুখে দিত, সারদা তেমন করিয়া নলটি ধারণ করিল, কিন্তু টানিবার পুর্কেই তাহার চক্ষে অশ্রু ভরিয়া উঠিল এবং সে প্রশান্তর পাশে গিয়া শুইয়া পড়িল।

রাধানাথ আসিয়া প্রশান্তকে জিজ্ঞাসা করিল, গুর বাড়ীর ঠিকানাটা তোমরা কেউ জান? একটা খবর ত দেওয়া দরকার, সংস্কারেরই বা কি হবে?

প্রশান্তকুমার কড়িকাঠের দিকে চাহিয়া বলিল, বেনেটোলায়
কত নখর বাড়ীটা খেন—

সেকি! নখরটা তোমার মনে নেই?

না।

রাধানাথ সারদা মিত্রকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি জানেন মশাই?

সারদা মিত্র নিঃশব্দে মাথা নাড়িল।

রাধানাথ কহিল, তবে, উপায়? ও প্রশান্ত, তুমি যে নড়তেই
চাও না হে, আমারই কি যত দায় নাকি! বলি ঠর আত্মীয় স্বজন কেউ
কোথাও আছে জান?

একবার খেন বলেছিল—বড় ছেলেটা অফিসে চাকরি করে, তার
অবস্থা করেছিল তাই কদিন আসতে পারে নি, কিন্তু তার নাম ত
জানি না।

ধুস্তোর ছাই, কি হাঙ্গামাতেই পড়েছি আমি—বলিয়া রাধানাথ
সারদা মিত্রকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিল, মশাই, আপনি একবার আসুন ত
ভেতরে, একটা যুক্তি করা যাক।

এতক্ষণে প্রশান্ত উঠিয়া বসিয়া কহিল, আপনিও ভেতরে যাচ্ছেন
তাহলে কিছু আগে আপনার বাড়ীর ঠিকানাটা বলে যান।

সারদা মিত্র ভয়-ব্যাঙ্কলিত কণ্ঠে বলিল, কেন, কেন, কি হয়েছে?
আমাকেও আবার, না না, আমার ঘরে যে ছই পরিবার বর্তমান
আছেন—এ অবস্থায় আমি কি করে—

‘আরে আসুন ত মশাই’—বলিয়া রাধানাথ যেই তাহার হাত
ধরিতে গেল, সারদা মিত্র মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হইয়া গেল।

প্রমোদিনী নাকে ক্রমাল বাদিয়া শব্দা আশ্রয় করিয়াছে, তাহার
মাথায় সিঁদুর, পায়ে আলতা, পরনে সেই বিবাহের চেলি। রাধানাথ
অনেক ডাকাডাকি করিল, কিন্তু সে সাড়া দিল না।

রাজি বিপ্রহরে রাধানাথ ও লাংড়া পুরোহিত মহাশয় বরদা পাতকে
ঘাড়ে করিয়া নিমতলা অভিমুখে যাত্রা করিল।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ সিংহ

চলচ্চিত্র

জী. বী. শ-এর দীর্ঘতা, বিকল্পে



দীর্ঘ জী. বী. শ

শতপ্রকার বৈচিত্র্যই সিনেমার আকর্ষণ

বৈচিত্র্য নং ১



উৎসব

বৈচিত্র্য নং ২



ব্যসনে চৈব

বৈচিত্র্য নং ৩



ছবিগে—

অরসিকেয় রসস্থ নিবেদম্



বাবসায়ীর রসিকতা

সংবাদ সাহিত্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শরৎচন্দ্রকে ডাক্তার উপাধি দিবেন এ সংবাদ শ্রবণ করিলামাত্র শরৎচন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তাহিত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতলব কি? আমার সহিত ইয়াকি করিতেছে না! ত! ডাক্তার হইব কেন? লিখিলাম থানকত গল্পের বই, অথচ ডাক্তার! ডাক্তার মানে কি? শরৎচন্দ্র এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে মাথা ঘুরিয়া ক্রমিতে লুটাইলেন। এ বিপদ হইতে তাহাকে কে উদ্ধার করিবে? পৃথিবীতে এমন বন্ধু কে আছে? একবেলা পড়িয়া থাকিবার পর হঠাৎ মনে পড়িল “ঠিক বটে, ঠিক,”—অবিনাশ ঘোষালকে জিজ্ঞাসা করিলেই ত হয়! সে ‘প্রাকৃতিক’ ভাষা জানে, এবং বাংলাভাষার বংশপরিচয় তাহার কর্তব্য। এই ত সেদিন কাজি নজরুলকে বলিয়াছে তাহার বাংলাভাষা সম্বন্ধে কিছু বলিবার অধিকার নাই, কারণ “সংস্কৃতই যে বাংলা ভাষার জননী” একথা কাজী জানে না। অবিনাশ জানে।

সুতরাং শরৎচন্দ্র এই অবিনাশকেই ডাকিলেন এবং ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—আচ্ছা অবিনাশ, ঢাকার মতলবটা কি? দুইচারটি নার্কোটিক ছাড়া ত আর কোনো ঔষধের নাম জানি না, তবে ডাক্তার উপাধি দিতে চায় কেন? ডাক্তার মানে কি? মতলব খারাপ নয় ত? মাইরী, এ যে ঘোর বিপদ!

অবিনাশ বলিল, ডাক্তার মানে জানি না, তবে আমি বলিতেছি, আপনার কোনো ক্ষতি হইবে না। ভাবিয়া দেখিবেন, আমি

শনিবারের চিঠি

৮৭৫

বলিতেছি। আমি কি না বলি? বাংলাভাষা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি উহাকে ভিত্তি করিয়া যদি আপনি একটা প্রবন্ধ ঢাকায় পড়িয়া আসেন তাহা হইলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও চূপ করিয়া থাকিবে না—অন্তত কবিরাজ-জাতীয় একটা উপাধি দিবেই। ‘আমার বিদ্যার বহর দেখিয়া আপনি আমাকেই যে আপনার পরামর্শদাতারূপে বাংলাদেশের ভিতর হইতে বাছিয়া লইয়াছেন ইহাতে আপনার বিদ্যার বহরও সকলেই দেখিতে পাইবে—কুছ পরোয়া নেহি—উপাধি ছাড়িবেন না—Be courageous, boy, বলিয়া অবিনাশ শরৎচন্দ্রের পিঠ চাপড়াইয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল।

বাহির হইয়া সোজা বাতায়ন অফিসে আসিল—এবং সেখানে বসিয়া লিখিল—

শরৎচন্দ্রকে ডি-লিট উপাধি প্রদান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইস-চ্যান্সেলারের অমুরোধ পত্র

“উপাধি গ্রহণ করিলে বিশ্ববিদ্যালয় দৃঢ় হইবে”

“ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্বে শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে ডি, লিট উপাধি প্রদান করবার ইচ্ছা প্রকাশ করবার সংবাদ ইতিপূর্বেই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইস চ্যান্সেলার শরৎচন্দ্রকে অহনয় বিনয় করে [প্রায় পা জুড়াইয়া দিয়া!] জানিয়েছেন তিনি যেন এ প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ না করেন। তিনি আরো বলেছেন, এই উপাধি তাঁর কোন গৌরব বাড়াবে না কিন্তু তা গ্রহণ করলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিজেকে দৃঢ় মনে করবে। পত্রখানি পেয়ে শরৎচন্দ্র বড় বিব্রত হয়ে পড়েন—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ উপাধি গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে উচিত হবে কি না, এ সম্বন্ধে তাঁর মনে সন্দেহ জাগে।

এই সম্মেলন দূর করবার জন্তে তিনি শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় ও শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ঘোষালকে এ সম্বন্ধে তাদের মতামত জানাতে বলেন। এর মধ্যে যে দোষের কিছুই নেই নানা যুক্তির দ্বারা এই কথাটা যখন তিনি উপলব্ধি করলেন তখন তা গ্রহণ করার মধ্যে তাঁর আর কোন আপত্তি রইল না। আগামী এপ্রিল মাসে এই উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কনভোকেশন হবে শরৎচন্দ্র তখন সশরীরে উপস্থিত থাকবেন, এমনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।" (বাতায়ন ১৪ ১৮জ ৪২)

শেষ কয়েক লাইনে অবশ্য লেখক এই কথাটি ব্ৰুকাইতে চাইয়াছেন যে ঢাকা এপ্রিল মাসে স্বর্ণের পরিণত হইবে এবং শরৎচন্দ্র সেখানে সশরীরে যাইবার মত পুণ্য অর্জন করিবেন। বোধহয় ইহা দ্বারা এপ্রিলের ঝড়ে পদ্মায় সীমার ডুবির ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

অয়শ্রীতে শ্রীবৈদেহী দেবী কি বলিতে চাহেন স্পষ্ট করিয়া বলুন। তিনি অস্পষ্টভাবে বাহা বলিতেছেন তাহা এই—

মর্ভার্ণু যুগে যে নারীও সম্পূর্ণ মর্ভার্ণু হইবে এই তো সঙ্গত ও স্বাভাবিক। পুরুষ যেখানে চলছে অতি দ্রুত গতিতে তাদের চিন্তা, বাক্য ও কাণ্ডের ভিতর প্রকাশ পাচ্ছে গতিশীলতা ও চঞ্চলতা—নারীও যে সেখানে সে গতিশীলতাকে বরণ করবে এ আর বিচিত্র কি? যে ছুটিবার আকর্ষণ আদিমকাল হতে পুরুষ ও নারীকে একই বান্দনে বেঁধে দিয়েছে, সে দুর্বলতাজননীয়, উচ্ছেদ্য [?] বন্ধন পরস্পরকে অতিক্রম করতে দিচ্ছে না, পাশাপাশি চলছে, উভয়ের মধ্যে গাঁটছড়া বেঁধে দিয়েছে—পুরুষ যদি দ্রুতপদে চলে যায় আর নারী যদি পিছিয়ে পড়ে তা হ'লে

সে বান্দনে টান পড়বে। বিংশ শতাব্দীর যেয়ে যেরে ও বাইরে সমান প্রতিপত্তি রাখতে চায়, তারা বলে আমরা অতীত কালের মত কেবল গৃহের অদীক্ষরী হ'য়ে থাকবো না, বাইরেও সাম্রাজ্য বিস্তার করতে চাই। পৃথিবীর সমস্ত দায়িত্ব, সব সংঘাত এড়িয়ে, সব কোলাহল বিবাদ বিসংবাদ ও বাস্তবের সকল প্রকার নির্মমতা হতে দূরে একান্ত গৃহকোণে আবদ্ধ হয়ে থাকতে চাইনে।

কিন্তু মজা এই, আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে মানুষের যত যুগ গিয়াছে—তাহার প্রত্যেকটিই সেই সেই যুগের মর্ভার্ণু যুগ। সেই সেই যুগে যে সকল শ্রীপুরুষ বাঁচিয়া ছিল তাহারা সকলেই মর্ভার্ণু হইবার সুযোগ পাইয়াছিল। এ যুগেও সকলেই এ যুগের। ভবিষ্যৎ যুগে সকলেই ভবিষ্যৎ যুগের হইবে।

পুরুষ কোথায় দ্রুতগতিতে যাইতেছে? বাক্য ও কাণ্ডে চঞ্চলতাই বা কোথায়? কাজ করিবার সময় হাত ও পায়ের চঞ্চলতা কি অত্যধিক বাড়িয়া গিয়াছে? টেনে, মোটরে বা এরোপ্লেনে দ্রুতগতিতে যাওয়া যায়; এগুলি বাদ দিলে হাতপায়ের জোর পূর্য্যাপেক্ষা বাড়িয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু বৈদেহী দেবী কি বলিতে চাহেন?

পুরুষ দ্রুত চলিবার ক্ষমতা লাভ করিয়া অফিসে কিংবা ফ্যাক্টরিতে দ্রুত যাইতেছে। নারী কি তাহা চায়? অফিসে এবং ফ্যাক্টরিতে যাইতে চায়? তাহা হইলে স্পষ্ট করিয়া সে কথা বলুক। অস্পষ্ট প্রার্থনায় প্রার্থনা পূরণের দ্রুতত নষ্ট হয়।

‘সাম্রাজ্য বিস্তার’ কথাটির অর্থ কি? একপ অস্পষ্ট দাবী লইয়া পুরুষের সমকক্ষতালাভ করা সহজ নহে। বাহিরের সাম্রাজ্য কোথায়? পুরুষের কর্মক্ষেত্রগুলির পরিচয় কি নারী পায় নাই? পুরুষ লাঙল লইয়া জমি চাষ করে, নারী কি ইহা চায়? পুরুষ বিষাক্ত গ্যাস এবং গোলাবাকন্দ লইয়া যুদ্ধ করে—জাহাজ ষ্টীয়ার রেলগাড়ি এরোপ্লেন চালায়, কলকারখানা চালায়, ঘরে ঘরে ঘুরিয়া জিনিস ফেরি করে, কুলীর কাজ করে, এলিনিয়ারিং করে, ইট সাম্রাজ্যই বাড়ি প্রস্তুত করে—এই ‘সাম্রাজ্যের’ কোনটি নারী দখল করিতে চায়? নাম উল্লেখ করিয়া স্পষ্ট বলুক আমরা ইহা চাই।

শুধু ‘সাম্রাজ্য’ বলিলে পুরুষ কিছুই বুঝিতে পারে না। কিন্তু ‘মডার্ন’ নারীর, গৃহধর্ম ইত্যাদিতে দায়িত্ব নাই, হঠাৎ একপ মনে হইবার কারণ কি? পৃথিবীর সমস্ত দায়িত্ব একা পুরুষেও লইতে পারে না—হঠাৎ নারী দাবতীয় দায়িত্ব লইতে চাহে কেন? পুরুষ যেদিন বৃষ্টিয়াছে সে মাতা হইতে পারে না, সেইদিন হইতে সে নারীর সহিত দায়িত্ব ভাগ করিয়া লইয়াছে। কিন্তু মডার্ন নারী দেখিতেছি পুরুষকে অতিক্রম করিয়া “পৃথিবীর সকল দায়িত্ব” নিজের ঘাড়ে লইতে চাহে! উদ্বেগ শাধু সন্দেহ নাই—কারণ নারী একাদ্বারে পিতা ও মাতা হইলে তাহা একটা দেখিবার মত বস্তু হইবে, এবং পুরুষও পুরুষত্বের ক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কিছুকাল নিশ্চিন্ত আরামে কাটাইতে পারিবে।

শ্রীবেদেহী দেবী আরও বলিতেছেন—

কিন্তু বাইরে যে অটোজ্যাকট পুরুষ বসে আছে সে বলে

নারী সীমাস্বর্গের ইচ্ছাশীল, সেখানে তার স্বর্ণরাজ্য গড়ে তুলবে, অন্তরের মধু দিয়ে ভরে রাখবে আমাদের অন্দরমহল।

মাত্র এইটুকুও যদি নারী পারিত তাহা হইলে তাহাকে সত্যি পুরুষ পূজা করিত—কিন্তু চূর্ভাগ্যের বিষয় বিধাতার ব্যবস্থাতেই নারীর কমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ; পরিপূর্ণরূপে নারী হইতেও সে পারে না! পুরুষ পূর্ণরূপে পুরুষই হইয়াছে, সে যাত্রার দল ছাড়া অন্য কোথাও নারী হইবার জ্ঞান আফালন করে নাই। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে নারী পুরুষ হইবার জ্ঞান আফালন করিয়া ইহাই প্রমাণ করিতেছে যে সে কিছুই হইতে পারে নাই।

মাধার ঘাম পায়ে ফেলিয়া পুরুষ আহাৰ্ঘ্য সংগ্রহের যে ব্যবস্থা করিয়াছে, পুরুষকে বিব্রত করিবার জ্ঞান সেই ব্যবস্থার অংশীদার হইবার জ্ঞান সে এখন ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। পুরুষ যে চাউল সংগ্রহ করিয়া আনিতেছে তাহা সিদ্ধ করিয়া তাহাকে আর খাওয়াইতে ইচ্ছা হইতেছে না। চাউলের জমিকে ‘সাম্রাজ্য’ মনে হইতেছে—উহা দখল করিতে পারিলেই নারীকে বিকশিত হইয়া উঠিবে বলিয়া বোধ হইতেছে। শ্রীবেদেহী দেবী মাত্র একটি স্পষ্ট কথা বলিয়াছেন, সেজ্ঞান যুক্তবাদ। পূর্বেই এটা প্রকাশ করিলে প্রবন্ধ এত দীর্ঘ না হইলেও চলিত। তিনি বলিয়াছেন—

ঘরের কোণের কোনো এক বিশেষ পুরুষের জ্ঞান নারী নয়, আবার কোনো বিশেষ নারীর জ্ঞানও পুরুষ নয়, সমস্ত জাতির সমগ্র পুরুষ ও নারীর ‘পরেই’ উভয়ের দাবী আছে।... আমাদের দেশের নারীরা একটি বিশেষ পুরুষের জন্যই স্পষ্ট হন, ফলে...

কিন্তু ইহার পর আর কিছু না বলাই ভাল।

ত্রিহরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর ভয় দেখানটা সার্থক হইবে কিনা বলা
শক্ত।—

মরি নাই আমি মরি নাই
আজি যে আবার পৃথিবীর প্রেম
গগনের নীল আলো চাই।
আজি যে প্রাণের বাজাইয়া বাঁশ
মরণের যত যাব উপহাসি'

জাগাবো ঘুমের বালা।

(ভারতবর্ষ)

কথাটা আরও কিছুদিন আগে প্রকাশ করা উচিত ছিল। যাহারা
বরাবর জীবিত আছে তাহারা কি এখন দখল ছাড়িবে? কিন্তু কবি
তুণু যে ভয় দেখাইতেছেন তাহাই নহে, লোভও দেখাইতেছেন। অর্থাৎ
তিনি নেশা করিবেন এবং গলায় মালা পরিবেন।

—

যথা—

শেফালির বনে শরৎ-উষায়
ফাগুনে রসিয়া বকুলের ছায়
রসিয়া রসিয়া চরম নেশায়
গাথিয়া পরিব মালা।

রসিয়া রসিয়া চরম নেশা কিরূপে হয় তাহা বুঝিলাম না। কিন্তু
“এক হইবে যায় যত ঘর বার একটি চরম হাঁকে।”—ইহা কি সত্য?
সে চরম হাঁকটি কি? ইহাই কি শেষের হাঁক?

—

ডিক্টর হুগো'র লে মিজেরাবল নামক একখানি উপন্যাস আছে,
সাধারণ বাঙালী সে খবর রাখে কিনা জানি না। কলিকাতায় মধ্যে
মধ্যে ইহার চিত্ররূপ সিনেমায় দেখানো হয়। সে সময় বাঙালী
চিত্রগৃহের স্বাধিকারী ইহার নাম দেন 'লা মিজারবেল'। Les
Miserables-এর Les কি করিয়া “লা” হয় তাহা ভাবিলে বিস্মিত
হইতে হয়। তাহার কারণ, যে দেশে দীর্ঘকাল ধরে কোনো কাজ করিতে
কেহ স্বেচ্ছাস্থ নহে, যেখানে সব বিষয়েই লে লে ছাড়া কেহ প্রেরণা
পায় না—সেই লেলাকেপার দেশে হঠাৎ করাসী “লে” “লা” হইয়া
উঠিল কেন ইহার উদ্ভব কে দিবে?

—

আমরা গত কানন মাসে স্কুলপাঠা বিষয়ে কিছু আলোচনা করিয়া-
ছিলাম। আলোচনা আরম্ভ করিয়া দেখিলাম, এদেশে পরিণত বয়সেও
যাহারা অপরিণত মন এবং বিকৃত মন লইয়া সাহিত্য বাবসা করিতে
যায় তাহাদের মনোবিকাশের আরম্ভেই এই বিকারের বীজ বপন করা
যায়। অর্থাৎ স্কুলে পড়িবার সময় হইতেই সে ভুল শেখে এবং ভুল পথে
গলিত হয়। ইহা লইয়া শিক্ষিত সমাজের প্রবল আন্দোলন করা
উচিত। কিন্তু ছুঃখের বিষয় আন্দোলন কোথায়ও হয় না। আমরা
“ম্যাট্রিকুলেশন হাইজীন” লেখকের বিজ্ঞানবিশ্বক অজ্ঞতা ধরিয়া দিবার
পর একমাত্র “আনন্দবাজার পত্রিকা” তাহার উল্লেখ করিয়া এ বিষয়ে
সম্পাদকীয় মন্তব্য করিয়াছিলেন। আমরা সেজন্ত উক্ত পত্রিকাকে
জবাব জানাইতেছি।

—

“সাধারণ জ্ঞান” নামক একখানি পুস্তক দেখিতেছি। এই
পুস্তকখানি কলিকাতার কোনো কোনো স্কুলের পাঠ্য-তালিকায় স্থান

পাইয়াছে—ফলে ইহার তিনটি সংস্করণ হইয়াছে। ইহার সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরকার। প্রকাশক, এম. সি. সুরকার এণ্ড সন্স লি., কলিকাতা। সম্পাদক ভূমিকায় লিখিয়াছেন—“এই সব অত্যন্ত সাধারণ জিনিষের জ্ঞান জানা না থাকলে পৃথিবীর কোন বিষয়ই ভাল কোরে বোধগম্য হয় না।”—পড়িয়া স্তম্ভিত হইলাম। যদি কোনো ইংরেজ এরূপ ছেলেদের পাঠ্য পুস্তকের ভূমিকায় লিখিতেন, “without knowing the knowledge of these common objects etc.” তাহা হইলে ইংরেজের দেশে তাহার কি ছন্দা হইত তাহাই ভাবিতেছি। এই পুস্তকে কোনো রচনা নাই। কতকগুলি প্রশ্ন এবং উত্তর আছে; ইহা ছাড়া পাহাড় নদী প্রভৃতির নাম আছে। একস্থানে সাতটি বস্তুর নাম দিয়া উপরে হেভি দেওয়া হইয়াছে, “পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্য্য।” ইহার ভিতর কোনটা সপ্তম আশ্চর্য্য তাহার নির্দেশ নাই। বোধহয় সাতটির প্রত্যেকটিই সপ্তম আশ্চর্য্য। সপ্তম এডোয়ার্ডের ছবি যখন দেখি তখন একটিমাত্র ব্যক্তির ছবি থাকতে বুঝিতে কষ্ট হয় না কে সপ্তম এডোয়ার্ড। “সাধারণ জ্ঞান”-সম্পাদকের মত শিশু-প্রেমিক ইংলেণ্ডে থাকিলে তিনি অবশ্য সাতজন এডোয়ার্ডের ছবি পাশাপাশি ছাপিয়া উপরে হেভি দিতেন সপ্তম এডোয়ার্ড। ইহা ছাড়া উক্ত বইতে যে সব ভুল আছে তাহা ছাপার ভুল বলিয়া চালাইলেও যাহারা এ বই পড়িবে তাহাদের কিছু সুবিধা হইবে না।

—
আমরা প্রসঙ্গ কথায় শ্রীযুক্ত জে. এল. ব্যানার্জির মাউন্ট এডারেট এবং গৌরীশঙ্কর লইয়া আলোচনা করিয়াছি। ব্যানার্জি মহাশয় গোষ্ঠে মেডালিষ্ট, রাজনীতিক, নোট-মেকার, প্রফেসর এবং স্থলপাঠ্য পুস্তক প্রণেতা। একজন ব্যক্তি এতগুলি কার্যে লিপ্ত থাকিলে তাহার

ভারতবর্ষীয় ভূগোল সংক্ষেপে জ্ঞান না থাকা বিচিত্র নহে। (অবশ্য ইহাতে ভৌগোলিক বিষয়বস্তু লইয়া স্থলপাঠ্য পুস্তক লিখিতে আটকাই না)। কিন্তু নিখিল-বন্দ্যোয় শিক্ষক-সমিতির সম্বন্ধেও কি একথা খাটে? তাহার “সাহিত্য-চয়ন” নামক একখানি বাংলা পাঠ্যপুস্তক সঙ্কলন করিয়াছেন। এবং বাংলাসাহিত্যে সঙ্কলন করিবার মত এত বিষয় থাকিতে এমন একটি বিষয় মনোনীত করিয়াছেন যাহাতে এডারেট শৃঙ্গ সঙ্ক্ষেপে একই ভুল রহিয়াছে। “এডারেট-শৃঙ্গ ও বান্দালীর কৃতিত্ব” নামক সঙ্কলিত গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে, “ভারতীয় জরীপ-বিভাগের নির্দেশাঙ্কসারে শ্রু ওয়াব তাহার পূর্বতন চীক শ্রু এডারেটের নামাঙ্কসারেই উক্ত শৃঙ্গটির নাম “এডারেট” রাখিতে বাধ্য হন। ইহার ভারতীয় নাম গৌরীশঙ্কর।”

এই গৌরীশঙ্কর দেখিতেছি সমগ্র বাংলাদেশের শিক্ষাবিভাগকে কলঙ্কিত করিবে! ইহাতে শুধু ভূগোলবিষয়ে ভুল নহে, মাছয়ের নামও ভুল আছে। শ্রু এডারেট বলিয়া কোনো ব্যক্তি ইউরোপে বা ভারতবর্ষে পরিচিত নহেন। ইংরেজি রীতি অঙ্কসারে কাহারও নামের পদবীর সহিত শ্রু ব্যবহৃত হয় না এ জ্ঞানও কি শিক্ষকমণ্ডলীর নাই?

—
বিচিত্রার “সেদিন আর আজ” নামক গল্পের যে অংশটি লেখক চাপিয়া গিয়াছেন সেটুকু প্রকাশ করিলে গল্পের অঙ্গহানি হইত বলিয়া মনে করি না। নাথক নাথিকার কি করিয়া বিবাহ হইল তাহা নাথকের নিজেরই মনে নাই। কারণ পনের বৎসর পূর্বের ঘটনা। ভাওয়াল সম্রাসীর মকদ্দমা আরম্ভ হইবার পর হইতে কোনো কিছু মনে রাখিবার নির্দিষ্টকাল বারো বৎসরের নিম্নে দাঁড়াইয়াছে। যাহা

হুক গল্পের সেই অংশটা এই—(নায়ক নায়িকা স্বর্ণা পার হইতেছে)—

তাকে পাঁজাকোলা করে' তুলে নিলাম। হঠাৎ আমার শিরায় শিরায় যেন বেজে উঠল হাজার তারার [?] রিনিকিনি-বক্ষস্পন্দন হতে লাগল দ্রুত তালে। স্রোতের ওপর ছোটো পাথরে পা রেখে দাঁড়িয়ে পড়লাম। আলো ও আঁধারের চূষনে পায়ে তলার জলটা জল জল করছে। কতকগুলো এলোমেলো চুলের ভেতর দিয়ে স্রুতির মুখের ওপর চাঁদের আলো ঢুলে উঠছে। হঠাৎ নিজেকে যেন হারিয়ে ফেললুম। কি যেকরছি সেদিকে কোন খেয়ালই রইল না। তাকে বৃকের ভেতর নিবিড় করে চেপে ধরলুম—সমস্ত যেন কি রকম পোলমালা হয়ে গেল!

তারপর থেকে দীর্ঘ পনেরটি বছর কেটে গিয়েছে—কেমন করে ঠিক মনে নেই স্রুতির সঙ্গে আমার বিয়েও হয়ে গেছে।

যে অংশটা ছাড় গিয়েছে তাহা এই। “হঠাৎ নিজেকে হারিয়ে ফেললুম। যখন জ্ঞান হল, দেখি হাসপাতালের সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে—সমস্ত হাতে পায়ে বৃকে পিঠে এবং মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। পাশে পুলিশ জবানবন্দী লিখে নেবার জন্ম প্রস্তুত হয়ে বসে আছে। একমাস পরে হাসপাতাল থেকে বেরিয়েই হাজতে গেলুম। সেখানে সমস্ত দোষ স্বীকার করলুম, এবং স্রুতির বাবাকে প্রতিশ্রুতি দিলুম বিয়ে করব।”

—

শান্তি পালের “পথচারী” গ্রন্থের ‘স্বয়ম্বাদ’ নামক কবিতাটি

বিচিত্রায় উদ্ভূত হইয়াছে। বিচিত্রাসম্পাদক উহার অংশবিশেষকে একটু হাল্কাশব্দক করিয়া ছাপিয়াছেন। বইতে আছে—

দেখা শোনা হ'ল কত,—

এপারে ওপারে দিঠি বিনিময় চলিল যে অবিরত।

বিচিত্রায় ছাপা হইয়াছে—

দেখা শোনা হ'ল কত,—

এ-পারে ও-পারে চিঠি-বিনিময় চলিল যে অবিরত।

দিঠি বিনিময় না করিয়া চিঠি বিনিময় করার বিপদ কবি হয়ত জানেন বলিয়াই ডাকঘরকে এড়াইয়া গিয়াছেন, কিন্তু বিচিত্রাসম্পাদক এক্সপ কাঁচা কাজ করিলেন কেন? এই উপদেশটি সর্বদা স্মরণ রাখিবেন—

Do right, fear no man.

Don't write, fear no woman.

—

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস সম্বন্ধে রাজনৈতিক বিষয় লইয়া অ্যালোকের অভিযোগ থাকা বিচিত্র নয়, কিন্তু তাই বলিয়া, তাঁহার বিবাহ করিবার অভিপ্রায় আছে অতএব তাঁহার চরিত্র খারাপ ইহা কি প্রমাণ করা যায়? কিন্তু ইহাই প্রমাণ করিবার জন্ম খেয়ালী একবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমরা তাহা লইয়া মন্তব্য করিয়াছিলাম। কৃষ্ণদাসের আবেদন পত্রখানি আবার খেয়ালীতে ছাপা হইয়াছে! বাংলাদেশে বা বাংলার বাহিরে কোন্ কোন্ লোকের চবিত্র কলুষিত ইহা পরীক্ষা করিবার জন্মই বোধহয় ফরয়ার্ডে Wanted—A Kayestha bridegroom for a graduate daughter of a provincial executive officer—এই বিজ্ঞাপনটি দেওয়া হইয়াছিল! কৃষ্ণদাস বিবাহ

করিতে পারিবেন না—একপ ব্যবস্থা দিবার স্পৰ্ধা খেয়ালীর হইল কেমন করিয়া। তাহা বুঝিতে পারিলাম না। বিজ্ঞাপন দেওয়া এবং একপ চিঠি সাধারণে প্রকাশ পাওয়া ইহাও আমাদের দেশের ভদ্রতার নমুনা হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। বাজারে যে কত্কার জুতা বিজ্ঞাপন দিতে হয়, সে কত্কারকে বিবাহ করিতে হইলে খেয়ালীর মতে বিবাহেচ্ছু ব্যক্তি, উক্ত কত্কারকে বিবাহ না করা পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতে পারিবেন না—তৎপূৰ্ণে তাহার একাধিক বিবাহের অভিজ্ঞতা থাকা চাই—তিনি বিবাহাত লোকের সেক্রেটারি বা শিষ্য হইতে পারিবেন না—কিছু নেশা করার অভ্যাস তাহার থাকিবে, ইত্যাদি। ইহাই বোধহয় খেয়ালীর দেশসেবা! মনে হইতেছে যেন স্বরাজ আসিল বলিয়া!

—

প্রবাসী বিজয়বর্গীয় নেশা কাটাঠাতে না কাটাঠাতে বিজয়বর্গের নেশায় পড়িয়াছেন। ‘এগজাম্পল ইজ বেটার গ্লান প্রিন্সেপ্ট’ এই কথাটি এতদিন বিশ্বাস করিকাম, কিন্তু প্রবাসীর ‘এগজাম্পল’ দেখিয়া আর সে বিশ্বাস রাখিতে পারিলাম না। ইহাই যদি ‘এগজাম্পল’ হয় তাহা হইলে ‘প্রিন্সেপ্টের’ স্বরূপ কি হইবে সে সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছি।

—

পৃথিবীতে মানবজাতির আবির্ভাবের পর ঠিক কোন তারিখ হইতে নেশার চল হইয়াছে তাহা আমাদের জানিবার উপায় নাই। নেশা করিবার পক্ষে এ সম্ভাব্য প্রয়োজনও নহে। কিন্তু ইহা সত্য যে যুগে যুগে একই নেশা মানুষের উপর একইরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিতেছে। সহস্র বৎসর পূর্বে মানুষ কোনো একটি বিশেষ

নেশার প্রভাবে পড়িয়া যাহা করিয়াছে, সহস্র বৎসর পরেও সেই নেশার প্রভাবে পড়িয়া লোকে তাহাই করিতেছে। ভারতবর্ষীয় একটি বিশেষ নেশার লক্ষণ এই যে তাহাতে নেশাকারীর স্থান এবং কাল সম্বন্ধে সকল জ্ঞান লুপ্ত হইয়া যায়। এই লক্ষণটি সহস্র বৎসরের পুরাতন হয় নাই, কখন হইবেও না—প্রবাসীর ‘এগজাম্পল’ দেখিয়া তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম।

—

প্রবাসীর গল্পে একপ কচির পরিচয় পূর্বে আর পাইয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। কলেজের ছাত্রী সরসী প্রকাণ্ড বাড়িতে একা থাকে, আর থাকে দারোয়ান। সে এত টাকার মালিক যে যে-কোনো উপলক্ষে চেক সহী করে। স্থানকাল সম্বন্ধে তাহাকে কিছু ভাবিতে হয় না। কাজেই তাহার “মধুপের দল” ছিল। তাহাদেরই একজন “পাণের পিচ” ফেলা উপলক্ষে তাহার সঙ্গে আলাপ করিল। সরসী কলেজ ছাড়িল। “পাণের পিচ”—ফেলা নামকের পাঠাপুস্তকে অল্পচি ধরিল। এদিকে সরসী মোটর লঞ্চ কিনিবে বলিয়া বিজ্ঞাপন দিয়াছে—“পাণের পিচ” এজেন্ট সাজিয়া দেখা করিল। সরসী বলিল, “কি পার্টিকুলার্স এনেছেন দেখি?” এই স্বরে আলাপ জমিল। “মেয়েরা সেকেণ্ডহাণ্ড জিনিস ব্যবহার করে না” “আপনি রাজি থাকলে সেকেণ্ড হার্ড ফোর্থ হাণ্ড, মেনি হাণ্ড দেখাতে পারি।” ইত্যাদিরূপ রসিকতা করিল এবং আটশ হাজার টাকার দশ পাসেন্ট যে আড়াই শত টাকা ইহাও জানাইল।—পরে এই জাতীয় রসিকতার মাজা বাড়িয়া যাওয়াতে তাহাদের বিবাহ হইল। কিন্তু সাধারণ বিবাহ নহে। স্বামীস্ত্রী পৃথক থাকিবে এই সন্ধে। চিন্ময় অর্থাৎ স্বামী দেখা করিতে পারে,

কিন্তু তাহারও সন্দেহ আছে। “মাঝে মাঝে আসবেন।” “সকালের দিকে আসবেন।” ইত্যাদি।

—

কলেজে পড়িলে কোনো ভদ্রস্থান কি ভদ্রিতে কথা বলে লেখকের তাহা জানা নাই, ভদ্র কৃতিও লেখকের নাই। কিন্তু লেখায় কোন গুণ থাকিলে প্রবাসীতে তাহা ছাপা হয় প্রবাসী তাহা নিশ্চয়ই জানেন। এক্ষণ গল্প যে প্রবাসীতে ছাপা হইতে পারে তাহা আমাদের কল্পনার অতীত ছিল, কেননা প্রবাসী পত্রকে আমরা আজিও শ্রদ্ধা করিতে অভিলাষ করি। তবে ‘এগজাম্পল’ গল্পে একটিমাত্র মূল্যবান কথা আমরা আবিস্কার করিয়াছি। তাহা এই—

মার্শাল কোম্পানী, ইউরোপীয়ান ফার্ম, তারা ছেঁচড়ামি করে না...ইউরোপীয়ান ফার্ম—ওরা বাপকেও রেহাদ করেনা।... প্রবাসীর মস্তকে কেহ কাঁঠাল ভাঙিয়া গেল না তা!

ভোট স্বপ্ন

প্রচণ্ড চৈতানীরোদ্ভ, দ্বিপ্রহর, খা খা চারিদিক, ক্রুদ্ধকণ্ঠে উর্দ্ধমুখে কোনোক্রমে চক্ষু মুদ্রিয়াছি, আচম্বিতে ভোটভিক্ষু—দিক তারে দিক শত দিক—দেশোদ্ধারে মন্ত হ’ল,—কতক্ষণ আর প্রাণে বাঁচি?

সম্ভাষণ-বুলি যত বাছা-বাছা জানা ছিল মোর—
ফার্সি, হিন্দুস্থানী, উর্দু. ইঙ্গবদ্ব কবিহু প্রয়োগ,
(অবশ্য আপন মনে সম্বোধনে) কণ্ঠে নাহি জোর—
নহিলে গব্যাক্ষপথে কে জুগিবে ক্যানভাসিং ভোগ?

ভূমিকম্প হয়ে গেল বয়ে গেল নির্দাচন ঝড়,
পুনরায় শান্তচিত্তে নিদ্রা দিতে করিহু প্রয়াস।
সহসা বিকট শব্দ—গিরিবিদারণ “ভোট ফর—”
নিদ্রার গণ্ডিতে চড় বসাইয়া গেল ঠাস্ ঠাস্!

চেতনা সামালি দেখি, হইয়াছি ভূমিতলে লীন,
সত্য নাহে ভোট স্বপ্ন! দেখি কোথা আছে আইওডিন।

পঞ্চমুখ শব্দা

পুস্তক-প্রসঙ্গ

শিক্ষা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তৃতীয় সংস্করণ (পরিবর্দ্ধিত), শ্রাবণ
১৩৪২ সাল, বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়, ২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট,
কলিকাতা। মূল্য ২।০। পৃঃ ১—২৮৬।

আমাদের দেশে যখন ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন হয় তখন অতি অল্প লোকেরই ভাগে এই শিক্ষাপ্রাপ্তি ঘটিত। এবং ষাঁহার পরমাত্রায়ও ইংরেজি বিদ্যা শিখিতেন তাঁহাদের চাকুরীলাভ অত্যন্ত হুলস্থূল ছিল। প্রধানতঃ এই কারণেই, ইংরেজি শিক্ষার যে একটা উলটা দিক আছে তাহা তখনকার দিনের শিক্ষিত ব্যক্তির ধারণাভীত ছিল। কিন্তু

কমশ: যখন গ্রীষ্ম মৌসুমের মত বীর অথচ অব্যর্থ গতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষ বাঙ্গালা বিভাগের ও পরী-পারীশালা সমূহের কাছে সাধন করিতে আরম্ভ করিল তখন আমাদের দেশের শিক্ষা-সমস্যা যে মনোবীকে সর্পাপেক্ষা বিচলিত করিয়া তুলিল তিনি হইতেছেন রবীন্দ্রনাথ। আমাদের শিক্ষাপ্রণালীর মূলে যে প্রাকৃত প্রমাদ বিদ্যমান রহিয়াছে তাহার প্রতি ত্রিভাষীল শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি রবীন্দ্রনাথ আজ প্রায় পূর্ণাঙ্গ বয়সের দরিয়। অসুখকণ আকর্ষণ করিয়া আসিতেছেন। রবীন্দ্রনাথ যে এতকাল অরণ্যে রোমন করেন নাই, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় আমরা শ্রীযু পাইব এইরূপ আশা করিতেছি।—হুই এক বৎসরের মধ্যেই মাতৃভাষা অবৈশিষ্ট্য পত্রিকা বহন হইবে এবং মাতৃভাষার সাহায্যে বিভাগ্যল সমূহে পঠনপাঠন চলিবে।

আলোচ্য পুস্তকে শিক্ষা-সংস্কৃত বাইশটি প্রবন্ধ, আলোচনা ও পর ইত্যাদি আছে। ইহার মধ্যে যে প্রবন্ধটি সর্বপুণ্যাতন তাহা ১২২৯ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল। সর্গাদিনিকটি ১৩৪২ সালে। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ, “উৎসব: হৃদয়ান্ন অলং”—ইহার অতিরিক্ত বলা নিম্নয়োজন। পুস্তকটি না থাকিলে শিক্ষিত বাঙ্গালীর পাঠাগার অপূর্ণ থাকিলে।

বিষমতারতী-প্রকাশিত গ্রন্থ, ততরায় কাণ, কাগজ ইত্যাদি যে উত্তম হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। হুই-এক হলে (সংস্কৃত কোটেশনে) একটু আদর্শ ভাষার ভুল চোখে পড়িল। বর্ণা—নং (১) বীধা কতবাংহে (পৃ: ৮২)। দুই (—দুই) (পৃ: ১০৭)।

২১, ২, ৩৬

শ্রীহরম্বর সেন

শ্রীল রামানন্দ রায় প্রণীতম্ **শ্রীজগন্নাথবন্দন নাটকম্**। শ্রীশ্রীশ্রীগলমিলনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়বাসনালিতম্। রায়ো-পাদিক ত্রিভাষ্যাতিক্রম শ্রদ্ধায়া সম্পাদিতমহাবাদিতক। চৈতন্যদ্বারা ৪৫০। প্রকাশক শ্রীনির্মলকুমার রায়, ৩৮ নং শ্রামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য একটাক মাত্র। পৃ: ১-১২৮।

বাম পৃষ্ঠায় মূল এবং দক্ষিণ পৃষ্ঠায় বঙ্গাভাষ্য বৈষ্ণব মূল মিলাইয়া পড়িবার সুবিধা আছে। অনুবাদ ভালই, যথাসম্ভব মূল্যসুগত। প্রথম ১৫৫০ সালের দিকে লোচন নাটকটির কবিতাগুলি অবলম্বনে কতকগুলি বাঙ্গালা ও ব্রজবুলি পদ রচনা করিয়াছিলেন। সেগুলি অনুবাদের অল্পভুল্য করায় গ্রন্থের সৌন্দর্য হইয়াছে। তবে ভগিনীশংকলি বাদ

দেওয়া ঠিক হয় নাই। অথচ বেগিতেছি অনুবাদক মহাশয় প্রচলিত পদগুলিতে ভগিনীশংকলি লিপ্যনুসারে লিখিত ভুলেন নাই।

শ্রীহরম্বর সেন

চুটি প্রদীপ। শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক

পি সি সরকার এণ্ড কোং লিমিটেড, কলকাতা, কলকাতা নগর, কলিকাতা।

ক্রাউন অক্টোবো, ৩১৬ পৃ: মূল্য আড়াই টাকা।

দৃষ্টি প্রদীপ উপজ্ঞানসামান্য পড়িতে পড়িতে শুধু এই কথাই মনে হইয়াছে যে ইহার নায়ক কতটা নহে, বর্ণকমাত্র। তাহার ব্যক্তিত্ব স্পষ্ট, সে অত্যন্ত জীবন্ত, কিন্তু সে ব্যক্তিত্ব-ধারা তাহার পরিমণ্ডলে যে কিছু স্পষ্ট করিয়া তুলিতে অক্ষম। সে লম্বা মেঘের মত মধুর গতিতে শুধু আকাশপথে ভাসিয়া চলিয়াছে, এবং ভাসিতে ভাসিতেই সূর্যোদয়ের বা সূর্যাস্তের আভাস কখনো রঙীন হইয়াছে, হিমবায়ুর স্পর্শ কখনো বা ভাঙি হইয়া আপনাকে বর্ণপের দ্বারা রিক্ত করিয়া লইয়াছে।

যেখানে পৌরস্বের দ্বারা একটা ছুপের মূল্যবাপটন করা যায় সেখানে সে ছুপটাকে অলসভাবে মানিয়া লইয়াছে। ছুপে সে অস্থিরমনা নহে, ছুপে তাহাকে বিচলিত করে: নিম্নলিখিত যে ছুপের রসে পুষ্টি ইহা তাহাও নহে। নিম্নলিখিত নিজের অস্তিত্বের লক্ষ ছুপ রচনা করিয়া গইয়াছিল, দৃষ্টি প্রদীপের নায়কের ছুপ প্রচলিত নহে, কারণ ছুপ তাহার কাছে একটা পজিটিভ রস নহে। ইহাকে সে মনে মনে এড়াইতেই চাহিয়াছে, কিন্তু সে চাওয়ার মধ্যে দুর্ভাগ্য সাহস নাই। দৃষ্টি প্রদীপের নায়ক যেন অশ্রুধারী। পৃথিবীকে সঙ্গাৎ দিয়া স্পর্শ করিতে করিতে হঠাৎ স্পর্শ করিতে পারে না, কোথায় যেন সে বাধা অনুভব করে, সমস্ত বস্তু তাহার পক্ষ শরীর ভেদ করিয়া চলিয়া যায়। যেন শীতকালের সন্ধ্যার মাঠের কৃষ্ণা, সমস্ত আকাশে ব্যাঙ অথচ ভূমি স্পর্শ করে না; শত শত অণু পরিমাণ মিরালথ বস্তুকে কেন্দ্র করিয়া তাহার অস্তিত্ব। কিন্তু তথাপি দৃষ্টি-প্রদীপের নায়ক মাহুণ। সামাজিক বিচারে তাহাকে স্থগিত হইয়া অমাহুণ (অমাহুণও মাহুণ, ম-মাহুণ নহে), মেকদওহীন ভীক দুর্ভাগ্য প্রভৃতি বলা চলে, কিন্তু গল্পের বিচারে তাহার চরিত্র অপক্লপ।

একটি চিরদিনের গৃহহীন পথিক, ঘর বাসিবার সাহস নাই, জনগণের পক্ষে মাহুণের দিকে কিরিয়া তাহাকে আঁকড়া দিয়া ধরিবার জোর নাই, শুধু আছে নিজের প্রতি অপরিণীম

মমর আর নিজেকে সকল দায়িত্ব হইতে বাঁচাইবার জন্য নিজেকে বন্ধন। কিন্তু এসময় “অ-মানুষিক” দৌর্য্যলোকে ঢাকিয়া দিয়াছে তাহার মনের আর একটি দিক। সে দিকে লেশমাত্র দৌর্য্যতা নাই। সে নিকের কোনো দারও লক্ষ্য নহে। সেদিকে কোনো জ্ঞান নাই, নিজেকে বন্ধন নাই। মানুষের দিক হইতে সমুচিত হইয়া সে বার বার এই দিকে জ্বর উদ্ভূত করিয়া নিজেকে এক মানবাত্মী জগতের সমুখে উপস্থাপিত করিয়াছে। এই জগতের সহিত তাহার সম্বন্ধ অত্যন্ত নিবিড়, অত্যন্ত সহজ। দুটি প্রাণীদের নায়কের সঙ্গে আমরা মানবালয় হইতে ফিরিয়া গিয়া কতবার আসিলাম অন্ধকার আকাশের নীচে উদ্ভূত প্রশস্ত গ্রাণ্ডের, নিজেকে প্রসারিত করিয়া বিহার যথোপযোজ্য চিরবেহমরা প্রকৃতিমাত্রার কোড়ে—দিনের বহুত্রে-আহরিত সত্য যেখানে ক্ষীণ স্মৃতিতে পরিণত হয়, স্পর্শযোগ্য বস্তু যেখানে চোখের সমুখে মিথ্যা মরীচিকার মত কাঁপিতে থাকে। আর এইখানে, এই প্রকৃতিকেও অতিক্রম করিয়া দেহিলাস আর এক পথিককে। সেই পথিক “নীল আকাশের দেবতা, দীর্ঘ ছবি এই বিশাল মাঠের মধ্যে সন্ধ্যার মেঘে, কালবৈশাখীর ঝোড়ে ছাওয়ায়।” ইহাকে দেখিয়া দুটি-প্রাণীদের নায়ক বলে, “এই রকম তারাতার অন্ধকার আকাশের তলে কতবার আমার মনে এসেছে তাকে পাওয়া আমার হঠাৎ মূরিয়ে না যায়—যে দেবতা সকল ধর্মের অতীত, দেশকালের অতীত—দীর্ঘ বেদী যেমন এই পৃথিবীতে মানুষের বুকে, তেমনি ওই শাশ্বত নীলাকাশে, অনন্ত নক্ষত্রসলের মধ্যে—মর্ত্য ও অমর্ত্য তাঁর পৃষ্টিবীণার হুই তার—আমার মনে হোমের আশ্রম তিনি প্রজ্জ্বলিত রাপুন হুইব পুগসমূহের মধ্যে—শাশ্বত সময় বোপে। আমার যা-কিছু মনের শক্তি, যা-কিছু বড় তাই দিয়ে তাকে বৃত্তে চাই।”

দুটি প্রাণীদের নায়কের মনের এই পরিচয়টি পাইবামাত্র তাহাকে আর ভাগ্যবিধিত অসহায় তৃণও বলিয়া কৃপার দুষ্টিতে দেখিতে পারি না। যে প্রাণী বাংলাদেশের রূপকে কখন কখন উদ্ভাটিত করিয়াছে তাহাকে কেহ বাঁচিয়া তাহার দ্বারা সংসারের কাজ করা হইতে পারে নাই, ইহা প্রাণীদের দোষ নহে। সে-প্রাণীও আরও একটা মহত্তর জগৎ পরিব্রাজমান হইয়াছে—এক মাত্র সেইখানেই তাহার যথার্থ মূল্য এবং সার্থকতা। বইখানি আরও নানা দিক দিয়াই সার্থক হইয়াছে। লেখার অনাড়ম্বর ভঙ্গি নায়কের মনের সকল রহস্যকে স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। সে যেন তাহার গোপন কথাগুলি পাঠকের কানে কানে বলিয়া যাইতেছে। মনে হয় না যে পড়িতেছি, মনে হয় কথা কানে শুনিতেছি।

শ্রী—

মুজাদ্দোম। শ্রীধরগঙ্গনাথ মিত্র। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। মূল্য এক টাকা।

আমরা সাধারণত কোনো বস্তুর বিশেষ রূপ বহু বস্তুর মধ্য হইতে পৃথক করিয়া দেখিতে পাই না। কিন্তু বহু-বস্তুর গাঢ়লিকা হইতে বাছাই করিয়া তাহার পারিপার্শ্বিক বস্তু-অংশকে অপেক্ষাকৃত দূরে সরাইয়া, কিংবা সেই বিশেষ বস্তুর রূপবিকাশের অস্বকুল বস্তু সমূহকে তাহার পাশে সাজাইয়া দিলেই তাহার সেই বিশেষ রূপটি আমাদের চোখে পড়ে। এই রূপ-মুচাইবার কাজ শিল্পীর।

শিল্পী আর এক উপায়ে রূপ-পৃষ্টি করেন। তিনি রূপচীন বস্তুকে সংগ্রহ করিয়া আপনাদের মন হইতে নানারূপ সাজ-অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া তাহাকে সাজাইয়া দেন। এখানে এই সাজাইবার ভঙ্গিটিই আসল। ইহা ফ্রেশন নহে, শিল্পীর রিক্রেশন। ইহা প্রেরণার পৃষ্টি নহে, খেলালের রচনা। প্রাণের সঙ্গে ইহার নিবিড় যোগ নাই। ইহা রূপকে অস্বাভাবিক করে না, মনকে শুশী করে। প্রাণের আবেগে ইহা স্পন্দিত নহে, বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল। ইংরেজিতে ইহাকেই বলে ‘পিওর এসে’। ইংরেজি ভাষায় এই-জাতীয় যে-সকল ‘এসে’ আছে তাহাদের সহিত আমাদের পরিচয় খনিষ্ঠ; কিন্তু বাংলা ভাষায় ইহার সংখ্যা নগণ্য। রবীন্দ্রনাথ (ছিন্ন-পত্র, ভাষানিহের পত্র, বিচিত্র প্রবন্ধ) এবং বীরবলকে বার দিলে পাঠ্য ‘এসে’ আর বিশেষ কিছু নাই। আধুনিক লেখকদের মধ্যে এক আধিক্যের নাম করা যাইতে পারে যাহারা ‘এসে’ রচনায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতেছেন।

অনতি-আধুনিক লেখকদের মধ্যে মদনমোহন ‘এসে’ গুলির দিকে দুষ্টি আকৃষ্ট হইল। ‘এসে’ লেখায় ইহার বিশেষ নিপুণতার পরিচয় পাইলাম। মুজাদ্দোম নামক ইহার প্রথমটির পরিচয় সাধারণ পাঠকের কাছে বিশেষ নাই। ইহার কারণ এই যে আমাদের দেশের পাঠকগণ অধিকাংশই ভাবগবণ। উজ্জ্বল রচনা দ্বারা তাহাদিগকে বত পীড়া বশ করা যায় বুদ্ধিতর রচনার দ্বারা উত্তম সহজে করা যায় না। সুতরাং বা কলেজে যে সমস্ত উৎকৃষ্ট গ্রন্থ তাহারা পড়িতে বাধ্য হয় তাহা ছাড়া বাহিরের কোনো উৎকৃষ্ট গ্রন্থ তাহারা পড়ে না। আমাদের দেশে এতদূর ভালমন্ত বিচারের ইচ্ছাও একটা মালকাঠি। যে গ্রন্থের প্রচার কম, প্রায় ধরিয়া লওয়া যায় যে সে গ্রন্থ ভাল।

মুদ্রাদোশে মোট দশটি 'এসে' আছে। ইহার সবগুলিই উপভোগ্য হইয়াছে। ইহার মধ্যে 'ধ্বংস-মখান' রচনটি আমাদের নিকট সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া মনে হইয়াছে। রসগ্রহণে বাহ্যিকের অগ্রহে আছে। তাহার মূদ্রা-দোষ অবশ্যই পাঠ করিবেন কারণ প্রাচুর্যের দ্বারা উৎকৃষ্ট রস কখনও উৎকট-রসে পর্যাৱেশিত হয় না।

—

দেশীয়া সাময়িক পত্রের ইতিহাস। প্রথম

পৃষ্ঠ, ১৮১৮-১৮৩৯। শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।
সাহিত্য-পরিষদ্-গ্রন্থাবলী ৮৬। রজন পাব্লিশিং হাউস, ২৫১২
মোহনবাগান রো, কলিকাতা। জাউন কোয়ার্টার পৃ. ১২৪।
মূল্য ২/- টাকা।

পঁচ শতাব্দীর সাময়িক পত্রিকাদি হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিপূর্বে 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' ও 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। এই উপলক্ষে, ছদ্মশ্রী মূল সংবাদপত্রগুলি অমূল্যমান করিয়া দেখিবার যে হযোগ তাহার দয়িগড়িল, সেই হযোগে হইতেই বর্তমান গ্রন্থের সূত্রপাত, এবং ইহা যে তাহার পূর্বরচিত গ্রন্থগুলির যশ অমূল্য বাড়িয়াছে, তাহা নিম্নলিখিত বলা বাইতে পারে।

এসেপে বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের আরম্ভ ১৮১৮ খৃঃ অব্দ হইতে। বর্তমান গ্রন্থে ১৮১৮ হইতে ১৮৩৯ পর্যন্ত মুদ্রিত বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের একটি নির্ভরযোগ্য ইতিহাস পাওয়া যাইবে। বিষয়টি নূতন না হইলেও এ সম্বন্ধে প্রামাণিক গ্রন্থের অভাব রহিয়াছে। ব্রজেন্দ্রনাথ সেই অভাব পূর্ণ করিবার সংকল্প করিয়া বাঙ্গালী পাঠকের ও ঐতিহাসিকের কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন। এ পর্যন্ত এ বিষয়ে যে-সকল পুস্তক বা গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে অনেক জ্ঞাতব্য ও মূল্যবান কথা থাকিলেও, একটিও পূর্ণাঙ্গ বা সম্পূর্ণ প্রামাণ্য বিবরণ বলিয়া গ্রহণযোগ্য হয় নাই। তৎকালে পত্রিকাগুলির পুরাতন ফাইলও নিতান্ত ছদ্মশ্রী ছিল; অমূল্যমানের চেষ্টা, হুবিধা বা উৎসাহ সকলের ছিল না; এবং ঐতিহাসিক-সম্বন্ধ পদ্ধতির ধারণাও দৃষ্টান্ত ছিল না। সেই জন্য এই সকল রচনার তথ্য ও অন্তর্য্য নিষ্কিচাবে স্থান পাইয়াছে; এবং চিত্তাকর্ষক হইলেও, কোনওটি চিরস্থায়ী

মূল্য লাভ করে নাই। ঐতিহাসিকের কঠোর তথ্য-নিষ্ঠা দেখণ পরিশ্রম, যত্ন ও একাগ্রতার অপেক্ষা করে, ব্রজেন্দ্রনাথের তাহাতে কৃষ্টি নাই; এবং তাহার পুস্তকের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা অনেক অধ্যবসায়ের দ্বারা সংগৃহীত নূতন ও ছদ্মশ্রী উপাদানের উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি যথাসম্ভব মূল সংবাদগুলি দেখিয়া বিবরণ সম্বলন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন; এবং এমন কোনও তথ্য, তারিখ বা ঘটনার তিনি উল্লেখ করেন নাই, যাহা ভ্রমের দ্বারা সংস্থাপিত করা যায় না। ইহার ফলে তিনি পুস্তক লেখকের ভুলত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা বর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছেন, এবং বহু স্থলে সন্দিগ্ধ বিষয়ের চূড়ান্ত নিশ্চয় করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু এখনও অনেক পুরাতন পত্র-পত্রিকার ফাইল লোক-চক্ষুর অগোচরে রহিয়াছে, অথবা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। হস্ত পরবর্তী অমূল্যমান নূতন উপাদান সংগ্রহ করিয়া এই অনিবার্য্য অসম্পূর্ণতা কালে পূরণ করিবে। কিন্তু এই সকল বাধা সত্ত্বেও বর্তমান সময়ে দত্তবৃত্ত অমূল্যমান ও চেষ্টা সম্ভব, তাহা করিতে ব্রজেন্দ্রনাথ কৃতি করেন নাই; এবং তাহার পুস্তক বাঙ্গালা সাহিত্যিক পত্রের প্রামাণ্য ইতিহাসের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে, একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

সাময়িক পত্র আধুনিক সভ্যতার একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ। প্রত্যেক যুগের যুগ ও ছন্দ, যৌবন ও অধোরবের যে চিত্র ইহাতে বিনের পর বিন অঙ্কিত হইয়া যায়, তাহা ঐতিহাসিকের মূল্যবান উপকরণ। এই চিত্র সকল সময়ে নির্মিত হয় না হইলেও, সেই যুগের বৈশিষ্ট্য ও জীবন-বৈচিত্র্যের সমসাময়িক পরিচয় হিসাবে উপেক্ষণীয় নহে। এই জন্য বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের একটি ধারাবাহিক ও হৃদযত ইতিহাসের প্রয়োজন রহিয়াছে, এবং সেই প্রয়োজন পূর্ণ করিবার ভার যোগ্য পাত্র, স্তম্ভ করিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ বাঙ্গালী পাঠক-সমাজের দৃষ্টিভঙ্গ অর্জন করিয়াছেন। যে-সকল পত্র-পত্রিকার ইতিহাস এই পুস্তকে নিবিবন্ধ হইয়াছে, তাহার মধ্যে 'নিদর্শন', 'সমচার-দর্পণ', 'ব্রাহ্মণ-সেবিকা', 'সংবাদ-কৌমুদী', 'সমচার-চক্রিকা', 'বঙ্গদূত', 'সংবাদ-প্রভাকর', 'জ্ঞানাবেশ', 'সংবাদ-ভাষ্য', 'সংবাদ-রসরাজ' প্রভৃতি তৎকালে সাহিত্য ও সমাজে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল; এবং এই কারণে ইহাদের বিভিন্ন ইতিহাস কেবল চিত্তাকর্ষক নহে, নানা বিষয়ে সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, এমন কি সাধারণ পাঠকেরও অবগতাতব্য ও শিক্ষাদায়ক। পুরাতন পত্রিকার প্রতিলিপি ও রচনার নমুনা

দেওয়াতে গ্রন্থের মূল্য আরও বর্ধিত হইয়াছে। আশা করি, এই পুথকের দ্বিতীয় খণ্ড জনতীব্রলক্ষে প্রকাশ করিয়া প্রজন্মবান্ধু তাহার বহু-আদ্যাস-সাধা ও বহুমুখ্য রচনা হৃদয়ঙ্গম করিবেন।

শ্রীশুশীলকুমার দে



হারমোনিয়ম কিনিতে হইলে ডোয়াকিনের হারমোনিয়মই কেনা উচিত

৫০ বৎসর ধরিয়া ডোয়াকিনের হারমোনিয়ম সুরের মাদুরা, গঠন,



স্বাধীন ও অত্যন্ত গুণের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। অতঃপর হারমোনিয়ম কিনিবার পূর্বে একবার ডোয়াকিনের হারমোনিয়ম দৃষ্টে খোঁজ করিবেন। নব-প্রকাশিত সচিত্র মূল্য-

তালিকার জন্য আজই পত্র লিখুন।

সোনেরা ডবল-রীড বক্স হারমোনিয়ম ৩ অক্টেভ, ৫ ষ্টেপ বাক্সহ ৩০ টাকা।

ডোয়াকিন এণ্ড সন্স

১১নং এস্প্রেনেড, কলিকাতা

৮ম বর্ষ]

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩

[৮ম সংখ্যা

“আধুনিক কবিতা” ও “রাজহংস”

জীবনযাত্রার বা পোষাক-পরিচ্ছদে আমরা মজার, কারণ আধুনিক যুগে আধুনিক হওয়া ছাড়া উপায় নাই। যুগটা যদি প্রাচীন হইত অর্থাৎ খৃষ্টাব্দ ১৯৩৬ যদি খৃষ্টপূর্ব ৩১৬ মাল হইত তাহা হইলে একরূপ যুগে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের উপযুক্ত চালচলনে একটা অভিনবত্ব অবশ্যই থাকিত। কিন্তু কালের অসামান্য বিধানে দুইটি কাল এক সঙ্গে থাকিতে পারে না। সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত সম্রাট অশোক এডোয়ার্ডের যুগে বাস করিতে পারেন না এবং vice versa.

প্রাচীন, প্রাচীন; আধুনিক, আধুনিক; ইহাই প্রকৃতির বিধান এবং শুধু তাহাই নহে চিন্তা ভাষা এবং অভিব্যক্তির বিধানও তাহাই। কিন্তু তবুও আমরা আধুনিক যুগের মায়ায় হইয়া হঠাৎ একমাত্র কাব্যের ক্ষেত্রেই ‘আধুনিক’ হইয়াছি একরূপ পৃথক বিজ্ঞাপন প্রচার করিবার

শ্রীপরিমল গোস্বামী এম-এ কর্তৃক সম্পাদিত ও রত্নম পারিষদ হাউসের ব্যবহারিকারী শ্রীকপিলপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীসঞ্জয়ীকান্ত দাসের পক্ষে ২৫২, মোহনবাগান রো, শনিরঞ্জন প্রেস হইতে গ্রন্থবোধ নাম কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শনিবারের চিঠি

প্রয়োজন বোধ কেন করিলাম ইহা বুঝা কঠিন। মনে হয়, আমরা কাব্যের ক্ষেত্রে কালকে অমান্য করিয়া এমন একটা অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে পড়িয়াছি যাহাতে নিজেদিগকেই সাধনা দিব্যর জ্ঞ 'আধুনিক' নামটি গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছি। কালিদাসের প্রতিভা-বিকাশের কালকে সে সময়ের আধুনিক কাল বলিয়া বিজ্ঞাপন দিব্যর প্রয়োজন হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা যে কালে বিকশিত হইয়াছে সে কালকেও রবীন্দ্রনাথ 'আধুনিক' বলিয়া প্রচার করেন নাই; কারণ স্বতঃসিদ্ধকে অল্প কোনো প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ করিব্যর প্রয়োজন অহুকৃত হয় না। কাব্য যে কালেই সৃষ্ট হউক সে আপনার বিশিষ্ট রূপ লইয়াই জন্মগ্রহণ করে, সে রূপ প্রাচীন বা নূতন নহে, তাহাই তাহার একমাত্র রূপ। স্বতরাং আধুনিক (বা মডার্ন) নামধারীগণ যে কাব্য সৃষ্টি করিতেছেন তাহার রূপ তাহাদের কাব্যের পক্ষে অবিলোম্বন নহে বলিয়াই তাহা আধুনিক হযত হইতেছে, কিন্তু কাব্য হইতেছে না। কারণ তাহারা নিজেরাই বলিতেছেন, তাহাদের কাব্য আধুনিক কাব্য। অর্থাৎ প্রেরণা কাব্যের নহে, আধুনিকতার। স্বতরাং যাহা সৃষ্ট হইতেছে, তাহা কাব্য নহে, আধুনিকতা।

জৈনক নমস্ত বাঙ্গ লেখক কাব্যকে আধুনিক করিব্যর একটি দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। দৃষ্টান্তটি বাংলাদেশের পক্ষে উপযুক্ত হইয়াছে। তাহার মতে, এক কালের কাব্য অল্প কালে অচল। ছেলেদের অনেকগুলি কবিতা তিনি আধুনিক করিয়া তুলিয়াছেন। একটি নমুনা উদ্ধৃত করিতেছি। একটি কবিতার আরম্ভ এইরূপ—

Father, dear father, come home with me now ;

The clock in the steeple strikes one.

You promised, dear father, that you would come home

As soon as your day's work was done.

শনিবারের চিঠি

কিন্তু আধুনিক পিতা এক্ষণে বাড়ীতেই বসিয়া থাকেন, স্বতরাং এক্ষণে কবিতা নাকি আর কাহারও মন জুলায় না। স্বতরাং কালের সঙ্গে ভাল রাখিয়া কবিতাটির পরিবর্তন ঘটাইতে হইল। অর্থাৎ কবিতাটি আধুনিক হইল। হইয়া যাহা পাড়াইল তাহা এই—

Oh father, dear father, why won't you go out ?

Why sit here and spoil all the fun ?

We took it for granted you would beat it down town

As soon as your dinner was done.

কিন্তু লোকে বাঙ্গকে বাঙ্গ বলিয়া বুদ্ধিতে পারে না।

কথাটা আরও পরিষ্কার করিয়া বলা অবশ্যক। এ যুগের কাব্য-মাত্রেরই স্বভাবতই এ যুগের। যে লোকটি বাঁচিয়া আছে সে স্বভাবতই জীবিত। যাহাদিগকে আমরা প্রাণী বলি তাহারা স্বভাবতই প্রাণী। কিন্তু যদি কেহ মনের এই সহজ চিন্তারীতিককে চমৎকৃত করিয়া অসংখ্য প্রাণীর ভিতর হইতে তিন চারিটি প্রাণীকে প্রাণী বলিয়া প্রচার করিতে থাকে, তখন কি ইহাই বুঝা উচিত নহে যে প্রচারকারী প্রাণীর সংজ্ঞা বিস্মৃত হইয়া হঠাৎ তিন চারিটি প্রাণীকে প্রাণী বলিয়া চিনিতে পারিয়াছে? এক্ষণে লোকের নিকট হইতে প্রাণীপরিচয় গ্রহণ করিতে আর প্রবৃত্তি থাকে না।

স্বতরাং কবিতা যদি মডার্ন হইয়া থাকে তবে তাহা মডার্ন যুগের সৃষ্টি বলিয়াই মডার্ন। মডার্ন কবিতার পক্ষে মডার্ন হওয়াটা একটা সংবাদই নহে। আসল সংবাদ, কাব্য সম্পূর্ণ রূপ লইয়া প্রকাশ পাইয়াছে কি না। অর্থাৎ রচনা কাব্যের রূপ গ্রহণ করিয়াছে কি না। কাব্যের রূপ বলিলাম এই জন্ম যে, যে কোনো জিনিসকে আমরা তাহার রূপ

অন্য ধারাই চিনিতে পারি। পাটীগণিতের অঙ্ক যে কবিতা নহে তাহারও পরিচয় পাই তাহাদের রূপে।

মনে হয়, মডার্ন কথাটির অর্থ একটা অর্থ আছে। অর্থাৎ যাহা সর্ব কালের তাহাকে অগ্রাহ্য করিয়া অতীত সাময়িক জিনিসকেই মডার্ন বলা হইতেছে। ইহা মডার্ন যুগের সৃষ্টি অতএব মডার্ন, তাহা নহে। ইহা ক্ষণস্থায়ী, ক্যাশন বদলাইলেই কাল ইহা ধূল্য লুটাইবে, সেই জন্ত ইহা মডার্ন। গোলাপ চাপা গন্ধরাজ কখনও মডার্ন হয়না; কাগজের ফুলই মডার্ন হইতে পারে।

চিন্তার দিক দিয়া আর একদল মডার্নকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। তাহার ভবিষ্যৎপন্থা বা অতিপ্রগতিশীল, স্মৃতিরাজ বর্তমান তাহাদের আলোচ্য নহে। ইহার আরও নির্যাস। ইহার আজ যাহা চিন্তা করিতেছে ভবিষ্যতের লোকের কাছে যে সে চিন্তা অতীত কালের প্রাচীন এবং মূল্যহীন চিন্তা রূপে দেখা দিবে এইটুকু ভবিষ্যৎ করনা করিবার ক্ষমতাও ইহাদের নাই।

অতএব কাব্যক্ষেত্রে মডার্নিজম বা ফিউচারিজম না মানাই উত্তম। যদি মানিতে হয় তবে একমাত্র ইটানিজম মানিব। সর্বোপেক্ষা উত্তম, কাল-সম্পর্কীয় কিছুই না মানা। কাব্য বিচারে কাব্যকে মানাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা।

রবীন্দ্রনাথ বর্তমানে গগনচন্দ্র রচনা করিতেছেন। গত ষাট বৎসরেরও উপরে তিনি কবিতা এবং গান রচনা করিয়াছেন এবং বহু ছন্দের পথ অতিক্রম করিয়া তিনি গগনচন্দ্রে পৌছিয়াছেন। কাব্যের উৎসমুখ শুদ্ধ-প্রায়, স্মৃতিরাজ ইহা ছন্দের অভিব্যক্তি নহে, কবির দীপ্য আশ্রয়। বর্তমানে তিনি যেটুকু প্রকাশ করিতে চাহেন অর্থাৎ এখনও যেটুকু

শনিবারের চিঠি

শনিবারের চিঠি

প্রকাশের ক্ষমতা তাহার মধ্যে অবশিষ্ট আছে তাহার জ্ঞান তিনি হয়ত গগনচন্দ্রের রূপটিই উপযুক্ত মনে করিয়াছেন। ইহা যে কবিতার বিকল্প নহে তাহা তিনি জ্ঞানেন। কারণ কবিতার দাবী গগনচন্দ্র পূরণ করিতে পারে না। ইহা কবিতার মুক্তিও নহে, গগনের দ্বারা কবিতার কাজ করা ইয়া লইবার চেষ্টা। হাতীর চলায় ছন্দ আছে বলিয়াই নটীর নৃত্য তাহার দ্বারা সম্ভব নহে। যাহারা এই হাতীর গমনচন্দ্রকেই নটীর নৃত্য-সময়ে নৃত্যের আসরে ক্রমাগত হাতী ছাড়িতেছে, তাহারা হাতীর গমনচন্দ্র এবং নটীর নৃত্যচন্দ্র কোনোটারই রস উপভোগ করিতে পারে না। গগনচন্দ্র সপক্ষে খুব বেশি বলিলেও মাত্র ইহাই বলা যায় যে ইহা রবীন্দ্রনাথের বর্তমান প্রকাশের একটা রূপ—তাহার গগন পন্থা বিভিন্ন প্রকার রচনা-রূপের ইহা অগ্রতম। কিন্তু ইহা কবিতার রূপ নহে, গদ্যের রূপ। গদ্য এবং পদ্য যে পার্থক্য সেই পার্থক্য গগন-চন্দ্রে এবং পন্থাচন্দ্রে। যদি কোনো সঙ্গীতশিল্পী আজন্ম সঙ্গীত সাধনা করিয়া কোনো সময় সঙ্গীত হইতে অবসর গ্রহণ করেন, এবং সঙ্গীতের রচনাগুলি ছাড়ার মত উচ্চারণ করিতে থাকেন তবে তাহা যেমন আমরা সঙ্গীত বলিয়া মানিব না, ছড়া বলিয়াই মানিব, গগনচন্দ্রও তেমনি আমরা রবীন্দ্রনাথের গগন রচনার একটি ভঙ্গি বলিয়াই মানিব। কদাপি তাহাকে কবিতা বলিয়া মানিব না।

রবীন্দ্রনাথের গগনচন্দ্রের একটি উৎকৃষ্ট অংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

তোমার কাছে কাছে প্রাঞ্জল রেখেছি প্রতি মুহূর্তের সংগ্রাম

ফলে শস্ত্রে তার জয়মালা হয় সার্থক।

অলে স্থলে তোমার ক্ষমাহীন রণরঙ্গ ভূমি,

দেখানে মৃত্যুর মুখে ঘোষিত হয় বিজয়ী প্রাণের জয়বার্তা ॥

...অচল অবরোধে আবদ্ধ পৃথিবী, মেঘলোকে উধাও পৃথিবী,
গিরিশৃঙ্গমালার মহৎ মৌনে ধ্যাননিমগ্না পৃথিবী,
নীলানুশাশির অতন্ত্রতরঙ্গে কলমঙ্গুথরা পৃথিবী
অল্পপূর্ণা ভূমি হৃন্দরী, অধরিক্তা ভূমি ভীষণা।

কিন্তু তবুও ইহা গল্প, ইহাতে সঙ্গীতের সেই স্বর নাই যাহা একবার
মর্মস্পর্শ করিলে বারংবার তাহাকে দোলা দিতে থাকে।

পূর্বে বলিয়াছি কবির কাব্য তাহার উপযুক্ত রূপ লইয়া আবির্ভূত
হয়। সে রূপ একেবারে নূতন হইতে পারে, তাহার মাত্রা ছন্দ
প্রভৃতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইতে পারে; আবার সে রূপ পরিচিত রূপও
হইতে পারে। কিন্তু পরিচিত হইলেই যে তাহা পুরাতন হইবে
তাহা নহে, তাহাতে ইহাই প্রমাণ হইবে যে সে রূপ আপনাকে
পূর্বে প্রকাশ করিয়াছে মাত্র, কিন্তু তাহার সার্থকতা আজিও শেষ
হয় নাই। স্মরণ্য পরিচিত রূপ দেখিলেই তাহাকে আমরা প্রাচীন
বলিব না; অপর পক্ষে আধুনিক হইলেই যে শুদ্ধমাত্র আধুনিকতার
খাতির গন্ধকে কবিতা বলিব তাহাও নহে। গল্প বা পদ্য আধুনিক
হইলেও যে গল্প, গল্প; এবং কবিতা, কবিতা; একথা মানিতে হইবে।
সাহার্য্য মানে নাই, তাহার্য্য ঘোর বিপদে পড়িয়াছে। “কবিতা” নামক
একখানি ত্রৈমাসিক পত্রিকা বাহির হইয়াছে। ইহার চৈত্র সংখ্যায়
মোট ২৩টি লেখা আছে, কিন্তু তন্মধ্যে ১৬টিই গল্প। এই “কবিতা”র
লেখকদের অধিকাংশের প্রেরণা কবিতার নহে, আধুনিকতার।
আধুনিকগণ গল্পকে পদ্য বলিবার সাহস রাখেন, সেই জন্মই পত্রিকার
নাম “কবিতা”। “গল্প-কবিতা”র লেখকগণ কিসে অহুপ্রাপিত
হইলেন তাহা সম্ভবতঃ তাহারও জানেন না।

ভূমিকায় লেখা হইয়াছে, গল্পছন্দ দেখিয়া লোকে যে বলে
কবিতা লেখা সহজ হইল কিন্তু মোটেও তাহা হয় নাই।—কিন্তু
লোকে কেন এরূপ বলে তাহা লেখক ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি?
কবিতা লেখা যে কবির পক্ষে কঠোর তাহা এই প্রথম জানিলাম।
আমাদের ধারণা ছিল উহা কবির পক্ষে স্বভাবতই সহজ। কিন্তু
কবিতা লেখা ত সাধারণ লোক সহজ বলে না, তবে গল্পকে
কবিতা বলিয়া চালাইলে সাধারণ লোক যদি বলে, ‘কবিতা লেখা
সহজ হইল’, তাহা হইলে একবার জন্ম তাহাকে বিশেষ দোষ
দেওয়া যায় না। গায়ক যদি গানের সুরটি বাদ দিয়া গানের কথা
লইয়া চীৎকার করিতে থাকে এবং বলে ইহাই গানের আধুনিক রূপ
তাহা হইলে সাধারণ লোক অবশ্যই বলিবে গান গাওয়া সহজ
হইল। নমুনা যাহা দেখিতেছি তাহাতে উক্ত লোক শুধু কথা
বলিয়াই নিবৃত্ত হইয়াছে ইহা লেখকের ভাগ্য। কবিতা লেখা সহজ
হইল, একবার প্রতিবাদ না করাই ভাল। “কবিতা” ত্রৈমাসিক
হইতে একটি সম্পূর্ণ “গল্প-কবিতা” উদ্ভূত করিতেছি—

ভোরের কলকাতা—

রিকশার উপরে ক্রান্ত চীনে গম্বিকা যখন চোখ বোজে
স্বর্গের অলস উত্তাপে,
তখন দিন-রাত্রির নিঃশব্দতা
তোমার রক্তে আসে
নীল নদীর মত।

কত দুসর চোখে অশ্রীল, নাগরিক আনন্দ,
পিচের পথে
অগণিত মাছঘের ক্রান্ত পদক্ষেপ।

যে-কোনো লোক ইচ্ছা করিলেই এরূপ “কবিতা” সারাজীবন মিনিটে একটি করিয়া লিখিয়া যাইতে পারে। এইরূপ একটি লেখার খাতা হইতে নমুনাস্বরূপ দুই একটি উদ্ধৃত করিতেছি। লেখক ঘড়ি ধরিয়া মিনিটে একটি করিয়া লিখিয়াছেন। এক ঘণ্টায় ৬০টি কবিতা তিনি লিখিয়াছেন।

(১)

ছেকড়া গাড়ির চাকার নীচে

যে প্রাণ হচ্ছে দলিত

যে ধূলি হচ্ছে নিষ্পেষিত

সকালে বিকালে বা রাত সাড়ে বারোটায়

সে প্রাণ আর সে ধূলি—

তার কতটুকু মূল্য ?

সব অশ্লীল—থাওয়া পরা ঘুমানো।

কিন্তু কি হবে এ সব ভেবে—

রাস্তা দিয়ে ক্রমাগত ছেকড়া গাড়ি ছুটে—

এখন রাত সাড়ে বারোটায়।

(২)

রাশিয়ার এক বারবনিতা

এল স্নেজে চড়ে মির্জাপুর স্টাটে।

পথে দেখা হ’ল এক পানউলির সঙ্গে ;

নেপথ্যে বলে, একটু দোস্তা দে না দিদি।

পানউলি উঠল চেঁচিয়ে

বলে মর মাগী, তুই আবার কোথাকার রে !

—ব’লে তাকে এই মারে ত সেই মারে।

অবশেষে মেসের এক চাকর ঝগড়াটা দিলে মিটিয়ে।

পাশেই প্যারাগন ঠোর।

ইহা যদি কবিতা হয় তবে কবিতার যে মুক্তি হইয়াছে এ বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না। রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া ক্লাস্ত। এরূপ অবস্থায় যে-হেতু তিনি গগলছন্দ লিখিতেছেন, সেই-হেতু আমরা একরূপ ধরিয়া লইতে পারি যে তাহার বর্তমান প্রকাশের পক্ষে ইহাই তাহার উপযুক্ত ফর্ম। কিন্তু এই ফর্মের ভিতর যদি তিনি কবিতার মুক্তি খুঁজিয়া পাইতেন তাহা হইলে তিনি অবশ্যই তাহার পূর্বলিখিত যাবতীয় কবিতার এই পথে মুক্তি দিতে উৎসুক হইতেন। হয়ত তাহার রূপ হইত এই—

ওগো সম্রাসী, পঞ্চশরকে পুড়িয়ে

এ করেছ কি ?

তার ছাইগুলো যে বিধময় ছড়িয়েছ।...

কিংবা—

আজ দীর্ঘ দিন ধরে সকল কাজই ত শেষ করেছি

আবার কেন ডাকছ ?...

কিংবা—

হে কুমার তোমার ধনকে একবার টান দাও

টানের চোটে তা ঝন ঝন করে বেজে উঠুক।...

কিন্তু কবিতা মুক্তি চাহিবে কেন? ফুল হইতে বর্ণ-গন্ধ মুক্তি চাহিয়া ফুলকে পরিত্যাগ করিবে, মানবাখ্যা মানব দেহ হইতে মুক্ত হইয়া যাইবে এবং এই অবস্থাকেই কি আমরা ফুল এবং মাছুষের পক্ষে আদর্শ অবস্থা বলিব? ফুলের পক্ষে বর্ণ-গন্ধের বন্ধন, মাছুষের পক্ষে প্রাণের বন্ধন, ইহাই যে ইহাদের পূর্তা, সে কথা কি-উপলক্ষে আজ বিস্মৃত হইবার প্রয়োজন হইল? কিন্তু ‘আধুনিক’ বা ‘মডার্ন’ হইবার অর্থ কি সত্যই এতখানি অভিনবত্বের প্রয়োজন আছে? আসলে এই অভিনবত্ব আর কিছুই নহে, কবিতার মৃত্যু। ইহা রবীন্দ্র-কাব্য-প্রবাহের শেষ পরিণতি। রবীন্দ্রনাথ যে স্বরে কাব্যজীবন বাঁধিয়াছিলেন সে স্বরের ধারা ঘাট বৎসরের অধিক কাল প্রবহমান রাখা তাঁহার একার পক্ষে সম্ভব নহে। অল্প ব্যক্তির পক্ষেও তাঁহার স্বরের জের টানা অসম্ভব। বাঁহারা একপ করিতে গিয়াছেন তাঁহার নিজেদিগকে আর ফিরিয়া পান নাই। ইহার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে অবনীন্দ্রনাথের শিল্পভঙ্গি। তাঁহার ভঙ্গি নকল করিয়া বাঁহারা শিল্পী মাঝিতে গিয়াছেন তাঁহারা কেহই অবনীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। অবনীন্দ্রনাথের ভঙ্গির অহুকরণ দ্বারা অবনীন্দ্রনাথ হইতে স্বতন্ত্র হওয়া চলে না। কাব্যে যেক্রপ, চিত্রশিল্পেও সেই রূপ—রূপ কাহারও অহুকৃতি হইতে পারে না। বাঁহারা শিল্পক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছেন তাঁহারা অবনীন্দ্রনাথকে অহুকরণ করেন নাই, তাঁহার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া নিজস্ব পথে চলিয়াছেন। এই নিজস্ব পথের বৈশিষ্ট্য আপনার গরজেই রক্ষা পায়, ইহার অল্প আড়ম্বর-আয়োজন করিতে হয় না।

রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে তাঁহার গল্প ছন্দের রূপটি বাঁহারা গ্রহণ করিয়াছে তাহারা ইহা পাইয়া অত্যন্ত খুশী হইয়া উঠিয়াছে। খুশী হইবার বিশেষ কারণ এই যে ইহা দ্বারা তাহারা বিনা সাধনায় কবি

রামে পরিচিত হইবার সুযোগ পাইয়াছে। পাঁচ ছয় লাইন গল্প লিখিলেই কবি হওয়া যায়, এত বড় সুযোগ বাংলা দেশে নষ্ট হইতে পারে না। যে দেশে উপাধি লোকে ভি-পি ভাকে জয় করে সে দেশে বিনা পয়সার উপাধি কে ছাড়িবে? কাজেই এখন “কবিতা”র পত্রিকাও বাহির হইতেছে।—কিন্তু হঠকারিতার একটা সীমা থাকা উচিত।

মানাক্রপ শূণ্ণগর্ভ আয়োজন ছাড়াও কবিতা যে এ যুগেও লেখা যাইতে পারে এবং কবিতার মূল নীতি অগ্রাহ্য না করিয়াও যে তাহাতে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা যাইতে পারে তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। আসলে স্বাতন্ত্র্য জিনিসটি চেষ্টার দ্বারাই নষ্ট হয়। চরিত্র বাহার নাই, স্বাতন্ত্র্যের অভাব তাহারই। শিল্পের ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় পাই আমরা শিল্পেরই মধ্যে, অহুকরণের মধ্যে নহে। মাছুষের মনে সৃষ্টির যে প্রেরণা রহিয়াছে তাহা কাহারও অহুকরণ নহে, কারণ প্রেরণা হইতে যে সৃষ্টি তাহা স্বতন্ত্র রূপ গ্রহণ করিতে বাধ্য। কিন্তু প্রেরণা বাহার নাই তাহাকেও অনেক সময় শিল্পীর অভিনয় করিতে হয়, কারণ অভিনয়ের আকাঙ্ক্ষা মানব-মনেরই একটা বৃত্তি—স্বতরাং অহুকরণ-কারীদিগকে আমরা ক্ষমা না করিলেও তাহাদিগকে অগ্রাহ্য করিতে পারি।

আরও একটি কারণে এই বার্থ সৃষ্টির অনিবার্যতা মানিয়া লইতে হয়। বড় প্রতিভার আবির্ভাব হইলে সেই যুগে ছোট প্রতিভার প্রায় মৃত্যু ঘটে। রবীন্দ্রনাথের বিরাট শক্তি গত পঞ্চাশ বৎসরের অধিককাল ধরিয়া সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের প্রাচুর্যে দেশকে বিম্বিত করিয়া রাখিয়াছিল। তাঁহার বিরামহীন সৃষ্টি, বহুতার স্রোতের মত সমস্ত দেশকে প্রাবিত করিয়া ফেলিয়াছিল, ইহাকে অতিক্রম করিয়া নূতন করিয়া ভাবিবার

নূতন করিয়া সৃষ্টি করিবার অবসর কাহারও ছিল না। কিন্তু আজ অর্ধ শতাব্দী পরে, বহু যখন সরিয়া গেল, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং যখন অছড়ব করিতে লাগিলেন তাঁহার শক্তি হ্রাস হইয়া আসিতেছে, তখন নিজের প্রভাব অতিক্রম করিয়া নিজেকে নূতনতর রূপে প্রকাশ করিবার জ্ঞতাঁহার চিন্তা ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি বুঝিলেন তাঁহার পক্ষে নূতন কাব্যের দ্বারা তাঁহার কাব্যের সুরকে অতিক্রম করা যাইবে না। কারণ, মাছের যত ক্ষমতাই থাকুক তাহার একটা সীমা আছেই। তিনি উপলব্ধি করিলেন—হয়ত এই উপলব্ধি সজ্ঞান উপলব্ধি নহে—যে তিনি যে পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন সে পথের কনভেনশন নষ্ট না করিলে তাঁহার ক্রমশীর্ণায়মান পথের শেষে নূতন পথ পাওয়া যাইবে না। একদিকে শক্তি হ্রাস, অঙ্গদিকে নূতন সৃষ্টির আবেগ।—নূতন সৃষ্টির দ্বারা কাব্যজীবনকেও অতিক্রম করিয়া, নিজের প্রভাবকেই নিজে কাটাইয়া, একটা নূতন জগৎ দেখিবার বাসনা কবির মধ্যে ছন্দাম হইয়া উঠিল। উপলব্ধি করিলাম যেন আয়েয়-গিরি বিদীর্ণ হইল। কবির মধ্যে একটা প্রচণ্ড শক্তি জাগিয়া উঠিল। এই শক্তি, প্রাচীন সংস্কার চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া অত্যন্ত প্রবল ভাবে একটা স্থল বলিষ্ঠতা লইয়া আত্মপ্রকাশ করিল তাঁহার চিত্র-শিল্পের ভিতর দিয়া। বহু মূর্খের টিটকারি এবং বাস্তবজগতের মস্তকে পা রাখিয়া তাঁহার শক্তির কলোাস আলোকহস্তে আসিয়া দাড়াইল। কাব্যের পথে রবীন্দ্রনাথ দেখানো নিঃশেষিতপ্রায়, চিত্রশিল্পের পথে তিনি আবার সেখানে নিজেকে নূতন করিয়া পাইলেন। শিল্পীর চিত্র এ বলিষ্ঠতার প্রকাশে বিন্মিত চমৎকৃত হইয়াছে কিন্তু কবির ভীকৃত্য তাহা স্পষ্ট করিয়া স্বীকার করে নাই। এই নূতন প্রকাশ যে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে কতখানি প্রয়োজন ছিল তাহা তিনি অবশ্যই অছড়ব করিয়াছেন—

যদিও তাঁহার শিল্পের ভাষা দেশের লোকের নিকট অপরিচিতই রহিয়া গেল। শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু বলিয়াছেন, "If Rabindranath seems rough and destructive, it is because he is breaking the ground anew for us that our future flowers may be more surely assured of their sap..."

এই কথাটি এদেশের লোক কখনও বুঝিতে চেষ্টা করিবে কিনা জানি না।

রবীন্দ্রোত্তর যুগে কাব্যের দিক দিয়া প্রথম এই বলিষ্ঠতা রূপ ধরিয়াছে সজ্ঞানীকান্তের ভিতরে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের চিত্রশিল্পে বাহ্যত যে বিদ্রোহ ফুটিয়াছে, সজ্ঞানীকান্তের কাব্যে ততখানি বিদ্রোহ দেখাইবার প্রয়োজন হয় নাই; তাহার কারণ সজ্ঞানীকান্তকে কাব্যসৃষ্টির জ্ঞতা নিজের চিন্তের সঙ্গে বিদ্রোহ করিতে হয় নাই। রবীন্দ্রনাথকে স্বীকার করিয়াই তিনি নিজের ক্ষেত্রটি আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার বাণী প্রায় সর্বক্ষেত্রেই বিদ্রোহীর বাণী, কিন্তু তাই বলিয়া এ বিদ্রোহ কবিতার স্থল নীতির সঙ্গে নহে। সেক্ষেত্র বিদ্রোহ থাকিলে হয়ত তাঁহার বক্তব্য এত উগ্রভাবে স্পষ্ট হইয়া উঠিত না কারণ, সেক্ষেত্র হইলে কোনো বক্তব্যই থাকিত না। যেমন নাই ঐ সব "আধুনিক" কবিদের। তাঁহার "রাজহংস"র ছন্দোবীতিতে যে স্বাতন্ত্র্য রহিয়াছে সেই স্বাতন্ত্র্যটিই বড় করিয়া দেখাইবার প্রয়োজন নাই, কারণ যাহা প্রাণবন্ত তাহা তাহার বাহিরের রূপের সঙ্গে অচ্ছেদ্য। রূপের কাঠামো গড়িয়া পরে তাহাতে প্রাণশক্তি প্রকাশ করা যায় না, দুইটি একই সঙ্গে জন্মলাভ করে। স্বতরাং রাজহংসের কবিতাগুলির মধ্যে প্রাণশক্তির যে পরিচয়

আছে; বলিষ্ঠতার যে সহজ প্রকাশ আছে তাহার রূপটিও সেই প্রকাশের সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছে। সচেতন না থাকিলে পড়িবার বা শুনিবার সময় এই স্বতন্ত্র রূপটি প্রায় লক্ষ্যগোচর হয় না।

‘রাজহংস’র কবিতাগুলি স্বরের স্বাক্ষর এবং লালিত্যের জড় কোথাও অপেক্ষা করে নাই। তাহারা প্রসাধন-চিকণ দেহ লইয়া নুপুর বাজাইতে বাজাইতেও পথ চলে নাই; কবিতাগুলি যেন স্বরের মত বেগে ‘বাহির হইয়া আসিয়াছে।’ ‘অপরূপ সে প্রকাশ।’ বাংলা কবিতার ভাষায় এরূপ দুর্দমনীয় শক্তির বাজনা ইতিপূর্বে আর দেখা যায় নাই। কঠিন ধাতু যেমন উত্তাপের স্পর্শে একটা আর একটার সঙ্গে সহজে মিশিয়া যায়, রাজহংসের কবিতাগুলিতেও তেমনি নানা জাতীয় শব্দ যেন একটা প্রচণ্ড উত্তাপে একত্বের মিলিয়া গিয়াছে। যে সমস্ত শব্দের ধ্বনিসামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া সাধারণ বাক্যরচনায় ব্যবহার করা কঠিন, তাহারা যেন মন্ত্রবলে কবির আয়ত্তাধীন হইয়াছে। কবিতাগুলি মিষ্টাক্ষর নহে, অথচ যতিগুলিও নির্দিষ্টসংখ্যক নহে। যতির বন্ধন না থাকাই ইহার নূতন রূপ প্রকাশে সাহায্য করিয়াছে। অলঙ্কার এবং আভরণহীন হইয়া শুদ্ধমাত্র নগ্ন প্রাণশক্তিতে তাহারা স্তম্ভর। ইহার স্পষ্ট প্রকাশ কোনো প্রসাধনের প্রাচুর্যে ক্ষুণ্ণ হয় নাই, শুদ্ধমাত্র কাব্যের মূল দর্শেই ইহার কাব্য হইয়া উঠিয়াছে। ‘কে জাগে’ নামক কবিতা হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি—

শুধু হাংসে মহাকাল—

হা হা সেই হাসি শুনিলাম যেন রজনী দ্বিপ্রহরে,
শীতের রাজি, মরা জ্যোৎস্নায় কুয়াসা গলিয়া পড়ে—
জনহীন রসারোড়—

চলে চারিজন ক্রান্ত চরণে, ক্ষণে বদলিয়া কাণ
মুখে অতি ক্ষীণ—বল-হরি-হরিবোল।

মহাকাল যেন হাসিল অট্ট হাসে।

সে জুর হাসিরে উপহাস করি’ আলোকিত দোতালায়
নবজাত শিশু ককিরে কাঁদিয়া ওঠে—

সেই জাগে চিরকাল।

কবির মনে প্রলয়ের ঝড় বহিতেছে, সেই ঝড়ের প্রতিধ্বনি শুনিতেছি তাঁহার কবিতায়। বিশ্বব্যাপী প্রলয় অন্ধকারের মধ্যে যেন ক্ষণে ক্ষণে বিছাৎ শিহরণ আর বজ্র নিখোঁষ। কবিচিন্তে এই প্রচণ্ড অস্থিরতা কেন, সর্বত্র তাহার হুস্পষ্ট নির্দেশ রহিয়াছে। কবি মহৎ মানবজীবনের মূল্যবোধতায় যেন থল থল করিয়া হাসিতেছেন—কখনও বা সেই ব্যর্থতার উগ্রতায় আপনাকে হনন করিতে চাহিয়াছেন, কখনও বা মৃত্যু পণ করিয়া সত্যের সহিত মুখামুখী পাড়াহিতে চাহিয়াছেন। ভীকতা, দুর্বলতা এবং শঠতার ব্যাধি সমাজের সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছে, মাছুষ তিলে তিলে মরিতেছে, অতি হীন সে মৃত্যু—কবি সে মৃত্যু চাহেন না, তিনি বলেন—

সে মৃত্যু আমার মৃত্যু নয়—

দিগন্ত ছাইয়া ওড়ে আমার শিবের জটাজ্জাল,
আকাশ আঁধার করে অন্ধের বিবৃতি।

ভূমিকম্প নহে তাহা নহে গিরিবিদারণ রূপ—

সে তো পলকের লীলা, নটেশের এক পদপাত,
দিকে দিকে ঠেঁ ঠেঁ মৃত্যুর তাণ্ডব—

তারই মাঝে জীবন অধূর—
 পাখা পত্র পুষ্প মেলে আলোকের পানে,
 প্রলয়ে করে না ভয়, পাড়িয়ে মৃত্যুর মুখামুখি
 আপনি বাড়িয়া চলে আপন গৌরবে।

দূর কর মোহ আবরণ,
 বৈশাখের উন্মাদ বাতাসে
 ছিন্নভিন্ন হয়ে যাক যুগান্তের কালো মায়াজাল,
 হাতক শ্রামল কিশলয়!
 যে জীবন যুগে যুগে মৃত্যুরে করিল উপহাস
 মৃত্যুরে করিল নমস্কার—
 করিল না ভয়,
 শ্মশানের ভঙ্গস্থপে সে জীবন খুঁজিছে আলোক,
 মাটি ফুঁড়ি উঠিবে আকাশে—
 মৃত্যুর বন্দনা গানে,
 সে জীবনে বার বার জানাই প্রগতি।...

গভীর নিরাশায় হউক বা ক্ষীণ আশায় হউক কবিচিন্তে সন্দেহা এই
 অস্থিরতা। প্রবল ভাবে বাঁচিতে হইবে আর তাহা যদি না পারিত
 তৎক্ষণাৎ যেন বীরের মত মরিয়া যাইতে পারি—অর্ধ জীবন অর্ধ
 মৃত্যুর মধ্য পথে বসিয়া বিলাস করিবার মত সময় নাই।

এর চেয়ে মৃত্যু ভাল, জীবনের মিথ্যা জয়ধ্বনি
 সবে মিলি তুলিতেছি, নবযুগ ব্যাধির প্রকোপে।

মেঘ ছোঁয়া দস্তে আজ জীবনের বীভৎস বিকার,
 জীবনের স্বরূপ এ নহে।
 প্রাণের মুখোশ পরি' মৃত্যু আসি দ্বারে দেয় হানা,
 লাক্ষিত দলিত পিষ্ট, যারা আমাদের মত ক্লীব
 দুগায় মরিতে চাহে দিবসের প্রভাতে সন্ধ্যায়,
 তিলে তিলে চলিয়াছি অতি হীন মৃত্যু অভিযানে,
 বিকল অক্ষম মোরা।

কবিচিন্তের অস্থিরতার এই পরিচয়টি পাইলে তাঁহার কবিতাগুলির
 শক্তির উৎসের পরিচয়ও পাওয়া যাইবে। এই বেদনা কবিচিন্তকে তীব্র
 বেগে ছুটাইয়া লইয়া চলিয়াছে, এবং মনে হয় জীবনের প্রতি অনেক-
 ধর্ম নিরাশাও আনিয়া দিয়াছে। তাই ত জীবনের প্রতি কবির
 বিদ্বেহ। এই বিদ্বেহই তাঁহার কাব্যকে রবীন্দ্র কাব্যদ্বারা হইতে
 অনেকখানি স্বতন্ত্র করিয়া দিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ নিজের সহিত বিদ্বেহ
 করিয়া নিজের প্রভাব কাটাইবার জন্ত যে ভাষার আশ্রয় লইলেন তাহা
 রেখা এবং বর্ণের ভাষা, কারণ কাব্যের ভাষা তাঁহার নিকট নিঃশেষিত।
 তাঁহার পক্ষে নূতন করিয়া রূঢ় বাস্তবের সঙ্গে পরিচয় বা জীবনকে
 নূতন দৃষ্টিতে দেখা আর সম্ভব নহে। তাই কাব্যের ক্ষেত্রে নূতন সৃষ্টির
 ভার নূতন কবিকে লইতে হইবে। নূতন কবি জীবনকে নূতন দৃষ্টিতে
 দেখিবেন, জীবন সপক্ষে নূতন বাণী প্রচার করিবেন। ইহা হয়ত রবীন্দ্র-
 নাথের স্বরের সঙ্গে সম্পূর্ণ ভাবে মিলিবে না, হয়ত কিছু কালের জন্ত
 তাঁহার স্বর লোকে বিস্মৃতও হইতে পারে, কিন্তু তবুও জীবনের পক্ষে
 ইহা অপরিহার্য। ইহা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিরোধ নহে, পরস্তু তাঁহার
 যেখানে শেষ, নূতন কবির যাত্রা সেইথান হইতে শুরু; এমনি করিয়া
 প্রতি যুগের বাণী মিলিত হইয়া একটি সম্পূর্ণ বাণী যুগান্তীত রূপে দেখা
 দিবে—যুগান্তীত মাহুষ সেই যুগেরই অপেক্ষা করিতেছে।

কবির প্রশ্ন

হাতুড়ির ঠক্ ঠকা ঠক্
তার মধ্যে প্রাণের বারতা,
ছপাছপ্ ঝাঁড় পড়ে জলে,
যুগান্তের বেদনার বাণী,
ক্যাচকোঁচ ঘোরে ঢাকা কঁদে
নিষ্পেষিত দুঃখীর কাহিনী;
কারখানা শিঙে ফোঁকে ভোরে
কুলিদের মরণ বাসরে,
ঘিস্ ঘাস কাটে খড় কারা,
ফোস করে সাপে খায় কাকে;
ঝন ঝন বাজিয়ে ঘুড়ুর
ছুটে যায় অক্লান্ত “রানার”,
“হেইয়ালো” হেঁকে টানে দড়া,
“এক বাঁও দুই বাঁও” ভাকে,
“আউর খোড়া” কারও আর্ন্তনাদ
সকলেরই মরণে জনম।
নিবিড় অরণ্যে যায় কেউ,
উদ্বেল সমুদ্র বক্ষে দোলে,
কেহ নামে খনির জঁঠরে
ঘাচে অন্ন শমন সকাশে।

ভগবান করেছে স্বজন
যদ্বী বেহ মদ্বী কেহ জাতে;
কারও কার্য সেবা কারও ভোগ
কারও কাম্মা কারও গাওয়া গান;
অথ কেহ কেহ বা সওয়ার
নিম্নিত, নিম্নক; ভূক্ত, ভোগী;
ক্রান্ত কেহ করিয়া হুঁম,
ক্রান্তি মানা কাহারও হুঁমে।
কেহ শয্যা পাতিয়া খালাস
নিজের শয়নে শুধু মাটি,
অতিরিক্ত করিয়া রজন
অনাহারে মরে কেহ কভু,
সারাদিন কাপড় বুনিয়া
কেহ ঘোরে উলঙ্গ হইয়া।
কত্থলের মোট বহে কেহ
ক্লিষ্ট দেহ শীতের তাড়নে,
অপক্লপ স্থগির বিধান;
স্থগিকর্ত্তা কিম্ব জেনো সবে
সর্ব মঙ্গলের—আনন্দের
নিঃসন্দেহ অনন্ত আকর।
বিধি যবে করেছে বিধান
তখন সে অবশ্যই বিধি;
বিধির বিধান মেনে চলা
সকলেরই উচিত তা জেনো।

ক'চিং ভেব না বিধি নাই
তাহলে বিধান যাবে ভেঙে।
বিধান ভাঙিলে সর্বনাশ—
কার? এই প্রশ্ন করে কবি।

শ্রীমধুকরকুমার কাক্সিলাল

দম্ভ

জগতের সর্বত্র, জীবনের সর্বকাজে, চতুর্দিকই কেবল দম্ভ।
জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ, মহাযুদ্ধ; ধনী এবং শ্রমিকের বিরোধ; তথা-
কথিত উচ্চ জাতিতে নীচ জাতিতে বিরোধ; গ্রামের সহিত গ্রামাশুরের
বিরোধ; প্রতিবেশীর সহিত দম্ভ; ব্যবসায়ীর সহিত জেতার কলহ;
উত্তমবর্গ ও অধমবর্গের বিবাদ; বৈবাহিকে বৈবাহিকে মনোমালিন্য;
ভ্রাতায় ভ্রাতায়, পিতা-পুত্রে সংঘর্ষ; সর্বদা, সর্বত্র এই দম্ভ, ইহা লইয়াই
সংসার ও সমাজ।

কিন্তু মাহুঘের অন্তরে যে দম্ভ প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে চলিতেছে,
তাহার তুলনায় উক্ত বিরোধগুলি কিছুই নহে। মাহুঘের অবচেতন মন
এবং সচেতন বুদ্ধির যে বিরোধ সর্বদা চলিতেছে, তাহা যেমন প্রবল
তেমনি গভীর এবং ততোধিক ভীষণ। এই দ্বন্দ্বের প্রবল সংঘাতের
নিকট ফরাসী বিপ্লব, রুম-জাপানের যুদ্ধ এবং সেনিনকার ইউরোপীয়

মহাসমর অতি নগণ্য, অতি তুচ্ছ। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই
মহাদ্বন্দ্বের সংবাদ জ্ঞাপনের জন্য কোন এ-পি বা ইউ-পি নাই। কয়েকজন
দরদী বন্ধুর উৎসাহে সম্প্রতি কয়েকটি সংবাদ কর্ণগোচর হইয়াছে। তাহাই
লিখিতেছি।

আমাদের স্বরেশ সেদিন গড়ের মাঠে বেড়াইতে গিয়াছিল। সন্ধ্যা
শেষ হইয়া রাত্রি আরম্ভ হইবে এমন সময়ে অপেক্ষাকৃত নির্জন এক
স্থান দেখিতে পাইল, একখানি চক্চকে গোড়াউন-বন্ডি মোটর
দাঁড়াইয়া আছে, কোন আরোহী নাই। কিছুক্ষণ সেদিকে দৃষ্টি দিতেই
তাহার অবচেতন মন আগ্রত হইয়া সচেতন বুদ্ধির সহিত যুদ্ধ আরম্ভ
করিল এবং অনতিবিলম্বে জয়লাভ করিল। স্বরেশের মনে হইল,
গাড়ীখানি তাহার নিছের। সে-ই ঐ গাড়ীতে চড়িয়া বেড়াইতে
আসিয়া ওখানে রাখিয়া দিয়াছে। ওখানা একান্ত তাহারই। এ
গাড়ীখানার সহিত তাহার সম্বন্ধ মোটেই আকস্মিক নহে। ঐ গাড়ী-
খানা ছাড়া অল্প কোন গাড়ী ওখানে থাকিলেও হয়ত তাহার টিক এমনি
মনে হইত। কিন্তু তথাপি তাহার অবচেতন মন বলিতে লাগিল, ওই
গাড়ীখানার সহিত স্বরেশের সম্বন্ধটা স্বাভাবিক, অনবচ্ছিন্ন, অনির্লচনীয়।
এটা তুচ্ছ বেচা-কেনা, তুচ্ছ তিন হাজার চার হাজার, তুচ্ছ নগদ
কিন্থা কিস্তিবন্দীর সম্বন্ধ নয়; হয়ত এ গাড়ী কোনদিন স্বরেশের
গারাজ প্রত্যক্ষ করিবার আশা আশঙ্কা বা স্পর্ধা করে নাই। কিন্তু ঠিক
এই কারণেই গাড়ীখানি নিতান্তই স্বরেশের। কয়েক সেকেন্ড পরেই
স্বরেশের মনে হইল, গাড়ীখানা তাহাকে বলিতেছে, ওগো, আমি
তোমারই। তোমারই জন্য আমি এখানে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া
আছি। তুমি এস, আসিয়া এই স্বকামল সীটে উপবেশন কর।
ষ্টাটারে ঈষৎ চাপ দিলেই আমার বৃকে প্রগতি-স্পন্দন আরম্ভ হইবে।

তার পর ক্লাচ করিয়া অ্যাক্সিলারেটরে পা রাখিয়া আস্তে জ্বোরে, যতক্ষণ ইচ্ছা, দেখানো ইচ্ছা আমায় লইয়া চল, আমি কিছুই বলিব না। ট্যাকে পাঁচ গ্যালন পেট্রোল এখনও মজুত আছে। স্বরেশ তাহাই করিল। ঘণ্টা দুই পরে একটি পুলিশ সার্জেন্টের সহিত সাক্ষাতের পর উহার সচেতন বুদ্ধি ফিরিয়া আসিল। দুই হাজার টাকার জামিন দিয়া থানা হইতে যখন বাসায় ফিরিল, তখন বুদ্ধিতে পারিল, অবচেতন মনের সহিত সচেতন বুদ্ধির সংঘর্ষ কিরূপ বিপজ্জনক। বুদ্ধিতে পারিলেও, একথা ঠিক যে ইহাতে স্বরেশের কোন দোষ নাই। অবচেতন মনের আদেশে সে যাহা করিয়াছে, তাহাতে কোন দোষ হইতে পারে না। যদি কোন দোষ কাহারও হইয়া থাকে, তবে তাহা ঐ গাড়ীর অধিকারীর এবং ড্রাইভারের। টাকা দিয়া কিনিয়াছে বলিয়াই অথবা ড্রাইভ করে বলিয়াই যে গাড়ীর উপর তাহাদের সম্পূর্ণ অধিকার হইবে এমন আইনের প্রকৃত মূল্য কতটুকু?

এইবার আমাদের মেসের চাকরের কথাটা বলি। সেদিন ভজ্জহরি শ্রামবাজার যাইবে বলিয়া চারিটি পয়সা লইয়া গলি হইতে বাহির হইল এবং ওয়েলিংটন স্ট্রীটের ধারে ট্রামের জন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিল। এমন সময়ে তাহার দৃষ্টি পার্শ্ব দোকানের কাচের আলমারি ভেদ করিয়া রসোগোলায় গমলার উপর পড়িল। পড়িতেই তাহার অবচেতন মন আগ্রহ হইয়া সচেতন বুদ্ধিটিকে যেন চপেটাঘাতেই পরাজিত করিয়া ফেলিল। ভজ্জহরির অবচেতন মন স্পষ্ট বুঝাইয়া দিল, শ্রামবাজার অপেক্ষা ঐ ময়রার দোকান তাহার বেশী আপনার এবং ট্যাকস্ চারিটি পয়সা অপেক্ষা একটি রসোগোলা অধিক প্রিয়তর। ফলে ভজ্জহরি মেস ফুলিল, শ্রামবাজার ফুলিল, ট্রাম ফুলিল, এবং চারিটি পয়সার মমতা হারাইল। একটি ঠোঙায় একটি সরস রসোগোলা লইয়া ফুটপাথে

আসিয়া দাঁড়াইল। এই সময়ে তাহার সচেতন বুদ্ধি আবার দ্বন্দ্ব প্রবৃত্ত হইল। একদিকে এই দ্বন্দ্ব চলিতে লাগিল, অপর দিকে ঠোঙা বাহিয়া 'চৈন' রস এবং জিহ্বা হইতে লালানিঃসৃত হইতে লাগিল। দশ সেকেন্ড এই দ্বন্দ্ব চলিবার পর হঠাৎ ভজ্জহরি নিজেকে যথাসাধ্য কঠোর করিয়া লইয়া রসোগোলাটিকে সবেগে চুমিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিল। যখন অবচেতন মনের সঙ্গে সচেতন বুদ্ধির দ্বন্দ্ব বাধে তখন সাধারণত শরীর ও মন এই দুইটির একটি পবিত্র থাকে, অপরটি অপবিত্র হইয়া যায়। কোন স্থলে শরীর পবিত্র থাকে, মন অপবিত্র হয়, আবার কোন স্থলে ঠিক তদ্বিপরীত ব্যাপার সংঘটিত হয়। এ স্থলেও অনেকটা সেইরূপ হইল। ভজ্জহরির গুণ্ডদ্বয় রসাপ্লুত হইয়া কলুষিত হইলেও পাকস্থলীটি পবিত্র রহিয়া গেল। এখন প্রশ্ন হইতেছে, এই যে ছানার্চিনিময় স্তম্ভুর রসাল নদর নিটোল বস্ত্রটি ওয়েলিংটন স্ট্রীটের ধূলায় লুপ্তিত হইল, ইহার জন্ত দায়ী কে? যে আপনার রূপ-রস-স্বাদ-গন্ধ লইয়া দেবতার নৈবেদ্য-রূপ ক্তার্থ হইতে পারিত, সে যে আজ কাকের মুখে বা ডানুলপ টায়ারের নীচে আপন সত্তা বিলুপ্ত করিয়া দিতে উদ্বৃত্ত, ইহার জন্ত দায়ী কে? আপনারা বলিবেন, ভজ্জহরি, কিন্তু ভজ্জহরি সম্পূর্ণ নির্দোষ। কারণ ভজ্জহরি মাছুষ; এবং মাছুষ অবচেতন মন এবং সচেতন বুদ্ধির সংঘাতে যাহা করিয়া থাকে, ভজ্জহরিও তাহাই করিয়াছে। প্রত্যং এখানেও চিরন্তন দ্বন্দ্বই দায়ী; আর দায়ী মাছুষের নিজের গড়া অস্বৃত্ত নিয়ম, যে নিয়মে ভজ্জহরি পয়সা না দিয়া রসোগোলা খাইতে পারে না। যদি তাহাকে পয়সা না দিতে হইত, তাহা হইলে 'অবচেতন মনের সঙ্গে সচেতন বুদ্ধির এত গোলা বামিত না।

এইরূপ দ্বন্দ্বের আরো দু' একটি সংবাদ লিখিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু ইতিমধ্যে লেখকের অবচেতন মনের সহিত সচেতন বুদ্ধির কলহ আরম্ভ

হওয়ায় আর অগ্রসর হইতে পারিলাম না। কিছুক্ষণ বসিয়া বসিয়া সেই কলহ শুনিতে লাগিলাম।

স-বু। এ সব কি করিতেছ ?

অ-ম। কেন, চুচার লাইন বাংলা লিখিলে দোষ কি ?

স-বু। তুমি বাপু পোষ্ট অফিসের কেরানী, এমন করিয়া সময় নষ্ট করা তোমার উচিত নয়।

অ-ম। কখনো এক আধ ঘণ্টা সময় কি কেহ নষ্ট করে না ?

স-বু। করে বই কি। তুমিও কর—পাশা গেল, দাবা গেল, নভেল পড়, তোমার অফিসের অগ্রাঙ্ক কর্মচারীদের কোঙ্গীবিচার কর—সকলে হাহা করে, তুমিও তাহাই কর।

অ-ম। এ সব কাজে বৃষ্টি সময় নষ্ট হয় না ?

স-বু। হয়, কিন্তু কেহ জানিতে পারে না। বোধহয় মিল্টন বলিয়াছেন, It is daylight that makes sin. তোমার অফিসের মঃ অঃ-কেরানীটি যদি সারাদিন ইম্প্রুভমেন্ট টাউ হইতে আরম্ভ করিয়া টালিগঞ্জ পর্যন্ত চমিয়া বেড়ায়, তাহা হইলেও লোকে জানিবে, আহা, লোকটি কারবন-পেপারের উপরে মঃ অঃ-রসিদ লিখিয়াই দিন কাটাইল।

কিন্তু তুমি যে আধ ঘণ্টা সময় নষ্ট করিলে, ইহার প্রমাণ কাগজে কলমে রহিয়া গেল। আরো একটা কথা এই যে, সময় পাঠিলেই যে তাহা নষ্ট করিতে হইবে, এমন কি কথা আছে ? এই ত পাশের বাড়ীর ভদ্রলোক তার চোটে ছেলে-মেয়ে দুটির জন্য একজন শিক্ষক খুঁজিতেছেন, তুমিই কেন পড়াও না ? তাও না পার, সকাল বিকাল চোটখাট বিজ্ঞানসম্মত করিতে পার, বাহাতে মূলধন প্রায় লাগে না বলিলেই হয়, যেমন দর, কুলপি বরফ, রিকশ, হোমিওপ্যাথি, ইত্যাদি। মোট কথা, বাংলা লেখা ছাড়।

অ-ম। কিন্তু—

বুঝিলাম, বিবাদ সহজে মিটিবে না। একবার ভাবিলাম, যাক গে, বাহা লিখিয়াছি, ছিঁড়িয়া ফেলি। আবার ভাবিলাম, লেখা যখন হইয়াই গিয়াছে, তখন আর ছিঁড়িয়া ফেলিলে কি লাভ হইবে ? ভাবিয়া কিছু স্থির করিতে পারিলাম না।

কিছুক্ষণ পরে দেখি, টেবিলের উপর লেখাটি নাই। মেষের চাকরটি ঘর খাঁট দিতেছিল ; তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, টেবিলের উপর যে কাগজখানায় আমি লিখিতেছিলাম, তাহা কি হইল ? সে বলিল, আপনি যে সেখানে এন্ডেলপে পুরিয়া ঠিকানা লিখিয়া আমায় ডাকে দিতে বলিলেন, আমি তা ডাকে দিয়া আসিয়াছি। আমার অবচেতন মন অমনি বলিয়া উঠিল, বেশ করিয়াছ।

সচেতন বৃষ্টি ফৌস করিয়া উঠিল, কাজটা ভাল করিলে না।

দ্বন্দ্ব এখনও চলিতেছে।

“ভাস্কর”

প্র। মাসিক পত্রিকা কয় প্রকার ?

উ। পাঁচ প্রকার।

প্র। কি কি ?

উ। (১) পুরাতন—ইহাতে লেখকের নাম থাকে রচনার শেষে। (২) নূতন—ইহাতে লেখকের নাম থাকে রচনার আরম্ভে। (৩) আধুনিক—ইহাতে লেখকের নাম থাকে রচনার পূর্বে, রচনার শেষে এবং প্রতি পৃষ্ঠার নীধনশেষে। (৪) ভবিষ্যৎ—ইহাতে লেখকের নাম থাকিবে রচনার পূর্বে, রচনার পরে, প্রতি পৃষ্ঠার আরম্ভে ও শেষে, প্রতি পৃষ্ঠার উপরে, নীচে, বামে ও দক্ষিণে এবং প্রতি দুই লাইনের মধ্যস্থলে। (৫) শাস্ত্র—ইহাতে লেখকের নাম থাকে না।

প্রসঙ্গ কথা

কলিকাতা এডুকেশন উইক কনফারেন্সে রবীন্দ্রনাথ “শিক্ষার স্বাক্ষরকরণ” নামক যে রচনাগুলি পাঠ করেন তাহা সর্বত্র প্রচারিত এবং প্রশংসিত হইয়াছে। আমাদের দেশে শিক্ষার ব্যবস্থা যে মাতৃভাষায় হওয়া উচিত ইহা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন, কারণ আদর্শ হিসাবে ইহার প্রতিবাদ করিবার উপায় কাহারও নাই। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, “বাংলা ভাষার পথ এখনো কাঁচা পথ। এই সমস্ত সমাধান হুঁহু বলে পাছে হোতে-করতে এমন একটা অতি অস্পষ্ট ভাবীকালে তাকে ঠেলে দেওয়া হয় যা অসম্ভাবিতের নামান্তর—এই আমাদের ভয়। আমাদের গতি মন্ডাকান্তা, কিন্তু আমাদের অবস্থাটা সবার করবার মতো নয়। তাই আমি বলি, পরিপূর্ণ স্রবোপেক্ষে জগ্রে হৃদয়কাল অপেক্ষা না করে অল্প বহরে কাজটা আরম্ভ করে দেওয়া ভালো, যেমন করে চারাগাছ রোপন করে সেই সহজ ভাবে। অর্থাৎ তার মধ্যে সমগ্র গাছেরই আদর্শ আছে, বাড়তে বাড়তে দিনে দিনে সেই আদর্শ সম্পূর্ণ হয়।”

রবীন্দ্রনাথের এই কথাগুলি অল্প যে-কোনো দেশ সম্বন্ধে সত্য হইতে পারিত, কিন্তু বাংলা দেশের পক্ষে সত্য নয়। বাংলা ভাষার পথ কাঁচা পথ তাহাতে কিছু ক্ষতি নাই। অর্থাৎ যদি শুদ্ধমাত্র ভাষাই আমাদের একমাত্র দৌর্লভ্য হইত তাহা হইলে সে দৌর্লভ্য কাটাইয়া উঠা অসম্ভব হইত না। কিন্তু ইহা ভাষাগত দৌর্লভ্য নহে। যদি এরূপ হইত যে পাঠ্য পুস্তকগুলি বাংলা ভাষায় লেখা হইবে—কিন্তু সেগুলি লিখিবেন

উজরপের লোকে, তাহা হইলে আমাদের কিছুমাত্র আপত্তির কারণ থাকিত না। বাঙালী বাংলা ভাষায় স্থলপাঠ্য পুস্তক লিখিবে ইহা ন্যবিত্তেও শিহরিয়া উঠি। কারণ বর্তমানে বহুগুলি বাঙালীর লেখা পাঠ্য পুস্তক আছে (তাহা বাংলায় হউক বা ইংরেজিতে হউক) তাহার স্বকিংশই অর্দ্ধশিক্ষিত ব্যবসাদার বাঙালীর লেখা। বিদ্যাসাগর বা রবীন্দ্রনাথ ছেলেদের পাঠ্য বই লিখিয়াছেন, ইহাতে বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তকের যে গৌরব লাভ হইয়াছিল সে গৌরব এখন আর তাহার নাই। আমরা প্রায় প্রতি মাসে আধুনিক বাঙালীর লেখা পাঠ্যপুস্তক কইয়া আলোচনা করিয়া আসিতেছি। আলোচনা করিয়া শুধু যে পুস্তকগুলির দ্বারতীর এবং লেখকদের জ্ঞানহীনতার পরিচয় দিতেছি তাহা নহে, আমরা আলোচনা করিতে গিয়া বৃক্ষিতে পারিতেছি, ইহাতে কাহারও কিছুই আসিয়া যায় না। মিথ্যা সংবাদপূর্ণ রচনা সম্বলিত পাঠ্য পুস্তক পূর্বেও যেমন চলিতেছিল, আমাদের লেখার পরেও তেমনি চলিতেছে। শিক্ষাক্ষেত্র হইতে যাহাদের অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া বাহির করিয়া দেওয়া উচিত তাহাদের লেখা বই টেকটবুক কমিটি কর্তৃক অস্বমোদিত হইতেছে এবং তাহা দ্বারা নিয়মিতরূপে শিশুপাল বধ হইতেছে। যে শিক্ষকেরা ইহা পড়াইতেছেন তাহাদের জ্ঞান হয়ত তাস-পাশা কিংবা ফুটবল-ক্রিকেটেই সীমাবদ্ধ, এবং হয়ত শিক্ষা বিষয় ছাড়া অন্য সকল বিষয়েই তাহারা গণ্যপণের নিকট পটুদের পরিচয় দিয়া থাকেন, স্বতরাং ভুল শিক্ষা দিবার সময় বা অপাঠ্য পুস্তক পড়াইবার সময় তাহারা কল্পনাও করিতে পারেন না যে ভুল শিক্ষা দিতেছেন বা অপাঠ্য পড়াইতেছেন।

শিক্ষার ক্ষেত্রে কি শিক্ষা দেওয়া হইবে তাহাই যদি ঠিক না থাকে, তাহা হইলে শিক্ষার নামে যাহা হইতে পারে তাহা ধাম্মা ছাড়া

অল্প কিছু নহে। বাংলা দেশে যে সব স্কুলে যত বেশি ইংরেজদের লেখা পাঠ্য বই পড়ানো হয় সে সব স্কুলকে তত বেশি প্রশংসা করা যাইতে পারে। কিন্তু শিক্ষা বাংলা ভাষায় চলিলে ইংরেজদের লেখা পাঠ্য অচল হইয়া পড়িবে এবং তখন ব্যবহার্য কাণ্ডজ্ঞানহীন মূর্খের লেখা বই পাঠ্যশ্রেণীভুক্ত হইবে। ইহার ফলে বাঙালীর শিক্ষার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। সুতরাং এদেশের স্কুলে শিক্ষক (স্কুলপাঠ্য পুস্তক প্রণেতাকেও শিক্ষক শ্রেণীভুক্ত করিতেছি) এবং শিক্ষার্থী—এই দুইটি বিভাগ করিলে চলিবে না। দরিদ্রা লইতে হইবে অধিকাংশ শিক্ষক মূর্থ। ছাত্রদের সঙ্গে ইহাদের ইহাই পার্থক্য যে তাহারা কিছুই জানে না, আর এই শিক্ষকেরা যাহা জানে তাহা প্রায় সবই ভুল জানে। সুতরাং এই দুই শ্রেণীকেই শিক্ষা দিতে হইবে। ইহারা একই সঙ্গে শিক্ষা পাইবে। শিক্ষক পড়াইতে পড়াইতে নিজে শিখিবে। ইহা আদৌ সম্ভব যদি পাঠ্য বইগুলি ইংরেজের লেখা হয়। বিশেষ করিয়া ইংরেজি সাহিত্য, ভূগোল এবং বিজ্ঞান বিষয়ের পাঠ্য। বাংলা সাহিত্য এবং বাংলা রচনাসমূহ (essays) বহুমাত্র, রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রচন্দ্রের প্রভৃতি খ্যাতনামা লেখকের গ্রন্থ হইতে সংকলিত হইবে মাত্র—কদাপি সংকলনকারী নিজে কিছু লিখিবেন না। ইহাদের গ্রন্থে যদি হাতী, কুকুর বা শরৎকাল বর্ষাকাল সম্বন্ধে কোনো রচনা না পাওয়া যায় তাহা হইলে তাহা রচনাগ্রন্থে স্থান না পাইলেও চলিবে। এরূপ কেন বলিতেছি, গত কয়েকমাসে আমাদের বিজ্ঞান ও সাহিত্য বিষয়ক পুস্তক বিশ্লেষণ দেখিলে তাহা বুঝিতে কষ্ট হইবে না। এবারে অল্প একখানি পুস্তক সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতেছি।

পুস্তকখানির নাম Bengali Composition with Essays and

Unseens, প্রণেতা প্রফেসর জিতেন্দ্রলাল বানার্জি এম. এ., বি. এল., এম. এল. সি, গোল্ড মেডালিস্ট; প্রকাশক কলেজ এসম্পারিয়াম, ৩০ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা। ৫২২ পৃঃ মূল্য ১৪০।

উন্নত এবং পরিবর্তিত ষষ্ঠ সংস্করণ। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে বইখানা অনেক স্কুলেই পাঠ্য বা ছাত্রদের ব্যবহারের অল্প অধমোদিত। পুস্তকের দশটে লেখা আছে Prescribed Text-Book for classes VII and VIII of H. E. Schools in Bengal. Vide Calcutta Gazette, Dated 13th Nov. 1930.

গ্রন্থকার জে. এল. বানার্জি মহাশয়ের নামের শেষে এম. এল. সি. উপাধিটি জুড়িয়া দেওয়া আছে। সুতরাং তাঁহার বইখানা পাঠ্য পুস্তক হিসাবে টেকসবুক কমিটি কেন মনোনীত করিলেন এরূপ একটি প্রশ্ন তিনি সহজেই কাউন্সিলে তুলিতে পারেন। আমরা শুধু পর্যট-গুলি বলিয়া দিতেছি।

টেকসবুক কমিটি যে না দেখিয়া, কিংবা দেখিয়াও না বুঝিয়া, পাঠ্য নির্ধারণ করেন এ বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। এবং এই জহুই বাঙালীর লেখা পাঠ্য পুস্তককে বিশ্বাস করা চলিবে না। শিক্ষা দানই যদি উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে কোনো অনাড়ির লেখা বই কোনো কারণেই কোনো স্কুলে স্থান পাইবার উপযুক্ত নহে। কারণ প্রকৃত অধিকারী ছাড়া এ বিষয়ে অল্প কেহ কোনো আদর্শ দেখাইবার উপযুক্ত নহেন। সাধারণ লোকে বই লিখিলে তিনি বইতে তথ্য সংগ্রহ করিবেন মাত্র এবং তাহাই অত্যন্ত সহজ ভাষায় প্রকাশ করিবেন—বিজ্ঞা জাহির করিবার উগ্র আবেগে ভাষার বিকৃতি সাধন বা ভুল তথ্য সংগ্রহ করিবেন না এবং ব্যবসায়ের নেশায় সর্বজ্ঞ সাজিয়া যে কোনো বিষয় লইয়া রচনা লিখিবেন না।

ব্যানার্জি মহাশয় ভূমিকায় লিখিয়া লইয়াছেন বটে, “রচনায় স্বাধীনতা না থাকিলে রচনা পশু হইয়া যায়”—কিন্তু তিনি স্বাধীনতার অর্থ বুঝিতে পারেন নাই। স্থূলপাঠ্য রচনার বই রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্র নহে, ইচ্ছা করিলেই এখানে পলিসি পরিবর্তন করা যায় না। কুহুর সম্বন্ধে বিবরণ লিখিতে গেলে তাহার চারিখানি পা-কে সন্দেহা স্বীকার করিতে হইবে—ছয়খানি কিংবা সাতখানি লিখিলে চলিবে না। অস্তুত স্থূলপাঠ্য রচনাশিক্ষার পুস্তকে চলিবে না। দেশের ছেলেদের মস্তক ভক্ষণ বিষয়ে কোনো রাজনৈতিক, নোট-মেকার, গোষ্ঠি মেডালিষ্ট বা প্রফেসরের কোনো স্বাধীনতা নাই, ইহা অস্তুত টেক্সটবুক কমিটির মনে রাখা উচিত ছিল। কারণ উক্ত কমিটিই আমাদের দেশের দায়িত্বজ্ঞানহীন লোকদের এই স্বাধীনতা দিয়াছেন।

যে বইখানি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি তাহাতে যে রচনাগুলি আছে তাহার ভাষার কথা বলিয়া লাভ নাই। আবোল তাবোল ভাষা সমালোচনার অতীত। কিন্তু যে সব বিষয়ে রচনা, সেই সব বিষয়ের অজ্ঞতা ছত্রে ছত্রে পরিফুট হইয়া উঠিয়াছে। এই রচনা পাঠ করিলে ছাত্রেরা অশিক্ষার স্তর হইতে একেবারে কুশিক্ষার স্তরে উত্তীর্ণ হইবে—ইতিপূর্বে কত ছাত্রের যে সর্বনাশ হইয়াছে তাহা গ্রন্থের সংস্করণের সংখ্যা দেখিয়াই বুঝিতে পারিতেছি।

একটি রচনা “সবাক চিত্র”। ইহার পাশে ইংরেজিতে লেখা আছে Cinematograph। সিনেমাটোগ্রাফ-এর বাংলা চলচ্চিত্র, এবং রচনাটিও চলচ্চিত্র সম্বন্ধে; কিন্তু এই রচনার নামটি হঠাৎ “সবাক-চিত্র” হইল কেন? এক স্থানে লেখা হইয়াছে, “চলচ্চিত্র

আলোকচিত্রের উন্নততর অবস্থা।” ইহা ঠিক নহে। আলোকচিত্রের সঙ্গে চলচ্চিত্রের পার্থক্য কোথায়? ছুইটিই আলোকচিত্র। মাছের দৌড় মাছের উন্নততর অবস্থা হইতে পারে না। মাছের বসিয়া থাকার সহিত মাছের দৌড় তুলনা চলিতে পারে, কিন্তু দৌড় মাছ হইতে বড় কি ছোট তাহা বলা যায় না। অল্প স্থানে বলা হইয়াছে, “পরিশেষে চক্ষের নিমেষ ফেলিতে যতটুকু সময় লাগে তাহার মধ্যে আলোকচিত্র তুলিবার যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়া গেল। এই যন্ত্রের সাহায্যে উদ্ভূত পানী ও ধাবমান অশ্বের ছবি তুলিবার আর কোন বাধা রহিল না।” চক্ষের নিমেষের অর্থ কি? “চক্ষের নিমেষ” সেকেন্ডে পাঁচ ছয় বারের বেশি ফেলা যায় না। কিন্তু উদ্ভূত পানীর ছবি বা ধাবমান অশ্বের ছবি তুলিতে এক সেকেন্ডের পঁচিশ ভাগের এক ভাগ সময় হইতে এক সেকেন্ডের হাজার ভাগের এক ভাগ সময় লাগে। অনেক সময় ইহা অপেক্ষাও কম সময় প্রয়োজন হয়। অল্প স্থানে বলা হইয়াছে, “চলচ্চিত্রের ছবিগুলির প্রত্যেকটির আকৃতি দৈর্ঘ্যে এক ইঞ্চি ও প্রস্থে ৩/৪ ইঞ্চি মাত্র।”—ইহাও ঠিক নহে। চলচ্চিত্রের ছবি নানারূপ মাপের হইয়া থাকে। অল্প “তার পর কালিফোর্নিয়ার সানফ্রান্সিস্কো-অধিবাসী মাইব্রিজ (Muybridge) নামক এক ব্যক্তি ১৮৭৭ বা ১৮৭৮ অব্দে ঘোড়া দৌড়ের পথের একধারে একটি ফটো তুলিবার ঘর নির্মাণ করিলেন।” ১৮৭৭ সালে ই. মেব্রিজ (E. Maybridge) অনেকগুলি ক্যামেরার সাহায্যে একটি ঘোড়ার দৌড়ান অবস্থার পর পর ছবি লইয়াছিলেন বটে। ইনিই লেখকের হাতে পড়িয়া মাইব্রিজ (Muybridge) হইয়াছেন!

পরবর্তী রচনা, টেলিফোন। টেলিফোন সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করা হইয়াছে এই যে ইহা অতি শীঘ্রই “সর্বত্র প্রসার লাভ করিবে এবং পল্লীবাণীসংগণও ইহার মহৎ উপকার হইতে বঞ্চিত হইবে না।” অর্থাৎ পল্লীর চাষীদের ঘরে ঘরে টেলিফোন বসিবে, এবং “অদূর ভবিষ্যতে” বসিবে। তাহার পর—

“আমরা সাধারণত প্রকৃতির যে নিয়ম অহুসারে শব্দ শ্রবণ করি, টেলিফোনেও সেই প্রাকৃতিক নিয়মেই শব্দ প্রেরণ ও গ্রহণের ব্যবস্থা হইয়াছে। যে কোন একটি শব্দ উদ্ভিত হইলে উহা বায়ু তরঙ্গে, ঈধর নামক একপ্রকার অতি সূক্ষ্ম ও অতি ক্ষুদ্রগতিশীল বায়বীয় পদার্থের সাহায্যে চালিত হইয়া আমাদের কর্ণপটাহে (sic) আসিয়া আঘাত করে। সঙ্গে সঙ্গে তথাকার সূক্ষ্ম উপশিরা [capillary veins?] গুলিতে একটা অস্থূতি জাগিয়া উঠে; ঐ অস্থূতিটি অবিলম্বে মস্তিষ্কে নীত হয়, তখন আমরা শব্দটি বুঝিতে পারি”।

ঈধর এবং শব্দ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে এক্ষণ কাণ্ডজ্ঞানহীন হইয়াও যে ছেলেদের পাঠ্য পুস্তক লেখা যায় তাহার দৃষ্টান্ত এই জাতীয় লেখকেরা বাংলা দেশে সর্বত্র দেখাইতেছেন। টেলিফোনের লেখক আরও বলিতেছেন, সহস্র দিক হইতে সহস্র শব্দ তরঙ্গ নিতাই আসিয়া একে অপরটিকে বাধা প্রদান করিতেছে। নানারূপ শব্দ ঠোকাঠুকি করিয়া দূরে ঘাইতে পারিতেছে না, সেই জগৎ শব্দকে তারের ভিতর দিয়া “অবাহত ভাবে নির্ঝিয়ে বহু দূরে চালিত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।” অর্থাৎ পৃথিবীতে যদি আর কোনো শব্দ না থাকিত তাহা হইলে একজন আর একজন হইতে যত দূরেই থাক—পরস্পর কথা কহিলেই শুনিতে পাইত! ইংলণ্ডের কথা ভারতবর্ষে শুনা যাইত—কিন্তু বহু শব্দ ঠোকাঠুকি হওয়াতে বড়ই অস্থবিধা হইয়াছে। অর্থাৎ ইহাতে “শব্দতরঙ্গের লীলা

অবাহত ভাবে চলিতে পারে না।” কাজেই দাতু নির্মিত তার ব্যবহার। কারণ “কোন দাতুর সাহায্যে শব্দকে বায়ুর মধ্য দিয়া নির্ঝিয়ে দূরস্থানে চালিত করা যায়।”

এই জাতীয় শিক্ষককে বেত্রদণ্ড দিবার ব্যবস্থাই বোধ হয় একমাত্র ব্যবস্থা। ইহার নারীহরণকারী চেয়ে বেশি অপরাধী। পরিচয় ক্রমশই হিতেছি।

লেখক বহু প্রলাপোক্তির পর বলিতেছেন, “যাহা হউক, আরও কত নূতন নূতন উদ্ভার আবিষ্কার এই টেলিফোনের উপর দিয়া চলিতে পারে তাহা ভবিষ্যতে আমরা দেখিতে পাইব।”

অতঃপর বাণ্যীয় পোতা নামক রচনায় প্রলাপ চরমে উঠিয়াছে। সমুদ্র মণ্ডিত করিয়া ফেরাই বোধ হয় জাহাজের উদ্দেশ্য। নমুনা—

“ইহার পরেই মাছ হাল, দাঁড় ও পাল আবিষ্কার করিল। এই তরণী লইয়া মাছ বহু শতাব্দী কাটাইয়া দিল—ইহারই সাহায্যে গ্রীকগণ সমুদ্র মণ্ডিত করিয়া ফিরিত। ...তারপর হইতে কত হাজার হাজার বাণ্যীয় জাহাজ মহাসমুদ্র মণ্ডিত করিয়া ফিরিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

লেখক নিজে যে ছেলেদের মস্তিষ্ক-সমুদ্র মণ্ডিত করিয়া ফিরিতেছেন, তাহা বিনয়বশত উল্লেখ করেন নাই।

ইহার পরেই লেখকের অমায়িকতা উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে। তিনি বলিতেছেন—

“ইংরাজের দেশ মহাসমুদ্রের মাঝখানে অবস্থিত বলিয়া জগতে ইংরাজের মত আর কাহারও জাহাজ নাই, কিন্তু

বিগত ইউরোপীয় মহাসমরে দেখা গিয়াছে আশ্মাণীর ডুবো জাহাজের কাণ্ড অতি ভীষণ।”

‘বাংলার শরৎ’ নামক রচনায়—

“তাহা ছাড়া, মা আনন্দময়ী শরতেই আগমন করেন—

জননী বাসন্তী ত রুদ্রকে তেমন করিয়া মাতাইতে পারেননা।

“এই সকল কারণেই, বোধ করি সৌন্দর্য রসজ্ঞ বাঙ্গালী তাহার জাতীয় মহোৎসব দুর্গাপূজার অছষ্ঠান শরৎকালেই করিয়া থাকে।” [শরৎকালে আনন্দময়ী আসেন বলিয়া বাঙালী দুর্গাপূজা করে! এই আনন্দময়ী ব্যক্তিটি কে?]

‘হিমালয়’ নামক রচনায়—

“হিমালয়ের প্রায় মধ্যস্থলে [প্রায় মধ্যস্থলে মানে কি?]

মানস সরোবর ও তাহার সন্নিহিত কৈলাসগিরি অবস্থিত।...

জগতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ গৌরীশঙ্কর ২৯১৪২ ফুট উচ্চ [জগতের

সর্বোচ্চ শৃঙ্গ গৌরীশঙ্কর নহে, মাউন্ট এভারেস্ট। গৌরী

শঙ্করের উচ্চতার পরিমাণ বিষয়ে পূর্বে মাসে উল্লিখিত হইয়াছে

—ইংরেজি ভূগোলেও পাওয়া যাইবে।]...ভগবান শঙ্করাচাধ্য

কেন্দরনাথে সমাধিলাভ করিয়াছিলেন, আবার এই হিমালয়েই

মহাতাণ্ডী দেশবন্ধু তাহার নশ্বর দেহ রাখিয়াছিলেন।

[হিমালয় লইয়া একদু ইয়াকি ইতিপূর্বে দেখি নাই।]

‘বঙ্কিমচন্দ্র’ নামক রচনায়—

স্বট অপেক্ষা বঙ্কিমের এই যে বিশিষ্টতা..... তাহার

অপেক্ষা নিখুঁত শিল্পের গল্প লেখক...

‘মোটর গাড়ী’ নামক রচনায়—

“শুধু স্থলে নহে, জলের উপর মোটর চালিত নৌকা

চলিতেছে এগুলিকে মোটর লাঞ্চ (Motor Lunch) বলা হয়।” ইত্যাদি ইত্যাদি।

শিক্ষার নামে একদু বর্ষরতা অল্প কোনো দেশে নাই। এই

বইএর টাইটল-পেজের শীর্ষে লেখা আছে—Prescribed Text-Book!

—কে বা কাহারো প্রেসক্রাইব করিয়াছে? তাহাদের নামে আদালতে

নালিশ চলি কিনা জানি না, যদি সে স্থবিধা না থাকে তবে শিক্ষার

নামে একদু জুয়াচুরির প্রতিকারমূলক কোনো আইন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

দেখা যাইতেছে, অজ্ঞ তাই স্থূলপাঠ্য পুস্তক লেখার একমাত্র

যোগ্যতা!—কারণ, অজ্ঞ লোকের মজুরি কম, এবং তাহাতে প্রকাশকের

লাভ বেশি। মিঃ জে. এল. বানানজির সঙ্গে তাহার প্রকাশকের বিরূপ

বন্দোবস্ত তাহা অবশ্য জানি না, তবে প্রকাশক যে অধিক লাভ করিতেছেন

এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাহা যদি না হয়, তবে অজ্ঞ লোককে বেশি

মজুরি দিয়া ঠিকিতেছেন। দৈনিক আট আনা মজুরি দিলে দৈনিক

বারো ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া একদু বই লিখিবার মত লোক এদেশে

লক্ষ লক্ষ পাওয়া যায়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নিম্নলিখিত তারিখের মধ্যে টেক্সট বুক রচনার

জন্ত বিজ্ঞাপন দিয়াছেন। সময়ের অল্পতার জন্ত সর্বত্র ইহার প্রতিবাদ

হইতেছে। প্রতিবাদকারীর মুক্তি এই যে এত অল্প সময়ে অর্থাৎ পাঁচ মাসে

স্থূল পাঠ্য বই লেখা যায় না। ইহা আমরা বিশ্বাস করি না। বাহার যে

বিষয়ে জ্ঞান আছে এবং লিখিবার ক্ষমতা আছে—তাহার পক্ষে

একপাঠ্য স্থূলপাঠ্য বই লিখিতে এক মাসের অধিককাল লাগা উচিত

নহে। ইহার সঙ্গে আরও এক মাস যোগ করিয়া দিলে ত কোনো

কথাই উঠিতে পারে না। সময় কিন্তু আছে পাঁচ মাস। ইহার মধ্যে

উক্ত বই ছাপিবার সময়ও ধরা হইয়াছে। ছাপিতে দুই মাসের বেশি লাগে না। কিন্তু বাহারা অনাধিকার চর্চা করিতে যাইবেন—(বাংলা দেশে সাধারণত বাহা হইয়া থাকে।)—তিনি অবশ্যই পাঁচ মাসে বই শেষ করিতে পারিবেন না। সময় যিনি পাঁচ মাস কেন পাঁচ বৎসর পাইয়াছেন তাহার বইখানি লইয়াই এতক্ষণ আলোচনা করিলাম। পাঁচ বৎসর সময় পাইয়া তিনি কিছু হুবিধা করিতে পারিয়াছেন কি? শ্রীযুক্ত রমেশ রায় এল-এম-এস লিখিত ম্যাট্রিকুলেশন হাইস্কুলেরও পঞ্চম সংস্করণের সমালোচনা করিয়াছিলাম। এত দীর্ঘ দিনেও তাহার নাইটোজেন যৌগিক পদার্থ রহিয়া গিয়াছে—মূলপদার্থ হইতে পারে নাই। হুতরাং সময়ের অল্পতা উপযুক্ত লোকের পক্ষে কোনো বাধাই নহে। হুত্বের বিষয় এদেশে উপযুক্ত ব্যক্তি তুলপাঠ্য পুস্তক লেখেন না। উপযুক্ত ব্যক্তির লেখা তুলপাঠ্য পুস্তক বাহা আছে তাহার সংখ্যা অতি সামান্য।

পরিব্রাজকের ডায়েরী

চইতা

রাঁচি হইতে হাজারিবাগ যাইবার পথে, সদর রাস্তা হইতে প্রায় সাত আট মাইল দূরে, বেড়মো নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। গ্রামের পাশে শালবনে আচ্ছন্ন পাহাড়, এবং তাহার কোলে পাথুরে চূণের একটি ক্ষুদ্র খনি। তাহারও নিকটে একটি ক্ষুদ্রকায় পার্শ্বতা নদী বহিয়া গিয়াছে। বর্ষার সময়ে উহা ঘোলা জলে ভরিয়া যায় এবং সময়ে সময়ে তীব্র স্রোতে পাশের দু'একটি পুরাতন শালবৃক্ষ ভাঙিয়া পড়ে; কিন্তু অল্প সময়ে নদীর শান্ত স্রোত ফলরব করিতে করিতে নানা বর্ণের উপলব্ধকে আলোড়িত করিয়া বহিতে থাকে।

বেড়মো গ্রামে বেশী লোকের বাস নয়। তাহাদের মধ্যে চইতা নামে একজন লোক বাস করিত। সে পাথরের খাদে কুলির কাজ করিত এবং সামান্য রোজগারে সন্তুষ্ট থাকিয়া হুখে সংসার যাত্রা নির্বাহ করিত। সংসারে তাহার স্ত্রী এবং একটি ছোট্ট ভাই ছাড়া আর কেহ ছিল না।

বেড়মো গ্রামের চূণখাদের মালিক আমার জনৈক বন্ধু ছিলেন। তিনি রাঁচিতেই বাস করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে কাজের তদারক করিবার জন্ত সাইকেলে চড়িয়া বেড়মো যাতায়াত করিতেন। একবার আমি কার্যোপলক্ষে রাঁচি গিয়াছিলাম। এমন সময়ে একদিন হঠাৎ আমার বন্ধুর নিকট সংবাদ আসিল যে খনিতে

প্র। Paradise কয়টি?

উ। তিনটি।

প্র। কি কি?

উ। (১) বাহারা মনে করেন দুই চারি বৎসরের মধ্যেই পরাজ হইয়া যাইবে, তাহাদের বাসস্থানের Fools' Paradise.

(২) নিষ্ঠাবান্ হিন্দুগণ যেরূপে চা-আদি পান করেন, তাহার নাম Fowls' Paradise.

(৩) অধ্যাপকাদি বিদ্বজ্জন যে গৃহে বিশ্রামলাভ করেন, তাহার নাম Owls' Paradise.

একটি ছুটনা ঘটনা। খনিতে কাজ সারিয়া যখন সকলে বাড়ী ফিরিতেছিল তখন নাকি হঠাৎ পা পিছলাইয়া চইতা পাহাড় হইতে খাদের নীচে পড়িয়া গিয়াছে। তাহার সঙ্গে সঙ্গে একটি বৃহৎ পাথরের খণ্ড ধসিয়া পড়ে, এবং তাহারই আঘাতে চইতার নাকি হাত এবং পা ভাঙিয়া গিয়াছে।

সংবাদ পাইবামাত্র আমার বন্ধু অতিশয় ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু রাজিতে তখন আর কোনও রকমে যাওয়া সম্ভব নয় বলিয়া পরদিন অতি প্রত্যুষে বেড়মোর দিকে রওনা হইলেন। সঙ্গে আমিও চলিলাম।

আমরা যখন বেড়মোয় পৌঁছিলাম তখন বেলা প্রায় নখট হইয়াছে। চইতার ঘরের বাহিরে তাহার স্ত্রী বসিয়া চোখ মুছিতেছিল; আমাদের দেখিয়া সে ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। ঘরের মধ্যে গ্রামের দুই চারিটি ব্যক্তি দাঁড়াইয়া ছিল। বিছানার পাশে বাইয়া আমরা দেখিলাম যে চইতা স্থির হইয়া শুইয়া আছে, কিন্তু তাহার দক্ষিণ উরু বিঘম ফুলিয়া অস্বাভাবিক আকার ধারণ করিয়াছে। হাত বা অঙ্গ কোন অঙ্গ ভাঙে নাই বটে, কিন্তু দক্ষিণ উরুর হাড় ভাঙিয়া একেবারে দুইখান হইয়া গিয়াছে। কোলার জন্ত পায়ের উপরের চামড়া টান হইয়া একেবারে তেলের মত চক্চক্ করিতেছে এবং তাহার উপরে দীর্ঘ দীর্ঘ হাত বুলাইয়া টের পাওয়া গেল যে চইতার সেখানে বিশেষ কিছু সাড় নাহি।

চইতার রোগশয্যা দেখিয়া বড় কষ্ট হইল। তাহার সংসার ক্ষুদ্র হইলেও একটি অসহায় ভ্রাতা এবং স্ত্রী সম্পূর্ণরূপে তাহারই রোজগারের উপরে নির্ভর করিত। শুধু তাহাই নহে। বেচারী

যহুদেহে প্রাতঃকালে কাজ করিতে গিয়াছে, কোথা হইতে দৈব ছুটনা আসিয়া ঘেন তাহার জীবন-পথে হঠাৎ একটা বাধা যন্ত্রণ করিয়া দিল।

আমার বন্ধুবর চইতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “চইতা, তোমার কি কোনও কষ্ট হইতেছে?” চইতা ঈষৎ হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, “না বাবু, পা ত’ আমার অনেক দিন খেটেছে, এবারে ছুটি চায়।” আমরা তাহাকে বুঝাইয়া বলিলাম যে তাহার কোনও ভয় নাই, হাসপাতালে গেলেই পা সারিয়া যাইবে এবং সে বেশ কাজকর্ম করিতে পারিবে। কিন্তু চইতা হাসপাতালে যাইতে কিছুতে স্বীকার করিল না। সে গুহার নিকটে জড়িবুটার চিকিৎসা করাইবে বলিয়া একটি টাকা চাহিল এবং বলিল, এখন হইতে না হয় সে “বইটুইয়া” হইয়া যাইবে, অর্থাৎ বসিয়া বসিয়া সকল কাজকর্ম করিবে। এমন দীরভাবে সে কথাটি বলিল যে আমরা উভয়ে অবাক হইয়া রহিলাম। একপু ছুরন্ত বাথার মধ্যে যে কেহ দীরভাবে সারাজীবন পছু হইয়া থাকিবার কল্পনাও করিতে পারে তাহা কখনও ভাবিতে পারি নাই।

আমার বন্ধু চইতাকে অনেক করিয়া বুঝাইলেন যে হাসপাতালে তাহার পা কাটিয়া দিবে না, সে সত্য সত্যই আরাম হইয়া যাইবে; কিন্তু কিছুতেই চইতাকে টলান গেল না। ডাক্তারির উপরে তাহার বিন্দুমাত্র আস্থা ছিল না, এবং সে গ্রাম ছাড়িয়া যাইতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিল। জড়িবুটার চিকিৎসা চলিতে লাগিল। চৈতাও ক্রমে ক্রমে সারিতে লাগিল। মাস কয়েক পরে পায়ের আলা যন্ত্রণা নিবারণ হইল বটে, কিন্তু চইতা পছু হইয়া পড়িল। সে বসিয়া বসিয়া ঘরের ভিতরে বা কুটারের প্রাঙ্গণে চলাফেরা করিত। কিন্তু সেজ্ঞ তাহার কোনও

কোভ ছিল না। পা ভাঙিয়া গিয়াছে বলিয়া সে কাহারও উপর রাগ করে নাই, যেমন অবস্থার মধ্যে আছে তাহাকে মানিয়া চলিতে চেষ্টা করিত।

কয়েক মাস পরে আমরা আবার একবার বেড়মোয় গিয়াছিলাম। তখন চইতাকে ঘরে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। তাহার স্ত্রীর নিকট অনিলাম যে সে আজকাল অল্প অল্প চলিতে ফিরিতে পারে এবং ছাগল চরাইবার জন্য আজ সে পার্শ্ববর্তী বনের মধ্যে গমন করিয়াছে। তাহার স্ত্রী এখন পাথরের খাদে কাজ করে, ছোট ভাইও খুড়ি বয়; এবং উভয়ের চেষ্টায় সংসারবাড়া এক রকম করিয়া নির্বাহ হইয়া যাইতেছে।

ইহার পরে রাঁচি হইতে চলিয়া আসিলাম। কলিকাতার কর্ণ স্রোতের মধ্যে চইতার মূর্তি অনেকটা ক্ষীণ হইয়া গেল। কিন্তু তাহার কথা সম্পূর্ণরূপে কোনো দিন ভুলিতে পারি নাই। নিজের জীবনে কোনও দুঃখ ক্লেশের মধ্যে পড়িলে চইতার রোগ শয্যার কথা মনে পড়িয়া যাইত। তাহার শান্ত মুখের হাসির কথা ও সহজ ভাবে সারা জীবন “বইঠ্যা” হইয়া কাটাইয়া দিবার সঙ্কল্প আবার মনে হইত। নিজের জীবনের সামান্য মানসিক দুঃখ কষ্টের ভারকে তখন নিতান্ত তুচ্ছ ও হালকা বস্তু বলিয়া বোধ হইত।

কিছু কাল পরে পূজার সময়ে আমি আবার রাঁচি গিয়াছিলাম। তখন এক দিন দল বাধিয়া বেড়মোতে বন ভোজনের জন্য যাই। চূপের খাদে আসিয়া চইতাকে দেখিবার ইচ্ছা হইল। পুরাতন পথ চিনিয়া লইতে বিলম্ব হইল না। চইতার বাড়ীতে পৌছিয়া তাহার ভাইটির সঙ্গে দেখা হইল। সে তখন একটু বড় হইয়াছে এবং তাহার গঠন একটু ঢালা হইয়াছে। মুখে গৌরবের রেখা দেখা দিয়াছে। সে আমাদের

আনাইল যে তাহার দাদা সকাল হইতে নদীতে মাছ ধরিতে গিয়াছে, এখনও বাড়ী ফেরে নাই।

ছোটনাগপুরে পাহাড়ী নদীর মধ্যে একরকম মাছ থাকে, তাহার আকারে ছোট এবং পাথরের ফাঁকে ফাঁকে সম্পূর্ণ আশ্রয়গোপন করিয়া থাকে। ইহাদের গলার নীচে একটি চাকার মত অঙ্গ থাকে, সেইটিকে দৃঢ়ভাবে পাথরের গায়ে চাপিয়া ধরিয়া ইহার পার্শ্বতা স্রোতের তড়ন সহ্য করিতে পারে। এই সকল মাছ সহজ উপায়ে ধরা কঠিন। কিন্তু পাহাড়ীরা ইহাদের ধরিবার জন্য একটি বিচিত্র উপায় বাহির করিয়াছে। জললে মগুন নামক এক প্রকার বৃক্ষ গাছ জন্মায়। মগুন ফল মাছের পক্ষে বিষ নয় বটে, কিন্তু মাছের উপর তাহার বিচিত্র ক্রিয়া হয়। মাছ ধরিবার পূর্বে পাহাড়ীরা নদীতে একটি ক্ষুদ্র বাধ বাধিয়া দেয়। জল জমিয়া কতকটা স্থির হইলে মগুন ফল পাথরে ছেঁচিয়া বালির সঙ্গে বেশ করিয়া রগড়াইয়া সেই জলে মিশ্রিত করিয়া দেয়। অল্পক্ষণের মধ্যেই মাছগুলির চোখ নষ্ট হইয়া যায় এবং তাহার জলের উপর ভাসিয়া উঠে। তখন তাহাদের গামছায় ছাকিয়া তুলিয়া লইলেই হয়।

আমরা বসিয়া থাকিতে থাকিতে চইতা এক বাক মাছ লইয়া হাজির হইল। সারা বেলার পরিশ্রমে ইহা তাহার লাভ হইয়াছে। চইতার চলনে তখনও যথেষ্ট দোষ রহিয়াছে। কিন্তু সে কথা যে তাহার মনে হইতেছে ইহা একবারও মনে হইল না। তাহার শরীর পূর্ণাপেক্ষা শীর্ণ ও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল বটে কিন্তু আমার কেবলই মনে হইতে লাগিল যে, শেষ পর্যন্ত চইতাই হয়ত জয়ী হইয়াছে। তাহার শরীরের অত্যন্ত বড় দুর্বলতা মনের উপরে বিন্দুমাত্র চিহ্ন রাখিয়া যাইতে পারে নাই। পূর্বের মত সে রোজগার করিতে পারে না, তাহাতে কি হইয়াছে? পা ভাঙিয়া সে পঙ্গু হইয়া গিয়াছে, তাহাতেই বা কি?

আসিবার সময়ে চইতা এক খুড়ি মাছ আমাদের সঙ্গে চাপাইয়া দিল। আমরা কিছুতেই লইব না, সেও ছাড়িবে না। অবশেষে তাহার মেহের উপহার আমরা প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলাম না। মাছ লইয়া আমরা বনভোজনের জায়গায় ফিরিয়া আসিলাম।

সেই আমার চইতার সঙ্গে শেষ দেখা। সেও আট বৎসরের উপরের কথা। কিন্তু তাহার সরল সাহস ও শেষ দিনের মধুর ব্যবহারের কথা আজও জুলিতে পারি নাই।

ভোট ভণ্ডল

প্রথম পর্ব

গঙ্গারামের বহিষ্কার

গঙ্গারাম। দেখলে গিন্নী, হতছাড়া জামাইয়ের কাণ্ড। দেখবো তুই কত বড় আমার জামাই, আর কেমন কর্পোরেশনে চুকিস। কাউন্সিলার হবেন...দেশের কাজ করবেন...বেটাছেলে!

মাতঙ্গিনী। তা আর একটু বোকাগে না কেন?

গঙ্গা। ওরে বাবা, আর কত বোকাগে? দরজা বন্ধ করে হাঁটু ধরে ব'লেছি যে বাবা দাওকেন্দর, তুমি আমার জামাই, ছেলে মাছ! আমার বয়স হ'য়েছে, দেশের কাজ করবার আর টাইম পাব না, তুমি নামটা উইথড্র কর, আমি একবার ছিদাম মুদী বেটাকে দেখি! তার উত্তরে বলে কি জান?

যাত। কি?

গঙ্গা। ব'লে আপনার কাশী যাবার সময় হ'য়েছে, বুড়ো বয়সে আর দেশের কাজটা নাই করলেন! শোন একবার গুণধর জামাইয়ের কথা। উঃ! এর চেয়ে মেয়েটা বিধবা হ'ল না কেন তাই ভাবছি! পাঞ্জী বদ্মায়েস!

যাত। তা' এদিককার কতদূর এগোলো?

গঙ্গা। তা' অনেক দূর! শতকরা পঁচাত্তরটা ভোট আমিই পাব জানি কিন্তু তা হ'লেও নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। অনেক বেটা সয়তান আছে, মুখে হয়ত আমাকে ভোট দেবে ব'লেছে কিন্তু কাজের সময় ঠিক উটোটি ক'রে আসবে। সে যাক্, তুমি কতদূর মেয়েদের ঠিক করলে বল!

যাত। তা' পাড়ার তো সবাই বলেছে তোমাকেই ভোট দেবে। ওপাড়ার ন'গিন্দী, হালদারদের বড় বো, পুঁটি মাসীর মেজ মেয়ে, খাদা পিসীর ননদের মেজ জা সবাই আমাদের দলে; তবে ছোটলোক মাগীগুলোর বড় তেজ, বলে আমরা ছিদামবাবুকে ভোট দোব!

গঙ্গা। ও বুকেছি, মুদীর দোকানে ধারে থায় আর কি। কুছ পরোয়া নেই, তুমি ব'লে দাও যে তোদের যা ধার হ'য়েছে আমি মিটিয়ে দোব, তোরা গঙ্গারামবাবুকে ভোট দে!

যাত। হ্যাঁ, আমি আবার ছোট লোকদের খোশামোদ ক'রতে যাই।

গঙ্গা। তুমি একেবারে ভারী ভদ্রলোক! ওরে বাপু, ওরা এখন আমাদের সাতগুটির চেয়ে আপন। টাকা চায়, খাবার চায়, যা চায় এখন ওদের দিয়ে ঠাণ্ডা কর। দেশের কাজ

এমনি হয় না। এখন একটু ভেতরে যাও ক্যানভাসাবরা আসছে!

নরহরি ও ক্যানভাসার দলের প্রবেশ

ক্যানভাসারগণ। জয় গঙ্গারামবাবুজী জয়!

গঙ্গা। এই-যে নরহরি...এরিকার কি প্বর?

নরহরি। সমস্ত একেবারে ready-made সার। From door to door কাছা গলায় দিয়ে আমি খুরবো, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন! মশাই, কিন্তু একটা বড় dangerous sign of the situation হ'য়ে যাচ্ছে!

গঙ্গা। বাংলায় বল বাবা, বুঝতে পারছি না!

নরহরি। মানে, ওটা সাহেবদের স্কুলে প'ড়ে প'ড়ে অভোস হয়ে গেছে।

Always talkative English—I mean ইংরিজিতে কথা বলার একটা—I mean—ইয়ে—

গঙ্গা। বুঝেছি। গোলমালটা হ'ল কোথায়?

নরহরি। গোলমাল আপনার brother-in-law, I mean sorry আপনার জামাই দারুকের ক'রতে আরম্ভ ক'রছে। তাব্বা গান বৈষেছে therefore আমাদেরও একটা গানের দল বার ক'রতে হয়। Back ground হ'য়ে পড়লে চলে না!

গঙ্গা। তুমি এখনই গান বার কর!

নরহরি। Ready-made Sir—এই নিন গান—এই নিন নতুন হারমোনিয়াম, আর এই নিন দোকানের বিল। Sir, নরহরি চক্রবর্তী তিন মাস পাড়ায় unemployed problem-এর দফা end করে দিয়েছে। তার কাছ থেকে green

work কখনও পাবেন না,...রিহাসেল পর্যন্ত accomplished, লাগাও হে—one, two—

ক্যানভাসারদের গান

জয়তু গঙ্গারাম

জয়—জয়—জয়—হে।

এবার ভোটের মুখে দেখিব

তোমারে ঠেকায় কে?

জয়—জয়—জয়—হে!

মোটর করিয়া ভোটের আনিব

চড়াব জুড়ি ও গাড়ী,

একটি ভোটের বিনিময়ে দোব

সন্দেশ হাড়ি হাড়ি

তোমারে নাচাবে কে?

তোমারে না চাবে কে?

তব গানে আজ শহর মুগ্ধ

জয়—জয়—জয়—হে!

দ্বিতীয় পর্ব

দারুকের বহির্দৃষ্টি

দারুক। মনোহরা, জেনে রেখো গঙ্গারাম গাঙ্গুলী আজ থেকে আর তোমার বাবা নয়। মেয়ে-জামায়ের মুখ চায় না সে আবার বাবা! বুড়ো বয়সে ঘোড়ারোগ ধরলে ঐ রকমই হয়!

মনো। আমি জানি চিরকাল বাবার ঐ রকম গোঁ! কোথায় জামাই একটা বড় কাজে নেমেছে, নিজের স্বার্থের জেদে নয়, অপরের হিতের জেদে, তা ক'রতে দিতেও ঠুর বুক ফেটে যাচ্ছে। গভর্ণমেন্ট এত রকম করেছে একটা ব্যয়স বেধে দেয় না কেন বলতো?

দারুণক। যা বলেছ! তাহ'লেই বুড়োগুলো ঠাণ্ডা হ'য়ে যায়। এবার কর্পোরেশনে আগে ঢুকি, তারপর অ্যাসেমব্লিতে ঢুকবো, সেখানে গিয়েই আগে ব্যয়স বাধার আইন করবো। দেশের লোক তবু একদিক দিয়ে নিশ্চিন্ত হবে। আচ্ছা একবার কাউন্সিলার হই তারপর বুড়োর বাড়ীর সামনে কবার কাঁট পড়ে দেখি। বেশী চালাকী করেন গ্যাস জ্বালা পর্য্যন্ত বন্ধ ক'রে দোব!

মনো। তাই করাই ঠিক! তবে বৃদ্ধবে জামায়ের ক্ষমতা আছে কি না। বুড়ো বয়সে আবার মাণ্ড কানভাস ক'রতে নেবেছে। ছিঃ, ছিঃ! যাই হোক আমি বেরিয়ে পড়ি...আজ আবার তোমার ছোট পিসীমার ভাজকে নিয়ে যেতে হবে। তোমাকে তো সবাই ভোট দেবে বলেছে তবে আমাদের নাপতিনীর দিদিমাকে কে বুঝিয়ে গেছে যে ছিদাম মুরী স্বদেশী, ওকেই ভোট দিও, তাই বুড়ী একটু বেকেছে।

দারুণক। শিগগির বুড়ীকে দিদিমা ব'লে জাপটে ধ'রে সোজা ক'রে ফেল। টাকা চায়, তাই দিও।

মনো। না সে বুড়ী বলে, ছিদাম তার ভাইপোর একটা চাকরি ক'রে দেবে বলেছে।

দারুণক। তুমি গিয়ে বল বাপু, কর্পোরেশনে গিয়ে শুধু তার ভাইপো

কেন, নাকি, নাকুনি যে যেখানে আছে সবাইকে বসিয়ে দেবে। বেরিয়ে পড়, বেরিয়ে পড়, আর দেরি করোনা।

মনো। আচ্ছা যাই তাহ'লে।

প্রধান

দারুণক। যাক, এদিককার তো এক রকম সবই ঠিক, আর ২০০টা ভোট জোগাড় হলেই বাস! কে?

জনৈক ছুঃহ ব্যক্তির প্রবেশ

ছুঃহ। বাবা ব্রাহ্মণের ছেলে বড় কঠে পড়েছি, আপনি গরীবের মা বাপ যদি কিছু ভিক্ষা দেন—তাই...

দারুণক। ভোট আছে?

ছুঃহ। আজ্ঞে ও ঘোটে নেই বাবা।

দারুণক। বুঝেছি, ভাগো! আমার এখন তোমার সঙ্গে বকবার সময় নেই।

ছুঃহ। বাবা, আপনারা ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের গতি...

দারুণক। গেট আউট! দরওয়ান!

ছুঃহ। না বাবা আমি এমনি চ'লে যাচ্ছি!

প্রধান

নেপথ্য—দারুণবাবু, আসতে পারি?

দারুণক। আরে সম্পাদক মশাই যে, আহুন আহুন! কি রকম কাগজ কাটছে?

সম্পাদক। খুব জোর কাটছে মশাই। আপনার শত্রুরকে যত গালাগালি দিচ্ছি কাগজের বিক্রি তত বাড়ছে। কিন্তু প্রেসের বিলটা বড্ড বেড়ে যাচ্ছে।

দারুণ। কোন ভাবনা নেই। আপনাকে আমি আজই চেক লিখে দিচ্ছি। আপনি আমার শস্তর বলে লজ্জা পাবেন না। ক'সে গাল দিন—তখনই সেও পান্টা গালাগাল দিয়ে হাজার দশেক প্যাম্ফ্লেট আর একখানা বাংলা দৈনিক বার করেছে। আপনি হাজার তিরিশ প্যাম্ফ্লেট বাজারে ছেড়ে দিন।

সম্পাদক। সে তো ছাড়বোই। আজ 'ভোট ভল্‌ক্যানো'তে কি লিখেছি দেখুন। "ভাব্য গঙ্গারামের কীর্তি"। ওহে গঙ্গারাম তোমার পিতা মাতা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়াই গঙ্গারাম নাম রাখিয়াছিলেন। তুমি কি-ওণে দারুণেশ্বরবাবুর প্রতি-দ্বন্দ্বিতায় নামিয়াছ? ভোটারগণ, ভাবিয়া দেখুন, একজন অমিতশক্তিশালী যুবক, আর একজন জরাজর্জর বৃদ্ধ, একজন দেশহিতায় চ মাযের নৈবেদ্য সাজাইয়া বসিয়া আছে, আর একজন লোলুপ দৃষ্টিতে নৈবেদ্যের কলা খাইবার জন্ত ব্যগ্র। পাঠক, ইহাদের চিনিয়া রাখুন।

চুতনাথ ও তাহার সঙ্গে অজ্ঞাত ক্যানভাসারের রক্ত গবেষণ

ভূত। মশাই, আজ ওদের ক্যানভাসারদের সঙ্গে মারপিট হ'তে হ'তে বেঁচে গেছে! দেখেছেন, কাগজে আপনার নামে কি লিখিয়েছে—এই দেখুন! "চ্যাংডার তুরাশা"—অজ্ঞাতশত্রু বালক যদি কোমরে খুশী বাঁধিয়া, চুমিকাঠি গালে দিয়া ঘুরিয়া বেড়ায় তাহা হইলে সকলের বাৎস্যল্যের উদয় হইতে পারে, কিন্তু সে যদি অকালে পরিপক্বতা লাভ করিয়া পিতার ক্ষুর লইয়া দাড়ি কামাইতে বসে তাহা হইলে তাহার গালে একটি চড় বসাইয়া বোড়িতে পাঠাইতে হয়। শ্রীমান

দারুণের আজ সেই অবস্থা, ইহাকে বোড়িতে পাঠায় এমন কি কেহ নাই? যে মদগঙ্গী যুবক স্ত্রীর পিতার খাতির রাখে না সে আপনার আমার খাতির রাখিবে কি? অথচ এই দুইদিনে আমরা চাই এমন একজন নিঃস্বার্থ ব্যক্তিকে যিনি খলিতকচ্ছ হইয়া আমাদের জন্ত ছুটিয়া আসিবেন। এমন লোক যদি কেহ থাকে তাহা হইলে গঙ্গারামবাবুই আছেন।

দারুণ। খুন করোনা।

ক্যানভাসারগণ। গুমুন করু দেগা।

সম্পাদক। মশাই, কাগজের গালাগালি কাকে বলে এইবার দেখাবো।

হতীয়া পর্ব

ফতো মিস্তিরের রক

মাখন। মিস্তির মশাই, তাহ'লে দেখবেন মজাবেন না। আমি ঠিক ১১টার সময় আপনার জন্তে গাড়ী নিয়ে আসবো। দারুণ-বাবুকে ভোট দিতেই হবে।

ফতো মিস্তির। আরে সে তো দোবই। কিন্তু মাখন, তার আগে তোমাদের গাড়ীখানা একবার চাই। গিটী বলছিলেন, একবার কালীঘাটে মাকে দর্শন করবেন আর চিড়িয়াখানা দেখে আসবেন। ওদের জন্তে মোটরটা একবার চাই, তার পরেই আমার যাত্রা—এই ঠিক রইল।

মাখন। এ তো সামান্য কথা। তা চিড়িয়াখানাটা সেদিন বাদ দিলে হয় না?

ফতো। তা অবশ্য যেতে পারে। কারণ সেটা ভোটের জায়গায়
গেলেই দেখতে পাওয়া যাবে, কিন্তু কালীঘাট—

মাখন। সে ঠিক রইলো। আমি তা হ'লে চলি। নমস্কার।

এসান

ছিদামের প্রবেশ

ছিদাম। নমস্কার মিত্রির মশাই। আমার কথাটা মনে আছে তো?

ফতো। নিশ্চয়। সে আর বলতে ছিদামবাবু।

ছিদাম। দেখুন একটা কথা শুনছিলাম যে আপনি নাকি গঙ্গারামবাবুর
ক্যানভাসার নরহরিকে একটা মিষ্টির ফর্দ দিয়ে বলেছেন
যে এই সব জিনিষ পত্র থাকলে তবে ভোটারের সংখ্যা
বাড়বে—এবং আপনার জেত্তেও নাকি আলাদা খাবার
পাঠানো হচ্ছে—

ফতো। আরে মশাই ঘাবড়াচ্ছেন কেন? ওদের বেয়ে আর একজনের
মোটরে চেপে যদি আপনাকে ভোট দিয়ে আসি, তাহ'লে
লাভ কার, আপনার না ওদের?—তা ছাড়া বুঝছেন না,
ওদের মিষ্টি নয় এক দিন দু দিন পাওয়া যাবে, কিন্তু
আপনার দোকান থেকে চিরকাল ধারে মাল নিতে হবে
তো? আপনার ভোট মারে কে?

ছিদাম। তা বুঝছি। তবু...

ফতো। মশাই, কি করি বলুন? ওদিকে দারুকের মাখন, এদিকে
গঙ্গারামের নরহরি—জু'দিকেই কথা দিতে হ'ল। নরহরি
তো মশাই কাছা গলায় দিয়ে হাজির! বলে মায়েয় গঙ্গালাভ
হয়েছে। আমি বললাম, সে কি হে? বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ,
দেশমাতার দায়—এ দায় থেকে উদ্ধার করতেই হবে।

আমাকে যে ভাবে কৈদে ধরলে, মুখ ফুটে আর 'না' বলতে
পারলাম না।

ছিদাম। যাক্কে তাহ'লে আজ চলি। সেদিন পোলিং স্টেশনে দেখা
হবে। নমস্কার।

ফতো। নমস্কার।

হাক খুড়ার প্রবেশ

এসান

হাক খুড়ো। কি হে ফতো, খবর কি? ভোটের রগড় চলছে কেমন?

ফতো। রগড় ব'লে রগড়। বাবা, কি জিনিষই আমাদের দিয়েছে।

ভাই, বন্ধু, শত্রু, জামাই কেউ কারুর আপনার নয় হে।

হাক খুড়ো। সে আর বলতে! পাড়ায় পাড়ায় দল—ঘরে ঘরে
বিচ্ছেদ। বাপ এক দলে, ছেলে এক দলে এও দেখলুম
মিত্রির।

ফতো। যাই হ'ক, গঙ্গারামদের খবর কি খুড়ো?

হাক খুড়ো। খবর আর কি, নরহরি আর মাখনদেরই রাজত্ব ভাই।

এই ছুখুলার বাজারে ওরাই যা ভালুক নাচিয়ে মেয়ে
দিলে। আরে, ওটা আবার কার দল বেরিয়েছে রে!
এ যে মেয়েদের গানের দল!

ফতো। হ্যাঁ হ্যাঁ, মাস্তা পিসির ডিরেকশনে দারুকের দল বেরিয়েছে।

গানের দল।

মেয়েদের গান

ওগো বাংলা দেশের মেয়ে,

দেশের জন্তু কার বল ত জল ঝরে চোখ বেয়ে?

সবার দেখি শুক জাগি,

সবাই দিতে চায় গো ঈশ্বরি

শুধু আছেন দারুণবাবু

মুখের দিকে চেয়ে ।

(তোমাদের) মুখের দিকে চেয়ে ।

মেয়েদের যত কষ্ট

জানিয়ে তাঁরে দাও স্পষ্ট

সবই তিনি খুঁচিয়ে দেবেন

কর্পোরেশন য়েয়ে ।

চতুর্থ পর্ক

দিশেহারা পার্ক—লোকজন, ভীড়, গোলমাল

নন্দরাম। Order, order !

সদাশিব। এইবার আমাদের সভার কার্য আরম্ভ করা হচ্ছে ।
আপনাদের নিশ্চয় জানা আছে যে কি উদ্দেশ্যে আমরা
আজ এই সন্ধ্যায় দিশেহারা পার্কে সমবেত হয়েছি ।
ভোট জিনিষটার ওপর আপনার, আমার, সমস্ত দেশবাসীর
গুটির শুভাশুভ নির্ভর করছে । অতএব খুব বিবেচনাক্রমে
সঙ্গে ভোট দিতে হবে ।

গজু। Capital !

গোলমাল ও হাসি

নন্দরাম, গণেশ । Order ! Order ! চুপ করুন, চুপ করুন ।

সদাশিব। প্রথমে একটি উদ্বোধন সঙ্গীত হবে তারপর নরহরি গড়গড়ি
মশাই বক্তৃতা করবেন ।

গান—জনৈক গায়ক

বৃন্দে মাতার দুঃখ বেদনা

ভুলান্তে যে এল মরীয়া হ'য়ে,

সে যে তব অতি আপনার জনা

বোঝ না কি এত দুঃখ স'য়ে ?

গঙ্গারাম সে ডগীরথ সম

বহাতে এসেছে স্থপের নদী

নদী মরে যাবে তোমরা তাঁহারে

একটিও ভোট না দাও যদি ।

বৃন্দে স্থপে দিও বিচার করিও ;

দিয়ে যাও ভোট মায়ে ও পোয়ে ।

হাততালি

সদাশিব। এইবার অক্লান্তকর্শী নরহরি গড়গড়ি মশাই আপনারদের
কাছে গঙ্গারামবাবুর সংক্ষেপে কিছু বলবেন ।

হাততালি

গোলমাল ; "আন্তে, আন্তে" বলিয়া কে একজন গোল থামাইবার চেষ্টা করিল

গজু। নরহরিবাবুর কাছা গলায় কেন ?

নন্দরাম। ঠিক যে মা মারা গেছেন ।

নরহরি (একটা টুলে দাঁড়াইয়া) । সমবেত নিখিল বাংলার নরনারীগণ,
দেশের মা যে মরে গেল, প্রাণ ফেটে মরে গেল । দেখতে
পাছ না ? শুনেতে পাছ না ? আমাদের মাতৃবিয়োগের
শোক কি তোমাদের প্রাণে জাগে না ? আগলে তোমরাও
কাছায় গলায় দিয়ে হাজির হতে । মায়ের কান্না, সে যে
মৃতদেহের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে । সে কান্না

তুনেছেন কে ?—গঙ্গারামবাবু। তাঁর ছুখ ঘোচাবে কে ?
গঙ্গারামবাবু।

একজন। হিয়ার, হিয়ার !

নরহরি। যদি মাকে আবার বাঁচাতে চাও, গঙ্গারামবাবুকে ভোট
দাও; ওদের সম্মেলন খেয়ে দেশত্রোহিতা ক'রো না।
গঙ্গারামবাবুর বিপক্ষে পাড়িয়েছেন একজন, যিনি তাঁর
জামাই, আর একজন মুদী। অর্থাৎ একজন নিজের
স্বার্থের জন্য স্বস্তরকে তাগ করতেও কুণ্ঠিত নয়, আর
একজন মুদীধানার দোকানের স্বার্থে তিনগুণ ভেজাল মাল
চালাবার জন্তে ভোট পেতে চাচ্ছেন। তুলনা ক'রে দেখ,
তোমরা কাকে ভোট দেবে ? গঙ্গারামবাবু ছাড়া সব
ছোঁচোর, সব পাজী, সব...

গজু, গণেশ, নন্দরাম, ছ একজন। মার, মার বেটাকে।

ওকতর গোলমাল

নরহরি। ওরে বাবারে, গেছি, গেছি।

মার, মার; পুলিশ, পুলিশ; দারুকাবাবু কি ফতে; ছিদাম মুদী-কি জয়; প্রভৃতি ভীষণ
গোলমালের সহিত সভাসঙ্গ হইল।

পঞ্চম পর্ব

পোলিং স্টেশন

অসম্ভব ভীড়, গোলমাল, মোটর যাতায়াত

সদাশিব। Vote for

গঙ্গারামের দল। গঙ্গারামবাবু।

আরও দুইবার এই উক্তি

গজু ও দারুকের দল। দারুকেরবাবু কি ফতে। দারুকেরবাবু
কি ফতে।

অনন্ত, ভজ্জহরি প্রভৃতি। ছিদাম মুদী কী জয়। ছিদাম মুদী কী জয়।
বিউপলু বাজিল

×—এদিকে মশাই, এদিকে দারুকাবাবুকে ভোট দেবেন।

×—মশাই, দ্বিতীয় নামটা মনে থাকে যেন।

×—ঠিক গঙ্গারামবাবুর নামের against এ চ্যারা কেটে দেবেন।
ভোটের। মশাই, হাত ছাড়ুন, হাত ছাড়ুন, গিছি, গিছি বাপুয়ে!
অমন করলে সব কেটে কুটে একেজার ক'রে দোব।

×—হিপ্ হিপ ছররে! গঙ্গারাম বাবু কী জয়।

অনন্ত। ছিদাম মুদী, মশাই, ছিদাম মুদী।

×—মনে থাকে যেন পরে ধারে চাল ভাল আনতে হবে।

সদাশিব ও নন্দরাম। Sir, vote for গঙ্গারামবাবু। ওদিকে সরবৎ
নেই, এখানে আইস্ক্রীম।

গোকুল। এদিকে মনোহরা আর রসগোল্লা আছে মশাই।

গজু। ও গোবিন্দবাবু, স্বেচ্ছাসেবকদের ছ একটা সিগারেট টিগ্রেট
ছাড়ুন। শালার বিড়ি খেতে বেতে মুখ যে কড়া মেয়ে
গেল মশাই।

গঙ্গা। নরহরি, নরহরি! আ, নরহরি কোথায় গেল।

গজু। আপনার হেড কানভাসার, মশাই, বাড়ীর সবাইকে নিয়ে কালী-
ঘাটে গেছে। এই ত তার শেষ মটর চড়া!

কয়েকজন হাসিয়া উঠিল

গঙ্গা। নরহরি! নরহরি!

এখানে
বিউপলু বাজিল

অনন্ত, কেই, ভজ্জহরি। ছিদাম মূদি leading—এক ঘটায় সাতশো ভোট।

নন্দরাম, সদাশিব, গণেশ। পথ ছেড়ে, পথ ছেড়ে। গঙ্গারাম কী জয়। দিদিমা, কাকে ভোট দিলেন। ও দিদিমা! দিদিমা। বাবা, আমি বুড়ো মাতুষ, পথ ছাড়। তোদের ও গ্যাট মাট বুঝি না। আমার খাবারগুলো নিয়ে বাড়ী যেতে দে। গোকুল। দিদিমা, আমাদের দারুকবাবুর মোটরে এসেছিলেন। তাঁকে ভোট দিয়েছেন তো?

নন্দরাম, সদাশিব, গণেশ। আমাদের গঙ্গারামবাবুর খাবার খেয়েছেন নিশ্চয় তাঁকে দিয়েছেন?
দিদিমা। দিইছি বই কি বাবা। তোদের দুজনকেই দিইছি।
ছিদেমের নামে চারা দিয়ে কেটে দিইছি।

১ম ও ২য় দল। কি সর্বনাশ! অ্যা!
ভজ্জহরি। জয় ছিদাম মূদি কী জয়।

বিউগল্ বাজিল

আহুন দিদিমা, রিজা ক'রে বাড়ী পৌছে দি।

দারুকের প্রবেশ

দারুক। মাখন! মাখন!

গজ্জ, দুর্গাপদ। থি, চিয়াস'ফর দারুক মুখাজ্জি।
অনন্ত। মাখন গ'লে গাওয়া ঘী হ'য়ে গেছে বাবা।

দারুক। আঃ, এই সময় মাখন কোথায় গেল! তার সকাল থেকে টিকি দেখতে পাচ্ছি না!

গ্রহান

সদাশিব, গণেশ, নন্দরাম। পথ ছেড়ে, পথ ছেড়ে। মেয়েরা আসছেন, সরে যান, সরে যান। গঙ্গারামবাবুকে ভোট দেবেন।
গজ্জ, দুর্গাপদ, গোকুল। মনে রাখবেন দারুকবাবুর মোটরে এসেছেন।
অনন্ত, ভজ্জহরি, কেই। মা ঠাকরপরা, ছিদাম মূদী জিতছেন। তাঁকেই ভোট দিয়ে দেশের মুখ রাখুন মা।

গোলমাল একটু অশ্লষ্ট হইল

মাতঙ্গিনী ও মনোহরার প্রবেশ

মাত। নীলিমা মাসীর ভোট আমার। তুই কোন্ আক্কেলে তার কাছে মোটর পাঠাস্! একটু লজ্জা করে না পোড়ারমুখী!
অমন মেয়ে জন্মে মরে নি কেন তাই ভাবি।

মনোহরা। তোমার লজ্জা করে না? জামাইয়ের ওপর হিংসে ক'রে বুড়ো বয়সে ভোট কুড়ুতে এসেছ! আর কদিন বা বাঁচবে। বুড়ো বুড়ীর রস দেখে যে লোকে গায়ে থুথু দিচ্ছে। তোমার মেয়ে ব'লে পরিচয় দিতে যে আমার লজ্জা করে।

মাত। পবরদার হারামজাদী! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা।
মারবো গালে চড়।

মনোহরা। বটে, মারো না দেখি তোমার কত বাড় বৃকের পাটা।
যে নধ নেড়ে মুখ ঘোরাচ্ছ একটা টানে ঐ নাক ছিঁড়ে দোব।

মাত। তবে রে—

একটু চড় মারিল

মনোহরা। বটে! আমার গালে চড়!

নধ বরিয়া নাক ছিঁড়িয়া দিল

মাত। (ক্রন্দন) ওরে বাবা রে! ওগো কষ্টা, দেখসে তোমার মেয়ের
কাণ্ড। ওমা নাক ছিড়ে দিলে মা! মা গো!
মনোহরা। (ক্রন্দন)

লোকজন ছুটিয়া আসিল

গঙ্গারামের দল। কি হয়েছে, কি হয়েছে? এঃ, এ যে একেবারে
নাকের দফা রফা! Ambulance, ambulance,
হাসপাতাল, হাসপাতাল।

একজন ফায়ারব্রিগেড ডাকিয়া আসিল

দারুকের দল। দারুকবাবু কী ফতে।
গঙ্গারামের দল। গঙ্গারামবাবু কী জয়।
ছিদামের দল। ছিদাম মুদী কা পোয়া বারো।

বিউগল্ বাজিল। মোটর হর্ণ ইত্যাদির গোলমাল

২৪ পর্ব

গঙ্গারামের বহিঃপাটী

গঙ্গা। বেটাচ্ছেলে নরহরি আমায় ফাঁসালে। হারামজাদা বেটা বিশ
হাজার টাকা এই কদিনে খরচ করিয়ে আমায় পথে বুসিয়ে
সরে পড়লো। উঃ, করকরে টাকাগুলো বেরিয়ে গেল!
উদয়াস্ত পরিশ্রম, টাকার ছেয়াদ, মনোমালিছ, কি না
হ'ল, গিন্নী?

মাত। যা হবার তা হ'ল। মধ্যাথান থেকে বাতের যন্ত্রণার উপদ্রব।
আমি তো আর পারি না।

গঙ্গা। উঃ! দেশের লোক বেটারা এমনি সয়তান! আমাদের
থেকে, দারুকের মোটরে চেপে ছিদামকে ভোট দিয়ে এল!
বেটা ক'সে ভেজাল তেল ঘি চালায়, সব বেটা কলেরা হ'য়ে
মরে, তবে আমার শাস্তি।

মাত। পাপ পূর্ণ একেই বলে। ভগবান, তুমি পোড়ারমুখোদের
দেখো।

একটি মোটর লরীতে করিয়া ছিদামের দল বিউগল্ বাজাইয়া বজিল

৩য় দল। Three cheers for ছিদাম মুদী। হিপ হিপ হুরে!
হিপ হিপ হুরে!

দরোগারনের প্রবেশ

দরো। বাবু সাব, ছাদামী মোদী আপকো সাথ ভেট করনে আয়া হয়।
গঙ্গা। ভাগা দেও।
দরো। উও তো শুনতাহি নেহি হজুর।
গঙ্গা। বোলো বাবুকা ব্যারাম হয়।
দরো। বেমারী পুছে তো কেনা বাঁতাও হজুর?
গঙ্গা। বোলো সিন্‌সিনিয়া হয়।
দরো। বহৎ আচ্ছা হজুর।

এস্থান

আর একটি মোটর আসিয়া পাঁড়িল। দারুক ও মনোহরার প্রবেশ

গঙ্গা। কে বাবা, দারুক এলে! এস বাবা। থাক থাক, আর পায়ের
ধুলো নিতে হবে না। বসো।

দারুক। (হাতজোড় করিয়া) আপনি আমায় ক্ষমা করুন শ্রুত মশাই।
শালা মাখন আমার গ্রিশ হাজার টাকা নিছক খরচ

করিয়ে দিলে। ওং, এ টাকাটায় যদি দেশে টিউব ওয়েল
কাটিয়ে দিতুম, লোকে নাম করতো।

মাত। কে, মনো এলি মা। (কাদিয়া) কেন এ কীষ্টি করতে
গেলুম মা!

মনো। (কাদিয়া) আর বোলো না মা, আর বোলো না। আমায়
ক্ষমা কর। তোমার নাকটা এখন কেমন আছে মা?

হসিনীদের গান

এই ইলেকশনের রঙ্গ

যদি না থাকতো ভবে

দেখতো

কে এই সং গো?

ইলেকশনে সবার মিতে

বুক চাপড়ান পরের হিতে

আসল কাজে অষ্ট রত্না

পরে রণে ভঙ্গ!

এই বাজারে টাকার শ্রদ্ধ

নেপায় মারে দই ও খাজ

দেশের লোকে হেসে আকুল

দেখে এদের চং গো।

সমাপ্ত

পৃথিবীর পাগলামী

কিন্তু এই সাইবেরিয়ায় বাচার উপযোগী যে সমস্ত খাজ সামগ্রী,
তার স্বত্বকে বেশী কথা না বলে শুধু এই বললেই যথেষ্ট হবে যে,
এখানেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী উন্নতির আবশ্যক। খাওয়ার যা জিনিষ
তাকে অথাদা বলাই চলে এবং পোষাক-পরিচ্ছদের চণ্ডের কোন
মানেই হয় না। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও সকলের মুখেই হাসি। এ ব্যাপার
প্রতি yardএ, প্রতি কারখানার উঠানে প্র্যাকার্ডের উপর মারা
সব ফোটোর হাসিমুখ দেখেই বোঝা যায়। যাদের ফোটো এমনিভাবে
দেখা যায়, তারা হচ্ছে groupes primes, অর্থাৎ যারা তাদের প্রস্তুত
কার্যে রেকর্ড রেখে, নামজাদা হয়ে পুরস্কৃত হয়েছে। ইউরোপে যেটাকে
travail d' accord * বলা হবে, রাশিয়ায় সেটা একটা প্রিমিয়াম
বা বোনাস, যার বস্তুগত হ্রবিধা ছাড়াও ফোটো বা খবরের কাগজে
নামোল্লেক্ষের একটা মনোগত সম্ভাষণ আছে। এমনিভাবেই রাশিয়া
তার টালি সাজানো বা মাটিতে গর্ত খনন প্রভৃতি সামান্য কাজে
ক্রতগামিতার স্পীড রাখছে। এটা অবশ্য সত্য কথা, যে এই ধরণের
স্পোর্টের জন্য কোন International Commission কখনও বসানো
হয়নি। কারণ এসব কন্ট্রোল করা বাস্তবিকই কঠিন, কিন্তু তবুও
নানারকম চিরু থেকে বোঝা যায়, কি ক্রতগতিতে এই সব কন্ট্রাকশানের
কাজ সাইবেরিয়াতে চলেছে।

কি ভয়ঙ্কর গতি! অথচ মাস্তমের চাল নেই, চুলো নেই।

* অর্থাৎ পুরণে কাজ, piece-work

শ্রমজীবীরা কোন রকম আপত্তি না করে কেমন করে এসব সহ করে, এইটাই আশ্চর্য। সম্ভবত, এমিয়া থেকে আগত এই সব ব্যক্তিদের মানসিক বৃত্তি রাশিয়ার ঠিক উপযোগী—বিশেষত জীবন ধারণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীনতা ও বস্তুতাত্ত্বিকার বিষয়ে। সর্বাপেক্ষা খেচ্চাচারী dictatorshipএর ভিত্তিই এখানে,—সে শুধু জনসাধারণের উপর ব্যক্তিগত কর্তৃত্ব করিয়েই নয়, তাদের উপর মানসিক প্রভুত্ব করিয়েও। এ ধরনের খেচ্চাচারিতা, সংগ্রামের ইচ্ছাশক্তি ও প্রণালী অতীব অদ্বুত।

নির্দিষ্টভাবে এই একচ্ছত্র প্রভুত্ব-বিস্তার এগিয়েই চলেছে, সামনে যা কিছু পাচ্ছে সব ঠেলে। এই industrialisation কার্যে যদি কেউ যোগ দিতে না চায়, তাকে, এমন কি আইনহুসারেও, পলাতক বলে গণ্য করা হয়। সাইবেরিয়ার কোন স্থানেই মেশিন গান, মিলিশিয়া, G. P. U., পলিটিক্যাল এজেন্টের অভাব নেই; এ বিষয়ে সাইবেরিয়া উরাল প্রদেশ বা U. O. K.র বিরাট কলকারখানার প্রদেশের চেয়ে কোন অংশে কম যায় না। যারা এই সব স্থান ঘুরে এসেছেন, তাদের অন্তত একটুও ধারণা হবে, কেমন ভাবে সব পিরামিড তৈরী করা হয়েছিল।

টেকনিক্যাল বিষয় সম্বন্ধে সঠিক কোন খবরই দেওয়া যেতে পারে না। Solikamskএর উদাহরণ ধরলে দেখা যাবে যে এই সহর গিল্জে ও পাদ্রীদের আন্তানায় ভর্তি; এ সবই এখন বদলে শাসন-কার্যের বাড়ী, ক্লাব, ডিপো প্রভৃতি হয়েছে। রাসায়নিক এই কেন্দ্রের জার্মান চীফ এঞ্জিনীয়ার লেখককে বলেছিলেন যে এখানে এখন বছরে আঠার লক্ষ টন পটাসিয়াম্ তৈরী হয়, অথচ ১৯৩০ সালেও

এখানে কিছুই ছিল না। Solikamskএর দক্ষিণে, কুড়ি একশ মাইল দূরে সর্বপ্রধান রাসায়নিক কারখানা দেখা যায়।

Magnitogarskএ, এমনকি মাটির লেভেলের উপরেই, বিশাল বনিজ স্তর পাওয়া গেছে। ১৯৩২এ ছোটো blast furnace যেখানে ষাটে : ১৯৪২এ, আশা করা যায়, আটটা খাটবে; কুড়ি লক্ষ টনের প্রস্তুত কার্য।

এক বিরাট ব্যারেজ উরালের নদীর গতিরোধ করেছে; এজত্ব কত মাইল ধরে, গ্রাম্য দৃশ্য একেবারে বদলে গেছে।

আরো সতের-আঠারশো মাইল দূরে কয়লার রাজ্য। Kusnetzkএর গর্ভে গ্র্যান্ডসাইট জমির উপর পর্যন্ত আছে। খালি Prokowskএর সব খনি থেকে বছরে এখন নব্বুই লক্ষ টন কয়লা তোলা হয়। ১৯৩৪ সালে এক কোটি চল্লিশ লক্ষ টন তোলা হবে। খনির চারিদিকে সেই টেপীর উপরও বড় বড় সহর উঠছে; Prokowskএর নিকট চারশো বাড়ী নিয়ে Tyrgon সহর তৈরী হয়েছে। Kusnetzk নিজে চারিধারে তাঁবু খাতানো এক বিরাট ক্যাম্প ছাড়া আর কিছুই নয়, এবং শতকরা ষাট জন লোক কি গ্রীষ্ম কি শীতে সেই পাতলা পদ্দার মধ্যে বাস করে।

Tcheljabinskএ কাঠের সব ব্যারাক্। কেবল Swerdlowskএ বানের উপযোগী সব বাড়ী আছে, কিন্তু হ'লে কি হয়, এসব বাড়ী ঠিক কয়েদখানার মত, একথা রাশিয়ানরা নিজেরাই বলে।

এই সব নতুন নতুন কলকারখানাময় সহর দেখে ক্রমাগতই মনে প্রশ্ন ওঠে, কেমন করে এ সবের ব্যয় নির্বাহ করা হয়, এই সব মেশিন কেনবার টাকা কোথেকে রাশিয়া জোগাড় করে? এই যে কোটি

কোটা টাকা মূলধন খাটান হয়েছে এসব কাজে, over-production এর সময় কি এ টাকা ঠিক ভাবে খাটতে পারবে? এই সমস্ত প্রশ্নই capitalistদের কথা। এর উত্তর বেশই দেওয়া যেতে পারে যে, এখানে production-এর quantity নিয়ে কোন কথা হয় না, নতুন নতুন সৃষ্টি নিয়েই কথা; আর যদি কিছু অর্থব্যয় করতেই হয়, তা তো কাঠ, শস্ত্র, তুলা, প্লাস্টিনাম প্রভৃতির দ্বারাই সঙ্কলান করা যেতে পারে।

সর্বদাই নতুন নতুন সোনার খনির আবিষ্কার হচ্ছে, আর উরাল প্রদেশে প্লাস্টিনামের উৎপাদন তো দিন দিন বেড়েই চলেছে।

সমস্ত জগতের সবচেয়ে মূল্যবান ধাতুর যে পরিমাণ উৎপাদন, তার শতকরা আশী ভাগই এই Kytlim-এই হয়। সোভিয়েটদের পকেট গুল্লরে Kytlimই রাতদিন অর্থ ঢালছে। উরালের পার্শ্ব প্রদেশের মাঝখানেই এই Kytlim একা দাঁড়িয়ে আছে।

বহুর দশক আগেও ফার- (fur) অন্বেষণকারীরা নিজেরাই পূর্তু শিখরে দেয়া এই উপত্যকায়, যেখানে উরাল পূর্তু শিখরসমূহ থেকে সবচেয়ে মূল্যবান ধাতু বায় সব স্রোত নেমেছে, প্রবেশ করতে পারেনি; Kytlim-এর উপত্যকাই হচ্ছে সেই স্থান যেখানে সবচেয়ে বেশী প্লাস্টিনাম পাওয়া যায়।

ক্রমশ

লেখক, জিস্কা

অহুবাদক, শ্রীতরুণ ঘোষাল, প্যারিস

চিঠি

এক

গতকাল সারা ছপুর ধরিয়া একটি চিঠি লিখিয়া কল্যাকার ডাক ঘাইকর পূর্বেই চিঠির বাক্সে ফেলিয়াছি; অর্থাৎ কালিকার সেই চিঠি আজ যাহার উদ্দেশ্যে লেখা হইয়াছে তাহার হাতে পৌঁছিতে।

পূজার বন্ধে তাহার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়। তাহাদের বাড়ী গিয়াছিলাম, বন্ধের পনর-কুড়ি দিন সেখানে কাটা হইয়াছিল। সেখানে হইতে চলিয়া আসিবার সময় তাহার একখানা পেন্সিল-স্কেচ এর ড্রইং খাতা—যা একদিন দেখিব বলিয়া লইয়াছিলাম—তুলিয়া স্টাট-কেসে করিয়া লইয়া আসিয়াছি। ইহাই চিঠি লেখার স্বযোগ,—একটা apology গোছের চাওয়া। ব্যাপারটা খুবই সহজ, অথচ কাল সারা ছপুর ধরিয়া সেই চিঠি লিখিয়াছি—রাইটিং প্যাণ্ডের অর্ধেক কাগজ নষ্ট করিয়া। শেষ পর্য্যন্ত যাহা লিখিয়াছি তাহা এই কয়টি কথা—“ভুলে আপনার ড্রইং খাতাটা নিয়ে চলে এসেছি; সে জন্ত ক্ষমা করবেন। সেটা কি এখনই ডাকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব, না আসছে বড়দিনের বন্ধে দিলেও চলবে?”

প্রথম যে চিঠি লিখিতে বসিয়াছিলাম তাহাতে ভূমিকার মাত্রা এত অধিক হইয়া পড়িল যে শেষ পর্য্যন্ত আর ব্যক্তব্য-বিষয়ের অবতারণাই করিতে পারিলাম না। কেবল অবতরণিকাই লিখিয়া চলিলাম, যথা—“মাছয়ের পদে পদে ভুল। সে চলিতে থাকে নিঃসন্দেহে আপনাকে সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে করিয়া। কিন্তু কোন অজ্ঞাত অথাত

ছিন্ন দিয়া যে মোহ আসিয়া তাহার চিত্তে বিলম্ব জাগাইবে, তাহা সে পূর্বে মোটেই জানিতে পারে না....." ইত্যাদি। ইহার পিছনে আমার যাহা কিছু বলিবার তাহা এই যে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে সেই খাতাটা লইয়া চলিয়া আসিয়াছি একটা অনিচ্ছাকৃত ভুলের বশে। যাহা হউক, ঐ কথাটুকু বলিবার অবসরই হইয়া উঠিতেছিল না। এমন কি ভূমিকার ভিতর রবিবাসুর এবং ছ'একজন ইংরেজ লেখকের রচনা হইতে কোটেশন কিছুই বাদ যাইতেছিল না। যখন 'জান ফিরিল, পাঁচ-সাতটি পাতা টান মারিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলাম।

দ্বিতীয় চিঠির পালা। কিন্তু এবার কমা চাহিবার মাত্রা অত্যধিক হইয়া উঠিল। পূর্বের বারে ছিল দর্শন, এবার কাব্য। প্রথমেই আরম্ভ করিলাম, 'নটীর পূজা'র 'কম হে কম' এই গানের দুই লাইন তুলিয়া (অর্থের দিকে নজর দেই নাই, কোটেশন দিলে বেশ জমকালো দেখায়, তাই 'কম' কথাটা দেখিয়াই উহা চালাইয়াছি)। তারপর কলম চালাইতে লাগিলাম, "...নারীর সেই ধরিত্রীর মত সহনশক্তি, সেই বিরাট কমা, যে কমা সীতা রামকে করিয়াছিলেন বনবাস সঙ্কেও, শকুন্তলা দ্বন্দ্বস্বকে করিয়াছিলেন উপেক্ষার পরও... ইত্যাদি,—সেই কমার গুণে আমাকেও ভূমি কমা করিও।" এই প্রকার প্রায় দুই পৃষ্ঠা কমার মহিমার কথা লিখিয়া যখন ফিরিয়া একবার পড়িলাম তখন দেখি, 'আপনি' স্থলে 'তুমি' বলিয়া তাহাকে সম্বোধন করিয়াছি, এবং যতগুলি কমার উদাহরণ দেখাইয়াছি সবই বিবাহিত দম্পতীকে আশ্রয় করিয়া। ভাল করিয়া দেখিলাম, কেমন যেন বাধ বাধ ঠেকিতে লাগিল। তখনই লিখিত পাতা দুইটি টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলাম।

এই রকম পাঁচ-ছয়বার লিখিলাম, পাঁচ-ছয়বারই ছিঁড়িয়া ফেলিলাম।

তখন মাথা গরম হইয়া উঠিয়াছে, কান লাল হইয়া তাহা দিয়া যেন আগুন ছুটিতে লাগিল। তাড়াতাড়ি চোখ-মুখ ধুইয়া, মাথায় জল দিয়া শুইয়া পড়িলাম। কিছুক্ষণ এপাশ-ওপাশ করিবার পর ঘুমাইয়া পড়িলাম। ঘুম ভাঙিলে ঘড়ি দেখিলাম, পৌনে চারটা বাজিয়াছে। বিছানা হইতে লাফাইয়া উঠিয়া পড়িলাম, কারণ চারটার সময় চিঠির বাক্স খোলার শেষ সময়। চিঠি লিখিতে বসিয়া গেলাম। ঘুমাইবার ফলে ভাবের আবেগ কমিয়া আসিয়াছিল, তাহা ভূমিকাবিহীন ছোট একটি চিঠি হইয়া দাঁড়াইল। যাহা হউক, সেইটাই গতকলা ভাকে তাহার উদ্দেশ্যে পাঠাইয়া দিয়াছি। * * * আজ এখন বেলা দশটা। এই সময় তাহাদের ওখানে চিঠি পাইবার সময়। সেও নিশ্চয়ই আমার চিঠি পাইয়াছে। সে চিঠিটি পাইয়া এবং পড়িয়া কি ভাবিবে এবং করিবে—তাহাই মনে মনে নানাভাবে চিন্তা করিয়া আমি এখন নানাপ্রকার ভাবের আশ্বাস পাইতেছি।

দুই

সে চিঠিটি হাতে পাইবে, দেখিবে খামে চিঠি, মনে করিবে তাহার কোন একসঙ্গে-পড়া মেয়ে-বন্ধু লিখিয়াছে। কিন্তু ঠিকানায় হাতের লেখা দেখিয়া কি একটু সন্দেহ মনে জাগিবে না যে তাহা কোন স্ত্রী-বন্ধুর নয়, পুরুষ-বন্ধুর? খামটি ছিঁড়িলে নিশ্চয়ই সে অবাক হইয়া যাইবে। দেখিবে, অপরিচিত হাতের লেখা। তৎক্ষণাৎ নীচে নাম অহস্ফান করিবে, নাম পড়িয়া আরও বিস্মিত হইবে। তখন অনেক প্রশ্ন, অনেক কথা তাহার মনে ভিড় জমাইবে। নিশ্চয়ই অনেক কথা একসঙ্গে তাহার বুকের ভিতর আলোড়ন

জাগাইবে। তাহার নিঃশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিবে, নাসিকার প্রান্ত দুটি ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিবে। তাহার মনের ভিতর উদিত সেই অনেক কথার কোন উত্তর না দিয়াই সে চিঠির কথাগুলি পড়িবে।

অল্প কয়েকটা কথা—কয়েক সেকেন্ডেই পড়া শেষ হইয়া যাইবে। কিন্তু সে কি খামিবে? সে খামিবে না। একবার, দুইবার, তিনবার, চারবার—পড়িতেই থাকিবে, তৃপ্তি পাইবে না। যত বার পড়িতে আরম্ভ করে প্রত্যেক বারেই একটা নূতন কোন অর্থ পাইবার আশা থাকে; যখন পড়ে, সে যেন কোন স্বপ্ন-লোকের ভিতর দিয়া যায়; যখন শেষ করে, অতৃপ্তি তাহাকে ব্যস্ত করে। * * * হঠাৎ তাহার বড়দির (আমার বৌদির) পায়ের শব্দে চমকিত হইয়া সে আমার চিঠিটি অতি ক্ষিপ্ৰগতিতে অথচ অতি সন্তর্পণে লুকাইয়া রাখিবে।

আজ তাহার চুল গোলা, স্নান করা, খাওয়া—সবই বড় তাড়াতাড়ি। ছোট বোন আসিয়া বলিল, মেজদি, আমার চুলটা ঠিক করে দাও না। সে ধমক দিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিল। মা আসিয়া বলিলেন, বাজার-খরচের হিসেবটা একবার দেখ ত। সে বিরক্তির সহিত চাকরের নিকট হইতে হিসাব লইতে গিয়া ছ'এক কথার পরই তাহাকে বকিয়া, গাল দিয়া উঠিয়া গেল। আজ সে একলাই খাইতে বসিল—সকলের আগে। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপার কি? সে উত্তর দিল, ওবাড়ীর, কাকিমা অনেকগুলি সেলাইএর কাজ দিয়েছেন, আজকেই শেষ করতে হবে।

যাহা হউক, সকল বিষয় কাটাইয়া উঠিয়া এখন সে নিজের ঘরে গিয়া থিল লাগাইল। ধীরে ধীরে চিঠিটি বাহির করিল। এইবার বেশ মনঃসংযোগ করিয়া পড়িতে বসিল। পড়িবার পূর্বে খাম,

খামের উপরে নিজের নাম-ঠিকানা, এবং চিঠির কাগজ বেশ করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লাগিল। Of its joy secure, the heart luxuriates with indifferent things"..... তাহার বুকের ভিতরকার অসীম আনন্দ মুখের হাসি হইয়া ফুটিয়া বাহির হইতে চাহিতেছে, সে নিম্ন গুঠকে দন্তপাটিদ্বয় মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া সেই হাসিকে খামাইতে চেষ্টা করিতেছে; আর তাহার ক্ষুরিত অধর রক্তাভ গুণ্ডদেশ এবং বেপখুময় বক্ষপুট তাহাকে এক অপূর্ণ ত্রীতে রাঙাইয়া তুলিয়াছে।

তারপর সে চিঠি পড়িবে। সেই একই চিঠি—সেই অল্প কয়েকটা কথা। তবু সে ছাড়িবে না। সে যেন চিঠিটাকে চিবাইয়া চিবাইয়া তাহার যত কিছু মধু, যত কিছু রস সব নিষ্কাশিত করিয়া শুষিয়া লইয়া শেষে কেবল ছিবড়ে-অংশটুকু পরিত্যাগ করিতে চায়। কত কথাই ভাবিল সে। ঐ অল্প কয়েকটি কথা হইতে রাশি রাশি কথা তাহার মনে হইতে লাগিল। মনে হইল আমার কথা, আমি যে কয়দিন তাহাদের ওখানে ছিলাম সে কয়দিনের প্রত্যেক খুঁটিনাটির কথা। আমি কবে তাহাকে কোন্ কথা বলিয়াছিলাম, কোন্ সময়ে তাহার দিকে কি ভাবে চাহিয়াছিলাম, আমার সহিত ভাগ্যক্রমে সে একলা থাকিলে আমি তাহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলাম..... ইত্যাদি সব একে একে তাহার মনের ভিতর জমাট বাঁধিতে লাগিল। * * * শেষ পর্যন্ত আপনাকে সামলাইতে না পারিয়া হয়ত সে কাঁদিয়া ফেলিল, কাঁদিয়া বুক ভাসাইল। তারপর প্রকৃতিস্থচিত্তে আবার যখন চিঠি পড়িতে লাগিল, তখন দেখিল, কই সে কথার ইঙ্গিত চিঠিতে ত একেবারেই নাই, একটা শব্দেও ত তাহার আভাস পাওয়া যায় না। নিজের

নিবৃত্তিতায় সে হয়ত আপন মনে হাসিয়া উঠিল,—সে হাসি বড় ব্যথা-
মাখান। এখন আমার বড়ই আকশোধ হইতেছে, কেন আমি তাহাকে
বেশী কথা লিখিলাম না? অস্তিত্ব এটুকু কেন লিখিলাম না যে
তাহাদের নিকট হইতে যে স্নেহ, যে আদর পাইয়াছি তাহা চিরদিন
মনে থাকিবে। তাহার নিভের কথা না লিখিয়া তাহার মার আমার
প্রতি পুণ্যম স্নেহের কথা লিখিলেও ত হইত! * * * বাহা হউক,
বাহা হইয়া গিয়াছে তাহা হইয়াই গিয়াছে। আবার ভাবিতে ভাবিতে
মনে আশার সঞ্চার হইতেছে। আমার চিঠি লেখাই কি আমার
জন্ম-নিবেদনের যথেষ্ট পরিচয় নয়? তাহার ত অনেকই গুরুত্ব ভূইং
পাতা আছে; শুনিয়াছি, অনেক মেয়ে-বন্ধুকে নাকি সে উপহারও দেয়।
এই রকম একটি তুচ্ছ বিষয়ের জন্ত আমি যে তাহার নিকট ক্ষমা
প্রার্থনা করিয়া চিঠি লিখিয়া পাঠাইয়াছি, তাহাতে কি সে বুঝিতে
পারিবে না যে আমার চিঠি লেখাটাই বড়, ক্ষমা চাওয়াটা নয়? এই
রকম অনেক প্রকার মনস্তত্ত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা করিয়া আশায় উৎফুল্ল হইয়া
উঠিলাম। নিশ্চয়ই তাহার অনেক-কথার একটি উত্তর পাইব।

* আর একদিন গিয়াছে। আমাদের পাড়ায় ডাক-পিওনের আসিতে
বেলা এগারটা হইয়া যায়। দৈর্ঘ্য হারাইয়া সকাল আটটায় ডাকঘরে
গিয়া আমাদের বাড়ীর চিঠিগুলি লইয়া আসিয়াছি; দুইটি মক্কেলের
মোকদ্দমা-সংক্রান্ত চিঠি এবং একটি মনি-অর্ডারের প্রাপ্তিস্বীকার।
তাহার চিঠি আসে নাই। আশায় রহিলাম, যদি আগামী কল্য
আসে।

শ্রীঅমলেন্দু বাগটী

খড়মের দৌরাহ্মা

এক

ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়ি, দশ-আনা-ছ-আনা চুল, পরনে বিচিত্র লুদী, মুখে
সর্বদা পেঁয়াজ রসূনের গন্ধ—এ হেন লোকের নাম রাধাবল্লভ। পিতামহ-
প্রদত্ত নাম। রাশিয়ায় শুনিয়াছি নাম বদলাইবার স্বযোগ আছে।
এদেশেও অনেক ছাত্র-ছাত্রী নাকি ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিবার পূর্বে নিজেদের
পছন্দসই নামকরণ করিয়া থাকেন। রাধাবল্লভ একবার ম্যাট্রিক দিবার
স্বযোগ অবশ্য পাইয়াছিল, কিন্তু নাম বদলাইবার কথাটা তাহার মনেই
হয় নাই। পৃথিবীতে এই সব অঘটন কেন ঘটে তাহা বলা শক্ত।
সে দুঃস্থ গবেষণায় প্রবৃত্ত না হইয়া আমি শুধু এইটুকুই বলিতে চাই
যে রাধাবল্লভের নামটা আরও একটু আধুনিক হইলে যেন মানাইত
ভাল। কারণ রাধাবল্লভ সত্যি একজন আধুনিক যুবক। চিন্তায়,
পোষাকে, কথায়-বার্তায়, বিশেষ করিয়া উপার্জন ব্যাপারে রাধাবল্লভ
একবারে অতি-আধুনিক। 'ব্রিজ' এবং 'ফ্লাশ' খেলায় রাধাবল্লভ
সুদক্ষ। এই পথে তাহার কিছু অর্থাগমও হয়। হয় বলিয়া রাধাবল্লভের
মাতুল রাধাবল্লভের নিকট রুতজ্ঞ। কারণ সিগারেট সিনেমার খরচটা
আর তাঁহাকে জোগাইতে হয় না। এই বাজারে তাহাও কম
লাভজনক নয়।

দুই

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ফেল করিবার পর হইতে রাধাবল্লভ তারুণ্য-

চর্চা করিতেছে। তারুণ্য-চর্চা বলিতে কি বুঝায় তাহা এ যুগের পাঠক-পাঠিকাগণ নিশ্চয়ই বোঝেন। বিস্তৃত বিবরণ নিশ্চয়োজন। নিরঙ্কুশ-ভাবে রাধাবল্লভের তারুণ্য-চর্চা চলিতেছিল। হঠাৎ একদিন বেচারী ঘা খাইয়া গেল।

মহাদেব-ঘায়েল-কারী ছুট দেবতাটি হঠাৎ একদা রাধাবল্লভ পোদ্দারকে লক্ষ্য করিয়াই তাঁহার অব্যর্থ শর-সন্ধান করিলেন। মদনোহিত মহাদেব মদনকে ভষ্ম করিয়া ফেলিয়াছিলেন ইহা সুবিদিত। মদনোহিত রাধাবল্লভ পোদ্দার কি করিয়াছিল তাহা হয়ত অনেকে জ্ঞানেন না। আমি জানি। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া বেচারী ধারে থানিকটা 'দ্রো' কিনিয়া ফেলিয়াছিল। 'আয়না', 'দ্রো', এবং রাধাবল্লভ যখন পরস্পর পরস্পরে নিমজ্জিত তখন কিন্তু পিতামহ প্রজ্ঞাপতি যে ঝুটুটিফুটিল মুখে পায়ের খড়ম খুলিতে লাগিলেন আবেগ-জ্বলিত রাধাবল্লভ তাহার বিন্দুবিসর্গও টের পাইল না।

তিন

পুঁটি নাম্নী যুবতীটি একদা রাধাবল্লভের হৃদয়-নাট্যনিকেতনে বিনা নোটসে স্বাভাৱ্য করিয়া অবতীর্ণ হইয়া গেল টামের জানালা গলিয়া। কখন পৃথিবীতে কি ভাবে যে কি ঘটে তাহা বলা দুষ্কর। পুঁটির সম্বলের মধ্যে অবশ্য তাহার বয়স। কিন্তু সেই বয়সটা কত—হোল কি ছাঙ্কিশ—তাহা সঠিক নির্ণয় করিবার পূর্বেই বেচারীরাধাবল্লভ মুগ্ধ হইয়া গেল। একবার মুগ্ধ হইয়া গেলে আর চালাকি চলে না। মন-রূপ অশ্বের মুখ হইতে মাহুষ তখন যুক্তি-রূপ বলা খুলিয়া ফেলিতে বাধ্য হয়। ঘোড়া চার পা তুলিয়া লাফাইতে থাকে। হইলও তাই।

মুগ্ধ রাধাবল্লভ লুকুভাবে হারিসন রোডে ঘুরিতে লাগিল। অথচ ব্যাপারটা এমন কিছু অসাধারণ নয়। এমন ত কতবারই ঘটিয়াছে। হারিসন রোডের ট্রামে আসিতে আসিতে কত বার কত মেয়েই ত রাধাবল্লভের চোখে পড়িয়াছে। কিন্তু ওই দ্বিতলবাসিনী গবাক্ষবস্ত্রিনী পুঁটিকে দেখিলামাত্র তাহার অস্থরের সমস্ত তন্ত্রীগুলি যেন একযোগে বলিয়া উঠিল, মোনা লিসা! আধুনিক ঔপন্যাসিকদের সমস্ত নায়িকাগণ আসিয়া যেন রাধাবল্লভের মন-প্রাঙ্গণে শঙ্ক-হস্তে সারি সারি দাঁড়াইয়া গেল পুঁটিকে বরণ করিবার জন্ত। এমন ত আগে হয় নাই।

এত বড় বিপর্যয় রাধাবল্লভের জীবনে আর কখনও হয় নাই। প্রেমে পড়িলে শোনা গিয়াছে জ্যোৎস্নাকে উত্তপ্ত এবং রৌদ্রকে হিমশীতল বলিয়া মনে হয়। রাধাবল্লভের স্পর্শ-শক্তির কোন বৈকল্য ঘটিল না বটে, কিন্তু তাহার জনবহুল হারিসন রোডকে নিতান্ত নির্জন বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ওই দ্বিতল বাড়ীটা ছাড়া যেন হারিসন রোডে আর কিছু নাই, বাকী সব হাওয়া;—প্রেমাক্রান্ত রাধাবল্লভের এইরূপ ধারণা হইল। এই ধারণার বশবর্তী হইয়াই বোধ হয় রাধাবল্লভ সেদিন ঠিক হারিসন রোডের মাঝামাঝি দাঁড়াইয়া নির্ভয়ে উর্দ্ধ-মুখ হইয়া শিস্যোগে পুঁটিকে প্রেম নিবেদন করিতেছিল। এমন সময় পিতামহ প্রজ্ঞাপতির খড়মখানা সজোরে আসিয়া লাগিল। কোথায় যে লাগিল তাহা ঠিক করিয়া দেখিবার পূর্বেই বেচারী অজ্ঞান হইয়া গেল।

খড়মখানা আসিল অবশ্য 'লরি'রূপে।

চার

দয়ার শরীর ছিল বলিয়া প্রাতঃস্মরণীয় বিজ্ঞাসাগর মহাশয় নাকি

জীবনে বহুবার নাস্তানাবুদ হইয়াছিলেন। দয়ালু রামকিঙ্কর হাজরারও হইলেন। নিত্যস্থ দয়াপরবশ হইয়াই হাবলি-মিটা-পণ্টু-বিশ্ব-পোকনের পিতা ছা-পোষা হাজরা মহাশয় অচেতন রাধাবল্লভকে আনিয়া নিজের বাহিরের ঘরটাতে স্থান দিলেন। পাশে যে সজ-পাস-করা নবীন ভক্তারটি ছিলেন তাঁহাকেও ডাকিয়া আনিলেন। ভক্তারবাবু রাধাবল্লভকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, “এঁকে নড়ান উচিত নয়। নাড়া-চাড়া করলে মারা যেতে পারেন।” স্ততরাং রাধাবল্লভকে হাস-পাতালে পাঠাইবার উদীয়মান ইচ্ছাটি দমন করিয়া দয়ালু রামকিঙ্করবাবু বাড়ীতেই তাহার শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করিলেন। মনে দয়ার সঞ্চার হইলে পয়সা খরচ অনিবার্য। রামকিঙ্করবাবুকে গাঁটের পয়সা ব্যয় করিয়া ভক্তার ছোকরাটির নির্দেশে অহুয়ায়ী একটি ‘আইস্ ব্যাগ’ খরিদ করিতে হইল। যদিও হাজরা মহাশয়ের মনে দয়ার সঞ্চার হইয়াছিল তথাপি তিনি মনে মনে কহিলেন, “গেরো আয় কি!”

পাচ

দুই দিন পরে অচেতন রাধাবল্লভ চক্ষু খুলিল। চক্ষু খুলিয়া দেখে, দাঁড়াইয়া আছে পুঁটি নয়, হাবলি। সে চক্ষু মুদিল। একটু পরে আবার খুলিয়া দেখে, পুঁটি নয়, হাবলি। ফলের রস করিয়া দিল হাবলি। ঔষধ খাওয়াইল হাবলি। পুঁটি কই? রামকিঙ্করবাবু আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “আজ কেমন আছে?”

“আজ একটু ভাল।” কি স্বন্দর স্বর হাবলির! মাথার শিয়রে বসিয়া হাওয়া করে হাবলি। বিদ্যান, কাপড়-চোপড় ঠিক করিয়া দেয় হাবলি। মাথায় গায়ে হাত বুলাইয়া দেয় হাবলি। সব হাবলি। আরও তিনদিন কাটিল। পুঁটি নাই। খালি হাবলি।

আবার থডম দেখা দিল। এবার ছদ্ম বেশে নয়, স্বরূপে। রামকিঙ্কর হাজরার হস্তে।

“বনফুল”

এই সংখ্যা শনিবারের চিঠির ২৩২ পৃষ্ঠার তিনটি Paradise-এর নাম আছে। উহা চাড়া আরও একটি আছে তাহার নাম Foul Paradise. এইখানে পুর্নোন্নিষিত তিন প্রকার লোকেরাই যাতায়াত করিয়া থাকেন।

প্রাপ্ত চিঠি

শ্রীযুক্ত শনিবারের চিঠির সম্পাদক মহাশয়,

গত পূর্ব মাসের শনিবারের চিঠিতে তপতীর, লীলা-দি'র ও আমার এক সঙ্গে লেখা যে-চিঠিখানি ছাপানো হইয়াছে, তাহাতে কতকগুলি কথা তপতী ও লীলা-দি' মেজরিটির জোরে বাদ দিয়াছেন। আপনাদের নিকট এমন অদ্বহীন চিঠি পাঠানোয় আমার মত ছিল না। তাই তাহাতে স্বাক্ষর করি নাই। চিঠির নীচে লেখা আমার নামটি একটু মন দিয়া দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারিতেন। উক্ত চিঠিতে যে-কথাগুলি বাদ পড়িয়াছে তাহা সংক্ষেপে এই :

যদিও আমরা তিনজনেই পাশাপাশি বাড়িতে থাকি, কিন্তু বাড়ি মাত্র দুইটি। লীলা-দি'র সঙ্গে আমার ছেলেবেলাকার ভাব। আমরা দুজনে এক সঙ্গে এক স্থলে লেখাপড়া করিয়াছি এবং স্থলে গিয়াছি এক 'বাসে'। অবশ্য ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই, কারণ আমরা প্রায় পাশাপাশি বাড়িতে থাকি। কিন্তু পরমাশ্চর্য্যের বিষয় এই যে লীলা-দি'ই যে শনিবারের চিঠির লীলাবতী তাহা একটুও বুঝিতে পারি নাই। বৃষ্টিবামাত্র বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "আ মুখপুড়ি! তুই আবার এমন লিখতে শিখলি কেবে থেকে লো?" চুল ধরিয়া টানাটানির স্বরূপাত সেই থেকেই। কি করিয়া বুঝিতে পারিলাম সে এক ভারী মজা এবং সে-মজা যে প্রকাশ করিব না, তাহা আগের চিঠিতেই জানাইয়াছি।

বড়ই আনন্দে আমাদের দিন কাটিতেছে। তপতী ও লীলা-দি'র

আনন্দের কারণ পারস্পরিক, আমি একটু সরিয়া থাকিয়া দুজনের গলায়-গলায় ভাব দেখিয়া আনন্দ করিতেছি।

আরও একটি কথা। আমাদের মধ্যে যাহার চুল সাড়ে তিন ফুট, তাহার চুল আগে আরও কয়েক ইঞ্চি বড় ছিল এবং সম্প্রতি লীলা-দি'র বাক্সে একঝোড়া খুঁটা গৌণ পাওয়া গিয়াছে। নমস্কার জানিবেন। ইতি

(মিস্) শ্রামলীয়া চাটুয্যে

প্রেম ও প্রেমাস্কুর

প্রেমোলজিষ্ট প্রেমাস্কুর কহিল, "এ মাসের মধ্যেই আশা করি থিসিস্টা শেষ করে ফেলতে পারবো।"

প্রেমাস্কুর গবেষণা করিতেছিল প্রেম সম্বন্ধে। প্রেমাস্কুর ডবল এম্—এ—ইংরেজীতে ও দর্শনশাস্ত্রে। একমাত্র সন্তান সে তাহার ধনী পিতার—বেকার সমস্তা বলিয়া যে বিষয় সমস্তা একটা আছে, তাহা প্রেমাস্কুর উপলব্ধি করিতে পারে নাই, কেন না—

"চির স্থবীজন ভ্রমে কি কখন..." ইত্যাদি।

দ্বিতীয়বার এম্—এ পাস করার পর প্রেমাস্কুর ঠিক করিল, কোনো একটা বিষয়ে গবেষণা করিতে হইবে। এই কোনো একটা বিষয় "প্রেম" হইল কেন তাহার বিশেষ কারণ এই যে তাহার মায়ের ইচ্ছা এইবার সে বিবাহ করিয়া দত্তর মতো সংসারী হয়। প্রেমাস্কুরের মত এই যে বাস্তবিক প্রেমে না পড়িলে বিবাহ করা উচিত নয়—প্রেমহীন

বিবাহ? ও, সে কথা ভাবাই যায় না। মা বলিয়াছিলেন, “তা বাছা প্রেমে পড়তে কেউ তো তোমায মানা করছে না!”

উত্তরে প্রেমাস্কুর বলিয়াছিল, “তা করছে না বটে। কিন্তু মা, যে জিনিষটায় পড়বো সে জিনিষটা আগে study করে নেওয়া দরকার। Look before you leap—এ কথাটা ইচ্ছলে হয়তো পড়েছো। আমি প্রেম সঙ্ক্ষে বেশ একটু আগে study করতে চাই—philosophical and scientific study; তারপর তোমার যা বলতে হয় বোলো।”

ছেলের ঠাডি করার ঝোঁক যে ভয়ানক রকম উগ্র, তা তাহা জানিতেন বলিয়াই তিনি আর কিছু বলেন নাই। অবশ্য মনে মনে বলিয়াছেন, “অর্থায় সাতার না শিখে কিছুতেই জলে নামবে না।”

তা ছাড়া এম-এ-তে শেলির কাব্য পড়ার সময় প্রেম সঙ্ক্ষে শেলি ও প্লেটোর মতের তুলনামূলক সমালোচনা তাহাকে পড়িতে হইয়াছিল বহু।

কাজেই প্রেম সঙ্ক্ষে গবেষণা করিবার ইচ্ছা—বিশেষত প্রেমাস্কুরের পক্ষে স্বাভাবিক, অন্তত ইহাতে বিশ্বয়ে অবাক হইবার কিছু নাই। এবং আমরা যে তাহাকে প্রেমোলজিষ্ট কেন বলি তাহাও বোধ হয় বুঝাইয়া দিবার দরকার নাই। এক বছর ধরিয়া প্রেমাস্কুরের প্রেমোলজির গবেষণা চলিয়াছে এবং এক বছর ধরিয়া আমরা তাকে প্রেমোলজিষ্ট নামে অভিহিত করিয়া আসিতেছি। এইটুকুই গোড়ার কথা সংক্ষেপে।

যাহা বলিতেছিলাম। প্রেমাস্কুর কহিল, “এ মাসের মধ্যেই আশা করি থিসিসটা শেষ করে ফেলতে পারবো।”

চুকট্টা মুখ হইতে নামাইয়া বারিধি কহিল, “তা বেশ।” বলিয়াই আবার চুকটটি মুখে দিয়া চেয়ারে হেলান দিয়া সে দেয়ালের দিকে

তাকাইয়া রহিল। যেন এই “তা বেশ”—টুকু বলা মারাত্মক রকম দরকার ছিল।

দার্শনিক নীরদ কহিল, “বের্গসের এল। ভিতাল্ সঙ্ক্ষে আপনি যে আলোচনা করেছেন প্রেমাস্কুরবাবু, সেটা আমার বাস্তবিকই ভারী ভালো লেগেছে। বের্গসকে আপনি চমৎকার ধরতে পেরেছেন। ঊর মিটিসিজ মটুকু আপনি বেশ মিটি করেই পরিষ্কার করেছেন। আর শপেনহয়ার সঙ্ক্ষে যা বলেছেন, ওটাও একবারে ঠাট্টা কথা। ঐ সঙ্গে আমার মনে হয় অয়কেনের থিওরির একটু আলোচনা করলে—”

“ভালো হত। ই্যা, তা হত ঠিকই।” প্রেমাস্কুর কহিল, “কিন্তু অয়কেনের থিওরির আলোচনা আরো পরে করবো। এখন পর্য্যন্ত আমি দেখাতে চেষ্টা করেছি প্রেমের সঙ্গে বের্গসের এল। ভিতাল্-এর সঙ্ঘট্টা কি।”

নীরদ কহিল, “ওঃ।”

আমি কহিলাম, “প্রেমাস্কুর ভাই, এসব শক্ত ব্যাপার আমাদের মত সাধারণ লোকের মাথায় ঢুকবে না। তুমি যে তব এডলিন সাধনা করে লাভ করলে তা বরং একটু সোজা করে আমাদের বুঝিয়ে দাও।”

প্রেমাস্কুর কহিল, “আচ্ছা। প্রেম সঙ্ক্ষে নীটশে যা বলেছেন তা শুনলে তোমরা চমকে উঠতে পারো। বের্গস আর অয়কেনের ফিলজফি থেকে যা পেয়েছি তা তোমরা হয়তো বুঝবে না। প্লেটোর থিওরি বুঝতে হলে যে দৈর্ঘ্য দরকার তা তোমাদের আছে বলে মনে হয় না। রাশিয়ার প্রফেসর পেট্রোপাভলভস্কি এ বিষয়ে কিছু বলতে চান কিনা, এবং চাইলে কি বলতে চান সেটা আমি এখনো ঠিক জানতে পারিনি। আর—”

বারিধি মুখ হইতে চুরুট নামাইয়া কহিল, “এসব তাহলে দরকার নেই।”

আমি কহিলাম, “আমাদের সোজা কথায় যা পারো বলো।”

প্রেমাস্থুর বলিতে লাগিল, “প্রথমেই তাহলে একটা ডেফিনিশন দরকার। কিন্তু প্রেম জিনিষটা অত্যন্ত জটিল, এত জটিল যে এর কোনো সোজা ডেফিনিশন দেওয়া আমার অসমর্থ। আমার নিজের সম্বন্ধে অল্প কোনো সম্ভায় যখন হারিয়ে ফেলতে চাই সেই আকাঙ্ক্ষাই প্রেম। অর্থাৎ আমার নিজের অপূর্ণতাটুকু যখন—না থাকে, ক্রমশ জটিল হয়ে যাচ্ছে। এ বিষয়ে শেলি ভারী চমৎকার লিখেছেন—কিন্তু তাও জটিল। সুতরাং তা থাকে। কি বলো?”

বারিধি বলিল, “থাকুক।”

প্রেমাস্থুর বলিল, “প্রেমের সঙ্গে ইকনমিক্সের অতি নিকট সম্বন্ধ। ইকনমিস্টরা অবশ্য এখানে প্রেমকে ইম্পট্যান্স দেবু নি—আশা করি আমার খিসিস পড়লে পর তাঁরা তাঁদের গ্রন্থে ‘প্রেম’ বিষয়ে আলদা চ্যাপটার লিখবেন।

“প্রথমেই দেখ, সোনা জিনিষটা অর্থনৈতিক জগতে অত্যন্ত দরকারী। আবার এই সোনার সঙ্গে প্রেমের সম্বন্ধ অতি নিকট। সোনা জিনিষটাকে এক হিসেবে প্রেম ও ইকনমিক্সের connecting link বা হাইফেন বলতে পারো।

“পুরুষ নারীর প্রেমে পড়ে বলেই তাকে হৃদয় করে সাজাতে চায় অলঙ্কারে। এজন্যই জুয়েলারীর দোকানগুলো চলে। জুয়েলারীর ব্যবসা করে যারা বড়লোক হয়েছে—they should thank Love for it—নয় কি? কারণ প্রেম আছে বলেই সোনার অলঙ্কারের চাহিদা আছে। অবশ্য বলতে পারো নকল সোনা দিয়েও তো

পুরুষ সাজাতে পারে তার হৃদয়-সিংহাসনের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে। কিন্তু তাহলে প্রেমও তেমনি নকল প্রেম হয়।

“আমাদের প্রেমিক কবি চণ্ডীদাস প্রেম ও সোনার এই যে নিকট সম্বন্ধ—এটা ভালো রকম জানতেন বলেই প্রেমকে সোনার সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন—

‘রজকিনী প্রেম

নিকষিত হেম

কামগন্ধ নাহি তায়।’.....”

দার্শনিক নীরদ কহিল, “হেগেল আর কীতে কিন্তু—”

বারিধি কহিল, “হেগেল আর কীতেকে আমাদের কোনো দরকার নেই।”

প্রেমাস্থুর কহিল, “কি বলছিলুম?”

আমি বলিলাম, “রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম—”

প্রেমাস্থুর বলিল, “মনে পড়েছে। তারপর শোনো। এই তো গেল সোনা ও প্রেমের সম্বন্ধ। অবশ্য এটা খুব সংক্ষেপে বললাম। আমার খিসিসে এ জিনিষটা নিয়ে আলোচনা করেছি পাঁচ পাতা। শুধু সোনার সঙ্গেই যে প্রেমের সম্বন্ধ তা নয়। আচ্ছা, কাগজের মিলগুলো কি করে চলে বলো তো?”

বারিধি কহিল, “খুব সম্ভব ইলেকট্রিক পাওয়ারে।”

“নাঃ, তোমরা সোজা জিনিষও বুঝতে পারো না।” প্রেমাস্থুর বলিল, “শোনো। কাগজের মিলগুলো অনেকাংশে প্রেমের জোরে চলে। প্রেমে পড়ে বলেই লোকে সাপ্তাহিক বা মাসিক বের করে’ প্রেমিকার নামে কবিতা লেখে। তা ছাড়া প্রেমপত্র লেখে—আর প্রেমের intensity বা উগ্রতা যত বেশী থাকে, চিঠিও সেই অল্পপাতে লদা হয় এবং vice versa। প্রত্যেক দিন কত প্রেমের চিঠি লেখা হচ্ছে

তার আর—চলতি কথায় বলতে গেলে—লেখাজোথা নেই। প্রত্যেক হুণ্ডায় হাজার হাজার রীম্ কাগজ এই সব পত্রিকা আর প্রেমপত্রের জন্ম থরচ হচ্ছে। যত বেশী প্রেম তত বেশী কাগজ থরচ এবং vice versa। কিন্তু প্রেম জিনিষটা না থাকলে কি হ'ত সেটা একবার ভেবে দেখ।

“প্রসাধনের জিনিষপত্রের সঙ্গে প্রেমের কি সম্পর্ক সেটা না বললেও বুঝতে পারবে। যুদ্ধের সময় এ সব জিনিষ বেশী বিক্রী হয় না তার কারণ এই যে তখন লোক প্রেমের কথা ভুলে যায়—প্রেম করবার সময়ও পায় অল্প।”

নীরদ কহিল, “ফ্রয়েড কিঙ্ক—”

বারিধি মুখ হইতে ঝট করিয়া চুকটটা নামাইয়া ফেলিয়া কহিল, “ফ্রয়েডকে আমাদের কোনো দরকার নেই।”

প্রেমাস্থুর বলিতে লাগিল, “সিনেমা-শিল্পের মেরুদণ্ডই হচ্ছে প্রেম। এমন একখানা ফিল্মের নাম করো যাতে প্রেম নেই। প্রেম না থাকলে ফিল্ম চলে না এ কথা প্রত্যেক ডিরেক্টর জানেন। ছনিয়ার বেশীর ভাগ লোকই প্রেমিক, কাজেই প্রেমকে বাদ দিয়ে ছবি তুললে ছনিয়ার বেশীর ভাগ লোকই সে ছবি বয়কট করবে এ একেবারে জানা কথা।

“প্রশ্ন করতে পারো প্রেমের ছবি দেখবার এত আগ্রহ কেন লোকের। তার জবাব দিচ্ছি।

“শতকরা নিরেন্দ্রই জন সিনেমামোদীই তরুণ ও তরুণী। এবং তরুণ বয়সেই প্রেম জিনিষটার প্রাবল্য বেশী তা তো সবাই জানে। এদের এবারে সাইকো-অ্যানালিসিস করা যাক।

“প্রথমে ধরো এক তরুণ ছোকরাকে—মনে করা যাক তার নাম বঙ্কেশ্বর ওরফে বকু। সাড়ে চার আনার একটা নীটে বসে বিড়ি

ফুকছে। ‘মরুতে প্রেম’ দেখতে এসেছে সে। এ ফিল্মে আছেন চিত্রজগতের বিখ্যাত প্রেমিক-প্রেমিকা চিরঞ্জীব চাট্টাঙ্গী ও সাগরিকা দেবী। বকু পয়সার অভাবে খেতে পায় না ভালো করে, কিন্তু এই দুজনের নামের আকর্ষণ সে এড়াতে পারেনি। খেটেখুটে হয়তো পেয়েছিলো আনা ছয় কি সাত, তাই থেকে অধিকাংশই সে থরচ করেছে ‘মরুতে প্রেম’ দেখবে বলে। দেখতে দেখতে বকু নিজেকে ভুলে যায়। নায়কের সঙ্গে সে নিজেকে এক করে ফেলে। ইংরেজীতে বলতে গেলে he steps into the hero's shoes. যতক্ষণ ছবি শেষ না হয় ততক্ষণ অবস্থান করে সে প্রেমের রাজ্যে—সে ভুলে যায় সে বঙ্কেশ্বর। বাস্তব জীবনে সে যা পায় না, কল্পনায় থানিকটা সময়ের জগত ও অন্তত তাই পাবে বলে সে আসে সিনেমায়। কল্পনা ও বাস্তবের যে চিরন্তন দ্বন্দ্ব আছে—”

নীরদ কহিল, “এ সম্বন্ধে দার্শনিক ফিক্টে—”

বারিধি অসহিষ্ণু হইয়া বলিয়া উঠিল, “তাকে আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই।”

প্রেমাস্থুর বলিতে লাগিল, “সেই দ্বন্দ্বটুকুই হচ্ছে সিনেমামোদীপী অট্টালিকার একটা প্রধান স্তম্ভ। বুঝলে তো ব্যাপারটা?”

আমি বলিলাম, “কিন্তু বাস্তব জগতে কি প্রেম নেই? বঙ্কেশ্বরের বাস্তবজীবনেও হয়তো প্রেমের—”

“ঐ পয়েন্টেই আমি আসছিলাম। শোনো। আমাদের বঙ্কেশ্বর হয় বিবাহিত, না হয় অবিবাহিত—দুটোর মধ্যে একটা হবে। ধরা যাক সে বিবাহিত। তাদের বিবাহিত জীবনে প্রেম থাকতে পারে, কিন্তু সেটা তত dramatic নয়। তাতে উচ্ছ্বাসের প্রাবল্য নেই, আভ্যন্তরীণ নেই। তাছাড়া বঙ্কেশ্বরকে দেখলে যদিও সেই বিখ্যাত

লন্ডাহনকারী বীরের কথা মনে পড়ে, তবুও তার সৌন্দর্য্যজ্ঞান এবং সৌন্দর্য্য-পিপাসা আছে। বকুর স্ত্রী বকুর এই তৃষ্ণা মিটাতে পারে না—বেগ বেগে যেমন পিপাসা যায় না। বাস্তবে তার যা লাভ করবার আশা নেই সেই জিনিষ ঘণ্টা কয়েকের জন্যে কল্পনায় পাবার আশাতে সে পয়সা খরচ করে ছবির পর্দার বৃকে প্রেমের লীলা দেখতে আসে।

“আর, ধরো আমাদের বকু অবিবাহিত।—”

আমি বলিলাম, “এতো অতি সোজা কথা। এ আর বলতে হবে না। বকুর সাইকো-অ্যানালিসিসটা এবারে বেশ বুঝে গেছি।”

প্রেমাকুর খুশী হইয়া কহিল, “বেশ বেশ! এই রকম বুঝিয়ে জোতাঁই তো চাই।

“তরুণী সিনেমামোদী—”

নীরদ কহিল, “সিনেমামোদিনী।”

“বিশেষত কলেজের ছাত্রীদের এভাবে যদি সাইকো-অ্যানালিসিস করা যায় তাহলেও অনেকটা এই রকম ফলই পাওয়া যায়। এঁদের সম্বন্ধে আমি বিশেষ করে কিছু বলতে চাই না—আমার খিসিসেও এঁদের সম্বন্ধে আলোচনা খুব সংক্ষেপে সেরেছি।

“তারপর ধরো বুড়ো-বুড়ীদের কথা। প্রেমের ছবি তাঁদের আকর্ষণ করে, তার কারণ তাঁরা বানিকটা সময় কল্পনায় তাঁদের চিরকালের জন্ম হারানো ঘোবনে ফিরে যেতে চান। অতীতের মধুর স্মৃতিগুলো তাঁদের মনকে আকুল করে কিনা। দেহ বান্ধক্য লাভ করলেও মনটা অতীতকে ভুলে যেতে পারে না—অনেক পরিমাণে তরুণ থেকে যায় সে।

“প্রেমকে যে চিরন্তন বলা হয়েছে—”

নীরদ বলিল, “এ সম্বন্ধে ফ্রেড এবং—” কিন্তু বারিধির বাধায় আর অগ্রসর হইতে পারিল না।

প্রেমাকুর বলিল, “না, বড় বৈশি details এ চলে যাচ্ছি, তোমাদের হয়তো এত detail ভালো নাও লাগতে পারে।”

আমি বলিলাম, “বেশ লাগছে।”

বারিধিও বলিল, “হ্যাঁ, বেশ লাগছে।”

প্রেমাকুর বলিতে লাগিল, “এবারে প্রেম ও সাহিত্য নিয়ে পড়া যাক। সাহিত্যে প্রেম সম্বন্ধে আমার খিসিসে বেশ ভালো রকম ধারা-বাহিক ঐতিহাসিক আলোচনা করেছে—সেটা আমার খিসিসটা প্রকাশিত হলে পড়ে দেখো। আমি আধুনিক সাহিত্যের সম্বন্ধে প্রেমের সম্বন্ধ নিয়ে তোমাদের কিছু বলবো।

“নতুন যারা লিখতে শুরু করে তারা বেশীর ভাগই লেখে প্রেমের কবিতা ও প্রেমের গল্প। তার একটা কারণ এই যে প্রেমের কবিতা ও প্রেমের গল্প লেখাই সবচেয়ে সোজা। আবার প্রেমের কবিতা লেখা প্রেমের গল্প লেখার চাইতেও সোজা, কেননা গল্পে অন্তত একটা প্লট ভেবে বার করা চাই—কবিতায় তারও দরকার নেই।

“তরুণ প্রেম-কাব্য ও প্রেম-গল্প লিখিয়েদের সাইকো-অ্যানালিসিস করলে দেখা যাবে যে এদের লেখার প্রেরণা ও উদ্দেশ্য এবং তরুণ সিনেমামোদীর সিনেমা দেখার প্রেরণা ও উদ্দেশ্য প্রায় একই। অর্থাৎ বাস্তবে যা অসম্ভব, কল্পনায় তাকে সম্ভব করা—বাস্তবে যে চাঁদ হাতের নাগালের চের উচুতে, কল্পনায় সে চাঁদকে হাতের মুঠোয় ধরা।

“যাদের প্রেমের গল্প বা কবিতা বত বেশী intense তাদের বাস্তব জীবনে এ জিনিষটার দৈর্ঘ্য তত বেশী এবং vice versa। আমার এই

খিওরির ওপর ভর করে একটা algebraic formulaতে পৌছেছি, যে ক্ষমতামূল্য দিয়ে লেখকের বাস্তব জীবন সফলকে আঁচ করা যায় তার কাব্য বা কথা-সাহিত্য থেকে।”

নীরদ বলিল, “কিন্তু—”

প্রেমাকুর তাহাকে অগ্রসর হইতে না দিয়া বলিল, “আপনি হয়তো আমার এ খিওরির যুক্তিযুক্ততা সফলকে কোনো প্রতিবাদ তুলতে চান, নীরদবাবু। কিন্তু সেটা এখন নয়। আমি এখন আপনাদের সঙ্গে তর্ক করতে বসিনি। আমার খিসিস্-এর কতকগুলো পয়েন্ট শুধু আপনাদের বলছি সফলকে। আমার খিসিস্টা বেরিয়ে গেলে সেটা পড়ার পর যদি তার প্রতিবাদ করতে চান তো আপনি একটা পাল্টা খিসিস্ লিখবেন।

“হ্যাঁ, যা বলছিলাম। একজুই আমি আজকালকার কচি লেখকদের প্রেমকাব্য ও গল্প পড়ে’ অনেক সময়ে কঁদে কেলি তাদের বাস্তব জীবনের দৈন্যের কথা ভেবে। আমার মনে হয় এদের লেখা প্রত্যেকটি প্রেমের কবিতা ও গল্প, এদের ব্যক্তিগত বেদনার—এবং হতাশারও বোধ হয়—পরোক্ষ অভিযুক্তি।

“আর একটা কথা। প্রেমের গল্প লেখা আমার মতে, ক্ষমতার অভাবের পরিচায়ক। প্রেমের গল্প লেখা মানেই সন্তায় পপুলার হওয়ার মতলব এবং—”

বারিধির মাসতুতো ভাই আধুনিক যুগের অস্বস্তি প্রেমের গল্প লিখিয়ে। কাজেই বারিধি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, বলিল, “এ সব ভাই তোমার খামখেয়ালী ছাড়া আর কিছু নয়। এ রকম উদ্ভট মত প্রকাশ করা আমাদের নিজেদের মধ্যে চলতে পারে, কিন্তু একটা খিসিস্-এ এ রকম যা-তা বলা নিরাপদ নয়—বিশেষত এ

খিসিস্ যখন অনেকেই পড়বে। প্রেম-সাহিত্যের রসগ্রহণ তুমি করতে পারো না সেটা প্রেম-সাহিত্যের দোষ নয়—তোমার দোষ। ঐ যে নীহালিকা খাতালু কি না বলেছিল?” বলিয়া বারিধি আমার মুখের পানে তাকাইল। আমি বলিলাম, “অলখিকৈথু লখথা নিবেদনং থিলখি মা লিখ মা লিখ মা লিখ।”

প্রেমাকুর মুখ হাসিয়া বলিল, “বারিধি আমার মনের কথাটা ঠিক ধরতে পারেন। বাস্তবিক প্রেম জিনিষটাকে আমি ঠাট্টা বা satirise করতে মোটেই চাই না, এবং প্রেম নামক জিনিষটাকে নিয়েই বহু সাহিত্যিক সাহিত্যের ভাণ্ডারে বহু মূল্যবান রত্ন দিয়ে গেছেন তাও মানি। কিন্তু সে সব মনোমীড়দের চিন্তাশক্তি ব’লে একটা জিনিষ ছিল, ভাবার ও ভাবের সংঘম ছিল, হৃদয় অন্তর্দৃষ্টি ছিল। কিন্তু আজ-কালকার……পাকু, তুমি হয়তো অনর্থক রেগে গিয়ে অনর্থ ঘটাবে। কিন্তু আমি একটু বলবো যে প্রেম বেচারাকে নিয়ে চূড়ান্ত করা গেছে। শুকে অন্তত কিছু কালের জুজু বিশ্রাম দেওয়া হোক, বেচারী একটু হাফ ছেড়ে বাঁচুক। সাহিত্যের সঙ্গে প্রেমের বন্ধন এমন অচ্ছেদ্য নয় যে অজু কিছু নিয়ে সাহিত্য হতে পারে না। আমাদের নতুন যুগের কি নতুন কোনো বাণী নেই যা থেকে নতুন সাহিত্য গড়ে উঠতে পারে?”

নীরদ উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিল, “ঠিক বলেছেন প্রেমাকুরবাবু। স্পিনোজার একটা কথা—”

বারিধি কহিল, “আমাদের বোধগম্য হবে কি না সন্দেহ।”

প্রেমাকুর বলিতে লাগিল, “আমি cynic নই। প্রেমের মত মহান জিনিষ জগতে কমই আছে তা মানি। প্রেমকে ভক্তি করি, শ্রদ্ধা করি। কিন্তু এই জিনিষটিকে আমার বাস্তবিক চিনি ক’জনে?

শাঁস ফেলে দিয়ে শোশা নিয়ে আমরা মেতে যাই এই তো হুথ। স্বাচ্ছন্দ্য-প্রিয়তা ইত্যাদি প্রেম নয়—ছাকাশী বা ছাবলামী। যে তথাকথিত প্রেম তরুণকে প্রায় তরুণী করে ফেলে, গণ্ডা গণ্ডা অর্থহীন কবিতা (অথবা যারা ছন্দ এবং মিল এই ছুটায় তত ওস্তাদ নয়, তাদের গণ্ডা উজ্জ্বল) লেখায়, তাকেই অনেকে প্রেম বলে মনে করেন—এ কি কম ট্রাজেডি?”

“মহাশূন্যের বিকাশ যে প্রেমে সেই তো সত্যিকারের প্রেম।”

আমি বলিলাম, “আমার মনে হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ যেন এই আইডিয়াটাই একটা কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। কিন্তু কবিতাটা মনে আসছে না।”

বারিধি চুরুটের ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল, “না আসাই ভালো।”

প্রেমাস্কুর বলিতে লাগিল, “প্রেম-পাখীর ছুটি ডানা—মিলন ও বিরহ। মিলনে বিরহের কল্পনা মিশে থাকে বলেই তার যেটুকু মাধুর্য, বিরহের অশ্রুতে ব্যাধার সঙ্গে স্বপ্ন আনন্দের যে রেশটুকু, তাও মিলনের কল্পনায়। দার্শনিকের চোখে দেখতে গেলে, মিলন ও বিরহকে আমরা যতটা আলাদা বলে ভাবি তারা বাস্তবিক তত আলাদা নয়। রবীন্দ্র-বাবুর অসীম যেমন সীমার মাঝে আপন স্বর বাজায় তেমনি—”

“আমরা তোমার এসব তত্ত্ব-কথার মানে বুঝতে না পেরে হাঁ করে চেয়ে থাকি।” বারিধি বলিল।

“এতে না বোঝবার কি আছে?” প্রেমাস্কুর বলিল, “জটিল এতে কি আছে বলুন তো নীরদবাবু!”

নীরদ বলিল, “এ তো অতি সোজা কথা। এ বিষয়ে শপে নুহয়ার বলেছেন—”

বারিধি বলিল, “তোমার কাছে বলতে পারেন—আমাদের কাছে কিছু বলেননি।”

নীরদ চটিয়া বিদায় লইবার উপক্রম করিতেছিল। আমি অনেক বুঝাইয়া তাহাকে ঠাণ্ডা করিলাম।

নীরদ উত্তেজিত ভাবে বলিল, “দেখ, বিরহ-মিলন, সীমা-অসীম, এদের আমরা যে-রকম পরস্পর-বিরোধী মনে করি, এরা তা নয়। চরমে—অর্থাৎ ultimately এরা এক—যে কোনো গঞ্জীকা-বিরোধী দার্শনিকই এক কথা বলবেন। সীমা আর অসীম—এক জিনিষেরই দুটো দিক মাত্র—two aspects of the same reality”.

আমি বলিলাম, “বুঝতে পারা এবং বুঝতে না পারাও তেমনি দুটো আলাদা জিনিষ নয়। এরাও একই জিনিষের দুটো দিক মাত্র। স্বতরাং বারিধি যে এ সব তথ্য বুঝতে পারে না তাতে তোমার রাগ করার কারণ নেই; কারণ তার এই বুঝতে না পারা—দার্শনিক ভাবে দেখতে গেলে—বুঝতে পারারই রকমফের মাত্র।”

বারিধি এইবার এমন বিশ্রী রকম হোঁ হোঁ করিয়া হাসিয়া উঠিল যে নীরদকে আর কিছুতেই থামাইয়া রাখা গেল না। বারিধিকে অস্পষ্ট ভাবে কি যেন বলিয়া প্রায় ঝড়ের মত বাহির হইয়া গেল। ইহার পর আলোচনা আর জমিল না।

প্রেমাস্কুর বলিল, “এবার ঠুকে ঠাণ্ডা কর গে যাও। তোমাদের তো ঐ ধোঁয়া। গভীর বিষয়ে প্রবেশ করতে পার না, চেষ্টাও করে না। শুধু হাসতে জানো অকারণে।”

চলিলাম নীরদকে ঠাণ্ডা করিতে।

—

জন্ম-সংশোধন: এই গল্পের আরম্ভে সপ্তম লাইনে একটি কবিতার ছত্র উদ্ধৃত হইয়াছে। উহার “হৃদয়জন” জাপানি ভুলে “হৃদয়জন” হইয়াছে। হৃদয়জন মার্জনা করিবেন, কেননা হৃদয়জন যে হৃদয়জন ইহা সঙ্গজনবিধিত।—
শ. চি. য.

চলচ্চিত্র

ছই মেরু



বাঙালী ছাত্রীর ভূমণ্ডলে নাতিশীতোষ্ণ বা গ্রীষ্মমণ্ডল নাই।

“জীবনের হিসাব”



“তিরিশী লক্ষ ঘোণীর কুণ্ডীপাকে আমাদের যাওয়া আসা। কিন্তু
আমরা লাজ ভুলে দেখি না যে এই জন্মপরম্পরায়
আদি জন্মটা হ’ল কোন কর্মের ফলে।”

(—বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, “ধামধেলালী”)

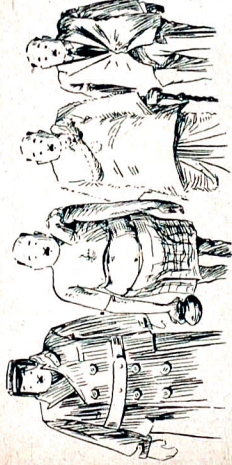
ভোট ভবিষ্যৎ



ভোট গ্রহণ প্রথার পরিবর্তে পদপ্রার্থীগণ ময়দানে রেষা দিবে। ইহাতে মনোনিবেশ
সহজে হইবে—টিকিট কিনিয়া দর্শকগণও ঘোড়দৌড়ের আনন্দ
উপভোগ করিবেন।

শনিবারের চিঠি

চার অধ্যায়



চারিজন ইয়ার নাই—একই ব্যক্তি পোষাকের আবাসিক বৈচিত্র্যে
চারি ভাগে বিভক্ত।

শনিবারের চিঠি

নারী ?

গত বৈশাখ মাসের “নারী” শীর্ষক ডায়েরিখানা সংগ্রহ করিবার পর অস্থমান করিয়াছিলাম যে উহার পরবর্তী অংশও হস্তগত হইবে। অস্থমান ঠিকই হইয়াছিল—এইমাত্র উহা হস্তগত হইয়াছে। “নারী” লেখা হইয়াছিল ১৩৩৭-৪১ সালে, এবং “নারী ?” লেখা হইয়াছে ১৩৪৩ সালে। ছয় হইতে দুই বৎসরের ব্যবধান। কিন্তু উক্ত “নারী” বা “নারী ?”র সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক না থাকিলেও, আমার বন্ধুর সম্পর্শে আসিয়া আমি স্বয়ং যে তত্ত্বটিকে জীবনে মানিয়া লইয়াছি নূতন করিয়া তাহারই একটা সমর্থন পাইয়া বড় আরাম বোধ করিতেছি। আমার তত্ত্বটি এই যে আমাদের জীবনটাই একটি প্রশ্ন ; এ প্রশ্নের উত্তর কোথায়ও নাই, থাকিবার দরকারও বোধ করি নাই। তাই আমরা মনে করি প্রশ্নটাই আমাদের সর্বস্ব, স্বতরাং ইহাকেই আমরা প্রাণপণে জীবন্ত রাখিতে চেষ্টা করি, কেননা প্রশ্নের বেথানে শেষ, চূর্ণ ভ মানবজীবনেরও সেখানে ইতি। কিন্তু এ সম্বন্ধে এত কথা বলিবার আছে যে ডায়েরিটাকে বাদ দিয়া আমার কথাই বলিতে হয়—কিন্তু তাহা করিব না। ডায়েরিটাই আরম্ভ করিতেছি, কিন্তু তৎপূর্বে বন্ধুর নিকট হইতে কি প্রকারে আমার সমর্থন পাইলাম তাহা বলি। নারীর সম্বন্ধে করিয়া পুঙ্খ কতখানি লাভবান হই ইহাই ছিল “নারী” নামক রচনার প্রশ্ন। এবারে “নারী ?” হেডিংটাই প্রশ্ন রূপে দেখা দিয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি, প্রশ্নই আমাদের জীবন, ইহাকে এড়ানো যায় না। ইতি

ডায়েরি সংগ্রাহক।

নিবারণের চিঠি

২২১

১লা বৈশাখ, ১৩৪৩—

মাটির রূপ কখনও এক রকম থাকে না, এ কথা ছয় বছর আগে লিখেছিলাম। আরও লিখেছিলাম, আমাদের জীবনের উপর দিয়ে এক এক সময় বর্ষার বানের মত বান বয়ে যায়, এবং তখন, মাটি যেমন উর্ধ্বরতা শক্তি লাভ করে আমরাও তেমনি সম্বুদ্ধিলাভ করি। এখন এই বানের কথা লিখেছিলাম তখন জীবন সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা ছিল না। মনে হয়েছিল বন্ধুর জলে শুধু পলিমাটিই পড়ে, মনে হয়নি যে তাতে অনেক কিছু ভাসিয়েও নিয়ে যায়।

গোড়াতেই বলে রাখি, যে-ডায়েরিটা আমার বন্ধুর নামে চালিয়েছিলাম তার নামক আমার বন্ধু নয় আমি স্বয়ং। আমি নিজের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করছিলাম। খিওরি হিসাবে আমার যুক্তির প্রতিবাদ কেউ করেননি। আমি নারী-বন্ধু পেয়েছিলাম, কিন্তু জীবনের আদর্শ তাঁকে পেয়ে কিছুমাত্র নষ্ট হয়নি—কারণ তখনও আমার ধারণা ছিল সংসারে শেষ পর্যন্ত একা চলা ছাড়া গতি নেই। কিন্তু আজ আমার অনেকখানি পরিবর্তন হয়েছে। আজ আমি বুঝতে পারছি, একা চলার প্রবৃত্তি যৌবনের প্রবৃত্তি। কিন্তু যৌবন চিরকাল থাকে না; জরা আসে, এবং কোমরে এবং পায়ে বাত হয়, তখন একা চলা দূরে থাক—তিন চার জন লোক দরাদরি করেও সেই বাতগ্রস্ত বৃদ্ধকে এক পা এগিয়ে দিতে পারে না। কিন্তু সে কথা থাক। আমি বৃদ্ধ হইনি। মনে এবং সর্বাঙ্গে আমার যৌবনের ঝড়ো হাওয়া এখনও বয়ে চলেছে—এখনও আমি সম্মানী হয়ে পাহাড়ে অরণ্যে ঘুরে বেড়াতে পারি।—কিন্তু তা করব না। বিবেক জাগ্রত হয়েছে, সম্মানী হবার উপায় নেই। হায়, জীবনের বিনিময়ে শুধু অভিজ্ঞতাই লাভ হয়, কিন্তু সে অভিজ্ঞতা নিজের জীবনে প্রয়োগ করা যায় না, কেননা

আর সময় থাকে না। আমার অভিজ্ঞতা দিয়ে যে অপরকে সাহায্য করব সে উপায়ও নেই, কেননা অভিজ্ঞতা কেউ ধার নেয় না।

পুরুষের জীবনে নারীর আবির্ভাব উভয়ের জীবনেরই একটা অভাবনীয় ঘটনা। উভয়ে উভয়ের সংস্পর্শে আসবে অথচ এক হয়ে মিশে যাবে না, যার যার সত্তা এবং ব্যক্তিত্ব ঠিক থাকবে। একজন দেবে ভালবাসা আর একজন দেবে প্রেরণা—একজন দেবে আশ্রয় আর একজন দেবে আলো; এমনি ক’রে, চাঁদ যেমন পৃথিবীর আশ্রয়ে থেকেও স্বতন্ত্র; উভয়ের গতি ব্যক্তিগত ভাবে পৃথক অথচ মিলিত ভাবে এক; একজন কর্মী, সংসারের কক্ষে ক্রমাগত পাক খেয়ে ফিরছে—অপর জন কলায় কলায় আপনাকে সাজিয়ে তুলছে; যেদিন সে যোল কলায় পূর্ণ হয়ে ওঠে সেদিন পৃথিবীর বৃকে জোয়ার আসে—তার মন চকল হয়, কিন্তু সে চাকলা তাকে ভেঙে ফেলে না, তেমনি পুরুষ এবং নারীর সম্বন্ধ হবে মিলনের অথচ তাতে স্বাতন্ত্র্য আর ব্যক্তিত্ব থাকবে অটুট।

কিন্তু এর মধ্যে একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার আছে। পুরুষ এবং নারীর সম্বন্ধের ভিতর একটা বিশেষ সময় আসে যখন পুরুষ তাকে বিয়ে করবার জন্তে প্রায় উন্মাদ হয়ে ওঠে। সে সব-খিওরি ভুলে যায়—তখন, যে লোক আগে লিপেছিল—“অস্তরের জীবনে সহচরী হবার জন্ম কোনো নারীকে স্বীকৃতি আকাঙ্ক্ষা করা একান্ত ভুল মনে হয়, কেননা শেষ পর্যন্ত একা চলা ছাড়া গতি নাই।”—সেই লোকটি নারীকে ব’লে বসে—“ভূমি আমার স্ত্রী হও, আমার পুত্রের জননী হও, আমাকে বাঁচাও।” এইটাই হ’ল স্ত্রীপুরুষের মিলনের ক্রাইসিস। এ ক্রাইসিসে মৃত্যু প্রায় অনিবার্য। হাজারে একজনও বাঁচে কিনা সন্দেহ। আমিও মশায় মরেছি। অর্থাৎ বিয়ে করেছি।

আমি গাধা—এত বুঝেও, এত লিপেও ক্রাইসিস কাটিয়ে উঠতে পারলাম না। আমাকে মাটির উপর ধরে রাখবেন এই ধরণের একটা নারীর সঙ্গ চেয়েছিলাম—কিন্তু যাকে পেয়েছি তিনি সম্প্রতি আমাকেই উড়িয়ে নিয়ে চলেছেন। আমি নিজে উড়ছিলাম, বেশ ছিলাম, কত দূরই বা যেতাম, না হয় আর নাই ফিরতাম। কিন্তু এ যে পরের পাখায় ওড়া—এর চেয়ে পুরুষের পক্ষে অপমানকর আর কি আছে! আমিই এখন প্রাণপণে তাকে মাটিতে ধরে রাখতে চাই, কিন্তু আমি কে?

আমি শিউলি গাছের মত নবজন্ম লাভ করতে চেয়েছিলাম। লিপেছিলাম, “তিনি [অর্থাৎ আমি] শিউলি গাছের মত নতুন একটা রূপে জন্মান্তর লাভ করতে চান, যে বৃক্ষের ছায়া বেশি নয়, কিন্তু পুষ্পের সম্ভারে যে বনতলকে শোভাযিত করে এইটুকু হওয়াই তাঁর আকাঙ্ক্ষা।” কিন্তু এখন দেখছি যে-বৃক্ষ হয়ে জন্মেছি তাতে ছায়াই আমার স্ববধানি, অর্থাৎ আমার নিজের কোনো অস্তিত্বই নেই। ক্রমাগত দেনা বাড়িয়ে চলেছি—কোথায় এর শেষ কে জানে!

“রামকানাই”

কিছুদিন পূর্বে আপনারা শনিবারের চিঠিতে এক রামকানাইয়ের কথা লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিয়াছি। লেখক তাহাতে এই কথাই বলিতে চাহিয়াছেন যে আহাৰ না জুটিলে লোকে আজকাল কবিতা লিখিতে আরম্ভ করে। একথা সত্য যে আজকাল বাংলা দেশের কবি সংখ্যা হঠাৎ বহু করিয়া বাড়িয়া গিয়াছে এবং বাড়িতেছে। বাংলা আজ আর সে সোনার বাংলা নাই এবং বাংলায় বাঙালী থাইতে পায় না ইত্যাদি বাঙালীর বহু দুর্দশার কথা আজকাল নিত্য শুনিতেছি এবং খবরের কাগজে ও মাসিক পত্রিকায় পড়িতেছি। আমি প্রবাসী বাঙালী—বাংলা দেশের সহিত চাক্ষুষ পরিচয় অতি অল্প, কালে-ভাঙ্গে কলিকাতায় যাই, কিছুদিন থাকিয়া চলিয়া আসি—কলিকাতার বাহিরের রূপই চোখে পড়ে এবং তাহা দেখিয়া আর যাহা কিছু মনে হউক একথা কখনো মনে হয় না যে কলিকাতার অধিবাসীগণ অনাহারে থাকে। অবশ্য একথাও সত্য যে শুধু কলিকাতা শহর দেখিয়া সমগ্র বাংলার অবস্থা ধারণা করা অজ্ঞায় এবং ভুল। দেশের হাড়ির খবর, সাহিত্যের খবর, কবিগণের খবর ইত্যাদি আমি অপেক্ষা আপনারা অনেক অধিক জ্ঞাত আছেন, সেইজন্য ঐসব বিষয়ে আপনাদের কথাই মানিয়া থাকি,—আজ আপনাদের ‘বিবৃত রামকানাইয়ের কথা মানিয়া লইতে পারিলাম না বলিয়াই আমার এই প্রসঙ্গের অবতারণা।

লেখক তাহার রামকানাইকে এক রূপে দেখিয়াছেন, আমি আমার রামকানাইকে ভিন্ন রূপে দেখিয়াছি। ছই রামকানাই-ই মূলে এক

এবং রামকানাই is equal to কি, সেকথা বাহাদের বলিয়া দিতে হইবে তাহাদের জ্ঞান আমি লিখিতে বসি নাই। লেখক শুধু বাংলা নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের রামকানাইদের বেইজ্ঞান করিয়াছেন (অপমান লিখিলাম না, যেহেতু আমি প্রবাসী বাঙালী এবং সেই হেতু আমার নিকট গুণঘাটি বিশেষ জোরালো ঠেকিল না—অপমানিত রামকানাইয়ের তরফ হইতে আমি তীব্র প্রতিবাদ করিতে চাই কি না!) তিনি ভুল করিয়া কত বড় অজ্ঞায় করিয়াছেন তাহা দেখাইবার জ্ঞান আমি রামকানাইয়ের ইতিহাস বিবৃত করিতেছি, (সব রামকানাইয়েরই ইতিহাস প্রায় এক—বড় জোর উনিশ-বিশ ফারাক) পরে তো মানহানির মামলা দায়ের করিবই!

রামকানাই বেলুনবাজারের ‘টাকার কুমীর’ দাস্তবাবুর একমাত্র সন্তান—মাঝে মাঝে পাটনায় বেড়াইতে আসে। পয়লা নম্বরের ক্যাবলার মত তাহার চেহারা, সেইজন্য তাহার উপর নজর পড়ে; তাই মুন্সেরবাসী, পাটনা ল কলেজের ছাত্র, বন্ধু নীরজচন্দ্রের নিকট রামকানাইয়ের খবর লই। তাহার নিকট জানিতে পারি যে রামকানাই এখনও আধুনিক যুগের হাওয়া লাগাইতে পারে নাই, যেহেতু দাস্তবাবু অত্যন্ত কড়া লোক, পুত্রকে সিনেমা দেখিতে দেন না, প্রতি রবিবারে নিজে পাড়াইয়া থাকিয়া নাপিতকে দিয়া শ্রীমানের চুল ছাঁটান, প্রত্যহ নিজে তিন ঘণ্টা করিয়া পড়ান এবং আরো এইরূপ বহু অত্যাচার করিয়া থাকেন, এবং সেই হেতু এখনও রামকানাইয়ের চেহারায়া স্মার্টনেসের খোলতাই আসে নাই। কিন্তু এহেন কড়া পিতার তত্ত্বাবধানে থাকিয়াও রামকানাই বার বার তিন বার চেষ্টা করিয়াও ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষাব্যাপ্তি উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই—মাতৃভাষাই নাকি বরাবর বাদ সাধিয়াছিলেন।

কিছুদিন পূর্বে নীরজের সহিত পথে ঘাইতে ঘাইতে রামকানাইকে দেখিলাম, রামকানাই আর সে রামকানাই নাই। তাহার কেশদাম নাপিতপ্রবরের স্পর্শ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে এবং তাহা সযত্নে অবিজ্ঞত, চোখে সর্ষহার উদাস দৃষ্টি, পাণ্ডাবীর বোতামগুলি খোলা, চাদর পথরজ চুঘন করিতেছে—ছোকরা-কবিগণের বর্ণনার সহিত হুবহু চেহারা মিলিয়া গিয়াছে।

নীরজকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ব্যাপার কি? তিনি আর নূতন কি বলিবেন, যাহা ভাবিয়াছিলাম ঠিক তাই, রামকানাই আজকাল কবি হইয়াছে এবং এক মাসিক পত্রিকা বাহির করিয়া তাহার সম্পাদনা করিতেছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, একি ক'রে সম্ভব হ'ল? তিনি বলিলেন, তুমি কি জান না দান্তবাসু মারা গিয়েছেন!

শ্রীহৃদাংশুসুন্দর সেন

সংসারী কবি

ইচ্ছে করে, কাব্য লিখি মনের স্থখে জ্যোৎস্নারাতে,

কলম হাতে—

কিন্তু যে হায় অন্ধ কাপে অন্ধাভাবে; দুঃখে শোকে

হৃদয় ধোকে!

উদর-অনল দগ্ধ করে কল্পনা মোর,

উর্ধ্বশী-সে ঘনায় চোখে রাক্ষসী মোর;

দীর্ঘশ্বাসের কাদন শুনে মলয়-পবন পলায় দূরে—

ব্যাকুল স্থরে!

পচা ভোবার মশার কামড় পাগল যখন করবে মোরে,

দুই প্রহরে—

(তখন) জ্যোৎস্নারাতের 'কৌকিল গীতি' স্বর্গসুখা ঢালবে কানে?

হায় কে জানে?

বাস্তবেরই বোকা যখন মাথায় চড়ে

নিছক সরল গল্প শুনে যুগু ধরে

কল্পদেবীর আসন কোথায় কাব্যে গানে পূর্ণ হ'বে?

ছন্দোপবে!

হায়—রে হায় জুটুছে না ভাত পল্লীমায়ে-কলার পাত্রে,

আপন হাতে

কেমন ক'রে কবির ডানায় উড়বে বল চাদের শোভায়

ভাবের হাওয়ায়!

—পর্ণপুটই নাইক যাহার আপন ঘরে

'কাকন থাল' কোথায় পাব বাণীর তরে?

উচ্ছে, ঝিল্পে, পুঁইডাঁটা, শাক যার না জোটে সকাল হ'লে

তার কি চলে—

পুকুর পাড়ে ব'সে ব'সে 'পদ্ম রবির-মিলন' দেখা,

কাব্য লেখা?

উর্ধ্বশীর সে নৃত্য দেখে, সুর-সভার কল্পলোকে—

গেলুম ঠ'কে!

চাঁর পেয়ালা ঠাণ্ডা হ'ল ডাকু রে ঝিকে—

—পুড়ে পুড়ে ছাই হ'ল যে তামাক, টিকে।

'নীলাঞ্চলা', 'বিধাধরা'—বিফল বুকি ফাণ্ডনরতি;—

—নিভল বাতি !

তবু যে হায় ইচ্ছে করে গ্রন্থ ছাপাই প্রিয়ার নামে,
অনেক দামে ।

কিন্তু রে হায়,—সাহস নাহি, নিরাশা যে ভাসছে চোখে

—পড়বে লোকে ?

কুমারগুপ্ত

বিহারে বাঙালী কি করিলে “বেহারী” হয় ?

আমাদের বাঙালী জাতির মধ্যে কোনও এন্টারপ্রাইজ নাই, তাই এই বুদ্ধিমান জাতিটা ক্রমাগত জীবন সংগ্রামে পিছাইয়া যাতেছে । ইটালী-আবিসিনিয়াতে যুদ্ধ বাধিল—দলে দলে সংবাদদাতা ইংলও আমেরিকা হইতে তুর্গম মনসা-বনপূর্ণ জলের লেশ বিহীন হাবসী দেশের দিকে ছুটিল । রুটলেজ সাহেব হিমালয়ের চূড়ায় উঠিবার আয়োজন করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে Times-এর বিশেষ সংবাদদাতা প্রেরিত হইল । আর আমরা বাঙালীরা প্রতিবেশী দেশের খবর সংগ্রহ করিবার জন্তও বিশেষ কিছু চেষ্টা করি না । গত পূজার ছুটিতে এক সময় এই সব কথা ভাবিতে ভাবিতে মাথা গরম হইয়া উঠিয়াছিল । বিজয়া দশমীর দিন রাত্রিতে হঠাৎ মাথায় থেয়াল চুকিল এই যে কাগজে Behar for the Beharees এবং Bengal for all লইয়া কথা কাটাকাটি হইতেছে

এবং বাঙালীরা বিহারে domiciled হইলেও বিহার সরকার উহাদের চাকুরী দিতেছে না কেন ইহার মূল খুঁজিয়া বাহির করিব । বাড়ির বাহির হইয়া পড়িলাম, এবং তিন দিনের পরিশ্রমের পর বাঙালীর “বেহারীভূত” হইবার সম্ভাবনা আবিষ্কার করিলাম ।

বিহারে বাঙালীর domiciled হইবার ব্যাপার অনেকেই জানেন, আবার অনেকেই জানেন না । শেখোক্তাদের অবগতির জন্ত বলিতেছি যে যদ্যপি কোন ঘোষ, বস্ত্র, দাস, চাটুযো, রায়, মল্লিক প্রভৃতি domicile-certificate চাহেন, তৎক্ষণাৎ মহকুমার সাবডিভিশনাল অফিসার একটি miscellaneous বা মোংফরকা মোকদ্দমার নথি খুলিয়া বসিবেন । এবং দরখাস্তকারী তাহার পিতা, তাহার মাতা, তাহার পিতামহ ও তাহার দিদিমা কতদিন বিহারে বাস করিতেছেন, দেশে অর্থাৎ বঙ্গদেশে পূজার ছুটিতে যাহেয় কিনা, কোন বিধবা স্মাদ্বীয়াকে মণি-অর্ডার করিয়া টাকা পাঠান কিনা, বিহারে জমি কিনিয়াছেন কিনা, যদি কিনিয়া থাকেন ত খাপরার বাড়ী করিয়াছেন কিনা (পাকা বাড়ী করিলে তাহা ভাড়া দিবার জন্ত করা হইয়াছে দরিদ্র লওয়া হইবে এবং উহা domicile certificate লওয়ার বিরুদ্ধে প্রমাণস্বরূপ ব্যবহার করা হইবে) ইত্যাদি অসুসন্ধান চলিবে । যদি ইহাতে সন্তোষজনকভাবে প্রমাণিত হয় দরখাস্তকারী অ-বাঙালী হইয়াছে, তাহা হইলে দুইজন মান্তবর বিহারী ভ্রমালোকের সহি পাইলে দরখাস্তকারীকে domicile certificate দেওয়া হইবে । যাহারা এইরূপ domicile certificate পাইয়াছেন তাহারা নিজেদের বিহারীদের সমকক্ষ মনে করেন এবং বিহার সরকারের অধীন চাকুরী পাইবার জন্ত দরখাস্ত করেন এবং তাহা না পাইলে টাংকার করিয়া কাগজে লিখিয়া আকাশ বাতাস বিদীর্ণ করিতে

থাকেন। কিন্তু ইহার কলিয়া যান যে আজকালকার জাতীয়তার যুগে domicile certificate পাইলেই যে বাঙালী “বেহারী” হইয়া যায় তাহা নহে। এ বিষয়ে বিহারী নেতারা কি হইলে বিহারে বাঙালী “বেহারী” হইয়া যায় তৎপক্ষে বিহার গবর্নমেন্টকে একটি গোপনীয় সাক্ষীর জরি করিতে বাধ্য করিয়াছেন। নিম্নে আমরা উক্ত গোপনীয় সাক্ষীর জরি হইতে কিছু কিছু অছবাদ করিয়া দিব। যে যে বাঙালীরা domicile certificate-এর জন্য দরখাস্ত করিবে তাহাদের সম্বন্ধে উপরোক্ত ভাবে প্রকাশ্য তদন্ত ব্যতিরেকে অপর একটি গোপনীয় তদন্তও করিতে হইবে। এই গোপনীয় তদন্তটি তিন ভাগে বিভক্ত হইবে—প্রথমতঃ মেডিক্যাল দ্বিতীয়তঃ সোশাল এবং তৃতীয়তঃ মর্যাল এবং স্পিরিচুয়াল। প্রথমতঃ মেডিক্যাল পরীক্ষা করিতে হইবে; এবং উহা এইভাবে সম্পন্ন হইবে। একপোয়া অডহর দাউল অর্জমন্টা ধরিয়া জলে সিক্ত করিয়া উহার উপর একপোয়া ভরসা খী ঢালিয়া দিতে হইবে; এবং উহা ঠাণ্ডা হইবার পূর্বে দরখাস্তকারী বাঙালীকে খাওয়াইয়া দিতে হইবে। সাড়ে তিন ঘন্টা পরে দুই লিটমাস পেপার গলার ভিতর দিয়া পাকস্থলীতে প্রবেশ করাইয়া দেখিতে হইবে পেটে অখল হইয়াছে কিনা। যদি হয় তাহা হইলে উহাকে “বেহারী” বলিয়া গ্রাহ্য করা হইবে না।

দ্বিতীয়তঃ দরখাস্তকারীর বাড়ী গুপ্তচর পাঠাইয়া দেখিতে হইবে বাটার মেয়েরা গড়গড়ায় তামাক টানিতেছে কিনা; এবং স্নান করিয়া গৃহিণীরা কপালে হলুদ লেপিয়া দিতেছেন কিনা। যত্বপি এই কয়টি পরীক্ষার মধ্যে একটিতেও দরখাস্তকারী ফেল করে তাহা হইলে উহাকে “বেহারী” বলিয়া গণ্য করা হইবে না।

তৃতীয় পরীক্ষাটি একটু শক্ত। দেখিবে বাঙালী মায়েই মিথ্যাবাদী; উহার যে মিথ্যাবাদী একথা লর্ড মেকলে বলিয়া গিয়াছেন। বাঙালীরা

কিন্তু শতকরা ৯৯টির বেশী মিথ্যা কথা বলে না। যত্বপি দেখ দরখাস্তকারী বাঙালী শতকরা ১০০টির কম মিথ্যা কথা বলিতেছে জানিবে উহার বাঙালীত্ব এখনও দূরীভূত হয় নাই এবং সে সম্পূর্ণরূপে “বেহারী” হইবার যোগ্যতা অর্জন করে নাই। আর যদি দেখ শতকরা অন্ততঃপক্ষে ১০০টি মিথ্যা কথা বলিতেছে উহাকে অবিলম্বে বিহারী শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইয়া domicile certificate দিবে।

যে সকল বাঙালী domicile-certificate প্রাপ্ত হইয়া বিহার সরকারে চাকুরী পায়েন নাই, জানিতে হইবে তাহারা কেহই “বেহারী” হইতে পারেন নাই।

শ্রীমদত্ত

সংবাদ সাহিত্য

সাবলাইম এবং রিভিকুলাস যে প্রায় পাশাপাশি থাকে, একটি হইতে অপরটি বেশি দূরে থাকে না—ইহার প্রমাণ আমরা সর্বদা পাইয়া থাকি; কোনো শব্দের বানানের মধ্যেও উক্ত মহাজন-বাক্যের ভাষ্যার্থটি নিহিত রহিয়াছে। টাকা হইতে টিকি এবং টাক বেশি দূরে নাই, চাদ হইতে চাদা, শক হইতে শাক দূরে থাকে না। স্বতরাং বন্ধ এবং বান্দ যে একজু থাকিবে ইহাতে আর বিচিৎ কি? এবং ইহা যদি বিচিৎ না হয় তাহা হইলে বৃহৎ বন্ধ আর বৃহৎ বান্দে কোনো তফাৎ থাকে না। তফাৎ সত্যই নাই। ইহা আমরা আগামী মাসে প্রমাণ করিয়া দেখাইব।

বাংলা সাহিত্যে ভাল বই এবং সেই বই—এর লেখক পরিচয় আমরা কয়েকমাস ধরিয়া দিতেছি। বর্তমান মাসে অনিবাধ্য কারণে ধারাবাহিক প্রবন্ধটির কিস্তি প্রকাশ করা সম্ভব হইল না। আগামী মাস হইতে আবার উহা বাহির হইবে। সম্প্রতি একখানি মাসিকপত্র আমাদের উপর অভিমান করিয়া বলিয়াছেন, দীনেশ সেন মহাশয়ের বৃহৎ বঙ্গ উপন্যাসখানির নাম আমরা করি নাই কারণ উহা নাকি আমাদের দলের লোকের লেখা নহে। একথা উক্ত পত্রিকা জানিলেন কি উপায়ে? কে আমাদের দলে বা কে দলের বাহিরে, তাহা বাহিরের লোকের জানা সম্ভব নহে। উক্ত মাসিকপত্রিকাকে এই উপলক্ষে জানাইতেছি যে আগামী মাসে আমরা বৃহৎ বঙ্গ উপন্যাস সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়া ইহাই প্রমাণ করিব যে আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রে কাহারও প্রতি কোনো ঘেঁষা নাই।

প্রবন্ধকের ‘উপাসনা মন্দিরে’ যাহা যাহা বলা হইয়াছে সেই সব কথার ঠিক বিপরীত কথা লিখিলেও একই উদ্দেশ্য সাধিত হইত। বলা হইয়াছে, কাম নিরাকার, প্রেম সাকার। বলা চলিত, কাম সাকার, প্রেম নিরাকার। কারণ যাহারা নিরাকারের উপাসক তাহারা কামকে নিরাকার বলিবেন না, এবং যাহারা সাকারের উপাসক তাহারা কামকে সাকার বলিবেন না। কিন্তু উহা সাকার কি নিরাকার তাহা ভাবিয়া দেখি নাই। আমরা কামকে কাম বলিয়াই জানি।

আর একটি প্রার্থনার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। তাহা এই—

অদিক জন চাই না—কে আছে, কামের অন্ধুর হৃদয়ক্ষেত্র থেকে উৎপাটিত করে দেবে এক মুহূর্তে! অমৃতের পুত্রই ধর্ম রক্ষা করে।

হৃদয়ক্ষেত্র হইতে কামের অন্ধুর উৎপাটিত করিয়া কিছুমাত্র লাভ নাই। উৎপাটিত করিতে হইলে দৈহিক ক্ষেত্র হইতে করাই উত্তম এবং সেজন্ত আধুনিক বিজ্ঞানের শরণাপন্ন হইতে হইবে, ইহাতে কামের ক্ষেত্র সমূলে উৎপাটিত হইবে। হৃদয় হইতে শুধু অন্ধুর উৎপাটিত করা যায়, কিন্তু বীজ যে রহিয়া যায়! সেই বীজ কামে এবং কামনায় অস্থপ্রাপিত করে। তখন ভগবৎ সাধনা ত্যাগ করিয়া ইনশিওর্যান্স কম্পানি খুলিতে এবং পাটের কারবার করিতে সাধ হয়। বীমা এবং পাট হইতে জীব মুক্তি পাইবে কিসে?

তবে প্রবর্তক, হৃদয় হইতে কামের ক্ষেত্র উৎপাটিত করিবার যে ইচ্ছিত প্রথম জিবর্ণ ছবিখানিতে করিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। বনদেব দম্পতী যেন ভ্রান্ত মানবকে ডাকিয়া বলিতেছেন, “অমৃতের পুত্র, তোমরা আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত কর—উন্মুক্ত-বঙ্গা দেবী এবং তাহাতে আলিঙ্গনবদ্ধ দেবকে দেখিয়া হৃদয়ক্ষেত্রে উৎপাটন ক্রিয়া অভ্যাস কর, তুলিও না তোমরা অমৃতের পুত্র।” প্রসঙ্গত বলা উচিত বৈশাখের প্রবর্তকে মোট ১৭টি উন্মুক্ত শ্বনের চিত্র ছাপা হইয়াছে।

বিচিত্রা সম্প্রতি সাম্যবাদে দীক্ষিত হইয়া কোনো দিকেই তাল সামলাইতে পারিতেছেন না। আর একথাও ঠিক, ছোটকে বড় করিয়া এবং বড়কে ছোট করিয়া মধ্যপথে কি করিয়া মিলাইয়া দেওয়া যায় এ সমস্যা খুব সম্ভব চিরদিন সমস্তাই রহিয়া যাইবে, কখনো নীমাংসিত হইতে পারিবে না। বিচিত্রায় আমাদের সেই পরিচিত গল্পটির এক জায়গায় লেখা হইয়াছে—

এরপর উঠিয়া পাঁড়াইলেন—রাজপুরোহিত তাঁর দীর্ঘ দেহ, লম্বিত শরীর, সংযত আবভাব [?] সকলেরই মনে এক অনির্কচনীয় ভাবের উদ্রেক করিল। শুধু গম্ভীর কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, “এ সবে প্রয়োজন তোমরা জান। জাতির দরবার অহমিয়াকে একপাশ করে রেখেছে! এর প্রতিবিধান চাই। তাই, আজ আমন্ত্রণ বাঙ্গালার অতিথি, যারা বিশ্বে জাতির চূড়ায় পাড়িয়ে আছেন। এই বাঙ্গালীর রক্ত অহমিয়ার রক্তে মিশবে, মিশে তোমরা পাবে—তাঁর সম্মান, যারা অহমিয়াকে একদিন উচুতে তুলে ধরবে।...বাহিরে শঙ্খধ্বনি হইল ও সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করিল সারি দিয়া শ্রেণীবদ্ধ তরুণী...

আমরা এখন বিচিক্রার স্থখে স্থখী হইবার চেষ্টা করিতেছি—ইহা ছাড়া আর কিছুই করিবার নাই।

—

সাহিত্যের মত বাংলাদেশে স্কুমার শিল্প ও লুপ্ত হইবার পথে আসিয়াছে। শিল্পক্ষেত্রে প্রকৃত শক্তিবান স্রষ্টার অভাব এক্ষণে শোচনীয়রূপে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে এখন হইতে দেশের লোকের মিলিত চেষ্টা ব্যতিরেকে ইহার আর ঠাট্টাবার কোনো আশাই নাই। স্বপ্নের বিষয়, ঘোর অন্ধকারের ভিতরেও আশার ক্ষীণ আলো দেখা যাইতেছে। দেশের মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলি এ বিষয়ে এক মত হইয়াছেন। সকলেই সম্মতের বলিতেছেন, হে স্বদেশীয় নরনারীসকল, আমরা অমৃতের সন্ধান পাইয়াছি, এস আমরা সকলে মিলিয়া উহা গ্রহণ করি। অর্থাৎ শিল্পের সন্ধান পাইয়াছি—বঙ্গদেশের একমাত্র শিল্পের সন্ধান পাইয়াছি। সেই শিল্প, চা-শিল্প। সমস্ত সাময়িক পত্র

সম্মতের বলিয়াছেন, বহু কলার ভিতর চা-কলা সত্ত্বতম। ‘অল্প কলা যখন আর নাই, তখন এস আমরা চা-কলা লইয়া মাতামাতি করি।

—

“প্রবর্তক” উপাসনা মন্দির স্থাপন করিয়াছেন, সেই “প্রবর্তক” চা শিল্প সম্বন্ধে বলিয়াছেন, ইহা একটি তপস্যা। এক্ষণে তপস্যা প্রাচীন ভারতের আশ্রমে ছিল কিনা জানি না, “প্রবর্তক” মাসিকের আশ্রমে কিঙ্ক দেখা যাইতেছে। প্রবর্তক লিখিতেছেন—

চা-বীজ রোপণ থেকে শুরু করে পেয়ালার স্বস্বাদ চা-টুকু হ’তে যে তপস্যা ও নিপুণতার প্রয়োজন হয় তা সত্যিই রোমাঞ্চকর। যন্ত্র-শিল্পের অবাস্তবনীয়তা, উপায় উন্মুক্ত চা বাগিচার প্রাকৃতিক লীলাক্ষেত্রে নেই।

এক্সপ ‘রোমাঞ্চকর’—অর্থাৎ এই ‘সত্যিই রোমাঞ্চকর তপস্যা’টি উপাসনা মন্দিরের বা প্রবর্তকসম্বন্ধের কোনো তপস্যা হয়ত নাই। ইহা আরার শুধু কলা-ক্ষেত্র নহে লীলা-ক্ষেত্রও বটে। শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় মহাশয় কি বলেন?

—

স্বপ্নের শর্মার ভুল্লভ বিষয়ে আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারিলাম না। তিনি বলিতেছেন (বিষয়)—

আমারে স্মরিছ তুমি, অশুগৃহ সান্ত্র অহুভবে
বুঝিতেছি মধ্যে মধ্যে। ইন্দ্রিয়েরা রয়েছে নীরবে
বিবরে ভুল্লভসম নিজ নিজ কোটরে নিলীন।
প্রাণের তিমিরে মোর দীপশিখা ছিল স্পন্দনহীন
সহসা উঠিল কাঁপি যেন কোন সমীর হিলোলে
নিবাত নিদ্রাশিখা তরঙ্গের তালে তালে দোলে!

প্রাণের অন্ধকারের স্পন্দনহীন দীপও শেষ পর্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু বিবরস্থ ভুক্তক কি করিল তাহার উল্লেখ কোথাও নাই। উপমাটা সার্থক হয় নাই।

শ্রীযুক্ত সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ভারতবর্ষে (বৈশাখ) 'জীবন-বীমা কোম্পানীর দান প্রথা' এবং 'তুমি কি আসিয়াছিলে' নামক কবিতা লিখিয়াছেন। দুইটির সঞ্চয় আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিতেছি।

তুমি কি আসিয়াছিলে, নবমেঘে প্রথম আঘাতে
নিরঙ্কর আধার রাত্রি, অবিশ্রাম দ্বারা বরিয়ণ
বিহীন চমক ফিরে প্রতিহত মেঘের পাহাড়ে
ঘন মেঘ অন্তরালে অস্থগুচি (sic) বাথার জন্মন।

উদ্ভিষ্ট ব্যক্তিটি যদি বীমার এজেন্ট হন তাহা হইলে আমাদের বলিবার কিছুই থাকে না, কারণ একমাত্র তিনিই যে-কোনো কালে যে-কোনো অবস্থাতেই আসিতে পারেন—এবং আসিয়াও থাকেন। কিন্তু তাঁহাকে স্মরণ করিয়া কবিতা লেখার প্রেরণা জাগে কিনা বলা শক্ত।

বাংলা সাহিত্য পড়িবেন কিনা ইহা লইয়া মুসলমান সমাজে ঘোর আন্দোলন হইতেছে—কিন্তু ইতিমধ্যে কখন বাংলা অক্ষরকে তাহার ফাসির মত উন্টাইয়া লইয়াছেন তাহা জানিতে পারি নাই। ভারতবর্ষ (বৈশাখ) বিজ্ঞাপন ৪৭ পৃষ্ঠায় 'সওগাত' উন্টা করিয়া ছাপা হইয়াছে। সীমার টাইপের মুখ উন্টা থাকে, ছাপিবার সময় সোজা হয়। কিন্তু এখানে উন্টা লিখিয়া উন্টা অক্ষরের প্রকৃতি ছাপা হইয়াছে। তাহাতে সওগাত শব্দটি ষা দিক হইতে পড়িতে হইবে। ইহা মন্দের ভাল।

গত মাসে আমরা বলিয়াছিলাম মুসলমানদের ভাষা এবং অক্ষর বাংলাভাষা ও অক্ষর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হওয়া আবশ্যক।

'ছন্দা' নামক সাপ্তাহিকে কেহ কবিতা পাঠাইবেন না বলিয়া যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে ইহার জ্ঞা 'ছন্দা'কে আমরা প্রশংসা করিতেছি। ইহা সাময়িক পত্রের পক্ষ হইতে অভিনবও বটে। আমাদের মনে হয় ইহাতে সমাজের উপকার হইবে। যে সকল কবি অনর্থক ডাকমাশুল খরচ করিয়া কবিতা পাঠান, অথচ সে কবিতা কাগজে ছাপা হয় না, তাঁহাদের ঘরের পয়সা ঘরে থাকিবে। ইহাতে কবির সংখ্যা ভবিষ্যতে কিছু কমিয়াও যাইতে পারে। কিন্তু হায়রে ছরাশা!

ঠিক এই মুহূর্ত্তে মনে হইতেছে, বাংলাদেশে কবি ও কবিতার অভিব্যক্তি বিষয়ে একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণা চলিতে পারে। পৃথিবী প্রথম বাষ্প অবস্থায় ছিল। ক্রমশঃ সেই বাষ্প জমাট বাঁধিয়া স্থলতর বস্তুতে পরিণত হইল। মাটি জল পৃথক হইল। ইহারই মধ্যে যে কোটি কোটি প্রকার উদ্ভিদ এবং প্রাণীর বীজ প্রচ্ছন্ন ছিল তাহারা প্রকাশের অস্থকূল আবহাওয়া পাইবামাত্র আপনাকে প্রকাশ করিতে থাকিল। সকল দেশে একই প্রকার আবহাওয়া মিলিল না। যেক-প্রদেশে, হিমমণ্ডলে, নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে এবং গ্রীষ্মমণ্ডলে বিশেষ বিশেষ প্রকার প্রাণী ও উদ্ভিদ দেখা দিল। অনেক সময় জাতি এক হইলেও আকৃতি ও ব্যবহার পৃথক হইয়া গেল। পৃথিবী স্থলতর মুষ্টি গ্রহণ করিবার মুহূর্ত্তে বাংলাদেশে এক শ্রেণীর কবিতার বীজ, প্রকাশের উপযুক্ত পরিমণ্ডল পাইয়া দিনে দিনে আপনাকে ফুটাইয়া তুলিতে

লাগিল। তাহারই পরিণতি আজ আমরা দেখিতেছি, এবং কবিতা চাই না বলিয়া বিজ্ঞাপন দিতেছি।

বাংলাদেশের উপর দিয়া উপক অব ক্যানসার রেখা চলিয়া গিয়াছে। এই রেখা রাজপুতানা মরুভূমির দক্ষিণ দিয়া আরব দেশের মরুভূমির উপর দিয়া সাহারার মরুভূমি ভেদ করিয়া আটলান্টিক মহাসাগর পার হইয়া মেক্সিকো উত্তীর্ণ হইয়া চীনদেশে পৌঁছিয়াছে। গবেষণা করিলে দেখা যাইবে এই রেখা পৃথিবীর যতগুলি স্থান স্পর্শ করিয়া গিয়াছে তাহার প্রত্যেকটি স্থানে একইরূপ কবিতার উৎপত্তি হইতেছে। যে স্থানে হয় নাই সে স্থান মরুভূমি হইয়া গিয়াছে। ছুঃখের বিষয় আরব মরুভূমি, সাহারার মরুভূমি, এবং আটলান্টিক মহাসাগরে মাছুয নাই—খাকিলে আমাদের কথার সত্যতা প্রমাণে কোনো বিষয় হইত না। বাকী চীন দেশ ও মেক্সিকো সম্বন্ধে কোনো সংবাদ রাখি না, কিন্তু এই দুই দেশেও যে কবিতার বস্তু বহিতেছে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

‘বর্ন্তমান’ নামক সাপ্তাহিক ভাষার বাহা নমুনা দেখাইয়াছেন তাহাতে আশা করিতেছি ইহার ‘বর্ন্তমান’ নামটি সার্থক হইয়াছে। কারণ বর্ন্তমানে বাংলা ভাষার কোনো রূপ নাই। বাংলাদেশে প্রতিদিন নূতন নূতন সাপ্তাহিক পত্রিকার যে কিরূপ চাহিদা বাড়িয়া যাইতেছে তাহা সহজেই বুঝা যাইবে। সাহিত্য ক্ষেত্রে কসজিপশন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। নির্দিষ্ট বয়স প্রাপ্ত হইলেই কলম লইয়া ছুটিয়া আসিতে হইবে—কোনো বিচার বা বিবেচনা চলিবে না। ইহাতে গোয়ান চালনা বা ভূমিকর্ষণ কিছুকাল স্থগিত থাকিবে বটে, কিন্তু সাহিত্যবিনাশ নিশ্চিতরূপে ঘটবে। সাহিত্য এবং ভাষার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার

অল্পই সাময়িক পত্রিকারূপ অস্ত্র চাই। অস্ত্র চালনাকারী ভাষা এবং সাহিত্য বিষয়ে যত অজ্ঞ হইবে ততই তাহার দ্বারা ভাষা ও সাহিত্য বিনাশ কাণ্ড উত্তমরূপে চলিবে।

প্রমাণ—

‘অশ্রীল’ কথাটার নাম শোনলেই অনেকের নাক গুলিয়ে আসে। কেহ আবার উদ্গ্রীব হয়ে থাকে তার তত্ত্ব জানতে একান্ত উৎসাহে। এদের উভয়ের মধ্যে ব্যবধান : এক সম্প্রদায় চায় শুকনো অসাড় গোঁড়ামীকে শাস্ত রাখতে। ব্যাপকভাবে এদের কোনরূপ জ্ঞান অজ্ঞানের স্পৃহা নেই, পারিবারিক জীবনের একটা নিত্যক তাদের কাছে থাকে অজ্ঞতায় অন্ধকার হয়ে। অপর সম্প্রদায় বুজে অজ্ঞত স্বস্থতর আলোড়নের পর শ্রান্ততার তৃপ্তির অল্প একটু আনন্দ। এ আনন্দ তারা পেতে চায় টলটলে হালকা সাহিত্যের ভেতর দিয়ে। যে শাস্ত, পরিশ্রমতিষ্ঠ কিংবা জটিল চিন্তার অবস্থিতে মুগ্ধ, সে স্বস্থ দার্শনিক বিশ্লেষণে তৃপ্তি পায় না, তাতে মন আকৃষিত হতে পারে না। যতটা মন ফুটে উঠবে রঙিন রসালো চিত্রে আর কথায়।...

প্রবন্ধটির নাম কলা কথা। লেখার সহিত সম্মতি রক্ষা করিতে হইলে কাগজের ‘বর্ন্তমান’ নামটি বদলাইয়া ‘মর্ন্তমান’ করিতে হয়, এবং করিলে বোধহয় সম্পাদক মহাশয়ের নামের সহিত যুক্ত appendixটি সার্থকতা লাভ করিতে পারে।

‘বিচিত্রা’ একপ্রকার অদৃশ্য বর্ণের সন্ধান পাইয়াছেন। বৈশাখ-

সংখ্যার মলাট ছাপাইতে যে দুইটি বর্ষ ব্যবহৃত হইয়াছে, এই অদৃশ্য বর্ণটি তাহার অঙ্গতম। ইহা কি আশুনে ধরিয়া দৃষ্ট করিতে হইবে?

খ্রীষ্ট হইতে প্রকাশিত একখানি নূতন মাসিক পত্র জন্মিয়াই নানারূপ পরিপাক কথা বলিবার প্রয়াস পাইয়াছে। ইহা হয়ত সম্ভব, কিন্তু তাই বলিয়া বয়সের মত পরিপাক শক্তি শিশুর কখনো হইতে পারে না। বাহাদুরি করিতে গিয়া শিশু বড়ই বিপদে পড়িয়াছে।

হিউমার বুঝিতে হইলে অভিজ্ঞতার বিস্তার এবং গভীরতা থাকা প্রয়োজন। যে বয়সে বুঝবু শুনিয়া হাসিতে হয় সে বয়সে কিছু বুঝিয়া হাসা স্বভাবতই কঠিন।

‘অগ্রগতি’ নামক সাপ্তাহিক আশুপরিচয় দিবার জ্ঞান অতিমাত্রায় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। অগ্রগতি লাভ করিতে হইলে একটু ক্ষুণ্ণ ছুটিতে হয় একথা সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া হাঙ্গা হইবার জ্ঞান কাণ্ডজ্ঞান বর্জন করিয়া ছুটিতে হইবে, শিক্ষাকে দূরে পরিহার করিয়া ছুটিতে হইবে এরূপ ঠিক নহে। সত্য বটে, অশিক্ষা, অক্ষ, এবং সে জ্ঞান অশিক্ষিত মনে করে তাহার সম্মুখে অজ্ঞ কিছু নাই, সে সকলকে পশ্চাতে ফেলিয়া বহুদূর অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু ইহা তাহার ভ্রম। অশিক্ষা কখনো কাহাকেও অগ্রসর করিয়া দেয় না, অশিক্ষিত নিজে এরূপ মনে করে মাত্র। সেই জ্ঞান অগ্রগতির এই নমুনাটি আমাদের ভাল লাগে নাই—

ক্ৰিতিমোহন ও বিদ্যুশেখর রবীন্দ্র-গ্যাংগের এই ছুটি কলিকলকাতায় ছিটকে পড়েছেন! আশ্চর্য্য এই লোকদুটির হস্তী-জলভ দ্বলভ—শক্তি যদি নাই থাকে, প্রবন্ধ না লিখলে ক্ষতি কি!.....

খ্রীযুক্ত ক্ৰিতিমোহন সেন বা বিদ্যুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের কোনো প্রবন্ধ এরূপ দুর্বোধ হয় না বাহাতে কোনো শিক্ষিত ব্যক্তির ক্রোধ উদ্বেগ করিতে পারে। কিন্তু পূর্বেরই বলিয়াছি মূর্খ হইলে একটু অসুবিধা আছে। ছুঁশের বিষয় বাল্যকাল শিক্ষায় অবহেলা করিলে পরে আর তাহার সংশোধন হয় না। অগ্রগতির জ্ঞান আমরা সত্যই ছুঁশ অশুভব করিতেছি।

বৈশাখের অর্চনায় শ্রীনিরুপমা দেবী ‘বাঙ্গালা ভাষা ও তাহার অক্ষর’ নামক প্রবন্ধে লিখিতেছেন—

বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ খ্রীযুক্ত স্বনামধন্য চট্টোপাধ্যায় বাঙ্গালা অক্ষরের পরিবর্তে রোমান অক্ষরের দ্বারা বাঙ্গালা লেখার প্রথা প্রবর্তনের জ্ঞান সচেষ্ট হইয়াছেন।...আমিও উহার সম্পূর্ণ বিরোধী। অজ্ঞান ভাষার দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার বৈশিষ্ট্য সৌন্দর্য্য ও একান্ত উপযোগী হইতেছে বাঙ্গালা অক্ষর। বাঙ্গালা অক্ষর তুলিয়া দিলে কি আমাদের ভাল হইবে?

ইহার উত্তর রিতেছি। স্বনামধন্য বাহা করিতে চাহিতেছেন তাহা বুঝিতে পারিলে তাহার সহিত বিরোধ থাকিবার কথা নহে। রোমান অক্ষর যদি বর্তমান বাংলা অক্ষরের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় তাহা হইলে সেই রোমান অক্ষরই আমাদের নিকট বাংলা অক্ষর বলিয়া প্রতীত হইবে। এবং যাহারা প্রথম হইতে রোমান অক্ষরকে বাংলা অক্ষর জানিয়া পড়িতে শিখিবে তাহাদের নিকট বর্তমান বাংলা অক্ষরই বিদেশী অক্ষর বলিয়া মনে হইবে। অর্থাৎ রোমান অক্ষরই তখন বাংলা অক্ষর বলিয়া লোকে চিনিতে পারিবে। আমি বর্তমান বাংলা অক্ষর চিনি, স্বতরাং আমার পক্ষে নূতন আর এক-জাতীয় অক্ষরকে

বাংলা অক্ষর রূপে কল্পনা করা অপেক্ষাকৃত কঠিন। স্মৃতিরাজ যোগ্যতায় বিচারের সময় নিজেই দুই ভাগে ভাগ না করিয়া অর্থাৎ দ্বিধাগ্রস্ত মনে বিচার না করিয়া অণ্ড দ্বিধাহীন মনে বিচার করাই শ্রেয়। বর্তমান বাংলা অক্ষরে লেখা হইলেও লেখিকার “বাঙ্গালা ভাষার বৈশিষ্ট্য সৌন্দর্য্য ও একান্ত উপযোগী হইতেছে বাঙ্গালা অক্ষর”—এরূপ ভাষাকে প্রশংসা করা যায় না। ভাষার উৎকর্ষের জন্ত কোনো বিশেষ-জাতীয় অক্ষরের প্রয়োজন এরূপ আমাদের মনে হয় না। অপর পক্ষে বিশেষ-জাতীয় অক্ষর হইলেই যে ভাষার উৎকর্ষ হইবে তাহা নহে। ইহার প্রমাণ লেখিকার নিজের ভাষাতেই রহিয়াছে, সংবাদ-সাহিত্যের অজ্ঞত্রও উক্ত ভাষাসমূহে মিলিবে।

—

বিরহে দেহের ঠিক কোন জায়গায় বেদনা জমা হয় তাহা আজ পর্য্যন্ত কোনো কবি ঠিক করিয়া বলিতে পারেন নাই। বহুকালা ধরিয়া তাহারা অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়িয়া আসিতেছেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই বেদনার স্থপ্ত শিহরণ কোথায় জমা হয় তাহার speculation আরম্ভ হইয়াছে। শিহরণ ঘুমন্ত অবস্থায় জমা হইতে থাকে। যথা—

তারি আশাপথ চেয়ে বসন্তের একদা সন্ধ্যায়

প্রেম স্বর্ণ রচেছিহ মোর আভিনায়!

সে তো নাহি এলো তাই শ্রান্ত হল মন

চোখের তারার মাঝে জমা হল বেদনার স্থপ্ত-শিহরণ।

স্থানটিও নূতন, যাহা জমা হইতেছে তাহাও নূতন। লেখাটিকে কবিতায় রচিত ধীসিস বলা যাইতে পারে।

—

কোনো কিছু আরম্ভ করিবার পর, ভাল হউক মন্দ হউক কিছুতেই

ছাড়িব না এরূপ পণ করিয়া যাহারা কাজে নামিতে পারে তাহারা সংসারের যত অনিষ্টই করুক তাহাদিগকে প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। আমরা বন্দেআলী মিয়ার কথা বলিতেছি। কবিতা লেখা সম্বন্ধে মিয়া সাহেব মরীয়া হইয়া উঠিয়াছেন। ইহাকে রোধ করে এমন শক্তি বাংলা দেশে নাই। ভাঙা ছন্দে বাঙাল ভাষায় কোনো রকমে কবি যেটুকু বুঝাইয়া বলিতে পারেন সেটুকু মাসিক পত্রিকাদিতে হয়ত এই কারণে ছাপা হয় যে তবু ত খানিকটা সময় মিয়া সাহেব কাগজ কলম লইয়া কাটাইতে পারিতেছেন—কারণ এই কবিতার ভাব যদি কবি কার্ধ্যে পরিণত করিতেন তাহা হইলে সেটা আরও সামাজিক হইত। ‘এসো আজ বিজ্ঞান ঘরে’ নামক কবিতায় কল্পনা ব্যক্তিকে ছাড়াইয়া যেখানে একটু দূরে গিয়াছে সেখানে কবি শুধু ছন্দ এবং ভাষা নহে শব্দার্থও ভুলিয়াছেন।

তব লেগে [লাইগা?] প্রাণে মোর সাগরের হিন্দোলা জাগে

মেঘের নিবিড় ভাষা সহসা গো গায়ে এসে লাগে।

এবং খুব সম্ভব কবিকে কাৎ করিয়া ফেলে। গায়ে আসিয়া লাগিতে পারে এরূপ ভাষা আমাদের জানা নাই। মেঘের যে ভাষা মাথায় বৃকে বা পিঠে লাগিতে পারে তাহা বৃষ্টি বা বিদ্যুৎ। কিন্তু কোনো মেয়ের কথা স্মরণ করিলে হঠাৎ গায়ে মেঘের ভাষা আসিয়া লাগিবে কেন?

—

খামপেয়ালী নামক নূতন প্রকাশিত পাক্ষিক পত্র জীমুক্ত শৈলজ্ঞানন্দ সুখোপাধ্যায় রচিত “রবীন্দ্রনাথ” নামক একটি ছোট গল্প বাহির হইয়াছে। গল্পটির সংকল্পসার এই: সরোজ নামক একটি ছুড়ি বাইশ বৎসরের ছেলে শান্তিনিকেতনে পড়িতে যায়—তাহার কবিতা লেখা বাস্তবিক ছিল। কিছুদিন পরে সরোজ পাগল হইয়া যায়। এবং

তাহার ধারণা হয় যে সেই রবীন্দ্রনাথ। শান্তিনিকেতনে যিনি থাকেন তিনি নকল, আসল রবীন্দ্রনাথ সরোজ নিজে। গল্পকার তারপর বলিতেছেন—

মাস দুই আগে এই সেদিন একবার গিয়াছিলাম। আমাদের এই আসল রবীন্দ্রনাথের সংবাদ লইতে গিয়া শুনিলাম—সে মরিয়াছে ভুবনভাঙ্গার একটা গাছের তলায়।

গল্পটি রূপক। রূপক ভাঙিলে যাহা ঝাড়াই তাহা এই যে বর্তমান রবীন্দ্রনাথ পূর্ণ রবীন্দ্রনাথের প্রেতাঙ্ক—আসল রবীন্দ্রনাথ আর বাঁচিয়া নাই। ব্যঙ্গ হিসাবে লেখাটি ভাল হইয়াছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসবের সময় এ লেখাটি রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা জানাইতেছি বলিয়া কোনো কাগজে ছাপা উচিত হয় না। রবীন্দ্রনাথকে বিজ্ঞপ করিতে হইলে অবশ্য ইহা ছাপাইতে কোনো বাধা নাই, কিন্তু আমরা যতদূর বুঝিতেছি ধামধেয়ালী গল্পটির তাৎপর্য্য না বুঝিয়া একাক করিয়াছেন, কিংবা কবির প্রতি শ্রদ্ধা দেখানো সত্বে ধামধেয়ালী পূর্ব্বের মত পরিবর্তন করিয়াছেন।

শৈলজাবাবুর উপরোক্ত গল্পটি যখন গত বৎসর উন্মোচন নামক অধুনালুপ্ত মাসিক পক্ষে পড়ি তখনও ঠিক এই কথাই মনে হইয়াছিল। উন্মোচনও রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা—সেগাইতে গিয়া ভুল করিয়া এই গল্পটি ছাপিয়াছিলেন। এই গল্পটি ভবিষ্যতে আর কত কাগজে ছাপা হইবে জানি না, তবে রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব চিরদিন আসিবে না, ইহাই আমাদের যা সাশ্বনা।

ধামধেয়ালীর 'চয়ন' পৃষ্ঠায় 'আধুনিক যুগের ভ্যাগের আদর্শ

সম্পর্কে স্বর্গীয় মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর নামটি স্মরণ করিতে পারিতেন। চয়নের ২৩নং সংবাদটি ভুল। বলা হইয়াছে, 'তিব্বত ভ্রমণকারী রাজা রামমোহন রায়।' কিন্তু রাজা রামমোহন রায়ের তিব্বতভ্রমণ কয়েক বৎসর হইল মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে।

রবিবারের অমৃতবাজার পত্রিকায় শ্রীযুক্ত আশু দে একটি করিয়া 'Patter' লিখিয়া থাকেন। কিন্তু রসিকতার ফল কতদূর গড়াইতে পারে তাহা আশুবাবু বোধহয় কল্পনা করিতে পারেন নাই। 'The Terrible Mr. Das' সম্বন্ধে যাহা লেখা হইয়াছে তাহাতে আমাদের আপত্তি করিবার কিছুই ছিল না, কিন্তু তিনি উক্ত মিঃ দাসকে দেখিবার পক্ষে ২৫২ মোহনবাগান রো ঠিকানাটি উপযুক্ত, এক্ষণ কথ্য লিখিলেন কেন? মিঃ দাসকে বাহারাই তি পূর্ব্ব জানিয়াছেন তাহাদের প্রতি যথেষ্ট সহায়ত্ব প্রদর্শন করিবার পূর্ব্বই নূতন লোকরিগকে তাহার ঠিকানা বলিয়া দেওয়া কোনো মন্ত্যলোকের কর্তব্য নহে।

পত্রিকায় গত ২৬শে এপ্রিল রবিবার আশুবাবুর The Terrible Mr. Das নামক 'প্যাটার' বাহির হয়। তাহার শেষে এই কথাগুলি ছিল—

And now you will want the address. Of course! Try 25/2 Mohanbagan Row. You will discover two things. That like most of my statements these are true episodes. And secondly, you will discover Mr. Das,

সুতরাং বহু ভুললোক উক্ত রবিবার দিন মিঃ দাসকে 'আবিষ্কার'

করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের ভিতর তিন জন গত ১০ই মে তারিখে হাসপাতাল হইতে স্বস্থ হইয়া ফিরিয়াছেন—মাত্র একজন এখনও ফেরেন নাই। তাঁহার কলার-বোন ভাঙিয়া গিয়াছে।

—

মোহনবাগান বো অফিসের বিশেষ কিছু রূপান্তর হয় নাই, কেবল পরদিন একটি আলমারি পাঁচখানা চেয়ার ও একটি সেক্রেটারিটে টেবিল নতুন করিয়া কিনিতে হইয়াছে। হাসির কথা শুনিলে মানুষ স্বভাবতই হাসিয়া থাকে, কিন্তু অমুকে এই মুহূর্ত্তে অমুক হাসির কথা বলিতে পারে ইহা অসম্মান করিয়া হাসা এবং হাসিতে হাসিতে হাত পা ছুঁড়িয়া চেয়ার টেবিল ভাঙা অথবা মানুষ খুন করা—ইহা স্বাভাবিক না হইলেও মিঃ দাসের পক্ষে ইহা স্বাভাবিক। ইহাকে বাহারা চিনিয়াছেন তাঁহারা জীবনের ধারা বদলাইয়া ফেলিয়াছেন;

—

গত রবিবারের ঘটনায় মিঃ দাসেরও সামান্য একটু ক্ষতি হইয়াছে। তিনি বেলা এগারোটায় যখন তাঁহার বেবি অগ্নি ক্রিয়া বাড়ি ফিরিতেছিলেন তখন গ্রে স্ট্রিটের মোড়ে হঠাৎ প্যাটারের কথাগুলি তাঁহার মনের মধ্যে আর একবার বিদ্যাতের মত নাচিয়া উঠে। মিঃ দাস চকিতে দিশাহারা হইয়া একা সেই গাড়ির মধ্যে হো হো হো হি হি হি করিতে করিতে—ইহার পরে তাঁহার আর কিছুই মনে নাই। আধ ঘণ্টা পরে তিনি যখন বাড়ি ফিরিলেন তখন দেখেন ছই হাতের মূঠার মধ্যে ষ্ট্রিয়ারিং চাকাটি ধরা রহিয়াছে, কিন্তু গাড়িখানা নাই। গাড়ি কোথায় ভাঙিয়া চুরমার হইয়াছে তাহা কিছুই স্মরণ হয় না। এই রকম প্রায়ই হয়, কারণ হাসির কথা কখন মনে আসিবে তাহার কোনোই স্থিরতা নাই।

—

ইটালি জয়লাভ করিয়াছে এবং আবিসীনিয়া পরাজিত হইয়াছে, ইহাতে আমরা একই সঙ্গে শোক প্রকাশ এবং আনন্দ প্রকাশ করিতে পারি। শহরের সমস্ত আলো নিবাইয়া দিয়া বাজি পুড়াইলে দুইপ্রকার কাজ এক সঙ্গে চলিতে পারে। আবিসীনিয়া আমাদের কেহ নহে, ইটালিও আমাদের কেহ নহে, স্বতরাং পক্ষপাতশূন্য হওয়াই ভাল। কিন্তু অনেক কাগজেই ইটালির বিপক্ষে এবং আবিসীনিয়ার স্বপক্ষে লেখা চলিতেছে। আবিসীনিয়ার রাজা কেন্ কোন্ কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়াছেন তাহা জানা প্রয়োজন।

—

কলিকাতার নাট্যজগতের সংবাদ ড়য়াবহ মনে হইতেছে। নব-নাট্যমন্দির 'অচলা'। রঙমহাল, 'সর্পহারা'। কিন্তু উপায় একটা ত বাহির করিতেই হইবে! নাট্যনিকেতন বলিতেছেন, 'ঋণ্য কৃত্তা'—, কিন্তু ইহাই কি শ্রেষ্ঠ পন্থা? মিনার্ভা 'দম্ভা' হইয়াছেন, কিন্তু কি লুপ্তন করিবেন?

—

আধুনিক কবিতা বিষয়ে প্রথম প্রবন্ধে কিছু আলোচনা করা গিয়াছে। 'কবিতা' নামক ত্রৈমাসিকও সে আলোচনায় স্থান পাইয়াছে। কিন্তু তাহার বিস্তারিত আলোচনা করিতে পারি নাই। কবিতায় কি করিয়া আধুনিক হওয়া যায় ছন্দের দিক হইতে তাহার সমাধান মিলিয়াছে। অর্থাৎ ছন্দটা গছের ছন্দ—আরো পরিষ্কার কথায়—গছের লাইন ভাঙিয়া লিখিয়া কবিতা করা হইয়াছে। এই বুজুকিতে বাংলাদেশের কে ভুলিতেছে তাহা আমাদের ধারণার অতীত, কিন্তু যদি ধরিয়াও লওয়া যায় যে কেহ কেহ ইহাকে কবিতা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে তাহা হইলেও এই প্রশ্নটি কি উঠে নাই

যে সে কবিতায় কিছু প্রকাশ হওয়া প্রয়োজন কিনা? অভিজ্ঞতা-গ্রন্থত বা উপলব্ধ বস্তুর সহিত আবেগ যুক্ত হইয়া যাহা প্রকাশ হয় তাহার রূপটি গভীর রূপ হইল বলিয়াই যে তাহা অগ্রাহ্য তাহা নহে; না হয় তাহাকেই একদল লোক কবিতা বলিল। তাহাতে কিছু ক্ষতি নাই—আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে আধুনিক নামধেয় কবিকুল কি প্রকাশ করিতেছে? নিজেকে ঠকাইবার জন্ম কি এত আড়ম্বর প্রয়োজন হয়? অ্যাষ্টিক কাগজ ত ইয়াকি নহে, ছাপাপানা দপ্তরি ইহাও ইয়াকি নহে—ইয়াকি শুধু রচনাগুলি।

কিন্তু নিজেকে ঠকাইবার এই নবলব্ধ পন্থায় নূতন লোককে ডাকিবার কোনো প্রয়োজন নাই। যে কোনো একখানা গল্পপুস্তকের বাক্যগুলি ভাঙিয়া ভাঙিয়া সাজাইয়া গেলে ইহার চেয়ে সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ ‘কবিতা’ হইতে পারে—ধরচ যদি করিতেই হয় তবে খ্যাতনামা লেখকদের রচনা গল্প কবিতায় রূপান্তরিত করাই উত্তম। ‘কবিতা’ (চৈত্র) কাগজের প্রথম ‘কবিতা’ হইতে কয়েক ছত্র পূর্বে উদ্ধৃত করিতেছি—

গভীর হাওয়ার রাত ছিল কাল—অসংখ্য নক্ষত্রের রাত;
সারারাত বিতীর্ণ হাওয়া আমার মশারিতে খেলেছে;
মশারিটা ফুলে উঠেছে কখনো মোণ্ডমী সমুদ্রের পেটের মত,
কখনো বিছানা ছিড়ে

নক্ষত্রের দিকে উড়ে যেতে চেয়েছে;

এক এক বার মনে হচ্ছিল আমার—আধো ঘুমের ভিতর

হয়তো—মাথার উপরে মশারি নেই আমার,

স্বাতী তারার কোল ঘেঁষে নীল হাওয়ার সমুদ্রে শাদা বকের মত
উড়ছে সে!

কাল এমন চমৎকার রাত ছিল।

মশারি নহে কবির কাপড়।

আমরা বলি যাবতীয় নূতন ও পুরাতন গল্প এই ফর্মে প্রস্তুত করিয়া লইলে বাংলাদেশের বর্তমান যুগকে কবিতার যুগ বলা যাইতে পারিবে। একটি নমুনা দিলাম—

আজ পনেরো বছর আমাদের বিবাহ হয়েছে

আজ পর্যন্ত তোমাকে চিঠি লিখিনি।

চিরদিন কাছেই পড়ে আছি—মুখের কথা অনেক

শুনেছ, আমিও শুনেছি;

চিঠি লেখবার মত ফাঁকটুকু পাওয়া যায় নি।

আজ আমি এসেছি তীর্থ করতে শ্রীক্ষেত্রে

তুমি আজ তোমার আপিসের কাজে।

শামুকের সঙ্গে খোলসের যে সঙ্গ,

কলকাতার সঙ্গে তোমার তাই;

সে তোমার দেহ-মনের সঙ্গে এঁটে গিয়েছে।...

(দ্বিতীয় পত্র)

পূর্বে বলিয়াছি বাংলাদেশে একজাতীয় কবিতার বীজ, সৃষ্টির আদি
হইতেই রহিয়া গিয়াছে। টমসন সাহেবও Times Literary Supplement-এ এই কথাই বলিয়াছেন। তিনি বলেন, “Bengal is a land made for poetry”... ইহার চেয়ে গুরুতর ঠাট্টা আমাদের কল্পনায় আসে না। সব কথাটি এই—“Bengal is a land made for poetry in its double simplicities—its two

Bengals, that of the Ganges immense and legendary, and that of the sal forested uplands. Its people live with the sense of boundless horizons; the word diganta, which may usually be translated horizon is rarely long away from Bengali poetry."

প্রাকৃতিক দৃশ্যই যদি দেশের কবিত্ব শক্তিকে জাগাইয়া তুলিবার পক্ষে একমাত্র সপ্ত হই তাহা হইলে টমসন সাহেবকে জিজ্ঞাসা করি পৃথিবীর কোন দেশে প্রকৃতি নাই? কোথায়ও পাহাড়পর্বত, কোথায়ও মাঠ ও সমতলভূমি, কোথায়ও অরণ্য, কোথায়ও সমুদ্র, কোথায়ও নদী, কোথায়ও মরুভূমি, কোথায়ও steppe ও prairie, কোথায়ও moor-land, কোথায়ও bog, কোথায়ও ব্রুদ, কোথায়ও বরফ।

অথবা আজীবন দিগন্তরেখা দেখিলেই যদি কোনো জাতি কবিতার প্রেরণা পাইত তাহা হইলে মহাসমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীগণ সকলেই কবি হইত! কিন্তু টমসন সাহেব বাংলা ভাল না বুঝিলেও নির্দোষ নহেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে বাংলাদেশের কাব্যের অতি-জননকে প্রশংসা করিতে হইলে বাংলাদেশের প্রকৃতিকে ইহার কারণস্বরূপ খাড়া করিতে হয়। 'কবিতা' ত্রৈমাসিকের যে লেখাগুলির চেহারা দেখিয়াই টমসন তাহাদিগকে কবিতা বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন—সেই লেখাগুলি যে কবিতা নহে তাহা টমসন মনে মনে জানেন কিনা বলিতে পারিব না, জানিলে তাঁহার এই প্রবন্ধটিকে ব্যঙ্গ প্রবন্ধ হিসাবে ধরিয়া লইতাম।

গল্পকে কবিতার মত সাজাইয়া লেখার যতগুলি ভঙ্গি দেখিয়াছি, তন্মধ্যে অগ্রগতির একটি গল্প আমাদের পক্ষে পুলকিত করিয়াছে। তাহা এই—

খাউ—হরিতকী—শাল—তোতা, ঘুঘু, পায়রা, মনিয়া—
চাঁদ—নক্ষত্রের কি এক বিশাল পৃথিবী!

নিঃশব্দ

শান্ত;

সমারোহে

বিশ্বয়ে

নিঃশব্দ।

এইভাবে শব্দ সাজাইলে বই ছাপাইয়া বাহির করিতে সাধারণ বই অপেক্ষা আট ভাগের একভাগ সময় লাগিবে। ইহাতে বাংলা অক্ষর পরিবর্তন করিয়া রোমান অক্ষর প্রচলন করিবার আর দরকার হইবে না। আমরা আগামী মাসে ইতিহাস ভূগোল এবং অঙ্কশাস্ত্র এইভাবে কবিতায় রূপান্তরিত করিয়া আমাদের কণার সত্যতা প্রমাণ করিব।

বর্তমান সংখ্যা শনিবারের চিঠি যে নূতন মলাটে শোভিত হইয়া সাধারণগণ আশ্চর্যপ্রকাশ করিল তাহা চিত্রিত করিয়াছেন বিখ্যাত কার্টুন-শিল্পী শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র লাহিড়ী, এম-এ। আজ ভাবিয়া অবাধ হইতে হয় যে ইনিই একদা কোনও মফঃস্বল কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপনা করিয়া শান্ত জীবন যাপন করিতেন। অকস্মাৎ কার্টুনের ভূত তাহার স্বপ্নে চাপিয়া তাঁহাকে কেমন করিয়া কলিকাতার ইন্সটিটিউটের মধ্যে আনিয়া ফেলিল তাহা ভূতপূর্ব অধ্যাপক মহাশয়ের অধ্যাপনার বিষয়ের মধ্যেই পড়ে; শনিবারের চিঠির তরফ হইতে আমাদের বলিবার কথা এই যে আমরাই তাঁহাকে এই দুর্ভাগ্যে প্ররোচিত এবং উৎসাহিত করিয়াছিলাম। আমাদের সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত তিনিই আশ্রিও করিয়া চলিয়াছেন, দীর্ঘ পাঁচ বৎসর ধরিয়া নিয়মিত মাসে মাসে শনিবারের চিঠির কার্টুন চিত্র আঁকিয়াই তাঁহার নিষ্কৃতি নাই, শনিবারের চিঠির মলাটও তাঁহাকে বছরবার আঁকিয়া দিতে হইয়াছে।

অধ্যাপনার পথে তাঁহার পদখলন করাইয়া আমরা ভাল করিয়াছি কি মন্দ করিয়াছি তাহার বিচার আমরা করিব না, তবে এই গল্প আমাদের চিরকালই থাকিবে যে বাংলাদেশের ইংরেজী বাংলা সকল সাময়িক পত্রের বিখ্যাত কাটুনিষ্ট ডোয়েজিনিস, পি-সি-এল, প্র-চ-লা অর্থাৎ প্রফুল্ল লাহিড়ী তাঁহার নূতন জীবন-যাত্রা পথে আমাদেরই সহযোগিতা করিয়াছিলেন। ব্যঙ্গরস ও ব্যঙ্গচিত্র যদি কখনও আমাদের দেশে যথাযোগ্য সমানর লাভ করিতে পারে তখনই প্রফুল্ল লাহিড়ী তাঁহার যথার্থ সম্মান লাভ করিবেন এবং সেইদিনই আমরা আপনাবিগকে কৃতার্থ মনে করিব।

—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-এর নূতন কার্য্য নির্বাহক সমিতির সভা নির্বাচন উপলক্ষে সাহিত্য পরিষৎ হইতে ভোটদাতাগণ যথারীতি নির্বাচন পত্র পাইয়াছিলেন। কিন্তু দেখিতেছি পরিষদের কতিপয় হিতৈষী পরিষৎ হইতে প্রেরিত চিঠির উপর ভরসা না করিয়া নিজেরা পৃথকভাবে কুড়িজন ত্যাগী মনোবী এবং পরিষদে সমপিত-প্রাণ ব্যক্তির নাম ছাপাইয়া তাহাদিগকেই ভোট দিবার জ্ঞা ভোটদাতাগণকে অহরোধ করিয়া পৃথক পত্র দিয়াছেন। “পরিষৎকে অমঙ্গলের হস্ত হইতে উদ্ধার” করিবার পক্ষে ইহার যে কিরূপ যোগ্য তাহা ইহাদের নামেই প্রকাশ। কারণ ইহার বঙ্গদেশে প্রায় স্বনামধন্য। অখ্যাত শ্রীযুক্ত স্বনতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নাম ইহাতে নাই। খ্যাত প্রধান প্রধান ব্যক্তির মধ্যে শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীলগপতি সরকার, শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীবিক্রম গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীসত্যত্রয় সেন প্রভৃতি বীণাপাণির সেবাকর্মে বিশ্ববিখ্যাত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। চিঠিখানি এই—

সবিরম নমস্কারপূর্বক নিবেদন,

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ বঙ্গের একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। ইহার সাক্ষ্যে বাঙ্গালীর গৌরব। মনোবী রামেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদী, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বিচারপতি সত্যনাথচন্দ্র মিত্র, রায় চুল্লীলাল বহু বাহাদুর, বোম্বেকেশ মুখোপাধ্যায়, রায় হতীন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রভৃতি কৃতিগণ অসাধারণ আত্মত্যাগ ও অস্বার্থ পরিচয়ের দ্বারা ইহার উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। সেই সকল কন্মী এখন আর ইচ্ছাযুক্ত নাই। অল্প বাহাদুর একদে

বর্ধমান আছেন, তাহারাত ঘটনাক্রমে পরিষদের কর্তৃত্বের হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

নববর্ষের জন্ম দীর্ঘই নূতন কার্য্য-নির্বাহক-সমিতি গঠিত হইবে এবং দুই চারি দিনের মধ্যে আপনাদের হস্তে নির্বাচন-পত্র পৌঁছিবে। আমাদের সনির্বাক্ষ অহরোধ, আপনি এই নির্বাচনে পুরাতন ও নূতন কন্মী এবং ত্যাগশীল ব্যক্তিগণকে নির্বাচন করিয়া সাহিত্য-পরিষৎকে অমঙ্গলের হস্ত হইতে উদ্ধার করুন। বাহাদুর বহদিন ধরিয়া পরিষদের সেবা করিয়া আসিয়াছেন, তাহারের নাম নিশ্চয়ই আপনার হৃদয়গত। তথাপি আপনার সুবিচার জন্ম আমরা এইরূপ ব্যক্তিগণের একটি তালিকা বিবেচনাপূর্বক প্রস্তুত করিয়া পাঠাইতেছি। ইহাদিগকে ছোট দিয়া পরিষদের কার্য্য বাহাতে হৃদয়ে পরিচালিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দেশের কৃতজ্ঞতাজনন হউন। ইতি—

বিনীত

শ্রীগণেশনাথ মিত্র, শ্রীমদ্রথমোহন বহু, শ্রীলগেশনাথ বহু, শ্রীমুগালকান্তি ঘোষ, শ্রীলেন্দ্রচন্দ্র সেন, শ্রীব্রজকুমার সরকার।

চিঠির সহি-কারকগণের মধ্যে দুইজন উক্ত বিশ্ববিখ্যাত ত্যাগী কুড়ি জনের মধ্যে আছেন।

আগামী সংখ্যায় Parvenu Egotist Non-descript ক্লাবের রবীন্দ্রজয়ন্তী নামক সচিত্র নাটক।

শনিবারের চিঠিতে প্রকাশিত নাটক

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভট্ট লিখিত ‘জামাই যষ্টী’ (শনিবারের চিঠি, আষাঢ় ১৩৩২) ‘প্রহারেণ ধনজয়ঃ’ এই নূতন নামে সেনোলা কর্তৃক রেকর্ড করা হইয়াছে।

‘চন্দ্রহাস’ লিখিত ‘ডিক্টেকটিভ’ (শনিবারের চিঠি, চৈত্র ১৩৪২, বৈশাখ ১৩৪৩) নামক নাটক গত ২৪শে এপ্রিল ১৯৩৬ তারিখে বেতার নাটুকে দল কর্তৃক প্রথম অভিনীত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত প্রথমদ্বার বিশী লিখিত ‘কণা কুশা—’ (শনিবারের চিঠি, আশ্বিন কাঙ্গিক ১৩৪২) নাট্যনিকতনে অভিনীত হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ ভট্ট লিখিত 'ভোট ভণ্ডুল' (শনিবারের চিঠি, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০) নামক নাটক মেগাফোন কর্তৃক রেকর্ড করা হইয়াছে, এবং কালি ফিল্ম কর্তৃক সবাকিভাবে রূপান্তরিত হইতেছে।
রবীন্দ্রনাথ মৈত্রেয় 'মানময়ী গার্লস স্কুল' ১৩৩৯ সালের আশ্বিন ও কাশিক সংখ্যা শনিবারের চিঠিতে প্রথম প্রকাশিত হয়।

অমঙ্গলোশন—১৩০৫ পুঠায় অমঙ্গলোশন "হৃদয়ন যে হৃদয়ন নহেন" হইবে।

—১৯১৬ পুঠায় শ্রীধরচন্দ্রকুমার সেনের স্থলে ঘোষ হইবে।

হারমোনিয়ম কিনিতে হইলে ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়মই কেনা উচিত

৫০ বৎসর ধরিয়া ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়ম জ্বরের মাদুর্য্য, গঠন,



স্থায়িত্ব ও অমৃতা গুণের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। অমৃ হারমোনিয়ম কিনিবার জন্য একবার ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়ম সত্বে খোঁজ করিবেন। নব-প্রকাশিত সচিত্র মূল্য-

তালিকার জন্য আশ্চর্য পত্র লিখুন।

সোনোরা ডবল-রীড, বক্স হারমোনিয়ম ৩ অক্টেভ, ৫ ষ্টপ বাক্সহ ৩০ টাকা।

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্স

১১নং এসপ্লেনেড, কলিকাতা

শ্রীপ্রিয়মল গোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত ও শনিগুরুন প্রেস, ২৫নং মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে শ্রীধরো নান কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

স্বাধীনতা সংগ্রাম



৮৮ বর্ষ]

আম্বাড, ১৩৪৩

[১ম সংখ্যা]

বাংলা সাহিত্য ও মুসলমান সম্প্রদায়

সাম্প্রদায়িক সাহিত্য কথাটি অতি অল্প দিন হইল বাংলা দেশে প্রচার হইতে আরম্ভ করিয়াছে, কিন্তু দেখিতে দেখিতে ইহা যে একরূপ উগ্র হইয়া উঠিবে একরূপ কল্পনা করিতে পারি না। এই উগ্রতার স্বরূপ দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। মোহাম্মদী নামক মাসিকের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা একটি বিশেষ সংখ্যারূপে দেখা দিয়াছে, এবং এই সংখ্যার ঘাবতীয় লেখক সমস্তের প্রচার করিয়াছেন যে হিন্দুদের রচিত সাহিত্য এবং ইতিহাস মুসলমানদের পক্ষে অপাঠ্য। এই প্রচারের ভাষা অধিকাংশ স্থলেই স্বকচিত্র পরিচায়ক নহে, কেন না ইহা দ্বারা তাঁহারা শুধু হিন্দুদের রচনা নহে, তাঁহাদের ধর্মকেও আক্রমণ করিয়াছেন। হিন্দুরা যদিও মুসলমানদের ধর্মকে কখনও আক্রমণ করেন নাই, তথাপি ইহারা মনে করিয়াছেন, যদি হিন্দু সাহিত্যের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিতে হয় তাহা

হইলে তাহাদের ধর্মকে অঙ্গীকার করিতে না পারিলে আপাতত মনের জালা জুড়াইবে না। যদি ইহাতে জ্বালা কিছু নিবৃত্তি হইয়া থাকে তাহা হইলে স্বপ্নের বিষয়, কারণ সাহিত্যের বিরুদ্ধে আক্রমণটি ঠিক সাহিত্যের বিরুদ্ধেই হয়ত নহে, কারণ সাহিত্য বৃষ্টিবার মত বা বৃষ্টিয়া সে সম্বন্ধে দীর্ঘভাবে আলোচনা করিবার মত মনের অবস্থা কাহারও আছে বলিয়া মনে হইতেছে না।

বাংলা সাহিত্য যদি প্রকৃতই মুসলমানের অপাঠ্য হয়, এবং যদি একরূপ ধারণার মূল যুক্তি না থাকিয়া কেবল সাম্প্রদায়িকতাই থাকে, তাহা হইলে ধর্মকে বা সাহিত্যকে আক্রমণ না করিয়াও, অল্পভাবে হিন্দু সংস্পর্শ বর্জনের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। কারণ, শুদ্ধ মাজ বিদ্যাক্ষার করিলে বাঞ্ছিত আদর্শ লাভে বিষয় ঘটে এবং সমস্তাও উত্তরোত্তর জটিল হইতে থাকে। মুসলমানগণ যদি ধর্মের ছলে দাবী করেন যে বক্ষিমচন্দ্রের রচনার এক তৃতীয়াংশ আমরা পড়িব না; মাইকেল মধুসূদন দত্তের রচনাব্যবস্থাকে বর্জন করিব বা রবীন্দ্রনাথের রচনার এক পঞ্চমাংশ অপাঠ্য বলিয়া ঘোষণা করিব, তাহা হইলে সাহিত্যের বিচারে সে দাবী অগ্রাহ্য হইবে। ধর্মের সঙ্গে সাহিত্যের মুখা কোন সম্বন্ধই নাই। স্বতবাংসে ধর্মের দাবী এ পথে অচল। ইহা শুধু বাংলা দেশের সাহিত্য সম্পর্কে নহে, পৃথিবীর সর্বত্রই সাহিত্য বিচারের এই একই রীতি। স্বতরাং মুসলমানদের ভাবিয়া দেখিতে হইবে কি করিলে একবারে বাংলা সাহিত্যকেই বর্জন করা যাইতে পারে। ইহা না করিলে চলিবে না, কারণ সাম্প্রদায়িকতা যখন উগ্র হইয়া ওঠে তখন চিন্তে আর যুক্তির চিহ্ন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, এবং একরূপ অবস্থায় নিজের মনের উত্তেজনাকেই একমাত্র যুক্তি বলিয়া ভ্রম হয়। এই ভ্রম মারাত্মক হইলেও ইহাকে আমরা স্বীকার

করিয়া লইতেছি। কারণ আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি মুসলমানগণ বাংলা সাহিত্য পড়িয়া পদে পদে হিন্দু সংস্কৃতির জ্বলে পড়িয়া যাইতেছেন এবং যত দিন যাইতেছে, যত মুসলমানদের ভিতর পঠনক্ষম লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, যত তাঁহারা বাংলা সাহিত্য শুলে বা কলেজে পড়িতেছেন ততই তাঁহাদের মধ্যে মুসলমান ধর্ম ত্যাগ করিয়া হিন্দু হইয়া যাইবার জন্ম একটা প্রাণান্তকর উৎসাহ দেখা যাইতেছে। বাংলা সাহিত্যের এমনি একটা উগ্র মোহ আছে যে ইহা পড়িতে গেলেই যে কোনো ধর্মের লোক স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া হিন্দু-ধর্মে দীক্ষিত হইবার জন্ম ছুটফট করে। এমন কি বাংলা সাহিত্য পড়ার ফলে বর্তমান যুগের মুসলমানদের ভিতর হইতে সাম্প্রদায়িক মনোভাবও দ্রুত লোপ পাইয়া যাইতেছে।

একরূপ অবস্থায় বাংলা সাহিত্য ত্যাগ করা ভিন্ন মুসলমানদের উপাধাত্তর নাই। বাংলা সাহিত্য ত্যাগ করার প্রশ্ন তুলিতেছি এই জন্ম যে এই সাহিত্য একরূপ ভাবে রচিত হইয়াছে যে ইহার শিরায় শিরায় হিন্দুর দেব দেবতার পরিচয়, হিন্দুর ঐতিহ্য, হিন্দুর সংস্কার, হিন্দুর ধ্যান, রক্তের জ্বালাময় প্রবাহিত হইতেছে। আরও জুগের বিষয় এই যে হিন্দুরা এদেশে প্রাচীনকাল হইতে আছে এবং তাহারা প্রাচীনকাল হইতেই সাহিত্য রচনা করিয়া আসিতেছে। হিন্দুরা যদি বৃদ্ধি করিয়া তাহার সাহিত্যে আরব দেশের ঐতিহ্য-পরিচয় ঢুকাইয়া দিতে পারিত তাহা হইলে আজ এই অবস্থার উদ্ভব হইত না। আরবদেশের সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সে উত্তরাধিকার স্বত্ত্ব লাভ করে নাই এ কথা সত্য, কিন্তু সাহিত্য রচনা করিতে গেলে সব সময় অন্তরের কথাই প্রকাশ করিতে হইবে একরূপ কোন বাধাত্মক বিধি নাই। সত্য বটে এদেশের অধিকাংশ মুসলমান পূর্বে হিন্দু ছিলেন, কিন্তু তাই বলিয়া কি তাহারা আরব

দেশের যুগ যুগান্তরের সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সত্ত্বে অস্ত্বে অস্থব করেন না? অস্থব অবশ্যই করেন, এবং সেই জগ্গই বাঙালী হইয়াও বাংলা দেশের প্রাচীন কোনো সংস্কৃতিই তাহাদের চিন্তে চিরস্থায়ী হয় নাই।

স্বতরাং দেখা যাইতেছে হিন্দু বাঙালী অজ্ঞাবধি যে সংস্কৃতির জ্ঞেয় টানিয়া চলিয়াছেন, বাংলা সাহিত্যেও তাহা প্রকাশ করিয়া বড়ই অজ্ঞায় করিয়াছেন। বাঙালীর পক্ষে সর্বাপেক্ষা অজ্ঞায় বাহা হইয়াছে তাহা কিন্তু মুসলমানগণ ধরিতে পারেন নাই। হিন্দুগণ বাংলা সাহিত্যের সাহায্যে যে-কোনো বাংলাভাষীকে অত্যন্ত হীন উপায়ে হিন্দু সংস্কৃতিতে দীক্ষিত করিয়া আসিতেছে। হীন উপায় বলিলাম এই জগ্গ যে উপায়ে গোপনীয়, সহজে কাহারও পরিবার উপায় নাই। আমরা তাহা খোলাখুলি ভাবে প্রকাশ করিয়া দিতেছি।

সকলই জানেন মুসলমানগণ একেশ্বরবাদী। তাহাদের পক্ষে অজ্ঞা ধর্মের, বিশেষ করিয়া হিন্দুধর্মের কোনো দেবতার নাম সদাসর্বদা উচ্চারণ করা কলাপকর নহে, দেবতার নাম সদাসর্বদা লেখা আরও অকলাপকর। কিন্তু হিন্দুরা অতি কৌশলে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের দ্বারা এই কাণ্ডটি সর্বদা করাইয়া লইতেছে। হিন্দুদের বিরুদ্ধে মোহাম্মদী সম্ভব অসম্ভব প্রায় সকল রকম অভিযোগই করিয়াছেন কিন্তু এই অভিযোগটি করেন নাই, কেননা হিন্দুদের এই কৌশলটি মোহাম্মদী ধরিতে পারেন নাই। আমরা হিন্দু, আমরা সর্বদা আল্লার নাম করিতে পারি—অতি আন্তরিক ভাবে আল্লার নিকট আমাদের প্রার্থনা জানাইতে পারি। আমরা বীশু খ্রীষ্টের নাম সর্বদা লইতে পারি—বীশু খ্রীষ্টের নিকট প্রার্থনা করিতে পারি—খ্রীষ্টান চার্চে গিয়া রবিবারে উপাসনা করিতে পারি। কারণ নাম আমাদের নিকট কিছুই নহে—আমরা

জানি সমস্ত বিশ্বের স্রষ্টা একজন মাত্রই ঈশ্বর আছেন—তাহার নাম একমাত্র বাংলা ভাষাতেই হইবে একুপ মনে করি না। এবং বাংলা ভাষাতেও যে একটি মাত্র নামই থাকিবে তাহাও মনে করি না। পৌরাণিক দেবতার নাম শত শত আছে, আমরা নানা মতের হিন্দু নানা ভাবে তাহাদের নামে ঈশ্বরের পূজা করিয়া থাকি এবং তাহাতেও আমাদের কিছু অর্থ হইল বলিয়া মনে করি না। একুপ করিলেই যে আমরা হিংস্র হইয়া উঠি বা পরধর্ম-অসহিষ্ণু হইয়া পড়ি তাহাও নহে। এমন কি ধর্ম আমাদের এমনই স্বাধীনতা যে অনেক সময় ঈশ্বর আছেন কিনা একুপ মনেও করিয়া থাকি—এবং ইহাতেও আমাদের হিন্দু থাকিতে আটকায় না।

কিন্তু মুসলমানগণ একুপ নহেন। তাহাদের ধর্ম ভাল কি মন্দ সে বিচার আমরা করিব না, কেননা এই বিশ্ব আমাদের নিকট একটি জটিল রহস্য। কে কি ভাবে এরহস্য ভেদ করিয়া ভগবানের সঙ্গে বোঝাপড়া করিয়া থাকেন তাহা আমরা বুঝি না। যে সমাজে যত শাধু এবং যত সজ্জন থাকেন সেই সমাজকে আমরা তত বেশি শ্রদ্ধা করি। সে সমাজের লোক হিন্দুই হউন বা মুসলমানই হউন বা খ্রীষ্টানই হউন শ্রদ্ধেয়ের নিকট আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদনে কোনোরূপ সংস্কার নাই। আমরা মাছুয়-বিচার যেমন ধর্মের দ্বারা করি না, তেমনি সাহিত্য-বিচারও ধর্মের দ্বারা করি না।

আমরা যে একজন্ম সহৎ সে কথা বলিতেছি না, আমরা কি তাহাই বলিতেছি। কিন্তু আমাদের নিকট আমাদের পূর্বপুরুষবিগেস্ত একটি কাজ বড়ই অজ্ঞায় বলিয়া মনে হইতেছে। অবশ্য ইহাতে পূর্বপুরুষদের বিশেষ কোনো দোষ নাই। তাহারা জানিতেন না যে পৃথিবীতে একুপ ধর্মের লোকও আমাদের সঙ্গে এক দেশে বাস করিবেন তাহাদের পক্ষে

হিন্দু দেবতার নাম সর্গদা উচ্চারণ করা অথবা হিন্দু দেবতার নাম সর্গদা লেখা পাপ বলিয়া গণ্য হইবে। আমি বাংলা অক্ষরের কথা বলিতেছি। বাংলা বর্ণমালার অধিকাংশই হিন্দু দেবতার নাম। এই নামগুলি আমাদের বাঙালী মুসলমান ভ্রাতাগণ সর্গদা লিখিতেছেন। লিখিতেছেন এবং স্বধর্মের নিকট সর্গদা অপরাধী হইতেছেন। মুসলমানগণ এতদিন খুব সস্তব ইহা জানিতেন না, কিন্তু আমাদের উচিত ইহা প্রকাশ করিয়া দেওয়া। এইরূপ চতুর উপায়ে, যেন প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্তই, মুসলমানদের হাত দিয়া সর্গদা হিন্দু দেবতার নাম লিখাইয়া লওয়া হইতেছে। আমি নিম্নে একটি তালিকা দিতেছি। আশা করি মুসলমানগণ এ বিষয়টি চিন্তা করিয়া দেখিবেন। যদি ইহার পরেও দেখি ইহাতে মুসলমানদের কোনই আপত্তি নাই তাহা হইলে বুঝিব তাহাদের সাহিত্য সম্পর্কে আপত্তি হিন্দু সংস্কৃতি বা দেবতার নামের জন্ত নহে—আপত্তির অন্য উদ্দেশ্য আছে। তালিকাটি এই—

অ—বিষ্ণু।

আ—শিব, ব্রহ্ম।

ই—কামদেব।

ঈ—লক্ষ্মী, কন্দর্প, কমলা।

উ—শিব।

ঊ—শিব।

ঋ—দেবমাতা, অদ্বিতি।

ঌ—শিব।

৐—দেবমাতা, অদ্বিতি।

এ—বিষ্ণু।

ঐ—শিব।

৩—ব্রহ্ম।

৪—(শূদ্রজাতির) প্রণব।

ক—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, যম, দক্ষ।

গ—গন্ধর্ব্ব, গণেশ।

চ—চণ্ডেশ্বর।

জ—শিব, বিষ্ণু।

ঝ—বৃহস্পতি, দৈত্যরাজ।

ঞ—ওজাচার্য্য।

ট—শিব।

ড—শিব।

ন—গণেশ।

ব—বক্রণ।

অ—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর।

ঐ—ইন্দ্র।

শ—শিব।

স—বিষ্ণু, শিব।

হ—বিষ্ণু, শিব।

স্বতরাং দেখা যাইতেছে, প্রত্যহ শিক্ষিত বাঙালী-মুসলমানের কেহ না কেহ বাংলা অক্ষরের নামে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি যাবতীয় হিন্দুর উপাশ্রয় দেবদেবতার নাম অথবা পুরাণবর্ণিত ব্যক্তিদের নাম লিখিতেছেন। Conquest of Culture এইখান হইতেই আরম্ভ। ইংরেজগণ ভারত অধিকার করিবার পর ইংরেজদের সংস্কৃতির প্রভাব বাঙালী হিন্দুর উপর বিস্তার করিলেন, মুসলমানদের উপর করিতে পারিলেন না। কিন্তু ইংরেজের সংস্কৃতি বাঙালী হিন্দুর পুরোক্ষ ভাবে উপকারই করিল। কারণ ইংরেজের প্রভাবে প্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িবার জন্তই হঠাৎ হিন্দুর আত্মবোধ জাগরিত হইল, অর্থাৎ তাহার নব জাগরণ হইল। হিন্দুর সংস্কৃতি ইউরোপ আমেরিকায় প্রচারিত হইতে লাগিল। হিন্দুর প্রাচীন জ্ঞানভাণ্ডার নতুন করিয়া হিন্দুর অধিকারে আসিল। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরাও কিন্তু এ বিষয়ে তাহাকে সাহায্য করিলেন। এই ভারতবর্ষের মাটিতে, ভারতবর্ষের আবহাওয়ায় যাহার উদ্ভব তাহা অতি সহজেই হিন্দুর প্রাণের সঙ্গে পুনরায় মিলিয়া গেল—এবং ভারতবর্ষে জন্মিয়া ভারতবর্ষীয় হিন্দু স্বভাবতই আপন সম্পদকে অতি আপনায় বলিয়া জ্ঞান করিল—আরব কিংবা মিশরের সংস্কৃতিকে আপনায় বলিয়া জ্ঞান করিতে পারিল না। সে আপনার দেশকে মা বলিয়াই ডাকিল এবং বহু শতাব্দী ধরিয়া মুসলমান সংস্পর্শে থাকিয়াও সে আপনার মাতৃভাষাতেই তাহার গ্রন্থাদি রচনা করিতে লাগিল। আরব পারস্য বা অছাচ্চ ভাষা হইতে অনেকগুলি শব্দ তাহার ভাষায় প্রবেশ করিল বটে, কিন্তু ইহা এতই সহজে হইল যে

ইহাতে তাহার আপন ভাষাকে বিরূত করিতে পারিল না। ভাষা বিরূত না হইবার আরও একটি কারণ এই যে এদেশের যে সব হিন্দু মুসলমান-ধর্মে দাক্ষিণ্য হইলেন তাহারা নিজেদের নামও ভারতীয় ভাষায় রাখিলেন না—একবারে খাটি আরব ভাষায় রাখিলেন। ইহাতে হিন্দু সঙ্গ তাহাদের আত্মীয়তা একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। শুধু নাম নহে পোষাকও ভারতীয় রহিল না। ধর্মের সঙ্গে নিজের নাম ও নিজের পোষাকের যে কি সম্বন্ধ থাকিতে পারে তাহা আমরা বুঝি না। কারণ হিন্দু যখন খ্রীষ্টান হয় তখন তাহার এরূপ বিকার ঘটে না। ধর্মাস্তর গ্রহণের সময় ধর্মের নিয়ম অমুযায়ী অথ একটি নাম গ্রহণ করিতে হয় বটে কিন্তু তাত্কা শতকরা নিরানব্বই জন ভারতীয়-খ্রীষ্টান কাথ্য ব্যবহার করেন না, ভারতীয় নামই ব্যবহার করেন। ভারতীয় খ্রীষ্টান ইহাও কখনো মনে করেন না যে খ্রীষ্টান ধর্মের সঙ্গে ভারতীয় পোষাকের কোনো বিরোধ আছে। শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দাস বা শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মল্লিক খ্রীষ্টান হইয়াও শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দাস এবং শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মল্লিকই থাকেন, খ্রীষ্টান হইয়াও খাটি স্বদেশী পোষাকে থাকেন, ইহাতে তাহাদের ধর্মের কিছুমাত্র ক্ষতি হয় না। বরঞ্চ এরূপ করাতে অতি সহজেই হিন্দুর সঙ্গে তাহাদের আন্তরিক প্রীতি বজায় থাকে। ধর্ম (religion বা creed) অস্তরের জিনিস; উহা ব্যক্তিগতও বটে—আমরা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কখনও ধর্মকে টানিয়া আনি না—কিন্তু বাহিরের ক্ষেত্রে ভাষা, আচার-ব্যবহার এবং পোষাক এক না হইলে আত্মীয়তায় কোণায় যেন বাধা পাই। বাঙালী খ্রীষ্টান বাঙালী হিন্দুর সঙ্গে সাফল্য কালে খাটি মাছুভাষাতেই নমস্কার জানাইয়া থাকেন, কখনও হিব্রু বা গ্রীক ভাষায় অভিনন্দন জানান না, এবং ঠিক এই

কারণেই বাঙালী-খ্রীষ্টানের সঙ্গে বাঙালী-হিন্দু নিজের অজ্ঞাতসারেই আত্মীয়তা অমুভব করে, মুসলমানের সঙ্গে ঠিক সেরূপ করে না। আমাদের সাহিত্যে যেমন আমরা হিন্দুদের আচার ব্যবহার লইয়া অনেক সময় ব্যঙ্গ করি, তেমনি খ্রীষ্টানদের আচার ব্যবহার লইয়াও অনেক সময় ব্যঙ্গ করি—করিবার সময় নিজের অজ্ঞাতসারেই মানিয়া লই যে যাহাদের ব্যঙ্গ করিতেছি তাহারা আমাদেরই আত্মীয়। কিন্তু হিন্দু-লেখক মুসলমানদের আচার ব্যবহার বা সমাজ লইয়া কোন ব্যঙ্গ দূরে থাক নিজের জ্ঞান বুদ্ধি মত কোনো কথাই বলিতে ইচ্ছা করেন না। কেন না আমরা জ্ঞান অধিকার মুসলমান যুক্তিতর্কের দ্বার ধারেন না—যদি কখনও মনে করেন হিন্দু লেখক তাহার প্রাণে আঘাত দিয়াছেন—তখনই সেই হিন্দু-লেখকের জঘা আত্মলিপ্সের প্রয়োজন অমুভূত হইবে। তখন হয়ত মেডিক্যাল কলেজের ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডে তাহাকে পাওয়া যাইবে। হয়ত শ্রদ্রশান পর্য্যন্তও যাওয়ার প্রয়োজন হইতে পারে।

এইভাবে মুসলমানগণ সর্কতে, হয়ত স্বেচ্ছায় নহে, কিন্তু আপন ধর্মের অমোঘ বিধি দ্বারা ইহা হিন্দু হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছেন। নাম এবং পোষাক পরিবর্তন অবশ্যই মুসলমান-ধর্মের বিধান, ইহার উপরে মানুষের কোনো হাত নাই, স্তবরাং ইহা লইয়া আমরা অভিযোগ করিলে তাহা হাস্যকর হইবে।

কিন্তু সর্কদা ইহা মনে রাখিতে হইবে ভারতবর্ষ হিন্দুর দেশ। ভারতীয় খ্রীষ্টানগণও এ কথা মানিয়া থাকেন। কারণ তাহারা যে ধর্মে-খ্রীষ্টান হইলেও জাতিতে হিন্দু, এটুকু অমুভব করিবার মত বোধশক্তি তাহাদের আছে—এবং আছে বলিয়াই নাম এবং পোষাক বদলাইয়া ফেলিবার প্রয়োজন তাহাদের নাই। ভারতবর্ষ যে স্বদেশ

একথা কেবল ইউরোপীয়গণ ভাবিতে পারেন না, যদিও কোনো কোনো আংলো-ইণ্ডিয়ান একরূপ ভাবিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আর এ দেশকে স্বদেশ ভাবিতে পারিতেছেন না মুসলমানগণ। ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভাবিলে এদেশের সংস্কৃতিকেই আপনার একমাত্র সংস্কৃতি বলিয়া তাহাদের মনে হইত। তাহারা ধর্ম মুসলমান থাকুন—মুসলমান-ধর্ম তাহারা অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত পালন করুন, কিন্তু মনে প্রাণে তাহারা ভারতীয় হউন। একরূপ হইলে দেখিতে পাইবেন যে এদেশের বেদ উপনিষদ, তাহাদেরই দেশের গৌরবময় যুগের তাহাদেরই পূর্ব পুরুষের রচিত—এদেশের বাহ্যিক বাস কালিদাস ভবভূতি তাহাদেরই স্বদেশীয়। এদেশকে আপন দেশ বলিয়া মনে করিলে রামায়ণ মহাভারতকে আর 'কেচ্ছা' বলিয়া মনে হইবে না, যেমন মোহাম্মদীর মনে হইয়াছে। কিন্তু হায়রে দুর্ভাগ্য!—এরূপ হইবার নহে, কখনও হইবেও না।

মোগল যুগে হঠাৎ কি করিয়া হিন্দু মুসলমান সংস্কৃতির মিলন হইয়াছিল তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে। মোগল শাসকগণ কেহই ভারতীয় ছিলেন না, স্বতন্ত্র হিন্দু-মুসলমানের পার্থক্যের মধ্যে কোনো ক্রটিমতাও ছিল না। এবং এই কারণেই পরস্পর মিলনে কোনো বাধা ছিল না। ইউরোপীয়ের সঙ্গে ভারতীয়ের ভেদ স্বাভাবিক, ইহা মনকে পীড়িত করে না, কিন্তু কোনো ভারতীয় যদি নিজেকে ইউরোপীয় বলিয়া মনে করে তাহা হইলে তাহার সহিত ভারতীয়ের মিলন হওয়া প্রায় অসম্ভব। আজ যদি ভারতীয় খ্রীষ্টানগণ বলিতে আরম্ভ করেন, প্যালেস্টাইনের সভ্যতাই আমাদের সভ্যতা, প্যালেস্টাইনের পোষাকই আমাদের পোষাক, প্যালেস্টাইনের ভাষাই আমাদের ভাষা, তাহা হইলে খ্রীষ্টানদের সহিত হিন্দুর

স্বাভাবিক আত্মীয়তা চিরদিনের জন্ত নষ্ট হইয়া যাইবে। কিন্তু স্বপ্নের বিষয় ভারতীয় খ্রীষ্টানগণ একরূপ মনে করিবার মধ্যে কোনো নুসি খুঁজিয়া পান না। এই জন্তই এদেশ মধুসূদন দত্তের মত প্রতিভা সম্ভব হইয়াছিল। তিনি ধর্ম খ্রীষ্টান হইয়াও তাহার স্বদেশের ঐতিহ্যকে অস্বীকার করিতে পারেন নাই। কারণ পূর্বেই বলিয়াছি সাহিত্যের সহিত রিলিজিয়ন বা ক্রীড়ার সম্পর্ক নাই। ভারতীয় সাহিত্যে ভারতীয়ই পুরাতাত্ত্বিক থাকিবে—ইহাই ত স্বাভাবিক। যে মাটিতে তাহার উদ্ভব সেই মাটিতে জন্মিয়া তাহাকে পুরাপুরি অস্বীকার করা চলে না। শুদ্ধমাত্র সাম্প্রদায়িকতা দ্বারা কোনো বিষয়ে সত্যকার অধিকারও জন্মে না। বহুদিনের কঠোর নিষ্ঠাধারা ভারতবর্ষীয় প্রাচীন ঐশ্বর্যের উত্তরাধিকার লাভ হয়। তাহার রামায়ণ মহাভারতকে 'কেচ্ছা' বলিয়া বেটুকু আত্মপ্রসাদ মুসলমানেরা লাভ করিতেছেন তাহার জন্ত কোনো

হিন্দুই মুসলমানকে ঈর্ষা করিবে না। রামায়ণ মহাভারতের মূল্য কি তাহাও বুঝাইবার জন্ত কেহ উৎসাহিত হইবে না। আসল কথা এই যে এদেশের ভাষায় কথা বলিতে গেলে অথবা সাহিত্য রচনা করিতে গেলে সেই সময় নিজের রিলিজিয়ন বিস্মৃত হইতে হইবে। হিন্দু যখন সাহিত্য রচনা করে, তখন সে যে হিন্দু সে কথা ভুলিয়া থাকে—হিন্দুর স্বর তাহার সাহিত্যে স্বভাবতই ফুটিয়া ওঠে। বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে কাজি নজরুল ইসলাম অনেক উৎকৃষ্ট কবিতা লিখিয়াছেন—সেগুলির স্বর কোনো রিলিজিয়নের স্বর নহে—স্বতন্ত্র তাহা হিন্দুর স্বর। হিন্দুর স্বর অর্থে হিন্দু রিলিজিয়নের স্বর নহে—হিন্দু সংস্কৃতির স্বর এবং এই স্বর খ্রীষ্টান মধুসূদন দত্তে ফুটিয়াছিল বলিয়াই তাহার রচনা বাংলা সাহিত্যের

আসন অলঙ্কৃত করিতেছে। আরবের স্বর বা প্যালেস্টাইনের স্বর বা মিশরের স্বর ভারতীয় সাহিত্যে লাগিবে না। হিন্দুস্থানে বসিয়া হিন্দুস্থানের স্বর আয়ত্ত করিতেই হইবে ইহা ছাড়া অল্প পথ নাই।

কিন্তু অল্প পথ নাই একথা বোধ হয় সম্পূর্ণ ঠিক নহে। আরও একটা পথ আছে—এবং এই পথের কথাই আমরা গত কয়েক মাস ধরিয়া বলিয়া আসিতেছি। অর্থাৎ মুসলমান ধর্মের যেরূপ বিধান দেখিতেছি তাহাতে তাহারা মুসলমানও থাকিবেন এবং ভারতীয়ও হইবেন ইহা সম্ভব হইবে না। ইহাই যদি সত্য হয় তাহা হইলে মুসলমানগণ অনর্থক বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে আপোষ করিতে আসিতেছেন। ইহার আপোষ হয় না। বাংলা সাহিত্য পড়িতে গেলে বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হইতে হইবে—রামায়ণ মহাভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিতে হইবে, allusions দেখিয়া চমকাইলে চলিবে না। আর যদি বাংলা সাহিত্য এভাবে পড়া অসম্ভব হইয়া ওঠে তাহা হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট আবদন করিয়া বাংলার গৌরবময় সাহিত্যকে মুসলমান ক্রোড়ের উপযুক্ত করিয়া লইবার চেষ্টা না করাই ভাল, কেন না ইহাতে সাহিত্যের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। বাঙালী হিন্দু, বাঙালী খ্রীষ্টান, এবং বাঙালী সাহিত্যের সহিত পরিচয়কামী অল্পদেশবাসী ইহা সমর্থন করিবেন না। এক্ষেত্রে মুসলমানের উচিত বাংলা ভাষা বর্জন করা, আর ইহা একেবারে অসম্ভব হইলে তাহাদের জন্য পৃথক বাংলা বই ব্যবস্থা করা—যে বই বাংলা অক্ষরেও লিখিত হইবে না—উদ্ভূত হইবে। কারণ পূর্বেই বলিয়াছি হিন্দু দেব দেবতার নাম উচ্চারণ করিলে যদি মুসলমানধর্ম দুর্বল হইয়া পড়ে তাহা হইলে দেব দেবতার নামার্থক বাংলা অক্ষর লিখিলেও সেই বিপদ। যদি

মুসলমানেরা বলেন, হিন্দু দেব দেবতার নাম লিখিলে তাহাদের ক্ষতি হয় না, তাহা হইলে আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি—উহা পড়িলেই বা ক্ষতি হইবে কেন? ক্ষতি যদি হয় তবে লেখা হউক বা পড়া হউক হইবেই। স্বতরাং মূল কথা যাহা পাড়াইল তাহা এই—(ইহার একটি মানিতে হইবে)

১। মুসলমানগণ বাংলা সাহিত্য পূরাপূরি পড়িবেন।

২। মুসলমানগণ বাংলা সাহিত্য পূরাপূরি বর্জন করিবেন।

৩। মুসলমানগণ হিন্দু-রচিত বাংলা সাহিত্য সুবিধা মত কাটিরা ছাটিয়া লইয়া উর্দু অক্ষরে পৃথকভাবে বই ছাপাইয়া পড়িবেন।

এই তিনটি প্রস্তাবের একটিমাত্র গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা যদি না হয় তাহা হইলে সহজেই বুঝা যাইবে যে বাংলা সাহিত্যে হিন্দু সংস্কৃতির ভয়েই মুসলমানগণ এ আন্দোলন করিতেছেন না। মুসলমানগণ যে লজিক-জাল বিস্তার করিয়াছেন তাহার মধ্যে তাহারা নিজে জড়াইয়া পড়িবার পূর্বে আমাদের প্রভাবিত ব্যবস্থা অবলম্বন করুন। তাহা যদি না করেন তাহা হইলে আন্দোলন বন্ধ করুন।

নিম্নেকেরা বল, মোহাম্মদীয় এ আন্দোলন নিছক হিন্দু-সংস্কৃতি-ভীতিই নহে। ইহা সাহিত্য সম্পর্কীয় আন্দোলনও নহে। ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে কমুনাল রেপ্রেজেন্টেশনের গাণিতিক হিসাব। অর্থাৎ রাষ্ট্রে যদি তাহারা সংখ্যা অল্পপাতে চাকরি পান, তবে সাহিত্যে বা বিজ্ঞানেই বা লোকসংখ্যার হিসাব চলিবে না কেন?

তাহারা বোধহয় পাঠ্যপুস্তক শতকরা পঞ্চাশটির রচনা মুসলমানের হউক ইহা চাহেন, যেমন চাহেন তাহারা সংখ্যা অল্পপাতে শিক্ষাক্ষেত্রে চাকরি। হিন্দুরা যদিও শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রায় এক কোটি টাকা দান করিয়াছেন এবং মুসলমান করিয়াছেন মাত্র কয়েক হাজার।

টাকা—তবুও দেশকে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার আগ্রহ যে মুসলমানদেরই অধিক ইহাতে আর সন্দেহ নাই। এই অল্প বিজ্ঞান কলেজেও কয়জন হিন্দু শিক্ষক এবং কয়জন মুসলমান শিক্ষক আছেন তাহার তালিকা ছাপিয়া মোহাম্মদী হিন্দুদের অবিচার প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু একথা কখনও তাঁহার বুদ্ধিবেশ না যে সাহিত্যে বা বিজ্ঞানে যেমন, চাকরির ক্ষেত্রেও তেমনি ধর্ম ভুলিয়া যোগ্যতার কথাই তুলিতে হয়। যে-কোনো একজন মুসলমান গ্র্যাডুয়েট মিনিষ্টার হইতে পারেন বলিয়াই তিনি যে সাহিত্য ইতিহাস বিজ্ঞান দর্শন বা অদ্বৈতশাস্ত্রও পড়াইতে পারিবেন মোহাম্মদীর হঠাৎ এরূপ মনে হইবার কি কারণ ঘটিল? মোহাম্মদী হিন্দুদের যোর পক্ষপাতিন্ধের এতগুলি লিষ্ট দিয়াছেন, কিন্তু হিন্দু যে প্রায় এক কোটি টাকা, হিন্দু এবং মুসলমান উভয়ের শিক্ষার অছই বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করিয়াছেন এবং করিয়া অছায় করিয়াছেন সে কথাটি উল্লেখ করেন নাই কেন?

সুতরাং মোহাম্মদীর কোনো যুক্তিই টিকিতেছে না। অপরপক্ষে মুসলমানদের মধ্যেই বাহারা শিক্ষিত এবং সংস্কৃতি সম্পন্ন তাঁহার। সর্বদা শিক্ষাক্ষেত্রে মোহাম্মদীর ছায়া গোড়ামির তীব্র প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছেন। অল্পদিন হইল মিঃ আলতাফ চৌধুরী একখানি বাংলা বার্ষিক পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার নিবেদনে তিনি যে সব কথা লিখিয়াছেন তাহাতে তাঁহার সত্যকথা বলিবার দুর্জয় সাহসে আমরা বিস্মিত হইয়াছি। তিনি বলিতেছেন—

“...এই হতভাগ্য দেশে হিন্দু-মুসলমানের রাষ্ট্রীয় স্বার্থের বাস্প-বিন্দুকে আশ্রয় করে সম্প্রদায়ের মধ্যে যে জাতভ্রোহিতার ঘনমেঘ

জমে উঠেছে তা আজ সাহিত্যের এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিপর্যাস্ত করে তুলেছে।...যে বিকৃত বুদ্ধির ফলে আজ মুসলমানের শিক্ষার ব্যবস্থাপকরা রাজপুত্রের বীরত্ব কাহিনী শিক্ষার্থীকে পড়তে দিতে চান না, সেই বিকৃত বুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে তাঁরা যদি এক দিন মুসলমানকে গম্ভীর জল ব্যবহার করতে নিষেধ করে বলেন তবে “বাহোবা”র আর অস্ত থাকবে না। তৈমুর লঙ্গ বা জেঙ্গীস খানকে ইংরেজি অক্ষরের পত্র থেকে উদ্ধার করে যদি বা বাংলা অক্ষরের উপর প্রাড়া করিয়ে দেওয়া সোজা হয়, কিন্তু ইউফ্রেটিস নদীর জলধারাকে বাংলাদেশের মাটির উপর টেনে আনবার মত প্রচেষ্টায় প্রথমত আরব্য মরুভূমির সীমা ছাড়বার আগেই ইউফ্রেটিসের শীতল স্রোত যাবে বাষ্প হয়ে উড়ে এবং বোধ করি তারও পূর্বেই বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ আড়াই কোটি পিপাসার্ত শুষ্ককণ্ঠ মুসলমান হবে মৃত! এই উপমা মনের ক্ষেত্রেও সমান প্রয়োগ করা চলে।

“শোনা যাচ্ছে মুসলিম জাগরণ শুরু হয়েছে। এই যদি তার সূচনা হয় তবে পরিণতি যে তার কোথায় গিয়ে পড়াবে তা অনেকের কাছেই স্পষ্ট। তবে সাহিত্যের দিক থেকে বিশেষ আশঙ্কার কারণ আছে বলে আমরা মনে করি না। কারণ সাহিত্য ক্ষেত্র মানবমনের লীলাক্ষেত্র, কোনও জাতিগত গোষ্ঠীর বা সম্প্রদায়ের আধিপত্য সেখানে থাকে না।...শুধু দুর্ভাগ্য তাদেরই যারা আলোক নিয়ন্ত্রিত উদয়াচলের পথের দিকে না চেয়ে আজ সত্যের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে চলেছে—যারা পূর্বদিককে সূর্যোদয়ের দিক না বলে’ আজ বলতে চাইছে “আমরা যে দিকে মুখ করিয়া নামাজ পড়ি তাহার উদ্দাটিক”! দুর্ভাগ্য আর কারণ নয় শুধু এই হতভাগ্য বাংলাদেশের মুসলমানের। (বর্ষবাণী, ১৩৪৩)

কিন্তু উগ্র সাম্প্রদায়িকতার নিকট এত বড় সত্য কথাও মিথ্যা হইয়া যায়। রেকর্ডেল করীম সাহেব কিছুকাল ধরিয়া মুসলমান সমাজকে মুক্তিদ্বারা অনেক কিছু বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু তাহাতেও কোনো ফল হইকে বলিয়া মনে করি না। কাজী নজরুল ইসলাম সাহিত্যক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতামানেন না। মোহাম্মদী কি মনে করেন ইহারা মুসলমান সমাজের শত্রু?

সাহিত্যক্ষেত্রে যে সাম্প্রদায়িকতা চলিতে পারে ইহা হিন্দুদের কল্পনাতীত। অস্বাভাবিক ক্ষেত্রে অল্পবিস্তর আছে—কিন্তু সেও শিক্ষিতের মধ্যে নহে। হিন্দুগণই হিন্দু মুসলমান মিলনের চেষ্টার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। ইহার সুনির্দিষ্ট প্রমাণ মহাত্মা গান্ধী এবং অস্বাভাবিক নেতা। সংস্কৃতির দিক দিয়া তাহাতে মিলনের ভিত্তি দৃঢ় হইতে পারে এ জন্য শ্রীযুক্ত অতুলানন্দ চক্রবর্তী Cultural Fellowship (Thacker Spink) নামক যে গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন তাহা অস্বতঃ প্রত্যেক মুসলমানের পড়িয়া দেখা উচিত। মুসলমানদের কি সম্পদ ছিল আর তাহার কতখানি আজ তাহারা হারাইতে বসিয়াছেন তাহার সন্ধান এই গ্রন্থে মিলিবে। মুসলমানের পক্ষ হইতে এই-জাতীয় প্রচেষ্টা হইয়াছে বলিয়া আমরা জানি না।

বিরোধের ক্ষেত্রে মুসলমানকে সর্বদা অগ্রগামী দেখা যায় অথচ হিন্দুর সঙ্গ তাহারা কি উপায়ে মিলিবেন সে জন্য কিছুমাত্র চিন্তা তাহাদের নাই। ধর্মের নামে সর্বসাধারণকে উত্তেজিত করিয়া, অধিকার লাভের জন্য এই যে অহৈতুক লোভ ইহা দ্বারা মুসলমান সমাজের ভবিষ্যতে যে ক্ষতি হইবে তাহা দেখিবার মত দৃষ্টিশক্তি তাহাদের মধ্যে দেখা যাইতেছে না। তাহাদের সে দৃষ্টিশক্তি আছে তাহারা মুসলমান সমাজের শত্রু বলিয়াই হয়ত বিবেচিত হন। দেশের এই দুর্ভাগ্য কতদিনে ঝুঁটিবে কে জানে!

মোটর ট্রিপ

বৈকালে বেড়াইতে বাহির হইয়া এক এক দিন বড় রাস্তার ফুটপাথে ঝাঁড়াইয়া মোটর-যাতায়াত দেখি। কত মোটর যায়—যাত্রীবাহী বাস, মালবাহী লরি এবং সম্রাট গৃহজনবাহী ট্যাক্সি অথবা প্রাইভেট কার। এইগুলির ভিতর শেখোক্তগুলিই দৃষ্টি আকর্ষণ করে বেশী।

খেতাদ ও খেতাদিনী চলিয়াছে। খেতাদ পাশে বসিয়া আছে, খেতাদিনী চালনা করিতেছে। সে অক্ষম, তাই তার ক্ষমতা দেখাইবার উগ্র প্রয়াস।...সাহেব মোটর চালাইতেছে; লাল টুপি পরা মুসলমান শোফার পিছনের সীটে বসিয়া ঝিমাইতেছে। শোফারই মোটর-চালনা করুক এবং সাহেব পিছনে বসিয়া পাইপ টায়াক্স, অথবা সাহেব মোটর চালনা করুক আর শোফার পিছনে বসিয়া তন্দ্রাভ্রম অতৃপ্ত করুক, তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। শোফার শোফারই এবং সাহেব সাহেবই, যদিও তাহারা একই মোটরে বসিয়া একই আরাম উপভোগ করিতেছে। যেমন পাশ্চাত্য দেশীদের চলিয়াছে তেমনি বাঙালী সম্রাটজনও অনেকে চলিয়াছে প্রাইভেট গাড়ীতে। কোন তরুণ যুবকে মোটরে যাইতে দেখিলে, তাহার সহিত আমাকে মিলাইয়া দেখি। মনে হয়, ও আমা অপেক্ষা কত সুখী, কেননা ওর ভবিষ্যৎ অসুস্থস্থানের, তথা অর্থের চিন্তা নাই। প্রশ্ন ওঠে, তবে কি উহার কোন চিন্তা নাই? আছে। আমাদের যেমন অর্থোপার্জন, তথা মুনিভাসিটি-পরীকার ফলাফলের চিন্তা; উহার তেমন বিলাস-চিন্তা, মঙ্গলময় বিধাতার বিধানে কাহারও চিন্তার হাত হইতে অব্যাহতি নাই।

মোটরকারের সহিত আমার সখ্য দর্শনীয়-ও-দর্শক হিসাবেই বরাবর চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু সেদিন হঠাৎ সে সখ্যটোর একটু

বিপর্যয় হইয়াছিল, অর্থাৎ প্রাইভেট গাড়ীতে ভ্রমণ করিবার এক সুযোগ, যেমন করিয়াই হউক, ঘটিয়া গেল।

গাড়ীতে চাপিয়া বসিলাম, শোফার ঠাট দিল। প্রথম গতি গ্রহণের সময় ইঞ্জিনে ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর শব্দ হইয়া পূর্ণগতি পাইবার পর পুনরায় যে পূর্ণ অফুট শব্দটি হইতে লাগিল তাহার সহিত আমিও অহভব করিলাম, যেন আমিও ধীরে ধীরে যোগাতা-শক্তি অর্জন করিতে করিতে শেষে সম্পূর্ণ এবং নিশ্চিত রূপে ধনী হইয়া উঠিলাম,—এখন আমাকে রোধ করে এরূপ শক্তি কাহার আছে? গাড়িটি সামান্য অফুট শব্দ করিতে করিতে পূর্ণগতিতে ছুটিতে লাগিল। এইখানে বাসের সঙ্গে কারের প্রভেদ। বাস কান-ঝালাপালা-করা দুর্দান্ত শব্দ করিয়া জোর করিয়া যেন বলিতে চাহে, “আমাকে তোমরা লক্ষ্য কর, আমি সম্মানার্থ”; কিন্তু কার মুখ শব্দ করিয়া ছোট্টে, তাহাকে জোর করিয়া কিছু বলিতে হয় না, তাহার সম্মানের আসন ক্ষুদ্র। এবং ইহাও সত্য, ফুটপাথের পদচারীরা বাসের অত বৈ-চৈ সবেও তাহাকে বিশেষ লক্ষ্য না করিয়া বরং বিরক্ত হয়, আবার কার যতই অস্পষ্ট শব্দ করিয়া পাশ কাটাতে চাক না কেন, সে পথিকের তাঁর আগ্রহাষিত দৃষ্টিকে এড়াইতে পারে না।

বেশ ঊর্ধ্বগতি করিয়া চাপিয়া বসিলাম; সীটের শ্রিং বোধ হয় অনেকটা দাবিয়া গিয়াছিল। সেই সময়কার ঐ দুর্লভ আরামটুকু যেন আমাকে তিলমাত্রও ফাঁকি দিতে না পারে—এইজন্য কিছুক্ষণ ধরিয়া অনেক প্রকারে আমার বসিবার ভঙ্গীকে দ্রুত করিতে লাগিলাম। কিন্তু বারে বারেই মনে হইতেছিল—এই বৃষ্টি ফসকাইয়া গেল। সে অস্বস্তিও কিছু কম ছিল না। উহার সহিত বোধ করি, কবি-বর্ণিত সম্ভোগ-মিলনের অতৃপ্তির যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে।

কার ছুটিয়া চলিল। অহভব করিলাম, বাঙালীর শতকরা এক-জনের অল্পতম আমি; কলিকাতা-শহরে সেই অল্প কয়েকজন যাহাদের ভাগ্যের কথা ভাবিয়া অনেকে দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছে—তাহাদের একজন আমি; সেই কয়েকজন যাহারা হাসিয়া কথা কহিলে সাধারণে তৃপ্তি বোধ করে—তাহাদের একজন আমি; সেই কয়েক জন যাহাদের বাড়ীর সামনে দিয়া হাটবার সময় এক অস্পষ্ট আশা আর্মাদিগকে আমাদের বেশ-ভূষা ও হাব-ভাব সযত্নে সচেতন করিয়া তোলে—তাহাদের একজন আমি; সেই কয়েক জন যাহাদের একজন হইবার আশা অনর্থক পোষণ করিয়া আমি আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সময়টুকু কাটাইয়া দিব—তাহাদের একজন আমি। রাস্তার দু'ধারে যত বড় বড় বাড়ী তার কোন একটার মালিক হয়ত আমি। ঐ বাড়ীতে যে তরুণী থাকে—যাহার কথা শুধু নভেলেই পড়িয়া থাকি, এবং অতিপরিচয়তার ভান করিয়া আগ্রহাষিত বন্ধুহলে যাহার খুঁটিনাটি কথা বর্ণনা করিয়া মিথ্যা গল্প অহভব করি—সেই মহার্ঘ্য আকাশ-সঙ্গারিণী তরুণী, বোধ হয়, এখন বালিশের ভিতর মুখ গুজিয়া আমারই কথা ভাবিয়া ভাবিয়া অশ্রু-বিসর্জন করিতেছে।

অনেকটা পথ অতিক্রান্ত হইয়া গেল। আমার কিন্তু তৃপ্তি হইতেছিল না। মনে হইতেছিল, আমার বড়লোকি দেখানর সুযোগ বৃষ্টি অমনি চলিয়া গেল। শোফারকে বলিতে ইচ্ছা হইতেছিল ইলেকট্রিক হর্ণটা টিপিয়া ধরিয়া রাখিতে। অথবা ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ীগুলির মত ঘণ্টা থাকিলে আরও ভাল হইত; সকলকে সচকিত করিয়া আমি ছুটিয়া চলিতাম। ছনিয়াস্বল্প লোককে চাঁৎকার করিয়া ডাকিয়া বলিতে ইচ্ছা করিতেছিল—দেখ, আমি কারে চড়িয়া যাইতেছি, আমি বড়লোক।

হঠাৎ অস্বাভাবিক ভাবে কারটি থামিয়া গেল। শোফার বিরক্তি-
বাক্য অক্ষুণ্ণ স্বরে কি বলিয়া উঠিল। চাহিয়া দেখি, একটি রক্ত-বৃক্ক
সহচারী এক যুবকের হাত ধরিয়া রাস্তা পার হইতেছে; আমার কার
একেবারে রাস্তার মাঝখানে তাহার সামনে আসিয়া পড়ায় শোফারকে
বাধা হইয়া পূর্ণগতির উপর ভেঙ-ঠগ করিতে হইয়াছে। যুবকটি
জ-কৃষিক্ত করিয়া বৃক্ককে বলিতেছে, "হাঁটতে পার না, বেড়ানর এত
মথ কেন বাপু?" বৃক্ক তাহার অসমর্থ পা-ছ'থানিকে সাধাতিবিক্ত
গতিশীল করিতে যাইয়া পড়িয়া গেল, যুবক তাহাকে টানিয়া ইেচড়াইয়া
রাস্তা পার করিল। বড়লোকের মোটরগাড়ীর পথ আটকাইয়া বৃক্ক যে
কত বড় অপরাধ করিয়াছে তাহা তাহারই ভীত-চকিত অসহায় ছু-
লুপ্তিত অবস্থায় মধ্যান্তিকভাবে মূৰ্ছ হইয়া উঠিল। আমার গাড়ী বৃক্ক
ফুলাইয়া ছুটিল। আরও জোরে—কেননা গরীব পদচারী হইতে
তাহার অধিকার যে কত বড় তাহা সে গরীবকেই সর্ব-সমক্ষে স্বীকার
করিতে দেখিয়াছে; উহাতেই ত বড়লোকের সব চাইতে বড় গর্বি।

আরও কিছুদূর বড় রাস্তায় ছুটিয়া এবার আমার কার গন্তব্য-স্থানের
নিকটে আসিয়া এক গলিতে ঢুকিল। সেখানে যে-কেউ ছিল,
সকলেই হর্নের শব্দ শুনিবামাত্র গলির এপাশে ওপাশে বাড়ীগুলির
দেয়াল ঘেসিয়া দাঁড়াইয়া গেল। আমার কার রাজার মত সম্মানে
তুইধারে সারিবদ্ধ অহুগতদের মাঝখানে দিয়া চলিতে লাগিল। বৃক্কদের
করণ দৃষ্টি এবং যুবকদের বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টি আমার পুশ্চাভিমেক ক্রিয়া
সম্পাদন করিল। আমি যখন রাস্তা দিয়া চলিব তখন উহার অবশ্রাই
পথ ছাড়িয়া দিবে, কেননা আমি মোটরবিহারী আর উহার পদচারী।

শ্রীঅমলেন্দু বাগচী

আষাঢ়ে

আজকাল ঘরে ঘরে যত বিড়ালের নাকে
লাথি মারিতেছে নাকি ইন্দুর,
মধবারা করিতেছে অনাহারে একাদশী
বিধবারা পরিতেছে সিন্দূর।
গণেশটি উলটায়ে নীল বস্ত্রিকা জালি'
যত মাড়োয়ারি নাকি কবিতা' লিগিছে থালি,
ঈদ ভগিনীকে নাকি বলা চলিবে না শালী,
বিস্তৃতি ঘটিতেছে বিন্দুর!

২

লুপি ছাড়িয়া যারা ধরেছিল লুপ্ত প্যান্ট
তাহারা কুঁকেছে নাকি ঘাগরায়,
মাথার মুকুট নাকি, পায়েতে পরিছে লোকে
মন্তক শোভিতেছে নাগরায়!
রূপো আর 'প্লাটিনাম' এক হয়ে গেছে নাকি,
ইতালির জয়-লাভ বোঝা গেছে সব ঠাকি,
মমতাজ বেগমের শোকেতে পরেশ চাকি
মুজ্জা গিয়াছে নাকি আগ্রায়।

৩

বহুটাকা বাকী রেখে বহু শত কাবুলীর
শ্রীগোবিন্দ নাকি শেষটায়
সাগরে ঝাঁপিয়েছিল!—প্রত্নতাত্ত্বিকেরা
টের পেয়েছেন বহু চেঁচায়।

আরেক চণ্ডীদাস সিংহুমে আছে চাপা,
ভয় নাই তারও কথা মাসিকে হইবে ছাপা,
দলিল পত্র তার মিলিছে খুঁজিয়া ধাপা,
নাচিতেছে রামা, গামা, কেঠায় !

৪

কাউনসিলেতে নাকি থাকিবে রিজার্ভ সীট
বৈটে, কালো, ফর্সা ও লম্বার,
গম্ব-ছন্দে লিখে মূলী পাঠাইবে বিল্
ঢাল ডাল ছন তেল লম্বার।
ক্যান্ডাসারের দল ওরিয়েণ্টাল ধাঁচে
আগেতে নাচিয়া নাকি কথা কহিবেন পাছে,
বিলাতি বেগুন হবে দেশী বেগুনের গাছে
কচু গাছে কাঁধি হবে রস্তার।

৫

'Nazi'কে বলিবে 'নাজি'—'নাসি' বলিলে বাপু
এ দেশেতে নাহি তার নিস্তার,
চলচ্চিত্রে নাকি চলিবে 'সবাক পাঞ্জি'
নামিবেন বহু 'মিস' 'মিষ্টার' !
চন্দ-বন্দো নাকি 'ডুয়েল' লড়িয়া শেষে
'ডুয়েট' ধরিবে এবে ঝুঁরি স্বরেতে হেসে,
সঙ্গ করিবেন স্বয়ং 'বক্স' এসে
দাড়ী নাড়ি ঘন কালো মিশ তার !
"বনফুল"

“ট্রাজেডি ও কমেডি”

“In the very temple of delight
Veil'd Melancholy has her sovran shrine.”

—(Keats)

“বত হাসি তত কাদা
বলে গেছে রাম শশা”

—(রামশর্মা ?)

“অনেক সময় হাসতে হাসতে কেইনে ফেলাই, আবার
অনেক সময় কাঁইনতে কাঁইনতে হেইন্তে ফেলাই।”

—(স্বজন নাইয়া)

“Our sweetest songs are those
That tell of saddest thoughts,”

—(Shelley)

“বন্ধুল দীবন-পথে কাঁদা আল হাসি
ছুদনায় হাত ধলে তলে পাথাপাখি।”

—(শ্রী নীহালিকা ষাঙ্কাল)

বিষ্ট আমরা অনেকেই খাই কিন্তু কখন এই সোজা কথাটা ভাবি
যে বিষ্টের দুইটি দিক আছে যাহার একটিকে বাদ দিয়া অপরটি রাখা
চলে না ? এমন বিষ্ট কেহ কোনদিন দেখিয়াছেন কি যাহার একটি
দিকই শুধু আছে, অত্র দিকটি নাই ? দুইটি দিক লইয়াই বিষ্ট।
তেরি হাসি ও অশ্রু—ট্রাজেডি ও কমেডি—লইয়াই জীবন। বিষ্টের
এক ধারের সহিত অত্র ধারটির যে সম্বন্ধ, হাসির সঙ্গে অশ্রুর, কমেডির
সঙ্গে ট্রাজেডিরও সেই সম্বন্ধ।...

বিখ্যাত জনপ্রিয় রঙ্গাভিনেতা বা কমেডিয়ান প্রফেসর কাস্তি বটব্যালের শোচনীয় বা ট্রাজিক্ মৃত্যুর কথা আপনারা সবাই তো কাগজে পড়িয়াছেন। কিন্তু কাগজে বিস্তারিত খবর প্রকাশিত হয় নাই। শুধু বলা হইয়াছিল যে মৃত্যুর আধ ঘণ্টা পূর্বে তাঁহার বৃকে অত্যন্ত বেদনা আরম্ভ হয়। কিন্তু বাবারও যেমন বাবা আছে, পূর্বেরও তেমন পূর্ব আছে। বৃকে রাখা আরম্ভ হইবার পূর্বের ব্যাপারই আমি বলিব। ট্রাজেডি ও কমেডির একরূপ সম্মিলন খুব কমই ঘটয়া থাকে, এই হিসাবে কাস্তিবাবুর জীবনের শেষ অধ্যায়টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মাসখানেক আগে কোন একটা রিলীফ ফাণ্ডের সাহায্যের জন্ত একটা Variety show-এর বন্দোবস্ত হইয়াছিল University Institute Hall-এ। প্রোগ্রামে প্রফেসর গুপ্তের ম্যাজিক; প্রফেসর গোস্বামী, চক্রবর্তী প্রমুখ বাংলার শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতশিল্পীদের গান ইত্যাদি বহু লোভনীয় বিষয় ছিল—সর্বপ্রথম ছিল প্রফেসর কাস্তি বটব্যালের রঙ্গ অভিনয়। বটতলা হইতে প্রকাশিত ব্যক্তিগত কেচ্ছা-কাহিনীর মত হ হ করিয়া টিকেট বিজী হইয়া গেল, বহু প্রবেশপ্রার্থী টিকেট না পাইয়া হতাশ-মনে সজল-নয়নে হায় হায় করিতে করিতে ফিরিয়া গেলেন।

বাঙালী যেমন প্রত্যেক অচুঠানই ঠিক punctually অর্থাৎ সময় মত আরম্ভ করে সেদিনও তাহার ব্যতিক্রম হইল না। বিজ্ঞাপিত সময়ের মাত্র দেড় ঘণ্টা পরই ড্রপ উঠিল। কাস্তিবাবু ধীরে ধীরে রঙ্গমঞ্চে আসিয়া দর্শকদিগকে অভিবাাদন করিয়া দাঁড়াইতেই দর্শকমহলে (মাহার বেনারী ভাগই তরল এবং ছাত্র) হাসি ও মতামতের স্রোত বহিতে লাগিল।

“কেমন ইয়ে করে এসে দাঁড়ালো দেখলি? হাঃ হাঃ! হাসিয়ে মারবে বলে দিচ্ছি। হাঃ হাঃ হাঃ!”

“কি যেন বলছে রে, শুনেতে পাওয়া যাচ্ছে না। ভারী মজার কথা নিশ্চয়ই। হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ!”

“দ্যাখ দ্যাখ দ্যাখ, মজাটা দ্যাখ একবার। হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ!” ইত্যাদি।

হঠাৎ একটু ষামিলে কাস্তিবাবু শুরু করিলেন, “আজ আপনাদের রামায়ণের অপ্রকাশিত-পূর্ব একটা কাহিনী শোনাবো। এ কাহিনী এর আগে আপনারা কেউ শোনেননি, আমিও শুনি নি।”

আবার হাসির রোল উঠিল। কাস্তিবাবু জ্বক্কেপ না করিয়া অগ্নানবদনে কাহিনী শুনাইতে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনমত অভিনয় করিতে লাগিলেন—এদিকে দর্শকমহলেও হাসি, ঢাকা-টিপ্পনী, মতামত-প্রকাশ ইত্যাদি চলিতে লাগিল।

কাস্তিবাবু বলিতে লাগিলেন :—

“লঙ্কার রাজার দশটি মাথা ছিল আপনারা বোধ হয় সবাই জানেন। সেইজন্মেই তার নাম ছিল দশানন। এক দিন হয়েছে কি, দশানন রাজার ভারী অস্থখ করেছে।”

“দেখলি তো? আগেই বলেছিলুম না, যে হাসিয়ে মারবে? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—ও বাবাঃ!”

“দশানন রাজা! হিঃ হিঃ হিঃ। আর কেউ হলে বলতো বাবণ রাজা। এমন মজা করে বলবে যে—হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ।”

“অস্থখ আবার যে-সে অস্থখ নয়—একেবারে রাক্ষুসে অস্থখ। হৈ হৈ ব্যাপার, রৈ রৈ কাণ্ড। সমস্ত লক্ষা জুড়ে লক্ষাকাণ্ড। ‘বাপরে মা রে’ বলে রাজার সে কি চীৎকার! এলো এক নামজাদা হোমিওপ্যাথ।...”

“হো: হো: হো:। রাবণের আমলে হোমিওপ্যাথ। হা: হা: হা:।
ঠোট ফাটা, হাসতেও পারি না ছাই, তবু হাসতে হয়—হো: হো:
হো: হো:।”

“দেখছি সুতো লালু? হা: হা: হা:—এ যে-সে কমেডিয়ান নয়।
এ একেবারে—হো: হো: হো:—হাসিয়া পেটে থিলু ধরিয়ে দিলে রে
বাবা। হো: হো: হো:।”

“রাণী মন্দোদরী বলেন—‘ভাস্কর, রোগী যে যায়। যা’ হোক
একটা ওষুধ দাও তাড়াতাড়ি।’ ভাস্কর বলে, ‘হোমিওপ্যাথিতে
তাড়াতাড়ি যা হোক একটা ওষুধ দেবার নিয়ম নেই। কেস্টা ভালো
করে study করতে হবে, symptom মিলিয়ে নিতে হবে, তবে তো।’
বলে ভাস্কর তো case study করতে লাগলো। এখন বিপদ
হয়েছে কি—সে এক অদ্ভুত রকমের রাক্সে বিপদ।...”

“হি: হি: হি:! দেখলি পচা? সুনলি তো বিভে? হা: হা:
হা:। অদ্ভুত রকমের রাক্সে বিপদ। হা: হা: হা:। এ বাবা, কাস্তি
বটব্যাল—তোদের নীলুবাবু নয়। এ একেবারে হে: হে: হে:—হাসির
রাজা। হো: হো: হো:।”

“রাজার দশটা মাথায় দশ ধরনের সিমটম্। Remedy select
করে দেখা গেল ১নং মাথায় অ্যাকোনাইট, ২নং মাথায় সাল্ফার, ৩নং
মাথায় ন্যাট্রাম মিউর, ৪নং মাথায় হেলিবোরাস, ৫নং মাথায় ইপিকাক,
৬নং মাথায় ডালকামারা, ৭নং মাথায়...মানে ভিন্ন ভিন্ন মাথায় ভিন্ন
ভিন্ন ওষুধ দরকার। ভাস্কর এখন কোন্ ওষুধ দেবে ঠিক করতে
পারে না। ভারী মুন্সিল! অথচ একটার বেশী ওষুধ একবারে দেওয়া
হোমিওপ্যাথির নিয়ম নয়। হোমিওপ্যাথি তো আর অ্যালোপ্যাথি
নয়!”

“হো: হো: হো: হো: হো:। গেলুম ভাই, মারা গেলুম। বলে
হোমিওপ্যাথি তো আর অ্যালোপ্যাথি নয়। হা: হা: হা:—ওরে
বাবা রে আজ মেরেই ফেলবে দেখচি। হো: হো: হো: হো:।”

“মাইরি ডা:—হা: হা: হা: হা: হা:—সত্যি ভাই, একটা জীনিয়াস
বটে। কেউ এমন হাসাতে পারে না। ও: হো: হো: হো:—হা:
হা: হা:।”

“ভাস্কর পাড়িয়ে পাড়িয়ে আকাশ পাতাল ভাবছে। রাণী মন্দোদরী
মনে মনে চেঁচাচ্ছেন, ‘বাটা ওষুধ দেয় না কেন?’ আর রাবণ তো
দশমুখে চেঁচাচ্ছে, ‘ওরে বাবা রে! গেলুম রে!’...উ:—বাবা গো!”

দর্শকমহলে:বিরাট হাসির রোল উঠিল এবং প্রফেসর কাস্তি বটব্যাল
ধপাস করিয়া রক্তমঞ্চের উপর পড়িয়া গিয়া গোড়াইতে লাগিলেন ও হাত
পা ছুঁড়িতে লাগিলেন। তিনি যতই গোড়াইতে ও হাত পা ছুঁড়িতে
লাগিলেন, দর্শকেরা ততই পুলকে উজ্জ্বলিত হইয়া চীৎকার করিয়া
হাসিতে লাগিল। আর তারি সঙ্গে হাসির ফাকে ফাকে সমালোচনা
ও ব্যাখ্যা চলিতে লাগিল:—

“কি চমৎকার দেখেছি? সত্যি তো আর নয়, সব মিছিমিছি
অ্যাকটিং। কিন্তু কিরকম natural দেখলি?”

“ওরে, সত্যি সত্যিও যে এত ছাচরাল হয় না রে।”

বাহিরের লোকেরা বাস্তবকে অভিনয় বলিয়া ভুল করিলেও
ভিতরের লোকেরা বাস্তবকে বাস্তব বলিয়া বুঝিতে পারিলেন।
যবনিকা পতন হইল।

তখন:—

“কি ফাইন ফিনিশটা দিলে দেখলি? How artistic! What
a genius!”

“কিন্তু শেষটা কি হলো তাতো কিছু বললে না।”

“ওরে হাবা, সব যদি বলে দেবে তাহলে আর আর্ট হল কি? ঐ যে শেষটায় কি হলো তা আর বললে না, ঐটুকুই তো মজা। হাঁ বাবা। এ হচ্ছে প্রফেসর কাস্তি বটব্যাল। দস্তুরমতো জীনিয়াস।”

ভিতরে এই দস্তুরমতো জীনিয়াসটি যত্নে ও শুশ্রূষায় শীঘ্রই অজ্ঞান অবস্থা হইতে সজ্ঞান অবস্থায় আসিলেন। সঙ্গে এক জন লোক লইয়া পিছনের দরজা দিয়া বাহির হইয়া গিয়া তিনি গাড়ীতে উঠিলেন এবং বলিয়া গেলেন, “আসল ব্যাপারটা গোপনই রাখবেন। দর্শক বোধ হয় ঠিক ব্যাপারটা ধরতে পারে নি।”

বাড়ী ফিরিবার পথে বন্ধু বিচক্ষণ ডাক্তার রণদা চৌধুরীর বাড়ী নামিয়া তাঁহাকে সব ব্যাপার বলিলেন। রণদাবাবু ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, “তুমি যে এ যাত্রা বেঁচে গেছ তাই আশ্চর্য। তোমার একটু blood pressure-এর ভাব আছে। এই রোগটা blood pressure থেকেই সাধারণতঃ হয়। এতে হঠাৎ মৃত্যু হওয়াটা কিছুই আশ্চর্য নয়। বরং না হওয়াটাই আশ্চর্য। এই আজ তোমার যেমন হয়েছিল এরকম sudden attack হয়, তার ফলে হয় sudden death.”

“সন্ধ্যা রোগ নাকি?”

“সাধারণ লোকের চোখে ঐ রকমই মনে হয় বটে, কিন্তু সন্ধ্যা রোগের সঙ্গে এ রোগের একটু তফাৎ আছে। সন্ধ্যা রোগে হঠাৎ হার্ট ফেল করে মরে—”

“আর এ রোগে হঠাৎ মরে, তারপর হার্ট ফেল করে?”

“না না তা নয়। এ সব ডাক্তারী বিষয় তুমি বুঝবে কেন বাপু? জেনে রাখ এ অশুখটা নতুন আবিষ্কার হয়েছে।”

“ব্যাটারা যে কেন সব নতুন রোগ আবিষ্কার করতে লেগেছে! এমনিই তো রোগের অন্ত নেই—তার উপর আবার নতুন নতুন রোগ আবিষ্কার কেন রে বাপু? আবিষ্কার করার কি আর জিনিষ নেই?”

“না, তুমি হাসালে দেখছি। বেশী কথা এখন বোলো না। এখন একটু বিশ্রাম দরকার। তোমাকে এক শিশি ট্যাবলেট দিয়ে দিচ্ছি। যখনি এরকম sudden attack হবে তখনি মেজার মাসে দু ড্রাম জলে একটা বড়ি ফেলে দেবে। দিলেই চট করে সেটা গলে যাবে।”

“তারপর সে জলটা কি করব?”

“খেয়ে ফেলবে। এটা খুব ভাল ঔষধ। যেমন বাঘ তেমনি টাগ। এ খেলে হঠাৎ কিছু হবার আর ভয় রইলো না। তারপর চট করে আমায় ফোন করে দেবে। আজকাল বাড়ীতেই rest নাও। অন্ততঃ এক মাস আর অভিনয় কোরো না।”

ঔষধ লইয়া কাস্তিবাবু বাড়ী ফিরিলেন, কিন্তু স্ত্রীকে কিছু বলিলেন না। কারণ, এমনিই তিনি স্ত্রীর সাংঘাতিক পতিভক্তির জ্বালায় অস্থির ছিলেন। তার উপর যদি এই হঠাৎ মৃত্যু ঘটাইতে সমর্থ নতুন আবিষ্কৃত রোগটির কথা তাহাকে বলেন তাহা হইলে পতিভক্তির বহর যে অসহ্য রকমে বাড়িয়া যাইবে সে কথা কল্পনা করিয়াই প্রফেসর কাস্তি বটব্যাল শিহরিয়া উঠিলেন।

যাক—সোমবারের পর মঙ্গলবার, মঙ্গলবারের পর বুধবার, এই ডাবে দিন বাইতে লাগিল। কাস্তিবাবু বাইরে বড় একটা যান না—কে জানে হঠাৎ কখন sudden attack হইয়া sudden death হইবে? তাকের উপর মেজার মাসটা রাখিয়াছেন, যেন দরকার মত পাওয়া যায়। পাছে কৈফিয়ত দিতে হয় স্ত্রীর কাছে, (এবং তাহা হইলেই তাহাকে সব কথাই

খুলিয়া বলিতে হয়) এই ভয়ে ট্যাবলেটের শিশিটা স্ট্রটকেসের মধ্যে রাখা আছে। জল খাইবার সময় কুঁজা হইতে মেজার ঘ্রাসে জল ভরিয়া খান—স্বী কাও দেখিয়া হাসিয়া অস্থির। মনে করেন হাস্য-রসিক স্বামীর এও এক মেজার খেয়াল।

একদিন মিসেস বটব্যাল এক বালা-বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করিতে যাইবেন টেপী, খেদী ও পটলীকে লইয়া। মেয়েদের বেশ করিয়া সাজাইয়া তারপর নিজে সাজিলেন। স্বামীকে 'হাসিয়া বলিলেন, "চলনুম গো একটু সরমা-সইয়ের ওখানে বেড়াতে।"

কান্তিবাবুর একটু রসিকতা করিবার সাধ হইল। কিন্তু নতুনস্বই হিউমারের প্রাণ—অথচ নতুন কোন রসিকতা কান্তিবাবুর কিছুতেই মনে আসিল না। হায় রে বরাত। বিধিলিপি কে খণ্ডাইতে পারে? স্বয়ং বিধাতাও না। রসিকতা করিবার প্রবল ইচ্ছা অথচ কোন রসিকতাই মনে আসিতেছে না। নিজের এই অদ্বুত অকৃতপূর্ণ অসহায়তার কথা ভাবিয়া কান্তিবাবুর হঠাৎ ভয়ানক হাসি পাইল। তিনি পত্নীর দিকে চাহিয়া উচ্চৈঃস্বরে হো হো করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন।

তাহার বেশবিছারের পারিপাটা দেখিয়া স্বামী হাসিতেছেন ভাবিয়া মিসেস বটব্যাল প্রথমটা একটু অপ্রতিভ হইয়া শেষে একটু সামলাইয়া লইয়া আত্মসমর্থনের জঙ্ক কি যেন বলিতে যাইতেছিলেন, ঠিক এমন সময় কান্তিবাবুর sudden attack হইল, অর্থাৎ বৃকের ভিতর সেদিনকার মত ভয়ানক যন্ত্রণা আরম্ভ হইল, কান্তিবাবু যন্ত্রণায় ও ভয়ে অস্থির হইয়া আত্মনার্দ করিয়া উঠিয়া বলিলেন, "ওগো, জলদি করে মেজার ঘ্রাসে ছুঁড়াম জল ভরো, আর আমার স্ট্রটকেসটা ধোয়ো।"

মিসেস বটব্যাল sudden attack এবং তাহার দাওয়াই রহস্য কিছু জ্ঞানেন না—কাজেই মেজার ঘ্রাসে ছুঁড়াম জল ভরা এবং স্ট্রটকেস খোলা, এই দুটি কাজের পারস্পরিক সম্বন্ধহীনতার কথা মনে করিয়া কিছুতেই হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। মিষ্টার বটব্যাল যতই আত্মনা দ করেন ততই মিসেস বটব্যাল স্বামীর অপূর্ণ রন্ধাভিনয়ে পুলকিত হইয়া প্রাণপণে হাসি চাপিতে গিয়া আরো প্রবল বেগে হাসিতে লাগিলেন। যন্ত্রণায় চোঁচাইতে চোঁচাইতে অস্থির হইয়া কান্তিবাবু যখন বিছানায় হেলিয়া পড়িলেন তখন মিসেস বটব্যাল এবং টেপী, খেদী ও পটলীরও তামাসা দেখিয়া হাসিতে হাসিতে প্রায় মাটিতে লুটাইয়া পড়িবার মত অবস্থা। অথচ কান্তিবাবু নিজে ব্যাথায় এত কাবু যে নিজে মেজার ঘ্রাসে জল ভরা এবং স্ট্রটকেস খুলিয়া ট্যাবলেটের শিশি বাহির করা ইত্যাদি তাহার পক্ষে অসম্ভব। এমন অবস্থাও মাহুষের হয়? কমেডিয়ানের জীবনে একটা প্রধান ট্রাজেডি এই যে তাঁহারা যখন সৌরিয়াস হইয়া কথা বলেন তখন লোকে তাহা সৌরিয়াস ভাবে লইতে পারে না। মনে করে ইহাও রন্ধাভিনয়।

তখন অনেকটা নিম্নলিখিত রূপ ব্যাপার চলিতে লাগিল—

"ওগো দোহাই তোমার চোদ্দ পুরুষের। মেজার ঘ্রাসে ছুঁড়াম জল ভরো। নইলে এখনই আমি গেলাম। উঃ, গেছি এবারে। ওরে খেদী, তোর—উঃ—তোর মা না পারে তো তুই খোল না স্ট্রটকেস।"

"হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—পায় পড়ি আর হাসিও না। হোঃ হোঃ হোঃ দম আটকে—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—মারা যাবে।"

"ও মেজদি, বাবা কেমন মজা করছে দাখ। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।"

সেই যে আমাদের ইকুলে ডাক্তার আর রোগীর কমিক দেখিয়েছিলো না!
ঠিক তেমনি। হাঃ হাঃ হাঃ।”

“না রে না, এ কমিক নয়। ওরে বাপরে—আমি আর নেই।
ওঃ—ওগো, যদি আরো কিছুদিন মাছের ঝোল খেতে চাও তো—ওঃ,
ওরে বাবা রে।—স্নীগ্গির হুটকেসটা খুলে—ওঃ—”

এভাবে প্রায় মিনিট পনেরো চলিল।

“ওঃ, বাবা এমন হাসতে পারে—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—” হাসিতে
হাসিতে অবশেষে টেপী দেখিল বাবা আর হাসাইবার চেষ্টা করিতেছে
না; আন্তে আন্তে মিসেস বটব্যালও প্রবল হাসির ষোঁক
সামলাইলেন। দেখেন প্রফেশর কান্ধি বটব্যাল নড়েনও না চড়েনও না।

ওদিকে নিত্যবাবু ওস্তাদজীর কাছে “কাটত নহি রাতিয়া পিয়া
বিন...” আরম্ভ করিয়াছেন। মিসেস বটব্যাল আন্তরিক কহিলেন,
“ও ঠাকুর পো! দেখে বাও তো ভাই কি হল।”

ঠাকুর পো আসিয়া দেখিলেন যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে।

শ্রীঅরুণ

পরিব্রাজকের ডায়েরি

সন্ধ্যাসী

হিমালয় প্রদেশে যেখানে জালামুখী তীর্থ আছে তাহার উত্তরভাগে
এক শরয়ে ত্রিগর্ভমণ্ডল নামে এক রাজ্য ছিল। চারিদিক পাহাড়ে
ঢাকা বলিয়া এই প্রদেশটি বহু দিন ধরিয়া স্বীয় স্বাধীনতা রক্ষা করিতে
পারিয়াছিল। স্থানটি প্রাচীন, এবং এখনও এখানে বহু ব্রাহ্মণ এবং
কজিরের বাস আছে। ত্রিগর্ভমণ্ডলের মধ্যে অনেকগুলি প্রাচীন মন্দির
দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কোনো কোনোটি জীর্ণ ও ভয়দেহে
প্রাচীনকালের স্মৃতি বহন করিয়া আছে; কোনোটি বা গ্রামের দরিদ্র
অধিবাসীগণের উৎসাহে অভয় অবস্থায় পাড়াইয়া রহিয়াছে। সেগুলিতে
এখনও সন্ধ্যারতির প্রদীপ জলিয়া থাকে।

কয়েক বৎসর পূর্বে ঘুরিতে ঘুরিতে পাঠানকোটের পূর্বদিকে এমনই
একটি পুরাতন গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হই। গ্রামটির নাম পাঠিয়ার।
সেখানে যে-সময়ে পৌছিলাম তখন বেলা প্রায় পড়িয়া আসিয়াছে;
অথচ সকালে যখন যাত্রা করি তখন একরূপ স্থির ছিল যে সন্ধ্যার পূর্বেই
পাঠিয়ার হইতে প্রায় ক্রোশখানেক দূরের একটি মন্দির দেখিয়া
আসিব।

গ্রামের মধ্যে সরকারী সড়কের নিকট একটি হালুয়াইএর দোকান
ছিল, লোকটির যথেষ্ট বয়স হইয়াছে। গলায় কয়েক ছড়া মালা, কপালে
তিলক এবং মস্তকে একটি দীর্ঘ পাগড়ি ছিল। হিমালয় প্রদেশে
বাইবার দোকানে অতিথি-সজ্জনের জন্ত শুইবারও বন্দোবস্ত করা

হইয়া থাকে। কিছু খাবারের সঙ্গে অতিরিক্ত চারি পয়সা ভাড়া দিলে এক রাজের জন্ত একটি খাটিয়া ভাড়া পাওয়া যায়। তিব্বত, কাম্বীর প্রভৃতি অঞ্চল হইতে যে-সকল পশ্বিক অথবা ব্যবসায়ী যাতায়াত করে, এইরূপ ব্যবস্থার দ্বারা তাহাদের খুবই সুবিধা হয়। উপরন্তু দোকানীগণেরও ইহা দ্বারা যথেষ্ট লাভ হইয়া থাকে।

আমার জিনিষপত্র দোকানের একপ্রান্তে গুছাইয়া আমি ক্ষুণ্ণপদে প্রাচীন দেবালয় সন্দর্শনে যাত্রা করিলাম। কিন্তু সেখানে পৌঁছিয়া দেখিলাম ইতিহাস পাঠে ইহাকে যত প্রাচীন বলিয়া ধারণা হইয়াছিল, বস্ত্ততঃ উহা তত প্রাচীন নহে। তথাপি মন্দিরটির সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য আহরণ করিয়া যখন পাঠিয়ারে ফিরিয়া আসিলাম তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আমি ফিরিয়া আসার পরেই হালুয়াই আহারের আয়োজন করিতে লাগিল। আমিও তাহার নির্দেশমত হাতমুখ ধুইবার জন্ত নিকটস্থ একটি নদীর দিকে অগ্রসর হইলাম।

সে সময়ে রজনী শুরুপক্ষ ছিল। সরকারী রাস্তার অনতিদূরে একটি ক্ষুদ্র শ্রোতধিনী ছিল। ত্রিগুপ্তমণ্ডল স্বভাবতঃ পর্বতাকীর্ণ হইলেও পাঠিয়ারের নিকটস্থ প্রদেশ কতক সমতল। নদীটি চাঁদের আলোয় চিকচিক করিয়া কিছুদূরে একটি বাকের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। পার্শ্বস্থ মাঠের মধ্যে এবং নদীপ্রান্তে ছ'একখণ্ড বড় পাথর দেখা যাইতেছিল। সন্ধ্যার নির্জনতা উপলব্ধি করিয়া স্থির হইয়া তাহার উপর বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়। দূর হইতে লোকালয়ের কোলাহল শোনা যাইতেছিল। গৃহস্থেরা তখন অবিকাংশই বাড়ীর উঠানে খাটিয়ার উপর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। কেহবা হুত দল বাধিয়া গান গাহিতেছে। আকাশে চাঁদের আলো খুব হালকা সূর্য্যশায় কিঞ্চিৎ নিম্প্রভ হইয়াছিল।

অনেকক্ষণ নদীতটে বসিয়া থাকিবার পর দোকানে যখন ফিরিয়া গেলাম, দোকানী অতিশয় যত্নসহকারে খাবার সাজাইয়া দিল, এবং আহারান্তে অতিথির যথোচিত ব্যবস্থা করিয়া দিল। আমি তাহাকে আহাৰ্য্যের মূল্যের সঙ্গে রাজে শয়নের জন্ত যখন আরও মূল্য ধরিয়া দিতে গেলাম তখন সে কিছুতেই তাহা লইতে স্বীকৃত হইল না। বিদেশী যাত্রী তাহার দেশের মন্দির দেখিতে আসিয়াছে, তাহার নিকট হইতে আহাৰ্য্যের মূল্য লইয়াই যেন সে কুন্তিত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু কি করিব, তাহাকেও ত' রোজগার করিয়া দিনপাত করিতে হয়।

দোকানে কাজকর্ম সারিবার পর দোকানী তাকের উপর হইতে একখানি পুরাতন গ্রন্থ পাড়িয়া প্রদীপের সম্মুখে তাহা পাঠ করিতে বসিল। তাহার ছোট নাতিটি সারাদিন দাদামশায়ের হাতে এটা-ওটা জোগাইয়াছে। সেও ক্রান্ত দেহে দেওয়ালের ধারে ক্ষুদ্র চটের বিছানায় বসিয়া দাদামশায়ের স্বর করা গ্রন্থপাঠ শুনিত লাগিল।

প্রাচীন যুগের কথা। ত্রিগুপ্তমণ্ডলের কোন্ রাজা কবে মহাবিক্রমে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, ধর্ম ও গোত্রাঙ্কণের রক্ষার জন্ত নিজের জীবন বিসর্জন দিয়াছিলেন, তাহারই গল্প ব্রাহ্মণ স্বর করিয়া পড়িতে লাগিল। মাঝে মাঝে ভাবের আবেগে ক্ষুদ্র নাতিটিকে এই সকল বীরত্বের কাহিনী আরও সরলভাবে বুঝাইয়া দিতে লাগিল। আমিও তন্ময় হইয়া শুনিতছিলাম। কিছুক্ষণ পরে বালকটি খুমাইয়া পড়িল। তখন তাহার বৃদ্ধ দাদামহাশয় আস্তে আস্তে উঠিয়া নাতির গায়ে বেশ করিয়া কাঁথাটি জড়াইয়া দিল, এবং মাথার নীচে গামছা পাট করিয়া বালিশের মত করিয়া দিল। তাহার পর নিজের জায়গায় ফিরিয়া আসিয়া একটু চাপা গলায় পুনরায় ইতিহাসের কাহিনী পড়িয়া শুনাইতে লাগিল।

রাত্রি দশটা বাজিয়া গেলে আমি দোকানীকে শুইবার ব্যবস্থা করিতে

বলিলাম। বুদ্ধ যন্ত্রসহকারে আমাকে ধোকানের উপরে কাঠের পোতলা ঘরে লইয়া গেল। এবং সেখানে নিজের বিছানাটি দেখাইয়া দিয়া তাহাতেই আমাকে শুইতে অমরোথ করিল। এবং বলিল, আমি যেন আজ তাহার এই সামান্য অতিথিসেবা প্রত্যাখ্যান না করি।

ধোকানীর অমরোথ সহজেই আমায় হৃদয় স্পর্শ করিল। তাহার আয়োজন হযত সামান্য, কিন্তু এই দূরদেশে একজন মাথুয, অপরিচিত এক ব্যক্তির জন্য একরূপ অযাচিত ঘ্নেহ বিতরণ করিতেছে ভাবিয়া দিতাই আমার হৃদয় অভিভূত হইয়া পড়িল।

কতকণ ঘুমাইয়াছিলাম বলিতে পারি না, গভীর রাত্রে নীচে কয়েক ব্যক্তির উত্তেজিত কণ্ঠের আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল। ধোকানীর গলার আওয়াজ চিনিতে পারিলাম, এবং তাহার সঙ্গ আরও দুই-তিনজন, পাঁহাড়া ভাষায় কথা বলিতেছে বুদ্ধিতে পারিলাম। কাহারও অমরোথের কথা হইতেছিল। হাসপাতাল ও ডাক্তারের কথা, কিছু গরম দুধ খাওয়াইবার ব্যবস্থা—এই সকল কথা মাঝে মাঝে বুদ্ধা যাইতেছিল। কিন্তু সেই রাত্রে উঠিয়া কি হইয়াছে তাহা আর অমরোথান করিবার মত উৎসাহ ছিল না। কিছুকণ পরে আবার ঘুমাইয়া পড়িলাম। পুনরায় যখন নিশ্রান্ত হইল, তখন ভোর হইয়া আসিতেছে, চারিদিকে আলো দৃষ্টিতে আরম্ভ করিয়াছে।

তাড়াতাড়ি বিছানাপত্র গুছাইয়া ভ্রমণের চেষ্টায় বাহির হইয়া পড়িলাম। বাহিরে বেশ স্নন্দর হাওয়া বহিতেছিল। কিছুদূর যাইতে রাত্রে সেই নদীটির নিকটে আসিয়া পৌঁছিলাম। ভোরের আলোয় বুদ্ধ দেখিলাম, তাহার রাত্রে সৌন্দর্য্য যেন সম্পূর্ণ লোপ পাইয়াছে। চারিদিকে ধূসর মাটি, মাঝে মাঝে কালো পাথর জাগিয়া আছে, এবং তাহারই পাশ দিয়া ক্ষীণগাত্রা নদীটি যেন সামান্য একটি খালের মত

বহিয়া যাইতেছে। রাত্রে সেই অপক্লপ রূপ যেন তাহার আর কিছুই নাই।

ভোর কাটিয়া গিয়া তখন বেশ সকাল হইয়া আসিয়াছে এবং মাঠের পথে দুই চারিজন লোকও চলাকের করিতে আরম্ভ করিয়াছে। একজন বুদ্ধ মুসলমান মাথায় সাদা টুপি পরিয়া নদীর পথ দিয়া যাইতেছিল। আমিও বেড়াইতে বেড়াইতে বানিকদূর আসিয়া পড়িয়াছিলাম। এমন সময় জলের ধারে একটি চোঁটাল পাথরের উপর হঠাৎ মনে হইল কি একটি বস্তু পড়িয়া আছে। কৌতূহলের বশে নিকটে যাইতেই গা ছম্ছম্ করিয়া উঠিল। দেখিলাম পাথরের উপরে একজন জটাঙ্গটধারী সন্ন্যাসীর মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে।

তিনি মৃত্যুর পূর্বে হযত বসিয়া ছিলেন। কিন্তু স্বাভাবিক ভাবে বসিয়া থাকিবার সামর্থ্য হযত ছিল না, তাই পা মুড়িয়া পাশে একপাশ পাথরের গায়ে হযত হেলান দিয়া বসিয়াছিলেন। সেই অবস্থাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। পাশে অগ্নির একটি কুণ্ড ছিল। তাহার শিখা বহুকণ হইল নিভিয়া গিয়াছে। প্রভাত সমীরণে ছাইগুলি ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সাধুর দেহও ক্রমশঃ মৃত্যুর স্পর্শে কঠিন হইয়া গিয়াছে। তাহার পর তাহা আর পাথরের উপর স্থির থাকিতে পারে নাই, সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া অবশেষে উল্টাইয়া পড়িয়াছে। পা মোড়া ছিল বলিয়া শরীরের অধোভাগ কাঠের পুতুলের মত আকাশের দিকে উঠিয়া রহিয়াছে, মাথা ধূসর উপরে লুটাইতেছে এবং জটীর একপ্রান্ত জলস্রোতে ভিজিয়া গিয়াছে। গায়ে একখানি চাদর ছিল। তাহা জড়াইয়া একটা হাত ও পিঠের কিয়দংশ ঢাকিয়া রহিয়াছে। সমস্ত মিলিয়া বস্তুটিকে একটি অস্বাভাবিক ও বিভীষিকারূপ দান করিয়াছে।

আমি পাড়াইয়া কি করা উচিত তাহা ভাবিতেছি, এমন সময়ে

সেই বৃদ্ধ মুসলমান নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে বেচারী, সম্মাসী সত্যই মারা গিয়াছে, ইহা যেন প্রত্যয় করিতে পারিতেছিল না। সে আমাকে বলিল যে এই সাধু কয়েক দিবস হইল গ্রামের প্রান্তে আশ্রয় লইয়াছিলেন। তিনি খুবই রুগ ছিলেন, এখন হয়ত রোগের তাড়নায় জ্ঞানহীন হইয়া পড়িয়াছেন। বৃদ্ধ মুসলমান দুই চারিবার পরম স্নেহে সম্মাসীকে, “ভইয়া উঠো, উঠ যাও ভইয়া” বলিয়া ডাক দিল। কিন্তু তখন কে তাহার সেই স্নেহের আশ্রানে সাড়া দিবে?

আরও বেলা হইতে গ্রামের লোকজন সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তাহার মধ্যে আমার বন্ধু ও আশ্রয়লাভা হালুইকরকেও দেখিতে পাইলাম। সে তখন সম্মাসীর ইতিবৃত্ত বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যান করিল।

প্রায় দুই সপ্তাহ পূর্বে সম্মাসী পাঠিয়ার গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। অনেকদিন রোগে ভুগিয়া ভুগিয়া তাহার শরীর দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। গ্রামের লোকজন তাহার সেবায়ত্নের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়াছিল বটে, কিন্তু তিনি সে সমস্তই প্রত্যাখ্যান করিলেন। তিনি গৃহস্থগণকে বলিলেন যে তাহার শরীর অকক্ষ্য হইয়া পড়িয়াছে, সে শরীরের দ্বারা আর কাজ চলিবে না। সেইজন্য তিনি ইহা ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। গৃহস্থেরা দুঃখ, আটা প্রভৃতি যাবতীয় আহাৰ্য্য তাহার সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিল বটে, কিন্তু সম্মাসী তাহার কিছুই গ্রহণ করেন নাই। ফলতঃ কয়েকদিনের মধ্যেই তাহার শরীর অতিশয় দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল।

গতরাত্রে শরীরের অবস্থা খুব খারাপ হইয়াছিল। দোকানী এবং অপর কয়েকজন তাঁহাকে গরম দুধ খাইবার জন্ত অনেক অনুরোধ করিয়াছিল, গ্রামের জনৈক বৈদ্য তাঁহাকে বহুপ্রকারে বুঝাইবার চেষ্টা

করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সম্মাসী হাসিমুখে সকলকেই প্রত্যাখ্যান করেন। দোকানীরা যখন সম্মাসীর নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছে তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর পার হইবে। তাহার পরেই হয়ত তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃতদেহ পড়িয়া বাণ্ডয়ার ফলে আঘাত লাগিয়া মুখের এক অংশ বিকৃতরূপ ধারণ করিয়াছে। কিন্তু সেই মুখে কোনওরূপ ব্যথা বা যন্ত্রণার চিহ্ন দেখা গেল না। চোখে নিতান্ত একটা অর্থহীন চাহনি ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

গ্রামের লোকজন ক্রমশঃ সম্মাসীর সমাধির যাবতীয় আয়োজন করিতে লাগিল। আমিও পাঠিয়ার হইতে অল্প গ্রামের দিকে রওনা হইয়া গেলাম। কিন্তু সম্মাসীর কথাটা কিছুতেই মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারিলাম না। শরীর জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, তাহার দ্বারা আর কাজ চলিবে না, অতএব তাহাকে পরিহার করিতে হইবে, এই কথা অনাড়ম্বরভাবে যে লোক ভাবিতে পারে, তাহার কত শক্তি!

আর সেই মৃত্যুর অর্থহীন চাহনি আজ পর্যন্ত ভুলিতে পারি নাই। সেদিন সম্মাসীর মৃত্যুর যেমন কোনও অর্থ খুঁজিয়া পাই নাই, আজও আবার তেমনই সময়ে সময়ে মনে হয় আমাদের এই জীবনেরই বা অর্থ কি? তাহারই বা সার্থকতা কোথায়?*

* ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন ওটের দক্ষিণ মেজ অভিযানের সঙ্গী ক্যাপ্টেন ওটস-ও (Capt. Oates) এইভাবে মৃত্যুক বরণ করিয়াছিলেন। হিমাক্রান্ত হইয়া যখন তিনি বৃষ্টিতে পারিলেন মৃত্যু অনিবার্য্য অথচ তাঁরুতে থাকিলে সঙ্গীদের গতি বাহ্যতঃ হয়—তখন তিনি মৃত্যু অবস্থায় বাহিরে চলিয়া গেলেন, আর ফিরিলেন না। সম্মাসীর এসকল এই ধীরের মহৎ মৃত্যুর কথা মনে পড়িল।—শনিবারের চিঠি সম্পাদক।

কেতুর পুচ্ছ

ডাক্তার অমিতাভ মিষ্টের বয়স আটশ বৎসর। মাত্র দুই বৎসর হইল সে কলেজ ছাড়িয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছে, কিন্তু ইহারই মধ্যে সহরে বেশ পণ্যের জমাইয়া তুলিয়াছে। সহরটি বেশ বড় এবং তাহাতে বহুমারী প্রবীন চিকিৎসকের অভাব নাই—তবু—

ইহাকেই বলে ভাগ্য।

অমিতাভ বেশ চটপটে; নাকে মুখে কথা। চেহারাও মন্দ নয়, বলিষ্ঠ দোহারালম্বা—মাথায় কোঁড়া চুল। ঠোঁটের গড়ন এমন যে মুহূর্ত্তমধ্যে চটুল ঠাট্টার ভঙ্গি হইতে গভীর সমবেদনায় নতপ্রান্ত্র হইয়া পড়িতে পারে। চোখের দৃষ্টি বৃদ্ধিতে প্রখর; নাকের ডগা হঠাৎ একটু উচু হইয়া গিয়া মুখথানাতে একটা দৃষ্ট ভেঁপেমির ভাব আনিয়া দিয়াছে।

সহরের ঈর্ষণাপরবশ শতমারীরা তাহাকে 'ভেঁপো ছোঁড়া' বলিয়া উল্লেখ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। রোগীর অভিভাবকরা তাহার কথা শুনিয়া অর্দ্ধেক উদ্বেগ তুলিয়া যাইতেন; শয্যাশায়ী রোগী তাহাকে দেখিয়া পাংশুমুখে হাস্য করিত।

সুতরাং বলা যাইতে পারে, কেবলমাত্র ভাগ্যের জোরেই অমিতাভ দুই বৎসরের মধ্যে সহরে পণ্যের জমাইয়া তুলে নাই।

সেদিন সকালে আটটার সময় নিজের ডিসপেন্সারির খাশ কক্ষে প্রবেশ করিয়া অমিতাভ দেখিল এক ভীমকান্তি বিরাট উদরবিশিষ্ট রোগী অত্যন্ত মজ্জিভঙ্গ ভাবে বসিয়া আছেন। রোগীটি অমিতাভের

শনিবারের চিঠি

১০৬৫

পরিচিত; প্রায় প্রত্যাহই প্রভাতে আসিয়া নিজ বেহের নানা বিচিত্র লক্ষণ সকল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ব্যক্ত করিয়া ব্যবস্থা লইয়া গিয়া থাকেন। ইনি জ্ঞাতিতে স্বর্ণকার।

অমিতাভ বলিল,—‘এই যে বিশ্বস্তর বাবু! আজ কেমন আছেন?’
মুম্বুকণ্ঠে বিশ্বস্তরবাবু বলিলেন,—‘বড় খারাপ। আমি বোধহয় আর বাঁচব না ডাক্তারবাবু!’

অমিতাভ মুখথানা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন করিয়া চেয়ারে উপবেশন করিল, বলিল,—‘তাই ত! আপনাকে আজ যেন কেমন একটু রোগা-রোগা দেখছি। কি হয়েছে বলুন ত! আবার কান কটকট করছে নাকি?’

অত্যন্ত বিমর্ষভাবে বিশ্বস্তরবাবু মাথা নাড়িলেন,—‘না। কাল রাতে দু’বার ঢেকুর উঠেছে; একবার এগারোটা বেজে সাত মিনিটে, আর একবার দু’টো বাজতে উনিশ মিনিটে।’

‘বলেন কি! এত ভাল কথা নয়। দেখি আপনার নাড়ী।’

বিষয়মুখে বিশ্বস্তরবাবু তাহার বজ্রমুষ্টি অগ্রসর করিয়া দিলেন। নাড়ী দেখিয়া অমিতাভ বলিল, ‘হ’। কাল রাতে কি পেয়েছিলেন?’

কাতরকণ্ঠে বিশ্বস্তরবাবু আহারের যে ফর্দ দিলেন তাহা শ্রবণ করিলেই সহজ মাহুষের অজীর্ণরোগ জন্মে। অমিতাভ কিন্তু তিলমাত্র বিচলিত না হইয়া বলিল,—‘তাই ত! এমন কিছু গুরুভোজন ত হয়নি, যার জন্তে রাতে দু’বার ঢেকুর উঠতে পারে। তবে কেন এমন হল?’

বিশ্বস্তর বলিলেন,—‘ডাক্তারবাবু, আমি কি সত্যিই বাঁচব না?’

ঈষৎ হাসিয়া অমিতাভ বলিল,—‘আপনি ভয় পাবেন না। আপনার মত লোক যদি অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাহলে আমরা আছি কি জন্তে? একটা গুণ্ড লিখে দিচ্ছি, সেইটে খাবার পর, ছুবেলা ব্যবহার করুন। গুণ্ডটা অবশ্য দামী—’

‘কত দাম?’

‘সাড়ে তিন টাকা পড়বে।’

‘বেশ, লিখে দিন। প্রাণের কাছে সাড়ে তিন টাকা আর কি বলুন!’ বলিয়া বিশ্বস্তর গভীর দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিলেন।

টাকা ডায়েস্টেস, আকোয়া টাইকোটিন্‌ সহযোগে একটি হজমি প্রেস্ক্রিপশান লিখিতে লিখিতে অমিতাভ জিজ্ঞাসা করিল,—‘আজকাল আপনার স্ত্রী কেমন আছেন?’

বিশ্বস্তর বলিলেন,—‘বেশ ভালই আছে।’

‘কাসিটা এখনো বায়নি?’

‘কাসে মাঝে মাঝে। কিন্তু সে কিছু নয়।’

‘সকোবেলা জর আসত, সেটা এখনো আসে নাকি?’

অনিচ্ছাভরে বিশ্বস্তর বলিলেন,—‘আসে হয়ত, ঠিক বলতে পারি না। আর, যেয়েমাত্ম—বুঝলেন না? অমন একটু আধটু—’

‘সে ত বটেই!’ প্রেস্ক্রিপশান বিশ্বস্তরকে দিয়া অমিতাভ বলিল, ‘তবে আমার মনে হয় তাঁকে কয়েকটা ক্যালসিয়াম ইনজেকশান দেওয়া দরকার। অবশ্য আপনার তুলনায় তাঁর অস্থ কচুই নয়—তবু—’

বিশ্বস্তর একটু গভীরভাবে বলিলেন,—‘নিজের অস্থের চিকিৎসা করতে করতেই লম্বা হয়ে গেলাম ডাক্তারবাবু, তার ওপর আবার যদি—’

অমিতাভ জানিত বিশ্বস্তরের লম্বা হইতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে, তবু সে বলিল,—‘আচ্ছা, তাঁকে আপনি এখানে নিয়ে আসবেন, আমি এমনি ইনজেকশান দিয়ে দেব। ওষুধের দামটা খালি দিতে হবে।’

বিশ্বস্তরবাবু অপ্রসন্নমনে কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া শেষে বলিলেন,—‘আচ্ছা দেখি।—ডাক্তারবাবু আপনি দৈব ওষুধে বিশ্বাস করেন?’

অমিতাভ তৎক্ষণাৎ বলিল,—‘হ্যাঁ করি বৈকি। তবে সামান্য অস্থে দৈব ওষুধ তেমন কাজ করে না। আপনি বরঞ্চ নিজের ব্যবহার করতে পারেন, আপনার যে ব্যাধি তাতে দৈব ওষুধ অব্যর্থ কাজ করবে। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারি ওষুধও খাওয়া চাই।’

বিশ্বস্তর স্ত্রীর জন্মই দৈব ওষুধের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কিন্তু ডাক্তার যখন দৈব চিকিৎসায় বিশ্বাস জ্ঞাপন করিল তখন তাঁহার নিজের জন্মও লোভ হইল। দৈব ওষুধের মূল্য কম অথচ উহা মনকে শান্তি দিতে পারে। তিনি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন,—‘এমন কাউকে জানেন ডাক্তারবাবু, যে মাছুলি-টাছুলি দিতে পারে? তাহলে হয়ত—’

এই সময় টেবিলের উপর টেলিফোন জিং জিং করিয়া বাজিয়া উঠিল। ফোন তুলিয়া লইয়া অমিতাভ বলিল,—‘কে আপনি?... আরে বিন্দা! কি খবর?... যেতে হবে? কি হয়েছে? মীনা ভাল আছে ত?... যাক, আমি ভেবেছিলাম মীনার বুঝি অস্থ কয়েছে...’

বিশ্বস্তরবাবু মাছুলির কথা তুলিয়া এই একতরফা আলাপ শুনিতে লাগিলেন।

‘...সার্জারি কেস! কার ওপর অস্ত্র করতে হবে?... হ্যাঁ!... কেতু? মীনার—কি বললে—ছেলে?... ও বুঝি। তা বেশ। আট টাকার কমে আমি ছুরি ধরি না, কিন্তু এ কেসে ডবল ফী চার্জ করব। রান্জি আছ?... বেশ। মীনা কোথায়?... ঘরেই আছে? তাকে ফোন ধরতে বল।... ভাল আছ মীনা? তোমার ছেলের—অর্থাৎ কেতুর—বয়স কত হল? ছ’ মাস?... হ্যাঁ! কি বললে ভাল শুনতে পেলুম না। আমার মনে হল, তুমি বললে—থ্যাং!... যাহোক, এই মাসেই তোমার বিয়ে, তার আগে তোমার ছেলের রোগ সারিয়ে দিতে

হবে—কেমন? কোনো ভয় নেই; অপারেশানটা অবশ্য গুরুতর, কিন্তু আমি সারিয়ে তুলব।...ভাল কথা, তোমার ভাবী পতিদেবতা সুনলুম একজন তরুণ ডাক্তার;—লোকটি বেশ উদার প্রকৃতির দেখছি...অভিনন্দন জানাচ্ছি, আশা করি তোমরা সুখী হবে। পরমেশ্বরের কাছে দম্পতীর দীর্ঘ জীবন কামনা করি...না না রাগ নয়,—সে ত এর পরে সারা জীবন ধরেই আছে...কিন্তু রবিবারের সেই কবিতাটা মনে আছে ত—‘খ্যাতির ক্ষতি পূরণ-প্রতি দৃষ্টি রাখি হরিণ আঁখি’? আমিও এখন থেকে ক্ষতিপূরণের দাবী জানিয়ে রাখছি।...কিসের ক্ষতি! বল কি! যদি এখানকার লোক জানতে পারে যে স্ত্রীয়া অধিকারীকে বঞ্চিত করে আমি এই অপারেশান করছি, তাহলে কি আর রক্ষে থাকবে? প্রফেশনাল এটিকেট আছে ত।...আচ্ছা, এখন যাচ্ছি। তোমার বিয়েতে কি উপহার দেব ভাবছি; কি দিলে ভাল হয় বল ত? একটা কুমীরের চামড়ার হটকেস?...না! এক সেট চায়ের বাসন?...তাও না! তবে?...আঁ! একটা আন্ত মাতৃষ চাই!...আচ্ছা মীনা, তুমি দূর থেকে ত বেশ কথা কইতে পারো, মুখেমুখি হলে আর মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না কেন?...লজ্জা! হু—‘আমার ক্ষম প্রাণ সকলি করেছি দান কেবল সন্মতকু রেখেছি’...আহা—কবিতা বললে ‘অমন চটে বাও কেন?...যাচ্ছি, পনেরো মিনিটের মধ্যে গিয়ে পৌঁছব—কেতুর বাবাকে আমার ভালবাসা দিও—’ অপর প্রান্ত হইতে টেলিফোনের তার কাটিয়া গেল।

ফোন রাখিয়া দিয়া অমিতাভের চেতনা হইল যে বিশম্বরবাবু এতক্ষণ একাগ্রমনে তাহার কথা শুনিতেছিলেন। সে চট করিয়া মুখখানাকে গম্ভীর করিয়া ফেলিল, বলিল,—‘আমাকে এখনি বেরুতে হবে, একটা শব্দ অপারেশান আছে।’

বিশম্বরবাবু কৌতূহল নিবারণ করিতে পারিলেন না, জিজ্ঞাসা করিলেন,—‘কোথায় যেতে হবে?’

‘বিনোদবাবু জমিদারের বাড়ী। তাঁর একটি ভায়ে—হু’ মাসের বাচ্ছা—তার মেরুদণ্ডের কয়েকটা হাড় কেটে বাদ দিতে হবে।—আপনি তাহলে ঐ গুপ্তা আপাততঃ চালান—’

অপারেশানের অস্ত্রাদি ব্যাগে লইয়া অমিতাভ তাহার দশ-মডেল অষ্টনি গাড়ীতে চড়িয়া প্রস্থান করিল। বিশম্বরবাবু কিছুক্ষণ হতভম্ব হইয়া বসিয়া রহিলেন। জমিদার বিনোদবাবুর পরিবারস্থ সকলকেই তিনি চেনেন,—কেবল ভ্রাতা আর ভগিনী, আর কেহ নাই। উভয়েই অববাহিত। সম্ভ্রতি ভগিনীর বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে—এই স্বত্রে বিশম্বরবাবু প্রায় পনেরো হাজার টাকার গহনা সরবরাহ করিবার ফরমাস পাইয়াছেন।

অথচ—?

বিনোদ বলিল,—‘ডাক্তারই বল আর গো-বন্তিই বল, তুমি ছাড়া মীনার কান্না ওপর বিশ্বাস নেই।’

বিনোদের পড়ার ঘরে বিনোদ ও অমিতাভ মুখোমুখি বসিয়াছিল, মীনা দাদার চেয়ারের পিছনে প্রাড়াইয়া ছিল। ছোটখাট মেয়েটি, বয়স সতের কি আঠারো; স্বন্দর চোখ দুটিতে আশঙ্কার ছায়া বাস্তবিক লাজুকতার সহিত মিশিয়া তাহাকে যেন আরও ছেলোমাতৃষ করিয়া দিয়াছে।

অমিতাভ তাহার দিকে চোখ তুলিয়া মুহূর্ত্তে বলিল,—‘একেই বলে পূর্বরাগ। ডাক্তারের কথা ছেড়ে দিলুম, কিন্তু গো-বন্তির

চেয়েও আমার ওপর বেশী বিশ্বাস,—খাটি ভালবাসা না হলে এমন হয় না।'

মীনা উত্তপ্ত মুখে অন্ধদিকে তাকাইয়া রহিল। অমিতাভ যদিও তাহার দাদার কলজের বন্ধু, (উভয়ে এক সঙ্গে আই-এস-সি পড়িয়াছিল) তবু অমিতাভের সান্নিধ্যে আসিলে সে কেবলই ঘামিতে থাকে; কোনো বসিবা তাহার ছ' একটা ঠাট্টার জবাব দিতে পারে, চোখোচোখি হইলে একেবারে বোবা হইয়া যায়।

অমিতাভ বলিল,—'বিন্দা দেখছ, মীনার কি রকম লজ্জা হয়েছে! তোমার সামনে প্রেমের কথা উত্থাপন করা আমার উচিত হয়নি। প্রেম হচ্ছে ভারি গোপনীয় জিনিষ, দাদার সামনে তা নিয়ে আলোচনা অতি গহিত, আড়ালে আবড়ালে চুরি করেই প্রেমের কথা বলতে হয়। অতএব ওকথা এখন থাক। এখন তোমার সংসারের খবর কি মীনা? তোমার বিলিতি ইচ্ছাগুলি বেশ মনের আনন্দে আছে? রুপী বাদরটির স্বাস্থ্যের কোনো রকম ব্যাঘাত হয়নি?'

বিনোদ হাসিয়া ফেলিল, বলিল,—'আঃ অমি, ওকে আঁর জালাতন করিসনি। এমনিতেই বেচারার কাল থেকে দুর্ভাবনায় শুকিয়ে উঠেছে। এখন যা, কাজটা সেরে আয়।'

'তথাস্তু।' অমিতাভ ব্যাগ হাতে করিয়া উঠিয়া পাড়াইল,—'তুমি আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চল মীনা। বিন্দা, তুমি আসবে না?'

'না, এখন একজন লোক আসবার কথা আছে।'

'উঃ—কি পাষাণ! ভাগ্যের চেয়ে লোক বড় হল।' অমি স্বদয়-বিদারক নিশ্বাস ত্যাগ করিল,—'বেশ! বেশ! চল মীনা।'

অমরের একটি রুদ্ধদ্বার ঘরের সম্মুখে আসিয়া মীনা পাড়াইল,

অমিতাভের মুখের দিকে কাতর চোখ তুলিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল,—'বাচবে ত?'

চমকিত হইয়া অমি বলিল,—'কে?'

ভংসনাপূর্ণ চোখে মীনা বলিল,—'কেতু।'

অমি তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিল,—'কোনো ভয় নেই, আমার অস্ত্রাঘাতে আজ পর্যন্ত কেউ মরেনি। একবার একটা হলো বেরালকে লাঠি মেরেছিলুম, সে আজ পর্যন্ত বেঁচে আছে।—এই ঘরে কেতু আছে ত? তুমিও এস না।'

মীনা শিহরিয়া উঠিল,—'আমি ও চোখে দেখতে পারব না।' বলিয়া চোখে আঁচল দিল।

অমি বলিল,—'আচ্ছা তুমি বাইরে পাড়িয়ে থাক; এক মিনিটে কাজ শেষ হয়ে যাবে।—কিন্তু ক্ষতিপূরণের কথাটা মনে আছে ত? তোমার দাদা অবশ্য ডবল ফী দেবে বলেছে, কিন্তু বিন্দাকে বিশ্বাস নেই, শেষপর্যন্ত হয়ত ফাঁকি দেবে। তখন কিন্তু তোমার কাছ থেকে আমি ক্ষতিপূরণ আদায় করব।'

আঁচলের ভিতর হইতে মীনা বলিল,—'যাও।'

অমি একবার চারিদিকে তাকাইয়া দেখিল, কেহ কোথাও নাই।

'অগ্রিম কিছু আদায় করে নিই।'—চট্ করিয়া তাহার সিঁধি-মূলে একটা চুষন করিল, তারপর ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

রক্ত করবীর মত রাঙা মুখ ছহাতে চাপিয়া মীনা দ্বারের বাহিরে পাড়াইয়া রহিল। ছি ছি—একটু লজ্জাও কি নাই! বিয়ের আগে—

ঘরের মধ্যে নিশুঙ্ক। পাঁচ মিনিট কাটিয়া গেল। মীনা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতে লাগিল। কেতু কি—?

তারপর সহসা ঘরের ভিতর হইতে তারপরে চীৎকার উঠিল—কেউ কেউ কেউ।

ক্রমশ কুতুর শাবকের কাতরোক্তি ক্রীণ হইয়া থামিয়া গেল। মিনিট দুই তিন পরে অমি বাহিরে আসিতেই মীনা ব্যাকুল বিক্ষারিত চক্ষে তাহার পানে তাকাইল।

অমি নিজের মুখ তাহার দিকে বাড়াইয়া বলিল,—‘এই নাও।’
না বুঝিয়া মীনা হাত পাতিল। কেতুর কণ্ঠিত পুচ্ছটি তাহার হাতে দিয়া অমি বলিল,—‘অপারেশান্ সার্বসেসফুল। রোগী এখন নিদ্রা যাচ্ছেন।’

মীনা লাজটি ছুঁড়িয়া মাটিতে ফেলিয়া দিল; তারপর ঘরে গিয়া চুকিল। অতকিতে অমির পিঠে একটি কিল মারিয়া দরজায় ধিল লাগাইয়া দিল।

অমি কিছুক্ষণ প্রাড়াইয়া রহিল। তারপর ক্ষুদ্র পুচ্ছাংশটি পকেটে পুরিয়া মুহু হাসিতে হাসিতে বাহিরের দিকে চলিল।

বাহিরের ঘরে আসিয়া অমি দেখিল বিশ্বস্তরবাবু বিনোদের কাছে বসিয়া আছেন। বিস্থিত হইয়া বলিল,—‘একি! বিশ্বস্তরবাবু আপনি এখানে যে?’

বিনোদ বুঝাইয়া দিল যে বিশ্বস্তরবাবু মীনার বিবাহের সমস্ত গহনা গড়ার ভার লইয়াছেন, স্বতরাং তাহার এ বাড়ীতে যাতায়াত বিচ্ছিন্ন নয়।

অমিতাভ কিছুকাল অপলক দৃষ্টিতে বিশ্বস্তরবাবুর দিকে তাকাইয়া রহিল; তারপর অঙ্গুলি সন্ধেতে তাহাকে ডাকিয়া বলিল,—‘এদিকে একবার শুনে যান, একটু কথা আছে।’

বিশ্বস্তরকে আড়ালে লইয়া গিয়া অমি বলিল,—‘আপনি আজ মাহুলি ধারণের কথা বলছিলেন না? হঠাৎ মনে পড়ে গেল, আমার কাছে ভাল দৈব ওষুধ আছে।’

বিশ্বস্তর উৎসুক নেত্রে চাহিয়া রহিলেন।

অমি গম্ভীর মুখে বলিল,—‘কেতু গ্রহই আপনার অনিষ্ট করছে; কেতুর মাহুলি ধারণ করলেই আর কোনো রোগ থাকবে না।’

আগ্রহ স্বরে বিশ্বস্তর বলিলেন,—‘কি করতে হবে?’

পকেটে হাত পুরিয়া কেতুর পুচ্ছটি নাড়িতে নাড়িতে অমি বলিল,—‘একটি বেশ বড় দেখে সোনার মাহুলি তৈরী করে কাল আপনি আমার কাছে নিয়ে যাবেন, আমি তাতে দৈব ওষুধ ভরে দেব। মাহুলিটি অন্তত তিন ইঞ্চি লম্বা হওয়া চাই, আর সেই অহুপাতে মোটা। সেটি গলায় ধারণ করতে হবে।’

হাত ঘষিতে ঘষিতে বিশ্বস্তর বলিলেন,—‘যে আজ্ঞে।’

‘আর আপনার স্ত্রীকেও সেই সন্ধে নিয়ে যাবেন, ইন্জেকশান দিয়ে দেব।’

দ্রব্য গ্রহণ হইয়া বিশ্বস্তর বলিলেন,—‘আচ্ছা।’

‘আপনি যখন এ বাড়ীর স্ত্রীকরা তখন ওষুধের দামটা আর আপনাকে দিতে হবে না।’

পুনরায় উৎফুল্ল হইয়া বিশ্বস্তর বলিলেন,—‘যে আজ্ঞে।’

‘চন্দ্রহাস’

রোটারি ক্লাব

দেবি,

আমা হতে আছ বহু উপরে
আমি চলি খালি পায়ে তুমি “শু” প’রে
মোরা মন্দিরে যাই সাঁঝে দুপুরে
তুমি “ট্যাপডাঙ্গা” কর ফেলি নুপুরে ;
তব “বেডরুমে” শোভে “কফি কাপ” যে ;
মোর চাটাই বাহিয়া ছোটো সাপ যে ;
যেথা স্নান কর সেথা রাখ কত কি
কত “সন্ট, সেন্ট” ; আমাদের মত কি !
পরে তোয়ালের জোন্সাটি পরিয়া
যাও “ড্রেসিং রুমেতে” । মোরা দরিয়া,
শিরে তৈল ঘষিয়া মণি সঘনে,
তবে, “শাওয়ারেও” স্নান হয় ; গগনে
যদি বর্ষার ঘনঘটা প্রাতেতে
হয় ঠিক মত নাচি গিয়ে ছাতেতে ।
তব যৌবন বন্দিনী বাধনে
ছাটা কুন্তল নব উন্মাদনে
হেয়, উষ্মল অকারণ প্লকে
“নহে মতলব ভাল” বলে কুলোকে ।
আর, বন্ধাবরণ স্বরু দেবীতে,
তাও, খসে পড়ে শ্রাম্পেন শেরিতে,

শনিবারের চিঠি

১০৭৫

পরপুরুষের পরশেতে হর্ষ
কত পতি পাও, সতি, প্রতি বর্ষ !
আর আমরা অলাব্ ছুলি সকালে
পতি খুশি হ’ন কচি আমে, অকালে
পর নিম্না যে স্বরু দুইপহরে
ইহা ছাড়া আর কাজ কি এ শহরে ?
বায় আনা দিয়ে তেল চুলে মাসেকে
এত অল্প খরচে ভালবাসে কে—
নিউ ইয়র্ক ও লণ্ডন ও পারীতে ;
ত্রকে বায় বেশী শ্রম কম শাড়ীতে ।
বিলে রহিবে সতত স্বামী ত্রস্ত
তাই বসন হয়েছে সাত প্রস্থ,
তবে সমুদ্রতটে জলকলিতে
লাগে সময় অল্প খুলে ফেলিতে
যত শহরের আভরণ ও লজ্জা
শুধু থাকে দেহ দূরে যায় সজ্জা ।
তবে ভেব না আমরা কিছু জানি না,
হলে সুবিধা মোরাও কিছু মানি না,
ঝড়ে যায় উড়ে আমাদেরও বস্ত্র,
জলে নামিলে মোদেরও আছে অস্ত্র,
দেহে আছে গো মোদেরও জেন বক্ষ,
পর পুরুষেরা করে সদা লক্ষ্য ।
যদি বাহিরে প্রচার করি অল্প,
করি’ প্রণয়ের অভিনয় ও গল্প,

গালে গাল রেখে নৃত্যে আনন্দে ;
 নহি অপারগ যথার্থ দৃষ্টে ।
 ওগো ওপারের অপরাধিনী,
 করি “দর্শন” হেতু তব নিন্দা
 চোখে দেখ এক, আর থাকে আড়ালে
 পড়ে মাটিতে দুটিই জ্বারে নাড়ালে ;
 তথা পূর্ব ও পশ্চিম ডালেতে
 তথা পূর্ব ও আধুনিক কালেতে,
 আছে যৌবন-ফল-ভার ভরিয়া
 থাকে ফ্রক শাড়ী ঘাঘরাটি পরিয়া,
 কিবা কিমানো সারঙ্গ কিবা পাঞ্জামা
 কিবা কোমরে কিছু না, বুকে না জামা,

সবে এক ভাবে চলে শুধু চঙেতে
 আছে তফাৎ এবং গা’র রঙেতে,
 বলি তাই এই ভুল কতু করো না
 ফ্রক ফেলিয়া সতীর শাড়ী পরো না ।
 যারা শাড়ীতে ঢাকিয়া দেহ অঙ্গ
 করে রেখেছেন ‘প্রিমিটিভ’ এ বঙ্গ,
 তাঁরা যেন না করিয়া মহা ভুলটি
 ছেঁটে বসেন না এলায়িত চুলটি,
 আর খুলিয়া ঘোমটা খুলি বঙ্গ
 খুঁজে বেড়ান না যুবাজন সখা ।
 কেন, দুইই এক প্রাকৃতিক ঘটনা
 এর তফাৎটা বেকুবের রটনা ।

যাঁর অন্তরে আছে প্রেম পিপাসা ;
 জুয়া খেলা চাই, কিবা তাস কি পাশা ?
 যাঁর মন চলে প্রণয়ের দিকেতে
 তাঁর কি ফরক বিবাহ কি নিকেতে ?
 তাই আধুনিক হইবার চেষ্টা
 আর আধ্যাত্মিক যত তেষ্টা ।
 চাহে সকলেই “উন্নতি” সঘনে
 মোর দৃষ্টি যে নিবন্ধ গগনে !

শ্রীমধুকরকুমার কাক্সিলাল

রামমোহন রায় কি খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ?

অল্পদিন হইল শ্রীযুক্ত অমলাচরণ বিজ্ঞানভূষণ মহাশয় মেদিনীপুর শাখা-
 পরিষদের বার্ষিক সভায় বক্তৃতাকালে এরূপ উক্তি করিয়াছেন যে রাজা
 রামমোহন রায় খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন । ইহা লইয়া তথায় কিছু
 চাকল্যেরও সৃষ্টি হইয়াছিল । বিজ্ঞানভূষণ মহাশয় ইতিহাস লইয়া কারবার
 করেন । তিনি যে বিনা-প্রমাণে এরূপ উক্তি করিবেন তাহা মনে হয় না ।
 বাহা হউক রামমোহন রায় সম্পর্কে এরূপ উক্তির সত্যতা নির্ধারণের
 জন্ত রামমোহন রায় বিষয়ে দীর্ঘকাল গবেষণা-নিরত শ্রীযুক্ত ব্রজেননাথ

বন্দোপাধ্যায় মহাশয়কে আমরা এ বিষয়ে প্রশ্ন করি। তিনি তদন্তের বিলাতের 'ওরিয়েন্টাল হেরাল্ড' পত্র (জানুয়ারি-মার্চ, ১৮২৮) প্রকাশিত কলিকাতা হুশীম-কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যর হার্ডিউ বৈটের একখানি পত্রের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। এই পত্র হইতে আবশ্যক অংশ আমরা যথাম্বুরূপে মুদ্রিত করিতেছি। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হইলে প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটিত হইবে এবং রামমোহনের খ্রীষ্টানত্ব গ্রহণ করার কাহিনী সত্য হইলে, তিনি যে ধর্মের দিক্ দিয়া নানারূপ পরীক্ষার পথে অগ্রসর হইতেছিলেন ইহাও প্রমাণিত হইবে। এই আলোচনায় আমরা বিজ্ঞাভূষণ মহাশয়কেও যোগদান করিতে অনুরোধ করিতেছি।—

THE ORIENTAL HERALD—VOL. XVI, Jany.-March 1828.

London MDCCCXXVIII.

"Sir Edward East's suggested Reforms in India," pp. 28-29.

... ..

RAM MOHUN ROY

Take another instance. A Native of high rank and great family estate in the province of Burdwan, a Brahmin of nine strings, which is of very high caste, by name of Ram Mohun Roy, son of Ram Caunt Roy, has lately declared himself a Christian, of what precise description does not distinctly appear; and, perhaps, he himself would find it difficult to determine that point, as his self-conversion seems by all account (for I am not personally acquainted with him) to be still in progress, and has not, I believe, proceeded further than a kind of Unitarianism.

I have heard that he calls himself a Unitarian Christian.* He says, however, that he will not do any thing willingly to forfeit his caste, (considering it probably as the nobility,) which he is desirous to preserve, and therefore declines eating, &c. with us, though he invites company, and sits at the table with them. Before he made public declaration of his faith, he consulted, as he says, upon this point of caste with his family, and with forty others of the principal and most respectable of his neighbours and friends, who promised to uphold and continue their association with him; and he adds, that if the other Brahmins be satisfied with this, he shall take no further steps to sever himself from them, or to influence others, who, in case of extremity, would, he thinks, follow him in his entire separation to the number of above 200.

This is a novel attempt, and, if successful, which remains yet to be proved, may be followed by important consequences. The Brahmin certainly regards his strings, independently of religious motives, as conferring worldly distinction upon him. They are marks of high descent, to which he naturally clings. In proportion as this feeling gains strength and encouragement, the other feeling will abate and be melted down. †

* Though he is extremely well versed in the Scriptures, from whence he has drawn his morality, his more accurate description, as I have since had reason to believe, is of a Deist. I have seen a curious work of his, lately published, being an address to his countrymen against idolatry, which he maintains to be corruption of their ancient faith.

† I do not find that he is a favourite among his countrymen; they say that he has publicly abused them, instead of endeavouring by private instruction to improve them.

What is the legal condition of this last mentioned personage? The distinction which he is attempting to establish, seems, if he succeed, to leave him essentially Hindu as to customs and laws respecting himself and his own rights, and so far it differs from the antecedent case; but it is certain that great difficulties must hereafter arise on his civil relations. As a Christian, if he terminates in one, can he have a plurality of wives? The legality of his issue, on a question of inheritance, must depend as to any subsequent marriage on the legality of the marriage rite, which the Hindoo law (though it recognizes the marriage of a stranger according to his own national form) has not yet recognized as between Hindoos, if not performed according to its own rite. Is such a person to be deemed a Hindoo in point of law for one purpose and not for another? His will could not be proved in the Supreme Court, which can only grant probate of a will of a British subject, as elsewhere explained. Would the pundits consider a professed Christian convert from their faith as a Gentoo for any purpose? Or is he to lose the benefit of the one code, without acquiring that of the other?

এখানে বলা প্রয়োজন, 'ওরিয়েন্টাল হেরাল্ড' পত্রের সম্পাদক ছিলেন জেমস্‌ সিন্ধ বাকিংহাম। ইনি রামমোহন রায়ের এক জন বিশিষ্ট বন্ধু। বাকিংহাম কলিকাতায় অবস্থান কালে ১৮১৮ সনে 'ক্যালকাটা জর্নাল' নামে একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। 'ক্যালকাটা জর্নাল' সে-যুগে উচ্চাঙ্গের সংবাদপত্র ছিল।

ইতিপূর্বে (জুন, ১২২৬) শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'মার্জার রিভিউ' পত্রিকাতে Victor Jacqemont লিখিত Voyage

Dans L'Inde গ্রন্থের অংশ-বিশেষ ফরাসী হইতে অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতেও রামমোহন রায় যে ক্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এরূপ উল্লেখ আছে।

—শ. চি. স.

পৃথিবীর পাগলামী

(পূর্বসূচক)

আজকাল সেখানে, সর্বদা সব রাস্তার উপর ভারী বাধা কাঠের কাঠামো, যার উপর দিয়ে—'ছারো গেজের' লাইন নিয়ে যাওয়া হয়েছে; বছরে অনেকবারই এই কাঠামো ভেঙে পড়ে' বিশাল বনের মধ্যে আগুন জালিয়ে দেয়; কিন্তু তা সত্ত্বেও এই জলা উপত্যকায় ছ'শো লোক, রাত্রিদিন প্রাটিনাম্‌ সন্ধান করেছে, কেননা লোনা গন্ধযুক্ত শ্রাওলার নীচে, পাহাড়ে নদী-দ্বীপ পাথরের নীচে, সর্বত্রই সেই কদমাক্ত মৃত্তিকায় লুকান সেই শ্বেতবর্ণ ধাতু পাওয়া যায়, যা সব ধাতুর চেয়ে ভারী, সব ধাতুর চেয়ে দামী।

Kytlim আজকের দিনে প্রায় সম্পূর্ণরূপে socialised। যেখানে যেখানে বড় বড় মেশিনে কাজ করেছে বা যেখানে এই ধাতু বহুল পরিমাণে পাওয়া যেতে পারে, সে সব স্থানের কাজ-কাজি প্রাইভেট অফসন্ধানকারীদের কাজ করতে দেওয়া হয় না। এরা সব সর্বদাই বিকারগ্রস্ত, এবং স্বর্ণ সন্ধানকারীদের পাগলামি,

এই প্র্যাটিনাম্ অধেষণকারীদের তুলনায় কিছুই নয়। রাত্রিদিন এরা মাটি উলট-পালট করেছে এবং বালি, মাটি, কাদা, আস্তাকুঁড় যা কিছু সব খুঁজেছে। এবং যদি দৈবাৎ, কোন স্থানে 'কয়েক গ্রাম' ধাতু পাওয়া যায়, তাহলে তো রক্ষা নেই; সেখানকার মাটি কামড়ে পড়ে থাকবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জলে থাকার ফলে সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে এবং কালশিরে পড়া হাত ক্ষয়ে ক্ষয়ে কবজী পর্যন্ত এসে ঠেকে, ততক্ষণ পর্যন্ত খোঁড়া, ধোওয়া, সন্ধান করার বিরাম থাকে না।

আর ভাল ভাল জায়গায়, dredgerএর কাজ। Kytlimএ এই রকম সাতটা কল আছে, যা দিনের চরিত্র ঘটায়, প্র্যাটিনাম পূর্ণ মাটি চিবোতে ব্যস্ত। এই সমস্ত নতুন ধরণের মেশিন, Kytlimএর গিরিশঙ্কট দিয়ে, ঘোড়ায় করে টেনে তোলা হয়; একটা মেশিন তুলতে সময়ে সময়ে একশো কুড়িটা ঘোড়াও লাগান হয়। সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে, বিরাট সেই ইম্পাতের জানোয়ারটাকে পার্শ্বাভ্যাস দিয়ে নিয়ে যাবার জন্তে, ঘোড়ায় টানতে থাকে; রাস্তায় সব কাঠের তক্তা বিছান, কাগজ জলাভূমির উপর দিয়ে পথ; এ সব তক্তা কখনও বা কাদায় গেড়ে যায়, কখনও বা উল্টে যায়। যাই হোক, অবশেষে, গন্তব্য স্থান এসে সেই কলের অংশ সকল জোড়া হয়, তখন সেই ইম্পাতের দৈত্য তিনতলা সমান উঁচু হয়ে ওঠে।

মেশিনের সঙ্গে সব 'কেবল্' ফিট করা; মোটর গর্জন করে ওঠে এবং 'ড্রেজার' জমির উপর বিশাল গর্ভ করতে থাকে; গর্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেটা জলে পূর্ণ হয়ে ওঠে। এমনি জমি!

বড় বড় গাছের গুঁড়ি দিয়ে, 'রাকট' তৈরী করা হয়, যার

উপর ড্রেজারটা চড়ান হয়। নদ্র, গভীরভাবে কাদার মধ্যে পুতে যায়; এবং অবিশ্রান্তভাবে তার বেসিন বাড়াতে বাড়াতে, ড্রেজার তটদেশ কাটতে থাকে; তার বড় বড় বালতী যা কিছু পায়, তাই চূর্ণ করে। অবিরাম তার কোদাল জলে ডুব মারে এবং অবিশ্রান্তই একটা নির্দিষ্ট এবং আগে থেকেই তৈরী করা জমির উপর দিয়ে পাথর-মাটি ভণ্ডি কর্দমাক্ত জল ছুটতে থাকে। মেশিন রুতিনশো মিটার কিউব মাটি চূর্ণ করতে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত না, section des eclusesএর, শেষ ফিলটার কার্যের পর, আবার একতাল কাদা খাড়া হয়ে ওঠে। Section des ecluses হচ্ছে, একটা স্থানের শেষ ষ্টেশন, শেষ সেকশন, যেটার চারদ্বারে মোটা ইম্পাতের বেড়া এবং যার কেবল মাত্র একটাই দরজা; দরজা, প্রতিক্ষেপ কাজের সময়, নতুন করে সীল করা হয়। ইম্পাতের এই দরজার কাছে একজন কন্ট্রোলার, অনেকটা ভূবীর মত পাষাকে ভূষিত; তার পায়ে উঁচু বুট এবং বেটে চুটো বড় রিভলভার। এবং সামনে ঐ section des eclusesএর খাঁচার মধ্যে, আর একজন কন্ট্রোলার; তারও কোমরে স্কোলান চুটো রিভলভার, কিন্তু হাত চুটো তার রিভলভারের হাতলে।

প্রতি ড্রেজারেরই দুজন করে পরীক্ষক; এরা মস্তো থেকে পাঠানো। যাবার এদের দুজনের উপর চোখ রাখার জন্তে, গুপ্তচরের অভাব নেই; তাদেরও মস্তোই পাঠিয়েছে।

এই সব 'লকে' (ecluses) কেবল জলের কলরোল ছাড়া অল্প কিছুই শোনা যায় না। হিন্ হিন্ শব্দ করে জলের মোটা তোড় একটা বড় পাত্রে, তার ফেণ্টের চাদরের উপর ছড়িয়ে পড়ে; যোগ্যের জমান কাদার এক অংশে সেই হাঁকনি স্বরূপ চাদর

লাগান; মোটা সুরু ছিঃওয়ালা নানা ধরণের ছাকনি পরস্পর ঘেসাঘেসী করে শাঝান। জলের তোড় কাদায় গিয়ে ধাক্কা মারে, কাধা গলে নামতে থাকে; গড়িয়ে গড়িয়ে সবচেয়ে স্থল ছিঃ বিশিষ্ট চাদরের উপর আসে এবং সেই সঞ্চিত কাদার তাল থেকে বাতাসের বৃদ্বদ ফুটে ওটে। শেষটুকরো চাদরের কাছেই অস্ত্রে সজ্জিত পরীক্ষক। ডেজারের কর্শচারীদের কর্পোরেশন বেড়ার কাছে জড় হয়ে, নিশ্চক্ৰতায় যেন জমে থাকে। তারপরেই Garjan Maltzeff পাইওনিয়ারদের অভিজ্ঞতম ব্যক্তি প্র্যাটিনাম সন্ধানে লেগে যান। নিপুণ হাতে ইনি কাদা ঘাঁটতে থাকেন; ধীরে ধীরে আলস্তের সঙ্গে, নোংরার মধ্যে চিকনির মত একটা যন্ত্র টানেন; পরে একটা বুরুষের সাহায্য নেন, বুরুষটা বারে বারেই তাঁর নিজের হস্তস্থিত ফেণ্টের উপর পুঁছতে থাকেন। ছোট ছোট গোলাকার সাদা বস্ত্র; তখন তিনি আব্দুল দিয়ে সেই ঘোঁয়াটে দামী ধাতুর থেকে ছোট তাল করেন। সকলের চোখ জলে ওঠে; সে এক আনন্দ। বাস্তবিক যখন সেই কাদার মধ্যে থেকে প্র্যাটিনাম আহরিষিত হয়, তখন মনের এক অভূতপূর্ণ ভাব হয়।

মজ্জমুৎবৎ সকলেই এই অহুসন্ধান কার্য্য চোখ দিয়ে যেন গিলতে থাকে। ছোট ছোট তাল এবারে আর ধূসর নয়; এখন তারা নীলাভ শ্বেত, প্র্যাটিনাম এখন বিশুদ্ধ।

আগুনের উপর শুকিয়ে, ওজন করে থলেয় পোরা হয়। ওদিকে নতুন করে ডেজার আবার তার কর্শব্য করতে থাকে,—এ ছোট গোলাকার তালটুকু স্বজন করবার জন্তে Kytlim উপত্যকার তিনশ মিটার কিউব পাথরে জমি কড়মড় করে ভাঙতে থাকে। মাইলের পর মাইল ধরে, জলাভূমির উলট-পালট করা হয়েছে, এখনও

অনেক বাকী; পাহাড়, বন জঙ্গল, উপত্যকা, কিছু বাদ থাকবে না, সবই খোঁড়া হবে। যে রাস্তা দিয়ে এই কার্য্যস্থানে আসা হয়, যে রাস্তা দিয়ে শ্রবজীবী বা কর্শচারীরা তাদের আশ্রানাথ যায়, সে সর্বের নীচেও প্র্যাটিনাম আছে; কাজেই সে সব খোঁড়া হবে এবং দরকার হলে, সেই এক খেন ধাতুর জন্তে বাড়ীঘর বনজঙ্গল বা কিছু সামনে পড়বে, সবই ডিনামাইটের সাহায্যে উড়িয়ে দেওয়া হবে।

হুশো লোকের এ ছাড়া অল্প কোন চিন্তা নেই; এরা যেন জন্তর মত বাস করে। সোভিয়েট শবরের কাগজ থেকে সংবাদ শোনা যায় যে, Kytlim একটা অতি বদ স্থান, সেখানে থালি রাজনৈতিক দণ্ডিত শাসামীরা কাজ করে এবং সেখানে কৃষকরা গরু কেনার অর্থ-সংগ্রহ করার চেষ্টা করে। এখানেই পৃথিবীর বড় ভাগ্যানুসন্ধানকারীরা, নানান 'কর্পোরেশনের' কাজে নিযুক্ত এবং তাদেরই আবিষ্কার অহুয়ায়ী সেই সব 'কর্পোরেশান' সেই সব জায়গা একচেটে করে নিয়েছে। Kytlim এর মত এত বদ আবহাওয়াযুক্ত ও এত অস্বাস্থ্যকর স্থান উরাল প্রদেশে আর নেই। এখানকার হুশো লোকের মধ্যে এমন একজনও নেই যার পা বাতব্যাধিতে ফুলে না উঠেছে বা যার মূৰ মশার কামড়ে বিকৃত হয়নি; তাছাড়া তাদের বাড়ী যে সব কাঠে তৈরী, সে সব কাঠ পচা।

চারদিকেই বন, অগম্য, দুর্ভেদ্য বন; গাছপালা ভগ্নি এক অতি ফলা স্থান, কিন্তু হলে হয় কি, একটা কাঠের বাড়ীর দাম সত্তর ফল। একটা মজুর মাসে মাড়ে এগার 'ফল' রোজগার করে।

পৃথিবীর প্র্যাটিনামের যে উৎপাদন, তার শতকরা আশী ভাগই এই Kytlim থেকে একাই আসে। ১৯১৪ সালে এখানে যে উৎপাদন

ছিল, এখানকার কর্পোরেশানরা এখনও সেই পরিমাণটা ঠিক বজায় রেখেছেন। বলতে কি, প্রাইভেট অহুসন্ধানকারীদের চেয়ে এই সব কর্পোরেশানের 'চীফ'রা বড় কম যান না, অহুসন্ধানের উত্তেজনার দিক থেকে।

এখানকার দৃশ্যে লোক সর্কদাই অসন্তুষ্ট মনে ঘোঁং ঘোঁং করে, কারণ, এরা প্র্যাটিনাম চুরি করতে পায় না; এ জিনিষটা অত্যন্ত শক্ত এখানে, এমন কি অসম্ভব বললেই চলে। চারিদিকেই চর, রিভলভার, মেশিনগান।

না থেমে, ড্রেজারের বাঁশী ক্রমাগতই বেজে চলে; পাথরও ক্রমাগত গুঁড়ো করা হয়। আবার তেমনি ঠাণ্ডা কনকনে উত্তরে বাতাসও এই উপত্যকায় ক্রমাগত বয়ে আনতে ছাড়ে না, গা পাক দেওয়া বাষ্প ও ধোঁয়া, যা উরালের বন পোড়ান আগুন থেকে সর্কদাই বাতাসে ভেসে আসে। এ সব অগ্নিকাণ্ডের কারণই হচ্ছে, মাছাতার আমলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেলওয়ে 'লোকোমোটিভ'; এ সব এঞ্জিন থেকে যে ফুলকী নির্গত হয়, তা রোধ করার কোন যন্ত্রই এতে লাগান নেই, কারণ এ সম্বন্ধে অর্থ খরচ করার কথা ভাবাই হয় না। যা কিছু অর্থ, তা কেবল Kytlim-এর বৈজ্ঞানিক স্টেশন বাড়াবার জন্তে এবং ড্রেজার কেনার জন্তেই ব্যরিত হয়।

এই ড্রেজারগুলো এর মধ্যেই সাতটা ছোট ব্লক গিলেছে, আরো ছুবছরে আরো তিনটে গিলবে। এদের কাজই হয়েছে ভীষণ শক্ত করে, বজ্রের গর্জনে, যা কিছু হাতের কাছে পাওয়া যায় সবই, পাথর মাটি ইত্যাদি চূর্ণ করা এবং তার সঙ্গে Kytlim-এর হুঁশে জ্বল লোককেও।

এই সব লোকদের কাজ শেষ হয়ে গেলে যখন এরা তাদের

ব্যারাকের শোবার আস্তানায় ফেরে এবং খালি পায়ে দুর্গন্ধময় পচা তাদের বিছানার উপর গড়ায় তখন তাদের মধ্যে মনে হয় যেন এটা একটা মর্গ। কোণে নিষ্কিঞ্চ জুতো থেকে এদের সাদা বাষ্প উঠছে; চারিদিকেই এই সিন্ততা এবং তার সঙ্গে যারা ঘুমুচ্ছে তাদের ভারী নাসিকাস্পর্শ। বাইরে শাস্ত্রী প্রহরীর ঘাঙড়া আসা এবং দূরে ড্রেজার কর্তৃক যন্ত্রিকার উপর জলের পতনের হু হু শব্দ। না, Kytlim-এর মনে দয়া নেই, এর বিশ্রামও নেই।

এস্থানের উপর আজ Kytlim-এর পতন হয়েছে। কারণ এখানে প্র্যাটিনামের অস্তিত্ব। সোভিয়েটদের কাছেও এই বহুমূল্য ধাতুর উৎপাদন কার্য ছাড়া এর অস্ত্র কোনই উপকারিতা নেই। এটা যেন এক নরক বিশেষ!

Kytlim-এর এই হুঁশো ক্রমচারীর সকলেই যেন জীতদাস! এখানকার বদ অবস্থা সবই অবশ্রু সংশোধন করা হবে একদিন, তবে এখন না। হবে তখন, যখন এই Kytlim থেকে quinquennial plan অনুসারে যা ঠিক করে রাখা হয়েছে, সেই পরিমাণ প্র্যাটিনামের উৎপাদন হবে, যদ্বারা সাইবেরিয়ার—industrialisation ব্রোদ্যাপন অবসানে, রাশিয়ার উপর উত্তমর্গ বিদেশ সমূহ কর্তৃক প্রেরিত হতী সকলের দাবী মিটান যাবে। Kytlim-এর অধিবাসীদের যখন এ ব্যাপার বুঝিয়ে বলা হয়, তখন যে তারা বিশেষ তুষ্ট হয় না একথা বলাই বাহুল্য। তবুও, প্র্যাটিনাম সন্ধানের উত্তেজনা এবং বিকার তাদের পেয়ে বসে, এবং নতুন নতুন স্থান আবিষ্কার করতেও এরা ছাড়ে না।

কমল

লেখক, জিসকা

অনুবাদক, শ্রীতরণ ঘোষাল, প্যারিস

প্রসঙ্গ কথা

বাংলাদেশের মধ্যে যতগুলি শহর আছে তাহার প্রত্যেকটিতে বর্তমানে যে ব্যবসায়ী অতি আড়ম্বরের সহিত চলিতেছে তাহা সিনেমা-ব্যবসা। যে কারণেই হউক সিনেমার মোহ লোককে একপার্শ্বে পাইয়া বসিয়াছে যে ইহা হইতে তাহার আর কোনো মুক্তির উপায় নাই। এই মুহুর্তে যদি স্বয়ং ভগবান ছইখানি এক টাকা ছই আনা মূল্যের টিকিট আনিয়া বলেন, ইহার একখানি সিনেমায় যাইবার, অল্পখানি স্বর্গে যাইবার, কোন খানি লইবে? তাহা হইলে আমি অন্তত বলিব, যে ভগবান তোমাকেও পূর্বে দেখি নাই, স্বর্গও পূর্বে দেখি নাই, স্বতরাং risk লইব না; যে টিকিটখানা সিনেমার জন্ত আছে উহার উপর লাল পেন্সিল দিয়া একটা ভাল সীট নম্বর বসাইয়া আমাকে দিয়া যাও, আমি সিনেমাতেই যাইব।

কিন্তু সিনেমা-ব্যবসা সম্পর্কে স্বদেশী কিংবা বিদেশী এই প্রশ্ন তোলা যায় কিনা তাহাই ভাবিতেছি। কারণ, শুনা যায়, বাংলাদেশের ষ্টুডিও হইতে এখনও এরূপ কিছু লাভ হইতেছে না যাহাতে ব্যবসা হিসাবে ইহার স্বদেশীয় অন্ত্রমোদন করা যাইতে পারে। লাভ আশাহরূপ না হইবার অনেকগুলি কারণ আছে, এই প্রশ্নে তাহারই আলোচনা করিব। এদেশে ছবি তুলিয়া তাহার বিক্রয় এদেশেই সমীচীন করিয়া রাখিলে কোনো ষ্টুডিও-বিশেষের কিঞ্চিৎ লাভ হইলেও ব্যাপকভাবে দেশের কিছুই লাভ হইল বলিয়া মনে করিব না। কারণ সিনেমা-ছবি

শনিবারের চিঠি

১০৮৭

তুলিতে ফিল্ম, (ক্যামেরার কথা ছাড়িয়াই দিলাম) রাসায়নিক দ্রব্য এবং অল্পাংশ আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি সমস্তই বিদেশ হইতে কিনিতে হয়। স্বতরাং একটি ছবি তুলিতে যে খরচ হয় তাহার অধিকাংশই বিদেশে পাঠাইতে হয়। এই হিসাবে স্বদেশী সিনেমা, স্বদেশী কাপড়ের সহিত তুলনীয় নহে। কাপড়ের জন্ত একবার মাত্র কল কিনিতে হয় কিন্তু কাপড় প্রস্তুতের জন্ত আর কাঁচা মাল অর্থাৎ তুলা বিদেশ হইতে আনিতে হয় না। আমেরিকা বা ইংলণ্ড বা জার্মানিতে যে সিনেমা-ছবি প্রস্তুত হয় তাহার প্রত্যেকটি অংশ তাহাদের স্বদেশেই প্রস্তুত, স্বতরাং তুলনায় তাহাদের লাভ অনেক বেশি। তবে বিদেশী ছবি ভাড়া করিয়া তাহাতে যে মুনাফা হয়, ছবি নিজের ষ্টুডিওতে প্রস্তুত করিলে মুনাফার পরিমাণ সমান থাকিলেও বা অনেক ক্ষেত্রে কম থাকিলেও অনেকগুলি দেশী লোকের অঙ্গ সংস্থান ষ্টুডিও হইতে হয় ইহাই যা অতিরিক্ত লাভ। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, এই লাভ অত্যন্ত সর্বাঙ্গক্ষেত্রে আবদ্ধ—এবং শুধুমাত্র ইহারই জন্ত সিনেমা-ব্যবসার স্বদেশীয়ত্ব গৌরবের নহে। বাস-চালনার ব্যবসা যেমন স্বদেশী! বাসের ইঞ্জিন, চাকা, টায়ার, টিউব বিদেশী, কাঠের কাজ চীনা মিস্ত্রীর, পেট্রল বিদেশী, চালক পাঞ্জাবী, টিকিট বিক্রেতা হিন্দুস্থানী। বাঙালী তাহাতে চড়িয়া গৌরব অশুভব করে। ইহাই স্বদেশীয়ত্বের গৌরব!

আমার বক্তব্য এই যে যন্ত্রপাতি বিষয়ে আমাদের পরমুখাপেক্ষিতা বত বেশিই হউক, যে স্বদেশী বস্তুটি তাহার সাহায্যে প্রস্তুত করিতেছি তাহা এত নিরুপস্থ হইতেছে কেন? বাংলাদেশে তোলা ছবি ইউরোপ বা আমেরিকায় বিক্রয় হইতেছে না কেন? এদেশের ছবি বিদেশে বিক্রয় না হওয়া পর্য্যন্ত ইহার যে কোনোই মূল্য নাই তাহা স্বীকার করিতেই

হইবে। বিদেশ নিখুঁৎ ক্যামেরা দিয়াছে, নিখুঁৎ কেমিক্যাল দিয়াছে, নিখুঁৎ ফিল্ম দিয়াছে—কিন্তু ইহার বেশি আর সে কি দিতে পারে? যন্ত্রনির্মিত সিনেমা-ভিরেক্টর দিলে অবশ্য ছুঁপ ছুঁচিত এবং তাহা হইলে সেই ভিরেক্টরের হাতে ছবিরও উৎকর্ষ বাড়িত এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এতখানি পরনির্ভরতা না হইলে কি আমাদের চলিবে না? দেশা হাইতেছে, বাঙালী সিনেমা-ব্যবসা না শিপিয়াই এ ব্যবসায় হাত দিয়াছে। বিদেশী ছবির উৎকর্ষ এত অধিক কেন আর দেশী ছবির উৎকর্ষ মোটেই নাই কেন ইহা যদি সিনেমা-ব্যবসায়ী চিন্তা করিয়া দেখিতেন তাহা হইলে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইবার পূর্বে এ ব্যবসাতে হাত দিতেন না। দেশী ছবি প্রস্তুত হইয়া দেশে খুব বিক্রয় হইতেছে, ইহাতে আমাদের কোনো ক্ষোভ নাই—আমরা এই কথাই বলিতে চাই যে এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় যাহাতে দেশী ছবি দেখিয়া কোনোরূপ খুঁৎ ধরিতে না পারে, এবং দেশী ছবি যাহাতে বিদেশীরাও দেখিয়া খুশী হয় সেক্ষেপ্তর ছবি না পৌঁছান পর্যন্ত আমরা কোনো দেশী ছবিকেই উৎকৃষ্ট বলিব না।

সিনেমা-ব্যবসায়ীর এ বিষয়ে অনেক কিছু চিন্তা করিবার আছে। আমরা সাহিত্যক্ষেত্রে যেমন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গল্পসাহিত্যের সহিত অল্পবিস্তর পরিচিত হইয়াছি, তেমনি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সিনেমা-চিত্রের অভিনয়ের সঙ্গেও অল্পবিস্তর পরিচিত হইয়াছি। কিরূপ ভঙ্গিতে কতখানি প্রকাশ করিলে গল্পের রস পরিস্ফুট হয় তাহা মূল গল্প পড়িয়া, শ্রেষ্ঠ সমালোচক কর্তৃক তাহার বিশ্লেষণ পড়িয়া, তাহার সমালোচনা পড়িয়া, মনে মনে আমরা উৎকৃষ্ট গল্পের একটি আদর্শ স্থির করিয়া লইয়াছি। অভিনয় সম্বন্ধেও ঠিক সেইরূপ। কোথায় কোন অভিনেতা বা অভিনেত্রী

কি ভাবে অভিনয় করিয়াছেন তাহার ইতিহাস পড়িয়া, তাহার সমালোচনা পড়িয়া, সেই অভিনয় সিনেমায় দেখিয়া, উৎকৃষ্ট অভিনয়েরও একটি আদর্শ আমরা মনে মনে স্থির করিয়া লইয়াছি। উৎকৃষ্ট অভিনেতা বা অভিনেত্রীর প্রত্যেক মুহূর্তের চালচলন, তাহার চাহনির ভঙ্গি, তাহার উচ্চারণ, তাহার কথা—আমাদের মনে গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। আমরা উৎকৃষ্ট অভিনয়ের প্রত্যেকটি সেকেন্ডের সহিত প্রত্যেকটি পরবর্তী সেকেন্ড গাঁথিয়া এমন একটি স্থনিপুণ ধারাবাহিকতা পাই, এবং তাহার মধ্যে এক মুহূর্তের জঙ্কণও এমন একটা কঁাক পাইনা যেখানে আমার কোনো পরিকল্পনা দ্বারা সেই অভিনয়টাকে হৃদয়তর করিবার পরামর্শ দিতে পারি। যেটুকু দেখি তাহা যেন অনিবার্যরূপে ঘটিয়া যায়, যেখানে যেটুকু প্রয়োজন তাহা যেন প্রাণের ধ্বংসেই ঘটিয়া ওঠে, আমার সমালোচনার অতীতরূপে, অপ্রত্যাশিতরূপে, আশাতীতরূপে ঘটিয়া ওঠে। আমার রসবোধকে নন্দিত করিয়া, পুলকিত করিয়া, তাহাকে বিস্ময়ে চমৎকৃত করিয়া রসধারা প্রবাহিত হইয়া যায়—যবনিকা পাতের সঙ্গে সঙ্গে একটা গভীর পরিতৃপ্তি লইয়া উঠিয়া আসি। আমার এতদিনের শিক্ষা, আমার রুচি এই অভিনয়কে যেন সর্দাস্তঃকরণে মানিয়া লয়। মন আপন মনেই বলে, হা ঠিক জিনিসটি পাইলাম, দেখা সার্থক হইল।

এরূপ হইবার কারণ এই যে আমার মনে কথাসিঞ্জের যেমন একটা আদর্শ আছে, আমার মনে অভিনয়শিল্পেরও তেমনি একটা আদর্শ আছে। বন্ধিমচন্দ্রের বা রবীন্দ্রনাথের গল্প আমাকে আনন্দ দেয়। (আমি এখানে বাংলা সাহিত্যের গল্প-লেখকদের কথা বলিতেছি না, সিনেমা সম্পর্কে উদাহরণ স্বরূপ দুইটি নাম উল্লেখ করিলাম মাত্র)।

বন্ধিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের গল্পে আমি প্রতিভার পরিচয় পাই। যেখানে প্রতিভার পরিচয় নাই, সেখানে আমার মন সঙ্গীত হইত। অক্ষম লেখকের হাতে গল্প যেখানে জমিল না, সেখানে আমার মন উদাসীন; এরূপ গল্পের সহিত আমার কোনো সম্পর্কই নাই, সে গল্প স্বদেশী গল্প বলিয়াও আমার কোনো গর্বের কারণ নাই। আমার আদর্শ হইতে যে গল্প নীচে নামিয়া গেল সাহিত্য-ক্ষেত্রে সে অস্বাভাবিক এবং জাতিচ্যুত। 'আমার আদর্শ' কথাটিতে ঠিক আমার ব্যক্তিগত আদর্শ বলিতেছি না, আমি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সকলের আদর্শের কথা বলিতেছি। অভিনয়েও ঠিক এইরূপ। স্মৃতির বা বন্ধিমচন্দ্রের বা রবীন্দ্রনাথের বা অল্প কোন প্রতিভাবান লেখকের গল্পকে যদি চিত্ররূপ দিতে হয় অর্থাৎ অভিনয়ের সাহায্যে যদি ইহাদের গল্পের রস ফুটাইতে হয় তাহা হইলে অভিনেতা এবং অভিনেত্রীর পরিচালককেও বন্ধিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের মতই প্রতিভাশালী হইতে হইবে। আমাদের দেশে যাহারা বন্ধিমচন্দ্র অথবা রবীন্দ্রনাথের গল্প সিনেমায় রূপান্তরিত করিয়াছেন, তাহারা রস-সৃষ্টির দিক দিয়া বন্ধিমচন্দ্র অথবা রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ কি না সে বিচার তাহারাই করিবেন, আমি বলিতে চাই যে আমি তাহাদের গল্পের চিত্র-রূপ দেখিয়া নিরাশ হইয়াছি।

সিনেমা ক্ষেত্রে রিপোর্টারের কাজ হইতে পরিচালকের কাজ কিছু স্বতন্ত্র। 'ফ্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট' বা 'ডেভিড কপারফিল্ড'-এর সিনেমা ছবি দেখিয়া যদি কি দেখিলাম তাহা আমি লিখিতে বসি, তাহা হইলে কখনও সেই দুইটি গল্পের রিপোর্ট লিখিয়া আমি ভুলটুকরি বা ডিকেন্স হইতে পারিব না। তাহা যদি সম্ভব হইত তাহা হইলে বাহারা প্রোগ্রামে গল্প-পরিচয় লেখে তাহারাও শ্রষ্টা। আমাদের দেশে সিনেমা-ক্ষেত্রে

ঠিক তাহাই হইতেছে। পার্থক্যের মধ্যে এই যে, ছবি দেখিয়া ভাষায় রিপোর্ট না লিখিয়া পরিচালকগণ গল্প পড়িয়া ছবির সাহায্যে তাহার রিপোর্ট লিখিতেছেন। এই দুইটিই রিপোর্টারের কাজ—রসস্রষ্টার কাজ নহে।

কতকগুলি টেকনিকের ভিতর একটি গল্পকে আনিয়া ছাড়িয়া দিলেই তাহা চিত্ররূপে রসোত্তীর্ণ হইতে পারে না। পরিচালকের মনে যদি রস-বোধ না থাকে এবং রসসৃষ্টির ক্ষমতা যদি তাহার না থাকে তবে গল্পে-বর্ণিত ঘটনাগুলি তাহার হাতে চিত্রে-বর্ণিত ঘটনায় পরিণত হইবে মাত্র, ইহার বেশি কিছু হইবে না। লেখক গল্পের ভিতর যে রস ফুটাইয়া তোলেন তাহার বাহন ভাষা, এবং ভাষার বাহন কতকগুলি অক্ষর। এই অক্ষরগুলি গাঁথিয়া তিনি অক্ষর এবং ভাষা উত্তীর্ণ হইয়া রসে পৌঁছান। ইহা দেখিয়া যদি কেহ মনে করে কতকগুলি অক্ষর বা টাইপের মালিক হইলেই রসস্রষ্টা হওয়া যায়, তাহা হইলে সে কথা আমরা শুনিব না। সিনেমা-ক্ষেত্রেও রসের বাহন অর্থাৎ অক্ষর অভিনেতা এবং অভিনেত্রী, এবং অভিনয়, ভাষা। অক্ষরের ভাষা হইতে ইহা সম্পূর্ণ পৃথক। কিন্তু রসের বিচারে দুইটি বিভিন্ন সৃষ্টিই সমকক্ষতা লাভ করিতে পারে। ইহা নির্ভর করে স্রষ্টার ক্ষমতার উপর।

চিত্রের এবং গল্পের ভাষা পৃথক হওয়াতে আমাদের দেশের পরিচালকদের একটু অসুবিধা হইয়াছে। অর্থাৎ গল্পে যাহা যাহা বর্ণিত হইয়াছে, ছবিতে তাহার ঠিক সেই সবই করিয়া যান কিন্তু ফলে দেখা যায় গল্প ছবিতে জমে নাই। গল্পে যেখানে নাটকের দৌড়াইবার কথা, সেখানে সে দৌড়াইতেছে; যেখানে নৌকায় উত্তীয়ার কথা, সেখানে

নৌকায় উঠিতেছে; যেখানে মারামারি করিবার কথা, সেখানে মারামারি করিতেছে; যেখানে হাসিবার কথা, সেখানে হাসিতেছে; যেখানে কাঁদিবার কথা, সেখানে কাঁদিতেছে, কিন্তু মোটের উপর শেষ করিয়া দেখা যাইতেছে, কিছুই হয় নাই। ইহাতে এই প্রশ্ন হয় যে পরিচালক অক্ষরের বা টাইপের মালিক হইয়াছেন কিন্তু তাহা এমনভাবে সাজাইতে পারিতেছেন না বাহাতে সাজাইবার উদ্দেশ্য অক্ষরকে অতিক্রম করিয়া কোনো উচ্চতর ক্ষেত্রে পৌঁছিতে পারে। ফলে আমরা সিনেমায় গিয়া গল্পে-বর্ণিত সমস্ত ঘটনাই দেখিতেছি কিন্তু মন ভরিতেছে না। পরিচালকের মধ্যে শিল্পীর বা স্রষ্টার পরিচয় পাইতেছি না। সাময়িক পত্রিকায় অক্ষম লেখকের লেখা নিরুপ্ত শ্রেণীর গল্প পড়িয়া মনে যে বিরক্তি আসে, দেশী সিনেমা-ছবি দেখিয়াও মন সেইরূপ বিরক্তিতে ভরিয়া যায়। টিকিট বিক্রয়ের সাক্ষ্য দেখিয়া ছবির উৎকর্ষ বিচার অসম্ভব বাংলা দেশে চলে না। ব্যবসার যদি বড় আদর্শ না থাকে, অর্থাৎ ছবি বিদেশে বিক্রয়ের উপযুক্ত করিয়া প্রস্তুত করিবার কল্পনা যদি আদৌ না থাকে তাহা হইলে যে-শ্রেণীর ছবি উঠিতেছে এবং সপ্তাহের পর সপ্তাহ বিক্রয় হইতেছে, তাহাতে আমাদের আপত্তি করিবার বিশেষ কিছুই নাই। আপাতত আমাদের দেশের সাধারণ লোক বাহা দেখিয়া মুগ্ধ হয়, সিনেমা-ছবির উৎকর্ষ বিচারের সময় সিনেমাকার সেই সাধারণ লোকের মাপকাঠির বিচার, সমালোচকের নিকট হইতে আশা করিবেন না। সাধারণ দর্শক এবং সমঝদার যদি সমালোচনার ক্ষেত্রে এক হইয়া যায় তাহা হইলে সমঝদারের পক্ষে তাহা মারাত্মক হইতে পারে। কারণ এদেশে এখনও সিনেমা ছবিতে এরূপ কোনো রামায়ণ বা মহাভারত রচিত হয় নাই বাহা ছোট বড় সকলকেই মুগ্ধ করিতে পারে। সুতরাং বিচারের সময় শ্রেণী বিভাগ করিতেই হইবে। সমঝদারের বিচারে যে ছবি ভাল সে

ছবির গল্প-অংশ হয়ত সাধারণের মনের মত হইতে পারে কিন্তু সাধারণের মনের মত গল্প হইলেই তাহার চিত্ররূপ সমঝদারের বিচারে উৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হইবে এরূপ কথা নাই। সুতরাং যে ছবি সাধারণ লোকে দেখিবার জন্ত ভীড় করিতেছে, তাহা শুধু এই কারণেই উৎকৃষ্ট এরূপ কখনও বলা চলিবে না। গল্প-লেখক যে গুণে উৎকৃষ্ট গল্প-লেখক হন, চিত্রকারের মধ্যে সেই গুণ থাকিলে তবে চিত্রকার উৎকৃষ্ট চিত্রকার বলিয়া গণ্য হইবেন। গল্পের ক্ষেত্রে যেরূপ বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথ, সিনেমা ক্ষেত্রেও তেমনি বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ঘটিলে তবে সিনেমায় রূপান্তরিত গল্প সমঝদারকে পুলকিত করিবে। কিন্তু বাংলা দেশে সে প্রতিভা কই? আজ পর্য্যন্ত যে সব ছবি প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার পরিচালকগণের রসের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের মত প্রতিভা আছে এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। টাকা দিয়া টাইপ কিনিতে পারিলেই যেমন কেবল তাহা সাজাইয়া রসসৃষ্টি করা যায় না, তেমনি টাকা দিয়া অভিনেতা-অভিনেত্রী সংগ্রহ করিলেই কেবল তাহা দ্বারা রসসৃষ্টি করা যায় না।

বাংলাদেশে সিনেমাশিল্প অল্পদিনের একথা স্বীকার্য্য। অর্থাৎ মাত্র সত্তের আঠার বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু চিত্রের নিরুপ্ততার ইহাই কি কৈফিয়ৎ? সিনেমার উপযুক্ত অভিনয় শিথিতে কি একটা জাতির অর্দ্ধশতাব্দী কাটিয়া যাইবে? ইহা সত্য নহে। আসল কথা এদেশের নিরুপ্ত অভিনয়ও বিক্রয় করা চলে বলিয়া এদিকে কাহারও কোনো উৎসাহ নাই। কারণ, উৎসাহ থাকিলেই কঠোর সাধনা আবশ্যক হইবে, আর-পাচরকম কাজ করিবার যথেষ্ট সময় পাওয়া যাইবে না, কেবল অভিনয়চর্চা করিয়াই সময়

কাটাইতে হইবে, কাজেই উৎসাহ নাই। দেশী কাপড়ের কল হইতে যদি পাঁচ ছয়টি মাত্র সূতা বাহির হইয়া আসিত, এবং কলের মালিক বলিতেন, “শিশুশিল্প, ইহার বেশি আর সম্ভব হইল না, অতএব এই পাঁচ ছয়টি সূতাকেই বস্ত্র মনে করিয়া এবং স্বদেশী বস্ত্র মনে করিয়া পরিধান কর”, তাহা হইলে সে কথায় দেশের লোক ভুলিত বলিয়া মনে হয় না। কারণ শিল্প শিশু হইলেও দেশীয় লোক শিশু নহে, স্তত্রাং বস্ত্রের পরিবর্তে কৈফিয়ৎ বিক্রয় করা শক্ত হইত। দেশীয় লোক অবশ্যই শিশু নহে, কিন্তু সে কেবল দেশের দিক দিয়া। মনের দিক দিয়া সে এখনও শিশুই রহিয়া গিয়াছে, তাই সিনেমামুদ্র হইতে প্রস্তুত দুই চারিটি সূতা পাইয়াই মনে করিতেছে তাহার মানসিক সম্ভার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। বাংলা দেশের এই মানসিক শিশুত্ব কবে ঘুচিবে তাহাই চিন্তা করিতেছি।

সাহিত্য সাম্প্রদায়িকতা

মোহাম্মদী, বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়-সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যবস্থার মধ্যে হিন্দুদের মুসলমান-বিশেষ আধিকার করিয়া যেরূপ অসহিষ্ণুভাবে এবং অসংযতভাবে মতামত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে শিক্ষিত বাঙালীমাত্রেই বিস্মিত হইয়াছেন। কারণ, শুধু সাহিত্যের ইতিহাস নহে, সামাজিক ইতিহাসও যে মুসলমানগণ এত সহজে ভুলিয়া যাঁতে পারেন তাহা আমরা সহজে বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। সমাজের হউক বা সাহিত্যের হউক ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলেই প্রকৃত বৈজ্ঞানিক পন্থাতে অগ্রসর হইতে হইবে। বৈজ্ঞানিক পন্থা, পক্ষপাতশূন্য পন্থা। ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিতে হইলে পক্ষপাতশূন্য সত্যাত্মসম্মত মন লইয়া অগ্রসর না হইলে যথার্থ তথ্য সংগৃহীত হইতে পারে না। সত্য বটে মুসলমান সমাজ এখনও ব্যাপকভাবে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা পায় নাই (এবং যতদিন যোগ্যতা লাভ করার পরিবর্তে ধর্মকেই পাখির সামলোর মাপকাঠি হিসাবে তাঁহারা গণ্য করিবেন ততদিন বৈজ্ঞানিক শিক্ষা পাইবার তাঁহাদের প্রয়োজনও নাই), সত্য বটে ভাষাবিজ্ঞান, ইতিহাস পুরাতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহারা গবেষণা করিতে উৎসাহিত নহেন—তথাপি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ জ্ঞান লাভ করিয়া থাকিলে এটুকু আশা অবশ্যই করা যায় যে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস তাঁহারা কিছু না কিছু পড়িয়াছেন, এবং পৃথিবীর অতীত দেশে বৈজ্ঞানিক বা ঐতিহাসিক গবেষণা কিরূপ রীতিতে সাধিত

হয় তাহার সংবাদও কিছু না কিছু অবগত হইয়াছেন। স্বতরাং আমরা এখনও বিশ্বাস করিতেছি যে হিন্দু ও মুসলমানের ভিতর বুদ্ধিগত কোনো বৈষম্য নাই বলিয়া বাংলা ভাষা বা সাহিত্য লইয়া মুসলমানগণ যে আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন তাহা নিতান্তই অভিমানবশে বা এমন কোনো ভ্রান্তিবশে যাহা নিতান্তই সাময়িক। এরূপ হওয়া অসম্ভব নহে। মানুষ অনেক সময় সমস্ত বুদ্ধিমা স্ববিধাও অত্যন্ত তুচ্ছ কারণে এরূপ কাজ করিয়া থাকে যাহাতে নিজের মারাত্মক ক্ষতি স্বীকার করিয়াও অশ্রের ক্ষতি করিতে পারিলে যেন তাহার অন্তর্দাহ অনেকটা নিবৃত্ত হয়।

মোহাম্মদী প্রথমেই ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে অধিত হিন্দুকলেজের একখানি ছবি ছাপিয়া দেখাইতেছেন যে ২০ বৎসর পূর্বে হিন্দুর উপর মুসলমান সভ্যতার যে প্রভাব ছিল আজ ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তাহা আর নাই। সভ্যতার প্রভাবের মধ্যে দেখা যাইতেছে কতকগুলি লোক কলেজ-সৌধের সম্মুখে জটলা করিতেছে, তাহাদের পোষাক অনেকটা মুসলমানী ধরণের। ইহা সভ্যতার প্রভাব নহে। মোহাম্মদী যে ইহা বুঝিতে পারেন নাই তাহা চিন্তা করিতেও লজ্জিত হইতেছি। দেশকে যখন যাহারা শাসন করেন নানা কারণে তাহাদের পোষাকই শিক্ষিত লোকের পোষাক হইয়া পড়ায়। এই রূপে একবার যাহা চলিত হইয়া যায় শাসন পরিবর্তন হইয়া গেলেও তাহা ছাড়িতে কিছু সময় লাগে। মুসলমানী আমলের পোষাক সময়-বিশেষে বাঙালী এখনও পরিয়া থাকে, যদিও শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে অন্তত যাহারা রাজকর্মচারী তাহারা এখন যুরোপীয় পোষাক পারেন। ব্যবসায় অথবা বড় চাকুরির ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে এখন যুরোপীয় পোষাকই বাঙালীর আদর্শ পোষাক

হইয়া যাইতেছে। এক্ষেত্রে ইংরেজগণই তাহাদের প্রতিযোগী। শুধু প্রতিযোগী নহেন, মুসলমানদিগকেও ইংরেজ ইংরেজি পোষাক পরাইয়া ছাড়িয়াছেন। যদি মুসলমানগণ ইংরেজকে তাড়াইয়া আবার এদেশের রাজা হইয়া বসিতে পারেন তাহা হইলে আবার হয়ত আমাদিগকে তুর্কী পোষাকই পরিতে হইবে—যদিও তুর্কী স্বাধীন থাকিয়াও খাটি যুরোপীয় পোষাক পরিতেছে এবং দমের সঙ্গে পোষাকের বা সভ্যতার কোনো সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে করিতেছে না। প্রাচীন তুর্কী-পোষাক বাঙালী মুসলমানদের এত প্রিয় হইল কেন বুঝিতে পারা যায় না, কারণ তুর্কী টুপির পরিবর্তে তাহারা যখন এদেশে প্রস্তুত টুপি পরিতেন তখন এদেশের মুসলমানদের কিছু আয় হইত। কিন্তু শিক্ষিত বাঙালী-মুসলমান দমের জন্ত সবই করিতে পারেন।

স্বতরাং মোহাম্মদী বুঝিতে পারিতেছেন, ইংরেজের কাছে হিন্দু এবং মুসলমান আমরা উভয়েই নিজ নিজ সভ্যতা (পোষাক) হারাষ্টতে বসিয়াছি, বুধা হুং করিয়া লাভ নাই। কিন্তু মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুর এদিকে একটু স্ববিধা বেশি দেখা যাইতেছে। মুসলমান যে-সভ্যতা হিন্দুর উপর বিস্তার করিয়াছিলেন বলিয়া মোহাম্মদী খুশী হইয়া উঠিয়াছেন এবং “সে দিন আর নাই” বলিয়া হুং অহুং করিয়াছেন, সে সভ্যতা হিন্দুকে মারিতে পারে নাই। যাহারা মরিবার মরিয়াছে, কিন্তু বাকী একুশ কোটি হিন্দু পালাক্রমে পৃথিবীর যাবতীয় প্রবল জাতির অধীন হইয়া একবার করিয়া পোষাক বদলাইবে বলিয়া প্রস্তুত হইয়াই আছে। কিন্তু আর তাহার মরিবার ভয় নাই।

মোহাম্মদী মুসলমান-সভ্যতার অজ্ঞ কোনো নিদর্শন খুঁজিয়া না।

পাইয়া পোষাককেই সভ্যতার নিদর্শন বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু আমরা মনে করি, সভ্যতার পরিচয় বাহিরে থাকে না, থাকে অন্তরে। মুসলমানগণ সভ্যতাই এদেশে যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন এবং যে প্রভাব নষ্ট করিবার জ্ঞান তাহারা নিজেরাই এখন উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন তাহার ফোটোগ্রাফ তোলা যায় না। শ্রীযুক্ত আবদুল করিম এবং মনসুর উদ্দীন যে সব ‘মারফতী’ গান সংগ্রহ করিয়াছেন তাহার ভিতর সেই সভ্যতার চিহ্ন কিছু কিছু মিলিবে।

মোহাম্মদী হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমান-সংস্কৃতি ধ্বংসের যে অভিযোগ করিয়াছেন তাহা সত্য নহে। সাহিত্যের ভিতর দিয়া হিন্দু কোনো ধ্বংসমূলক উদ্দেশ্য প্রচার করে নাই। হিন্দু সাহিত্য নিজের প্রাণ শক্তিতে ধীরে ধীরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। আজ সে সাহিত্য-ক্ষেত্রে বনস্পতির মত মাথা তুলিয়া পাড়াইয়াছে—কিন্তু মরুভূমিকে বনস্পতি চিহ্ন করিবে কেন? বাংলা দেশে শত শত বৎসরের রাজত্বের ফলস্বরূপ বাংলা সাহিত্যে মুসলমানগণ এমন কি সৃষ্টি করিয়াছেন যাহা ধ্বংস করিবার জ্ঞান হিন্দু সাহিত্য উজাত হইয়াছে? মুসলমান রাজত্ব-সময়ে ‘মুসলমান সাহিত্য’ গড়িবার কোনো আয়োজনই দেখা যায় না। পক্ষান্তরে মুসলমানরাজাই হিন্দুদের সাহিত্য পড়িবার আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন এরূপ প্রমাণ রহিয়াছে।

বাংলাদেশের মুসলমানগণ অধিকাংশই দীক্ষিত-মুসলমান বলিয়া তাহারা হঠাৎ হিন্দু সংস্কৃতি বিস্মৃত হইয়া একদিকে যেমন আরব দেশের সংস্কৃতি আয়ত্ত্ব করিতে পারেন নাই, অতীতকে তেমনি হঠাৎ বিদেশীভাবে অহুপ্রাণিত হইয়া নূতন সাহিত্যও রচনা করিতে পারেন নাই। সুতরাং হিন্দুদের রচিত সাহিত্যের দ্বারা অপ্রতিহত-রূপে প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে; কাহারও দোষে নহে, কাহারও

জটি বা ভ্রান্তির জ্ঞান নহে—অতীত দেশে সাহিত্য যেমন করিয়া জয়লাভ করে এদেশেও তেমনি স্বাভাবিক রীতিতেই সাহিত্য জয়লাভ করিয়াছে। সুতরাং মোহাম্মদীর অভিযোগের কোনো কারণ আমরা খুঁজিয়া পাইতেছি না। এবং কিসের বিরুদ্ধে অভিযোগ তাহারও কোনো স্পষ্ট দাবী মোহাম্মদীর আছে বলিয়া মনে হয় না।

সাহিত্য যদি স্বীকার্য হয়, তাহা হইলে হিন্দু-ধর্মের আদর্শ বা তাহার দেবদেবতা লইয়া সমালোচনা করা হাজির। হিন্দু যে সব সাহিত্য পৃথিবীর সর্বত্র মনোমুগ্ধকর আদরের বস্তু, যে দর্শন বিজ্ঞানের জ্ঞান হিন্দু পৃথিবীর সর্বত্র শ্রদ্ধেয় তাহাকে গাল দিলে নিজেরই সঙ্গীর্ণতা প্রকাশ পায়। হাউই সাহস করিয়া তারকার মুখে ছাই নিক্ষেপ করিতে যায় বটে কিন্তু সে ছাই তারকাকে স্পর্শ করে না, হাউইএর পশ্চাতেই ফিরিয়া আসে। একটি জাতির হাজার হাজার বৎসরের সভ্যতা এবং সংস্কৃতির পরিচয় লাভ করিতে হইলে, মোহাম্মদী মতটা মনে করিয়াছেন, ততটা সহজে তাহা লাভ করা যায় না। ইহার জ্ঞান রীতিমত সাধনা দরকার। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ সাধনা দ্বারা হিন্দু সভ্যতার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু সে কথা যাক। মোহাম্মদী হিন্দু-সভ্যতার রিকর্ম করিবেন বলিয়া যদি মনে করিয়া থাকেন তাহা হইলে সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা ত্যাগ করিয়া কর্মক্ষেত্রে নামিয়া পড়ুন। সভ্যতা-সংস্কারই যদি উদ্দেশ্য হয় তবে বিশ্ববিদ্যালয়কে আক্রমণ করা কেন? কাহাকেও আক্রমণ করিতে হইবে না। সংস্কারক আমাদের মধ্যে যুগে যুগে আসিয়াছেন, আমরা তাঁহাকে যুগে যুগে অভিনন্দিত করিয়াছি, তাঁহাকে গুরু

বলিয়া মাত্র করিয়াছি। কিন্তু সংস্কারক হইতে গেলেও সাধনার দরকার হইবে। সংস্কারককে হিন্দু হইতে হইবে—হিন্দুও স্বথচ্ছত্বের সঙ্গে আপনাকে এক করিয়া দিতে হইবে—তবে তো তাহা সম্ভব হইবে। আমাদের মন এ বিষয়ে মুক্ত। ভালবাসিয়া যে আমরাগিকে ডাক দিয়াছে তাহারই ডাকে আমরা চিরদিন সাড়া দিয়া আসিয়াছি। বাহির হইতে, বিদ্যেপূর্ণ সমালোচনা দ্বারা কেহ কাহারও হৃদয় জয় করিতে পারে না।

আর যদি সভ্যতা-সংস্কার উদ্দেশ্য না হইয়া সাহিত্য-সংস্কার উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলেও সভ্যতাকে গাল দিলে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। পৃথিবীতে যত জাতি আছে তাহাদের প্রত্যেকেরই নিজের একটি করিয়া বিশেষ আদর্শ আছে। এবং এ কথাও ভোর করিয়া বলা যায় যে কোনো জাতিই নিজের সেই আদর্শে অজ্ঞাবধি পৌছাইতে পারে নাই। মানুষের কত দুর্বলতা, কত ভ্রান্তি, কত ক্রটি। ইসলামীয় সভ্যতা যদি মুসলমানদের আদর্শ হয় তাহা হইলেও একথা বলা চলে যে অধিকাংশ মুসলমান ব্যক্তিগত বা জাতিগত ভাবে সে আদর্শে পৌছিতে পারেন নাই। অতীতকে বিদ্বৈষ করা বা অতীতের আদর্শ সম্বন্ধে কুসংস্কৃত মন্তব্য করা বা অতীতের ধর্মের নিন্দা করা ইহা নিশ্চিতই ইসলাম ধর্মের আদর্শ হইতে পারে না। অথচ দেখা যাইতেছে মোহাম্মদীয় লেখকগণ ব্যক্তিগতভাবে এই সব দোষে দুষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন। ইসলামধর্ম একেশ্বরবাদী, হিন্দুধর্মও তাই। মৃতি পূজা হিন্দুর নিকটেও জড়পূজা নহে। হিন্দুগণ নানামুষ্টিতে উপলব্ধ করিয়া এক ঈশ্বরেরই পূজা করিয়া থাকে। প্রতীকের ভিতর দিয়া ঈশ্বর পূজার এই রীতি বা ধর্ম প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। আজ হিন্দুদের

অনেকের নিকট এই প্রতীকের প্রয়োজনও হয় না। মোটকথা ঈশ্বরকে পূজা করা, ইহা নিত্যন্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার—ইহার রীতি লইয়া দাঙ্কিত্য করা মানুষের পক্ষে শোভন নহে। কারণ ইহা যদি সত্য হয় যে সমস্ত বিশ্বের মাত্র একজনই ঈশ্বর আছেন, এবং মানুষ যতই সর্কীয় হউক, তিনি কখনও সর্কীয় হইতে পারেন না, তাহা হইলে পূজার পদ্ধতি লইয়া মারামারি করায় কাহারও যে কি লাভ হইতে পারে তাহা আমরা বুঝি না।

কিন্তু এ কথা নিশ্চিত যে মানুষের ধর্ম বিষয়ে যত বড় আদর্শই থাকুক—মানুষের কোথাও না কোথাও একটা সীমা আছে। সে কাগজে কলমে সংস্কার মুক্ত হইলেও হাতে কলমে সংস্কারেরই দাস। পির পূজা (পির পিরন্তী) বা গোরস্থানের পাথরকে চূষন করা বা ছলছলের ঘোড়ার পায়ে জল দান বা পির-মুরদী প্রভৃতিও fetishism বা জড়পূজারই একটা রূপ। ইহা অজ্ঞান নহে। মুসলমানদের এই পৌত্তলিকতার কাহিনী যদি কোনো খ্রীষ্টান পাঠ করেন তাহা হইলে তিনিও খ্রীষ্টান ধর্ম নষ্ট হইল, একরূপ মনে করিবেন না। কারণ খ্রীষ্টান-গণ একেশ্বরবাদী হইলেও তাঁহাদের মধ্যেও এই পৌত্তলিকতা আছে। যীশুর মৃতি, ক্রস, প্রভৃতি চিহ্ন তাঁহাদের চাই। কিন্তু ইহা দ্বারা মুসলমান বা খ্রীষ্টান ধর্মের পৌত্তলিকতা প্রমাণিত হয় না। কারণ ঈশ্বরে বিশ্বাস মানুষের চিত্তে, সে ঈশ্বর-উপাসনার আত্মবিশ্বাস হিসাবে বাহিরে যাহাই করুক তাহাতে ইহা প্রমাণ হয় না যে সে ঈশ্বরকে ভুলিয়া বাহিরের জড়বস্তু লইয়াই মাতামাতি করিতেছে। যত ব্যক্তিগত ভাবে তাহাও কেহ করিতে পারে, কারণ মানুষের আন্তরিকতা সকলের সমান নহে, ইহার ইতর বিশেষ আছে, এবং সাধু হইতে শয়তান এবং ইহার মধ্যবর্তী যতগুলি পর্যায় আছে—সেই সকল পর্যায়ের লোক

সকল ধর্মেই আছে। ইসলাম ধর্ম, খ্রীষ্ট ধর্ম বা হিন্দু ধর্ম—এই সকল ধর্মের লোকের মধ্যেই সাধুর দেখা মিলিবে এবং শয়তানের দেখাও মিলিবে। যদি এমন হইত যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলে মানুষ মাজেই সাধু হয়, তাহা হইলে পৃথিবীর যাবতীয় লোক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইত। যদি এমন হইত, খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হইলে যাবতীয় লোক সাধু হয় তাহা হইলে পৃথিবীর যাবতীয় লোক খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করিত। অথবা যদি হিন্দু হইলে সাধু হওয়া বাইত তাহা হইলে সকলেই হিন্দু হইত। কিন্তু দেখা বাইতেছে, ধর্মের আদর্শ যাহার যাহাই হউক, মানুষ সবত্রই এক; সেই জ্ঞান মনে হয় সামাজিকতার ক্ষেত্রে যেখানে মানুষে মানুষে সমৃদ্ধ সেখানে ধর্মের প্রশ্ন না তোলাই শ্রেয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাহাই। এখানেও কোন ধর্ম বড় বা কোন সভ্যতা বড় সে প্রশ্ন ওঠে না। আমরা যখন আরবী বা ফারসী পড়ি তখন আরব বা পারস্য দেশের ধর্ম সমাজ ইতিহাস সংস্কৃতি প্রভৃতি জানিবার জন্মই উহা পড়ি। আমরা যখন ইংরেজী পড়ি তখন ইংরেজের সংস্কৃতির পরিচয় লাভ করিবার জন্মই তাহা পড়ি। এমন কি ইংরেজদের বাইবেল গ্রন্থ পাঠ যাহাতে হিন্দু ছাত্রদের পক্ষে আবশ্যিক হয় সে জ্ঞান হিন্দুরাই উহা বিখবিজ্ঞালায় হইতে পাঠ্যরূপে মনোনীত করাইয়া লইয়াছে। আমরা যদি বিদেশীর সংস্কৃতি বা ধর্মকে ভয় করিতাম, তাহা হইলে অতি সহজেই বিদেশী ধর্মের যাবতীয় সংস্রব সাহিত্যের দিক হইতে অন্তত ত্যাগ করিতে পারিতাম। হয়ত এরূপ অবস্থা হইলে আমরাও বায়না ধরিতাম যে ইংরেজগণ সাহিত্য রচনা কালে যেন হিন্দু সংস্কৃতির কথা তাহাতে কিছু কিছু চুকাইয়া দেন। কিন্তু আমরা এরূপ হাশ্বকর প্রস্তাব করিতে পারি না। Oxford

University Press হইতে প্রকাশিত একখণ্ড বাংলাদেশের স্থলপাঠ্য পুস্তক আমার সম্মুখে রহিয়াছে। উহাতে সফ্রেটিস, প্লেটো, আরিস্টটল, কলধাস, হারগ্রীভস, আর্করাইট, কম্পটন, কার্টরাইট, বাস, ম্যাগাস, হাল অ্যাণ্ডার্সন, নাইটিঙ্গেল, ডেভি, ফারাডে, জেনি লিও, আর্ন, এল. টিভেন্সন, হেলেন কেলার, সার আর্থার পিয়ার্সন প্রভৃতির জীবন কাহিনী আছে। এই পুস্তক আমরা অত্যন্ত আগ্রহের সহিত আমাদের ছেলেদিগকে পড়াইয়া থাকি। পড়াইবার সময় কখনও মনে করি না যে বিধর্মীর জীবনী পড়াইতেছি বা পড়াইয়া অন্যায় করিতেছি। হিন্দুর পক্ষে এরূপ কল্পনা স্বপ্নেরও অতীত। কারণ আমরা মনে করি শিক্ষা লাভ করার সর্বপ্রধান অঙ্গ জাগতিক ঘটনা সমূহ অবগত হওয়া এবং যত দিকে যত বিষয় জানিতে পারি, শিক্ষা ততখানিই মার্গক হইল বলিয়া মনে করি। জানিব, এবং অপরকে জানাইব, ইহাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। অবাচীনের যত শিক্ষার ক্ষেত্রে ধর্মের গোঁড়ামিকে টানিয়া আনিয়া আমরা ত অনায়াসেই উক্ত গ্রন্থের লেখককে বলিতে পারি যে, যে বইতে সবগুলি বিধর্মীর জীবনী, সে বই আমরা পড়িব না, বা পড়াইব না; ঐ বইতে হিন্দুদের জীবন কথা চুকাও; কেন, হিন্দুরা কি বড় কাজ করে নাই?

ইংরেজিতে এইরূপ মনোবৃত্তিকে ফ্যানাটিসিজম বলে। আমাদের ধর্মবিষয়ে এই ফ্যানাটিসিজম নাই। আমরা বারবার বলিতেছি সাহিত্যক্ষেত্রে ধর্ম লইয়া গুণগোল করা চলিবে না। যদি বাংলা সাহিত্য পড়িতে হয় তাহা হইলে বাংলা সাহিত্যে যাহা আছে তাহা সবই পড়িতে হইবে। ইহার ভিতর অন্যায় বা লজ্জার কিছুই নাই। জ্ঞানলাভ যত বিষয়ে হয় ততই ত শিক্ষার্থী কল্যাণ। বক্তৃতাগুলি জিনিস জানিলে ধর্মে আঘাত লাগে, ধর্ম এতখানি দুর্বল

বলিয়া ঘোষণা করা কি লজ্জাকর নহে? জানা এবং অভ্যাস করা দুইটি পৃথক জিনিস। নারায়ণ এবং লক্ষ্মীর সম্বন্ধ কি ইহা জানিলে ধর্ম আঘাত লাগিবে কেন? কোরানে কি আছে তাহা জানিলে হিন্দুধর্মে ত আঘাত লাগে না, বাইবেল পড়িয়া বাইবেলের ঘটনা জানিতেছি, তাহাতে আমার মনে ত আঘাত লাগে না। বরঞ্চ না জানিলে অজ্ঞতাজনিত দুঃখ পাই। যদি এমন হইত যে বাইবেল পড়িতে গেলে খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হইতে হইবে তাহা হইলে বাইবেলের পাঠ গ্রহণ করায় বাধা উপস্থিত হইত। যদি হিন্দু ধর্মের একরূপ বিধি থাকিত যে হিন্দু পুরাণ পড়িতে হইলে মন্দিরে দেবতাপূজা অভ্যাস করিতে হইবে তাহা হইলে খ্রীষ্টান এবং মুসলমানের পক্ষে হিন্দু পুরাণ পড়া সম্ভব হইত না। কিন্তু একরূপ কিছুই হইতেছে না। জ্ঞানলাভ করিব না বলিয়া জেদ করা এ যুগের পক্ষে প্রকৃতই বাড়াবাড়ি।

আমরা বরঞ্চ একথাও বলি, মুসলমানগণ যদি বাংলা রচনা দ্বারা বাংলা সাহিত্যকে কখনও সম্পদশালী করিতে পারেন তখন আমরা সানন্দে তাঁহাদের রচনা পড়িব। কিন্তু তাঁহারা আজ পর্যন্ত বাংলা-সাহিত্যে কিছুই স্থাপি করিতে পারেন নাই। বাংলা ভাষা বিষয়ে একরূপ উদাসীন হইলে ভবিষ্যতে কখনও পারিবেন কিনা সন্দেহ। প্রাচীনকালে মুসলমানগণের কেহ কেহ বাংলা ভাষায় উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচনা করিয়াছেন কিন্তু বর্তমানের কোন মুসলমানই ত তাহা পুনঃ প্রচারের জন্ত কোন চেষ্টা করিতেছেন না। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে আলাওলের ভাল সংস্করণ বাহির করিবার চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু কোন মুসলমান সে চেষ্টা করেন নাই। বাংলাদেশে বঙ্গবাসী বহুমতী ও হিতবাদী হিন্দুদের রচিত গ্রন্থ প্রচারের যেকরূপ চেষ্টা করিয়াছেন, কোন মুসলমান প্রতিষ্ঠান হইতে সাহিত্যের একরূপ সার্বজনীন প্রচারের চেষ্টা হয় নাই। যেদিন

মুসলমান খাটি বাঙালী হইয়া খাটি বাংলাভাষায় সাহিত্য রচনা করিবেন সেদিন আর তাঁহাকে হিন্দু অগ্রাহ্য করিল বলিয়া কোন অভিযোগ করিতে হইবে না। ধর্মভেদ সেদিন সাহিত্য হইতে অন্তর্হিত হইবে একথা জোর করিয়াই বলিতেছি। সে সাহিত্যে যদি আরব দেশের কথা ছাড়া আর কিছু না থাকে তাহা হইলেও তাহা বাংলা সাহিত্যের আসন অলঙ্ঘ্য করিবে এবং বাঙালী হিন্দু মুন্ড হইয়া তাহা পড়িবে। কিন্তু একরূপ আকাঙ্ক্ষা না করিয়া মুসলমানগণ বাংলা সাহিত্য হইতে পিছাইয়া যাইতেই চাহিতেছেন। খ্রীষ্টানগণ এতদিন মথি লিপিত স্তম্ভমাচার প্রচার করিয়া দেখিলেন উহা কেহ পড়ে না। সেইজন্ত এখন খাটি বাংলায় কি করিয়া বাইবেল প্রচার করা যায় তাহার চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। খাটি বাংলা ভিন্ন অন্য কিছু বাংলাদেশে চলিবে না। সেইজন্ত বলিতেছি মুসলমানগণ যদি বাংলা সাহিত্যে বাংলা ভাষার বিশিষ্ট প্রকাশভঙ্গিকে অগ্রাহ্য করিয়া আরবী প্রকাশভঙ্গি দ্বারা বাংলা সাহিত্য রচনা করিতে যান তাহা হইলে তাহা সার্বজনীন সাহিত্য হইবে না। উহাই তখন হইবে সাম্প্রদায়িক সাহিত্য। বাইবেল সার্বজনীন কিন্তু মথি লিপিত স্তম্ভমাচার সাম্প্রদায়িক। সাহিত্য যখন সাম্প্রদায়িক বিশেষণে ভূষিত হয় তখন তাহা আর সাহিত্য থাকে না, তখন তাহা হয় বিজ্ঞাপন। যেদেশে মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ জন্মিয়াছেন সেদেশে খিচুড়ি ভাষায় বিজ্ঞাপন সাহিত্য চলিবে না। তাহা ছাড়া পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশে সেই সেই দেশের নিজস্ব ভাষা ব্যবহৃত হয়, একমাত্র বাংলাদেশে বাংলাভাষা চলিবে কি না একরূপ প্রশ্ন উঠিবার কোনই হেতু নাই। আরব দেশের সংস্কৃতি যদি বাংলাদেশে প্রচার করিতে হয় তবে আরব দেশের ভাষাতেই তাহা করা উচিত, অবশ্য তৎপূর্বে সমগ্র বঙ্গদেশের মধ্যে আরবদেশের ভাষাকেই দেশের।

প্রধান ভাষা রূপে স্বীকার করাইয়া লইতে হইবে। ইহা খুব কঠিন নহে। এখন হইতে সমস্ত শিশুপাঠ্য পুস্তক আরব্যাভাষায় লিখিয়া যাবতীয় তাহা পাঠ্য করিতে হইবে। ইংরেজি পড়া একেবারে বন্ধ করিয়া তৎপরিবর্তে আরবী ভাষা প্রচলিত করিতে হইবে—তাহা হইলে আগামী একশত বৎসরের মধ্যে মুসলমানদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইতে পারে। ইহাতে আমাদের আপত্তি নাই, কিন্তু সন্দেহ হয় যে ইহা কল্পিত বতথানি ত্যাগ স্বীকার প্রয়োজন মুসলমানগণ তাহা করিতে পারিবেন না। সুতরাং আপাতত বাংলা ভাষা ছাড়া গত্যন্তর নাই। একমাত্র Esperanto ভিন্ন ভাষার দিক দিয়া রক্ষা করার আর কোন সংবাদ আমরা পাই নাই। সুতরাং আরবী এবং বঙ্গভাষা মিলাইয়া নতুন একটি ভাষা সৃষ্টি বর্তমানে সম্ভব হইবে বলিয়া মনে করি না। সুতরাং যে দিক দিয়াই বিচার করি খ্রিষ্টা ফিরিয়া বাংলা ভাষাতেই আশ্রয় লইতে হইতেছে।

প্রসঙ্গত আর একটি কথা বলা প্রয়োজন। বাংলা ভাষার মধ্যে কোন গুপ্ত উদ্দেশ্য নাই। অত্ৰ কোন ধর্মের লোককে অকারণ পীড়িত করিয়া তাহাকে হিন্দুর সংস্কৃতিতে দীক্ষা দিবার যত্নস্বত্বও বাংলা ভাষার মধ্যে নাই। পূর্বেই বলিয়াছি কোন জিনিস জানা এবং তাহাতে দীক্ষিত হওয়ার মধ্যে গুরুতর পার্থক্য আছে। বাংলা ভাষা শিখিতে গিয়া বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্যকেই অস্বীকার করার কথা শুনিতে বড় ধারণা লাগে।

বানান-কমিটিতে মুসলমান গ্রহণ করা হয় নাই কেন মোহাম্মদী এক্সপ্ৰেশনও তুলিয়াছেন। সংস্কৃতজ্ঞ না হইয়া বাংলা বানান সম্পর্কে মতামত দিবার কাহারও ইচ্ছা হইবে কেন বুঝিলাম না। বাংলা ভাষায় অনেকগুলি পারসিক এবং আরবী শব্দ আছে, কিন্তু বিশুদ্ধ

উচ্চারণ অহুয়ায়ী তাহার বানান নির্ধারণ করিবার পক্ষে বাঙালীর মধ্যে একমাত্র অধিকার শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের। শব্দতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক রীতি অহুয়ায়ী বানান না লিখিলে যে কিরূপ উচ্চারণ-বিভীষিকা হইতে পারে তাহা মোহাম্মদীর “মুছলমান” বানানেই প্রমাণিত হইতেছে। ‘ছ’ এর উচ্চারণ chh। পূর্ববঙ্গে অনেক জায়গায় ছ বিকৃতরূপে s-এর মত উচ্চারিত হয়। গায়ের জোরে s-এর উচ্চারণ মোহাম্মদী chh-এর সাহায্যে করিতেছেন। বানান-কমিটিতে পেশীবলের স্থান ছিল না, বৈজ্ঞানিক রীতিতেই যাহা কিছু সম্পাদিত হইয়াছে। ‘মোছলেম খান’ (Mochhlem Khan) বা শামছদ্দিন আহম্মদ গাহারা লিখিতে পারেন তাহারা বানান-সংস্কারের আশা না করিলেই ভাল হয়। মূল আরবী অহুয়ারে শমস্-দ-দীন অথবা “শমস্ অদ-দীন অহ-মদ” হইবে। এ ব্যবস্থা একমাত্র সুনীতিবাবুই দিতে পারেন। মূল কিসমস্ মুসলমানের হাতেই ‘কেচ্ছা’ (kechchha)য় পরিণত হইয়াছে। শব্দবিজ্ঞানের রীতি অহুয়ায়ী ইহা অচল।

ধর্মে মুসলমান হইলেও ভারতীয় জাতি বা নেশান হিসাবে সকলেই হিন্দু। খ্রীষ্টানও হিন্দুজাতির অন্তর্ভুক্ত। হিন্দু মানেই ভারতবর্ষীয়। পৃথিবীর সর্বত্রই লোকে পরস্পর জাতির নামেই পরিচিত হয়, ধর্মের নামে নহে। I am a Hindu বলিলে ইউরোপ বা আমেরিকা আমাকে ভারতবাসী বলিয়া বুঝিতে পারে, কিন্তু I am an Indian বলিলে আমি যে ভারতবাসী ইহা সকলে নাও বুঝিতে পারে। এবং হিন্দু বলিলে যে ধর্ম না বুঝিয়া ভারতবাসীকেই বুঝায় ইহার একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ, প্রবর্তকে (জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩) প্রকাশিত শ্রীযুক্ত রমানাথ বিশ্বাসের “বাইসিকলে আমার ভূপাঠন” নামক ভ্রমণকাহিনীতে পাওয়া যাইতেছে।

তেহবানে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেওয়া সঙ্গেও রামনাথবাবু ফে-
হিন্দুধর্মী সে কথা তাঁহার সঙ্গে আলাপকারী ভদ্রলোক বৃত্তিতে পারেন
নাই। কারণ তুরঙ্গে যাইবার পাসপোর্টের প্রশ্ন তুলিতেই সেই
ভদ্রলোকটি “চিন্তিতভাবে বললে, হাঁ, তুর্কীতে আজকাল প্রবেশ করাটা
বড়ই দুঃসাধ্য, বিশেষ আপনাদের মত গোঁড়া মুসলমানদের পক্ষে, নব্য
তুর্কীরা এ সব বড় একটা পছন্দ করে না।

“একটু আশ্চর্য্য হলাম। প্রতিবাদে বললাম, আমি তো মুসলমান
নই; আমি একজন হিন্দু।

“আমার কথা শুনে যুবকটি যেন আরও বিস্মিত হল। বললে
বেশ তো আপনি যখন হিন্দু, তখন মুসলমান নন কি করে?

“বিপদ আর কি! ভাবলাম কি ক’রে বুঝাই এ লোকটাকে।
অবশেষে আঙুল দিয়ে টেবিলের উপর লিখতে লিখতে হুস্পষ্ট স্বরে
বুঝাতে চেষ্টা করলাম যে, আমি ইসলাম নই, আমার ধর্ম হিন্দু। সে
কিরূপ ধর্ম মশায়, এর নাম কখন শুনিনি। মহা কাপরে পড়িলাম।
বললাম, ভারতে কটা ধর্ম আছে তা জানেন?

“যুবকটি আঙুল গুণে বললে, বৌদ্ধ, ইসলাম, খৃষ্টান। আপনি এর
মধ্যে কোনটায় আছেন?

“কথা না বাড়িয়ে সোজা বললাম, বৌদ্ধ। আনন্দে যুবকটি যেন
লাকিয়ে উঠল। টেবিলের উপর মুঠাখাত করে বললে, তাই বলুন,
আপনি বুদ্ধিষ্ট হিন্দু।...”

কিন্তু যুক্তির সংখ্যা বাড়াইতে গেলে ইহার শেষ পাওয়া যাইবে না,
সমস্তা জটিল হইতে জটিলতর হইতে থাকিবে। মুসলমানগণ যদি
কোন শুভ মুহূর্তে স্থির করিয়া ফেলিতে পারেন যে ভারতবর্ষ তাঁহাদের
অধেশ, ভারতবর্ষের গৌরবে তাঁহাদের গৌরব, ভারতবর্ষের অতীত,

বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ তাঁহাদেরই অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ, তাহা
হইলে বিরোধ একমুহূর্তে ঘুচিয়া যাইবে। প্রীতির সখন্ধ কখনও যুক্তি
এবং তর্কদ্বারা স্থাপিত হইতে পারে না,—তাঁহারা যে প্রশ্ন তুলিয়াছেন
এবং আমরা তাহার যে উত্তর দিতেছি, ইহা আমাদের মিলন
ঘটাইবে না। প্রশ্ন উঠিয়াছে বলিয়াই দায়ে পড়িয়া উত্তর দিতে
হইতেছে; কিন্তু আমরা জানি যুক্তিদ্বারা জ্বলাভ করিলেই বর্তমান
সমস্টার সমাধান করিতে পারিব না। মুসলমানগণ যে মুহূর্তে তাঁহাদের
মনোভাব পরিবর্তন করিবেন, সেই মুহূর্তে এই দ্বন্দ্ব শেষ হইয়া যাইবে।
আমরা ইহার জন্ত দৈবের মুখ চাহিয়া বসিয়া আছি।

জন্ম সংশোধন: এই প্রবন্ধের নাম ‘সাহিত্য ও
মাম্প্রদায়িকতা’—ভ্রমক্রমে ‘ও’ অক্ষরটি বাদ পড়িয়াছে।

নাতি-আধুনিক সাহিত্য

চুয়াচন্দন

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘চুয়াচন্দন’ ছয়টি গল্পের সমষ্টি।
রক্তখন্ডাত, কর্তার কীষ্টি ও মরণ-ভোমরার উপজীব্য বর্তমানকালের
জীবন হইতে গৃহীত। বাকি তিনটিকে ঐতিহাসিক গল্প বলা যাইতে
পারে।

শরদিন্দুবাবুর প্রধান গুণ ঐতিহাসিক কল্পনা। বহু দূরকালের
সামান্য কথখানা ঘটনার কঙ্কালের মধ্যে তিনি প্রতিভার মন্ত্রবলে প্রাণ

সফল করতে পারেন। এ শক্তি প্রচুর পরিমাণে বঙ্কিমচন্দ্রের ও কিয়ৎ পরিমাণে রমেশচন্দ্রের ছিল। তৎপরবর্তী লেখকদের মধ্যে এ শক্তি দেখি নাই। প্রাণী তত্ত্ববিদেরা প্রাগৈতিহাসিক যুগের জানোয়ারের এক-আধখানা অস্থির ভগ্নাংশ পাইলে সমগ্র জন্তুটির আকৃতি সংগঠন করিতে পারেন। কিন্তু ঐতিহাসিক কল্পনা তার চেয়েও বিশ্বয়কর শক্তি। ইহার বলে ইতিহাসের ঘটনা ও চরিত্রের মধ্যে প্রাণসঞ্চার করা যায়। শরদিন্দুবাবুর এই শক্তি আছে। 'তিনি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিলে সিদ্ধকাম হইতে পারিবেন বলিয়া আশা করি।

বাঘের বাচ্চা গল্পে কিশোর শিবাজীর চিত্র পাওয়া যায়। কিশোর শিবাজীকে আমরা কোথাও দেখি নাই। শিবাজীর শরীরের যে বর্ণনা তিনি দিয়াছেন, তাহা আশ্চর্য্য রকমে বস্তুগত। শিবাজীর দেহের উর্ধ্বার্দ্ধ যে নিম্নার্দ্ধের অপেক্ষা সযল ও পুষ্ট ছিল, ইহা শরদিন্দুবাবু কোথাও পড়িয়াছেন কিনা জানি না। কিন্তু শিবাজীর অস্বাভাবিক চিত্র দেখিলেই এই কথাটি মনে হয়। বোধ হয় ইহা শিবাজীর প্রতিষ্ঠিত মহারাষ্ট্র রাজ্যেরও প্রতীক। শিবাজীর মৃত্যুর একশতাব্দীর মধ্যেই মহারাষ্ট্র রাষ্ট্র ভাঙিয়া পড়িল; তাহার নিম্নার্দ্ধ বা ভিত্তি অস্পষ্ট ছিল, ইহাই বোধকরি তাহার সবচেয়ে বড় কারণ।

এই গল্পে আমরা দেখিতে পাই শিবাজীর human জ্ঞান ছিল। বোধকরি অধিক বয়সেও তিনি এ শক্তি হারান নাই। নতুবা আর্য্যজ্ঞেবের কয়েদ হইতে সন্দেহের খুঁড়ি করিয়া পালাইবার বুদ্ধি তাহার মনে আসিত না।

বক্তৃক্ষা ও চুয়াচন্দন গল্প দুইটি আমাদের সবচেয়ে ভাল লাগিয়াছে। বক্তৃক্ষায় ভাঙ্কো-ডা-গামার আমলের গোয়া নগর একটি কাহিনী।

সেই সময়ের গোয়া নগর এবং তৎকালকার লোকজন এমন জীবন্তভাবে লেখক আঁকিয়াছেন যে তাঁহাকে প্রশংসার ভাষা খুঁজিয়া পাই না। হয়তো এ সব তথ্য তিনি ইতিহাস হইতে পাইয়াছেন, কিন্তু এ প্রাণ তো ইতিহাসের গ্রন্থে ছিল না।

কিন্তু তার চেয়েও বিশ্বয়ের, গল্পের যে ফ্রেমটির মধ্যে এই গোয়া নগরের কাহিনীকে তিনি আঁটিয়া দিয়াছেন। কলিকাতায় এক মাংস বিক্রেতা ও গোয়ানগর হইতে আগত এক পতুগীজ ফিরিনির মধ্যে খুনখুনীকে লেখক অপূর্ণ প্রতিভাবলে বহু শতাব্দীর পূর্বকাল ভাঙ্কো-ডা-গামা ও মির্জা দাউদের সঙ্গে জড়িত কবিতা দিয়াছেন। বুদ্ধি বলে, ইহা অসম্ভব, সংস্কার বলে—সম্ভব হইতেও পারে। বিজ্ঞান বলে, ইহা মিথ্যা; আর্ট বলে, ইহা সত্য। লেখক গল্প লেখায় আর্টের সাহায্যেই ইহা সত্য করিয়া তুলিয়াছেন, পড়িবার সময়ে ইহা বিশ্বাস না করিয়া উপায় নাই।

চুয়াচন্দনও চৈতন্যদেবের আমলের নদীয়ার একটি কাহিনী। যেমন রোমাণ্টিক তেমনি বাস্তব। কিন্তু ইহার মধ্যে সবচেয়ে ভাল লাগিয়াছে কিশোর চৈতন্যের চিত্রটি, চৈতন্যদেবের যে মণ্ডিত মস্তক কোপীনসমূহ মন্দির সঙ্গে আমরা সচরাচর পরিচিত, এ চিত্র সে চিত্র নয়। এ-সেই দুর্দান্ত বিদ্যান, মূর্ণ পণ্ডিতদের মুষ্টিমান ভাষা স্বরূপ, দৈব প্রতিভায় সমুজ্জ্বল, একত্ববে-গঙ্গাগর্ভ-নির্মলজিত-পণ্ডিতের টিকি ধরিয়া টানিয়া তোলা, প্রচুর হাঙ্গে প্রগল্ভ সম্ভাষ-পূর্ববর্তী চৈতন্যদেবের চিত্র। চৈতন্যদেব যে এমন ছিলেন তাহা কোন কোন বৈষ্ণব লেখকের জীবনী হইতে পাওয়া যায়, কিন্তু স্পষ্টভাবে সে ছবি দেখি নাই। যে চৈতন্য একদিন বিষ্ণুপ্রিয়ায় ত্যাগ করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই, তিনি আবার একদিন অন্ধকার রাতে মাধবগঙ্গা চন্দনের সহিত চুয়ার রাক্ষস

বিবাহ দিয়াছিলেন এমনতর মিথ্যা-সত্য ইহার আগে পড়ি নাই। ষাহারা চৈতন্যদেবের গতাত্মগতিক চিত্র দেখিয়া বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তাহারা এ দৃশ্য দেখিলে চৈতন্যদেবের ভক্ত হইয়া উঠিবেন, আশা করিতেছি।

এই কাহিনীটিতেও তৎকালীন তাত্ত্বিক দেশাচারের চিত্র স্পষ্টভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। শরদিন্দুবাবুকে অহরোধ তিনি গল্পটিকে নাটকে পরিণত করেন। ইহার মধ্যে যথার্থ নাটকীয় উপাদান আছে।

বর্তমানকালের উপজীব্য সাহাদের বিষয়বস্তু এমন গল্পগুলির মধ্যে কর্তার কীষ্টির জমিদার জীবীকেশবাবুর চিত্রটি বড়ই উপভোগ্য। প্রাচীনকালের একজন জমিদারের ইনি type। রাগিলে ইনি আসবাব ভাঙিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু কাচের গেলাস ভাঙিলে ইহার রাগ কমিয়া আসে। জীবীকেশবাবু রাগে অন্ধ হইয়া টেবিল চেয়ার ভাঙিয়া বেড়াইতেছেন, হঠাৎ কেহ হাতের কাছে একটি কাচের গেলাস আগাইয়া দিল। তিনি তাহা ভাঙিয়া শাস্ত হইলেন। এ চিত্র যেমন সজীব তেমনি সত্য।

মরণ ভোমরা ও রক্তখণ্ডোত ভৌতিক গল্প। ভূতের গল্পের দুটি অন্ত্যাবশ্যক অঙ্গ—তাহা ভূতের হওয়া চাই ও গল্প হওয়া চাই। শরদিন্দুবাবু এ বিষয়ে সিদ্ধহস্ত। ইহার প্রধান রস—রহস্যের রস। সংস্কার এখানে বুদ্ধির বড় শরীক। শরদিন্দুবাবুর মধ্যে এই রহস্য ঘনীভূত করিয়া তুলিবার শক্তি যথেষ্ট আছে। সেইজন্যই তিনি ভিটেক্টিব উপগ্রাস রচনাতেও পারদম। তাহার রচিত ব্যোমকেশের ডায়েরী এক নিঃশ্বাসে পড়িয়া ফেলিয়াছি। পড়িতে পড়িতে অত্যন্ত উদ্গ্রীব হইয়া আর কথপাতা বাকি আছে দেখিয়া লইয়াছি। অনেকদিন এভাবে বই পড়ি নাই।

এবার হইতে ভোমরা দেখিলেই শরদিন্দুবাবুর কথা মনে পড়িবে, কি জানি তিনদিনের মধ্যে কাহাকে ইহুদাম ত্যাগ করিতে হইবে।

ইতিপূর্বে ষাহাদের সমালোচনা করিয়াছি তাহারা সকলেই বিশ্লেষণমূলক লেখক। শরদিন্দুবাবু সেপথে যান নাই। তাহার গল্প পড়িতে পড়িতে বারংবার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের কথা মনে পড়িয়াছে। প্রভাতবাবু যেমন তৎকালীন অগ্রাগ্র লেখক হইতে স্বতন্ত্র ছিলেন, ইনিও তেমনি আধুনিক সকল গল্প রচয়িতাদের মধ্যে স্বতন্ত্র। কি ভাষায়, কি সরস বাচন ভঙ্গীতে, কি গল্পের উপজীব্যে। আধুনিক উপগ্রাস ঘটনাবিরল, বিশ্লেষণ-বহুল; শরদিন্দুবাবুর গল্প বিশ্লেষণ বিরল, ঘটনাবহুল, বিশ্লেষণের শক্তি যেমন তিনি দেখান নাই, তেমনি তিনি দেখাইয়াছেন কি করিয়া ঘটনার জাল বুনিয়া যাইতে হয়। একটি বিষয়ে শরদিন্দুবাবু আধুনিকদের মধ্যে অসামান্য, সে তাহার অবিরাম narration এর শক্তিতে।

আর একটি ব্যাপারের জন্য লেখকের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। গল্প বলিতে বসিয়া তাহার বক্তৃতা ও উপদেশ দিবার অভ্যাস নাই। আজকাল উপগ্রাস শুনিয়া নিশ্চয় করিয়া কেহ বলিতে পারে না তাহার মধ্যে কি পাওয়া যাইবে। ভাষাতত্ত্ব হইতে ভূতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব হইতে মিশ্রন-তত্ত্ব সমস্তই, কেবল গল্প না থাকিতেও পারে। শরদিন্দুবাবুর বই নির্ভয়ে খোলা যাইতে পারে, কারণ কোন তত্ত্ব তাহাতে নাই, আর নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে, গল্প তাহাতে আছেই।

বাংলা বইয়ের দুঃখ

সম্প্রতি বাংলা পত্রিকাদিতে “বাংলা বইয়ের দুঃখ” সম্বন্ধে বেশ কিছু আলোচনা হইয়া গিয়াছে। ‘বিচিত্রা’য় শ্রদ্ধেয় শরৎচন্দ্র, তাহার পর শ্রদ্ধাস্পদ কেদারনাথ, ধেমালীতে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী, (দীরবল নহেন তো?) আরও এদিক ওদিক অনেকে এ সম্বন্ধে আলোচনা করায় মনে হয় যে এবিষয়ে ইহারা অর্থাৎ সাহিত্যিকগণ বেশ গভীর ভাবেই ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অবশ্য না ভাবিয়াই বা উপায় কি? বাংলা সাহিত্যের যা বাজার!

ইতিমধ্যে ‘বিচিত্রা’তেই শ্রীযুক্ত কাননবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় জানাইয়াছেন যে শরৎবাবুর লেখা পড়িবার পর হইতেই অনেকেই—যাহারা আগে বাংলা বই কিনিতেন না—মাসে মাসে দুইচারিখানা করিয়া বাংলা বই কিনিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাহা হইলে বেশ বোঝা যাইতেছে যে এই আলোচনার সুফল সঙ্গে সঙ্গেই ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহার জন্ত ধন্যবাদটা পরোক্ষভাবে বিচিত্রা সম্পাদক উপেনবাবুরই প্রাপ্য—কারণ তিনিই আলোচনার স্বরূপাত করিয়াছিলেন।

বাংলা বইয়ের দুঃখ দুটিবে বাংলা বইয়ের ‘সেল’ বাড়িলে—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। স্বতরাং বিক্রয় বাড়টাই আসল কথা। আর দুঃখ যে আছে তাহা অবিসংহারী সত্য কথা। বস্তুত বলিতে গেলে আমাদের দুঃখ যে কোন্ বিষয়ে নাই তাহাই ভাবিয়া পাই না। যাক্।—দুঃখ আছে ভাল—দুঃখ দূর করিবার চেষ্টায় হাত

লাগানো উচিত। কিন্তু দুঃখকে লইয়া সমারোহ করা যেন আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। তাই দুঃখ না করিয়াও উপায় নাই। উপায় কিই বা থাকিতে পারে? কলসী আর দড়ী? তাহাও জোটে না। সেজন্তও দুঃখ করিতে হয়। “বাঙালী হাসে কিনা” প্রবন্ধের লেখক একটা অত্যন্ত খাটা কথা বলিয়াছিলেন—‘miracle নাই বলিয়া magic নাই বলিয়াই আমরা কাঁদি।’…… স্বতরাং দুঃখ সম্বন্ধে আলোচনা না করিয়া বইয়ের সেল বাড়ান যায় কি করিয়া সে সম্বন্ধে আলোচনাই শ্রেয়।

শ্রদ্ধেয় তারানাথর বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবোধ কুমার সান্যাল প্রমুখ লেখকদের কথাবার্তা হইতে ও বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রভৃতির ছোট্ট একটা খুচরা প্রবন্ধ বা লেখা হইতে আমার মনে হয় (এবং আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য একই দিকে) যে ব্যক্তিগত ভাবে, বাংলা দেশেই হউক বা বাংলার বাহিরেই হউক, বাঙালী জনসাধারণ যে বড় একটা বই কিনিয়া থাকে বা কিনিতে পারে বলিয়া বোধ হয় না। স্বতরাং হয় লাইব্রেরির সংখ্যা বৃদ্ধি করা দরকার না হয় সকলকে লাইব্রেরির সভা হইতে বাধ্য করা দরকার। যাহাদের টাকা আছে, যাহারা বই কিনিতে পারেন—তাহারা ব্যক্তিগত ভাবে বাংলা পুস্তকাদি তো জন্ম করিবেনই তাহার উপর সকলের পড়িবার ও সেই সঙ্গে সঙ্গে বই বিক্রয়ের সুবিধা করিয়া দিবেন লাইব্রেরি স্থাপনায় সাহায্য করিয়া বা বর্তমান লাইব্রেরিগুলিতে অর্থ সাহায্য করিয়া।

ব্যক্তিগত ভাবে বই কিনিবার কথায় আর একটা কথা মনে পড়িল। আমরা, যাহারা বাংলা দেশের বাহিরে থাকি (কথাতা যাহারা কলিকাতার বাহিরে থাকেন তাহাদের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য)।

এ সম্বন্ধে পদে পদে অস্ববিধা ভোগ করি। পুস্তক ক্রয় করিতে যাইব—বইয়ের দোকানে হয় বাংলা বই একেবারেই নাই আর নয় তো বাহা আছে সেগুলি হইতে বাছিয়া লওয়া দুষ্কর বা অসম্ভব। হয় তো এমন কতকগুলি বই রহিয়াছে যে গুলি সাধারণত সের দরে বিক্রয় হইয়া থাকে; আর যেগুলির বিক্রয় হইলে বাংলা সাহিত্যের কোন উপকার হইবে না, বাংলা বইয়ের ছুঃখ ঘুচিবে না। প্রতিবার কলিকাতা হইতে বই আনান অসম্ভব।—রেজেন্সী থ্রচ, ভিঃ পিঃ থ্রচ বা মনি অর্ডার থ্রচ, ডাক থ্রচ প্রভৃতিতেই বইয়ের দ্বিগুণ বাহির হইয়া যায়—এ অবস্থায় কি করিতে পারি? বিজ্ঞাপন দেখিয়া বই আনানও চলে না—সকল পুস্তকেই “বঙ্গ সাহিত্যে যুগান্তর” অনিয়াছে। বাংলায় সেরূপ ভাল সমালোচনাও বাহির হয় না—বাহা দেখিয়া লোকে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে পারে—বেশীর ভাগই “ছাপা বাধাই ভাল।” উপহারের বইয়ের তো অভাব নাই! স্তত্রাং চোখ কান বুজিয়া নামী লেখকদের বইয়ের অর্ডার দেওয়া বা কেনা ছাড়া গতান্তর থাকে না। অবশ্য তাহাও যদি সম্ভবপর হইতে পারিত বা হইত তাহা হইলেও আক্ষেপের কারণ অনেক পরিমাণে কমিত।

বিদেশী প্রকাশকগণ বইয়ের প্রচার বাড়াইবার জন্ত সাধারণত যেসব উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন সেগুলির কিছু কিছু বাংলার প্রকাশকগণ লইতে পারিলে কিছু স্ববিধা হয় তো হইত। এমন অনেক প্রকাশক আছেন যাহারা নূতন কোন বড় বা দামী বই বাহির হইলে দেশের বিভিন্ন লাইব্রেরি যাহারা পুস্তকাদি কিনিয়া থাকেন বা যাহারা কিনিতে পারেন, ও বড় বড় লোকদের বাছিয়া লইয়া এমন প্রজ্ঞাপ্ত আরম্ভ করেন যে শেষ পর্যন্ত অনেকেই কোনও

না কোন বই না কিনিয়া উপায় থাকে না। অবশ্য এগুলি বড় বড় সিরিজ—যেমন মহাকাব্য, শিশুভারতী সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। অত্যাশ্চর্য উপায়গুলির মধ্যে দু'একটির বিশদ আলোচনা করা বাইতে পারে।

বিদেশীয় প্রকাশকগণ বড় বড় লেখকদের বই বা অধ্যাতনামা বা স্বল্পখ্যাত লেখকদের ভাল ভাল একই বইয়ের একই সময়ে একসঙ্গে কতকগুলি সংস্করণ প্রকাশ করেন। পুস্তকটি প্রেসে গিয়াছে—প্রকৃ ইত্যাদিও দেখা হইয়া গিয়াছে, ফাইনাল প্রিণ্টিং এর সময় অতি সাধারণ কাগজে কিছু ছাপান হইল। সেগুলিকে বাধাইবার সময় একটি কাগজের মলাট আর একটি হয়ত কাপড়ের মলাট, দুই রকম মলাটে পুস্তকটি বাজারে বাহির করা হইল। আবার ঐ সেট হইতেই কতক বই ভাল কাগজে, কতকগুলো খুব ভাল কাগজে ছাপাইয়া বিভিন্ন রকম ভাবে বাধাইয়া প্রকাশ করা হইল। ইহাতে থ্রচের অল্প খুব বেশী পরিমাণে না বাড়াইয়াও একই বইয়ের কয়েক সংস্করণ বাহির হইল—রাজা রাজাডারা de luxe edition লইলেন, আমাদের মত গরীবেরা cheap edition পাইলাম। আমাদেরও শতা পড়িল আবার প্রকাশকের থ্রচ প্রায় একই পড়াতে তিনিও হেরদরে পুসাইয়া লইতে পারিলেন বলিয়াই বোধ হয়।

আর একটি উপায়। জনসাধারণকে বইয়ের আশ্বাস পাওয়াইয়া দেওয়া। অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে অনেকে বই একেবারেই পড়েন না—কিন্তু একবার বই পড়িবার নেশা ধরাইয়া দিলে তিনি সাধারণ পাঠক অপেক্ষাও বইয়ের বেশী অহুরাগী হইয়া পড়েন। এই বই পড়িবার নেশা জাগাইয়া দিবার জন্ত বা মস্তিষ্কের হৃদয় অতৃপ্তিটা জাগ্রত করাইবার জন্ত বই ইহাদের চোখের সম্মুখে ধরিতে হয়, বই পড়া সম্বন্ধে বিভিন্ন slogan বা বিভিন্ন মহাপুরুষদের বাণী—তাহারা বই সম্বন্ধে বা

পুস্তকপাঠি সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন। [আনন্দবাজারে যেমন কিছুদিন পূর্বে কখন কখন বড় বড় অক্ষরে ছাপা হইত—“মনে প্রাণে স্বদেশী হউন"]। কাহাকেও হয়ত বড় একটা ‘টুরে’ বাহির হইতে হইবে বা নির্জন স্থানে একলা কিছুকাল বাস করিতে হইবে—হঠাৎ তাহার চোখে পড়িল একখানা বইয়ের মলাটের ভিতরকার পৃষ্ঠায় লেখা—“বই—অবসরের সাথী বা এরকম কিছু—(ইংরাজী বইয়ের মলাটের ভিতরকার পাতায় এরকম লেখা প্রায়ই থাকে ; অন্তত পক্ষে কিছুদিন আগে পর্যন্তও থাকিত) তখন তাহার নিঃসঙ্গ যাত্রার সাথী বা অবসরের চিন্তাবিনোদনের উপায়রূপে কিছু বই লইয়া যাইবার, বা যতদিন তাহাকে নিঃসঙ্গ অবস্থায় থাকিতে হইবে ততদিন যাহাতে কিছু কিছু বই পান তাহার ব্যবস্থা করিবার একটা স্বাভাবিক ইচ্ছা ভ্রলোকের মনে দেখা দিবে। অবশ্য যদি তাহার টাকা থাকে !

বাংলা বইয়ের scientific cataloguing এর বিশেষ প্রয়োজন। বাংলায় অনেক বিষয়ে অনেক ভাল ভাল পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে—শেঙিল সাধারণ পুস্তকের তালিকায় পাওয়া যায় না। অথচ প্রয়োজনের সময় জানিতে পারিলে, বিশেষ করিয়া কোন পুস্তকগারের জন্ত বই আনাইবার সময়, ছুঁচারিখানা বিক্রয় হইতে পারিত। অবশ্য ছুঁচারখানি বই বিক্রয়ে প্রশ্রাশক বা গ্রন্থকারের বিশেষ স্রবিধা হইবে কিনা সম্ভব কিন্তু তবুও বইগুলি যখন প্রকাশ করা হইয়াছে তখন তাহার বিক্রয় হওয়া দরকার, অন্ততপক্ষে প্রচার হওয়া প্রয়োজন। ‘বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ’এর উচিত “সাহিত্য পঞ্জিকা” জাতীয় পুস্তক প্রকাশের ব্যবস্থা করা।

এই ক্ষেত্রে মনে হয় যে একটি “গ্রন্থকার সঙ্ঘ”র বিশেষ প্রয়োজন আছে। গ্রন্থকার সঙ্ঘ সম্ভবপর না হইলে অমুদ্রিত অমুদ্রিত সমিতির

প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে (যেমন “বেঙ্গল অ্যাকাডেমি অফ লিটারেচার ” ‘পুর্নায়’ কিছু আলোচনা হইয়াছে। ‘বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ’ এরিকে নজর দিতে পারিলে ভাল হয়। ইংলণ্ডে ‘Book Club’, বা “Book of the month” প্রভৃতি, পুস্তকাদির প্রচার ও পুস্তক পাঠের প্রসার বাড়াইতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে ও করিতেছে। যাহারা টা সেস্ কমিটি প্রভৃতির প্রচার কার্য লক্ষ্য করিয়াছেন তাহারা ইহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিবেন। বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ লেখকদের প্রতিষ্ঠিত এইরকম একটা সঙ্ঘের অস্তিত্ব কি লোপ পাইয়াছে ? যদি পাইয়া থাকে তবে হুঃখের কথা।

কোনও লেখক কোনও নূতন সহরে পদার্পণ করিলে তাহার সম্বন্ধে স্থানীয় জনসাধারণের কৌতূহল নূতন করিয়া জাগিয়া উঠে— তাহারা সেই লেখকের লেখা পুস্তকাদি পড়িতে আরম্ভ করেন, ছুঁকখানি বইও কিনিয়া থাকেন। বাংলার বাহিরে এমন বহু সহর আছে যেখানে বাঙালীর বাস নিত্যন্ত অল্প নয়—সেখানেও দেখা গিয়াছে যে সাধারণ লোকে খুব খ্যাতিনামা ছুঁ এক জন লেখক ব্যতীত অল্প কাহারও বড় একটা নাম জানেন না, বা জানিলেও তাহাদের রচনা বড় একটা পড়েন নাই। লেখকগণ এই সকল সহরে গেলে তাহাদের সম্বন্ধে living advertisement হইয়া যায়। অবশ্য ব্যাপারটি ব্যয়সাধ্য এবং ঠিক আপাতলাভ কতটা হয় তাহা বোঝা সম্ভবপর নহে। কিন্তু অনেকেরই অনেক স্থানে যাইতে তো হয়—মধ্যপথে আরও ছুঁ এক জায়গায় বেড়াইয়া আসা বিশেষ শক্ত হয় না।

এ সম্বন্ধে আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও আছে। আমরা বাংলার বাহিরের একটি সহরে অতুলপ্রসাদ সেনের স্থিতি সভার

অহুষ্ঠান করাতে অতুলপ্রসাদের কবিতা পড়িবার একটা আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়।

আরও উপায় আছে। পড়িয়া অনেকই হাসিবেন সত্য। তাঁহারা হাসিতে পারেন। বাংলার বাহিরে অবাঙালীদের বাংলা বই পড়িবার ইচ্ছা ও সখ প্রায়ই দেখা যায়। কিন্তু বাংলা না জানাতে বা শিখিবার কোনই উপায় না থাকাতে তাঁহাদের অহুর্বাদের উপর নির্ভর করিতে হয়। ইহার ফল অনেকক্ষেত্রেই বাংলা সাহিত্যের পক্ষে ক্ষতিকর হইয়া ওঠে—বাংলার সম্যক ভাব হিন্দী প্রভৃতি ভাষাতে সকল সময় ফুটাইয়া তোলা এই সকল অহুর্বাদকদের দ্বারা সম্ভবপর হইয়া ওঠে না। যদি কোন প্রকাশক বা প্রতিষ্ঠান—যেমন প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন—হিন্দী-উর্দু-ইংরেজী প্রভৃতি ভাষাভাষীদের বাংলা শিখিবার প্রাথমিক পুস্তক প্রণয়ন করিতে পারেন ও এই সব অহুর্বাদের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে পারেন তাহা হইলে পরিণামে সফল আশা করা যাইতে পারে। বাংলা পুস্তকের অহুর্বাদের উপর—বিশেষ করিয়া যাহাতে ভাল ভাল পুস্তকাদি অনূদিত হয়—বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

বাংলা সাহিত্যের প্রচারের জন্ত বাংলা ভাষার প্রচারের প্রয়োজন। বাংলা ভাষার প্রচার হইলে বাংলা সাহিত্যেরও প্রচার হইবে। হিন্দীভাষা প্রচার চেষ্টার তুলনায় বাংলাভাষার প্রচার কিছু হয় নাই ও হয় না। অবশ্য হিন্দী ভাষা প্রচারের অগ্রতম কারণ—রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন। অবাঙালীদের মধ্যে বাংলার প্রচার ও বাংলা সাহিত্যের ঐশ্বর্যের কথা জ্ঞানান বিশেষ দরকার। যাহারা বাংলা সাহিত্যের ঐশ্বর্যের কথা অবগত আছেন তাঁহাদের মধ্যে বাংলা শিখিবার ইচ্ছা স্বাভাবিক। এবিষয়ে প্রবাসী বাঙালী ছাত্ররা অনেক কাজ

করিতে পারেন। যাহারা বাংলা সাহিত্যের ঐশ্বর্যের কথা জ্ঞানেন না তাঁহাদের সে সখক্ষে সবিশেষ বিবরণ জানাইয়া, পরে তাঁহাদের বাংলা ভাষা শিখাইবার ব্যবস্থা করিয়া বা বাংলা শিখিতে উৎসাহ দিয়া ও যাহারা এই ঐশ্বর্যের কথা অবগত আছেন তাঁহাদের বাংলা শিখাইয়া (কারণ এইরূপ বাংলা শিখান ব্যক্তিগত ভাবেও করা বিশেষ কঠিন নহে)—ভাষাজ্ঞানী তথা বাংলা সাহিত্যের যথেষ্ট সেবা করিতে পারেন। প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা লিখিয়া বাংলা সাহিত্যের সেবা অপেক্ষা এ ব্যবস্থা কোন অংশেই হীন হইবে না। বরং এই শিক্ষাদান কার্যের উপায় উদ্ভাবনা করিতে গিয়া অবাঙালীদের জন্ত বাংলার প্রাথমিক পুস্তক সঞ্চলন করা সহজতর হইয়া উঠিবে। তাহা স্থায়ী উপকার করা হইবে।

প্রাথমিক পুস্তক প্রণয়নের কথা হাতকর বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু আমার বিশ্বাস যাহারা এলাহাবাদে হিন্দী সাহিত্য পরিষদের স্থায়ী গৃহ ও মিউজিয়াম উদ্বোধন উপলক্ষে দস্ত বক্তৃতা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা অন্তত হাসিবেন না। দক্ষিণ ভারতে হিন্দী প্রচারের ফলে আজকাল সেখানে লক্ষ লক্ষ হিন্দী পুস্তক বিক্রয় হয়। কল্যাণী পারসেটেক্স বাদ দিলেও বোধহয় সহস্রের নীচে যাইবে না। সমগ্র ভারতবর্ষময় বাংলা পড়িবার একটা আগ্রহ বর্তমান। [শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল মোহনলাল ঝাংবেরী প্রবন্ধ,—“গুজরাটের উপর বাঙালী সাহিত্যের প্রভাব” প্রভৃতি দ্রষ্টব্য]। ইহাকে কাজে লাগান বিশেষ প্রয়োজন।

মাসিক সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলি তাহাদের বিক্রয় বাড়াইবার জন্ত নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিতে পারেন। ক।—রেলওয়ে ষ্টেল পত্রিকা বিক্রয়ের ব্যবস্থা, খ। প্রত্যেক বড় বড় সহরে এজেন্টের

মারফৎ পুচরা বিক্রয় করা, গ। স্থূল, কলোজ, হটেল প্রভৃতিতে ক্রয় করা ইবার জন্ত ডি. পি. আই.-এর অনুমোদন। অবশ্য অর্থাগমের সহজতর পন্থাও রহিয়াছে—সিনেমা, বীমা, চা ও টনিক সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ। সিনেমার দ্বিবিধ স্থবিধা—মলাটের উপর কোন অভিনেত্রীর 'পোশাক' ও ভিত্তরে একটা পাতায় হলিউডের বা টলিউডের জল্পনা ছাপিলেই 'হট কেকের মত' বিক্রয় হইয়া যাইবে। তাহার উপর বিজ্ঞাপন তো আছেই।

অলমিতি.....

ম. চ. স.

‘বৃহৎ বঙ্গ’

রায়বাহাদুর শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, ডি. লিট. (অনু) কবিশেখর প্রণীত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ছই থণ্ডে প্রকাশিত বৃহৎ সচিত্র পুস্তকখানি আমরা যাহার নিকট সমালোচনার্থ প্রেরণ করিয়াছিলাম তিনি যথাসময়ে সমালোচনা না পাঠাইয়া এক প্রজ্ঞাঘাত করিয়া আমাদেরকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছেন, অথচ সমালোচনা প্রকাশ করিব বলিয়া পাঠকবর্গকে আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়াছি। আমরা নিজেরা এই পুস্তক সমালোচনার স্পর্ধা রাখি না, তথাপি যে এই কার্যে (ঠেকা দিবার মত) আমাদেরকে হতক্ষেপ করিতে হইতেছে তাহা নিতান্তই গ্রহের ফের বলিতে হইবে। ১৩৩৫ সনের চৈত্র ও ১৩৩৬ সনের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত সচিত্র দীনেশ-নামা মারফৎ দীনেশবাবুর যে

পরিচয় আমরা পাইয়াছিলাম, আশা করি নাই যে তাহার পর আবার নূতন করিয়া কিছু তাঁহার সম্বন্ধে বাংলাদেশে বলিতে হইবে বা বলিবার থাকিবে। তথাপি ‘বৃহৎ বঙ্গ’ যখন লিখিত হইয়াছে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সাধারণের বহুমহন্ত টাকা ব্যয় করিয়া ইহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়াছেন তখন বৃত্তিতেছি স্বস্থ কানমায়া এদেশে কাজ হয় না, কাহাকেও পথ হইতে সরাইতে হইলে তাহার মুখে ছাত্ত পূরিয়া মাথায় গোটা স্থপারি রাখিয়া সর্বসমক্ষে হাতুড়ি না পিটাইলে এখানে চলে না। দীনেশবাবু বুদ্ধ এবং আজ প্রায় ৩৫ বৎসর ধরিয়া মৃত্যুশয্যা শুইয়া শুইয়া ক্রমাগত বৃত্তিভোগ, চাকুরী এবং পুস্তক রচনা করিয়া চলিয়াছেন, (‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্য’ ২য় সংস্করণ, ১৯০১ ভূমিকা এবং ‘বৃহৎ বঙ্গ’ ভূমিকা দ্রষ্টব্য) স্বতরাং তাঁহার সম্বন্ধে কঠিন হইতে স্বতই বাধ বাধ ঠেকে। তা ছাড়া আরও একটি কথা এই যে ‘বৃহৎ বঙ্গ’ ব্যাপারে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের অপরাধের গুরুত্ব ততটা নহে যতটা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের। চন্দ্রাকান্ত মস্তিষ্ক লইয়া তিনি যাহা গুণী লিখিতে পারেন, গালগল্পকে ইতিহাস বলিয়া চালাইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারেন, অহুমান ও কল্পনার আশ্রয় লইয়া অযোধ্যাকে কিল্কিদ্ধা এবং কিল্কিদ্ধাকে অযোধ্যা বানাওয়া ভুলিতে পারেন, অপরাধ তাহাদেরই বাহারা এই সকল জঞ্জাল পয়সা ব্যয় করিয়া ছাপাইয়া প্রকাশ করিয়াছেন; হাজার হাজার টাকা ব্যয় করিবার পূর্বে একবারও বিচার করিয়া দেখেন নাই কি অমেধ্যবস্ত্র তাহার সাধারণের পাতে পরিবেশন করিতে চলিয়াছেন। বঙ্গের একজন মহামনীষীর সহিত এ বিষয়ে আমাদের কথা হইয়াছিল, তিনি বলিয়াছিলেন, পাগলাগারদের আন্তর্যুড়ে যে বস্ত্র পুড়িয়া ছাই হইবার কথা তাহাই ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করিয়া সমগ্র পৃথিবীর সম্মুখে বাংলাদেশ ও জাতিকে যেভাবে

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় লাহিত করিয়াছেন, গবর্ণমেন্টের উচিত বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রান্ট বন্ধ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে শাস্তি দেওয়া। শুধু বিশ্ববিদ্যালয় নয়, আনন্দবাজার পত্রিকা ও অমৃতবাজার পত্রিকা এই পুস্তক সমালোচনার নামে শুধু ইহার আক্রমণ ও আয়তনে ভুলিয়া যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা বাহির করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাদেরও ধোপানাপিত বন্ধ করিয়া দেওয়া সমাজের কর্তব্য। ভূয়া সমালোচনার ভুলিয়া যদি কর্তৃপক্ষেরা এই পুস্তককে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যরূপে নির্দেশ করেন তাঁহা হইলে লজ্জার আর অবধি থাকিবে না। এবং তাহাতে যে ক্ষতি হইবে তাহার প্রণয়ন করিতে স্তর আশুতোষকে পুনরায় জন্ম পরিগ্রহ করিতে হইবে।

উপরে উপরে কথা বলিয়া আমরা পাঠককে ধোঁকা দিতে চাহি না। এই unmitigated rubbishএর দুই একটির মাত্র উল্লেখ করিয়া স্বধীজনের বিচার প্রার্থনা করিব।

ভুলভ্রান্তি বাহাই করিয়া থাকুন শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় প্রথম যৌবনে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের গদ্যমাদনরূপ মালমশলা সংগ্রহ করিয়া ভাষার ও জাতির প্রভূত উপকারই সাধন করিয়াছেন এবং সেজন্য তিনি অক্ষয় কীর্তীর অধিকারীও হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কথ্যতা সেইখানেই পরিসমাপ্ত এবং সেদিন হইতে আজ পর্যন্ত তিনি জাবর কাটা ছাড়া অন্য কোনও কাজ করেন নাই। অতীত কীর্তীর আধুলিটি ভাঙাইয়া বেশ কৌশলে দেশের ও দেশের মাধ্যম কাঁঠাল ভাঙিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার সংগ্রহের পর বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে অনেক নূতন মালমশলা সংগৃহীত, অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত এবং অনেক ভুল শুদ্ধ হইয়াছে, তিনি ‘ভুল্লোকের এক কথা’ এই মহামূল্য নীতি-বাক্যের অমসরণে তাঁহার পুস্তকের পরবর্তী সংস্করণ সমূহে নূতন

আবিষ্কারের সাহায্যে কোনও পরিবর্তন করাই যুক্তিসঙ্গত মনে করেন নাই—অথচ মহামাফ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার পুস্তকের প্রচার বন্ধ করেন নাই। তাঁহার সেই সকল ভুলভ্রান্তি ও সংস্কার বৃহদাকারে ‘বৃহৎ বন্ধে’ দেখা দিয়াছে অথচ সে পুস্তকখানিও প্রকাশিত হইল! রায়বাহাদুরী কপাল ইহাকেই বলে!

আমরা এই পুস্তকখানি যাহার নিকট সমালোচনার্থ প্রেরণ করিয়াছিলাম তিনি নিম্নলিখিত পত্রটি লিখিয়া পুস্তক দুইখণ্ড আমাদিগকে ফেরত দিয়াছেন। পত্রটি এইরূপ—

মহাশয়, আমি কাজের লোক, আমার সময় অল্প, তথাপি আপনাদের অমুরোধে এবং নিজের আগ্রহেও বটে, খুব শ্রদ্ধাসহকারে ‘বৃহৎ বন্ধ’ বইখানি পড়িতে বসিয়াছিলাম, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যত্ন করিয়া বইখানি ছাপিয়াছেন, “আমিও উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট” ইত্যাদি অনেক কিছুই পুস্তকখানি ভাল লাগিবার সপক্ষে ছিল কিন্তু ভূমিকায কয়েকপাতা পড়িয়া আমি ইাপাইয়া উঠিলাম, আমার ইাপানির টান আছে, মনে হইল আর বাঁচিব না—সতীশ কবিরাজ মহাশয়ের কথা মনে হইল কিন্তু সেও তো বেহালায়! দীনেশ সেনের মুখদর্শন করিব না বলিয়া ইাপানির কষ্টও সহ্য করিলাম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত আমি যুক্ত বলিয়া লজ্জা অহুভব করিলাম। আমার এখনও সন্দেহ হইতেছে ইহা কোনও ছুটলোকের কাজ, এই পুস্তক আমাদের দীনেশচন্দ্র সেনের লেখা নহে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইহা ছাপেন নাই—বিশ্ববিদ্যালয়কে থেলো করিবার জন্ত কেহ নিজের নাক কাটিয়া এই কাণ্ড করিয়াছে!

পড়িতে পড়িতে ভূমিকার ১০ পাতায় যখন আসিলাম তখন পর্যন্ত স্থস্থির ছিলাম। ‘হুটির’ মজ্রাকর প্রমাদ বলিয়া মানিয়া লইতে

কষ্ট হইল না। কিন্তু দ্বাদশ পংক্তিতে পৌছিয়াই ‘দ্বাদশগোপাল’ দেখিয়া চমকিয়া উঠিলাম, বর্তমানে কোন শিক্ষিত লোক যিনি বহুকাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের চেয়ার দখল করিয়া ছিলেন, যিনি এম-এ ছাত্রদের পড়ান এবং পরীক্ষা করেন বাংলা সাহিত্যে গবেষক বলিয়া বাহার খ্যাতি আছে, ১০ লাইনের মধ্যে তিনি এতগুলি ভুল করিতে পারেন তাহা বিশ্বাস হয় না, এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সে পুস্তকও ছাপেন! যিনি ‘মক্ষলীপুত্র গোসাল’কে ‘মক্ষলীপুত্র গোশাল’ ‘অজিতকেশকক্ষলী’কে ‘অজিত কেশ কক্ষল’; ‘কোকুদ কচ্চয়ন’কে ‘ককুদ কচ্চয়ন’; ‘নিগুগ্ধগ্রাতপুস্তক’ ‘নিগুগ্ধ জাতি-পুত্র’ এবং ‘কথাবন্তু’কে ‘কথাবথু’ লিখিতে পারেন; অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের বিখ্যাত ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায় পুস্তকের সঠিক নাম আজিও যিনি অবগত নন তাহার পুস্তক পড়িতে আর প্রবৃত্তি হইল না। আরও দুই লাইন পরে যখন চোখে পড়িল এই পণ্ডিত প্রবর খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রণীত (বুদ্ধ ঘোষ) ‘কথাবন্তু’কে বিনা দ্বিধায় ৯ শত বৎসর পূর্বে অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে প্রেরণ করিয়াছেন তখন মনে হইল এ বঙ্গদেশে সকলই সম্ভব, সম্ভবদশ অস্বারোহী একদা বঙ্গদেশ দখল করিয়াছিল ইহা বোধ হয় সত্যই হইবে, হুতরাং আপনাদের সাধের ‘সুহৃৎ বঙ্গ’ আপনাদের ফেরত পাঠাইলাম। আপনারা অচ্ছ বাবস্থা করিবেন। ইতি.....

হুতরাং আমরা বিপদে পড়িয়াছি, একজন যোগ্যবান্ধি এই কাজ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন, দ্বিতীয় কাহাকেও না পাওয়া পর্য্যন্ত এই পুস্তকের উপযুক্ত সমালোচনা প্রকাশ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে। তথাপি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের ভয়ে আমরা পুস্তকের এখান ওখান

হইতে কিছু অসঙ্গতি প্রদর্শন করিয়াই এবারে ক্ষান্ত থাকিব, ভবিষ্যতে উপযুক্ত লোকে এই কার্যে হস্তক্ষেপ করিলে উপযুক্ত সমালোচনা শনিবারের চিঠিতে প্রকাশ হইবে।

ছাপার ভুল অসংখ্য। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকে এত ভুল অসম্ভব। ভূমিকা ৥০—‘মনে উদরই (উদয়ই) হইতে পারে না।’ ঐ ১—‘সমাজে এতবড় বিদ্রোহীর (বিদ্রোহের) স্বর...’ গড়পড়তায় পৃষ্ঠায় ১টি করিয়া একরূপ ভুল আছে। ভূমিকা ১/—‘শয্যা-বিলাসীর গল্প বাংলার গল্প নয়, অথচ এই সকল গল্পকে উপলক্ষ করিয়া লেখক বাঙালীর ‘অসীম’-প্রিয়তাকে জয়যুক্ত করিয়াছেন।’ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বেতাল পঞ্চবিংশতির সহিত লেখকের পরিচয় থাকিলে জানিতে পারিতেন গল্পটি আসলে উত্তর পশ্চিম ভারতের আমদানি।

ঐ ১০—‘আলেকজেন্ডার’ নয় আলেক জাগার। ঐ ১১—‘যে সমুদ্রগুপ্ত আসমুদ্র হিমাচল জয় করিয়াছিলেন’—সমুদ্রগুপ্ত কখনই আসমুদ্র হিমাচল জয় করেন নাই। সমুদ্রগুপ্ত হইতে পলাসীর যুদ্ধ ইতিহাসে একরূপ বিপর্য্যয় লাক ইতিপূর্বে দৃষ্ট হয় নাই। অহুপ্রাসের অহুগ্রহ!

ঐ ১১/—বান্ধলার রাজভক্তি ও জনসাধারণের প্রভুভক্তি লইয়া সেন মহাশয় একটি নিবন্ধ লিখিয়াছেন। ‘জগতের ইতিহাসে ছুপ্পা’—এমন করিয়া লিখিতে পারিলে ছুপ্পা কিছুই নয়!

ঐ ১১৮—কৃষ্ণের সহিত হিন্দুর তুলনা—উপমা দীনেশসেনজ। ‘যে মর্ধ্যান্তিক অত্যাচারের ফলে কৃষ্ণ স্বাভাবিক নিয়মসম্মত তাহার পৃষ্ঠে দৃঢ় আচ্ছাদনের সৃষ্টি করে, হিন্দুরাও সেইরূপ অত্যাচারে বহির্জগতের সঙ্গে সন্ধ ঘেঁষে করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন।’ কৃষ্ণ আচ্ছাদনের সৃষ্টি করে, মাছুষ গ্রাসাচ্ছাদনের সৃষ্টি করে। তফাৎ বেশি নাই।

ঐ ১৮/—‘সনাতন’ ও রূপ—তিক্তকায় বনফল খাইতেন এবং চৈতন্যচরিতামতে লিখিত আছে—তাঁহার জ্ঞানের কোন একটি বৃক্ষের নীচে শুইলে পাছে সেই স্থানটির প্রতি আসক্তি জন্মে, এই জ্ঞান নিত্য নূতন বটবৃক্ষের নীচে শুইতেন।’ শুধু সনাতন সম্বন্ধে এই কথা লিখিত আছে, রূপ সম্বন্ধে নয়।

বীর হাধীর—‘হাধির’ নয়।

ঐ ১৯/—‘মাদাম দি লাকেয়েতি (Madam de Lafcitye’ নয় Countess de La Fayette. হায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

ঐ ১৯/—“পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কারের”—বিভালঙ্কার—তর্কালঙ্কার নয়, ভ্রমলোক দীনেশ সেন এই ভুল আজ ৫০ বৎসর ধরিয়া করিয়া আসিতেছেন।

‘সকৌর্জ’ ?

ঐ ১৮/—১৮০ ও ১৮০০ পৃষ্ঠায় সেন মহাশয় যে সকল পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন তাহার একটি তালিকা প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু এমনই তাহার গবেষণা-জ্ঞান যে পুস্তকগুলির ও লেখকের যথার্থ নাম পর্যন্ত তিনি দিয়া উঠিতে পারেন নাই। “রামতল্লাহ্‌ লাহিড়ী ও তৎকালিক বঙ্গীয় সমাজ” নয় “রামতল্লাহ্‌ লাহিড়ী ও তৎকালীন—বঙ্গসমাজ।” ডাক্তার রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত ‘প্রাচীন বাঙ্গালার ইতিহাস’ নয়—মণীন্দ্রমোহন বহু প্রণীত ‘সহজিয়া-সংক্রান্ত পুস্তক’ নয়। ঠগ বাছিতে গা উজাড়—কত নাম করিব ?

ঐ ১৮০/—‘বিজনরাজ চ্যাটার্জি’—চট্টোপাধ্যায় নন, ‘বিমানচন্দ্র মজুমদার’ নয় ‘বিমানবিহারী মজুমদার।

ঐ ১৮০/—“তাঁহার বহুসংখ্যক পার্শ্বদগণের জীবনী”—‘পার্বদ’ বানান

এখনও রপ্ত হয় নাই। এই পৃষ্ঠায় একটি মাত্র সত্যকথা আছে তাহা এই—

“এমন দেবতার নৈবেদ্য নাই, যাহাতে চক্ষুর আঘাত না করিয়াছি।” আশ্চর্য্য, তবু সেন মহাশয় এখনও ‘সাহিত্য চক্ৰ’ উপাধি পান নাই !

ঐ ২/—বেচারিা ডাঃ এনামুল হক—তিনি ‘এনামুল হক’ হইয়াছেন, পিতৃপুণ্ডা এখনও এনামেল হন নাই !

ঐ ২৮-১০—ভাষাতত্ত্বের যে গভীর গবেষণার দ্বারা সেন মহাশয় যাবার বরোবদর (বদর বদর !) কে বাড়বজ্ঞ প্রমাণ করিয়া ঢাকার বজ্রযোগিণীর সহিত সম্বন্ধযুক্ত করিয়াছেন তাহা পড়িলে অশ্রু স্রবণ করা যায় না, সভারের চন্দন বৃক্ষও আমাদিগকে প্রায় কাঁদাইয়া ছাড়ে। কিন্তু ‘বড়োবদর’ তিনি কোথায় পাইলেন ? আমরা তো বোরোবদর বলিয়াই জানি।

ঐ ২৯/—‘কুমুর নৃত্য অপাংক্তের ছিল।’ সেকালে কুমুর নৃত্য অপাংক্তেয় ছিল না।

ঐ ২৯/০—‘মহেশ’ নয় মাহেশ।

ঐ ৩/০—সেন মহাশয়, পুত্র বিনয়ের নিকট হীনযান মহাযান সম্বন্ধে যে আলোচনা শুনিয়াছেন তাহা বার্ককাহেতু গুলাইয়া ফেলিয়াছেন। ‘মহাযান’ ‘হীনযান’ অপেক্ষা প্রাচীন। সম্বন্ধ ‘পুণ্ডরীক (mixed Sanskrit) লেখা হইলেও) হীনযান গ্রন্থ, মহাযান গ্রন্থ নহে।

অসময়ে মনুহন নামাতে এবারে ‘বৃহৎ বঙ্গ’ অভিযানে আমরা মাত্র এক নম্বর ক্যাপ্পে পৌছিয়াই থামিয়া গেলাম—ভবিষ্যতে আর কতদূর অগ্রসর হইতে পারিব তাহা ভবিষ্যতের আবহাওয়ার উপর নির্ভর করিতেছে।

চলচ্চিত্র

দোকানীর সাবধানতা



যদি সত্যই কেহ রাপ চাহে!

শনিবারের চিঠি

১১৩৩

প্রাচীরে বিজ্ঞাপন



সর্বদা স্বকল প্রদান করে না।

অতীত ও বর্তমান (১)



অবস্থাভেদ

অতীত ও বর্তমান (২)



জাতিভেদ

সংবাদ সাহিত্য

সাপ্তাহিক কাগজ অগ্রগতি সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন, শ্রীযুক্ত বিদ্যুৎশেখর শাস্ত্রী বা শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের লেখা-প্রবন্ধ সাহিত্য নহে, অর্থাৎ পড়িয়া আনন্দ পাওয়া যায় না। আমরা এতদিন পরে উক্ত অগ্রগতির লেখক সম্বন্ধে নিশ্চিত হইলাম। শাস্ত্রেও বলে, "Better late than never"। অর্থাৎ বিলম্ব সাহিত্য বিষয়ে জ্ঞান যে উক্ত লেখকের একটু দেরীতে হইল তাহাতেও আমরা স্তুতী হইয়াছি। আমরা জানি শাস্ত্রীমহাশয় বা সুনীতিবাবু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন, ইহা যদি অগ্রগতির বোধশক্তিকে অতিক্রম করিয়া গিয়া থাকে তাহা হইলে সে দোষ উহাদের লেখার মধ্যে নাই, দোষ রহিয়াছে পাঠকের মধ্যে। গবেষণামূলক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পড়িয়া অগ্রগতি লিখিতেছেন, "...তা কেউ পড়ে আগাগোড়া হৃদয়ঙ্গম করেছেন বা আনন্দ পেয়েছেন বলতে পারেন?"—যদি ইহার উত্তরে বলি, আনন্দ পাইয়াছি, তবে তাহা প্রমাণ করিবার উপায় নাই। সেইজন্য গোটাকত কথা বলা প্রয়োজন। সকলেই জানেন, শাস্ত্রীমহাশয় বা সুনীতিবাবু কবিতা লেখেন না; তাঁহার গল্প বা উপন্যাসও লেখেন না; জি. কে. সির মত প্রবন্ধ লেখেন না, পঞ্চভূতের ভায়েতির মত ভায়েরি লেখেন না। কাজেই ইহাদের রচনা বিলম্ব সাহিত্য নহে, 'applied' সাহিত্য। 'Applied' সাহিত্য মানেই উদ্দেশ্যমূলক, অর্থাৎ সাহিত্যের মধ্যস্থতায় তাঁহার অল্প কিছু বলিতে চাহেন। বিলম্ব সাহিত্যে সার্বজনীন আনন্দ, applied সাহিত্যে আনন্দ সার্বজনীন নহে। প্রথমটিতে কিছুই প্রচার করা হয় না, দ্বিতীয়টি প্রচার করিবার জন্যই রচিত।

সুতরাং চটু করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়া আনন্দলাভ করিবার জন্য কেহই পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ পড়েন না। শাস্ত্রীমহাশয় বা সুনীতিবাবু বৈজ্ঞানিক বা পণ্ডিত নামে খ্যাত, "সাহিত্যের দিকপাল" বলিয়া খ্যাত নহেন, যেমন অগ্রগতি নিজের সুবিধার জন্য অহুমান করিয়া লইয়াছেন।

অগ্রগতির নিজেরই সাহিত্যের সংজ্ঞাবিষয়ে স্পষ্ট ধারণা এতদিন ছিল না, কিন্তু মনে হইতেছে এই উপলক্ষে নিজের অজ্ঞাতসারেই তাঁহার মনে একটি প্রশ্ন জাগিয়াছে। অর্থাৎ তিনি বুদ্ধিতে পারিয়াছেন যে সুনীতিবাবুর লেখা পড়িয়া আনন্দ পাওয়া যায় না। চটু করিয়া মন মজে কিনা পরীক্ষার জন্য রোমাঞ্চকর ডিটেকটিব উপন্যাস পড়িয়া দেখিতে পারেন।

অগ্রগতি শাস্ত্রীমহাশয় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,

বহু ভাষাবিৎ ও মহাজ্ঞানী বলে শুনেছি। কিন্তু আমরা তাঁর ব্যক্তিগত জ্ঞানের কথা শুনে নিশ্চিত থাকবো কি করে? তিনি কি দিয়েছেন দেশকে? দুদশটা অতি সাধারণ প্রবন্ধ যা তিনি লিখেছেন তা আর পাঁচ জনেও লিখতে পারত বলেই আমাদের বিশ্বাস।

এরূপ হইয়া থাকিলে দেশের উন্নতি হইয়াছে বলিতে হইবে। কারণ শাস্ত্রীমহাশয় বহুবর্ষ ধরিয়া গবেষণা করিয়া যাহা লিখিতেছেন, অগ্রগতির লেখক বিনা সাধনাতেই সেরূপ লিখিতে পারেন বলিয়া ধারণা হইয়াছে। তাহা হইলে ইহা শাস্ত্রীমহাশয়ের দোষ নহে, দেশের সৌভাগ্য। এরূপ সৌভাগ্য হইলে অর্থাৎ ডেভিলের সংখ্যা বাড়িয়া গেলে, দেবতাগণ স্বভাবতই সেখানে আসিতে সঙ্কোচবোধ করিবেন, সুতরাং আন্দোলন চলিতে থাকুক।

স্বভোঠাকুর নিজে লিখিতেছেন, সৃষ্টির বেদনা তাঁহার কেবল আরম্ভ হইয়াছে। এদিকে নীলিমা দেবী প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন, স্বভোঠাকুরের সৃষ্টি যাবতীয় সৃষ্টিকে হঠ্, হঠ্ করিয়া ফিরিতেছে। কিন্তু আমরা স্বয়ং ঠাকুরের কথাই বিশ্বাস করিতে চাই—

সৃষ্টির বেদনা মোর সর্ব্ব অঙ্গ ঘিরে
জর্জরিত যন্ত্রণায় মরিতেছে কিরে
এ নিখিল ভুবনেতে ভূমিষ্টের লাগি
অস্থির উন্মুগ চিত্তে কাঁদে জন্ম মাগি।

ইহার প্রথম অর্থ এই যে 'বেদনা' স্বয়ং জন্মলাভ করিবার জন্ত কাদিতেছে। দ্বিতীয় অর্থ এই যে 'জন্ম-মাগি' স্বয়ং ভূমিষ্ট হইতে চাহিতেছে। জন্মনের অর্থ বুঝিতেছি বটে কিন্তু সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না। স্বভোঠাকুর যদি বহুপ্রসবী হন তাহা হইলে নীলিমা দেবীর কথা বিশ্বাস করায় আর কোন বাধা থাকে না।

—

ভারতবর্ষের 'জলেনি আলো অন্ধকারে' নামক গল্পের এক অংশ আছে—

প্রায় প্রতি রবিবারেই নন্দাবাবুর বাড়ী মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ থাকে, তা ছাড়া যখন তখন চা পান ত আছেই। এখন হইতে আমার আহারের ও জীবনের স্বাদ একেবারে বদলাইয়া গেল।

একটুখানি চা খাওয়ার মধ্যে, ছোটো ফল ও মিষ্টান্ন চর্ষণের ভিতর যে এতখানি আনন্দ নিহিত থাকিতে পারে, ইহা পূর্বে কোনও দিন কল্পনা করি নাই। অন্নবান্ধন যে কেবলমাত্র করস্পর্শে অমৃত হইয়া উঠিতে পারে ইহা ধারণা করা আমার...পক্ষে

প্রায় অসম্ভব ছিল।...বহুকাল পরে রসনায় আমার গাড়েয়ালি চাকরের রান্নার স্বাদও অকস্মাৎ যেন মধুর লাগিল।

আপিসে সমস্তক্ষণ মনের ভিতর যেন গান বাজিতে থাকে...পিয়ানোর ধ্বনি কানে যেন মধু ঢালিয়া দেয়।...আপিসের কাজে এমন একটা অদৃষ্টপূর্ব্ব উৎসাহ আসিল, যাহা পূর্বেকার ওদাগ্রের বিপরীত। ইদানিং আমার স্বভাবটা কেমন যেন খিটখিটে হইয়া গিয়াছিল, সহসা সেখানে এমন একটা উদারতা আসিয়া ইহাকে রসসিক্ত করিয়া দিল...সমস্ত অতি পুরাতন একঘেয়ে ঘটনা আমার চোখে সম্প্রতি নূতনতর হইয়া উঠিল। চারিদিকের সমস্ত কিছুই সুন্দর ও সার্থক...গৃহে ফিরিবার জন্ত একটা অভূতপূর্ব্ব আকর্ষণ...

এত কথা না লিখিয়া লেখক যদি কেবলমাত্র বলিতেন, 'প্রেমে পড়িয়াছি' তাহা হইলে এরূপ অবস্থায় যাহা যাহা হয় সবই বুঝিতে পারিতাম, কারণ এত চেষ্টা সম্বন্ধে লক্ষণাদির প্রায় বারো আনা বাদ গিয়াছে। ইহাতে প্রমাণ হয়, হয় লেখক প্রেমে পড়েন নাই, না হয় নিজের মন বিশ্লেষণ করিবার ক্ষমতা হারাইয়াছেন। বর্ত্তমানে এরূপ বিবরণ অচল।

উক্ত লেখককে সংশোধন করিয়া আমরা প্রেমে-পড়া মনের একটি বর্ণনা দিতেছি—

অকসিৎ বসিয়া অকারণ আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা হয়, পিয়ানোর ধ্বনি কানে আসিতেই আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা হয়, পুরাতন একঘেয়ে জীবন পরণ করিলেই আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা হয়, অন্নবান্ধন দেখিলেই আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা হয়,

গাড়োয়ালি চাকরের রান্না স্বরণ করিলে আশ্চর্য্য করিতে ইচ্ছা হয়....।

মোটকথা, সর্লক্ষণ সর্ববিষয়ে আশ্চর্য্য্য করার ইচ্ছা না হইলে তাহাকে আমরা খাটি প্রেমোপড়া বলিব না। উক্ত লেখক ডেজাল চালাইয়াছেন।

—

বেতারে সিনেমা-সংবাদ ব্রডকাষ্ট করিবার ব্যবস্থা আছে। 'যিনি এ কাজ করিয়া থাকেন তাঁহার বেতন অমৃতবাজার পত্রিকার মতে মাসে ত্রিশ টাকা। সপ্তাহে একবার করিয়া সিনেমা সংবাদ দিতে হয়। সংবাদদাতার বেতন যাহাতে বৃদ্ধি পাইয়া তিনশত কিংবা চারিশত টাকা কিংবা আরও বেশি (?) হয় সেজন্য অমৃতবাজার পত্রিকা খুব একটোটি ওকালতি করিয়াছেন, কিন্তু কোঁকের মাথায় তাল ঠিক রাখিতে পারেন নাই। কারণ তাঁহাদের মতে "We are told that the cinema comments are made from the Calcutta Station by a man who draws a paltry salary of about Rs. 30 per month and we have no hesitation in taking the strongest objection to this practice, because a man who is so ill-paid can be easily made use of by interested parties to have their own business purposes served."

অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক মাসে কত পান জানি না, তবে পত্রিকার জন্ম-সময়ে যাহারা সম্পাদক ছিলেন তাহারা নিশ্চয় স্বল্প হইতেই প্রত্যেকে ত্রিশ টাকার বেশি পাইয়াছেন। তাহা না হইলে জার্মালিঙ্কমে একপ সততা সম্ভব হইত না। পত্রিকার প্রত্যেকটি সংবাদ যাহাতে নিদোষ হয় সেজন্য পত্রিকা প্রত্যেক সংবাদদাতাকেও প্রতি সপ্তাহে নিশ্চয়ই ত্রিশ টাকার বেশি দিয়া থাকেন। ন্যূনপক্ষে কত টাকা

পর্য্যস্ত বেতন লইয়াও সাধু থাকা যায় তাহা প্রকাশ করিয়া পত্রিকা আমাদেরকে বাধিত করিবেন।

—

'মোহাম্মদী' পত্রিকার 'টেকস্টবুক' সম্বন্ধে আলোচনার প্রতিবাদ করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ এবং নিজের কৈফিয়ৎও ছড়ার সবিনয়ে পেশ করিয়াছেন।

মা করিলেই বোধ হয় ভাল হইত। নিজের মর্যাদা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং হয়ত অচেতন; কিন্তু দেশবাসী তাহাকে dignityর উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, সেখান হইতে তিনি নামিয়া আসিলে তাহাদের মাথা হেঁট হয়।

তবু এই কৈফিয়ৎ সম্বন্ধে আমরা কোনো কথা বলিতাম না, যদি না উহার প্রতি ছত্রে এমন কাতর মিনতি ও প্রতিপক্ষকে তুষ্ট রাখিবার আকুল আগ্রহ পরিশুট হইয়া উঠিত। তাঁহার কৈফিয়ৎ শুনিয়া, ব্যাঙ্গের দ্বারা অজ্ঞান জাগ-শিশুর কাকুতিপূর্ণ মুক্তি মনে পড়িয়া যায়।

—

প্রতিবাদ করিতে হইলেই তেরিয়া ভাবে গালি-গালাজ করিতে হইবে এমন কোনো কথা নাই; কিন্তু একেবারে 'শ্রীচরণের ছাঁচ' হইয়া যািতে হইবে—এতটা বিনয় রবীন্দ্রনাথের পক্ষেও অশোভন। পূর্বেও রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যিক মোরগের লড়াইয়ে অবতীর্ণ হইয়াছেন, কিন্তু এত সঙ্কচিত সমস্ত ভাব তাঁহার আর কখনো দেখি নাই। মনে হয়, তাঁহার জ্ঞান কেবলমাত্র সাহিত্য-গত নয়—বাজিতগত।

—

কিসের ভয়? রবীন্দ্রনাথ বয়সে প্রধান, সাবধান হইয়া কথা বলিতে জানেন। কিন্তু যেখানে বক্তব্য বিষয়-সম্পর্কীয় সমস্ত মুক্তি

প্রমাণ ছাপাইয়া কেবল প্রতিপক্ষকে খুশী রাখিবার প্রয়াসেই উদ্দেশ্য হইয়া উঠিয়াছে সেখানে সাবধানতার মাত্রা কিছু অতিরিক্ত তাহা স্বীকার করিতে হইবে। প্রতিপক্ষ মুসলমান বলিয়াই কি রবীন্দ্রনাথের এই ভ্রাস? তনিয়াছি, জীবন যত দুরাইয়া আসে জীবনের স্পৃহাও তাহার বিপরীত অল্পপাতে বাড়িতে থাকে, রবীন্দ্রনাথ কি অপমৃত মৃত্যুর ভয়ে শিহরিয়া উঠিতেছেন? তবে এই প্রতিবাদ করিবার প্রয়োজন ছিল কি?

নিজের অপরাধ লঘু করিবার অনেক চেষ্টা রবীন্দ্রনাথ করিয়াছেন। কেবল মুসলমানই তাহার খুঁত ধরে এই অপবাদ ফালন করিবার জন্ত তিনি হিন্দুদেরও টানিয়া আনিয়াছেন। এখানে তিনি নির্ভীক। বাঙালী কবে তাহার কি নিন্দা করিয়াছে, বাংলাদেশটা কিরূপ জঘন্ট স্থান সে সন্দেহে বিশদভাবে লিখিতে তাহার সন্কেচ হয় নাই। কারণ তিনি জ্ঞানেন, বাঙালী হিন্দু বিরক্ত হইলে নিন্দাই করিবে, ছুরি বসাইবে না।

পরিশেষে রবীন্দ্রনাথ বেশ ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন যে তাহার অল্পযোগ কেবল একটি মাত্র মুসলমানের প্রতি—অর্থাৎ ‘মোহাম্মদী’র উক্ত প্রবন্ধের লেখকের প্রতি। অল্প কাহারও বিরুদ্ধে তাহার কোনো অল্পযোগ নাই, এমন কি ‘মোহাম্মদী’ সম্পাদকের বিরুদ্ধেও তাহার কোনো নালিশ নাই। সম্পাদক অবশ্য অল্পমোদন করিয়াই প্রবন্ধটি ছাপিয়াছিলেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাহাকেও অব্যাহতি দিয়াছেন। এই উদারতা ‘মোহাম্মদী’ সম্পাদক অবশ্যই উপভোগ করিবেন।

প্রশংসাক্রমে ছিয়াত্তর বর্ষীয় রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—‘আমি যে ধৃতরাষ্ট্র নই সে কথা প্রমাণ করা এতই সহজ যে আমি চেষ্টাও করব না।’

আমাদের কিন্তু সন্দেহ দূর হইতেছে না। তিনি যে মোহাম্মদ ধৃতরাষ্ট্র নন তাহা রবীন্দ্রনাথ চেষ্টা করিলেও প্রমাণ করিতে পারিবেন কি?

জ্যোষ্ঠের ‘ভারতবর্ষে’ ‘স্বরের জন্ম’ নামক একটি ছবি দেখিয়া আমরা পরম পুলকিত হইয়াছি। স্বরের মা দাড়াইয়া আছে, তাহার পদতলে সংলগ্ন পাঁচটি হোস্ পাইপ দিয়া স্বর জন্মলাভ করিতেছে। পাইপগুলির প্রান্তভাগ দেখা যাইতেছে না, তবে অল্পমান করিতেছি পৃথিবীর পাঁচটি বিভিন্ন দেশে ইহার পাঁচটি প্রান্তভাগ গিয়া পৌছিয়াছে।

‘বৃহৎ বদ’ গ্রন্থদ্বয় যে উপক্ৰাস তাহার আর একটি প্রমাণ পাওয়া গেল ডক্টর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার এম-এ, পি-এইচ ডি লিখিত সমালোচনা হইতে। ইনিও আমাদের মত সমর্থন করিয়াছেন। আমরা ‘ভারতবর্ষ’ হইতে কয়েক লাইন উদ্ধৃত করিতেছি—

প্রতিপদে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কষ্টপাথরে মূল্য যাচাই করিয়া অথবা সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ দ্বারা সত্যমিথ্যার পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া তিনি (ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন) অগ্রসর হন নাই। স্বতরাং তাহার কোন্ কোন্ মত অগ্রাহ হইবে—কোন্ কোন্ মত গ্রাহ হইবে—তাহার বিচারের ভার ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকের হস্তেই ছাড়িয়া দিয়াছেন। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, “আমার এই পুস্তক ভাবী ঐতিহাসিকগণের পক্ষে একখানি পাদপীঠরূপে গণ্য হইলে যথ্য হইবে।

দীনেশবাবু বুদ্ধি করিয়া যাহা বলিয়াছেন, রমেশবাবু বিনয়বশত তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। অর্থাৎ ‘বৃহৎ বন্ধের’ কোন কোন মত গ্রাহ্য হইবে না, তাহা বর্তমান কোনও ঐতিহাসিকই স্থির করিতে পারিবেন না, একমাত্র যিনি পারিবেন তিনি ভবিষ্যতের ঐতিহাসিক। আমরা মনে করিয়াছিলাম বর্তমানেরও একরূপ ঐতিহাসিকের দেখা মিলিবে।

আমাদের জনৈক শ্রদ্ধেয় গ্রাহক দেৱাতুল হইতে আমাদের পত্রিকার ত্রিভঙ্গ্য করিয়া এক চিঠি দিয়াছেন। ঘটনাটি এই : আমরা যখন ডি. পি. পাঠাই তখন তাহার টাকা পোটল্লের হইতে আসে। ইহাই নূতন ঠিকানা মনে করিয়া তদবধি আমরা নিয়মিত আন্দামানে কাগজ পাঠাইতেছিলাম। কিন্তু তিনি লিখিয়াছেন—

গত দুইমাস আপনারা আমার নামের শনিবারের চিঠি আন্দামান পোটল্লের হইতে ঠিকানায় কেন পাঠাইয়াছিলেন তাহার কারণ বুঝিলাম না। সেখানে হইতে ঠিকানা কাটিয়া দেওয়ায় মাসখানেক দেৱীতে আমি পত্রিকা পাই। আমি দুইতিন মাসের জন্ত ফেক্সবারি মাসে সেখানে টুরে গিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু আপনাদিগকে কোনও ঠিকানা পরিবর্তন করিতে চিঠি দেই নাই। এ অবস্থায় আপনারা বুদ্ধি (বা ভদ্বিপরীত) খাটাইয়া আমাকে কষ্ট দিয়াছেন। আশাকরি আপনাদের কর্মচারীরা ভবিষ্যতে একরূপ অনাবশ্যক অতিবুদ্ধির পরিচয় না দিয়া পত্রিকা আমার নির্দিষ্ট ঠিকানাতেই পাঠাইবেন। ইতি ভবদীয় শ্রী—
যিনি পত্রিকা ডেম্প্যাচ্ করেন তাহাকে আমরা ইহার কৈফিয়ৎ তলব করিতে তিনি বলিলেন—“কেন, আন্দামানে একবার গেলে ত

দশ বছরের নীচে কেউ ফেরে না, সেই ধারণাতেই কাগজ সেখানে পাঠাচ্ছিলাম।”—এরূপ কৈফিয়ৎ শুনিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমাদের শ্রদ্ধেয় গ্রাহক এজ্ঞা আমাদের কক্ষ করিবেন; আমরা ডেম্প্যাচিংএর ভার এখন হইতে নূতন লোকের হাতে দিলাম।

বাংলাভাষা রাষ্ট্রভাষা হইতে পারে কিনা এ বিষয়ে চিন্তা করিতেছিলাম, ইতিমধ্যে শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার ঘোষ নামক আমাদের জনৈক পাঠক পাটনা হইতে স্বরাষ্ট্রনায়কদের হাতে বাংলাভাষা কিরূপ উৎকর্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহার একটি নমুনা পাঠাইয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন, “বহু বর্ষ পূর্বে Strand Magazine এ “English as she is spoke” শীর্ষক একপ্রকার নমুনা বাহির হইত, এবং তাহাতে ভারতবর্ষ এবং চীনদেশের প্রতি বিশেষ করিয়া কটাক্ষপাত করা হইত। অধুনা বিহারে বিজ্ঞাপনী বাংলা কিরূপ উৎকর্ষলাভ করিয়াছে তাহার একটি বিশিষ্ট নমুনা আপনার নিকট প্রেরণ করিতেছি। আশা করি বিজ্ঞাপনদাতার বাংলাভাষায় প্রগাঢ় ব্যাপ্তির পরিচয় পাইয়া চমৎকৃত হইয়া যাইবেন।”

পলেস আফ ভেরাটীজ

শনিবার ৪ টা জনবরী হইতে পরাতন সন্ধ্যা সাড়ে ছব টা বা

সাড়ে নব টা রবিবার মার্টনী ১১ ০টা

ইয়ট ইনডিয়ন ফিলমেসর সরেঘট দান।

বিত্তোহী

সরেঘটাগ—বহীনচন্দর চৌধুরী, তুমন রায়, জাশনা ও ডলি।

যহ রাজপুতানা স্বারন রামাচকারী বা পরেম কাহানীর ত্রুততি অপ্তরব চিত্তর ততসহ পরাইসন।

(রাতকানা) দেখনা হইবে।

১৪ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের অগ্রদূতে 'চল্টি' শীর্ষক রচনার দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফে পুস্তকঘাটে বয়ীষসী মেয়ের মুখে যে কথাগুলি দেওয়া হইয়াছে এবং যে কথা লেখক শুনিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—
এ কথাগুলি প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে রচিত রসিক রায়ের পাঁচালি হইতে চুরি। লেখক একটা মিথ্যা গল্প না ফাঁদিয়া রসিক রায়ের নাম করিলেই ভাল করিতে।

জ্ঞানেক আটিষ্ট বলিতেছেন—

“যে সব লোক বেশী কাপড় পরে’ অঙ্গের গঠন লুকিয়ে রাখেন তাঁরা মাছুষ খুন করতে পারেন।” ঠিক কথা, কারণ statisticsএ দেখা যায় যে, প্রায় সকল নরঘাতকই কাপড় পরিয়া মাছুষ খুন করিয়াছেন। উল্লেখ অবস্থায় নরহত্যা হইলে নরহত্যা অচিরাত্ বন্ধ হইয়া যাইত। ইহা ছাড়া যাহারা নরহত্যায় বিশ্বাস করেন না তাহারা প্রায় সকলেই অল্প কাপড় পরেন অথবা কিছুই পরেন না। যথা—সন্ন্যাসী, যোগী, মহাত্মা প্রভৃতি।

এই সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধ ‘আনন্দবাজার পত্রিকায়’ ও পরে ‘ভগ্নদূতে’ প্রকাশিত হইয়াছে। আবার সংখ্যা প্রবাসীতে প্রকাশিত ‘সাম্প্রদায়িক সাহিত্য’ নামক রচনা হইতে দুইটি প্যারাগ্রাফ এই সংখ্যায় প্রকাশিত ‘সাহিত্য ও সাম্প্রদায়িকতা’ নামক প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এই প্রবন্ধ সম্পূর্ণভাবে ভগ্নদূতেও প্রকাশিত হইল।

গত সংখ্যায় ‘শনিবারের চিঠিতে’ প্রকাশিত নাটকের’ তালিকায় মানময়ী গালস্‌ স্কুলের উল্লেখ ছিল, কিন্তু তখন লিখিতে ভুল হইয়াছিল যে উক্ত নাটকটি মেগাকোন কোম্পানি কর্তৃক রেকর্ড করা হইয়াছে।

রামপ্রাণ গুপ্ত-স্মৃতি-পুরস্কার

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের রামপ্রাণ গুপ্ত-স্মৃতি-পুরস্কার নির্বাচন-সমিতি কর্তৃক গত দুই বৎসরের মধ্যে বাংলার সামাজিক ইতিহাসের বিষয়ে বঙ্গভাষায় যে-সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে তন্মধ্যে শ্রীমুত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত “সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম—৩য় খণ্ড” এবং “বঙ্গীয় নাট্যশালায় ইতিহাস” সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহের দিক্ দিয়া শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় ব্রজেন্দ্রবাবু রামপ্রাণ গুপ্ত-স্মৃতি-পুরস্কার পাইয়াছেন। ব্রজেন্দ্রবাবু এই টাকা না লইয়া পরিষৎকে দান করিয়াছেন।

পুস্তক প্রসঙ্গ

টাকার কথা। লেখক শ্রীঅনাথগোপাল সেন, প্রকাশক মর্ডার বুক এজেন্সী; ১০, কলেজ স্ট্রার, কলিকাতা ক্রাউন অক্টোভো, ১১৭ পৃঃ মূল্য পাঁচ টাকা।

ইহাতে ‘রাজনীতি বনাম অর্থনীতি’, ‘স্বর্ণমান’, ‘ভারতে মুদ্রা-নীতি’, ‘আমাদের রেশিও সমস্যা’, ‘বর্তমান অর্থসঙ্কট’, ‘দেশীয় শিল্পের অন্তরায়’, এবং ‘যে দেশে টাকা নাই’—এই সাতটি স্থলিখিত প্রবন্ধ আছে।

যে টাকার সমস্যা আজ পৃথিবীতে যুগান্তর ঘটাইতেছে সে সমস্যা আমাদের সমস্যা নহে। আমাদের সমস্যা অন্তরূপ। টাকা

উপার্জন এবং তাহা খরচের যে সনাতন রীতিতে আমরা অভ্যস্ত তাহাতে অর্থ সমস্যা আমাদের নিকট অর্থাভাব জনিত সমস্যা ছাড়া আর কিছু নহে। স্বতরাং স্বর্ণমান বা মুদ্রানীতি সম্বন্ধে আমাদের কিছুমাত্র চিন্তা করিতে হয় না, এবং ঠিক এই কারণেই বাংলা ভাষায় যে ইহা চিন্তা করা যায় সে বিশ্বাসও আমাদের নাই। কিন্তু অনাথগোপালবাবু তাঁহার 'টাকার কথা' নামক গ্রন্থে প্রমাণ করিয়াছেন যে বাংলা ভাষা 'অর্থনীতি' আলোচনার পক্ষে কোন বাধাই সৃষ্টি করে না। বইখানি পড়িতে আরম্ভ করিলেই মনে হইতে থাকে যেন আমি হঠাৎ পৃথিবীর শক্তিমান জাতির একজন হইয়া তাহাদেরই সম-স্বত্বের চিন্তায় অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছি। এইরূপ গ্রন্থ বাংলা ভাষার গৌরব, এবং ইহার প্রচার যত অধিক হইবে ততই প্রমাণ হইবে বাঙালী গাঁটি বাংলা ভাষায় আধুনিক জগতের সংবাদ পাঠ করিতে আর লজ্জাবোধ করে না। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর ভূমিকাটি পড়িয়াও আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

লেনিনের সহিত ম্যাক্সিম গর্কি। অম্বুবাদক মণিলাল শ্রীমানী এম-এ, বি-এল। প্রকাশক, শ্রীকল্যাণময় শ্রীমানী, ২০ নবীন সরকার লেন, কলিকাতা। ক্রাউন অক্টেভো, ২০ পৃষ্ঠা, মূল্য এক টাকা।

এই-জাতীয় গ্রন্থ বাংলা ভাষায় প্রচারিত হউক এরূপ ইচ্ছা শিক্ষিত বাঙালীর মনে জাগিয়াছে। ইহা শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রচারের ইচ্ছাটাই প্রচারের সাফল্য সূচিত করে না। আলোচ্য গ্রন্থে অম্বুবাদের ভাষা আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়াছে, ইহাতে উদ্বেগ অনেকখানি বার্থ হইবে। বাক্যগঠনের ভঙ্গি ইংরেজি বাক্যভঙ্গির

অম্বুরূপ হইয়াছে; হুতরাং পড়িতে কষ্ট হয়। অম্বুবাদে আর একটু যত্ন লইলে বইখানিকে আমরা প্রশংসা করিতে পারিতাম।

'নাগিনী', 'হুত্য়ানিলানী'। বিচিত্র রহস্য সিরিজ, প্রকাশক শ্রীঅবলাকান্ত রায়, সিদ্ধেশ্বর প্রেস, ৩২৩ শিবনারায়ণ দাস লেন কলিকাতা। ক্রাউন অক্টেভো, পৃ: ১১০ ও ১১৫, মূল্য প্রত্যেক ৬ ও বারো আনা।

রোমান্সকর ঘটনাসম্বলিত ডিটেকটিব উপন্যাস। গল্প মৌলিক নহে, কিন্তু দেশী নাম প্রভৃতি দ্বারা বাংলাভাষায় পরিবর্তিত। পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া ছাড়া যায় না, মাত্র ইহাই এই-জাতীয় গ্রন্থের গুণ। ঘটনাগুলি মাঝে মাঝে অস্বাভাবিক না হইলে এবং লেখা আর একটু সংযত হইলে এগুলি উচ্চশ্রেণীর গল্প হইতে পারিত। আশা করি ভবিষ্যতে সম্পাদকগণ নূতন বইগুলি সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। ঘটনার পারস্পর্য্যে যদি বাস্তবতার অপরিহার্য্যতা না থাকে তাহা হইলে রোমান্স যতই হউক খুশী হওয়া যায় না।

দসেটিমলের তাঁবেদারী। লেখক শ্রীকপিলপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য। প্রকাশক, রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ২৫২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা। ১৬৬ পৃ: মূল্য ১।০।

প্রথমটি নাটিকা, বাকী সব ছোট গল্প। ইহাতে নিম্নলিখিত বারোটি রচনা আছে: দসেটিমলের তাঁবেদারী, বনোয়ারীলাল, বেকার, মহিলা মজলিস, গোবর্দ্ধন, বুড়ি বি, কমলি, ডাইনী, বুলাকিলালের ইচ্ছা, অপেরা বাধন, আশুতোষ, রেলইয়ার্ডের বক্ষপত্তরে।

'দসেটিমলের তাঁবেদারী' অভিনয়যোগ্য করিয়া রচিত। শিক্ষিত

বাঙালী যুবক ধনী মাড়োয়ারীর অধীন চাকরি লইয়াছে। বেতন দৈনিক আড়াই পয়সা। শিক্ষিত বাঙালী জীবনে বেকারত্বের যে ট্রাজেডি তাহাই এই নাটিকার উপরীষ্য। লেখক ইহারই উপর রং চড়াইয়া ট্রাজেডির উপাদানে ব্যঙ্গ সৃষ্টি করিয়াছেন। লেখকের চাবুকটি হস্ত-কৌতুকের আড়ালে প্রচ্ছন্ন আছে, কিন্তু তাহার আঘাত এড়াইবার উপায় নাই, হৃৎবেগ লজ্জায় প্রানিতে মন ঢকল হইয়া ওঠে। বাকী গল্পগুলির প্রায় সমস্তই ছোটখাটো ঘরোয়া স্বর্ণচুপের কাহিনী। লেখকের অল্পকম্পা, অসহায় নিঃশ্বের প্রতি সহায়কৃতি প্রত্যেকটি গল্পের মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। ‘বেকার’ গল্পটি অনেকগুলি খণ্ডচিত্রের মালা। দিবাস্বপ্নের মত লেখকের মনকে চিহ্নিত করিয়া একে একে চলিয়া গিয়াছে। এই গল্পটি অবাঙালী ও বাঙালী জীবনের contrast; জীবনের পাশে মৃত্যুর দৃশ্য; অতি করুণ এবং ভয়াবহ। যাহারা ছোট গল্প পড়িতে ভালবাসেন তাঁহাদের নিকট এই গল্পগুলির একটা বিশেষ মূল্য হইবে একথা নির্ভয়ে বলা যায়।

যৌনবিজ্ঞান। লেখক আবুল-হাসানান, আই. পি.। লেখক কর্তৃক প্রকাশিত। ডঃ গিরিশশেখর বহু কর্তৃক লিখিত ভূমিকা সম্বলিত ক্রাউন অক্টোভো, ৫০২ পৃঃ মূল্য পাড়ে চারি টাকা।

লেখক নানা দেশীয় যৌন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বহু পরিভ্রম সহকারে গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক আলোচনা অত্যন্ত সরল ভাষায় হৃদয় উদ্ভিত, লেখক এ বিষয়ে সকলকাম হইয়াছেন। ইতিপূর্বে যৌনবিজ্ঞান ইংরেজি ভাষাতেই নিবন্ধ ছিল, লেখক ইংরেজির গণ্ডি হইতে তাহাকে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছেন। তবে অস্বাভাবিক দেশে বিজ্ঞানের সকল বিভাগের পুস্তকই সেই দেশের ভাষায় রচিত

হয়, আমাদের দেশে এখনও সে অবস্থার উদ্ভব হয় নাই। কাজেই অস্বাভাবিক দেশে বিজ্ঞানের বহু বিভাগের মধ্যে যৌনবিজ্ঞান যেমন অদ্ব্যতন, বাংলাদেশে সেরূপ নহে। বাংলা দেশে ইহাকে একতম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। স্বতরাং যৌনবিজ্ঞান এদেশের সাধারণ পাঠক ঠিক বিজ্ঞান হিসাবেই গ্রহণ করিবে না, ইহাকে রস সাহিত্য বলিয়া গণ্য করিবে। স্বতরাং এই-জাতীয় গ্রন্থ সাধারণের মধ্যে প্রচারে সমাজের যথার্থ উপকার হইবে কিনা সে বিষয়ে আমাদের মন এখনও বিধাবিভক্ত হইয়া আছে।

মোগল যুগে স্ত্রীশিক্ষা। লেখক শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। স্ত্রীর যত্ননাথ সরকার, এম-এ, ডি-লিট-লিখিত ভূমিকা সম্বলিত। ক্রাউন অক্টোভো, ৪০ পৃষ্ঠা, মূল্য আট আনা।

গ্রন্থের প্রারম্ভে ব্রজেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, “মোগল আমলে ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ছিল না,—যেহেতু অজ্ঞান-তিমিরাক্ষম হইয়া মোগল-মহিলাগণ জীবনযাপন করিতেন, ইতিহাসে এ মত সমর্থন করে না।”

ব্রজেন্দ্রবাবু এই গ্রন্থে এই কথাই প্রমাণিত করিয়াছেন। বেগম গুলশদন, সলীমা সুলতান বেগম, মাহমুদ আনসা, নূরজাহান, মুমতাজ-মহল, জাহান-আরা, সিতা-উম্মিরা, জাহান-জেব-বানু, জেব-উম্মিরা, বদর-উম্মিরা, নূর-উম্মিরা এই এগারো জন মোগল-মহিলা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি ভারতবর্ষের স্ত্রীশিক্ষা-সম্পর্কে মোগল অন্তঃপুরের কথাই কেন বলিয়াছেন তাহার উত্তর-স্বরূপ লিখিয়াছেন, “মোগল যুগে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে আমরা সর্বাঙ্গে বাদশাহ-গণের অন্তঃপুরের সন্ধান লইতে চাই; কেননা সেখানেই অবরোধ-প্রথা আপনার প্রভাব পূর্ণমাত্রায় বিস্তার করিবার অবকাশ পাইয়াছিল।”

ব্রজেনবাবুর অলোচনা সম্পূর্ণ ইতিহাস-অনুসৃত, কল্পনা দ্বারা বা বাড়াইয়া বলিবার ঝোঁকে তিনি কোথাও সত্যকে বিকৃত করেন নাই, ভাষাও অত্যন্ত সঙ্গমপূর্ণ এবং সংযত। বইখানি গল্পের মত স্বথপাঠ্য হইয়াছে।

শ্রীপ্র—

শতচান্দ্রী (কবিতা সমষ্টি) শ্রীশান্তিপাল প্রণীত। মূল্য ৥০ আনা।

শান্তিবাবুর প্রথম কবিতাগ্রন্থ ছায়ায় সমালোচনার সময়ে বলিয়াছিলাম, শান্তিবাবু প্রকৃত কবি, কিন্তু তিনি যে বড় কবি তাহা প্রমাণের ভার তাঁহার উপরে রহিল। ইহা কবির দ্বিতীয় গ্রন্থ। ছায়াতে ছিল কেবল পল্লী-কবিতা। পল্লী কবিতায় কবির প্রকৃতি বোঝা যায়, কিন্তু আকৃতি বোঝা যায় না। বর্তমান কাব্যে পল্লী-কবিতা আছে, কিন্তু তাছাড়া কয়েকটি কবিতা আছে যাহা কোন পল্লী-কবির পক্ষে, কোন-আধুনিক-বাউলের পক্ষে কিম্বা কোন অত্যাধুনিক ময়মনসিংহ শ্রীতিরচয়িতার পক্ষে লেখা অসম্ভব। এই কবিতাগুলি পড়িয়া বর্তমান কবির কবি-প্রকৃতি ছাড়াও তাঁহার শক্তির আকৃতি সন্দেহে খানিকটা ধারণা করিতে পারিলাম। এই কবিতাগুলি কবির মনঃপ্রকর্ষের পরিচায়ক। পূর্বিমায়, কবি, বিদায় সঙ্গীত, আলো শীর্ষক চারটি কবিতায় যে বৈচিত্র্য আছে তাহা সরল পল্লীকবির শক্তির অতীত।

আমরা পূর্বেও বলিয়াছি, আবার বলিতেছি আধুনিক পল্লী কবিদের মধ্যে শান্তিবাবু শ্রেষ্ঠ। তিনি যে শিক্ষা শক্তি বা অভিজ্ঞতার অভাবে পল্লী কবিতা লেখেন তাহা নয়। ইচ্ছা করিলে তিনি মানবমনের

চিরন্তন ব্যাকুলতাকেও কাব্যে প্রকাশ করিতে পারেন, তাহার প্রমাণ উপরিউক্ত কবিতা চারটির নামে।

শান্তিবাবুর প্রথম গ্রন্থে ভাবের প্রসার দেখিয়াছিলাম, বর্তমান গ্রন্থে দেখিতেছি তাহা প্রশস্ততর হইয়াছে।

শ্রীপ্র—

“বন্ধু চিকিৎসা” : শ্রীঅপরূপ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

ভূমিকাতেই দেখিয়া স্তম্ভিত হইলাম, লেখক লিখিতেছেন, “আমি গর্ভের সহিত বলিতে পারি অতি অল্প ঘরেই আজ পর্যন্ত কেহই যক্ষ্মারোগাক্রান্ত হন নাই।” গর্ভ করিবার মত বিষয় বটে! লেখক দরিদ্র এবং নিজে একজন যক্ষ্মারোগী। সেজন্য তাঁহাকে চিকিৎসার জন্য নানাভাবে বিব্রত হইতে হইয়াছে এবং দরিদ্র যক্ষ্মারোগীগণের যাহাতে বৈজ্ঞানিক প্রণালী মতে শ্রানোটোরিয়মে থাকিয়া বিনা খরচায় স্বচিকিৎসা হয় তজ্জন্য তিনি অর্থসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহার পুস্তক বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়া তিনি শ্রানোটোরিয়ম স্থাপন করিবেন বলিয়া বিশ্বাস করেন। তাঁহার উদ্দেশ্য সাধু তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই—কিন্তু আমাদের বিশ্বাস কেবলমাত্র পুস্তক বিক্রয়লব্ধ অর্থে এই সংস্কার সাধিত হওয়া সম্ভবপর নহে। বঙ্গদেশে শিক্ষিত লোক কম। যে কয়েকজন আছেন তাঁহাদের মধ্যে “বন্ধু চিকিৎসা” পাঠ করিবার স্পৃহা ব্যাপকভাবে দেখা দিবে ইহা দুরাশা; দিলেও উদ্দেশ্য সফল হইবে কিনা সন্দেহ। লেখক রোগজীবনে যতপ্রকার দুঃখকষ্টের মধ্যে পড়িয়া যতপ্রকার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন তাহা এই পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। লেখক নিজে বোধহয় একজন হোমিওপ্যাথ। কারণ অ্যালোপ্যাথদিগের প্রতি হোমিওপ্যাথহুল্লভ উদ্ভা মাঝে মাঝে প্রকট

হইয়া পড়িয়াছে। যে মহৎ উদ্দেশ্যে পুস্তকখানি উৎসর্গীকৃত এই জাতীয় উদ্যম সে উদ্দেশ্য বার্থ হইবার সম্ভাবনা আছে। লেখক যক্ষারোগীগণের প্রতি নানারূপ উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু যক্ষারোগে ভুগিলেই যক্ষা চিকিৎসা সম্বন্ধে পারদর্শী হওয়া যায় না। যক্ষারোগের হুচিকিৎসা একমাত্র বিশেষজ্ঞগণই করিতে পারেন এবং সে বিষয়ে পরামর্শ দিবার অধিকার তাঁহাদেরই আছে। এই কথা লেখকের জানা উচিত ছিল। জানিলে নিম্নলিখিত রূপ উপদেশ দিয়া স্বধী-সমাজে হাস্যাস্পদ হইতেন না।

“আরোগের পর যক্ষারোগীদের বিবাহ করা উচিত কি না এই বিষয় লইয়া নানা মূনি নানা মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। আমার মনে হয় আরোগের অন্ততঃ পাঁচ বছর পরে যাহাদের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত উত্তম এবং যাহাদের অর্থের জ্বা কাহারও সাহায্য লইতে হইবে না বা চাকুরির উপর ভরসাও করিয়া থাকিতে হইবে না, কেবলমাত্র তাহারাই কহা-পক্ষের নিকট নিজের পূর্ব সমুদয় রোগবৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া স্বাস্থ্যবতী যুবতীকে বিবাহ করিতে পারেন এবং স্ত্রীকে প্রত্যেক বৈয়াকিক কার্যের সহকারিণী করিয়া যাহাতে উভয়ের কল্যাণ কোনপ্রকার স্বাস্থ্য ধারাপ না হয় তদ্ব্যবস্থাপন সাবধানতা অবলম্বন করিয়া উভয়ে উভয়ের পরম বদ্ধরূপে কালাতিপাত করিতে পারেন। স্ত্রী গর্ভবতী হইলে পর প্রতি সপ্তাহে ক্যালকোরিয়া কার্ড ৩০ শক্তি প্রসব না হওয়া পর্য্যন্ত থাইবেন...”

এইরূপে আট ঘাট বোধিয়া যক্ষারোগী আদৌ বিবাহ করিতে পারিবেন কিনা সে সম্বন্ধে আলোচনা না করিয়া ইহাই আমরা বলিতে চাই যে “যক্ষারোগীর বিবাহ করা উচিত কিনা” এই প্রশ্নের আলোচনা আমরা কোন বিশেষজ্ঞের নিকট হইতে শুদ্ধার সহিত

অনিতে প্রস্তুত আছি। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অনর্থক অনধিকার চর্চা করিয়াছেন।

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

ত্রিঙ্কল নদীর কুলে। লেখক শ্রীকান্তনী মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক, শ্রীতারাদাস মুখোপাধ্যায়, ১১-ই আরপুলি লেন, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

কবিতার বই। ইহার কিছু কিছু চিত্রাংশ পূর্বে প্রবাসীতে বাহির হইয়াছে। সমস্তটা মিলিয়া একটি করণ গল্প। কেরানি শহরে থাকে—স্রী থাকে দেশে। বহুকাল মিলন ঘটিতে পারে না। এইরূপ একটি বহু বাস্তবিক মিলন দুযোগে স্বামী দেশে গিয়া দেখিল স্রী মারা গিয়াছে, মৃতদেহ শ্মশানে আসিয়াছে। নায়ক তাহার সমস্ত বিবাহিত জীবনের স্মৃতি এই কবিতায় ব্যক্ত করিয়াছেন। বর্ণিত চিত্রগুলি চমৎকার হইয়াছে।

বাংলা বানান। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত—মূল্য দুই আনা।

তন্তব, তৎসম, দেশজ ও বিদেশী শব্দ সমূহ বাংলাতে একটি নিদ্ধিষ্ট বানানে লেখা হউক এই উদ্দেশ্যে বানান-কমিটী এই পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন। এতদিন পরে বাংলা শব্দের একটা বিশেষ রূপ আমরা সর্বত্রই দেখিতে পাইব ইহা কল্পনা করিয়া আনন্দ হইতেছে।

শনিবারের চিঠির বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত "সাহিত্য ও সাম্প্র-
দায়িকতা" শীর্ষক প্রবন্ধ নতুন বানানে লিখিত হইয়াছে।

— — —

হারমোনিয়ম কিনিতে হইলে ডোয়াকিনের হারমোনিয়মই কেনা উচিত

৫০ বৎসর ধরিয়া ডোয়াকিনের হারমোনিয়ম স্বরের মাধুর্য্য, গঠন,



স্বায়িত্ব ও অস্বাভাবিক শব্দের জন্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ
বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। অত্যা
হারমোনিয়ম কিনিবার পূর্বে একবার
ডোয়াকিনের হারমোনিয়ম সম্বন্ধে খোঁজ
করিবেন। নব-প্রকাশিত সচিহ্ন মূল্য-

তালিকার জন্ত আজই পত্র লিখুন।

সোনারো ডবল-রাড্‌ বক্স হারমোনিয়ম ৩ অক্টেভ, ৫ ষ্টপ বাক্সসহ
৩০ টাকা।

ডোয়াকিন এণ্ড সন্স

১১নং এসপ্রেনেড, কলিকাতা

ক্রিপারিল গোস্বামী এম-এ কর্তৃক সম্পাদিত ও রজন পাব্লিশিং হাউসের স্বত্বাধিকারী
ক্রিপারিলপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীসঞ্জীকান্ত দাসের পক্ষে ২৫১২ মোহনবাগান রো,
শনিয়ঙ্গম গ্রেস হইতে ত্রিগ্রন্থোপদান কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীমদ্রামকৃষ্ণচন্দ্র



৮ম বর্ষ]

আবণ, ১৩৪৩

[১০ম সংখ্যা

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বপ্নাঙ্কিত, স্বল্পলবক ও মাংসবাদিক হিসাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর
প্রথমার্দ্ধের বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি
বিশিষ্ট স্থান আছে। কিন্তু বাহারা এই যুগের ইতিহাস লিখিয়াছেন
তাঁহাদের নিকট ভবানীচরণ তাঁহার প্রাপ্য সম্মান লাভ করেন নাই। •
এক শত বৎসর অতীত হইতে-না-হইতেই আমরা তাঁহার কথা প্রায়
বিস্মৃত হইয়াছি।

• ভবানীচরণ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনামূলক দুই-চারিটি গ্রন্থ ইতিপূর্বে প্রকাশিত
হইয়াছে। সেগুলির তালিকা :-

(১) "ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়"—শ্রীঅমলাচরণ বিদ্যাসুধন। 'বাণী', জ্যৈষ্ঠ
১৩১৪, পৃ. ৩৭-৩৯। 'পঞ্চপুষ্প', ফাল্গুন ১৩৩৮, পৃ. ১৪৩৩-৩৪।

(২) S. C. Sanial: "History of the Press in India"—The
Calcutta Review for Jan'y. 1911, pp. 23-26.

(৩) S. K. De: "Some Old Bengali Books and Periodicals in
the British Museum"—The Indian Historical Quarterly, March
1926, pp. 54-55; March 1927, pp. 13-20.

আমার 'সাব্যাপদেশে সেকালের কথা' (১ম-৩য় খণ্ড) গ্রন্থে ভবানীচরণ সম্বন্ধে
অনেক জাতব্য কথা আছে।

ভবানীচরণ রামমোহন রায়ের সমসাময়িক; শুধু সমসাময়িকই নয় প্রবল প্রতিপক্ষও ছিলেন। রামমোহন যখন সহমরণ-প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত করেন, তখন ভবানীচরণ মসিযুদ্ধে তাঁহার সম্মুখীন হইয়াছিলেন। সহমরণ-নিবারণ-আইন জারি হইলে ভবানীচরণ এই আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিবার জন্ত এবং “স্বধর্ম ও সদাচার ও সম্বাবহারাদি রক্ষার্থ” ধর্মসভা নামে সমাজ-স্থাপনে অগ্রণী হইয়াছিলেন এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এই সভার সম্পাদকের কার্য বিশেষ কৃতিত্বের সহিত সম্পাদন করিয়াছিলেন। ভবানীচরণ রক্ষণশীল হিন্দু ছিলেন। তিনি বহু শাস্ত্রগ্রন্থ টীকাটীপ্সনী-সমেত পুথির আকারে তুলট কাগজে পুনর্মুদ্রিত করিয়া দেশবাসীর মধ্যে প্রচার করেন। হিন্দুকলেজে উচ্চ-ইংরেজী শিক্ষালাভের ফলে যুবকদের মধ্যে হিন্দু আচারের বন্ধন শিথিল হইয়া আসিতেছে দেখিয়া তিনি পুরাতন সমাজ রক্ষার জন্ত চেষ্টা করেন।

ভবানীচরণ সে-যুগের এক জন খ্যাতনামা সাংবাদিক। সংবাদপত্র-পরিচালনায় তাঁহার হাতেখড়ি হয় ‘সম্বাদ কোমুদী’ পত্রে। তাঁহারই উত্তোগে ‘সম্বাদ কোমুদী’ প্রকাশিত হয় এবং এই সাপ্তাহিক পত্রের প্রথম জ্যেষ্ঠদশ সংখ্যা তিনিই সম্পাদন করেন। তাহার পর তিনি কলুটোলায় সমাচার চন্দ্রিকা বস্ত্র স্থাপন করিয়া ‘সমাচার চন্দ্রিকা’ নামে একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। ইহা আচারনিষ্ঠ হিন্দুদের মুখপত্র ছিল। ‘সমাচার চন্দ্রিকা’ সে-যুগের একখানি উৎকৃষ্ট সংবাদপত্র।

গ্রন্থকার-হিসাবেও ভবানীচরণের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। তিনি প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য বাংলায় অনেকগুলি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। বাঙ্গ-রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা-সাহিত্যের আলোচনা করিতে গেলে বাঙ্গবিজ্ঞপূর্ণ সামাজিক চিত্র রচনায় ভবানীচরণের নাম সর্বাগ্রে করিতে হয়। অনেকের ধারণা

আছে প্যারীচাঁদ মিত্র—ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুর-রচিত ‘আলালের ঘরের দুলাল’ই বাংলা ভাষায় প্রথম সামাজিক উপন্যাস। কিন্তু ‘আলালের বহুপূর্বে ১৮২৩ সনে (?) ভবানীচরণ ছদ্মনামে ‘নববাবু বিলাস’ রচনা করিয়াছিলেন; ইহারই উপর ভিত্তি করিয়া ‘আলাল’ রচিত। ১৮২১-২২ সনে ‘সমাচার দর্পণ’ পত্রে “বাবুর উপাখ্যান”, “শৌকীন বাবু”, “বন্ধের বিবাহ”, “ব্রাহ্মণপণ্ডিত”, “বৈষ্ণব” ও “বৈষ্ণব-সম্বাদ” এই কয়টি বিজ্ঞপ ও হাস্যরসাত্মক চিত্র প্রকাশিত হয়; এগুলিও খুব সম্ভব ভবানীচরণের রচনা, অন্ততঃ “ব্রাহ্মণপণ্ডিত” চিত্রটির লেখক যে তিনিই, সহযোগী সাহিত্যে তাহার ইঙ্গিত আছে। ৫ ভবানীচরণের ‘কলিকাতা কমলালয়’, ‘নববাবু বিলাস’, ‘দুতীবিলাস’ প্রভৃতি গ্রন্থ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙালী সমাজের ঐতিহাসিক উপকরণে সমৃদ্ধ।

ভবানীচরণ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা-সাহিত্যের এক জন দিকপাল ছিলেন। তাঁহার জীবদ্দশায় শ্রীরামপুরের ‘সমাচার দর্পণ’ তাঁহার সম্বন্ধে যথার্থই মন্তব্য করিয়াছিলেন:—“জ্ঞান-বুদ্ধিতে তাঁহার তুল্য এতদেশে অপর ব্যক্তি দুর্লভ”। “ফ্রেণ্ড-অব-ইণ্ডিয়া”র মতে তিনি “One of the ablest men of the age.”

স্বতরাং বর্তমান পুস্তকের ভূমিকা হিসাবে ভবানীচরণের জীবন-কাহিনী বিবৃত করিবার সার্থকতা আছে। এই বিবরণ-সঙ্কলনে

* ‘সংবাদপত্রে’ সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮১-৮৩; ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩১-৪৭।

† “We close this slight and imperfect sketch with a humorous description of the brahmuns and pundits in Calcutta, drawn up, we suspect, by the same able pen to which we are indebted for “The amusements of the modern baboo” [Nava Babu Bilas.] It was sent for insertion in the Bengalee Newspaper [Sumachar Durpam.]—“The Hindoo Priesthood,” The Friend of India (Quarterly), March 1826, p. 324.

ভবানীচরণের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে প্রকাশিত একখানি জীবনচরিত * হইতে আমরা বিশেষভাবে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি।

বাল্যজীবন

“...পরগনা উৎসর্গপাতি নারায়ণপুর নিবাসী ৮৪মজয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ধনোপার্জনান্তিলায়ে কলিকাতা নগরে সমাগত হইয়া প্রথমত টাকশালের পদবিশেষে নিযুক্ত থাকিয়া অল্পকাল মধ্যে প্রকৌ সম্ভাবহার ও শীলতা সাধুতায় সকলের নিকট গণ্য মাজ্ঞ পূজা হইলেন।

“উক্ত মহাত্মার জ্যেষ্ঠপুত্র বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯২৪ সালের আষাঢ়ী শৌর্গমাসীতে উক্ত পরগনার উক্তগ্রামে জন্ম পরিগ্রহ করেন,...। তিনি শৈশবকালে শিশু প্রামাণিক + হইয়া প্রিয়ভায়ে ও শান্ত স্বভাবে সর্গদ্বা জনক জননী ও ভ্রাতৃ ভগিনীর সহকৌড়ক বয়স্ক বালকাবলির আনন্দগ্রহ হন, এইরূপে প্রতিনিয়ত গ্রহুণ বদনে জৌড়া কৌড়কে কৌমারকাল যাপন করিলেন, তদনন্তর তাঁহার পিতা কলিকাতা মধ্যে

* ভবানীচরণের মৃত্যুর পর বৎসর—১৮৪৩ সনে বহুদমভার উত্তোয়ে তাঁহার ৪০ পৃষ্ঠার একখানি ক্ষুদ্র জীবনচরিত প্রকাশিত হয়। ইহার নাম ‘ধর্মসভার অতীত সম্পাদক ৮বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনচরিত দৃষ্টকৃত পবিত্র চরিত্র বিবরণ’। কলিকাতার ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরিতে (No. 182, Cc. 84, 2) ইহার এক খণ্ড আছে, কিন্তু আধ্যাপক না-খাকায় প্রকাশকাল জানিবার উপায় নাই। পুস্তকখানি ১৮৪৩ সনের গোড়ায় প্রকাশিত হয়; ১৮৪৩, ১৪ই এপ্রিল তারিখের ‘সংবাদ ভাষ্য’ পরে প্রকাশিত নিম্নোক্তকৃত অংশ পাঠ করিলেই তাহা বুঝা যাইবে :—

“গত বহুশ্রুতিবাসনয়া চন্দ্রিকার সহিত আমারদিগের নিকট এক পুস্তক আসিয়াছে,—তাছাড়া ৮বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবন বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে,—।”

+ শিশু প্রামাণিক = আদর্শ শিশু। এই কথাটির প্রয়োগ ‘আলালের ঘরের দুলাল’ পুস্তকে ও অন্তর দেহিতে পাওয়া যায়।

কলুটোলা স্থানে একখানি বাড়ী ৩ ক্রয় পূর্বক তাঁহাকে কলিকাতায় আনয়ন করিয়া শুভদিনে বিদ্যারম্ভ করাইলেন, যদিচ তৎকালে এক্ষণকার ছাত্র বিদ্যালয়িকার সরল সরনি ছিল না ততরাং সামান্য শিক্ষকের নিকট বিদ্যালয়িকার প্রস্তুত হইলেন তথাপি স্বকৃত স্বকৃতি বশত বয়স্কাল মধ্যেই স্বকৃতি হইলেন অর্থাৎ বঙ্গীয় পারদীয় এবং ইংলণ্ডীয় অর্থকরী বিদ্যা তাঁহার অভ্যাসের অগ্রসারি হইল,...। তিনি উৎসাহ সখে উপায়সাহিত্য বশত বিদ্যা শিক্ষার বিরত হইয়া পরিবার পালনে ভারাক্রান্ত পিতার [মৃত্যু ১২৩০ সালে] সাহজ্যার্থ বোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমে বিধব কন্ধ্যাভিজিত হন।” (জীবনচরিত, পৃ. ১-৩)

নিম্ন কলিকাতা নিবনন

“বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমত ডকেট কোম্পানির কার্যালয়ে সরকারী কার্যে নিযুক্ত হইয়া অল্পকাল মধ্যে দীর্ঘ পরিচয়ে কার্য পারদর্শিতা ও কৃতজ্ঞতা গুণবান সাহেবের অনুগ্রহ লাভ করত সদর মেটের কর্মে নিযুক্ত হন, তাহার এক বৎসর অন্তর ঐ হৌসের মুৎসন্দি হইলেন, এই রূপে কিঞ্চিকালযাপন + পরে শুভ কালের উদয়ে তাঁহার কদয়ে সিগবর্শনের প্রস্তুতি উদয় পাইল—তিনি পিত্রাদির প্রবোধোদয়ার্থ প্রচুরার্থ উপার্জনের প্রয়োজন জানাইয়া ১২২১ সালে সর উলিয়ম কার সাহেবের সহিত পশ্চিম প্রদেশে যাত্রা করিলেন,—পরে সাহেবের সহিত মিরটে অবস্থিত হইয়া সময়ে তীর্থাঙ্গি ভ্রমণ করত মনন করিলেন যে কিঞ্চিদর্শ সংগ্রহ পূর্বক বদরিকাশ্রমাদি বেসকল দূরগ্রহ দর্শন তীর্থ আছে তাহা দর্শনে যাইবেন কিন্তু এক দিবস মিরটে মধ্যে কতজি

* সেকালের সংবাদপত্রে ভবানীচরণের কলিকাতা-বাটীর এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় :—“শহর কলিকাতার হরতির বাগানে রামমোহন খোষের ষ্ট্রিটের শামিল ও তদ্ব্যবস্থিত যে এক তেতলা ইষ্টক নিশ্চিত গৃহ অথবা পরিবারদিগের বসতি বাড়ী নং ২০ এবং তাহার সঙ্গে যে এক বগ ও বন্দ ভূমি অস্থমান ১৩ তেরো কাঠা...।” (‘সংবাদ প্রভাকর’, ২৩ আগষ্ট, ১৮৪১)

+ “Bhobanichurn Bannerjee served me 11 years in the capacity of a Sircar.”—J. Duckett, 21 Novr. 1814.

তীর্থশ্রমির নিকট পুরাণ শ্রবণ কালে গায়েছা ধর্ম প্রকরণে জ্ঞাত হইলেন যে পিতৃ মাতৃ সেবনে ধর্মনিষ্ঠ গৃহির সর্বতীর্থ দর্শনজাত সম্যক ফলোদয় হয়, পিতৃ সেবা বিমুখ বাড়ির অনিষ্ট ব্যতীত তীর্থ দর্শনে অশীষ্ট লাভ হইতে পারে না, এই পৌরাণিক উপদেশে পরিশেষে তাঁহার রূদ্রহা প্রগল্ভা আশা সংঘটা হইল, পরে পঞ্চম বৎসরে স্বাম্যে পুনরগত হন্তত পিতৃাদির আনন্দ বর্জন হইলেন, অনন্তর সর উল্লসিত কায় সাহেব মিরাট হইতে আসিয়া কলিকাতা চূর্ণের মেজর জেনারী পরাভিষিক্ত হইলে উক্ত মহাত্মা তাঁহার নিজের মৃৎসিদ্ধি হন, কিংকালান্তরে তাঁহার বিলাত গমন প্রস্তুত কোলগৌ কেপ্পটন সাহেবের বাটাতে কাথ্যাভিষিক্ত হইলেন, কালাত্যয়ে ঐ সাহেব বোম্বাই গমন করিতে তিনি সর চার্লস ডাইলি সাহেবের নিকট কলিকাতা পরমিটের দারোগাগিরি কর্মে নিযুক্ত হইয়া কাথ্য দ্বারা সরকার বাহাদুরের অনেক লাভের সোপান দর্শন করাইলেন সাহেব তৎপ্রতি ঐত হইয়া তাঁহাকে প্রধান কলিকটেলের কর্মে নিযুক্ত করিলেন, কালক্রমে ঐ সাহেবের পাটনা গমন ও কায় সাহেবের বিলাত হইতে প্রত্যাগমন প্রস্তুত পরমিটের কর্ম পরিত্যাগ পূর্বক উক্ত সাহেবের নিজকাৰ্য্য করিতে লাগিলেন, তৎপরে বিত্তীয়বায় ঐ সাহেব বিলাতগামী হইলে তিনি বিশাপ মিডিলটন সাহেবের কর্মে প্রস্তুত হন, পরে হস্তিম কোর্টের চিফ জুজিস সর হেনরি ব্রাপেট সাহেবের নিজের মৃৎসিদ্ধি হইলেন, এক দিবস লর্ড বিশাপ হিবর সাহেব তাঁহার কাথ্যদক্ষতা নির্দোষিতা সত্যাবিত্তিাদি সদগুণের কথা শ্রবণ করিয়া আরান পূর্বক নিজ কাৰ্য্যে নিযুক্ত করেন, এবশ্রকয়ে কিছুকাল গত হইলে সর ফ্রাইষ্টফর পুলর সাহেব চিফ জুজিসীপদে অভিষিক্ত হইয়া প্রসন্নান্তর তাঁহার গুণামুগ্ধতা শ্রবণে স্পগ্রাহী সাহেব লর্ড বিশাপ সাহেবকে অমুরোধ করিয়া তাঁহাকে আনয়ন করত নিজ কাৰ্য্যের ভারার্ণ করিলেন, তাহাতে তাঁহাকে কিংকালের জন্ত উভয় স্থানীয় কাৰ্য্য নির্বাহ করিতে হইয়াছিল, কএক মাস পরে চিফ জুজিস সাহেব লোকান্তরিত হইলে তিনি কেবল লর্ড বিশাপের কর্ম নির্বাহ করিতে লাগিলেন, ঐ কালে উক্ত সাহেব বিশাপস কালোজ নামক বুধদ্বিধ্যালয় স্থাপন করিয়া তদধ্যক্ষতা পদে তাঁহাকে অভিষিক্ত করিলেন, কতক কাল ঐ কাথ্য করিয়া পরে শোলা দানার নিমক একটু মেনে জিনিং সাহেবের স্বদানে শোলা দানার মধ্য ডিবিজনের সিগিগুদারী পদে নিযুক্ত হন [জানুয়ারি ১৮২০], কালক্রমে তথাকার বাহুবায় তৎসমক্ষে পান্থ্যকারি না হওয়াতে তিনি বাটা আইসেন, পরে

ঐ কাহারি এবালিস হইলে কিছু কালের জন্ত হুগলির কালেকটরী পান্থ্যকারিগি কর্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তদনন্তর ইংলিসমান পত্রের বিখ্যাত সম্পাদক মেনে ইষ্টাকুইলর সাহেব তাঁহাকে নিজ আফিসের অধ্যক্ষকর্ম পদে নিয়োজন করেন, কএক বৎসর পরে ঐ কর্ম ত্যাগ করিয়া টেরা আফিসের দেওয়ানী পদে অভিষিক্ত হন, তদনন্তর মিং হিকি বেলি কোম্পানির বাণিজ্যালে প্রধান পদস্থ হইয়া কাথ্য করিতে অকস্মাৎ তাঁহার জীবন ও কাথ্যালে সম কালেই কাল কর্তৃক অবকলিত হয়। তিনি যেহে স্থানে কাণ্ড করিয়াছিলেন তাহার প্রত্যেক স্থানীয় কর্তাদিগের প্রাক্ষরিত প্রশংসা পত্র * প্রাপ্ত হন, তদ্বারা প্রকাশ হইবেক যে উক্ত তাবৎ কাথ্য ভিন্ন তাঁহার অজ্ঞত প্রধানত স্থানেও বিষয় কর্ম ছিল। তিনি অজ্ঞাতবলথনে কখন কোন স্থানে ধনার্জনের যত্ন করেন নাই, জ্ঞাতজিত বিভবে সর্বদা হ্রসবোধ্য প্রাক্ষরিত, তদ্রিকট অজ্ঞত প্রচুর ধনোপার্জনের এবং অধিক হ্রসব সন্তোষের কথা করিলে তিনি হাস্ত করিয়া কহিতেন যে 'হ্রসবের কারণ দন নহে কেবল নিবিকল্প মনোমাত্র, শান্তচিত্ত লোকেরা সন্তোষামৃত পানে যেরূপ তৃপ্ত ও স্থনী হইয়া থাকেন সে রূপ ধনলুপ্ত চঞ্চলমন। মনুষ্যেরা ইন্দ্রিয় লাভ করিয়াও হইতে পারেন না যেহেতু আশার পার নাই' এই কথা করিয়া মোনো হইতেন ইতি।' (জীবনচরিত, পৃ. ৩৭)

তীর্থযাত্রা বিবরণ ২

"প্রসিদ্ধ মহাশয় সপ্তবিশ বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে দিগদর্শনোচ্ছুক হইয়া ১২২১ সালে প্রথমবার দিগদর্শনে যাত্রা করেন, গমন কালে গঙ্গার উভয় তটস্থ সমস্ত দেবালয় দ্ব্যালয় দেখিতেই রাজমহালে উপস্থিত হইয়া মেনে কাথ্য সাহেবের স্থানে কয়েক জন রক্ষক লইয়া বিজ্ঞাচলে নানাথলে পটাবন করিয়া তদনন্তর পূর্বতনী মগধরাজের রাজধানী মুঙ্গেরের নিকট রামকুণ্ড সীতাকুণ্ডের শীতোষ্ণ জলে স্নানাবগাহন করিলেন, পরে মুঙ্গের হইতে যানারোহণে ত্রিলোকজননী সীতাজনক জনক রাজর্ষির রাজধানী

* ভবানীচরণের জীবনচরিতের ৩৫-৪০ পৃষ্ঠায় এই সকল প্রশংসাপত্র মুদ্রিত হইয়াছে।

বিধিয়ার গমন করিয়া তরু সমস্ত দেবাগার ও দেবাবিদেব মহাদেবের ভূয় কামুক
দর্শনে প্রমত্ত মনে পাটনায় প্রত্যাগমনার্থ যাত্রা করত পথিমধ্যে শালগ্রাম শিলাগর্ভা
গওকী সলিলে কৃতপ্রাত হইয়া কহল গ্রামের অদূরে গঙ্গাগর্ভে উন্নত পবিত্র বাসি
প্রবাহ নিত্য ধৌত শিখরাগ্রে শ্রীশ্রীবেঙ্কনাথখা শিব সন্ধান পূর্বক পাটনায় উপস্থিত
হইয়া ধানগ্রামীর পর্বত প্রভৃতি নানা স্থানীয় সৌন্দর্য দর্শন করেন। কথিত আছে
ষাপরম্বরের রাজচক্রবর্তী ভরাসংঘের কারাগার উক্ত পর্বতের উপত্যকায় ছিল অজ্ঞাপি
ঐ স্থানে প্রাচীন ভগ্নাট্টালিকার নানা চিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে। পিতৃ বর্ষমানের গয়া
গমনের সার্থকতা বিহয় প্রস্তুত তাহাতে পরাভূত হইয়া শোণাখা নদে স্নানাবগাহন
করত আনন্দকানন কাশীধাম গমন পূর্বক উত্তরবাহিনী হরদীপিকা মণিকর্ণিকা নীরে
স্নানচিহ্নে হস্তান্ত হইয়া কাশ্যনিধান বিশ্বনিধান নির্লাগ্রদ ভগবান বিবেকর পূজা
সময়ান পূর্বক বিশ্বজ্ঞা বিশ্ববন্দ্য বিশ্বজননী ভবানী অন্নপূর্ণার পূজা দ্বারা অতীষ্ট পূর্ণ
করত পক্ষকোশ মুক্তি ক্ষেত্রে দেবালয় দেবনিচয় দর্শন পুরস্কার তীর্থবিহিত নিয়মাচারে
ত্রিরাত্রি বাস করিয়া মুখাপুর গমন করিলেন, তথায় বিদ্যাচলে বিদ্যাবাসিনীর মোক্ষপ্রদ
পাদপঙ্কজে মনোমথপূর্ণ নিবেশ করাইয়া ভক্তি মকরম পানে তৃপ্তচেতা হইয়া তীর্থযাত্রার
প্রমাণে যাত্রা করিলেন, তথায় ত্রিবেণী সঙ্গমে প্রান দান শিরোমুগ্ধন দ্বারা নিম্ভু-
পাপ হওত বেগীমাধব অক্ষয়বট দর্শন পূর্বক বিরাট যাত্রা করেন, তথায় কিয়ৎকাল
অবস্থিত হইয়া পরে মুক্তিধাম মধুরা গমন করেন, তথা শ্রীকৃষ্ণাবনে শ্রীগোবিন্দ, গোপীনাথ,
মদনমোহন, গোপেশ্বরাদি দেব দর্শন এবং কালিনীতরলতরঙ্গাবগাহিত শৈত্য সৌখন্দ্য
মালা গুণগুচ্ছানিল দোলাচিত স্বপ্ন নিঃস্রিত কোকিল কোকিলাখিল কুহকল কলিত
কেলিকোকা বিধুযুগ বিকসিত সুধুমাবলি গলিত মকরম পানাকুল অলিকুল গুঞ্জরিত
সৌরভোমোদিত মঞ্জুল নিকুঞ্জ পুঞ্জ ভ্রমণে, কোকিল বন, কামাবন, গোবর্দ্ধনাদি তীর্থ
দর্শনে, এবং চতুর্নশিঃ প্রকাশবস্ত্রি মধুরা মণ্ডল পরিভ্রমণে পত্রম হৃথাম্রভব করিলেন,
তদনন্তর কুরুক্ষেত্রাদি তীর্থ ভ্রমণ করিয়া হরিদ্বারে গঙ্গাস্নান করত আলমোরার পর্বত
পঞ্চাটন পূর্বক কেদারনাথে গমন করেন, এইরূপে প্রথমবার তীর্থ ভ্রমণ করিয়া গৃহে
আইসেন, অনন্তর ১২৩০ সালে দীর্ঘ পিতার গঙ্গাভ্রমণ হইলে যথাবিধি শ্রাদ্ধাদি
সম্বাদান করিয়া দ্বিতীয়বার তীর্থযাত্রা করেন তৎপ্রথমে গয়া গমন করত শ্রীশ্রীগদ্যার
পাদপঙ্কে পিণ্ডদান পূর্বক পাদ গয়া চন্দ্রনাথ গমন করত কামাখ্যা দর্শন করিয়া বাটী

আইসেন, পরে ১২৪১ * সালে তৃতীয়বার তীর্থযাত্রা কালে রথযাত্রা সময়ে পুরুষোত্তম
ক্ষেত্রে প্রয়াণ করত, পথিমধ্যে দ্বাজপুত্র নাভিগয়ায় পিণ্ডদানদ্বারা ত্রিগয়া সমাপন
করিয়া পিতৃ ঋণ মোচিত হইয়া ভুবনখণ্ডে পুরুষোত্তমে এবং কোণার্ক তীর্থবিহিত
নিয়মে প্রান তর্পণ দেবালয় দেব দর্শন করিয়া তৃপ্ত হন। তিনি নানা তীর্থ ভ্রমণ কালে
যেসকল কার্য করিয়াছেন তাহা বিস্তার রূপে বর্ণিত হইলে একখানি বৃহৎগ্রন্থ প্রস্তুত
হইতে পারে। তাহার পরোপকারিতা ও বিচক্ষণতার কথা কি কহিব যখন যে তীর্থ
গমন বরিয়াছেন তখন সে তীর্থের নিগূঢ় সন্ধান লইয়াছেন, পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে পাণ্ডুরা
প্রতারণা দ্বারা লোকনাথখা শিবের স্বরূপ ভোগ বাজারে শ্রীশ্রীগঙ্গাধরের ভোগ বন্দিয়া
বিক্রয় করিত এবং বরকালাবধি সন্ধান না জানিয়া যাত্রিগণ তাহা ভোজন করিতেন
কিন্তু শান্ত পুরুষোত্তম জগন্নাথের প্রসাদভিহ্ন অল্প দেবতার অন্নভোগ ভক্ষণের বিধি
নাই, তিনি চতুরতা দ্বারা ঐ কার্যের সন্ধান পাইয়া প্রথমত বিক্রোতাগিকে নিষেধ করেন
সে কথায় তাহার মনোযোগ না করাতে পুরীর কালেক্টর সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া
ঐহাকে বিশেষ প্রকার বৃত্তাহী রাজকীয় শাসন দ্বারা ঐ কুপ্রথা চিরমুহিতা করিলেন,
এই বাপারে ক্ষেত্রে রাজা স্বয়ং প্রতিবাদী হইয়াও কৃতকার্য হইতে পারেন নাই, এই
বিষয় সাধারণের কিপ্রকার হিতকর তাহা সাধু লোকেরা বুঝিতে পারিবেন। অপর
তিনি ক্ষেত্র গমন কালীন বহুতর নদীমধ্যে পারাবারকারি তরিবাহকদিগের অত্যাচার
দূষ্ট করিয়াছিলেন প্রত্যাগমন কালে কটকের কমিন্ত্রনর সাহেবকে তদ্বারায় মূলক
বৃত্তান্ত অবগত করাইয়া এমত আজ্ঞাপত্র অর্থাৎ পরবান বাহির করাইলেন যে
তদ্বারা যাত্রিকেরা বিনা রেশে বিনা বায়ে নদী পার হইয়া ঐহাকে ধন্যবাদের সহিত
আশীর্বাদ করিয়াছিলেন ইতি।" (জীবনচরিত, পৃ. ৭-১১)

* গুণ সম্বয় মুদ্রাকরপ্রমাদবশত "১২৪১" স্থলে ১২৪২ ছাপা হইয়াছে। ভবানীচরণ
যে ১২৪১ সালেই শ্রীক্ষেত্র যাত্রা করেন, তাহা ২৬ ভাদ্র ১২৪১ তারিখের 'সম্ভাচার দর্শন'
হইতে উক্ত নিম্নলিখিত সংবাদট হইতে বুঝা যাইবে:—

"চন্দ্রিকা সম্পাদক মহাশয় প্রাপ্তি শ্রীক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগত হওয়াতে দীর্ঘ
পত্রে তথ্যের কথা উক্তি প্রকাশ করিয়াছেন।"

চলিত্ত বর্ণন :

“মাত্র বহাশয় নবমবর্ষ বয়ঃক্রমে উপনীত ও দশমবর্ষে উদাহিত হন, পরগনা উৎসাহ
অন্তঃপাতি মমিক নওয়াপাড়া গ্রাম নিবাসি কালীকির মমিকের কন্যা সহিত তাঁহার
প্রথম পরিণয় হয়, তাঁহার বিশেষ বয়সে প্রথম পুত্র শ্রীমত রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও
তাঁহার দুই বৎসর অন্তরে দ্বিতীয় পুত্র রাজরাজেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহার
চতুর্বিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমে উক্ত পত্নী দৈহিক পীড়াপলকে গতপ্রাণা হন,—জনকের অমুমত্যা
অমুমতিতে দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন. তৎপত্নীগণ্ডে শ্রীমত নিমাইচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও
শ্রীমতী সত্যী নামী কন্যার জন্ম পরিগ্রহ হয়। কথিত মহাশয় অতিসদাশয় ও নিরদ্বন্দ্ব
ছিলেন, দেব দ্বিজ পূজনে ধর্ম যজনে তাঁহার নিষ্ঠা নতি ছিল, তিনি প্রত্যহ প্রত্যয়ে
গার্ভোধান করত প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্বক সন্ধ্যা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৈল গ্রহণ সময়ে
সমাগত পরিচিতা পরিচিত শিষ্ট সাম্প্রদায়িক জনগণের সহিত ইষ্ট মিষ্টালাপ করত স্নান
ভর্গপ দেব পূজনাদি নিত্য কর্মব্যসনে ভোজোন্মত্তের বিষয় কাঞ্চা পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত
হইতেন, অবকাশ মতে আশ্রয় সজ্জনের সহিত সন্ধ্যাপন করিতেন, নিরালস্যে তাঁহার স্থা
কালযাপন হইত না, নিকটে জনশূন্য হইলে পুত্রকাদি পাঠ করিতেন, প্রায় দিবসে নিজা
যাইতেন না, বিষয় কর্মে আবৃত থাকিলেও নিকটে সমুদ্র আগত হইলে সমাদরের সহিত
তৎসং কিয়ৎকাল কথাপকথন করিতেন, অপরিচিত দীনজনেরা ও তাপিত লোকেরা
তাঁহার প্রিয়ালোপে স্নাতল হইত, তিনি পতিভগণকে লইয়া মথোৎ শাস্ত্রালাপ করিতেন,
এবং সর্বদা অধ্যাপকগণের উপকারেচ্ছা ছিলেন, নৈমিত্তিক কাম্য কর্ম দান দেবর্জনাধিতে
তাঁহার বিশেষ আস্থা ছিল, আশ্রয় বাসকগণকে দেখিয়া দূরে হইতে অশ্রুস্রবনে প্রিয়-
বচনে সুপল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন, পরোকে প্রিয়জনের প্রশংসা করা তাঁহার স্বাভাবিক
কার্য ছিল, পরনিষ্ঠা এবং অসহিত ছিলেন, তদ্রিক্ত বা তাঁহার সমক্ষে অস্ত্রের
নিকট কেহ পরদ্রব্যে প্রবৃত্ত হইলে তিনি প্রতিবাদ করিয়া যথিযথ্যে নিন্দাবাদ হইত
তাঁহার গুণাযুগে নিম্নককে নতশিরা করিতেন, তাঁহার এই গুণে কোন
বিপক্ষও সপক্ষ হইয়াছিল, তিনি আশ্রয় সজ্জনের ও প্রতিবাদিগণের পীড়া সংবাদ
পাইলে কর্মান্তর পরিত্যাগ পূর্বক পীড়িতজনের শুধ পদ্ম প্রদান বা প্রদানীয় উপদেশ

দান করিতেন, বিপদাগর সমুদ্র তাঁহার শরণাগত হইলে প্রাণপনে তাঁহার বিশিষ্ট
হিতচেষ্টা করিতেন, কৃতকার্য হইলে ঈশ্বরের প্রতি সাধুবাদ পূর্বক অমৃত হইতেন,
তিনি দেবোমায়া পাঠ এবং নিয়তাস্ত্র ছিলেন, অসাধ্য সাধনে উৎসুকতা ছিল
না, যে বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেন তাহা প্রায় অসিদ্ধ হইত না। এতদেবীয় মনুষ্যকে
ধর্ম ও শতাব্যুহাঙ্গী করিতে তাঁহার বিশেষ উদ্যোগ ছিল, ধর্মমোহি দেবনিম্নক
নাট্যকারির সহিত তিনি আলোপও করিতেন না, তাঁহার বাক্পটুতা ও বক্তৃতাশক্তি
এমত নিপুণ ছিল যে তিনি যেসভায় গমন করিতেন তদ্বৎ সভ্যেরা তাঁহার নব নব
রস বিকসিত বাক্যে আকৃষ্ট হইতেন, তদ্বৎ তিনি ছুরি সভায় সত্বকতা
ঘাটা অগণা ধস্তবদ পাইয়াছেন, তিনি প্রতিদিন সায়ে সন্ধ্যার পর পূরণ এবং পূর্বক
নগরীয় যাবদীয় সংবাদ পত্র পাঠ করিয়া রাখিত দুই এহর পরে নিজা যাইতেন ইতি।”
(জীবনচরিত, পৃ. ১১-১৩)

কীৰ্ত্তি বিবরণ :

সংবাদপত্র-পরিচালন :-

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা দেশের প্রথম বিশিষ্ট সংবাদপত্র-
লেখক ও সম্পাদক। তিনি ১৮২১ সনের ৪ ডিসেম্বর ‘সংবাদ কৌমুদী’
নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। ইহার প্রথম
১৩ সংখ্যা তিনি সম্পাদন করিয়াছিলেন। ধর্মমত লইয়া কর্তৃপক্ষের
সহিত মতভেদ হওয়ায় ভবানীচরণ ‘সংবাদ কৌমুদী’র সংস্রব ত্যাগ
করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। উত্তোগী পুরুষের সিদ্ধি অনিবার্য;
ভবানীচরণ নিজের চেষ্টায় ‘সমাচার চন্দ্রিকা’ নামে একখানি সাপ্তাহিক
পত্র প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ৫ মার্চ
১৮২২ তারিখে। প্রথম দুই সংখ্যা প্রকাশিত হইবার পর ভবানীচরণ
এই ইত্তাহার প্রকাশ করেন :-

ইত্তাহার।—কলিকাতার কলুটোলা গ্রাম নিবাসী শ্রীমত ভবানীচরণ
বন্দ্যোপাধ্যায় সকল বিজ্ঞ সাহেবকে মহাশয়েরদিগকে বিজ্ঞাপন করিতেছেন যে

তিনি স্বয়ং কৌমুদী নামক সমাচার পত্র ১ প্রথমাবধি ১৩ সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশ করিয়াছেন সম্প্রতি সমাচার চন্দ্রিকানামক এক পত্র প্রকাশ করিতেছেন তাহাতে নানাবিদেশীয় বিবিধ সমাচার অনায়াসে জানা যায়। প্রথম পত্র ২৩ ফাল্গুন মঙ্গলবার প্রকাশ করিয়াছেন ২ দ্বিতীয় পত্র সোমবার প্রকাশিত হইয়াছে এবং পরেও প্রতিসোমবারে প্রকাশিত হইবে। এই প্রত্যাশক মঙ্গলবারদিগের প্রতিমাসে ১ টাকা মূল্য দিতে হইবে। ('সমাচার দর্পণ', ২৩ মার্চ ১৮২২)

'সমাচার চন্দ্রিকা' রক্ষণশীল হিন্দুদের মুখপত্র ছিল। ইহার গ্রাহক-সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৮২২ সনের এপ্রিল মাসে 'সমাচার চন্দ্রিকা' সাপ্তাহিক হইতে 'দ্বি-সাপ্তাহিক' (অর্থাৎ সপ্তাহে দুইবার) পত্রে পরিণত হয়।*

ভবানীচরণের জীবনচরিতে 'সমাচার চন্দ্রিকা'র একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে তাহা নিয়ে উদ্ধৃত করা হইল :—

"কথিত পুণ্যায়্য ইংলণ্ডীয়দিগের দ্বারা এতদ্দেশে মুদ্রা যন্ত্রের ও সংবাদ পত্রের স্থাপন দর্শনে বঙ্গ ভাষায় সংবাদ পত্রের প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক হন তাহাতে ১২২৮ সালে সংবাদ কৌমুদী পত্রিকা কোনও ব্যক্তির সংপৃষ্টতার প্রকাশমানা করেন পরে অংশিগণের সহিত ধর্ম বিষয়ে ঐকমত্য না হওয়ায় ঐ পত্র পরিত্যাগ পূর্বক সমাচার চন্দ্রিকা পত্র প্রচার পুরস্কার নিম্নালায়ে এক ছাপাঘর স্থাপন করিলেন, অনন্তর অংশিরা কৌমুদীপত্র সম্পাদনে অশক্ত হইয়া তাহা মৃত রামমোহন রায়ের হস্তে স্তম্ভ করত চন্দ্রিকা পত্রের উন্নতি বোধার্থে বিবিধ উদ্ভব করিতে লাগিল কিন্তু ধর্মপত্রিকা চন্দ্রিকা মনোরঞ্জিকানিষিদ্ধারা সাধারণ সমীপে সমাদরণীয় হওয়াতে একবর্ষ মধ্যে অনানু আট শত গুণগ্রাহক ব্যক্তি ইহার গ্রাহক হইলেন ইহাতে কৌমুদী পত্রই অবসান পাইল, হৃদয় কাল এই বঙ্গ রাজ্য যবনাধীন প্রযুক্ত দেশীয় ভাষা বাবনিক ভাষার সহিত মিশ্রিত হইয়া যায় পরে চন্দ্রিকায় গোড়ীয় সুকোমল সাধু ভাষা বিস্তৃত হওয়াতে বিভাসুপ্রাণিগণের দ্বয়ে সাধু ভাষা শিক্ষার অনুরাগ

বৃদ্ধি পাইতে লাগিল অতএব ঐ পত্রকে এতদ্দেশীয় ভাষা পরিবর্তনের মূলত্ব বলিতে হয়, ইহা ভিন্ন ঐ পত্রে ধর্ম ও রাজনীতি বিষয়ক বিবিধ প্রস্তাব প্রকাশ দ্বারা বঙ্গদেশের যে কিপথান্ত উপকার হইয়াছে তাহা বিদ্বান লোকেরাই বিশেষরূপে জানিয়াছেন, কিছুকাল পরে উক্ত রায় এতদ্দেশীয়া সাধুদিগের সনাতন ধর্ম সংগমন নিবারণোদ্যোগে পীড়াভিগ্রায় কৌমুদীপত্রে ব্যস্ত করিতে উক্ত মহাশয় রায়ের প্রতিপক্ষরূপে লেখনী ধারণ করিলেন তদবধি রায়ের বিলাতপ্রাপ্তিপথান্ত সঙ্গীদাই উত্তর পরিকায় বিবিধ বাদামুহাব জরিত হইয়াছিল, উক্ত মহাশয়ের গদ্য পদ্য রচনা ও উত্তর প্রত্যুত্তর লেখনে এমত পটীতা ছিল যে যেকোন কথা কটুভাঙ্গলে লিখিত হইলেও মানুষ রস রহিত হইত না, একই সময়ে তাহার বার জর বিস্তার প্রতি প্রতিপক্ষ রামমোহন রায় বহুশ্রদ্ধা হইয়াও তিরোহৃত হইয়া মুক্তকণ্ঠে তাহার প্রতি সাধুবাদ করিতেন।" (জীবনচরিত, পৃ. ১৪-১৫)

স্বরচিত গ্রন্থ :—

১। নববাবু বিলাস। ১৮২৩ সন (?)

ভবানীচরণের জীবনচরিতের নিম্নোক্ত অংশ পাঠ করিলে জানা যাইবে যে 'নববাবু বিলাস'ই তাহার সর্বপ্রথম রচনা :—

"তিনি আত্মীয়গণের অধুরোধে গদ্য পদ্য রচনায় প্রথমতঃ নববাবু বিলাস নামক এক পুস্তক রচনা করেন ঐ পুস্তক সাধারণের কৌতুকজনক ফলত তদ্বারা কৌশলে এতদ্রগরীয় ভাণ্ডারান সপ্তানদিগকে কটাক করিতে তদানীঃ অনেকে তদুত্তে কুকাব্য পরিহার করিয়া সংপথবাগনন করেন। তদনন্তর ১২৩০ সালে কলিকাতা কমলাগঞ্জ গ্রন্থ বিকাশ করিলেন,..." (জীবনচরিত, পৃ. ১৫)

পাদরাী লন্ডের মতে (Catalogue, p. 82) 'নববাবু বিলাস' পুস্তকের প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল ১৮২৩ সন। ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৩৮ সনে ; * এই সংস্করণের এক খণ্ড পুস্তক চট্টগ্রামের

* শ্রীরামপুরের 'ফ্রেণ্ড-অফ-ইন্ডিয়া' (অক্টোবর, ১৮২৫) "১৮২৫ সনে" প্রকাশিত সংস্করণের আখ্যানবস্তুর আভাস দিগা, "The Amusements of the Modern

* 'সমাচার চন্দ্রিকা' সম্বন্ধে বিস্তৃত ইতিহাস আমাদের 'দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস', প্রথম খণ্ডের ১৭-২১ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে।

মুন্সী আবদুল করিমের গ্রন্থাগারে আছে। তিনি তাহার এইরূপ বর্ণনা দিয়াছেন :—

প্রায় আটপেজী আকারের কাগজে ৭১ পৃষ্ঠায় শেষ। বড় বড় অক্ষর। বারান্দা কাগজ। আবরণ পত্রে লেখা আছে।—“শ্রীশ্রীকৃষ্ণ শর্মণঃ। গোড়ি দেশ চলিত সাধু ভাষায় শ্রীপ্রমথ নাথ শর্মণ কৃত নবাবু বিলাস নামক গ্রন্থ কলিকাতায় সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্রে বিতরণকার মুদ্রাক্ষিত হইল। শকাব্দ ১৭৬০। সন ১২৪৫ সাল।”

ইহা চারিখণ্ডে বিভক্ত; খণ্ড—অনুরাগও, পদ্মবর্ণও, কুহুমখণ্ড ও ফলখণ্ড। সর্বদো বন্দনা, গণপতি বন্দনা, সরস্বতী বন্দনা। এগুলি পড়ে। তৎপর ‘ভূমিকা’।—ভাষা গদ্য পদ্য। *

আমি ১৮৫৩ সনে প্রকাশিত সংস্করণের এক খণ্ড ‘নবাবু বিলাস’ (পৃ. সংখ্যা ৫১) উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরিতে দেখিয়াছি; তাহাতেও গ্রন্থকাররূপে ‘প্রমথনাথ শর্মণ’—এই নাম আছে। প্রকৃতপক্ষে ইহা ভবানীচরণের ছদ্মনাম। ১ সেপ্টেম্বর ১৮৩১ তারিখের ‘সমাচার চন্দ্রিকা’য় প্রকাশিত নিম্নোক্ত পত্র হইতে আমার কথার প্রমাণ পাওয়া যাইবে :—

শ্রীমত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় শ্রীচরণে—...একলে নূতন বাবুরিগের সিংগন পুরের কাণ্ডেমি ভয় ও কলিকাতা নিবাসী অরোহণ পন্নোগ্রামবাসির

Baboo, A Work in Bengalee, printed in Calcutta, 1825” নামে একটি দীর্ঘ সমালোচনা করেন। লঙ্ঘের তালিকা-মত ‘নবাবু বিলাস’ের প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল ১৮২০ সন মির্জা বলিয়া গ্রহণ করিলে, বলিতে হইবে ‘হেও-অব-ইণ্ডিয়া’ প্রথম সংস্করণের পৃষ্ঠকেরই সমালোচনা করিয়াছিলেন এবং এই সমালোচনায় পুস্তকের প্রকাশকাল সন্মত্রে “১৮২৫ সন” ব্রুজিত হইয়াছে।

* বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, মুন্সী আবদুল করিম সংকলিত, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, পৃ. ২৩৬।

নবাবহার ভয় এবং কুলটী রমণী পতি বস্ত্রীর কুস্রিয়া ভয় ও লম্পটগণ পরদার গমনে শেষ বিচ্ছেদ এবং ধনক্ষয় ভয় হইতে মহাশয়ের কৃপাতে উদ্ধার হইয়াছেন যেহেতু নবাবু বিলাস ও কলিকাতা কমলালয় এবং দূতী বিলাস গ্রন্থ অপূর্ণ উপদেশে উক্ত দোষোদ্ধার উদ্দেশে প্রকাশ করিয়াছেন তাহা কে না স্বীকার করিতেছেন...। ৫ ভাদ্র ১২৩৮ সাল—শ্রীম, বি,।

২। কলিকাতা কমলালয়। সন ১২৩০ (—১৮২০?)। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৮+২১।

এই পুস্তকের বিষয়—প্রমোত্তরচ্ছলে কলিকাতার রীতিবর্ণন। ইহার প্রথম সংস্করণের এক খণ্ড বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-গ্রন্থাগারে আছে। ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরিতেও এক খণ্ড আছে, তবে তাহা আখ্যাপত্র-বিহীন।

৩। হিতোপদেশ / পরতন্ত্র হইতে উদ্ধৃত / শ্রীবিষ্ণুশর্মকর্তৃক সংগৃহীত সংস্কৃত গ্রন্থ / তদীয়ার্থ গোড়ীয় ভাষায় / শ্রীভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় / দ্বারা সংগৃহীত হইয়া কলিকাতায় / সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্রে / মুদ্রাক্ষিত হইল // শকাব্দা: ১৭৪৫ / সন ১২৩০।

এই পুস্তকের এক খণ্ড বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-গ্রন্থাগারে আছে। ইহার পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৩৪৫। ইহা হইতে ‘ভূমিকা’ অংশটি নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি :—

হিতোপদেশ গ্রন্থভাষ্য সংগ্রহকারের বিজ্ঞাপনমিবঃ অজ্ঞ বিজ্ঞ বালক বৃদ্ধ যুবা সকলেরি উপকার জনক এই হিতোপদেশ গ্রন্থ শ্রীল শ্রীমত কুমার শিবচন্দ্র রায় ভণ্ডা শ্রীমং শ্রীমুগ্ধ নৃসিংহচন্দ্র রায় বাহাদুরদিগের অমৃততাম্বুসারে সংস্কৃত মূল রোম ভাষিণী তাহার অর্থ নৌড়ীয় ভাষায় প্রকাশ করা গেল এই গ্রন্থ বাহারবিগ্যোর উপস্থিত থাকে তাঁহার। সকল বিষয়ের উত্তম অর্থম বিবেচনা করিতে পারেন এবং এই গ্রন্থ মতে কর্ম করিলে লোকের ইহকালে ও পরকালে কোন দোষ শর্পে না যেহেতু এ গ্রন্থ অভ্যাস হইলে লোক ইহলোকে সভ্যভব্য

ধাঙ্গিক হয়, ইহা বিজ্ঞপ্তির বিদিত আছে ইহাতে বাহার সন্দেহ হয় তিনি গ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ বিশেষ মনোযোগ পূর্বক পাঠ করিলেই জানিতে পারিবেন ইতি।

৪। দূতীবিলাস। কলিকাতা ১৭৪৭ শক (— ১৮২৫ সন)। পৃ. ৮+১৩২, ১২ খানি চিত্রসন্মিত।

‘দূতীবিলাস’ কাব্যগ্রন্থের প্রথম সংস্করণের এক খণ্ড বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়মে আছে।

১৮৪৭ সনে ‘দূতীবিলাস’ের একটি সংস্করণ (পৃ. সংখ্যা ১১৭) প্রকাশিত হয়। ইহার এক খণ্ড বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-গ্রন্থাগারে আছে। কিন্তু এই সংস্করণে কোন চিত্র নাই। ইহার আখ্যাপাত্র এইরূপ :—

শ্রীশ্রীহরিঃ। / কাব্যগ্রন্থঃ / পৌড়দেশ চলিত ভাষা ভাষিত / স্বকোমল পদ্যরাশি নানাস্থল রচিত / শ্রীমুত ভবানী চরণ বন্দোপাধ্যায় কৃত / আদ্যিস ভক্তিরস ঘটিত / দূতীবিলাস / প্রসঙ্গিক রসদায়ক পুস্তক / কলিকাতা কবিত-রত্নাকর যন্তে / চতুর্থবার / মুদ্রাক্ষরে মুদ্রিত হইল। / সন ১২৪৩ সাল ভাদ্রিখ ৪ চৈত্র।

১৮৪৭ সনের এই সংস্করণ হইতে “গ্রন্থের সূচনা।” ভাগ উদ্ধৃত হইল; ইহা হইতে পুস্তকের আখ্যানবস্তুর আভাস পাওয়া যাইবে :—

নিবেদন শুন সব রসিক শ্রবণ।
যে কারণে এই গ্রন্থ হইল রচন।
কলিকাতা নগরস্থ নিমাক্রি চরণ।
মমিক উপাধি তিনি প্রতাপে রাখণ।
কান্তির তুলনা তুল্য পাওয়া নাহি যায়।
দুতীকান্তি যোষে লোকে ভীষ দুতীগ্রায়।

ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায়

আট পুত্র তাঁহার সকলে গুণবান।
একগণে তাহার সাত জন বর্তমান।
তার মধ্যে শপ্তম স্বরূপচন্দ্র নাম।
দেবগুণ ছিলে ভক্তি অতিক্রপাধার।
ধনি গুণি মানি লোক মান্ত করে মানে।
একদিন সেই জন বসিয়া বাগানে।
বহুতর বিজ্ঞবর লয়ে গুণি সব।
কথিতেছিলেন নানা আনন্দ উৎসব।
নানা রস রাগরসে এসঙ্গ উঠিল।
মুদ্রাক্ষরে বহু গ্রন্থ প্রকাশ হইল।
কিন্তু আদ্যিস কাব্য দেখিতে না পাই।
যে দেখি ভারতকৃত নব্য কিছু নাই।
এখন কতক নব্য নায়ক মজিয়া।
করে কত রস নানা নায়িকা লইয়া।
সে রস বর্ণিলে ভাল গ্রন্থ এক হয়।
তাঁহার সুকণ্ঠ তাকে ইথে সুখোদয়।
সভাস্থ সকলে বলে তাঁহার নিকটে।
এই মত গ্রন্থ করা যুক্তিসিদ্ধ বটে।
অনন্তর কহিলেন বিজ্ঞবিচক্ষণ।
যাক্তি কোথা পাব গ্রন্থ করিবে রচণ।
কেহ পরে কহিলেন তাঁহার কথায়।
ভবানীচরণ নাম বন্দ্য উপাধ্যায়।
সমাচার চন্দ্রিকা আকর গৌরে জানি।
তাঁহা হৈতে হইবেক এই অমুমানি।
সকলের সহ তিনি করিয়া মন্ত্রণ।
অদ্যে দিলেন গ্রন্থ করিতে রচনা।
তাঁহার বিনয় বাক্য শীকার করিয়া।

কি ভাবে রচিত গ্রন্থ নাই তাহা।
 ভাবিতে ভাবিতে ভাব হইল উদয়।
 নূতন দূতী আছে কতিপয়।
 প্রবলা হইয়া তারা নবো করে বশ।
 কত স্থানে কত মতে করে কত রস।
 দূতীভক্তি দূতী গুণিত করে বহুজন।
 গোপনে কেমনে দূতী করয়ে মেলন।
 যুবক যুবতী পেয়ে করে কি আচার।
 এসব বর্ণন করি করিয়া বিস্তার।
 প্রধান এ গ্রন্থমধ্যে হইবেক দূতী।
 অন্তএব দূতী বিলাসাখ্য এই পুতি।
 ভবানী চরণ ভাবি এ সকল মনে।
 আলোচনা করি গ্রন্থারম্ভিল রচনে।

৫। নববিবি বিলাস। ১৮৩০ সন (খ)

‘নববিবি বিলাস’ ভবানীচরণেরই রচনা—এইরূপ একটা কথা অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু এ-সম্বন্ধে কোন অঁকাটা প্রমাণ কোন লেখকই দিতে পারেন নাই। পুস্তকখানি দেখিবার সৌভাগ্য এখনও আমার ঘটে নাই। চট্টগ্রামের মুনশী আবদুল করিমের গ্রন্থাগারে এই পুস্তকের এক খণ্ড ছিল, এখন আর নাই। তিনি পুস্তকখানির একটি বর্ণনা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি :—

কাগজ ও আকারাদি ‘বাবু বিলাস’দির মত। আবরণ পরে লেখা আছে :—“শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণী শ্রীচরণ ভরগা। নববিবি বিলাস অর্থাৎ কুলটাবর্ষে কুলকামিনীর চুখ প্রকাশ। যথা।

“অগ্রে বেড়া পরে দাসী মধ্যে ভবতি কুচনী।

সর্বশেষে সর্বনাশে সারঃ ভবতি চুচনী।”

এতৎ ত্র্যমূলক বিস্তৃত গ্রন্থ। অদুর ও পদম ও কুম্ভ ও ফল এই খণ্ড চতুর্থে কুলটাবর্ষন ছিলে কুলটাবর্ষন ও মনোরঞ্জন ও জ্ঞানার্জন নিমিত্ত এই পুস্তক মুজাপুরনিবাসী শ্রীমধুধার আদেশে তৃতীয়বার কমলালয় যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল। সন ১২৪৭ সাল ইং ১৮৪০ সাল।”

আরম্ভে গণেশ, গুরু ও সরস্বতী বন্দনা; তৎপর ভূমিকা। যথা :—

“যদ্যপি নব বাবু বিলাসে নব বাবুদিগের প্ৰভাব অপ্রকাশ আছে, কিন্তু সে গ্রন্থের ফল খণ্ডে লিখিত ফলের প্রধান মূল বাবুদিগের বিবি, সেই বিবিজন প্রধান মূলের অনুরোধে শেষ ফল তাহাতে সবিশেষ ব্যক্ত হয় নাই, এ নিমিত্তে তৎপ্রকাশে এতাদৃশ পূরক নববিবি বিলাস নামক এই গ্রন্থ রচনা করিলাম।” ইত্যাদি।

শেষ।—

অতঃপর ছাড়ি দাসী হইল কুচনী।
 সর্ব শেষ সর্ব নাশে লইল চুচনী।
 এক জর্মে চারি অর্থ হইল আমার।
 নষ্ট হয়। কষ্ট এত পাই বার বার।
 অতএব পুনঃ করি নিবেদন।
 কুল ধর্ম রক্ষা কর কুল নারীজন।
 অগ্রে বেড়া পরে দাসী ইত্যাদি।

প্রাণ্ডত্ব ত মোক। ইতি নববিবি বিলাসঃ সমাপ্ত।

ভাষা গজ পদ্ম। স্থানে স্থানে হিন্দী বোল আছে। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১১৭।

... ... ভণিতা নাই, তবে সম্ভবতঃ ইহাও ‘নববাবুবিলাস’ রচয়িতার রচিত।*

উপরিস্থিত সংস্করণটিতে গ্রন্থকারের নাম নাই, কিন্তু বিলাতের ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরিতে এই পুস্তকের যে খণ্ডটি (১৮৫৩ সন, পু.

* বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ—মুনশী শ্রীআবদুল করিম সঙ্কলিত। ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, পৃ. ২৬৬।

১১৭৬

শনিবারের চিঠি, শ্রাবণ, ১৩৪৩

সংখ্যা ৮২) আছে তাহাতে গ্রন্থকাররূপে ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম আছে। ইহা ছদ্মনাম হওয়াও বিচিত্র নয়; 'প্রমথনাথ' শব্দও এই ছদ্মনামে ভবানীচরণ 'নববাবু বিলাস' প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং 'ভবানীচরণ' 'প্রমথনাথ' ও 'ভোলানাথ'—তিনটি নামের অর্থও এক। তবে একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে ভবানীচরণের অস্বাভাবিক পুস্তকের দ্বারা 'নববিবি বিলাস' তাহার সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্রে মুদ্রিত হয় নাই। পুস্তকখানি যন্ত্রিত হইবার অব্যবহিত পূর্বে সংবাদপত্রে এই বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হইয়াছিল :—

বিজ্ঞাপন। সম্ভ্রতি উক্ত যন্ত্রে [“বহুভাষ্যে দেবুতলার গেনে অমর সিংহ চৌধুরির বাগিতে উপেক্ষালাল যন্ত্রে”]...বিবিবিলাস...যন্ত্রিত হইবে এতদ্বারা গ্রন্থাভিলাষী যদি কেহ হন তবে মল্লবার শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন সিংহ চৌধুরির নিকটে পত্র প্রেরণ করিবেন...বিবিবিলাস ১, ইতি। ('সমাচার বর্নন', ২৮ আগষ্ট ১৮৩০)

আর একটা কথা, জীবনচরিতে ভবানীচরণের গ্রন্থাবলীর মধ্যে তাহার বেনামী রচনা 'নববাবু বিলাস'ের উল্লেখ আছে, কিন্তু 'নববিবি বিলাস'ের উল্লেখ নাই। তবে ইহাও স্বীকার্য যে ভবানীচরণের সর্বগ্রন্থের নাম তাহার জীবনচরিতে পাওয়া যায় না; উদাহরণ-স্বরূপ 'আশ্চর্য উপাখ্যান' ও 'হিতোপদেশ'ের নাম করা যাইতে পারে।

৬। শ্রীশ্রীগয়াতীর্থ বিস্তার। ১৮৩১ সন।

এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ ১২৩৮ সালে (= ১৮৩১ সনে) এবং দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৪৩ সনে প্রকাশিত হয়। 'সমাচার চন্দ্রিকা' হইতে দুইটি অংশ উদ্ধৃত করিতেছি; তাহা হইতে উভয় সংস্করণের প্রকাশ-কাল জানা যাইবে :—

শ্রীশ্রীগয়াতীর্থ বিস্তার গ্রন্থ পদ্য পয়ার ভাষায় সর্বসাধারণের মনোরঞ্জন হইয়াছে যেহেতু পুণ্যভাগিতে সকলি আছে বটে কিন্তু শ্রদ্ধাধির সকল পাঠ্য নহে।—

কল্পটিং চন্দ্রিকাপাঠকল্প ১...৩ বৈশাখ। ('সমাচার চন্দ্রিকা', ২২ এপ্রিল ১৮৩১।)

শ্রীশ্রীগয়াতীর্থ বিস্তার।—পাঠকবর্ণের দ্বন্দ্ব ধাকিতে পারে গত ১২৩৮ সালে আমরা গয়াতীর্থ বিস্তার নামক একখানি ক্ষুদ্র বহি রচনা পূর্বক মুদ্রিত করিয়া চন্দ্রিকা গ্রন্থকর্ণের পারিতোষিক প্রদান করিয়াছি এক্ষণে সেই গ্রন্থ এ যন্ত্রালয়ে আর না থাকিতে কোনও ব্যক্তির অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি নাই তজ্জন্ত পুনর্বার ঐ পুস্তক মুদ্রাক্ষিত করা গেল...। বাহুপুর্ণার সহিত ঐকা করিয়া স্থান শ্রুতকরত পৌরীয়া সাধুভাষায় পয়ারাঙ্কনে রচনা করা গিয়াছে তাহা তজ্জগৎমানিদিগের উপকারজনক বটে। ('সমাচার চন্দ্রিকা' ৭ ডিসেম্বর ১৮৪৩।)

৭। আশ্চর্য উপাখ্যান / অর্থাৎ মুক্ত কালীশঙ্কর রায়ের বিবরণ। / কমতাদিকীর্তীকৃত্য ইহাতে বর্ণন। / কলিকাতা নগরে / সমাচারচন্দ্রিকা যন্ত্রে মুদ্রিত হইল। / ১ চৈত্র ১২৪১ সাল। / [—১৩ মার্চ ১৮৩৫]

২০ পৃষ্ঠার এই পুস্তিকাখানিতে যশোহর, নড়াইলের জমীদার কালীশঙ্কর রায়ের কীর্তি-কাহিনী পয়ার ছন্দে বর্ণিত হইয়াছে। আখ্যায়িক পত্রে গ্রন্থকারের নাম না থাকিলেও শেষ পৃষ্ঠায় আছে, যথা—

শ্রীভবানী চরণ ষ্ট্রি বন্দ্যোপাধ্যায়।
হৃদয়িত পুণ্য কীর্্তি রচিলা ভাষায়।

পাদরী লঙের তালিকায় (পৃ. ৭৮) এই পুস্তিকার প্রকাশকাল "১৮৩৪ সন" বলিয়া মুদ্রিত হইয়াছে; প্রকৃতপক্ষে ইহা ১৮৩৫ সন হইবে। কলিকাতার ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরিতে (No. 182. Nc. 83. 1.) এক খণ্ড 'আশ্চর্য উপাখ্যান' আছে।

৮। শ্রীশ্রীজগন্নাথঃ / শ্রীভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক / সংগৃহীত / পুরুষোত্তম চন্দ্রিকা। / অর্থাৎ শ্রীক্ষেত্রদামের বিবরণ। / সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্রে মুদ্রিত। / হইল ইতি। / ১৭৬৬ শকাব্দ / ১২৫১ সাল। / [পৃ. সংখ্যা ৭৭]

এই পুস্তক মুদ্রিত হইবার পর ১৮৪৪ সনের ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে 'সমাচার চন্দ্রিকা' লিখিয়াছিলেন :—

শ্রীশ্রীপুণ্ড্রোত্তম চন্দ্রিকা। পাঠকবর্গের স্মরণ আছে আমরা পূর্বে পুণ্ড্রোত্তম চন্দ্রিকা চন্দ্রিকা যন্ত্রে মুদ্রিতারম্ভ করিয়া আপনাবিগকে সংবাদ দিয়াছি এক্ষণে বিদিত করিতেছি যে সেই পুস্তক মুদ্রিত সমাপ্ত হইয়াছে...। গ্রন্থের সংক্ষেপ বিবরণ এই গ্রন্থমত লক্ষ্যকেন্দ্রে অর্থাৎ পুরোধামে প্রসিদ্ধ যত দেবমুর্ত্তি আছেন এবং তথায় গমন করিয়া যেহেতু একাকারে তীর্থ করিতে হয় ও শ্রীশ্রীমুর্ত্তির দ্বাদশ বাজা ছত্রিশ নিয়োগ ইত্যাদি অংশ বিশেষ রূপে লিখিত হইয়াছে অপর ঐ ধামে প্রতিদিন যেহেতু কার্য্য নির্বাহ হয় তাহা উদ্ভাষ্য ভাষায় লিখিত হইয়া থাকে তাহার নাম মারলা পত্রিকা কহে সেই পত্রিকা হইতে কলিমুগের আরম্ভাবধি বর্তমান সময় পর্য্যন্ত যত রাজা ঐ রাজ্য অধিকার করিয়াছেন ফলত রাজা মুখিগিরাবধি বর্তমান রাজা রামচন্দ্র দেবের অধিকারপর্য্যন্ত যতই নতুন কর্ত্তি হইয়াছে ও তাঁহারদের রাজ্য কাল শকাব্দ সহিত মিলিত করিয়া এতাবৎ সংক্ষেপে সংগৃহীত হইয়াছে তাহাতে প্রকাশ আছে রক্ত বাহু কালাপাহাড় ইত্যাদির উপাখ্যান বা ইতিহাস অতি আশ্চর্য্য। দ্বিতীয় চন্দ্রকেন্দ্রে যাহা ভুবনেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ তথায় কোটি লিঙ্গ আছেন। তৃতীয় গদ্যকেন্দ্রে ফলত যাজপুর যে স্থানে নাভিগয়া অর্থাৎ গয়াপুরের নাভিদেশ তথায় গয়াশ্রাদ্ধ করিতে হয়। চতুর্থ পদ্মকেন্দ্রে যাহা কণারক বলিয়া খ্যাত তথায় শূর্য্য ও চন্দ্র মুর্ত্তি ছিলেন তাহা পুরোধামে আনাত হন ইত্যাদি নানা ইতিহাস সখলিত উক্ত চারি কেন্দ্রের বিশেষ বিবরণ অশ্রুৎ কর্ত্তৃক গোড়ায় ভাষায় গদ্য পদ্য রচনায় পুণ্ড্রোত্তম চন্দ্রিকা নামে প্রস্তুত হইয়াছে। গ্রন্থের পুস্তক মূল্য ১ টাকা স্থির করা গিয়াছে ইতি।

কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি, উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরি, রামমোহন লাইব্রেরি এবং রাজা রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে এই পুস্তক আছে। *

* শ্রীগুত শিবরতন মিত্র 'বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবক' গ্রন্থের ৪৪১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে ভবানীচরণ ১৮৪২ সনে 'রাগীভবাগচরিত' নামে একখানি পুস্তক রচনা করেন। এই

প্রাচীন শাস্ত্রাদি গ্রন্থ প্রকাশ :—

ভবানীচরণ তাঁহার সমাচার-চন্দ্রিকা মুদ্রায়ন্ত্রে অনেকগুলি শাস্ত্র-গ্রন্থ ও কয়েকখানি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ পুনর্মুদ্রিত করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবন-চরিতে প্রকাশ :—

"তিনি সটীক শ্রীভাগবতের ও সটীক মহাসংহিতার চুস্তাপাতা নিরাকরণ কারণ বহুযয়ে পুস্তকস্বয় মুদ্রিত করেন। এতদ্ব্যতীত অসিংহিতা প্রভৃতি মূলমুদ্রিত প্রচলন ছিল না একারণ ঐ মহাত্মা জাতিগিরি নানাদেশ হইতে তাহার আদর্শ আনাইয়া ভাষাভাষার সংশোধন পূর্বক উনবিংশতি সংহিতা মুদ্রাঙ্কিত করিয়া দেশের পরমোপকার করেন, তরনশ্বর সটীক শ্রীভাগবতসীতা ও সটীক গ্রন্থাখচন্দ্রোদয় নাটক ও হস্তাধার নাটক প্রভৃতি কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কণ করিয়াছেন, পরিশেষে গত বর্ষে বহুদিনের প্রতিজ্ঞাত শ্রীরঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কৃত ২৮ তত্ত্ব নব্য স্মৃতি সম্পূর্ণ রূপে মুদ্রিত করেন।" (পৃ. ১৬)

এই সকল গ্রন্থের মধ্যে আমি যেগুলির সন্ধান পাইয়াছি, সেগুলির নাম, প্রকাশকাল ও প্রাপ্তিস্থানের উল্লেখ করিতেছি :—

(১) শ্রীমদ্ভাগবত। ৩১ বৈশাখ ১৭৫২ শক।

ইহা পুথির আকারে তুলট কাগজে মুদ্রিত। ইতিপূর্বে বোধ হয় এই ধরণে আর কোন গ্রন্থ ছাপা হয় নাই। গ্রন্থের পুণ্ড্রিকায় ভবানী-

উজ্জির মূলে কোন সত্য নাই বলিয়াই আমার বিশ্বাস। পাদবী লঙ্ঘের নিম্নলিখিত পুস্তকটি অমুখ্যাব্দ করিতে যাইয়া মিত্র মহাশয় বোধ হয় "সমাচার চন্দ্রিকা-সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনচরিত"-এর স্থলে "রাগীভবাগচরিত" অমুখ্যাব্দ করিয়াছেন :—"In 1842 we had the life of Bhavanā, editor of the Chāndrika and the great leader of the Pro Sati party, a curious piece of biography." (Long's Descriptive Catalogue of Bengali Books, p. 25.)

চরণের বংশ-লতা এবং মূত্রগম্যাস্থিকাল—৩১ বৈশাখ ১৭৫২ শক—১২ মে ১৮৩০ দেওয়া আছে। এই গ্রন্থ জোড়াসাঁকো রাজবাটীর রাজা শিবচন্দ্র রায়ের অর্থাহুকুলো মুদ্রিত হয়। ১৮৪২ সনের ৩১ মে তারিখে ‘সম্বাদ ভাস্কর’ লেখেন :—

রাজা শিবচন্দ্র রায় বাহাদুর বিহারী জিলেন, তাঁহার ঘনতেই চন্দ্রিকা যন্ত্রালয়ে শ্রীমন্তাগবত গ্রন্থ অতি শুদ্ধরূপে মুদ্রাঙ্কিত হয়, তাহার প্রত্যেক গ্রন্থের মূল্য ৩২ টাকা নির্দিষ্ট করিয়া চন্দ্রিকাসম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাবু টাকা লইয়াছেন, রাজা শিবচন্দ্র রায় বাহাদুর সে টাকা গ্রহণ করেন নাই।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-গ্রন্থাগার ও এশিয়াটিক সোসাইটিতে এই গ্রন্থ আছে।

(২) প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক। ২০ শ্রাবণ ১৭৫৪ শকাব্দাঃ।

১৮৩২ সনের জুন মাসে সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ মিশ্রের ‘প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক’ তুলট কাগজে পুথির আকারে মুদ্রিত হয়। গ্রন্থশেষে আছে :—

শ্রবণরত্নর ধরনি পরিমিত শকাব্দীয় শ্রাবণ শুক্লাবিন্দু বিশেষবাসরে কলিকাতা নগরে বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীভবানীচরণ শর্মা পরম কল্যাণবৎসল্য মাজবদাচরণগ্রন্থে নড়াল নিবাসি শ্রীকৃষ্ণ বাবু রাধাচরণ রায় মহাশয় মহোদয়প্রামুখ্যতা প্রবোধচন্দ্রোদয় নামধের নাটকমিদং সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিতঃ।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-গ্রন্থাগারে এই গ্রন্থের এক খণ্ড আছে।

(৩) বিপ্রভক্তি চন্দ্রিকা। “কলিকাতা নগরে সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্রে মুদ্রিত শকাব্দাঃ ১৭৫৪” ॥ পৃ.-সংখ্যা ১০।

পুথির আকারে তুলট কাগজে ছাপা। পুস্তিকার বিষয়বস্তু :— মতিলাল শীল ধর্মসভায় প্রব্রু করেন, “শূদ্রবৈষ্যক ব্রাহ্মণের নমস্ত কি না। ঐ বৈষ্যক ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিলে ঐ ব্রাহ্মণ সেই বৈষ্যককে প্রণাম

করবেন কি না এবং শূদ্রবৈষ্যকের প্রসাদ ব্রাহ্মণ ভোজন করিতে পারেন কি না। ধর্মসভার পণ্ডিতবর্গ—নিমাইচন্দ্র শিরোমণি, শঙ্কুচন্দ্র শর্মা, জয়-গোপাল তর্কালঙ্কার ও হরনাথ শর্মা—এই প্রশ্নের উত্তরে যে ব্যবস্থাপত্র দেন তাহা ভাষার্থসহিত এই পুস্তিকায় মুদ্রিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ধর্মসভায় সম্পাদক রূপে ভবানীচরণের সহিত মতিলাল শীলের যে কথানি পত্র-ব্যবহার হয় তাহাও পুস্তিকায় স্থান লাভ করিয়াছে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-গ্রন্থাগারে ‘বিপ্রভক্তি চন্দ্রিকা’র এক খণ্ড আছে।

(৪) মহুসংহিতা। ২০ ফাল্গুন ১৭৫৪ শক।

গ্রন্থের পুস্তিকায় মূত্রগম্যাস্থিকাল—২০ ফাল্গুন ১৮৫৪ শক—২ মার্চ ১৮৩৩ দেওয়া আছে। ইহাও তুলট কাগজে পুথির আকারে মুদ্রিত। সাতক্ষীরার জমীদার (তৎকালে কাশীপুর-নিবাসী) প্রাণনাথ চৌধুরীর আত্মকুলো মহুসংহিতা মুদ্রিত হয়।

এশিয়াটিক সোসাইটিতে ইহার এক খণ্ড আছে।

(৫) উনবিংশ সংহিতা। (অদ্বিঃ, আপত্তন্ত, অত্রি, শঙ্ক, শাতাতপ, দক্ষ, গৌতম, হারীত, কাত্যায়ন, লিখিত, পরাশর, সম্বর্ত, উশনঃ, বিষ্ণু, বৃহস্পতি, বাস, যাজ্ঞবল্ক্য, যম ও বশিষ্ঠ সংহিতা)। এই সকল সংহিতার কোনখানিতেই মূত্রগম্যাস্থিকাল দেওয়া নাই। আত্মমানিক ১৮৩৩ সনে এগুলি মুদ্রিত হয়।

মহুসংহিতা-সমেত উপরিক্ত উনবিংশ সংহিতা প্যারিসের Bibliotheque Nationale-এ আছে (Catalogue General des livres imprimes de la Bibliotheque Nationale, vol. xii)

কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরিতে বশিষ্ঠ সংহিতা

ছাড়া বাকী ১৮ খানি সংহিতা আছে। এই সকল সংহিতা পুথির আকারে তুলট কাগজে ছাপা।

(৬) শ্রীভগবদ্গীতা। ৩ অখিনি ১৭৫৭ শক (“সিদ্ধেশ্বরধর-ধরশাকীয়াখিনিত্ত তৃতীয়বাসরে”)।

১৮৩৫ সনে, সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্রে, তুলট কাগজে পুথির আকারে ইহা মুদ্রিত হয়।

এই গ্রন্থের এক খণ্ড এশিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরিতে আছে।

(৭) রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কৃত অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব নব্য স্মৃতি।

গ্রন্থে মূদ্রণকাল দেওয়া নাই। ১৮৪৮ সনে ইহার মূদ্রণ সমাপ্ত হয় বলিয়া মনে হইতেছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্মিলনীর গ্রন্থাগারে ইহার এক খণ্ড আছে।

ধর্মসভা :—

ভবানীচরণের আর একটি শ্রমগীর্ষ কাথ্য ধর্মসভা নামে সমাজ স্থাপন। প্রধানতঃ তাঁহারই উদ্যোগে এই সভা স্থাপিত হয় এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি এই সভার সম্পাদক ছিলেন।

ধর্মসভা স্থাপিত হয় ১৭ জ্যৈষ্ঠয়ারি ১৮৩০ (৫ মাঘ ১২৩৬) তারিখে। সহমরণ-নিবারণ-আইনের বিরুদ্ধে বিলাতে আপীল করা এই সভার উৎপত্তির অমৃতম কারণ হইলেও, প্রধানতঃ “স্বধর্ম ও সমাচার ও সম্ব্যবহারাদি রক্ষার্থ” এই সভা স্থাপিত হইয়াছিল।*

ভবানীচরণের জীবনীতে ধর্মসভার এই বিবরণটি পাওয়া যায় :—

“১২৩৫ সালে প্রদেশীয় ধর্মরক্ষার্থ উক্ত মহাশয়ের প্রযত্নে এই ধর্মসভা স্থাপিত হইয়া ইহার দ্বারা প্রদেশের যে হিতোপলব্ধি হইয়াছে তাহা সাধারণের অবিস্মিত

নাই, যদিও এই সভার মুখোদ্দেশ্য সত্যি সহগমন ধর্ম নিবারণের আইন নিবারণ কুটিল কাল সহকারে না হউক তথাচ বিলাত হইতে অল্প ২ ধর্ম বিষয়ে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের হস্ত ভ্রাস নিবেদে স্পষ্টাঙ্গ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে এবং কলনাইজ অর্থাৎ এতদ্দেশে বিনাদেশে ইংলণ্ডীয় সাধারণের প্রতিবাসিতাক্রমে বসবাস করণ বাহা এতদ্দেশীয়দিগের অতি ভয়ানক তাহার নিবারণ হইতাত্বে, এই সভার দ্বারা জগীচাঁদ্রি কৃষ্ণবিহারি নাস্তিক মতাক্রান্ত হিন্দু সন্তানেরদিগের মতগর্প ধর্ম হইয়া সনাতন ধর্ম উজ্জ্বল আছে, নানাদেশীয় ধার্মিকগণ ধর্ম বিষয়ে নির্ধাতন প্রাপ্ত হইয়া এই সভাকে অবগত করিলে ইহার দ্বারা যথাসাধ্য কার্য্যসিদ্ধির চেষ্টা হইয়া থাকে, এই মহাসভার শাখা সভা নানা প্রদেশে অর্থাৎ ঢাকা পাটনা দানাপুর আব্দুল গভূতি স্থানেন স্থাপিতা হইয়া ধার্মিকগণের ধর্মরক্ষা হইতেছে, সাধারণের অহিত ব্যাপার উপস্থিত হইলে এই সভা রাজদ্বারে আবেদন দ্বারা হিতৈষিণী হইয়া থাকেন, পাজি সাহেবেরা বিনাদানদ্বলে হিন্দু বালককে যে জগীচাঁদ্রি করিতে নিতান্ত যত্নবান তদ্বিবারণ কারণ শীলস ফিকালেজ নামক অবৈতনিক বিদ্যালয় এই সভার অধীন স্থাপিত হয়, নগরীয় প্রধান ব্যক্ত বালক যুজাতুর বিদ্যাবাদি গ্রামাঞ্চাদনে অবসর হইলে এই সভাদ্বারা দানপত্রী হইয়া যথোদ্যোগ্য দাসিক বৃত্তিবরূপ বিত্ত পাইয়া থাকেন ইত্যাদি প্রকার দেশীয় নানা মঙ্গল এই সভাদ্বারা হইয়া থাকে, এবং সন্ত ধর্মসভার স্তম্ভিকর্তা উক্ত মহাশয় তজ্জাত ইহার সভ্যরা এই সভার সম্পাদকত্ব পদে তাঁহাকে অভিযুক্ত করেন ইতি।” (জীবনচরিত, পৃ. ১৩-১৮)

মৃত্যু নিবরণ :

১৮৪৮ সনের ২০এ ফেব্রুয়ারি (৯ ফাল্গুন ১২৫৪) তারিখে ভবানীচরণ ভাগীরথী-তীরে দেহরক্ষা করেন। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব হইতে তিনি বহুমুগ্ন রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন।

* সংবাদপত্রে দেখালের কথা, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৪, ১৫৫, ১৫৬ প্রভৃতি।

সে-যুগে লেখক ও বিদ্বান ব্যক্তি হিসাবে তাঁহার কি প্রতিষ্ঠা ছিল তাহা সমসাময়িক বিবরণ হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

ভবানীচরণের মৃত্যুতে গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ তৎসম্পাদিত 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রে লিখিয়াছিলেন :—

"ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এই গুণে আমরা শোকাকুল হইতেছি গোড়ায় তাঁহার ব্যাকরণ স্তম্ভ গদ্য পদ্য লিখিতে এবং সংগ্রহ করিতে তাঁহার তুলা ব্যক্তি আর দেখিতে পাই না, কোন বিষয়ে বাহাদুর্য্য উপস্থিত হইলে ভবানী বাবুর সহিত লিপি মুদ্রে আমরা ভীত চইতাম, এবং অনেক বিষয়ে তিনি বাহা লিখিয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে শিক্ষকরূপে মান্ত করিয়াছি,..." (জীবনচরিত, পৃ. ২১)

'ফ্রেড-অব-ইণ্ডিয়া' (৮ জুন ১৮৭৮) লেখেন :—

"Friday June 2...the Dhurma Sabha is about to print, and circulate among its friends, a memoir of its late able Secretary, Baboo Bhobany Churn Banerjee...We take great shame to ourselves for having neglected distinctly to notice the death of this Native gentleman, one of the ablest men of the age ;"

ভবানীচরণ একবার সদর আমীন পদপ্রার্থী হন। এই সংবাদ পাইয়া সে-যুগের একখানি শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র—শ্রীরামপুরের 'সমাচার দর্পণ' সম্পাদকীয় স্তম্ভে লেখেন :—

অনেককালাবধি শ্রীমত বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমাদের আলাপ পরিচয় আছে এবং যদ্যপিও তাঁহার আমায়দিগের সঙ্গে কোন পক্ষে সংগ্রতিপক্ষতাও থাকুক তথাপি সত্য কহিতে হইলে জান বুদ্ধিতে তাঁহার তুলা এতদেশে অপর ব্যক্তি ছিল না। (১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২।)

শ্রীপ্রজ্ঞেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিজ্ঞপ্তি

শনিবারের চিঠির পাঠকবর্গের নিকট একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি করিতেছি। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লইয়া যাহারা আলোচনা করেন তাহারা জানেন যে মাত্র দেড়শত বৎসরের অনধিককাল বাংলা ভাষায় পুস্তক ও পত্রিকা মুদ্রণ-কাণ্ড আরম্ভ হইলেও ইতিমধ্যেই বহু মুদ্রিত পুস্তক ও পত্রিকা নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। প্রাচীন লাইব্রেরীর ক্যাটালগে অথবা পুরাতন পত্রিকার সমালোচনা-পুঠায় অথবা বিজ্ঞাপনে এমন অনেক পুস্তকের নাম পাইতেছি যাহার কভকগুলির কোনই সন্ধান মিলিতেছে না, কয়েকটি, প্রসিদ্ধ এবং অপ্রসিদ্ধ, সাধারণ অথবা ব্যক্তিগত পুস্তকাগারের অতি সুরক্ষিত ছুত্ৰপ্য বিভাগে এমন ভাবে অবস্থান করিতেছে যে বিশেষ অত্মসন্ধিৎসা ও অধ্যবসায় ব্যতিরেকে সেগুলি কেহই চোখেও দেখিতে পাইবেন না; এতদসঙ্গেও স্থানীয় কীট ও জলবায়ু মাহাশ্বেদ্যে বইগুলির অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছে যে আর কিছুদিন পরে ইহারও অনেকগুলির সন্ধান মিলিবে না। বৈদান্তিক বাঙালী বলিবেন, মহাকাল বাহা গ্রাস করিতেছেন তাহাকে টিকাইয়া রাখবার স্পন্দনা না থাকাই ভাল, কিন্তু ঐতিহাসিক তাহা মানিবেন কেন? ইতিবৃত্ত আলোচনা করিতে গিয়া প্রতিদিন দেখা যাইতেছে মহাকাল বিচিত্র লীলাময়; মানুষের বিচারে বাহা ভাল তাহার অনেক কিছুই বিলুপ্ত হইয়াছে, বাহা মন্দ তাহারই অনেকগুলি সগৌরবে টিকিয়া আছে। স্বতরাং মানুষ মহাকালকে উপেক্ষা করিয়া প্রাচীনকে বর্তমানে টানিয়া আনিতে কখনই দ্বিধা করিবে না। কোনও বস্তুর (পুস্তকই ধরা যাক) নিজস্ব মূল্য বিচারে পুনর্জীবন প্রাপ্তির অধিকার না থাকিলেও প্রাচীন কালের সমাজ ও সাহিত্যের ইতিহাসের উপকরণ হিসাবে মূল্য অসামান্য হইতে পারে।

নানাদিক বিবেচনা করিয়া আমরা বর্তমান সংখ্যা হইতে শনিবারের চিঠিতে এই ধরণের কয়েকটি ছাপ্রাপ্য অথচ অত্যন্ত মূল্যবান পুস্তক পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা করিলাম। এইগুলি **দুঃপ্রাপ্য গ্রন্থমালা** নামে পুস্তকাকারে স্বতন্ত্র প্রকাশিত হইবে এবং মাত্র নিষ্কিষ্ট সংখ্যা ছাপা হইবে। যাহারা স্বতন্ত্র পুস্তক ক্রয় করিতে অনিচ্ছুক তাহারা মাসে মাসে ধারাবাহিকভাবে শনিবারের চিঠিতেই সেগুলি পড়িতে পারিবেন। অত্যন্ত দুঃপ্রাপ্য এবং অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পুস্তক ছাড়া এই বিভাগে কিছু প্রকাশিত হইবে না।

প্রথমেই আমরা 'কলিকাতা কমলালয়' নামক একখানি পুস্তক পুনর্মুদ্রিত করিতেছি। এই পুস্তক অথবা ইহার গ্রন্থকার কেহই এখন আর সাধারণ বাঙালী পাঠকের পরিচিত নহেন, অথচ এমন একদিন ছিল যেদিন এই পুস্তকের লেখক সৎক্ষে 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'তে লিখিত হইয়াছিল—“one of the ablest men of the age” ইনিই সুবিখ্যাত 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রিকার সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বর্তমান সংখ্যা শনিবারের চিঠির প্রথম প্রবন্ধে সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বহু পরিশ্রম করিয়া এই বিশ্বতপ্রায় সাহিত্যধুরন্ধরের জীবনী সৎক্ষে যতটুকু উপাদান সংগ্রহ করা সম্ভব তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহার অতিরিক্ত কিছু জ্ঞানিবার এখন আর সম্ভাবনা নাই। এই প্রবন্ধই 'কলিকাতা কমলালয়' পুস্তকের ভূমিকা স্বরূপ মুদ্রিত হইবে।

ভবানীচরণের মত একজন এত বড় শক্তিশালী সম্পাদক ও লেখক যে কেন একশত বৎসর অতিক্রান্ত হইতে না হইতেই বিশ্বতিগর্ভে তলাইয়া গেলেন তাহা ভাবিবার বিষয়। ব্রজেন্দ্রবাবু-লিখিত জীবনী পাঠ করিলেই ভবানীচরণের বহুবিধ কীর্তি ও বহুমুখী প্রতিভার কথা

সকলেই জ্ঞানিতে পারিবেন; অথচ এই কীর্তি ও প্রতিভা তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারে নাই। ইহার একটি কারণ এই হইতে পারে যে, তিনি ছিলেন রক্ষণশীল দলের নেতা। বিপ্লবের যে প্রবল বহা ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী সমাজে ভাঙন ধরাইতে আরম্ভ করিয়াছিল তিনি প্রবল বিক্রমে তাহার বিকক্ষে লড়িতে শুরু করিয়াছিলেন; রামমোহনের মত প্রবল প্রতিপক্ষকেও তিনি যথেষ্ট বেগ দিয়াছিলেন কিন্তু কালের প্রচণ্ড তরঙ্গাঘাতে ঐরাবতের মত বিরাট তিনিও ঝাড়াইতে পারেন নাই। পরবর্ত্তী যুগে উপর্য্যাপি যে ধারা তরঙ্গ তুলিয়া বাংলার সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রাবল আনিয়াছে তাহা রামমোহনেরই উত্তরসূর্য্যধকদের ধারা। স্বতরাং ভবানীচরণ আর মাথা তুলিবার অবকাশ পান নাই, তলাইয়া গিয়াছেন।

ভবানীচরণ রচিত অনেকগুলি পুস্তকের মধ্যে 'কলিকাতা কমলালয়'কেই কেন প্রাধান্য দেওয়া হইল তাহা বলা প্রয়োজন। তদানীন্তন সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ হিসাবে 'নববাবু বিলাস', 'নববিবি বিলাস' (প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকিলেও পরোক্ষ প্রমাণের দ্বারা ভবানীচরণের রচনা বলিয়া অস্বীকৃত), 'দুতী বিলাস' ও 'কলিকাতা কমলালয়' এই চারিটি পুস্তকই উল্লেখযোগ্য। প্রথম তিনটি পুস্তকের বিষয়বস্তু ও তদ্বিষয়ক বর্ণনা বর্ত্তমানে কচিবিগর্হিত মনে হইতে পারে। সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ হিসাবেও 'দুতী বিলাস' নিরুপ্ত গ্রন্থ। স্বতরাং 'কলিকাতা কমলালয়'কেই প্রাধান্য দেওয়া হইল।

ব্রজেন্দ্রবাবুর বর্ণনা হইতে দেখা যাইবে যে এই পুস্তকের বিষয়—প্রশান্তরঞ্জে কলিকাতার রীতিবর্ণন। এই পুস্তক ১৮২৩ সালে প্রথম মুদ্রিত হয়। স্বতরাং দেড়শত বৎসর পূর্ব্বের কলিকাতার বাঙালী সমাজের বর্ণনা ইহাতে পাওয়া যাইতেছে। ব্রজেন্দ্রবাবু এই পুস্তকের দুইটি কপি মিলাইয়া পাঠ প্রস্তুত করিয়াছেন, এই কার্যে শ্রীযুক্ত অমলাচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছেন।

বর্তমান সংখ্যায় ভবানীচরণের জীবনী ও রচনা প্রায় ৪ ফর্দা স্থান অধিকার করিয়াছে বলিয়া আমরা পত্রিকা এক ফর্দা বাড়াইয়া দিলাম। ভবানীচরণের জীবনই প্রমাণ করিয়া দিবে যে বাংলা সাহিত্য-পত্রিকায় এতখানি স্থান তিনি দাবী করিতে পারেন। ব্রজেনবাবুর সাহায্যে আমরা যে তাঁহার প্রাপ্যের সামান্য অংশও দিতে পারিলাম এইজন্য নিজদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেছি। শনিবারের চিঠির পাঠকেরা অল্পগ্রহ পূর্বক এই সংখ্যাকে ‘ভবানীচরণ সংখ্যা’ জ্ঞান করিয়া আমাদের দিকে কমা করিবেন।

আগামী সংখ্যায় ‘কলিকাতা কমলালয়’র শেষ অংশ প্রকাশিত হইবে।

১২৮০ সালে প্রকাশিত ‘বঙ্গভূষণ’ নামক পুস্তকে সুবিখ্যাত কবি ও নাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায় মহাশয় ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে যে প্রশংসা-কবিতা লিখিয়াছিলেন তাহাই পুনর্মুদ্রিত করিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিলাম।

বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

চন্দ্রমা-চন্দ্রিকা যথা নিশার যতনে
বিশদ বিভায়, মরি সাদরে সাজায় ;
তেমতি “চন্দ্রিকা” তব আজো বাঙ্গালায়
সাজাইছে রাজ-নীতি-বিভা বিতরণে।
দেশ-হিতে ব্রতী হয়ে যুঝিলে বিস্তর
বিপক্ষ পত্রের সহ, শুধু অস্ত-বল
আছিল “চন্দ্রিকা”-রব ; গদ্যতে সম্বল
করি যথা ভীম দলে অরুণকরিকর।
যা কিছু সম্বাদ পত্র—নিরখি এখন—
বঙ্গভাষা—প্রকাশিত বঙ্গের ভিতরে,
তোমার “চন্দ্রিকা” দ্বিজ, অতি পুরাতন,
নিষ্কিয়ে আজিও বঙ্গ নিয়ত বিহরে।
এ বঙ্গ বিরল লোক তোমার মতন,
তাইত আক্ষেপে সবে বিমর্ষ অন্তরে।

শ্রীভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিরচিত

কলিকাতা কমলালয়

প্রথম তরঙ্গ

কলিকাতা সমাচারচন্দ্রিকা যন্ত্রে

মুদ্রিত হইল

সন ১২৩০

শ্রীশ্রীহরিঃ ॥—

অথ নির্ঘণ্টঃ

বিষয়	পত্র	পঙ্ক্তি
কলিকাতা কমলালয় ভূমিকা	১	১
কলিকাতা কমলালয়	৫	১
কলিকাতা কমলালয় প্রথম তরঙ্গে এই মহানগরের বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইবার বাসনায় কোন বিদেশির জিজ্ঞাসার উপক্রম	৭	১১
জিজ্ঞাসার উপক্রমে দোষ বিবেচনার উল্লেখ	৮	৩
বিদেশির জিজ্ঞাসা	৮	৭
নগরবাসির দোষোন্মেষণ	৮	৯
বিদেশির প্রত্যুত্তর	১২	১০
আচারভ্রষ্ট বিষয়ক বিদেশির প্রশ্ন	১৪	১৫
নগরবাসির উত্তর	১৫	৪
বিদ্যি ভ্রষ্টলোকের ধারা	১৫	১০
মধ্যবিত্ত ভ্রষ্টলোকের ধারা	১৬	১৪
অসাধারণ ভাগ্যবান লোকের ধারা	১৭	৮
বিফুপরাগণ বিষয়ে ত্রিপদী	১৮	৩
কণ্ঠকাণ্ড সঙ্ঘ্যাবন্দনাদি বিষয়ক বিদেশির প্রশ্ন	১৯	৩
নগরবাসির উত্তর	১৯	৯
শাস্ত্রাধ্যয়নাদি ত্যাগ বিষয়ক বিদেশির প্রশ্ন	২০	১৬

কলিকাতা কমলালয়

১১২১

বিষয়	পত্র	পঙ্ক্তি
নগরবাসির উত্তর	২২	১২
ভ্রষ্টলোক স্বাভাৱীয় ভাষায় অল্প স্বাভাৱীয় ভাষা মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করেন, এতদ্বিষয়ে বিদেশির প্রশ্ন	২৪	১২
ভাষাকথা যাবনিক ভাষা ও সাধুভাষার বিবরণ	২৫	
নগরবাসির উত্তর	৩৫	১৫
যাহার বাঙ্গালা নাই এমন ভাষার বিবরণ	৩৬	৫
ভ্রষ্টলোক আপনাদের প্রশংসা শ্রবণ করেন, এতৎ বিষয়ে বিদেশির প্রশ্ন	৪১	৭১
নগরবাসির উত্তর	৪২	১৫
দলাদল বিষয়ে বিদেশির একাদশ প্রশ্ন	৪৭	৩
নগরবাসির একাদশ উত্তর	৪৮	৭
শূদ্র দলপতি বিষয়ে বিদেশির প্রশ্ন	৫৬	
নগরবাসির উত্তর	৫৭	৭
ব্রাহ্মণ দলপতি বিষয়ক বিদেশির প্রশ্ন	৫৮	১৪
নগরবাসির উত্তর	৫৯	৩
দলাদলিতে অধ্যাপকদিগের লাভ ক্ষতি, এতদ্বিষয়ে বিদেশির প্রশ্ন	৫৯	১৬
নগরবাসির উত্তর	৬১	১২
দলপতিরা আপন দল পুষ্টির কারণ কর্জ দিয়া থাকেন, এতদ্বিষয়ক বিদেশির প্রশ্ন	৬২	১৮
নগরবাসির উত্তর	৬১	৮
বিদ্যা বিষয়ে বিদেশির প্রশ্ন	৬৩	১০

বিষয়	পত্র	পঙ্ক্তি
নগরবাসির উত্তর	৬৬	১
কেতাব ক্রয় করিয়া কেন সাজাইয়া রাখেন এতৎ বিষয়ে বিদেশির প্রশ্ন	৬৭	৮
নগরবাসির উত্তর	৬৯	১৪
পুস্তকের সবিস্তৃপসন্ না করণ বিষয়ে বিদেশির প্রশ্ন	৭১	১০
নগরবাসির উত্তর	৭২	১১
কলিকাতায় এবং ইতত্ততো গ্রামে পাঠশালা বিষয়ে বিদেশির প্রশ্ন	৭৮	১৭
নগরবাসির উত্তর	৭৯	১২
বাল্মালি বালকদিগের প্রতি সাহেব লোকেরদিগের বিজ্ঞা বিষয়ে মনোযোগ করণের কারণ জিজ্ঞাসা	৮০	১৭
নগরবাসির উত্তর	৮১	৫
কলিকাতাস্থ ভাগ্যবান লোকেরদিগের কি হেতু পাঠশালায় মনোযোগ নাই এতদ্বিষয়ে বিদেশির প্রশ্ন	৮১	১২
নগরবাসির উত্তর	৮২	১
কলিকাতাবাসি কয়েক জন ব্যক্তিরেকে আর কাহারো বিজ্ঞা বিষয়ে মনোযোগ নাই ইহার কারণ কি, এতদ্বিষয়ে বিদেশির জিজ্ঞাসা	৮২	১৮
নগরবাসির উত্তর	৮৩	৫
বিজ্ঞা বিষয়ে নগরবাসির উত্তর শ্রবণে বিদেশির সন্দেহ	৮৩	১০
নগরবাসির উত্তর	৮৩	১৫

বিষয়	পত্র	পঙ্ক্তি
গীত বাজাদি বিষয়ে বিদেশির প্রশ্ন	৮৩	১৮
নগরবাসির উত্তর	৮৪	৬
ভাগ্যবান ব্যক্তির নিকট অনেক লোক যাতায়াত বিষয়ে বিদেশির প্রশ্ন	৮৪	১০
নগরবাসির উত্তর	৮৫	৭
ভাগ্যবান ব্যক্তির নিকট অনেক লোক যাতায়াত বিষয়ের উত্তর শ্রবণে বিদেশির অধিক সন্দেহ	৮৭	১
নগরবাসির উত্তর	৮৭	১৩
ভাগ্যবান লোক কত্যা ভগিনীর বিবাহের ভারগ্রস্ত ব্যক্তিদগো নিযত যাতায়াত করান এতদ্বিষয়ে বিদেশির প্রশ্ন	৮৮	৯
নগরবাসির উত্তর	৮৮	৩১
বাবুর মোসাহেবদিগের কি প্রকারে দিন নির্ধার হয় এতদ্বিষয়ে বিদেশির প্রশ্ন	৮৯	১
নগরবাসির উত্তর	৮৯	৯
বাবুর নিকটে পণ্ডিতেরা শাস্ত্রের তাৎপর্য্য শুনে এতদ্বিষয়ে বিদেশির প্রশ্ন	৯০	৩
নগরবাসির উত্তর	৯০	১২

ঐশ্রীহরি: ॥

কলিকাতা কমলালয়

ভূমিকা ।

— — —

পল্লিগ্রাম নিবাসী ও অচ্ছাত্র নগরবাসী লোক সকল এই কলিকাতায় আসিয়া এখানকার আচার বিচার ব্যবহার রীতি ও বাক্কোশলাদি অবগত হইতে আশু অসমর্থ হইলেন তৎপ্রযুক্ত শঙ্কায়ুক্ত হইয়া এতদ্রূপবাসি লোকেরদিগের নিকট গমনাগমন করেন এবং সভা ভবা হইয়াও তাঁহারদিগের নিকটে অসভা ও অভব্যাক্ষায় বসিয়া থাকেন কারণ যখন নগরবাসী বহুজন একত্র হইয়া প্রমোত্তরভাবে পরস্পর কথোপকথন করেন তৎকালে পল্লিগ্রাম নিবাসি ব্যক্তি কোন সচ্ছত্র করিলেও নগরস্থ মহাশয়রা তাহা গ্রহণ না করিয়া কহেন তুমি পল্লিগ্রাম নিবাসী অর্থাৎ পাড়াগেয়ে মানুষ অতদ্ব দিবস কলিকাতায় আসিয়াছ এখান[২]কার রীতিজ্ঞ নহ, তোমার একথায় প্রয়োজন নাঞি এ উত্তরে নিকটতর হইয়া ঐ ব্যক্তি ছুঃখিত হইলেন অতএব এই কলিকাতা মহানগরের স্থলবৃত্তান্ত বিবরণ করিয়া কলিকাতা কমলালয় নামক গ্রন্থকরণে প্রবর্ত্ত হইলাম এতদ্ব্যপ্ত পাঠে বা শ্রবণে অনায়াসে এখানকার ব্যবহার ও রীতি ও বাক্চাতুরী ইত্যাদি আশু জ্ঞাত হইতে পারিবেন, অধিকন্তু কলিকাতা কমলালয় হইতে বৃত্তান্তরূপ অনেক রত্নলাভ হইতে পারিবেক ইহাতে এক সন্দেহ আছে যে দোষদর্শী মূর্থরূপ কুস্তীর ও

নিম্নকরূপী সর্প ইহারা এ কমলালয় হইতে রত্নলাভের ব্যাঘাত করিবার নিমিত্ত স্বীয় স্বভাবদ্বারা অনেক যত্ন পাইবেক অর্থাৎ এতদ্ব্যপ্ত গ্রহণে বা পাঠে অনেক বাধা জন্মাইবেক তাহাতে বুঝি বিজ্ঞেরা এতদ্ব্যপ্ত গ্রহণ না করেন কিন্তু এই স্থির করিয়াছি যে বিজ্ঞেরদিগের বিজ্ঞতারূপ ঐযদিদ্বারা তাহারা ভৎসিত ও তাড়িত হইয়া অবশ্যই নিবৃত্তিত হইবেক অত[৩]এব কলিকাতা কমলালয় সমাদৃত হইয়া সতেরদিগের সর্বদা বৃত্তান্ত ও বাক্কোশলাদি রূপ রত্ন প্রদান করিবেন ।

এই গ্রন্থে চারি তরঙ্গ হইবেক আমার প্রার্থনা যদি গ্রন্থমধ্যে বর্ণভ্রম ও আসত্তিভ্রম থাকে তবে সাধু মহাশয়রা স্বীয় সাধুস্বভাবপ্রযুক্ত তাহা গ্রহণ না করিয়া তাৎপর্থা গ্রহণ করিলে আমার শ্রমসার্থক্য হইবেক গ্রন্থমধ্যে বিদেশির প্রশ্ন ও নগরবাসির উত্তরদ্বারা নানাবিধ বিষয়বৃত্তান্ত প্রকাশ হইবেক বিদেশির সঙ্কেত বি, নগরবাসির সঙ্কেত ন, প্রশ্নের সঙ্কেত প্র, উত্তরের সঙ্কেত উ, এই সঙ্কেতদ্বারা বিদেশির প্রশ্ন ও নগরবাসির উত্তর বিবেচনা পূর্বক পাঠ করিবেন ইতি ॥৩০॥

ঐশ্রীচূর্ণা

শরণং

॥ কলিকাতা কমলালয় ॥

কলিকাতার সাগরের সহিত সাদৃশ্য আছে তৎপ্রযুক্ত কলিকাতা কমলালয় নাম স্থির হইল, কমলা লক্ষ্মী তাঁহার আলায় এই অর্থদ্বারা কমলালয় শব্দে যেমন সমুদ্রের উপস্থিতি হইতেছে তেমন কলিকাতার উপস্থিতিও হইতে পারে অতএব কলিকাতা কমলালয় শব্দের যোগার্থ রহিল।

অথ সাগরের বিবরণ।

সাগরে অপেয় অগাধ জল, বর্ষাকালে তজ্জল নির্গত হইয়া দেশ বিদেশ যাইতেছে ও নানা নদীর সমাগম সাগরে হইতেছে এবং সাগর নানাবিধ রত্নের আকর হইয়াছেন ও দেবাসুর [৬] সংগ্রামে সাগর মগ্ন হইয়াছিল তাহাতে হালাহল ও অমৃত উঠিয়াছিল এবং সাগর অস্থপম ও সর্ব দেশ গ্যাত হইয়াছেন সাগরে হাঁগর কুস্তীরাদি জলজন্তু বাস করিতেছে ভগবান্ নারায়ণ সাগরবাসী হইয়াছেন ও তথায় লক্ষ্মীও বাস করিতেছেন সাগরে সর্বদা তরঙ্গ ও কল্লোল হইতেছে ইত্যাদি।

কলিকাতার বিবরণ

কলিকাতা মূত্রাক্রপ অপেয় অগাধ জলে পরিপূরিতা হইয়াছে বৃহৎ কর্ণকালে মূত্রাজল নির্গত হইয়া নানাদিগদেশগামি হইতেছে নানাবিধা মূত্রানদীর নিরন্তর গমনাগমন হইতেছে বিবিধ বিজ্ঞা ও বিদ্বানরূপ বহু, রত্ন আছে ইংরাজ নবাব সংগ্রাম কালে কলিকাতা মগ্ন হইয়াছিল তাহাতে বিষাদরূপ হালাহল ও হর্ষরূপ অমৃত উঠাইয়াছিল কলিকাতা নিরুপমা ও সর্ব দেশ গ্যাতা হইয়াছে পরনিম্পাপরায়ণ অনেক জন হাঁগর কলিকাতা বাস [৭] করিতেছে ও মূর্খরূপ ভয়ানক কুস্তীর অনেক ব্যাড়াইতেছে লক্ষ্মী সর্বদা বিরাজ করিতেছেন তদর্শনে ভগবান্ নারায়ণও বিগ্রহরূপ ধারণ করিয়া আসিয়াছেন সর্বদা তুরঙ্গাদি বাহন ও ধনমন্ত্রতাদি তরঙ্গ হইতেছে এবং এই তরঙ্গে কোলাহলেসে বাহুল্য হইয়াছে ইত্যাদি অতএব উভয়ের ধর্ম্য সাম্যে সমান সংজ্ঞা হইল ইতি।

কলিকাতা কমলালয়

প্রথম তরঙ্গ

কোন বিদেশী এই মহানগর কলিকাতায় আসিয়া এতদ্রগরস্থ কোন বিজ্ঞ ব্যক্তিকে এতদ্রগরের বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইবার বাসনায় প্রণয় করিতেছেন, মহাশয় আমি কলিকাতার রীতিজ্ঞ নহি, আপনি ভাবধর্ম্য বৃত্তান্ত অবগত আছেন, যেসকল প্রশ্ন করি কৃপাপূর্বক সচুত্তর প্রদান দ্বারা আমার অজ্ঞতা অর্থাৎ পাড়াগায়ে কলঙ্ক ভঞ্জন করিলে অত্যাচারে

মহাশয়কে [৮] সাধু পূরম সাধু ও ধন্যবাদ করত চিরকাল উপকৃত হইয়া থাকিব।

এতৎ শ্রবণানন্তর নগরবাসী মহাশয় উত্তর করিতেছেন, যে শুন ভাই তোমাকে কলিকাতার রীতি ব্যবহার অবগত করাইতে পারি কিন্তু ইহাতে কয়েক দোষ বিবেচনা করিতেছি।

বিদেশী কহিতেছেন মহাশয় কিং দোষ আজ্ঞা করুন

ন, উ, প্রথমত এই বে পল্লিগ্রাম নিবাসি লোকেরা এই কলিকাতায় আসিয়া কোন এক সোপাধি সংগ্রহ করিয়া কাহার বাটীতে কিছা বাসাতে বাস করেন পরে নানা প্রকার লোকের সহিত আলাপ কৌশল করিবার নিমিত্ত প্রায় সর্বত্র গমনাগমন করেন ইহাতে কোন স্থানে ইংরাজী কোন স্থানে পারসী কোন স্থানে হিন্দি ইত্যাদি নানা বিজ্ঞার আলোচনা দেখিয়া অতিশয় পরিশ্রম ও যত্ন পূর্বক ভাগ্যবান লোকের-দিগের উপাসনা করিয়া বিনাযায়ে [৯] বিজ্ঞা শিক্ষা করেন এবং এখানকার আহার ব্যবহার বাক্য বিষয়ে নিপুণ হইয়া অনেকের নিকট মাঞ্জও করেন অপর কোনও লোকের নিকট নিরন্তর যাতায়াত দ্বারা উপাসনা করিয়া কোন বিষয় কথ্বে প্রবর্ত্ত হইয়া কিম্বদন্ত সঞ্চয় হইলেই এখানকার লোকের বাক্য ব্যবহার রীতি প্রভৃতির উপর দোষোন্মাস করিয়া হেয় জ্ঞান করেন, দ্বিতীয়, এখানকার লোকেরা যে কথ্বে স্বীকার না করেন পল্লিগ্রাম নিবাসিরা তাহা অকুতোভয়ে অস্বীকার করিয়া থাকেন মনে করেন যে আমার এখানে জাতি কুটুম্ব কেহ নাই আমি নিম্মিত বা অনিম্মিত কথ্বে করিলে আমাকে কেহ কিছুই কহিবেক না।

তৃতীয়, যেসকল কথ্বে ছই শত টাকা বেতন লভ্য হয় সেসকল তাহার অত্যন্ত বেতনে অস্বীকার করেন এবং দিবা আট ঘণ্টা অবধি রাতি ১০ দশ ঘণ্টা পর্য্যন্ত মূনিবের নিকট কথ্বে করিয়া [১০] প্রতিপন্ন

হয়েন ইহাতে এতঃপরবাসি অনেক লোকের অনেক ক্ষতি বোধ হইতেছে কারণ তাহারাদৃশ কথ্বে করিতে পারেন না চতুর্থ, এতঃপরবাসি ভাগ্যবান লোকের বাটীতে সরকার বা মুহুরির কথ্বে নিযুক্ত হইয়া থাকেন বাটীর কেহ বহুশ্রমসাধ্য অকর্তব্য কথ্বে করিতে আজ্ঞা করিলেও তাহা স্বীকার করিয়া তৎক্ষণে তৎকথ্বে সম্পন্ন দ্বারা তাহাকে সন্তোষ করিয়া থাকেন ইহাতে সকলের প্রিয় ও বিশ্বস্তপাত্র হয়েন পরে সে বাটীর কর্ত্তা পরলোক প্রাপ্ত হইলে সন্তানেরদিগে নানা প্রকার মনোনীত উপদেশ দিয়া বিবাদ উপস্থিত করান এবং তৎকালে নাবালক কিছা বিধবা স্ত্রীলোক ধনাদিকারী থাকিলে তৎক্ষেই পক্ষপাত করেন পরে আদালতে প্রবর্ত্ত করাইয়া সে সংসার ছারখার করিয়া আপনিই ধনাঢ্য হয়েন

পঞ্চম, যদি অধিকতর ধনাঢ্য হয়েন তবে এখানে বাসাবাটী করিয়া পরিবার সহিত বাস করেন কিন্তু রুহং কথ্বেও উপস্থিত হইলে [১১] পৈতৃকস্থলে গমন করেন তাহাতে প্রতিবাসী বা আত্মীয় লোক জিজ্ঞাসা করেন যে আপনি এখানে নিরন্তর পরিবার লইয়া বসতি করেন এবং ভাগ্যবানও হইয়াছেন কিন্তু এখানে কোন ক্রিয়াকলাপ করেন না ইহার কারণ কি, তাহাতে উত্তর করিয়া থাকেন যে আমারদিগের নিয়ম আছে পৈতৃক স্থানে কথ্বে করিতে হয় আর সেখানে জমিদারি প্রভৃতি অনেক বিষয় আছে সেই জমিদারির উপস্থিত হইতেই তাবৎ কথ্বে নির্বাহ হইয়া থাকে এই রীতিক্রমে পিতামহষ্টকুর বহুকাল কথ্বে করিয়া স্বর্গগত হইয়াছেন তাহা আমরা এক্ষণে কি প্রকারে অনুশ্রী করিব আর কলিকাতায় কোন কথ্বেও হইতে পারে না দেখ এ স্থানে যেসকল লোক জুর্গোৎসব করেন তাহাকে ঝাড় উৎসব, বাতি উৎসব, কবি উৎসব, বাই উৎসব, কিছা স্ত্রীর গহনা উৎসব, ও বস্ত্রোৎসব বলিলেও বলা যায় ইত্যাদি নানা প্রকার ব্যঙ্গ বিজ্ঞপ করিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন।

[১২] অতএব ভাই তোমারদিগো রীতিজ্ঞ করিলে আমারদিগের শ্রেয় নাই যদি বল আমি এখানে বাস করিয়া ক্রমে কাল বিলম্বে রীতিজ্ঞ হইব তাহাও আমার ভাল বোধ হয় না কেন না যদি আশু এখানকার রীতিজ্ঞ না হইতে পার তবে এখানে বাস করাই ভার হইবেক যেহেতুক এস্থানের রীতির অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত লজ্জিত এবং দুঃখিত ও অপমানিত হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিবা।

বি, উ, মহাশয় যেসকল কথা कहিলেন ইহা যথার্থ হইতে পারে কিন্তু তাহাং লোকেবি কি এতাদৃশ স্বভাব এমত নহে, আরো বলি নগরবাসি লোকের মধ্যে যাহারা একরূপ দায়গ্রস্ত হইয়াছেন বৃষ্টি তাঁহারা হিতোপদেশাদি গ্রন্থ পাঠ না করিয়া থাকিবেন কিম্বা তাহার ছই চারি শ্লোকও তাঁহারদিগের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট না হইয়া থাকিবে তাহা হইলে অবশ্যই ঐ গ্রন্থের শ্লোকার্থ শ্রবণ করিয়া বিবেচনা পূর্বক চলিতেন, শ্লোকো [১৩] যথা, সর্ষত্র হি পরীক্ষতে স্বভাবো নেতরে গুণাঃ। অতীত্য হি গুণান সন্ধান স্বভাবো মুক্তি বস্তুতে। অর্থাৎ আদৌ সকলেরি স্বভাব বিবেচনা করিবেক অল্প গুণ বিবেচনা করিবেক না যেহেতু সকল গুণকে অতিক্রম করিয়া স্বভাব মস্তকান্ত্রিত হইয়াছে অতএব নিবেদন আপনি যেসকল ধারাবাহিক দোষ कहিলেন তাহাতে কেবল নগরবাসি লোকেরদিগের অজ্ঞতা প্রকাশ হইতেছে, অপর স্থানের গুণে লোকের স্বভাব ভাল হয় এমত নহে, সর্ষত্র ত্রিবিধা লোকা উত্তমাদমমধ্যমাঃ। অর্থাৎ উত্তম অধম মধ্যম এই ত্রিবিধ প্রকার লোক সর্ষত্রই আছে মহাশয় অহসন্ধান করিয়া দেখুন এই সহর মধ্যে কত প্রকার পাইবেন বরঞ্চ পল্লিগ্রাম ভাল সেস্থানে লোকের প্রায় একই স্বভাব, এ সহরে নানা দেশীয় নানা লোক বাস করিতেছে তাহার মধ্যে পাপিষ্ঠ নরাধম ধর্মিষ্ঠ শিষ্ট শাস্ত্র অজ্ঞ বিজ্ঞ বিবিধ প্রকার লোক আছে আপনি তাহা

অদশ্য জ্ঞাত থাকিবেন অতএব [১৪] অজ্ঞান নগরবাসী বা পল্লীগ্রাম নিবাসী তাহাং লোক কি প্রকারে দোষী হইতে পারে।

অনন্তর নগরবাসী कहিতেছেন শুন ভাই বিবেচনায় বৃষ্টিলাম তুমি লোক ভাল রীতি উপদেশ করিবার উপযুক্ত পাত্র বট বিজ্ঞেরদিগের এই রীতি যে পাত্র বিবেচনা না করিয়া বিজ্ঞ লোক দ্রব্যাদি কোন বস্তু অর্পণ করিবেক না অতএব যেমন দ্রব্য তেমন পাত্র না হইলে অপিত দ্রব্যাদির হানি হয় দেখ এই বিবেচনায় লোক তৈল প্রভৃতি জলীয় দ্রব্য মুক্তিকার পাত্রে বা কাচপাত্রে স্থাপিত করে লৌহপাত্র ব্যতিরেকে অল্প পাত্রে পারা প্রভৃতি দ্রব্যাদি স্থাপন করে না অতএব তুমি হুপাত্র তোমার প্রস্নের উত্তর দ্বারা অবশ্যই যথার্থোপদেশ করিব ॥০০০০

বি, প্র, শুনিতে পাই কলিকাতার অনেক লোক আচারভ্রষ্ট হইয়াছেন ইহারা অতি প্রাতঃকালে আহাৰাদি করিয়া কৰ্মস্থানে গমন করেন তাহাং দিবস সেই স্থানেই কাল যাপন হয় কেহ [১৫] রাত্রি ছই দণ্ড বা চারি দণ্ড কেহবা এক প্রহর সময়ে গৃহে আসিয়া পুনর্বার আহাৰাদি করিয়া শয়ন করেন মাত্র।

ন, উ, আপনি যাহা শুনিয়াছেন তাহা যথার্থ বটে কিন্তু এতাদৃশী রীতি হিন্দু মাত্রেয় প্রায় নাই তবে যদি কাহার থাকে সে কেবল হিন্দুবেশধারী হইবেক তাহার বিশেষ আমি বলিতে সমর্থ নহি কিন্তু ভক্তলোকেরদিগের যে ধারা জ্ঞাত আছি তাহা শুন।

বিষয়ি ভক্তলোকের ধারা

যাহারা প্রধানতঃ কৰ্ম অর্থাৎ দেওয়ানি বা মুছল্লিসিগরি কৰ্ম করিয়া থাকেন তাহারা প্রাতে গাজোখান করিয়া মুখ প্রকালনাদি পূর্বক

বহুবিধ লোকের সহিত আলাপ করিয়া পরে তৈল মর্দন করিয়া থাকেন নানা প্রকার তৈল ঝাঁহার বাহাতে স্খাচ্ছব হয় তিনি তাহাই মর্দন করিয়া স্নানক্রিয়া সমাপনানন্তর পূজাহোমদান বলিবৈষ প্রভৃতি কর্ম করিয়া ভোজন করেন [১৬] ক্রিষ্ণিকাল বিশ্রাম করিয়া অপূর্ণ পোষাক জামাখোড়া ইত্যাদি পরিধান করিয়া পালকী বা অপূর্ণ শকটারোহণে কর্মস্থানে গমন করেন কর্মাহুযায়ী কাল বিবেচনা পূর্বক তৎস্থানে থাকিয়া গৃহে আগত হইয়া সেসকল বস্তাদি পরিত্যাগ করিয়া হস্তপাদাদি প্রক্ষালনানন্তর গন্ধোদকস্পর্শে পরিজ্ঞ হইয়া সাযংসন্ধ্যা বন্দনাদি সমাপন করিয়া জলযোগানন্তর পুনর্বার বৈঠক হয়, পরে অনেক লোকের সমাগম হইয়া থাকে কেহ কোন কর্মোপলক্ষে কেহবা কেবল সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত আইসেন অথবা তিনি কখন কাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন ইত্যাদি ।

মধ্যাহ্ন লোক অর্থাৎ ঝাঁহার দানাচ্য নহেন কেবল অন্নযোগে আছেন তাঁহাদিগের প্রায় ঐ রীতি কেবল দান বৈঠকি আলাপের অন্তত আর পরিশ্রমের বাহুল্য ।

দরিদ্র অথচ ভদ্র লোক তাঁহারদিগের অনেক [১৭] ঐ দ্বারা কেবল আহার ও দানাদি কর্মের লাঘব আছে আর শ্রমবিষয়ে প্রাবল্য বড় কারণ কেহ মুহুরি কেহ মেটে কেহবা বাজারসরকার ইত্যাদি কর্ম করিয়া থাকেন বিস্তর পথ হাঁটিতে হয় পরে প্রায় প্রতিদিন রাজে গিয়া দেওয়ানজীর নিকট আজ্ঞা যেআজ্ঞা মহাশয় করিতে হয় না করিলেও নয় পোড়া উদরের আলা ।

এই সকল কর্মকারি বিষয়ি ভদ্রলোকের দ্বারা কহিলাম এক্ষণে অসাধারণ ভাগ্যবান লোকের রীতি শুনহ, ভগবানের রূপাতে ঝাঁহারদিগের প্রচুরতর ধন আছে সেই ধনের বুদ্ধি অর্থাৎ সুদ হইতে

কাহার বা জমীদারির উপস্থত হইতে গ্রাম্য বায় হইয়াও উদ্ভূত হয় তাঁহারা প্রায় আপন আলয়ে থাকিয়া পূর্বোক্ত রীতাহুসারে সন্ধ্যা বন্দনাদিপূর্বক মধ্যাহ্নকালে ভোজন করিয়া প্রায় অনেকেই নিজা যান চারি [১৮] বা ছয় দণ্ড বেলা সম্বন্ধে আপন বিষয়ে দৃষ্টি করেন কেহবা পুরাণাদি শ্রবণ করিয়া থাকেন ।

ত্রিপদি ॥

হয়ে বিষ্ণুপরাণ, সবে করি একমন, পুরাণ শ্রবণে করেন স্থিরতর মতি । ভারতাদি ইতিহাস, শ্রবণেতে অভিলাষ, সদাঅচরিত তাহে একান্ত ভক্তি ॥ পণ্ডিতমণ্ডলী করি, সকলেতে হরিং, এই বাণী বলিতে অশ্রপাত । ধীর কিবা মৃঢ়মতি, ভারত শ্রবণে অতি, শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া করে নিতি যাওয়াত ॥ এইরূপ শতং, স্থানেতে কহিব কত, হইতেছে পুরাণাদি পাঠ নিরন্তর । পাঠাপাঠ বিবেচনা, করি অর্থ আলোচনা, সদশ্র হইয়া বসি বিজ্ঞ বহুতর ॥ নৃসিংহ বরাহ কৃষ্ণ, আদি পুরাণের মর্ম, বেত্তাসকল বসিয়াছেন হইয়া পাঠক । পাঠকের যদি ভ্রম, হয় তবে উপশম, কারণ পুস্তক লয়ে আছেন ধারক ॥ শ্রোতাগণে একমনে, বসিয়া পুরাণ শুনে, সম্বন্ধে বসিয়া আছেন প্রভু জনার্দন । [১৯] শালগ্রাম শিলাবেশে, সকলে করুণা রসে, ভাসিতেছেন হইতেছে দুই অশ্রপতন, ইত্যাদি ॥

বি, প্র, আপনি যেসকল ভদ্রলোকের কথা কহিলেন ইহাতে আমি বিশ্বাস্যপন্ন হইলাম যেহেতু পূর্বে শ্রুত ছিলাম যে কলিকাতার অধিক লোক কর্মকাণ্ড ও সন্ধ্যা বন্দনাদি পরিত্যাগ করিয়াছে এবং আহার ও পরিচ্ছদেরও বিবেচনা নাই বাহাতে স্খাচ্ছব হয় তাহাই করেন

ন, উ, আপনি নিতান্ত ভ্রান্ত এমত কথাও কর্তৃত্বহরে প্রবেশ হইতে দেখে যেহেতু এদেশে কেবল কর্মকাণ্ডেরি বাহুল্য এবং মহামহোপাধ্যায়

স্মার্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়রা জাজল্যমান বসিয়া আছেন তাঁহাদিগের ব্যবহাৰ্য্যগারে ভাগ্যবান লোকেরা সৰ্বদাই দেব প্রতিষ্ঠা পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা দোল দুৰ্গোৎসব রথ নিত্য নৈমিত্তিক কৰ্ম্ম করিতেছেন বিশেষতঃ পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধাদি কৰ্ম্মে ধনী লোকসকল স্বজাতি জাতি [২০] বন্ধুবান্ধব পুরোহিত অধ্যাপকাদি নিমন্ত্রণ করিয়া আশ্রম সভা শোভা করেন।

ঐ সভামধ্যে কেহ সোনার কেহ রূপার ছই চারি দানসাগর করিয়া থাকেন তাহাতে অপূৰ্ণ ২ পর্য্যন্ত প্রতীতি ব্যবহারোপযোগি দ্রব্য সকল উৎসর্গ করিয়া পাত্রবিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক দানাদি করেন আর অধ্যাপক বিদায়ের দ্বৈত পূজা দ্বারা এমত কেহ শুনে নাই, নৈমিত্তিক পণ্ডিতের বিদায় ১০০।৮০। ঘড়া গাড়া, স্মার্ত পণ্ডিত বিদায় ৫০।৩০। গাড়া, খাল বাটা ইত্যাদি।

আর শ্রাদ্ধ দিবসে বা রাজ্যে কাদ্মালবিদায়, প্রত্যেক কাদ্মালি ২, কেহ ১, ১০।০০/০০ কিন্তু যতলোক আইসে সকলকেই দিয়া থাকেন আপন বিভব বুদ্ধিয়া দানের নিয়ম করিয়া দেন তোমাকে আর আমি কত কহিব।

বি, প্র, ভাল যদি এমন ধারা তবে কলিকাতার এমত অধ্যাতিক কেন হইল যে আপনাদিগের শাস্ত্রের অধ্যয়ন ত্যাগ করিয়া কেবল পারসী [২১] ও ইংরাজী পড়েন বাঙ্গালা লিখিতে ও পড়িতে জানেন না এবং বাঙ্গালা শাস্ত্র হেয় জ্ঞান করিয়া শিক্ষা করেন না আর শ্রাদ্ধশাস্তির বিষয়, যখন পিতা মাতার পরলোকপ্রাপ্তি হয় তখন অশ্রোষ্টিক্রিয়াকে কুৎসিত কৰ্ম্ম বোধ করিয়া প্রতিনিধি দ্বারা দাহ করিয়া তর্পণ করিয়া থাকেন সেই সময় এক অঞ্জলি জল অধিক করিয়া প্রদান করেন অর্থাৎ এক কালেই অঞ্জলি পূর্ব্বক শ্রাদ্ধাদি উদ্‌যাপন করিয়া আইসেন এবং অশৌচের চিহ্নার্থে কেবল চুল ধারণ মাত্র করেন কেহবা কেবল মস্তকের

কেশ রাখিয়া কুটী যাইবার অথরোধে দাড়ির কোঁর করান, আর অত্যন্ত অপূৰ্ণ শিষ্ট শাস্ত্র মহাশয়রা অশৌচ সময়ে শুদ্ধাচারার্থে কেবল ত্রাণি মাত্র পান করেন অল্প সময়ে আহার বাজারের পাককরা মাংস মিঠাই ও মুছলমানরুত পাওকুটী এবং নানা প্রকার সরাপ ইত্যাদি দ্রব্য সকল ভোজন করেন পরিচ্ছদ অর্থাৎ পোষাক দৃতি প্রতীতি বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া ইজার জামাজোড়া [২২] ইত্যাদি পরেন কালাচর্ম্মের পাছকা ফিঁতেবান্ধা গোড়তোলা মাথানেড়া বোঁচা সকল পায়ে দেন আর কোন বিদেশী উদাসীন লোক ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়া পাচক ব্রাহ্মণ হইয়া বাটার অশ্বপুঁরে পাক করেন কাহার বাটাতে একজন কাহার বাটাতে দুইজন স্ত্রীলোকমাত্র থাকেন অল্প পুরুষ কেহ থাকেন না নিরুধেগে সেই সকল ব্রাহ্মণেরদিগের বাটার ভিতরে যাইতে দেন তাহার। অন্নব্যঞ্জনাদি পাক করিয়া দিলে সকলে ভোজন করেন এই সকল ধারা কাহারদিগের, তাহা শুনিতে বাস্তা করি।

ন, উ, আপনি যাহা কহিলেন এ তাবৎ সত্য বটে কিন্তু ভক্তলোকের এমত ব্যবহার নহে ভাই তোমাকে সকলি কহিতে হয় ইহার মধ্যে কোন ভক্তলোকের সন্তানেরা তোমার উক্ত পাছকা ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং কোন মজ্জলি অথবা দরবার যাইবার নিমিত্ত হিন্দুহানি পোষাকও ব্যবহার করেন তাহাতে [২৩] ফলের হানি নাই কেবল কিঞ্চিৎ দৃষ্টিগোঁরব মাত্র আর শাস্ত্র অধ্যয়ন বিষয় যাহা কহিলে তাহার উত্তর করিতে পারিলাম না তুমি আগে কিছু কাল বাস কর তবে ক্রমে সকলি দেখিতে পাইবা কেহ সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন না তুমি ইহাই শুনিবাছ কিন্তু সে জাতিমাত্র দেখ অমুক বাবু কতপ্রকার সংস্কৃত গ্রন্থ করিয়াছেন আর অনেক ভক্তলোকের সন্তানেরা অগ্রে সংস্কৃতাহাযি বাঙ্গালা ভাষা ও লেখাপড়া অভ্যাস করিয়া পশ্চাৎ অর্থকরী ইংরাজী ও

পাসি বিজ্ঞা শিক্ষা করেন অর্থকরী বিজ্ঞা শিক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য, যথা অর্থগম্যে নিত্যমরোগিতা চ প্রিয়া চ ভাষ্যা প্রিয়বাদিনী চ। বস্তু-পুঞ্জোর্থকরী চ বিজ্ঞা যড়জীবলোকেশু স্থথানি রাজ্ঞন

অতএব অর্থকরী বিজ্ঞোপার্জনের আবশ্যকতা আছে তাহা শাস্ত্রসিদ্ধি বটে এবং যখন যিনি দেশাধিপতি হইলেন তখন তাহাদিগের বিজ্ঞাভ্যাস না করিলে কি প্রকারে রাজ্যকর্ম [২৪] নির্বাহ হয় ইহাতে আমার মতে কোন দোষ দেখি না ॥১৥

বান্দালা লিখিতে ও পড়িতে জানেন না এবং অভ্যাসে হেয়জ্ঞান করেন ও তর্পণের সহিত শ্রদ্ধার বিসর্জন ইহার উত্তর হইবেক এবং অশৌচের চিকার্থে কেবল চুলধারণ, কাহারবা কেবল মস্তকে বেশধারণ, পাচক ব্রাহ্মণের বৃন্তাস্ত্র মাংসাদি আহার ইত্যাদির উত্তর ক্রমে করিব এ তরঙ্গে কেবল ভ্রলোকের দ্বারা বিবরণ হইতেছে যদি ভ্রলোকের ব্যবহারে তোমার কোন সন্দেহ থাকে তাহার প্রশ্ন কর উত্তর করিব।

বি, প্র, ভাল মহাশয় অনিয়াছি যে ভ্রলোকের মধ্যে অনেক লোক স্বজাতীয় ভাষায় অল্প জাতীয় ভাষা মিশ্রিত করিয়া কহিয়া থাকেন যথা কম, কবুল, কমবেশ, কয়লা, কর্জ, কয়াকয়ি, কাজিয়া, ইত্যাদি ককার অবধি ককার পর্য্যন্ত, ইহাতে বোধ হয় সংস্কৃত শাস্ত্র ইহার পড়েন নাই এবং পণ্ডিতের সহিত আলাপও [২৫] করেন নাই তাহা হইলে এতাদৃশ বাক্য ব্যবহার করিতেন না স্বজাতীয় এক অভিপ্রায়ের অধিক ভাষা থাকিতে যাবনিক ভাষা ব্যবহার করেন না।

যথা।

যাবনিক ভাষা

সাধুভাষা

কমিনে

১

অস্তাজ, কুজ, সামাজ, নীচ,

কল

১

যয়

কলম	১	লেখনী
কসম	১	শপথ, দিব্য
কসাই	১	গোয়
কহুর	১	অপরাধ, ত্রুটি,
কড়া	১	শক্ত, কঠিন,
কম	১	অল্প, নান,
কবুল	১	স্বীকার, স্বীকার, প্রতিশ্রুত,
কসবি	১	বেশা, গণিকা, বারাক্তনা, কুলটা
কামড়ায়	১	দংশন, দস্তাঘাত,
[[২৬] কাজিয়া	১	কলহ, বিবাদ, বিসম্বাদ, বিরোধ,
কামাল	১	বলবৎ, অসাধারণ,
কায়দা	১	রীতি, ধারা,
কাঁচা	১	অপক, আম,
কেজা	১	বাহ, দুর্গ,
কেতাব	১	পুস্তক, গ্রন্থ,
কিনারা	১	উপাস্ত, তীর,
কিম্বত	১	মূল্য
খয়রাৎ	১	বিতরণ, দান,
খরচ	১	ব্যয়,
গাটা	১	নিশ্চয়, অকৃত্রিম,
খাড়া	১	দণ্ডায়মান,
খাড়া ২	১	শীঘ্র, ত্রুত, ত্রুত,
খারাব	১	মন্দ, কদর্য, কুৎসিত, নিম্নিত,
খালাস	১	মুক্ত, মোচন, উদ্ধার,

	ধামকা	১	হঠাৎ, অকস্মাৎ, দৈবাৎ,
	ধাসা	১	উত্তম, ভদ্র, পরিপাটি,
	ধাজনা	১	কর, উপস্থিত, রাজস্ব
[২৭]	ধুন	১	বিনাশ, হত্যা, ঘাত,
	ধুব	১	উত্তম, উৎকৃষ্ট, ভদ্র,
	ধুসি	১	আনন্দ, আহ্লাদ, পরিতোষ, সন্তোষ
	ধোলাসা	১	পরিষ্কার,
	ধোসামোদ	১	উপাসনা,
	ধোস	১	উত্তম, ধ্বং,
	ধোদ	১	স্বয়ং,
	গরম	১	উত্তপ্ত, উষ্ণ,
	গরমী	১	গ্রীষ্ম, নিদ্রাঘ,
	গজী	১	স্বার্থী, স্বার্থপর,
	গরজ	১	আবশ্যিক, প্রয়োজন,
	গওর	১	মনোযোগ, অভিনিবেশ, অবধান,
	গমি	১	শোক, সন্তাপ,
	ঘুম	১	নিদ্রা
	ঘুম	১	উৎকোচ
	জঙ্গল	১	বন, অরণ্য,
	জড়	১	মূল
	জবর	১	বড়, সবল, বলবান,
[২৮]	জবানী	১	প্রমুখ্যৎ
	জবাব	১	উত্তর
	জায়দাদ	১	সম্পত্তি, সর্বস্ব, স্বাবসাদি,

	জাচাই	১	পরীক্ষা, বিবেচনা,
	জায়গা	১	স্থান,
	জান	১	প্রাণ,
	জোহেল	১	কারাগার, কারাগৃহ,
	জোলদী	১	উজ্জল, সৌন্দর্য,
	ঝাঁক	১	সমূহ, বিস্তর,
	ঝুঁটা	১	মিথ্যা, অসত্য
	টুকরা	১	কিঞ্চিৎ
	টেড়া	১	বাঁকা, বক, বক্র,
	ঠগ	১	চোর
	ঠাগায়	১	চুরি করে,
	ঠাওর	১	বিবেচনা,
	ঠাট্টা	১	উপহাস, দ্বেষ,
	ঠাণ্ডা	১	শিথল, শীতল, হিম,
	ঠাঠ	১	কপট, কাপ,
[২৯]	ঠিক	১	নিশ্চিত, নির্ধারিত, যথার্থ,
	ভর	১	ভয়, শঙ্কা, ভ্রাস,
	ডাকাইত	১	দস্যু
	ডালি	১	উপঢৌকন
	ডোল	১	প্রকার, ধারা, গঠন,
	ঢাকা	১	আচ্ছাদন, আবরণ
	ঢিল	১	দ্রব
	ঢুকাই	১	প্রবেশ করায়
	তরফ	১	স্বরূপ

তুফান	১	তরঙ্গ
তাগাদা	১	শীত, ক্ষত
তামাসা	১	কৌতুক, কাব্য, রহস্য
তাক্কব	১	চমৎকার, বিস্ময়,
তগির	১	কর্ষণচাত,
দর	১	মূল্য
দাক্কা	১	কলহ, দ্বন্দ্বজ,
দাবি	১	প্রাপ্য,
দেক	১	বিরক্ত,
[৩০] দেরি	১	বিলম্ব, গোণ
দেল	১	অন্তঃকরণ, মন,
দখল	১	অধীন,
দোলত	১	সম্পত্তি
দাখিল	১	উপনীত
ধুম	১	তুমুল,
ধোকা	১	সুন্দেহ,
নমুদ	১	অঙ্কুর, আরম্ভ, প্রথম,
নেক	১	উত্তম,
পদম	১	লোম, রোম
পাঞ্জি	১	অস্ত্রাজ, সামাগ্র, ক্ষুদ্র,
ফরসা	১	তত্ত্ব, পরিকার,
ফসাদ	১	মিথ্যা, কাল্পনিক,
ফের	১	বেষ্টন,
বহল	১	নিযুক্ত, স্থাপিত,

বদল	১	বিনিময়, পরিবর্ত,
বরাত	১	প্রতিনিধি,
বদ	১	মন্দ,
[৩১] বরামদ	১	অপবাদ,
বাকি	১	অবশিষ্ট,
বাগান	১	উত্থান, উপবন,
বেদান্ত	১	বুদ্ধি,
বক্ত	১	অদৃষ্ট, ভাগ্য,
বদজাত	১	ভুই, অসং,
বনিয়াদ	১	মূল,
ভাঁজ	১	মিশ্রিত,
ভাগড়া	১	পলায়িত,
ভিতর	১	মধ্য, মধ্যস্থল,
ভোর	১	প্রত্যয়, প্রাতঃকাল,
মঞ্জুর	১	স্বীকার,
মন্তবা	১	ভাঁড়, ভণ্ড
মরদ	১	পুরুষ,
মজলিস	১	সভা,
মরজী	১	মনস্থ,
মজাক	১	শ্লেষ,
মতলব	১	অভিপ্রায়, মনস্থ,
[৩২] মকরর	১	নিযুক্ত, প্রবর্ত,
মসলৎ	১	পরামর্শ,
মাফ	১	মার্জনা কমা

মাথা	১	পরিমাণ,
মাফিক	১	মত, দ্বারা,
মাফিক	১	প্রণয়, আত্মীয়তা,
মোনাসব	১	রীতি,
মুখিল	১	কেশ, আপদ,
মুকসমল	১	গোপন, অপ্ৰকাশ,
মুদই	১	বাদী, বিবাদি, প্রতিবাদী,
রদ	১	অকথা, রহিত,
রকম	১	প্রকার, মত,
রফা	১	পরিষ্কার,
রেয়াইত	১	মাস্কিনা,
রোসনাই	১	উজ্জ্বল,
লড়াই	১	যুদ্ধ
লাল	১	রক্ত,
সহর	১	নগর,
[৩৩] সহজ	১	অবলীলা, অবহেলা, অনায়াস,
সওয়ারি	১	যান,
সহি	১	স্বাক্ষর,
সমুজ	১	বিবেচনা,
সাঁচা	১	সত্য
সাজা	১	দণ্ড,
সাপ	১	পরিষ্কার
সিদা	১	সহল
স্বয়	১	রূপণ

সগুণ	১	দিব্য, শপথ
সেওয়াদ	১	ব্যক্তিরেক
সুজী	১	নির্ধটন
সেপাহি	১	সৈন্য
সোর	১	চিৎকার
হকাম	১	কলহ
হট	১	ইতর
হক	১	সত্য, যথার্থ
[৩৪] হলপ	১	শপথ,
হাওয়া	১	বায়ু, পবন
হামেসা	১	সন্দেহ
হাজির	১	উপস্থিত
হামাল	১	গর্ভ
হাজার	১	সহস্র
হুকুম	১	আজ্ঞা, অচ্যুতি
কতরা	১	কতি
আসল	১	প্রকৃত
আইন	১	রীতি, ধারা
আন্মেসা	১	সন্দেহ
আন্দাজ	১	অচ্যুমান
আজব	১	আশ্চর্য
আমল	১	অধিকার
আপশোষ	১	শেষ
আসমান	১	আকাশ

আচ্ছা	১	উত্তম, বিলক্ষণ, ভাল
আসান	১	শৈথিল্য
[৩৫] ইয়ার	১	স্বরণ
ইংফাক	১	প্রণয়, বিবেচনা
ইসাদী	১	সাক্ষী
উঠাও	১	উত্তোলন
এমারত	১	অষ্টালিকা
এসারা	১	সঙ্কেত
ওজর	১	অপেক্ষা, প্রতিবন্ধকতা
ওমর	১	বয়ঃক্রম
ওসোয়াস	১	সন্মোহ
ওজন	১	তুলা

ইত্যাদি কত শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন তাহার গোটাকত শব্দ তোমাকে শুনাইলাম অতএব বুঝা যায় পণ্ডিতের সহিত সহবাসও নাই

নং উঃ

আপনি যেসকল শব্দ সংগ্রহ করিয়া কহিলেন তাহা ভুল্লোলকে ব্যবহার করিয়া থাকেন সেকথা সত্য বটে কিন্তু জিজ্ঞাসা করি যেসকল শব্দের অর্থ বাঙ্গলা ভাষায় হয় না অথবা [৩৬] সেইমত শব্দ তোমার সংস্কৃত বা তদনুযায়ী শব্দেও নাই তাহার কি কর্তব্য যদি বল এমত কোন শব্দ নাই যে যাহা বাঙ্গলা বা সংস্কৃত ভাষায় নাই সেই সন্মোহ ভজনপথে কএকটা শব্দ কহি শুন।

কাছারি	কোরক
কামান	বস্ত
হুতি	খাজাকী

খাতা	জুম
খানসামা	জাঁক
খুস্কী	জের
খেলাং	জখম
গজ	জবানবন্দী
গলি	ঝামা
গুনাগার	ঝকমারি
গুদাম	টাকা
গুজরত	টালমটাল
গম্বা	টাঙ্গান
চড়ন্দার	ঠিকা
চকট	টিকানা
চাদা	টিকদেওন
চালাক	তহবিলদার
চুকলী	তরজমা
চৌকীদার	থোকথাক
ছাড়	থাবা
ছাপা	থানা
ছানি	থান
ছুটা	দোকর
জমীদার	দোকান
জমাদার	দলিল
[৩৭] জামিন	দফরা
জেলা	দাওয়া

দাখিলা	বাজি
দেওড়	বাজার
ধমক	বাজে
ধরাট	ভাও
ধাক্কা	ভাড়াট্যা
নামজুব	মজুর
নালিস	মুদ্রত
নিলাম	যড়াও
নগর	রওনা
নকসা	রহ
[৩৮] নকল	রসদ
নাঞ্জির	লাগাও
ফাঁকা	সওদা
ফতুয়া	সরকার
ফতো	হরকরা
ফাঁদ	হারামজাদা
ফেরাফেরি	চটকো
ফেতরাজি	হণ্ডি
ফরাগর	
ফাঁসি	হাকিম
ফুট	হাজা
বাহাদর	হামরাও
বেগার	[৩৯] হজুর
বেচারি	আসামী

আদালত	আদত
উকিল	আদাব্
এস্তেহার	উম্মী
হাল্লা	ওগয়রা

ইংরাজী শব্দ

ননহুট	গরিপ
সমন	কালেক্টর
কামান্‌লা	কাপ্তান
কোম্পানি	জজ
কোর্ট	সপিনা
টচমেন্ট	ওয়ারিন
ডবল	এজেন্ট
ডিক্রি	ড্রেজরি
ডিসমিস	বিল
ডিউ	সারজন
প্রিমিয়ম	ডিসকোন্ট
	ইত্যাদি

[৪০] ইহার কতক কতক ব্যবহার করিয়া থাকেন কিন্তু ইহাতেও বড় দোষ স্পর্শ হয় না যেহেতু সজ্ঞাপূজা ও দৈবকর্মে পিতৃকর্মে ঐ সকল শব্দ ব্যবহার করিলেই দোষ হইতে পারে বিষয় কৰ্ম নির্বাহার্থে কিম্বা হাজ পত্তীহাসাদি সময়ে ব্যবহার করণে কি দোষ আর অজ্ঞ জাতীয় ভাষা না কহিলে পরে সংস্কৃতভাষায় ভাষা ব্যবহার করিলে অনেকে বৃদ্ধিতে পারে না তবে কিরূপে বিষয় কৰ্ম নির্বাহ হয়, আরো বলি যখন

যে জাতি রাজ্য করেন তখন তজ্জাতীয় অনেক বাক্য চলিত হইয়া থাকে বিশেষতঃ রাজবিচার সম্পর্কীয় ব্যাপারের কথাসকল ব্যবহার না করিলে উপায় নাই।

অপর কহিয়াছ পণ্ডিত লইয়া আলাপ সহবাস নাঞি এ তোমার প্রলাপবাক্য যেহেতু কলিকাতা নিবাসি ভাগ্যবান লোকেরিগের নিকটে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সর্দার গমনাগমন আছে এবং ভাগ্যবান ব্যক্তি সকল পণ্ডিতেরিগের নানা প্রকার [৪১] গৌরব করিয়া নিয়ত প্রতিপালন করিতেছেন তাহা শ্রবণ কর পল্লিগ্রাম হইতে কেহ ছাত্র কেহ কৃতবিদ্য হইয়া কলিকাতায় আসিয়া থাকেন কোন যোগে কাহার দ্বারা কোন ভ্রমরত ভাগ্যবান লোকের সহিত আলাপ করেন পরে সর্দার যাতায়াতের দ্বারা আশ্রয়িতা হয় যদি আপনার বিচার প্রাচুর্য্য প্রকাশ করিতে পারেন তবেই তাঁহার প্রতিপত্তি হয় শেষে তাঁহার টোল চতুষ্পাটী ঐ দয়ালু দাম্পিক বাবু করিয়া দেন এবং বাহাতে তিনি সর্জিত প্যাত হইয়া অধিক লাভ করিতে পারেন তাহার স্বত্বপরত চেষ্টা করেন এই প্রকারে অনেক টোল চৌবাড়ী হইয়াছে এবং এইক্ষণেও হইতেছে ইহাতেই বিবেচনা কর পণ্ডিত সহিত আলাপ কৌশল আছে কিনা।

বি, প্র, আপনি যেসকল কথা কহিতেছেন ইহাতে আমার অনেক সন্দেহ নিরাস হইতেছে [৪২] কিন্তু মহাশয় এক আশ্চর্য্য বোধ করি যে এমত সম্ভাব্যহার্য্যিত ভ্রমলোকেরদিগের একই বিষয়ে কেন নির্দা হয় বলিতে পারি না, দেখ প্রায় সর্দার জনিতে পাই যে প্রায় অনেক ভ্রমলোক আপন প্রশংসা জনিতে মহা সন্তোষ করেন ইহাতে কি মূর্থ কি পণ্ডিত সকলেই কহিয়া থাকেন যে মহাশয়ের তুলা গুণবান ও গুণবোদ্ধা আর দেখি না ইত্যাদি আর দানও দস্ত যুক্ত হইয়া করেন যথা অমুক পিতার আঁকে ব্রাহ্মণেরদিগো দশ টাকা দিয়াছে আমি ২০ টাকা দিব

আর অত্যন্ত অহংকার্য্যিত এবং বিজ্ঞাতীয় অভিমानी যথা আমি বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ ধনবান্ রূপবান্ ইত্যাদি এ প্রকার হইলে ভ্রমলোকের ভ্রম্ব্য কি প্রকারে থাকিতে পারে।

ন, উ, ওহে ভাই জন এ বাঙ্গলা দেশ এস্থান বড় কঠিন তাহার মধ্যে বিশেষতঃ কলিকাতা এখানে কোন অংশে লোকের অল্পরাগ পাওয়া ভার যেহেতু যদি কোন ব্যক্তি অধিক দান করেন [৪৩] তবে তাঁহাকে কেহ অমুক বয়াইয়া গেল জিহ্বার কি বিষয় হইবেক, এপ্রকার দান করিয়া কত লোক দরিদ্র হইয়াছে তাহার সাক্ষী অমুক হালদার প্রভৃতি গিয়াছেন যদি কেহ দান না করেন তবে তাঁহাকে বড়মাহুষ যদি কেহ বলে তবে অল্প ব্যক্তি কেহ রাম বল তাহার নাম যুগায়েও আনিয়া না সেটা রূপের শেষ কৃত্য তাহার নাম করিলে সেদিন ভাল যায় না, তার অল্প লোককে দেওয়া দূরে থাকুক আপনি যায় না পরে না আর যদি কোন লোক উত্তম আহার করেন ও উত্তম বস্ত্রাদি পরিধান করেন তবে বলে ও পিতা মাতা পুত্র পৌত্র কলত্র গুরু পুরোহিত কাহার নহে যে কিছু যায় দেখিতে পাও সে কেবল আপন শরীর শুশ্রূষার্থ মাত্র অল্প লোকের উপকার করা দূরে থাকুক আপনি স্ত্রী বাহাকে শায়ে শরীরের অর্ধেক কহে।

যথা

বেদে যুতো তস্মৈ চ লৌকিকাচায়ে চ ॥ শরী[৪৪]রার্জ্য দ্বতা জায়া পুণ্যাপুণ্যকলে সমা ইতি। তাহার সহিত কোন সম্পর্ক নাঞি এত বিষয় আছে তবু তাহার ভাল বস্ত্র কি আভরণ কদাচ কিছুই দেয় না যদি কেহ আপনি ভাল যায় ও ভাল পরে ও স্ত্রীকেও তেমনি করে তবে কহে ওটা অত্যন্ত রৈগ ওহার যে কিছু দেখিতে পাও কেবল দেবা আর দেবী দুইজন মাত্র ধর্ম কর্ম কিছুই নাঞি যদি কেহ ঐ সকল বিষয়ে

আপন আপন বিভবানুসারে বিবেচনা পূর্বক ব্যয় করেন এবং স্বজাতি জ্ঞাতিকুটম্ব দায়গ্রস্ত হইয়া ধরিলে কিঞ্চিৎ দিয়া থাকেন এমত জানিলে অনেকে আগমন করেন কোন দিবস এক ব্যক্তি আগত হইলেন আপন বিষয় অবগত করাইলেন পরে সেই ব্যক্তিকে একটা কি দুইটা টাকা দিলেন কিন্তু সাবকাশের অন্ততাই হউক কিংবা অধিক শ্রবলৌকিকতা বাঁকা কহিতে যদি অক্ষম হইয়েন তবে ঐ আগত ব্যক্তি সেই দুটা টাকা লইয়া বাহিরে আসিয়া কহে [৪৫] কি কহিব আমার কপাল মন্দ নতুবা এমত লোকের নিকটে কখন আসিতাম না ওহে মহাশয় শুনিবা দুটা টাকা আমাকে দিলেক এই অহঙ্কারে আমার সহিত কথা কহিলেক না পাৎসাহার মোহর মাধ্যম রাখি নতুবা ওহার টাকায় প্রশ্রাব করিয়া দিতাম, বাহার সাক্ষাতে কহে তিনি কহেন তুমি ভাল কর নাঞি এমত লোকের কাছে ভালমাছঘে যাইবেক না তাহা কথিত আছে

যথা

বরমপিভিক্ষা বরমুপবাসঃ, বরমসিধারা তরুতলবাসঃ । বরমপি ঘোরে নরকে মরণং ন চ ধনগন্ধিবান্ধবশরণং ॥ অতএব বলি ভাই লোকের এখানে অহুরাগ পাওয়া বড় ভার, বিশেষতো ভিক্ষুক নিম্নক ও শত্রু ইহারদিগের নিকট কখনই অহুরাগ পাওয়া যায় না

যথা

ভিক্ষুকেনাহুরাগোহন্তি নাহুরাগোহন্তি নিম্নকে [৪৬] কৌন্ত্যঃ দানে চ শৌর্যো চ শত্রুলোকত্র কা কথা । অতএব ভিক্ষুকে কে পরিতোষ করিতে পারেন অতিশয় বিনিয় পুঙ্খকে নিম্নকভক্ত বিটল বলে স্বন্দর অপুঙ্খকে তাহার শত্রুরা শত্রুতা করিয়া কহে ওহার গায়ে কটা চামড়া মাত্র সেসকল নিম্নার কথা গ্রহণ করিবা না আর ভ্রলোকের উচিত

নহে যে অহুসন্ধান করিয়া কাহার দোষ গ্রহণ করেন তাহাতে যেসকল গুণ থাকে তাহাই গ্রাহ্য

যথা গুণায়স্তু দোষাঃ স্বজনবদনে দুর্জনমুখে গুণা দোষায়স্তু কিমপি পরমং বিশ্বয়তরং । যথা জীমুতোহয়ং লবণজলধেৰ্ক্ষারি মধুরং ফণী পীত্বা ক্ষীরং বমতি গরলং দুঃসহতরং ।

অন্তার্থঃ

দোষকে বলিয়া গুণ হুজনেতে কয়, দুর্জনে মুখেতে ইহার বিপরীত হয়, অপেয়, জলধি জল মেখে করি পান, বর্ষণ করয়ে দেণ অমৃত সমান, [৪৭] ক্ষীরপানে সর্প বিষ করয়ে বমন, দুর্জনেনো এই মত জ্ঞান আচরণ ।

ক্রমশঃ

ভৌতিক

দেখিয়াছি ভূত আজিকে,

পিশাচ, ডাইনি, পেরেতের পুত পাজিকে ।

সবান্ধবেতে হাঃ হাঃ হাঃ হাসিয়া আইল

বিকট চণ্ডেতে ভেঁচি মারিয়া ধাইল

অহুধর আর বিসর্গে মিলি' কাহিল

ভয়াবহ কথা, রক্তের স্রোত বহিল ।

এক "রীম" ভূত পাঁচশ করিয়া "রীমে"তে,
 "রীম" খুলে ওড়ে ভোঁ ভোঁ করে তারা কি মেতে,
 তাল ও তমাল বকুল এবং নিমেতে
 বসে সারি সারি সকালে ছুপুরে হিমেতে।

তরুণী প্রেতিনী আসে বৃকে বাধা বোমা যে,
 দেখিয়া প্রেমিক ভূতের হইল "কোমা" যে,
 চুষন হানে ছমাছম তারা সধনে,
 সবে কাঁপে ভয়ে তারা থসে পড়ে গগনে।

মুণ্ড কাটিয়া শূন্সে উজ্জ্বল ছোড়ে যে,
 মাছুষ ধরিয়া সেলায়ের কলে ফোড়ে যে,
 টেকিতে কুটিয়া বিক্রয় করে অস্থি,
 আচার বানায় রৌদ্রে শুধায়ে হস্তী
 হণ্ড হণ্ড সবে সাবধান,
 কর কসে স্বান না হইলে পাবে আশ্রাণ।

ভূত কবছ ডাইনে,
 বাঁচাতে পারে না পুলিশ, গোরা কি আইনে;
 নির্ঘাত যাবে পিষিয়া,
 গাধার রক্তে তোমার রক্ত মিশিয়া
 অপক্লপ হবে গন্ধ;
 সর্ক জীবের আন্তনাদের ছন্দ
 বাজিবে প্রলয় কাবো
 ভূতেরা যখন আকাশ হইতে নাববে।

হে কবি তোমার অপঘাতে হবে শেষ যে,
 কলেরা ডেবু বেরিবেদি হলে ক্রেশ যে,
 কলিঙ্গা চুমিয়া ভূতে খেলে কিবা দুঃখ—
 মামুদোর নথ সতত দারল হৃদয়।
 পেতনীর। স্তনি "প্রাভিজমে" বড় পাফা,
 তা ছাড়া "নিউজ্" তাই চাই তার দাফা।
 ব্রহ্মদৈত্য অকারণ প্রেম পুলকে
 বেল গাছে থাকে, মেনি ডাকে ঐ হলোকে।
 মেকুর হলও ঢেকুর তোলে সে প্রণয়ে,
 ডাক্তার খোঁজে গালিতে প্রেমের ত্রণ এ।
 কে কোথায় আছ মাছুষ জন্ত ইষ্টক,
 সাবধান! চাঘ প্রেতে পেতে আজ পিষ্টক।
 মোটা লোক, খেকো আড়ালে;
 ঘরের বাহিরে চরণটি আজ বাড়ালে
 নাহি নিস্তার—

প্রেতিনী দাক্ষণ "কিস্" তার,
 (যদি) পড়ে কোন মতে গালেতে
 "সালফিউরিক" "নাইট্রিক" সেই লালেতে
 গলে যাবে, গলে যাবে ঠিক,
 আতঙ্কে খাবি খাবে ঠিক।

হেরো বেকা ভূত টেড়া বিভীষণ বজ্র,
 পায়ের বদলে আছে অস্থির চক্র,

খাটো ভূত দেখে আছে ভূত কত লখা
এক সাথে সোলে যেন কাঁদিতরা রস্তা ;
জাগ্রৎ ভূত “এলারাম” বাজে অতে,

কেহ ঘোরে নিয়ে সঙ্গে,
পুঁটুলিতে নিয়ে মাথাটি ;
কেহ বানিয়েছে কাঁথাটি,
প্রেমিকা প্রেতিনী তাহারই লইয়া চন্দ্র
চরিত্র ঠিক থাকিবে, তাহার বন্দ ।
কারো নিতখে নেত্র ;
কারো লাঙ্গুল বেজ,

ছিল সে দারোগা বৃষ্টি বা
ল্যাজ মরে পিঠ খুঁজি বা !
ভীষণ ব্যাপার ভূতে ভরে যায় ছুনিয়া,
বিশ্বাস নাহি হয় যদি কথা শুনিয়া
হুংখে তোমার কাঁদবে শৃগাল কুকুরে ;

মুখ দেখে পরে মুকুরে
হবে সন্দেহ, “এ ত আমি নয়, আর কেউ”
ভয় সাগরের ভূত ঢেউ,
বস্ত্র তাহার ভয় ছাড়া আর কিছু নাই
ফেনিল ছুঁপিয়া কাঁপিয়া গঞ্জে ভয়টাই ।
উন্মির সারি ভীষণ আকার ও প্রকারে,
প্রাণ কেঁপে ওঠে লাগে নিদারুণ ধোঁকা রে ;
গ্রাস করে থাকে ছুটে আসে বেগে উদ্‌দাম
মন-বালুতটে আছাড়িয়া পড়ে ছড়দাম

তখন চাহিয়া দেখি রে
আরে, অল শুধু ! ছি, ছি, একেবারে মেকি রে !
কোথা ভূত, প্রেত, পিশাচ, ডাকিনী, যোগিনী,
রাক্ষস, দানো, যথ, মামদোর ভগিনী,
“সব খুট হায়”—কিছু নাই ভাই ছুনিয়ায়,
ভূতের গল্প শুনি আয়—
কাছাকাছি বসে গা ঘেঁষিয়া ঠেসে কজনে,
গল্পের শেষে কাটাব রাত্রি ভজনে ।

শ্রীমধুকরকুমার কাঞ্চিলাল

নারী, পুরুষ ও প্রেম

পুরুষ চিরদিন নারীকে রহস্যময়ী বলিয়া ভাবে । সে নিজে পুরুষ ;
অতএব তাহার মধোও যে কোনো রহস্যের বিষয় থাকিতে পারে একথা
কোনদিনই সে ভাবিয়া দেখে নাই ।

তেমনি নারী ও পুরুষকে কিছু পরিমাণে রহস্যময় বলিয়া ভাবে ।
এবং সে নিজে নারী বলিয়া নারীর মধোও যে কোনো রহস্যের বিষয়
থাকিতে পারে একথা সেও কোনদিন ভাবিয়া দেখিবার প্রয়োজন বোধ
করে নাই ।

বাবহাৱিক জীবনে উভয়ের মনে পরস্পরের প্রতি এই রহস্যবোধের
বাস্তবিক প্রয়োজন আছে । কিন্তু, নারী ও পুরুষের মধো বাস্তবিকই
কোনো রহস্যের বিষয় আছে কি না, আসলে তাহাই ভাবিবার কথা ।

পুরুষ যখন নারীর প্রেমে কায়েম হইয়া বসে, তখন সে ভাবে, 'আমি জয়লাভ করিয়াছি'। নেহাৎ ধাবড়া বৃষ্টি বলিয়াই সে বৃষ্টিতে পারে না, যে, নারী কিন্তু তখন নিজেকে একটুও পরাজিত বলিয়া ভাবে না। বরঞ্চ সে এ বিষয়ে পুরুষের চেয়েও 'এক কাঠি' বাড়ী। পুরুষ যদি ভাবে, যে, 'আমি জয়লাভ করিয়াছি' ত, নারী ভাবে,— 'আমার মুগ্ধা সফল হইয়াছে'।

পুরুষের মন ব্যাধের মন; সে জাল পাতিতে ভালবাসে। নারীর মন শিকারীর মন; সে শর-সন্ধানেই বঁধী।

নারীর জীবনে বাস্তব-অহুত্ব প্রায় সকল স্থান লইয়াই বর্তমান। পুরুষের জীবনে ভাবাহুত্বের অবসরই সকলের চেয়ে বেশি।

তাই, প্রেমের পূজায় পুরুষ চিরদিন বর্ণ, গন্ধ ও গানের অর্ঘ্যই সাজাইয়া আনিতে ভালবাসে। But oh, the tragedy of it!— মেয়েরা কিন্তু আলোচাল ও কলার নৈবেদ্যই পছন্দ করে বেশি।

অবিবাহিত অবস্থায় নারী শীলতায়, সংযমে, সলজ্জভাবে ও জ্বরের উদারতায় আপনার চারিদিকে একটি আকর্ষণময় পরিবেশ এবং হুনিবিড় স্নিগ্ধতা রচনা করে। কিন্তু বিবাহের পর, পুতুল প্রভৃতি আর পাঁচটা অকেজো খেলনার মত এগুলিকেও সে বাপের বাড়ির আদাড়ে পাদাড়ে যথারীতি ফেলিয়া রাখিয়া যায়। অথচ পুরুষের বেলায় আমরা বিবাহের পরই তাহার জীবনে সংযম ও শৃঙ্খলার সমাবেশ দেখিতে পাই।

এ সবার অর্থ ইহাই, যে, মেয়েরা মূর্থ নয়, এবং পুরুষেরা এক-একটি আন্ত ভোঙ্কলদাস! কেননা, নারী-দেহের গঠন কঠোর নয়, কিন্তু

জীবন-সংগ্রাম কঠোর। অপচি—পুরুষের নাকে দড়ি পরাইতে হইলে কিঞ্চিৎ কৌশল ও বুদ্ধির প্রয়োজন।

পুরুষেরা প্রায়ই বলিয়া থাকেন,—মেয়েদিগকে মাথায় তুলিয়া নৃত্যশীল হওয়া পুরুষের পক্ষে লজ্জার বিষয়। কেননা, মাথায় থাকিবার কোনো যোগ্যতাই তাহাদের নাই।

অপিতৃ, পুরুষের মস্তকই হইতেছে মেয়েদের অবস্থান করিবার যোগ্যতম স্থান। অস্বস্ত, পুরুষের পক্ষে মেয়েদিগকে মাথা হইতে নামাইয়া ফেলার অক্ষমতাই তাহার প্রমাণ।

মেয়েরা পুরুষের মাথায় থাকে বলিয়াই পুরুষের শরণ—নারীর চরণ! এবং সেই কারণেই পুরুষের 'দেহি পদপল্লবমুদারম্'-প্রমুখ আবেদনগুলি কোনমতেই অত্যাশ-সঙ্গত নহে।

প্রেমে পড়িয়াছে এমন পুরুষকে সহজেই চিনিতে পারা যায়, কিন্তু এমন নারীকে চেনা কঠিন। নারীর এই সকল গোপনতার মূলে আছে তাহার 'অশিক্ষিতপটুতা'।

কৌশল ও পটুতা পুরুষের পক্ষে শিক্ষা-সাপেক্ষ। নারী বিনা শিক্ষায় তাহা লাভ করে। পুরুষের পক্ষে ইহা matter of reason, নারীর পক্ষে ইহা matter of instinct।

Reason পুরুষের কান ধরিয়া নিয়তই 'উঠ-বোস' করায়; নারীকে সে দূর হইতে করে নমস্কার।

পুরুষের shyness ও মেয়েদের shyness—এ মূলগত পার্থক্য আছে। পুরুষের লাজুকতা দুর্বলতা মাত্র। ইহা অশোভন (awkward)।

নারীর লাজুকতা তাহার যৌন-প্রতীতি (sex-consciousness) হইতে জন্ম লাভ করে। ইহা উপযুক্ত (becoming) এবং মূল্যবান।

লাজুক পুরুষ নারীর শ্রদ্ধার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, কিন্তু প্রেমের উপর নয়। প্রেমের জগতে লাজুক পুরুষ নারীর জীবনে বিভবন্য মাজ।

প্রেম পুরুষের কর্তব্যবৃত্ত জীবনের নৈমিত্তিক বিলাস। ইহা নারীর ব্যবসায়—বিজ্ঞেন্স! বলা বাহুল্য, বিজ্ঞেন্স কোনরূপ দুর্বলতাকেই সম্বন্ধ করিতে অক্ষম।

পুরুষের মুখের দিকে চাহিয়া কথা বলিতে গেলেই, চোখ মুখ রাজা করিয়া ঘামিয়া ‘এক-সা’ হইয়া-যাওয়া-রূপ যে লক্ষ্য, তাহা দুর্বলতা নয়, তাহা লক্ষণ; তাহা instinctive; প্রেমের বিজ্ঞেন্সে তাহা নারীর পরম সহায়ক।

প্রেমকে নারীর বিজ্ঞেন্স বলিতেছি বলিয়া বাহার ক্ষুদ্র হইতেছেন তাহার অবশ্যই পুরুষ। এমতাবস্থায় তাহাদিগকে বুঝানো নিশ্চয়ই খুব কঠিন কাজ, যে, এক-বাটি চাঁদের আলোয় সম্ভবত বিশ্বদ্রাবী বিলাস-ও থাকিতে পারে, কিন্তু এক-বাটি ছুখের পুষ্টির কথামাজও তাহাতে নাই।

প্রেমকে আমরা বিধি ও অবিধি এবং নীতি ও দুর্নীতির ছুরি চালাইয়া যখন বিশ্লেষণ করিতে বসি তখন বিচার-বোধ (reason) আমাদের অচ্যুত থাকিতে পারে। প্রেমকে অচ্যুত থাকিতে করে সংস্কার (instinct)।

বিচার-বোধের সৃষ্টিকর্তা মানুষ (নিশ্চয়-ই পুরুষ মানুষ!)। জান

ও সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে ইহার সৃষ্টির আরম্ভ। আর সংস্কারকে সৃষ্টি করিয়াছে প্রকৃতি। সৃষ্টির আদিম যুগ হইতেই ইহার অঙ্গ ও অনিবার্য শক্তি জীব-চরিত্রে বহুমূল হইয়া আছে।

বিচার-বোধের motive power নাই। সংস্কারের motive power অপরিণাম। মানুষের জীবন-ধারা, ইচ্ছা ও কর্তব্যকে সংস্কারই পরিচালিত করে—বিচার-বোধের দ্বিধায় পড়িয়া জীবন-ধারার সহজ গতি প্রতি পদেই বাধা প্রাপ্ত হয়।

Maxim Gorki বলিয়াছেন,—“Our reason is the source of all our misfortunes....Like a child it wants to see how this thing and that thing are made and what there is inside them and of course it breaks them.”

এ-সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত Bernard Shawর এই কথাটি আরও মূল্যবান : “The man who listens to Reason is lost.”

তাঁহার ঐ ‘man’ শব্দটির ব্যবহারে আরও একটি পরম সত্যের প্রকাশ দেখিতে পাইতেছি। তাহা এই,—A woman is normal enough never to listen to Reason.

শুধু বিচার-বোধ কেন, যত রাজ্যের নড়বড়ে জিনিস পুরুষ-ই সৃষ্টি করিয়া থাকে। নারীর সৃষ্টি কোনদিন-ই নড়বড়ে নয়।

সংস্কার প্রকৃতির সৃষ্টি। প্রকৃতির নারী-রূপ পুরুষেরই কল্পনা।

যে যত বেশি নীতিপরায়ণ, প্রেমে পড়িবার ভয় তাহার-ই তত বেশী।

প্রাচীন কালের অতি নীতিপরায়ণতার যুগে মহাশক্তি ও মহামুনিগণকে প্রেমে পড়িয়া সেই জন্তই অমন hopelessly হাত-পা ভাঙিতে দেখি।

প্রেমকে দূরে রাখিয়া যে যত বেশি উপরে উঠিয়া যায়, পতন কালে মারাত্মক দুর্দশা তাহার-ই অদৃষ্ট-লিপি।

ভাল হোক, মন্দ হোক, প্রেমে পড়িবার স্বযোগ বা দুর্যোগ একবার সম্মুখে আসিলে হীনীতি হীনীতির বিচার জুলিয়া গলগলীয়ুক্তবাসে পুরুষকে চিরদিন-ই প্রেমের বেদীতে মাথা ঠেকাইতে দেখিতেছি। বলা বাহুল্য, নারীর পদপল্লব-ই এই প্রেমের বেদী। নিজের বেলায় লোকে বলে—স্বর্গ! অপরের বেলায় বলে—নরক! কিন্তু শ্রীমতী শ্রামলীয়া চাটুয্যের মতে—ইহা ঈড়শিও নয়, ট'ড়শিও নয়, ইহা নোয়া বেকানো। It is like death! স্বর্গ-ই হোক আর নরক-ই হোক, all will have to go the same way!

(মিস) শ্রামলীয়া চাটুয্যে

একটি বর্ষার সন্ধ্যা

বাড়ীতে বসে আছি। কার বাড়ীতে? যার বাড়ীতেই হোক না কেন, তাতে আপনার কি?

বাড়ীতে বসে আছি। ঘরেতে আমি একলা। বাড়ীটা নির্জন, মাঠের ধারে। আশে পাশে দু'একটা বাড়ী আছে বটে, কিন্তু তা দূরে, তাছাড়া সেগুলি এদেশীয় খোঁটা পুন্ডবদের। স্বতরাং থাকলেও আমার কোন লাভ নেই। না না ভায়া, মনে সন্দেহ করবেন না। আমি বিবাহিত, বয়েস পঁয়তাল্লিশ, সন্তান তিনটি এবং শ্রীমতী পার্শ্বস্থিত কক্ষেই বর্তমান আছেন। তাঁর কাংশ্র কণ্ঠধনি আমার চিন্তাস্রোতকে মাঝে মাঝে বাধা দিচ্ছে। কিন্তু তা থামাবার কোনও উপায় আমার জানা নেই; কারণ আমি অতি ক্ষুদ্র ও দুর্বল। দেবীকে কোনও বিষয়ে বাধা দেবার মত অসদভিপ্রায় আমার মোটেই নেই এবং মুহূর্তের জ্ঞাও সে ভাব মনে স্থান দিলে—যাক, সে কথা শুনে আপনার লাভ নেই। ই্যা—আমি একলা, ঘরে বসেছিলাম।

বর্ষার সন্ধ্যা। মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবছি, আমি মরে গেলেও কি আমার শ্রীমতী পরলোক বলে জায়গাটায় যাবেন?—তাড়াতাড়ি চিন্তাস্রোতকে অগ্র দিকে ফেরালাম। দুঃস্থ চিন্তা।

আজকে শ্রীনাথবাবু বা রামকান্তবাবু কেউ আসেননি। বোধ হয় বৃষ্টির জন্ত। খানিক আগে যে বৃষ্টি হয়ে গেছে, তাতে জলে আর কাদায় মাঠটা বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। তাদের না আসায় কোনও

দোষ নেই। কিন্তু, আমার আজ কি করে কাটবে? অফিসে যতক্ষণ থাকি, ভালই থাকি। বড়বাবুর মেজাজটা খারাপ হলেও গৃহিণীর চেয়ে যে টের ভাল তা আমি জোর গলায় স্বীকার করব—অবশ্য, গৃহিণীর সামনে নয়। বাড়ীতে বিকলে এসে ঢুকলেই মনে হয়, যেন নরকের কুস্তীপাকের মধ্যে পড়ে গেছি। গৃহিণী আর আমার তিনটি সন্তান, যেন সকলে যমদূত। বন্ধুরা ঘণ্টা দুয়েক থেকে গল্প শুভব করে বাড়ী ফেরে। সে ছুখটা স্বপ্নের মত কেটে যায়। তারপর? তারপর আমি আর গৃহিণী, গৃহিণী আর আমি, আর আমার তিনটি সন্তান।

রাত্রির গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে আমি যেন আবহের গভীরতার প্রদেশে চলে যেতে থাকি। চন্দ্রালোকপ্লাবিত স্থপ্ত সৌন্দর্য্য হয়ত কোন দিন আমার নিচ্ছীৰ তাক্যাকে নাড়া দেয়; কিন্তু গৃহিণী নিতান্ত অরসিকের হায বলে ওঠেন, “মিনুষের বয়েস কত হোল, সেদিকে খেয়াল আছে?” তাই ত বয়সের খেয়ালটা আমার করা উচিত বই কি! আমার যৌবন গেছে। আমার মনের অর্ধেক তাক্য আকাশের সঙ্গে, মাটির সঙ্গে মিলিয়ে গেছে; যেটুকু উদ্ভূত সে তো মনের নিভৃত কন্দরে মৃতের মত নিচ্ছীৰ অবস্থায় পড়ে আছে। চন্দ্রালোকের সৌন্দর্য্যকে, নীলী রাত্রির মৌন দৃষ্টকে আমায় উপেক্ষা কর্ত্তেই হবে। আমায় ভাবতে হবে, যে আমার বয়স অনেক হয়েছে।

“ওগো শুন্‌ছ?”

চিন্তাষোভের গতি রুদ্ধ হল। বাইরে মেঘ ঘনঘটা করে আসছে, বাতাস বইছে অতি ধীরে ধীরে। বন্ধাম, “শুন্‌ছ বই কি”।

“কি শুন্‌ছ?”

“খা বলছ, তাই শুন্‌ছি।”

“ইয়ালি রাথ, একটা কাজ করো।”

“আদেশ কর দেবী, তোমার কোন কাজটা কবে না করেছি?”

“কি চাই আজকাল শুরু করেছ—বয়েস বাড়ছে না কমছে?”

“তা তো জানি না।”

“ছাকামো ছাড়। মণিটা এলে আজকে খুব ধমকে দিও, রাত দিন শুধু থেলা, দিন দিন বয়ে যাচ্ছে। এমন জুর্ঘ্যেগের দিনেও থেলা—মাগো!”

গৃহিণী আরও কি সব বলতে বলতে কক্ষান্তরে গেলেন। আমি বাইরের দিকে তাকালাম। অন্ধকার হয়ে আসছে। বাতাস বইছে জোরে। মেঘগর্জন হচ্ছে ঘন ঘন। মনটা কেমন যেন আকুলি বিকুলি করতে থাকে। একটা অপূর্ব্ব অবশ ভাব। মনে মনে ভাবি, আমার জীবনের আজ তৃতীয় অধ্যায়ও শেষ হতে চলল। কিন্তু এর মধ্যে কি লাভ করলাম? প্রশ্নের উত্তর পাই না। বার্থতার নিষ্ফল, অর্থহীন অভিযোগ আমার বৃকে তোলপাড় করতে থাকে।

কোথাও যেন বজ্রপাত হয়। বিদ্যুৎ চমকতে থাকে মুহূর্ত্ত।

“রামা—ও রামা হারামজাদা—” র্থেকী কুকুরের মত গৃহিণী চীংকার করে ওঠেন। কিন্তু আজ তাঁর এই চীংকার আমি মোটেই বিচলিত হই না। আজ গৃহিণীর কর্ণশ কণ্ঠেও যেন কেমন একটা মাদকতাময় স্বর। বর্ষার মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, সন্ধ্যার অন্ধকার, আর পাগলপারা বাতাস; আমার মনের নিচ্ছীৰ তাক্যাকে যেন আজ আবার বহুদিন পরে নাড়া দিচ্ছে। সে যেন হঠাৎ চোখ মেলে বিশ্বম্বে চেয়ে আছে। আমি তাকে অহুভব করতে পারছি। তাঁর গভীর রহস্যময় চোখের চাউনি আমায় এখন বিস্মৃত করে তুলছে; তাঁর

পুষ্পের চেয়েও নরম দেহের স্পর্শে আমার দেহমন অবশ হয়ে যাচ্ছে।

“ওগো স্তনছ ?”

উত্তর দিই না—ক্ষমতা নেই। আমি যেন সুরাপান করেছি।

“ডাক্তার, মুখপোড়া, হুহমানটার আলায় হাড় ক'খানা গেল। সেই কখন বাজার গেছে। যেমন কর্তা, তেমনি তার চাকর আর ছেলে-মেয়েরা—ওরে অ'রামা—ওগো—একবার জাম্বুবানটাকে ডাকো না—”

তবুও উত্তর দিই না। দেবও না। আজ আমি ভাবব। জীবনে হয়ত বহু বর্ষার সন্ধ্যা আসবে, কিন্তু এমনটি কি আর কোনও দিন পাব ? জীবনের আর কোন মায়া নেই কারণ আর আকর্ষণ নেই। রতীন চশমা ভেঙে গেছে। এখন একটা গভীর তন্দ্রার ভাব। হু' একটা স্বপ্নস্থল। যদি আজ আমার অহুতিকে আহ্বান করে, তা উপেক্ষা করা আমার জীবনের যে কত বড় অপচয়, তা তোমরা কেউ বুঝবে না।

মেঘগর্জনে হয় জোর—গুরু-গুরু-গুরু-গুরু। গৃহিণীর তর্জনে গর্জনে মেঘগর্জনের কাছে ডুবে যায়। আমি মেথকে দৃজবাদ দিই।

দৃজবাদ দিতে গিয়ে মেঘের দিকে তাকাই,—পুঞ্জীভূত ঘনকুম্ববর্ণ মেঘ। ভাবি—এমন কেন হল ? মেঘের গুরু গুরু ডাকে বাতাসের শৌ' শৌ' শব্দে, আবহা অন্ধকারে মন আজ এমন কেন হল ? এ কি বিভিন্ন অহুত্ব !

“ওগো, আজ ক' তারিখ ?”

“পয়লা আষাঢ়।”

আবার ভাবি, পয়লা আষাঢ় কালিদাস মেঘদূত আরম্ভ করেছিলেন। সে কি এমন এক পয়লা আষাঢ়ের বর্ষার সন্ধ্যায় ? আজ আমার

সন্ধ্যারের নাগপাশে বন্দী মনেও যে অপূর্ণ বাধা ও আনন্দের ছোঁয়াচ লেগেছে ঐ সন্ধ্যার অন্ধকার আকাশে মেঘরাশি দেখে ;—কালিদাসের মনেও কি এমনি ভাব জেগেছিল ? কে জানে। হয়ত জেগেছিল।

কিন্তু সেদিনও যে আকাশভরা মেঘ ছিল, মেঘে বিভ্রাৎ ছিল তা কে স্বীকার করবে ? এমন এক পয়লা আষাঢ়ের সন্ধ্যায় নিবিড় কুম্ব মেঘরাশি বিরহী যক্ষের বাস্তবহ হয়ে চলেছিল অলকাপুরীতে তাঁর প্রেয়সীর কাছে তাঁর বাণী নিবেদন করতে।

আমি আজ এই মেথকে কি বাণী দেব ? ও যেন আমারি জঙ্ঘ অপেক্ষা করেছে। কিন্তু কাকে বলতে বলব ? যাকে বলতে চাই, তাঁর মুখ তো দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে ঢাকা। সে কি শুধু আমার প্রেয়সী ? না, শুধু প্রেয়সী নয়—শুদ্ধমাত্র প্রেয়সী তো এই মর্ত্যালোকেই বর্তমান আছেন এবং দৌত্যকাধার জঙ্ঘ আমার তিনটি বংশধর ও রামা নামক ভৃত্তা আছেন। না—আমার প্রেয়সী যখন মর্ত্যালোকেই বর্তমান আছেন তখন মেথকে আর কি বলব ? তার চেয়ে মেঘ যদি একটা এরোপ্লেন হ'ত, তাহলে না হয় অলকাপুরীর প্যারিস-লগুন একবার ঘুরে আসতাম।

কিন্তু তবুও হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে কে যেন এর প্রতিবাদ করে বলে—এ মেঘ রোজ আসে না—এ অহুত্বিত তুমি রোজ পাবে কোথায় ? কিছু বল।—আচ্ছা, তাই হোক। মনে মনে বলি—হে বারিদ, আমার নিষ্কীর্ণ তাকগোর একটু স্পন্দনে যে মানস স্বপ্নলোক আজ আবার আমি দেখতে পাচ্ছি, তাতে, যে মানসীপ্রিয়া দীর্ঘঅবগুণ্ঠনে মুখাবৃত করে আছেন, তাকে গিয়ে বল,—“হে মানসীপ্রিয়া, তুমি তোমার অবগুণ্ঠন খুলে ফেলে আমার সকল স্বপ্নের অবলান করে দাও। তোমার দৃষ্টির গভীরতার মধ্যে আমার মানসদৃষ্টি ডুবে যাক, তোমার অহুত্বিত্তে আমার সকল অহুত্বিত্ত লোপ পাক।”

মনে হয় কে যেন আমার কাঁধে হাত রেখেছে। কবে চূর্ণ কুন্তল আমার গালে এসে লেগে আমার সর্বাঙ্গ রোমাক্ত করে তুলেছে—কার মুখ উষ্ণ নিঃশ্বাস আমার দেহের উপর এসে লাগছে। হে প্রিয়া, এতদিনে তুমি তোমার অবগুণ্ঠন খুলে আমার পার্শ্বে এসে দাঁড়িয়েছ কি?

“ওন্‌ছ?”

চমকে উঠলাম। স্বপ্নলোক থেকে ধপাস করে মর্ত্যালোকে আবার পড়ে গেলাম। কাঁধে এক হাত দিয়ে, ছোটছেলেটাকে কোলে করে আমার ইহজীবনের বাস্তব প্রিয়া। স্বপ্নলোক আর কালিদাসের কথাটা তখনও মনে ছিল। তাই—আমার আটত্রিশ বৎসর বয়স্ক সুলক্ষী প্রৌঢ়া প্রেমসীকে মনে হল যেন—তখী, বিধাধরা, মদালসা যুবতী। বললাম, “অয়ি! মন্থচূতমঞ্জরী! কমলায়তচাকলোচনে!

অপহৃত্য মনঃ ক্ব যাসি মে কিমরাজকমতঃ বর্ন্ততে?”

কিমার্শ্ব্যমতঃপরম্? গৃহিণী হাসলেন। রাগ না ক’রে, জ্রুটি না ক’রে, রাগাবাদ্যার কথা, কাচ্চাবাচ্চার কথা না তুলে—তিনি পরিবর্তে হাসলেন।

“কি বল—সংস্কৃত না?”

“কি তা শুনে আর কাজ নেই। ওটা একটা মন্ত্র। পড়ে ভূত তাড়ালাম।”

গৃহিণী এদিক ওদিক তাকান। অন্ধকার ঘরে, একটু বোধ হয় শিউরে ওঠেন।

আবার বলি, “গিন্নী, আজ মনে হচ্ছে যেন আজকেই আমাদের বিয়ে হয়েছে”—

“কি কথার ছিন্নি, কোলে ছেলেটা রয়েছে দেখছ না”—

“তা হোক।” হাত ধরে বললাম, “এমন বাদল সন্ধ্যায় কেবল তোমার কথাই মনে পড়ছিল গিন্নী।” গৃহিণী অন্ধকারে মিশি লাগানো দস্তপংক্তি মেলে হাসলেন, “যাও।”

“এসে গিন্নী, একটু বোস—একটা...”

একটু রসিকতা করতে যাই, গৃহিণী কৌশল করে ওঠেন, “বুড়ো বয়েসে ভীমরতি একেই বলে। নাও ছেলেটাকে একটু দর, জর এসেছে। ওদিকে থাকলে আমার পিছুপিছু ঘুরে জলে ভিজে মারা যাবে।”

ছেলেটাকে ভয়ঙ্করবে কোলে নিই। কাতরকণ্ঠে বলি, “গিন্নী, একটু বোসোই না—”

একটা বেথাপ্লা কড়ার!

“হ্যা—আমি বুড়ো বয়েসে তোমার সঙ্গে রসিকতা করি। অন্ধকারে ভূতের মতন বসে আছ, একবার ডাকতেও পীর না, আলোর জ্বালা?”

গৃহিণী চলে যান।

কালিদাস, মেঘ, সব মন থেকে মুছে গেছে। মানসীপ্রিয়ার ঘোম্টা সবে গেছে। বিকৃত, বীভৎস তার আকৃতি।

বৃষ্টি পড়ছে মৃদলধারে। ঠাণ্ডা বোধ হয়। একটা বিড়ি ধরিয়ে টানি। বিড়ির ক্ষুদ্র অগ্নিশিখায় ঘরটা মাঝে মাঝে যেন চমকে উঠে।

ভাবি—মানসীপ্রিয়া নয়, স্বপ্নলোক নয়, কালিদাস নয়। ভাবি—এই সময়ে গরম গরম ভালপুতী আর পেয়াঙ্গী হলে বেশ হত। ঢোক গিলে খুব জোরে রিডিটা টানি।

হঠাৎ কোলের ছোট ছেলেটা নাকি-স্বরে আন্দার করে, “বাবা,

আমি বিলি খাব।" তেলে বেগুনে জলে উঠে বলি, "কেন বাবা, ওর উপর এত ঝোঁক কেন? আমার মাথাটা তো তোমাদের খাবার জন্ত মজুত রয়েছে। বেশ জিনিষ। খাবে?" ছেঁলেটা ঘাড় নাড়ে।

বাইরে তখন অবিশ্রান্ত রুপ্তিপাত হচ্ছে।

শ্রীনবেন্দুভূষণ ঘোষ

ঔদরিক।

ফুল দিয়ে তুমি ভুল করিয়াছ মোরে—হে গুলী!

কেন আনিলে না ভালিতে তোমার ভরে—'বেগুনি'?

ভাবিছ বাদলে জন্মাব ক'জন জুটি—জলুসা;

ফুল না আনিয়া আনিলে যে হ'ত দুটি—'কলুসা'।

ধরা ভেসে যায় শ্রাবণের ধারা পাতে—বাহিরে,

এ আধারে হায় পেঁয়াজের বড়া সাথে—নাহি রে!

কাবুলী মটর নিধেন 'নকলদানা'—নইলে—

প্রেম জমে শুধু মুখে মিঠে কথা নানা—কইলে?

সবুজ কালিতে লিখেছ সসঙ্কোচে—কি লিপি?

আনোঁ কি কী পেলে এ প্রাণের ক্ষুধা ঘোচে? জিলিপি।

অক্ষকোড়ি ছাদে ফেঁদেছ গালের পাশে—জলুপী।

পারিতে কিনিতে এর চেয়ে অনায়াসে—জলুপি।

পর্বতপ্রায় চিঠি জমা; এত পারো—বকিতে!

সরবত মুখে ধরানি তো একবারো—চকিতে।

সন্দেশ দিলে মন দেবো নাকো ফলত—হা বিধি।

হেন নিষ্ঠুর কে মোদের বলে বলো তো? সাধি-দি?

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

মেসের ঠাকুর

আমাদের মেসে এক নূতন ঠাকুর আসিয়াছে। বাইবার ঘরে বসিয়া ভোজন-নিরত সকলেই রন্ধনের অপকৃষ্টতা এবং পরিবেশনে বিলম্বের উল্লেখ করিয়া ঠাকুরকে বাক্যবাণে জর্জরিত করিয়া ফেলিল। একজন, বয়সে তরুণ (ষ্টুডেন্ট—অতএব স্পিরিটেড!) এমন কথা বলিয়া ফেলিল যাহাতে ঠাকুরের আত্ম-সম্মানে নিম্নম না লাগে। প্রবীণেরা, এতটা না হটলেও চলিত—এইরূপ ভাবসহকারে ষ্টুডেন্টের প্রতি চাহিল মাত্র, মৌখিক প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইল না। আমি কহিলাম, "মেসের থাওয়া—যেখানেই যান এইরকমই হ'য়ে থাকে।" ষ্টুডেন্ট গজিয়া উঠিল, "ষ্টুডেন্ট, মশাই, কার তোয়াক্কা রাখি?" অজ্ঞদের প্রতি চাহিয়া বলিয়া যাইতে লাগিলাম, "আপনারা বরাবরই একটা ভুল ক'রে আসছেন। মেসের থাওয়াকে বাড়ির থাওয়ার সঙ্গে তুলনা ক'রে অনর্থক গোলমালের সৃষ্টি করেন।" ষ্টুডেন্ট আমার কথা মক্ষ্যনানেই চাঁৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "মরাল কারেজ নেই মশায়, কথা বলতে আসবেন না।" আরও

কিছু বলিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু ষ্টুডেন্টের আক্ষালনের তোড়ে খামিয়া গেলাম।

সেদিন পাইবার ঘরে বাহা বাহা ঘটনা গেল তাহার ভিতর হইতে আমার অংশটুকু বাদ দিলে আর যেটুকু থাকে সে সমস্তই পুনরাবৃত্তি মাত্র। কেননা, বর্তমান ঠাকুরের পূর্বে যে ঠাকুর ছিল সে যখন প্রথম আসে তাহার বেলাতেও অল্পরূপ অভিনন্দন জুটিয়াছিল। ইহা দেখিয়াছি, এবং ভাল দেখিয়া বুঝিতেছি, যখনই কোন নূতন ঠাকুর আসে, আমাদের মেসের বাবু। মেসের পাওয়া সত্বে হঠাৎ সচকিত হহয়া উঠে। আবার দীর্ঘ দীর্ঘে সহিয়া যায়। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, এক ঠাকুরের রাম্মা পাইতে থাইতে নূতন ঠাকুর আসিলে রাম্মার ভিৎস্ব আশা করিতে গিয়া বাড়িতে যে ভিন্ন আহার উপভোগ করিয়াছি তাহারই কথা মনে পড়িয়া যায়, এবং তাহার সহিত মেসের খাওয়ার তুলনা করিয়া গণ্ডগোল বাধাইয়া দেই। মেসের ঠাকুরের রন্ধনের অপকৃষ্টতা বা পরিবেশনে বিলম্ব উপলক্ষ মাত্র, গণ্ডগোলের মূলে রহিয়াছে বাড়ির খাওয়ার ক্ষতি। বাড়িতে আহারে বসিয়াছি; মা অথবা বৌদি দৃঢ়সহকারে পরিবেশন করিতেছেন; আর একটু পাইবার জন্ত পীড়াপীড়ি করিতেছেন; অথ পাইলে সংযাকুল হইতেছেন; সমস্তটুকু পাইলে আমাদের তো তৃপ্তি নহে, তৃপ্তি যেন তাঁদেরই!—এ স্নেহ-রসায়িত আহার মেসে কোথায় মিলিবে? ঠাকুর বরাদ্দ-মাসিক ভাল তরকারী দিয়া খাইবে, আমরা পাইলেই কি, আর না পাইলেই বা কি? মাছের টুকরা ছুইখানার জায়গায় তিনখানা চাহিলেই বিপদ!

কিন্তু এমতাবস্থায় সে ঠাকুর বেচারীকে দোষ দিব কি, সে বেতন-ভোগী রাধুনী-মাত্র। সামান্য সে, কি করিয়া মা-বৌদির অত গভীর,

অত অনগ্র-সাধারণ ব্যক্তির পরিচয় দিবে! বাড়ির পাওয়ার সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত আছে মা-বৌদির মমতা-মধুর স্নেহ ও যত্ন। যদি হঠাৎ তাহাদিগকে উড়াইয়া দিয়া উড়িয়াবাসীকে স্থান দেই, তবে অসন্তোষ যে আসিবে তাহার জন্ত দায়ী কি এই হতভাগা? ঠাকুর তো দূর্বের কথা, তুমি অনেক সময় কত পাতান মা-মাসির কথা বলিয়া থাক, তাহাদের কথাই একবার ভাবিয়া দেখ। তোমার নিজ মা-মাসির নিকট যে সহজ অনাড়ম্বর প্রীতি পাইয়া থাক, পাতানদের নিকট ঠিক তদ্রূপ কি মেলে? পাতানদের বেলা একটু কৃত্রিমতার অস্বস্তি বোধ কর না কি? পাতানদের সহিত কথায় বাস্তব প্রায়ই তুমি তাহাদের অপার (?) স্নেহ-প্রীতির কথা উল্লেখ কর না কি? অন্তত একবার বল না কি, “আপনার ভিতর আমি আমার মাকে খুঁজে পেয়েছি—”? এই উল্লেখই তো তোমাদের পারস্পরিক আত্মীয়তাবোধের সহজতা সত্বে সন্দ্বিহান করিয়া তোলে। আপন মা-মাসি-বৌদির নিকট জীবনে কখনও একরূপ উল্লেখ করিয়াছ? (এ অসম্ভব প্রশ্নের উত্তরে মন শুধু বলে,—এ কি অদ্ভুত প্রশ্ন!).....উহা যে ‘ব্রহ্মানন্দ মহোদয়’ রস; তাই তার স্বশব্দব্যাক্য নাই। ছোট ছোট কাজ, ছোট ছোট ঘটনার নিঃশেষ বাচি-মালার নীচে রহিয়াছে অতুল শক্তিমূল স্বগম্ভীর প্রবাহের ধ্বনি। পাতানদের বেলা আছে চটল-বচন-সর্বস্ব স্বপ্ন-তোয়া প্রবাহিণী। উহা ফাঁকা, একটু দৃষ্টি দিলেই বালুকা-রাশিতে খাইয়া ঠেকে। মা আমি-বুকের শিকড়; আমাকে টান দরও, মা পর্যন্ত উৎপাটিত হইয়া আসিবে। আমি পাতান-বুকের পরগাছা; আমাকে টানিয়া উৎপাটন কর, পাতান সামান্য উঃ আঃ করিয়াই নিশ্চিন্ত হইবে। পাতান আর আমি অস্বাভাবিক কৃত্রিম জোড়—মহুয়া-চেঠা-প্রস্তুত। মাছ যবে জোড়া লাগায় তাহা বাহির হইতে যতই কেন অলক্ষ্য থাকুক না, উহা

জোড়াই থাকিয়া যায়। প্রকৃতি যে জোড়া লাগায় তাহা আর জোড়া থাকে না, দুইকে এক করিয়া ফেলে।

পাইবার ঘরে ঠাকুরকে যে আমরা গালাগাল দেই তাহা নিরর্থক বোকামি, কেননা আমাদের অভিযোগ সম্পূর্ণ অমূলক। আমাদের অভিযোগ যেন এইরূপ—ওহে ঠাকুর, কেন তুমি মা-মাসি বা বৌদির দ্বিতীয় সংস্করণ হইলে না? আমরা যদি নকলের ভিতর আসলকে পাইতে চাই, যাহা যাহা নয় তাহাকে সেইরূপে আকাজক্ষা করি, তবে অবশ্যই বিড়ম্বিত হইব। এবং আমরা মূর্খ, তাই অতৃপ্তির কলিত-হেতু নির্দোষ বেচারাকে গালাগাল দিয়া আয়ুক্ষয় করি।

ঠাকুরকে তো তাহার জটিল জ্ঞান দোষারোপ করিলাম। আমরা কি? মেসের ঠাকুরের যে রান্না ভাল হয় না তাহার কারণ কি ঠাকুরের রন্ধন-কৌশলের দোষ, না ম্যানেজারবাবুর তেল-ঘি-মশলা ইত্যাদিতে ব্যয়সঙ্কোচের দোষ? বাড়িতে মা-বৌদিরা রন্ধন-কার্যে পৰ্যাপ্ত তেল-ঘি-মশলা ব্যবহার করিতে পান,—তাহাদের রন্ধন মৃৎ-রোচক না হইয়া যায় কোথায়! মেসের ঠাকুর ঘি পায় না, পাইলেও অল্প-দামের ভেজাল-দেওয়া ঘি। তেল মোটেই পৰ্যাপ্ত পরিমাণে পায় না। জন-প্রতি মাছের অংশ দুই টুকরা, অথচ ঝোল চাই এক বাটি; ঠাকুরকে সেই অল্পপাতে স্বল্প-মৎস্তে ঝোল বেশি রাখিতে হয়, তৎফল সেই ঝোল যে কিসের ঝোল তাহা অবোধ্য। তরকারির সংস্থান অল্প, বাবুরা চাহিবে বেশি। একরূপ অবস্থায় ঠাকুর কি করিবে? অথচ এমনই মজা, পাইবার বেলা ঠাকুরকে সামনে পাইয়া বাবুদের আহারে অতৃপ্তি-হেতু যত আক্রোশ সব গিয়া পড়ে বেচারীর স্বক্ষে।

আর এক কথা। আমরা মা-বৌদির উপর যতটা বিশ্বাস, যতটা নির্ভর করি মেসের ঠাকুরের উপর তার এক কণাও করি না। তাহাকে

সর্বদা অবিশ্বাস করিয়া হিসাব লইতে বসি, আর আহারের সময় তাহার নিকট প্রত্যাশা করিব আন্তরিকতা। আমাদের ব্যবহার হইবে অবিশ্বাস-মূল বিজ্ঞেন্স-লাইক, আর ঠাকুরের ব্যবহারকে হইতে হইবে বিশ্বাস-মূল আত্মীয়। নিজেরাই অবিশ্বাসের খোঁচায় পূর্ব হইতে যে প্রীতিকে বাসা বাঁধিতে দিলাম না, কার্যকালে সেই প্রীতিরই দাবী করিতেছি। স্বয়ং অকী আকুলীকৃত্য অশ্রুকারণং পৃচ্ছসি।

* আমি তো বলি, বাড়ির আহারে মা-বৌদির যে স্নেহ-মধুর তত্ত্বাবধান বর্তমান, মেসের থাওয়ায় ঠাকুরের দিক হইতে তাহার আভাস একেবারে অসম্ভব নহে। এই তো সেদিন বর্তমান ঠাকুরের পক্ষ হইয়া ষ্টুডেন্টের মাছুলার বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও যে সামান্য দু'একটি কথা বলিয়াছি, তাহার পর হইতে পাইবার ঘরে ঠাকুর আমাকে একলা পাইলেই বেশি তরকারি, বড় বড় মাছের টুকরা দিয়া যায় এবং বার বার সতর্কত্ব জিজ্ঞাসা করে, “আর কিছু দেব কি?”.....চাউঁঘে তর্ক করিয়া বলে, “সে কেবল তোমার ভাগ্যে ঘটে, আর কেউ তো ঠাকুরের কাছে সে ছবিধে পায় না।” আমি বলি, “একান্নবর্তী পরিবারে আমার মাও লুকিয়ে আমাকে এটা গুটা পাইয়ে যান।” *

শ্রীম্মলেন্দু বাগচী

পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা

কাহার যে কখন কি ঘটিবে বলা যায় না। এই তো সেদিন মাত্র ভজহরি চাকলাদার মহাশয় তপুস বেলা শস্তায় রুই মাছ কিনিয়া বাজার হইতে ফিরিতেছিলেন। মনে আশা করিতেছিলেন আজ চমৎকার একটা ভোজ্য হইবে। কিন্তু হঠাৎ কোথা হইতে একটা মাল-বোঝাই লরী আসিয়া সরসজিহ্ন চাকলাদার মহাশয়কে পথের মাঝখানে চাপ্টা করিয়া দিল, এবং ঝুড়ি সমেত মাছগুলিরও আর জ্ঞাতি রহিল না। এরূপ যে হইতে পারে তাহা চাকলাদার মহাশয় কল্পনাও করিতে পারেন নাই, স্বতরাং হঠাৎ কি যে ব্যাপার হইয়া গেল মুহূর্তের মধ্যে, তাহা প্রথমটা তিনি বুঝিতেই পারিলেন না। যখন বুঝিলেন তখন তিনি আর ইহলোকে নাই।

আমাদের নাজুগোপালের কথাই ধরুন না কেন। বার বার তিনবার ম্যাটিক ফেল করার পর এই বছর সে চতুর্থবার ম্যাটিক দিবার জন্ম তৈরী হইতেছিল। পিতা ভাল করিয়াই বুঝাইয়া দিয়াছিলেন এ বছর পাস করা চাই—নতুবা বাড়ীতে তাহার আর স্থান হইবে না, এবং নাজুগোপাল সুবেদন নীলমণি বলিয়া তাহাকে রেহাই দেওয়া হইবে না। তাহার স্থলে দস্তক পুত্র গ্রহণ করা দরকার হইলে তাহাতেও তিনি পশ্চাত্তাপ হইবেন না। পিতারা সাধারণত যে রকম একাধারে আন্তরোয় ও আন্তরোয় হইয়া থাকেন নাজুগোপালের পিতৃদেব আদৌ সেক্ষেপ ছিলেন না। বরং ঠিক তাহার বিপরীত ছিলেন। অর্থাৎ তিনি কোনো রকমেই চট্ করিয়া তুষ্ট বা রুষ্ট হইতেন না—কিন্তু একবার

তুষ্ট হইলে যেমন তাঁহাকে রুষ্ট করা কঠিন হইত, তেমনি একবার রুষ্ট হইলেও তাঁহাকে তুষ্ট করিতে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইত। স্বতরাং নাজুগোপাল বেচারী বৃত্তিয়াছিল যে, মুসোলিনির হঠাৎ মহাত্মা গান্ধীর শিগ্গা হওয়া বরং সম্ভব, কিন্তু পিতার এই চরম বাণীর একটুমাাত্রও নড়চড় করা পরম পিতা পরমেশ্বরের পক্ষেও সম্ভব নহে।

নাজুগোপাল একটি বিষয়ে একেবারে নিঃসন্দেহ ছিল—পরীক্ষা দিলেই সে ফেল করিবে। ফেল না করার একমাত্র উপায়, পরীক্ষা না দেওয়া। কিন্তু পিতার আদেশ এই যে, পরীক্ষা তো দিতে হইবেই, উপরন্তু পাসও করিতে হইবে।

নিরুপায় হইয়া নাজুগোপাল কানিয়া কহিয়াছিল, “মা রক্ষাকালী, রক্ষা করো মা।”

কাতর প্রার্থনা বুঝা হইল না। মা রক্ষাকালী প্রার্থনা শুনিলেন। কিন্তু তিনি নিজে বোধ হয় কোনো কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন, ক্লাজেই নাজুগোপালকে রক্ষা করিবার ভার তিনি দিলেন মা শীতলাকে। তিনি আসিয়া চিরদিনের জন্ম রক্ষা করিলেন। এমনটি যে হইবে তাহা নাজুগোপাল বা তাহার পিতা কাহারো কল্পনায় আসে নাই।

শশাঙ্কবাবুর বাড়ীর উড়িয়া মালীটা হঠাৎ কাহার প্ররোচনায় চার আনা পরস্য খরচ করিয়া একটা লটারীর টিকেট কিনিয়া ফেলিয়াছিল। কিনিয়া ফেলিয়া তাহার অহতাশের অন্ত ছিল না। যাহার প্ররোচনায় তাহার ট্যাঙ্ক হইতে চারি গড়া পরস্য খসিয়াছিল, তাহার কথা উঠিলেই সে বলিত, “সড়া বড় জোড়োর অছি। সড়াকো মখা ভাঙি দিব।”

কিন্তু বেচারী এই সড়াকটির মখা ভাঙি দিবার স্বযোগ পাইল না। দেবার টাইকয়েড জরের প্রায় এপিডেমিক লাগিয়াছিল। মালীরও

টাইফয়েড হইল। জরের সময় তাকে যদি বলা হইত আর অল্পদিন পরেই সে লটারির টাকা পাইয়া বড়লোক হইয়া যাইবে তাহা হইলে সে যাহা বলিত তাহার বাংলা তর্জমা করিলে এই রকম পাড়ায়—লটারীর টাকা পাওয়া আমার বরাতে নাই তা আমি জানি। একটা হতচ্ছাড়ার পাল্লায় পড়িয়া চার আনা পয়সা জলে গিয়াছে বই তো নয়!

লোকটা যে দিন মারা যায়—হায় রে!—সেদিন সে প্রধানত দুটি জিনিষ জানিত না (আমরাও জানিতাম না): এক নম্বর এই যে, সেদিন সে মরিবে। দুই নম্বর এই যে, তার পরের দিনই খবর পাওয়া যাইবে যে তাহার টিকেটে পাঁচ হাজার টাকার প্রাইজ উঠিয়াছে।।.....

খেঁচুবাবু আমাদের বিখ্যাত চাচার হোটেলে ঢুকিয়া দুজোড়া ফাউল্ কাট্লেটের অর্ডার দিলেন। একটাতে এক কামড় দিতেই হঠাৎ পেটে এমন কলিক্ পেন্ শব্দ হইল যে অভুক্ত কাট্লেট-গুলির দাম চুকাইয়া দিয়া তাহাকে রিক্সা করিয়া বাড়ী ফিরিতে হইল। স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে হঠাৎ যে এরকম বেঘাড়া ব্যথা শব্দ হইবে তাহা খেঁচুবাবু স্বপ্নেও ভাবেন নাই। কারণ, যদি ভাবিতেন তাহা হইলে চাচার হোটেলে ঢুকিবার আগেই বাড়ী ফিরিতে ব্যস্ত হইতেন।।.....

স্বতরাং দেখা যাইতেছে কাহার যে কখন কি হইবে কিছুই বলা যায় না। যদি দাঁত তাহা হইলে অনেক ক্ষেত্রেই বোধ হয় লোকে আগেই সাবধান হইয়া যাইত এবং যাহা হইবার তাহা হইতে পারিত না।

ধর্মতলার মোড়ে পাড়াইয়া এই সব কথাই নানা রকমে খুঁটাইয়া

ফিরাইয়া উল্টাইয়া পাঠাইয়া ভাবিতেছিলাম। এই ধরণের ভাবা আমার একটা রোগ বিশেষ। বহু চেষ্টা করিয়াও কোথাও একটা কেরানিগিরি বাগাইতে পারি নাই। অগত্যা হতাশ হইয়া ঠিক করিয়া ফেলিয়াছিলাম দার্শনিক হইব, এবং পৃথিবীর লোকসম্পদ বাড়াইবার দিকে বুধা মনোযোগ না দিয়া পৃথিবীর উচ্চ চিন্তার ভাণ্ডারে কিছু সম্পদ দিয়া যাইব। এই উদ্দেশ্য লইয়াই ভাবিতে শুরু করিয়াছিলাম।

কিন্তু এই মহান উদ্দেশ্য সাধনের সুবিধা বাড়াইতে মোটেই ছিল না। কারণ বাড়ীর সবাই উচ্চ চিন্তা অপেক্ষা টাকার মূল্য এবং প্রয়োজনটাই বেশি বুঝিতেন, এবং বাড়ীতে বসিয়া চুপচাপ ভাবিতে দেখিলেই আমাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেন। কাজেই বাধা হইয়া আমি একটা চালাকি করিতাম। সাড়ে দশটার মধ্যেই নাওয়া খাওয়া নারিয়া লইয়া অত্যন্ত ব্যস্তভাবে—ঠিক যেন চাকরীর খোঁজে বা উমেদারীতে বাহির হইয়া যাইতাম। তারপর কখনো ইডেন্ গার্ডেনে, কখনো এসপ্লানেডে, কখনো দেশবন্ধু পার্কে—যেদিন যেখানে সুবিধা পাইতাম ভাবিতাম। সারাদিন ভাবিয়া কোনোদিন বিকালে, কোনোদিন সন্ধ্যায়, কোনোদিন রাতে বাড়ী ফিরিতাম। বাড়ীর লোকেরা ভাবিতেন বহু উমেদারী করিয়া ফিরিয়াছি। তাহাদের এই ধারণাটাকে আরো পাকা করিবার জন্ত সখেদে বলিতাম, “কি যে পোড়ার কপাল, কোথাও যদি কিছু সুবিধা হয়!” কোনো দিন বা বর্তমান শিক্ষা ও শিল্প-পদ্ধতির বিস্তারিত সমালোচনা করিয়া ইউনিভারসিটিকে গালি দিতাম।

বাজে কথা ছাড়িয়া এবার আসল কথাটাই ধরি। ধর্মতলার মোড়ে পাড়াইয়া লজ্জা চুখিতে চুখিতে ভাবিতেছিলাম। একথা তখন কল্পনাই

করিতে পারি নাই যে হঠাৎ কেহ আসিয়া আমার কাছে ছ' আনা পয়সা চাহিবে। কাজেই যখন শুনিলাম, “ভাই, ছ' আনা পয়সা ধার দিতে পারো?” এবং মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম, যে ব্যক্তি ধার চাহিতেছে সে ব্যক্তিটি আমার বন্ধু জীবন, তখন একটু অবাকই হইয়া গিয়াছিলাম। জীবন থাকে টালায়। অতদূর হইতে.....থাক, বাজে কথা বাড়াইয়া লাভ কি? কাজের কথাই বলি।

প্রশ্ন করিলাম, “আরে জীবন যে! হঠাৎ ছ' আনা পয়সা ধার করবার কি দরকার হল হে?”

জীবন বলিল, “ভাই, এখান থেকে টালা যে অনেক দূর, তা তো জানো? হেটে অতদূর যেতে জানু বেরিয়ে যাবে। তাই বাসে যাবো। কিন্তু পকেটে পয়সা নেই একটিও।”

বলিলাম, “বাড়ী থেকে যখন বেরোও তখন হিসাব করে পয়সা নিয়ে বেরোও না নাকি?”

“বেরিয়েছিলাম তো প্রায় পৌনে ছ'টাকা নিয়ে,” জীবন বলিল, “কিন্তু—যাক, সে অনেক কথা ভাই। থাকে তো ছ' আনা পয়সা ধার দিয়ে আমায় উদ্ধার করো।”

অত্যন্ত কৌতূহল হইল। বলিলাম, “ভাই, সব ব্যাপারটা আমাকে বলতে হবে। চলো ওয়েলিংটন স্টোয়ারে বসিগে। নিশ্চয়ই মজার ব্যাপার কিছু হয়েছে। চলো।”

ওয়েলিংটন স্টোয়ারে ঢুকিয়া একটা বেঞ্চে দুজনে বসিলাম। জীবন বলিতে লাগিল—

“ব্যাপারটার রসগ্রহণ করতে হলে আগের ব্যাপারটা অর্থাৎ contextটাও জানা চাই। সুতরাং আগের ব্যাপার থেকেই সব বলি। এই অল্প কিছুদিন আগে আমার বিয়ের একটা কথা চলছিলো

জানো তো? মেয়েটির নাম লবঙ্গলতিকা, ডাক নাম লবঙ্গ—এবং তার বাপ মেয়ের সঙ্গে নগদ পাঁচ হাজার টাকা ফাউ দিতে চেয়েছিলেন। শেষকালে দেখা গেল মেয়েটির ডাক নাম সার্থক—অর্থাৎ তার গায়ের রং লবঙ্গের মতই, আর তার কথার ঝাঞ্জও লবঙ্গের ঝাঞ্জের মত। বোঝা গেল পাঁচ হাজার টাকাটাই আসল, মেয়েটিই ফাউ। ফাউ বাদ দিয়ে আসলটা নিতে আমার আপত্তি ছিল না, কিন্তু দাতা যা দিতে চেয়েছিলেন তার কম দিতে রাজী হতেন না বোধ হয়। কাজেই মধ্যস্থতা ভেঙে দিতে হল। আমরাও মনটা যেন একটু ভেঙে গেল।”

“লবঙ্গকে লাভ করতে পারলে না বলে?”

“ঠিক তা নয়। বলি শোনো। আমি কাব্য ভালোবাসি এবং যথেষ্ট পড়ি তা জানো তো? লবঙ্গলতিকা নামটা শুনেই মনে হয়েছিল আমাদের বৈষ্ণব দ্বিবার ললিত-লবঙ্গলতা-পরিশীলন-মলয় কোমল-সমীরে। মনে বেশ একটা দোলা লেগেছিল। মনে মনে বেশ একটা স্তম্ভর কল্পনা-স্বপ্ন রচনা করেছিলাম। তখন তো আর জানি না যে মেয়ের বাপ-মা মেয়ের এমন সার্থক নাম রেখেছিলেন! কাজেই বাস্তবের ভূমিতে পড়ে আমার কল্পনার রঙিন কাচের গ্লাসটা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেল। তাতে মন খারাপ হবার কথা নয়, বিশেষ যখন গ্লাসটা প্রায় মুখের কাছে এসেছিল?”

এ বিষয়ে আমার বাস্তবিক কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। কাজেই ইহাতে মন খারাপ হইবার কথা কিনা ঠিক বলিতে না পারিয়া নীরব রহিলাম। জীবন বলিতে লাগিল—

“তা যাই হোক, আমার মনের অবস্থা বাড়ীর কাউকে জানতে দিলাম না। কয়েকদিন এভাবে গেল—অনেক প্রেমের গল্প পড়লুম।

ইংরেজী সাহিত্য, কবিত্তাল সাহিত্য, বাংলা সাহিত্য। বাস্তবিক ভাই, প্রেমের কথা-সাহিত্য যত পড়বে তত জ্ঞান বাড়বে। প্রেম জিনিষটা দস্তুরমতো একটা আর্ট বটে তো? ছেলেবেলা নয়। কি করে প্রেম করতে হয় বাংলার বোধহয় নাইটি পারসেন্ট ছেলেই জানে না। মেয়েদের পারসেন্টেজ তো আরো বেশি। ইউনিভারসিটিতে তো আর প্রেম সম্বন্ধে কোনো কোর্স নেই! আর তা না থাকাই ভালো। কেন না ‘প্রেম’ যদি সিলেবাসের একটা বিষয় হ’ত তা হলে জিনিষটা অত্যন্ত dull and uninteresting হয়ে যেতো। এই দেখ না, আমি যে কাব্য এত ভালোবাসি, তবু শেলী কীটস আর ওয়ার্ডসওয়ার্থের উপর এত চটা কেন? এদের কাব্য সিলেবাসে আছে বলে। রসগোলা, সন্দেশ, সোনাপাপড়ী এসব কার না ভালো লাগে? কিন্তু যদি একজামিন দেবার জ্ঞা এসব খেতে হ’ত তাহলে আমি অন্তত এদের নাম শুনলেই ক্ষেপে যেতাম।”

আমি বলিলাম, “ঠিক বলেছো। এই যেমন—”

“নাঃ!” একটু যেন বিরক্ত হইয়াই জীবন বলিল, “তুমি দেখচি কথা বাড়াতে পারলে আর কমাতে চাও না। Brevity is the... কি না কথাটা?...সে যাই হোক, সে কথাটা তুমি বড় ভুলে যাও। আচ্ছা, যা বলছিলাম। প্রেম-সাহিত্য পড়ে পড়ে তো যথেষ্ট জ্ঞানসঞ্চয় করলুম—অনেক আইডীয়া পেলুম। এই আইডীয়া পাওয়াটাই হচ্ছে সাহিত্য পড়বার প্রধান উদ্দেশ্য। সববৎ খাওয়ার উদ্দেশ্য যেমন ঠাণ্ডা আরাম পাওয়া, চাকরী করার উদ্দেশ্য যেমন টাকা বেজগার করা, ডাক্তার দেখানোর উদ্দেশ্য যেমন অস্থখ সারান, বায়োস্কোপের টিকিট কাটার উদ্দেশ্য যেমন বায়োস্কোপ দেখা, তেমনি সাহিত্য পড়ার উদ্দেশ্য প্রধানত আইডীয়া পাওয়া। শুনছো তো?”

“শুনছি বই কি!”

“থ্যাঙ্কস। আরো শোনো। যে সমস্ত আইডীয়া পেলাম সে সবগুলো বলতে গেলে অনেক সময় লেগে যাবে। বোধহয় রাত বারোটার আগে বলে শেষ করতে পারবো না। কাজেই details এ যাবো না। মোটামুট বুঝলুম এই যে, আমাদের মাদ্ধাতার আমলের প্রথায় প্রেম চলে না—তাতে রোমান্স নেই, কারণ তা থাকতে পারে না। মুক্তি অর্থাৎ freedom চাই, নৃতনব চাই, dramatic situation চাই, কথার বাধুনি চাই, smartness চাই—যাক complete list দেবার দরকার নেই। প্রেম করতে হলে প্রথমটা চাই চেহার। By the way, আমার চেহারটা কেমন দেখ? ঠিক করে বলবে। Flattery একদম নয়—I hate it. Call a spade a spade.”

বলিলাম, “চেহারটা যে তোমার নিতান্তই খারাপ তা নয়—তবে নাকটা যেন একটু বেশি রকম চ্যাটালো।”

চটু করিয়া চটিয়া গিয়া জীবন বলিল, “নাক কি খেজুর-পাতার ডগার মত ছুঁচলো হবে নাকি তুমি বলতে চাও? তোমার পছন্দ দেখে—মাইরি ভাই—অবাক মেরে যেতে হয়।”

বলিলাম নাকের সমালোচনা করাটা ঠিক হয় নাই। ভুলটা শুধরাইয়া লইবার উদ্দেশ্যে বলিলাম, “আজকাল আবাব মেয়েরা বেশি সরু ছুঁচলো নাক পছন্দ করে না। আর, না করাই তো উচিত। বাস্তবিকই বেশি সরু নাক হলে গড়ারের মতো দেখায়। এই তোমার যেমন আছে—খেজুর-পাতার ডগাও নয়, অথচ গড়ের মাঠও নয়—এই হচ্ছে আজকাল আইডীয়া।” মিস্ গুপ্তাও সেদিন একথা বলছিলেন।”

“কোন মিস্ গুপ্তা? আমার নাকই বা তিনি কোথায় দেখলেন?” অত্যন্ত খুশি হইয়া জীবন বলিল। মুখে হাসির স্রোত।

বলিলাম, “তুমি চিনবে না। তোমার নাক তিনি একদিন দেখেছিলেন স্ত্রামবাজারে।”

“তারপর?”

“তারপর তাঁকে দেখলুম কব্রেরেজের দোকানে ঢুকতে।”

“হঁ, তারপর?”

“তারপর কি করলেন জানি না। আমি এসে পড়লুম কিনা! বোধ হয় কোনো গুপ্ত কিলেন। অথবা... যাক। তোমার কাহিনী চলুক।”

কাল্পনিক মিস্ গুপ্তা যে জীবনের মনে বেশ একটা দোলা দিয়াছিলেন তাহা বেশ পরিষ্কার বৃত্তিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু জীবন তাহার দুর্বলতা আমার নিকট অপ্রকাশিত রাখিতে সচেষ্ট ছিল। বোধ হয় মিস্ গুপ্তা সপক্ষে আরো কিছু জানিবার কোতুল এবং আকাঙ্ক্ষা তাহার ছিল, কিন্তু পাছে দুর্বলতা ধরা পড়ে এইজন্মই এদিকে সে বেশি অগ্রসর হইল না। অথবা হয়তো... যাহোক, যে কারণেই হোক, তাহার চাপটা নাকের প্রশংসাকাত্মক সপক্ষে আর কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া জীবন বলিতে লাগিল—

“হ্যাঁ, কি বলছিলুম? চেহারা চাই। প্রেমের সন্ধে চেহারার বন্ধন বড় শক্ত বন্ধন। কথাটা ঠিক জুঁসই হল না। বরং বলি... ঐ যে কথায় বলে না? ‘কি বলে হে?’ কথায় কি যে বলে ঠিক জানিতাম না। বলিলাম, ‘তুমি যখন বলছ তখন একটা কিছু বলে নিশ্চয়ই, কিন্তু কি যে বলে তা ঠিক বলতে পারছি না।’

“তা থাক্ গে। হ্যাঁ, ঐ যে বলছিলুম—চেহারা চাই। রংও চাই, আবল্য কাঠ হলে চলবে না। এই যেমন সেই লবঙ্গ—থাক্, ও বেচারার কথা আর তুলবো না। ওর গায়ের রঙের জন্ম ওকে নিশ্চয়ই

দোষ দেওয়া যায় না। অবশ্য সত্যি কথা বলতে গেলে ওকে দেখে যে ওর প্রেমে পড়বে না তাকেও সেজন্ম দোষ দেওয়া যায় না।... রঙের culture চাই। সাবান মাখা, ক্রীম মাখা—এসব শুধু বিলাসিতা নয় জেনো। Complexion জিনিষটা দৈবায়ত্ত—ভগবানের দান বটে, কিন্তু তা বজায় রাখা এবং তার culture মাছুষের কর্তব্য। যেমন স্ব কর্তৃ ভগবানের দান, কিন্তু তা বজায় রাখতে হলে এবং বাস্তবিক ওস্তাদ হতে গেলে সাধনার দরকার—ভগবানের দান নিয়ে বসে থাকলে চলে না। রঙের সাধনা এবং রূপের সাধনা বড় কম সাধনা নয়। টয়লেট করা ফ্যাশান নয়—কর্তব্য। টয়লেটেরই সংস্কৃত নাম প্রসাধন—প্রসাধনও এক রকমের সাধন। প্রসাধন কি না প্র সাধন, মানেই...”

এই মানেটা বলিতে তাহাকে বুঝা গলদবশত হইতে দেখিয়া তাহাকে বাঁচাইবার জন্ম বলিলাম, “থাক্, অত details দরকার নেই।”

মস্ত একটা বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়া জীবন কহিল, “হ্যাঁ, আমিও তাই ভাবছিলুম। কি জানো? কথায় কথা বাড়ে। Talk begets talk, শান্তোরে এই জন্মেই তো বেশি কথা বলতে পই পই করে ব্যরণ করে দিয়েছে। আমারও ভাই সেই পন্থা। যা বলবো একেবারে to the point—যা নেহাৎ না বললে নয়। ঐ যে তোমার গিয়ে কি না বলে—beating about the bush—ও আমি একদম like করি না। হ্যাঁ, যা বলছিলাম—চেহারা চাই। চেহারা বলতে কি বোঝায় তুমি মনে করো, শুধু মুখ?”

“শুধু মুখ নয়। অর্থাৎ চেহারা বলতে যা যা বোঝায় সব মিলিয়েই চেহারা।”

“ঠিক ধরেছো। চেহারা—তব্ব বা সৌন্দর্য্য—তব্ব যাই বোলো, তাঁর ঐটিই হচ্ছে একেবারে গোড়ার কথা। ফিগার বাদ দিলে চলবে না।

বদিও অনেকেই এ ভুলটা করেন—অর্থাৎ ফিগার জিনিষটাকে যতটা প্রাধান্য দেওয়া উচিত তা দেন না। অজ্ঞা, আমার figure তো দেখছেো?”

“অনেক দিন থেকেই।” বলিলাম, “মোট figure আমি আরপেই পছন্দ করি না। মোটা হওয়াকেই তো ইংরেজিতে বলে obesity।” কারণ জীবন আজন্ম রোগা—আমার চাইতেও ঢের রোগা। কাজেই অতি মোটা হওয়াকে ইংরেজিতে যেমন obesity বলে তেমনি জীবনের মত ফিগার হওয়াকেও যে ইংরেজিতে কিছু বলে তাহা আর বলা প্রয়োজন মনে করিলাম না। অত্যন্ত খুশী হইয়া জীবন বলিল, “Slim figureই আমি বরাবর পছন্দ করি। ঠিক যেখানে যেটুকু দরকার তার বাড়তি নয়—not an ounce of spare loose flesh in any part of the body, একবারে steelএর frame চাই—নরম তুলোর বস্তা নয়।” বলিয়া মুস্তিবক দুটি হাত শূন্য সজোরে ঝাঁকাইয়া সে একবারে নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়া দিল যে তাহার দেহটি একটি steel frame বিশেষ—নরম তুলোর বস্তা নয়।”

“তা যাক। যা বলছিলুম।” সে বলিতে লাগিল, “প্রেমের জ্ঞান প্রদানিত যা দরকার তা তো বললুম। চেহার, রং ইত্যাদির জ্ঞান তো দাবড়াইনি; ভাবনা ছিল একটু তোমার ঐ সিচুয়েশান আর বাক্পটুতা অর্থাৎ eloquenceএর জ্ঞান। মেয়েদের সঙ্গে মিশবার তো সুযোগ পাইনি, কাজে কাজেই shyness জিনিষটা ছিল। যাক গে, এসব বাজে কথা দরকার নেই। কাজের কথাই বলি। কিন্তু ভাই, তোমাকে যে খোলাখুলিভাবে, অর্থাৎ frankly আমার অন্তরের অন্তরতম কথাগুলো বলে দিচ্ছি—”

তাহাকে নিশ্চিত করিবার জ্ঞান বলিলাম, “ভয় নেই; তার unfair

advantage আমি নেবো না। আমাকে তুমি কি এতই অবিশ্বাস করো ভাই?”

“না, ঠিক অবিশ্বাস নয়।” জীবন বলিল, “অবিশ্বাস ঠিক নয়। তবে, কি জানো? ঐ একটা...থাক; কাজের কথাই বলা যাক। ভেবে দেখলুম shynessএর জ্ঞান না ভেবে আগে situation তৈরী করা দরকার। সিচুয়েশানে পড়ে গেলে তখন shyness আপনি চলে যায়। লড়াইয়ের মাঠে অর্থাৎ battle-fieldএ নামলেই অনেক কাপুরুষও বীর হয়ে যায় জানো তো?...কিন্তু situation পেতে হলে সুযোগ অর্থাৎ opportunity চাই—opportunity খোজা চাই। You must seek out opportunity; opportunity will not seek you out. বুঝলে তো? এই সোজা কথাটাই কিন্তু অনেকেই বোঝে না, এবং বোঝে না যে তাও বুঝতে পারে না।

“সে যা হোক, প্রেমের গল্প পড়ে অনেক আইডীয়া পেয়েছিলাম—কি করে সুযোগ খুঁজতে হয়, কি করে তার সদ্ব্যবহার করতে হয়, কি করে সিচুয়েশান তৈরী করে নিতে হয়। অবশ্য এও ঠিক যে, গল্পে যেমনটি হয় বাস্তবে তেমনটি হওয়া সকলের ভাগ্যে সম্ভব হয় না। যেমন ধরো একটা গল্পে পড়েছিলাম, এক তরুণ, তার নাম প্রবীর কি প্রতুল ঠিক মনে নেই, আত্মভেদ্য করবার জন্তে হঠাৎ একদিন তার দাদার মোটর সাইকেল নিয়ে কলকাতা থেকে বরাবর চলে গেল পেশোয়ার, কাউকে বলা নেই কণ্ডা নেই, কিছু না। এদিকে তার দাদা আপিস বাবার সময় ভাবেন, ‘তাইতো, আমার মোটর বাইক গেল কোথা?’ প্রবীর—প্রবীর না প্রতুল সেটা আমার ঠিক মনে নেই, ধরে নাও প্রবীরই—বাড়ীতে নেই, মোটর বাইকও নেই। বোঝা গেল প্রবীরই সেটা নিয়ে বেরিয়েছে। অগত্যা রেগেমেগে বাসে চড়েই

আপিস গেলেন। এদিকে প্রবীর তো অনেক জায়গা দেখে শুনে পৌঁছেলো পেশোয়ার। হৃন্দর চেহারা, তরুণ বয়স, তায় আবার tourist—যেখানে যায় সেখানেই আদর পায়। ফিরে আসবার সময় লক্ষ্যে দেখতে গেল। সেখানে যার guest হ'ল তিনি একজন প্রবাসী বাঙালি ডব্রলোক—মস্ত ব্যারিষ্টার—অগাধ টাকা তাঁর, আর একমাত্র সন্তান মিস্ ম্যানিমা হালদার। মিস্ হালদার টেনিস খেলেন, প্রবীরও টেনিসে পাকা ওস্তাদ। দুজনে naturally ভাব হয়ে গেল, আর এই ভাবই শেষকালে হ'ল প্রেম।...এরকম কারো কারো ভাগ্যে সম্ভব হতে পারে, কিন্তু সকলের ভাগ্যে নয়। কজনের দাদার মোটর বাইক থাকে? আর আমার দাদার যদিই বা থাকতো—ও জিনিসটা আমি বিশেষ পছন্দ করি না। মোটর বাইকের চেয়ে মোটর বাসই আমার বেশি পছন্দ।

“মাক্ গে—অনেক ভেবে দেখলুম সাহিত্যে ঠিক আমার পক্ষে জুন্সই ready made প্রান পাওয়া যাবে না। সবগুলো আইডীয়া থেকে help নিয়ে আমার নিজের মাথা থেকে কোনো প্রান ঠিক করতে হবে।

“একদিন আমাদের ছাতে সন্ধ্যাবেলা আপন মনে পায়চারি করছি, এমন সময় হঠাৎ একটা প্রান এসে গেল মাথায়। যার জন্তে অপেক্ষা করে বসে আছি, হঠাৎ কোনদিন বাসে তার সঙ্গে দেখা হতে পারে। কিন্তু কোনো তরুণীর সঙ্গে তো আর গায়ে পড়ে আলাপ করা যায় না। একটা অজুহাত চাই। দুনিয়ায় অসম্ভব কিছু নেই তা তো জানো? Impossible is a word found only in a fool's dictionary. একদিন হয়তো এমন হতে পারে যে কোনো তরুণী বাসের ভাড়া দেবার সময় দেখেন সঙ্গে পয়সা নেই অথবা কম পড়েছে। মুখের এ বৎ

মনের অবস্থা তাঁর অভ্যাস করণ, এই বিব্রত ভাব তাঁর হৃন্দর মুখটিকে আরো হৃন্দর করে তুলেছে। তিনি ভাবছেন, ‘এখন কি করা যায়?’ অমনি আমি তখন এগিয়ে বলবো, ‘Never mind, আমি আপনাকে ধার দিচ্ছি। কত চাই আপনার?’ তিনি বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে naturally আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হবেন। তারপর আমার ঠিকানাটা জেনে নেবেন—কারণ রুগী থাকতে তো আর তিনি চাইবেন না, এবং স্বপ্নমুক্ত হতে হলেই ঠিকানা জানা চাই। এর পরে যাওয়া আসা, টিপারটি, এবং তারপর আস্তে আস্তে.....কিন্তু বড় detailsএর মধ্যে যাচ্ছি।

“হ্যাঁ, এই প্রান অস্থায়ী কাজও চললো। রোজ পকেটে টাকা পাঁচ ছয় নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। বাসে বাসে শহর ঘুরি। কিন্তু কোনো মেয়েরই পয়সার অভাব হয় না বা কম পড়ে না। এমন রাগ হতে লাগলো। এরা কি একদিনও ভুল করে মনিবাগ বাড়ীতে ফেলে আসতে পারে না, অথবা ভুলে কম পয়সা নিয়ে বেরোতে পারে না? মাইরি ভাই, এসব অতি-সাবধান মেয়েদের উপর এত রাগ হতে লাগলো যে তা আর বলবার নয়। তবু আশা ছাড়লুম না। দিনে দিনে আমার জেদ বাড়তে লাগলো। অনেক পয়সাও খরচ হতে লাগলো। All section টিকেট কয়েকটা হয়ে যেতো যত পয়সা বাস ভাড়া খরচ করলুম। কিন্তু মাসের প্রায় মাঝামাঝি তো আর monthly ticket পাওয়া যাবে না—তা ছাড়া রোজই ভাবি আজই successful হবো।

“আজ হয়েছে কি জানো? বেরিয়েছিলুম প্রায় পৌনে ছ' টাকা নিয়ে। শ্রামবাজার থেকে গেলুম কালীঘাট। তিনজন তরুণী ছিল তাতে। অনেক আশা ছিল বুকে। কিন্তু হতাশ হতে হল। ফিবুতি বাসে চড়লাম। এসপ্লানেন্ডের কাছাকাছি এসে ভাবলাম, ‘ধাক,

এইবার successএর কাছাকাছি এসেছি। কারণ কণ্ঠস্বর ঠিক আমার সামনের সীটে-বসা তরুণীটির কাছে ভাড়া চাইতেই তাঁর যেন কেমন একটু ইয়ে—অর্থাৎ hesitationএর ভাব দেখলুম। মনে মনে ভগবানকে ধন্যবাদ দিলুম—বেচারীকে জীবনে কোনোদিন যা দিইনি। দেরী করলে পাছে অল্প কেউ স্বযোগটা নিয়ে ফেলে এই ভেবে তাড়াতাড়ি আমার মনি-ব্যাগটা পকেট থেকে বার করে বললুম, ‘এই যে আমি দিচ্ছি।’

“তাঁর নিজের মনি-ব্যাগটি খুলে পয়সা বার করতে করতে তরুণীটি আমার দিকে চেয়ে আধ-আশ্চর্যায়িত আধ-রাগায়িত ভাবে বললেন, ‘তার মানে?’ বাসের অস্বস্তি যাত্রীরাও অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে রইলো।

“আমি ভুল বুঝে ভাবাচাফা খেয়ে গেলুম। তারপর একটু সামলে নিয়ে বললুম, ‘মাপ করবেন। আমি ভেবেছিলাম আপনার হয়তো কোনো রকমে পয়সা short পড়েছে। তাই ভেবেছিলাম যদি আপনাকে help করতে পারি।’

“তরুণীটি একটু হেসে বললেন, ‘থ্যাঙ্ক্‌স্‌!’”

“উঃ, সে কি সোজা থ্যাঙ্ক্‌স্‌ ভাই? সে থ্যাঙ্ক্‌স্‌ জুতো মারার বাড়ি। ঐ তোমার ‘জর মেরে গুতো দান’ না কি একটা কথা আছে না? ব্যাপারটা হোলো অনেকটা সেই রকম।

“আশে পাশে মুছ হাসি ইত্যাদির জালায় নেমে পড়তে বাধা হলুম। মাইরি ভাই, যাকে বলে ভিজে বেড়াল, আমি প্রায় তাই হয়ে গিয়েছিলাম।

“তারপর—বাস্টা চলে যেতে—আপন মনে হাঁটতে-হাঁটতে মনে মনে গাঁটকাটা আর পকেটমারগুলোকে গালি দিতে লাগলুম।

“ভাবতে লাগলুম—হায় রে! কলকাতায় এমন দিন ছিলো পকেটে পয়সা নিয়ে বেরোলে পকেটমারের হাত থেকে রেহাই পাওয়া আশ্চর্যের বিষয় ছিলো। আর আজকাল কোথায় গেল গাঁটকাটা, গুস্তাদের দল? কোথায় গেল সব পকেটমার? এই যে মেয়েরা দিকি পয়সা নিয়ে বেপরোয়া ভাবে চলাফেরা করে, এদের পকেট মারা বা গাঁট কাটা কি যায় না? নাঃ, কলকাতার সেদিন আর নেই। জোচ্চোরগুলো সব যেন সাধু হয়ে গেছে, অথবা পুলিশ ব্যাটাদের জালায় স্তব্ধ করে তে পারছে না।

“এই ভাবে জোচ্চোর গাঁটকাটা আর পকেটমারগুলোর বাপাস্ত— শুধু তা কেন, চৌদ্দপুরুষান্ত করতে করতে একেবারে নিউ সিনেমার কাছে এসে পড়েছি। শ্রামবাজারের একটা বাস পেয়ে তাতে উঠতে যাবো এমন সময় হঠাৎ পকেটে হাত পড়ায় খেয়াল হোলো মনিব্যাগটা পকেট থেকে উধাও হয়েছে। হঠাৎ চমকে গেলুম—a very unpleasant surprise. বুঝলুম এ পকেটমারদের চৌদ্দপুরুষান্ত করার ফল। কি যে ভয়ানক রাগ হোলো, কি আর বলবো ভাই! আমি কখনো দেখলুম না বা শুনলুম না কোনো মেয়ের পকেট মারা গেছে! পকেটমার গাঁটকাটাগুলো পর্যাপ্ত chivalrous হয়ে উঠলো। কি সাংঘাতিক ব্যাপার একবার ভাবো তো!.....

“যাক্, ভেবেছিলাম অগত্যা হেঁটেই বাড়ী ফিরবো। বরাত ভালো তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। দাও ভাই, দু’ আনা পয়সা ধার দাও।”

বলিলাম, “তা দেবো। কিন্তু—এ ব্যাপারে হতাশ হয়ে তুমি কি——”

“মোট্টেই না, মোট্টেই না।” জোর গলায় জীবন বলিল, “হাল

আমি ছাড়বো না। আমি optimist, pessimist নই। আমার কল্পনার মানসী বাস্তবে কি রূপ ধরবে সেইটে দেখবার জ্ঞান আমি আকুল, শুধু কল্পনা নিয়ে মাহুয় বসে থাকতে পারে না। কবির হৃদয় তো পারে—কিন্তু আমি কবি নই, আমার মাথায় অগুণ্ণতা আইডীয়া, একটার পর একটা try করে যাবো, একটা লেগে যাবেই যাবে। কি বলো ?”

আমি মাথা নাড়িয়া বলিলাম, “নিশ্চয়।”

জীবন নিজের চুলের উপর সম্মেহে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, “আমরা তরুণের দল, সবাই যাত্রী—প্রেমের পথের যাত্রী। কল্পনায় মানসীর বাস্তব রূপের উদ্দেশ্যে আমাদের যাত্রা। এ চিরন্তন। যুগ যুগ ধরে এমনি হয়ে আসছে। এ যাত্রার পথ মন্থন নয়, বরং বন্ধুর। কবি এই আইডীয়াটাকেই কবিতার ভাষায় বলেছেন—

পতন অভ্যাস বন্ধুর পন্থা যুগ যুগ দাবিত যাত্রী।...”

শ্রীঅরুণ

প্রসঙ্গ কথা

সাহিত্য বা শিল্প-বিচারে ‘ম্যাটার’ এবং ‘ফর্ম’ এই দুইটিই সমান মূল্যবান। এই দুইটি বিষয় যদি প্রকাশক্ষেত্রে এক হইয়া না যায় অহা হইলে সে প্রকাশের বিশেষ কোন মূল্য নাই। ‘ম্যাটার’, শিল্পীর অভিজ্ঞতা বা উপলব্ধি। এই অভিজ্ঞতা বা উপলব্ধি আমরা প্রকাশ করি ভাষার সাহায্যে। এই ভাষা সাহিত্যের ক্ষেত্রে ধ্বনি, এবং চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে রেখা বা বর্ণ। পৃথিবীর সকল লোকেই ভাষার সাহায্যে নিজ নিজ অভিজ্ঞতা প্রকাশ করে, কিন্তু প্রকাশিত বিষয় মাত্রেরই সাহিত্য বা শিল্প হয় না। তাহার কারণ এই যে কোন রচনাকে সাহিত্য বা শিল্পের পর্ধ্যায়ে উন্নীত হইতে হইলে তাহাকে কতকগুলি সত্য পালন করিতে হয়। এই সত্যগুলি যথাযথ পালিত হইলে তবে আমরা সেই রচনাকে সাহিত্য বা শিল্প বলিয়া গণ্য করি। প্রকাশের ফর্ম এই সত্য। উপযুক্ত ফর্মে প্রকাশিত না হইলে সত্য পালিত হইতে পারে না, এবং সত্য পালিত না হইলে দয়া করিয়া কোন রচনাকে সাহিত্য বা শিল্প বলায় আমাদের অধিকার নাই।

অবশ্য এই ফর্ম বিষয়ে মতভেদ আছে। যে কোন প্রকাশই কোন না কোন ফর্ম ছাড়া হইতে পারে না। শিল্পের ক্ষেত্রে যেমন আধুনিক কালের যাবতীয় বার্থ রচনাকেই সমালোচকগণ কতকগুলি নুতন নাম দিয়া তাহাদের অস্তিত্বকে সার্থক করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তেমনি সাহিত্যের ক্ষেত্রেও যাবতীয় বার্থ সৃষ্টি কোন না কোন

নূতন নামের আশ্রয়ে বাঁচিতে চাহিতেছে। শিল্পের ক্ষেত্রে Cubism যেমন বার্থ, Futurism : যেমন বার্থ, এক কথায় modernism যেমন বার্থ, সাহিত্যের ক্ষেত্রে modernism বা আধুনিকতাও তেমনি বার্থ। অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য প্রকাশের সহজ ভাষা যখন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না তখনই লোকে বিকৃত এবং জটিল পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করে। ইহাতে সহজেই প্রমাণ হয় যে শ্রষ্টার মনে অভিজ্ঞতা স্পষ্ট হইয়া ওঠে নাই। অবশ্য অভিজ্ঞতার এমন একটা অবস্থা থাকি সম্ভব যখন কোন ভাষা দ্বারাই তাহাকে স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করা যায় না, কিন্তু প্রথম হইতেই অস্পষ্ট এবং জটিল ফর্ম, প্রকাশের এক মাত্র বাহনরূপে স্থির করিয়া লইলে আমরা অভিজ্ঞতা বিষয়েই সন্দিহান হইব। Cubism এই অস্পষ্ট বাহন; ইহা শিল্পীর একটি চাতুরী মাত্র, ইহার বেশি কিছু নহে।

আধুনিক নামাশ্রয়ী বর্তমান বাংলা কবিতায় এই চাতুরী দেখা দিয়াছে। বক্তব্য কোথায়ও প্রবল নহে, স্পষ্ট নহে, অর্থাৎ বক্তব্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে কিছুই নাই, কিন্তু তবু তাহার প্রকাশ আছে। এই প্রকাশ কখনও সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করিতে পারে না। প্রকাশের তিনটি রূপ আমরা দেখিতেছি। প্রথম, বক্তব্য আছে কিন্তু প্রকাশের উপযুক্ত ফর্ম নাই; দ্বিতীয়, ফর্ম আছে কিন্তু বক্তব্য কিছুই নাই; তৃতীয়, বক্তব্যও নাই ফর্মও নাই। এই তিনটির কোনটাই কাব্য-পদবাচ্য নহে। আধুনিক বাংলা কবিতায় ইহার কোন-না-কোন একটা প্রকট হইতেছে। ইহা আধুনিক কবি-নামধারীগণ যে বুঝিতেছেন না তাহা নহে; পক্ষান্তরে উত্তমরূপেই যে বুঝিতেছেন সে প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। অর্থাৎ বাংলা কবিতা লিখিবার সঙ্গে

সঙ্গেই তাহার ইংরেজি অমুবাদ করিয়া প্রচার করা হইতেছে। লোক ঠকাইবার ইহার চেয়ে সহজ উপায় আর হইতে পারে না।

লোক ঠকানর অর্থ নিজেকেই ঠকান। কারণ মূল কাব্যের গুণ বিচার বাহারা অমুবাদের সাহায্যে করিতে পারেন তাঁহাদের ঠকাতে বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় না। কারণ ইহা ছাড়া তাঁহাদের আর অল্প উপায় নাই। কিন্তু অবাঙালীর নিকট হইতে অমুবাদ-সাহিত্যের প্রশংসা দেখিয়া দেশের লোক যখন ঠেকে তখন তাহা মারাত্মক। কাব্য বিচারে মূল কাব্যের ভাষা, ছন্দ, ঠাইল প্রভৃতি মিলাইয়া যে ফর্ম তাহাকে অতিক্রম করিয়া অমুবাদে যাহা পাওয়া যায় তাহা সেই কবিতার বক্তব্যের আভাস মাত্র। অমুবাদে এই আভাসটুকু মাত্র পাইয়াই যদি কেহ মনে করেন যে মূল কবিতার সূক্ষ্ম কারুকার্য এবং মিউজিক নিশ্চয়ই খুব উচ্চতরের আছে তাহা হইলে কাব্যবিচারে তিনি মুর্থস্থলভ ভুল করিবেন। এবং এই জাতীয় ভুলই অমুবাদ-পাঠক করিয়া থাকেন। আমি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার অংশ—

তুমি মোরে পারনা বুঝিতে
প্রশান্ত বিবাদভরে ছুটি আঁখি প্রশ্ন করে
অর্থ মোর চাহিছে খুঁজিতে
চক্ষুমা যেমন ভাবে স্থির নত মুখে
চেয়ে থাকে সমুদ্রের বুকে।

কিছু আমি করিনি গোপন,
যাহা আছে সব আছে তোমার আঁখির কাছে
প্রসারিত অব্যাহত মন;
দিয়েছি সমস্ত মোর করিতে ধারণা
তাই মোরে বুঝিতে পার না?

ইহার ছন্দ, ইহার ধ্বনি, ইহার ভাষা, সমস্ত মিলিয়া যে ফর্মে আমরা
এই ষ্টান্সা দুইটি পাইতেছি তাহা কাব্যবিচারে নিশ্চিতই পুরা মার্কা
পাইবে। কিন্তু এই কথাগুলি যদি এইভাবে সাজান যায়—

কাতরতা মাথান তোমার চোখে,
জানতে সে চোখ চায় গো আমার মানে;
চক্ষু যেমন সাগর বক্ষু ঠোকে,
তবু তাহার অর্থ নাহি জানে।
পরান আমার প্রথম হ'তে শেষ,
তোমার কাছেই আছে বেকাক থোলা;
নাইক সেখা ময়গুপ্তি লেশ
অর্থ কাজেই শিকের থাকে তোলা।

মূল কবিতা এবং তাহার পরিবর্তিত এই রূপটির পার্থক্য পাঠকের
নিকট অবশ্যই স্পষ্ট। দুইটিরই ভাবার্থ এক, কিন্তু ভাষা এবং ফর্মের
পার্থক্যে একটি রসের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করিতেছে, অন্যটি আদৌ
কবিতা হইয়াছে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। অস্বত যিনি
নিঃসন্দেহে বলিতে পারিবেন কবিতা হয় নাই তাহার কথা সর্কাগ্রে
গ্রাহ্য হইবে।

কিন্তু এই দুইটি কবিতাই অহুবাদের বেলায় এক হইতে বাধ্য
নাই। রবীন্দ্রনাথের নিজের অহুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি—

Your questioning eyes are sad. They seek to know
my meaning as the moon would fathom the sea.

I have bared my life before your eyes from end to
end, with nothing hidden or held back. That is why
you know me not.

এমন কি, এই অহুবাদের জন্ম মূল রচনার কোন ছন্দ থাকারও
প্রয়োজন হয় না। যে-কোন শ্রেণীর ভাষায় যে-কোন ভঙ্গিতে মূল
লিখিত থাকুক না কেন অহুবাদের ভাষা ভাল হইলে মূলকে উৎকৃষ্ট
বলিয়া চালাইয়া দেওয়া সহজ। স্বতরাং মূলের সহিত অহুবাদের
সদ্বৃতিটা accident, যেমন রবীন্দ্রনাথের বেলায় হইয়াছে। সাধারণত
এই সদ্বৃতি থাকে না। মূলের রুতিত্ব মূল লেখকের, অহুবাদের রুতিত্ব
অহুবাদকের।

আবার অহুবাদের সাহায্যে মূলের সৌন্দর্য একেবারে উড়াইয়া
দেওয়াও সহজ। সেরূপ অহুবাদ দেখিয়া যদি কেহ মূলের বিচার
করেন তবে তাহাও অজ্ঞান হইবে। আমি এই দ্বিতীয় প্রকার
অহুবাদের চরম দৃষ্টান্ত দিতেছি। মূল রচনা—

কোন দূরের মানুষ যেন এল আজ কাছে
তিমির আড়ালে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে।
বুকে দোলে তার বিরহ বাথার মালা
গোপন মিলন অমৃত গন্ধ ঢালা
মনে হয় তার চরণের ধ্বনি জানি
হার মানি তার অজানা জনের সাজে।

অহুবাদ—

“What far-fetched man perhaps come today near behind a whale standing silently, Swing on his breast the garland which says, “Be brave”, pouring with the deathless odour of clandestine unions. Methinks wiring foot-sound I know, Garland-proud wiring unknown person's make up.”

এই অহুবাদ পড়িয়াও মূল বুঝিবার উপায় নাই। পূর্বের অহুবাদটি ভাবাহুবাদ, পরের অহুবাদটি প্রত্যেক শব্দের। ‘ভিমির আড়ালে’—‘behind a whale’; ‘বিরহ’—‘be brave’; ‘শব্দাহুবাদ’ ইহা অপেক্ষা বিশ্বস্ততার আর হইতে পারে না। টমুস সাহেবও এই রীতিতেই রবীন্দ্রনাথের অহুবাদ করিয়াছিলেন।

কাব্য উপযুক্ত ছন্দে লিখিত হয়, যাহার ছন্দের কান নাই তাহার পক্ষে কবিতা লিখিতে যাওয়া বিড়ম্বনা। সুতরাং যদি ছন্দ-অনভিজ্ঞের লেখা কবিতা কবিতা-হিসাবে বিচার করিতে যাই তাহা হইলে তাহার কাব্যমূল্য আমরা দেই না। কিন্তু তাহার অহুবাদ করিয়া অন্যায়সে লোককে ভুল বুঝাইতে পারি। একই গান ওস্তাদ হইতে আনাড়ি সকলেই গাহিতে পারে, কিন্তু যে লোকটার গলায় স্বর নাই এবং তাল বিষয়ে যে একেবারে অজ্ঞ, গায়ক হিসাবে তাহার কোন মর্যাদা আমরা দেই না। কিন্তু সেই আনাড়ির গাওয়া গানের কথাগুলি লিখিয়া এবং তাহার স্বর-তালের নাম লিখিয়া যদি কাহারও সম্মুখে ধরা-দায় তবে সে কি তৎক্ষণাৎ তাহাকে ওস্তাদ গায়ক হিসাবে মানিয়া লইতে পারে? সে কি জিজ্ঞাসা করিবে না যে গানটি গাওয়া

হইয়াছিল কেমন? গানের মূল্য যেমন গাওয়ার উপরে নির্ভর করে, কাবোঁর মূল্যও তেমনি কাব্য রচনার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। সুতরাং অহুবাদ পড়িয়া মূল কাব্য ঠিক হইয়াছে কি না সে বিচার করিবার উপায় নাই।

তালতলার চটী

আমার স্বগীয় পিতামহদেব পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞাসাগর মহাশয়ের সংশ্রবে ঘন ঘন আসিয়া ছিলেন; ফলে তাঁহার “বিজ্ঞাসাগরী চটী”র প্রতি প্রীতি বাড়িয়া গিয়াছিল। সদাসর্বদা বিজ্ঞাসাগরী চটী পরিতেন; বাড়ীতে ত পরিতেনই বিজ্ঞাসাগর মহাশয়ের অমুকরণে বাড়ীর বাহিরেও পরিতেন। পথে, ঘাটে, ট্রামে, ঘোড়ার গাড়ীতে, পূজায়, পার্কিং, নিমন্ত্রণে, আমন্ত্রণে, লোকলৌকিকতায়, বন্ধু-গৃহে বা কুটুম্ব বাড়ীতে ঐ সেকলে বিজ্ঞাসাগরী চটী পরিয়া যাইতেন। তবে তাই বলিয়া যেন কেহ মনে না করেন তিনি বিজ্ঞাসাগরী চটী পরিয়া আপিস আদালত বা লাট-দরবারে যাইতেন। বিজ্ঞাসাগর মহাশয় তালতলার চটী পরিয়া ছোটলাট হ্যাঁলিডে সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন বলিয়া যে সকলের পক্ষে তাহা সম্ভব ছিল তাহা নহে। সে যুগে লোকে চটী জুতা পরিয়া লাট বাড়ীতে যাওয়ার কথা ভাবিতেই পারিত না। আমার ঠাকুরদা মহাশয়ও পারিতেন না—তাই বলিয়া যে তিনি সে যুগের Moderate বা Liberal ছিলেন তাহা নহে। বরং তিনি সে যুগের গরম দলের একজন ছিলেন। একদিন রেড রোডে

বাংলার তদানীন্তন ছোটলাট স্যর জন পিটার গ্রাট সাহেব পাদচারণা করিতেছিলেন; আমার ঠাকুরদা মহাশয়ও ঐ রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন; ছোটলাটের সহিত চোখাচোখি হইল, তথাপি তিনি সেলাম করিলেন না। একজন চাপরাশি দোড়াইয়া আসিয়া বলিল, বাবু সাহেব, ছোটলাট যাইতেছেন, সেলাম করুন। আমার ঠাকুরদা বলিলেন, হোকগে ছোটলাট, আমি সেলাম করিব না। কথাটা ছোটলাটের কানে উঠিল। ছোটলাট তাহার সম্বন্ধে সার্থী দুইটি সাহেবকে—খুব সম্ভব দুইটিই এডিকং হইবে—তাহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা আসিয়া ঠাকুরদা মহাশয়কে ছোটলাটকে দেখাইয়া সেলাম করিতে বলিল। ঠাকুরদা মহাশয় বলিলেন, কেন আমি ওই সাহেবটাকে সেলাম করিব? সাহেব দুটি বলিল, উনি ছোটলাট। ইতাবসরে ছোটলাট স্বয়ং অকুস্থলে আসিয়া হাজির। ছোটলাট ঠাকুরদা মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কেন ছোটলাটকে তাহার প্রাণ্য সেলাম দিতেছেন না। ঠাকুরদা মহাশয় উত্তর করিলেন, যখন ছোটলাটকে দেখিব তখন সেলাম করিব। এডিকং সাহেব দুইটি বলিল, ইনিই ছোটলাট। ঠাকুরদা বলিলেন, তাহা হইলে কলিকাতায় আরও অনেক ছোটলাট আছে। ছোটলাট হাসিয়া বলিলেন, কি হইলে আমাকে আপনার ছোটলাট বলিয়া বিশ্বাস হইবে? ঠাকুরদা উত্তর করিলেন যে দরবারে বসিয়া খেলাত বিতরণ করিলে। ঠাকুরদা মহাশয় দরকার না হইলে সাহেব দেখিলেই—তা সে সাহেব ছোটলাটই হউন না কেন—সেলাম করিতেন না। তখনকার দিনে সাহেব দেখিলেই সেলাম করা রেওয়াজ ছিল। সদাগরী আপিসের এক কেরানি ভবানীপুরে বাসায় ফিরিবার পথে গড়ের মাঠে সাহেবদের ছেলে-মেয়েদের দেখিলেও সেলাম হুকিতেন। জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন,

যে ইহারাই বড় হইলে বড় সাহেব হইবেন। ঠাকুরদা মহাশয়ের চটী-জুতা-প্রীতির কথা বলিয়াছি। তাহার শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাবে আমাদের বাড়ীতে তালতলার চটীজুতার প্রভাব খুব বেশী। সকলেই তালতলার চটীজুতা পরিতেন, আমার বাবাও পরিতেন। আমাদের পাড়ায় শরৎ সেন বলিয়া একটি উচ্ছৃঙ্খল যুবক ছিল; নিমন্ত্রণ-বাড়ীতে তাহার কোন বেয়াদবির জ্ঞান আমার পিতাঠাকুর তাহাকে পা হইতে চটীজুতা খুলিয়া উত্তমমধ্যম দেন। ফলে উক্ত শরৎ সেন হীরা মোস্তাফের পরামর্শে বারাকপুর ক্যান্টন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বাবার নামে এক নালিশ করিতে যায়—ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব দরখাস্ত লইয়া শরৎ সেনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি দিয়া টোমাকে মারিল? শরৎ সেন বলিল, চটীজুতা। সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, চটীজুতা? শরৎ সেন বলিল, হাঁ হজুর। সাহেব পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, নিমন্ত্রণ বাড়ীতে চটীজুতা পরিয়া আসাম্য আসিয়াছিল?—শরৎ বলিল, হাঁ। সাহেব অমনি লিখিলেন, It is unthinkable that a gentleman would come to a public place of festivity in slippers. Case false; Dismissed u. s 203 a. p. c. চটীজুতার প্রভাবে বাবার নামে কোন মোকদ্দমা দায়ের হইতে পারিল না। এমন যে চটী-জুতা, এই চটীজুতা কেনা একবার বাল্যকালে দেখিয়াছিলাম। তালতলার চৌমাথার নিকট একটি বাড়ীতে বিবাহ। ঐ বিবাহ উপলক্ষে আমরা আসিয়াছিলাম ও দুই তিন দিন ছিলাম। বাড়ীর সামনেই হরিদাসের চটীজুতার দোকান। একদিন দেখি বেলা নয়টা আন্দাজ গুটি দুই কালো পিরান-গায়ে-দেওয়া লোক ছাতি বগলে করিয়া হরিদাসের দোকানে ঢুকিল এবং নানাপ্রকারের ও মাপের চটীজুতা হাতে করিয়া পরখ করিতে লাগিল। ঘণ্টা খানেক বাদে এক জোড়া জুতা,

দর দাম ১৬০ সাত সিকা ঠিক করিয়া, পায়ে হয় কি না পরীক্ষা করিবার জন্ত পায়ের নিকট রাখিল। হরিদাসের ছেলে ক্ষেত্রের বলিল, ও কি মাপ করিতেছ? কৌচার খুঁটা কান হইতে কান অবধি মাপিয়া লও—দেখিবে জুতা যদি মূখের মতন হয় তবে পায়ের ঠিক হইবে। এইরূপে জুতা যখন মাপসই হইল, তখন জুতা কিরূপ মজবুত তাহা দেখাইবার জন্ত ক্ষেত্রের খরিদারের নাকের সামনে সোজা আধ হাত তফাতে দু পাটি জুতা ফটাফট করিয়া ঠুকিয়া বলিল, বাবু, ইহার তলা খাইতে আপনার ছুটি মাস লাগিবে। এই রসিকতাটি বহু ব্যবহারে পুরাতন হইয়া এখন পরিত্যক্ত হইয়াছে। তার পর খরিদার যখন দাম দিয়া দুপাটি চটাজুতা কাগজে মুড়িয়া বগলে লইয়াছে এমন সময়ে বাস্তার ফুটপাথ হইতে একটি লোক ঝাঁ করিয়া উঠিয়া গিয়া ক্ষেত্রের বগল হইতে দুই পাটি চটাজুতা টানিয়া লইয়া নাল বসাইতে লাগিল। সামনে, পিছনে, পার্শ্বে, গোড়ালিতে, এদিকে ওদিকে প্রত্যেক পাটিতে ৭টি করিয়া নাল লাগাইয়া দিল। নালের দাম $৭ \times ২ \times ২$ এক আনা = ৬০/০ আনা ও নাল লাগাইবার সম্বন্ধী ২ পাটিতে ৬০ একটুনে ১ টাকার দাবী করিয়া বলিল। ১৬০ সাত সিকার জুতাতে ১ টাকার নাল লাগাইয়া খরিদার মহা আনন্দে জুতা জোড়াটি ছেঁড়া কাগজে মুড়িয়া বগলদাবায় পুরিয়া গৃহে ফিরিল।

তালতলার চটা আজকাল দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার এক মাস্তাজী imitation সৌধীন লোকদের পায়ে মধ্যো মধ্যো দেখিতে পাওয়া যায়। বর্তমান যুগের ছোকরারা যদি কেহ বিদ্যাসাগরী চটীর স্বরূপ দেখিতে চাহেন তো হেদোর উত্তর-পশ্চিম কোণে বটকুম্ব পালের পায়ে দেখিতে পাইবেন।

“যমদত্ত”

কাব্যের উপেক্ষিত

Poetic justice বলিয়া একটা কথা সংসারে সুপ্রচলিত আছে; কিন্তু জগতে কোথাও এই বস্তুটির সাক্ষাৎ মেলে না। পক্ষান্তরে, 'poetic injustice' বলিয়া কোনও প্রচলিত কথা না থাকিলেও ইহার অসংখ্য দৃষ্টান্ত আমরা চক্ষের সম্মুখে সর্বদাই দেখিতে পাই। আদি কবির অবস্রকার poetic injustice-এ দৃষ্ট হইয়াই রবীন্দ্রনাথ একদা 'কাব্যের উপেক্ষিতা' লিখিয়াছিলেন। কিন্তু স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও এই ত্রুটি-মুক্ত নহেন। ইহা আমরা পরে দেখিতেছি।

আচ্ছা মহাশয়, poetic injustice নহে তো কি বলুন? কাব্যে, সাহিত্যে, চিত্রে শেষ ব্যাপার বা শেষ বিষয় লইয়া শিল্পহুষ্টি করিবার প্রথা আছে। ইহা খারাপ বলিতেছি না। শেষের ব্যাপার আটের চমৎকার বিষয়-বস্তু হইতে পারে। "The Last Rose of Summer" বা "শেষ পারানির কড়ি আমার কণ্ঠে নিলেম গান" কাব্য হিসাবে অনবদ্য। "The Last Supper"-এর চিত্র অঙ্কিত করিয়া কত শিল্পী যশস্বী হইয়াছেন। এমন কি রাজা রামমোহনও (তিনি যে কবি ছিলেন একরূপ অপবাদ ব্রজেনবাবুও দিবেন না) লিখিয়াছেন—

“মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর,

অন্তে বাক্য কবে—কিন্তু তুমি রবে নিরন্তর।”

[আচ্ছা, মহাশয় রামমোহন নিরন্তর থাকিতে পারার অবস্থাটাকে ভয়ঙ্কর বলিয়া বর্ণনা করিলেন কেন? আমার গৃহে অল্প যিনি আছেন, এবং যে সকল অন্তেরা প্রায়ই পদার্পণ করিয়া থাকেন—তাহারা যখন

‘বাক্য’ কহেন, তখন তো নিরন্তর থাকিতে পারিলে বাঁচিয়া যাই।
কিন্তু হায়!—নিরন্তর থাকিয়াই অব্যাহতি আছে কি?]

সে কথা নয়। কিন্তু কিছু কাল হইতে লক্ষ্য করিতেছি, বাঙলা সাহিত্যে শেষ বিষয়ে লিখিয়া ফেলিবার জ্ঞান একটা রীতিমত প্রত্যা-
যোগিতা হ্রস্ব হইয়া গিয়াছে। শরৎচন্দ্র ‘শেষ প্রশ্ন’ লিখিলেন, রবীন্দ্রনাথ
‘শেষের কবিতা’ লিখিলেন, নরেশ সেনগুপ্ত ‘শেষ পথ’ লিখিলেন।
আপনারাও ‘শেষ শ্রাব্দ’ করিলেন; এবং আরও উজ্জন খানেক শেষ-নাম
রেজিস্টার্ড করিয়া রাখিলেন।

রাখুন, ক্ষতি নাই। কিন্তু সংসারে শ্রেষ্ঠ শেষ-বস্তুটির (ইহাকে
শেষতম বা চরম-শেষও বলিতে পারেন) সম্পর্কে কেহ একটি কথাও
বলিলেন না। ইহাই কি কবিজ্ঞানোচিত সত্যতার লক্ষণ? আমি শেষ
তারিখের কথা বলিতেছি। বলা বাহুল্য মাসের শেষ তারিখ।

কেন মহাশয়, মাসের শেষ তারিখ আটের উপজীব্য নহে কিসে?
আটের criterion কি? Unique and universal. শেষ তারিখ—
the last date, অতএব unique ত বটেই; আর ইহা যে
universal এ বিষয়ে লাটসাহেব হইতে লাটুবাবু পর্য্যন্ত সকলেই
একমত। তবে? অথচ রবীন্দ্রনাথ দূরে থাকুন, নজরুল পর্য্যন্ত ইহার
উপর একটি গুজল রচনা করিলেন না; দিলীপ একটি পিলুকেদার
আলাপ করিলেন না। ইহা কাব্যের উপেক্ষিত হইয়াই রহিল।

আজিকার সাম্যবাদের দিনে এই বৈষম্য-মূলক অবিচার চলিতেই
পারে না। বাঙলার কবিমূলের এই ঘোর কলঙ্ক আমি প্রকালন
করিবই। তাহারই অপরিসীম ফল—এই কবিতাটি। আপনি
জানিয়া নিশ্চয়ই আনন্দিত হইবেন—সত্যাকার শেষ-বিষয়ক কবিতা
যে রূপে লেখা উচিত, ইহা সেইরূপেই লিখিত হইয়াছে। অর্থাৎ শেষ

চরণ হইতে লিখিতে শুরু করিয়া প্রথম চরণে উদ্রীত হইয়াছি। ইহাতেই
বৃষিতে পারিবেন কবিতাটি প্রকৃতই কত উচু দরের।

পাছে আপনারা ভুল বোঝেন—তাই এইটুকু ভূমিকা।

আম্বাচে

সকালে উঠিয়া ভাবি, পনেরোই আম্বাচে,
মনোরম ভোর বেলা—আহা কিবা ধামা রে!
এলায়েছে কালো চুল বিরহিণী বরণা;
চানচুর সহযোগে চা—রসনা সরসা।
ভিজ্জ শাড়ী মেলে দিতে ও বাড়ীর বধুটি
মুচকিয়ে হেসে যায়—চাক-ভাঙা মধুটি!
চনমন করে উঠি; লিখিবই কবিতা,
প্রকৃতির অভিসার—একে যাব সবি’ তা।
কাগজ টানিয়া নিয়া বসিয়াছি সদা—
হেন কালে আচমকা স্থূলতম গদ্য—
যুম-ভাঙা স্বরে প্রিয়া ক’ন করে কষ্ট—
“হবে না বাজার আজ,—বলে দিহু পষ্ট।”
একদম নক-আউট! হায় মিছে আশা রে,—
পড়েছে তিরিশে জুন পনেরোই আম্বাচে!
ক্রমে ক্রমে এসে জোটে যত ‘ভ্যাম’ ভ্যাসেরা,
এদের নরক লিখে যাননি কো ব্যাসেরা।
তার পরেতেই শুরু থাটি মেঘ-মল্লার—
ফাটা গলা, ভাঙা-গলা, হৈ হৈ হুন্নার।

এই মতে দিন কাটে; কত আর কইব?
মনিব্যাগে 'মনি' নেই,—একি ছুঁদেব!
তত্পরি নামিয়াছে পিচপিচে বরষা।
বাঁচিব না বেশি দিন, এই শুধু ভরসা!*

“বায়রন”

পৃথিবীর পাগলামী

(পূর্বাহ্নস্মৃতি)

Kytilimই হোক বা Swerdlowskই হোক, Turk-sibএর লাইনের
লম্বালম্বি পিতলের কারখানাগুলোই হোক আর রেলওয়ে থেকে অতি
দূরে অবস্থিত সোনার খনিগুলোই হোক, এই বিশাল সাম্রাজ্য, যার
এক কোণ থেকে আর এক কোণ পর্যন্ত যেতে এক্সপ্রেস ট্রেনের পঞ্চাশ
ঘণ্টা লাগে, তার চারিদিকে-ছড়িয়ে-পড়া রাসায়নিক কারখানাি হোক
বা কয়লার খনিই হোক,—যা কিছু পরিদর্শন বা লগ্য করাই যাক না
কেন, সমস্ত অধিবাসীর মধ্যে যে একটা ভীষণ ব্যস্ততা রয়েছে, এটা
নজরে পড়ে।

* এ বৎসরে পনেরোই আবারে তিরিশে জুন পড়ে নাই; এবং ঐ তারিখে বধাও
ছিল না। মিলের খাত্তিরে কবি সত্যের অপলাপ করিয়াছেন। শ. চি. স.

+ এই পঞ্চাশ ঘণ্টা লাগে দুহাজার কিলোমিটার যেতে, অর্থাৎ মস্তব্যর দিক
থেকে আরম্ভ করে প্রথমদেই পড়ে লোহার খনি সকল এবং পরে কয়লার খনি।
এই দুই স্থানের দূরত্বই হচ্ছে দুহাজার কিলোমিটার।

সর্বদাই এখানে যুদ্ধের গর্জন শোনা যায়, প্রকৃতির বিপক্ষে
মেশীনের যুদ্ধ, এমন কি স্বয়ং অধিবাসীদেরই বিরুদ্ধে চলছে। সকলে
যেন জড়ের মত কাজ করছে এবং হাজার হাজার লোক নির্দয়ভাবে
মেশীনের যুগকাঠে বলি পড়ছে।

প্রতি ঘণ্টায় সিগারেটের ধূমপান করবার জন্য পাঁচ মিনিট বিজ্ঞান।
প্রতি কারখানাতেই একটা করে বড় জলে ভর্তি পিপে আছে, তাতেই
দুই সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া নিয়ম।

রাত্রিদিন কাজ চলছে। রাত্রিতে প্রোজেক্টরের আলোকস্রাব
কাব্যস্থান দেখলে ভূতের রাজ্য বলেই মনে হয়। কেবল এগিয়ে চলা
আর এগিয়ে চলা! অতি দূর প্রদেশের সমস্ত জমি—সর্বনিম্ন স্তর অবধি
—এই মেশীন গর্জনে কাঁপছে। বনজঙ্গল বা সমতল ক্ষেত্রের প্রাণীরা
যেমন বিপদের স্বপ্নপাতে পালাতে থাকে, তেমনি কৃষকেরা তাদের ছোট
সম্পত্তি সব ত্যাগ করে, ভিখারী বা ভাগ্যাবণ্ড অথবা প্রোলেটারিয়াটের
মত শহরে পালায়ে আসে। দেড়শো বছর ধরে এক লক্ষ জার্মান কৃষক
সাইবেরিয়ায় বাস করত, এক টুকরো কাপড়ে তাদের যা কিছু সম্পত্তি
বঁধে নিয়ে তারা বিদেশ যাত্রার জন্য হাটতে থাকে; নেকড়ে, ডাকাত,
সীমান্ত পথের গ্রহরীর পশ্চাৎদ্বারে আক্রান্ত হয়ে স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরে
এরা ছুটে পালাতে থাকে; শেষে বস্ত্র পরিত্যক্ত ও মরুভূমি পার হয়ে তারা
চীনদেশে আসে। এদের গন্তব্য স্থান অর্থাৎ লক্ষ্য হচ্ছে নর্থ
আমেরিকা। আর, ঠিক এদেরই পিছনে, সেই রাশিয়াতেই টেকনিকের
সত্যিকারের পাগলামি দৃষ্টিগোচর বেড়ে উঠে মাটি চূর্ণ করে বড় বড়
বাধ, আকাশচুম্বী অট্টালিকা, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শহর তৈরী করতে এবং
মেশীনকে গর্জন করবার স্বযোগ দিতে লেগেছে। পূর্ব সাইবেরিয়ার
কলকারখানাময় স্থানের বিশালতা কল্পনাতীত। প্রতিযোগিতায় অজয়

হয়ে পাঁড়াবে এ শীঘ্রই; আর, এর প্রাধিক্রম যে খালি রাশিয়াকেই স্পর্শ করবে তা নয়, কারণ এটাকে উত্তর ও মধ্য এশিয়ায় লৌহের যুগের আরম্ভও বলা চলে। রাজনৈতিক কারণে এর যা কিছু উৎপাদন সব পূর্বের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে। অর্থনীতির দিক থেকে Magnitogarsk, Tagil ও Kusnetzক এর উৎপন্ন লৌহের কাজ হচ্ছে। প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত যতটা স্থান মুক্ত, ততখানি স্থানকে মডার্নাইজ করা, অর্থাৎ, পশ্চিম সাইবেরিয়া থেকে আরম্ভ করে পূর্ব সাইবেরিয়া এবং Mongolia, Chinese Turkistan, চীনদেশের মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি সব স্থান ধরে তির্যকতের সীমানা পর্যন্ত। ১৯৩৩ সালে, অর্থাৎ পঞ্চ বাধিকী প্র্যানের শেষে, রাশিয়া চায় এক কোটি সত্তর লক্ষ টন লৌহ উৎপন্ন করতে, যার সত্তর লক্ষই ভোয়ানদীর পূর্ব থেকেই উঠবে। ১৯৩৭এ, অর্থাৎ দ্বিতীয় পঞ্চ বাধিকী প্র্যানের শেষে, ইউরোপীয়ান রাশিয়ার বা উৎপাদন শক্তি—তিন কোটি টন, তার থেকে আরও তিন কোটি বিশ লক্ষ টন উৎপাদন পূর্বাঙ্কলকে করতে হবে। এটা ঠিকই যে, কলকারখানার কেন্দ্রস্থল, Ukraineএর রাজধানী, Charkow থেকে Swerdlowsক এ উঠে যাবে। Swerdlowsক এর আগের নাম ছিল Ekaterinenbourg; উরালের এই শহরেই Ipatiev-এর * বাড়ীর সেলারের মধ্যে রাশিয়ার সম্রাট শেখ জার ও তাঁর পরিবারবর্গকে হত্যা করা হয়। Swerdlowsক যে নূতন পূর্ব-রাশিয়ার রাজধানী হয়ে পাঁড়াবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তখন উরলাঙ্কল হবে একটা বিশাল কেন্দ্র, এখানকার মত খালি সীমানাই থাকবে না।

Enthusiastরা দলে দলে, হাজারে হাজারে, লাগে লাগে এই সেণ্টারে আসছে বা আসার জন্ত যে চেষ্টা করতে হয় তা করছে; অথচ কৃষকেরা, যারা আগে এখানে জন্তর মত বাস করলেও অন্তত স্বাধীন এবং এখানকার সীমাহীন সমতলক্ষেত্রের কর্তা ছিল, যাদের জীবন ষাটবার জন্ত যতটুকু দরকার ততটুকুই কেবল ছিল, তার বেশি যারা চেয়ে বেড়াত না, সেই কৃষকেরা, সেই অশিক্ষিত অথচ কতকাংশে সুখী কৃষকেরা আজ এই সেণ্টার ত্যাগ করে পালাচ্ছে।

হুজলা হুজলা জমি তাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তার উপর বড় বড় কলকারখানা বসান হচ্ছে।

Novo-Sibirskতে, এই ধরনের এক কৃষকের সঙ্গে লেখকের কথাবার্তা হয়েছিল। পূর্বে এর অনেক সম্পত্তিই ছিল, কিন্তু কিছু দিন হল তাকে সম্পত্তি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। কৃষক-বিদ্রোহ, যা ঘটেছিল ককেশাসে, তার সম্বন্ধেই কথা উঠল। কৃষক বললে, “যদি আমাদের চাষা ভাইরা অস্ত্রশস্ত্র পেত, সবাইকেই হত্যা করে ফেলত।”

লেখক জিজ্ঞেস করলেন, “কাদের? সোভিয়েট সরকারের নেতাদের?”

“কেন, খালি নেতাদের আর কমিউনিষ্টদের—যারা হাতের মধ্যে পড়বে, তাদের সকলকেই। আমাদের লোকেরা চিন্তা করে দেখেনা। যারা কৃষক নয়, তাদের সকলকেই। রাশিয়ান কৃষক অন্ধের মতই আঘাত করে।” তার পরেই হঠাৎ নিজের মনের অগোচরেই বলে উঠল, “ভগবান রক্ষা করুন এই কমিউনিষ্টদের।” তারপর হাত ছুটো উটে কাঁধে ঠেকিয়ে ক্রসের মত চিহ্ন করলে।

সরল এই কৃষক, মন্সো থেকে অতি দূরে থেকেও, আসন্ন বিপদ যেন বুঝতে পারছে। সমস্ত রাশিয়ার মতই এর ভয়, ঐ বৃষ্টি আবার

বীভৎস chaos মুখবাদান করে ছুটে আসছে, এই বৃষ্টি রক্তস্রোত ছুটে এসে সমস্ত রাশিয়াকে ডুবিয়ে বর্তমান শাসন-পদ্ধতি সম্পূর্ণ উল্টে দেয়।

সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ যে সমস্ত কৃষকের জমি ছিনিয়ে নিয়েছে, তারা সরকারের এই অসাধারণ ক্ষমতা ও প্রতাপিতিকে গভীর ভাবে ঘৃণা করে। তবুও তারা প্রার্থনা করে যে, এই সরকার বরং থাকুক, এই শাসনের পতন হলে এ দেশ নরকে পরিণত হবে। খুব কম লোকেই এ বিষয়ে কিছু ধারণা করবার শক্তি রাখে, কারণ খুব কম লোকেই এই রাশিয়া সে, ১৯৩২ সালে সমস্ত জগৎ জয় করবার শক্তি রাখে, কারণ খুব কম লোকেই, যে রাশিয়া ১৯৩২ সালে সমস্ত জগৎ জয় করবার জন্তে সংগ্রাম করেছে, সে যে কত বিশাল তার খবর রাখে।

যারা রাশিয়াকে এই শব্দট থেকে উদ্ধার করতে চান তাঁরা পৃথিবীর নানান অংশ থেকেই রাশিয়াতে আসছেন। এঁরা একটা নতুন ব্যবস্থা দেখছেন এখানে; দেখছেন সব বিষয়ে এর বাড়াবাড়ি, দেখছেন মাহুষের জীবন ধারণের প্রণালী পরিবর্তনের প্রথম মাহুষিক চেষ্টা।

রাশিয়ার সীমাহীন ক্ষেত্রে ভ্রমণ করলে দেখা যায়, একত্ব, সাম্য আর ধৃষ্ণ বিস্তৃত অসীম সীমানা।

Wagon restaurant-তে লেখকের পাশেই একজন আমেরিকান বসেছিলেন। তিনি তাঁর সঙ্গিনীকে Haitir Zombicদের কথা বলছিলেন, 'তুলোর চায়ের জন্ত আমি সেখানে যাই; আমি একবার দেখতে পাই যে একটা মহিলার তীব্রদারীতে তিন জন পুরুষ কাজ

করছে; তারা জন্তর মত খাটছে। আমার গাইড বললে, এরা Zombies। Zombie কথার মানে হচ্ছে পুনর্জীবিত করা আত্মহীন এক মৃতদেহ। যারা এই ব্র্যাক আর্ট জানে তারা টাটকা একটা মৃতদেহ পচবার পূর্বে কবর থেকে টেনে বার করে, তারপর তাদের নিজেদের কাজে খাটাবার জন্ত এক রকম mechanical জীবন দেয়। বলা-বাহুল্য, আমি এই বীভৎস ব্যাপার মোটেই বিশ্বাস করিনি। যাই হোক, এই তিন জন লোক তো জানোয়ারের মত কাজ করছিল। তাদের গতি থেকে সত্যি কিছু আশ্চর্য্য ও অসাধারণ বলে আমার মনে হচ্ছিল। আমার গাইড তাদের একজনের পিঠি চাপড়াতেই সে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে উঠল। আমার ভয় বলে কখনো কিছু নেই, কিন্তু তাকে দেখে বাস্তবিকই আমি চমকে উঠলুম। ও রকম ভাবহীন মুখ আমি জীবনে কখনো দেখিনি। সব চেয়ে আশ্চর্য্য হচ্ছে চোখ ছোটো; মূতের মত স্থির, নিশ্চল। এরা অন্ধ ছিল না, তবুও দেখতে পাচ্ছিল না। এ দেখে আমার মনে এক আশ্চর্য্য অমৃদুতির উদ্বেগ হয়, আমার মনে যেন একটা প্যানিক আসে। বায়লজির ইনস্টিটিউটে একবার আমি একটা কুকুর দেখেছিলুম, তার মস্তিষ্কের থানিকটা অংশ বার করে নেওয়া হয়েছিল। সেই কুকুরের যে চাহনি দেখেছি, তা ঠিক Zombicদের দৃষ্টির মত।

‘আমার সঙ্গী আমায় বললে যে কবর দেওয়ার অনেক বছরই বাদে লোকে তাদের পিতৃপিতামহদের মাঠে কাজ করতে দেখেছে। মূখের মিলের আশ্চর্য্য ঘটনা সংযোগ কি? Haitir একজন ডাক্তারকে আমি এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলুম। তিনি বলেছিলেন, তিনি অমাহুষিক, অস্বাভাবিক ঘটনা বা miraclesএ বিশ্বাস করেন না। অথচ Zombicদের ব্যাপারে সহজে অবিশ্বাসযোগ্য কিছু যে আছে, এটা ঠিকই।

যে সব কবরের মধ্যে এত ভক্তিদরে মৃতদেহ সব তাদের পরিবার-বর্গ গোর দিয়েছে, সেই সব কবর থেকে, যে সব লোক এখন কৃত্তিকার্য্যে খাটছে, তাদের অধিকাংশকেই তোলা হয়নি, একথা তিনি ঠিক জোরের সঙ্গে অস্বীকার করতে পারেন না, এও তিনি বলেছিলেন। আমি তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম, জীবনের গতিরোধ (suspension) হতে পারে কি না? তার উত্তরে তিনি নেহাৎই এক গুণ্ডময় বই টেনে নিয়ে আমায় তার একটা অংশ দেখালেন; বইখানি হাইটির পীনাল কোড : তার ২৪২এর আর্টিকল এ লেখা,—কোনরূপ প্রবাণ্ডগণের ব্যবহার, যাতে মানুষকে হত্যা না করলেও, তার দেহমন কিছু কাল ধরে, তা সে বেশিই হোক আর কমই হোক, এক রকম অসঙ্গ অবস্থার স্থাপ্তি করে, সেই ব্যবহারকে হত্যা করার চেষ্টা বলেই গণ্য করা হবে, প্রবাণ্ডগণের উপাদান যাই হোক না কেন বা এই সম্মোহন-অবস্থার যে ফলই হোক না কেন; এবং এই অবস্থা সবেও যদি কাউকে কবর দেওয়া হয়, তবে সেই গোর দেওয়া কার্য্যকে হত্যার সামিল গণ্য করা হবে।

এ ব্যাপারের বর্ণনা শুনলে প্রাণ জ্বাতকে উঠে সত্যই। তবে সস্ত্রিনীর সামনে আমেরিকানের এ ঘটনা বলা উচিত হয়নি, কারণ সেই মহিলা ভয়ে হঠাৎ কঁদে উঠলেন। আর লেখক প্রভৃতি অল্প সকলে তখন সোভিয়েটিক কারখানা সমূহের পুলীর বেটিংএর কাছে কাজে-লাগা লক্ষ লক্ষ হতভাগ্যের মৃতের মত দৃষ্টির কথা ভাবতে লাগলেন, সেই লক্ষ লক্ষ হতভাগ্য, যারা দিনের পর দিন না বুকে না ভেবে বিনা স্বার্থে কলের মত একই ভাবে কাজ করে চলেছে।

এ কথা সত্য যে অনেক কাল ধরে আমেরিকাতেও এ ব্যাপার চলছে; ইউরোপেও অভাব নেই; কিন্তু তাই বলে পৃথিবীর একমাত্র প্রোলেটারিয়াট—জনতন্ত্র শাসনেও কি ঠিক একই জিনিষ দেখা যাবে?

Zombieদের ব্যাপার সত্যই, এ ব্যাপার লেখক নিজে দেখেছেন। আত্মাহীন, এ ধরণের আশ্রয়্য লোক তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন। বিজ্ঞান আজ পর্য্যন্ত জগৎকে যা দিতে পেরেছে, Seabrook তার অধিকাংশ ডকুমেন্টই অনেক দিন ধরে যোগাড় করে এই আশ্রয়্য ব্যাপারের বিচার করেছেন। Zombieদের ইতিহাস যে কেবল সত্য তা নয়, এটা 'symbolique'ও। রাশিয়ার টেনের ভোজনাগারে বসে, সে সময়ে, এ ব্যাপারের সত্যতা যেন অন্তরের মধ্য থেকেই জানা গিয়েছিল।

কয়েক বৎসর পূর্বে প্রবীণ বিজ্ঞের মত আমেরিকা যা ভেবেছিল, সেই হচ্ছে রাশিয়ার এখনকার আইডিয়াল, অর্থাৎ, complete mechanisation, intensive production এবং সব শেষে rationalisation। রাশিয়ার আইডিয়াল আজ লক্ষ্যপ্রায়,—আজ, এই সময়ে, যে সময়ে আমেরিকার মেশিনের প্রতি বিশ্বাস টলতে আরম্ভ করেছে, যে সময়ে পৃথিবীর সর্বপ্রধান অর্থশালী দেশ—এই আমেরিকার সকলেই প্রায় অগাধ বিশ্বাসে, আশায় রাশিয়ার দিকে দৃষ্টি দিতে শুরু করেছে।

সাপেরা যেমন নিজের লেজ নিজে কামড়ায়, রাশিয়ার হয়েছে তাই; রাশিয়ার এ যেন একটা ট্যাঙ্কেডি, যা তার পঞ্চবার্ষিকী প্লানের প্রাণ্য, অপ্রাণ্য, সংখ্যা প্রভৃতি কোন প্রাধাচ্ছ না দিয়েই, প্রকাশ করেছে!

ক্রমশ

লেখক, জিস্কা

অনুবাদক, শ্রীতরুণ ঘোষাল, প্যারিস

আষাঢ়ের 'আষাঢ়ে'র উত্তর

আষাঢ়ের আষাঢ়েতে আমারে কিছু নাই
হয়তো বোঝেনি লোকে কলম ধরেছি তাই।

১

ইছুর মারিছে লাখি বিড়ালের নাসিকায়

বিড়াল দিতেছে থেলা মারিবার জঙ্ঘ,
আহাৰ্য্য নাই ঘরে সধবার একাদশী

বিধবা পেয়েছে পতি বিবাহহতে অঙ্ঘ।
ব্যবসা মন্দা আজ, তাই যত মাড়োয়ারি
'কেছা' লিখিছে বসি অপরের গদ্যে,
বাজার ফেলেছে ছেয়ে গদ্য ছন্দরাশি
ছন্দ মিলের বড় গোলমাল পদ্যে।

'শালী' কথা 'ভাল্গার', কারণ ভগিনী তাঁর
'অপোজ' করেন এই স্তম্ভুর 'কল্'কে,
অনেক বিন্দু মিলি সিদ্ধ হয়েছে যদি
Neglect করা আর চলে নাকে। 'স্বল্'কে।

২

Evolution মতে লুপ্ত হইতে প্যাণ্ট
প্যাণ্ট পৌছেছে গিয়ে ঠিকমত ঘাগুয়ায়,
হাবসীর রাজা আজ মুকুট পরিবে পায়
বার্থ প্রেমিক মাথা ঢেকে দেবে নাগরায়।
তরুণের মগজেতে কত ভাব বাসা করে
এক দামে হয় 'রূপা' 'প্লাটিনাম' তৈরি,

আষাঢ়ের 'আষাঢ়ে'র উত্তর

১২৮৩

আধুনিকতার ধূমে ভগ্নি হয়েছে মাথা
শুভ্রতা ছুজনার পরিচয়ে বৈরি।
ইতালি পেয়েছে শুধু 'আদিস্' আষাৰ্য্য'টুকু
মনে হয় তাও ফাঁকি মিছে রচা গল্প,
'কমলে'র কোনো খোজ আশ্রয় পেল নাকে।
পরেরের শোক কিছু হয় নাই অল্প।

৩

ব্যবসা মন্দা বড় গানেতে ভেঙ্গে না প্রাণ
গৌরের হয়েছিল টাকা নিতে কাবুলি,
'মাগরে' দিয়াছে প্রাণ' প্রচার করিল শেষে
যদিও লুকিয়ে আছে কোটরেতে হাবলির
সিংহুমে গান আছে, কেন না রসিক তিনি
গাহিতে বলেন সধা সেখানের লোককে,
মাটিতে ঝরিছে গান, কয়লা তুলিছে তান
'মাইকা' প্রকাশ করে বিরহের শোককে।
এহেন সিংহুমে চণ্ডীঠাকুর আছে
নাহিক মোটেই তাতে মন্দেহ বিন্দু,
অবশ্য ধাপা খুঁজে, রামা, শ্যামা, কেঁটার
প্রমাণ করিবে তিনি নন খাটি হিন্দু।

৪

ফর্সা 'মাইনরিটি', তাদের 'প্রোটেক্ট' করা
সরকারি কাহনের সব বাড়ি অল্প,

গদ্যছন্দে লেখা ছিদাম মুদীর বিল

প্রমাণ করিবে কত বড় হ'ল বন্ধ।

'ক্যান্ডাসারে'র দল প্রথমে পুরুষ ছিল

এখন হয়েছে নারী, করে তাই নৃত্য,

'কথায় ভেজে না চিঁড়ে' বুঝেছে বীমার দল

ওরিগেটালি নাচে হরে নেয় চিত্ত।

বিলাতি পোষাক ওঠে কালো চামড়ার পরে

'টমাটো' হবে না কেন বেগুনের বৃক্ষে ?

কচু গাছে কলা হবে, নয় তো ভারত কেন

স্বাধীনতা চাই বলি করিতেছে ভিক্ষে !

৫

'ফন' কেন 'Von' হ'ল 'নাৎসি' হইল 'Nazi'

নিশ্চয় কেতাবের প্রিন্টিং মিসটেক্,

অত দিন ধরে যদি 'দক্ষ যজ্ঞ' চলে

'সবাক পাঞ্জি'তে তবে রেকর্ড হইবে ব্রেক্।

ডুয়েলের পরিণতি ডুয়েট স্তনিত গিয়ে

হাত পা না ভাঙে যাতে পুলিশের দৃষ্টি,

সে দিকে রাখিতে হবে, পিছল হয়েছে পথ

কারণ মুঘলধারে হইতেছে বৃষ্টি।

'বক্স' এসেছে বটে, দাড়ি তার আছে কিনা

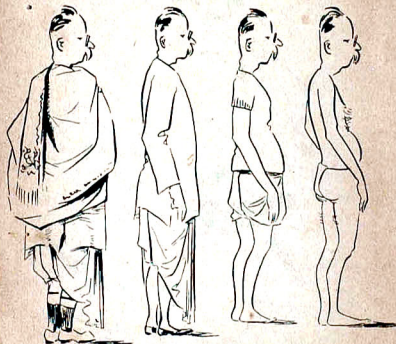
সে বিষয়ে গবেষণা চলিতেছে নিতা,

এসবের ফলাফল প্রকাশ হইবে কবে

তারি খোজে রহিলাম উৎসুক চিত্ত।

চলচ্চিত্র

বাংলার রাজনীতি ১৯২০—১৯৩৬



তত: কিম্?

HURDLE RACE



“পতনঅভ্যাসবন্ধুরপন্থা যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী”

সংবাদ সাহিত্য

শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামী গত সার্কি তিন বৎসর কাল সম্পাদক হিসাবে শনিবারের চিঠিকে সমস্ত লালন করিয়া আসিয়াছেন, বহুবিধ অসুবিধার মধ্যে ইহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। কার্যান্তরে ব্যাপৃত থাকার দরুন সময়াভাবে শনিবারের চিঠির সম্পাদন কার্য হইতে তিনি অবসর গ্রহণ করিলেন।

সকল ভদ্রলোকই জীবনে এক আধবার অন্তত মনে মনেও প্রতিজ্ঞা করিয়া বসেন যে ছুঁচা মারিয়া হাত গন্ধ করিবেন না, এবং হয় তো প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতেও পারেন কারণ ছুঁচা পারংপক্ষে আমাদের পথ মাড়ায় না। করপোরেশনের মুক্তিকাতলস্থ ড্রেনের অব্যবস্থায় বেচারারা মাঝে মাঝে অস্থির হইয়া উপরে উঠিলেও আমাদের অনিষ্ট বিশেষ করে না। কিন্তু ক্ষুদ্রতর জীব ছারপোকা সৰ্বদে অত্র কথা। হাতে গন্ধ, বিছানা ময়লা হইলেও চূপ করিয়া থাকা বেশীক্ষণ সম্ভব নয়, কারণ, বিছানায় না শুইলে আমাদের কিছতেই চলে না; চেয়ারেও বসিতে হয়। আমাদেরকে এড়াইয়া চলে না বলিয়াই নিশ্চয় ভাবে ছারপোকা মারার বিধি, ছুঁচা না মারিলেও চলে। ছুঁচা ভদ্রলোক, ছারপোকা ইতর।

‘শেষের কবিতা’য় যখন নিবারণ চক্রবর্তীর প্রথম সাফল্য পাইয়াছিলাম তখন তাহার প্রতি অমিত রায়ে অতটা মমতা সত্ত্বেও মনে হইয়াছিল, আর বেশী দিন নয়, লোকটা একটা দারুণ বিপাকে পড়িবেই। হইয়াছেও তাই। ‘অগ্রগতি’র চাপে এত অল্পদিনের মধ্যেই যে এমন সকল symptom প্রকাশ পাইবে তাহা আমরাও কল্পনা করিতে পারি নাই এবং হয় তো রবীন্দ্রনাথও পারেন নাই। সম্পাদক

আশু চট্টোপাধ্যায়কে হেকিম কল্লনা করিয়া 'বন্ধু' সঞ্চোধনে প্রতীকার ব্যবস্থা চাহিয়া স্বাভাবিক প্রবণতায় ছন্দে লিখিয়া তিনি যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা সত্য সত্যই অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থার সূচনা করিতেছে। সম্পাদক মহাশয় সম্ভবত ব্যবসাদার হেকিম কবিরাজের মত কোনও কিছুই 'গোপনীয়' রাখায় বিশ্বাস করেন না। সম্ভবত কেন, নিশ্চয়ই করেন না, বিগত বিশেষ 'প্রেম সংখ্যা'তেই তাহার পরিচয় আছে। তাই পাছে বাড়ীতে রাখিলে চিঠিখানি কুমারী আত্মীয়দের হাতে পড়িয়া কোনও অঘটন ঘটায় এই আশঙ্কায় একেবারে পত্রিকায় ছাপাইয়া গোপনতার জড় মারিয়া দিয়াছেন। নিজের দিক হইতে ভালই করিয়াছেন কিন্তু বন্ধুদের খাতির এবং সম্পাদকীয় দায়িত্বও তো আছে! ব্যবসাদারী সেটাও তো কম নয়। যে কোনও একটা পরীক্ষিত patent গুপ্তের নাম লিখিয়া জানাইলেই যেখানে কাজ হইত, অথবা 'প্রেম-সংখ্যা'র 'প্রেমের পাতল' এর লেখক হুজো ঠাকুরের সহিত একটা personal contact ঘটাইয়া দিতে পারিলেই যেখানে উপকার দর্শিত সেখানে অথবা কম্পোজিটরদের উপর এই অত্যাচার কেন? এই দায়িত্বজ্ঞানহীনতার জন্য সম্পাদক মহাশয়কে লেখকদের তরফ হইতে 'বয়স্কট' করা উচিত।

অথবা সমস্তটাই একটা চাল, বিজ্ঞাপন আদায়ের একটা অতি হুস্ক কৌশল মাত্র। নিবারণ চক্রবর্তী মহাশয় আসলে হুস্ক এবং সক্ষমই আছেন, বিজ্ঞাপনদাতাদের লোভ দেখাইবার জন্য তাঁহার হাতেই জ্বাল পাতানো হইয়াছে। যে পত্রিকার লেখকের এবং হয় তো সম্পাদকের এই শ্রেণীর ব্যায়রাম আছে সেই পত্রিকার পাঠকেরাও যে এই রোগের কবল হইতে মুক্ত আছে তাহা কখনই সম্ভব নয়, থাকিলে

এতদিন বার্ষিক বা বার্ষিক চাঁদা মনিঅর্ডার বা ভি-পির ফর্ম মারফৎ না গিয়া রাছ কোম্পানী অথবা বাটা কোম্পানীর ছাপ মারা বাক্সে উপস্থিত হইত। স্মরণ্য তাগদ-কারী পেটেন্ট ঔষধ বিক্রেতার অবিলাসে 'প্রেম কোথায়' কবিতার জ্বাবে নিজেদের ঠিকানা ও প্রশংসাপত্র লইয়া হাজির হইবে। দুই চার বার হাত ঢালাঢালি না হওয়া পর্যন্ত কলিকাতার পুলিশ কমিশনার সাহেব নিশ্চয়ই ঘুমাইতে থাকিবেন। ফন্দী ভাল।

পাঠকেরা ভাবিতে পারেন ধোকা দিতেছি, একটু নমুনা নিশ্চয়ই চাই। এই ২০ লাইনের কবিতা-পত্রে মোট বাইশটি রোগলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে, পুলিশের ভয়ে সংযত হইয়াই একটি মাত্র লক্ষণের উল্লেখ করিতেছি। বাকী লক্ষণগুলি, 'অগ্রগতি'র সম্পাদক মহাশয়ের অভিভাবকের নিকট আবেদন করিলেই জানিতে পারা যাইবে।

আজ মোর প্রেম নাই, তাই যত হেরি হায় যুবতী কুমারী—
নিত্য হুচার করো, কারো স্তম্ভ যুগ্মদন,—বহুতোয়া নারী—
কেহ নাহি পারে মোরে সঙ্গহৃৎ বিতরিয়া করিতে চঞ্চল।
নাহি নাচে শায়রবন্ধু, মিথন-উল্লাসে—শুধু মরে অশ্রুজল।

কিন্তু যদি দুর্ভাগ্য লেখকের বণিত অবস্থা সত্য হয় তাহা হইলে বুঝিতেছি অগ্রগতির লেখকেরা অগ্রগতির পাঠক নয়, হইলে 'প্রেমসংখ্যা' অগ্রগতি পাঠেই ভুল্লোকের কাজ হইত, সম্পাদকের চাতুরীতে তাঁহাকে এভাবে exposed হইতে হইত না।

আর যদি অগ্রগতি পড়িয়াও কাজ না হইয়া থাকে তাহা হইলে এই পণ্ডিত কেন?

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার ক্রমশ বহু সুযোগই ঘটতেছে। সাদু আশুতোষ বর্তমান থাকিলে 'বর্তমান'

দেখিয়া মাতৃভাষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে গৌরবের আসন দিয়াছেন মনে করিয়া খুশী হইতেন। এম-এ পাস করা সম্পাদক, বি-এস-সি পাস করা সহঃ সম্পাদক। 'বর্তমান' তবু 'ভবিষ্যতে'র নকল করিয়া ভূত হইয়া উঠিতেছে।

—

ইংলণ্ডের রাজকবি John Masefield এর বাংলা জানা থাকিলে অন্তত নালিশ করিবার জ্ঞাও তিনি আর একবার বেশী করিয়া রাহোর দরবারে উপস্থিত হইতেন একথা আমরা হলফ করিয়া বলিতে পারি।

'প্রিয়ায় সৌন্দর্য' বর্ণনায়—

কালবৈশাখী ঈতল করা ঈর ঈরে বৃষ্টি ও
নবদুর্গাদলের চারা দেওয়া জন্ম-বিকাশ।

আরো দেখেছি।—

গাহানে বাতাসে ফুলে ওঠা কাহাজের পালের
তলা দিয়ে কত অজানা অতেনা দেশ। কিন্তু

গত ২১শে আষাঢ়, রবিবারের পর John Masefield আর বাঁচিয়া আছেন কিনা সন্দেহ হইতেছে।

—

কে বা কাহারো কবে যেন কোথায় বলিয়া বা লিখিয়া থাকিবেন, ফিল্ম শিল্পে ভক্ত নারীর আবির্ভাব নীতি-অহুমোদিত নয়। সম্পাদকীয় অহুস্ফাদনের পর 'বর্তমান' জানাইতেছেন—

এ অভিশ্রমে কিছুদিন ষ্টুডিওর ভেতর ঘুরে দেখলাম সত্য উপলব্ধির অলপ নিশ্চিন্ততার স্ত ১০০-দেখলাম সেখানে উচ্ছ্বের বিসর্গিতা কিছু নেই, যা আছে তা পুণিয়ার জ্যোৎস্নার মত বিক্ষতায় পবিত্র।

নিশ্চয়ই। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয় ইনি কাদের তরফের। ষ্টুডিও-মালিকরা প্রত্যহ একপ কতজনকে পবিত্র শ্রদ্ধ পুণিমার জ্যোৎস্না পান করিতে দেন? অমাবশ্যার সময় কি ষ্টুডিওর কাজ বন্ধ থাকে?

—

কিন্তু এই Enthusiastটি এখানেই থামেন নাই। ষ্টুডিও ভাবিতে গিয়া হঠাৎ তাঁহার ঘরের কথা মনে পড়িয়া গিয়াছে। তিনি কেপিয়া গিয়া বলিতেছেন—

তার চেয়ে অহুস্ফাদনের দৃষ্টিতে সমাজের অন্তঃপ্রোতের দিকে তাকালে দেখতে পাওয়া যাবে অহুস্ফাদন্য (sic) গোষ্ঠিতে (sic) গুষ্ঠি (?) ব্যক্তিগতের বহু প্রবাহিত হয়ে থাকাই অনেকটা বাস্তবিক। বোধ হয় হয়ে থাকে তা।

এবারও নিশ্চয়ই। নহিলে ইহাদের উদ্ভব হয় কোথা হইতে?

—

আরও খবর আছে।

নট কিংবা নটী কারোই বিপরীত (জয় ভারতচন্দ্র!) জনের সাথে ষ্টুডিওতে অহুস্ফাদন স্থাপনের প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান আছে অনেকখানি। প্রথমতঃ কর্তৃপক্ষের কাছে অভিশ্রায় জানাতে হবে, তারপর একটা—

বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন এম-এ থোলা চোখে কতদূর ঠিকতে পারেন এই নিবন্ধটি তাহারই দৃষ্টান্ত। *

—

'সমাজের অন্তঃপ্রোতের... অহুস্ফাদন্য'দের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াই যে সম্পাদক মহাশয় ফাস্ত হইয়াছেন তাহা নয়। দৃষ্টান্তও আছে। নিম্নবর্ণনার নায়িকা সিনেমা আটটি নয়, গৃহস্থ-কন্যা।

*...নাও—এইটুকু খেয়ে নাও।'

গোড় নিজেই তরুণীর মুখের কাছে গ্লাসটি এগিয়ে ধরেন। গ্লাসটি নিশেষ করে মুখ-চোখ এক অস্বাভাবিক রকম কঁচকে তরুণী বলে—

'আচ্ছা, কাল থেকে তো 'ওবু' ওবু' বলে এই একই জিনিষ আমায় খাওয়াচ্ছেন।

সত্যি কথা বলুন তো জিনিষটা কি?

হস্তস্থিত গ্লাসটি নিশেষ করে গোড় বলেন—

'রাগ করবে না তো, মদ।'

'ম—দ।' তরুণী তার ঘরে উত্তেজিতভাবে উঠে বসে রোষকান্ডিত নেড়ে, তারপর নিজের মনে মুলুঙে কি যেন ভেবে নিয়ে আবার অর্ধশ্রদ্ধিত হয়ে বলে, নাঃ, রাগ করবার মত এতে কি আছে।

* এই প্রবন্ধটিই বিস্তৃততর হইয়া ২৩শে আষাঢ়ের 'নাচঘরে' প্রকাশিত হইয়াছে। কয়েকটি ব্যক্তিগত ইঙ্গিতও ইহাতে আছে।

‘অর্জুনাযিত’ বাঙালী পাঠক মাজেই ‘বর্তমান’ সম্বন্ধে এই কথাই হয়তো বলিয়া থাকেন—কিন্তু মোল্লার সঙ্গে সঙ্গে মসজিদ পর্য্যন্ত আমরা এখনও পৌঁছাই নাই।

—

এবার স্বয়ং সম্পাদক মণীন্দ্র বসু এম-এ মহাশয়ের কবিতা।

তোমার বুকের প্রচুরতার মাঝখানে আমার মুখখানাকে
রাখতে দাও অনেকক্ষণ...

.....তোমার চুলের গন্ধ

দিক্ আমার চোখটায় জ্বালাপনের নেশা লাগিয়ে।

তোমার পাংলা কাঁচের মত

গোলাপী ঠোঁটের পাতা থেকে

আমার শুকনো বিবর্ণ ঠোঁটে

ঢেলে দাও গানিকটা ইটালীয়ান ভারমুগ,

পাঠক ভাবিতেছেন অহুবাদ, স্বভো ঠাকুরের নীলিমা দেবী রুত অহুবাদের অহুবাদ হইতে পারিত কিন্তু তাহাও নয়। জন্মদাতা পিতা বছবৎসর পূর্বে অহুবাদের কাজ করিয়া এতদিনে হয়তো অহুতাপ করিতেছেন, পুত্র আপনার কাজ করিয়া চলিয়াছেন।

‘সাহানার’ সম্পাদক হেমন্ত গুপ্ত যে এতটা সেয়ানা তাহা আমাদের জানা ছিল না, শুধু আবর্তনে নয়, ভঙ্গলোক বলিয়া এবং না বলিয়া আ-হরণেও পটু। এবং চোর মাজেরই যেমন লম্বালম্বা বুলি থাকে ইহারও তাহাই আছে। অথচ এখনও হাত সাফাই হয় নাই, ধরাও পড়িয়া যান। নীলমণি হালদার কোম্পানী হয়তো এখনও ধরিতে পারেন নাই।

—

পঞ্চম সংখ্যা ‘সাহানার’ সম্পাদকীয় মন্তব্য পড়িয়া অনেকে কাঁদিয়াছেন একদম খবর পাইয়াছি। এক, অশ্রুয়ে ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় হাসিতে পারিতেন কিন্তু তিনি কাজের লোক,

হয় তো এসব দেখিবার সময় পান না। ‘সাহানার’ সম্পাদকীয় হইতে উদ্ধৃত করিতেছি—

“মর্যালিট”—চমৎকার জিনিষ।...রাম একজামিনে ঢুকতে পারে নি, M.A. fail করলে, ছাত্র ঘৃণা নয়নি তাই চাকরী হারালে।...হরি Higher mental Sphereএ মিশবে বলেই হয়ত শিক্ষিতা মেয়ে বিয়ে করেছিল। তার প্রত্যেক ফল হয়েছিল—‘ও’ বছরে ছুটি ছেলে মেয়ে।...মিলের জন্তে Scott’s Emulsion,.....একটু বুকের বোম্ব ছিল, most moral disease? পাপের ফলে যে সব রোগ হয়, তা নয়—অন্যএব sympathy করতে পারে। স্ত্রী নিলেন ছেলেপুলের ভার—বুকের পর টিউশনী। প্রবাসে নিরানন্দে গুরুশ্রমে বেশ একটু কাহিল হয়ে পড়লেন...হরি বেচারী হা-হাভাশ করতো বই কি।...

কি বলছ বন্ধু Human weakness (sic)? It is inhuman weakness (sic). কে তাকে বলেছিল, তুমি না। হয় একটু দুপথেই যাও না।...But he had not the pluck to be immoral, He had a homicidal morality.

স্ত্রীকে ভুট করবার জন্তে সে কাজ করেছিল।—It is a lie, It is worse than that. তাকে চাওয়া দূরে থাকুক, তার স্ত্রী তার পায়ের ধরে বলতো, ওগো আমার দয়া করে, এখানে তুমি এসো না—...তবে ব্যাপারটা বেশী দূর গড়ালে না—মেয়েটি...হাসপাতালে মারা পড়ল।...গ্রেস ওদের থাকে না—পায়ের প্রতিও নয়, পর-পুরুষের প্রতিও নয়। She was nothing but a mother আর মাতৃর ছিল তার হৃৎকের বিধ।

এতখানি জায়গা নষ্ট করিবার প্রয়োজন ছিল না, তবে কিনা এদেশে অঁকাটা প্রমাণ চোখে আঙুল দিয়া না দেখাইলে কাজ হয় না তাই সম্পাদক-প্রবরের কীটিক একটু বিশদভাবেই দেখাইতেছি। এই প্রবন্ধের উপর হয়তো পাঁচ প্যাকেট সিগারেট উড়িয়াছে, নীলমণি হালদার কোম্পানী আরও কিছু চালিয়াছেন।

—

শনিবারের চিঠির প্রতি সাহানা একটু বিরূপ। সেই শনিবারের চিঠিতে ১৩৩৬ সালের ভাদ্র সংখ্যায় ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ‘নরকের কীট’ নামে একটি বড় গল্প বাহির হইয়াছিল। হেমন্ত গুপ্তের যদি জানা থাকিত যে বাংলাদেশে ওই ঠাইলে লিখিবার

লোক আর দ্বিতীয় নাই তাহা হইলে তিনি হয়তো সামলাইয়া চলিতেন। কিন্তু চুরিবিজ্ঞা থাকিলে কি হইবে, আসল বিদ্যা যে পেটে কম। 'নরকের কীট' (১৫-১৭ পৃষ্ঠা) হইতে নীচের অংশ তুলিতেছি—

—Morality?—ঈ, ও স্মিথটা তোমাদের আছে। হুবোধকে চিনতে?...চুরি করতে পারলে না বলে M. A.তে fail করলে, ঘুষ দিতে পারলে না বলে চাকরী খোঁজালো।...Higher mental sphereএ মিশবে বলে হুহু শিক্তি মেয়ে বে' করেছিল। তার অত্যন্ত ফল হয়েছিল—চারটে না কটা ড়েলে।.....সবটাই বোম্বহয় থরচ হয়েছিল Scott's Emulsionএ। ড়েলালেকের একটু বুকের দোষ ছিল, a most moral disease। পানের ফলে যে সব 'ছষ্টরোগ' হয়, এ রোগ সে দলে নয়। অতএব sympathy করতে পার।

হেলেপুলের সমস্ত ভারটা গ্রীকেই বহন করতে হ'ল।...সুলের কাজের পর...tuitionই করে কাটাতে হ'ত। অবাসে, নিরানন্দে, গুরুত্বে তিনি বেশ রুখ হয়ে পড়লেন।...হুবোধ গ্রীর জন্ত হা-হতাশ করতে অনেক।...

—Human weakness? It is inhuman weakness। আমি তাকে বলেছিলাম...তুমি না হয় একটু কুপে যাও। But he had not the pluck to be immoral. He had a homicidal morality.

গ্রীকে ডুই করবার জন্ত সে এই কাজ করেছিল? It is a lie. It is worse than that....হুবোধকে কামনা করা দু'রে থাকে, তার গ্রী পায়ে ধরে তাকে বলেছিল, 'ওগো, আমার ওপর দয়া কর। আমার কাছে আর এসো না।'...তবে ব্যাপারটা বেশী দূর গড়াল না। গ্রীটা managed to die in a hospital....তার মরণে গ্রেসের লেশমাত্রও ছিল না।—বামীর প্রতিও না, পরপুরুষের প্রতিও না। She was nothing but a mother এবং মাতৃস্থ ছিল তাঁর হৃদয়ের বিদ।

বাতায়ন—মুক্ত বাতায়ন।

যু তার বাইরের পুপিবাটকে

চিনতে পারে। বিশ্বের রূপ

রস, রন্ধের ছোঁচাচ পেয়ে

শিউরে ওঠে—খোমটা পড়ে।

অনেনা পখিক পখ চলতে চলতে

তার পানে চেয়ে ঢোক মারে—

[বাতায়ন, ৩৪ বর্ষ, ১ম সংখ্যা পৃষ্ঠা ৬

কিন্তু চেনা হইতে বিলম্ব হয় না। শ্রীমুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় চিরদিন এই পত্রিকাবানিকে স্নেহের চোখে দেখিয়া থাকেন। ঋচিও দেখেন।

যথা।

রাশিয়ার ষ্টালিন যে নৃতন পারিবারিক আইন প্রবর্তন করেছেন তার ফলে এবার থেকে মেরেরা মা হওয়ার প্রচুর সুযোগ সুবিধা পাবেন।...রাশিয়ার ধার্মী বোটারদেরও কাজ বাড়ল।

শ্রীমুক্ত ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে—

আমরা বিশ্বাস করি তাঁর বয়সও আছে এবং বহুদৈবের কাছে থেকে যৌনত্বের বইগুলিও তিনি পড়ে ফেলেছেন। নচেৎ কি করে তিনি জানলেন "বহুব পরিণত হবেই হবে গ্রেসে এবং কামে।" শুনেছি ধূর্জটিপ্রসাদ অধ্যাপক—এক হিসেবে ছাত্ররা তাঁর বহু। ভয়ের কথা নয় কি।

বাতায়নের মুক্তিও একেবারে অবিনাশী!

মহিলা বিভাগ চালাতে হলে যে সমস্ত অভিজ্ঞতা থাকা এগোজন কোন কুমারীর নিকট থেকে তা আশা করা যায় না। যদি সম্ভাব্য পালন সম্বন্ধে মহিলা বিভাগে কোন বিতর্কিতা উঠে, কুমারী আহানরা কি করবেন?

'নারীর মূল্য'র শ্রীমতী অনিলাদেবী কি বলেন?

বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে 'বাতায়ন' ওয়াকিবহাল নিশ্চয়ই। 'ভারত-বর্ষ' পত্রিকা সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন—

গত দীর্ঘ তের বৎসর যে যোঁরানে এই পত্রিকাবানি বেঁচে আছে তা বাংলাদেশের সাহিত্যপুস্তকীদের অজানা নাই।

কিন্তু চতুর্দিকশ মানে যে চর্চিশ, চোদ্দ নয়, তাহা জানিতে হইলে অভিধান খুলিতে হয়। তাহার চাইতে মল্লিক মহাশয়ের 'ব্যবহারের মিত্ততা' অল্পভব করা সহজ ও লাভজনক।

ছারপোকা মারিয়া কেহ শেষ করিয়াছে শুনিয়াছেন কি?

দ্বৈমাসিক 'কবিতা'র চতুর্থ সংখ্যায় 'কবিতার পাঠক' প্রবন্ধে সম্পাদক বলিতেছেন—

কবিতা বলে অর, ধরে নিতে হয় অনেকখানি। অনেক সময় কবিতার কথাগুলো নিষ্কিষ্ট কোনো ধরই দেয় না; কিম্বা যে-ধরটা দেয় সেটা আপাতত তুষ্ট। কিন্তু সেই কয়েকটি কথার পারস্পরিক সংযোগনাই হয় এমন যে মোটের উপর ফলটা হয় অলৌকিক—[পৃ: ৪২]

বর্তমান সংখ্যা 'কবিতা' হইতেই এই অলৌকিকতার কিঞ্চিৎ নমুনা আমরা আহরণ করিতেছি—

১। অঙ্ককারের শুদ্ধতা ভেঙে কে যেন বলল—

"জানো কালরাসে মিলির বিয়ে হয়ে গেছে।"

—অঙ্ককারের দীপ্তিতে সে শব্দ পাশরের মতো।

"ও কিছুই নয়; কদিনই বা মনে থাকবে;

তবে হয়তো কোনো রাসে রতিবিহারের সময়
হঠাৎ তোমাকে মনে পড়বে,

আর সেদিন সমস্ত রাত

তোষে আর ঘুম আসবে না।"

পাঠক, উপরের খিণ্ণী ও নীচের প্রাক্টিস মিলাইয়া দেখুন, ইহার পরেও যদি কাব্যের অলৌকিকত্ব আপনাদের অবিশ্বাস থাকে তাহা হইলে 'কবিতা' সম্পাদক মহাশয়েরই কথার প্রতিফলন করিয়া বলিতে বাধ্য হইব—

ষষ্ঠ্যবতই সকলের মধ্যে সব জিনিষ থাকে না, যে-বস্তুর সাহায্যে ভালো ও মহৎ কবিতা উপভোগ করা যায় সেটাই অনেকের মধ্যে অশুপস্থিত, এবং একখাটা অকুণ্ঠে মনে নেয়াই বোধ হয় ভালো। অধিকাংশ মানুষের মনের রচনাই এমন যে নিচু জাতের পদ্য না হ'লে সেখানে কোনো জায়গাই পড়বে না।

উচু জাতের বলিয়াই সম্পাদক মহাশয় তাঁহার পত্রিকায় কবিতা-গুলির স্থান দিয়াছেন, ইহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি, হুতরাং নমুনা হিসাবে এগুলি দাখিল করিলে তিনি আমাদের দোষী করিতে পারেন না।

২। কামনার দুরাশয়

কল্পনার দুরাশয়

শব্দের বীজের বড় নিলম্ব হাওয়ায়।

শব্দ থেকে শব্দান্তরে

জগৎ থেকে জগদান্তরে

আমাদের চক্রমণ

অগ্রহীন চক্রমণ

মুক্তিহীন চক্রমণ

—তারপর ঘুম ভাঙে বিকেল বেলায়।

ইহা স্বয়ং সম্পাদক মহাশয়ের রচনা, হুতরাং ইহার অলৌকিকত্ব বিশ্বাস করিতে পাঠকের বাধিবে না।

৩। জানি, জানি এই অম্লতচক্ষে চক্রমণ।

কুটলোমুটে বলি শব্দ তাই কথা।

ফ্রেসিডা, আমার এতও আকুলতা

জীবনের লোভে বিদিশা বিস্মরণ।

শ্রীবিষ্ণুদের এই রচনা বৈফল্যেরা নিশ্চয়ই বুঝিবেন!

৪। সে কে এক নারী এসে ডাকিল আমারে,

বলিল, তোমারে চাই : বেতের ফলের মত নীলাভ বাষ্পিত
তোমার ছুই চোখ

খুঁজেছি নগ্নরে আমি,—কুরাশার পাখ মাঝ,—

সন্ধ্যার নদীর জলে নামে যে আলোক

জোনাকীর দেহ হতে,—খুঁজেছি তোমারে সেইখানে :—

ঘুর পৈচার মত ডান মেলে অগ্রাশের অন্ধকারে

ধানসিঁড়ি বেয়ে বেয়ে

সোনার সিঁড়ির মত ধানে আর ধানে

তোমারে খুঁজেছি আমি নির্জন পৈচার মত প্রাণে।

সিঁড়ি দেখিয়া যেমন কাশী চেনা যায় 'ধানসিঁড়ি' দেখিয়া জীবনানন্দ (জীবনানন্দ নয়) দশকে পাঠকে চিনিতে পারিবেন কিন্তু কথাটা নাম লইয়া নয়—অলৌকিকত্ব লইয়া। 'নির্জন পৈচার মত প্রাণ' যদি

অলৌকিক না হয় তাহা হইলে সীতার পাতাল প্রবেশও অলৌকিক নয়।

কবিতা হইলেও মানুষের স্পর্ধার যে একটা সীমা আছে একথা ইহার। বিশ্বত হইয়াছেন।

‘মোহাম্মদী’র সম্পাদক মোলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সাহেবকে আমরা নিষ্ঠাবান, গোঁড়া ও ধার্মিক মুসলমান বলিয়া জানিতাম। ‘মাসিক মোহাম্মদী’র ইউনিভার্সিটি সংখ্যা (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩) পাঠ করিলে ইহাতে কোনো সন্দেহ তো থাকেই না, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দুদের চাপে মুসলমান ধর্মের অবমাননার সঠিক খবর পাইয়া অশ্রু-সম্বরণ করা দুঃস্থ হইয়া উঠে। স্কুল কলেজের পাঠ্যপুস্তকে অকারণে হিন্দু দেব দেবীর নাম ঢুকাইয়া যে ভাবে মুসলমান ছাত্রদের মগজে হিন্দুসংস্কার ঢুকাইয়া দেওয়া হইতেছে তাহাতে অচিরকাল মধ্যে যে তাহারা বিশ্বাসী হইয়া উঠিবে এই আশঙ্কায় মোলানা সাহেবের দিনে শাস্তি ও রাজ্যে নিস্তা নাই। মোলানা সাহেবের ভাষাতেই শুধন—

স্কুল ও কলেজগুলির বাঙ্গলা-পাঠ্যগুলির সন্ধান লইলে দেখা যাইবে যে, সেগুলির এক বিরাট অংশ পরিপূর্ণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে নরপুঞ্জার, জড়পুঞ্জার, প্রতীক ও প্রকৃতি-পুঞ্জার কৃশিকার এবং আদিম যুগের অসভ্য মানুষের পৌরাণিক অন্ধ-বিশ্বাস ও কুসংস্কারের মহিমা-প্রচারে।

এমন কি, রবীন্দ্রনাথ পঞ্চানন ইউনিভার্সিটি সংখ্যায়, পৌত্তলিকতা প্রচারে সহায়তা করিবার জন্য লালিত হইয়াছেন।

সুতরাং আবার সংখ্যা ‘মাসিক মোহাম্মদী’র ৬৪৪ পৃষ্ঠায় ‘পুনলাভ’ নামক নিবন্ধটি পাঠ করিয়া আমরা যুগপৎ বিস্মিত চমকিত ও শিহরিত

হইয়া উঠিলাম। তাহা হইলে সমস্তাই ভাণ? গোড়ামিটা মুখোমুখি মাত্র? মোলানা সাহেবও মন্তলববাজ? Thou too Brutus?

—
রচনাটির আরম্ভ এইরূপ—

পুণ্যলোক রাজা নগের দেহে কলি কি ভাবে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, তাহা আমরা সকলেই জানি।

হয় তো কিছু অর্থলাভ ঘটয়াছে কিন্তু অর্থের জন্যই কি পৃথিবীতে সব কিছু করা যায়? ইউনিভার্সিটি সংখ্যার পর ইহার জন্য ধার্মিক মুসলমান সমাজের কাছে মোলানা সাহেব কি জবাবদিহি করিবেন? শুধু ইউনিভার্সিটিরই অপরাধ নয়, প্রয়োজন হইলে ‘মোহাম্মদী’ও ‘পৌরাণিক অন্ধ-বিশ্বাস ও কুসংস্কারের মহিমা-প্রচার’ করিয়া থাকেন। ধন্য রক্তচক্র!

—
পলাত-গবেষণার একটি নমুনা আবার সংখ্যা ‘মোহাম্মদী’ হইতে উলিয়া দিতেছি। ‘বাংলা ভাষায় আরবী-পারসী শব্দ’ সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া আবদুল কাদির লিখিতেছেন—

কোঁকিঁবানী রামায়ণ... ইত্যাদিতে যে আরবী, পারসী শব্দ একেবারে পাওয়া যায় না, এমন নয়;

দেব দানব জীন বেটা ব্রহ্মার কারণ।

যানর হইরা তোর বধিব জীবন।

‘জীন’ বড় করিয়া ছাপিয়া লেখক দেখাইতে চাহিয়াছেন যে ওটি মুসলমানী শব্দ। কিন্তু আসলে যে শব্দটি জিন—(জিনহ, জয় করিয়া থাক) জীন নয় তাহা কাদির সাহেবকে কে বুঝাইবে? দানব অর্থে

জীন্ দরিলে যে চরণটির কোনই অর্থ হয় না গোঁড়ামির প্রকোপে লেখক বা সম্পাদক কাহারও তাহা ঠাহর হয় নাই! 'মোহাম্মদী'র গবেষণা আগাগোড়াই এই জাতীয়।

হারমোনিয়ম কিনিতে হইলে

ডোয়াকিনের হারমোনিয়মই
কেনা উচিত

৫০ বৎসর ধরিয়া ডোয়াকিনের হারমোনিয়ম স্তরের মাধুর্য্য, গঠন, স্থায়িত্ব ও অস্বাভাবিক গুণের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। অল্প হারমোনিয়ম কিনিবার পূর্বে একবার ডোয়াকিনের হারমোনিয়ম সম্বন্ধে খোঁজ করিবেন। নব-প্রকাশিত সচিচ মূল্য-



তালিকার জন্য আজই পত্র লিখুন।

সোনোরা ডবল-রীড বক্স হারমোনিয়ম ৩ অক্টেভ, ৫ ষ্টপ বাজসহ ৩০ টাকা।

ডোয়াকিন এণ্ড সন্স

১১নং এস্পেনেড, কলিকাতা

শনিরঞ্জন গোস্ব, ২৫১২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে

ঔপন্যাসিক নান কব্জক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রী ব্রজনাথ চট্টোপাধ্যায়



৮৭ বহু]

ভাজ, ১৩৪৩

[১১শ সংখ্যা]

ইতিহাস নয়

১

প্রফেসর আর্নল্ড জে টয়েনবীর বিখ্যাত পুস্তক 'এ ষ্টাডি অফ্ হিষ্ট্রি' পড়িতেছি, এমন সময় ত্রিযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন প্রণীত 'বুহং বদ' হাতে আসিধা পড়িল। এই ঘটনাসমাবেশ সম্পূর্ণ দৈবকৃত, তবু ইহার মধ্যে কাহারও যেন একটা নিগূঢ় ইঙ্গিত আছে বলিয়া মনে হইল— কারণ, সকল দিক হইতেই গ্রন্থ দুইখানি পরস্পরের উপমান ও উপমেয়।

প্রথমত, দুইখানি পুস্তকেই দুইটি আত্মপ্রত্যয়শীল জাতির দুই জন লক্ষপ্রতিষ্ঠ গবেষক ও ইতিহাসকার সারাজীবনের সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। প্রফেসর টয়েনবী অবশ্য বয়সে সেন-মহাশয়ের পূজ্যস্থানীয়। তবু তিনিও অন্তমানে দিনেশের মতই আয়ু

বলতা ও শাস্ত্রের অকূল বিস্তার অহুভব করিয়াছেন; তাই সেট জন হইতে এই বাক্যটি উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, 'Work ...while it is day...'। ভাল করিয়াছেন বলিতে হইবে, কারণ ইহার পরই তাহার দ্বারা যে কবিতাটি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে একটা গভীর সত্য আছে।—

"Thought shall be the harder,
Heart the keener,
Mood shall be the more,
As our might lessens."

শক্তি যতই কমিয়া আসিতে থাকে, চিন্তা ততই অয়াসসাধ্য হইয়া উঠে, হৃদয় ততই উদ্বেল হয়, প্রস্তুতিও তেমনিই কূল ছাপাইয়া বহিতে থাকে। এই তথ্যটি হৃদয়ঙ্গম করিয়া দীনেশবাবুও বৎসর কুড়ি আগে 'বৃহৎ বঙ্গ' সমাপ্ত করিলে হয়ত ভাল করিতেন।

'বৃহৎ বঙ্গ' ও 'ষ্টাডি অফ্ হিষ্ট্রি'র দ্বিতীয় সাদৃশ্য ইহাদের কোনটিই সাধারণ ইতিহাস নয়। বর্তমান যুগে পৃথিবীর প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ও শিক্ষায়তনে অগণিত গ্রন্থকোট পুরাতন শিলালিপি, পুস্তক ও দলিলপত্র খাঁটিয়া তথ্যের উপর তথ্য সাজাইয়া অক্ষমোহে জ্ঞানের যে বন্ধীকল্প গড়িয়া তুলিতেছে, দুইখানি পুস্তকই তাহার প্রতিবাদ। দীনেশবাবু লিখিয়াছেন, 'পুস্তকখানি আমি নানারূপ গুরুতর সমস্যা দ্বারা জটিল করি নাই; নানারূপ বিভিন্ন মতের ঘূর্ণীপাকে পড়িয়া পাণ্ডিত্য-প্রদর্শনের কোন চেষ্টা করি নাই;...এই পুস্তকের ভাষা হয়ত ঠিক বিজ্ঞানসদৃশ, ওজন করা, নিলিপ্ত ঐতিহাসিকের ভাষা হয় নাই।' প্রফেসর টয়েনবীও বলিয়াছেন, বর্তমান যুগের 'বৈজ্ঞানিক' ইতিহাস ইতিহাস নয়, 'ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশনের' আর একটি দিক। এই

সকল রচনাকে গিবনের 'ডিক্লাইন এণ্ড ফল্ অফ্ দি রোমান এম্পায়ারের' সহিত তুলনা না করিয়া বিংশশতাব্দীর রেল, জাহাজ, স্বড়ঙ্গ, কারখানা, স্ট্রাইক্‌পার, বাঁধ বা সেতুর সহিত তুলনা করা উচিত। কিন্তু তিনি যে ইতিহাস রচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা জ্ঞানের এই অতি-বিক্লিষ্ট ও অতিবিক্লিষ্ট অক্ষ পেশীচালনা নয়, পুরাতন ধরণে বুদ্ধি ও দৃষ্টির সাহায্যে মানবজাতির সমগ্র ও অথও অতীতকে বুঝিবার চেষ্টা। প্রকৃত প্রস্তাবে তাহার এবং দীনেশবাবুর, উভয়ের গ্রন্থই শুধু পাঠকের পক্ষেই নয়, রচয়িতার পক্ষেও দেশ কাল পাত্র ও ঘটনার জটিল ব্যাহার ভিতর দিয়া পথ আবিষ্কারের চেষ্টা।

পুস্তক দুইখানির তৃতীয় সমান লক্ষণ বাহ্যিক। দুইখানিতেই দুইটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানের ছাপ রহিয়াছে। 'ষ্টাডি অফ্ হিষ্ট্রি' ইংলণ্ডের রয়্যাল ইন্সটিটিউট অফ্ ইণ্টার গ্রাশনাল এক্‌ফোর্স-এর পোষকতায় প্রকাশিত হইয়াছে। 'বৃহৎ বঙ্গ' প্রকাশিত হইয়াছে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক। বাঙালীর জীবনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে স্থান, ইংরেজের জীবনে হয়ত সে-স্থান রয়্যাল ইন্সটিটিউট অফ্ ইণ্টারগ্রাশনাল এক্‌ফোর্সের নয়, অক্সফোর্ডের। তবু ইংরেজী ভাষা-ভাষীর নিকট 'ষ্টাডি অফ্ হিষ্ট্রি' যে সম্মান ও সমাদর পাইয়াছে, তাহাতে তাহাকে, 'বৃহৎ বঙ্গ' যেমন বাঙালীর, তেমনি ইংরেজ জাতির ঐতিহাসিক চিন্তার প্রতীক বলিয়া গণ্য করিলে অত্যাঘ হইবে না।

তবু এ-দুয়ের মধ্যে পার্থক্য কত! এবং পুস্তক দুইটিকে ইতিহাস হিসাবে বিচার করিতে হইলে এই পার্থক্যের গুরুত্ব কত! সভ্যতার

উপান-পতন, বিস্তার ও সংঘর্ষের মূল স্বভাব খুঁজিতে গিয়া প্রফেসর টয়েনবী প্রথমেই বৃত্তিতে পারিয়াছেন, অহুসঙ্কান কোন একটি জাতিবিশেষের জীবনকাহিনীতে আবদ্ধ রাখিলে এই নিয়ম আবিস্কৃত হইবার নয়, ক্ষেত্রকে আরও প্রসারিত করিতে হইবে। কারণ, কি রাজনীতিতে, কি ধর্মে সাহিত্যে ও আর্টে, কি শিল্পে ব্যবসা-বাণিজ্যে ও আর্থিক ব্যাপারে কোন জাতিই স্বয়ংপূর্ণ নয়, হইতে পারেও না; পৃথিবীর প্রত্যেকটি জাতির কার্যকলাপ একটা বৃহত্তর সমাজের কার্যকলাপের অংশ মাত্র, একটা বৃহত্তর ইতিহাসের পরিচ্ছেদ; স্তূতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত সেই বৃহত্তর সমাজের পরিধি ও সীমা আবিস্কৃত না হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত শুধু বিশেষ একটি জাতির কার্যকলাপের মধ্যে ইতিহাসের ধারা দেখিবার চেষ্টা অন্ধের হস্তীর ন্যায় মাত্র।

ইংলণ্ডের দৃষ্টান্ত দিয়াই প্রফেসর টয়েনবী এই কথাটা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইংলণ্ড দ্বীপ বলিয়া ইউরোপীয় মহাদেশ হইতে ভৌগোলিক সংস্থানে বিচ্ছিন্ন; রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ঐতিহাসিক যুগের প্রারম্ভ হইতেই অল্পবিস্তর স্বতন্ত্র; বর্তমানেও একটি প্রবল, স্বরাষ্ট্র ও স্বাধীন রাষ্ট্রীয় শক্তি। এই ইংলণ্ডের ইতিহাসও সমগ্র ইউরোপের ইতিহাস হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলে অবোধ্য হইয়া দাঁড়ায়। ইহার প্রমাণ ইংলণ্ডের গৃহযুদ্ধ গ্রহণ, 'কিউন্ডাল সিস্টেম', 'রিনেসেন্স', 'রিফর্মেশন', ঔপনিবেশিক বিস্তার, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রবর্তন ও 'ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশনের' ইতিহাস স্বতন্ত্র ভাবে আলোচনা করিবার চেষ্টা করিলেই পাওয়া যাইবে।

এই জ্ঞান প্রফেসর টয়েনবী তাহার আলোচনাতে জাতীয় জীবনের গভীর মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া মানবজাতির বৃহত্তর সমাজগুলিকে আবিস্কার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন, বর্তমান যুগের

ঐতিহাসিক গবেষণায় এক দিকে যেমন 'ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশনের' প্রভাব প্রতীয়মান, আর দিকে তেমনি জাতীয়তাবাদের ছাপও স্পষ্ট। আজকাল,—শুধু আজকাল কেন, গত চার পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া ইউরোপের প্রত্যেকটি জাতি কি রাষ্ট্রে, কি সংস্কৃতিতে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা দাবী করিয়া আসিতেছে এবং উহার ফলে অনেকটা স্বাভাব্য লাভও করিয়াছে। এই জাতীয় স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা কেবলমাত্র কার্যক্ষেত্রেই আবদ্ধ থাকে নাই, চিন্তা-জগতেও বিস্তার লাভ করিয়াছে। ইহারই প্রভাবে ইউরোপের ঐতিহাসিকরা স্রোতে গা ঢালিয়া জাতীয় ইতিহাসকেই ইতিহাস রচনার একমাত্র রূপ বলিয়া মানিয়া লইতেছেন, ইউরোপের স্বাভাবিক ঐক্যের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন।

শুধু ইহাই যদি হইত তাহা হইলেও কোন কথা ছিল না। কারণ, বর্তমান কালে জার্মেনী, ফ্রান্স, ইটালী, ইংলণ্ড প্রভৃতি যে ইউরোপের এক-একটি বিশিষ্ট অংশ তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাহা ছাড়া, সমগ্র ইউরোপের ইতিহাস আলোচনা করিবার মত জ্ঞান ও সময় সকলের না-ও থাকিতে পারে। কিন্তু ইউরোপীয় ইতিহাসের জাতীয় বিভাগ শুধু বর্তমান কালের আলোচনাতেই আর আবদ্ধ থাকিতেছে না, ইউরোপের যে-যুগে বর্তমান জাতিভেদ-জাতিভেদে বিচ্ছিন্নতা ছিল না সে-যুগেও আরোপিত হইতেছে, অর্থাৎ যে-সময়ে ফ্রান্স বা জার্মেনীকে বা ইতালীকে কোন ক্রমেই পরস্পরবিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিবার উপায় ছিল না, জাতীয়তাবাদের মোহে সেই যুগেও তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করা হইতেছে।

এই অন্ধ আবেগ যে কতদূর যাইতে পারে, অধ্যাপক টয়েনবী তাহার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ দিয়াছেন। মসিয় কামিই জুলিয়া বর্তমান কালের এক জন লক্ষপ্রতিষ্ঠ করাঙ্গী ঐতিহাসিক। তাহার

পাণ্ডিত্য, গবেষণা ও স্বস্থ বিশ্লেষণ শক্তি সর্জনস্বীকৃত। তিনি ফ্রান্সের জীবন-প্রভাতের যে ইতিহাস লিখিয়াছেন, তাহাতে এই কথাটাই প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন, ফ্রান্স আজ যেরূপ স্বতন্ত্র, আবহমান কাল হইতেই এরূপ স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট ছিল। যত হৃদয় অতীতের কথাই তিনি বলুন না কেন, ফ্রান্স যে ফ্রান্সই, অথচ কোন দেশ, জাতি, সমাজ বা সভ্যতার অংশ নয় এই বিশ্বাস তাঁহার কল্পনা ও বিচারকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। এই ভাবে এক যুগ হইতে আর এক যুগে পিছাইয়া বাইতে বাইতে প্রস্তুত যুগেও তিনি ফ্রান্সের প্রকৃতিদত্ত স্বাভাবিক আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন। সে-যুগে ফ্রান্স বলিয়া কোন একটা বিশিষ্ট জিনিষের অস্তিত্ব কল্পনা করা সম্ভব কি-না সে প্রশ্ন এক নিমেষের জ্ঞানও তাঁহার মনে জাগে না, কারণ যে-যুগের কথাই তিনি বলুন না কেন, এ-কথাটা তাঁহার পক্ষে বিশ্বত হওয়া সম্ভব নয় যে তিনি আজিকার ফ্রান্সের সম্ভান—মহাযুদ্ধে যাহারা অকাতরে প্রাণবিসর্জন দিয়া বলিয়াছিল—*‘ils ne passeront pas’*, বিদেশীকে সীমান্ত অতিক্রম করিয়া আসিতে দিব না।

৩

প্রফেসর টয়েনবী যে-পথ ছাড়িয়াছেন, দীনেশবাবু তাহাই ধরিয়াছেন। স্বপ্রাচীন কাল হইতে বাংলাদেশ ও বাঙালীকে সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেবিবার উপায় আছে কি-না, এ-প্রশ্ন তাঁহার মনে একবারও জাগে নাই। তিনি সম্প্রতিভাষায় স্বীকার করিয়াছেন, “আমি বাংলা দেশ অপেক্ষা পূণ্যার্থী জানি না, বাংলা ভাষা বাহা আমি মাতার নিকট শিখিয়াছি, বাহাতে আমার

স্বীপুত্রকল্পা কথা বলিয়া আমার শ্রবণে অমৃত ঢালিয়া দিতেছেন, সেই ভাষার মত এমন হৃদয় ও হৃদ্রাঘ্য আর কোন ভাষা আমি জানি না; আমার কর্ণে কোকিল-পাখিয়া-কণ্ঠে এরূপ কলতান নাই। বাংলা সাহিত্যের মত এমন ভাব ও কবিত্বের ধনি আমি কোথাও পাই নাই। আমি বিশ্বপ্রেমিক নহি, আমি একান্তভাবে প্রাদেশিক; তাহাতে কেহ যদি মনে করেন, আমি যুগোপযোগী নহি,—আমি ক্রমবৃদ্ধিযু অগ্রগতিশীল সভ্যতার পশ্চাৎ-ভাগে কৃপমত্বক হইয়া পড়িয়া আছি,—তবে সেই অভিযোগের আমি প্রতিবাদ করিব না, আমি তাহাই। আমার একমাত্র গর্স আমি মায়ের ছেলে—তাঁহার হাতের দানতুর্পা ও আশিসের অপেক্ষা আমার কাছে বড় কিছুই নাই।” কিন্তু দীনেশবাবু একটি ভুল করিতেছেন। তিনি বাংলা দেশকে ভালবাসিবেন ইহাতে কাহারও আপত্তি হইতে পারে না। সকলেই নিজের জিনিষকে আদরপূর্ণ ও অপরের জিনিষকে তুচ্ছ বলিয়া মনে করে। যে-পাখিয়ার কলতানে আমরা মুগ্ধ, ইংরেজের নিকট তাহার গান এত অসহ্য যে, সে তাহার নাম দিয়াছে ‘ব্রেন-ফিভার বার্ড’। স্বতরাং বাংলা ভাষাই পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা হৃদ্রাঘ্য ভাষা কি-না, অথবা বাংলার দানতুর্পাই জগতের সর্বাপেক্ষা কাম্য বস্তু কি-না, প্রশ্ন তাহা নয়। প্রশ্ন—বর্তমানে বাংলা দেশ বলিয়া ধ্যাত যে ভূখণ্ড তাহার অতীতকে আরদীতে পরিণত করিয়া উহাতে নিজেরই মুখের প্রতিবিম্ব দেখিবার অধিকার আমাদের আছে কি-না। দীনেশবাবুর মনে আপাতত অবশ্য এ-বিষয়ে কোন সংশয় নাই, কিন্তু আজ যদি তাঁহার স্বীপুত্রকল্পা হঠাৎ শ্রীশ্রীকৃষ্ণকীর্তন অথবা বৌদ্ধ গান ও দোহার ভাষায় কথা বলিতে আরম্ভ করেন তবে হয়ত তিনি স্বীকার করিবেন, তিনি যে বাংলা দেশকে ভালবাসেন তাহা অনাদি ও অনন্ত নয়।

বাংলা দেশের অতীতকে বাংলা দেশের বর্তমানের ছাচে ঢালিয়া দীনেশবাবু কোন মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন, এ-কথা বলা অস্বাভাবিক হইবে, কারণ এ-ব্যাপারটি আমাদের বহুদিনের পরিচিত। ১৯০৫—১৯০৭ সনের স্বদেশী আন্দোলনের স্বরূপ বুঝাইতে গিয়া প্রায় কুড়ি বৎসর আগে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ বলিয়াছিলেন এই আন্দোলনে আমরা ‘বাংলার যে জীবন্ত প্রাণ, তাহার সাক্ষ্য পাইয়াছি। বাংলার প্রাণে প্রাণে আবহমান যে সভ্যতা ও সাধনার শ্রোত, তাহাতে অবগাহন করিয়াছি। বাংলার যে ইতিহাসের দ্বারা তাহাকে কতকটা বুঝিতে পারিয়াছি। বৌদ্ধের বুদ্ধ, শৈবের শক্তি, শাক্তের শক্তি, বৈষ্ণবের ভক্তি, সবই যেন চক্ষুর সম্মুখে প্রতিভাত হইল। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতির গান মনে পড়িল। মহাপ্রভুর জীবন-গৌরব আমাদের প্রাণের গৌরব বাড়িয়া দিল। জ্ঞানদাসের গান, গোবিন্দদাসের গান, লোচনদাসের গান, সবই যেন একসঙ্গে সাড়া দিয়া উঠিল। কবিওয়ালাদের গানের ধ্বনি প্রাণে বাজিতে লাগিল। রামপ্রসাদের সাধনসঙ্গীতে আমরা মজিয়া।’ দেশবন্ধুর আবেগময় দেশপ্রেম বাঙালীর সমগ্র ইতিহাসকে যেমন স্বদেশী-আন্দোলনের উৎস বলিয়া দেখিতে পাইয়াছিল, বর্তমান যুগের প্রাদেশিক-স্বাভাববাদী বাঙালীও তেমনই বাংলার অতীতকে ভারীযুগের ‘প্রভিন্সিয়াল অটোনমি’-ভোগী বাংলা দেশের মত পঙ্কাজী, খোষ্টা, মাড়োয়ারী, মাস্তাজী, বিহারী সম্পর্কবর্জিত দেখিতে চান। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই, এই মনোভাব একান্তই একদেশদর্শী। বাঙালীর বৈশিষ্ট্য অত্বে কেহ কলঙ্কিত করিয়াছে এ-কথা স্বীকার করিতে আমাদের বাধিলেও, চীন, জাপান,

তিব্বত, হুয়াজা, জাভা, বলি, সিংহল, শ্যাম, কাষোজে বাঙালী অন্যের বৈশিষ্ট্য নষ্ট করিয়াছে, এই দাবী করিতে আমাদের কিছু মাত্র সন্দেহ হয় না।

এই বিষয়টি একটু প্রাণধান করিয়া দেখিলেই বোঝা যাইবে, আমাদের ঐতিহাসিক আলোচনা আমাদের বর্তমানের আশা-আকাঙ্ক্ষার দ্বারা কতটুকু আচ্ছন্ন হইয়া আছে। আজ আমরা ভারতবর্ষকে কতকগুলি প্রাদেশিক জাতি ও সংস্কৃতির সমষ্টি বা ‘কেম্বারশ্যন’ রূপে দেখিতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছি। কিন্তু ইতিহাসে তাহার কোন সাক্ষ্য নাই। ভারতবর্ষের স্থাপত্য, চিত্রকলায়, সাহিত্যে, ধর্মসাধনায়, ব্রিটিশ আধিপত্যের পূর্বে বহু বৈষম্য ছিল বটে, কিন্তু উহাতে প্রাদেশিকতার কোন অস্তিত্ব ছিল না। এমন কি যে-বাংলা-দেশ ভৌগোলিক সংস্থানের জন্য উত্তরাপথের কেন্দ্রীয় সভ্যতা হইতে বরাবরই একটু দূরে ছিল এবং রাষ্ট্রীয় ব্যাপারেও বহু শত বৎসর বিচ্ছিন্ন ছিল, সেখানেও বাঙালীত্ববাদ বা বিশিষ্ট একটা বাঙালী সভ্যতা স্থির চেষ্টা হয় নাই।

এই কথাটা একটি উদাহরণ দিয়া স্পষ্ট করিবার চেষ্টা করিব। ১৩৩৫ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া আকবরের বাংলা জয়ের পূর্বে পর্যন্ত বাংলা দেশের একটা নিরক্ষর স্বাতন্ত্র্যের যুগ। এই যুগেও বাঙালী যে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের সহিত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিতে চায় নাই চৈতন্যের জীবনই তাহার অন্যতম প্রমাণ। এখন আমরা মধ্যযুগের বাঙালী-জীবনকে বাংলা দেশের খুব একটা নিজস্ব জিনিষ বলিয়া দাবী করিতে আরম্ভ করিয়াছি, কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে তাহার সহিত ভারতবর্ষের অস্বাভাবিক প্রদেশের তৎকালীন সংস্কৃতির কোন মূলগত পার্থক্য পাওয়া যাইবে না। যাহারা

খড়ের ঘরে, ছেঁড়া কাপড়, ও চিত্রিত হাড়িরুড়িতে বাংলা দেশের প্রাণধর্মের সন্ধান পান, তাঁহারা সে-যুগের সংস্কৃতির মূল সূত্রটিই ভুলিয়া গিয়াছেন বলিলে অশ্রদ্ধা হইবে কি? মুসলমান যুগে হিন্দুর সামাজিক ইতিহাস আলোচনা করিতে গিয়া একথাটা বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, তখন ভারতবর্ষের জনসমষ্টি কোন নূতন সভ্যতার সৃষ্টি করিতে পারে নাই, এই কয় শত বৎসর ধরিয়া তাঁহারা কেবলমাত্র কি ভাষায়, কি ধর্মে, কি সাহিত্য ও আর্টে, কি আচার-ব্যবহারে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার একটা অপভ্রংশ সৃষ্টি করিবার চেষ্টা লইয়া ব্যাপৃত ছিল। উহার ফলে আমরা বাহা পাইয়াছিলাম, তাহা হিন্দু সভ্যতার একটা 'তদ্ভব' রূপ মাত্র; এই গ্রাম্য সংস্কৃতির মধ্যে বৈচিত্র্য যতই থাকুক না কেন, উহা কোন প্রাদেশিক সভ্যতার ভিত্তি হইয়া দাঁড়ায় নাই।

কিন্তু ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠা হইবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চিন্তা অঙ্গ খাতে বহিতে আরম্ভ করিল। জাতিগত স্বাতন্ত্র্যে আস্থা ইউরোপের রাষ্ট্রীয় চিন্তার একটা বিশেষ ধর্ম। উহার বশে মধ্যযুগের একাকামী ইউরোপ বর্তমান কালের পরস্পরসংগ্রামশীল জাতি-সমষ্টিতে পরিণত হইয়াছে। আমরাও ইংরেজী শিক্ষা লাভের ফলে জাতীয়তাবাদ গ্রহণ করিয়াছি, এবং জাতীয়তাবাদের প্রভাবে ভারত-বর্ষকে ইউরোপের সহিত তুলনা করিয়া প্রদেশগুলিকে জাতি-ক্রান্ত বা ইটালীর সমধর্মী জ্ঞান করিতেছি। বাংলা দেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রথম প্রবর্তিত হওয়ায় ইউরোপের রাষ্ট্রীয় চিন্তা বাঙালীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী প্রসার লাভ করিয়াছে এবং শুধু রাজনৈতিক ব্যাপারেই নয়, ঐতিহাসিক আলোচনাতেও ছায়া বিস্তার করিতেছে। তাই, জাতীয় স্বাতন্ত্র্যে আস্থাবান করানী ঐতিহাসিক যেমন প্রস্তরযুগেও

ফ্রান্সের অবিদ্যমান আশ্রয় সন্ধান পাইয়াছেন, আমরাও তেমনই স্বপ্রাচীন কাল হইতে বাঙালীর বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করিতেছি।

৫

দীনেশবাবু বাংলা দেশেরই ইতিহাস লিখিতে বসিয়াছেন। এই ইতিহাস (অন্ততঃ একটি নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বে) স্বতন্ত্র করিয়া লিখিবার উপায় নাই বলিলে অশ্রদ্ধা শোনা যাবে। কিন্তু উহার অপেক্ষাও অল্পতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাঁহার রচিত 'বুহং বদে' বাংলা দেশের রূপ। এ কোন বাংলা দেশ? আমাদের জীবিত কালে আমরা তিনটি বাংলা দেশ দেখিলাম,—(১) লেপ্টেনেন্ট-গভর্নর শাসিত বিহার-উড়িষ্যা সম্বলিত প্রদেশ; (২) কার্জন কর্তৃক বিভক্ত 'দ্বি-বঙ্গ' (উহার একটিতে বিহার উড়িষ্যা ও অপরটিতে আসাম অন্তর্ভুক্ত ছিল); ও (৩) লর্ড হাডিং কর্তৃক সৃষ্ট বর্তমান বাংলা। ইহা ছাড়া 'বেঙ্গল আর্মি'-র একটি বাংলা ছিল; ও এই চারটি 'রাজনৈতিক' বাংলা ছাড়া আর একটি বাংলা দেশ তখনও ছিল, এখনও আছে,—উহা বাংলাভাষাভাষী বাঙালীর বাংলা; তাঁহার সবটুকু এখনও বর্তমান বাংলা উপরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। বাংলা দেশের ইতিহাস লিখিতে গিয়া ইহাদের কোনটিকে অবলম্বন করিব? বহুমুখ্যে অবশ্য তাঁহার যুগের ইংরেজসৃষ্ট বাংলাকে অবলম্বন করিয়া সপ্ত কোটি কণ্ঠের কলকল করাল মিনাদের কথা গাহিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথও লিখিয়াছেন, 'সাত কোটি সন্তানের, যে মুক্ত জননী, রেখেছ বাঙালী করে', মাধব কর নি।' —ইহাদের কেহই বাংলাভাষাভাষী একটি ৩৪ লক্ষ ৬৮ হাজার ৪শত ৬২ জন

বাঙালীর কথা মনে রাখা প্রয়োজনও জ্ঞান করেন নাই। কিন্তু দীনেশ-বাবুর কল্পনা দেশে-কালে আরও স্বদূরপ্রসারিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তিনি কেবলমাত্র বাংলা দেশে বিখ্যাত দেখিয়াই তৃপ্ত হন নাই, বিশ্বের বাংলারূপ দেখিয়াছেন। তাঁহার বাংলাদেশে মহেশ্বে-দড়ো আছে, কুম্ভ আছে, রামায়ণ আছে, বৃদ্ধ আছে, মহাবীর আছে, চন্দ্রগুপ্ত চাণক্য অশোক আছে, পুণ্যমিত্র আছে, গুপ্ত সম্রাটরা আছে, অজ্ঞান আছে, গোপাল ধর্মপাল দেবপাল রামপাল তা আছে, এমন কি পার্শ্বত জিপুবা, কোচবিহার ও প্রাগজ্যোতিষপুরও আছে। কিন্তু যদি কোন যুক্তপ্রদেশ বা বিহার বাসী বিমূঢ় ঐতিহাসিক বৃদ্ধ বা সমুদ্রগুপ্তকে শুধু ঐ অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া বিহার ও আগ্রা-অযোধ্যার ইতিহাসের মধ্যে টানিয়া লয় তবে আমাদের নিকট উহা বিসদৃশ ঠেকিবে বই কি!

৬

কিন্তু ইহার চেয়েও বড় একটা কথা আছে। মাছ ভলে বাস করে; স্থলে তুলিবা মাত্র সে যদি মরিয়া যায় তাহা হইলে আমরা তাহাকে দোষ দিই না। আমরা বায়ুগুণে বাস করি, বায়ু ভিন্ন আমাদের বাঁচিবার উপায় নাই; ইহাও নিন্দার বিষয় নয়। কিন্তু যে-যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই যুগের আবেষ্টনী ভিন্ন অল্প কোন আবেষ্টনীতে নিঃশ্বাস ফেলিতে যদি ঐতিহাসিকের কষ্ট বোধ হয়, তাহা হইলে তাঁহার ঐতিহাসিক হইবার কোনও অধিকার নাই, কারণ নিয়ত-পরিবর্তনশীল মনুষ্য সমাজের বিশিষ্ট কালধর্ম আবিষ্কার করাই তাঁহার কাজ।

বাঙালীর ইতিহাস ও জীবনী রচনা এই অক্ষমতার পরিচয়

প্রতিনিয়তই পাইতেছি। বাংলা দেশের সকল দেবদেবীর মুখই যেমন কুমারের একটি ছাচেই ঢালা হয়, সকল মহাপুরুষের চরিত্রও তেমনই একই ছাচে ঢালা হইয়া দেশকালের সহিত সম্বন্ধবিবজ্জিত দেবমুষ্টি হইয়া পাড়ায়। রামমোহন আমাদের নিকট শ্বশি, কেশবচন্দ্র আমাদের নিকট শ্বশি, বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের নিকট শ্বশি, বিবেকানন্দ আমাদের নিকট শ্বশি, রবীন্দ্রনাথ আমাদের নিকট শ্বশি। উহারা যে-কালে এবং যে-পরিবেষ্টনীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাও এই ধরণেরই বিশিষ্টতাবজ্জিত দেবমুষ্টির পাদদীর্ঘ। ঠিক এই নিয়মের অহুর্বর্তন করিয়াই বাঙালীর ছেলে ইতিহাস পড়িবার সময়ে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত সকল সংগ্রামেরই যে-রূপ দেখে তাহা তাহার চিরপরিচিত যাত্রার যুদ্ধের।

অল্প বাঙালী লেখক ও ঐতিহাসিকরা যাহা শোভনতার আত্ম রক্ষা করিয়া করিবেন, দীনেশবাবু তাহা ভাবাবেগে উদ্বেল হইয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে করিতে করিবেন ইহা খুবই স্বাভাবিক। তিনি যে-যুগেই বাঙালীকে দেখুন না কেন, যে-কাঁখেই তাহাকে নিরত দেখুন না কেন, তাহার নিকট বাঙালীর প্রতিটি অঙ্গ-সঞ্চালন 'ভূমা'র সন্ধান। তিনি বলেন, "কি সাহিত্যে, কি শিল্পে, কি ধর্মে, বাঙালী যে পথে চলিয়াছে, সেই পথেই তাহার লক্ষ্য ভূমা।" "প্রত্যেক ক্ষুদ্র বিষয়ে বাঙালী অসীমকে লক্ষ্য করিয়াছে। সেই অসীম মহান হইতেও মহান এবং অণু হইতেও অণু—মহতোহপি মহীয়ান অণোরপি অণীয়ান!" যথা—

"রাজ্যের অতিবিশালায় অলসদের পরীক্ষা। তিনি অলসদিগকে ভরণপোষণ করিবেন—এই ঘোষণা করিয়াছিলেন। শত শত অলস ব্যক্তি আসিয়া অতিবিশালা ভর্তি করিয়া ফেলিল। পরীক্ষার দিনে

মধ্যরাত্রে রাজা গৃহে আগুন ধরাইয়া দিলেন, অভিধারা যে যে পথ পাইল—পলাইয়া গেল, মাত্র রহিল তিন জন। এই তিন জন প্রকৃত অলস বান্ধি প্রজ্বলিত অগ্নিতে পুড়িয়া মরিতে উদ্যত হইল, তবু নিজে কে বাচাইবার চেষ্টামাত্র করিল না। এক জন আগুন দেখিয়া বলিয়া উঠিল ‘কত রবি জলে?’ দ্বিতীয় বান্ধি আরও অলস, সে বলিল ‘কে বা আঁখি মেলে?’ চোখ চাওয়াও তাহার নিকট শ্রমসাধ্য; তৃতীয় বান্ধি বাক্যব্যয় করিতেও প্রস্তুত নহে—সে অতি সংক্ষেপে বলিল ‘ফি শো’ (ফিরিয়া শোও)। এই সকল ভুল্‌ল গল্পের দ্বারা বুঝা যায়, বুদ্ধি ও অহুত্বকে হুম্মাতিহুম্ম ও অতিপ্রথর করিবার যে তপস্বী, তাহাতে বাঙালী সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল।” (বৃহৎ বঙ্গ, ভূমিকা, ১/০ পৃ.)।

সুধু কি এই? দীনেশবাবু বলেন, “বাঙালীর ভাব-প্রবণতা সম্বন্ধে বেশী লেখা বাহুল্য। এখনও হয়ত এক্ষণে দুই একটি বৈষ্ণব পাওয়া যাইতে পারে, যিনি গঙ্গাতীরে বসিয়া গঙ্গামুক্তিকা-দর্শনে কাঁদিয়া অধীর হন, যেহেতু সেই মুক্তিকায় যে খোল তৈয়ার হয়,—সেই খোল সংকীর্ণনের সময় বাজিয়া কৃষ্ণনামের মাহাত্ম্য জ্ঞাপন করে। ‘ক দেখি কাদ হে বাপু কিসের কারণ?’ বাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, তিনি বাঙালী প্রহ্লাদ।” (ভূমিকা, ১৮ পৃ.)

এই ‘ভূমা’র অধেষণ ছাড়া অজ্ঞাত বহু বিষয়েও বাঙালীর অসামান্যতার পরিচয় দীনেশবাবু দিয়াছেন। সেগুলি এই—

(১) বাঙালীর দেহশ্রী; (২) বাঙালীর বীরত্ব; (৩) বাঙালীর প্রভুভক্তি; (৪) বাঙালীর ত্যাগ; (৫) বাঙালীর সুকুমার মনোরত্তি; (৬) বাঙালী রমণীর একনিষ্ঠ সতীত্ব; (৭) বাঙালীর মনস্বিতা; (৮) বাঙালীর ঐশ্বর্য—“সেদিন পর্য্যন্তও” জগৎ শেঠেরা

[অবশ্য বাঙালী] জগতের মধ্যে সর্বাধিক ধনী ছিলেন, ঐতিহাসিকেরা স্বীকার করিয়াছেন। জড়জগতের ঐশ্বর্য বাঙালী প্রমত্ত হইয়া ভোগ করে, এবং যখন সময় উপস্থিত হয় [অর্থাৎ মৃত্যুর পর] তখন অপ্রমত্ত হইয়া তপের দ্বারা তাহা ত্যাগ করিতে পারে; বাঙালী ষটিকাযন্ত্রের দোলন-দণ্ডের দ্বারা দুই বিরুদ্ধ সীমার মধ্যে অতি সহজে আনাগোনা করে। বাঙালী চরিত্রের ইহাই বিশেষত্ব। আজ চিত্তরঞ্জন বিলাসী বাবু, ভোগে আকর্ষিত, কাল চিত্তরঞ্জন বিলাসী ফকির। নিজের বাস গৃহখানি পর্য্যন্ত দান করিয়া ফেলিয়াছেন!” (ভূমিকা, ১৯/০ পৃ.)

বাঙালীর এত কীত্তির মধ্যে দীনেশবাবু শুধু একটি কীত্তির উল্লেখ করেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন, বাঙালী যখন হুম্ম কাজ করে তখন সে বোনে একেবারে মুসলিম ও যখন হুম্ম চিন্তা করে তখন সৃষ্টি করে নবাবাড়া। তাহার এই তালিকা সম্পূর্ণ করিবার জন্ম বলা আবশ্যক বাঙালী যখন ইতিহাস রচনা করে তখন সে লেখে ‘বৃহৎ বঙ্গ’।

তবু, ইতিহাস না হইলেও ‘বৃহৎ বঙ্গ’ রচনা সার্থক হইবে মনে করিবার হেতু আছে। আমরা যখন করণ রসে আত্মপ্ত হইয়া কাঁদিতে থাকি তখন নিজেদের মুখশ্রী বড়ই মধুর, বড়ই হৃদয়স্পর্শী বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সেই সময়ে যদি কেহ আমাদের সম্মুখে একখানি আরসী আনিয়া ধরে তবে মুহূর্তের মধ্যে সে মোহ কাটিয়া যায়। বাঙালীর কীত্তি ও অতীতের কথা স্মরণ করিয়া আমরা বহুকাল ধরিয়া কাঁদিয়া আসিতেছি, আজ ‘বৃহৎ বঙ্গ’-মুকুরে সেই রোরুদ্যমান মুখের প্রতিবিম্ব দেখিয়া হয়ত হঠাৎ হাসিয়া ফেলিব!

চন্দ্র-চকোরম্

চাঁদেবে ডাকিয়া কহিল চকোর,

“আর কত কাল দূরেতে রবে,

কত পূর্ণিমা আসিল ও গেল,

স্বপ্ন কবে গো সফল হবে ?

সুদূর ধরার ক্ষুদ্র বিহগী

কেন তার মনে দিয়েছ হানা ?

উড়ে যেতে চাই কিছু দূর গিয়া

ক্লান্ত হইয়া পড়ে যে ডানা।

জ্যোৎস্না-সাগরে যাই যে ডুবিয়া

আলোক পাখারে হারাই দিশা,

আর কত দূরে আছ ওগো তুমি

আর কত কাল বহিব তুয়া ?”

চকোরে থামায়ে কহিল চন্দ্র,

“বকর বকর কোরো না মিছে,

এক আধটি নয়, সাতাশ পত্নী

অহরহ আছে আমার পিছে !”

মুচকি হাসিয়া কহিল চকোর,

“একটি পত্নী থাকিলে পরে

হয়তো আসিতে সাহস হত না

নানা সংশয়-সরম-ডরে।

সাতাশ পত্নী আছে বলিয়াই

সাহস করিয়া এসেছি আমি ;

আমার গোপন বেদনার কথা

দয়া করে শুধু শোন গো স্বামি !”

হুতরাং শুধু দয়া করিয়াই

চকোরের কথা শুনিল শশী।

তার পর যাহা ঘটিল তা লিখে

বুখা করিব না নষ্ট মসী।

“বনফুল”

শয়ংচন্দ্র করুণা কত না করে বন্ধিমচাঁদে ;

জিমতী কমলে জড়িয়ে ব্যাকুল রোহিনী আজিও কাঁদে।

মনোহরপুরে রাতে ও ঘোষালে গাছে মনোহর নাই,

তারো চেয়ে দাখা, লাগিল সরস ও ঢাকাই পরোটাটাই ?

চৌমা চেনুরেতে বালীগঞ্জের আবাকাশ যে ভরপুর,

কে বড় কে ছোট, কে বলিয়া দিবে, আফিম না খোলাজুড় ?

বাকা হাসি আজও হাসিজে কে যেন কমলকাণ্ঠী টাঙে,

বড় সেই বাণ শুক্বে গোবরে তুলে যে ধরেছে টাঙে।

(পাঠান্তর) ধস্ত ধস্ত সেই কালাচাঁদ ধরা সরা বার রঙে।

ব্যাঙের আধুলি

(একটি ছেলে-ভুলানো গল্প)

নন্দশীলের পোড়ো বাড়ির অন্দরের উঠানে এঁদো কুয়োর ব্যাঙ বাস করে। দশ-বিশ, পাঁচশো, সাতশো, হাজার-দু'হাজার।

শীল বংশের কথা কে না জানে? প্রসিদ্ধ বনেদী বংশ। এখন বংশে বাতি দেবার কেউ নেই; কিন্তু এক সময় তাদের সমৃদ্ধির সীমা ছিল না। ধনে, ঐশ্বর্যে, বিজ্ঞায়, জ্ঞানে, আভিষেকতায় তাদের জুড়ি পাওয়া ভার ছিল। আশ পাশের প্রতিবেশীর বাড়ির কত দুঃস্থ লোক তাদের বাড়িতে এসে কামেমীভাবে গেড়ে বসেছে এবং অবশেষে তাদের গোষ্ঠিতুল্য হয়ে গেছে—তার ইয়ত্তা নেই। এখন তাদের ভেঙে-পড়া পাঁচ-মহলা বাড়ির প্রকাণ্ড খামঙুলো দর্শকের সবিস্ময় আঁকার উদ্বেক করে।

কিন্তু সে রামও নাই, সে অঘোধ্যাও নাই। দোতালার সামনের বড় দালানে, যেখানে কস্তুরী স-পারিষদ বসতেন, সকাল সন্ধ্যা যেখানে শাস্ত্র আলোচনা চলত, কাব্য-চর্চা হত, সঙ্গীতের বৈঠক বসত, নাচের জলসা জমত, এখন সেখানে কানিসে ঝাঁকে ঝাঁকে পায়রার দল বাসা বেঁধেছে। দিনের পর দিন সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি তাদের 'বাক-বাকুমের' আর অন্ত নাই।

আর রাম্মা-মহলের আভিনায় যে প্রকাণ্ড ইদারা ছিল, যার জলে রাম্মা-অন্ন পরিবেশন করে শীলবংশের গৃহলক্ষ্মীরা এক দিন প্রভাত সহস্র জনকে পরিতৃপ্ত করেছেন, এক জন অতিথিকেও বিমুখ করেন নি, যে

ইদারা এখন ভেঙে পড়ে জ্বল গজিয়ে এঁদো পড়ে গিয়েছে, সেই কুয়োর গণ্ডীর মধ্যে মহানন্দে বাস করে ব্যাঙের গোষ্ঠি। কোলা ব্যাঙ, সোনা ব্যাঙ, কুনো ব্যাঙ, কটুকটে ব্যাঙ।

উপরের দালানের কানিসে যে পায়রার দল বাস করে, তারা মাঝে মাঝে ডানা ঝাপটায়; কখন কখন একটু এদিক ওদিক উড়ে আসে। কিন্তু পোড়ো বাড়ির চৌহদ্দির বাইরে বড় একটা যায় না। কচিং ছু একটা বেপরোয়া পায়রা চৌহদ্দির বাইরে ছটকে পড়ে প্রতিবেশীর বাড়ির কানাচে ঘুরে আসে। সেদিন পায়রা মহলে চপল বুক্নির আর সীমা থাকে না। 'বাক-বাকুমের' চোটে পাড়া সরগরম হয়ে উঠে।

আর ঘোর বর্ষায় যেদিন আকাশে ঘনায় মেঘ, অন্ধকার এঁদো কুয়োর আরও অন্ধকার হয়ে উঠে, সেদিন স্বরূপ ব্যাঙের রাজ্যে মহোৎসব। কোলা ব্যাঙ, সোনা ব্যাঙ, কুনো ব্যাঙ, কটুকটে ব্যাঙ মহোৎসবে গুগুগভীর কণ্ঠে নিজেরদের স্বপ্রাচীন গৌরবের-মহিমা কীর্তন করতে স্বরূপ করে দেয়।

এমনি ভাবে শীলের পোড়ো বাড়ির দোতালার দালানের কানিসে ভিমে তা' দিয়ে পায়রার দল, আর রাম্মা-মহলের আভিনায় উঠানের কুয়োর মধ্যে এক চোখ বুজে ব্যাঙের গোষ্ঠি পরম আনন্দে দিন কাটায়।

এর মধ্যে হঠাৎ এক দিন ওলোট পালোট হয়ে যায়।

যহু আর মধুকুে তাদের মা খেলবার জন্মে একটা আধুলি দিয়েছিলেন। খেলবার জন্মে সাধারণত মাঘেরা ছোট ছেলেদের হাতে আধুলি দেন না। তাদের মা আধুলিটা কোন রকমে চালাতে পারেন নি বলেই, হতাশ হয়ে তাদের দিয়ে দিয়েছিলেন। কেন না আধুলিটা ছিল অচল।

তারা সেটি নিয়ে খেলা করতে করতে কুয়ার ধারে কাড়াকাড়ি স্বর করে দিয়েছিল আর সেটি টুপ করে কুয়ার মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। ঠিক কোলা ব্যাণ্ডের সামনে।

ব্যাণ্ড সেটি সমস্তে কুড়িয়ে নিলে।

এর পর থেকে কোলা ব্যাণ্ডের আর গর্বের সীমা নেই। সোজা কথা নয়। একটি আধুলির মালিক সে!

দেখতে দেখতে ব্যাণ্ড মহলে তার ভয়ানক সম্মান আর প্রতিপত্তি হয়ে পড়ল। কারণে অকারণে অল্প ব্যাণ্ডেরা তার কাছে উপদেশ নিতে আসে। অন্ন-প্রাশনে ছেলের নামকরণ থেকে টাইটেল স্বত্বের জটিল মোকদ্দমার পরামর্শ তার কাছেই চায়। কোলা গম্ভীর মুখিতে চোখে মোটা রিমের গগল চড়িয়ে একটু ঘাড় বাকিয়ে আর সকলের প্রতি অতি রূপার দৃষ্টিপাত করে। কারও উপরোধ রক্ষা করে; কারও বা করে না।

কিন্তু ব্যাণ্ডের দল তার চারিদিকে ভিড় করেছে থাকে।

সোনা ব্যাণ্ড এসে বলে—“দাদা, আমার সোনাকপোর দোকানটা চালাতে তোমায় একটু সাহায্য করতে হয়—”

কোলা মুহূর্তে বলে—“আমাকে নিয়েই তোদের যত টানাটানি। তা আচ্ছা, দেখব—”

কুনো ব্যাণ্ড এসে বলে—“বৌয়ের প্রসব হচ্ছে না; তিন দিন থেকে ব্যাথা থাকে। ভারি মুশ্কিল; কি করি দাদা বল তো—”

দাদা মুখ ব্যাঙ্গার করে বলে—“করবি আর কি? তিন কোটা পুনর্ব্যবস্থা—”

কটকটে ব্যাণ্ড এসে বলে—“আমরা একটা ব্যায়াম-সমিতি করেছি। আপনাকে তার প্রেসিডেন্ট হতে হবে—”

কোলা ব্যাণ্ড রেগে বলে—“বা বা, গুণোমি করবার আর জায়গা পাস নি?—”

এমনি করে দিন দিন তার প্রতিপত্তি বেড়ে চলে।

এমন কি যে জগতে তার প্রাধিকার স্বত্বপাত—তার কথাও সবাই ক্রমে ভুলে যেতে থাকে। কারণে অকারণে অল্প সব ব্যাণ্ড তার কাছে ছুটে আসে। তার উপদেশ পেয়ে দগ্ধ হয়। তাকে ট্রাষ্টের সভাপতি করে, ফাণ্ডের কোষাধ্যক্ষ করে; তাকে নিয়ে মাতামাতি করে। কেন করে—সে কথা আর কেউ মনে রাখে না। তার সর্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব স্বত্ব করে কারও মনে কোন সন্দেহ জাগে না। সকলেই তার সামনে দিয়ে যাবার সময় সেলাম করে যায়।

এর মধ্যে হয়েছে কি, এক দিন কয়েকটা ছোকরা ব্যাণ্ড কোলা ব্যাণ্ডের সামনে দিয়ে যাবার সময় সেলাম করে নি। ছেলে-ছোকরার গোয়ার্দু মি আর কি!

কোলা তো অগ্নিশর্মা! “কী এত বড় আশ্পর্দা! আমায় সেলাম করলি নে যে?”

ছেলে-ছোকরার দুর্ধৃদ্ধি! বললে—“কেন? তোমায় সেলাম করতে যাব কেন?”

“কি বলি? কেন? কেন সেলাম করবি? জানিস আমি কে? নিকোঁধ!” কোলা গর্জন করে ওঠে।

ছেলে-ছোকরার জ্যাঠামি। বলে—“জানব না কেন? তুমিও ঠিক আমাদের মতই নিকোঁধ ব্যাণ্ড; কেবল বসে বসে খেয়ে বেশী মোটা হয়ে পড়েছ।”

রাগে চীৎকার করে কোলা ব্যাণ্ড বলে—“দেখবি? দেখবি তবে?—এই দ্যাখ—” বলে আধুলিটি মুখে তুলে ধরে দেখায়।

“জানিস এটা কি ? জানিস এটা দিয়ে কি করতে পারি ?”

একটা ছোকরা ব্যাঙ বলে—“ওটা তো একটা আধুলি ; পুরো একটা টাকাও নয় !—”

আর একটা ছোকরা ব্যাঙ বলে—“ওটা তো ঘষা। মনে হচ্ছে অচল। ওটা দিয়ে আর তুমি কি করতে পার ?—”

“কি করতে পারি ?” কোলা চীৎকার করে বলে। “এখুনি এটাকে নিয়ে গিয়ে সোনাপটতে ভাঙিয়ে টেরিটি বাজারে গিয়ে টুপি কিনতে পারি। কিনে মাথায় পরতে পারি। পারিস তোরা ?”

ছোকরার দল হাসে।

কোলা ব্যাঙ আর দ্বিক্রি না করে, আধুলিটি মুখে করে এক লাফ দেয়। ইচ্ছেটা—তখুনি সোনাপট গিয়ে সেটি ভাঙিয়ে, টেরিটি বাজার থেকে টুপি কিনে এনে মাথায় প’রে এই অর্ধাটীনগুলোকে দেখিয়ে দেয়। কিন্তু কুমোর পাড়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এসে ঠিক আগের জায়গায় পড়ে। ছোকরার দল হেসে ওঠে। তাতেও সে দমে না। কাপড় এঁটে নিয়ে আবার লাফ দেয়। পর মুহূর্তেই আবার ছিটকে ফিরে আসে। কিন্তু তার অধ্যবসায় অসীম। আধুলিটি কামড়ে ধ’রে সে আবার লাফায়।

তা লাফাক। তাতে তোমার আমার কিছু আসে যায় না।

“বায়রন”

“জি. পি” বনাম “পি. পি”

“জি. পি” অর্থাৎ ইংরেজী G. P. — Government Pleader অর্থাৎ দেওয়ানি সরকারী উকিল। আর “পি. পি” অর্থাৎ ইংরেজী P. P. — Public Prosecutor অর্থাৎ ফৌজদারী সরকারী উকিল। অনেক জেলায় কেবল মাত্র “জি. পি” আছেন, “পি. পি” নাই ; “জি. পি”কেই “পি. পি”র কাজ করিতে হয় ; আবার অনেক জেলায় কাজ বেশী বলিয়া দেওয়ানি কাজের জন্য “জি. পি” আর ফৌজদারী কাজের জন্য আলাহিদা “পি. পি”। সম্প্রতি ছ’গুণ পরগনার “জি. পি” ও “পি. পি” রায়বাহাদুর — ও রায়বাহাদুর — উভয়েই পরলোক গমন করিলে তাঁহাদের স্থলে দুই জন ভরদ্বাজ “জি. পি” ও “পি. পি” নিযুক্ত হইলেন। দুই জনেই ভরদ্বাজ—স্বতরাং জ্ঞাতি-শ্রুতি বর্তমান ; দুই জনে লড়াই, কে মানে বড় ? “পি. পি” বলিতেছেন, যে স্বয়ং “মুকুট” (Crown) আমার মজেল, আর “জি. পি”, তোমার মজেল স-কাউন্সিল ভারত সচিব (Secretary of State for India in Council) ; স্বতরাং মাজ হিসাবে আমিই বড়। “জি. পি” উত্তর করিলেন, আমার হাত দিয়া লাখ লাখ টাকার মামলা হয় ; রাজস্বের কোন অংশ এই রাজ্যভুক্ত কিনা তাহাও আমার হাত দিয়া হয়, আর তুমি “পি. পি”, না হয় দুইটা খুনে বা ভাকাতকে ফাঁসি কাঠে লটকাও বা জেলে পাঠাও। “পি. পি” বলিলেন, আমি বিনা ওকালতনামায় হাজির হইতে পারি আর তুমি “জি. পি”, তোমাকে power ফাইল করিতে হয়। “জি. পি” বাধা দিয়া বলিলেন, আমার powerএ কোর্ট ফী ষ্টাম্প দিতে হয় না। “পি. পি”

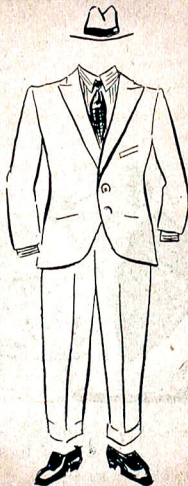
জবাব দিলেন, আমি ইচ্ছা করিলে যে কোন খুঁকে *nolle prosequere* এন্টার করিয়া ছাড়িয়া দিতে পারি; আর তোমাকে এক টাকা ছাড়িতে হইলে জেলার কালেক্টরকে তিনবার লিখিতে হয়। এক্ষেত্রে আমি, “পি. পি”, নিশ্চয়ই তোমার চেয়ে মানে বড়; আর নিভা দেখিতে পাওয়া যায় যে, ফৌজদারি আপীল থাকিলে জিলার জজ সাহেব আগে ফৌজদারি আপীল শুনে; আর তুমি “জি. পি”, তোমার দেওয়ানি আপীল *peremptorily fixed* থাকিলেও চূপ করিয়া বসিয়া থাকিতে হয়। সব কথা শুনিয়া “জি. পি” বলিলেন যে, কলিকালে Civil লোকদের চেয়ে Criminalদের প্রতিপত্তি বেশী। ইহার পর “পি. পি” আর কোন কথা বলিলেন না। বলিলেন, আমার দায়রার ডাক হইয়াছে। পাঠকগণ বিচার করিয়া দেখিবেন, “জি. পি” বড় না “পি. পি” বড়?

শ্রীমদন্ত

যাহারা ভালোবেসে নয়ন জলে ভেসে
ভাসায় সারা দেশে ফিলিম শরদায়,
খেলার মাঠে গিয়ে পড়ে যে আছাড়িয়ে
যায় না ভেঙ্ক নিয়ে শ্রীপাট-খড়দায়।
দীর্ঘ সারারাত সিনেমা দেখে কাত
হয় না, তারা জাত কখনো ছোট নয়।
খেলার মাঠে যারা সমানে থাকে খাড়া
ঘণ্টা সাত ঝড়, তাদের জয় জয়।

চলচ্চিত্র

দি ইন্ডিজিবল ম্যান



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌছিবার পূর্বে ওয়াশেল মোজার দোকানে
ডক্টর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও শরৎচন্দ্র



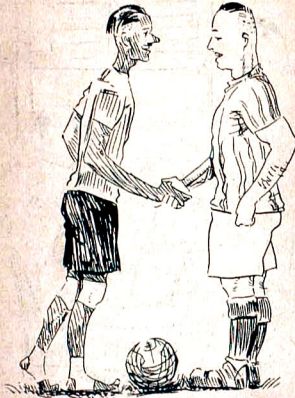
“খাঁচার পাখী ছিল সোনার খাঁচাটিতে
বনের পাখী ছিল বনে,
একদা কি করিয়া মিলন হ’ল দোহে—
কি ছিল বিধাতার মনে।”

১৯৪০ সালে শরৎচন্দ্র



ইসলামিয়া কলেজে

ভারতবর্ষ ও চীন



গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ ।

চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্ত্র ॥

‘ধর্মের ষাঁড়’ বনাম ‘বড়লাটের ষাঁড়’

এ “রমানাথের পুষ্টি এঁড়ে” নয়, সত্যিই একটা গুরুতর এবং গাভীর্ষাপূর্ণ বিষয়। ভারতের মাননীয় বড়লাট বাহাদুর নাকি বুধোৎসবের ব্যবস্থা করিতেছেন। উদ্দেশ্য অবশ্য ভালই হইবে। বিনিয়োগ পরীক্ষার তথ্য ক্রমিক-কুল-কল্যাণ !

মুসলমান আমাদের কথা ইতিহাসের পৃষ্ঠাগত। স্বতরাং সে পুরাতন কাহিনী ঘাটিয়া লাভ নাই। তবু একথা অস্বীকার করা যায় না যে, একালের সঙ্গে সে কালের একটা পার্থক্য ছিল। একালের বাবুরা যেমন মোটা মাহিনার চাকুরি সারিয়া অজীর্ণ অথল সঙ্গে লইয়া পেন্সন গ্রহণ করিতেছেন, এবং কতুবা মধুপুরে, কতুবা বালিগঞ্জে বাড়ি ফাঁদিয়া বসিতেছেন, সেকালে অতটা ছিল না। রাজদরবারে যত প্রতিপত্তিই থাক, সমাজে সম্মানিত হইতে না পারিলে, সামাজিক বলিয়া গণ্য না হইলে লোকে তাহাকে মান্য বলিত না, আর মান্যও মনে তৃপ্তি পাইত না, শাস্তি লাভ করিত না। কাজেই সকলকেই সমাজ মানিয়া চলিতে হইত, সমাজের বিধি-নিষেধ পালন করিতে হইত। লোকে ঘটা করিয়া পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিত, বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা করিত। পিতৃশ্রাদ্ধে বুধোৎসব, পতি-পুত্রবতীর শ্রাদ্ধে চন্দনধেহু অবশ্য করণীয় ছিল। দেব দেউলের প্রতিষ্ঠায় গ্রামের শ্রীবুদ্ধি হইত, অসময়ে অনেকের আহার্য মিলিত। বাস্তবহীন বড় লোক একটা ব্যঙ্গের বিষয় ছিল। গঙ্গাগোবিন্দ, নবকৃষ্ণ পর্য্যন্ত এই ধারার জের দেখিতে পাই।

ইংরেজ আমলে সমাজটাই গেল ছত্রভঙ্গ হইয়া। উন্নতি অনেক হইয়াছে, কিন্তু মানুষের মনে আত্মীয়তার বান্ধনটা শিথিল হইয়া গিয়াছে। দেশাত্মবোধ জাগিয়াছে, দেশভূতৌ ভাইএর অজ্ঞ কানিতে শিথিয়াছি, কিন্তু আপন জনের সঙ্গে আত্মীয়তা-বোধ মরিয়াছে, প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্ভাবে বাস করিতে পারিতেছি না। পয়সাওয়ালা লোকে গ্রাম ছাড়িয়াছে। যাহারা আছে, তাহারা ম্যালেরিয়ায় মোকদ্দমায় মগ্নমগ্ন। যে ছুবেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, তার কে করে বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা, আর কে করে বৃক্ষোৎসর্গ?

বৃক্ষোৎসর্গের বিধি সেদিনেও ছিল। গ্রামে গ্রামে ‘ধর্মের বাঁড়’ দেখিতে পাওয়া যাইত। কিন্তু লোকে উৎপাত সঙ্ঘ করিতে পারিল না। মিউনিসিপ্যালিটির সৃষ্টি হওয়ায় স্ববিধা হইয়া গেল, ধর্মের বাঁড়কে সহরে চালান দেওয়া রেওয়াজ হইয়া পড়াইল। বুধবার সেখানে গিয়া ময়লার পাড়া টানিয়া ফিরিতে লাগিলেন। পাছায় ছাপ-মারা বাঁড়কে হিন্দুর পক্ষে কিছু বলা নিষেধ। হিন্দুর বৃক্ষোৎসর্গের বাঁড়কে ধর্মের বাঁড় বলিত। সে বাঁড় গ্রামের মধ্যে স্বচ্ছন্দে পাইয়া খেলিয়া বেড়াইত। যার তার কদল খাইত, যেখানে সেখানে রাত্রি কাটাইত, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ঘুরিত। আবার অনেক সিবিলিয়ান বাঁড় মারকুটনো হইত, গরু, ছাগল, মাছ যাহাকে পাইত বাছবিচার করিত না, বেজায় গুঁতাইত। তাই লোকে দল বাঁদিয়া বাঁড় তাড়াইত। কিন্তু আমরাই দেখিয়াছি গ্রামের লোক মিলিয়া কোন সাধারণী জায়গায় একটা খোঁয়াড তৈয়ার করিয়া দিয়াছে। ছোট হইতে বাঁড়টিকে কোন “গাছুটে” পালে চরাইয়া বশ করিয়াছে। বাঁড়টি দিবা পোষ মানিয়াছে, আর গ্রামে বেশ উৎকৃষ্ট গোবংশের সৃষ্টি করিতেছে। ক্রমে লোকে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করার অভ্যাস জ্বলিল, দলাদলিতে

মান্তিল, ধর্মের বাঁড়কে তখন উৎপাত বলিয়া মনে হইল। যে রীতি-নীতি সমাজ হইতে প্রায় উঠিয়া গিয়াছে, ধর্মের সঙ্গে বাঁদিয়াও যাহাকে বাঁচাইয়া রাখা গেল না, ঠেঙ্গাইয়া চোখের জলে নাকের জলে বিদায় করিয়া আজ তাহাকে কথার ছলে ফিরান চলিবে কি? বড়লাট এবং তাঁর অচরোধ (?) মত ছোটলাটের দল না হয় বৃক্ষোৎসর্গ করিলেন, দেখাদেখি জেলার হাকিমেরাও অচুঠানের ক্রটি রাখিলেন না, চাই কি লাট বেলাটের নেক নজরের নেশায় খেতাবাদির আশায় দেশীয় বড় লোকের দলও না হয় ছ’একটা বাঁড়ই কিনিয়া ফেলিলেন, কিন্তু ততঃ কিম্? তার পর? আবার তো সেই যা তাই হইবে! শোভা হিসাবে শহরে মিউনিসিপ্যালিটি কি জেলাবোর্ডের তত্ত্বে, কিম্বা কোন বড় লোকের বৈঠকখানায় হয়তো ছ’একটা বাঁড় দিন কয়েকের জঙ্গ ভাল খানাপিনায় হুইপুই হইয়া উঠিবে, তাহাতে লাভ? পল্লীগ্রামের উপায় কি? পল্লীগ্রামে গোবংশ যে নির্বংশ হইয়া গেল। ভাল বাঁড় নাই, ভাল গাই নাই। গ্রাম হইতে গরু বাহির হইবার গোপথ নাই, গরু বাছুরের জঙ্গ চরাট গোচর ভূমি নাই। বড়লাট সব নয়া-নোতুন ঘরকরা পাতাইয়া দিবেন কি? লোকের যদি সেই মতিবীতিই থাকিবে, তবে এমন গতি হইবে কেন? ধর্মের বাঁড়কে তাড়াইবে কেন? নিজেরা মিলিয়া একটা ভাল বাঁড়, কয়েকটা ভাল গাই রাখিতে পারিবে না কেন?

আমাদের ধর্মের অজ্ঞ কোনরূপ গৌড়ামি নাই। হিন্দুর ধর্মে যাহারা ‘গৌড়া’ ‘পাতি’র জাতি নির্ণয় করেন, তাহাদের মতলবের প্রশংসা করিতে পারি না। গৌড়ামি নাই, কিন্তু তাই বলিয়া আচারভ্রষ্টতার বাহাদুরি দেখিতে পারি না। নিষ্ঠাটানতার প্রশংসা দেওয়া উচিত বলিয়া মনে করি না। স্বধর্ম পালনে যদি সমাজের মঙ্গল হয়, নিজের কল্যাণ

হয়, পাড়াপড়ঙ্গী সঙ্গ ঘনিষ্ঠতার বন্ধন হয়, তবে তাহা অপালনের
হেতু কি? বুঝোৎসর্গের পরকালের দিকটা ছাড়িয়া দিলাম, ইহকালের
দিকটায় অন্ধ হইলে চলিবে কেন? বুঝোৎসর্গে একটা ষাঁড়ের সঙ্গে
চারিটা বৎসতরী (বক্কা) দানেরও ব্যবস্থা ছিল। স্বতরাং গ্রামে
একটা বুঝোৎসর্গের অনুষ্ঠান হইলেই অন্তত কিছুদিনের জন্য গোবংশ
বৃদ্ধির জন্য ভাবিতে হইত না। মন্ত্রগুলির মধ্যেও কোনরূপ মন্দ
কথা ছিল না।

বৎসতরী চতুষ্টয় সহ বুঝে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া বুঝ কর্ণে
মন্ত্র পাঠ করিতে হইত—

“ও বুঝোহসি ভগবান্ ধর্মশতপুংসঃ প্রকীর্ষিতঃ।

বুঝোমি হামহং ভক্তা সমাম্ রক্ষতু সর্বদা॥”

তার পরের মন্ত্র হইতেছে—

“হে বৎসতর্যো বো যুয়াকং এনং যুবানং পতিং স্বামিনং দদানি
ত্যাঞ্জামি ত্যক্তং প্রার্থয়ামি তেন বুযেণ প্রিয়েণ সহ ক্রীড়ন্ত্যঃ খেলন্ত্যঃ
স্বভগা লোকেশ প্রিয়াশ্চরণ ত্বানি ভক্ষয়থ ভ্রমথ।

হে বৎসতর্যো যুয়মপি মানঃ নান্মং সত্ত্ববিষয়া ভবিষ্যথ কিন্তু ময়া
ত্যাক্তব্যো বয়ং বুযশ্চ ভবতীনাঞ্চ ত্যাগেন রায়স্পোষণে ধনসমৃদ্ধ্যা
সাপ্ত জহুযা সপ্তজন্ম ব্যাপকেন ইযা অয়েন চ সমাদম জষ্টা ভবেম স্বভগা
লোকেশ প্রিয়াঃ।

এনং যুবানমিত্যশ্চ যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিতুষ্টপুত্ৰনো গাবো দেবতা
বুঝোৎসর্গে বিনিয়োগঃ। ও এনং যুবানং পতিং বো দদানি তেন
ক্রীড়ন্ত্যঃ প্রিয়েণ মা নঃ সাপ্ত জহুযা স্বভগা রায়স্পোষণে সমিযা
মদেম।”

এই মন্ত্র পাঠের পর বুঝোৎসর্গ করিতে হয়। তাহার পৃথক মন্ত্র
আছে। উৎসর্গের পর কয়েকটি মন্ত্র বুঝকে শুনাইতে হয় এবং ‘যথেষ্টং
যুযং পথ্যট’ এই বলিয়া বৎসতরী সহ বুঝকে মুক্ত করিয়া দিতে হয়। এই
সময় ঘোড়হস্তে বুঝের নিকট প্রার্থনা করিতে হয়—

“ও ন খাদে: পর শজ্জানি না ক্রামে গর্ভিনীক গাম্।”

বুঝ অবশ্য সে প্রার্থনা বজায় রাখিয়া চলে না। কিন্তু গ্রামবাসীকে
সমাজকে দেখিতে হয়, দাতার উদ্দেশ্য যেন সার্থকতা লাভ করে, দানে
যেন কাহার উদ্বেগ না ঘটে।

বড়লাট বুঝোৎসর্গ করুন তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু তার
পূর্বে যদি তিনি শ্রীযুক্ত এন. সরকার মহাশয়ের নিকট বুঝোৎসর্গের মন্ত্র
কয়টার অনুবাদ শুনিয়া লইতেন এবং বুঝের সঙ্গে বৎসতরী দানের
ব্যবস্থা করিতেন, আমরা বাধিত হইতাম। বুঝোৎসর্গের ষাঁড়ের
পাছায় চক্র-ত্রিশূল আঁকা থাকে, বড়লাটের ষাঁড়ের কোথায় কোন
চিহ্ন থাকিবে, কোন বিলাতী শিল্পীকে তাহার পরিকল্পনা দাখিল
করিতে বলা হইয়াছে কিনা মাদ্রাজের সত্যমুর্তি ব্যবস্থাপক সভায়
তদ্বিষয়ক একটি প্রশ্ন উত্থাপন করুন। বড়লাটের ষাঁড়ে অশুশীল কারণ
নাই, তবে ঐ সঙ্গে ধর্মের ষাঁড় রক্ষার একটা আপিল করিলে ভাল
হয়।

কিছু দিন হইতে একটা মজা দেখিতেছি, মহাশ্রদ্ধা কংগ্রেসে কোন
স্বামী মঞ্জুর করাইয়া লইলে ভারতীয় বাজেটে তাহারই ভায়ারা-ভাই-
গোছের একটা স্বামী উভূত হইতেছে। কিন্তু এবার ব্যাপারটা
নূতন দেখিলাম। কংগ্রেসে অবশ্য কিন্তু এ পথ্যস্ত বিশেষ করিয়া
বুঝোৎসর্গের কোন কথা আছে কিনা জানা যায় না। যদিও মহাশ্রদ্ধা
গবো তেমন গুরুত্ব আরোপ করেন না, ছাগ-দুগ্ধেই তাহার সম্প্রীতির

আধিক্য, তথাপি এবার একটু উল্টা স্বর গাওনায় কতি কি? বড়-লাটের ঘাড়ের পান্টা জ্বাবে যদি কংগ্রেসের খাঁড় ছাড়িবার ব্যবস্থা হয় তবে বোধ হয় কাজ মন্দ হয় না। পাছে সম্প্রদায়ের দায়ে পড়িতে হয়, তাই কংগ্রেস ধর্মকে বিদায় দিয়াছেন। স্বতরাং ধর্মের খাঁড়ের কথায় মূলমানগণ কোন কথা তুলিলে কংগ্রেস সহসা কিছু করিতে পারিবেন না। তাহাকে তখন বাধা হইয়া না-গ্রহণ না-বর্জন নীতি অবলম্বন করিতে হইবে। এবম্বিধাবস্থায় শ্রীযুক্ত পদমরাজ জৈন মহাশয় হিন্দু মহাসভার নাম লইয়া অগ্রসর হইতে পারেন। হিন্দু-মহাসভা ব্রহ্মোৎসর্গের পুনঃপ্রবর্তন করিতে পারেন কিনা ভাবিয়া দেখুন। বেশী বিলম্ব করা চলিবে না। সম্মুখে আসল সমস্যা ধর্মের খাঁড় বনাম বড়লাটের খাঁড়।

চিঠিতে চিঠিতে করেছি পাগল বিধে.

আরও চিঠি লেখে আমার যতক শিখে—

তাদের চিঠির আকার প্রকার ছন্দ

শব্দ বর্ণ শব্দ হর আর গুণ

আমাকে যাহারা চাহে না তাদের মধ্যে

জাগায় শব্দ, আলা ধরে মন-চক্ষে।

প্রসঙ্গ কথা

১৩ই আগষ্ট তারিখে ষ্টেটসম্যান পত্রিকার স্পেশাল কorespondent-
বার্লিন হইতে এয়ারমেল যোগে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন—

There is the same old story to tell about the Indian athletes and wrestlers at the Olympic Games—failure and more failure. A wonderful country is ours, with a population of over 350 million and some of the finest specimens of manhood in the world. But our great country, with its vast resources, its princely patrons of sport, its wonderful climate, its clean-living manhood, cannot produce a single winner in the greatest of all athletic festivals. Running, walking, swimming, wrestling, boxing, rowing—the manliest of sports and not an Indian to uphold the name of his country!

I can write reams and reams on this subject, but refrain from doing so. One reason is the shame I feel.

কথাটা লজ্জার, সন্দেহ নাই; অথচ ঘরে বসিয়া আমাদের চাঁৎকার ও উল্লসনেরও অন্ত নাই। তারুণ্যের জয়ঢাক সাহিত্য-পত্রিকার পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় বাজিতে দেখি, নারী-প্রগতিতে বাংলাদেশ এবং তাহার পিছনে সমস্ত ভারতবর্ষ, জার্মানি-আমেরিকাকেও ছাড়াইতে বসিয়াছে। ভালমন্দ লিপিতে পারার প্রশ্ন নয়, এক কলম যাহারা লিখিয়া ফেলিয়াছে কলিকাতার একাংশকে প্যারিসের লাতিন কোয়ার্টারে পরিণত করিবার জ্ঞান তাহাদের কি অগ্রহ! তাহাদের মনের গুহমুখ আশা-আকাঙ্ক্ষার কতকগুলি নমুনা এইবারকার সংবাদ সাহিত্যে মিলিবে। ইহার। যে নিজেরাই শুধু বেচাল দেখাইয়া ক্ষান্ত হইতেছে তাহা নহে, ইহাদের পথে যাহারা চলিতেছে না তাহাদিগকে, বস্তাপচা, প্রাচীন, সত্যমশিবে-

হৃন্দরম ইত্যাদি অদ্ভুত অদ্ভুত আখ্যা দিয়া ইহারা নিজেদের গায়ের জালা মিটাইতে ও অপাংক্ষেপতা বিস্তৃত হইতে চাহিতেছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, অপথ্যে মাছঘের, বিশেষ করিয়া পরাম্ভোজী তরুণ সম্প্রদায়ের অধিক রুচি বলিয়া এই কুংসিং আদর্শ প্রতিদিন অতি ক্রুত বিম্বুভিলাস করিতেছে এবং ইতিমধ্যে-অঙ্কভাষ এই জাতির মেরুগণ এমন বাকিয়া যাইতেছে যে মনে হইতেছে, আমরা আর মাথা তুলিয়া কখনও দাঁড়াইতে পারিব না। জীবনের সর্ববিভাগে, সকল দিকে আমাদের লাঞ্ছনা মানি এবং পরাজয়ের মূল আমাদেরিগের সাহিত্যে অচুসদ্ধান করিলে মিলিবে—আসলে একটা দুঃসারোগ্য জাতীয় ব্যাধির এগুলি বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

কিন্তু অতি-আধুনিক তারুণ্য, পত্রিকার পৃষ্ঠায় অকারণ আশ্ফালন ব্যতিরেকে সত্যকার বড়াই করিতে পারে কিসের, মহৎ এবং বৃহৎ জীবনের কোন্ পরিচয় আজ পর্যন্ত সে দিতে পারিয়াছে? যে finest specimens of manhood-এর কথা উপরে বলা হইয়াছে তাহার তো বিগত শতাব্দীর specimen মাত্র; 'জয় উচ্ছ্বলতার' নূতন আদর্শকে জয়যুক্ত করিতে পারে এমন একটি জীবও তো সারা ভারতবর্ষ তোলপাড় করিলে মিলিবে না। স্বভাষ-গ্রহরলালকে বর্তমান আদর্শ সম্বৃত্ত বলিলে চলিবে না; ধ্যানচাঁদ-নাইডু আধুনিক নন—আমরা কি শুধু স্বভো ঠাকুর ও লীলাময় বহুকে লইয়া বড়াই করিব? রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র বাতিল হউন কতি নাই, কিন্তু তাহাদের আসনে বসাইব কি আশু চট্টোপাধ্যায় ও মনোজ বহুকে?

যাহাদের লজ্জা রাগিবার ঠাই নাই তাহারা যখন বড়াই শুরু করে

তখন বৃত্তিতে হয় দেবতার অভিশাপ তাহাদের লাগিয়াছে। আমরা অভিশপ্ত এবং অভিশপ্ত বলিয়াই পরপদলিত পরাম্ভোজী ভিক্ষুক—এইমাত্র আমাদের পরিচয়। সূর্য্যাকে বগলে পুরিয়া সাগর লঙ্ঘন করিতে পারি এই আশ্ফালন এখন আর আমাদের চলিবে না। তাহার প্রমাণ দিতে হইবে। বৎসরে বৎসরে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া এই যে ভারতবর্ষের ছেলেরা বারবার আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অপদস্থ হইয়া ফিরিতেছে, ঘরে বসিয়া রীতিমত প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত তাহারা যেন প্রতিযোগিতা কামনা না করে। যে প্রতিভা তুবড়ির মত হঠাৎ ক্ষণকালের চমক লাগাইয়া দিয়া নিস্তেজ হয় সেই ক্ষণস্থায়ী প্রতিভা মাত্র আমাদের এত দিন সম্বল ছিল বলিয়া আমরা শতায় নাম কিনিয়া মাস্তামাতি করিয়াছি কিন্তু সত্যকার বিজয়মালা জীবনের কোনও বিভাগে আমাদের গলায় আসিয়া পৌঁছে নাই। শুধু তীক্ষ্ণতাই যেমন তরবারি নয়, তীক্ষ্ণতার সঙ্গে পানিকটা শক্ত ইচ্ছাপ্রাপ্ত ও প্রয়োজন, প্রতিভার সঙ্গে তেমনই প্রয়োজন পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের, রীতিমত সাধনার। আধুনিক তারুণ্যের সব চাইতে বড় অভাব এই সাধনার; এই কারণেই ইহা স্থায়িত্ব দাবী করিতে পারিতেছে না।

গত শতাব্দীর যে সকল ভারতীয় মহাপুরুষ পৃথিবীজোড়া সম্মান অর্জন করিয়াছেন তাহাদের জীবনী পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই, আন্তরিক কণ্ঠপ্রেরণা লইয়া তাহারা জীবন শুরু করিয়াছিলেন, পরিশ্রম করিতে কখনও পরাশ্রয় হন নাই। যে রবীন্দ্রনাথ আজিও অতি-আধুনিক তারুণ্যের দেবতা বলিয়া পূজিত হন, যিনি ফুলের ঘায়ে মুচ্ছা যান—এক শ্রেণীর বাঙালীর এইরূপ ধারণা—সেই রবীন্দ্রনাথ এখন পর্যন্ত শুধু অভ্যাসের জোরে যে পরিশ্রম করেন তাহার সহিত পাজা

দিতে পারে এমন একজন তরুণের কথাও তো মনে পড়িতেছে না। বাঙালীর ছেলেকে আজ কে বুঝাওয়া দিবে যে, প্রতিভা ও অধ্যবসায় পরস্পর-বিরোধী নহে; একমাত্র পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ই প্রতিভাকে স্বাধী প্রতিষ্ঠা দিতে পারে। উইলিয়াম কেরী বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার ভ্রাতৃপুত্রকে সন্মোদন করিয়া বলিয়াছিলেন—

"Eustace, if after my removal, anyone should think it worth his while to write my life, I will give you a criterion by which you may judge of its correctness. If he give me credit for being a plodder he will describe me justly. Anything beyond this will be too much. I can plod. I can persevere in any definite pursuit. To this I owe everything."

যে Humiliating Story চেষ্টাস্থানের নিজস্ব সংবাদদাতা বার্লিন হইতে শুনাইয়াছেন তাহা আমাদের শুনিতে হইত না যদি আমরা plod করিতে পারিতাম।

ঐযুক্ত স্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 'ডক্টর' উপাধি-ধারণের ব্যোমতা লইয়া বাতায়নের এক জন পত্রপ্রেমক সন্মুহ প্রকাশ করিয়াছেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় হয়তো ইহা শুনিয়া প্রাণ খুলিয়া খানিকটা হাসিয়াছেন কিন্তু আমরা হাসিতে পারিলাম না। দা'ঠাকুরের দেশ আমাদের, আসর জমাইয়া যে বচন আঙড়াইতে পারে এখানে তাহারই জিৎ; অতি মূর্খের কথারও পাল্টা জবাব এখানে দিতে হয়; দুর্ভাগ্য সন্দেহ নাই, কিন্তু এ দুর্ভাগ্য আমাদেরই বরণ করিতেই হইবে।

উক্ত পত্রপ্রেমক লিখিয়াছেন—

ডক্টর স্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর উপাধিলাভের আশায় একটি 'থিসিস' লেখেন। তার আন্তোষ এই লেখাটির পরীক্ষক হিসেবে ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনকে নিযুক্ত করেন। ডক্টর সেন রচনাটিকে ডক্টরেটের অযোগ্য

বলে মত প্রকাশ করেন। তখন তার আন্তোষ আর একজনকে এই রচনাটি দীনেশবাবুর সহযোগে পরীক্ষা করতে বলেন। তিনিও দীনেশবাবুর মত এর অযোগ্যতার উল্লেখ করেন। তখন তার আন্তোষ রচনাটির অক্ষমতা সম্বন্ধে নিকটে (১) হন এবং স্বনীতিবাবু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট উপাধি লাভের আশা ত্যাগ করেন; এবং পরে এই রচনাটির কিছু অবলম্বন করে বিলেত থেকে ডক্টরেট নিয়ে আসেন। বলা বাহুল্য যে-বিষয়ে স্বনীতিবাবু উপাধিটি পেয়েছেন সে-বিষয়ে ওখানে বোম্বার মত পণ্ডিত হচ্ছেন মিষ্টার থমসনের মত সব প্রাচ্য-ভাষাবীড় (বা) বীর 'চলতি ভাষার' ইংরেজি প্রতিশব্দ দিয়েছেন 'walking language'.

বাতায়ন, ৮ই শ্রাবণ, ১৩৪৩, পৃ: ৪

ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন যদি বান্ধক্য ও জরায় পীড়িত না থাকিতেন তাহা হইলে তিনিই হয়তো সর্বপ্রাণে ইহার প্রতিবাদ করিতেন। এত বড় মিথ্যা ছাপার অক্ষরে বাহির হওয়া এদেশেই সম্ভব, কারণ এখানকার ইতরেরা জানে স্বনীতিবাবুর মত ভদ্রলোকেরা তাহাদের কানে হাত দিতেও দ্বিধা করিবেন।

প্রশংসাপত্র ও পরিচয়ের অপেক্ষা স্বনীতিবাবু নিশ্চয়ই রাখেন না, তথাপি সাধারণের অবগতির জ্ঞতা তাহার সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি—স্বনীতিবাবু ক্ষমা করিবেন।

ঐস্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৯১১ সালের বি.এ. পরীক্ষায় ইংরেজী অনার্সে ১ম শ্রেণীর ১ম স্থান অধিকার করেন। ১৯১৩ সালে এম.এ.র ইংরেজী বি গ্রুপে (এ গ্রুপ বি গ্রুপ জড়াইয়া) ১ম শ্রেণীর প্রথম হন এবং ১৯১৪ সালে তার আন্তোষই তাঁহাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। ১৯১৬ সালে তিনি প্রথম থিসিস The sounds of Modern

Bengali দাখিল করিয়া P. R. S. লাভ করেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও রামেন্দ্রচন্দ্রের জিবেদী মহাশয়ের এই থিসিসের পরীক্ষক ছিলেন, তাঁহারাই ইহার উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা করেন। ঐ বৎসরেই তিনি P. R. S.-এর দ্বিতীয় থিসিস The Bengali verb and Bengali verb roots দাখিল করিয়া পরীক্ষক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রশংসা লাভ করেন। ১৯১৭ সালে তিনি জুবিলি রিসার্চ প্রাইজের নিদিষ্ট বিষয়ে—Comparative Philology with special reference to Bengali Dialects প্রবন্ধ লেখেন। যত দূর স্মরণ হয়, পরীক্ষক ছিলেন শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিজ্ঞানিদি। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি ওই পুরস্কার লাভ করেন। ওই বৎসরেই তিনি P. R. S.-এর তৃতীয় থিসিস The Persian Element in Bengali দাখিল করিয়া স্মার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯১৯ সালে তিনি সরকারী যুক্তি লাভ করিয়া ভাষাতত্ত্ব ও ধ্বনিতত্ত্ব অধ্যয়নের জন্ত বিলাত যান এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি. লিট. পরীক্ষার থিসিস দিবার অধুমতি প্রাপ্ত হন। তিনি কখনই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট পাইবার কল্পনা করেন নাই। ১৯১৯ সালেই তিনি লণ্ডন হইতে P. R. S. সম্পূর্ণ করিবার জন্ত চতুর্থ থিসিস প্রেরণ করেন। বিষয় ছিল—The Studies in the চর্যাপদের অর্থ্য বৌদ্ধ গান ও দোহার ৮৭টি চর্যাপদের ভাষার আলোচনা। এই আলোচনায় তিনি এগুলিকে বাংলা ভাষার আদি নমুনা বলিয়া উল্লেখ করেন। এই থিসিসের পরীক্ষক ছিলেন সম্ভবতঃ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন ও শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার। তখন এই চর্যাপদগুলি বাঙলা কি না ইহা লইয়া হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত বিশ্ববিদ্যালয় দলের বিরোধ চলিতেছিল, শাস্ত্রী মহাশয় এগুলিকে বাঙলা বলিয়াছিলেন—সম্ভবতঃ এই বিরোধের

ফলেই স্বনীতিবাবুর থিসিস অগ্রাহ্য হয়। অথচ ওই থিসিসের প্রতিপাত্ত বিষয়ে স্বনীতিবাবুর বিচার পড়িয়া বিখ্যাত প্রাচ্যাতত্ত্ববিদ Jacobi তাঁহার অপভ্রংশ কাব্য “ভবিসত্ত্ব কহ” এর সংস্করণের ভূমিকায় চর্যাপদের ভাষা বাঙলা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। প্যারিসের বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯২২ সালে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগে স্বনীতিবাবু বৌদ্ধ গান ও দোহা বিশেষতঃ চর্যাপদের ভাষাবিষয়ক ব্যাখ্যান দেন। তাঁহার পূর্বে মত তিনি সেখানেও বক্তৃতা করেন। প্যারিসের Ecole Pratique Des Hautes Etudes-এর ১৯২২-২৩ সনের বার্ষিক বিবরণীতে অধ্যাপক Jules Bloch এই ব্যাখ্যানের প্রশংসা করিয়াছেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাঁহার যে থিসিস পূর্বে অগ্রাহ্য হইয়াছিল, সেই থিসিসেরই সহিত ‘বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব’ বিষয়ক একটি ২৬ পাতার ছোট পুস্তিকা দাখিল করিয়া তাঁহার P. R. S. থিসিস সম্পূর্ণ হয় এবং তাঁহাকে Mouat Medal দেওয়া হয়। P. R. S. থিসিস সম্পূর্ণ হইলেই এই মেডেল পাওয়া যায়। বিলাত হইতে ফিরিবার দুই বৎসর পূর্বে ইহা ঘটিয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বেশী দূরে নয়, যে কেহ আমাদের এই উক্তিগুলির সত্যাসত্য অল্প আয়াসে নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন।

* * *

কাজেই দেখা যাইতেছে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন স্বনীতিবাবুর কোনও ডক্টরেটের থিসিস কখনও দেখেন নাই এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও বাতিল থিসিস দাখিল করিয়াও স্বনীতিবাবু লণ্ডনের ডক্টরেট পান নাই। ১৯২২ সালে তিনি লণ্ডনের ডক্টরেট পান, সেই জন্য তিনি সেখানেই কাজ করিয়াছিলেন, এক মূর্গী তাঁহাকে দুইবার জবাই করিতে হয় নাই। তাঁহার থিসিসের নাম The Origin and

Development of the Bengali Language। উপরে যতগুলি খিসিসের উল্লেখ করা হইয়াছে তন্মধ্যে কেবল Bengali Verb খিসিসের অংশবিশেষ তিনি তাঁহার লগুন খিসিসের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। টমসনের মত কোন পণ্ডিত লগুনে পরীক্ষক ছিলেন না, ছিলেন স্ত্রার জর্জ গ্রীয়ার্সন, ডক্টর গ্রেহাম বেলী এবং মিঃ সাটন পেজ। Indian Philology সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপারে স্ত্রার জর্জ গ্রীয়ার্সন ও ডক্টর গ্রেহাম বেলীর স্থান কোথায় শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই তাহা অবগত আছেন। লগুনের এই খিসিসই পরে পরিবর্তিত আকারে পুস্তকাকারে বাহির হয় এবং স্বয়ং গ্রীয়ার্সন সাহেব ইহার ভূমিকা লিখিয়া দেন। এই পুস্তক প্রকাশ করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও পাশ্চাত্য দেশ সহজে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন।

“রচনাটির অক্ষমতা সন্দেহে নিশ্চেষ্ট হন” বা “প্রাচ্যভাষাবীদ” প্রভৃতি বাক্যের মাতৃভাষার নমুনা তাঁহার কথার জবাবে এত কথা লিখিবার প্রয়োজন ছিল না এবং আমাদের গুণকালতি না হইলেও স্ত্রীতিবাবুর প্রতিষ্ঠার বিন্দুমাত্র লাঘব হইত না। তথাপি এত কথা লিখিতেছি এই জ্ঞে যে এই চ্যাংড়া অর্ধাচীনের কথার অন্তরালে এক জন অতি প্রাচীন অর্ধাচীনের আন্তরিকত্বের স্পষ্টত্ব হইতেছে। যে ব্যক্তির বিদ্যার দৌড় কাঁধা ও পট সংগ্রহ পঞ্চাশ এবং মাতৃভাষার দোহাই দিয়া চোখের জলে ভাসিয়া মাটিতে গড়াগড়ি দিতে বাক্যের বাধে না মুখের জ্ঞানে তাহাকে ক্ষমা করা ছাড়া আমাদের গতান্তর নাই।

আইন এবং শৃঙ্খলা সদর ছাড়িয়া যখন অলিতে গলিতে প্রবেশ করে তখন ভয় হয় যবের হেঁসেলেও বৃষ্টি টান পড়িবে। বাংলার শিক্ষামন্ত্রী এবং শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর প্রভৃতির সদরের কাজ বোধ হয় শেষ

হইয়াছে—দেশের শতকরা শতজননের শিক্ষার ব্যবস্থা তাঁহারা সম্পূর্ণ করিয়াছেন; প্রাথমিক শিক্ষার পথে কোনই বাধা নাই; মন্তবে ও টোলে হিন্দুমুসলমানি ভাষার সামঞ্জস্য তাঁহারা করিয়া ফেলিয়াছেন এবং টেকটবুকের নামে যে খুড়ি খুড়ি ভুল-ভ্রান্তি ও ভাষার অপপ্রয়োগ ছাত্রদিগকে প্রভাহ এতকাল গিলান হইয়াছে সেগুলি বিশুদ্ধ ও পরিমার্জিত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে, স্ত্রতার সদরের কাজ এক প্রকার থওম; শিক্ষা-প্রধানেরা অন্দরে ঢুকিবেন।

ঢুকিতেছেনও। শিক্ষার কাজ সমাপ্ত—বৃত্তি লইয়া বৃত্তিভোগীরা মাথা ঘামাইতেছেন। ইঠাং তাঁহারা ধরিয়া ফেলিয়াছেন যে পরীক্ষায় কৃত্তিস্থের মাপকাঠিতে এতকাল ছাত্রদিগকে যে বৃত্তি দেওয়া হইয়াছে তাহা ঠিক হয় নাই; দারিদ্র্যকে মাপকাঠি করিয়া বৃত্তি দেওয়াটাই নাকি সমীচীন হইবে। ইউরোপে নাকি এই ব্যবস্থা আছে এবং শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর বটম্‌লি সাহেবও নাকি এই দরিদ্র-বৃত্তির জোরে মাথায় হইয়াছেন। ভূতপূর্ব শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় নবাব স্ত্রার খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেব তিন বৎসর পূর্বে দারিদ্র্যের মাপকাঠিতে বৃত্তি দেওয়ার একটি স্কীম খাড়া করিয়াছিলেন এবং ১৯৩৬এর পরীক্ষার ফলে বৃত্তিদান উক্ত স্কীম অনুযায়ী হইত যদি না সাময়িক পত্রিকায় ইহার বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই আলোচনা চলিত। আপাতত এই স্কীম ইয়োরোপ ও আমেরিকার পদ্ধতি সন্দেহে একটি ‘এনকোয়ারি’র অপেক্ষায় আছে, আগামী বৎসরে এই স্কীমকে আর ঠেকান যাইবে না। বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়ের বিবৃতি অনুসারে বৃদ্ধা যাহ, খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেবের স্কীম সন্দেহে তিনি ঝুঁকিবহাল ছিলেন না। তিনি বলেন, ইয়োরোপের প্রত্যেক প্রদেশেই পারিবারিক আয়

অমুখ্যায়ী সাধারণ বৃত্তির ব্যবস্থা আছে তবে রিসার্চ বৃত্তি সত্যাকার প্রতিভা অমুখ্যায়ী প্রদত্ত হইয়া থাকে।

অর্থাৎ, ভাল করিয়া লেখাপড়া শিখিবার যে সামান্য উৎসাহ এই বৃত্তির আকারে বাঙালী ছাত্রদের দেওয়া হইত তাহাও আর থাকিবে না। চাকুরির লোভে বাঙালী এককাল লেখাপড়া শিখিয়া আসিয়াছে, ভাল চাকুরি এখন আকাশ-বৃহ্মের সামিল, বৃত্তিটুকুর লোভ ছিল, তাহাও থাকিবে না। দরিদ্র হইবার জ্ঞত কাহাকেও পরিশ্রম করিতে হয় না, স্বতরাং দরিদ্র বাঙালী ঘরে বসিয়াই বৃত্তি-আনন্দ উপভোগ করিবে, ইহা হইতে স্বপ্নের বিষয় আর কি হইতে পারে! আমরা ভিজ্ঞাসা করি—বাঙালীর মধ্যে বড় লোক কে যে স্বতন্ত্র একটা দারিদ্র্য-মাপকাঠি খাড়া করিতে হইল? তথাকথিত বড়লোকদের ছেলেরা কয়টা বৃত্তির অধিকারী হয়? আসলে সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ছেলেরা বৃত্তি পাইয়া থাকে এবং মধ্যবিত্ত গৃহস্থ অপেক্ষা দরিদ্র বাংলায় কেহ নয়।

আমাদের সন্দেহ হয়, দারিদ্র্যের ওজুহাতে বৃত্তির ব্যবস্থার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন সাম্প্রদায়িকতা প্রকাশ পাইতেছে, হয়তো আমাদের ভুল হইতে পারে কিন্তু আয়োজন বৈধ দেখিতেছি তাহাতে ভরসা হয় না। ইহা লইয়া এখনও বিস্তৃত আলোচনার সময় আসে নাই। যদি দরিদ্রের ভ্রূক্ষে শিক্ষাবিভাগের চক্ষু এমনই অশ্রুসঞ্ছল হইয়া উঠে কয়েকটা স্বতন্ত্র দরিদ্র-বৃত্তির ব্যবস্থা করা কি বিশেষ কঠিন? মেয়েদের জ্ঞত স্বতন্ত্র বৃত্তি আছে, নিপীড়িত জাতিদের স্বতন্ত্র বৃত্তি দিয়া সাহায্য করা হয়, না হয় দরিদ্রদেরও গবর্ণমেন্ট সেইভাবেই সাহায্য করিতেন! পরিশ্রম করিয়া লেখাপড়ার দ্বারা যে কৃতিত্ব অর্জন করিল, বৃত্তির পরিমাণ এমন কি

অধিক যে তাহাকে সেইটুকু সাহায্য ও উৎসাহ হইতে বঞ্চিত করিতে হইবে?

তাছাড়া, দরিদ্র অদরিদ্র বিচারের ভার তো এই সকল কর্তব্যপরায়ণ লোকের হাতেই থাকিবে। কর্তব্যপরায়ণ বলিতেছি এই জ্ঞত যে, রিসার্চ স্কলারশিপ দিবার আইন তাঁহারাষ্ট প্রণয়ন করিয়াছেন এবং কাজে বাহাদের রিসার্চ স্কলারশিপ দেওয়া হইতেছে আইনের বাধা-বন্ধিতে তাঁহাদিগকে ঠিক ফেলা বাইতেছে না দেখিতেছি। স্বতরাং কর্তব্য যে ইঁহারা ভাল ভাবেই সম্পাদন করিবেন তাহাতে সন্দেহ কি? পক্ষপাতিত্ব করিবার ইহা অপেক্ষা অপক্কপ স্বযোগ হয়তো আর মিলিবে না।

রিসার্চ স্কলারশিপের কথা বলিতেছিলাম। নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তগুলি হইতে প্রতীতি হইবে যে শিক্ষা-বিভাগের প্রধানদের কথা এবং কাজ এক নয়, সাধারণ বৃত্তির বেলাতেই কি তাঁহারা দারিদ্র্য আঁকড়াইয়া বিচার করিতে পারিবেন?

রিসার্চ স্কলারশিপ সংক্ষেপে নীচের ঘোষণা-বাক্যটি Calcutta Gazette Part I B Page 401 of 2. 4. 36 ও Part I B page 406 of 9. 4. 36তে বাংলাদেশের পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের অস্থায়ী ডিরেক্টর ডব্লিউ. এ. জে. দ্বন্দ্ব সাহেবের সহিতে বাহির হইয়াছিল।

Research Scholarships will be awarded for the encouragement of original research to candidates who have high and special qualifications and appear to be likely to conduct original research with success...scholarship may be renewed from year to year up to the limit of three years....Each candidate for a scholarship should submit his application...on or before the 10th May next, and must produce evidence of having passed from a College or other institution in Bengal the M. A. or M. Sc., examination of the Calcutta or Dacca University, or of having obtained some other equivalent or higher degree of either of these Universities in 1933 or 1934 or 1935.

ঘোষণা-অনুযায়ী এই সালের জন্ম এই বৃত্তি বাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে তাঁহাদের তিনজনের নাম ও কৃতিত্বের ইতিহাস দিতেছি—

New Research Scholarships tenable from 1. 7. 36 to 30. 6. 37 announced in the Calcutta Gazette Part 1. B of 23. 7. 36 page 1214.

1. Dr. Durgada Mitra: passed B. Sc. from the Scottish Churches College, with honours in Mathematics in 1921 and was placed eighth in the 2nd Class, there being 11 first classes in the subject. Passed M. B. in 1927 and did not get any honours in any of the Subjects examined?

2. Mohamed Nurul Karim: Passed B. A. in pass course. Preliminary M. A. in 1933.
(Calcutta Gazette Part 1. B. p. 1827 of 7. 9. 33)
Got plucked in M. A. in 1934.
Passed M. A. in 1935.

3. Ashutosh Mukherji—appeared in B. Sc. but got plucked in 1930; passed B. Sc. with honours in Chemistry in 1931. Appeared in the M. Sc. examination but got plucked in 1933. Passed M. Sc. in Pure Chemistry in 1934, stood 3rd in the 2nd Class, there being 4 first classes in the year.

জন পাঁচ ছয় রিসার্চ স্কলার বাছিতে গিয়াই যেখানে এমন অপূর্ণপ বিচারবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে [অর্থাৎ ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৩৩, ৩৪, ৩৫ সালের পাশকরা নয় এমন ব্যক্তি নির্বাচিত হইয়াছে; পরীক্ষায় ফেল করিয়াছে এমন ছাত্রও আছে] সেখানে গাদার মড়া ম্যাটি কুলেশন আই.এ. বি.এর সাধারণ বৃত্তির বেলায় কি ঘটিতে পারে তাহা কল্পনা করিতে পারা যায়। কৃতিত্বের তবু একটা বহিঃপ্রকাশ আছে, কিন্তু দারিদ্র্যের বিচারে তাহারা তো শুধু অন্তঃদৃষ্টির ব্যবহার করিবেন! বরাবর কৃতিত্বের সহিত পাশ করিয়া যে সকল ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে যশস্বী হইয়াছেন এমন সকল ছাত্রের দাবী অগ্রাহ্য করিয়া দুই কোপ তিন কোপ

খাওয়া ছাত্রদের বৃত্তি দেওয়া হইল কেন ইহার জবাব কে দিবে? শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় নিশ্চয়ই দিবেন না।

বিরিট-রাজার অন্তঃপুরে নর্তকী বৃহন্নলা যেদিন সহসা ভারতবিশ্বাস্য মহাবীর অর্জুনরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন সেদিন উত্তরাগ্রমুখ রাজকুমারের মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল কল্পনা করিবার বিষয় বটে—আমরা প্রায় অনুরূপ রূপের পড়িয়াছি। শ্রাবণ সংখ্যা শনিবারের চিঠির ‘নারী পুরুষ ও প্রেম’ নিবন্ধের লেখিকা মিস শ্রামলীয়া চাট্‌ঘো সহসা কাছা-মালকোচা আঁটিয়া আমাদের গালে চড় কসাইয়া দিয়াছেন; গালে হাত ব্লাইতেছি আর ভাবিতেছি—appearances are always deceptive

ব্যাপারটা এই। বাকীপুর, পাটনা হইতে শ্রীধীরেন্দ্রমোহন চৌধুরী আমাদের একটা পত্রাঘাত করিয়াছেন, তাহার প্রথম অংশ এই—

সবিনয় নিবেদন—

শ্রাবণ মাসের শনিবারের চিঠিতে (Miss) শ্রামলীয়া চাট্‌ঘোর ‘নারী, পুরুষ ও প্রেম’ পড়িলাম। মিস্ শ্রামলীয়া চাট্‌ঘোকে আমরা চিনি না—কিন্তু আমরা ভাগলপুরের শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার সেন শুকন্তে চিনি। শৈলেন বাবু ‘আমরা যা ভাবি আর যা ভাবি না’ নামে ১৫টি প্রবন্ধ আমাদের (প্রভাতীসঙ্গ পরিচালিত) হাতে লেখা পত্রিকা ‘প্রভাতী’তে প্রকাশের জন্ম পাঠান। উহা ‘প্রভাতী’র বৈশাখ ১৩৪২ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পরে ঐ প্রবন্ধটাই সন্দের পক্ষ হইতে উত্তরায় পাঠান হয়। এখন দেখিতেছি ঐ প্রবন্ধটাই ‘নারী, পুরুষ ও প্রেম’ নাম গ্রহণ করিয়া শনিবারের চিঠিতে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। উত্তরায় ভাদ্র ১৩৪২ সংখ্যায় প্রকাশিত ঐ প্রবন্ধটী এবং শ্রীমতী চাট্‌ঘোর বর্তমান লেখাটা বিশ্লেষণ ও বিচার করিলে দেখা যায় যে

শ্রীমতী চাটুখোর লেখাটার ৭০% শৈলেন বাবুর লেখার ছব্ব নকল, ২৫% একটু অবল বদল।

চিঠি পড়িয়া মনে হইতেছে, আমরা একটা ঘোরতর যড়যন্ত্রের মধ্যে পড়িয়াছি। একমাত্র মিস শ্রামলীয়া চাটুখোই ইচ্ছা করিলে আমাদের রক্ষা করিতে পারেন, তিনি কে জানি না, রাম না সীতা বলিতে পারি না, যেই হউন দয়া করিয়া আত্মপ্রকাশ ও জবাবদিহি করুন নতুবা আমরা মারা যাই।

অতঃপর বাকী জীবন মুসলমান সমাজ লইয়া লিখিবেন বলিয়া শরংচন্দ্র যে উক্তি করিয়াছেন বলিয়া সাময়িক পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছে, দেখিতেছি আমাদের মত অনেকেই তাহাতে আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছেন না। কলিকাতায় ও ঢাকায় কয়েকটি মুসলমান সভাসমিতি শরংচন্দ্রকে অভিনন্দন দিতে অস্বীকার করিয়াছেন। ইহার শরংচন্দ্রের এত বড় একটা প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও তাহাকে বরণ করিতেছেন না কেন জানি না, আমরা তাহাকে অবিশ্বাস করিতেছি অত্র কারণে। শরংচন্দ্রের লেখার যে বৈশিষ্ট্যের কথা তিনি নিজেই ঢাকায় দুই একটি সভাসমিতিতে উল্লেখ করিয়াছেন তাহা এই যে, তিনি জীবনে এমন কিছুই লিখিতে পারেন নাই যাহা তাহার অভিজ্ঞতাপ্রসূত নয়। বালীগঞ্জে বাড়ী ফাঁদিয়া বাংলার অবজ্ঞাত মুসলমান সমাজ সপক্ষে অভিজ্ঞতা অর্জন করা বাগবাজারে বসিয়া লণ্ডন করেস্পণ্ডেন্ট হওয়ার চাইতেও কঠিন কাজ। শরংচন্দ্র পারিবেন না। তাহার সে বয়স নাই।

রোল্ড গোল্ড

‘নাইন ক্যারেট’ লিখিত

আমার কবিতা লিখিবার খুব ইচ্ছা ;
কারণ ইতিহাসে পড়িয়াছি
কবিতা লিখিয়া অনেকে অর্ধেক রাজত্ব
ও রাজকন্ডা লাভ করিয়া
স্থখে স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিয়া গিয়াছে।
তা ছাড়া, কবিতার সাহায্যে
এক এক জন মানুষ বহু রমণীর মনোহরণ করিয়াছে
এবং এক রমণীর সর্বস্ব অপহরণ করিয়াছে।
সুতরাং কবিতা লেখা খুবই লাভজনক
এমন কি
কবিতায় বিজ্ঞাপন,
কবিতায় চাকরির আবেদন,
বড় সাহেবের বিবাহের সম্ভাষণ,
ধর্ম প্রচার,
চাঁদা আদায়
বিবাহের নিমন্ত্রণ ;
এবং ইংরেজীতে
On Demand
I promise to pay

Mr. Chhagalram Choramal
etc. etc.

লিখিয়া

মোট টাকা রোজগারও করা চলে।

কিন্তু এ হেন কবিতার

পুরানো সংস্করণ

ছন্দে ও মিলে সকলের

নাগালের উপরে।

তাই

যেমন চক্লিশ ক্যারেটের অভাবে বাইশ

তৎপরে আঠার, চৌদ্দ ও নয়

এবং শেষ অবধি রোল্ড গোল্ড

সেই রকম

ছন্দ ও মিল, পূর্ণ হইতে ভঙ্গ

তার পরে কখন সখন

এবং শেষ অবধি নিপাত করিয়া

নিছক সকল বাংলাই বজ্রিত কবিতা

আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত

প্রণালীতে

আবিষ্কৃত হইয়াছে।

সস্তার চূড়ান্ত!

সকলের আটপৌরে

এমন কি এর পর

মুদীর পাতা লেখা,

ধোঁপার হিসাব,

গয়লার বিল, সব কবিতায় হইবে;

চাই কি অক্ষর পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে

শুধু স্বরবর্ণে কিংবা ব্যঞ্জনবর্ণে

অযুক্তাক্ষরে ও শুধু এ বর্ণে ও বর্ণে

কবিতা লেখা চলিবে।

আজ কাল 'মনোপলি'

কি জ্বাতি ভেদ

কি অধিকার অনধিকার

এ সব কথা কেহ মানেন না।

শুধু কবিই কবিতা লিখিবে

কিন্তু কবিতায় কাব্য থাকিতেই হইবে,

অথবা ছন্দ, শব্দবিন্যাস, মিল,

কথামাধুর্য, কি ভাব ও অর্থ না

থাকিলে কবিতা হইবে না;

এ জ্বলুম কে সহ্য করিবে?

'মেজরিটি' যাহা করিবে তাহাই উত্তম।

আমরা সংখ্যায় অধিক

আমাদের লেখা কবিতাই কবিতা।

আর একটা শিকল ভাঙা হইল:

এর পর দরকার ভাঙ্গা

ঐ অভিধানটাকে!

মানের বাধাবীধি মানিব না

মুক্তি দিব অথকে শব্দের বাধন থেকে।

এখন যে শব্দের যা অর্থ
তখন সে অর্থ যে কোন শব্দে
বা যে কোন শব্দে যে কোন অর্থ,
এমনই একটা বিরাট মুক্তির
'টাইফুন' বইয়ে দেব।
তখন এক একটা বই
সে সহস্র বইয়ের সামিল হবে।
প'ড়ে যে যার ইচ্ছে যা খুশী
বুঝে নেবে।
কাব্য, কি জ্যামিতি, কি ভূগোল,
কি দ্বা পঞ্জিকা, উপদ্রাস অথবা গৃহচিকিৎসা;
সব এক বই!
একই বই
সকালে পাঠ্যপুস্তক
ও রাত্রে অপাঠ্য রূপে
পড়া চলবে।
মিলন, মুক্তি ও প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা
বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল থাইবে
মুরগী দিয়া গাড়ী টানাইব
আর ঘোড়া করিবে মুরগীর কাজ।
তবেই বাংলার সভ্যতা সর্বজয়ী হইবে!

ভাটমেন!

হাবুলচন্দ্রের সিদ্ধিলাভ

কোন অবস্থার হেতু না জানিলে তাহার অর্থ করা যায় না।
যিনি বলিবেন যায়, হয় তিনি আহাম্যক নয় মিথ্যাবাদী। আচ্ছা
অর্থ করুন, আমি একটি অবস্থার কথা বলিতেছি। তিনি অর্থ করুন।
যদি করিতে পারেন, বলিব আমিই—, আচ্ছা সে কথা পরে হইবে।
অগ্রে দেখা যাক মহাশয়ের দৌড় কতদূর। অবস্থাটি এই—

একটি হৃন্দর স্তম্ভজিত কক্ষ। এক ধারে জোড়া পালকের উপর
কৈশোর ও তরুণের মধ্যকালবস্ত্রী একটি নারী-রত্ন। তাহাকে
যেরিয়া চতুঃপার্শ্বে এত ফুলের ভিড় যে বিছানার এতটুকু আয়গা ফাঁক
নাই,—(ফুলগুলির নাম বলিয়া পাঠকের কল্পনার মূলে ফুঁটারাঘাত
করিতে চাই না, যে যাহার পছন্দমত ভাবিয়া লইবেন, আমি আপত্তি
করিব না) আর সেই ফুলের সাগরে একটি জ্যোৎস্নালোকিত
সোনালী ঢেউএর মুকুটে এক টুকরা নীলকান্তমণির দীপ্তি। অর্থাৎ
মেয়েটির দক্ষিণ-করপল্লবের অনামিকায় একটি নীল পাথরের আংটি।
মেয়েটি দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া নিশ্চলভাবে পড়িয়া আছে,
জাগিয়া আছে অথবা ঘুমাইতেছে—তাহা বুঝিবার উপায় নাই। কক্ষটির
অপর প্রান্তে একটি যুবক ব্যায়চন্দ্রের উপর ধ্যানাসীন, তাহার দৃষ্টি
নাসিকাগ্রে নিবদ্ধ। সম্মুখের ড্রেসিং টেবিলের উপর একটি মিরারভোর
ল্যাম্প স্বল্প তেজে জলিতেছে,—আলোকের পশ্চাতে ও আয়নার সম্মুখে
কার্ডবোর্ডের ফ্রেমে বাধান দক্ষিণেখরের কালীমূর্তি ও ধ্যানমগ্ন রামকৃষ্ণের
একটি চিত্র।

বাস, আপাতত এই পর্য্যন্তই বলিব। এখন জিজ্ঞাসা করি,
অবস্থাটির অর্থ বোধগম্য হইয়াছে তো? আমি যদি আর একটি কথাও

না বলি, তবে কেমন হয়? যে যাহার মত আবোল তাবোল বকিতে থাকিবেন, এই তো? আর আমার যদি যথেষ্ট ধৈর্য না থাকে তবে উভয় পক্ষকেই ছুই চারিটা কড়া কথা শুনিতে হইবে, এই তো? কি দরকার? তাহার চেয়ে প্রকৃত বৃত্তান্ত আমিই প্রকাশ করিতেছি,—অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন।

উপরোক্ত যুবকটির ডাক-নাম হাবুলচন্দ্র, ভাল নাম কি তাহা জানি না। শুধু আমি নহে, এ পাড়ার কেহই জানে না, অল্প পাড়া কা কথা। গত তিন বৎসরে সে উপদ্রুপরি বি. এ. ফেল করিয়াছে এবং পরশু রাত্রে তাহার বিবাহ হইয়াছে। আজ ফুলশয্যা, পালঙ্কের উপর নব-পরিলীতা বধু,—নাম পদ্মাবতী।

হাবুলচন্দ্র প্রথম-জীবনে রামকৃষ্ণ মিশনের এক জন বড় ওয়ার্কার ছিল। কলেরা, বসন্ত, বহা ও টুভিঙ্গ—ইহাই ছিল তাহার জীবনের মূলমন্ত্র। পিতার একমাত্র পুত্র এবং পিতা সওদাগরি অফিসের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। তিনি অতিশয় কড়া লোক এবং এক্রূপ গম্ভীর-প্রকৃতি যে বাড়ীর কোন লোক সহসা তাহার চোখের দিকে চাহিয়া কথা বলিতে ভরসা করিত না। হাবুলের এক ভগিনী বিদ্যমলতা, তাহার বিবাহ দিয়া হাবুলের পিতা জামাইটিকে নিজের অফিসেই কাশিম্বারের কাজ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু জামাইটি একজন বড় ক্ল্যাশ-থেলোয়াড়, অফিসের তহবিল হইতে হাজার খানেক টাকা ভাঙ্গিয়া ফেলায় তিন বৎসর শ্রীঘরবাসের বন্দোবস্ত হইয়াছে। হাবুলের পিতা তাহাকে বাঁচাইবার কোন চেষ্টাই করেন নাই। বিদ্যমলতা পিজালয়েই আছে।

হাবুলচন্দ্র সেবাশ্রমের আত্মকুলো ছইবার আই. এ. ফেল করিবার পর তাহার পিতা আর তাহাকে বাটীর বাহির হইতে দেন নাই। পর বৎসর হাবুল আই. এ. পাশ করিল বটে, কিন্তু স্বামীজীর জ্ঞান-যোগ

পাঠাশ্বে স্থির করিল—পিতা তাহাকে দেহ দান করিয়াছেন সত্য, সেজন্য তিনি সেই দেহের দাসত্ব দাবি করিতে পারেন। কিন্তু তাহার আত্মা অবিনাশী, অক্ষয়, অনাদি। তাহা তো তাহার পিতা তাহাকে দান করেন নাই। হাবুলের আত্মার উপর তাহার কি অধিকার আছে?

হাবুলচন্দ্রের জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আত্মার অস্থূলীন প্রকৃতি হইল। কয়েক দিনের মধ্যেই তাহার দৃঢ় ধারণা হইল—যোগিক মার্গে সে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে, আত্ম-সাক্ষ্য-কারের বড় অধিক বিলম্ব নাই। কোন দিন রাত্রে সে স্বপ্ন দেখিত ছন্দক তাহার কাপড় ছাড়াইয়া লইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে, কোন দিন দেখিত শ্রীচৈতন্যের পরামাণিক তাহার কেশ-কর্ত্তন করিবার জন্য ক্ষুর শানাইতেছে। সে সেই দিনের কথা ভাবিত, যে দিন সিদ্ধি লাভান্তে সে ফিরিয়া আসিয়া পিতামাতাকে ব্রহ্মজ্ঞান দান করিবে। পিতা অশ্রু-গদগদ কণ্ঠে তাহাকে বলিবেন—গুরো চৈতন্য দেহি। সে তাহা দিবে, জীবনদাতার স্বপ্ন সে আত্মজ্ঞান দিয়া পরিশোধ করিবে। কিন্তু সেই হইবে প্রকৃত গুরু, কারণ দেহ দান অপেক্ষা জ্ঞান দানের মর্যাদা অনেক বেশী।

এক দিন বিদ্যমলতা চায়েই পেয়ালা হস্তে আসিয়া তাহাকে বলিয়াছিল—দাদা, চা নাও। হাবুল তখন গুরুতর চিন্তায় মগ্ন, তাহার আত্মানে জরোপ করে নাই। সে স্বপ্ন দিয়া বলিয়াছিল—নাও বাপু, চা খেয়ে নিয়ে যত ইচ্ছা ভাবো, আবার ঠাণ্ডা হয়ে গেলে বলবে—গরম করে আন, ভাল জালায় পড়েছি যাহোক।

স্বামীর বিচ্ছেদের প্রতিক্রিয়া বিদ্যমলতার অন্তরে অত্যন্ত বদ মেজাজের রূপ ধারণ করিয়াছিল। ইহার পরিচয় তাহার পিতা পাইতেন

না বটে, কিন্তু মা ও দাদার কোন কথা অথবা কোন আচরণ সে পারতপক্ষে সহ্য করিত না, এক কথা বলিলে দশ কথা শুনাইয়া দিত, কোন কথা না বলিলে আরও বেশী শুনাইত।

হাবুলচন্দ্র অভিভূতস্থরে বলিয়াছিল—বিদ্যা, আমি কে তা জানিস?

—জানি না। আবার, আমার দাদা হাবুলচন্দ্র।

—পাগল! জানিস,—তোতে, আমাতে, এই জ্ঞানলা, ওই কড়িকাঠ আর এই আলমারির মধ্যে কোনই তফাৎ নেই, আসলে সব একই জিনিষ!

বিদ্যাহীনতা ঠক করিয়া টেবিলের উপর চায়ের কাপ রাখিয়া প্রস্থান করিয়াছিল, হাবুল পরমহংসের দিকে তাকাইয়া বলিয়াছিল—How long, oh Lord, how long!

হাবুলচন্দ্রের বৈরাগ্য ও তীব্র সাধনার কথা ক্রমশ তাহার পিতার কানে উঠিল। ওসব হাবুলচন্দ্রের বৃদ্ধরূপে সাব্যস্ত করিয়া প্রথমটী তিনি গ্রাহ্য করেন নাই। মনে মনে আশাও ছিল, পাসটা করিলেই তাহাকে নিজের অফিসে ঢুকাইয়া লইবেন, তার পর কাজের চাপে সে আপনাই চিট হইয়া যাইবে। কিন্তু হাবুলচন্দ্র পাস তো করিলই না, পক্ষান্তরে পড়ার বই বিক্রয় করিয়া ভাল ভাল যোগদর্শনের বই কিনিয়া আধ্যাত্মিক মার্গে অগ্রসর হইবার দৃঢ়তর সঙ্কল্প করিল। হাবুলের মাতা এক দিন কণ্ঠকে ধরিয়া বসিলেন—ওগো শুনচ, হেবলোটার একটা বিয়ে দাও, নইলে ওর মতি গতি ফিরবে না।

কথাটা হাবুলের পিতার নিকট খুব suggestive মনে হইল। অস্বস্ত হইয়া একটা খুব বড় experiment, এবং ইহা ব্যতীত হাবুলচন্দ্রের উদ্ধারের দ্বিতীয় পন্থা নাই—তাহা তিনি স্বীকার করিলেন।

হাবুল মার নিকট ঘোরতর আপত্তি জানাইয়াছিল, কিন্তু তিনি সে কথা তাহার পিতার কানে জুলিতে ভরসা করেন নাই। অগত্যা হাবুলচন্দ্র অবশেষে মনে করিয়াছিল, বেশ তাহাই হউক; সিদ্ধার্থ, শ্রীচৈতন্য ও পরমহংস তিন জনেই বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু বিবাহ কি তাঁহাদিগকে বাধিতে পারিয়াছিল? History will simply repeat itself. সেও তাহার পিতাকে এ বিষয়ে একটা রীতিমত শিক্ষা দিয়া ফাইবে। আর সত্যই বিবাহের পর সংসার ত্যাগ যতটা romantic এবং যতখানি ত্যাগের গন্ধ তাহাতে আছে, বিবাহের পূর্বে তাহার সিকিও নাই। এখন আছে কি যে ত্যাগ করিবে? আর সে তো অক্ষয়, অবিনাশী, অপরিবর্তনশীল,—জন্ম মৃত্যু যাহার পক্ষে কথার কথা, সে নাকি বিবাহে—হঁঃ।

তথাপি সাবধানের মার নাই, হাবুলচন্দ্র তাহার আত্মার জ্যোতিকে স্বীয় চিন্তাকাশে দ্বিগুণভাবে জালিয়া দিবার উদ্দেশ্যে শুভদৃষ্টির সময় চক্ষু বৃজিয়াছিল এবং বাসরঘরে ধ্যানাসীন হইয়া বসিয়াছিল। সমবেত রমণীমন্দের স্বমধুর আত্মনাকে মনে করিয়াছিল—বৃন্দের জীবনে মায়ের নির্যাতন। অবশেষে যখন সকলে মিলিয়া পদ্মাবতীকে হাবুলের কোলে বসাইবার চেষ্টা করিল, হাবুল মনে করিল সময় উপস্থিত, বৃদ্ধ ইহাদিগকে এত দূর অগ্রসর হইতে দেন নাই। উঠিয়া পড়িয়া দৌড় দিবার কালে বাহিরের বারান্দায় শাস্ত্রভট্টাচার্য্যর সহিত দেখা, তিনি তাহার হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিয়াছিলেন—একি বাবা! বাসরঘর ছেড়ে কি যেতে আছে?

হাবুল কাতরকণ্ঠে বলিয়াছিল—হাত ছেড়ে দিন, আপনি আমাকে ধরতে পারবেন না। কেউ কোন দিন পারে নি, আমাকে ছোঁয়া যায় না, কাটা যায় না, আমার শীত গ্রীষ্ম নেই, আমি লম্বাও নই,

চণ্ডাও নই। যেটাকে আপনি ধারণ করেছেন—ওটা আমার খোলস মাত্র, ইচ্ছা করলে এখুনি একে—

শাশুড়ীঠাকুরাণীর হস্ত আপনিই স্থলিত হইয়া পড়িয়াছিল, তিনি কাঁদিয়া কহিয়াছিলেন—ওমা, শেষে কি একটা পাগলের হাতে আমার পদ্মাটাকে মঁপে দিলে গা!

হাবুলের অসময়ে প্রত্যাবর্তনের ফলে তাহার মাতা ও ভগিনীর উদ্বেগের সীমা রহিল না। কিন্তু হাবুলের নিকট ব্যাপারটার কেন্দ্র হরিস পাওয়া গেল না। হাবুলের পিতা কল্পাবৃত্ত কলেবরে আসিয়া কহিলেন—হতভাগা রাস্কল, আমাকে এমনি করে অপমান করলে! বাড়ী থেকে এখনই দূর হয়ে যা বলছি, আমি এমন ছেলের মুখদর্শন করতে চাই না।

হাবুল মনে মনে হাসিয়া বলিয়াছিল—হায় অবোধ, সে জিনিষের কি মান অপমান বোধ আছে? না তাকে দূর করিয়া দেওয়া যায়? কোথা হইতে কে কাহাকে দূর করিবে?

কিন্তু অবোধ পিতা যখন তাহাকে ঘাড়ে ধরিয়া সেই রাজ্জই পুনরায় শব্দগুহে ফিরাইয়া লইয়া গেলেন সে মনে করিল—পিতার হাতও নখর, তাহার ঘাড়ও নখর, তাহার এই মাওয়াটাও কণস্থায়ী, তবে তাহার আক্ষেপ কিসের? কিন্তু সে রাতে আর কেহ তাহাকে জালাইতে সাহস করে নাই।

ইহার পরের দৃশ্য প্রথমেই বাক্ত করিয়াছি। অর্থাৎ হাবুলের ফুলশয্যার রাত্রি। হাবুল গভীর ধ্যানে মগ্ন। এক এক বলক দমকা বাতাস পালক শীর্ষের বাতায়ন পথ দিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে এবং কামিনী ও কুসুমের মিশ্র স্রবাস বহিয়া আনিয়া হাবুলের মাশে পাশে ঘুরিয়া মিরান্ডোর বাতিটাকে ঝাঁপাইয়া ড্রেসিং টেবিলের

পার্শ্ববর্তী বাতায়ন দিয়া নির্গত হইয়া যাইতেছে। দেওয়ালের ঘড়িতে বাক্সি একটা বাজিল। একটা টিকটিকি টেবিলের উপর লাফাইয়া পড়িয়া ঘাড় উঁচু করিয়া হাবুলের নাসাদেশ লক্ষ্য করিল। হাবুলের ভয় হইল পাছে তাহার নাকের উপরই লাফাইয়া পড়ে, হাবুল ব্যস্ত হইয়া অগ্রেই টিকটিকিটার নাকে একটি ফুঁ ঝাড়িয়া দিল। সে 'টিক' করিয়া আওয়াজ করিয়াই টেবিল হইতে লাফাইয়া পড়িল এবং ছুটিয়া গিয়া কুঁকাবাকা গতিতে পালঙ্কের পায়ার বাহিয়া শয্যার উপর উঠিয়া ফুলের গহনে অদৃশ্য হইয়া গেল। তাহার গতি অমুসরণ করিয়া হাবুল শয্যার উপর হইতে আর দৃষ্টি ফিরাইতে পারিল না। বিশেষ করিয়া আংটিটার নীল আলো তাহার চোখে ছুরির ক্লার মত বিধিয়া গেল। হাবুল অতি কষ্টে দৃষ্টি অপসারিত করিয়া চিন্তা করিল—

তাহার ধ্যানভঙ্গকারী টিকটিকিটাকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া দরকার। কিন্তু ব্যাটাকে ধরা যায় কিরূপে? বাস্তবিক, সাধনমার্গ অতিশয় বদ্ধুর, পদে পদে বাধা। হাবুল আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং টিকটিকিটার খোজে শয্যার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। ইস, এরা ফুলে ফুলে আজ করিয়াছে কি? কিন্তু তাহার কি বুঝে না—হাবুলের নিকট ফুলও যা টিকটিকিও তাই? আর তাহার আত্মজ্যোতির নিকট ঐ আংটির আলো? হুঁ! এমন সময় আর এক বলক দমকা বাতাসে পদ্মাবতীর অবগুণ্ঠন ঈষৎ উড়িয়া গেল, এবং তাহার সমস্তরচিত কররার একাংশ উন্মুক্ত হইল ও তাহার বিচিত্রবর্ণ কর্ণভূষণ অপক্লপ দীপ্তি বিকীরণ করিয়া উঠিল। হাবুলের চিত্ত অজ্ঞাতসারে বলিয়া উঠিল—বাঃ বেশ তো! কিন্তু পরক্ষণেই তাহার বিবেক মাথা ঝাড়া দিয়া উঠিল এবং কানে কানে বলিল—হুঁ, বেশ আর কি! ওই জানালা ও কড়িকাঠের সহিত ওরই বা কি তফাৎটা আছে?

এমন সময় ঘুমের ঘোরে পদ্মা পাশ ফিরিয়া শুইল এবং স্বপ্নালোকে তাহার আয়ত জুয়াল, মুদিত আখিপল্লবে এবং স্থঠাম ওঠ দুখানিতে একটি মুহূর্তম হাসির আভাস ফুটিয়া উঠিল। হাবুলের মন আবার বলিয়া উঠিল—বাঃ বেশ তো! বিবেক বেচারী কাঁহাতক পাহারা দিবে,—জাগিয়া জাগিয়া বোধ হয় তাহার চক্ষে এই সময়টা তন্দ্রা আসিয়াছিল, মনের বেকাস কথাটা তাহার কানে পৌঁছিল না। সেই কাকে চিন্তামগ্ন হাবুল কুসুমাস্তীর্ণ শয্যার এক প্রান্তে বসিয়া পড়িল এবং অচান্দনভাবে একটি গোলাপের কুঁড়ি তুলিয়া লইয়া নাকে ঠেকাইল। হাবুলের অবসন্ন চিত্তে ফুলের গন্ধটা যেন নাকোঁটিকের কাজ করিল। সব যেন ক্রমশঃ দৃষ্টির সম্মুখে ধোঁয়ার মত কুণ্ডলী পাকাইয়া উঠিতেছে, যোগদর্শনের মূলমন্ত্রটা বার বার চেষ্টা করিয়াও মনে পড়িতেছে না। চক্ষুধ্ব নাসিকাগ্র বিস্মৃত হইয়া হাতের গোলাপ কুঁড়িটার প্রতি স্থির হইয়া আছে। দীরে দীরে লঘুস্পর্শ কুসুমের ভিড় হাবুলের মনটাকে ছাইয়া ফেলিল।

এমন সময় পদ্মাবতীর স্থললিত কণ্ঠস্বর তাহার কানে বাজিল—
কত রাত আর জাগবে? ঘুম পায় না বন্ধি!

অতর্কিতে সেতারটার গায়ে হাত লাগিলে স্বরের অল্পরঞ্জন যেমন বাজিয়া বাজিয়া ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে থাকে, শেষে আর না বাজিলেও মনে হয় চেতনার স্বরলোকে তাহা বাজিতেছে—দূর হইতে দূরান্তরে মিলাইয়া যাইতেছে, কিন্তু কখনও নিঃশেষ হইয়া মরিয়া যাইতেছে না, হাবুলের কানে পদ্মাবতীর কণ্ঠস্বর তেমনি মরিয়াও মরিল না।

এইবার হাবুলকে আমরা কিছুক্ষণ রেহাই দিব। অত বড় একটা জ্ঞানীলোকের আত্মবিশ্বস্তির মুহূর্তটা লোকচক্ষে তুলিয়া ধরা ভাল

হইবে না। পাঠকের বরননা স্বেচ্ছায় বিচরণ করুক, আমি কোন অপরাধের ভাগী হইতে চাই না।

তবে হাঁ, শেষ রাত্রিতে আবার হাবুলের কক্ষে কি ঘটিতেছে, তাহা দেখা দরকার মনে করি। কারণ, এতক্ষণে তাহার বৈবাগ্য আবার জাগিয়া উঠিয়াছে, সে বুঝিতে পারিয়াছে সে কে এবং পদ্মাবতীই বা কে! সে এতক্ষণে পদ্মার পায়ে ধরিয়া কাদিতেছে আর বলিতেছে—
বা কে! সে এতক্ষণে পদ্মার পায়ে ধরিয়া কাদিতেছে আর বলিতেছে—
পদ্মা, আমায় তুমি ক্ষমা কর। তুমি আমার পত্নী নও, আমি তোমার স্বামী নই, আমাদের বিবাহটাও সত্য নয়, কে কাহাকে বিবাহ করিতে পারে? তুমিও নারী নও, আমিও পুরুষ নই। এ আমার ক্ষণিকের আত্মবিশ্বাস, পদ্মা, তুমি আমায় ক্ষমা কর।

পদ্মাবতী অতিকষ্টে পা ছাড়াইয়া উঠিয়া পলাইল।

ইহার পর দুই রাত্রি কাটিয়াছে।

সেদিন প্রভাতে পদ্মার চোখের ছলছলভাব দেখিয়া বিচ্যুততা তাহাকে ধরিয়া বসিয়াছিল—কি হয়েছে বল! পদ্মা প্রথমে কোন কথা বলিতে চাহে নাই, কিন্তু বিচ্যুতও সহজ পাত্র নহে, সব কথা আদায় করিয়া তবে ছাড়িয়াছে। দাদার কীত্তি শুনিয়া সে তো চটিয়াই আগুন। বলে—এত দূর ভগামি—দুধও খাবেন আবার মুখও মুছবেন! আচ্ছা মজা দেখাচ্ছি। পদ্মা আজ থেকে তুমি আমার কাছে শোবে।

বলা বাহুল্য, দিনের বেলাও পদ্মাবতী হাবুলের নিকট অদৃশ্যমান হইয়া বিরাজ করিতে লাগিল। ফুলশয্যার পর হাবুল তিন রাত্রি একাকী যাপন করিয়াছে। প্রত্যেক রাত্রে সে যতবার উঠা বসা এবং পায়চারি করিয়াছে তাহা পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফিল্মের সাহায্যে দেখান সম্ভব হইলে হাবুলচন্দ্রের ক্রিয়ায় গতি মিনিটে একশো মাইলের কম হইবে না। তা ছাড়া এ কয়দিন সে একটিবারও চক্ষু ও নাসিকার

সহযোগস্থাপন করিতে পারে নাই। পতঞ্জলি তাহাকে কোন সাহায্য করেন নাই, জৈমিনি নির্বাক, কণাদও নিরুত্তর। সেদিনকার টিকটিকিটাও পলাইয়াছে। দক্ষিণেশ্বরের কালীমাতার সহস্র নয়নে করুণা অথবা বিক্রপ তাহাও হাবুল স্থির করিতে পারে নাই। বারবার শুধু মনে পড়িয়াছে—যাক, সে কথা বলিয়া আর লাভ কি?

আজ হাবুলের তৃতীয় রাত্রি। সে বিছানার উপর চক্ৰ বৃজিয়া পড়িয়া আছে। গত দুই রাত্রি একটিবারও তাহার চোখে ঘুম আসে নাই, আজও যে আসিবে না, তাহা সে নিশ্চিত জানিত। কিন্তু উপায় কি আছে? অর্থাৎ কি করিবে সে? বাস্তবিক তাহার করিবার মত কিছুই নাই, চক্ৰ বৃজিয়া পড়িয়া থাকাই ভাল। কিন্তু তাহাতেও কি পার আছে ছাই! আজ তো ঘরটায় ফুলের চিহ্নমাত্রও নাই, তথাপি আজিকার বাতাস তেমনি চকল এবং সেই চকলতার চেউএ ঘরময় ভাসিয়া বেড়াইতেছে ফুলের গন্ধ ও পদ্মার মূদিত চোখের হাসি। হাবুল বিরক্ত হইয়া উঠিয়া জানালা বন্ধ করিয়া দিল। মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিল—এইবার সে নিশ্চয় ঘুমাইবে এবং শেষ রাত্রে উঠিয়া ধ্যান আরম্ভ করিবে।

হাবুলের পরিশ্রান্ত স্বাম্যমণ্ডলী কিয়ৎকালের জ্ঞাত মুহূর্ত্তমান হইয়া পড়িয়াছিল। এমন সময় হঠাৎ বীণানিন্দিত স্বরে কে যেন বলিয়া উঠিল—কত রাত আর জাগবে, ঘুম পায় না বৃষ্টি!

হাবুল জ্যামুক্ত দহকের মত শয্যাতে লাকাইয়া উঠিল এবং চতুর্দিকে চাহিয়া দেখিল—কেহ কোথাও নাই। ঘরে অসহ গরম, ঘামে তাহার সর্বাঙ্গ ভিজিয়া গিয়াছে। হাবুল মাতালের মত টলিতে টলিতে ঘরের বাহিরে আসিল। বারান্দার অপর প্রান্তে বিদ্যুজ্বলতার শব্দকক্ষ। দ্বার প্রান্তে আসিয়া হাবুল দেখিল দরজা খোলাই আছে,

ঘর অন্ধকার। দক্ষিণের জানালা দিয়া ছ হ করিয়া বাতাস ঢুকিতেছে এবং বৃষ্টি অন্ধকারে বিদ্যুতের মশারিটা বাতাসের আবেগে পাগল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু পদ্মা কোন দিকে আছে তাহা হাবুল জানে না। যদি হাবুল ভুল করিয়া বিদ্যুতের গায়ে হাত দিয়া ফেলে, তবে তো অনর্থ, বাধিয়া যাইবে। হঠাৎ এক বৃষ্টি তাহার মাথায় আসিল। একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা দরকার, উহার জাগিয়া আছে কিনা, যদি থাকে গোলমাল করিবার পূর্বেই সে সরিয়া পড়িবে, আর যদি ঘুমাইয়া থাকে তবে হাতড়াইয়া দেখিলেই চলিবে; হাবুল একবার মুছ কাসিল, কোন সাড়াশব্দ নাই। হাবুল পুনরায় কাসিল, এবার বেশ একটু জোরে। তথাপি সব চূপচাপ। সে বুঝিল আর অপেক্ষা করা বুঝা। মশারির মধ্যে হাত ঢুকাইয়া দিতেই যাহার হউক একটি ছোট পা তাহার হাতে লাগিল। হাঁ, এত ছোট পা বিদ্যুতের হইতেই পারে না। হাবুলের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল শুধু একটু জোরে পায়ের উপর চাপ দেওয়া, কিন্তু উত্তেজনার সময় প্রত্যেক কাজটাই যে ইচ্ছার অধুপাতে সম্পন্ন করা যায়—তাহা নহে। হাবুল পাটাকে রীতিমত জোরে টানিয়া দিল।

ইহার পরিণতি এরূপ অভাবনীয় আকারে দেখা দিবে তাহা হাবুল কল্পনাও করে নাই। দুইটি আর্ন্ত নারীকণ্ঠের “বাইগো বাবাগো” ইত্যাদি সমবেত চীৎকারে পাশের ঘর হইতে হাবুলের পিতামাতা নিদ্রাভঙ্গে ছুটিয়া আসিলেন। অন্ধকারে মহাগোলযোগ শুরু হইল। হাবুলের অন্তরাস্ত্রা খাঁচা পরিভাগ করিল। যদিও সে বৃষ্টিতে পারিল পলায়নের এই মহেন্দ্রকণ্ঠ, তথাপি সে এক পা নড়িতে পারিল না, কারণ দুইটি পাই তাহার পাখর হইয়া গিয়াছে—ইহা সে বেশ অহুভব করিল। তাছাড়া পিতার হাতে যদি লাঠি থাকে, দরজার বাহিরে পা দিবামাত্র

সেই লাঠি তাহার ঘাড়ে পড়িবে, তিনি তো আর অন্ধকারে তাহার একমাত্র বংশধরকে চিনিতে পারিবেন না! কাজেই স্বস্থানে অবস্থান করাই শেষ, তাহা হইলে হয়তো একটা কিনারা হইতেও পারিবে।

বিশ্বের প্রথম ধাক্কাটা সামলাইয়া হাবুলের পিতা আলো জালিয়া আনিলেন। হাবুল দৃশ্যমান হইল, কিন্তু তাহার দৃষ্টি কড়িকাঠে। হাবুলের পিতা আশ্চর্য্যবিত্ত হইয়া কহিলেন—কিরে, তুই এখানে! এত রাত্রে! কি দরকার? হাবুলের চমক ভাঙ্গিল,—আজ্ঞে না, এই আমার—কি বলে, ইয়ে—গতমাসের ইয়েটা—কোথায় গেল, তাই—

পিতা থামাইয়া দিয়া বলিলেন—হঁ, তোমার ঘরে যাও। তিনি পত্নী ও কন্ডার সহিত দৃষ্টিবিনিময় করিলেন,—হাবুল ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। বিদ্বান্ধতা অনেক কষ্টে হাসি চাপিয়া বলিল—মা, এইবার তোমরা যাও, আমরা ঘরে থিল বন্ধ করে শুছি পদ্মা কাঠ হইয়া পড়িয়া ছিল। হাবুলের মা বলিলেন—কি যে ছেলেমাছুরি করিস বিদ্বাং, তোর এখনও কাণ্ডজ্ঞান হ'ল না!

শেষ দৃশ্য। হাবুলের কক্ষে পদ্মাবতী দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। হাবুল অনেক সাধাসাধনা করিয়াছে—পদ্মা কথা কহে নাই। হাবুল বলিতেছে—পদ্মা, সেদিন তোমার পায়ে ধরাটা আমার পক্ষে ভারী অত্যাঘ হয়েছিল, তুমি আমাকে ক্ষমা কর, করবে না? শুনছ, ও পদ্মা!

পদ্মা নিরুত্তর।

—আমার একটা কথারও জবাব দেবে না, পদ্মা? তুমি কি পাষণ্ড?
হাবুলচন্দ্র পুনরায় পদ্মাবতীর পদধারণ করিল।

ভবানীচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত

কলিকাতা কমলালয়

(পূর্বাহ্নরুতি)

বি, প্র, ভাল মহাশয় তোমাকে জিজ্ঞাসা করি এই কলিকাতার মধ্যে ভদ্রলোকেরদিগের চারি পাচ দল আছে ইহাতে আমার অনেক সন্দেহ হইয়াছে। ১ প্র,। এই যে অনৈক্য না হইলে দল হয় না ইহাতে ভদ্রলোকের অনৈক্যতার কারণ কি, ২ প্র,। দলপতি মহাশয়েরা চেষ্টা করিয়া কি দল করেন, ৩ প্র,। দলপতির ইহাতে লভ্য কি, ৪ প্র,। দলপতিরদিগের দলস্থ সকলকে বশীভূত রাখিতে কিছু ব্যয় হয় কি না, ৫ প্র,। দলস্থ সকলে দলপতির সহিত কিরূপ ব্যবহার করেন, ৬ প্র,। দল করিবার ফল কি, ৭ প্র,। কোন লোক যদি কাহার দলাক্রান্ত না হয় তাহাতে ক্ষতি কি, ৮ প্র,। এক ব্যক্তি কোন দলভুক্ত আছে সে ব্যক্তি সে দল পরিত্যাগ করিয়া অন্য দলে যাইতে পারে কিনা, ৯ প্র,। দলপতিরা আপন স্বেচ্ছায় কাহাকেও ত্যাগ করেন কিনা, ১০ প্র,। [৪৮] এক২ জাতির কি এক২ দল, ১১ প্র,। ব্রাহ্মণেরা কি দলপতি কি ধনীলোক, বা রাজদত্ত সম্মানিত ব্যক্তি দলপতি হইয়া থাকেন এই দলের বিষয়ে

মহাশয়কে বিশেষ মনোযোগপূর্বক উত্তর করিতে হইবেক ইহার অনেক ঘোটে হইয়া থাকে এবং হইবেক ॥

ন, উ, রাম, একি বৃহদ্ব্যাপার উপস্থিত করিয়াছ দলাদলির উত্তরে বৃদ্ধি অনেক গালাগালি থাইতে হইবেক কারণ দলপতিদিগের নিগৃহীতপ্রিয় বিবেচনা করিয়া বলিতে হইবেক ইহাতে কে তুষ্ট কে রুষ্ট হইবেন বলা যায় না।

১ দলপতি সম্মান অমৃতভিক্ষিত আছে তাহা প্রাপ্তি নিমিত্ত অনেকের বাঞ্ছা স্বতরাং অনেকে এক দ্রব্যভিলাষী হইলেই পরস্পর অমৈত্র্য হইয়া উঠে।

২ কেবল দলপতির চেষ্টায় দল হয় এমত নহে গণেরদিগের অনেক আকিঞ্চন হয় এবং ভদ্রতর লোকেরা যাহাকে পক্ষপাতশূন্য অথচ সর্বত্র [৪০] মাত্র গুণিগণাগ্রগণ্য বিবেচনা করেন তাহাকেই দলপতি করিতে যত্ন পান।

৩ দল করিতে দলপতির লভ্য এই, আপন দলের মধ্যে কোন ব্যক্তির বাটীতে কোন বৃহৎ কৰ্ম্ম অর্থাৎ পুরাণ আরম্ভ সমাপন দিবসে এবং পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধাদি কৰ্ম্ম উপস্থিত হইলে ঐ ব্যক্তি দলপতির নিকটে আসিয়া আপন বিষয় অবগত করান এবং আপন বিভবায়ুসারে ব্যয় করিবার ক্ষমতাও জানান তিনি সেই ব্যয়োপযুক্ত লোক নিমন্ত্রণ করিবার ফর্দ করিয়া দেন আপন দলের নৈক্যভাবাপন্ন কুলীন ব্রাহ্মণ এত, ভঙ্গ কুলীন এত, অধ্যাপক এত, সেই ফর্দ প্রমাণ নিমন্ত্রণ হয় পরে সিংহ ও পজ দেওয়ান তৎপরে কৰ্ম্ম দিবসে নির্ণয় সময়ে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিসকলে দলপতির অহুমতি লইয়া কৰ্ম্মকর্ত্তার বাটীতে আগমন করেন দলপতি প্রায় সর্বত্রই কিঞ্চিংকাল বিলম্ব করিয়া গমন করিয়া থাকেন [৫০] সকল লোক তাহার প্রতীক্ষা করিয়া সভায় বসিয়া কাল যাপন করেন

অধ্যাপকেরা সভাস্থ হইয়া পরস্পর নানা শাস্ত্রের বিচার করিতেছেন কুলজ কুলীন মহাশয়সকল এবং কুলচাৰ্য্যসকল কুলজীর ব্যাখ্যা করিতেছেন গোষ্ঠীপতিকে বেষ্টিত করিয়া কুলীনসকল বসিয়াছেন ভট্টেরা কৰ্ম্মকর্ত্তার বংশাবলি ও পূৰ্ব্বপুরুষের এবং তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিতেছে ঐ সভাবাটীর দ্বারে দ্বারপালেরা হস্তপদাদি দ্বারা নিমন্ত্রিত ভিন্ন অস্থ লোকের গমন বারণ করিতেছে এমত সময়ে অতি আশ্চর্য্য-বন্ধুবান্ধবসমভিব্যাহারে ভূপতিভুল্যাম্যাদ দলপতি আসিয়া উপস্থিত হইলেন তৎকালে সভাস্থ সকলে গাত্ৰোত্থান পূর্বক আসিতে আজ্ঞা হয় ইত্যাদি পূজ্যতাবোধক সম্বোধন বাক্যোচ্চারণ পুরঃসর অভ্যর্থনা করেন তৎপরে দলপতি তন্মহাবল্লি স্থানে পৃথক আসনে উপবিষ্ট হইয়েন কিঞ্চিংকাল বিলম্বে জিজ্ঞাসা করেন অমুক [৫১] আসিয়াছেন ইত্যাদি, পরে কৰ্ম্মকর্ত্তা দলপতির নিকট আসিয়া গললম্বীকৃতবাসা হইয়া নিবেদন করেন বেলা বা রাত্রি অধিক হইয়াছে অহুমতি হইলে সভাস্থ মহাশয়দিগে মালা চন্দন অৰ্পণ করা যায় দলপতি অহুমতি করেন গোষ্ঠীপতি অমকের নিকট যাও, তাহার অহুমতি হয় পরে কুলীন ও অধ্যাপক মহাশয়সকলেও অহুমতি করেন পরে পরিচারক ব্রাহ্মণেরা চন্দনের বাটী ও পুষ্পমালা আনিয়া কহে অগ্রে চন্দন কাহাকে দেওয়া যাইবেক সে সময় প্রায় অনেক স্থানে বিরোধ হইয়া থাকে যেহেতু চন্দনের পাজ গোষ্ঠীপতি হইয়েন সে সভায় দুই তিন জন থাকিলেই স্বতরাং বিরোধ হয় পরে দলপতি বিরোধ ভঞ্জন করিয়া দেন অগ্রে গোষ্ঠীপতির চন্দন হইলে সভাস্থ ব্রাহ্মণের হয় তৎপরে দলপতির চন্দন হয়

তৎপরে অগ্রপশ্চাৎবিবেচনা থাকে না একাদিক্রমেই মালাচন্দন হইয়া থাকে পরে সকলেই আপন-স্থানে প্রস্থান করেন অনন্তর যাহার [৫২] সহিত যাহার আহার ব্যবহার থাকে তাহার আহার করিয়া

ধাকেন পরে দলপতি মহাশয় উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া বিদায়ের অঙ্গপাত করিয়া দেন কর্তৃকর্তা তদনুসারে সম্মান পূর্বক সকলকে দানাদি প্রদান করেন ইহাতে দলপতির যে লভ্য হয় তাহা আমি আর অধিক কি কহিব আপনিই বিবেচনা করুন।

৪ উত্তর, দলস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগে আপন বাটার কথোপলক্ষে বৎসরের মধ্যে প্রায় দুই একবার ক্রিষ্ণ ২২ দিতে হয় এবং দুর্গোৎসব সময়ে পাত্রবিশেষে পূজার পূর্বে কোন কোন ব্যক্তিকেও পূজার সময়ে ভগবতীর প্রসাদি দ্রব্য নৈবেদ্য তৈলস্ব বস্ত্র ইত্যাদি দিতে হয় অত্র লোকের পূজাদিতে যে ব্যয় হয়, তাহা হইতে দলপতির অধিক ব্যয় হইয়া থাকে আর দলপতিকে অধিক বাক্য ব্যয়ও করিতে হয় তাহার কারণ দলের ঘোট প্রায় সর্বদাই আছে।

[৫৩] ৫ উত্তর, এক প্রকার ৩ ধারাতে কহিয়াছি যে দলপতির অমুমতি ব্যতিরেকে কোন স্থানে গমন করা যায় না এবং কাহাকেও বলা যায় না পুনশ্চ বালি, যখন যিনি দলভুক্ত হয়েন তখন দলপতির ক্ষতি তাহাকে নিজ নাম লেখাইতে হয় এবং যদি কোন ব্যক্তি দোষী বা অববাদগ্রস্ত হয় তবে দলপতি দলস্থ সকলকে ডাকাইলে তাহার নিকট যাইতে হয় সকলের পরামর্শ যাহা স্থির হয় তাহা দলপতি আজ্ঞা করিলেই করিতে হয়।

৬ উত্তর, দলের ফল শুন দল থাকিলে লোকের জাতি ও ধর্ম থাকে যেহেতু কোন ব্যক্তি কুকর্ম করিলে তাহার বাটাতে কেহ জলস্পর্শ করে না এবং পদার্পণও করে না তাহার সহিত কাহার নৈকট্যতা বা স্কটবৃত্ততা কিবা আত্মীয়তা থাকিলেও দলস্থ লোকের ও দলপতির অমুমতি না হইলে যাইতে পারেন না ইহাতে শঙ্কিত হইয়া লোকসমূহ তাহার ব্যবহার করেন তাহাতে [৫৪] ধর্ম রক্ষা পায় আর কেহ

যদি মিথ্যাপবাদে পতিত হয় তবে দলপতি আপন গণকে বলা তাহাকে উদ্ধার করেন ইহাতে তাহার জাতি রক্ষা পায়, অতএব দলাদলের ফল আপনি বিবেচনা কর।

৭ উত্তর, এই স্থানে বসতি করিয়া কেহ যদি দলভুক্ত না হয়েন তবে তাহার অনেক ক্ষতি হয় যেহেতু তিনি কোন কর্ম করিলে তাহার বাটাতে কেহ যায় না এবং তিনিও কাহাকে নিমন্ত্রণ করিতে পারেন না যদিও তাহার কর্ম আটক হয় না যেহেতু নানা দেশনিবাসি অর্থাৎ বিষ্ণুপুর কাশীঘোড়া প্রভৃতি স্থানের ব্রাহ্মণ কলিকাতায় অনেক পাওয়া যায় তথাচ গ্রামস্থ লোক তাহার বাটাতে গমন না করিলে কেবল তাহাকে একাকী থাকিতে হয় তাহাতে লোকে যাহা বলিয়া থাকে তাহা বিবেচনা কর।

৮ উত্তর, দলপতি ত্যাগ করিতে পারে কি না, এ প্রশ্ন তুমি অতি বালকের দ্বারা করিয়াছ যে [৫৫] হেতু দলপতির অধিকারে কেহ বাস করে না কেবল লৌকিক ব্যবহারানুরোধে এক ব্যক্তিকে জেষ্ঠ্য করিয়া সম্মান প্রদান করিয়াছেন মাত্র অতএব ঐ মানদাতা ব্যক্তি যদি দলপতির মান প্রদান না করেন তবে তাহার কে কি করিতে পারে হুতরাং সে ব্যক্তি স্বচ্ছন্দে দলপতিকে অবজ্ঞা করিয়া আপন যেচ্ছায় দল পরিত্যাগ করিতে পারে।

৯ উত্তর, দলপতি আপন যেচ্ছায় কাহাকেও বিনা কারণে পরিত্যাগ করেন না করিলেও করিতে পারেন কিন্তু তাহার নিমিত্ত বহু বিরোধ উপস্থিত হয় তাহার কারণ দলস্থ লোকেরা জিজ্ঞাসা করেন যে মহাশয় আপনি অমুককে কি অপরাধে পরিত্যাগ করিলেন তাহার কারণ দর্শাইতে না পারিলে বরঞ্চ দল ভাদ্রিবার সম্ভাবনা হইয়া উঠে ইহাতেই বোধ হয় যে দলপতি ত্যাগ করিলেই করিতে পারেন এমত নহে।

১০ উ০ জাতি মাত্রেই একই দল এমত নহে [৫৬] ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ ইহারদিগের দলভুক্ত কামার কুমার তিলি মালি শাকারি কাশারি গন্ধবণিক তন্ত্রবায় প্রভৃতি জাতি আছেন কিন্তু ইহারদিগের স্বস্বজাতীয় আহার ব্যবহার বিষয়ে ভিন্নই দল আছে এক জাতিতে দল কেবল স্ববর্ণবণিকেরদিগের দেখিতেছি।

১১ উত্তর, ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও নবসাক সম্বলিত যত দল দেখিতে পাও ইহার দলপতি ব্রাহ্মণ আর কায়স্থ ব্যতিরেকে অন্য জাতি নহে আর ধনবান ও রাজদত্ত মানে মাচ্ছমান লোক দলপতি হইলে এমত নহে ধনবান জিম্বাবান বিবেচক মধ্যাদক লোক দলপতি হইয়া থাকেন।

বি, প্র, আপনকার অমুগ্রহেতে দলাদলের বিষয় তাবৎ অবগত হইলাম কিন্তু শূদ্রে ব্রাহ্মণের দলপতি হইয়া থাকেন ইহা শুনিয়া বিশ্বয়াপন্ন হইয়াছি তাহাতে ব্রাহ্মণঠাকুর মহাশয়রা কি আপন স্বেচ্ছাপূর্বক তাহারদিগের দলভুক্ত থাকেন কি তাহারা ভয় কিম্বা লোভ দর্শি [৫৭] ইয়া আপন দলভুক্ত করেন, বিবেচনা করুন ইহাতে উভয়ের মন্দ হইতে পারে যেহেতু আপনকার প্রমুখ্যে যে প্রকার দলপতির প্রাধাত্য শুনিলাম তদনুসারে প্রধানতঃ ব্রাহ্মণের উপর প্রকাশ হইলে ভূদেবদিগের মানের লাঘব হয় তৎপ্রসূক্ত দলপতিরো পাপ হইতে পারে।

ন, উ, তুমি অবিবেচনার যদি প্রশ্ন কর তবে তোমার কথায় আমি নিরুত্তর হইব দলপতির প্রধানতঃ দ্বারা ভূদেবদিগের অপমান হয় এ তোমার বৃষ্টিবার ক্রটি যেহেতু আমি তোমাকে অবগত করিয়াছি যে দলপতির মান দশজনে দিয়াছেন এবং বাহাতে ব্রাহ্মণ ঠাকুরদিগের মানের ও লাভের আধিক্য হয় তাহাই দলপতি চেষ্টা করেন যদি বল যে তাহার অহুমতি লইয়া কর্ত্ত করিতে হয় সে যেমন এক ব্যক্তি

বিবেচক লোকের স্থানে পরামর্শ লওয়া এতাবদ্ব্যজ্ঞ আর যদি বল যে সভামধ্যে চন্দন তাঁহাকে [৫৮] দিতে হয় তাহাও বিবেচনা করিতে পারেন নাই, অগ্রে গোষ্ঠীপতিকে চন্দন দিয়া থাকে, মালাচন্দন কুলীন মহাশয়দিগে দিতে হয় কারণ ব্রাহ্মণের মধ্যে তাহারাই শ্রেষ্ঠ অতএব সকল কুলীনের পূজক অর্থাৎ চারি মেলের কুলীনকে যিনি কড়া দান করেন তাঁহাকে গোষ্ঠীপতিবলে দেবতার তুষ্ট হইলে যেমন বর প্রদান করেন তেমনি কুলীন দেবতার গোষ্ঠীপতিকে চন্দন প্রদান করিয়াছেন গোষ্ঠীপতির চন্দন হইলে সকলকে দেওয়া সিদ্ধ হয় তৎপরে দলপতি দেবনিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করিয়া থাকেন ইহাতে তাহারদিগের অপমান কি প্রকারে হয়।

বি, প্র, শুনিয়াছি কলিকাতায় যত দল আছে সকল দলেরি কায়স্থ জাতি দলপতি, ব্রাহ্মণ দলপতি এক জনও নাই কিন্তু যদি ব্রাহ্মণ দলপতি এক জনও না থাকেন তবে বড় খেদের বিষয়, যেহেতু আপনি দলপতির যে লক্ষণ [৫৯] কহিয়াছেন সে লক্ষণজ্ঞাত অনেক ব্রাহ্মণ আছেন তাহারদিগের দল না হয় কেন।

ন, উত্তর, তোমার কথার উত্তর পশ্চাৎ করিব সংপ্রতি জিজ্ঞাসা করি তোমার নিবাস বৃষ্টি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের অধিকারে হইবেক যেহেতু শুনিয়াছি যে তাহার অধিকারে ব্রাহ্মণসকল শূদ্রের বাটীতে আহার করা দূরে থাকুক মালাচন্দনার্থেও পাদার্পণ করেন না ইহাতে আমার বোধ হইতেছে যে শূদ্র দলপতির প্রতি তোমার প্রীতি নাই ব্রাহ্মণ দলপতি হইলে আপনি কিছু তুষ্ট হও ভাল তোমাকে সন্তুষ্ট করি।

এই কলিকাতায় ব্রাহ্মণ দলপতিও আছেন তাহারদিগের দলে কেবলই ব্রাহ্মণ ইহাতে কুলীন ও শ্রোত্রিয় ও বংশজ সকলেই আছেন। আর কোন জাতি নাই।

বি, প্র, দল বিষয়ক অনেক প্রশ্ন করিয়াছি আর এক প্রশ্ন করিয়া এ বিষয়ে ক্ষান্ত হইব আপনি কহিয়াছেন যে অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য মহা[৬০] শয়রাও দলভুক্ত আছেন ইহাতে তাঁহারদিগের ক্ষতি হইতেছে কি, না, আমার বোধ হয় যে অনেক ক্ষতি হইতেছে এবং তাঁহারাও একদলভুক্ত থাকিতে বড় সম্ভট নহেন যেহেতু তাঁহারা আপনঃ পরিবার পরিভ্যাগ করিয়া মানের লাঘবতা স্বীকার পূর্বক কিঞ্চিৎ অর্থ লাভের নিমিত্ত কলিকাতায় টোল চৌবাড়ী করিয়া কষ্টে কাল যাপন করিতেছেন যদি বলেন মানের লাঘবতা কি, তাহা আপনারা কলিকাতায় বসিয়া জানিতে পারিবেন না পল্লিগ্রাম নিবাসি অধ্যাপক মহাশয়রা কহিয়া থাকেন যে কলিকাতায় যেসকল অধ্যাপকেরা ব্যবসায় করিতেছেন সে কেবল নাম মাত্র তাঁহারদিগের প্রায় কাহারো প্রকৃত রূপ ব্যবসায় হয় না ইত্যাদি দোষ, আর যে সকল সংকল্প করিয়া থাকেন তাহারো অহুরাগ পান না সে যাহা ইউক এ সকল দোষ স্বীকার করিয়াও যদি কিঞ্চিৎ লাভ হয় তবে ক্ষতি নাই কিন্তু সে লাভের সম্ভাবনাও [৬১] নাই যেহেতু দলদল তাহার মহৎ প্রতিবন্ধক হইয়াছে তন্নিমিত্ত সর্বত্র গমনাগমন করিতে পারেন না স্বতরাং লাভ হইতে পারে না অতএব আমি বলি অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের সহিত দল না করিলে ভাল হয় আর তাহা না হয় দলপতিরা এমত বিবেচনা করেন যে কলিকাতার মধ্যে যে কয়েক দল আছে সকল দলে সংবৎসরে যাহা দিয়া থাকেন তাঁহারা স্বততপরত তাহাই দেন নতুবা দল করিয়া কেবল নিমজ্জণোপভোগি ব্রাহ্মণদিগে ক্রেশ দেওয়া হয় কি না ইহা বিবেচনা করুন।

ন, উ, দল অনেক হওয়াতে কেবল অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যদিগেরি লাভাধিকা হইতেছে যেহেতু পূর্বের কখন জনিয়াছেন যে অধ্যাপক

বিষয় ১০০৮০।৩০।৫০।৩০। টাকা, ইদানী অনেক দল হওয়াতে রূপা-সোনার দানসাগর এবং অধিক টাকা বিদায় দেওয়া কেবল স্বেষােষ্য প্রযুক্ত করিতেছেন যদি সকলে একা [৬২] হইতেন তবে কি তাঁহারা এত টাকা বিদায় পাইতেন। ১০।১৫।২০। বিদায়ের হার হইত, এক স্থানে ১০০ টাকা আর রূপার ঘড়া গাছু ইত্যাদি বিদায় পাওয়া যায়

অতএব একই দলস্থ হওয়াতে তাঁহারদিগের বড় স্বত্ব হইয়াছে অত্যাচ্ছ লোকের বরঞ্চ কোন লাভ নাই আর এক্ষণে যেব্যক্তি কোন কর্ম করে সে অগ্রে অধ্যাপক নিমন্ত্রণ করিয়া থাকে পূর্বে কেবল আশ্র-শ্রাদ্ধাদিতেই নিমন্ত্রণ হইত অত্ৰ মামূলিক কর্মে তাহার নামও করিত না এক্ষণে দলপতিরা সচেষ্ট হইয়া নিমন্ত্রণ করান কর্মকর্তারা দলপতির অহুরোধে এবং আপন ধর্ম ও স্থাতি ও ঐশ্বর্য্য প্রকাশ-করণার্থে পূর্বসংস্কার মামূলিক কর্মে অধ্যাপক নিমন্ত্রণ করা রীতি ছিল না তাহা অত্থথা করিয়াও সংপ্রতি নিমন্ত্রণ করিয়া বহু দান বিতরণ করিতেছেন দলাদলি না থাকিলে কি এমত হইত।

বি, প্র, আমি জনিয়াছি দলপতিরা আপনঃ দল [৬৩] পুষ্টির কারণ ৫।৭।১০।২০।২৫। হাজার টাকা কর্জ দিয়া দোকান কিম্বা অত্ৰ ব্যবসায় করণ তৎপরে তাহাকে আপন দলভুক্ত করেন, অত্ৰ আর এক জন তাহা হইতে অধিক দিয়া আপন দলে লইয়া যায় একথার আপনি কি জানেন।

ন, উ, এ হইতে পারে অমূলক কথা কখন হয় না আমি ইহার বিশেষ জানি না কোন জাতি বিশেষের হইবেক কিন্তু কায়স্থ ব্রাহ্মণ-দিগের দলের মধ্যে এমত শুনা যায় নাই।

বি, প্র, শুন মহাশয় তোমার প্রসাদে অনেক বিষয় অবগত হইলাম সম্প্রতি বিজ্ঞাবিষয়ক কতকগুলিন ব্যবহারের প্রশ্ন করি মহাশয়

গুণসাগর তাহার সন্তুস্ত করিয়া আমাকে বিজ্ঞ করুন ইহাতে কিছু মনে করিবেন না যেহেতু পাড়াগৈয়ে বলাই বড়, ইহা আপনি কহিয়াছেন, আর শাস্ত্রেও এমত কথিত আছে যে প্রাজ লোক অজ্ঞ লোকের সন্দেশ ভঞ্জন অবশ্যই করিবেন।

[৬৪] যথা সংশয়োৎপন্নহুংখংহি, পণ্ডিতভোয়া নিবেদয়েৎ। পণ্ডিতস্তৎপ্রযত্নেন, শাস্ত্রদৃষ্ট্যানিবারয়েৎ। অস্তার্থঃ পুরুষ, বিষয়ে সন্নিহিত হইলে তন্নিবারণার্থ পণ্ডিতদিগো জিজ্ঞাসা করিবেক পণ্ডিতেরা শাস্ত্রাচসারে তাহার সন্দেশ দূর করিবেন, মহাশয় বিজ্ঞ আমি অবিজ্ঞ অতএব আমার সন্দেশ নিবারণ আপনাকে অবশ্যই করিতে হইবেক আমার বাসস্থান পল্লিগ্রাম সেই নিবিড় বনমধ্যে বসিয়া শুনিয়াছি সত্য-মিথ্যা ধর্ম জানেন যে কলিকাতার অনেক ভাগ্যবান লোক আপন সন্তানদিগো অপূর্ণ আভরণ ও বস্ত্রাদি দেন আর বিবাহাদি কর্ণে কেহ এক লক্ষ কেহ দুই তিন চারি পাঁচ লক্ষও হইবেক অত্যানন্দে ব্যয় করিয়া থাকেন কিন্তু শুনিতে পাই আপন সন্তানদিগের বিদ্যা বিষয়ে মনোযোগের অত্যন্ত অল্পতা যেহেতু স্বজাতীয় ভাষা ও অক্ষর শিক্ষার্থে এক জন ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন লোককে কিঞ্চিৎ অধিক বেতন দিয়া না [৬৫] রাখিয়া হ্রস্ব দীর্ঘ ইত্যাদি বিবেচনা শূন্য কেবল অল্পশাস্ত্রে কিঞ্চিৎ জ্ঞানাপন্ন লোককে কিঞ্চিৎ বেতন প্রদানে রাখিয়া তাহাই শিক্ষা করান ইহাতে কিপ্রকারে সেই সন্তানদিগের উত্তম বিদ্যা হইতে পারে আর যদি স্বজাতীয় বিদ্যায় অপরূপতা রহিল তবে অত্যাচ্ছ জাতীয় বিদ্যাতেই বা কিপ্রকারে পারদর্শী হইবেন এবং এক জন ভাল বিদ্বান লোকের স্থানে বালককে বিদ্যা শিক্ষা না করায় কারণ কি তাহাও কিছু বিবেচনায় স্থির করিতে পারিলাম না যদি ধনব্যয় বিবেচনা করি তবে আভরণাদি ও স্তৃতিকা যন্ত্রী পূজা অবধি বিবাহ পর্য্যন্ত ব্যয়ের

খাতা দেখিলে বা শুনিলে আক্কেল গুড়ুম হয়, অর্থাৎ বিশম্বায়ণ হইতে হয় অতএব কক্ণাময় আমার এই ভাবনামল উত্তর ভুলে বিবারণ করিতে হইবেক।

[৬৬] ন, উ, এ বিষয় অনেক বিবেচনা করিয়া উত্তর করিতে হইবেক যেহেতু আমার দৃষ্টচর প্রায় অনেক ধনিলোকের, সন্তান অপূর্ণঃ গুণবান্ তবে ছুই চারিজন নিগুণ এ সহরের মধ্যে থাকিতে পারেন সে যাহা হউক আমাকে তোমার কথার উত্তর করিতে হইবেক, পিতা মাতার মনোযোগের অল্পতা আছে বটে, কিন্তু সকলের নহে তাহার কারণ যাহারদিগের পিতা পিতামহ বিদ্যার দ্বারা ধন উপার্জন করিয়াছেন এবং তদ্বারা মাছও হইয়াছেন তাহারাই বিজ্ঞার মর্ম জানেন এবং সন্তানদিগেরো মনোযোগ পূর্বক বিদ্যা শিক্ষা করণ আর যাহারা বিদ্যা ভিন্ন অল্প কোন কারণে ধন উপার্জন করিয়াছেন এবং করিতেছেন তাহার। জানেন কেবল জমা খরচ জানিলেই, কর্ম চলে বিদ্যা বিষয়ে বুঝা টাকা ব্যয় করিবার আবশ্যক নাই আর আভরণ ও স্তৃতিকা পূজাদি কর্ণে অধিক ধন ব্যয় করণের কারণ শুন সেই সন্তানের জননী [৬৭] প্রীতার্থ এবং সর্বত্র আপন ঐশ্বর্য প্রকাশার্থ, কেহও লোকোপকারার্থ এক কর্ম উপলক্ষ করিয়া অধিক ব্যয় করেন তদ্বারা অনেক লোক কিঞ্চিৎ পায়, কেহ বা রাগদ্বেষ প্রযুক্ত ব্যয় করে, অমুক আপন সন্তানের বিবাহে এই করিয়াছে আমি তাহার আটগুণ করিব যেন এমন বিবাহ আর কেহ না দিতে পারে ইত্যাদি।

বি, প্র, মহাশয় এই কলিকাতায় ভাগ্যবান্ লোকের বাটীতে আমারদিগের দেশস্থ কতকগুলি লোক কোনও কর্মে নিযুক্ত আছেন তাহারদিগের প্রমুখ্যৎ অবগত হইয়াছি যে বাবুসকল নানা জাতীয় ভাষার উত্তমঃ গ্রন্থ অর্থাৎ পার্সি ইংরাজী আরবি কেতাব ক্রয় করিয়া

কেহ এক কেহবা দুই গেলাসওয়ালা আলমারির মধ্যে হৃন্দর শ্রেণী পূর্বক এমত সাজাইয়া রাখেন যে দোকানদারের বাপেও এমত সোনার হল করিয়া কেতাব সাজাইয়া রাখিতে পারে না আর তাহাতে এমন বস্ত্র করেন এক শত বৎ [৬৮] মরেও কেহ বোধ করিতে পারেন না যে এই কেতাবে কাহার হস্তস্পর্শ হইয়াছে অল্প পরের হস্ত দেখিয়া দূরে থাকুক জেলদগর ভিন্ন বাবুও স্বয়ং কখন হস্ত দেন নাই এবং কোনকালেও দিবেন এমত কথাও শুনা যায় না, ভাল আমি জিজ্ঞাসা করি ঐ সকল কেতাব তাঁহারা রাখিয়াছেন ইহার কারণ কি আমি পাড়ার্গেয়ে ভূত কিছুই বুঝিতে না পারিয়া নানা প্রকার তর্ক করিয়া মরিতেছি এক প্রকার এই বুঝা যায় বাবুরা বুঝি শুনিয়া থাকিবেন যে অধিক পুস্তক গৃহে রাখিলে সরস্বতী বদ্ধ থাকেন যেমন অধিক ধন আছে তাহার বায় না করিলে লক্ষী স্থিরী থাকেন বায় করিলেই বিচলিতা হয়েন ইহাও বুঝি তেমনি কেতাব লইয়া আন্দোলন করিলে সরস্বতী বিরক্তা হয়েন তৎপ্রযুক্ত হস্তস্পর্শ তাহাতে করেন না।

দ্বিতীয় প্রকার এই বুঝি যেমন পুণ্যসকল হেতুক ও কেহবা ঐশ্বর্য প্রকাশ হেতুক [৬৯] বিগ্রহ স্থাপিত করিয়া থাকেন ঐ বিগ্রহের সেবার পরিপাটি ও স্তুতি এবং নানা প্রকার আভরণ ও অপূর্ণ মন্দির করিয়া দেন কিন্তু আপনাকে সেবাটিতে একবার প্রণাম করিতেও বাইতে হয় না এওবা সেইরূপ হয় বিদ্যা সংস্থান হেতুক এবং ঐশ্বর্য প্রকাশ কারণ কতকগুলি পুস্তক প্রস্তুত করিয়া আশ্চর্য আলমারির মধ্যে রাখিয়াছেন এবং জেলদগর ও দণ্ডির নিযুক্ত আছে তাহারাই সর্বদা সেই সকল কেতাবের সেবা করিতেছে বাবুকে ঐ কেতাব কখন দেখিতে বা স্পর্শ করিতেও হয় না, আপনি গুণনিধি অতএব এ অবোধকে ঐ বিষয়ের বোধ জন্মাও।

ন, উ, অহে তুমি কি অবোধ তোমার জালায় আমি জলিত হইলাম এমতঃ প্রশ্ন কর যাহা অতি সাধারণ বুদ্ধি দ্বারাও বুঝা যায় ইহাতে বাধা হয় না যে তোমার বাক্যের আর উত্তর করি তবে কি করিব স্বীকার করিয়াছি না করিলে প্রতিজ্ঞা [৭০] ভয় হয় কিন্তু পুনঃ প্রতিজ্ঞা করিলাম যেপাশ্চ তুমি কি তোমার দেশের লোক না বুঝিবেন তাবৎ আমি বুঝাইব সে যাহা হউক এক্ষণে তোমার প্রশ্নের উত্তর করি, পুস্তক প্রস্তুত করিবার কারণ বুঝিতে পারো নাই, অতএব নানা তর্ক করিতেছ, পুস্তক সংগ্রহের কারণ এই ভাগ্যবান লোকের সংসারে তাবৎ দ্রব্যই থাকে তাবৎ রত্ন যত্ন করিয়া রাখেন কিন্তু সর্বদা সকল দ্রব্য ব্যবহার করিতে হয় না যখন যাহার আবশ্যক হয় তখন তাহা ব্যবহার করেন যাহারদিগের সকল পুস্তক ব্যবহার করিবার কোন প্রয়োজন রাখে না তাঁহারা কি এমত দায়গ্রস্ত হইয়াছেন যে ঐ কেতাবগুলি অর্থ বায় করিয়া কিনিয়াছেন তাহা ব্যবহার [না] করিলে দিনযাপন হয় না এমত নহে আর যাহারদিগের কেতাব ব্যবহার না করিলে দিন চলে না তাঁহারা তাহা করিয়াও থাকেন এখন বুঝিলা কেমন মনের মত উত্তর হইয়াছে।

[৭১] বি, প্র, মহাশয়কে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেও ভয় করি যেহেতু এক্ষণে কট্টকটব্য বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন সে যাহা হউক ভালহ বল আর মন্দই বল আমার মনে যতগুলি কথা আছে তাহা না কহিয়া ক্ষান্ত হইব না, সম্ভ্রতি শুনিয়াছি যে কলিকাতায় নানা শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া অতি কোমল ভাষায় এবং সংস্কৃত মূল রাখিয়া তাহার অর্থ অতি স্বগম সাধু ভাষাতে নানা প্রকার গ্রন্থ হইতেছে ঐ সকল পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করণার্থ সবিসৃজিপ্‌সিদ্দান না, কি, বলিয়া থাকে কে জানে পাড়ার্গেয়ে মাছয় সকল বুঝি নী অর্থাৎ চান্দা করে কোন

গ্রন্থের মূল্য ৪৪২।৩০ ইত্যাদি স্থির করিয়া ধনি লোকের নিকট লইয়া যায় তাহাতে কেহ কহেন আমার বান্ধালা গ্রন্থে কিছু প্রয়োজন নাই কেহ বলেন এ সকল বালকদিগের শিক্ষার নিমিত্ত হইতেছে আমারদিগের ইহাতে আবশ্যক কি কেহ বলেন এই ছাপাওয়ালা [৭২] দিগের জালায় আর প্রাণ বাঁচে না সর্বদাই আইসে মহাশয় হিতোপদেশ পুঁথি হইতেছে সহি করুন কেহ বলে দায়ভাগার্থদীপিকা হইতেছে নাম সহি করিয়া দিউন কেহ বলেন কল্যা আইসহ কিন্তু আমিও সেই পাত্র অজ্ঞাবধি এক অক্ষরও লই নাই যদি আমার কাছে আনে তবে কহি কল্যা আসিবা অথবা রবিবারে, শর্মা সেই রবিবারে বাগানে প্রস্থান করেন তাহার। ঘুরে ব্যাড়াই ইত্যাদি ব্যবহার ইহার কারণ কি কহ দেখি শুনি।

ন, উ, হায়২ পরমেশ্বর তোমাকে কিবা বুদ্ধি দিয়াছেন ও, পল্লি-গ্রামস্থ মহাশয়, যে অঞ্চলে বুদ্ধিমান লোক আছে সেদিগ দিয়াও বুদ্ধি তোমার কখন গমন হয় নাই যেহেতু তুমি ইহা বুদ্ধিতে পার না যে এই কলিকাতায় যত ছাপাখানা আছে তাহাতে যেসকল পুস্তক প্রস্তুত হইতেছে তাহা কোথায় যায়, ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে এই নগরবাসী লোকেই [৭৩] প্রায় তাবৎ লইয়া থাকেন তোমার পাড়ার্গেয়ে লোক কয়খানা পুস্তক লয়, আমি মনে করি অনেক স্থানের লোক অজ্ঞাপি জানেও না যে ছাপাখানা কি প্রকার, তবে যে কহিতেছ পুস্তক গ্রহণ নিমিত্ত অনেকে স্বাক্ষর করেন না তাহার কারণ শ্রবণ কর, তুমি ভাই পাড়ার্গেয়ে মাছুষ ঘড়ী কাহাকে বলে তাহা জ্ঞান না যদি এক শত টাকা মূল্যের একটি ঘড়ী তোমাকে পাঁচ টাকা মূল্যে দেওয়া যায় তুমি কি তাহা গ্রহণ করিয়া থাক তেমনি এক ব্যক্তি কোন ভাগ্যবান লোকের বাটীপ্ৰ পাচক ব্রাহ্মণ, দিবা কপাল যুড়ে ফোটা

করিয়া শুভ বস্ত্র পরিধান পূর্বক গমন করিতেছে, তাহাকে যদি কেহ বলে মহাশয় ছায়াদর্শন প্রভৃতি সকল দর্শন টাকা সহিত অল্পমূল্যে পাওয়া যায় আপনি লইবেন সে কি তাহা লয়, আর এক জন মূর্খ কায়স্থ, মূলীখানার দোকান করিয়া কিঞ্চিৎ সংস্থান করি [৭৪] যাচ্ছে বাটা ঘর দরজাও পাকা বটে তাহাকে দেখিয়া তুমি যদি তাহাকে বল মহাশয় সংপ্রতি কলিকাতায় জমীদারি কাগজের এক আশ্চর্য্য পুস্তক হইয়াছে আপনি লইবেন সে তাহার মর্ম্ম কি জানে, আর এক জন চিকিৎসকবেশধারী, হস্তে একটা ঔষধের ডিপা আছে হাড়ি শুড়ি ডোম ইত্যাদি লোকের জড়ি বড়ি লতা পাতা দ্বারা চিকিৎসা করে তাহাকে যদি বল, যে ভরত মল্লিকের টাকা সমেত বৈজ্ঞক গ্রন্থসকল ছাপা হইতেছে মহাশয় লইবেন, সে তাহা লইয়া কি করিবে, এক ব্যক্তি তাঁত বোনা তাঁতি, চিরকাল তাঁত বুনিয়া অপূর্ব্ব অট্টালিকা করিয়াছে তাহাতে তুমি তাহাকে সন্মোক জ্ঞান করিয়া যদি বল যে হিতোপদেশ গ্রন্থ ছাপা হইতেছে লইবেন, তবে সে তোমাকে কি বলে, আর এক জন কড়ি কিছা পয়সা ব্যাচা বেণে কঁতকগুলিন চাবি হাতে করিয়া ভাল মানুষের মত বস্ত্রাদি পরিয়া চিনাবাজারমুখ যাইতেছে [৭৫] তুমি তাহাকে বড় লোক জ্ঞান করিয়া যদি বল মহাশয় এক আশ্চর্য্য বিদ্যুদ্ব্যবহারবিধি গ্রন্থ ছাপা হইতেছে আপনি লইবেন তবে কি সে তাহাতে ব্যগ্র হয়, এক জন তেলি, কেবল দাঁড়িপাল্লা ধরিয়া তুলা বিক্রয় করে তাহাতে ধনোপার্জন দ্বারা সঙ্গতি করিয়া নানা প্রকার ঐশ্বর্য্য করিয়াছে তাহার দ্বারে দ্বারি ব্রজবাসি দেখিয়া বড়মাছুষ বোধ করিয়া যদি বল মহাশয় মুক্তবোধ ব্যাকরণ এবং তাহার ভাষায় টাকা করিয়া ছাপা হইতেছে অতি অল্প মূল্যেই পাওয়া যায় আপনি লইবেন, তবে সে তৎকালে এমত কথা বলে কি না যে তাহার নামে এক থালা,

এক জন মালি, প্রতিদিন প্রাতঃকালে ফুল বিবপত্র লইয়া লোকের বাটীতেই দিয়ে বেড়ায়, তাহার পর দোকানে বসিয়া নগদ বিক্রয় করে দুই চারি দণ্ড বেলা থাকিতে দুই প্রহর রাজি পর্যন্ত রাত্তায় ২ বসিয়া বেড়ায় চাই বেলফুল, এমত লোককে যদি তুমি বল যে [৭৬] প্রবোধ-চন্দ্রোদয় নাটক ভাষা হইতেছে লইবেন, সে তোমাকে অবোধজ্ঞান করিয়া অবশ্যই বলে তাহার মূল্য একটা কলিকার তুল্যও নয়, এক ব্যক্তি কামার কেবল লোহা পীটাইত, পরে কলিকাতায় জিউলরি অর্থাৎ সোনারূপার হীরকাদি দ্বারা আভরণ প্রস্তুত করিয়া কিঞ্চিৎ ধন সঞ্চয় করিয়াছে ভাল ২ কাপড় পরে তাহাই দেখিয়া তুমি তাহাকে যদি বল সমাচার চক্রিকা প্রভৃতি বাঙ্গালা ভাষায় সমাচার পত্র প্রকাশ হইতেছে আপনি লইবেন, তবে সে কি তাহাতে সমাদর করে, আর এক জন কাসারি নূতনবাজারের অঞ্চলে বসিয়া কেবল রাঙ্গা তামা দস্তা সীসা পিস্তল গালাইয়া বাসন বানাইতেছে কলঙ্ক হইলে গুরুর গুড়া দিয়া পরিষ্কার করে, তাহাকে তুমি কহিলে যে দায়ভাগার্থদীপিকা গ্রন্থ লইবা সে তৎক্ষণে তোমাকে এমত কথা বলে কি না যে পুরান পিস্তল কি দরে বিক্রয় কর, এক ব্যক্তি শাখারি শোভাবাজারে বসিয়া শাখের করাত [৭৭] লইয়া কর্ম করিতেছে, তাহার দোকানে অনেক শঙ্খ দেখিয়া যদি বল যে অঙ্কশাস্ত্রের দর্পণ পুস্তক লইবা তবে সে তোমাকে কেননা বলিবেক হাতের শাখা দর্পণে দেখিবার কি কায়, এক ব্যক্তি নাপিত বাজারে ক্ষুরিকর্ম করিয়া বেড়ায়, কোন কোন ভাগ্যবানের সন্তান হইয়াছিল তাহার সংবাদ কোন স্থানে দিয়া দিয়া বস্ত্র পাইয়াছে তাহা পরীধান করিয়া গমন করিতেছে এবং হস্ততে ক্ষুরের ভাঁড়ি ধেরুয়া কাপড় মোড়া আছে তুমি ঐ নাপিতকে তাহাতে গ্রন্থপাঠক জ্ঞান করিয়া যদি বল যে রাসপঞ্চাধ্যায় অমুক কর্তৃক ভাষায়

প্রস্তুত হইতেছে লইবা, সে অবশ্যই বলিবেক ক্ষুরধার ছুঁতে কাটে মাছি, একজন সদোপ কৃষিকর্মে পারগ বড়, কেবল তাহাই বুঝিতে দক্ষ, তাহার অটালিকা বাটা দেখিয়া যদি বল, জ্যোতিঃসারসংগ্রহ গ্রন্থ হইতেছে আপনি লইবা, তাহাতে জিজ্ঞাসা করে কি না যে অমাবস্তা কবে তাহার কারণ অমাবস্তার দিবস কৃষিকর্ম [৭৮] নিবেদ আছে, তাহার গ্রন্থে কি প্রয়োজন, একজন ছুতার কেবল টেকি পীড়ি পুড়ম গড়িয়া থাকে ইদানী আলমারি ঢেঙ্গ প্রভৃতি কাঠের কর্ম করিয়া কিঞ্চিৎ সন্ত্রস্তাপন্ন হইয়াছে দিব্য ঢাকাই ধুতি জামদানের একলাই পরিধান করিয়া অসময়ের ইলিস মস্ত্র ১ একটা ২ দুই টাকায় ক্রয় করিয়া হস্তে লইয়া বাইতেছে তাহাকে যদি বল, ইংরাজী বাঙ্গালা ডেক্সনরি হইতেছে লইবা সে তখন একথা অবশ্যই বলিবে যে মহাশয় করাতি পাণ্ডয়া যায় না কাঠচেরা মস্তিল হইয়াছে আমি কি করিব ইত্যাদি অতএব ধনী লোক মাত্রেই পুস্তকের মধ্য বুকে এবং গ্রাহক হয় এমত নহে ঐ সকল জাতির মধ্যে যাহারদিগের বিজ্ঞা বিষয়ে অধিক আলোচনা আছে তাহারদিগের নিকট লইয়া গেলে অবশ্যই অতৃষ্ণান পত্রে স্বাক্ষর করিয়া থাকেন।

বি, প্র, শুন রূপানিধান মহাশয়, পুস্তক বিষয়ের উপযুক্ত উত্তর প্রদান করিয়াছেন [৭৯] তাহাতে আমি নিরুত্তর হইলাম সংপ্রতি আর এক প্রশ্ন করি এই কলিকাতা মহানগর মধ্যে এবং ইতস্ততো গ্রামে ধর্মার্থে অনেক পাঠশালা কলিকাতানগরস্থ ভাগ্যবান মহাশয়রা করিয়া দিয়াছেন ইহা শুনিয়া আমি মহা আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি যে ঐ সকল ধর্মশীল দয়াময় মহাশয়দিগকে আপনি অবগত আছেন কি না আর ঐ সকল পাঠশালাতে বালকেরা কোন শাস্ত্র

অধ্যয়ন করেন আপনি যদি এই পাঠশালা বিষয়ের বিশেষ অবগত করান তবে না করেন কি।

ন, উ, শুন ভাই পাঠশালা বিষয়ের সকল বিশেষ বৃত্তান্ত আমি বলিতে পারি না কিন্তু যাহা শুনিয়াছি তাহা অবগত করাই যত উত্তমঃ পাঠশালা দেখিতে পাও এ প্রায় তাবতি পাদারি সাহেবেরা করিয়া দিয়াছেন সেই পাঠশালাতে দরিদ্রলোকের বালকেরা এবং ধনিলোকের বালকেরাও বিনা বায়ে বাদ্বালা [৮০] লেখা পড়ায় উত্তম রূপে হুশিক্ষিত হইতেছে এবং ঐ সাহেবেরা বালকদিগের শিক্ষা বিষয়ে বিশেষরূপে মনোযোগ করিয়া থাকেন সেই মনোযোগের বিবরণ কিঞ্চিৎ বলি, বালকদিগের পড়িবার নিমিত্ত উত্তমঃ গ্রন্থ বাদ্বালা ভাষায় প্রস্তুত করিবার কারণ স্থলবুক সোসাইটি অর্থাৎ পাঠশালার পুস্তক প্রস্তুত করণ কারণ এক সমাজ স্থাপন করিয়াছেন তদ্বারা নানাবিধ গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া ঐ বালকদিগের প্রদান করিয়া থাকেন এবং বালকদিগের কি প্রকার শিক্ষা হইতেছে তাহার পরীক্ষা লইয়া থাকেন অপর শ্রীযুত ডেবিড হের নামক এক সাহেব নিজ অর্থ ব্যয় করিয়া পুর্নোক্ত রীতাহুসারে এক পাঠশালা করিয়া দিয়াছেন এবং আপনিও মনোযোগ পূর্বক তাহার অহুসন্ধান করেন পাঠশালার বিবরণ এই তোমাকে কহিলাম।

বি, প্র, শুন করণাময় ঐ পাঠশালার বিষয়ে আমি আর এক প্রশ্ন করি সাহেবেরা বাদ্বালা [৮১] বালকদিগের বিদ্যা শিক্ষা করাইবার নিমিত্ত এতাদৃশ মনোযোগ করণের কারণ কি ইহার উত্তর প্রদানে তোমার নিকট অত্যন্ত বাঞ্ছিত হইব।

ন, উ, সাহেবেরদিগের অভিপ্রায় আমি কি প্রকারে বলিতে পারি আমার বিবেচনা দ্বারা এই হয় যে তাহার ধর্ম্মার্থে পাঠশালা

করিতেছেন যেহেতু তাহার অত্যন্ত ধর্ম্মশীল এবং হুবিচারক এদেশে আসিয়া দেখিলেন যে দরিদ্রলোকের বালকদিগের বিদ্যা উপার্জনের কোন পন্থা নাই তাহাতেই দয়ার্জ্র চিন্তা হইয়া পাঠশালা বিষয়ে মনোযোগ করিয়াছেন।

বি, প্র, আমি এ সকল পাঠশালার মর্ম্ম বুঝিলাম, সংপ্রতি জিজ্ঞাসা করি এতদ্বগরবাসি ভাগ্যবান বাদ্বালা লোকেরা কি কোন পাঠশালা করিয়া দেন নাঞ্চি এবং তাহাদিগের কি এবিষয়ে মনোযোগ নাই।

[৮২] ন, উ, মনোযোগ তাবতেরি নাই এমত নহে যাহাদিগের ইহাতে মনোযোগ আছে তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর কলিকাতার সুপ্রীম কোর্ট আদালতের প্রধান জজ শ্রীযুত স্যার ইডওয়ার্ড ইএট সাহেব হিন্দু বালকদিগের নিমিত্ত হিন্দু কলেজ নামক এক বিদ্যালয় স্থাপিত করণের সময়ে অনেক ধনিলোককে আহ্বান করিয়াছিলেন তাহাতে শ্রীল শ্রীযুত মহারাজা তেজচন্দ্র বাহাদর এবং শ্রীযুত বাবু চন্দ্রকুমার ঠাকুর প্রভৃতি অনেকের মনোযোগ দ্বারা ঐ কলেজ স্থাপিত হইয়াছে সেই কলেজে অনেক বালক নানা বিদ্যা উপার্জন করিয়াছে এবং করিতেছে ঐ কলেজের আর বিশেষ বৃত্তান্ত যদি জানিবার বাঞ্ছা হয় তবে কলেজের রিণ্ডলেনসন অর্থাৎ বিদ্যালয়ের দ্বারা সমাচার চন্দ্রিকায় প্রকাশ আছে তাহা পাঠ করিলেই জানিতে পারিবা।

বি, প্র, ভাল বিজ্ঞা বিষয়ে এই নগর নিবাসি [৮৩] এত ধনিলোকের মধ্যে কেবল এই কয়েক জন ব্যতিরেকে আর কাহারো মনোযোগ না হওনের কারণ শুনিতে অত্যন্ত বাঞ্ছিত হইয়াছি তুমি বাঞ্ছাকল্পতরু আমার এই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর।

ন, উ, যত প্রশ্ন করিয়াছ তাহার যেমন হউক এক প্রকার আপন বুদ্ধাহুসারে উত্তর করিয়াছি কিন্তু তোমার এ প্রশ্নের উত্তর করিতে

অক্ষম হইলাম ইহার কারণ তুমি এক্ষণে যে বিবেচনা কর তাহাই হইতে পারে।

বি, প্র, মহাশয়কে অনেক প্রশ্ন করিয়াছি তাহার উত্তর প্রদানে আমার সন্দেহ নিবারণ করিয়াছেন সংপ্রতি আরো কতকগুলি বিষয়ে সন্দিগ্ধ আছি যদি বিরক্ত না হইয়া উত্তর করেন তবে কৃতার্থ হই।

ন, উ, আপনি বিদ্যা বিষয়ে প্রশ্ন করিবেন ইহাই কহিয়াছিলেন তাহা ভিন্ন অল্প প্রশ্ন করিতেও প্রবৃত্ত হইলেন এ বড় আশ্চর্য্য কথা।

বি, প্র, বিদ্যা ভিন্ন অল্প প্রশ্ন করিবা না [৮৪] কিন্তু অল্প বিদ্যা বিষয়ে কিছু প্রশ্ন করি, শ্রুত আছি যে এতদ্বারা অনেক নবাব ও বাদশাহি বারাক্ষাসকল গীত বাদ্যাদি বিদ্যায় নিপুণতর, তৎকৃত্যুলা কালোঘাত্ গায়ক বাদক হইয়াছে ইহার আপনি কি জানেন।

ন, উ, গান বাজনাশকল ভালমতে বুঝি না কিন্তু গ্রিহারা কি প্রকার কালোঘাত্ হইয়াছেন তাহা আপন বুদ্ধাভ্যাসে বলি যেমন কাঁঠালের আমসম্ব ইহাই বিবেচনা করিবা।

বি, প্র, মহাশয় আমি শুনিয়াছি যে অনেক ভাগ্যবান লোকের নিকট কতকগুলি লোক নিয়ত যাতায়াত করে প্রতিদিন প্রাতঃকালে যায় বেলা দশ এগার ঘণ্টা পর্যন্ত বসিয়া থাকে এবং বৈকালে যায় রাজি দুই প্রহর পর্যন্ত তথায় কালযাপন করে আর ইহাদিগের কেবল এই কথ্য যে অনবরত বাবুর হাই উঠিলে তুড়ি দেয় এবং আজ্ঞা যেআজ্ঞা মহাশয় করে, ইহাতে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে ঐ সকল লোক কোন কথ্যে [৮৫] পারগ কি, না, আর কোন শাস্ত্রে কিছু দৃষ্টি আছে কি, না, আর ইহারা যে যেখানে গিয়া থাকে সে নিয়ত তাহার নিকট গমনাগমন করে, কি, সর্বত্রই যায় এই তাহাদিগের কথ্য, আমি ঐ সকল ব্যক্তির বিশেষ অবগত হইবার নিমিত্ত অস্থঃকরণে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছি।

ন, উ, আপনি যাহা শুনিয়াছেন তাহা মিথ্যা নহে অনেকের নিকটে লোক নিয়ত যাতায়াত করে বটে, যে সকল লোক গমনাগমন করে তাহার মধ্যে অনেক প্রকার লোক আছে কেহ বাদশাহি পারসি ইংরাজী শাস্ত্রে কিঞ্চিৎ জ্ঞানাপন্ন হইয়া ঐ ভাগ্যবান ব্যক্তিকে তাহার গুরু পুরোহিত প্রভৃতির স্থপারিস আনিয়া দেয়, কোন বিষয়কর্মের আশায় যাতায়াত করে, কেহ ভিক্ষা করিতে অতি নিপুণ কচ্ছা ভগিনীর বিবাহের ভারাক্রান্ত হইয়া তদ্ব্যবহার উপলক্ষে যাতায়াত করিতেছে, কেহ বাবুর সহিত আলাপ কৌশল করিবার নিমিত্ত নিয়ত যাইতেছে মনোনিীত [৮৬] কথা কহিতে ও কথ্য করিতে তাহার বিলক্ষণ পারগ, তাহারদিগের সঙ্গে লইয়া বাবু স্থানবিশেষে গমন করেন, লোকে তাহাদিগের কথ্য ইহার অমুক বাবুর মোমায়েব ইহাতে তাহার মহা আনন্দিত থাকে এবং তাহার মধ্যে দুই চারি পাঁচ জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতও আছেন তাহার কখন শাস্ত্রবিচার করেন, কখন শাস্ত্রের তাৎপর্য্যও শুনেন, ইহাতে বোধ হয় যে তাহারও উপাসনার পারদর্শী হইবেন, কোনই ব্যক্তির গান বাদ্যাদি শাস্ত্রে কিঞ্চিৎ জ্ঞান আছে, বাবুর যখন তদ্বিষয়ে বাঞ্ছা হয় তখন তাহার তদ্বারা তাহাকে আমোদিত করেন কতকগুলি লোক আছে তাহার মিথ্যা গল্প করিতে ও লোকের কুংসা প্রকাশ করিতে বিলক্ষণ নিপুণ তাহার সময়মুহুরে বক্তৃতা করে, আর এসকল লোক একজনার নিকট নিয়ত যাতায়াত করে এমত নহে পাণ্ডিত্যবিশেষে অনেকের নিকট যায়, এক্ষণে আপনকার ব্যাকুলচিত্তকে সন্তুষ্ট করিয়া আমাকে অহঙ্কুল হও।

[৮৭] বি, প্র, আপনকার স্থানে বাবুর নিকট লোক যাতায়াতের বিষয়ের উত্তর শুনিয়া নিঃসন্দিগ্ধ না হইয়া বরং অধিকতর সন্দিগ্ধ হইলাম যেহেতু আপনি কহিলেন যে কতকগুলি লোক কথ্যের উমেদার

আছে ইহাতে বোধ হইল যে তাহারা চিরকাল কেবল ওমেদারি রূপেই কালযাপন করিতেছে ভাল আপনকাকে জিজ্ঞাসা করি বাবু তাহারদিগের কোন কৰ্ম করিয়া না দেখেনের কারণ কি আর যদিও তাঁহার হস্তে কোন কৰ্ম না থাকে তবে তাহারদিগো কেন মিথ্যা আখ্যাস বাক্যে যাতায়াত করাইয়া ক্রেস দেখন ইহার উত্তর করুন পশ্চাৎ আর কয়েক বিষয়ের বিশেষ জিজ্ঞাসা করিব।

ন, উ, তুমি অপূৰ্ণ বিবেচনা করিয়াছ আমি কি এমত কথা বলিয়াছি যে কতকগুলিন লোক আছে তাহারা চিরকাল ওমেদারি করিয়া থাকে শুন বলি যে সকল লোক কৰ্মের ওমেদে থাকে তাহার মধ্যে ব্যক্তি বিশেষকে উপস্থিত [৮৮] মতে কৰ্ম বিশেষে নিযুক্ত করিয়া থাকেন আর যদি কাহার হস্তে কোন কৰ্ম না থাকে তবে ঐ ওমেদারি ব্যক্তি সুপারিস আনিবা মাত্র তাহাকে কহেন এক্ষণে কোন কৰ্ম নাই আপনি অন্তর্য চেষ্টা করুন তাহা সে ব্যক্তি না শুনিয়া বলে ভাল, মহাশয়ের নিকট যাতায়াত করি কৰ্ম উপস্থিত মতে করিয়া দিবেন, ইহাতে বাবু কি তাহাকে কহিবেন তুমি আমার বাটতে আসিতে পাইবে না।

বি, প্র, কচ্ছা ভগিনী ইত্যাদি বিবাহের ভারগ্রস্ত ব্যক্তিদিগো কেন যাতায়াত করান আপন শজ্ঞাহুসারে যাহা হয় তাহা তৎক্ষণাৎ দিয়া বিবাহ না করেন কেন।

ন, উ, আমি তোমাকে এমত কথা বলি নাই যে দুই চারি ব্যক্তি এক বাবুর নিকট যাবজ্জীবন ঐ দায় উদ্ধার আশয় যাতায়াত করিতেছে, শুন কতং লোক আসিতেছে উপায় করিয়া যাইতেছে।

[৮৯] বি, প্র, আপনি কহিলেন যে কতকগুলিন লোক আছে তাহাদিগের লোকে বাবুর মোসাহেব বলিলে এবং স্থান বিশেষে বাবুর

সঙ্গে গেলে তাহারা সন্ধ্যা থাকে, ভাল বুঝিলাম তাহারা আহ্লাদে লোক, ধর্মতো বিরুদ্ধ লোকতো নিন্দা এমত বিষয় যাহা হয় তাহা মনে করে না কিন্তু জিজ্ঞাসা করি তাহারদিগের কি প্রকারে দিন নির্বাহ হয়।

ন, উ, শুন যাহারা বাবুর মোসাহেব রূপে খ্যাত হয় তাহারদিগের বিষয় তোমাকে কি বলিব আমার বোধ হয় বুঝি ঐ নরাধমেরদিগের ইহকালও নাই পরকালও নাই, তবে দিনপাতের বিষয়, তাহা বাবুর প্রসাদে আপনং উদর পূরণ হয়, যদি কাহার পরিবার থাকে তবে তাহারদিগের পরমেশ্বর দিন চালাইবেন ইহাই ভাবে, আর কখনং বাবু কিছুই দিয়া থাকেন তাহা বুঝি কেহই পরিবারেরদিগকে দেয়, প্রায় অনেকেই তাহারদিগের ইহকাল [৯০] নিস্তার কর্ত্তীকেই দিয়া থাকে বাটার পরিবারেরা কোন উপায় করিয়া লয়।

বি, প্র, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের বিষয়ে আপনি কহিলেন যে তাঁহার বাবুর নিকট শাস্ত্রের তাৎপর্য শুনে ইহাতে চমৎকৃত হইলাম যেহেতু তাঁহার পণ্ডিত, বহুকালাবধি অনেক পরিশ্রম পূৰ্ব্বক বিদ্যা উপার্জন করিয়া শাস্ত্রের তাৎপর্য বিবেচনা করিতে অক্ষম হইয়া যে ব্যক্তি শাস্ত্রে অন্ধ অর্থাৎ সংস্কৃত এক অক্ষরও পড়ে নাই সে তাহার তাৎপর্য বলিয়া দেয় তাহা তাঁহার শ্রবণ করেন এ বড় আশ্চর্য্য কথা।

ন, উ, আপনি বিবেচনা করুন, ঐ দীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা অনেক শ্রমে বিদ্যা উপার্জন করিয়া পরিবারেরদিগের উদর ভরণ পোষণার্থে কিঞ্চিৎ অর্থাকাজ্জী হইয়া কলিকাতায় আসিয়াছেন অত্যাচ্ছ ব্যবসায় কিছুই জানেন না কেবল বাবুলোকের নিকট নিয়ত যাতায়াত করেন দুই বেলা গিয়া আশীর্বাদ করিয়া থাকেন তাহাতে [৯১] কোন বাবুর কিছুই মনোযোগ হয় না তবে কি করিবেন বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে বাবু নিতান্ত বিজ্ঞাভিমানী অতএব ইহাকে বিজ্ঞ বলিলে অধিক সন্ধ্য থাকেন

এইহেতু কেহই চতুরতা করিয়া ছই জনে একা হইয়া গায়দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রের কোটি করিয়া বাবুকে মধ্যস্থ মানেন, কেহ স্বতিশাস্ত্রের কোন বচনের উপর দোষ দিয়া তদুদ্ধার নিমিত্ত বাবুকে তাহার তাৎপর্যা জিজ্ঞাসা করেন সেই বাবু তাঁহারদিগের চতুরতা বিবেচনা না করিয়া আপন বুদ্ধ্যছাড়াই একটা কোন কথা কহেন, পণ্ডিত মহাশয়েরা সেই কথায় তাঁহাকে সাধুবাদ করত অনেক প্রশংসা করেন বাবুজী তাহাতেই তুষ্ট হইয়া কিছুই দেন ইহাতেই কালযাপন করিতেছেন অতএব তাঁহারদিগের উপর কোন দোষ হইতে পারে না।

ইতি শ্রীভবানীচরণশম্ভুত কলিকাতা কমলালয়ে প্রথম তরঙ্গঃ

সমাপ্তঃ ॥ * ॥

সৃষ্টিতত্ত্ব

(বারোয়ারী কবিতা)

আকাশ যখন না ছিল তখন কোথায় আছিল চন্দ্র,
কিরিক্যার ওপারে ছিল সে মুকু-অঙ্গ অঙ্গু।
সাগর ছিল কি কলসীমধ্যে, জেয়সী ছিল কি বায়ে ?
এই প্রশ্নের উত্তর দিব ? দিব না, এখন থাক সে।
উত্তর দিলে উত্তরাগুণে পাইতে হইবে ধাক্কা,
উঃ দক্ষিণে, নেংটি পরিয়া চন্দ্র ছিল সে পাক।
কাজল যখন সজল হয়েছিল তারেই বলিবে প্রেম কি ?
কতখানি তার আছিল যে O, K. কতখানি ছিল N. G.।
ক্ষের অস্তাবে চন্দ্র তখন ছিল নিজ রসে মগ্ন,
একল ওকুল ঝুল হারারে মুকুল হইল ভগ্ন।
রামের সহিত রহিমও থাকুক, গুণী রজন্যসী চন্দ্র,
খুঁটিলা সব উড়িছে আকাশে সামলাও সবে রক্ত।

পরিব্রাজকের ডায়েরি

অজয় নদী

কয়েক বৎসর আগেকার কথা। ঘটনাটি সামান্য হইলেও সে সময়ে আমার মনে গভীর রেখাপাত করিয়া গিয়াছে। এবং শুধু আমার জীবনেই করিয়াছে বলিয়া আমি ইহা কোথাও লিখিয়াও রাখি নাই, ছ-একজনকে ছাড়া ইহার কথা কাহাকেও বলিও নাই।

জীবনে এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটয়া গিয়াছে যে জগৎ আমার পক্ষে পূর্ব হইতে হয়তো সাবধান হইলে ভাল হইত; কিন্তু নিজের স্বভাবের দোষে তাহা পারি নাই। ফলে বাহিরের জগতের কাছে চোট খাইয়াছি। তথাপি মনের মধ্যে এই বলিয়া তৃপ্তি লাভ করিতাম যে নিজের সত্যকে তো পরাপ্ত হইতে দিই নাই! কিন্তু হইলেকি হয়, দুঃখ তো আঘাত দিয়া যায় এবং সকল সময়ে তাহা সহিবার মত অবস্থাও থাকে না। সেইজন্য পানিক স্থলিভাভের আশায় মাঝে মাঝে কোনও জনহীন স্থানে গিয়া নিজের সঙ্গে খোলাখুলি ভাবে বোঝাপাড়া করিয়া লইতাম।

এমনই একদিনকার ঘটনা। তখন বর্ষাকাল, ডরা শ্রাবণ মাস। নানা ঘটনার সংঘাতে অতিষ্ঠ হইয়া সেদিন অজয় নদীর কূলে পলাইয়া গেলাম। পাড়ের জমি শরের বনে আচ্ছন্ন, মাঝে মাঝে ছ-একটি বাবলা গাছ এবং নীচে গেরুয়া রঙের ফেনিল জল থরস্রোতে বহিয়া চলিয়াছিল। ওপারে কাশ এবং শরের বন, দূরে একটি পরিত্যক্ত গ্রামের জীর্ণ অট্টালিকা দেখা যাইতেছিল। ঘনবিশ্রান্ত, পুরাতন আম-কাঠালের বাগান ভেদ করিয়া তাহা মাথা তুলিয়া পাড়িয়াছিল। পরিত্যক্ত

গ্রামের অধিবাসীগণ নদীর পারে আরও কিছু দূরে সরিয়া গিয়া নিজেদের কুটার নির্মাণ করিয়াছিল। তাহাদের ক্ষুদ্র কুটারশ্রেণী এবং লেবুর ক্ষেত দূর হইতেও দেখা যাইতেছিল।

বসিয়া বসিয়া নিজেরই কথা ভাবিতে লাগিলাম। যাহারা আমাকে আঘাত করিয়াছে, তাহাদের কথা। মনের ভিতর হইতে তাহাদের বিরুদ্ধে সকল ক্রোধ, সকল বিদ্বেষকে দূর করিবার চেষ্টা করিতেছিলাম। কিন্তু কিছুতেই তাহা যেন সম্ভব হইতেছিল না। চারিদিকে এত মৃত্যু, এরূপ স্বার্থ এবং অহমিকার ধুম যে তাহার জ্বালায় হৃদয় ভারাক্রান্ত ও পীড়িত হইয়া উঠিতেছিল। এমন সময়ে হঠাৎ আমার সামনের সামান্য একটি বাবলা গাছের ডালের প্রতি দৃষ্টি পড়িল। ছোট ডাল কচি কচি পাতা লইয়া নদীর কূল হইতে জলের নিম্নগণে যেন নীচের দিকে মুইয়া পড়িয়াছে। ঠিক কি হইল বলিতে পারি না। কিন্তু হঠাৎ এই সামান্য দৃশ্যটি দেখিয়া আমার দুই চোখ প্রাণিয়া জল ভরিয়া আসিল। একটি সামান্য বাবলার পাতায় যে এত সৌন্দর্য নিহিত থাকিতে পারে তাহা কখনও ভাবি নাই। আমার সমস্ত অন্তঃকরণ তাহারই রূপে ভরিয়া গেল। নীচে নদী, ওপারে বালুর চর, শরের বন, আরও দূরে ঘন সবুজ বনরেখা—সব যেন এই তরুণ পল্লবের মস্তক্পর্শে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। আমি আর তাহার দিক হইতে চোখ ফিরাইতে পারিলাম না। বাহিরের সমগ্র প্রকৃতির দিকে তাকাইয়া ছিলাম না বটে, কিন্তু রুদ্ধে রুদ্ধে তাহার উপস্থিতি অহুভব করিতেছিলাম। মনে হইতে লাগিল যেন সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি আজ তরঙ্গের আকার ধারণ করিয়া আমাকে প্রাণিত করিতে বসিয়াছে। ঝড় বহিলে যেমন হয়, আমার কানে তাহারই মত শব্দ ভাসিয়া আসিল এবং কণেকের জঘ্ন মাঠ, ঘাট, নদী, তরুশ্রেণী, এমন কি সেই ক্ষুদ্র

বাবলার পাতাগুলি পর্যন্ত অপার সৌন্দর্য-তরঙ্গের আকার ধারণ করিয়া আমাকে ডুবাইয়া দিয়া গেল।

কতকণ এই ভাবে কাটিয়াছিল জানি না। কিন্তু যখন প্রকৃতিস্থ হইলাম তখন ক্ষমায় এবং প্রেমে আমার সমগ্র অন্তর ভরিয়া গিয়াছিল। বিশ্বজননের কাহারও বিরুদ্ধে আমার আর কোনও অভিযোগ রহিল না। যে মাটির উপরে বসিয়া ছিলাম, তাহাও আপন হইতে আরও আপনায় হইয়া গেল। গাঢ় প্রেমের বশে তাহাকে চুম্বন করিলাম।

ইহাই সেদিনকার ঘটনা। ঘটনাটি এমনই বা কি! একটি সামান্য বৃক্ষপত্রের সৌন্দর্যে কণেকের জঘ্ন অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম বই তো নয়! কিন্তু বাহাই হউক, ইহার পর কয়েকদিন ধরিয়া সর্বক্ষণ যেন এক অশ্রুশ্রাবত আনন্দলোকে বিচরণ করিতে লাগিলাম। কাহারও প্রতি কোনও ঘেঘ রহিল না; যাহাদের পূর্বে বিরোধী জ্ঞান করিয়াছিলাম, মনের মধ্যে তফাৎ করিয়া দেখিয়াছিলাম, তাহাদের আজ পরিপূর্ণ ক্ষমায় বৃকে জড়াইয়া ধরিতে পারি এইরূপ মনে হইতে লাগিল।

কিন্তু এই ভাব বহু দিন টিকিল না। কয়েক দিবস পরে ধীরে ধীরে মনে হইল আমার প্রেমের দ্বারা বিশ্বজনকে তো জয় করিতে পারিলাম না। তাহারা যেমন অন্ধ ছিল তেমনই থাকিয়া গেল, তাহাদের আলস্যের, ভয় এবং অবসাদের পর্বত-স্তুপ তো আমি বিন্দুমাত্র টলাইতে পারি নাই। তখন অজয়ের কূলে আমার কণিকের জঘ্ন সৌন্দর্যের অহুভূতিকে বিলাসের মুহূর্ত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, মনের মধ্যে প্রশ্ন উঠিল, “আজ্ঞা, ঐ মুহূর্তে আমি এমন কী নূতন বস্ত্র লাভ করিয়াছিলাম যাহার জঘ্ন সেই অহুভূতির পুনরাবৃত্তির আকাঙ্ক্ষা

করিতে পারি ?” ভাবিয়া দেখিলাম, নূতন এমন কিছুই পাই নাই। সমগ্র বিশ্বমানব যে এক, ইহা বুদ্ধির দ্বারা ইতিপূর্বে অহুভব করিয়াছিলাম। কর্মে সত্যত তাহা প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতাম। কিন্তু বাহিরের তমসার সহিত সংগ্রামের মধ্যে জ্বলিয়া সে বিশ্বাসটি হয়তো প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। সেদিন কেবল নদীর কূলে ক্ষণিকের জ্ঞান সেই অহুভুতিই লাভ হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে আমার দৃষ্টি এমন কী বিস্তীর্ণ হইয়াছিল, নূতন কোন জ্ঞানই বা লাভ করিয়াছিলাম ? বরং সেদিনকার অহুভুতির বশে অন্তরে এমন একটা ভাবপ্রবণতার সৃষ্টি হইয়াছিল, যাহা আমার কর্মের শক্তিকে বৃদ্ধি না করিয়া বরং গোপন বিলাসের এক পথ উন্মোচন করিয়া দিয়াছিল। হয়তো সেই-জ্ঞানই আর ও পথে বাইবার বাসনা হয় নাই।

কিন্তু তাই বলিয়া আজ যে সৌন্দর্যের আকর্ষণ ভুলিয়া গিয়াছি তাহা নহে। হিমালয়ের কোড়ে পাড়াইয়া দেখিয়াছি—দূরে পর্বতমালা ধূসর হইতে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ হইতে নীল এবং অবশেষে নীল হইতে শুভ্র জমাট মেঘের আকার ধারণ করিয়া পাড়াইয়া আছে। কোথায় তাহার আরম্ভ, কোথায় মেঘলোকের সমাপ্তি, সব যেন একাকার হইয়া গিয়াছে। তাহার রূপের তুলনা হয় না। সে রূপে ক্ষণিকের জ্ঞান স্বপ্নের মধ্যে কোথায় যেন গোপন ভার অহুভব করিয়াছি, সেই সৌন্দর্যকে অবহেলা করিয়া নিখাস ফেলিতেও যেন ভয় করিয়াছে, কিন্তু তাহা অজ্ঞানদের মত কখনও আমাকে আজ্ঞা বা মোহাবিষ্ট করিতে পারে নাই।

হিমালয় দেখিয়া অন্তরে বল পাইয়াছি, মনে হইয়াছে ইহা যেন আমাদের যুদ্ধাক্রান্ত বুদ্ধর জীবনের প্রতিচ্ছবি। নিজের জীবনে যে সকল গুণা-নামা খটিয়াছে পাহাড়ের স্তরবিস্তীর্ণ রূপ যেন তাহারই

সাক্ষ্য দিতেছে। কেবল ভরসার বিষয় এই যে, জীবন-সংগ্রামের মধ্যে যখন গহন বনাকীর্ণ উপত্যকায় দিশাহারা হইয়া পড়ি তখন হিমালয়ের মধ্যে কৃষ্ণ পর্বতশ্রেণীর পরপারে যে অনন্ত বীর্ণে মণ্ডিত শুভ্র ভূমির জয়কিরীট বিরাজ করে তাহার কথা স্বরণপথে উদিত হয়। এবং তাহা অন্তরে ভরসা এবং সহিষ্ণুতা কিরাইয়া আনে।

সংগ্রামের ফাঁকে ফাঁকে মানুষ ইহা অপেক্ষা আর কী বেশী আশা করিতে পারে ?

পৃথিবীর পাগলামী

(পূর্বাহ্নবৃত্তি)

অনেক পেশাদার বৈজ্ঞানিক ব্যক্তির সঙ্গেই লেখক পঞ্চবার্ষিকী প্র্যানের আলোচনা করেছেন।

Kytlim পরিদর্শনের সামান্য কিছুদিন পরেই Russo-Asiatic Consolidated Ltd.এর প্রেসিডেন্ট Leslie Urquhartএর সঙ্গে তাঁর কথা বলার সুযোগ হয়; Kytlim অংশের সমস্তই আগে এর দখলেই ছিল; ইনিই উরাল অঞ্চলের খনিজ পদার্থ আবিষ্কার করে এ সব রত্ন কাজে লাগিয়েছেন।

সত্য কথা বলতে কি, পঞ্চবার্ষিকী প্র্যানের সৃষ্টি রাশিয়ার কেবল একটি বিশেষ অংশের জন্তই; এই প্র্যান সম্বন্ধে তো আলোচনা হচ্ছিলই তাছাড়াও অগ্ন্যাত অংশ সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল, যার কথা এই প্র্যানে কোনরূপই উল্লেখ করেনি।

Mr. Urquhart বুঝিয়ে বললেন যে, এত চেষ্টা সত্ত্বেও লৌহ উৎপাদনের যত্থানি আশা ও চেষ্টা করা হয়েছিল, ততদূর পর্য্যন্ত এগোতে পারেনি। ইচ্ছাপাত আশা করা হয়েছিল নব্বুই লক্ষ, হয়েছে পঞ্চাশ লক্ষ। কয়লার সম্বন্ধে কথা ছিল যে, শতকরা সাতচল্লিশ এই প্রোপোরশনে বেড়ে চলবে, কিন্তু তা না হয়ে শতকরা মাত্র আট হয়েছে। অন্য দিকে, এখানকার রেলওয়ের অবস্থা যেমন খাবার ছিল তেমনিই আছে। দশ লক্ষ টনেরও বেশী খাদ্যসামগ্রী হেলাফেলা করে সাজান হয়ে গুদামের অভাবে পচে। এমনকি, গত বৎসরে গমের উৎপাদন ১২৩০ সালের চেয়ে অনেক কমই হয়েছিল। ১২০২ থেকে ১২১৩ সাল পর্য্যন্ত জমি যেমন কৃষিকার্য্যোপযোগী ছিল, এই নূতন মেকানিকাল সিস্টেমের ফলে সে সব জমি কম ব্যবহার্য্য হতে আরম্ভ করেছে। * গত বিশ্বযুদ্ধের আগের পাঁচ বৎসর জন-পিছু শস্য উৎপাদন ছিল ছশো পঁচিশ কিলোগ্রাম, অথচ ১২৩১এ সেখানে পাঁচশো পঁচিশ নেমেছে। রাশিয়া আজকাল তার নিজের ব্যক্তিগত খোরাকের জন্য যতটুকু জিনিষের দরকার, তা উৎপন্ন করতে পারছে না।

চেষ্টা চলছিল সমস্ত হাজার মাইল মোটর যাবার পথ তৈরি করার। কিন্তু চার বছরেও দু হাজার চারশো মাইলের বেশি এগোয়নি। ফোর্ডের কারখানার সঙ্গে চুক্তি করা হয়েছিল যে, এক বিরাট ওয়ার্কশপ তৈরি করা হবে, যা থেকে বছরে এক লক্ষ ওয়াগন তৈরি সম্ভব হয়। একাজের জন্য দশ কোটি ডলার ব্যয় করা হয়, কিন্তু আজ সেই কারখানার কতকাংশ অকেজো হয়ে পড়ে আছে, কেননা, শিকিত অভিজ্ঞ মজুরের অভাব। ত্রিশটা কাগজের মিলের কাজের জন্য বিরাট বিরাট

* কারণ, জমি সব সরকারের, ব্যক্তিগত কিছু নেই; চাষাও তাই আর খাতে না আগের মত।

সেলিউলোজের কারখানা তৈরি হয়েছিল, আজ সে সব বন্ধ; দেশে কাঠের অভাব, কারণ বিদেশকে মেশীনের দাম দিতে এবং বিদেশী বাজার dumping করতে সব কাঠই রপ্তানী হয়েছে।

Leslie Urquhart আরও বললেন যে, মজুররা দলে দলে কারখানা ছেড়ে পালায়; তাছাড়া এক স্থান থেকে স্থানান্তরে emigration তো আছেই।

ইনি যা বললেন সবই ঠিক। কেবল একটা কথা ইনি বলেননি যে, যিনি রাশিয়া সম্বন্ধে একটুও খবর রাখেন, তিনিই জানেন যে, রাশিয়ার আন্তর্দেশীয় রাজনীতির সঙ্গে এই পঞ্চবার্ষিকী প্র্যানের প্রায় কোন সংশ্রবই নেই এবং এই প্র্যান অস্থায়ী কাজ আদায় হোক আর না হোক, তাতে সরকারের বিশেষ কিছু যায় আসে না।

যত রকম সম্ভব শক্ত বাধনে সরকারের অসীম শক্তি জনসাধারণকে বেঁধে রেখেছে। সরকারের চেষ্টা সমস্তই নির্থৃত করার; এ বড় কম কথা নয়। পনের বছরের প্রান, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী প্র্যানের সঙ্গে যার মেয়াদ সেদিন ফুরিয়েছে, তার মত নূতন নূতন আরও কিছু করার প্রস্তাব চলছে। কাজ এখন একটু মধুরগতিতে চলেছে সত্যি, কিন্তু যেটুকু চলছে তার ব্রেক নেই।

তুলা থেকে প্রস্তুত বস্ত্রাদির রপ্তানী বাড়ছেই; ১২২৯এ দু কোটি পঁচিশ লক্ষ ডলার, ১২৩০এ দু কোটি নব্বুই লক্ষ এবং ১২৩১এ প্রায় তিন কোটি চল্লিশ লক্ষ ডলারের রপ্তানী, অথচ খোদ রাশিয়াতে এক টুকরা কাপড় খুঁজে পেতে হলে যা পরিশ্রম করতে হয় তা কল্পনাতীত। সম্ভবত দু মাস চেষ্টার পর সেই টুকরাটি পাওয়া যাবে, কিন্তু তার যে রং সে পরিচয় না দেওয়াই ভাল। তবুও রাশিয়ায় কলকারখানার দিক থেকে আবার উন্নতি শুরু হবে, যদি ১২৩৩এর অক্টোবরেও তার প্রথমবারের কলিত আশা পূর্ণ না হয়।

ইউরোপীয়ান ও আমেরিকান মেশিন দিয়ে, আমেরিকার ও ইউরোপের শ্রেষ্ঠ এঞ্জিনীয়ারদের সাহায্য নিয়ে রাশিয়া এমন ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সাম্রাজ্যের পত্তন করবে, যাকে জয় করা প্রায় অসম্ভব হবে। কয়েক যুগ পূর্বে জাপান যা করেছিল, রাশিয়াতে তা আজ অনেক গুণ বৃদ্ধি করা হবে। যে রকমেই হোক না কেন, প্রশ্ন হয়েছে হুবিশাল এক সাম্রাজ্যকে অসম্ভব রকমে শক্তিশালী করা।

ধীরে ধীরে এই কলের রাজ্যে মেশিন সকলকে দ্বাভা মেরে তার পথ থেকে হটিয়ে দেবে। অনেক দিনই হয়ে গেছে, এখন আর কেউ সোভিয়েটিক শাসনের পতনের কথা মুখে আনে না; অস্তিত্ব, যারা রাশিয়াকে একটু ভালরকমেই জানেন, তারা এগানে ভবিষ্যতে কোন বড় পরিবর্তনের কথা ভাবেন না। আন্তর্দেশিক পরিবর্তন চলছে অপ্রতিহতভাবেই, কয়েকবৎসর পূর্বে আমেরিকার যা অবস্থা ছিল এবং যে অবস্থার ফলে আমেরিকার এই নরকোচিত দুর্বস্থা, রাশিয়া সেই দিকেই ভেসে চলছে; রাশিয়া supermechanised একটা দেশে রূপান্তরিত হচ্ছে, যেখানে মাছই কিছুই নয়, লৌহ এবং ইস্পাতই সব।

আমেরিকা রাশিয়াকে পরিত্রাতা ধরে তার দিকে তাকিয়ে আছে, আবার রাশিয়া জার্মানি আর আমেরিকাকে নিজের আদর্শ ভেবে বসে আছে।

এ হচ্ছে এক বৃত্ত, যার শেষ নেই, যার মধ্যে পক্ষাশ কোটি লোক আবদ্ধ; রক্ত মাংসের এই বন্দীরা এ থেকে বেরোবার পথ খুঁজে পাচ্ছে না।

না, সত্যিই এই চির-বৃত্ত (cercle perpetuel), এই ব্যাধ

থেকে বের হবার পথ নেই। এসব ব্যাপারের বর্ণনা চলে, এসব ব্যাপার দেখান যায়, কিন্তু এ থেকে কোন উপসংহার করা যায় না। কেবল এই কল্পকোলাহলচিন্তাপূর্ণ পৃথিবীর চিত্র অঙ্কনেই কতকগুলো মোটামুটি ঘটনার বিবরণ প্রকাশে এবং সকলের জননী বহুধরার উপর এই তামাসার পরিচয় প্রদানেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। ইয়া, এই ধরণী—এই বৃত্তা ধরণী—অটো, এরোপ্লেন সব্বো যার মনের কোণ থেকে আদিম অধিবাসীদের ভয়-চিন্তা দূর তো হয়নি, তাছাড়াও, যে প্রাগৈতিহাসিক যুগের, প্রাচীন অস্তিত্ব কালের কিছু কিছু নমুনা এখনও লুকিয়ে রেখে দিয়েছে।

এই পৃথিবী, যার কোন ধারণাই নেই এত সব মেশিন নিয়ে সে কি করবে—সেই পৃথিবীর মধ্যেই এখনও এমন সব দ্বীপ আছে, যেখানে আদিম কালের অদ্ভুত জন্তু সব বাস করে। উদাহরণ হচ্ছে Comodoroতে, যে দ্বীপে Warans দেখতে পাওয়া যায়।

Comodo হচ্ছে ইণ্ডো-মালয় দ্বীপপুঞ্জের একটা হারান দ্বীপ; বোধ হয় পৃথিবীর আশ্চর্য্যতম স্থান এটা। এই কমোডোতেই এই ‘গুয়ারান’ জন্তু দেখা যায়। গুয়ারান হচ্ছে বিরাট আকারের এক রকম গোসাপ, গিরগিটি জাতীয় জীব। এই জাতীয় জীবের অস্তিত্ব পৃথিবীর খুব কম লোকেই জানেন। পৃথিবীর অন্য যুগের একমাত্র বংশধর এই গুয়ারানদের জীবন্ত ধরে আনবার জন্তু যে আমেরিকান অভিযান যায়, সেই অভিযানে যোগ দিতে যখন Dvik Howler লেখককে নিমন্ত্রণ করেন, তখন সমগ্র পৃথিবীতে এক উজনের বেশী লোক ছিল কিনা সম্ভেদ, যারা এই জানোয়ারদের নাম পর্যন্ত শুনেছিলেন।

১৯১২ সালে ইংরেজ Ouwens এই নতুন জীবের প্রথম আবিষ্কার করেন। প্রতিদিন Revues Zoologiques থেকে নতুন নতুন

জাতির জানোয়ার আবিষ্কারের সংবাদ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সে সব জীব আর ইতিমধ্যে জানাশোনা জীবের বিশেষ কোন পার্থক্যই পাওয়া যায়নি। Ouwens যে জীবের আবিষ্কার করেছিলেন সে হচ্ছে বাস্তবিক অতি আদিম কালের জীবের একটা চিহ্ন। এই ডাগনরা, এই ভীষণ বিরাট গোসাপরা অতীব মাংসাশী, বন্য, ভয়ঙ্কর ও বিপজ্জনক। Ouwens Java-র একটা সংবাদপত্রে তাঁর এই আবিষ্কার সপক্ষে অনেক চিত্তাশীল প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু কেহই তাঁর এই আবিষ্কারের উপযুক্ত প্রাদান্যের কথা ভেবে দেখেননি। তারপরেই পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধ বাধল এবং তা সকলকে এই দৈত্যদের কথা ভুলিয়ে দিলে।

আজ কেবল বছর কয়েক ধরে আবার এই জন্তু সপক্ষে নানা রকম কানা-ঘুষা হচ্ছিল। শোনা গেল, ইন্ডো-মালয় দ্বীপপুঞ্জের এক লুকান দ্বীপে এক রকম জানোয়ার আছে, যাদের দৈর্ঘ্য হচ্ছে সাত মিটার (প্রায় চোদ্দ হাত); এরা নাকি আশু আশু গরু গিলে ফেলে এবং তাদের লেজের প্রচণ্ড বাড়ি দিয়ে মানুষকে আক্রমণ করে। শোনা গেল যে, Sumbawa ও Flores এই দুই ছোট দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে Comodo দ্বীপেই এই জন্তুর বাস।

সমস্ত জগতের প্রাণীতত্ত্ববিদরা এই বিরল জন্তুর সপক্ষে খবর নিতে উৎসুক হলেন। সেই কারণেই এই অভিযান এবং সেই সঙ্গে লেখকের গমন।

তাই এই অভিযানের জন্য একখানা জাহাজ আলাদা ভাড়া (charter) করতে হয়েছিল, কারণ কমোডো যাবার কোন ব্যবস্থাই নেই; সমস্ত লাইন থেকেই দূরে অবস্থিত এই কমোডো। অভিযানের দলে একজন সিনেমা-অপারেটর এবং একজন জন্তু-খরা বিশেষজ্ঞও ছিলেন।

Floresএ এক দল অর্ধসভা অধিবাসী নিযুক্ত করা হ'ল; তারা তো এই Waranদের সপক্ষে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ঘটনাবলী বলতে লাগল। তাদের এই জানোয়ারে এত ভয় যে, এই ভয়ঙ্কর জন্তুর শিকারে যাবার নামেই তারা কাঁপতে লাগল।

Comodo হচ্ছে পার্শ্বতা আগ্নেয়গিরিপূর্ণ এক দ্বীপ; এখানে বৃক্ষহীন প্রান্তর, তাল নারিকেলের ছোট ছোট বন, বাঁশের ঝোপ আর বালির পাহাড়; কোন মানুষই এখানে বাস করে না, এখানে কেবল দেখা যায় ঘাঁড়, ঘারা বনে বাস করে বহু হয়ে গেছে, ছোট ছোট হরিণ আর বুনো বরা।

কমোডো দ্বীপের এই ডাগন জন্তু এই দ্বীপের কাছে ঠিক সেই রকমই, যেমন সিংহ হচ্ছে আফ্রিকায় আর ব্যাজ হচ্ছে এশিয়ায়। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী মাংসাশী জন্তু হচ্ছে এই ডাগন।

পাহাড়-ঘেরা বালুকাময় সমুদ্রতটের এক স্থানে তাঁবু গাড়া হ'ল; তাঁবুর কাছেই এক জঙ্গল। শোনা গেল এই রকম স্থানই এই গুয়ারানদের প্রিয়।

তিন দিন ধরে একটাও দেখা গেল না। একটা পাথরের স্তরের পিছনে একটা ঘরের মত বিশাল এক গর্ত ছিল। স্বর্ধাকিরণবীক্স এক প্রভাতে, এখানেই এক বিরাট মাথা দেখা গেল; মাথা কেবল বিরাটই নয়, অতি কদাকার বীভৎসও। ছোট ছোটো চোখ যেন জলছে; ব্যাদান বিস্তৃত, মাংসপিণ্ডময়, বীভৎস ও রুক্ষ; অঙ্গ মাংসপূর্ণ, ভারী; রং নোংরা দুগর। জন্তু মাংস ও ভাঙ্গি হলে কি হয়, অদ্ভুত ক্ষিপ্ততার সঙ্গে জন্তুদের মধ্যে অতর্কিত হয়ে গেল। এঁরা তখন একটা বন-বরা শিকার করলেন। সেটাকে জালের মধ্যে টোপের কাজে

লাগিয়ে সেইদিনই একটা ড্রাগন ধরা হ'ল। ড্রাগনটা ছুটে টোপ ধরতে গিয়ে জালের মধ্যে পড়ে, তাইতেই তাকে ধরা সম্ভব হয়েছিল।

এই জানোয়ারটিকে দমন করা এবং বাঁধা বড় সহজে হয়ে ওঠেনি, কারণ জালের মধ্যে পড়েও আশ্বর্যকার জঙ্ঘ এ ভীষণ সংগ্রাম করেছিল; অনেক ধনুসধারিতর পর তবে এটাকে কাবু করা হয়েছে। পেশায় তার লেজের বাড়িতে ছোট একটা গাছও ডেঙে পড়ে; সেই লেজ সে ক্রমাগতই আঁফালন করছিল; তার বীভৎস মুখ থেকে গোঁ গোঁ শব্দ বার হচ্ছিল, আর বার হচ্ছিল এক রকম লাল, যার ভীষণতা সেই ইউরোপীয়ানদেরও কাঁপিয়ে দিয়েছিল। সেখানকার অধিবাসীদের কথা বাদই দেওয়া হোক, তারা তো ভয়ে ছুটে পালিয়েছিল অনেক আগেই। আর Elton, যিনি এ পর্যন্ত শতাব্দিক সাংহে, ব্যাজ প্রভৃতি সব রকমের বস্ত্র জম্ব ধরেছেন, তিনিও অনেকক্ষণ ইতস্তত করার পর এই গুয়ারানের কাছে এগোতে সাহস করেছিলেন, অথচ বাঁধনের চোটে তখন এর আর আশ্বর্যকার চেষ্টা করার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। অসাধারণ তৎপরতা, অজানা ভীষণতা ও আদিম কালোচিত শক্তি যেন দৃঢ় এই ড্রাগনের বিশিষ্ট গুণ।

এটাকে ও এটার সঙ্গে আরো ক'টাকে, যাদের পরে ধরা হয়েছিল, নিউইয়র্কে পাঠান হয়। ক্র্যাঙ্কফোর্ট ও বালিনের পশুশালায় এখনও এদের চারটে বেঁচে আছে। শোনা গিয়েছিল এরা সাত মিটার লম্বা হয়, আসলে কিন্তু অতটা নয়; মাত্র সাড়ে তিন মিটার।

চার সপ্তাহ যে লেখকেরা কমনোডোতে ছিলেন, এর মধ্যে একদিনের জঙ্ঘও একটা গুয়ারান এদের আক্রমণ করেনি। কিন্তু তিন তিন বার, নেহাৎ সৌভাগ্যক্রমে, বুনা গরুর হাত থেকে তিনি বেঁচে গিয়েছিলেন;

এরা, বিনা কারণেই, যে জীবন্ত প্রাণীকেই চোখের সামনে পায়—তার উপর লাফিয়ে পড়ে, গুঁতোয়, যা পায় সব ধ্বংস করে। অথচ এই বুনা গরুরাই গুয়ারানদের ভয়ে ধরহরি। লেখক স্বচক্ষে দেখেছেন, একদিন একটা ড্রাগন এক বলশালী ঘাঁড়ের দিকে ধাবা গেড়ে এগোচ্ছিল; ভয়ে সে ঘাঁড়টা কাঁপতে লাগল বটে, কিন্তু পালাবার কোন চেষ্টাই না করে মুন্ডের মত ঝাঁড়িয়ে রইল। এখানকার অধিবাসীরা বলে, গুয়ারানদের লালায় এক আশ্চর্য গুণ আছে; এবং লেখকদের অভিযানের দলের সকলেই এই লাল-নির্গমন দেখেছেন ও একথা বিশ্বাস করেন।

যাই হোক, লেজ-খাড়া, চোখ-লাল-করা সেই বলদ ড্রাগনের আগমনের অপেক্ষা করতে লাগল; কিন্তু কোন রকম সংগ্রামই করলে না; বন্দুকধারী মাহুযকেও যে-বলদ আক্রমণ করতে ইতস্তত করে না, সে সম্মোহিতের মত নিশ্চল হয়ে রইল। এদিকে গুয়ারান ওজনে ভারি হ'লেও অদ্ভুত ক্ষিপ্র; একটা আঘাতেই বুনা গরুটাকে ভূমিশায়িত করে ধারাল চোয়ালের দাঁত দিয়ে তার গলা কেটে ফেললে। ও, সে ব্যাদান কি ভয়ঙ্কর! চোয়াল ছুটে বড় বড় ছুটে তুরায়ালের মত, তার উপর স্ত্রীমুখ দাঁত বসান। বড় বড় ছুটে মাংসের দলা মৃত জন্তুর দেহ থেকে ড্রাগনের মুখ-গহবরে টপটপ করে প্রবেশ করে অদৃশ্য হয়ে গেল। এই জানোয়ারেরা অতিশয় খাতুলোভী, রক্তাক্ত মাংস খাওয়া ছাড়া এদের আর কোন চিন্তা নেই। এরা বেশ বুদ্ধিমানও বটে—চালাকচতুর এবং তেজীও। এদের শক্তি অদ্ভুত। অল্প বয়সে এরা গাছে চড়তে শেখে; পাখীর ডিম খেতে এরা ভালই বাসে। গুয়ারানরা সকলেই সম্ভরণক্ষম; পাহাড়ের চারিদিকে সঁাতার দিয়ে বেড়ায় এরা, এটা দেখা গেছে। আর একটা মজা হচ্ছে, এরা সব নির্ভীকপ্রিয়, একা একা বাস করে।

পাথরের নীচে একটা গুপ্ত বা পতিত বৃক্ষের নীচেই এদের বাসস্থান। বাসের কাছাকাছি যদি নিজ জাতীয় কোন জীব দেখতে পায়, তা হলে তোরকা নেই, রক্তের কুরুক্ষেত্র বইবে। এরা একা একাই ঘুরে বেড়ায়, মাথা উঁচু করে গর্জনের সঙ্গে, তবে ধীরে ধীরে ও তেড়াবেঁকা হয়ে।

১২৩৩ সালেও প্রাগৈতিহাসিক যুগ বর্তমান! আর কেবল তাহি কি? কয়েক হাজার বৎসর পূর্বে যেমন হয়েছিল, তেমনি আজও এমন হতে পারে না কি, যা কিছু হ'ব বা হুং বলে গণ্য করা হয় তা সবই এক বৃহৎ প্রাকৃতিক দুর্ঘটনায় লুপ্ত হয়ে যেতে পারে? জগতের এই সব ছোট খোট রাষ্ট্রনৈতিক সমস্তা বা ভীতিজনক অর্থনৈতিক দুর্ঘটনা সব কিছুই প্রকৃতির এক সামান্য আঘাতেই রাছগুস্ত চক্রের মত ঢাকা পড়ে যেতে পারে; প্রকৃতির ভীষণতার কাছে, তার দুর্ব্যোপের তুলনায় আজকালকার এই সব ব্যোমধান মাছির মত ছাড়া আর কি? এই সব বড়বড় কারখানা ছেলেদের খেলাঘর এবং এই সব মেশীন খেলনা ছাড়া আর কি?

১২৩১ সালে চীন দেশে যা ঘটেছিল, যাতে কোটি কোটি জীবন্ত মানুষ ধ্বংস হয়েছিল, লেখক স্বচক্ষে সে সব দেখেছেন; তাই আজ তিনি উপরিলিখিত কথাগুলি জোর করেই বলতে পারেন।

১২৩১এর সেপ্টেম্বরে রয়টারের একটা খবর সমস্ত জগতের প্রেসে প্রকাশিত হয়; কেবল কয়েকটি কথা মাত্র; কিন্তু সমস্ত জগতের শত শত সংবাদেব কাছে,—যে-সংবাদসমূহ থেকে দিন দিন স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, ক্রমশই ভীষণ হতে ভীষণতর ভাবেই প্রকাশিত হয়ে

পড়ছে যে, জগৎ ভেঙে পড়ছে, একটা যুগের শেষ হতে চলল এবং এই chaosএর ঢাকনির প্রায় সমস্তটাই খুলে গেছে,—সেই সব জাগতিক সংবাদেব পাশে, রয়টারের সেই কয়েকটা কথা, সেই কয়েকটা লাইন, খুব কম লোকেই লক্ষ্য করেছেন।

ক্রমশ

জিস্কার গ্রন্থ অবলম্বনে

শ্রীতরুণ ঘোষাল কর্তৃক লিখিত

বঙ্গকবি ও বিশ্বনারী

(PROLOGUE)

হে রূপসী বিশ্বনারী, আসিলাম আজ
তোমার দুয়ারে, ভিক্ষা নহে মোর কাজ;
করিতেছি দাবী,
আসিয়াছি নাবি
মম উচ্চ সিংহাসন হ'তে,
আজ কোন মতে
কিরিব না তোমাতে না লভি।
আমি সর্বগুণাকর বাংলার কবি,
বাহিরে দারিদ্র্য মোর, দেহ অস্থিসার,
কাবুলি সদনে ধার,

করিয়াছি অল্প লেখাপড়া ;
 মগজে পড়েছে চড়া
 মুখস্থ করিয়া পরবানী ;
 চিকিৎসার গুণ টানি
 চলিয়াছে দেহতরী মন্দগতি,
 জ্ঞান নয়নের স্ফোতি—
 ফুল কটি, শীর্ণ বৃক্ষ বাহ,
 বাহিরের রাহ
 করিয়াছে পূর্ণগ্রাস অন্তরের শশী,
 সখল হইল মসী ;
 মাড়োয়ারী ম'লে যায় কান,
 তবু গাহি গান
 ভুল স্বরে, লিখি কাব্য কত,
 কামনা সন্তত
 তাড়াইয়া ফেরে মনে রাখালের মত মাঠে মাঠে ;
 তাই শুয়ে থাকে
 ফেলিয়া নিশ্বাস
 জাগাইব মহাঝড় এই অভিলাষ।
 রে প্রেমসী বিশ্বনারী,
 আমার সকাশে সারি সারি
 হও উপস্থিত ক্ষত,
 হও প্রতিশ্রুত
 আমারে বাসিবে ভাল,
 যদিও রংটি কালো,

পেটে পিলে—গাটে নাই কড়ি,
 তবু মোর প্রেমে পড়ি
 দাও মোরে স্থান বক্ষে
 পিতা ভ্রাতা পতি চক্ষে
 দিয়া ধূলি ;
 শুন লো আমার বুলি
 চক্ষু বুজে ;
 কামনার পুখে
 ক্ষীত আজ মন বিক্ষেপক,
 সাজিয়া ঘোটক
 রজকিনী-সখা আমি
 কাব্যের পুটুলি দামী
 পুষ্টে বহি বাহির হ'লাম।
 হে হৃন্দরী, তোমার গোলাম
 আজ হ'তে আমি ছেনো ;
 একটু champagne টেনো
 মোর সঙ্গে ব'সে,
 Champagne কাহাকে বলে অভিধান চ'বে
 করেছে বাহির,
 আরও বিজ্ঞা করিব জাহির
 ক্যাটালগ প্রভৃতি ঘাটিয়া,
 ক্রমে ক্রমে
 ঘোর পরিশ্রমে।

আমি সব জানি জেনো,
 বিশ্ব মাঝে নাহি হেন
 সরস্বাম, বিলাস-ভোগের
 অবসরে বিভিন্ন রোগের,
 যাহা আমি দেখি নাই
 মুজ্জিত কেতার পড়ে
 বিজ্ঞাপন ছড়ে ছড়ে ;
 তোমার আমার যবে মিলন হইবে,
 সকলে কহিবে,
 "এত কাল পরে সত্য
 প্রণয়ের নব তথ্য
 করি আবিষ্কার,
 অতি পরিষ্কার
 সর্ব জ্ঞানে নব জ্ঞান করিল অর্পণ,
 পুরাতনী প্রেমের তর্পণ
 হইল champagne sherry রসে,
 হ'ল হোম গঞ্জিকার ধূমে
 শ্রাব্দের বাসর bed roomএ ।"
 এখনও হয়নি উচ্চারণ তার শেষ মন্ত,
 আমার কল্পনা-যন্ত্র
 Petrol ব্যতীত
 গতির অতীত
 এক প্রান্তে পড়ে আছে,
 মোর কাছে

নাহি কিছু পার্থিব সম্বল
 রূপ, গুণ, অর্থ, জ্ঞান ; শুধু কি কবল,
 কাথা, অন্ধ উপলব্ধি ভাব,
 চর্কিত কথার জাব,
 বাসনার পদ্ম সংস্করণ
 করি আভরণ
 হে বিশ্বরমণী, তব দীপ্ত স্বয়ম্বরে
 কাপিতে কাপিতে জরে
 হব উপস্থিত ? দাও গো আশ্বাস,
 Erotic স্থপক luscious,
 আশার ফলেতে ভরে দাও মনোধামা ।
 (EPILOGUE)
 বলেছেন মেজমামা,
 "মাতুল অর্থেতে পুষ্টি,
 অল্পেতে নাহিক তৃষ্টি,
 থাও বেশী কাজ কর কম,
 আজ হ'তে হ'লাম নির্ধম ;
 হয় কর আমদানি,
 নতুবা এ দানাপানি
 আর চলিবে না,
 জলন্ত বিড়ির বকি জলিবে না
 আমার থুঁচাতে,
 নারীর চক্কোতে

যদি চাও জীবন কাটাতে
পারিবে না এ গৃহে আঁটাতে
তোমার হারেমখানি;
ভুলিয়া প্রণয়বাণী
ধর শুভকরী,
সহায় নিশ্চয় তব হবেন শত্রুরী !"

চিঠিপত্র

"বালীগঞ্জের মেয়ে"

শনিবারের চিঠির সম্পাদক মহাশয় সমীপে—

কিছুদিন পূর্বে অমৃতবাজার পত্রিকায়, 'ইংলণ্ডে ভারতীয় ছাত্রী' (The Indian Woman Student in England) শীর্ষক একটি রচনা বাহির হইয়াছে। উহাতে আমরা অনেকগুলি সংবাদ পাইলাম। ভারতীয় ছাত্রীর কথা প্রসঙ্গে মিস্ কিন্নেয়ার্ড (Miss Kinnaird) ছাত্রীদের কাওজানহীনতার কিছু পরিচয় দিয়াছেন। ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি, উনিশ বৎসর বয়স্কা জনৈক ছাত্রী একা আমেরিকা রওনা হয়, কিন্তু বিশ্বয়ের বিষয় এই যে, এরূপ ভ্রমণ যে কিরূপ বিপজ্জনক সে সম্বন্ধে তাহার কোনরূপ দৃষ্টিস্তাই ছিল না। মেয়েটি দেখিতে ছিল সুন্দরী, অথচ জাহাজে তাহার একটিও পরিচিত লোক নাই। এরূপ অবস্থায় যে-কোন বিপদ তাহার হইতে পারিত। মিস্ কিন্নেয়ার্ড তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "কৈশাও কোন বন্দোবস্ত না করে এই ভাবে

যাওয়ার অর্থ কি?" মেয়েটি তৎক্ষণাৎ জবাব দেয়, "ও, সে জ্ঞান ভাবনা কি? Y. W. C. A. রয়েছে, এরা সর্বত্রই আমার সাহায্য করবেন।" সৌভাগ্যবশত: সেই জাহাজেই Y. W. C. A.র একজন কর্মচারী যাইতেছিলেন, তাহাকে এ সংবাদ দেওয়া হইলে, তিনি তাহার সকল ব্যবস্থার ভার নেন। আর এক সময় অল্প একটি বালিকা ইংলণ্ডে আসিয়া দারুণ অর্থকষ্টে পড়ে। তাহাকে শেষ পর্যন্ত একজন আফ্রিকা-বাসীর নিকট হইতে টাকা ধার করিতে হয়।

হুতরাং দেখা যাইতেছে, আধুনিক সভ্যতার জন্মভূমি ইউরোপ বা আমেরিকা দর্শনের লোভে আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত মেয়েদের মধ্যেও পুরুষদের মত হুঃসাহসিকতা বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহার শেষ ফল কি হইবে তাহা অস্বপ্নান করা কঠিন নহে।

এই রচনা হইতে আমরা আর একটি সংবাদ জানিতে পারিতেছি। পূর্বে Y. W. C. A. ভারতীয় ছাত্রীদের জন্য পুথক বাড়ি লইয়া ভারতীয় খাজ সরবরাহ করিতেন, কিন্তু ছাত্রীরা এরূপ স্বাভাব্যে আপত্তি করতে এই রীতি আর এখন নাই। ভারতীয় ছাত্রীরা যাহাতে অল্প দেশীয় ছাত্রীদের সঙ্গে খোলাখুলি ভাবে মিশিতে পারে সেই জ্ঞান তাহার। বেছায় এই ভারতীয় স্বতন্ত্র রীতি ত্যাগ করিয়াছে। একত্র মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে পারিলে পরস্পরকে ঘনিষ্ঠরূপে জানিবার সুবিধা হয়, একথা স্বীকাৰ্য্য; কিন্তু অনেক সময় বিদেশীয় রীতি সম্বন্ধে একটি মোহ থাকতে স্বদেশীয় রীতিতে বিতৃষ্ণা আসা অসম্ভব নহে। আমরা ত দেশে বসিয়া দেখিতেছি যে যে-সব মহিলা বিলাতে বিলাতী সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিয়া আসিয়াছেন তাহারা এদেশে ফিরিয়া আর এদেশের অর্থাৎ স্বদেশের রীতিনীতির সঙ্গে নিজেদিগকে

খাপ খাওয়াইতে পারিতেছেন না। এইরূপ না-ইউরোপীয় না-ভারতীয় অবস্থায় এদেশে একটি তৃতীয় সমাজ গড়িয়া উঠিতেছে। বিদেশীর ক্রীতি-বিনিময়ের ফলস্বরূপ তাঁহাদের মুখে কৃত্রিম রং বেশি দেখা দিতেছে, হাতে জাপানী ছাতা এবং ব্যাগ কুলিতেছে, এবং মুখ হইতে যে ভাষা বাহির হইতেছে তাহাকে ঠিক বাংলা ভাষা বলা যাইতেছে না। ইহারা বিদেশিনীদের সঙ্গে যাহা বিনিময় করিলেন বলিয়া ভূষি লাভ করিতেছেন, তাহাতে দান অপেক্ষা গ্রহণের অংশই সবখানি। অর্থাৎ বিদেশিনীগণ ভারতীয়ার নিকট হইতে 'খানা' ছাড়া আর কিছুই গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু ভারতীয়াগণ তাঁহাদের ফ্যাশনটুকু পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়া দেশে ফিরিলেন।

এই নূতন সমাজের মেয়েরাই খুব সম্ভব 'বালীগঞ্জের মেয়ে' নামে অভিহিতা হইয়া থাকেন। বস্ত্রত বালীগঞ্জে ইহাদের উদ্ভব নহে, ইহারা যে দুই-চারিজন বিলাত হইতে সভা মাঝি আসিয়াছেন, তাঁহাদেরই সঙ্গ লাভ করিয়া যাবতীয় মেয়ে 'বালীগঞ্জের মেয়ে' নামে অভিহিত হইতেছে। ইহারা নাসিকা উন্নত করিয়া পথ চলেন, শিক্ষা লাভ করিলে চিত্তের যে ঐদার্যা লাভ হইবার কথা, অন্ততঃ এদেশে যাহারা শিক্ষিত, তাঁহাদের যেটুকু উদারতা লাভ হইয়াছে তাহাও ইহাদের নাই। মেয়েরা যখন প্রথম ইংরেজি শিক্ষা লাভ করিয়া স্বাধীন ভাবে পথে চলাফেরা করিতে আরম্ভ করে, তখন তাহাদের শিরে এদেশে সম্ভব অসম্ভব নানারূপ কটকটি বসিত হইয়াছে। সে ইতিহাস আমি জানি। আমি প্রাচীন পন্থী হইয়া শিক্ষিতা মেয়েদের সম্বন্ধে সেই অতীত কালের কটকটির পুনরাবৃত্তি করিতেছি না। বর্তমান কালে মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার যথেষ্ট প্রচার হইয়াছে, এবং

দেশে সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই এ জিনিসটা সহিয়া গিয়াছে। সুতরাং আমি সাধারণ শিক্ষিতা মেয়েদের কথা বলিতেছি না। আমি যাহাদের কথা বলিতেছি তাঁহারা শিক্ষিতা নামের অযোগ্য।

এই সংবাদের শেষ অংশে বলা হইয়াছে, ঐ সব মেয়েদের কাহারও কাহারও বিবাহের কথা উঠে। লেখিকা বলিতেছেন, যে-মেয়ে ৩০... মুইল বা তাহারও অধিক দূরে বাস করিয়া আসিয়াছে তাহার সম্বন্ধে সকলেরই মনে একটি মোহ জন্মান স্বাভাবিক। বিদেশ ভ্রমণ এবং বিদেশবাসীর সাহচর্য লাভ এই দুইটি ঘটনাই উক্ত মোহ সৃষ্টি করিয়া থাকে। সুতরাং বিবাহের বেলায় মেয়ের পক্ষে ইহা একটি অতিরিক্ত গুণ হিসাবে গণ্য হইয়া থাকে। এবং মেয়ে যদি বিবাহিত জীবনকেই শেষ পর্যন্ত আদর্শ জীবন হিসাবে মানিয়া লয় তাহা হইলে স্বামীর সহধর্মিণী হিসাবে বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত মেয়ের মূল্য যে বেশি ইহা মানিতে হইবে।

আমি কিন্তু এ বিষয়ে লেখিকার সহিত একমত হইতে পারিলাম না। কারণ এদেশের অবস্থা এখনও এরূপ হয় নাই বাহাতে সহজে এরূপ মেয়ে তাহার এই নূতন কৃতিত্বের মাপে মনোমত স্বামী লাভ করিতে পারে। যে মেয়ে বিস্তারিত ভাবে বিদেশ ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছে, সে স্বভাবতই এরূপ স্বামী পছন্দ করিবে, যে অন্ততঃ তাহার চেয়ে বেশি অথবা তাহার সমান বিদেশ-ভ্রমণ বা বিদেশী শিক্ষাজাত 'ঐদার্যা' লাভ করিয়াছে। কিন্তু দেশে এরূপ স্বামী হইবার উপযুক্ত লোক বেশি পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ আমাদের দেশের স্বাভাবিক রীতি অমুযায়ী যে সব যুবক বিদেশে শিক্ষা লাভ করিতে যায় তাহারা প্রায় সকলেই পূর্বে বিবাহ করিয়া যায়। সুতরাং স্বামী

মনোনয়নের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্ক হইয়া পড়ে। যে মেয়ে বিদেশে শিক্ষালাভ করিয়াছে, সে খুব সহজে এদেশে-শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবককে বিবাহ করিতে চাহিবে না; পক্ষান্তরে এদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত কোন যুবকই 'বিলাত-ফেরৎ' মেয়েকে বিবাহ করিতে রাজি হইবে না। স্বাধীনভাবে মেলামেশা করিয়া বিদেশ হইতে ঘুরিয়া আসিয়াছে এক্ষণ কোন মেয়ে এদেশের নারীদের আদর্শে জীবন যাপন করিতেছে বলিয়া কোন দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করিতে পারে নাই। যাহারা বিবাহের পরে স্বামীর সঙ্গে বিদেশ ভ্রমণ করিয়াছে তাহাদের কথা স্বতন্ত্র; যাহারা কুমারী অবস্থায় বিদেশে শিক্ষালাভ করিয়াছে তাহাদের কথাই বলিতেছি। বিদেশে হউক বা স্বদেশে হউক শিক্ষালাভের একটা আদর্শ থাকে। বর্তমানে আমাদের দেশের যে অবস্থা তাহাতে ফলাফল যাহাই হউক, যে-সব মেয়েরা বিদেশে শিক্ষালাভ করিতে যায় তাহাদের উদ্দেশ্য ইহাই হওয়া উচিত যে বিদেশের যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ এবং তাহার মধ্যে যেটুকু ভারতবর্ষে দান করিলে ভারতবর্ষের সম্ভাব্য উপকার, সেইটুকু বিদেশ হইতে আনিয়া এ দেশে দান করা। এই আদর্শ তুলিয়া যাহারা শুধু ভিত্তি লাভের জন্ত বা খাতি বিলাতি এটিকেই শিখিবার জন্ত বিদেশে যায় তাহাদের শিক্ষা যে সম্পূর্ণ বার্থ এ কথা বলাই বাহুল্য। বিবাহের বাজারে মূল্য বৃদ্ধি করিবার জন্ত মেয়েদের পক্ষে বিদেশে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা এখনও দেশে অস্বীকৃত হয় নাই। সে প্রয়োজনীয়তা আদৌ হইবে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। স্বতন্ত্র বিলাতিয়ানা নকল করিয়া দেশে একটি তৃতীয় সম্প্রদায় গড়িয়া তুলিবার জন্ত দেশের মহামূল্য অর্থ ব্যয় করিয়া বিদেশে যাওয়ার সার্থকতা কি তাহা আমরা কোনদিন বুঝিতে পারিব না।

অর্থব্যয়ের মধ্যে একটা গৌরব হয়ত আছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই গৌরব গর্বেরই নামান্তর। আসল যে শিক্ষা তাহা অর্থদ্বারা ক্রয় করা যায় না। অনেকের এক্ষণ ধারণা আছে যে এদেশে জন্মিলেই মনটা এত সতর্ক হইয়া যায় যে বাহিরে একবার ঘুরিয়া না আসিলে সে সতর্কতা কাটান অসম্ভব। কিন্তু যে মন সতর্ক তাহাকে কিছুর দ্বারাই প্রশস্ত করা যায় না। প্রশস্ত মনকে প্রশস্ততর হয়ত করা সম্ভব কিন্তু সতর্ক মন প্রশস্ত হয় না। বরঞ্চ বাহিরের এই বহুমূল্যে কেনা শিক্ষায় মন আরও বেশি সতর্ক হইয়া যায় ইহার প্রমাণ প্রচুর রহিয়াছে। আমাদের দেশের নারীর আদর্শ স্বামীকে জীবনে মানিয়া লইবার প্রথা আছে, কিন্তু ইহাকে কি কেহ সতর্কতা বলিবেন? এবং যে মেয়েদের আদর্শের ভিতর স্বামীকে মানিয়া লইবার নির্দেশ নাই, অংশীদার হিসাবে চুক্তি করিয়া স্বামী গ্রহণ করিবার প্রথা আছে, এবং মনান্তর উপস্থিত হইলেই পৃথক হইয়া যাইবার পথ উন্মুক্ত আছে, অথবা পৃথক হইয়া যাইবার জন্তই মনান্তর ঘটাইবার কৌশল জানা আছে, তাহারা কি উদার? 'অল্প দেশের সামাজিক ব্যবস্থা সেই দেশের পক্ষে ভাল কি মন্দ তাহা আমরা বাহির হইতে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিব না, কিন্তু আমাদের দেশের মন লইয়া আমাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা দেখিলে আমার ত মনে হয় আমাদের দেশের মেয়েরাই অধিকতর উদার। যে 'তৃতীয়' সমাজের কথা বলিয়াছি তাহাদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। তাহারা আমাদের প্রাচীন গৌরব বা ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হইতে রাজি নহে, তাহারা ইংলও আমেরিকা বা ইউরোপের কোন-নো কোন দেশের ঐতিহ্য উত্তরাধিকারহুজে দাবী করিতে চায়।

কিন্তু ইহার ফল কি হইবে? যাহাদের স্বদেশে স্থান নাই, তাহারা কি বিদেশের শিক্ষা আকর্ষণ করিতে পারে? এই দেশের রীতিনীতি, এদেশের আচারব্যবহার, এদেশের পোষাকপরিচ্ছদ, এদেশের শিক্ষাতে যদি মহৎ হইবার পথ না পাওয়া যায় তাহা হইলে ত এদেশের বাসভূমিই পরিভাগ করিয়া চিরদিনের মত বিদেশে গিয়া বাস করিতে হয়। মহৎ হইতে গেলে এদেশের এত দিনের শিক্ষা ভাগ করিয়া তবে মহৎ হইতে হইবে এতখানি জ্ঞান যে এই মেয়েদের হইয়াছে ইহার জ্ঞান তাহাদিগকে দখলদার না দিয়া থাকি যায় না। এদেশে জন্মিয়া কেবল মানুষের মত আকৃতিটা দৈবাৎ লাভ করা গিয়াছে, না হইলে হয়ত ইহার জ্ঞানই মহৎ হইবার পথ বন্ধ হইয়া যাইত। কিন্তু ইহা গেল বিজ্ঞপের কথা। আসলে আমি যাহা বলিতে চাই তাহা এই যে বিদেশীয় সমালোচক তাহার নিজস্ব বিচারবুদ্ধি হইতে, ভারতীয় নারীর পক্ষে ইংলণ্ডে কিরূপ আচারব্যবহার পালন করা কর্তব্য এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহাতে তাহাকে আমি লেশমাত্র অভিযুক্ত করিতেছি না। তাহার উদ্দেশ্য নিশ্চিতই সাধু, কেননা দায়িত্ববুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া তিনি মেয়েদের কাণ্ডজ্ঞানহীনতা বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন তাহা ঠিকই হইয়াছে। ভারতীয় মেয়েরা যখন ইংলণ্ডে গিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন পরস্পর অন্তরঙ্গতা দ্বারা যাহাতে পরস্পরকে অধিক করিয়া জানিতে পারে সে বিষয়ে তিনি যে উপদেশ দিয়াছেন তাহা সত্যসত্যই হইয়াছে। কিন্তু আমি যাহা বলিতে চাই তাহা এই যে আমাদের দেশের মেয়েরা নিজেকে অন্তর্জ্ঞ ও ইউরোপের মেয়েকে ফুলীন মনে করিয়া তাহাদের সহিত যদি সৌহার্দ্য করিতে যায় তাহা হইলে কখনই কাহারও কল্যাণ হইতে পারে না। এবং এই জ্ঞানই যে সব মেয়ে স্বদেশে ফিরিয়া আসিতেছে তাহারা

কেবল ইউরোপের যেটুকু নকল করা সহজ সেটুকু নকল করিতেছে কিন্তু যেটুকু আশ্চর্য করা কঠিন তাহা আশ্চর্য করিতে চেষ্টা করিতেছে না। আমার ভ্রূণ শুধু ইহাদের জ্ঞানই। ইতি—

বিনীত

শ্রীসাবিত্রী দেবী

ছলনাময়ী

প্র. বি.

‘ছলনাময়ী’ তারানন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নূতনতম গল্পের বই। ইহাতে দশটি গল্প আছে।

তারানন্দরবাবু ইতিপূর্বে ‘রাইকমল’ লিখিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার প্রতিভার বৈশিষ্ট্য ছোট গল্প যেমন দুটোটা উঠে, এমন আর কিছুতে নয়। রাইকমলকেও ছোট গল্প বলা চলে; রাইকমলের চরিত্রকে অবলম্বন করিয়া গল্পটি দানী ঝাংগা উঠিয়াছে। কিন্তু ছলনাময়ীর গল্পগুলির মধ্যে লেখক প্রতিভার প্রকৃত ক্ষেত্র যেন বুঝিয়া পাইয়াছেন। ইহার অধিকাংশ গল্প ইতিপূর্বে কোন না কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে, কাজেই ইহাদের বিশদ পরিচয় দান অনাবশ্যক।

তারানন্দরবাবুর প্রতিভার প্রধান লক্ষণ এই যে, তাহার দৃষ্টি ও ঋণ্য বস্তুর মধ্যে কোন বাধা নাই। বায়ুমণ্ডলের অতিশূন্য মূলিজাল কিংবা কুহেলিকা পর্যন্ত সে দৃষ্টিকে জ্ঞান করিতে পারে না। বাস্তবিক পক্ষে বস্তুর প্রকৃতি কি তাহা আমরা জানি না, বোধ হয় জানা সম্ভবও নয়, দৃষ্টি যতই তীক্ষ্ণ এবং মধ্যস্থিত বাধা যতই শূন্য হউক না কেন, তাহাতে বস্তুর প্রকৃতি কিছু না কিছু পরিবর্তিত হইয়া যায়। কিন্তু কোন কোন সৌভাগ্যবান

* ছলনাময়ী—গল্পের বই, শ্রীতারানন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ‘প্রকাশক—বরেন্দ্র লাইব্রেরী, কলিকাতা। মূল্য ২২

বাঙ্কি থাকেন, বাঁহারা প্রকৃতিগত স্বাভাবিক শক্তিতে বস্তুর বহুপকে বাঁকিটা পরিমাণে সৰ্বটা নড়ে, ধরিতে পারেন। ইহাদের আমরা বলি দার্শনিক বা শিল্পী। তারাশকরবাবু এই দলের। তাঁহার অপরিয়ান তাঁর দৃষ্টি বস্তুর বহুপকে কিংব পরিমাণে আরও করিয়াছে এবং তাঁহার দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি মিলাইয়া, অন্তত কিছুকণের জ্ঞানও আমরা জগৎকে সত্যরূপে দেখিতে সমর্থ হই।

এই গ্রন্থের 'মেলা' গল্পটিকে তাঁহার প্রতিভার প্রতীক বলিয়া ধরা যাইতে পারে। গল্পের ক্ষুদ্র মেলা বৃহৎ জগৎ-মেলাকে স্মরণ করাইয়া দেয়। লেখক সেই মেলাতে ক্ষুদ্র বালক ও বালিকাঘরের দৃষ্টি লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। মনি ও অন্নর, বোন ও ভাই, উভয়েই শিশু, এই শিশুর দৃষ্টির দ্বারা লেখক মেলার বহুপকে বর্ণনা করিয়াছেন। শিশুর দৃষ্টির দ্বারা এই যে, সে দৃষ্টি অতি সরল, জগতের খুলা অত অল্প বয়সে তাহাকে জান করিতে পারে না। লেখক সেই শিশু-দৃষ্টি লইয়া মেলায় ঘুরিতেছেন, তাঁহার দেখা ক্রমে আমাদের দেখা হইয়া উঠিতেছে। বাহিরের খুলা যেমন শিশুর দৃষ্টিকে মলিন করিতে পারে না, অন্তরের ব্যক্তিগত চিন্তাও তেমনি তাহাকে রঞ্জিত করিতে পারে না, সে যেমন দেখে, তেমনি দেখায়। বাস্তবিক পক্ষে জগৎ-ব্যাপার স্বভাবতই এমন বিস্ময়কর, যে, তাহাকে রজন করা অতিরঞ্জন মাত্র। আমরা প্রকৃত বস্তু দেখিতে পাই না বলিয়াই তাহার অভাব পূরণ করি অতিরঞ্জনের সাহায্যে। লেখক অতিরঞ্জন না করিয়া জগৎ-মেলায় চিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন।

সেই জগৎই তাঁহার গরের ঘরনা, স্থান ও ব্যক্তিগুলি একান্তভাবে বিশিষ্ট, তাহাদের সঙ্গে আর কোন ঘটনার রচনায় ও ব্যক্তির ভুল হইবার উপায় নাই। কিন্তু বস্তুর বহুপকে এমনই সাহায্য যে বিশিষ্ট বস্তু শিল্পীর হাতে পড়িলে নিকলিশের হইয়া উঠে, ব্যক্তিগত জিনিস বিশ্বগত হয়; একজনীন সাক্ষরজনীন হয়, অর্থাৎ জীবন সাহিত্যে পরিণত হয়।

সেই জগৎই 'ঘাদের ফুল'র সাঁওতাল রমণীদের অতিশয় প্রাদেশিক আচার-বাহ্যর, অস্বাভাবিক ক্ষুদ্রতা পিঁড়া না দিয়া আনন্দ দেয়; কিংবা ততোধিক, ওটী ক্ষুদ্র বিশিষ্টতাই সাঁওতাল জীবনকে সর্বজনভোগ্য করিয়া তুলিয়াছে মনে হয়। 'মুগুঞ্জ মহাশয়ের' যে খোঁড়া পাথানিকে লইয়া বড় ভয়, রাগিয়া গেলে যে সেই পাট্টী সর্বশেষ মেখেতে মুকিয়ার অভ্যাস; তাহা যে শুধু বৃদ্ধ মুগুঞ্জকে সত্য করিয়া তুলিয়াছে তাহা নয়, মুগুঞ্জের চরিত্রের ওটা একটা অপরিহার্য অঙ্গ। 'রতীন চন্দ্র'র গোলাইজীর অজুত

রনিকতার ধরণ তাঁহার দেহের আকৃতির মতই বিশিষ্ট। এইসব ব্যক্তিকে আর অজ কাহারও সঙ্গে ভুল করিবার সম্ভাবনা নাই। ইহা যে হইতে পারিয়াছে তাহার একবার কারো লেখকের দৃষ্টির সেই বহুপকে, বাহার কাছে কোন জিনিষই অ-দৃষ্ট ব্যক্তি বা না। তারাশকরবাবু যদি লেখক না হইয়া চিত্রকর হইতেন, তবে অতি সুন্দর রেখা দ্বারা, পুঙ্কভর কালকায়ের দ্বারা বহুপকে অঙ্কন করিতেন, ইহা বোধ হয় নিঃসংশয়ে বলা যায়।

এই বৃদ্ধ বহু দৃষ্টির সারল্যেই তারাশকরবাবু মানুষের হৃৎ স্রবের এমন মর্দঙ্গ বলে পৌঁছিতে পারিয়াছেন, যাহা কেবলমাত্র আন্তরিকতার দ্বারা সম্ভবপর নহে। আন্তরিকতা মানুষের স্রবয়ে প্রবেশের পাকা পথ; সেখানে বহু পথিক, কিন্তু ঘটনাবলী প্রায়ই একই প্রকার। এই বহু দৃষ্টি মানুষের স্রবয় রাজ্যের গলির পথ; এখানে পথিক অল্প, কিন্তু ইহাতে বিচিত্রতা অনেক। পরাতিকের পদাবলীর চাপে হৃৎ স্রবের চিক্র এখানে চাপা পড়িয়া যায় না। একবার এখানে যে প্রবেশ করিতে পারিয়াছে, সে অঙ্গকার বনিয় মধ্যে মনি আবিষ্কার করিয়া বসে। 'সন্ধ্যামণি' 'ভাইরী' বাঁধা গল্প দুইটি গভীর সমবেদনার পূর্ব। 'ব্যাধির' হারান 'রতীন চন্দ্র'র গোলাই, 'মুগুঞ্জ মহাশয়ের' মুগুঞ্জ, 'ছলনাময়ী'র ম্যানেজার প্রকৃতিক প্রথম দৃষ্টিকে অজুত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সাহিত্যে প্রথম দৃষ্টির অপেক্ষা শেষ দৃষ্টিরই মূল্য বেশি। সত্য কথা বলিতে কি এইসব ব্যক্তিকে অজুত বলিয়াই যে লেখক অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা নয়, দেখিতে জানিলে সব ব্যক্তিই অজুত।

'আগভাইয়ের দীর্ঘ' ও 'খড়া' গল্পে লেখক বর্তমান জীবনকে অতিক্রম করিয়া অতীত-কালের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। কিন্তু আটের কোশলে অতীতকালকে বর্তমানরূপে প্রাণ্ড করাইয়া তবে তিনি গল্প বলিয়াছেন। খড়া গল্প সম্বন্ধে শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, রত্নস্নানেশের কুখিত পাণেশের পরে এই জাতীয় গল্প মাত্র গোটা কয়েক লিখিত হইয়াছে, উদাহরণ শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রক্তসন্ধ্যা'ও মনোজ বহুর 'বনমর্দর' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ছলনাময়ী এই গ্রন্থের শেষ গল্প, ইহারই নামে গ্রন্থের নামকরণ। এক তাত্ত্বিক সাধুর তপস্কার ট্র্যাজেডিতে ইহার গল্প-রস। তদ্রূপে আত্মশক্তি সাধুর নিকটে ছলনাময়ীরূপে মাঝে মাঝে প্রকাশিত হইয়া তাহাকে গভীরতর ট্র্যাজেডির মধ্যে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। সাধু ইহাকে না পারে ধরিতে, না পাড়ে ছাড়িতে। আমার মনে হয়, শুভ-সাধনার বিষয়ে এত বড় মর্মান্তিক সত্য কথা ইহার পূর্বে আর কেহ গল্পাকারে লেখেন নাই।

আশা করি তারাশকরবাবুর প্রতিভা আমাদের কাছে ছলনাময়ীর রূপ ধারণ করিবে না, তিনি ছোট গল্পের মধ্য দিয়া আমাদের কাছে ধরা দিবেন।

সংবাদ সাহিত্য

স্বপ্নে দেখিলাম, যীশু খ্রীষ্ট কলিকাতায় আসিয়াছেন, মোড়ে রসেট মালাই থাইয়া এসম্প্রদানের আটচালায় মিনিট কয়েক দাঁড়াইয়া তিনি বাংলা সাম্প্রদায়িক মাসিক ও ত্রৈমাসিকগুলি দেখিয়া লখা লখা পা ফেলিয়া সোজা অষ্টার্লিনী মছমেটের চুড়ায় গিয়া উঠিলেন এবং অকস্মাৎ তারশ্বরে চীৎকার করিয়া গল্প কবিতায় বলিতে লাগিলেন—

লাঞ্ছিত কর তাহাদের যাহাদের উল্লাদ প্রলাপ
তিনমাস অন্তর কবিতা হয়।

শূলে দাও তাহাদের যাহাদের অগ্রগতি
দুস্ততির নামান্তর।

করণা কর তাহাদের যাহাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।
আঘাত কর তাহাদের যাহাদের বর্তমান স্বরঝরে।
বর্জন কর তাহাদের যাহাদের বাতায়নের অন্তরালে
বারাঙ্গনার মূর্তি।

ক্ষমা কর তাহাদের যাহাদের পূর্বাশায় সন্ধ্যার
করাল ছায়া।

যীশু খ্রীষ্ট হিংস্র হইয়া উঠিয়াছেন। এ স্বপ্নের কোনও যানে নাই।

খেলা ছ'কা সোনার ফরসীতে বসিয়াছে। নোবেল প্রাইজ না পাইয়াও নোবেল-লরেটকে বগলে পুরিয়া শরৎচন্দ্র খুশী আছেন।

রবার্ট ব্রাউনিং যদি চার্লস গাভিসের গলা জড়াইয়া বসিতেন দেখিতে কেমন হইত? রবীন্দ্রনাথ রবিবাসরের মুকুর্ষি হইয়াছেন শরৎচন্দ্রের বাড়িতে। জলধর সেনের অন্ন এতদিনে সত্যসত্যই মারা গেল।

তামলী ফুটা হইয়া জল ঝরিতেছে, ইহাই কি রবীন্দ্রনাথের বালীগঞ্জ আসার কারণ? অথবা বুড়া বয়সে তিনি আফিম খরিলেন?

যাহাদের বাড়িতে হিন্দু মেলায় আয়োজন হইয়াছে, বিশ্বজ্ঞান সমাগমে যাহাদের বৈঠকখানা মুখর ছিল, যিনি আত্মীয় সভা বসিতে দেখিয়াছেন, প্রিয়নাথ সেন, লোকেন পালিত যাহার সহচর, বন্ধিমের মালা যিনি একদা গলায় ধারণ করিয়াছেন, মহাত্মা গান্ধীকে যিনি কমলালেবুর রস খাওয়াইয়াছেন, যুগধর্মে তিনি আসিয়া পাটি পাড়িয়া শরৎচন্দ্রের দাওঘায় বসিলেন, তেলে-ভাজা খাইয়াছেন কিনা খবরের কাগজে তাহার প্রকাশ নাই; কালস্ত কুটীলা গতি, বলিতেই হইবে। তথাপি স্বভোঠাকুরের দল রবীন্দ্রনাথের আভিজাত্য লইয়া ব্যঙ্গ করে ইহা বিচিত্রতর নয় কি?

বকুল বাগান রোডের মূর্গীর হেসেলকে চাপা দিয়া যেমন বাংলার নব বৈষ্ণব-ধর্ম—মনোহর পুতুরের মদীর দোকান তেমনই বাংলার কালচারের আশ্রয় হইয়াছে। বন্ধিমচন্দ্র মিথ্যা লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন।

নলিনীদেবের বিপন্ন করিয়া শরৎচন্দ্রেরা উদিত হইতেছেন। পত্রিকা বাহির হইবে। বর্গসঙ্কর শুনিয়াছিলাম, এবার কিরণশঙ্করের পালা।

একদিকে বিরল, অন্যদিকে মূলচাঁদ—বাংলার Business ও Journalism ক্ষত উন্নতি করিতেছে। দড়ি ও কলসির কারবারও কি অবান্তালীর হাতে গিয়াছে? জল নাই?

রবীন্দ্রনাথের লিখিত ছুটি কবিতা পড়িলাম একটি বিচিত্রায়, একটি প্রবাসীতে। পড়িয়া মনে হইল—

কাব্যহীন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাত, লেগে,
পুঞ্জ পুঞ্জ কাব্য ফেনা উঠে জেগে।

কাব্য স্বজনের পূর্বের chaos আলোড়ন করিয়া শুধু নিছক ইচ্ছাশক্তির জোরে কাব্যের cosmos গড়িয়া উঠিতেছে। প্রথম কাব্য-চেষ্টার অপূর্ণ অচ্যুত। যেন Paleolithic মানব গণ্ডারের শূন্য তুলিকারূপে ব্যবহার করিয়া শেওলা-পড়া পাহাড়ের গায়ে Mona Lisaর চিত্র আঁকিবার চেষ্টা করিতেছে।

এ জাতীয় কবিতার Geological কথা Anthropological অর্থ হয়; Cultural মূল্য নাই। কারণ কাব্যের ক্রমবিকাশের প্রথম ধাপগুলি কি প্রকার ছিল তাহা আজ বিশ্বকাব্যের পাঁচতলায় পৌঁছিয়া আমাদের দেখিয়া উপভোগ করিবার শক্তি নাই, প্রয়োজনও নাই। যেমন সৃষ্টির প্রথমে সর্প জীবই Amœba ছিল। ইতিহাস এই; কিন্তু মানব কি তাহা বৃষ্টিবার জন্ম Amœba'র সাক্ষ্য রসের রাজ্যের কোন মূল্য নাই। কারণ Amœba মাহুষ নয়—গদ্য কবিতাও কবিতা নয়। সাহিত্য কিনা তাহাও গিরীন্দ্রশেখর বসু মহাশয় বলিতে পারেন।

“পরিচয়ের” মাসিক প্রকাশ আরম্ভ হইল। আমরা “পরিচয়ের” কবিতাগুলি খুবই উপভোগ করি। কবি মাস্ট্রেই “ম্যাসকিষ্ট” অর্থাৎ ‘আঘাত পে যে পরশ তব’ বলিয়া কবি সকল নির্দয় অভ্যাসের সানন্দে মনে বরণ করিয়া লন। তাই আমরা কাব্য, ভাব, ছন্দ, মিল, ভাষা প্রভৃতির উপর নবীন কবিদের মা কালীর নৃত্য খুবই “খিলের” সহিত সম্বন্ধ করি।

প্রথম কবি বলিতেছেন

জন সমুদ্রে নেমেছে জোয়ার,
হৃদয়ে আমার চড়া।

জোয়ার নামিয়া চলিল। চড়া উর্দ্ধে আরও উর্দ্ধে উঠিয়া চলিল—
অস্তরের পথ বাহিয়া ব্রহ্মতালুর শেষ সীমানা অবধি।

আরও আছে—

হালকা হাওয়ায় বল্লম উর্দ্ধ ধরে।
সাত সমুদ্র চৌদ্র নদীর পার—
হালকা হাওয়ায় হৃদয় হুহাতে ভরে।
হঠকারিতায় ভেঙে মাও ভীকু ঘার।

বল্লম vertically উর্দ্ধ হইতে হইতে horizontally সাত সমুদ্র ও চৌদ্র নদী পার হইয়া গেল। তের নদীতে কবির ছন্দপতন হয়, তাই নদী নিছক আটের খাতারে চৌদ্র হইল। তার পর হালকা হাওয়া বল্লমের ঠেলায় solid হইল ও কবি তাই হৃদয়ের ballast রূপে ব্যবহার শুরু করিলেন। একেই বলে প্রতিভা! Martial, Geographical, Allegorical ও Nautical.

পায়ে পায়ে চলে তোমার শরীর বেঁধে
আমার কামনা প্রেতজ্ঞার বেশে

Poltergeist আর কি? বল্লমের গতিবিধিতে মনে হয় মামদো ভূত।

কবি নীরেন্দ্রনাথ রায় সত্যিই নীরেন্দ্র অর্থাৎ গভীর জলের মৎস। তিনি “বিরোধ” কবিতায় মেঘ, জন দি ব্যাপটিং, বীণা জীঠ, তারা, স্বর্গ ইত্যাদি নানা প্রকার ব্যারিটারি অবাস্তর আলোচনা করিয়া ঠিক শেষরক্ষা করিয়াছেন। স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল ঘাটিয়া বলিলেন—

যেমন যাবে তোমার দেহ আমার দেহে
একটি পরম সন্দেহে।

All's well that ends well!

— যুবনাথ 'শরীর নৈরাশ্র' ঢাক ঢোল, রোশনাই, চিনা-পটকা অথবা নারীহরণ প্রভৃতি কিছু পাড়েন নাই, এজন্য আমরা কৃতজ্ঞ। কবিতাটা হংসোমধ্যে বকোবথা হইয়াছে। একরূপ লিখিলে যুবনাথ শীঘ্রই যুথভ্রষ্ট হইবেন।

মহলানবিশ আগের নামিলেন। কবিতার সহিত তাঁহার জাঠতৃত খুড়তৃত সম্বন্ধ একটু ঘুরাইয়া ফিরাইয়া। এবারকার কবিতায় Bengal Waterproof Works ও Calcutta Tramways-এর বিষয় আলোচনা হইয়াছে। সিগারেটও আছে কিন্তু কোন Brand-এর নাম নাই। রাজকন্ডার অভিমারে কবি ট্রামে চড়িয়া বাহির হইলেন; কাঁধে বর্ধাতি। ভীষণ democratic ও modern। গন্তব্যস্থানে পৌছিয়া হয়তো দেখিবেন রাজকন্ডা Typewriter-এ স্বয়ম্বরের estimates ছাপিতেছেন অথবা Hockey stick দিয়া রাক্ষস খোকস বধ করিতেছেন।

মন-মোটর রে আমার
চলিস তুই ভাব-পেট্রোলে
প্রেমের ব্যাটারী হয়েছে ডিসচার্জ
হৃদয়-কয়েল ফাঁকা।

চুখনে আসে না স্পার্ক টিকমত
কাব্যের একুজট হতে হয় মিস্কায়ার।

অতটা democratic হইল না—কিন্তু আল্টা মার্গ বটে।

নাসৌ মনির্বাশ্র মতং নভিন্নম্। বাংলা সাহিত্যে মনিদের মতও যে ভিন্ন শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'বাঘের কপিশ চোখে' কবিতাটি হইতেই তাহা প্রমাণিত হইতেছে। শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত 'বলাকা' নামক বৈমাসিক পত্রিকায় এই কবিতাটি "১৩৪২ সনের শ্রেষ্ঠ কবিতা" বলিয়া পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। অথচ ১৩৪৩-এর আখ্যাতের বিচিত্রা মারফত

সম্পূর্ণ ভিন্ন মত আমাদের কানে আসিতেছে। পণ্ডিতারী ও শ্রীহট্ট দূর সম্মেহ নাই কিন্তু এত দূর ?

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় 'ক্ষনিরাত্ম কাব্যাত্ম' নামক প্রবন্ধে বলিতেছেন—

ক্ষনিপট্টর একটি উপায় হল, কথায় ভাবে ফাঁক রেখে রেখে চলা—এই ফাঁকই কল্পনার ব্যঞ্জনার অবসর করে দেয় (এইই হুজুতান নাম "লক্ষণ")। আধুনিক যুগে এই ফাঁককে যতদূর সম্ভব বিস্তৃত করে দেওয়া হয়—ফাঁকের পরিবর্তে তাই দেখা গিয়েছে গল্পের এবং গল্পের উভয় পারের মধ্যে কোন মিল বা সামঞ্জস্য নাই। আগে ফাঁক ছিল যতি মাত্র, পুথক অথচ সবুশ জিনিষের সংযোগ সেতু। কিন্তু এখন—আচ্ছা! একটু নমুনা তবে শুধুন—

গরাদের ওপায়েতে বাঘ
হাই তুলে অকস্মাৎ ঘের গড়াগড়ি
কি দুর্বল ভদ্রিমাটি তার—
জুতোর ফিতেটা পেছে খুলে
নীচু হয়ে সবতনে বাঁধি *

কবির বলার উদ্দেশ্য "নাই তাই পাখ, থাকলে কোথা পেতে"—অর্থাৎ জংলী বাঘটা বন্দী, তাই নিশ্চিন্তে তুমি ওর সামনে জুতোর ফিতে বাঁধ, কিন্তু—আচ্ছা কি ট্রাজেডি।

এখন কথা, অর্ধেক বাক্যকে উল্ল কর রাপলেই যদি কাব্য গড়ে ওঠে তবে বেদান্ত হরের অর্পণ্য। শ্রেষ্ঠ কাব্য জগতে আর নাই (এক তান্ত্রিকের মত ব্রীং সিং হাড়া হস্ত) তার পর কথায় বা চলনে এখানে যাহু কই? ছন্দের হরের বেশ ধনি যে হুরুরের দিকে নিয়ে চলে—কোথায় সে অনির্পট্টনীয়তা, সে ইলজাল, সে ম্যাগিক ?

উপরে উদ্ধৃত কাব্যংশ 'বাঘের কপিশ চোখে' হইতে উদ্ধৃত। শ্রীযুক্ত গুপ্ত মহাশয়ের সাহস আছে বলিতে হইবে। 'কবিতা' পত্রিকার

* বিচিত্রায় এখানে ভুলক্রমে 'সমতলে বাঁধে' ছাপা হইয়াছে।

অগ্রতম সম্পাদক মহাশয়কে লইয়া বাদ্য করা—লেখক আশ্রমবাসী বলিয়াই পারিয়াছেন।

কিন্তু নলিনীবাবু তবু তো এখনও 'হবি কার্ঠাসন' শুনে নাই। শুনিলে আর যাহাই করুন, তিনি আর বাধোক্তি করিতে সাহস পাইবেন না। চতুর্থ সংখ্যা কবিতার ৩৩ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি—

পদ আমার কবিতা।

অমাবস্তার দেয়ালি।

শোকাবসন্ন নিজাধীন

মায় রজনীর সবিতা।

মোটের উপর কলিকাতায় বর্তমানে কবিতা জিনিষটা যেমন ঘোরালো হইয়া আসিতেছে তাহাতে পণ্ডিত্যরীতে বসিয়া আর কাব্য বা ধ্বনি বিচার করা চলিবে না। রীতিমত ওয়াকিবহাল হইতে হইলে ভবানীপুরে বাসা বাধা ছাড়া গতাস্ত্র নাই।

কিন্তু নলিনীবাবুর নিয়োক্ত কথামূল্য প্রণিধানযোগ্য।

কারো টেলেক্রাফী ভঙ্গীর স্থান থাকতে পারে, সম্পূর্ণ বিসদৃশ বিজাতীয় উপকরণ (incommensurables) এক পাটায় বাটা যেতে পারে, মহান্ (sublime) ও তুচ্ছকে (ridiculous) একই জোয়ালে জুড়ে দেওয়া যেতে পারে হয়ত—কিন্তু সে জন্ত চাই একটা অবটনবটবপটরসী মারামজি। দেয়ালীরের এ ক্ষমতা ছিল—বাস্তবিকর এ ক্ষমতা ছিল (কুম্ভার কঁজুও যিনি grand styleএ বর্ণনা করেছেন)। আধুনিকের প্রতিষ্ঠা একদিকে রূঢ় তর্কবুদ্ধি, অপরদিকে স্থূল অমার্জিত ইন্দ্রিয় অধঃপতন—কিন্তু এ দুটিকে রূপান্তরিত করে তুলতে পারে যে তৃতীয় শক্তি, এক গাঢ়তর চেতনা তাকে ত পাই না।

মধ্যে কিছুদিন অতি-আধুনিক বাংলা সাহিত্যে সখদে বাঙালী শিক্ষিত ভদ্রলোককে সজাগ হইয়া উঠিতে দেখিয়াছিলাম, প্রাচীন-

নবীনের দৃষ্-কচকচিত্তে তখন আকাশ মুখর ছিল এবং নৃতনের পুরোহিতেরা বিবাহ করিয়া প্রফেসর মুণ্ডের বা পত্রিকা-সম্পাদক হইয়া দাডত্ব হইয়া উঠেন নাই। তার পর 'টকির' যুগ হ্র হইয়াছে; বাঙালী ধ্রুদের ব্যাকুল অহুত্বের অনেকখানিই এখন যেন আশ্রয় পাইয়া দানা বাধিতেছে। হলিউড ও টলিউডের স্বত্তিবাদে অগ্রগতি এবং ভবিষ্যৎ পর্য্যন্ত কেমন যেন শান্ত হইয়া পড়িয়াছে। হয়তো ইহা মেক-আপ মাত্র, তথাপি সাধারণ বাঙালী ভদ্রলোক একটু নিকঙ্কণ আছেন।

অতি-আধুনিকের উদগ্রতার উপর পরিচয়ের আভিজাত্য থানিকটা শীতল জল নিক্ষেপ করিলেও অন্তঃসলিলা বর্ধমান, ভবিষ্যৎকে চমকাইয়া দিয়া মাটি ফুঁড়িয়া উঠিতেছে—আকাশ বাতাস আবার গধম হইয়া উঠিল বলিয়া। হাওয়া-আফিস হইতে আব-হাওয়ার পূর্বাভাস প্রচারিত হয়; আমরা বৈজ্ঞানিক নই, ভরসা করিয়া 'ফোরকাস্ট' করিতে পারি না; কয়েকটি লক্ষণ মাত্র সাধারণের গোচরে আনিয়া ইঙ্গিতে মাত্র বলিতে পারি—পর্ন্ততো বহিমান্ ধূমাং। সম্রাসীর ভয় নাই, গৃহী সাবধান হইতে পারেন।

সঙ্গীক মিঃ রায় কুমারী কহা ('কলেজের সেকেণ্ড ইয়ারে পড়া মেয়ে') নমিতাকে লইয়া উড়িয়া ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। পুরীর সী-ভিউ হোটেলের রিসার্চ হলার বিনোদের সঙ্গে তাঁহাদের সাক্ষাৎ। বিনোদের সঙ্গে পরিচয়, খণ্ডগিরি উদয়গিরি দেখিবার কালে। কোনারক যাইবার প্রস্তাবে মিঃ রায় সঙ্গীক বার্ককোর দোহাই দিলেন, নমিতা বিনোদের সঙ্গে যাইবে। তার পর বিনোদের জ্বানীতে শুধুন—

পরদিন সন্ধ্যায় দেখা, সমুজ্জ্বল স্থান মায় জগন্নাথ দর্শন পর্য্যন্ত এক সঙ্গে গায়ত্রী। বেলা প্রায় ১১টার হোটেলের ফিরে যাওয়া যাওয়া সেরে কাসেমখানার

নিরে মন্দিরে যাছি তথা সন্ধ্যাও আলোক চিরের অন্ধ। নমিতাও সাধী হ'ল।
কলেজের সেকেন্ড ইয়ারে পড়া মেয়েকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঘরে বসিয়ে রাখার
পক্ষপাতী তার বাপ মা কেউই ছিলেন না। বিভিন্ন স্থানের কয়েকটা ফটো নিলুম—
নমিতাও ছু একটা মেটে উঠলো। কির আসতে আসতে বললুম—‘মিস্ রায়
তুনছেন?’ ‘আমাকে ত আপনি বলছেন না যে তুনবে? ও রকম আপনি আপনি
করলে আমি কিছুই শুন্তে পাই না।’ ‘আজ্ঞা—অপরাধ বীকার কছি।’ ‘হাঁ—
বলুন, কি বলছিলেন।’ ‘আমি বলছিলুম কি—মন্দিরের গায়ে যে সব নয় চিহ্ন আছে
রয়েছে তার ফটো নেওয়ার সময় তুমি আমার কি ভেবেছিলে, বলত?’ ‘কিছুই
ভাবিনি—তবে ভাবছিলুম এইটুকু যে মন্দিরের উপরে ঐ চিত্রের বার্থকতা (Sic) কি?’
‘বার্থকতা (Sic) কি তা জানিনা তবে গুণ্ডালা কাম শাপের কতগুলো illustration—
বাংসায়নে এগুলোর উল্লেখ আছে। এ থেকে পুরোপুরি উড়িয়ে কামনা হাবিষে
হয়ত কিছু হতে পারে।’ ‘তুনেছি বিয়ের আগে কামশাপ নাকি পড়তে নেই?
আপনার কি বিয়ে হয়েছে?’ বলে সে ঝিক করে হেসে ফেললো। একটু গাভীয়া
নিয়ে বললুম—‘না—কিন্তু বিয়ের পাসপোর্ট না পেলে কোন একটা শাপ পড়া যেতে
পারে না, তা আমি বীকার করি না। হয়ত এটা তোমাদের চোখে ঘোষের—
যদি সেটা ঘোষেরই হয় তা হলে ঘোষটা এই যে বিয়েটাকে তোমরা যত উচুতে স্থান
দাও, আমি তত উচুতে দিই না। চুচারণন পাড়ার লোক ভেঁকে তাদের সাক্ষী
করে যে মিলন তার হয়ত কিছু প্রয়োজন আছে state-এর দিক থেকে, population
এর দিক থেকে, inheritance-এর দিক থেকে। বৃদ্ধ বয়সে হয়ত এ মিলনের কিছু
ধাকে একটু স্বতন্ত্র কারণ পরশরের পরিচর্যার প্রয়োজনীয়তা হয়ে উঠে সে বয়সে
খুব বড়। কিন্তু তার পূর্বে গুণ্ডালা বাধা ধরা নিয়মের কোন ব্যাধি আছে বলে আমি
মনে করি না। আর বিয়ের পর কামশাপ পড়লে সত্যি রক্ষা হবে নইলে হবে না—
এ কথাটাও অস্বীকার। সত্যি কথাটির definitionই বিভিন্ন লোকের কাছে বিভিন্ন
রকম, বিভিন্ন জাতির কাছে বিভিন্ন রূপে ওর বিকাশ। আমাদের ধারণা গ্রীসল্যান্ডের
ধারণার কাছে একেবারে বিধা হয়ে যায়। হুতরাও ওর একটা ভূমিরকমারী
অস্তিত্বকে বিধাস করে আমাদের ঘেরের চিরন্তন চাহিদাকে গুরু করার স্পৃহা
আমার নেই।’ ‘গুরু আপনি নই বা করলেন কিন্তু সে চাহিদা থেকে যে population

এর question উঠবে না তার কোন নিশ্চয়তা আছে কি?’ ‘নিশ্চয়ই আছে।
তুমি কি মনে করছে আজকের অগতির বৈজ্ঞানিকদের কাছে এখনো ঐ problem
unsolved রয়েছে?’ হোটেলের কাছে এসে পড়েছি। নমিতা চোখের ভাষা
বললে—ও বিষয় আর এখন নয়।

সন্ধ্যাবেলা বেড়িয়ে ফিরে আসতে আসতে বললুম—‘এখন গিয়ে স্টেটলো
ডেভেলপ করে নিতে হবে—নইলে কালকের অন্ধ নতুন স্টেট চার্জ করা যাবে না।’
‘ডেভেলপিং আমি দেখতে পাবো বিনোদবাগু?’ ‘বাঃ কে মনে পাবে না—থাকলেই
হ'ল।’ মিসেস রায় শ্রোহের হাসি হেসে বললেন—‘জানি বিনোদ। ওর জানবার
ইচ্ছে এত বেশী যে সে যা সামনে আসে তাই শিগতে চায়।’ ‘মিস্ রায় গম্ভীর ভাবে
বললেন—‘হাঁ, জানবার স্পৃহা বলবতী না থাকলে কি আর পড়াশুনা করতে পারে?’
আজ নমিতারও ছু একখানা ছবি উঠেছে—নমিতার ফটো সমন্বিত দৃষ্টান্তী শাসিক
পরে স্থান পাবে শুনে তাঁরা অতি মাত্রায় আনন্দিত হয়ে উঠলেন।

আমার নিজের রুমটাকেই dark রুম করে নিলুম। পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকারের
মাঝখানে red light অলটে, নিগ্রো রমণীর ঠোঁটের লিপটিকের মত। একখানা
স্টেট ডেভেলপ করতে করতে বললুম—‘কি চমৎকার—এই যে নমিতা দেবী ক্রমে
ক্রমে আত্মপ্রকাশ করছেন—যেমন করে আত্ম-প্রকাশ করেছিল পৃথিবীর প্রথম
আলো রক্তরূপী ভূমিবারা পাজার টুটে।’ ‘হয়েছে, আর কবির ফলতে হবে না।
যেখি কি রকম হ'ল?’ ‘উহু, উহু অত কাছে নয়—তোমার গোলাপ কোমল কপালঘর
আর একটু সরিয়ে নাও—মাথুঘের চিরন্তন দুর্বলতাকে প্রকাশ দেওয়া উচিত নয়।’
বলে সেটটাকে গুলের ভিতর ডুবিয়ে দিলাম। ‘যে দুর্বলতা চিরন্তন তাকে আমি
ভয় করি না।’ বলে নমিতা ফিক্ করে হেসে ফেলল। ঘাড়টা আর একটু ছুঁয়ে
সে গুলের ভিটুটা নাড়তে থাকে—নিশাসে তার সরিয়ে সরিয়ে দেয় আমার কপালের
উপর নেতিয়ে পড়া ছ চারখানা আগোছালা চুল। চোখ দুটো অবশ্য বিভ্রান্ত
হয়ে আসে—মিনতি-ভরা দৃষ্টি নিয়ে তার চোখের দিকে তাকাইতেই সে তার আলতো
ঠোঁট দুখানি নিবিড় ভাবে চেপে ধরে আমার ঠোঁটের মাঝখানে—সমস্ত শরীরে তার
জাগে শিহরণ, অধীর উদ্দামনাগ।

‘ছবিটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে না ত ?’ ‘না’।

‘উঃ বড় বেরী হয়ে গেছে মা বাবা কি ভাবছেন বলত ? আমি এই মেটাটা তাকের দেখিয়ে আমি, কেমন ?’ ‘দাঁড়াও—মুখের খামটা—?’ খাঁচল দিয়ে মুখ ও ঘাড় ভাল করে মুছে নিয়ে একটা ছুইনির হাসি হেসে নমিতা বেরিয়ে গেল।

দ্বিতীয় দৃষ্ট। হোটেলের ঘর। ‘নমিতার মা ও বাবা সাক্ষী-গোপাল দেখতে গেছেন।’

সমুদ্রের দিকে জান্নালা খোলা—জান্নালার সঙ্গেই আমার শোবার খাট—তুয়ে তুয়ে সমুদ্রের ডেয়ার মাতামাতি দেখতে বেশ লাগছে। নাখায় হাত চালাতে আমি তাকে এতটুকু বাধাও বিদ্রূম না—কোমল স্পর্শে জাগে মত্ততা—একান্ত ভাবে পাবার ইচ্ছা ছাড়িয়ে উঠে সকল বাধা, সকল বন্ধ। কাণের পাশের চুলগুলো হুহাতে সরিয়ে দিতে দিতে আন্তে আন্তে নানিয়ে আমি তার পুশ কোমল ওঠপুট—চুষন মরিয়ার শিথিল করে আনে তার সর্পিঙ্গ—একান্ত নির্ভর সে তাকে ছেড়ে দেয় অশ্রুত আলিঙ্গনে।

‘নমি !’ * চোখ না খুলেই সে সাড়া দেয়—‘কি ?’ ‘আমার যে ছুটি মুহূর্ত তুমি অথবা ভরে বিরহে তার মূল্য কি তা আমি জানি না। হরত এ ছুটি মুহূর্ত আমার জীবনে খুব বড় হয়ে জেগে থাকবে—হরত বা ভুলে যাব ছুদিন বাসেই—কিন্তু আমার সকল ব্যাপার অজানার ভিতর এ ছুটি মুহূর্তের জন্ত আমি তোমার নিকট কৃতজ্ঞ হয়ে থাকব চিরদিন। নমিতা তার দ্রাব্য হাত দুখানি দিয়ে একটু জোরে জড়িয়ে ধরে বলে—‘তোমায় আমি চাই, আমার সর্প অসুহৃতির ভিতর দিয়ে—আমার সকল স্থখ দুঃখের মধ্যে—আমার যা কিছু সব, সবের মাখখানে—’ ‘পাগলামো করো না, নমি। আমাদের এই মুক্ত প্রাণকে বাঁধনে এনে তার অমর্যাদা তুমি করো না। এ ছুটি মুহূর্তকে তুমি ভুলে যেয়ো—যদি সংস্কার-মুক্ত হতে না পার—দুঃখের মত মনে করে রেখো। হরত এ জীবনে আবার দেখা হবে, হরত বা হবে না—বেধা হ’বার আশায় বসে থাকার মত এত দুর্লভ তুমি কখন হবে না, এ বিশ্বাস আমার আছে।’ ‘না—না—আমায় ছেড়ে যেয়ো না—আমি সইতে পারবো না...’ বুকের ভিতর আরো জোরে চেপে ধরে সে কঁদে ফেললে আন্তে আন্তে চোখ দুটো মুছিয়ে দিয়ে বললুম—‘দবি না সইতে পার—আমায় লিখো—আমি

আসবো কথা দিছি। কিন্তু আমার অমর্যাদা, তুমি সংস্কারমুক্ত হও—ভুলতে চেষ্টা করো। চল বারান্দায় বসিগে—তাতে মন অনেকটা স্থির হবে।’

নমিতা আদ্যনার সামনে দাঁড়িয়ে টিক হয়ে নিয়ে বাইরে এল—বারান্দায় এক খানা ইঞ্জি চেয়ার টেনে পাশে এনে বসল। ‘বাঃ—তোমার মুখের প্রম চিহ্নগুলো তোমায় ভারী চমৎকার দেখাচ্ছে, নমি !’ ‘আমার একখানা হাত ছুহাতের মাখখানে চেপে ধরে বলো—‘এইবার বল আমায় ভুলবে না—আমি লিখলেই তুমি আসবে।’ নিশ্চয়ই আসব—আমায় শপথ করবার কোন দরকার নেই—তবে আমার অমর্যাদাও মনে রেখো। মুক্ত বে, স্বাধীন যে তাকে বিধি নিষেধ এনে ফুর করে না।’

* প্রাকটিস-এ আমাদের কিছুমাত্র আপত্তি নাই। যুগ-যুগ ধরিয়া একই ভাবে ইহা অম্লম্বত হইয়া আসিতেছে, অতীতেও যা, বর্তমানেও তাই কিন্তু থিওরিতেই আমাদের আপত্তি।

বেজায় গরম পড়িয়াছে, নায়কের চোখে ঘুম নাই। আকাশের বৃকে সফেদ জ্যোৎস্না। নায়ক বিছানা ছাড়িয়া জানালার পাশে গিয়া দেখিল “ও বাড়ার বাঁধা ছনিয়ার ত্রাকা মেয়ে—দ্বিবিয়া ঘুমোয় দৈজী চেয়ারেতে জানালাটা খুলে দিয়ে। জ্যাকেট জড়ানো উচ্চ বুকখানা একখানা বইয়ে রয়েছে ঢাকা...”

স্বস্তরাং

দরজাটা খুলে অতি সাবধানে

পাঁচিল উপকে যাই—

খামের আড়ালে দাঁড়িয়ে কণেক

দেখি কেহ কোথা নাই।

বাচিলার প্রাণ বেপরোয়া অতি

বালকনি বয়ে উঠি—

জানালার যেতে ফুটি পাই না

সবই দেখি যে মাটি।

নিরাশ হইয়া ফিরে যাব শেষে

একি কভু প্রাণে সয় ?

মরিয়া হইয়া লাক দিহু এক

দূর করি সব ভয়।

...

...

বিপ্লবিত হয়ে জেগে উঠে বীণা
 চেয়ে থাকে মুখ পানে
 চাঁকায় করে ওঠা ঠিক কিনা
 এই ভাবে মনে মনে।
 নামারে তাহারে পরিচয় দিয়ে
 দূর করি তার ভয়।
 শাড়ীটা গুছিয়ে উঠে পড়ে মেয়ে
 শাসন করিয়া কহ—
 কি গো মহাবীর! এসেছ হেথায়
 দুর্গ করিতে জয়?
 যদি ভাকি আমি বাড়ীর লোকেরে
 নেই কি তোমার ভয়?
 পড়ে যদি যেতে, শুড়িয়ে যে হাত
 গুড়ানো চকের মত
 তার চেয়ে বেশী জান না কি তুমি
 ক্যাণ্ডল হত কত?
 আজকের মত সাহসীপনটা
 দেখাতে হবে না আর
 ফিউচারে ওটা কাজেতে লাগবে
 এখন খুলছি দ্বার।

বিপ্লবজনক হইলেও কবিতাবর্ণিত প্রাকটিকে আপত্তি করিবার কিছু
 নাই কিন্তু 'সামিং-আপ' মারাত্মক।

তার পরে হায় শত নারী
 এসেছে দুয়ারে মোর
 তবু আজও মোর সারাদেহে ঐ
 জড়ারে স্মৃতিটা ওর।

জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয় বাছাদনদের বাড়ী কোথায় এবং
 ইহার কোন সমাজের লোক?

আধুনিক শিক্ষিত মেয়েরা অতি-আধুনিক বাংলা সাম্প্রদায়িক পাঠ
 করিয়া নিজেদের সখন্দে জ্ঞান অর্জন করিলে যে জোট বাঁধিয়া লেখা-পড়া

ছাড়িয়া দিতেন ইহা আমরা হালক করিয়া বলিতে পারি। বাদ একবার
 ভাঙিলে জল যে কোথায় গিয়া প্রবেশ করে "শতাব্দীর মেয়ে" সখন্দে
 কোনও সাম্প্রদায়িক পত্রিকায় প্রকাশিত নিয়োক্ত কথোপকথন হইতে
 তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে—

শীতা ও শিহরণ

শিহরণ। বিংশ শতাব্দীর কোন মেয়েকেই আমি বিশ্বাস করি না। সে মুখে
 যতো বড়োই সাদা সাজুক না কানো, আমি করি তাকে আন্তরিক দৃশ্য।
 এমন কোনো কাউকে দাখাতে পারো তুমি—যে কাক্সর পরশ বুক পেতে নেয় নি?
 শীতা। তুমি...তুমি শুধু সন্দেহের দোহাই দিয়ে সারা মেয়ে জাতটার গায়ে
 দাগ একে বিতে চাও?

শিহরণ। আলো! শুধু সন্দেহ? এ আমার প্রাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স—গত
 বার জেগে আমি এটুকু বিষয়ের দরবারে পৌঁছে দিতে পারি—কোনো মেয়েই ঠিক
 নেই। সে যেই হোক না! স্তরের লালসার আওণে ইন্দ্রন জুগিয়েছেই!
 আশ্চর্য! একটা মেয়ে তো দেখতে পেলাম না—যে এক বিন্দুও পরিত্রাণ পর্ক
 করতে পারে।

বুঝিতে পারি ইহা। পারসোনাল 'প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স'—গত
 রাগের কথা এবং ব্যক্তিগত কথা লইয়া আলোচনায় ফল নাই। এখানেই
 'ব্যাপারটার শেষ হইলে আমাদের আপত্তি ছিল না কিন্তু এই নাটকের
 শেষে 'শতাব্দীর মেয়ে'র যে বৈশিষ্ট্যের কথা শীতার মুখে উচ্চারিত
 হইয়াছে তাহা মেয়েদের পক্ষে এতই অপমানজনক যে দশটা 'মহিলা-
 বিভাগ' ও পচিশটা নারীপ্রগতি বিষয়ক প্রবন্ধেও এই অপমানের
 প্রতীকার হইবে না।

শীতা (আদেশের স্বরে)। যাও এক মিনিটও দাঁড়িও না—

শিহরণ। যা সত্যি, আজকালকার মেয়েরা যা করচে—তাই বলে বনাম
 তোমার?...এতে তোমার কিছু অপমান করা হয়েছে?...

শীতা। ঠা—ঠা—ঠা...আমি একজন মেয়েরা 'অপমান' সহ্য করতে পারিনি—
 পারি না এবং পারবো না— এইখানেই হোলো তব্বাৎ শতাব্দীর মেয়ের সঙ্গে।

হোতে পারে এরা দেহ দায় সকলকে—কিন্তু দেয় না এরা দেহের সমস্ত জাতের মান।
বেহটাকে বড়ো করে এরা মাথো বুকে অপদার্থ।

কিন্তু আমরা তো কিছুই বুঝিলাম না এবং আরও বুঝিলাম না যে
পূর্ব শতাব্দীর মেয়েরা এতদিন কি করিতেছিলেন? হৃতিকাগৃহে
লবণ সহযোগে নানা প্রক্রিয়ার কথা তাহারা তো জানিতেন!

সমাজতত্ত্ববিদেরা বলেন, কোনও দেশ বা জাতির সামাজিক
ইতিহাস রচনা করিবার পক্ষে সমসাময়িক সাহিত্য শ্রেষ্ঠ উপকরণ নয়—
অল্প উপকরণের যেখানে একান্ত অভাব সেখানেই অতি সাবধানে
ইতিহাস রচনার কাজে সমসাময়িক গল্প-উপন্যাস-কবিতা হইতে
মালমশলা সংগ্রহ করিতে হয়। সমাজতত্ত্ববিদেরা বর্তমান সামাজিক
জীবন হইতে প্রত্যক্ষত কি উপকরণ সংগ্রহ করিতেছেন জানি না,
একদা যদি সে সকল লুপ্ত হইয়া শুধু সাময়িক সাহিত্যই বর্তমান থাকে
তাহা হইলে আধুনিক বাঙালীর চরিত্র কি ভাবে চিত্রিত হইবে তাহার
কিঞ্চিৎ অভাস উপরোক্ত নমুনাগুলিতে মিলিবে। দেশ ও জাতির
কথা যাহারা চিন্তা করিয়া থাকেন তাহারা অবহিত হইবেন। নিয়ে
সমসাময়িক সাহিত্য হইতে বাঙালী জীবনের আর একটু চিত্র দিতেছি।
পরবর্তীকালে কোনও ঐতিহাসিক এই চিত্রকে বিংশ শতাব্দীর
চতুর্থ দশকের কো-এডুকেশনের ফল বলিয়া যদি তুলিয়া দেখাইতে চান
তাহা হইলে তাহা কো-এডুকেশন-সমর্থকদের পক্ষে একটু নিন্দার
হইবে বই কি!

নীলিমা ও কুমার ক্লাসফ্রেণ্ড!

চুম—একটা চুমার জন্ত পুরো আধখটা ঘরে খণ্ডাখণ্ডির আর অস্ত নেই।
কুমার গুর পরিজ্ঞাত বেহটা নরম সোফাটার ওপর এলিয়ে দিয়ে বলে,—

"দাও—গিয়ারেটটা ধরিয়ে দাও।"

"ওহ—বেশলাই কোশা পাব?"

"মুখখানা কী চক্রে কুমার বলে—

"Shame!" আজকালের up to date মেয়ের কাছে একটা লাইও থাকে না।"

প্ৰভাবজাত জ্বাকামি ভরা তাকিলোর স্তরে নীলিমা বলে,—

"ও ছাই না খেলে কি হয়?"

"বিয়েই বিষকলয় কি না।"

"তার মানে?"

"বুঝতে পারছো না,—কাছে এসো—বুঝিয়ে দিই।"

এক পা পিছিয়ে গিয়ে নীলিমা বলে,—

"আবার!"

"আচ্ছা ঐখানে ছলেই চলবে। এতক্ষণ জীবন্ত আঙন নিয়ে খেলা করলাম,—
এবার কতকটা আঙন না উদরস্থ করলে চলবে কেন।"

"আমি কি আঙন নাকি,—বাঃ রে!"

"শুধু আঙন। বিষদাহী আঙন। প্রাণমাতান—বুক জুড়ান—মন আলান
ট্রেনেটিয়েথ সেন্সুরির থাকে বলে 'হারনেশ'।"

"বাজে কথা রাখুন। আচ্ছা আপনার মতো কি?"

নীলিমা টেবিলের একটা কোনে এসে একটা পা মেথের ঠেকিয়ে আর একটা
খুলিয়ে বসে।

কুমার বলে—

"মতো? মতো আবার কি—ইইমেন এও ওয়াইন।"

"ওয়াইনে তো শুনেছি এ্যালকোহেল আছে?"

"সেই জন্তই তো ট্র জিনিফটার ওপর আমার এত দরব। যখন পাই তখন
একেবারে বুক থেকে পেট পর্যন্ত আঙনের ধলকার মত খলে যায়। কেন—তুমি
কি কোন দিন টেষ্ট করনি নীলিমা?"

পাতলা পিনপিনে নাকিথের ঝিকিটে ঠোঁটটা ঈষৎ বাঁকিয়ে নীলিমা বলে,—

"ভিঃ, অমন প্রযুক্তি আমাদের নয়।"

চেয়ারখানার সোফা হয়ে বসে কুমার বলে—"তবে বলবো? কিন্তু বড় জমীল
হয়ে পড়বে। তোমাদের এয়ারট্রোটিকটিক সোসাইটিতে (ডোন্ট মাইও)..."

কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, আমরা ঘুমাইয়া আছি। দেশের
যুবকদের আমরা চিনি না, যুবতীদের মনোবৃত্তি আমরা তলাইয়া
দেখি না। যাহাকে আমরা দুর্নীতি ভাবিয়া নাক সিঁটকাইতেছি
তাহা মোটেই দুর্নীতি নয়—হুহ সবল অতি-আধুনিক জীবনের সরল
বিকাশ মাত্র। আমাদের দেখিবার ডব্বি পৃথক বলিয়া ঘাবড়াইয়া গিয়া

এতটা কলেক্টারি করিতেছি। যদি প্রগতিবাদীদের কথাই বিশ্বাস করিতে হয় তাহা হইলে শক্তি হইবার কারণ নাই। বাহাদুরের লেখা হইতে উপরের নমুনাগুলি তুলিলাম, তাঁহারা একটি গভীর প্রবন্ধে অবিশ্বাসীদের কাছে নিজেদের অর্থাৎ অতি-আধুনিকদের ভিতরের কথাটা পেশ করিয়াছেন। আসল সমস্যাটা কথটা। এতদিন কেহ প্রণিধান করিয়া দেখেন নাই—না অভিজ্ঞত রবীন্দ্রনাথ, না সিউডো-অভিজ্ঞত শরৎচন্দ্র। কথটা শোনা দরকার।

দেশে আর-একটি গুরুতর আকার ধারণ করেছে। এই যে বৎসরের বৎসর শিক্ষিত যুবকের দল বিশ্ববিদ্যালয়ের গভী পেরিয়ে সংসারে পা দিচ্ছে, তারা কি তাদের অল্পসম্পত্তার পরিপূরণ করতে পারবে? মোটেই না! কিন্তু যৌবনের একটা আকাঙ্ক্ষা আছে যেটা দৈহিক ক্ষুধার চেয়ে বেশী; সেটা হচ্ছে যৌন আকাঙ্ক্ষা। এটাও একটা মানুষের পক্ষে অপরিহার্য জিনিষ। কিন্তু যে সব চর্চাপারী নিজেদের একারই পেট চালাতে পারছে না তারা কি করে সমাজ অনুমোদিত বিবাহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়? আর ভবিষ্যৎ যে শিশুর স্বজন হবে তাদের গ্রামাঞ্চালদানের ব্যবস্থা কি হবে? কিন্তু তাই বলে যৌন মিলনের অভাবে তারা মানুষোচিত যৌবনের অপব্যবহার করতে পারে না। তাই বাংলার জাতীয় জীবনে এসেছে একটা উদ্দাম মুক্ত প্রেমের আকাঙ্ক্ষা। আর সঙ্গীত সাহিত্যে দেখা দিয়েছে এই জাতীয় জীবনের প্রতিকলিত একটা ছবি। মেয়েদের সম্বন্ধেও এই একই কথা।

বর্তমান যুগটারও একটা গতি আছে। তার—বর্তমানের মানুষের—চায় না নীরস, প্রাণহীন কয়েকটা সামাজিক কনভেনশনকে স্বীকড়ে থাকতে। তারা এখন সমাজকে গ্রহণ করছে—তোমরা ত বারণ করছ মুক্ত প্রেমের প্রসার, কিন্তু মুক্ত প্রেমেরই বা তোমরা কি ব্যবস্থা করছ? তার উত্তরে নীতিবিদ্রা চুপ।

তাঁই বর্তমানের সাহিত্যের এই আন্দোলনেরও একটা উদ্দেশ্য আছে। বাংলার যুবক যুবতী সম্ভ্রমায় এখন প্রকৃত যৌন জীবন যাপনের অন্তর্ভুক্তি—অস্বাভাবিক উপায় গ্রহণ করে—হয়ে যাচ্ছে নিকার্বা, প্রাণহীন, মৃত্যু। এদের ঝাটতে হলে, বীণাবাদন ও দুঃসাহসিক করে তুলতে হলে দরকার নীতির বীণন আলগা করার, প্রয়োজন এদের সংস্কারমুক্ত করবার। এতে পপুলেশন বা ইনহেরিট্যান্সের দিক থেকে যদি কোন বাধা থাকে ত সে বাধা বাংলার তরুণ সম্ভ্রমায়ের ভাঙ্গা দরকার—কলঙ্ক সহ্য করবার শক্তি দিয়ে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতাই সর্ব প্রথম কাম।

নিশ্চয়ই। নিরঙ্কুশ সত্যকে আর কতদিন চোখ বুজিয়া ঠেকাইয়া

রাখিব। সতী-শব কাঁধে নটরাজ তাণ্ডব নৃত্য করিতেছেন; ছাগমুণ্ড লইয়া দক্ষেরা বোকার মত বসিয়া থাকুক, সমাজের তাহাতে কিছু যাইবে আসিবে না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, বোম-ভোলা-নাথেরা এই দক্ষদের মাথায় কাঁটাল ভাঙিয়া একটু নাচিয়া লইতেছেন না তো? সিগারেটের পয়সাটাও নিজেরা রোজগার করেন কি?

তবু ও তথা যাক, একটু 'রোমান্স' চর্চা করা প্রয়োজন। 'মধ্যাহ্নে' তাহার অবকাশও আছে।

হে যুবতী মেয়ে

... ..

মধ্যাহ্নে প্রেম হয় না?

আমার ঠোঁটের বাঁধ ভেঙে উপচে আসে
গাসের কিনারা বেয়ে উপচে পড়া হুরার
ফেশার মত

তরঙ্গারিত, ফেশারিত কত কথা:

অলস-পরশ খেলার এই তো সময়?

তোমার মশ্ণ রসনা থেকে গড়িয়ে আসে
খুশাল প্রেম-সিক্ত কথা:

রাতের অন্ধকার প্রেমের জুংসই সময়...

নিবসে যা একবারে অসম্ভব...

তোমার মতে:

পাপ কাজ আঁধারে হয়।

কাণ, তাতে সতী সেজে থাকবার মস্তো হুবিধে।

... ..

তুমি দিনে রাঙি হলে।

আমিও তোমার কথার সার নিলুম...

তুমি কি শেষ আমি কুমারী রইলে

না, একটা চুপনের দ্বারা যুবতী হলে...

সামনেই ছুস্তর পুজার ছুটি। কো-এডুকেশন হোক ক্ষতি নাই
কিন্তু ছুটিটা আলাদা আলাদা দিলে হয় না?

না। বিবাহ-রূপ পূর্বাভাস ইন্সটিটিউশন আর চলিল না। শ্রীমানেরা ইহার পিছনে যেরূপ লাগিয়াছেন ইহাকে বাচান দায় হইয়া উঠিল।

শ্রীমান মুখ্জে ইউনিভার্সিটির ছাত্র, বনলতা গান্ধী ডায়োশেসনে ফাই ইয়ার। বয়স ঘোলা। লজিকের পাঠ। তার পর প্রেম কিন্তু শ্রীমানের অর্থবল কম; বনলতার বিবাহ হইল শ্রীমানের সহপাঠী তপেশের সঙ্গে।

বনলতা তপেশের ঘর করে, শ্রীমানও এদিক ওদিক করিয়া জার্নালিজমে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তপেশ আফিস যায়, শ্রীমান সেই অবসরে রোজই বনলতার সঙ্গে পুরাতন বন্ধুত্ব আলাইতে আসে। এমন এক বৎসর। তপেশ খবর পায়। শ্রীমান সপক্ষে বনলতাকে মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে আবার চুপ করিয়া থাকে।

শ্রীমান 'রেন্ডন টাইমস'-এর এডিটরি পাইয়াছে, বনলতাকে তাহার স্বামীর আশ্রয় হইতে ছিনাইয়া লইয়া যাঁতে-চায়। বনলতা ভয় পাইয়া ননদের ঘরে চলিয়া যায়।

স্বামী স্ত্রী নিউ এম্পায়ার হইতে বায়োস্তোপ দেখিয়া ফিরিয়াছে। তপেশ স্ত্রীকে আদরের অভিনয় করে।

সে এগিয়ে এসে দুহাতে স্বামীর গলা পেঁচিয়ে ধরলো, চুমু খেলো তাকে... তপেশ রোমাঙ্কিত হল। স্ত্রীর সুকর উপত্যকার হাত বুলাতে বুলাতে...

কিন্তু উপত্যকা মাজেই বাঘ থাকে, উপত্যকা হইতে বাঘ বাহির হইল, স্ত্রীর পাঁচো কাজ হইল না।

হেমে উঠলো তপেশ: কুমারী জীবনে লুকিয়ে এর গুর সঙ্গে প্রেম কোরে স্ত্রী হওয়ার পর ওইটুকুই ত ফালতু আনল।

...কেন তুমি এসব বোলাছো আজ? ...আমি যে তোমার স্ত্রী।

হ্যাঁ তাতো দেখছি। সিথিতেও সেকথা অনেক সিধুর-বায় কোরে গিষে রেখেছে। তপেশ হঠাৎ বিজ্ঞানার উপর উঠে বসে... 'আদুল দিয়ে যবে-যবে' বনলতার সিধির সিধুর (sic) মুখে বিতে লাগলো: এর আর দরকার নেই বনলতা। তোমাকে খেতে-পরতে দেবো, কাছে নিয়ে শোব রাজে... পায় ধরি তোমার, ওসো আমাকে ছাড়ো, ছাড়ো। সিধির সিধুর মুখে না বলছি— সিধির সিধুর মুহুর্তে নেই।

...স্বামী তখনও হাসছে: ভয় নেই, এতে তোমার কিছুই হবে না। হ'ত কিছু, যদি শ্রীমান কুমারী অবস্থার তোমাকে 'মা' কোরতে পারতো। আমি হলে অন্ততঃ তাই কোরতুম।...

পরের দিন।...শ্রীমানের কাছে: আমি ত তোমার কথাই রাখলুম।...

...তার জাহাজে এসে উঠলো।

...রেলুনে গিয়ে আমার কি পরিচয় দেবে?

...তুমি আমার উপস্ত্রী।

—না। তুমি আমাকে বিয়ে করে। শ্রীমান।

—বিয়ে, দু'বছর আগে হ'লে হয়তো করতুম।

—এখনও নিঃসন্দেহে কোরতে পারো।...এই একবছর, বোললে বিশ্বাস কোরবে না, আমি আমার পামীকে...

—এ আর কটন কী? মাজ ত এক বছর।

বনলতা লজ্জিত হাসি বেঙ্গে বোললো: এক বছর যথেষ্ট সময়। এই এক বছরে বাঙালী মেয়েরা দু'বার প্রেগন্ট হ'য়।...তুমি আমাকে বিয়ে কোরবে কি না?

—...বিয়ে? আবার?

—...সমালো ত থাকতে হবে।

—সমাজ?...কাকের চাইতে ঠুনকো সমাজের আয়নার মুখ দেখতে চাও এখনো? স্বামী-স্ত্রীর চাইতেও বড়ো বন্ধনের কলন কোরতে পারো না?

উপত্যকায় বাঘের কথা বলিয়াছিলাম। তুল। শ্রীমান বলিল,

যতদিন ইচ্ছে থাকবে, তোমাকে স্ত্রী না-কোরো আমি তোমার নারীশ্বের উপর ধাবা উঠিয়ে হিন্দু আনন্দে তোমার দেহ ও যৌবন উপভোগ কোরবো,— তুমিও তাই।

এখন—হরির উপরে হরি হরি শোভা পায়।

হরিকে দেখিয়া হরি হরিতে লুকাই ॥

স্পিরিচুয়ালিষ্টরা বলেন, মৃত্যুর পরপারে গেলেও এপারের সহিত মাহুষের যোগসূত্র ছিন্ন হয় না। তাঁহারা নির্মম। করুণা করিয়া ইহার বিপদের দিকটা ভাবিয়া দেখিলে একরূপ প্রচার করিতেন না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা ধরুন। তাঁহার যোগসূত্র যদি ছিন্ন না হইয়া থাকে তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহার সাক্ষাৎ নুনাতি-পুত্র স্বভো ঠাকুরের 'সত্যম বনাম স্বন্দরম' তিনি পড়িয়াছেন।

জনি ওয়াকার, হইফির ইস্তাহারের বড়-বড় অক্ষরে প্রায়ই লেখা থাকত দেখা যেছে :—“বর্ণ ইনি এইটিন সিন্ধি সিন্ধি গোল্ড টুং।”

এর পর যখনই সত্য শিবু হুম্বরু এই মাছাতা আমলের মানুষি ‘বায়েত’ টি নজরে পড়ে তখনই কি জানি কেন, অক্ষর আনন্দে ঐ জনি ওয়াকারের ইস্তাহারটি অক্ষমাৎ জেগে ওঠে আমার আদ্য।

স্টল্যাও বাসীদের মধ্যে জনিওয়াকারের জনপ্রিয়তার মতই ব্রাহ্মসাক্ষী বহু পত্রিকার পাতার আলো ঐ অতি পুরোণা উক্তিটির সম্মান অকৃত ভাবে অক্ষম আছে লক্ষ্য করে আশ্চর্য হ’তে হয়।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহশি হইতে পারেন কিন্তু ভবিষ্যদ্বশী যে ছিলেন না তাহার প্রমাণ হুভো ঠাকুর।

হইলে, তাহারই কষ্টাজিত অর্থ তিনি কখনই তাহারই বিরুদ্ধে প্রচার কার্যে লাগাইতে দিতেন না। হুভো ঠাকুর সত্যই বলিয়াছেন—

“সত্যের একমাত্র বিশেষণ হচ্ছে সে সাংঘাতিক, সেই কারণে সে শিবও নয়, হুম্বরও হতে পারে না।”

সাংঘাতিক !

কবিতার একটি সংজ্ঞা এই যে, ইহা আত্মগোপন করিতে সহায়তা করে। অর্থাৎ সেনার দায়ে কবি যখন পীড়িত তখনই হয়তো লিখিয়া বসেন—

প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে
মাবিত করিয়া ইত্যাদি

কিন্তু কবিতায় স্বরূপও প্রকাশিত হইতে পারে। যেমন—

মনে হয়, এই নরম মাটির বুকে
উপড় হয়ে চুবে নি
সরল দুর্বার সব দুখটুকু।

মনে হয়, এই নরম নীল দুর্বার ডগায়,
আমি আমার ঠোট ছুইয়ে রাখি
অনেক—অনেকগণ ঘরে।

সাধ বায়, দুরন্ত শিশুর মত
আমি আমার কচি পাঁত বসিয়ে দি
শুনের বোটার মত নরম দুর্বার ডগায় !

ইহাতে কাহারও আপত্তি হইবার কথা নয়। ‘দুরন্ত’ ও ‘শিশুর’ মধ্যে ‘ছাগ’ কথাটি বাদ দেওয়াতেই আমাদের আপত্তি।

‘বান্ধিত্ব ও বেঙ্গাগুপ্তি’ প্রবন্ধে হুভো ঠাকুর পিতামহ রবীন্দ্রনাথ ও জ্যোতীতাত শরৎচন্দ্রের উপর বেশ একহাত লইয়াছেন।

এই বিখ্যাত কখনও মাড়োয়ারী মাঝি বেঙ্গল ষ্টোরের দারোদ্যাটন (sic), কখনও রূপবাহির উদ্বোধন উৎসব, কখনও ‘জলযোগ’ অথবা ‘মিষ্টিমুখ’ দোকানের দরিদ্র আবাদন কিংবা ইসলামিয়া আদর্শ ও বৌদ্ধ কলাচারের গোহাই দিয়ে হায়রাবাদ হ’তে চীন অবাধি অর্থ উপায়ের এই রকম কৌশলে কখনও তিনি আটকান নি, এই কারণে বহুরা বহুস্থানে মুসলমান হিন্দু ও বহুজাতের দ্বারা ঠাণ্ডা বিখ্যেপ্রেমের সত্যের সর্বনাশ-নাশন হয়েছে। এই বারান্দার-বাঁড়ানো বিখ্যেপ্রেম-সাধন যে ইচ্ছে সে তাই নিশ্চয়ের সামগ্রিক উদ্বেগ সাধনের ক্ষুদ্র যথেষ্টতার (sic) ভাবে বাহ্যিক করতে পারে, ঢেক বই—এর চাক্ষুতিকো যদি হতে পারে সে চৌকোশ।

কিন্তু সব চেয়ে বিস্ময় উৎপাদন করে টাউনহলে ভাঁড়ের ভূমিকার শরৎ চট্টোপাধ্যায়কে দেখে। এখানে ধাঁড়িয়ে তিনি আবোলতাবোল অনেক উপদেশ উদ্‌গার করেছেন। বিশেষ করে মুসলমানদের হস্তান্তর ছুরিকার যথেষ্টতার নিয়ন্ত্রিত ক্ষুদ্র বহু বাক্য ব্যয় করতে হয়েছে তাঁকে।—কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হয়েছে এই—যে এর কিছুদিন পরেই এই সাহিত্যিকটি ঢাকা ইউনিভার্সিটি হতে “ডক্টর অফ লিটারেচার” উপাধি পাওয়ার পর বেঙ্গল উপরোক্ত মুসলমানদের ছুরিতেই নিজের ব্যক্তিত্বের কোরবানী সাধন করে’ ঘোষণা করলেন : এর পর থেকে তিনি ঠাণ্ডা উপজ্ঞাসে একমাত্র মুসলমান নরনারীর চিত্র একেই তাঁর বাকী জীবন অতিবাহিত করবেন।

ইতিপূর্বেই স্বভো ঠাকুর বলিয়াছেন, সত্য হইতেছে সাংঘাতিক।
উপরোক্ত কথাগুলি সাংঘাতিক—সত্য কি না জানি না।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ঢাকায় লাটসাহেবের কাছে শরৎচন্দ্রের শেষ জীবনে মুসলমান সমাজ লইয়া সাহিত্য সৃষ্টির প্রতিশ্রুতিতে বাতায়ন পর্যন্ত একটু চকল হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহারা খবরের কাগজের রিপোর্টকে বিশ্বাস করেন না। শরৎচন্দ্র ঢাকা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া স্বয়ং তাঁহাদের নিকট রিপোর্ট দাখিল না করা পর্যন্ত স্থির হইতে পারিতেছেন না। আমরাও সঠিক বিবরণ বাতায়ন মারফত না জানা পর্যন্ত কিছুই বিশ্বাস করিব না এবং বাতায়নের জিলোচন শর্খার সহিত গলা মিলাইয়া বলিব, “যিনি যথার্থ সাহিত্য স্রষ্টা তিনি তাঁর অন্তরের অমুভূতিকেই রূপ দেন……স্বতঃপ্রসুতির বশেই লেখেন……অতএব শরৎচন্দ্রের এ প্রতিশ্রুতির মানে কি?”

আসলে শরৎচন্দ্র গবর্নরের সামনে পড়িয়া অনভ্যাসের দরূণ ঘাবড়াইয়া গিয়া একটা গলতি করিয়া ফেলিয়াছেন, শরৎচন্দ্রের কথাই কোনও মানে নাই।

ঢাকায় এবার অনেক কিছুই খোলা হইয়া গেল। শরৎচন্দ্রকে অশিক্ষিত ভারিয়া ঠাহারা তাঁহার লেখাকে খেলো ভাবিতেন তাঁহাদের মুখে চুপ কালি পড়িয়াছে।

শরৎচন্দ্র দীর্ঘ জীবন ঘুরিয়া বিজ্ঞান চর্চা করিয়াছেন, আবার ছবিও আঁকিয়াছেন। দেউলটিতে কবে ‘শান্তিনিকেতন’ প্রতিষ্ঠিত হইবে, এবং শরৎচন্দ্রের নাচের দল বাহির হইবে, আমরা কিছুকাল তাহারই প্রতীক্ষা করিব।

কালচাঁদেই এই, গোরাচাঁদে না জানি কি হইবে!

ঢাকা রূপলাল হাউসে শরৎচন্দ্র তাঁহার বক্তৃতার এক স্থলে বলিয়াছেন, যে, তাঁহার শিক্ষক (?) স্বর্গীয় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি কথা অমুখ্যায় তিনি বরাবরই চলিয়া আসিয়াছেন। কথাটি এই—“যা নিজের জীবনে উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতা দিয়ে নিজের মধ্যে সত্য হয়ে উঠেনি—যা কাণে শুনা বা বইয়ে পড়া তা নিয়ে কোনদিন সাহিত্য রচনার চেষ্টা করিসনে।”

শরৎচন্দ্র যে তাঁহার গুরুর কথা কখনই অতিক্রম করেন নাই ‘পথের দাবী’ ও ‘শেষ প্রহ্নে’ তাহার অনেক পরিচয় আছে। সব্যসাচী এবং কমলের চরিত্র জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে যিনি অঙ্কিত করিয়াছেন তিনি স্থানে অস্থানে বঙ্কিমচন্দ্রকে খোঁচা দিলেও আমরা তাহা সহ্য করিব, ষ্টেজে জীবানন্দের ভূমিকায় শিশিরকুমারকে যেমন সহ্য করিয়া থাকি। শরৎচন্দ্র নিশ্চিন্ত থাকুন।

কিন্তু শরৎচন্দ্রের কথা বিশ্বাস করিতে হইলে অধ্যাপক ডাক্তার সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয়কে অবিশ্বাস করিতে হয়। তাঁহার ‘শরৎচন্দ্র’ পুস্তকের ১৫৫ পৃষ্ঠায় তিনি বলিতেছেন—

“বাঙাল দেশের অভিজাত সম্ভ্রদাণ্ডের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের পরিচয় অগভীর; তাই যেখানেই ইহার চিত্র তিনি আঁকিয়াছেন, সেখানেই তাহা গ্রাহনীয় ও একঘেয়ে হইয়া পড়িয়াছে।”

'মোয়াজ্জিন' সম্পাদক সৈয়দ আবদুর রব সাহেবকে আমরা জানি। তিনি তরুণ নন, বরং তার উট।। সন্তবত সময়াভাবে তাঁহার পত্রিকার সব লেখা তিনি দেখিয়া উঠিতে পারেন না, কিংবা, ভালো মাহুষ—সব কথা'র টিক অর্থ বুঝিতে পারেন না। যাহাই হউক, আঘাট সংখ্যা মোয়াজ্জিনে থানিকটা কাঁচা তরল তারুণ্য ঢুকিয়া পড়িয়াছে। 'মিস বকিতা'র চরিত্র-চিত্রে ডাঃ এন. জেড থান, এম-বি যে ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গি ব্যবহার করিতেছেন তাহা ভবিষ্যৎ মুসলমানী সাহিত্যের আদর্শ হইলে আশঙ্কাস্থিত হইবার কারণ আছে। উদ্ধৃত করিতেছি—

মোট দশ পনের দিন কোর্টশিপ চলল, বিয়ের চেয়েও সেটা মিষ্টি। টিক আনারসের মত, গন্ধে দৃশ্যে যত ভাল, খেতে কি আর তত। তার পর বাথতামূলক গতামুখতিকতার আমাদের বিয়ে হয়ে গেল পাড়াসুদ্ধ জানিয়ে হাজার লোককে সাক্ষী করে,—উৎসবের উদ্দেশ্য আর কি হতে পারে?—এর মধ্যেই গাছে ফল ধরিল, যেন শাকশুজীর বীজ একটু ভিজে মাটিতে পড়তে পারলেই হল, অমনি পেকেড়ু বসাল।...আমার লেবরেটরিতে নিঃশব্দে যে কাজ চলছিল তার তুলনা দুনিয়ার আর কোনও লেবরেটরিতে কিংবা মৈসিন ঘরে নাই।...সাত মাস গিয়ে মোটে আট মাসে পড়তেই...এক এক জেলে।

অশিক্ষিত-পটু এইরূপই হইবার কথা, কিন্তু রব সাহেবের সাবধান হওয়া উচিত ছিল।

নিভা সেনের হান, রেকফাষ্ট, সাজসজ্জা সমস্তই শেষ হয়ে গাছে।...একটা অরেকষ্টার ঘুর গুন গুন করতে করতে কণ্ঠে প্রবেশ করল তার ক্রম-মেট।

নিভা সেনের ক্রম-মেট যে মুণ্ডরের মত পিয়ানো ভাঁজিতে ভাঁজিতে আসে নাই ইহা আমাদের ভাগ্য বলিতে হইবে।

১৩৪৩, ২১শে আশ্বিনের 'দীপানী'র 'পাঠকের আসরে', 'শ্রী পাঠক' যে কথাগুলি বলিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। পাঠকদের সজ্জবদ্ধ হইবার দিন আসিয়াছে। পাঠক মাত্রকেই ভাল মাহুষ ভাবিয়া যে লেখক মাত্রই অপমান করিয়া যাইবেন—ইহা আর হইতে দেওয়া উচিত নয়, কিন্তু আমরা ভাবিতেছি—বাছাই করিবে কে? মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতায় লেখক পাঠকে মিলিয়া সাড়ে-বত্রিশ-ভাজার সৃষ্টি হইয়াছে; যে রাম সেই রহিম হইয়া বসিয়া আছে, পথের ঐ ডাষ্টবিনে ফেলিব কাহাকে? তথাপি চেষ্টা করা কর্তব্য।

ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের 'বৃহৎ বঙ্গ'এ মধ্যবিত্ত রক্তের কেরামতি খুব একটো দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি, 'কবিতা'য় সমর সেন 'উর্ধ্বশ্রী'কে সোধোদন করিয়া বলিতেছেন—

তুমি কি আসবে আমাদের মধ্যবিত্ত রক্তে

দিগন্তে দূরন্ত মেঘের মতো।...

চিন্তাশ্রম সেবাসদনে যেমন বিষয়মুখে

উর্ধ্বর মেয়েরা আসে!

পড়িয়া মনে হইতেছে, বাংলার সকল মেয়েই অহুর্ধ্বর হইলেই ভাল হইত! হায় ধোয়ি কবি!

নিরবচ্ছিন্ন প্রেমের পথে যাহা যাহা বাধা কবিতায় শ্রীবুদ্ধদেব বহু মহাশয় তাহার একটা ফিরিস্তি দিয়া—প্রায়সীকে বলিতেছেন—

তোমার শরীর যেন পাল-তোলা নৌকার মাস্তুল,

ছল ছল জলের ঢেউয়ের মত চল

ছবিটা চোখ বুজিয়া অহুভব করিবার চেষ্টা করিতেছি—মনে হইতেছে এ যেন একটা বিশেষ অবস্থার বর্ণনা, হাসি পাইতেছে এই ভাবিয়া যে কবি মিথ্যা পাশের বাড়ির গ্রামোফোন এবং উনানের ধোঁয়ার দোষ দিতেছেন কেন।

DWARKIN'S HARMONIUMS



হারমোনিয়ম কিনিতে হইলে ডোয়াকিনের হারমোনিয়মই আপনার কেনা উচিত। ডোয়াকিনই হাত হারমোনিয়মের আবিষ্কারক এবং এই যন্ত্রের বাহা কিছু উন্নতি এ যাবৎ হইয়াছে তাহা ডোয়াকিনের বাড়ী থেকেই উদ্ভূত।

বাজারের জিনিষ ২৪ টাকা কম দামে অবশ্য পাইতে পারেন কিন্তু তাহা ডোয়াকিনের জিনিষের মত নির্ভরযোগ্য কখনই হইতে পারে না।

সচিত্র মূল্য তালিকার জন্য লিখুন।

DWARKIN & SON, 11, Esplanade, Calcutta.

শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫১২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে

শ্রীপ্রবোধ নান কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



৮ম বর্ষ]

আশ্বিন, ১৩৪৩

[১২শ সংখ্যা

হিন্দু-মুসলমান বিরোধের গোড়ার কথা

১

একটা সহজ উপমা দিয়াই আরম্ভ করিব। পিতামাতা ও শিশু পুত্রকন্যা লইয়া একট সংসার। মনকষাকষি, মান-অভিমান, নালিশ ও ঝগড়া, এমন কি অল্পশব্দ মারামারিও যে নাই তাহা নয়। তবু পরিবার এক, কারণ উহার কেন্দ্র এক। স্নোকের মাথায় যে বাহাই করুক না কেন অবশেষে সকলকেই পথে ফিরিয়া আসিতে হইবে। সৌরজগতে যেমন সকল গ্রহ-উপগ্রহেরই একটা বাধা পথ আছে, মাহার বাহিরে যাওয়া কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়, তা সে স্থায়ী হইতে যতই দূরে থাকুক না কেন, আমাদের কল্পিত পরিবারেও তেমনই প্রত্যেকটি ব্যক্তিরই একটা নির্দিষ্ট স্থান ও পথ আছে; এই স্থান ও পথ ছাড়িয়া

কেহই থাকিতে বা চলিতে পারে না, কারণ এই পরিবারের জীবিকার সংস্থান, ধানধারণা, আশা ও আকাঙ্ক্ষা, রীতিপদ্ধতি সবই যে ব্যক্তিতে কেন্দ্রীভূত সে ব্যক্তি একক ও শ্রেষ্ঠ, সে ব্যক্তি পিতা।

ক্রমে ছেলেরা বড় হইতে লাগিল ও বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে নিজস্ব আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষার অস্তিত্ব আবিষ্কার করিতে লাগিল। তখন আর পিতামাতার সহিত সকল বিষয়ে মেলে না। দেখিতে পায়, তাঁহারা বাহা দিয়াছেন তাহার বাহিরেও বিরাট একটা জগৎ আছে, তাঁহারা যে ধানধারণা বহিয়া আসিয়াছেন পৃথিবীতে তাহা ছাড়াও কামা জিনিষ আছে; সে-গুলিও উপেক্ষার বস্তু নয়। ধীরে ধীরে পিতা ও পুত্রের মধ্যে একটা ব্যবধানের সৃষ্টি হয়, পুত্রের পরিণত জীবনের কেন্দ্র বালাজীবনের কেন্দ্র হইতে সরিয়া আসিতে আরম্ভ করে। এই অবস্থায়, বৃদ্ধিমান হইলে পিতামাতা পক্ষাশোঁড়ে বনং ব্রজেন্দ্র নীতি অমুসরণ করেন, না হইলে পুত্রের স্বাতন্ত্র্যলাভের ইচ্ছায় বাধা দিবার চেষ্টা করিয়া নিজের ও অপরের অশান্তি ডাকিয়া আনেন।

তার পর ভাইয়ে ভাইয়ে পৃথক হইবার পালা। যাহারা একই পিতামাতার সন্তান, আবালা এক সঙ্গে রহিয়াছে, এক সময়ে হয়ত বা এক জন অপর জনকে মুহূর্ত্তের জন্তও না দেখিতে পাইলে অস্থির হইয়া উঠিত, তাহাদের এই মধ্যস্থিত ছাড়াছাড়ির কারণ হিসাবে দুইটি জিনিষ প্রায় জনশ্রুতিতে পরিণত হইয়া গিয়াছে। উহাদের একটি টাকা, অপরটি স্ত্রী। কিন্তু এ-দুটির কোনটিকেই জাতবিচ্ছেদের মূল হেতু বলা চলে না। উহারা উপলব্ধ্য মাত্র। স্ত্রী যাহাকে প্ররোচনা করিবে অথবা অর্থ যাহাকে প্রলুব্ধ করিবে তাহার নিজের মনে যদি ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের আকাঙ্ক্ষা না থাকে, তাহা হইলে শুধু বাহিরেরই চাপে জয়গত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইবার নয়। তাই যে

স্বাতন্ত্র্যের ইচ্ছা পিতা ও পুত্রের মধ্যে ব্যবধানের সৃষ্টি করে উহাই ভাই ও ভাইয়ের মধ্যেও বিরোধের সৃষ্টি করে বলিতে হইবে। জগতের অধিকাংশ লোক পাখি বাপার লইয়াই মত্ত। সেজন্য এই ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সংঘর্ষ সাধারণত আর্থিক বিবাদের রূপ ধরিয়াই দেখা দেয়। কিন্তু তাই বলিয়া অর্থকেই উহার মূল মনে করিবার কোন হেতু নাই; অর্থ অবলম্বন মাত্র; মূল মানবমনের সেই বিশিষ্ট ধর্ম যাহা আমাদিগকে যুগে যুগে কালে কালে কি পাখি কি অপাখি বাপারে পরধর্ম ভয়াবহ বলিয়া স্বদর্শে নির্ধনকেও শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতে প্ররোচিত করিয়া আসিয়াছে।

ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান বিরোধের মূলও আছে এই স্বাতন্ত্র্য-ভোগের ইচ্ছা। অবশ্য মনে রাখা প্রয়োজন এই স্বাতন্ত্র্য কোন ব্যক্তি বিশেষের নয়, দুইটি বিরাট সম্প্রদায়ের। আজ জাতীয় জীবনের যে-কোন ক্ষেত্রেই ধরি না কেন, তাহাতে সব চেয়ে বড় যে জিনিষটা পাই তাহা হিন্দুর হিন্দুত্ব ও মুসলমানের মুসলমানত্ব বজায় রাখিবার ইচ্ছা। হিন্দুরা অবশ্য এ-কথা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, তাঁহারা যে আদর্শ ধরিয়াছেন উহা জাতীয় আদর্শ, মুসলমানরা বিদেশ হইতে গৃহীত আদর্শের মোহে আচ্ছন্ন রহিয়াছেন বলিয়াই ভারতবর্ষকে চিনিতে পারিতেছেন না। কিন্তু এই কথা বলিলেই বিবাদ মিটিবে না। যে রীতিনীতি, ধর্ম ও সংস্কৃতিকে মুসলমানরা ধরিয়া আছেন, বিদেশীই হউক কিংবা স্বদেশীই হউক তাহাকে তাঁহারা নিজস্ব বলিয়া মনে করেন। সহস্র যুক্তিতেও তাঁহারা এই আদর্শকে ছাড়িয়া অল্প আদর্শ অবলম্বন করিবেন না। পক্ষান্তরে হিন্দুরাও নিজেদের আচার-ব্যবহার ও সংস্কৃতির ঐতিহাসিক ধারা বজায় রাখিতে বদ্ধপরিকর। ইহাই হিন্দু-মুসলমান বিরোধের একেবারে গোড়ার কথা। এই

বিরোধে কার দাবি কতটা যুক্তিযুক্ত প্রায় তাহা নয়। বিরোধটা যে জাজ্জল্যমান ও উহা যে দুইটি সমাজের ধর্ম ও ব্যক্তিত্বের সংঘাত তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

তবু আরও একটি যুক্তি দিয়া ব্যাপারটা বুঝাইবার চেষ্টা করিব। ধরা যাক, আজ ভারতীয় ঐক্যের কথা মনে করিয়া হিন্দুরা মুসলমানদিগের চাকুরির সমস্ত দাবি মিটাইতে প্রস্তুত হইয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলেই কি মুসলমানরা রাষ্ট্রে, সমাজে, শিক্ষায়, সাহিত্যে, ধর্মে, আচার-বাবহারে মুসলমান বলিয়া স্বতন্ত্র থাকিবার ইচ্ছা ত্যাগ করিবেন? ইহাই যদি হইত, তাহা হইলে পাঠ্যপুস্তকে রামায়ণ বা মহাভারতের গল্প সম্বন্ধে তাহারা এত আপত্তি করিতেছেন কেন? সেখানে ত পান্থিক স্বার্থের কোন বিরোধ নাই। আর হিন্দু, মুসলমান, ইংরেজ সকল নেতারা ইহা স্পষ্টদায়ের মধ্যে রক্ষার কথা বলিতেছেন কেন? দুইটি পক্ষকে স্বতন্ত্র ও পরস্পরবিরোধী বলিয়া স্বীকার করিয়া না লইলে ত রক্ষার কোন কথাই উঠিতে পারে না। সুতরাং আসল ব্যাপারটা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই যে আজ ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ যে বিশিষ্ট রূপ ধারণ করিয়া দেখা দিয়াছে তাহা দুইটি পূর্ণবিকশিত স্বাতন্ত্র্যবোধের সংঘাত। হিন্দু ও মুসলমান, উভয় পক্ষেরই এই স্বাতন্ত্র্যবোধকে বিনষ্ট না করিতে পারিলে শুধু রক্ষা করিয়া ভারতীয় ঐক্যের কোন আশাই নাই।

২

কিন্তু বিনষ্ট করিতে হইবে বলিলেই স্বাতন্ত্র্যবোধ লোপ পাইবে না। জানা প্রয়োজন এই স্বাতন্ত্র্যবোধের মূল কি আছে। আমরা অবশ্য বলি, তৃতীয় পক্ষের ঐচ্ছাই হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ মিটিতেছে না,

এবং এই তৃতীয় পক্ষ না থাকিলে উভয়ের বিরোধ এত উগ্র হইয়া উঠিত না। ইহার অর্থ যদি এই হয় যে হিন্দু-মুসলমানের পরস্পর অবিश्वास ও অমিল বজায় রাখা ইংরেজ শাসকদের স্বার্থ এবং এই মনোমালিন্য থাকাতে তাহারা যথেষ্ট লাভবান হইতেছেন, তাহা হইলে এই উক্তি সম্বন্ধে আপত্তির কোন কারণ হইতে পারে না। কিন্তু আরও এক দাপ অগ্রসর হইয়া কেহ যদি বলিয়া বলেন, হিন্দু-মুসলমান বিরোধ ঘোল আনা বা বারো আনা ইংরেজদেরই স্বপ্ন তাহা হইলে ইতিহাস তাহার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে না। ইংরেজ শাসনের পূর্বেও হিন্দু-মুসলমান বিরোধ বর্তমান ছিল এবং ইংরেজ-রাজত্বের প্রথম দিকে, যখন কোম্পানী হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টির কিছুমাত্র চেষ্টা করেন নাই—তখনও মুসলমানদের দ্বারা দেবদেবীর প্রতিমা ইত্যাদি ভাঙ্গা ও ব্যাপকভাবে হিন্দুদের উপর অত্যাচারের দৃষ্টান্ত বিরল ছিল না। * সুতরাং মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র্যবোধের বিকাশের জন্য কেবলমাত্র ইংরেজশাসনকে দায়ী না করিয়া অন্য কারণও খুঁজিতে হইবে। এই কারণগুলিকে কালাহুতিক্রমিক ভাবে সাজাইতে গেলে কি ফল পাওয়া যায় তাহাই দেখা যাক।

* ইহার দৃষ্টান্ত হিসাবে তিনটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে :—

(১) কলিকাতা, ১৮২০ সন। “গত দুর্গোৎসবে হিন্দুরা সমুদ্রী পূজা দিবসে প্রাতঃকালে নবগজিকা গ্রান করাইতে গজাতীরে আনিয়াছিল। পরে গ্রান করাইয়া বাজাদি সমেত বাটা যাইতেছিল। যখন তাহারা চকটাবনীতে গৈছিল তখন অনেক মুসলমান সেখানে একত্র তাহারদিগের সহিত কলহ করিল ও তাহারদিগের মারিপিট করিল এবং ঢোল প্রভৃতি সকল ভাঙ্গিল ও নবগজিকার কলার গাছ কাটিল। তখন হিন্দু লোকেরা ধানান্তে সমাচার দিলে সেখানকার বরকন্দাশ আসিয়া যত যত মুসলমানের দ্বিগুণে পাইল সে সকলকে বাধিয়া পুলিশে চালান করিল। সেখানকার বিচারে অপরাধ

প্রথমেই চোখে পড়ে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের শাস্ত্রীয় বিধান। এই বিধান অমুসারে হিন্দু-মুসলমান উভয়েই নিজেদের একা সম্বন্ধে অতিশয় সজ্ঞান ও অপরের সম্বন্ধে অত্যন্ত অসহিষ্ণু। হিন্দুসমাজকে অসহিষ্ণু বা অমুসারে বলিলে বোধ করি অনেকের নিকট আশ্চর্য্য টেকিবে। কিন্তু ইহা কাল্পনিক অভিযোগ নয়। হিন্দুরা গায়ে পড়িয়া অমুসারবাহকী লোককে আক্রমণ না করিলেও নিজেদের জাত বাচাইবার জন্য যে বিধিব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাতেই মানবজাতির

বিশেষ কাহারও তিনমাস কাহারও পাঁচ মাস মেয়াদে করেদের আজ্ঞা হইল এবং নজাফ মুসলমান যে যে ছিল তাহারদিগের ভারি জরিপানা হইল এবং সেই সময়ে আজ্ঞা হইল যে কলিকাতার গোয়ারা বাহিরে বাইতে পারিবে না এবং বাহিরের গোয়ারা কলিকাতার মধ্যে আসিতে পারিবে না।" (সমাচার দর্পণ, ২৮শে অক্টোবর, ১৮২০।)

(২) কাশী, ১৮২১ সন। "বশ বৎসর হইল কাশীতে হিন্দু ও মুসলমানের বড় বিরোধে হইয়াছিল। মুসলমানেরা হিন্দুদের দেবালয়ে গোহত্যা করিল তাহাতে হিন্দুরা কোপাধিত হইয়া মুসলমানেরদের এক প্রধান মসজিদ ইয়াগ সেখানে এক শুরকে মারিয়া ফেলিল তাহারদের শিবির ভাঙ্গিয়া ফেলিল ও তাহারদের কোরাণ ছিঁড়িয়া আপন আপন পায়ের নীচে রাখিল। মুসলমানেরা ইহাতে আরও ক্রুদ্ধ হইয়া হিন্দুদের প্রধান মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলিল ও কালভেরদের জাতা ভাঙ্গিয়া ফেলিল ও পুনর্বার সেখানে মোহত্যা করিল ও রক্ত সর্ব্বত্র ছিটাইল ও মৃত গাে এক পবিত্র পুকুরিগীতে ফেলিল। পরে হিন্দুরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আপনাদের শক্তিশর্বাণ মুসলমানেরদিগকে মারিল। তাহাতে ইংলণ্ডীয় সেনাপতিরা অল্প কোন উপায় না দেখিয়া আপনাদের সৈন্যদ্বারা উভয় পক্ষে বিরোধ নিষ্পত্তি করিয়া দিলেন।" (সমাচার দর্পণ, ২৪শে জুলাই, ১৮২১। সংবাদপত্রে সেকালের কথা, তৃতীয় খণ্ড, ১৫২ পৃ. ১)

(৩) ঢাকা ও ফরিদপুর, ১৮৩৭ সন। "ইরানী জিলা ফরিদপুরের অন্তঃপাতি শিবচর থানার সরহদে বাহাদুর গ্রামে সরিষামূল নামক এক জবন বাবলাহি লওনচুক হইয়া দ্রুতধিক ১২০০০ জোলা ও মোসলমান দলবদ্ধ করিয়া...তৎপটুদিগের হিন্দুদিগের বাটী চড়াও হইয়া দেবদেবীর পূজার প্রতি অশ্লৈষ্য প্রকার আঘাত জন্মাইতেছে এবং এই

অহিন্দু অংশের চূড়ান্ত অপমান করা হইয়াছে। ইহার উত্তরে হযত অনেকে বলিবেন, হিন্দু ত অজ্ঞ জাতির আচার বা ধর্মের নিন্দা করে না, শুধু জাতিতে জাতিতে ধর্ম ধর্মের ও আচারে আচারে পার্থক্য আছে বলিয়া নিজের স্বাভাবিক বজায় রাখিয়া চলিতে চায়। এই ধরনের যুক্তি শুনিলে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবন্দী নেতাদের কথা মনে পড়িয়া যায়। তাহারা প্রথমে নেতাল, কেপ প্রভিন্স বা ট্রান্সভাল প্রবাসী ভারতবাসীকে কুলীজ্ঞানে বতন্ত্র বাসস্থান, স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল,

জিলা ঢাকার অন্তঃপাতি মলকতগঞ্জ থানার সরহদে রাজনগরনিবাসি দেওয়ান মৃত্যুঞ্জয় রায়ের স্থাপিত শ্রাদ্ধ শিবলিঙ্গ ভাঙ্গিয়া নবীতে বিসর্জন দিয়াছে এবং ঐ থানার সরহদে পোড়াগাছা গ্রামে একজন ভ্রমলোকের বাটীতে রাজিযোগে চড়াও হইয়া সর্ব্বধন হরণ করিয়া তাহার গৃহে অগ্নি দিয়া অবশিষ্ট যে ছিল ভ্রমরাশি হওয়াতে একজন জবন ধৃত হইয়া ঢাকার দণ্ডার্য্য অর্পিত হইয়াছে। আর শ্রুত হওয়া গেল সরিষামূল দলভুক্ত দুই জনেরা ঐ ফরিদপুরের অন্তঃপাতি পাটকালা গ্রামের বাবু ভারিগীচরণ মজুমদারের প্রতি নানাপ্রকার দোহায়া অর্থাৎ তাহার বাটীতে দেবদেবীর পূজার আঘাত জন্মাইয়া গোহত্যা ইত্যাদি কুসংস্কৃত উপহিত করিলে মজুমদার বাবু জবনদিগের সহিত সমুখ যুদ্ধ অমুচিৎ বোধ করিয়া ঐ সকল দোহায়া ফরিদপুরের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হজুতে জ্ঞাপন করিলে ঐ সাহেব বিচারপূর্ব্বক এক জন জবনকে কারাগারে বদ্ধ করিয়াছেন এবং এবিষয়ের বিলম্বন অমুসন্ধান করিতেছেন। হে সম্পাদক মহাশয় দুই জনেরা মফঃসলে এসকল অত্যাচার ও দোহায়া দ্বারা ক্ষান্ত না হইয়া বরং বিচারপূর্ব্বক আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইল।... আমি বোধ করি সরিষামূল যবন যেকার দলবদ্ধ হইয়া উত্তর উত্তর প্রবল হইতেছে অল্পদিনের মধ্যে হিন্দু ধর্ম লোপ হইয়া অকালে প্রলয় হইবেক। সরিষামূল জোটাশাটের শত অংশের এক অংশ ভীতুমির করিয়া ছিল না। অতএব আমরা শ্রীলঙ্কায়ের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি তিনি হিন্দু ধর্ম ও দেশ রক্ষার নিমিত্ত উক্ত ব্যক্তির দলভদের বিহিত আজ্ঞা করুন। ইতি সন ১২৪০ সাল তারিখ ২৪ চৈত্র। জিলা ঢাকা নিবাসি দ্রুতি তাগিপাশ্রু।" (সমাচার দর্পণ, ২২শে এপ্রিল ১৮৩৭। সংবাদপত্রে সেকালের কথা, তৃতীয় খণ্ড, ৩২ পৃ. ১)

মানবাহন ইত্যাদি ব্যবহার করিতে বলিতেন। আজকাল ঐরূপ কথা বলিলে অনেক ঋণড়াবিবাদের সম্ভাবনা আছে বলিয়া নূতন জ্বর ধরিয়াছেন। এখন তাঁহারা বলেন, ভারতবাসীকে কৃষ্ণাঙ্গ বলিয়া তাঁহারা মোটেই ঘৃণা করেন না; ভারতবাসীরা অতিপ্রাচীন ও সভ্য জাতি, তবে ভারতীয় সভ্যতা ও দক্ষিণ আফ্রিকার সভ্যতা বিভিন্ন ধরণের বলিয়া এ-দুয়ের জন্ত স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

স্বতন্ত্রাং নিজেদের অপমানের কথা শ্রবণ করিয়া তর্ক করিবার চেষ্টা না করিয়া আমাদের স্বীকার করা উচিত হিন্দুর শাস্ত্রে অস্ত্রের ধর্মের প্রতি অবজ্ঞা না থাকিলেও অস্ত্র ধর্মাবলম্বী লোকের প্রতি অস্ত্র-দারতার অভাব নাই। মুসলমানের অসহিষ্ণুতা ঠিক ইহার উল্টা। হিন্দুর ঘৃণা অহিন্দু মানুষকে, মুসলমানের ঘৃণা অমুসলমান ধর্মাবিশ্বাসকে। আমরা অহিন্দুর হিন্দু হইবার পথ রাখি নাই, তবু তাহাদিগকে অহিন্দু বলিয়াই অপাংক্ত্যে করিয়া রাখিয়াছি। মুসলমানরা অস্ত্র ধর্মাবিশ্বাসকে, বিশেষ করিয়া পৌত্তলিকতাকে ঘৃণ্য করেন বলিয়াই সকলের মুসলমান হইবার পথ উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। মোটের উপর হিন্দুর অহুদারতাকে 'প্যাসিভ' ও মুসলমানের অহুদারতাকে 'অ্যাক্টিভ' বলা যাইতে পারে।

কিন্তু অহুদারতার প্রকৃতি যাহাই হউক উহার ফল উভয় পক্ষেই এক পাড়াইয়াছে। হিন্দু যেমন হিন্দুর সামাজিক বিধান অহুসারে সকল হিন্দুকে আপন ও সকল মুসলমানকে পর বলিয়া জ্ঞান করিতে বাধ্য, মুসলিম ধর্মশাস্ত্রের বিধান অহুসারী মুসলমানও তেমনই সকল মুসলমানকে আপন ও সকল হিন্দুকে পর মনে করিতে বাধ্য। বরঞ্চ মুসলমান সমাজের আভ্যন্তরীণ সাম্য ও ভ্রাতৃত্বভাবের জন্ত অমুসলমান সম্বন্ধে তাঁহারা আরও বেশী সজ্ঞান। মুসলমান ধর্মশাস্ত্রের

নির্দেশ মত মুসলিম মাজেরই নিকট পৃথিবী ছুইভাগে বিভক্ত—
(১) দার-অল-ইসলাম; (২) দার-অল-হরুব। দার-অল-ইসলামের অর্থ ইসলামের দেশ, অর্থাৎ যে দেশ মুসলমান ধর্মাবলম্বী শাসক কর্তৃক অধিকৃত ও শাসিত। দার-অল-হরুবের অর্থ যুদ্ধের দেশ, যে দেশে যুদ্ধ করিয়া ইসলামের প্রাধিক্ত স্থাপন করিতে হইবে। ইসলামের বিধান অহুসারে কোন মুসলমান অমুসলমানের অধীন থাকিতে পারেন না। শুধু তাই নয়, অমুসলমান জগৎ ও মুসলমান জগতের মধ্যে চিরন্তন বিরোধ। এই জন্তই অমুসলমান জগতের নামকরণ হইয়াছে দার-অল-হরুব, যুদ্ধের দেশ। এই নির্দেশের জন্ত অমুসলমান ও মুসলমান রাজ্যের মধ্যে কোন মৈত্রী হইতে পারে না; যতদিন পর্যন্ত না দার-অল-হরুব দার-অল-ইসলামে পরিণত হইবে ততদিন পর্যন্ত বিশ্বাসী মুসলমান মাজকেই জিহাদ বা ধর্ম যুদ্ধ চালাইতে হইবে। জিহাদের নিয়ম অহুসারী অবিশ্বাসীকে হয় (১) মুসলমান হইতে হইবে, কিংবা (২) মুসলমানের প্রাধিক্ত স্বীকার করিয়া ও জিজিয়া দিতে স্বীকৃত হইয়া আশ্রিত (খিন্দী) হইয়া থাকিতে হইবে, কিংবা (৩) যুদ্ধ করিতে হইবে। ইসলামের বিধান মানিলে এই তিন পথের এক পথ ভিন্ন মুসলমানের অমুসলমানের নিকট যাইবার চতুর্থ আর কোন পথ নাই। *

* জিহাদের বিধান অবশ্য ইসলামে একদিনেই প্রবর্তিত হয় নাই। মহম্মদের মদিনা প্রয়াণের পূর্বে আদেশ ছিল, অবিশ্বাসীরা অত্যাচার করিলেও প্রতিশোধের চেষ্টা করিবে না। কিন্তু হিজিরার পর হইতেই একটা নূতন ধারা দেখা দেয় ও ক্রমে ক্রমে তিনটি ধাপে জিহাদের নির্দেশ ধর্মশাস্ত্রের বিধান বলিয়া স্বীকৃত হয়। এই ধাপগুলি এই—
(১) বিশ্বাসীরা আক্রান্ত হইলে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিবে। (কোরান, ২২:৩৯-৪২)।
(২) যুদ্ধ মুসলিমের কর্তব্য (কোরান ২২:১২-২১৩)। "The strife is prescribed

পৃথিবীকে দার-অল-ইসলাম ও দার-অল-হুব্বে বিভাগ আবাদগিকে উইন্সি প্রভৃতির স্বায়ী বিপ্লব (পাশ্চাত্যে রিভলিউশন) খিওরী ও কমিউনিষ্টের কার্যকলাপের কথা শ্রবণ করাইয়া দেয়। * গোড়া কমিউনিষ্টের নিকট পৃথিবীর সমস্ত লোক যেমন দুইটি পরস্পর বিরোধী শ্রেণীতে বিভক্ত, বিশ্বাসী মুসলমানের নিকটও তেমনই মুসলমান ও অমুসলমানের পার্থক্য ও বিরোধ অবশ্যস্বীকার্য। কিন্তু এখানে একটি আপত্তি উঠিতে পারে। যদি ইহাই সত্য হয় যে এক মুসলমান ধর্ম অবলম্বন ভিন্ন ইসলামের বিধান অল্পসারে মুসলমান ও অমুসলমানের

for you.')। (৩) অবিদ্বাসী মাত্রকেই ইসলামে লীকিত করিতে হইবে। এই শেষ নির্দেশ ইসলামের সিঁড়ির ঘণ্ডে প্রবর্তিত হয় ও যুগারী, মুসলিম প্রভৃতি দূত হসিদে পুণিকবিত্ত রূপে দেখা যায়। তখন মহম্মদের ঘণ্ডে এই ধরণের বাণী দেওয়া হইয়াছে— ইসলামকে স্বীকার না করা পর্যন্ত যুদ্ধ করিতে হইবে। ('I am commanded to fight against men until they bear witness that there is no God but Allah, and that Muhammad is God's messenger; only by pronouncing these words can they make their property and blood secure from me.')

* এই প্রসঙ্গে কমিউনিষ্ট নেতাদের কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত হইতেছে, "Sheep must protect themselves against the wolves. It is absurd to suppose that you can secure a common sheep-wolf's will. There must be either a wolves' will or a sheep's will. In the same way, there cannot be a common capitalistic-labour will." "The communist revolution can be victorious only as a world revolution." "The permanent revolution in Russia grows into a European revolution of the proletariat." "The proletariat of Russia never thought of creating an isolated socialist state. A self-sufficient 'socialist' state is a petty-bourgeois ideal."

প্রকৃত সমর্থনের কোন উপায় নাই, তাহা হইলে ভারতবর্ষে এতদিন ধরিয়া হিন্দু ও মুসলমান পাশাপাশি বাস করিল কি করিয়া, এবং মুসলমান আধিপত্যের সময়েও কি সামাজিক আচারে, কি সাহিত্যে ও কলায়, এমন কি ধর্মবিশ্বাসেও উভয়ের আংশিক মিলন হইল কি করিয়া? ইহার প্রথম উত্তর এই যে, কোন সমাজ বা ধর্মবিপ্লবের প্রারম্ভে যে উগ্রতা থাকে তাহা চিরকাল স্থায়ী হয় না। রুশিয়ার যে কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রতন্ত্রের কথা এই মাত্র বলা হইল, তাহা এখন পৃথিবীব্যাপী বিপ্লবের আশা ছাড়িয়া দিয়া ধনিক গভর্নমেন্টের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইতেছে, ধনিক সমাজও এখন আর তাহাকে অশুভ জ্ঞান করিতেছে না। ব্রাহ্মধর্ম প্রবর্তনের গোড়ার দিকে ব্রাহ্মরা নিজেদিগকে হিন্দু বলিয়া স্বীকার করিতে যুগাই বোধ করিতেন, এখন বরঞ্চ তাহার। হিন্দু নামে একটু গৌরবই অহভব করেন। তেমনই মুসলমান সমাজেও অমুসলমান সপক্ষে প্রথমে যে তীব্র অসহিষ্ণুতা ছিল তাহা অবস্হাচক্ষে মন্দীভূত হইয়া পড়িয়াছিল। * অল্প ব্যাপারেও আমরা এই জিনিষটা লক্ষ্য করি। চিত্রাঙ্কন ও কুশীদ গ্রহণ দুই-ই মুসলমান ধর্মশাস্ত্র অহুযায়ী নিষিদ্ধ। অথচ মুসলমান চিত্রকলা পৃথিবীর একটা বড় সম্পদ এবং স্নদ লওয়া সপক্ষে স্পষ্ট বিধান আরবদেশেও লঙ্ঘিত হইয়াছে।

ইহা ছাড়া ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমানের পাশাপাশি বাসের ও ভাব আদান প্রদানের আর একটা বড় কারণও আছে। এদেশের মুসলমানরা গতাহুগতিক প্রথা অহুযায়ী শেষ সৈয়দ মোগল পাঠান এই চারি

* শ্রবণ রাণা এয়োজন, মহম্মদ ও তাঁহার অনুচরবর্গের প্রতি অল্প আরবদের অত্যাচার ও আক্রমণের জন্তই প্রথমে এই অসহিষ্ণুতার উদ্ভব হয়।

শ্রেণীতে বিভক্ত। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে উহাদের বারো আনাই ভারতবর্ষের পুরাতন অধিবাসী। পঞ্জাবের গ্রাম্য মুসলমানকে জাতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে এখনও সে আমি জাঠ, কিংবা রাজপুত, কিম্বা আবন, গাক্কার ইত্যাদি বলিয়াই পরিচয় দেয়, ধর্মের উল্লেখ করে না। ভারতবর্ষের অজ্ঞ যে মুসলমান আছে তাহাদের সামাজিক আচার-ব্যবহার লক্ষ্য করিলেও দেখা যায়, উহারা কোথাও ইসলামের বিধিনিষেধ একেবারে নির্ভুতভাবে পালন করিতে পারে নাই; ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলেও লোকাচারে, দৈনন্দিন জীবনে, উৎসবে-আমোদে, এমন কি পূজাপার্বণেও হিন্দু হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় নাই।

এই ত গেল মুসলমান পক্ষের কথা। মুসলমান আদিপত্যের যুগে হিন্দু-মুসলমানের যে মিলন দেখিতে পাওয়া যায় তাহার একটা হিন্দুর দিকও আছে। তখন সাধারণ মুসলমান যেমন যোল আনা গোঁড়া মুসলমান ছিল না সাধারণ হিন্দুও তেমনই যোল আনা গোঁড়া হিন্দু ছিল না। এই যুগে হিন্দু সভ্যতার প্রাচীন গৌরবের কোন স্মৃতি ছিল না। স্মৃতির হিন্দুর সংস্কৃতি লোপ পাইবে এই আশঙ্কা করিয়া সাধারণ হিন্দু-মুসলমানের আচার, ভাষা, পোষাকপরিচ্ছদ, এমন কি ধর্মবিশ্বাসও গ্রহণ করিতে সঙ্কোচ বোধ করিত না। এই কারণে তখন দুই সম্প্রদায়ের সাধারণ লোকের মধ্যে সৌহার্দ্য থাকাই স্বাভাবিক বলিয়া মনে করিতে হইবে। বিবাদ হইলেই বরঞ্চ আশ্রয় হইবার কথা ছিল।

কিন্তু সমাজের নিয়ন্ত্রণে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের কাহিনী বলিতে গিয়া দুই সম্প্রদায়েরই অজ্ঞ একটা স্তরও যে ছিল তাহা ভুলিয়া গেলে চলিবে না। সেই স্তরে হিন্দু যেমন হিন্দুর হিন্দু রক্ষা সম্বন্ধে সজ্ঞান

মুসলমানও তেমনই ইসলামের বিপক্ষ দ্বারা প্রচার করিবার জ্ঞান বন্ধ-পরিকর। এই স্বপ্নের নেতা একদিকে মুসলমান উলোমা ও অত্মদিকে হিন্দু পণ্ডিত। উহাদের একপক্ষ যেমন হিন্দুকে 'যবন দোষ' হইতে রক্ষা করিবার জ্ঞান কঠিন বিধান সৃষ্টি করিতেছিলেন, আর একপক্ষও তেমনই মুসলমানধর্ম বিস্তার এবং ইসলামের প্রকৃত অহুশাসন প্রচারের চেষ্টা করিতেছিলেন। এই বিবাদের মধ্যে মাঝে মাঝে মুসলমান খুলতান ও বাদশাহরা আসিয়া পড়িয়াছেন, হিন্দু রাজারাও আসিয়াছেন। কিন্তু সেকালে এ-যুগের মত জনমতের উপর প্রভাব বিস্তার করিবার উপায় ছিল না বলিয়া উহাদের প্রচেষ্টা মাঝে মাঝে সফল হইলেও সমগ্র দেশব্যাপী হিন্দু-মুসলমান বিরোধে পরিণত হইতে পারে নাই।

এইবার ঊনবিংশ শতাব্দীতে নামিয়া আসা যাক। ভারতবর্ষে ইংরেজরাজত্ব প্রতিষ্ঠা হইবার সঙ্গে সঙ্গে যখন একদিকে মুসলমানের আদিপত্য ও অত্মদিকে হিন্দুপদ পাদশাহীর স্বপ্ন ঘুচিয়া গেল; যখন একদিকে হিন্দুত্বের অবলম্বন মারাঠা, রাজপুত ও জাঠ সামন্তগণ ও অত্মদিকে মুসলমানত্বের অবলম্বন মোগল পাঠান অভিজাতবর্গ হস্তবল হইলেন, তখন উভয় সম্প্রদায়ের সাধারণ লোকে মিলিয়া, সাহিত্য সঙ্গীত চিত্রকলা সামাজিক আচার-ব্যবহার ও আর্থিক ব্যাপারে যে ঐক্যবন্ধন বহুকাল ধরিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহাকে দৃঢ়তর করিয়া ইংরেজবিরোধী একটা জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি করিল না কেন? বরঞ্চ একই পরাধীনতা সত্ত্বেও ইংরেজশাসনকালেই উভয় সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র্যবোধ আরও উগ্র হইয়া উঠিল কেন?

এই ব্যাপারটা বুঝিতে হইলে সকলের আগে আমাদের জাতীয়তাবাদের প্রকৃতি কি তাহা আবিষ্কার করা প্রয়োজন। ইংরেজশাসনের প্রথম একশত বৎসর ধরিয়া বাহারা ইংরেজের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল তাহাদের সকলেই ভারতবর্ষের পুরাতন হিন্দু-মুসলিম রাষ্ট্রতন্ত্রের উত্তরাধিকারী অথবা সেই পুরাতন রাষ্ট্রতন্ত্রের পুনরুত্থানকারী। ইহাদের শেষ চেষ্টা সিপাহীবিদ্রোহ। এই সমুদয় চেষ্টার মধ্যেই হিন্দু-মুসলমানের মিলন দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যে রাষ্ট্রীয় স্বাভাবিকতার আকাঙ্ক্ষা আজিকার জাতীয় আন্দোলনের মূলে তাহার প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বাহারা উহার প্রবর্তক ও পুরোধা তাহারা যে কেবলমাত্র ইউরোপীয় ‘ন্যাশনালিজম’ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন তাহাই নয়, এ-দেশের পুরাতন শাসকদের সহিত ইংরেজের সংঘর্ষে ইংরেজের পক্ষসমর্থকও ছিলেন। রামমোহন রায়ের সহিত বর্তমান যুগের জাতীয় আন্দোলনের সম্পর্ক সর্বজনবিদিত। তিনি ১৮২৯ সনে এক জন ফরাসী পর্যটককে বলেন, “যখন বিজয়ী জাতি বিজিত জাতির ভুলনায় অধিক সভ্য, তখন পরাধীনতাকে দুইয়টি বিশেষ ক্ষেত্র ভিন্ন সাধারণভাবে অনিষ্টকর বলা যাইতে পারে না, কারণ বিজয়ী জাতির সভ্যতার উৎকর্ষদ্বারা বিজিত জাতি উপরুত হয়। যদি আমরা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়া অল্প অনেক বিষয়েই ক্ষতিগ্রস্ত না হইতে চাই তাহা হইলে ভারতবর্ষে ইংরেজশাসন আরও বহু বৎসর স্থায়ী হওয়া প্রয়োজন।” *

• “La conquete est bien rarement un mal, quand le peuple conquerant est plus civilise que le peuple conquis, parce qu'elle apporte a celui-ci les biens de la civilisation. Il faut a l'Inde bien des annees de domination anglaise pour qu'elle puisse ne pas perdre beaucomp en ressaisissant son independance politique.” (Victor Jacquemont—“Journal”. Tome I, pp. 186-187.)

বন্ধিমচন্দ্রও বলিয়া গিয়াছেন, ইংরেজরা আমাদেরকে অরাজকতা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। তাহা ছাড়া বন্ধিম সপক্ষে আর একটি গল্পও আছে। তিনি যখন ভেপুটিগিরির জন্ম প্রার্থী হন, তখনও সিপাহী-বিদ্রোহের জ্বর চলিতেছে। যে পদস্থ ইংরেজ কর্মচারীর নিকট তিনি গিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাকে এই যুদ্ধের ফলাফল সপক্ষে প্রবৃত্ত করিলেন। বন্ধিম উত্তর দিলেন, ইংরেজের জয় সপক্ষে বিন্দুমাত্র দ্বিধা থাকিলে তিনি চাকুরীর জন্ম আসিতেন না।

জাতীয় স্বাধীনতার জন্ম একান্ত আগ্রহশীল, অথচ বাহারা এই স্বাধীনতার রক্ষা ও লাভের জন্ম প্রাপ্ত দিয়া চেষ্টা করিতেছে তাহাদের বিরুদ্ধাচরণ, এই ব্যাপারটা অনেকের নিকট, বিশেষ করিয়া অল্প দেশের জাতীয়তাবাদীদের নিকট, বড়ই আশ্চর্য্য ঠেকিবে। কিন্তু আমাদের জাতীয় জাগরণের নেতারা সম্পূর্ণ সজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় এই পথ ধরিয়াছিলেন। * শুধু তাহাই নয়, তাহারা বিশেষ করিয়া যে জাতীয় পুনরুত্থানের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন তাহা হিন্দুর প্রাচীন গৌরব, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রীয় শক্তি ফিরাইয়া আনিবার স্বপ্ন। রিনেসেন্সের সময়ে ইউরোপীয় জাতিরা যেমন নতন করিয়া গ্রীস ও রোমের সভ্যতার সন্ধান পান, ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্ববিদ ও প্রত্নতাত্ত্বিকদের

• পরবর্ত্তীযুগে অল্প এই মনোভাবের পরিবর্তন হয়। বিনায়ক দামোদর সাভারকর ‘১৮৫৭ সনের ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ’ এই নাম দিয়া সিপাহীবিদ্রোহের ইতিহাস লেখেন, দেবীর বামনদাস বহু ওয়ারেন হেস্টিংস, ওয়েলেসলী, ডালহাউসী প্রভৃতির তীব্র সমালোচনা করেন, এবং অস্তিত্ব বহু লেখক শিখ, মারাঠা, মোগল, সিরাজউদ্দৌলা, এমন কি নন্দকুমারের পর্য্যাপ্ত পক্ষ সমর্থন করিয়া পুস্তক রচনা করেন। কিন্তু তখন মৌখিক সহায়ত ভিন্ন অল্প কোনরূপ সহায়তা করিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। বোধ করি কার্যক্ষেত্রে কিছু করিবার ছিল না বলিয়াই সহায়তহীন উত্তর হইয়াছিল।

গবেষণার ফলে ভারতবর্ষের হিন্দু-ও তেমনই-তাহাদের প্রাচীন কীষ্টির সন্ধান পান। রামমোহন, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, টিলক প্রভৃতি সকলেই এই প্রাচীন হিন্দুধারার প্রচারক। তাহারা একদিকে সংস্কারক, অপর দিকে জাতীয়তাবাদী। ইহাদের সকলেই প্রচলিত হিন্দু আচারকে বিনাবিচারে গ্রহণ না করিয়া প্রাচীন হিন্দুসভ্যতার আদর্শের মধ্যে প্রেরণা খুঁজিয়াছিলেন। তাই ইহাদের শিক্ষায় ভারতবর্ষের জাতীয় অভ্যুত্থানের যে ধারণা শিক্ষিত সাধারণের মধ্যে গড়িয়া উঠিল তাহা সম্পূর্ণ হিন্দুভাবাপন্ন। কি রাষ্ট্রে কি সংস্কৃতিতে উহার দুইটি দিক দেখিতে পাওয়া যায়। উহা একদিকে যেমন ইংরেজবিরোধী, আর একদিকে তেমনই মুসলমান বিরোধীও বটে।

৫

যে কারণে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের হিন্দুরা পূর্বাশ্রয় অনেক বেশী হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া উঠেন, ঠিক সেই কারণেই ভারতবর্ষের মুসলমানরাও এই যুগে অনেক বেশী ইসলামী ভাবাপন্ন হইয়া পড়েন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে কেবলমাত্র এদেশেই যে মুসলমানের আধিপত্য ও গৌরব লুপ্ত হয় তাহাই নয়, পশ্চিম এশিয়া, আফ্রিকা এবং পূর্ব ইউরোপেও তাহাদের ক্ষমতা হ্রাস হইতে আরম্ভ করে। আলজিরিয়া ফরাসীরা দখল করেন, মিশরে ও হুদানে ইংরেজের প্রভুত্ব স্থাপিত হয়, গ্রীক সার্ব বুলগেরিয়ান রুমানীয়ান প্রভৃতি জাতির বিরুদ্ধে তুর্কীর স্বতন্ত্রতাবাদী সঙ্কটিত হয়, ইউরোপীয় শক্তিবর্গ তুর্কীর আভ্যন্তরীণ শাসনে হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করেন, ও রুশিয়ার চাপে পারস্যে ও মধ্য এশিয়ার মুসলমান আধিপত্য ক্ষয় হয়। ইসলামের এই সর্বস্বাধীন ছুরবন্ধার সময়ে জগতের সমস্ত মুসলমানকে একছত্রের নীচে সমবেত

করিয়া, ইসলামকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার স্বপ্ন লইয়া এক সংস্কারকের আবির্ভাব হয়। ইহার নাম সৈয়দ জামাল-উদ্দীন অল-আফগানী।

পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদের ইতিহাসে মাংসিনির যে স্থান ইসলাম-জগতে জামাল-উদ্দীন নিঃসন্দেহে সেই স্থান অধিকার করিতে পারেন। কি পাণ্ডিত্যে, কি বাগ্মীতায়, কি কথ্যে, কি রাষ্ট্রনীতিজ্ঞানে, কি আদর্শপরায়ণতায় ঊনবিংশ শতাব্দীতে তাহার সমকক্ষ দ্বিতীয় ব্যক্তি মুসলিম সমাজে জন্মগ্রহণ করেন নাই। মিশরের 'গ্র্যাণ্ড মুফতি' শেখ মুহম্মদ আবদু সর্কাত অসাধারণ ব্যক্তি বলিয়া স্বীকৃত। তিনিও জামাল-উদ্দীনকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। তুর্কী পারস্ত প্রভৃতি স্বাধীন মুসলমান দেশকে ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের হাত হইতে বাঁচাইয়া পৃথিবীর সমস্ত মুসলমানকে এক খলিফার নেতৃত্বে একত্র করাই তাহার জীবনের স্বপ্ন ছিল। ইহার জন্ত তিনি পাখি ভোগস্থ তুচ্ছ করিয়া কোমর্ধ্য ও দারিদ্র্য বরণ করিয়া ভারতবর্ষ হইতে আফগানিস্থান, পারস্ত, তুর্কী, মিশর, ফ্রান্স এমন কি আমেরিকা পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাহার প্রচার-কাণ্ডে মুসলমান জগতে একটা নবজাগরণের সূচনা হয়। সকল বিষয়ে তাহার কাণ্ড্যকলাপ ও মতামতের সমর্থক না হইলেও, এমন কি সময়ে সময়ে তাহাকে উৎপীড়ন করিলেও পারস্যের নসরুদ্দিন শাহ ও তুর্কীর সুলতান আবদুল হামিদ তাহার পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন। মিশরে আরাবী পাশার নেতৃত্বে স্বাধীনতালাভের চেষ্টাও তাহারই শিক্ষার ফলে ঘটে। *

* 'মন্ত-হিরশ-শর্ক'র লেখক একজন সিরীয় খৃষ্টান। তিনি বলেন, "He raised up a living spirit in the hearts of his friends and disciples which stirred their energies and sharpened their pens, and the East

সে-যুগের স্বাধীন মুসলমান রাজ্যের নৃপতিরা যদি আরও আদর্শ-পরায়ণ ও চক্ষুমান হইতেন, এবং কেবল নিজেদের বংশ ও ব্যক্তিগত স্বার্থের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া ইসলামের প্রকৃত স্বার্থ সধক্ষে সচেতন হইতেন, তাহা হইলে জামাল-উদ্দীনের শিক্ষা হয়ত আরও অনেক বেশী ফলপ্রসূ হইত। কিন্তু এই সকল বাধা সত্ত্বেও ত্রাহার প্রচার ও আন্দোলনে সমগ্র মুসলমান জগতে ইসলামের পূর্ব গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার আকাঙ্ক্ষা জাগে ও মুসলিম সমাজের একেবারে ধারণা আরও অধিক বন্ধন হয়। এই কারণেই হুলতান আবদুল হামিদ জামাল-উদ্দীন সধক্ষে সকল বিষয়ে একমত ও নিঃসংশয় না হইলেও নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্ত প্যান-ইসলামিজম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। তখন ইউরোপীয় শক্তিবর্গ তুর্কীর শাসনতন্ত্র সংস্কার করিবার জন্ত ও খৃষ্টান প্রজাদিগকে স্থানীয় স্বরাজ দিবার জন্ত তাহার উপর চাপ দিতেছিল। তিনি দেখিলেন, ইহার উত্তরে যদি তিনি ইউরোপীয় শক্তিবর্গের মুসলমান প্রজাদিগের মধ্যে একটা উত্তেজনা ও বিস্ফোরকের ভাবের সৃষ্টি করিতে পারেন, তাহা হইলে বিপর্যাস ইংরেজ করাসী কুশীলয়া হয়ত তাহাকে নিরুপদ্রবে থাকিতে দিতে পারে। ঠিক এই কারণেই আবদুল হামিদের রাজ্যচ্যুতির পর নবাতুর্ক দলও প্যান-ইসলামিজমের পোষক হইলেন। ইহাদের অনেকেই ইউরোপে বা ইউরোপীয় ধরণে শিক্ষালাভ করিয়া থিলাফতে বিশ্বাস হারাইয়াছিলেন। তবুও তাহারা জানিতেন, ইউরোপীয় শক্তিবর্গের হাত হইতে বাঁচিতে profited and will profit by them." (ব্রাউন-কৃত ইংরেজী অম্বাধার)। জামাল-উদ্দীনের জন্ম ১৮৩৩-৩৯ সনে ও মৃত্যু ১৮৯৭ সনে হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্ত এডওয়ার্ড জি ব্রাউন প্রণীত "The Persian Revolution of 1905-09"-এর প্রথম অধ্যায় উত্তম।

হইলে সমগ্র মুসলমান সমাজকে প্রবুদ্ধ না করিলে চলিবে না। তাই ত্রাহার ও বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ও মহাযুদ্ধের সময়ে মুসলমানদিগকে ইসলামের নীতি ও ইসলামের একা সধক্ষে সদাজাগ্রত রাখিবার চেষ্টা করেন।

এই প্যান-ইসলামিক আন্দোলনের প্রভাব ১৮৮০ সনের পর হইতে ভারতবর্ষের মুসলমানদের মধ্যেও বিস্তারলাভ করিতে আরম্ভ করে। জামাল-উদ্দীন নিজে কলিকাতা পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। ১৮৮৩ সনে উইলফ্রিড ব্রাউন্ট যখন কলিকাতায় আসেন তখন তিনি পুরাতন ও নূতন, উভয় মতাবলম্বী মুসলমানদের মধ্যেই জামাল-উদ্দীনের প্রতি শ্রদ্ধার যথেষ্ট পরিচয় পান, জামাল-উদ্দীনের শিক্ষার ফলও স্পষ্ট লক্ষ্য করেন। বাংলার জাতীয় আন্দোলনের সুবিখ্যাত নেতা ও হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রচারক বিপিনচন্দ্র পালও লিখিয়াছেন,—

"He [Jamal-ud-din] passed through India inoculating many a leader of Mahomedan thought in Calcutta and Bombay and other cities with this new virus. As a messenger of this gospel, Jamal-ud-din went from India to Egypt and Turkey. But the seed that he had sown among us grew in secret for over a quarter of a century. Its only outer manifestation was seen in a new self-consciousness of our Moslem neighbours, a new conceit of separate communal interests, and a new desire to revive, in the name of purity, the old iconoclastic spirit of the Islamic faith and thereby to work a new religious cleavage between the Mahomedans and their Hindu neighbours." *

স্বদেশীয়গণের হিন্দু নেতারা মুসলমান-জাগরণের প্রতি কি মনোভাব পোষণ করিতেন, পালমহাশয়ের এই উক্তিতে তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। হিন্দুর পক্ষে হিন্দু সভ্যতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবার ইচ্ছা যদি 'virus' না হয়, তাহা হইলে মুসলমানের পক্ষে ইসলামের হৃতপ্রায় গৌরব ফিরাইয়া আনিবার আকাঙ্ক্ষাই 'virus' বলিয়া অভিহিত হইবে কেন? তাহা ছাড়া, পালমহাশয় জামাল-উদ্দীনের প্রতি একটি অবিচার করিয়াছেন। জামাল-উদ্দীনের ইসলাম প্রেম প্রধানতঃ ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী ছিল বলিয়া তিনি ভারতবর্ষের হিন্দুদের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। কিন্তু এই সকল তর্ক এখানে তুলিবার প্রয়োজন নাই। ভারতীয় মুসলমানদের আত্মচৈতন্যের জাগৃতি ভাল হউক মন্দ হউক, উহা যে প্যান-ইসলামিজম্-এর প্রভাবে উদ্ভূত হয়, মাত্র ইহাই বর্তমানে আমার প্রতিপাদ্য।

অবশ্য ইহার পূর্বে ওয়াহাবি সম্প্রদায়ও এদেশের মুসলমানদিগকে আরও খাটি মুসলমান করিবার প্রচেষ্টা আরম্ভ করিয়াছিলেন। * কিন্তু তাহাদের মূখ ছিল সম্পূর্ণ অতীতের দিকে। ধর্মসভার নিছক রক্ষণশীল আন্দোলন যেমন হিন্দুদের উপর বেশী প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই, বোল আনা পুরাতনপন্থী ওয়াহাবি নীতিও তেমনি বর্তমান যুগের মুসলমানদিগকে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। কিন্তু নূতন প্যান-ইসলামিজম্ নূতন হিন্দু জাতীয়তাবাদের মত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, নূতন ও পুরাতনের সংমিশ্রণ বলিয়া ভবিষ্যৎস্থান যুবক ও শিক্ষিত সমাজকে অগ্রপ্রানিত করিতে সক্ষম হইয়াছিল। ইহার প্রমাণ হিসাবে এইটুকু

* ১৮২০ সনের কাহাকাহি রায়-বেরেলির সৈয়দ আহমদ ভারতবর্ষে ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রবর্তন করেন। বাংলা দেশের তীর্থুমির ঠাঁহারই শিষ্য ছিলেন। ১৮৩০-৭০ সনের মধ্যে ওয়াহাবি আন্দোলন আরও প্রসার লাভ করে।

বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এ-যুগের ভারতবর্ষীয় নব্য মুসলমানদের যাহারা নেতা, তাহাদের সকলেই, স্তর সৈয়দ আমীর আলি প্রভৃতি, এমন কি স্তর সৈয়দ আহমদ পথান, প্যান-ইসলামিজমের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। *

৬

জাতীয় জাগরণের ফলে হিন্দুরা ও প্যান-ইসলামিজমের ফলে মুসলমানরা উনবিংশ শতাব্দীর শেষ বিশ-ত্রিশ বৎসর ধরিয়া ধীরে ধীরে আত্মানুভূতি লাভ করিতেছিলেন। এ-দুয়ের মধ্যে প্রথম সংঘর্ষ ঘটিল ১৯০৬-১৯০৭ সনে স্বদেশী আন্দোলন উপলক্ষে। ইহার বহু পূর্বে হইতেই

* ভারতবর্ষে প্যান-ইসলামিজম্-এর প্রসার নথকে ব্রিটিশ ও রুশীয় গভর্ণমেন্টও যে সচেতন ছিলেন, তাহার কয়েকটি প্রমাণ এখানে দেওয়া যাইতে পারে। ১৯১০ সনের ১৫ই ডিসেম্বর ব্রিটিশ দূত স্তর জর্জ বুকাননের সহিত ভারের এ-বিষয়ে যে কথাবার্তা হয়, স্তর জর্জ তাহার নিম্নোক্ত চূড়ক দিয়াছেন, "His Majesty continued... Great Britain had of late experienced considerable troubles in India, and Russia was likely soon to be confronted with similar difficulties in Turkestan. An active propaganda was being carried there by the Mullahs, and His Majesty feared that we were both threatened with a serious Pan-Islamic movement. I observed that it was rather with the Hindus than with the Mahomedans that our troubles in India had originated, but that many attributed to the young Turks the desire to encourage such a movement as that of which His Majesty had spoken. (Sir George Buchanan to Sir E. Grey, dtd. Dec. 15, 1910).

ইহার কয়েকদিন পরে জার ও ইটালিগণের সহিত স্তর জর্জ বুকাননের আবার এই বিষয়ে কথাবার্তা হয়, ও এই কথোপকথনের মধ্য স্তর জর্জ পররাষ্ট্রবিভাগকে জানান।

ভারতবর্ষের মুসলমানরা হিন্দুদের সর্গবিষয়ে উন্নতির তুলনায় নিজেদের দুর্বলতা লক্ষ্য করিয়া বিশেষ ক্ষোভ অস্থির করিতেছিলেন। কিন্তু যুগোপযোগী শিক্ষার অভাবে ও ইংরেজ গভর্নমেণ্টের সহিত বিরোধ থাকায় কি করিয়া ইহার প্রতীকার করা যায় তাহা ভাবিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। এই দুই বাধা দূর করিবার ব্যবস্থা করিয়া ভারতীয় মুসলমান সমাজকে নতুন পথ নির্দেশ করেন সর্বাগ্রে শ্রর সৈয়দ আহমদ ও তিনি যে দারবার প্রবর্তন করেন তাহার পরিণতি হয় স্বদেশী

তাঁহার উক্তরে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রবিভাগের পার্শ্বমেন্ট অফিস-সেক্রেটারী শ্রর আর্থার নিকলসন লেখেন, "I do not quite see how we can utilize the risks of the Pan-Islamic movement. There is no doubt that the Russians are becoming uneasy in regard to this movement, and Benckendorf left with me the other day a series of questions which I have passed to the India office, as to what steps we were taking in India towards controlling and influencing the instruction which was given in our Moslem schools. When I was in Russia, I ascertained that the young Turks were carrying on a fairly active propaganda in the south of Russia and in Turkestan, and it is possible that they may extend their activity to India." (Sir Arthur Nicolson to Sir G. Buchanan dtd, Jan. 3, 1911).

ইহার বঙ্গর বেড়েক পরে কুশিয়ার পররাষ্ট্রসচিব মসিগ সাজোনভ আবার শ্রর এডোয়ার্ড গ্রেস নিকট এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। আফগানিস্থানে তুর্ক সামরিক কক্ষচারীদের উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, "Ces instructeurs s'occupent en meme temps de propagande, pan-islamique, egalement dangereuse au point de vue des interets anglais et russes. Gagnant du terrain dans les domaines de l'Emir et excitant le fanatisme des populations afghanes, cette propagande penetre de plus en plus dans les regions limitrophes de la Russie et des pays qui se trouvent sous son protectorat." (Memorandum communicated by Sazonov, Sept. 24, 1912).

আন্দোলনের সময়ে। তখন মুসলমানরা দুইটি জিনিষ উপলব্ধি করেন। প্রথমত তাঁহারা দেখেন, সংঘবদ্ধ ভাবে আন্দোলন করিয়া হিন্দুরা রাষ্ট্রতন্ত্রে নিজেদের অধিকার স্থাপন করিতে চাহিতেছেন ও অনেকটা ক্লতকার্য্যও হইতে চলিয়াছেন; দ্বিতীয়ত তাঁহারা অস্থান করেন, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করিতে পারিলে হিন্দুরা দেশে যে দারবার প্রবর্তন করিবেন তাহা তাঁহাদের বিশিষ্ট হিন্দুজাতীয়তার ধারা। মুসলমানদের এই শেষোক্ত দারবা যে অমূলক নয়, তাহা হিন্দু নেতারাও স্বীকার করিয়াছেন। বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় বলেন,—

"Nor can the Indian nationalists absolutely absolve themselves of all responsibility for this unfortunate state of things. If the Moslem leaders tried to wipe out the memories of the Sikhs and the Mahrattas, the Hindu nationalist leaders also sought to revive them. It was no doubt a supreme psychological need of the nationalist propaganda; and so far as these memories were revived to recreate the self-confidence of a people suffering from a state of hopelessness and listless inertia, they did only good and no harm. But the effect of this revival did not stop here. It gradually awoke, at least in a section of the nationalists, the foolish and suicidal ambition of once more re-establishing either a single Hindu State or a confederacy of Hindu States in India. Some people, thus, secretly interpreted Swaraj as a Hindu Raj. And this folly is also to some extent responsible for the antagonism, in any case, of the soberer section of our Moslem fellow-countrymen towards our nationalist ideals and activities; and thus it lent, unconsciously, considerable support to the Pan-

Islamic propaganda among almost all classes of educated Mahomedans. *

এই বিশ্লেষণ যে সম্পূর্ণ সত্য তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। হিন্দু জাতীয়ত্বের প্রতিযোগিতায় মুসলমানত্ব ক্ষয় হইতে পারে এই আশঙ্কা হইতে ও স্বদেশী আন্দোলনের দৃষ্টান্তে ভারতবর্ষের মুসলমানদের মনে সর্বপ্রথমে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারেও ইসলামীয় আদর্শ অহুমসরণ করিবার আকাঙ্ক্ষা জাগে। তাহা না হইলে কেবলমাত্র ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের প্ররোচনায় মোসলেম লীগ ও কমুনাল ইলেক্টরেটের প্রবর্তন হইত কিনা সন্দেহ।

হিন্দুর জাতীয়তা ও মুসলমানের মুসলিমত্বের মধ্যে যে সংঘাত স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে প্রথমে প্রকট হয়, তাহা হইত কয়েক বৎসরের মধ্যেই পূর্ণপরিণতি লাভ করিত। কিন্তু কতকগুলি কারণে করে নাই। প্রথমত, ১৯১১-১২ সনে একদিকে রুশিয়া পারস্যের উত্তরার্ধ গ্রাস করিতে উজ্জত হইলেন ও অত্রদিকে ইটালী ত্রিপলিতে তুর্ক-সাম্রাজ্যকে আক্রমণ করিলেন। স্বাধীন মুসলমান রাজ্য দুইটির এই বিপদে ইংরেজরা উহাদের সহায়তা করিবেন, ভারতবর্ষের মুসলমানরা এই আশা করিয়াছিলেন। উহাদের আশা পূর্ণ হয় নাই। একদিকে 'ট্রিপল এলায়েন্স' হইতে ইটালীকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিবার প্রলোভনে পড়িয়া ও অত্রদিকে 'ট্রিপল আঁতা' এর ঐক্য বজায় রাখিবার গুরুতর প্রয়োজন বুঝিয়া ইংলণ্ড, ইটালী বা রুশিয়া কাহারও বিরুদ্ধাচরণে অগ্রসর হওয়া সমীচীন মনে করিলেন না। বাঙ্কান যুদ্ধেও ঠিক এই

ব্যাপারটাই ঘটিল। * ইহার অল্পদিন পরেই আসিল ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ। এই যুদ্ধে তুর্কী ও ইংলণ্ড বিরুদ্ধপক্ষে যোগ দিলেন; ইংরেজদের সাহায্যে ও মরণায় হেজাজের আমীর হসেন তাঁহার পুত্র-পরিজনসহ তুর্কীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিলেন। ক্রমশঃ তুর্কীর পরাজয়, মিত্রশক্তিবর্গ কর্তৃক কনষ্টান্টিনোপল অধিকার, সেভ্র-এর সন্ধি ও গ্রীক সেনাকর্তৃক এশিয়া মাইনর আক্রমণ সকলই ঘটিল। এই সকল

* বাঙ্কান যুদ্ধের সময়ে ইংলণ্ডের সমস্তার উদাহরণ হিসাবে সার জর্জ বুকাননের একটি পত্র হইতে অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করা যাইতেছে। সার জর্জ লেখেন, "But the position of His Majesty's Government will be a very difficult one. Their attitude will be watched with jealous apprehensions both by His Majesty's Mahomedan subjects in India and by the Russian public. The former will expect them to throw the weight of their influence into the scale in favour of their co-religionists in Turkey, while the latter will look to England, as a member of the Triple Entente, to support Russia in advocating the cause of the Balkan Slavs." (Letter dtd. Oct. 12, 1912 to Sir E. Grey.) কিন্তু ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট এ-ব্যাপারে মুসলমানদের ইচ্ছা পূর্ণ করা সম্ভব মনে করেন নাই। সার আর্থার নিকলসন লেখেন, মুসলমানরা তুর্কীর সাহায্য করিতে অভিলাষী হইলেও রাষ্ট্রনীতি ও জনমত উভয়ের জড়ই গ্রেট-ব্রিটেনের পক্ষে তাহা করা সম্ভব নয় (which neither public opinion nor our own policy would justify us in doing.)

সেই সময়ে সার আর্থার নিকলসন বড়লাট লর্ড হার্জিঙ্কেও লেখেন, "I need not say that we have always kept most carefully in view the necessity of us doing as little as possible to arouse Moslem feeling, as we know very well the effect which would be produced amongst our Mussulmans in India. I am afraid, however, that careful as we are, an attack by Christian Powers on Turkey will create a good deal of trouble in your dominions, and I dare say we shall be reproached for not having put our foot down and averted the conflict. You know just as well as I do that we are perfectly unable to take such steps."

ব্যাপারে ১৯১১ সন হইতে লোজানের সন্ধি (১৯২৩ সন) পর্য্যন্ত ভারতীয় মুসলমানদিগের মন গ্রেট-ব্রিটেনের প্রতি এত বিমূগ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহারা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ইংরেজকে বাধা দিবার জ্ঞান হিন্দুদের সহযোগিতা পর্য্যন্ত করিতে প্রস্তুত হইলেন। এই নূতন ধারার স্বরূপাত হয় ১৯১১-১২ সনে, যখন মোহাম্মদ লীগ সর্বপ্রথমে কংগ্রেসের সহিত একমত হইয়া স্বায়ত্তশাসনকে মুসলিম সম্প্রদায়েরও লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করেন। ইহার পর ঘটনাচক্রে উভয় সম্প্রদায়ের একা উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলে ও অবশেষে ১৯২০-২২ সনে কংগ্রেস ও খিলাফ কমিটির একাত্মতায় পরিণতি লাভ করে। কিন্তু তুর্কী যেমনই আবার বিজয়ী হইয়া জাতীয় স্বাধীনতা ফিরিয়া পাইলেন, তখনই হিন্দু-মুসলমানের একা ঘৃণা গেল, হিন্দুর হিন্দুত্ব ও মুসলমানের মুসলমানত্বের মধ্যে পুনরায় সংঘাত বাড়িয়া উঠিল। এই সংঘাতই নূতন রাষ্ট্রতন্ত্রের উপলক্ষ্য পাইয়া বর্ত্তমানে পূর্ণ-কলেবর হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আজ 'কমুনাল এওয়ার্ড' বা সাম্প্রদায়িক ভাগবাটোয়ারার ফলে বাংলাদেশের রাষ্ট্রতন্ত্রে হিন্দুর তুলনায় মুসলমানের প্রাধান্য বেশী হইতে চলিয়াছে। ইহাতে ১৯০৭ সনে মুসলমান সম্প্রদায় যে অবস্থায় পড়িয়াছিলেন, ১৯৩৬ সনে হিন্দুদের অবস্থা ঠিক তাহাই দাঁড়াইয়াছে। তাহারা আশঙ্কা করিতেছেন, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হাতে পাইয়াই মুসলমানরা কি শিক্ষায়, কি সাহিত্যে বাঙালী হিন্দুর গৌরবের বস্তু, প্রাচীন ভারতীয় আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত বিশিষ্ট সংস্কৃতি নষ্ট করিয়া ফেলিবেন। এই আশঙ্কা অমূলকও নয়, অছায়াও নয়। পক্ষান্তরে মুসলমানরা যদি বাংলাদেশের সরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে মুসলিম ছাঁচে ঢালিতে চান তাহাও তাহাদের পক্ষে অছায়া হইবে না। বাইশ শত বৎসর পূর্বে

এরিষ্টল বলিয়াছিলেন, 'প্রত্যেক রাষ্ট্রের পক্ষেই তাহার উপযোগী একটা শিক্ষাপদ্ধতি অবশ্য প্রয়োজনীয়।' এই নীতি অমূল্য করিয়াই জগতের সমস্ত রাষ্ট্র শিক্ষাপদ্ধতিতে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য প্রবর্ত্তন ও রক্ষা করিবার জ্ঞান প্রাপণ চেষ্টা করেন।* রুশিয়ার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দোভিয়েট নীতি ভিন্ন অল্প শিক্ষার স্থান নাই; ইটালীতে কাশিত শিক্ষা ভিন্ন অল্প শিক্ষা দেওয়া হয় না; জাৰ্মানীতে নাসিগণ তাহাদের 'আদর্শ' অমূল্য প্যাঠা পুস্তক রচনা করাইতেছেন। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হাতে আসিলে বাংলাদেশের মুসলমানরাও হয়ত তাহাই করিবেন। হিন্দুরাও যে ইহা না করিতেন তাহা নয়। বর্ত্তমান জগতে 'টোটালাটারিয়ান স্টেট' বা অথও রাষ্ট্রের আদর্শ যে-ভাবে প্রচার লাভ করিতেছে, তাহাতে এই ধারা দিনে দিনে আরও বহুমূল হইবে। হিন্দু বা মুসলমান কাহারও পক্ষে ইহার প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিবার উপায় নাই। স্বতরাং এই ক্ষেত্রে কাহার দিকে কতটুকু ছায়া, কাহার দিকে কতটুকু অছায়া সে-বিচার সম্পূর্ণ অবাস্তব। স্বীকার করা প্রয়োজন, বাংলাদেশ দ্বি-কেন্দ্র হইয়াছে; বাংলাদেশের হিন্দু ও মুসলমান ভাই হইলেও প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া নিজের নিজের ব্যক্তিত্বের সন্ধান পাইয়া আপনার পথ ধরিতে চাহিতেছে।

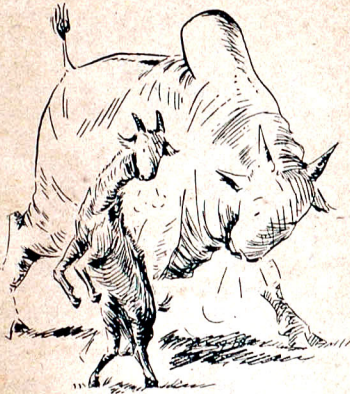
* এই প্রসঙ্গে দোভিয়েট রুশিয়ার একজন লেখকের উক্তি সকলেরই প্রদানযোগ্য।

ইনি বলিতেছেন,—

"The teacher works in a particular society and for a particular society. His activity is directed by the demands of the class or classes which at the moment rule the State. Education is the preparation of future as well as present citizens for social life. Therefore, schools, elementary as well as higher, never were and never will be free from politics as long as the State exists."

চলচ্চিত্র

বর্তমান ভারতবর্ষ



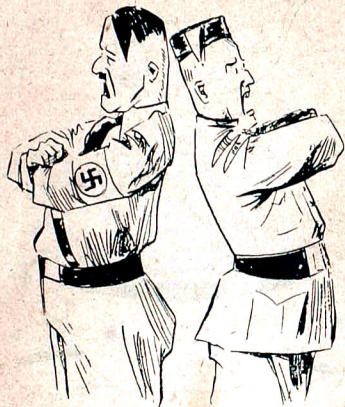
মাড়ে ও ছাগলে খেলিছে রদে,
চলে কংগ্রেস তাহার সঙ্গে,
গুঁতা আর দুধ মঞ্চল করি
চলিছে ভারত—আমরা বদে
ভদ্র সে রণে, ভজি অনন্দে।

টি-শেষ কমিটি



মাইরি, তোদের রদ এসব কি ?
শেষাশেষি ভিজিয়ে দিলি ছি !

মুঘল—Hit



পিঠোপিঠি আছি মুখোমুখি হব করে ?
—যজ্ঞকুণ্ডে আগুন জলিবে যবে।

শারদীয় সম্ভাষণ



রমণা এবং বালীগঞ্জ অনেকখানি দূর,
আসল মালে ফাকি এরা চালায় চিটেগুড় !

বিজ্ঞপ্তি

এই সংখ্যায় 'শনিবারের চিঠি'র অষ্টম বর্ষ শেষ হইল। আগামী বর্ষ হইতে 'চিঠি' পরিবর্তিত ও সংস্কৃত আকারে প্রকাশিত করিবার আয়োজন করা হইয়াছে। ইহাতে আমাদের গ্রাহক ও পাঠকবর্গ সন্তুষ্ট হইবেন বলিয়াই ভরসা রাখি। হস্ত-কৌতুক, বাঙ্গ-বিজ্ঞপ্তি, ও নির্ভীক সমালোচনা 'শনিবারের চিঠি'র বৈশিষ্ট্য। আগামী সংখ্যায় উহার এই বিশিষ্টতা আরও উপভোগ্য হইয়া দেখা দিবে।

'শনিবারের চিঠি' বরাবরই পাঠকবর্গের অতুলন সচ্ছন্দতা ও উৎসাহ পাইয়া আসিয়াছে। গত তিন মাসের 'চিঠি'র একটি খণ্ডও প্রকাশ হইবার অজ্ঞানের মধ্যেই অবশিষ্ট থাকে নাই। ইহাতে সাধারণ নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা যদি পূর্ণ হইতেই এক্কেটগিকে বলিয়া রাখেন তাহা হইল 'শনিবারের চিঠি' পাইতে অশ্রুবিধা হইবে না। কার্তিক সংখ্যা যদিও অনেক বেশী ছাপা হইতেছে, তবুও প্রকাশের দুই চারি দিনের মধ্যেই ফুরাইয়া যাইবার সম্ভাবনা।

গ্রন্থ, গল্প, নয়া, বাঙ্গাজি, সমালোচনা, কবিতা, নাটক ও দুঃখাপ্য পুস্তক প্রকাশ 'শনিবারের চিঠি' নিঃসৃত ভাবে করিয়া আসিয়াছে। নাটকপ্রকাশে 'শনিবারের চিঠি' যে নির্পীচনবদ্ধতা ও উজ্জম প্রদর্শন করিয়াছে তাহা বাংলাদেশের অজ কোন সাময়িকপত্র করেন নাই। 'শনিবারের চিঠি'র এই বিশিষ্টতা বজায় রাখিবার জন্ত আগামী সংখ্যা হইতে শ্রীঅনুমান বিশীর নূতন নাটক 'সুতং পিবেৎ' প্রকাশিত হইবে।

এই সংখ্যায় বর্ষশেষ হইল বলিয়া 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়চন্দ্র চরিত্র' একবারে শেষ করিতে হইয়াছে। সেজন্ত দুঃখাপ্য গ্রন্থমালার অজ নির্দিষ্ট পূঁঠাসংখ্যাও বাড়িয়াই হইয়াছে।

পরিবর্তিত ও পরিবর্তিত আকারে

কার্তিক সংখ্যা

আশ্বিনের শেষের দিকে প্রকাশিত হইবে

ভূমিকা

রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত

পরিচয়

১৮০৫ সনে, অর্থাৎ এক শত একত্রিশ বৎসর পূর্বে, 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়চন্দ্র চরিত্র' প্রকাশিত হয়। ইহার লেখক রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত হইয়াছে রাজীবলোচনের কৃষ্ণনগর রাজবাটীর সহিত সম্পর্ক ছিল ("descended from the family of the Rajah")। ইহার বেশী তাঁহার সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু জানা যায় না। রাজীবলোচন কলেজ-অফ-ফোর্ট উইলিয়ামের বাংলা-বিভাগের এক জন পণ্ডিত ছিলেন। লর্ড ওয়েলেসলীর চেম্বার ১৮০০ সনের শেষার্শ্বে কলিকাতায় এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। বিলাত হইতে নবাগত সিবিলিয়ানদিগকে কক্ষক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পূর্বে এখানে কিছু দিন দেশীয় ভাষা শিখিতে হইত। ১৮০১ সনের ৪ঠা মে তারিখে কলেজের বিভিন্ন বিভাগের পণ্ডিত, মৌলভী প্রভৃতির নিয়োগ সম্ভব হয়। বাংলা-বিভাগের কর্ত্তা হন শ্রীরামপুরের পাদরি উইলিয়ম কেরী। তাঁহার অধীনে মুদ্রাঙ্কন বিভাগস্থার ও রামনাথ বিভাগ্যচম্পতি যথাক্রমে মাসিক দুই শত ও এক শত টাকা বেতনে প্রধান ও দ্বিতীয় পণ্ডিতের কর্ম করিতেন। ইহা ছাড়া মাসিক ৪০ টাকা বেতনের ছয় জন সহকারী পণ্ডিতও ছিলেন; রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় ইহাদের মধ্যে এক জন।

কেরী শ্রীরামপুর মিশনের পুস্তকাদি রচনা-ব্যাপারে সহায়তা করিবার জ্ঞান নবদীপ ও অধ্যক্ষ স্থান হইতে কয়েক জন ব্যাতনামা পণ্ডিত সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অনেকে কেরীর সুপারিশে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

কলেজে কাজ লইয়া কেরী পাঠ্যপুস্তকের অভাবে বিশেষ অস্থবিধা পড়িলেন। কলেজ-কর্তৃপক্ষও এই অস্থবিধা সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন না; তাঁহারা দেশীয় পণ্ডিতদিগকে পুস্তক-রচনায় উৎসাহিত করিবার জ্ঞান নগদ পুরস্কারের ব্যবস্থা করিলেন।* ইহা ছাড়া এই সকল রচনা মুদ্রণের সাহায্যার্থ কলেজ-কাউন্সিল পুস্তকের অনেকগুলি খণ্ড কলেজের জম্ম ক্রয় করিতেন। এই ব্যবস্থায় এবং কেরীর নিকট হইতে উৎসাহ পাইয়া কলেজের পণ্ডিতবর্গ পাঠ্যপুস্তক-রচনায় মনোযোগী হইয়াছিলেন। রামরাম বসু 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১) ও 'লিপি মালা' (১৮০২) রচনা করিয়া, এবং মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার 'বজ্রিং সিংহাসন' (১৮০২) রচনা করিয়া কলেজ-কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে যথাযোগ্য পুরস্কৃত হইয়াছিলেন। 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়চন্দ্র চরিত্র' রচনা করিয়া রাজীবলোচন পাণ্ডুলিপি কেরীর হস্তে সমর্পণ করেন। তাঁহার রচনাপাঠে সম্বৃষ্ট হইয়া কেরী ১৮০৪ সনের অক্টোবর মাসে কলেজ-কর্তৃপক্ষকে এই পত্র লেখেন:—

To the Council of the College of Fort William,
Gentlemen,

In consequence of the encouragement given to literary merit by this institution Rajeeb Lochun, a Pundit in

* At a Council held on the 7th July 1801. RESOLVED that Premiums shall be proposed to the learned Natives for encouraging literary works in the Native languages. (Home Dept. Miscellaneous No. 559, p. 6.)

the Bengalee Department has lately composed an history of Raja Krishnu Chunder Roy (late of Krishnunagur) in the Bengalee Language.

Chundee Churn, another Pundit in the same Department, has, with the help of some learned Brahmuns, translated the Bhagvut Geeta into Bengalee.

I have examined these works and think them to be worthy the patronage of the College, and recommend the writers as deserving some reward for their labours.

Accompanying this I send the manuscripts of these two works which I recommend to be printed for the use of the Bengalee Class.

COLLEGE
5th October 1804.

I am, Gentlemen,
Your most obedient humble servant,
W. CAREY.

কেরীর সুপারিশে কলেজ-কর্তৃপক্ষ রাজীবলোচনকে এক শত টাকা পুরস্কার দিতে এবং পুস্তকখানি মুদ্রিত হইলে ১০০ খণ্ড ক্রয় করিতে স্বীকৃত হন।*

'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়চন্দ্র চরিত্র' ১৮০৫ সনে শ্রীরামপুরে মুদ্রিত হয়; অনেকে ভুল করিয়া ইহার প্রথম সংস্করণ প্রকাশের তারিখ "১৮০১" সন বলিয়াছেন। নানা সময়ে ইহার আরও কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল।

* At a Council held on 12 November 1804. RESOLVED that 100 copies of the History of Rajah Krishnu Chunder Roy in the Bengalee Language,.....be subscribed for by the College.

RESOLVED that a premium of Sicca Rupees 100 be awarded to Rajeeb Lochun Pundit for his History of Rajah Krishnu Chunder Roy in the Bengalee Language.

রাজীবলোচন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহিত বেশী দিন যুক্ত ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। ১৮১৮ সালে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের পণ্ডিতগণের যে তালিকা পাওয়া যায় তাহাতে রাজীবলোচনের নাম নাই। (Roebuck's Annals of the College of Fort William, Appendix, pp. 49-50 দ্রষ্টব্য।) কিন্তু কেন্দ্রীয় একখানি জীবনচরিতে লিখিত হইয়াছে—“Rajib Lochan served throughout Carey's twenty-nine years...”. এই পুস্তকে তথ্যটি অনেক ভুল আমাদের চোখে পড়িয়াছে। যদি উপরের উক্তিটি ভুল না হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে রাজীবলোচন ১৮৩০ সাল পর্যন্তই কোনও না কোন ভাবে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহিত যুক্ত ছিলেন।*

কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরিতে এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণের এক খণ্ড আছে। ভবানীপুরের শ্রীযুক্ত হুশীলকুমার মজুমদার মহাশয়ের নিকটও এই সংস্করণের এক খণ্ড এবং ১৮১১ সনে লণ্ডনে ছাপা সংস্করণ এক খণ্ড আছে। বন্দীয়-সাহিত্য-পরিষদ গ্রন্থাগারে শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত ১৮৩৪ ও ১৮৫৭ সনের সংস্করণ আছে; তাহা ছাড়া লং সাহেবের আদেশানুসারে গোপীনাথ চক্রবর্তী এণ্ড কোম্পানির উদ্যোগে ১৭৮০ শকে প্রকাশিত সংস্করণেরও এক খণ্ড আছে। শেহজাদ সংস্করণে গ্রন্থের অনেক স্থানে ভাষার বিস্তার বিপর্যয় ইত্যাদি যে-সকল দোষ ছিল, তাহা গিরিশচন্দ্র বিজয়ারত্ন সংশোধন করিয়া দেন।

ভাস্কর, ১৩৪৩।

শ্রীযুক্তেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্মৃ চরিত্রং।—

শ্রীযুক্ত রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের
রচিতং।—

কৃষ্ণচন্দ্রমহারাজ ধরণীর মাজ
যাহার অধিকারে নবদ্বীপ সমাজ।
পূর্বে বুভাঙ্গ যত করিয়া প্রচার
কৃষ্ণচন্দ্র চরিত্র পরে করিব বিস্তার।

শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।—

১৮০৫।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়শু চরিত্রং ।

বহুভূমিতে হাবিলি পরগণায় কাঁকদি গ্রামে কাশীনাথ রায় মহাশয়ের বসতি ছিল পরগণা ও তাঁহার জমিদারি কিছু কাল পরে রাজকরের কারণ ঢাকার স্বায় সহিত বিবাদ উপস্থিত হইল সেই বিবাদে পরাভব হইয়া বনিতাকে সঙ্গে করিয়া দেশ ত্যাগ করিলেন বহুকাল ভ্রমণ করিতে২ বাগুয়ান পরগণায় বিশ্বনাথ সমাধারের বাটিতে উপস্থিত হইলেন সমাধার যথেষ্ট সমাদর করিয়া নিজালয়েতে অপূর্ণ স্থান নিরূপণ করিয়া দিয়া রায়কে এবং রায়ের গৃহিণীকে যতপূর্বক পালন করিতে লাগিলেন । কিঞ্চিৎ কালান্তরে রায়ের বনিতা গতিগী হইয়া রায়কে কহিলেন যে নাথ বৃদ্ধি আমার গর্ভ হইল ইহা শুনিয়া রায় অত্যন্ত কাতর হইয়া কহিলেন রাজ্যচ্যুত [৪] হইয়া পরের বাটিতে থাকিয়া রাণী কি প্রকারে প্রসব হইবা এবং অনেক বিলাপ করিলেন অনেক বিবেচনাসত্ত্বে প্রভাতে সমাধারকে সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাত করিয়া কহিলেন যে তাত আমরা তোমার সম্ভান সম্ভতি আপনি ইহাই বিবেচনা করিয়া যে উচিত হয় তাহাই করিবেন সমাধার অনেক আশ্বাস করিয়া কহাভাবে রাণীকে পালন করিতে লাগিলেন রায় দেখেন সমাধার আশ্বকন্টার ছায় রাণীকে পালন করিতে প্রবর্ত্ত তখন চিন্তা করিতেছেন রাজ্য গেল পরের বাটিতে কত কাল বাস এক্রূপে করিব ইহাই অন্তঃকরণে উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত কাতর হইয়া বিবেচনা করিয়া দেখেন ইহার উপায় হস্তিনাপুরে না গেলে আমার উপায়ান্তর হইবেক না ইহাই দাখ্য করিয়া

সমাধারকে না কহিয়া এবং আশ্ববনিতাকে না বলিয়া হস্তিনাপুরে প্রস্থান করিলেন ।—

সমাধার রায়কে না দেখিয়া অত্যন্ত উদ্ভিগ্ন [৫] এবং রায়ের গৃহিণী রায়ের অধেষণ না পাইয়া বিপদ সাগরে মগ্না ক্ষিভমানা রোদনপরা শোকাকুলা । সমাধার অতিশয় কাতরা দেখিয়া রাণীকে কহিতেছেন তুমি আমার কন্ডা যদিপি রায় এক্রূপ করিলেন আমি তোমাকে প্রতিপালন করিব তুমি কদাচ চিন্তা করিবা না । তখন রাণী সমাধারের কথা শ্রবণ করিয়া স্থিরা হইয়া কহিলেন পিতা তোমা বাতিলেকে আমার আর অর্থ জন নাই সমাধার কহিলেন কন্ডা কদাচ ভাবনা করিবা না তখন রায়ের বনিতা স্থিরা হইলেন সমাধার সর্বদা রাণীকে অধিক স্নেহেতে পালন করেন সময়ক্রমে রায়ের বনিতা প্রসব হইলেন অপূর্ণ বালক দর্শন করিয়া পরমহুগ্ন হইয়া কহিলেন পিতাকে ডাক সমাধার উপস্থিত হইলেই কহিলেন পিতা দৌহিত্র দর্শন কর । সমাধার দর্শন করিয়া দেপেন লক্ষণাক্রান্ত দৌহিত্রভাবে সমাধার পালন করিতে লাগিলেন সময়ক্রমে অন্নপ্রাশন দিয়া নাম রাখিলেন শ্রীরাম সকল লোক [৬] জানিলেক সমাধারের পরিবার এই হেতু নাম হইল রাম সমাধার ।—

এই রূপে কতক কাল যায় রায় হস্তিনাপুর গমন করিলেন কিন্তু পুনরায় আগমন হইল না । সমাধার বিবেচনা করিলেন বালকের যজ্ঞোপবীতের সময় উপস্থিত হইল অতএব প্রধান২ পণ্ডিতের স্থানে জিজ্ঞাসা করি তাঁহারা যেমত কহেন সেইমত কাধ্য করিব । এই সকল বিবেচনা করিতে২ রায়ের দ্বাদশ বৎসর গত হইল পরে পণ্ডিতের বাবস্থা মতে রায়ের আশ্রয় করাইয়া শ্রীরামের যজ্ঞোপবীত দিয়া বিবাহ দিলেন ।—

কিছু কালান্তরে শ্রীরাম সমাধারের জন্মা গতিগী হইলেন সময়ক্রমে

রাম সমাধারের বনিতা প্রসব হইলেন অপূর্ণ বালক সর্ক লক্ষণাক্রান্ত অতিশয় রূপবান চন্দ্রের ছায় রাম সমাধার পুত্রকে দেখিয়া বিবেচনা করিতেছেন বুঝি এই পুত্র হইতে আমাদের সুল উজ্জল হইবেক আনন্দার্ণবে মগ্ন হইলেন। পুত্র দিনে চন্দ্রকলার ছায় প্রকাশ [৭] পাইতেছেন অন্নপ্রাশনাদি দিয়া নাম রাখিলেন ভবানন্দ।—

ক্রমে রাম সমাধারের তিন পুত্র হইল জ্যেষ্ঠ ভবানন্দ মধ্যম হরিবল্লভ কনিষ্ঠ সুবুদ্ধি। ভবানন্দ মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ছায় অতিশয় তেজস্পূর্ণ। কক্ষিকাল গোণে ভবানন্দ বিজ্ঞা অভ্যাস করিতে প্রবর্ত্ত প্রতিধর বাহা শুনে তৎক্ষণে তাহাই অভ্যাস হয় প্রথম শাস্ত্রপাঠ পশ্চাৎ বাঙ্গালা লিখনপঠন এবং পারসি ও আরবি ইত্যাদিতে বিশারদ হইলেন অল্পবিজ্ঞাতে অতিবড় ক্ষমতাপন্ন হয়রোহণে নলরাজার ছায় সর্ক বিজ্ঞায় ব্রহ্মপতির তুল্য। রাম সমাধার দেখিলেন পুত্র সর্কবিদ্যায় অতিশয় গুণবান হইল মনে বিবেচনা করিতেছেন এখন পুত্র রাজধানিতে গমন করে তবে উত্তম হয় কিন্তু পুত্রের বিবাহ অতি সুরায় দিতে ইচ্ছাছে ইহাই স্থির করিয়া ভবানন্দের বিবাহ দিলেন ক্রমে তিন পুত্রের বিবাহ হইল।—

[৮] ভবানন্দ অন্তঃকরণে নানাপ্রকার বিবেচনা করিলেন আমার বাটাতে থাকা পরামর্শ নহে আমি রাজধানিতে গমন করিব ইহাই স্থির করিয়া পিতাকে কহিলেন পিতা আমি বাটাতে থাকিব না রাজধানিতে গমন করিব। রাম সমাধার কহিলেন উপযুক্ত পরামর্শ করিয়াছ ভাল দিবস স্থির করিয়া যাত্রা কর। পিতার অমুমতি পাইয়া ভবানন্দ কক্ষিং অর্থ লইয়া দিয়া যানে রাজধানিতে গমন করিলেন তর্খন রাজধানি ঢাকায়। ভবানন্দ ঢাকায় উপস্থিত হইয়া উত্তম এক স্থানে রহিলেন এবং সর্কজ্ঞে গমনাগমন করিতে প্রবর্ত্ত বঙ্গাধিকারির নিকটে

যাতায়াত করিতে বঙ্গাধিকারীর নিকটে প্রতিপন্ন হইলেন। বঙ্গাধিকারী মহাশয় দেখেন ভবানন্দ অতিবড় গুণবান। অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া আশুকার্য্যের মধ্যে প্রধান কার্য্যে ভবানন্দকে নিযুক্ত করিলেন খ্যাতি রাখিলেন রায়মজুমদার। সেই অবধি খ্যাতি হইল ভবানন্দ রায় মজুমদার।—

[৯] রায় মজুমদারের উন্নতি যথেষ্ট হইল কিছু কালান্তরে যশহর নগরে প্রতাপাদিত্য নামে রাজা অতিশয় প্রতাপাশিত হইয়া রাজস্ব নিবারণ করিলেন। এই সকল বৃত্তান্ত প্রতাপাদিত্য চরিত্রে বিস্তার আছে।—

রাজা প্রতাপাদিত্যকে ধরিতে ঢাকার বাদসা রাজা মানসিংহকে আজ্ঞা করিলেন তুমি যাইয়া রাজা প্রতাপাদিত্যকে ধরিয়া আন তাহাতে রাজা মানসিংহ যে আজ্ঞা বলিয়া স্বীকার করিলেন পশ্চাৎ রাজা মানসিংহ অন্তঃকরণে বিবেচনা করিলেন রাজা প্রতাপাদিত্য বড় দুর্ব্বল আমাকে আনিতে সুবা আজ্ঞা করিলেন কিন্তু সেই দেশীয় এক জন উপযুক্ত মহাশয় পাইলে ভাল হয় ইহার পূর্ক ভবানন্দ রায় মজুমদার রাজা মানসিংহের নিকট যাতায়াত করিতেছেন তাহাতেই রাজা মানসিংহ ভবানন্দ রায় মজুমদারকে জ্ঞাত ছিলেন স্বরণ হইল যে ভবানন্দ রায় মজুমদার [১০] সর্কশাস্ত্রে পণ্ডিত এবং গোড় নিবাসী অতএব বঙ্গাধিকারীকে কহিয়া রায় মজুমদারকে লইব ইহাই স্থির করিয়া বঙ্গাধিকারীকে রাজা কহিলেন তোমার চাকর ভবানন্দ রায় মজুমদারকে আমাকে দেহ আমি সঙ্গে লইয়া যাইব। বঙ্গাধিকারী কহিলেন যে আজ্ঞা কিন্তু বঙ্গাধিকারির যথেষ্ট খেদ হইল যে এমন চাকর আর কখন পাইব না কি করেন। রায় মজুমদারকে আহ্বান করিয়া কহিলেন তোমাকে রাজা মানসিংহের সঙ্গে যাইতে হইল। রায় মজুমদার নিবেদন করিলেন কোন

দেশে যাইতে হইবেক তাহাতে বঙ্গাধিকারী কহিলেন গোড়ে যশহর নগরে রাজা প্রতাপাদিত্য রাজকর বারণ করিয়াছে তাহাকে ধরিতে রাজা মানসিংহ যাইতেছেন তুমিও তাহার সহিত গমন কর। যে আজ্ঞা বলিয়া রায় মজুমদার স্বীকার করিলেন। পরে রাজা মানসিংহ ডুবানন্দ রায় মজুমদার ও নবলক্ষ সৈন্য সঙ্গে করিয়া প্রতাপাদিত্য নিধন করিতে গোড়ে প্রস্থান করিয়া দুই মাসে বালুচর [১১] গ্রামে উপনীত হইলেন রায় মজুমদারকে কহিলেন রায় মজুমদার এ স্থানের কি নাম তাহাতে রায় মজুমদার নিবেদন করিলেন মহারাজ এ স্থানের নাম বালুচর গঙ্গার রেড়ীতে গ্রাম পত্তন হইয়াছে। রাজা মানসিংহ কহিলেন অপূর্ণ স্থান এই স্থানে রাজধানি হইলে উত্তম হয়। এই কথোপকথনের পর আজ্ঞা করিলেন আমি কিংকিংকাল এখানে বিশ্রাম করিব। রায় মজুমদার সকল মন্থাকে কহিলেন তোমরা এই স্থানে বিশ্রাম করহ। কতক কালান্তরে রাজা মানসিংহ রায় মজুমদারকে আজ্ঞা করিলেন সকল সৈন্যকে সংবাদ করহ কল্যাণ এ স্থান হইতে প্রস্থান করিব। আজ্ঞামুসারে যাবদীয় সৈন্যকে ভেরীর নামে জানাইলেন যে কল্যাণ এ স্থান হইতে প্রস্থান করিব পর দিবস সৈন্যের সহিত রাজা মানসিংহ গমন করিলেন।—

এক দিবসের পর বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইয়া রাজা মানসিংহ রায় মজুমদারকে জিজ্ঞাস [১২] করিলেন এ কোন স্থান? রায় মজুমদার নিবেদন করিলেন মহারাজ এ স্থানের নাম বর্দ্ধমান এ স্থানের অধিপতি রাজা ধীরসিংহ ছিলেন এক্ষণে তাহার পুত্র রাজা ধীরসিংহ রাজত্ব করিতেছেন। রাজা ধীরসিংহ শ্রবণ করিলেন যে রাজা মানসিংহ রাজা প্রতাপাদিত্যকে নিপাত করিতে নবলক্ষ দলে আসিয়াছেন। রাজা ধীরসিংহ নিজ পরিবারের উপর আজ্ঞা করিলেন তোমরা সকলে

সসজ্জ হও আমি রাজা মানসিংহের সহিত সাফাং করিতে যাইব এবং নানা প্রকার সামগ্রী ভেট দিতে হইবেক তাহার আয়োজন করহ। রাজা ধীরসিংহ নিজ ভৃত্যেরদিগের প্রতি আজ্ঞা করণে নানাবিধ সামগ্রীর আয়োজন হইয়া প্রস্তুত হইল। পরে রাজা ধীরসিংহ দিব্য বানে আরোহণ করিয়া ভেটের দ্রব্য সকল সঙ্গে করিয়া রাজা মানসিংহের নিকট সাফাং করিতে গমন করিলেন অগ্রে এক জন প্রধান চাকর রায় মজুমদারের নিকট যাইয়া নিবেদন করিলেক যে [১৩] বর্দ্ধমানের রাজা ধীরসিংহ মানসিংহের সহিত সাফাং করিতে আসিতেছেন মহারাজার নিকটে আপনি যাইয়া নিবেদন করুন। পরে রায় মজুমদার রাজা মানসিংহকে নিবেদন করিলেন মহারাজ বর্দ্ধমানের রাজা ধীরসিংহ সাফাং করিতে আসিতেছেন। রাজা মানসিংহ কহিলেন আসিতে কহ। পরে রাজা ধীরসিংহ নানা দ্রব্য ভেট দিয়া প্রণাম করিয়া পাড়াইলেন ভেটের দ্রব্য দিদি দুই ফীর আশ্র কাঠাল নারিকেল গুঁড়াক শ্রীফল আতা ও আরং নানা জাতীয় ফল এবং অপরূপ বস্ত্র পটবস্ত্র ও উত্তম হুতার বস্ত্র ও বনাত মথমল এবং চুনি চন্দ্রকান্তমণি হৃদ্যকান্তমণি নীলকান্তমণি অম্বকান্তমণি এবং সহস্র সুবর্ণ দিলেন। ভেটের দ্রব্য দর্শন করিয়া আর রাজার শিষ্টতা দেখিয়া রাজা মানসিংহ অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া রাজা ধীরসিংহকে বসিতে আজ্ঞা করিলেন। রাজা ধীরসিংহ নানা প্রকার শিষ্টাচার করিয়া কহিলেন মহারাজ আমার নগরের [১৪] ভাগ্যক্রমে এবং আমার অদৃষ্টে প্রসন্নপ্রযুক্ত মহারাজার আগমন হইয়াছে। রাজা মানসিংহ অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া রাজা ধীরসিংহকে হস্তি ঘোটক এবং দ্রব্য রাজবস্ত্র মুক্তার মালা নানাবিধ অভরণ প্রসাদ করিলেন আর কহিলেন আমি তোমার নগর ভ্রমণ করিয়া দেখিব। রাজা ধীরসিংহ নিবেদন করিলেন যে

আজ্ঞা। এই সকল কথার পর ধীরসিংহ প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন। পর দিবস রাজা মানসিংহ রাজা ধীরসিংহের নগর ভ্রমণ করিতে গমন করিলেন। ভবানন্দ রায় মজুমদারকে সঙ্গে করিয়া রাজা মানসিংহ নগর ভ্রমণ করিতে২ দেখেন এক হুড়ঙ্গ রায় মজুমদারকে জিজ্ঞাসা করিলেন এ কিসের হুড়ঙ্গ। তাহাতে রায় মজুমদার নিবেদন করিলেন রাজা ধীরসিংহের এক কন্যা বিজ্ঞা নামে ছিল সে কন্যা সর্দশাস্ত্রে পণ্ডিতা ইহাতেই কন্যা প্রতিজ্ঞা করিলেক যে আমাকে শাস্ত্রের বিচারে পরাভব করিবেক তাহাকে আমি বর[১৫]মালা দিব এই সংবাদ দেশদেশান্তর প্রচার হওনে অনেক২ রাজপুত্র আসিলেন সকলকে পরাভব করিলেক পরে দক্ষিণ দেশে কাকিপুরের গুণসিদ্ধ মহারাজার তনয় স্তম্বর নামে অতিশয় রূপবান এবং সর্দশাস্ত্রে মহামহোপাধ্যায় এই সকল সংবাদ পাইয়া পিতা মাতাকে না কহিয়া বর্ধমানে হারা নামে এক মালিনীর বাটিতে বাসা করিয়া রহিলেন সেই স্তম্বর হুড়ঙ্গ কাটিয়া বিজ্ঞার নিকট যাইয়া শাস্ত্র বিচারে জয়ী হইয়া বিজ্ঞাকে গর্ভদ্বার বিবাহ করিলেন। ইহার বিজ্ঞার চোর পঞ্চাশতে আছে। রাজা মানসিংহ আজ্ঞা করিলেন যে গ্রন্থ আনিয়া আমাকে শুনাও। রায় মজুমদার চোর পঞ্চাশত শ্লোক আনাইয়া যাবদীয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করাইলেন।—

পশ্চাৎ রাজা মানসিংহ বর্ধমান হইতে গমন করিয়া বিবেচনা করিলেন যে ভবানন্দ রায় মজুমদারের বাটী দেখিয়া যাইব। রায় মজুমদারকে কহিলেন আমি তোমার বাটী হইয়া যাইব। রায় [১৬] মজুমদার যে আজ্ঞা বলিয়া পরম দৃষ্ট হইলেন রাজা মানসিংহ বাণ্ডয়ান পরগণায় উপস্থিত হইয়া ভবানন্দ রায়ের বাটীতে উপনীত হইলেন। রায় মজুমদার নানা জাতীয় ভেটের সামগ্রী রাজার গোচরে আনিলেন রায় মজুমদারের আত্মলাদ এবং সামগ্রীর আয়োজন দেখিয়া রাজা মানসিংহ

অত্যন্ত তুষ্ট হইলেন ইতিমধ্যে ঝড় বৃষ্টি অতিশয় উপস্থিত রাজা মানসিংহের সঙ্গে নবলক সৈন্য খাণ্ড সামগ্রীর কারণ মহাব্যস্ত রায় মজুমদার যাবদীয় সৈন্যের আহার পরগণা হইতে এবং নিজালয় হইতে দিলেন এই প্রকার সম্ভ্রাহ হস্তি ঘোটক পদাতিক প্রভৃতি সকলেই কোন ব্যামোহ পাইলেক না। ইহাতে রাজা মানসিংহ ভবানন্দ রায়কে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া রায় মজুমদারকে কহিলেন যদি ঈশ্বর আমাকে জয়ী করিয়া আনেন তবে তোমার উপকারের প্রত্নপকার করিব। পশ্চাৎ যশহরে গমন করিয়া রাজা প্রতাপাদিত্যকে শাসিত [১৭] করিয়া কিছু কাল গোণে ঢাকায় প্রস্থান করিলেন।

ভবানন্দ রায় মজুমদার রাজা মানসিংহের সহিত ঢাকায় গমন করিলেন এক দিবস রাজা মানসিংহ রায় মজুমদারকে কহিলেন তুমি আমার সাহায্য অনেক২ করিয়াছ অতএব তোমার কোন বাসনা থাকে আমাকে কহ আমি তাহা পূর্ণ করিব ইহা শুনিয়া রায় মজুমদার নিবেদন করিলেন যদি আমার প্রতি অহুগ্রহ করেন তবে বাণ্ডয়ান পরগণা আমার জমিদারী আজ্ঞা হয়। রাজা মানসিংহ স্বীকার করিয়া কহিলেন ঢাকায় উপস্থিত হইয়া অগ্রে তোমার বাসনা পূর্ণ করিব ভবানন্দ রায় মজুমদারের অন্তঃকরণে যথেষ্ট আত্মলাদ হইয়া বিবেচনা করিতেছেন বৃষ্টি ফুলসম্মার রূপা হয়।

রাজা মানসিংহ জয়ী হইয়া আসিতেছেন এই সংবাদ বাদসা পাইয়া অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া রাজা মানসিংহকে রাজপ্রসাদ দিবেন তাহার [১৮] আয়োজন করিতে আজ্ঞা করিলেন প্রধান মন্ত্রীরা সামগ্রী সমাধান করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন।—

ভবানন্দ রায় মজুমদারের বাটীতে আশ্চর্য্য এক প্রকরণ হই তাহার বৃত্তান্ত এই বড়গাছি নামে এক গ্রাম তাহাতে হরি হোড়ের

বসতি হরি হোড় অতি বড় ধনবান এবং পূণ্যশীল অত্যন্ত ধার্মিক লক্ষ্মী সর্কদা স্থিরা হইয়া হরি হোড়ের নিবাসে বসতি করেন বহুকাল এই রূপে গত হইল হরি হোড়ের পরিবার অতি বিস্তারিত সর্কদা বিবাদ করিতে প্রবর্ত্ত বাটীর মধ্যে হাটের কোলাহলের দ্বারা লক্ষ্মী বিবেচনা করিলেন এ বাটীতে আর তিষ্ঠান গেল না অতএব আমার পরম ভক্ত ভবানন্দ মজুমদার তাহার বাটীতে গমন করি ইহাই স্থির করিয়া হরি হোড়ের বাটী হইতে ভবানন্দ মজুমদারের বাটীতে চলিলেন। পথের মধ্যে স্মরণ হইল নদীর নিকট ঈশ্বরী পাটনী আছে সে আমার অনেক [১৯] তপস্যা করিয়াছে তাহাকে সাফা দিয়া বর প্রদান করিয়া পশ্চাৎ মজুমদারের বাটীতে যাইব এই চিন্তা করিয়া পরম হৃদয়ী এক কন্যা হইলেন কৃষ্ণদেবে একটি ঝাঁপী লইয়া নদীর নিকটে যাইয়া কহিলেন ঈশ্বরী পাটনী আমাকে পার করিয়া দেহ ঈশ্বরী পাটনী কহিলেক মা তুমি কে অগ্রে আমাকে কহ পশ্চাৎ পার করিব ইহা শুনিয়া হাস্য করিয়া কহিলেন ঈশ্বরী আমি ভবানন্দ মজুমদারের কন্যা খণ্ডলায়ে গিয়াছিলাম সেখানে বিবাদের জ্বালাতে তিষ্ঠিতে পারিলাম না এখন পিজ্রায়ে যাইতেছি ইহা শুনিয়া ঈশ্বরী পাটনী কহিলেক মা তুমি মজুমদার মহাশয়ের কন্যা নহ তাহার কন্যা হইলে এ বেশে একাকিনী কেন যাইবা কিন্তু আমার অন্তঃকরণে উদয় হইতেছে তুমি লক্ষ্মী মজুমদারকে কৃতার্থ করিতে গমন করিয়াছ আমি অতি দুঃখিনী আমার্কে আশ্রয় পরিচয় দিউন তাহাতে লক্ষ্মী হাস্য করিলেন ঈশ্বরী পাটনী পরম আক্সাদে নৌকা শীঘ্র আনিয়া [২০] কহিলেক মা নৌকায় বৈশ লক্ষ্মী নৌকায় বসিয়া দুইখানি পদ জলে রাখিলেন ঈশ্বরী পাটনী কহিলেক মা গো জলে নানা হিংস্রক জন্ত আছে কি জানি পাছে পদে দংশন করে পু দুইখানি তুলিয়া বৈশ তাহাতে লক্ষ্মী কহিলেন পদ কোথায়

রাখিব ঈশ্বরী পাটনী কহিলেক পা দুইখানি জলসেচনীর উপরে রাখ বিখমাতা ইহা শুনিয়া জলসেচনিতে পদ রাখিলেন। জলসেচনিতে পদ স্পর্শ হইতেই সেচনি স্বর্ণ হইল ঈশ্বরী পাটনী দেখে সেচনি নোনা হইল তখন অন্তঃকরণে বিবেচনা করিলেক ইনি সামান্য নন জগৎজননী ছল করিয়া আমার নিকট আসিয়াছেন ঈশ্বরী পাটনী লক্ষ্মীর পদে নত হইয়া প্রণাম করিয়া বহুবিধ শুব করিলেক তখন লক্ষ্মী হাস্য করিয়া কহিলেন ঈশ্বরী পাটনী তুমি আমার অনেক তপস্যা করিয়াছ আমি বড় বাধা আছি বর যাচ্চা কর। ঈশ্বরী পাটনী কহিলেক মা গো তোমার কৃপায় আমার সকল পূর্ণ হইল যদি বর দিবেন তবে [২১] এই বর দিউন যে আমার সন্তান যাবৎ থাকিবেক কেহ দুঃখ না পায় এবং দুঃখ ভাত খাউক তথাস্থ বলিয়া লক্ষ্মী অন্তর্দ্বন্দ্ব হইলেন।—

পশ্চাৎ ঈশ্বরী পাটনী আনন্দ সাগরে মগ্না হইয়া ভবানন্দ মজুমদারের বাটীতে যাইয়া মজুমদারের গৃহিণীকে সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাত করিলেক মজুমদারের বনিতা আনন্দপূর্ণে মগ্না হইয়া ঈশ্বরী পাটনীকে দিব্য বস্ত্র অভরণে সজ্জিত করিয়া পশ্চাৎ পুরবাসিনীরা সকলে আসিয়া জয়ন্ত ধ্বনি করিতে প্রবর্ত্ত আহ্লাদের সীমা নাই রজনী যোগে ভবানন্দ মজুমদারের স্ত্রী স্বপ্নে দেখেন অপূর্ণ এক কন্যা কহিতেছেন আমি তোমার বাটীতে আসিয়াছি এবং আমার একটি ঝাঁপী তোমার ঘরে রাখিয়াছি তুমি সর্কদা আমার পূজা করিবা এবং ঝাঁপীটি খুলিবা না রায় মজুমদারের স্ত্রী প্রাতে গাজোখান করিয়া দেখেন ঘরের মধ্যস্থলে ঝাঁপী স্নান করিয়া ঝাঁপী মন্তকে লইয়া অপূর্ণ এক স্থানে রাখিয়া [২২] নানাবিধ অয়োজন করিয়া লক্ষ্মীর পূজা করিলেন অদ্যাপি সেই ঝাঁপী আছে।—

ভবানন্দ রায় মজুমদার রাজা মানসিংহের সহিত ঢাকায় উপস্থিত হইলেন পরে এক দিবস রাজা মানসিংহের সহিত জাহাঙ্গিরসা বাদসাহের

নিকট গমন করিলেন বাদসাহের নিকট গমন এবং আগমন পর্য্যন্ত বিস্তারিত সংবাদ রাজা মানসিংহ নিবেদন করিলেন কিন্তু ভবানন্দ মজুমদারের বিস্তরত প্রশংসা বাদসাহের নিকট করণে বাদসা আজ্ঞা করিলেন তাহাকে আমার নিকটে আন রাজা মানসিংহ অত্যন্ত হুটে হইয়া আত্মন করিলেন রায় মজুমদার বিস্তরত নমস্কার করিয়া করপুটে সম্মুখে পাড়াইলেন বাদসা ভবানন্দ মজুমদারকে দেখিয়া তুটে হইয়া কহিলেন উপযুক্ত মহাশয় বটে পশ্চাৎ রাজা মানসিংহকে নান্য প্রকার রাজপ্রসাদ সামগ্রী দিয়া আজ্ঞা করিলেন তোমার কোন বাসনা থাকে আমাকে কহ আমি তাহা পূর্ণ [২৩] করিব তখন রাজা মানসিংহ নিবেদন করিলেন রাজা প্রতাপাদিত্যকে শাসিত করণের মূল ভবানন্দ মজুমদার যদি আজ্ঞা হয় তবে মজুমদারকে রাজপ্রসাদ কিছু দিউন বাদসা হাস্ত করিয়া কহিলেন উহার নিবেদন কি তখন রাজা মানসিংহ করপুটে কহিলেন বাঙ্গালার মধ্যে বাগ্‌য়ান নামে এক পরগণা আছে সেই পরগণা ইহার জমিদারি হউক বাদসা হাস্ত করিয়া কহিলেন জমিদারির লিপি করিয়া দেহ আজ্ঞা পাইয়া রাজা মানসিংহ বাগ্‌য়ান পরগণার জমিদারির লিপি বাদসাহার স্বাক্ষর করিয়া মজুমদারকে দিয়া সম্ভ্রান্ত করিলেন রায় মজুমদার জমিদারির লিপি লইয়া বাদসাহের নিকট হইতে বিদায় হইয়া রাজা মানসিংহের বাটীতে গেলেন। রাজা মানসিংহ কিঞ্চিৎ গোপে রাজদরবার হইতে বিদায় হইয়া বাটীতে আসিলেন দেখেন ভবানন্দ মজুমদার বসিয়া রহিয়াছেন জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কি কার্যে এখন এখানে আসিয়াছ তাহাতে মজুমদার কহিলেন [২৪] মহারাজ আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন কিছু কালের জন্তে বিদায় করুন ইহাতেই রাজা মানসিংহ কহিলেন মজুমদার নিজ বাটীতে ঘাইবা মজুমদার নিবেদন করিলেন যেমন আজ্ঞা

হয় রাজা মানসিংহ বহুবিধ রাজপ্রসাদ দিয়া যথেষ্ট তুষ্ট করিয়া মজুমদারকে বাটীতে বিদায় করিলেন।—

ভবানন্দ মজুমদার রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া মনের আনন্দে শুভ লগ্নে তরুণি যোগে বাটী প্রস্থান করিলেন।—

ভবানন্দ মজুমদার বাটীর নিকট আসিয়া নিজালায়ে দূত প্রেরণ করিয়া সংবাদ দিয়া পশ্চাৎ আপনি উপস্থিত হইলেন যাবদীয় লোক শ্রবণ করিলেন যে রায় মজুমদার বাগ্‌য়ান পরগণা জমিদারি করিয়া আসিয়াছেন ইহাতে যাবদীয় মহাশয় হর্ষ হইয়া ভেটের সামগ্রী লইয়া সাফাৎ করিতে গমন করিলেক সকলেরি মহা আনন্দ হইল রায় মজুমদার যে যেমন মহাশয় তাহাকে [২৫] তেমন সমাদর করিয়া শিষ্টাচার করিলেন এবং প্রজারদিগকে যথেষ্ট আশ্বাস করিয়া সকল মহাশয়কে জমিদারির পত্র দেখাইলেন পশ্চাৎ আত্মপুণে গমন করিয়া পুরমধ্যে উত্তম স্থানে কিঞ্চিৎ কাল বসিয়া অস্তঃপুরে গমন করিয়া মধুর বাক্যে নিজ পরিবারের তৌষ জন্মাইয়া দিব্য আসনে বসিলেন রায় মজুমদারের পত্নী লক্ষ্মীর আগমনের যাবদীয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন সকল সমাচার জ্ঞাত হইয়া রায় মজুমদার বিবেচনা করিলেন লক্ষ্মীর রূপায় আমার সকল সম্পত্তি মহানন্দে গাজোখান করিয়া কাঁপী দর্শন করিয়া প্রণামানন্তর বহুবিধ স্তব করিলেন এবং সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া জ্ঞাতী কুটুম নিমন্ত্রণ করিয়া লক্ষ্মীর পূজা করিলেন এবং রাজকীয় ব্যাপার করিতে প্রযত্ন সকল প্রজা মনের হর্ষে রাজকর যোগাইতে লাগিল। কিছু কালানন্তরে ভবানন্দ রায় মজুমদারের তিন পুত্র [২৬] হইল জ্যেষ্ঠের নাম রাগিলেন গোপাল মধ্যমের নাম গোবিন্দ কনিষ্ঠের নাম শ্রীকৃষ্ণ ইহারদিগের মধ্যে গোপাল রায় সর্ব শাস্ত্রে উত্তম পণ্ডিত। কতক কালানন্তরে রায় মজুমদার তিন পুত্রের বিবাহ দিলেন কালক্রমে

গোপাল রায়ের পুত্র হইল নাম রাখিলেন রাঘব রায় ভবানন্দ রায় পৌত্র দর্শন করিয়া বিবেচনা করিলেন এ পৌত্র অতি প্রধান মহত্ব হইবেক সর্ব লক্ষণে লক্ষণাক্রান্ত। পৌত্রোৎসবে মহতী ঘটা করিয়া পশ্চাৎ ভ্রাতা হুবুন্ধি রায় ও হরিবল্লভ রায়কে কিঞ্চিৎ জমিদারি করিয়া দিয়া সংসার হইতে বিরত হইলেন। পরে গোপাল রায় সর্বাধাফ হইয়া কাল যাপন করেন কিছু কাল পরে গোপাল রায় ভ্রাতা গোবিন্দ রায় ও ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণ রায়কে কিঞ্চিৎ জমিদারি দিয়া ঈশ্বর ভজন কারণ বিষয়তাপ্ত হইলেন। পরে রাঘব রায় সর্ব শাস্ত্রে গুণবান অতিবড় দাতা সর্বদা যাবদীয় প্রজার প্রতিপালনে মতিমান সর্ব লক্ষণাক্রান্ত দান ধ্যান যোগ [২৭] সদালাপ বিশিষ্ট লোকের সমাদর রাজ্য স্বত্ব সকল লোকের নিকট মহৎ স্থাখ্যাতাপন্ন জমিদারির বাহুল্য হইতে লাগিল মনেই বিচার করিয়া স্থির করিলেন আমি রাজধানীতে গমন করিব শুভ দিন স্থির করিয়া রাজধানীতে গমন করিলেন সম্রাটের রাজ্যের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আত্মমানের গৌরব যথেষ্ট জন্মাইলেন। সম্রাটের রাজ্য রাঘব রায়ের সহিত আলাপ করিয়া দেখিলেন এ বড় মহত্ব ইহাকে রাজ্য করি পরে অনেক ভূমির কর্তা করিয়া রাজপ্রসাদ দিয়া উপাধি রাখিলেন রাঘব রায় মহারাজ সেই অবধি খ্যাতি হইল মহারাজ পরে মহারাজ আত্মরাজধানীতে আগমন করিয়া রাজত্বের বাহুল্য করিয়া কাল জাপন করেন সময়ক্রমে এক পুত্র হইল তাহার নাম রাখিলেন রুদ্র রায় পশ্চাৎ কিঞ্চিৎ কালানন্তরে রুদ্র রায়কে রাজ্য দিয়া ঈশ্বরে মনোপর্ণ করিলেন।

[২৮] রুদ্র রায় মহারাজ রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া মহানন্দে কাল জাপন করেন এক দিবস পাত্ৰ মিত্র সকলকে আজ্ঞা করিলেন যে তোমরা সকলে মাটায়ারি পরগণায় যাইয়া অপূর্ণা এক পুরী প্রস্তুত করহ আমি

সেই স্থানে বাস করিব সকলেই কহিলেন উপযুক্ত স্থান বটে এই পরামর্শ স্থির করিয়া প্রধানই চাকর অগ্রে গমন করিয়া বাটী নির্মাণ করিলেন পরে রুদ্র রায় মহারাজ সপরিবারে মাটায়ারি বাটী যাইয়া বসতি করিলেন অদ্যাপি এ সকল স্থান বর্তমান আছে পরে সময়ক্রমে রুদ্র রায় মহারাজার তিন পুত্র হইল জ্যোতীর নাম রামচন্দ্র মধ্যম রামকৃষ্ণ কনিষ্ঠ রামজীবন। রামচন্দ্র মহারাজ অতিবড় বলবান রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া বলক্রমে অনেক ক্ষুদ্র জমিদারের ভূমি লইয়া আপন রাজ্য অধিক করিলেন রামচন্দ্র মহারাজ অবর্তমানে রামকৃষ্ণ রাজা হইলেন এই কালীন ঢাকা য় স্থা হইলেন মুরসিদাবাদ ইনি ঢাকা পরিত্যাগ করিয়া আত্ম[২৯]নামে এক অপূর্ণ নগর বসাইয়া নাম রাখিলেন মুরসিদাবাদ এই নগরে রাজধানী করিলেন। রামকৃষ্ণ মহারাজ পরমধার্মিক এবং প্রবার নিকট যথেষ্ট মর্যাদাযুক্ত যে রাজকর পূর্বে নিয়মিত ছিল তাহা অপেক্ষা কিছু অল্প করিয়া যথেষ্ট সৈন্য রাখিয়া রাজ্যের বাহুল্য করিলেন। রামকৃষ্ণ মহারাজ বাইশ লক্ষের জমিদারি করিয়া পরম স্থখে কাল জাপন করেন তাহার অবর্তমানে রামজীবন রায় রাজা হইলেন।

রামজীবন রায় মহারাজ রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া রাজ্য রামকৃষ্ণ কৃষ্ণনগর নামে যে এক নগর করিয়াছিলেন সেই স্থানে রাজধানী করিলেন। রামজীবন রায় মহারাজ অত্যন্ত প্রতাপাশ্রিত রাজ্য অতিশয় শাসিত করিয়া এই রূপে কাল ক্ষেপণ করেন সময় ক্রমে মহারাজার দুই পুত্র হইল জ্যোতী রঘুরাম কনিষ্ঠ রামগোপাল কিছু কালানন্তরে রঘুরাম রায় রাজা হইলেন রঘুরাম রায় মহারাজ অতিবড় দাতা পুণ্যবান পরম স্থখে কাল জাপন করেন রাজা [৩০] রাণীর অধিক বয়স্ক হইল পুত্র না হওয়াতে সর্বদা বেদিত থাকেন এক দিবস মনেই চিন্তা করিয়া

স্থির করিলেন ঈশ্বরের আরাধনা ব্যতিরেকে উত্তম রত্ন লাভ হয় না অতএব আমরা দুই জনে কঠোর তপস্যা করি তবে ঈশ্বর অবশু পুত্র দিবেন রাজা রাণী ইহাই স্থির করিয়া আরাধনার নিয়ম করিলেন অতিপ্রাতে গাজোখান করিয়া স্নানান্তর ঈশ্বরের মহতী পূজা করিয়া সূর্য্য দৃষ্টি করিয়া রাজা রাণী প্রত্যহ ঈশ্বরের তপস্যা করেন এইরূপে এক বৎসর গত হইল রাজা রাণীর তপস্যাতে সকল লোকের চমৎকার বোধ হইয়া বিস্তর প্রশংসা করিলেক আরাধনার নিয়ম এক বৎসর তাহা পূর্ণ হইলে মহতী ঘটী করিয়া যজ্ঞ করিলেন কিঞ্চিৎ কাল পরে এক দিবস রাজ্যে রাজা রঘুরাম রাণীর সহিত অস্তঃপুরে শয়ন করিয়াছেন রজনী শেষে রাণী অপূর্ণ স্বপ্ন দেখিয়া চৈতন্য হইয়া রাজাকে গাজোখান করাইলেন রাজার চৈতন্য হইলে পরে নিবেদন [৩১] করিলেন হে মহারাজ আমি এক আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিলাম রাজা কহিলেন কি স্বপ্ন দেখিয়াছ রাণী কহিলেন আমি নিদ্রায় ছিলাম এক জন অপূর্ণ পুরুষ আসিয়া আমাকে কহিলেন আমি তোমার পুত্র হইব আমিহইতে তোমরা অনেক স্ত্রী হইবা এবং যাবদীয় লোক তোমাকে স্বর্গগর্তী কহিবেক যে হেতু আমাকে প্রসব হইবা আমি কহিলাম আপনি কে তাহাতে কহিলেন তোমরা বাহার আরাধনা করিয়াছিল। আমি তাহার অহুগৃহীত তোমার পুত্র হইতে আমাকে আজ্ঞা হইয়াছে ইহাই বলিয়া অতিক্রম মুষ্টি দারণ করিয়া আমার মুখমধ্যে প্রবেশ করিলেন রাজা রঘুরাম রায় স্বপ্নের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মহা আনন্দার্ণবে মগ্ন হইয়া রাণীকে কহিলেন তোমার অপূর্ণ বালক হইবেক অজ্ঞ তোমার গর্ভাধান হইল এ কথা অজ্ঞকে কহিবা না। কিঞ্চিৎ কাল পরে রাণীর গর্ভ প্রচার হইলে পাত্র মিত্র আত্মীয়বর্গের সমূহ আনন্দ হইল দিনে নানা [৩২] প্রকার উৎসাহ হইতেছে সময়ক্রমে রাণীর প্রসব বেদনা উপস্থিত হইল এই সম্বাদ

রাজা শুনিয়া জ্যোতিষ শাস্ত্রে মহামহোপাধ্যায় এমত পণ্ডিতগণকে লইয়া রাজ্যে অস্তঃপুরের নিকটে বসিলেন যাবদীয় প্রধানত ভৃত্যোরা সদা সাবধানে আছে যখন যাহাকে যে আজ্ঞা হইবেক তৎক্ষণেতে সে কাৰ্য্য করিবেক ইতিমধ্যে শুভক্ষণে শুভলগ্নে অপূর্ণ এক পুত্র হইল পুত্রের রূপে পুরী চন্দ্রের স্যায় আলো করিল রাজপুরে জন্ম ধনি হইবামাত্র অট্টালিকার উপরে বাস্তোভূম শঙ্খ ঘণ্টা ঘড়ি তুরী ভেরী ঝাঁঝরী রামশিলা ঢঙ্কা ঢোল দামামা এবং বীণা মৃদঙ্গ কাংশ্য করতাল রামবেণী প্রভৃতি নানা যন্ত্রের বাজে কোলাহল শব্দ নগরস্থ রমণীরা রাজপুরে আসিয়া ছলুং ধনি করিতে প্রবর্ত্ত হইল রাজা পরমাঙ্কাদে শততঃ স্বর্গ একতঃ ব্রাহ্মণকে এবং উদাসীনকে ও অক্ষ আতুরের এবং ধন্যকে প্রদান করিতে লাগিলেন যাবদীয় নগরস্থ লোকেরদিগের [৩৩] সন্তোষের সীমা নাই কিঞ্চিৎ কাল পরে পাত্রের প্রতি রাজা আজ্ঞা করিলেন যাবদীয় নগরের লোকের বাটীতে মস্তা ও দধি এবং সন্দেশ ভারে প্রদান কর পাত্র রাজাজ্ঞাসারে সকলের বাটীতে প্রদান করিয়া পশ্চাৎ রাজার নিকট গমন করিয়া নিবেদন করিলেন মহারাজ অস্তঃপুরে যাইয়া পুত্র দর্শন করুন এবং ভৃত্যবর্গেরদিগেরও বাসনা রাজপুত্র দেখে রাজা হাস্য করিয়া কহিলেন কর্তব্য বটে রাজা অগ্রে পুরমধ্যে গমন করিয়া পুত্র দর্শন করিলেন পশ্চাৎ দাসীরদিগের প্রতি আজ্ঞা করিলেন পাত্র প্রভৃতি যাবদীয় ভৃত্যোরা রাজপুত্র দর্শন করিতে আসিতেছে সকলকে দেখাও দাসীরা রাজপুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া যাবদীয় প্রধানত ভৃত্যোদিগকে দেখাইল। পরে সকলেই অস্তঃপুর হইতে আগমন করিয়া রাজসভাতে বসিলেন সমস্ত ব্রাহ্মণেরা বেদধ্বনি করিতে লাগিলেন পরে জ্যোতিষী ভট্টাচার্য্যেরা নানা শাস্ত্র বিচার করিয়া দেখিলেন অপূর্ণ [৩৪] বালক হইয়াছে রাজার নিকটে নিবেদন করিলেন

মহারাজ এই যে রাজপুত্র হইয়াছেন ইহার দীর্ঘ পরমায়ু হইবেক সর্ব শাস্ত্রে মহামহোপাধ্যায় এবং বুদ্ধিতে বৃহস্পতির ছায়া এবং ধর্মাত্মা হইবেন সকল লোক ইহার অতিশয় যশ ঘূষিবেক মহারাজচক্রবর্তী হইয়া বহুকাল রাজ্য করিবেন মহারাজ ইহার গুণে কুল উজ্জ্বল হইবেক রাজ্য জ্যোতিষী ভট্টাচার্যেরদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত হর্ষযুক্ত হইলেন কিছু কালানন্তরে নর্তকীরা আসিয়া রজনীতে রাজার সম্মুখে নৃত্য করিতে প্রবর্ত হইল দিবা রাত্রি সর্বদাই নগরস্থ লোকেরদিগের আনন্দের সীমা নাই এইরূপে কালক্ষেপণ করেন। রাজপুত্র দিনে ২ চন্দ্রের ছায়া বৃদ্ধি পাইতেছেন নাম রাখিলেন কৃষ্ণচন্দ্র কালক্রমে বিদ্যা অভ্যাস করিতে প্রবর্ত হইলেন ঐতিহ্য যখন যাহা শুনেন তৎক্ষণাৎ অভ্যাস হয় সকল শাস্ত্রেই পণ্ডিত হইলেন পরে বাঙ্গালা ও ফারসি শাস্ত্রেও পণ্ডিত হইয়া [৩৫] অস্ত্রবিজ্ঞাতে প্রবর্ত হইয়া অল্প দিনেই অস্ত্র শিক্ষা করিয়া রাজকীয় ব্যাপার শিক্ষা করিতে লাগিলেন রাজারদিগের যেমন নীতিবস্তু আছে তাহা শিক্ষা করিলেন অল্প কালের মধ্যে সকল বিষয়ের পারগ হইলেন রাজা রঘুরাম রায় দেখিলেন পুত্র সর্বগুণালঙ্কৃত হইলেন অতএব পুত্রের বিবাহ দিয়া রাজ্য করিয়া আমি ঐশ্বর্য্যস্থানে যাইয়া নিজকন্দের সাধন করি ইহাই মনোমধ্যে স্থির করিয়া সকল সভাসদরাজনেরদিগকে আজ্ঞা করিলেন তোমরা সকলে বিবেচনা করিয়া উত্তম বংশে পরম স্ত্রী কন্যা স্থির করহ আমি রাজপুত্রের বিবাহ দ্বার্য্য দিব সকলেই যে আজ্ঞা বলিয়া স্বীকার করিল পরে অনেক কন্ডার অন্বেষণ করিতে লাগিল শত ২ স্থানে মহম্মদ প্রেরিত হইল পরে সকলের বিবেচনায় উত্তম বংশে পরম স্ত্রী কন্যা সহিত সম্বন্ধ নির্ণয় হইয়া বিবাহের উত্তোগ করিতে লাগিলেন রাঢ় গোড় বঙ্গ নিবাসী [৩৬] যাবদীয় রাজগণ এবং পণ্ডিতগণ ও প্রধান ২ মহম্মদ নিমন্ত্রণ করিলেন বিবাহের

দিবস ফাগুন মাসে স্থির হইল যাবদীয় মহম্মদের কারণ নানা স্থানে ভাণ্ডার হইল প্রতি ভাণ্ডারে চর্বা চোখ লেহ পেয় চারি প্রকার সামগ্রী পরিপূর্ণ এবং যে যেমন মহম্মদ তাহারি মত থাকনের স্থান নির্মাণ হইল রাজধানীতে যাবৎ দেশীয় লোক আগমন করিতে লাগিল। রাজা আশ্বজনেরদিগের প্রতি আজ্ঞা করিয়া দিলেন তোমরা সর্বদা তত্ত্ব করিবা বিস্তর লোকের আগমন হইতেছে যেন কেহ অতুচ্ছ থাকে না যে যত লয় তাহাই দিবা রাজাজ্ঞায়সারে স্বয়ং কার্য্যে সর্বদা সাবধানে আছে পরে রাজগণের আগমন শ্রবণ করিয়া রাজা আপনি প্রত্যেক রাজার নিকটস্থ হইয়া সমাদরপূর্বক উত্তম আলয়ে থাকনের স্থান নিরূপিত করিয়া দিলেন এবং উপযুক্ত মহম্মদ রাজগণের নিকটে নিয়োজিত করিলেন যে যেমন রাজা সেইরূপ সমাদর করেন এবং সামগ্রীর আয়োজন [৩৭] করিয়া প্রেরিত করিলেন পরে রাজা রঘুরাম নগর ভ্রমণ করিয়া মহম্মদ দেখিলেন দেখেন অতিবিস্তর লোক আসিয়াছে এত লোকের খাচ্ছ সামগ্রী কি প্রকারে ভৃত্যেরা দিতে পারিবেক অতএব নগরস্থ যাবদীয় খাচ্ছ সামগ্রীর দোকান আছে ইহাই অগ্নি ক্রয় করিয়া সকলকে অন্নমতি করি যত লয় তাহা দেয় ইহা মনে স্থির করিয়া পাত্রকে আহ্বান করিয়া কহিলেন যে রূপ মহম্মদ আসিয়াছে ইহাতে কেহ খাচ্ছ সামগ্রী প্রদান করিয়া যশ লইতে পারিবে না কিন্তু যদি কেহ উপবাসী থাকে তবে বড় অধ্যাত্তি অতএব নগরে যত আহ্বারের দ্রব্যের মহাজন লোক আছে তাহারদিগকে কহ যে যত চাহে তাহাকে তত দেয় এবং যে আপনি লয় তাহাকে বারণ না করে লোকসকল আপন ২ স্বেচ্ছার মত দ্রব্য লউক পরে মহাজনেরদিগের লিপিমত টাকা দেয়া যাইবেক আর ভাণ্ডারের নিয়োজিত লোককে কহ যে যত চাহে তাহার দশ গুণ [৩৮] করিয়া সামগ্রী দেয় এবং তুমি সর্বত্র ভ্রমণ করিবা যেন কেহ দুঃখ না পায়

পাত্র যে আজ্ঞা বলিয়া স্বীকার করিলেন অসংখ্য মহত্বের আগমন হইয়াছে কোলাহলে নগরের লোক বধির হইল নগরের শোভার সীমা নাই সহস্র পতাকা রক্ত পীত শুভ্র নীল ইত্যাদি উজ্জ্বলমানা নানা জাতীয় বাস্তোত্তম রাজপুত্র মহামহোৎসব অত্র রাজগণ দর্শন করিয়া দম্বিত করিতেছেন। আর অনেক পণ্ডিত লোক আগমন করিয়া নিজঃ স্থানে কালক্ষেপণ করিতেছেন। রাজপুত্র প্রত্যহ অপূর্ণ সভা হয় যাবদীয় রাজগণ এবং পণ্ডিতগণ এবং প্রধান মহত্ব সকলেই রাজসভায় গমন করিয়া স্বঃ স্থানে বৈশেন নর্তক নর্তকী শতঃ আসিয়া নৃত্য গীত বাজ শ্রবণ করায় এইরূপ প্রত্যহ লগ্নক্রমে রাজপুত্রের বিবাহ মহতী ঘটাপূর্নক হইল পরে মহারাজ রঘুরাম রায় অনাহুত যে সকল লোক আসিয়াছিল তাহারদিগকে মনোনীত ধন দিয়া বিদায় করিলেন সকলে [৩৯] স্তব্ধাতি করিয়া আপনঃ দেশে গমন করিল পরে রাজগণেরদিগকে উপযুক্ত মর্যাদা করিয়া বিদায় করিলেন পণ্ডিতেরদিগকে এবং প্রধানঃ মহত্বেরদিগকে যে যেমন পাত্র বিবেচনাপূর্নক মর্যাদা করিয়া বিদায় করিলেন সকলেই স্তব্ধাতি করিলেক যশে দিগমণ্ডল পরিপূর্ণ হইল এই প্রকার মহতী ঘট করিয়া রাজা রঘুরাম কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের বিবাহ দিলেন রাজা রাণী পুত্র এবং পুত্রবধূ প্রাপ্ত হইয়া আশ্বিনে কাল জাপন করিতে লাগিলেন এইরূপে কিঞ্চিৎ কাল যায় পরে মহারাজ রঘুরাম রায় কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে রাজ্যে নিযুক্ত করিয়া আপন ঈশ্বর ভঞ্জে প্রবর্ত হইলেন পরে কৃষ্ণচন্দ্র রায় রাজা হইয়া দক্ষশাস্ত্রমতে প্রজা পালন করিতে আরম্ভ করিলেন রাজ্যের লোকেরদিগের কোন ব্যামোহ নাই ভৃত্যবর্গেরা নিজঃ কার্যে প্রাধান্ত করিয়া কালক্ষেপণ করে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের স্তব্ধাতির সীমা নাই তখন রাজধানী মুরসিদাবাদে নবাব সাহেবের [৪০] নিকট মহারাজার অত্যন্ত সম্মত সর্ব প্রকারে মহারাজচক্রবর্তীর দ্বায় ব্যবহার।—

এক দিবস মহারাজ পাত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে পূর্বে এ বংশে যে সকল রাজগণ হইয়াছিলেন তাহারা কেহ যজ্ঞ করিয়াছিলেন তাহাতে পাত্র নিবেদন করিল মহারাজ আমরা পুরুষাচ্ছক্রমে এ রাজ্যের পাত্র কিন্তু যে সকল মহারাজারা গিয়াছেন আরঃ প্রকার স্তব্ধাতি করিয়াছেন কিন্তু যজ্ঞ কেহ করেন নাই মহারাজ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পাত্রকে কহিলেন আমি অতি বৃহদযজ্ঞ করিব তুমি আয়োজন কর পাত্র নিবেদন করিলেন মহারাজ প্রধানঃ পণ্ডিতেরদিগকে আহ্বান করিয়া কি যজ্ঞ করিবেন তাহা স্থির করণ পশ্চাৎ যেমনঃ আজ্ঞা করিবেন তাহাই করিব পাত্রের বাক্যে রাজা সন্মত্রে লিপি প্রেরিত করিলেন ভট্টাচার্যেরদিগের আসিতে রাজপত্র প্রধানঃ পণ্ডিতেরা প্রাপ্ত হইয়া মহা হর্ষে রাজধানী কৃষ্ণনগরে আগমন করিলেন।—

[৪১] পরে রাজা শ্রবণ করিলেন যে প্রধানঃ পণ্ডিতেরা আমরা আজ্ঞা হসারে আগমন করিয়াছেন। পাত্রের প্রতি রাজা আজ্ঞা করিলেন অনেকঃ পণ্ডিতের আগমন হইয়াছে অতএব তাহারদিগকে উত্তম স্থানে বাসা দেহ এবং উত্তম খাদ্য সামগ্রীও দেহ যেন কোনমতে ব্যামোহ না পান। পাত্র রাজাজ্ঞামতে যাবদীয় পণ্ডিতেরদিগকে উত্তম স্থান দিয়া খাদ্য সামগ্রী যথেষ্টরূপ দিলেন পর দিবস রাজসভা করিয়া পণ্ডিতেরদিগকে আহ্বান করিলেন পণ্ডিতেরা রাজার বিত্তমানে আসিয়া মহারাজকে আশীর্বাদ করিয়া রাজসভাতে বসিয়া নানা শাস্ত্রের বিচার করিতে প্রবর্ত হইলেন। বিচারানন্তরে পণ্ডিতেরা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে নিবেদন করিলেন আমরাদিগের প্রতি রাজলিপি কি কারণ গিয়াছিল তাহাতে রাজা আজ্ঞা করিলেন আমি মনোমধ্যে বাসনা করিয়াছি যজ্ঞ করিব অতএব আপনারা বিচার করিয়া আজ্ঞা [৪২] করণ কি যজ্ঞ করিব আর কিরূপ করিলে সর্বত্র স্তব্ধাতি হইবেক এই বাক্য ধীরবর্গেরা

শ্রবণ করিয়া মহারাজকে নিবেদন করিলেন এ অপূর্ণ পরামর্শ করিয়াছেন অন্য আমরা বাসায় প্রস্থান করি কল্যাণ আসিয়া নিবেদন করিব।—

পর দিবস পণ্ডিতেরা আগমন করিয়া রাজাকে আশীর্বাদ করিয়া রাজসভায় সকলে বসিলেন পরে রাজা পণ্ডিতেরদিগের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন আপনারা কি স্থির করিয়াছেন পণ্ডিতেরা কহিলেন মহারাজ অগ্নিহোত্রী বাজপেয়ী যজ্ঞ করুন। রাজা উত্তর করিলেন দুই যজ্ঞ এককালীন করিব কি পৃথক করিব ইহা বিবেচনা করিয়া আপনারা আমাকে আজ্ঞা করুন এবং কত তদ্বা হইলে যজ্ঞ সাদ্ধ হইবেক তাহাও আজ্ঞা করুন পণ্ডিতেরা কহিলেন মহারাজ রাজযজ্ঞ ইহার বিবেচনা মহারাজ করিবেন যজ্ঞের যের সামগ্রীর আবশ্যক তাহার যাগ করিয়া দিই রাজা কহিলেন ভাল তাহাই দিউন পরে পণ্ডিতেরা [৪৩] রাজসভা হইতে গাত্ৰোত্থান করিয়া পাত্রের নিকট যাইয়া যজ্ঞের সামগ্রীর যাগ করিয়া দিলেন এবং কহিলেন যে ত্রয যজ্ঞেতে লাগিবেক তাহাই আমরা লিখিয়া দিলাম পরে পাত্র সামুদায়িক বরাদ্দ করিয়া দেখিলেন বিংশতি লক্ষ তদ্বা হইলে যজ্ঞ সাদ্ধ হইবেক। মহারাজার নিকটে পাত্র গমন করিয়া সমস্ত নিবেদন করিলেন। রাজা হাস্য করিয়া কহিলেন আয়োজন করহ পরে পাত্র যজ্ঞের ত্রযাসকল আয়োজন করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন।—

পরে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় অঙ্গ বদ কলিঙ্গ রাঢ় গোড় কাশী দ্রাবিড় উৎকল কাশ্মীর প্রভৃতি দেশস্থ যাবদীয় পণ্ডিতেরদিগের প্রতি নিমন্ত্রণের লিপি পাঠাইলেন যজ্ঞের কাল উপস্থিত হইলেই সকল দেশীয় ধীরবর্গেরা আসিলেন রাজা অতিশয় ঘটাপূর্ণক যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিলেন এবং সকল লোককে যথেষ্ট ধন দিয়া পরিতোষ জন্মাইলেন রাজার স্থখ্যাতির সীমা নাই যাবদীয় পণ্ডিতেরা রাজার নাম রাখিলেন অগ্নিহোত্রী বাজপেয়ী

[৪৪] শ্রীময়্যরাজ্যরাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র রায় এই নাম মহারাজ প্রাপ্ত হইয়া আনন্দার্ণবে মগ্ন হইলেন পশ্চাৎ যাবদেশীয় পণ্ডিতেরদিগকে বহুবিধ ধন দিয়া বিদায় করিয়া মনের হর্ষে রাজ্য করেন রাজ্য শাসিত হইলে সর্বজ স্থখ্যাতি পাইলেন প্রজাসকলের যথেষ্ট আশ্রয় কোনরূপে ব্যামোহ নাই এইরূপে কালক্ষেপণ করেন।—

এক দিবস অশ্রুতকরণে হইল শিকারে যাইব পরে ভৃত্যবর্গেরদিগকে আজ্ঞা করিলেন আমি মুগয়া করিতে যাইব তোমরা সকলে সমজ্ঞ হও আজ্ঞা প্রমাণে সকলে প্রস্তুত হইল। রাজা অখারোহণে গমন করিয়া নিবিড় বনে মুগয়া করেন ইতিমধ্যে এক স্থানে উন্নত হইয়া দেখেন অতিরম্য স্থান চারি দিগে নদী মধ্যে এক ক্ষুদ্র দ্বীপ এবং স্থানেই অনেক পশু পক্ষী আছে নানা প্রকার শব্দ হইতেছে রাজা স্থান নিরীক্ষণ করিলেন এ অপূর্ণ স্থান আমি এইখানে কিছু দিন বিশ্রাম করিব রাজাজ্যক্রমে ভৃত্যবর্গেরা রাজার [৪৫] থাকিবার উপযুক্ত স্থান করিয়া দিয়া পশ্চাৎ আপনাদিগের স্থান করিয়া সকলেই সেই স্থানে বাস করেন। পরে রাজা আজ্ঞা করিলেন আমি এই স্থানে পুরী নির্মাণ করিব পাত্রকে শীঘ্র আনয়ন কর রাজাজ্যাসুরে দূত গিয়া পাত্রকে আনিল পাত্রকে দেখিয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় কহিলেন তুমি এই স্থানে অপূর্ণ এক পুরী প্রস্তুত কর যেন কোনরূপে কেহ নিন্দা না করে। পাত্র নিবেদন করিলেন মহারাজ আপনি রাজধানীতে গমন করুন আমি পুরী নির্মাণ করাই পশ্চাৎ প্রস্তুত হইলেই মহারাজ আসিয়া দেখিবেন। পাত্রের বাক্যে রাজা রাজধানীতে আগমন করিলেন পাত্র সেই স্থানে থাকিয়া পুরী নির্মাণ করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন চারি দিগে যে নদী আছে সেই গড় হইল দক্ষিণ দিগের নদী বন্ধন করিয়া প্রধান পথ করিলেন এবং সৈন্যের থাকনের স্থান করিলেন বড় কামান দুই পার্শে রাখিলেন হঠাৎ পুরমধ্যে শত্রু প্রবেশ

করিতে না পারে তৎপরে [৪৬] অপূর্ণ অট্টালিকা তৎপরে বাত্মাগার তার পরে অতি উচ্চ অট্টালিকা তাতে ঘড়ি তদুর্দ্ধে খটী তার পর চারি দরজা মধ্যে সদাগরেরদিগের থাকনের স্থান এবং হাট নানা জাতীয় দ্রব্যের জন্য বিক্রয় হইবেক তন্মধ্যে বিস্তারিত পথ কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া এক অট্টালিকা তাতে নানা জাতীয় যন্ত্র লইয়া যন্ত্রীরা বাত্মোচ্চম করিবেক পরে রাজবাটী প্রথম এক চতুঃসীমা দক্ষিণদ্বারী এক অট্টালিকা তাহাতে রাজকীয় ব্যাপার হইবেক। তিন পার্শ্বে অট্টালিকা তাতে ভূতোরী থাকিবে পরে এক চতুঃসীমা তাতে ঈশ্বরের আলয় অপূর্ণ রম্য স্থান সহস্র লোকে দর্শন করিতে পারে পরে একখান পুরী তাতে মহারাজার বিরাজ করণের স্থান চারি দিগে অট্টালিকা পরে অন্তঃপুর অতি বৃহৎ বাটী নানা স্থানে নানা প্রকার অট্টালিকা। অন্তঃপুরের কিঞ্চিৎ দূরে এক পুষ্পোদ্যান চতুর্দিকে প্রাচীর মহারাণী প্রভৃতি পুষ্পোদ্যানে গমন করিতে পারেন পুষ্পোদ্যানে নানাজাতীয় পুষ্প তন্মধ্যস্থানে এক অট্টা[৪৭]লিকা তাহাতে বসিয়া রাণী নৃত্যকীরদিগের নৃত্য দর্শন করেন এবং গীত বাদ্য শ্রবণ করেন। পশ্চিমদিগের যে পথ সেই পথ দিয়া কিঞ্চিৎ গমন করিলে এক ধর্মশালা সেখানে অন্ধ আতুর পঙ্গু এবং উদাসীন যে কেহ উপনীত হইবেক যার যে দেখেছা আহ্বারের দ্রব্য পাইবেক ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিয়া দ্রব্য রাখিলেন।—

পরে পূর্ণ দিগে এক অপূর্ণ পুষ্পোদ্যান তার মধ্যস্থানে অট্টালিকা এবং নানাজাতীয় বৃক্ষ ও পুষ্প এই পুষ্পোদ্যানের পর যাবদীয় মহারাজার জাতি এবং কুটুম্বদিগের পৃথক অট্টালিকাময়ী বাটী প্রত্যেক বাটীতে দেবালয় এইরূপ অনেক প্রকার বাহুল্য করিয়া বাটী প্রস্তুত করিলেন। পরে পাজ বাটী নির্মাণ করাইয়া মহারাজকে সম্বাদ দিলেন যে বাটী প্রস্তুত হইয়াছে। মহারাজ সপরিবারে নূতন বাটীতে আগমন করিয়া

সকল পুরী দেখিয়া অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া পাজকে রাজপ্রসাদ দিয়া জিজ্ঞাসা করি[৪৮]লেন অধ্যাপকেরদিগের স্থান করিয়াছ পাজ নিবেদন করিলেন মহারাজার যে পুষ্পের বাগান হইয়াছে তাহারি নিকট স্থান আছে আজ্ঞা করিলে সেই স্থানে প্রস্তুত করি রাজা কহিলেন অতি শীঘ্র প্রস্তুত করহ রাজাজ্ঞামুসারে পৃথক পাঠশালা প্রস্তুত করাইলেন সেই সকল পাঠশালায় প্রধান পণ্ডিতেরা বসতি করিয়া অধ্যাপনা করাইতে লাগিলেন এবং নানা দেশীয় গুণবান লোক আসিয়া গুণ শিক্ষা করান এবং করেন রাজা শুভক্ষণে পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন আশ্বলাদের সীমা নাই। পুরীর নাম শিবনিবাস নদীর নাম কঙ্কণা রাখিলেন পুরবাসী যাবদীয় মহাত্মেরা মহাত্ম্যে সর্বদা হাত্ত পরিহায়েতে কালক্ষেপণ এবং ধর্ম্মাচরণ ঈশ্বরের আরাধনা করেন এইরূপে মহারাজ বসতি করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন মধ্যে রাজা মুরসিদাবাদে গমন করিয়া নবাব সাহেবের সহিত শাক্য করিয়া খেওঁ শিষ্টাচার করেন এবং নানা জাতীয় ভেটের দ্রব্য নবাবকে দেন তখন [৪৯] নবাব আলাবুদ্ধি অতিবড় ধর্ম্মাত্মা সকলের প্রতি দয়ালু পুণ্যশীল সকল রাজারা রাজকর নবাবকে দিয়া হুখেতে কালক্ষেপণ করিতেছেন রাজ্যোৎপাত কাহার নাই যে যেমন মহাত্ম তাহাকে সেইরূপ নবাবের রূপা কিন্তু নবাব সাহেবের পুত্র নাই এক কচ্ছা কচ্ছার প্রতি নবাব সাহেবের অতিশয় স্নেহ কিছু কালানন্তরে নবাব সাহেবের এক দৌহিত্র হইল নাম রাখিলেন সাজেরদৌলা নবাব সাহেবের বাসনা দৌহিত্র সর্ষদাই নিকটে থাকে এইরূপে কিছু কাল যায় সাজেরদৌলা অতিবড় দুর্বৃত্ত হইলেন যাহা মনে আইসে তাহাই করেন কেহ বারণ করিতে পারে না নবাব সাহেবের পাজ মহারাজ মহেন্দ্র এবং আরও প্রধান চাকর অনেক আছে সকলেই ঐক্য হইয়া নবাব সাহেবকে নিবেদন করিলেন

স্রাজেরদৌলা অতিশয় দৌরাখ্য্য করিতেছেন ইহার আপনি উপায়াস্তর
কল্পন তার পর নবাব [৫০] সাহেব স্রাজেরদৌলাকে ডাকাইয়া
কহিলেন তুমি যাবদীয় লোকের উপর দৌরাখ্য্য করহ এ অতিমন্দ কর্ম
সাবধান কদাচ মন্দ ক্রিয়া করিও না এইরূপ শাসিত করণে স্রাজেরদৌলা
প্রধান পাজগণেরদিগকে আশ্বাস করিয়া দমন করিলেক আমি যে কাথ্য
করি তাহা যদি নবাব সাহেবের কর্ণগোচর হয় তবে তোমারদিগের
যথেষ্ট দণ্ড করিব এবং একথা নবাব সাহেবের নিকট তোমরা কহিয়াছ
যদি আমার নবাবি হয় তবে ইহার প্রতিফল স্বন্দরমতে দিব যত
প্রধানত ভৃত্যরা মহাশঙ্কিত হইয়া নীরব হইলেন তার পর স্রাজেরদৌলা
নানা প্রকারে দৌরাখ্য্য করিতে আরম্ভ করিলেক নদী দিয়া নৌকা যায়
সে নৌকা ডুবায় মহাযাসকল ডুবে মরে ইহাই দেখে এবং যাহার
আলয়েতে শুনে পরমহুন্দরী কহা আছে বলক্রমে সেই কহা হরণ করে ও
গুপ্তিগী প্রী আনিয়া উদর চিরিয়া দেখে কোনখানে সন্তান থাকে এইরূপ
অতিশয় দৌরাখ্য্য আরম্ভ করিল। [৫১] সকল লোক বিবেচনা
করিতে প্রবর্ত্ত হইল পরস্পর বিবেচনা করিলেন এ দেশে আর থাকা
পরামর্শ নহে নগরস্থ লোকসকল মুরসিদাবাদ ত্যাগ করিয়া পলায়নপর
হইল হাহাকার শব্দ উঠিল সকল লোকেই ঈশ্বরের স্থানে আরাধনা
করিতে প্রবর্ত্ত হইল যে এ দেশে জ্বন অধিকারী না থাকে। কিছু দিন
যায় নবাব আলাউদ্দিন লোকান্তর হইলে স্রাজেরদৌলা নবাব হইলেন
যাবদীয় প্রধানত ভৃত্যবর্গেরা ভেট দিয়া করপুটে নিবেদন করিলেন
আপনি এখন এ দেশের কর্ত্তা হইলেন যাহাতে রাজ্যের লোক স্থবী হয়
তাহা করিবেন ঈশ্বর আপনকারে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ করিলেন এ দেশের
লোককে স্থপে রাখিলে বহু কাল রাজ্য করিতে পারিবেন এই প্রকার
পাত্র মিত্র লোকে সর্ব্বদা সুখান কিঙ্ক তিনি চুপ্ত প্রকৃতি ত্যাগ ও উত্তম

বাক্য শ্রবণ করেন না সকল লোক এবং প্রধানত চাকরেরা বিবেচনা
করিলেন স্রাজেরদৌলা নবাব থাকিলে কাহারো কল্যাণ নাই অতএব
কি হইবে [৫২] কোথা যাব ইহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারেন না
পরে যাবৎ দেশীয় রাজা একা হইয়া নবাবের প্রধান পাত্র মহারাজ
মহেন্দ্রকে নিবেদন করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন রাজাসকলের নাম বঙ্গমানে
রাজা ও নবাবের রাজা দিনাজপুরের রাজা বিষ্ণুপুরের রাজা
মেদনীপুরের রাজা বীরভূমের রাজা ইত্যাদি করিয়া সকল রাজগণ প্রধান
পাত্রের নিকট যাত্রা করিয়া স্রাজেরদৌলার দৌরাখ্য্য নিবেদন করিলেন
মহারাজ মহেন্দ্র সকলকে আশ্বাস দিয়া স্বং রাজ্যে প্রেরিত করিলেন।

পরে যাবদীয় মন্ত্রীরা নবাব স্রাজেরদৌলায় নীতি শিক্ষা কল্পন যত
উত্তম কথা কহেন স্রাজেরদৌলা ততোধিক মন্দ করে পরে মহারাজ
মহেন্দ্র এবং রাজা রামনারায়ণ রাজা রাজবল্লভ রাজা কৃষ্ণদাস ও মীর
জাফরালিখা এই সকল লোক একা হইয়া এক নিবস জগৎসেট
মহাশয়ের বাটীতে গমন করিয়া জগৎসেটের সহিত বিরলে বসিয়া
পরামর্শ করিতে লাগিলেন মহারাজ মহেন্দ্র [৫৩] অগ্রে কহিলেন
আমি যাহা কহি তাহা তোমরা শ্রবণ করহ আমরা এ দেশে অনেক
কালাবধি আছি এবং নবাব সাহেবেরদিগের আজ্ঞাঅবর্ত্তী হইয়া প্রাধান্য
রূপে পুরুষাচ্চক্রমে কালক্ষেপণ করিতেছি এখন যিনি নবাব হইলেন
ইহার নিকট মানের লঘুতা দিনত হইতে লাগিল আর সকল লোকের
উপর অতিশয় দৌরাখ্য্য কতরূপে নিষেধ করিলাম এবং বুঝাইলাম
তাহা কদাচ শুনে না আর দৌরাখ্য্য করে অতএব ইহার উপায় কি
সকলে বিবেচনা করহ রাজা রামনারায়ণ কহিলেন ইহার উপায়
হস্তিনাপুরে অনেক গমন করিয়া এ নবাবকে তগির করিয়া অচ্ছ এক
নবাব না আনিলে এ রাজ্যের কল্যাণ নাই। রাজা রাজবল্লভ কহিলেন

এ পরামর্শ কিছু নয় হস্তিনাপুরের বাদশা জবন তিনি আর এক জন নবাব দিবেন সেও জবন অতএব জবন অধিকারী থাকিলে হিন্দু হিন্দু থাকিবে না এইরূপ কথোপকথন স্থির কিছুই হয় না শেষে এই পরামর্শ হইল যাহাতে [৫৪] জবন দূর হয় তাহার চেষ্টা করহ ইহাতে জগৎসেট কহিলেন এক কাধ্য করহ নবাবের রাজ্য কৃষ্ণচন্দ্র রায় অতিবড় বুদ্ধিমান তাহাকে আনিতে দূত পাঠাও তিনি আইলই যে পরামর্শ হয় তাহাই করিব। সকলে সত্য কহিয়া দূত প্রেরণ করিয়া নিজ স্থানে প্রস্থান করিলেন।—

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় শিবনিবাসের বাটীতে মহাহর্ষে বিশ্রাম করিতেছেন সর্দার আনন্দিৎ পুরবাসীরা সর্বক্ষণ উত্তম কন্ডে নিযুক্ত নানা দেশীয় গুণবান ব্যক্তি আসিয়া রাজসভায় বসিয়া গুণের পরীক্ষা দিতেছেন পণ্ডিতেরা ছাত্র সমভিব্যাহত রাজার নিকটস্থ হইয়া শাস্ত্রের বিচার করিতেছেন এই প্রকার প্রতাহ হইতেছে দ্বিতীয় রাজা বিজয়াদিত্যের ছাত্র সভা সকলেই মহারাজকে প্রশংসা করে দিন২ রাজ্যের বাহুল্য এবং প্রজার বাহুল্য হইতেছে রাজার পাঁচ পুত্র কোন অংশে ক্রটি নাই যাবদীয় লোক স্বর্গে কালক্ষেপণ করিতেছে কিন্তু নবাব স্বাজেরদৌলা অত্যন্ত দুর্বৃত্ত হই [৫৫] যাছে মহারাজ চিন্তাদিত্য আছেন দেশাধিকারী দুঃস্থ কখন কি করে মধ্যে পণ্ডিতেরদিগের প্রতি আজ্ঞা করেন দেখ দেশাধিকারী অতি দুর্বৃত্ত তোমরা সকলে ঈশ্বরের নিকট আরাধনা কর যেন হুঃ অধিকারী এ দেশে না থাকে কিন্তু অতি গোপনে আরাধনা করিবা কদাচ প্রচার না হয় এইরূপে নিজ রাজ্যে বাস করিতেছেন ইতিমধ্যে মুরসিদাবাদ হইতে পত্র লইয়া দূত রাজপুরে উপস্থিত হইল দ্বারী কহিলেক তুমি কে কোথা হইতে আসিলা দূত আশ্বপরিচয় দিয়া কহিল তুমি মহারাজকে সন্বাদ দেহ পরে

যেমন আজ্ঞা করিবেন সেইমত কার্য করি দূতের বাক্যক্রমে দ্বারী মহারাজতক নিবেদন করিল মহারাজ মুরসিদাবাদ হইতে পত্র লইয়া এক দূত আসিয়াছে রাজা দ্বারীর বাক্য শ্রবণ করিয়া আজ্ঞা করিলেন দূতকে তোমার নিকট রাখ পত্র আনহ দ্বারী অতীশীঘ্র গমন করিয়া দূতকে আশ্বস্থানে বসাইয়া পত্র আনিয়া মহারাজকে দিলেক রাজা [৫৬] সভা ত্যাগ করিয়া গোপনে বসিয়া পত্র পাঠ করিয়া যাবদীয় সন্বাদ জ্ঞাত হইলেন বিস্তারিত সমাচার জ্ঞাত হইয়া হর্ষ বিষাদ দুই হইল হর্ষ হইল যাবদীয় পাত্র মিত্র ও প্রধান২ মন্ত্রীরা একজু হইয়াছেন অতএব বৃষ্টি অধিকারের ভাল হইবেক বিষাদ হইল নবাব অতি দুঃস্থ যদি এ সকল কথা প্রকাশ হয় তবে জাতি প্রাণ যাইবেক এইরূপে মনোমধ্যে বিবেচনা করিতে লাগিলেন প্রচার কিছু করিলেন না কোন ভৃত্যকে আজ্ঞা করিয়া দিলেন যে দূত আসিয়াছে তাহাকে হাজার টাকা দেহ আর খাদ্য দ্রব্য যথেষ্ট করিয়া দেহ।—

পরে রজনীতে আশ্বীয়বর্ণের সহিত বসিয়া পাত্রকে আহ্বান করিয়া অতি নির্জন স্থানে বসিয়া সকলকে পত্র জ্ঞাত করাইয়া কহিলেন তোমরা বিবেচনা করহ ইহার কি কণ্ঠ্য নবাবের প্রধান পাত্র লিখিয়াছেন শীঘ্র মুরসিদাবাদে যাইতে এবং নবাবের দৌরাত্ম্যক্রমে সকল প্রধান২ মন্ত্রীরা একজু হইয়া আমাকে আজ্ঞা লিপি লিখিয়াছেন [৫৭] আমি সেস্থানে যাইলে যে হয় বিবেচনা করিবেন অতএব মহতী বিপৎ উপস্থিত ইহার যে সংপরামর্শ তাহা তোমরা কহ সকলেই নিঃশব্দ কাহারো মুখে বাক্য নাই ক্ষণেক পরে পাত্র নিবেদন করিল মহারাজ দেশাধিকারীর বিষয় অতি সাবধানপূর্বক বিবেচনা করিতে হইবেক রাজা কহিলেন কি বিবেচনা করা যায় পাত্র নিবেদন করিল অগ্রে মহারাজ গমন না করিয়া আমি অগ্রে গমন করি সেখানকার সমস্ত প্রকরণ জ্ঞাত হইয়া

ভূতা যেমন নিবেদন লিখিবে সেই রূপ কার্য করিবেন হঠাৎ মহারাজার যাওয়া পরামর্শ হয় না এই কথা পাত্র কহিলে পর আরও মন্ত্রীরা কহিল মহারাজ এই কর্তব্য এই পরামর্শ স্থির করিয়া কিঞ্চিৎ কালের পর পাত্রকে প্রেরিত করিলেন তখন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পাত্র কালীপ্রসাদ সিংহ।—

কালীপ্রসাদ সিংহ মুরসিদাবাদে উপস্থিত হইয়া [৫৮] আশ্বরাজার এক বাটী ছিল সেই স্থানে থাকিয়া মহারাজ মহেন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নিবেদন করিলেন আমারদিগের মহারাজাকে নিকট আসিতে আজ্ঞাপত্র গিয়াছিল পত্র পাইয়া মহারাজ অত্যন্ত দুষ্ট হইয়া আগমনের দিন স্থির করিয়াছিলেন ইতিমধ্যে শারীরিক পীড়া হইয়া অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইলেন এ নিমিত্ত আমাকে নিকটে পাঠাইয়াছেন এবং ভেটের কিঞ্চিৎ দ্রব্যও পাঠাইয়াছেন দৃষ্টি করিতে আজ্ঞা হউক মহারাজ মহেন্দ্র হাঙ্গ করিয়া কহিলেন তুমি অদ্য রজনীতে আসিবে বিশেষ কার্য আছে কালীপ্রসাদ সিংহ নমস্কার করিয়া বিদায় হইয়া স্বস্থানে গেলেন পরে রজনী যোগে মহারাজার বাটীতে আসিয়া মহারাজ মহেন্দ্রকে সন্ধান দেয়াইলেন মহারাজ মহেন্দ্র শ্রবণ করিলেন কালীপ্রসাদ সিংহ আসিয়াছেন আরও যত মহত্ব নিকটে ছিল তাহারদিগকে কহিলেন অত্ন তোমরা স্বস্থানে প্রস্থান কর আমার কিঞ্চিৎ বিশেষ কর্ম আছে আরও যত [৫৯] লোক সভায় ছিল সকলে বিদায় হইয়া গেল পরে কালীপ্রসাদ সিংহকে আনিতে অহুমতি দিলেন কালীপ্রসাদ সিংহ আসিয়া নমস্কার করিয়া নিকটে বসিয়া নিবেদন করিলেন কি জ্ঞে আমার মহারাজাকে আসিতে আজ্ঞাপত্র গিয়াছিল তাহাতে মহারাজ মহেন্দ্র কহিলেন আমারদিগের দেশাধিকারীর প্রকরণ সমস্তই শুনিতেছ এ নবাব থাকিলে কাহার জ্ঞাতি প্রাণ থাকিবেক না অতএব তোমার রাজা অতিবিজ্ঞ

এবং নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত ও অতিবড় বুদ্ধিমান অতএব তাহার সহিত পরামর্শ করিয়া ইহার উপায়ান্তর চেষ্টা পাওয়া যায় এই বাক্য শ্রবণ করিয়া করযোড়ে কালীপ্রসাদ সিংহ নিবেদন করিলেন মহারাজ যে আজ্ঞা করিলেন সকলি প্রমাণ কিন্তু রাজ্যকর্ত্তা অতি দ্রুত নাবধানে এ সকল পরামর্শ করিবেন আমার মহারাজাও সন্দেহ এই চিন্তাতেই চিন্তিত আছেন অতএব নিবেদন করি যদি মহারাজারদিগের সকলের একাবাক্য হইয়াছে তবে অবশ্য ইহার [৬০] উপায় হবেক কিন্তু জ্বন দমন না করিয়া যদি একরূপ দৌরাশ্রয় মত করেন তবে কারু জ্ঞাতি প্রাণ থাকিবে না এবং জ্বন অধিকারী না হইয়া অত্ন কোন দেশীয় মহত্ব দেশাধিকারী হন তাহা হইলে সকল মঙ্গল হবেক মহারাজ মহেন্দ্র উত্তর করিলেন এইরূপ আমারদিগের বাসনা এই নিমিত্তে তোমার রাজাকে আসিতে লিখিয়াছিলাম তিনি শারীরিক পীড়িত হইয়াছেন অতএব তুমি শীঘ্র বিদায় হও যাহাতে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় শীঘ্র এখানে আসিতে পারেন তাহা করিবা আর এ স্থানে গৌণ করিও না। কালীপ্রসাদ সিংহ নিবেদন করিলেন এ স্থানে আসিয়া নবাব সাহেবের সহিত যদি সাক্ষাৎ না করিয়া যাই আর যদি দুষ্ট লোকে নবাব গোচরে সমাচার কহে তবে নবাবের উন্মাদ হইবেক আর নবাবের আজ্ঞা ব্যতিরেক এ সহরে আমার মহারাজ আসিতে পারেন না অতএব নিবেদন করি আমাকে নবাব সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করান [৬১] আমি নবাবের গোচরে নিবেদন করিব আমার মহারাজার একবার শ্রীমুখের সহিত সাক্ষাৎ করিতে নিতান্ত বাসনা এবং আরও যে বিশেষ নিবেদন আছে তাহা সাক্ষাতে নিবেদন করেন এইরূপ কহিয়া নবাব সাহেবের মত করিয়া শেষে মহারাজ এখানে আইলে ভাল হয় মহাশয় কর্ত্তা ইহাতে যেমত আজ্ঞা করেন তাহাই করি মহারাজ মহেন্দ্র শুনিয়া কহিলেন উত্তম কহিয়াছ কল্যা

তোমাকে নবাব সাহেবের গোচরে লইয়া যাইব তুমি অতিপ্রাতে প্রস্তুত হইয়া আমার নিকট আসিবা কালীপ্রসাদ সিংহ নমস্কার করিয়া বাসায় বিদায় হইলেন।

পরে কালীপ্রসাদ সিংহ ডেটের নানা জাতীয় আয়োজন করিলেন প্রাতে ডেটের সামগ্রী লইয়া মহারাজার বাটীতে উপস্থিত হইলেন মহারাজ মহেন্দ্রের চতুর্দাল প্রস্তুত হইল কিঞ্চিৎ পরে মহারাজ মহেন্দ্র এবং কালীপ্রসাদ সিংহ নবাব সাহেবের দ্বারে উপস্থিত হইয়া অগ্রে মহারাজা [৬২] মহেন্দ্র নবাবের গোচরে গেলেন যেমন নিয়ম আছে সেইমত নমস্কার করিয়া নবাব সাহেবের সভাতে কণ্ঠক বসিলেন পরে নবাব সাহেবকে নিবেদন করিলেন নবদ্বীপের রাজা আত্মপাত্রকে প্রেরিত করিয়াছে এবং কিঞ্চিৎ ডেটের দ্রব্য পাঠাইয়াছে আজ্ঞা হইলেই নিকটে আইসে নবাব সাহেব কণ্ঠক থাকিয়া কহিলেন আসিতে বল এক জন ভৃত্য গিয়া কালীপ্রসাদ সিংহকে নবাব সাহেবের গোচরে আনিল কালীপ্রসাদ সিংহ সহস্র ২ নমস্কার করিয়া ডেট দিয়া নিবেদন করিলেন অনেক দিবস আমার রাজা সাহেবকে দর্শন করেন নাই এবং আত্মনিবেদন আছে তাহাও গোচর করেন নাই যদি অগ্রহ করিয়া আজ্ঞা করেন তবে দর্শন করিয়া যে আত্মনিবেদন তাহা করেন নবাব এ সকল বাক্য শ্রবণ না করিয়া মহারাজার প্রতি দৃষ্টি করিলেন তখন মহারাজ মহেন্দ্র করপুটে নিবেদন করিলেন যদি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় আসিবার [৬৩] কারণ নিবেদন করিয়া পাঠাইয়াছে ইহাতে আসিতে আজ্ঞা হইলে ভাল হয় তখন নবাব সাহেব আজ্ঞা করিলেন ভাল রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে আমার নিকট আসিতে আজ্ঞাপত্র দেহ এই বাক্যের পর কালীপ্রসাদ সিংহ অনেক ২ নমস্কার করিয়া নবাব সাহেবের নিকট হইতে যেখানে মহারাজা রাজকর্ম করেন সেই স্থানে আসিয়া বসিলেন কিঞ্চিৎ পরে

মহারাজ মহেন্দ্র উপস্থিত হইয়া নবাবের অহুমতি লিপি দিয়া কালীপ্রসাদ সিংহকে বিদায় করিলেন।—

পরে কালীপ্রসাদ সিংহ শিবনিবাসে আসিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন রাজা বিরলে গিয়া পাত্রকে আস্থান করিয়া কহিলেন মুরসিদাবাদের যাবদীয় সংবাদ বিস্তার করিয়া কহ কালীপ্রসাদ সিংহ বিস্তারিত করিয়া সমস্ত নিবেদন করিল তিনি সমস্ত সমাচার জ্ঞাত হইয়া আত্মপাত্রকে অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া রাজপ্রসাদ দিয়া যথেষ্ট সম্মান করিয়া আজ্ঞা [৬৪] করিলেন ভাল দিবস স্থির করহ রাজধানীতে যাইব কিঞ্চিৎ গোণে শুভক্ষেণে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় উত্তম ২ ময়ী লইয়া মুরসিদাবাদে উপস্থিত হইলেন কিঞ্চিৎ পরে নবাবের যাবদীয় প্রধান ২ পাত্র মিত্রগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন সকলের সহিত সাক্ষাৎ হইলেই নবাবের দ্বারে উপনীত হইয়া সখাদ দিলেন। নবাব সাহেব শুনিয়া আজ্ঞা করিলেন আসিতে কহ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় নানাবিধ ডেটের দ্রব্য দিয়া পাঠাইয়া রহিলেন ডেটের সামগ্রী নবাব সাহেব দৃষ্টি করিয়া তুষ্ট হইয়া বসিতে আজ্ঞা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন শারীরিক ভাল আছে রাজা করপুটে নিবেদন করিলেন সাহেবের প্রসাদ ২ সকল মঙ্গল এবং শারীরিকও মঙ্গল এইরূপ অনেক শিষ্টাচার গেল কণ্ঠক বসিয়া রাজা নিবেদন করিলেন যদি আজ্ঞা হয় তবে বাসায় যাই অনেক ২ নিবেদন আছে পশ্চাৎ গোচর করিব নবাব অহুমতি দিলেন। এ দিবস [৬৫] রাজা বাসায় আসিয়া মহারাজ মহেন্দ্র ও রাজা রামনারায়ণ ও রাজা রাজবল্লভ এবং জগৎসেট ও মীর জাকরালি থা ইহারদিগের নিকট মহত প্রেরণ করিলেন আমি সাক্ষাৎ করিতে যাইব সকলেই অহুমতি করিলেন রাজে আসিতে কহিও ক্রমে ২ রাজা সকলের নিকট রাখে গমন করিয়া আত্মনিবেদন

করিলেন। পরে জগৎসেট কহিলেন এ দেশের অত্যন্ত অপ্রভুল হইল দেশাধিকারী অতিভরস্ব কাক বাক্য শুনে না দিন২ দৌরাণ্য অধিক হইতেছে অতএব সকলে একবাক্যতা হইয়া বিবেচনা না করিলে কাহার নিরুত্তি নাই এই কথার পর রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কহিলেন আপনারা রাজঘারের কর্ত্তা আমরা আপনকারদিগের মতাবলম্বী যেমন২ কহিবেন সেইরূপ কার্য করিব ইহাই শুনিয়া জগৎসেট কহিলেন অদ্য বাসায় ঘাউন আমি মহারাজা মহেন্দ্রের সহিত পরামর্শ করিয়া নিভৃত এক স্থানে বসিয়া আপনকাকে [৬৬] ডাকাইব সে দিবস বিদায় হইয়া রাজা বাসায় আসিলেন পরে এক দিবস জগৎসেটের বাটীতে রাজা মহেন্দ্র প্রভৃতি সকলে বসিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে আস্থান করিলেন দূত আসিয়া রাজাকে লইয়া গেল যথাযোগ্য স্থানে সকলে বসিলেন। ক্ষণেক পরে রাজা রামনারায়ণ প্রশ্ন করিলেন আপনারা সকলেই বিবেচনা করুন দেশাধিকারী অতিশয় দুর্বৃত্ত উত্তর২ দৌরাণ্যের বুদ্ধি হইতেছে অতএব কি করা যায় এই কথার পর মহারাজা মহেন্দ্র কহিলেন আমরা পুরুষাত্মক্রেম নবাবের চাকর যদি আমারদিগের হইতে কোন ক্ষতি নবাব সাহেবের হয় তবে অধর্ম এবং অধ্যাত্মিক অতএব আমি কোন মন্দ কর্মের মধ্যে থাকিব না তবে যে পূর্বে এক আশ বাক্য কহিয়াছিলাম সে বড় উদ্যোগযুক্ত এইক্ষেণে বিবেচনা করিলাম এসব কার্য ভাল নয় এই কথার পর রাজা রামনারায়ণ ও রাজা রাজবল্লভ এবং জগৎসেট ও মীর জাফরালি খাঁ কহিলেন যদিও আপনি এ পরামর্শ [৬৭] হইতে ক্ষান্ত হইলেন কিন্তু দেশ রক্ষা পায় না এবং ভদ্র লোকের জাতি প্রাণ থাকা ভার হইল। অনেক২ রূপ কহিতে মহারাজা মহেন্দ্র কহিলেন তোমরা কি প্রকার করিয়া তখন রাজা রামনারায়ণ কহিলেন পূর্বে

এ কথার প্রস্তাব এক দিবস হইয়াছিল তাহাতে সকলে কহিয়াছিলেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় অতিবড় মন্ত্রী তাহাকে আনাইয়া জিজ্ঞাসা করা যাউক তিনি যেমন২ পরামর্শ দিবেন সেইমত কার্য করিব এখন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় এই মাগাতে আছেন ইহাকে জিজ্ঞাসা করুন যে২ পরামর্শ কহেন তাহাই শ্রবণ করিয়া যে হয় পশ্চাৎ করিবেন। ইহার পর রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি সকলি জ্ঞাত হইয়াছ এখন কি কর্ত্তব্য। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় হাস্য করিয়া নিবেদন করিলেন মহাশয়েরা সকলেই প্রধান মহত্ব আপনকারা আমাকে অহুমতি করিতেছেন পরামর্শ দিতে এ বড় আশ্চর্য্য সে যে হউক আমি নিবেদন করি তাহা শ্রবণ করুন আমার [৬৮]দিগের দেশাধিকারী যিনি ইনি জবন ইহার দৌরাণ্যক্রমে আপনারা বাস্তব হইয়া উপায়াস্তর চিন্তা করিতেছেন। সমভিব্যাহৃত মীর জাফরালি খাঁ সাহেব ইনিও জ্ঞাতে জবন অতএব আমার আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। এই কথার পর সকলে হাস্য করিয়া কহিলেন হাঁ ইনি জবন বটেন কিন্তু ইহার প্রকৃতি অতিউত্তম আপনি ইহাকে সন্দেহ করিবেন না পশ্চাৎ কৃষ্ণচন্দ্র রায় নিবেদন করিলেন এ দেশের উপর বৃষ্টি ঈশ্বরের নিগ্রহ হইয়াছে নতুবা এককালীন এত হয় না প্রথম যিনি দেশাধিকারী ইহার সর্বদা পরানিষ্ট চিন্তা এবং যোগানে শুনেন হুম্মরী জী আছে তাহা বলক্রমে গ্রহণ করেন এবং কিঞ্চিৎ অপরাধে জাতি প্রাণ নষ্ট করেন দ্বিতীয় বরগী আসিয়া লুট করে তাহাতে মনোযোগ নাই তৃতীয় সন্যাসী আসিয়া যাহার উত্তম ঘর দেখে তাহাই ভাঙ্গিয়া কাঠ করে তাহা কেহ নিবারণ করে না অশেষ প্রকার এ দেশে উৎপাত হইয়াছে অতএব [৬৯] দেশের কর্ত্তা জবন থাকিলে কাহার ধর্ম থাকিবে না এবং জাতিও থাকিবে না অতএব ঈশ্বরের নিগ্রহ না হইলে এত উৎপাত

হয় না আমি একারণ অনেক বিশিষ্ট লোককে কহিয়াছি তোমরা সকলে ঈশ্বরের আরাধনা বিশিষ্টরূপে কর যেন আর উৎপাত না হয় এবং জ্বন অধিকারী না থাকে আশ্রয় জাতি ধর্ম রক্ষা পায় এইরূপ ব্যবহার আমি সর্বদাই করিতেছি অতএব নিবেদন করি ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন নষ্ট করিবেন না কিন্তু এক স্থপারামর্শ আছে আমি নিবেদন করি যদি সকলের পরামর্শ সিদ্ধ হয় তবে তাহার চেষ্টা পাঠিতে পারি। তখন সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন কি পরামর্শ কহ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কহিলেন, সকলে মনোযোগ করিয়া শ্রবণ করুন।

এ দেশের অধিকারী সর্বপ্রকারে উত্তম হন এবং অল্প জাতি ও এ দেশীয় না হন তবেই মঙ্গল হয়। জগৎসেট প্রভৃতি কহিলেন এমন কে তাহা বিস্তারিয়া কহ রাজা কহিলেন বিলাতে নিবাস [৭০] জাতে ইন্দুরাজ কলিকাতায় কোঠি করিয়া আছেন যদি তাহারা এ রাজ্যের রাজা হন তবে সকল মঙ্গল হবেক। ইহা শুনিয়া সকলেই কহিলেন তাহারদিগের কিং গুণ আছে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কহিলেন তাহারদিগের গুণ এইঃ সকল সত্যবাদী জিতেদ্রিয় পরহিংসা করেন না যোদ্ধা অতিবড় প্রজাপ্রতি যথেষ্ট দয়া এবং অত্যন্ত কমতাপন্ন বুদ্ধিতে বৃহস্পতির গ্রাহ ধনেতে কুবের তুলা দার্শনিক এবং অজ্ঞানের গ্রাহ পরাক্রম প্রজ্ঞা পালনে সাক্ষ্য যুগিষ্ঠির এবং সকলে ঐক্যতাপন্ন শিষ্টের পালন ছুটের দমন রাজার সকল গুণ তাহারদিগের আছে অতএব যদি তাহারা এ দেশাধিকারী হন তবে সকলের নিস্তার নতুবা জ্বনে সকল নষ্ট করিবেক। এই কথা পর জগৎসেট কহিলেন তাহারা উত্তম বটেন তাহা আমি জ্ঞাত আছি কিন্তু তাহারদিগের বাক্য আমরাও বুঝিতে পারি না ও আমারদিগের বাক্য তাহারাও বুঝিতে পারেন না ইহার পর রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় [৭১] কহিলেন এখন তাহারা কলিকাতায় কোঠি

করিয়া বাসিয়া করিতেছেন সেই কলিকাতার দক্ষিণে কালীঘাট নামে এক স্থান আছে তাহাতে কালীঠাকুরাণী আছেন আমি মধ্যে কালীপূজার কারণ গিয়া থাকি সেই কালে কলিকাতার কোঠির যিনি বড় সাহেব তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া থাকি ইহাতেই তাহার চরিত্র আমি সমস্তই জ্ঞাত আছি। এই কথা পর রাজা রামনারায়ণ কহিলেন আপনি মধ্যে কলিকাতার কোঠির বড় সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন কিন্তু তাহার বাক্য কি প্রকারে আপনি বুঝেন আর আপনকার কথা তিনি বা কি প্রকারে জ্ঞাত হন। এই কথা উত্তর রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কহিলেন কলিকাতায় অনেক বিশিষ্ট লোকের বসতি আছে তাহারা সকলে ইন্দুরাজী ভাষা অভ্যাস করিয়াছেন এবং সেই সকল বিশিষ্ট মহাশয় সাহেবের চাকর আছেন তাহারা ইহা বুঝাইয়া দেন। ইহা শুনিয়া সকলে কহিলেন ইহারা এ দেশের কর্তা হইলে সকল [৭২] রক্ষা পায় অতএব আপনি কলিকাতায় গমন করিয়া যে সকল কথা উপস্থিত হইল এই সকল বৃত্তান্ত কোঠির বড় সাহেবের নিকট জ্ঞাত করা ইবা তিনি যেমন কহেন বিস্তারিত আমারদের কহিবা এবং তিনি প্রতিজ্ঞা করিবেন তাহারা দেশাধিকারী হইলে আমারদিগের এ রাজ্যের প্রতুল করিবেন আর এখন যে কার্য আমারদিগের আছে ইহাতেই রাখিবেন। এই কথা পর রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কহিলেন তাহারা দেশাধিকারী হইবেন রাজ্যের প্রতুল রাখিলেই রাজ্যের প্রতুল হয় আমাদের এ কথা কহেন আবশ্যক নাই তবে যে কথা কহিলেন আপনারদিগের যে কার্য আছে ইহাতেই নিযুক্ত রাখিবেন তাহার কোন সন্দেহ মহাশয়েরা করিবেন না তাহারদিগের রাজ্য হইলেই স্বাধীন সকল লোক হইবেক কিন্তু আপনারা আমাকে নিতান্ত স্থির করিয়া আজ্ঞা করুন। পরে সকলেই কহিলেন এই স্থির হইল আপনি কলিকাতায় গমন করুন ইহা বলিয়া [৭৩]

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে বিদায় করিয়া সকলে স্বপ্ন স্থানে প্রস্থান করিলেন।—

পর দিবস রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় নবাব সাহেবের নিকট আশ্রয়াজ্ঞার অপ্রতুল নিবেদন করিয়া রাজধানীতে বিদায় হইয়া নিজ রাজ্যে প্রস্থান করিলেন পরে শিবনিবাসের বাটীতে উপনীত হইলেন। রাজা যাবদীয় পাত্র মিত্রগণকে আজ্ঞা করিলেন আমি একবার কালীঘাটে যাইব তোমরা প্রস্তুত হও সকলে যে আজ্ঞা বলিয়া রাজসভা হইতে আশ্রয় স্থানে আসিয়া রাজার গমনের আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন কিঞ্চিৎ গৌণে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় পাত্রকে সঙ্গে করিয়া কালীঘাটে আসিলেন কিঞ্চিৎ কাল পরে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কোঠির বড় সাহেবের নিকট আপন পাত্রকে পাঠাইলেন আর কহিলেন তুমি সাহেবকে নিবেদন কর গিয়া আমি কল্যা সাফাং করিতে যাইব। রাজার পাত্র আসিয়া সাহেবের [৭৪] সহিত সাফাং করিয়া নিবেদন করিলেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় কালীঘাটে আসিয়াছেন এখন বাসনা সাহেবের সহিত সাফাং করেন। সাহেব আজ্ঞা করিলেন আসিতে কহ সাহেবের আজ্ঞা পাইয়া পাত্র রাজাকে সমভিযাহুত করিয়া পর দিবস সাহেবের নিকট আনিলেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় সাহেবের সহিত সাফাং করিবা মাত্র সাহেব যথেষ্ট মর্যাদা করিয়া বসিতে সিংহাসন দিলেন রাজা ও সাহেব ছই জন সিংহাসনে বসিয়া অনেক হস্ত পরিহাস্ত করিলেন এবং রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় অনেক শিষ্টাচার করিলেন সাহেবের প্রধান যে চাকর তিনি উভয়েরি বাক্য বুঝাইয়া জ্ঞাত করাইতে লাগিলেন অনেক কথার পর রাজা কহিলেন আমার কিঞ্চিৎ বিশেষ নিবেদন আছে সাহেব কহিলেন কি নিবেদন রাজা মুরসিদাবাদের বৃত্তান্ত সমস্ত জ্ঞাত করাইলেন আর কহিলেন এ

রাজ্য আপনারা রক্ষা না করিলে যাবদীয় লোক অত্যন্ত ব্যামোহ পায় [৭৫] এবং জবন অধিকারী থাকিলে সকল দেশ নষ্ট হয় এই কারণ নবাবের প্রধানত পাত্র মিত্রগণ আপনকার নিকটে আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন সকল বৃত্তান্ত সাহেব শ্রবণ করিয়া আশ্বাস দিয়া কহিলেন আমি এ সংবাদ বিলাতে লিপি সেখানকার আজ্ঞা আনিয়া পশ্চাৎ যুদ্ধ করিয়া এ দেশ করতলে আনিয়া সকল মনুষ্যকে পরম স্বখে রাখিব তুমি এই সমাচার নবাবের পাত্রমিত্রগণকে লিখহ এবং যথেষ্ট আশ্বাস করিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে বিদায় করিয়া সাহেব সকল বৃত্তান্ত বিলাতে লিখিলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় শিবনিবাসের বাটীতে উপস্থিত হইয়া সকল বিস্তারিত নবাব সাহেবের প্রধানত পাত্রকে জ্ঞাত করাইলেন সকলে শ্রবণ করিয়া দ্বষ্ট হইলেন।—

দৈবের ঘটনাক্রমে নবাবের বিপদ উপস্থিত হইল তাহার বৃত্তান্ত এই।—

ইঙ্গরাজের বাণিজ্যের কোঠি অনেক গ্রামে ছিল যে জিনিষের যে রাজকর নিয়ম ছিল সেই মত [৭৬] নবাব সাহেব পাইতেন। নবাব শ্রাজেরদৌলার অন্তঃকরণে করিলেন ইঙ্গরাজেরা ব্যাপার বাণিজ্য অতিবিস্তার করিতে লাগিলেন অতএব আমি এখন অধিক রাজকর লইব ইহাই মনোমধ্যে বিবেচনা করিয়া প্রধানত পাত্রগণকে আজ্ঞা করিলেন সর্বত্র সন্ধান লিখহ যেখানে ইঙ্গরাজের বাণিজ্যের কোঠি আছে সেইখানে আমার যৎ চাকরেরা রাজকরের কারণ আছে তাহারদিগের উপর এই লিখহ যে সব নিয়ম আছে তাহা অপেক্ষা রাজকর অধিক লয় ইহা শুনিয়া পাত্র কহিলেন ইঙ্গরাজ সাহেবেরা বিদেশী মহাজন এ দেশে অনেক কালাবধি ব্যাপার বাণিজ্য করেন নিয়মিত রাজকর বরাবর দেন কখন অধিক দেন নাই এখন আপনি অধিক লইবেন এ উত্তম পরামর্শ

হয় না তবে মহাশয় কর্ত্তা যেমত আজ্ঞা হয় এই কথায় যাবদীয় প্রধান পাত্র মিত্রগণ সকলেই কহিলেন মহারাজ মহেন্দ্র যে কহিলেন এই উত্তম আদ্যোপান্ত যে হইয়া আসিতেছে [৭৭] এখন তাহাতে ব্যতিক্রম করা ভাল নহে। পাত্রমিত্রগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া নবাব উন্মাদিত হইয়া কহিলেন তোমরা আমার চাকর আমি যেমন কহিব সেই মত কার্য্য করিবা তোমারদিগের বিবেচনায় কি করে পুনরায় যদি এ বিষয়েতে কেহ বাক্য কহ তবে তাহার যথেষ্ট শাস্তি করিব সকলে নিশ্চয় হইলেন পরে আজ্ঞা প্রমাণ যেখানে কোঠি ছিল সেইস্থানের আশ্রয়চাকরের প্রতি লিপি লিখিলেন অজ্ঞাবধি ইঙ্গরাজ সাহেব লোকেরা বাণিজ্য যে করিতেছেন তাহারদিগকে করের যে নিয়ম ছিল তাহা অপেক্ষা রাজকর অধিক লইবা। এই সমাচার পাইয়া নবাবের চাকর লোকেরা কোঠির চাকরেরদিগের স্থানে অধিক রাজকর লইতে উজ্জত হইল কোঠির চাকর সমস্ত কলিকাতার কোঠির বড় সাহেবকে বিস্তারিত সমাচার লিখিলেন সাহেব সর্ব্বত্রের পত্র পাইয়া সংবাদ জ্ঞাত হইলেন।—

এই সময়ে নবাব সাহেব রাজা রাজবল্লভের উপর [৭৮] কোন কার্য্যের কারণ উন্মাদিত হইলেন কিন্তু বাহ্যে প্রকাশ করেন নাই। রাজা রাজবল্লভ আপন পুত্র কৃষ্ণদাসের সহিত গোপনে বিবেচনা করিলেন যে নবাব সাহেব আমারদিগের উপর উন্মাদ করিয়াছেন অতএব যদি আমরা এখানে থাকি তবে জাতি প্রাণ ও ধন সকল যাবেক অতএব এই সময় সপরিবারে পলায়ন করি। রাজা কৃষ্ণদাস কহিলেন নবাবের সাংখ্যাতে থাকিলে এ সকলি সারিবে কিন্তু পলায়ন করিয়া কোথায় যাইব সকল দেশ নবাবের। রাজা রাজবল্লভ কহিলেন চল কলিকাতায় যাই সে স্থান নবাবের অধিকার নহে ইঙ্গরাজ সাহেবেরদিগের

অধিকার এবং তাহারদিগের শ্রুণ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় বিস্তারিত কহিয়াছেন তাহাতে আমি জ্ঞাত আছি তাহারা শরণাগত জনকে ত্যাগ করেন না অতএব কলিকাতায় গমন করা পরামর্শ নতুবা সকল নষ্ট হবেক এই স্থির করিয়া সপরিবারে পলায়ন করিয়া রাজা রাজবল্লভ কলিকাতায় আসিয়া [৭৯] কোঠির বড় সাহেবের শরণ লইয়া বিস্তারিত নিবেদন করিলেন কোঠির সাহেব আশ্বাস করিয়া বলিলেন তোমারদিগের কোন চিন্তা নাই তুমি কলিকাতায় থাকহ ইহাই বলিয়া আপনার প্রধান চাকরকে কহিয়া দিলেন রাজা রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাস দুই জনে নবাবের শ্রদ্ধায় পলায়ন করিয়া আমার শরণ লইয়াছে তুমি যথেষ্ট আশ্বাস দিয়া উত্তম এক স্থানে রাখহ। সাহেবের আজ্ঞা মতে প্রধান চাকর উত্তম স্থানে রাখিলেন।—

কিছুকাল গোপে নবাব স্নানোদ্যানে শ্রবণ করিলেন যে রাজা রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাস সপরিবারে পলায়ন করিয়া কলিকাতায় গিয়া রহিয়াছে শুনিবামাত্র অতিক্রোধিত হইয়া মহারাজ মহেন্দ্রকে আজ্ঞা করিলেন কলিকাতার কোঠির বড় সাহেবকে এক পত্র লিখ যে আমার চাকর রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাস এখান হইতে পলায়ন করিয়া আপনকার নিকটে আছে তাহারদিগের দুই জনকে বন্দন করিয়া আমার নিকট শীঘ্র [৮০] পাঠাইবে মহারাজ মহেন্দ্র নবাব সাহেবের আজ্ঞা শুনিয়া নিশ্চয়ে রহিলেন ক্ষণেকের পর নিবেদন করিলেন যে আজ্ঞা তাহাই লিখিতেছি কিন্তু এক নিবেদন আছে নবাব কহিলেন কি কলিকাতার কোঠির যে বড় সাহেব আছে তাহারদিগের জ্ঞাতের এক নিয়ম আছে যদি কেহ শরণাগত হয় তার জন্মে আপনার প্রাণ দিলেও যদি সে রক্ষা পায় তাহাও করেন এ কেবল তাহারদিগের নিয়ম নহে সকলেরি শাস্ত্রে এই মত আছে শরণাগত রক্ষা করিলে ধর্ম্ম মার শরণাগত ত্যাগ

করিলে অর্থ কিন্তু বিশেষ তাঁহারদিগের পণ প্রাণ থাকিতে শরণাগত জাগ করেন না অতএব নিবেদন করি কিঞ্চিৎ কালের জন্তে রাজবল্লভ কলিকাতায় থাকুক পশ্চাৎ কৌশলক্রমে আমি তাহাকে আনিতেছি হঠাৎ এমত লিখন যদি আপনি লিখেন আর কোঠির সাহেব রাজবল্লভকে ত্যাগ না করেন তবেই বিবাদ উপস্থিত হইবেক তাহাতে যে রূপ [৮১] কার্য করিতে আজ্ঞা করেন সেইমত কার্য করি। নবাব তুনিয়া অধিক ক্রোধ করিয়া কহিলেন এখনি কোঠির সাহেবকে লিখহ। পরে মহারাজ মহেন্দ্র মুন্সি লোককে পত্র লিখিতে আজ্ঞা করিয়া দিলেন পত্রের বিবরণ এই।—

আশ্বমদ্বল সংবাদ লিখিয়া লিখিলেন আমার চাকর রাজা রাজবল্লভ ও রাজা কৃষ্ণদাস এখান হইতে পলায়ন করিয়া আপনকার নিকটে রহিয়াছে অতএব ভাইজী তাহারদিগের দুই জনকে বন্দন করিয়া শীঘ্র আমার নিকট পাঠাইবেন ইহাতে কদাচ অস্বাস্থ্য করিবেন না এইমত পত্র লিখিয়া কলিকাতায় পাঠাইলেন কোঠির বড় সাহেব লিপি পাইয়া আপন প্রধান পাত্র মিত্রগণকে আহ্বান করিয়া পত্র দেখাইলেন চাকরেরা পত্র জ্ঞাত হইয়া সাহেবকে পত্রের অর্থ জ্ঞাত করাইলেন পত্রের অর্থ তুনিয়া সাহেব হস্ত করিয়া আশ্বচাকরকে আজ্ঞা করিলেন পত্রের উত্তর [৮২] লিখহ। নবাব সাহেবকে কলিকাতার কোঠির বড় সাহেব উত্তর লিখিলেন তাহার বিবরণ এই।—

আশ্বমদ্বল সমাচার লিখিয়া লিখিলেন ভাই সাহেবের এক পত্র পাইয়া পরম হুগ্ধ হইয়া সমাচার জ্ঞাত হইলাম। আপনকার চাকর রাজা রাজবল্লভ ও রাজা কৃষ্ণদাস দুই জন পলায়ন করিয়া আমার শরণাপন্ন হইয়াছে তাহার কারণ এই ভাই সাহেবের সঙ্গে আমার যথেষ্ট প্রণয় আছে আমার নিকট থাকিলে ইহার ভয় হইতে মুক্ত হইবেক

অতএব এ ক্ষুদ্র লোক ইহার প্রতি আপনকার ক্রোধ সে কেমন যেমন মেঘের উপর সিংহের পথক্রম অতএব আপনি এ দেশাধিকারী সকলের উপর রূপাবলোকন করিয়া পালন করিতে উচিত হয়। ইহাতে যত্বপূর্ণ অল্প অপরোধে চাকরেরদিগের উপর নিগ্রহ করেন তবে কর্তব্য মহিমার ক্রটি হয় আর লিখিয়াছেন দুই জনকে বন্দন করিয়া শীঘ্র পাঠাইতে এ বড় আশ্চর্য্য বাক্য শরণাগত জনকে ত্যাগ [৮৩] করিতে সর্ব শাস্ত্রে নিষেধ এবং আমারদিগের শাস্ত্রে ও ব্যবহারে যথেষ্ট মন্দ অতএব কিঞ্চিৎ কালের জন্তে আপনি ব্যস্ত হইবেন না আমি কৌশলক্রমে রাজবল্লভকে নিকট পাঠাইব। আর আমারদিগের বাণিজ্য এ দেশে অনেক কালাবধি আছে তাহাতে রাজকরের যে নিয়ম আছে তাহা এখন দিতেছি হঠাৎ আপনকার চাকরেরা অধিক লইতে চাহে এ বিষয় আপনি আশ্বলোকেরদিগকে বারণ করিয়া দিবেন যেন অধিক না চাহে।

নবাব সাহেব কোঠিবু সাহেবের পত্রের উত্তর জ্ঞাত হইয়া পাত্র মিত্রগণকে আজ্ঞা করিলেন কলিকাতার কোঠির সাহেব যে উত্তর লিখিয়াছেন তাহার শীঘ্র প্রত্যুত্তর লিখহ পাত্র আজ্ঞামতে পত্র লিখিলেন তাহার বিবরণ এই।—

আশ্বমদ্বল লিখিয়া লিখিলেন ভাইজীর প্রত্যুত্তর পত্র পাইয়া সংবাদ জ্ঞাত হইলাম লিখিয়াছেন রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাস দুই জন পলায়ন করিয়া আপনকার শরণাগত হইয়াছে অতএব [৮৪] শরণাগত ব্যক্তিকে ত্যাগ করণে যথেষ্ট অর্থ সে প্রমাণ বটে কিন্তু রাজাজ্ঞা পরিত্যাগ কল্পিলেও অর্থ আছে আর আপনি বিদেশী তাহাতে মহাজন দেশাধিকারীর সহিত বিবাদ হয় এমত কার্য করা উচিত নহে অতএব আমি এ দেশের অধিকারী আমার বাক্যে যদ্যপি নিষেধ ভঙ্গ হয় তাহাও পণ্ডিতের

কর্তব্য আপনকার সহিত যথেষ্ট প্রণয় আছে বাহাতে প্রণয় ভঙ্গ না হয় এমত করিবেন আর লিখিয়াছেন আপনকার কোঠি যেখানেই সেই স্থানে আমার লোকে অধিক রাজকর লইতে উদ্যত হইয়াছে তাহার কারণ এই পূর্বে যখন আপনারা এ দেশে কোঠি করিলেন তখন অল্পই সামগ্রীর বাণিজ্য করিতেন এখন অতিশয় দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় করিতেছেন অতএব ইহাতে কিরূপে পূর্বের মত রাজকর থাকে এবং সওদাগরেরদিগেরও এই ধর্ম যদি অধিক বাণিজ্য হয় তবে যে দেশাধিকারী থাকে তাহাকেও কিঞ্চিৎ অধিক দেয় সে যে হউক। এখন [৮৫] রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাসকে শীঘ্র এখানে পাঠাইবেন এবং যেখানেই আপনকার কোঠি আছে সেই কোঠিতে সমাচার লিখিবেন অধিক রাজকর দেয় বরং এখন যে হারে রাজকর দিবেন এইমত চিরকাল থাকিবেন এইরূপ পত্র লিখিয়া কলিকাতায় পাঠাইলেন দূত আসিয়া কোঠির বড় সাহেবকে পত্র দিলেক কোঠির বড় সাহেব পত্র জ্ঞাত হইয়া পুনরায় উত্তর লিখিলেন তাহার বিবরণ এই।—

আপন মঙ্গল ও শিষ্টাচারের পর লিখিলেন নবাব ভাইজাঁউ সাহেবের পত্র পাইয়া সকল সংবাদ জ্ঞাত হইলাম রাজা রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাসের কারণ পুনঃ লিখিতেছেন আর লিখিয়াছেন যে দেশাধিকারীর বাক্যে নিয়ম ভঙ্গ করিতে পারে এবং রাজাজ্ঞা লঙ্ঘনে পাপ আছে সেও প্রমাণ বটে কিন্তু আশ্বয় শাস্ত্রমতে এই হয় যে শরণাগত জনের কারণ প্রাণ দিবেক তথাপি তাহাকে ত্যাগ করিবে না অতএব দেশাধিকারী ব্যতিরেক অল্প কেহ প্রাণ দণ্ড করিতে পারে [৮৬] না তুল্যাতুল্য হইলেই প্রাণের শঙ্কা কিন্তু শরণাগতের কারণ সে শঙ্কা করিবে না তাহার প্রমাণ অনেক শাস্ত্রে আছে সমান জনের সহিত শরণাগতের কারণ বিবাদ হইলে প্রাণ যাওনের কারণ কি অতএব

যেখানে প্রাণপণ সেখানে শরণাগতের জন্মে যদি দেশাধিকারীর সহিত বিবাদ হয় তাহাও স্বীকার করিবে তাহাতে যত্নপি প্রাণ যায় তথাপি ধর্ম এবং যে নিয়ম আছে তাহাও রক্ষা হবে অতএব আপনকার নিকট উত্তমং পণ্ডিত আছে তাহারদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন যদি তাহারদিগের ব্যবস্থাতে শরণাগতকে ত্যাগ করা যায় তবে আমি ত্যাগ করিব আর এ রাজ্য পূর্বে হিন্দু লোকেরদিগের ছিল আপনকার নিকটে অনেক হিন্দু চাকর আছে তাহারা অবশ্য আপনঃ শাস্ত্র জ্ঞাত আছে দেখ অতিপূর্বে দণ্ডী নামে এক রাজা ছিলেন সর্বদা যুগয়া করিতেন এক দিবস দণ্ডী রাজা যুগয়াতে গমন করিলেন এক বনের মধ্যে গমন [৮৭] করিয়া যুগয়া করিতেছেন ইতিমধ্যে এক অশ্বিনী দেখিলেন অত্যন্ত চক্লগতি এবং আশ্চর্য্য মূর্ত্তি অশ্বিনীকে দেখিয়া রাজা অতিশয় দ্বষ্ট হইয়া সকল সৈন্যকে কহিলেন এই অশ্বিনীকে ধর। রাজাজ্ঞা পাইয়া সকল সৈন্য অশ্বিনীকে ধরিলেক দণ্ডী রাজা অশ্বিনীকে লইয়া আশ্রয়াজ্যে আসিলেন। অশ্বিনী দিবসে ঘোটকী রাজ্যে এক অপূর্ণা স্তম্ভরী কচ্ছা হয় ইহাতে দণ্ডী রাজার বড় আশ্চর্য্য বোধ হইল এইরূপে কিছু কাল যায় এক দিবস রাজনীতে সেই কচ্ছাকে দণ্ডী রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কে আমাকে সত্য কহ তখন সেই কচ্ছা কহিলেন আমি স্বর্গের নৃত্যকী ছিলাম এক দিবস ইন্দ্রের নিকটে নৃত্য করিতেছি অম্মমনস্ক হইলাম ইহাতেই তাল ভঙ্গ হইল তাল ভঙ্গ হওনে ইন্দ্র উদ্য করিয়া কহিলেন যেমন তুমি মন্দ নৃত্য করিলা অতএব অশ্বিনী হইয়া সর্বদা বনমধ্যে নৃত্য কর গিয়া। পরে আমি ইন্দ্রকে বহুবিধ শুব করিলাম পরে ইন্দ্র কিঞ্চিৎ ভূষ্ট হইয়া [৮৮] কহিলেন তুমি রাজনীতে কচ্ছা হইবা। এবং দণ্ডী রাজা তোমাকে ধরিলেক তার পর মুক্ত হইয়া আমার নিকটে আসিবা। ইহা শুনিয়া দণ্ডী রাজা

যত্নপূর্বক অশ্বিনীকে রাখেন। এক দিবস শ্রীকৃষ্ণ আপন আলয় হইতে শ্রবণ করিলেন যে দণ্ডী রাজা এক অপূর্ণা অশ্বিনী পাইয়াছে সেই অশ্বিনী চাহিলেন দণ্ডী রাজা সে অশ্বিনী কদাচ দিলেন না পরে শ্রীকৃষ্ণ বহু সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিতে উজ্জত হইলেন দণ্ডী রাজা শ্রবণ করিলেক যে শ্রীকৃষ্ণ আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিতেছেন ইহা শুনিয়া পলাইয়া অনেক২ স্থানে গমন করিলেন পরে পাণ্ডব পুত্র যুধিষ্ঠির ভীম অর্জুন নকুল সহদেব ইহারদিগের মধ্যে ভীমের শরণাপন্ন হইলেন ভীম আশ্বাস করিলেন হে দণ্ডী রাজা অশ্বিনীর সহিত আমার নিকটে থাক তোমার কোন চিন্তা নাই দণ্ডী রাজা যথেষ্ট আশ্বাস পাইয়া ভীমের নিকটে রহিলেন পরে শ্রীকৃষ্ণ শুনিলেন যে দণ্ডী রাজা অশ্বিনী সহিত ভীমের শরণাপন্ন হইয়াছে পশ্চাৎ [৮০] শ্রীকৃষ্ণ দূত পাঠাইলেন যে দণ্ডী রাজা অশ্বিনীর সহিত সেখানে আছে অতএব তাহাকে এবং অশ্বিনীকে শীঘ্র আমার নিকট পাঠাইবেন এই সন্বাদ পাইয়া ভীম বড় ভাবিত হইলেন ভীমেরদিগের বল বৃদ্ধি বিক্রম যে কিছু সকল শ্রীকৃষ্ণ অস্ত্রকরণে বিবেচনা করিলেন যে শরণাগত জনকে রক্ষা যদি না করি তবে বৃথা প্রাণ ধারণ করা যদি না দিই তবে কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবেক কৃষ্ণের যুদ্ধেতে প্রাণ রক্ষা হইবে না তবে কি করি অনেক মত চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন বরং যুদ্ধেতে প্রাণ যায় সেও উত্তম তথাপি শরণাগত জনকে দেয়া মত নহে ইহাই স্থির করিয়া কৃষ্ণের দূতকে বিদায় করিলেন দণ্ডী রাজা ও অশ্বিনীকে দিলেন না শ্রীকৃষ্ণ এই সন্বাদ পাইয়া মহাক্রোধে সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিতে আগমন করিলেন পশ্চাৎ ভীম আশ্বাসহোদরেরদিগকে সন্বাদ দিলেন তখন যুধিষ্ঠির প্রভৃতি শুনিয়া মহা[৮০]ক্রোধান্বিত হইয়া রণ করিতে প্রবৃত্ত। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন তোমরা আমার আশ্রিত দণ্ডী রাজার কারণ আমার সঙ্গে রণ করিতে

আসিলা ভীমার্জুন কহিলেন আপনি যে কহিলেন সে প্রমাণ বটে কিন্তু শরণাগত জনের কারণ আমরা প্রাণ দিতে স্বীকার করিয়াছি তখন শ্রীকৃষ্ণ হাস্য করিয়া কহিলেন আমি তোমারদিগের সাহস এবং ধর্মজ্ঞান দেখিবার কারণ এক্ষণ করিয়াছিলাম এইরূপে কথোপকথন অনেক হইল পশ্চাৎ অশ্বিনী সাক্ষাতে আসিয়া কৃষ্ণ দর্শন করিয়া ইন্দ্রের অভিসম্পাত হইতে মুক্ত হইয়া আশ্বস্থানে গমন করিলেক।—

অতএব আমি হিন্দুলোকের স্থানে এমন কথা শ্রবণ করিয়াছি এবং হিন্দুর শাস্ত্রেও অনেক স্থানে প্রমাণ আছে যে শরণাগতকে কদাচ ত্যাগ করিবে না আমারদিগের শাস্ত্রেও শরণাগতকে ত্যাগ করিতে যথেষ্ট নিষেধ আছে তথাপি বারং লিখিতেছেন আপনি এদেশের কপ্তা আপনকার [২১] নিকটে সকল জাতীয় মহত্ব আছে বরং সকলকে জিজ্ঞাসা করিবেন বিশেষত আমারদিগের পণ প্রাণসঙ্গে শরণাগত ব্যক্তিকে ত্যাগ করিব না অতএব রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাসকে পশ্চাৎ কৌশলক্রমে আপনকার নিকট পাঠাইব এইক্ষণে আপনি কিঞ্চিৎ কালের জেছ স্থির থাকিবেন আর যে লিখিয়াছেন আমারদিগের বাণিজ্য অধিক হইতেছে অতএব রাজকর অধিক লাগিবেক কিন্তু আমারদিগের বাণিজ্য এ দেশে অনেক কালাবধি আছে তাহাতে হস্তিনাপুরের সম্রাটের রাজা যিনি তিনি এই নিয়ম করিয়া দিয়াছেন এবং কতং সুখা গিয়াছে কখন অধিক দিই নাই এখন অধিক দিব না আপনি বিবেচক বিবেচনা করিয়া যে সংপারামর্শ হয় তাহাই করিবেন।—

এই মত লিখিয়া নবাব সাহেবের নিকট পাঠাইলেন।—

নবাব সাহেব কলিকাতার কোঠির বড় সাহেবের পত্র জ্ঞাত হইয়া অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া পাত্রকে [২২] আজ্ঞা করিলেন কলিকাতার কোঠির সাহেব বৃদ্ধি আমার বাক্য শুনিলেন না অতএব আর এক পত্র

লিখ হ যদি বাক্য পালন করেন তবে ভালই নতুবা আমি কলিকাতা লুট করিয়া তাহারদিগকে এ দেশে থাকিতে দিব না। পাত্র নিবেদন করিলেন আপনি দেশাধিকারী কিন্তু শাস্ত্রমত বিচার করিলে ভাল হয় তাহাতে নবাব कहিলেন আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে আমি শাস্ত্র বিচার করি না তুমি শীঘ্র পত্রের উত্তর লিখিয়া আনহ। মহারাজ মহেন্দ্র নীরব হইয়া পত্র লেখাইলেন তাহার বিবরণ এই।

আশ্বিনাষ্টাচারের পর লিখিলেন ভাই সাহেবের পত্র পাইয়া সকল সমাচার জ্ঞাত হইলাম আপনি অনেক শাস্ত্রমত লিখিয়াছেন এবং পূর্ব যেমন হইয়াছে তাহাও লিখিয়াছেন এ সকল প্রমাণ বটে কিন্তু সর্ব্বত্রই রাজারদিগের এই পণ যে শরণাগত ত্যাগ করেন না তাহার কারণ এই রাজা যদি শরণাগত ত্যাগ করেন তবে তার [২৩] রাজ্যের বাহুলা হয় না এবং পরাক্রমেরও ক্রটি হয় আপনি রাজা নহেন মহাজন কেবল বাপার বাণিজ্য করিবেন ইহাতে রাজার চাষ ব্যবহার কেন অতএব যদি রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাসকে এখানে শীঘ্র পাঠান তবে ভালই নতুবা আমি আপনকার সহিত যুদ্ধ করিব আপনি যুদ্ধসজ্জা করিবেন কিন্তু যদি যুদ্ধ না করেন তবে পূর্ব্বের যে নিয়মিত রাজকর আছে এইক্ষণে তাহাই দিবেন আমি আপন চাকরেরদিগকে আজ্ঞা করিয়া দিলাম এবং শ্রীযুত কোম্পানির নামে যে ক্রয় বিক্রয় হইবেক তাহারি নিয়ম থাকিবেক কিন্তু আরও যত সাহেব লোকেরা বাণিজ্য করিতেছেন তাহারদিগের স্থানে অধিক রাজকর লইব অতএব আপনি বিবেচক সম্প্রদায় করিয়া পত্রের উত্তর লিখিবেন। এইরূপ পত্র লিখিয়া কলিকাতায় বড় সাহেবের নিকট পাঠাইলেন।—

কোঠির বড় সাহেব পত্র জ্ঞাত হইয়া আপনার চাকর লোককে জ্ঞাত করিলেন আর कहিলেন [২৪] আমি রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাসকে

কদাচ দিব না অতএব বুঝি নবাবের সহিত আমার বিবাদ উপস্থিত হইল কিন্তু নবাব এ দেশাধিকারী তাহার সৈন্য অধিক আমি মহাজনীয় ব্যবসা করি সৈন্য নাই তাহাতে চারা কি তোমরা এ নগরে বাস করিয়া রহিয়াছ অতএব আশ্বয় পরিবার অত দেশে প্রেরণ কর আর কিছু সৈন্য যদি সংগ্রহ করিতে পার তাহারও চেষ্টা পাও এবং নবাবের পত্রের উত্তর লিখ।—

এই মত পত্রের উত্তর প্রত্যুত্তর অনেক গেল নবাব শাজেরদৌলা কদাচ কাহার বাক্য শ্রবণ করিলেন না মহাক্রোধাগিত হইয়া যাবদীয় সৈন্য সঙ্গে করিয়া যুদ্ধের কারণ কলিকাতায় প্রস্থান করিলেন।—

কলিকাতার কোঠির বড় সাহেব শুনিলেন যে নবাব শাজেরদৌলা সৈন্যে যুদ্ধ করিতে আসিতেছেন ইহা শ্রবণ করিয়া আপনার যাবদীয় চাকর লোককে আহ্বান করিয়া कहিলেন তোমরা [২৫]দিগকে পূর্ব্বেরই সকল বৃত্তান্ত कहিয়াছি সংপ্রতি নবাব সৈন্যে রণ করিতে আসিতেছেন তোমরা সকলে সাবধানে থাকহ এবং আর কিছু সৈন্য আমাকে আনিয়া দেহ সাহেবের মত চাকর লোক সকলেই উদ্বিগ্ন হইয়া চিন্তা করিতে প্রবর্ত্ত এবং সাহেবের আজ্ঞাচারে কিছু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া দিয়া আশ্বয় পরিজন লোককে অত স্থানে গোপনে রাখিয়া আপনারা সকলে সৈন্যের সঙ্গে থাকিয়া যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। পুরাণ কোঠির গড়ের উপর ধরে কামান রাখিয়া রণ সজ্জা করিয়া সকলে সাবধানে থাকিলেন। তখন পুরাতন কোঠির নীচে গদা ছিলেন তাহাতে যুদ্ধের ছোট জাহাজ প্রস্তুত করিলেন এবং যাবদীয় ধন ও বহুমূল্য দ্রব্য সমস্তই জাহাজে রাখিয়া অত্যন্ত সাহস করিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকিলেন এবং বাগবাজারের পুলের উপর পঁচিশ কামান ও কিঞ্চিৎ সৈন্য রাখিলেন।—

কিঞ্চিৎ গোণে নবাব প্রাজেরদৌলা সব সৈন্য [২৬] লইয়া কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন বাগবাজারের পুলের নিকট উপনীত হইলেই যুদ্ধ আরম্ভ হইল। নবাবের বহু সৈন্য ছিল তথাপি পুলের সৈন্যগণকে জয়ী হইতে পারিতেছে না এবং নবাবের অনেক সৈন্য নষ্ট হইল। কলিকাতানিবাসী লোক সকল তরপীতেই প্রায় আছে। রাজা রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাস নৌকাযোগে বঙ্গ দেশেতে গমন করিয়া অতি গোপনে রহিলেন। পরে বাগবাজারে অনেক যুদ্ধ করিয়া কোঠির বড় সাহেবের সৈন্য কাতর হইল। পরে নবাবের সৈন্য নগরে প্রবেশ করিয়া নগরনিবাসিরদিগের ধন এবং দ্রব্য যে যাহা পায় সে তাহাই লইতে লাগিল পশ্চাৎ নবাবের প্রধান ২ সৈন্যসকল পুরাণ কোঠির নিকট উপনীত হইলেই কোঠির সাহেব রণ করিতে আরম্ভ করিলেন নবাবের সৈন্যও রণ করিতে লাগিল কিন্তু কাহার শক্তি হয় না যে এক পদ অগ্রগামী হন সাহেবের যুদ্ধ ও সাহস দেখিয়া সকলেই যথেষ্ট প্রশংসা করিতে [২৭] লাগিলেন যে এমন যোদ্ধা কখন কেহ দেখে নাই শিলাবুড়ির দ্বায় গোলা গুলি পড়িতেছে এইরূপ সপ্তাহ যুদ্ধ হইল নবাবের বিস্তর সৈন্য প্রাণ ত্যাগ করিলেক। কোঠির সাহেবের সৈন্য অল্প কি করিবেন গড়ে তিষ্ঠিতে না পারিয়া জাহাজের উপর আরোহণ করিলেন পশ্চাৎ নবাব সাহেবের সৈন্য গড়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। কোঠির বড় সাহেব জাহাজের উপর থাকিয়া অনেক প্রকার যুদ্ধ করিলেন বিস্তর সৈন্যের অল্প সৈন্যে কি করিতে পারে অনেক যুদ্ধের পর জাহাজ ভাসাইয়া সাহেব বিলাতে গমন করিলেন। তখন ভক্তলোক সকলেই বিমর্ষ হইয়া কহিতে লাগিলেন যে এ দেশের আর মঙ্গল হয় না কেননা বিদেশী সওদাগর লোক আর আসিবে না যে অচ্যায় উপস্থিত হইল অতএব যদি কখন ইন্দ্রাজের

এ দেশে আইসেন আর ঈশ্বর যদি জ্বনাধিকারী নষ্ট করেন তবেই এ [২৮] রাজ্যের মঙ্গল হবে নতুবা এ দেশের লোকের যথেষ্ট দুর্গতি হইবেক এইরূপ পরস্পর কহিতে লাগিলেন এবং ক্ষুদ্র লোক সকলেই হাহাকার করিয়া রোদন করিতে লাগিল আর সকলেই মনে নবাবেরে মন্দ কহিতে লাগিল কোন ব্যক্তি কহে ভাই হে ইন্দ্রাজের ভুল্য সত্যবাদী নাই এবং দয়া যথেষ্ট যে লোক অল্প স্থানে যে বেতন পাইত সেই লোক সাহেবের চাকর হইলে তার দ্বিগুণ বেতন মিলিত এইরূপ সকলে সাহেবের গুণাহ্বাদ করিতে প্রবর্ত্ত।—

পরে নবাব প্রাজেরদৌলা সমরে জয়ী হইয়া যাবদীয় লোককে আজ্ঞা করিলেন কোঠির সাহেবের চাকর লোকের বাটী ঘর যত আছে সকল ভাঙ্গিয়া ফেল। আজ্ঞামতে সকল ভূত্যেরা কলিকাতার যাবদীয় অট্টালিকা ভাঙিতে প্রবর্ত্ত হইল নগরমধ্যে উত্তম স্থান রাখিলেক না এইরূপ নগর ভয় করিয়া সর্ব্বদে সৈন্য রাখিয়া নবাব [২৯] মুরসিদাবাদে গমন করিলেন। পাত্ত মিত্রগণ সকলে অচ্যায় দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন শঙ্কায় কেহ কিছু কহিতে পারেন না এইরূপ এক বৎসর গত হইল।—

পরে ইন্দ্রাজ সাহেব লোক সৈন্যে পাঁচ জাহাজ পরিপূর্ণ করিয়া কলিকাতার নিকটে আসিয়া দূত দ্বারা যথাদ জ্ঞাত হইলেন যে নবাব কিছু সৈন্য রাখিয়া আপনি রাজধানীতে গমন করিয়াছেন। পরে যে সকল সৈন্য কলিকাতায় ছিল তাহারদিগের সঙ্গে রণ করিয়া সে সব সৈন্য নিপাত করিয়া কলিকাতার কোঠির মধ্যে প্রবেশ করিয়া আশ্রয়তাকা উঠাইয়া দিলেন।

পশ্চাৎ সকল মহন্ত পরস্পরায় শ্রবণ করিয়া অশান্ত হুট হইল এবং পূর্বে যে সকল লোক চাকর ছিল তাহার শ্রবণ করিয়া আনন্দমাগরে মগ্ন হইয়া আপন ২ পরিবার লইয়া নগরে প্রবেশ করিল। পশ্চাৎ সাহেবের

নিকট নানাজাতীয় খাজ দ্রব্য ভেট দিয়া আশ্ব্য সমাচার জ্ঞাত [১০০] করাইলেন। সাহেব হস্ত করিয়া অনেক প্রকার আশ্বাস দিয়া পূর্বে যে যে লোক যে যে কর্ণে নিযুক্ত ছিল সেই লোক সেই কর্ণেতে নিযুক্ত করিলেন। নগরবাসী লোকেরদিগের আনন্দের সীমা নাই পরে সাহেব প্রধান চাকরকে আজ্ঞা করিলেন যে পূর্বে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় আমার নিকটে আসিয়াছিলেন তাহাতে আমি তাঁহাকে কহিয়াছিলাম যে বিলাতের আজ্ঞা না লইয়া নবাবের সহিত বিবাদ করিতে পারি না এখন বিলাতের কর্তার আজ্ঞা লইয়া আসিয়াছি নবাবের সহিত যুদ্ধ করিব তাঁহারা আমার সাহায্য করিবেন কি না এই সমাচার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে কহিলে তিনি যে উত্তর করেন তাহা বাহাতে জ্ঞাত হইতে পারি তাহা করহ প্রধান পাত্র কহিলেন যে আজ্ঞা আমি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের নিকটে দূত প্রেরিত করিয়া সন্বাদ আনাইতেছি। পরে সাহেবের চাকর সাহেবের আগমন সমাচার বিস্তারিত করিয়া লিখিয়া মহারাজার [১০১] নিকটে দূত পাঠাইলেন দূত কৃষ্ণনগরে উপনীত হইয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে পত্র দিল রাজা পূর্বেই সাহেবের আগমন সন্বাদ পাইয়াছিলেন পরে পত্র পাইয়া সকল জ্ঞাত হইয়া অত্যন্ত হুই হইয়া দূতকে রাজপ্রসাদ দিয়া পত্রের উত্তর লিখিলেন।—

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় সাহেবকে যে পত্র লিখিলেন তাহার বিবরণ এই।—

আপন মঙ্গল এবং অনেক প্রকার শিষ্টাচার লিখিয়া লিখিলেন সাহেব পুনরায় আগমন করিয়া কলিকাতা অধিকার করিয়াছেন ইহাতে অনুভূতিযুক্ত হইয়া আনন্দার্ণবে মগ্ন হইয়াছি এবং বৃদ্ধি আমারদিগের এ রাজ্য রক্ষা পাইবে। আপনকার সহিত পূর্বে যে কথোপকথন হইয়াছিল সেই সকল সন্বাদকানুণ মুরসিদাবাদে মহত্ব প্রেরিত করিলাম

আপনি রণসজ্জা করিয়া প্রস্তুত থাকিবেন মুরসিদাবাদের সমাচার পাইলেই নিবেদন লিখিব কিন্তু পূর্বে যে নিবেদন [১০২] করিয়া আসিয়াছি তাহার অত্যা কদাচ হবে না।

এই প্রকার পত্র লিখিয়া কলিকাতায় সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। পরে মুরসিদাবাদে আশ্ব্যপাত্রকে পাঠাইলেন। সাহেব রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের লিপি পাইয়া অত্যন্ত হুই হইলেন পশ্চাৎ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পাত্র মুরসিদাবাদে উপনীত হইয়া মহারাজ মহেন্দ্র ও রাজা রামনারায়ণ ও জগৎসেট ও মীর জাফরালি থা প্রভৃতি সকলকে পূর্বের সমাচার শ্রবণ করিয়া দিলেন সকলেই যথেষ্ট আশ্বাস করিয়া কহিলেন তোমার রাজ্যকে সন্বাদ দেহ যে কলিকাতায় মহত্ব পাঠান ও বাহাতে সাহেব স্বরায় সৈন্য সহিত আইসেন তাহা করেন মীর জাফরালি থা কহিলেন আমি নবাবের সেনাপতি সকল সৈন্য আমার বশতাপন্ন যেমত কহিব তাহাই সৈন্যেরা করিবে কিন্তু আমার এক কথা সাহেবকে পালন করিতে হইবে ইহাই সাহেব পর্য্যন্ত নিবেদন করিয়া করার আনন্দ তবে যেমত সাহেব আজ্ঞা করিবেন আমি সেই [১০৩] মত কার্য করিব। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পাত্র কহিলেন কি কথা আজ্ঞা করুন আমি সাহেবতক নিবেদন লিখিয়া করার আনাইব। মীর জাফরালি থা কহিলেন পশ্চাৎ এ দেশের নবাব আমাকে দিবেন যদি সাহেব এই প্রতিজ্ঞা করেন তবে আমি মনোযোগ করিয়া সাহেবের সহিত যুদ্ধ করিব না এই সমাচারের উত্তর আনহ। পশ্চাৎ কালী-প্রসাদ সিংহ বিস্তারিত সমাচার আপন আশ্ব্য জনৈক মহত্ব দিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে নিবেদন লিখিয়া পাঠাইলেন। মহারাজ মুরসিদাবাদের যাবদীয় সন্বাদ লিখিয়া কলিকাতায় সাহেবকে জ্ঞাত করাইলেন সাহেব বিস্তারিত সমাচার শুনিয়া যথেষ্ট হুই হইয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে

লিখিলেন নবাব শ্রাজেরদৌলার সেনাপতি মীর জাফরালি খাঁ নবাবি চাহিয়াছে আমিও সত্য করিলাম শ্রাজেরদৌলাকে দূর করিয়া মীর জাফরালি থাকে নবাব করিব তুমি এই সমাচার মীর জাফরালি থাকে দিলে সৈ যেমত উত্তর [১০৪] করে তাহা আমাকে লিখিবা। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় সাহেবের পত্র জ্ঞাত হইয়া বিস্তারিত সমাচার লোক দ্বারা আপন পাত্রকে জানাইলেন।—

রাজপাত্র সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া মীর জাফরালি খাঁর নিকট গমন করিয়া আহুপূর্বক সমস্ত নিবেদন করিলেন। মীর জাফরালি খাঁ অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া কহিলেন আমি আর মনোযোগ করিয়া রণ করিব না তুমি সাহেবকে সমাচার দেও যুদ্ধ করিয়া শীঘ্র জয়ী হউন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পাত্র নিবেদন করিলেন যেমন সাহেব সত্য করিয়াছেন আপনাকে নবাব করিবেন তেমনি আপনিও সত্য করুন যে মনোযোগ করিয়া সমর করিবেন না। এই কথা র পর মীর জাফরালি খাঁ হস্ত করিয়া সত্য করিলেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পাত্র ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া বিদায় হইলেন।—

পরে কৃষ্ণনগরে গমন করিয়া দেখেন যে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় শিব-নিবাসের বাটীতে [১০৫] গিয়াছেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় নবাবের শত্ৰু কখন কোন বাটীতে থাকেন ইহা আশ্চর্য্যতাবর্ণেরাও জানে না সর্বদা চিন্তাবিত এই সকল কথা র যোজনকর্তা আমি যদি নবাব শ্রাজেরদৌলা কিঞ্চিৎ সন্ধান পায় তবে আমার জাতি প্রাণ রাখিবেক না ইহাতে সর্বদা ব্যস্ত থাকেন। পরে পাত্র মুরসিদাবাদ হইতে মহারাজার নিকটে উপস্থিত হইয়া সমস্ত নিবেদন করিলেন। মহারাজ জ্ঞাত হইয়া পাত্রকে আজ্ঞা করিলেন তুমি অদ্যই কলিকাতায় প্রস্থান কর বিস্তারিত সমাচার সাহেবের নিকটে নিবেদন করিয়া শীঘ্র যাহাতে নবাব নিপাত হয় তাহার চেষ্টা

পাও গিয়া। পাত্র রাজাজ্ঞানুসারে কলিকাতায় আসিয়া সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আহুপূর্বক সমস্ত নিবেদন করিলেন। সাহেব তুষ্ট হইয়া রাজপাত্রকে প্রসাদ দ্রব্য দিয়া যথেষ্ট সন্মান করিয়া বিদায় করিলেন। তখন কালীপ্রসাদ সিংহ কিঞ্চিৎ [১০৬] গোঁঘে বাটী প্রস্থান করিল। সাহেব আপনার যাবদীয় সৈন্যকে আজ্ঞা করিলেন তোমরা সকলে সুরসজ্জা করিয়া প্রস্তুত হও আমি কল্যা নবাব শ্রাজেরদৌলার সহিত সমর করিতে যাইব আজ্ঞামাত্রে সকল সৈন্য রণসজ্জা করিয়া প্রস্তুত হইল সাহেব দেখিলেন সকল সৈন্য প্রস্তুত তখন শুভক্ষণে সাহেব গমন করিলেন নানা প্রকার বাদ্য বাজিতে লাগিল বাদ্যের ধ্বনিতে এবং সৈন্যের অপূর্ব সজ্জা দেখিয়া সকল লোক চমৎকৃত হইয়া সকলেই জয়ং ধ্বনি করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং যাত্রিক দ্রব্য সকল সমুখে রাখিয়া গ্রামের মছয়োরী মঙ্গলধ্বনি করিতে লাগিল সাহেব হস্ত করিয়া আপন সেনাপতিকে আজ্ঞা করিয়া দিলেন গ্রামের লোকের উপর কোন সৈন্য দৌরাখ্যা করিতে না পারে সাহেব এইরূপে সৈন্য সঙ্গে করিয়া চলিলেন।

পরে মুরসিদাবাদতক সমাচার হইল যে ইন্দ্ররাজ সাহেব নবাবের সহিত রণ করিতে আসিতে [১০৭] ছেন এবং নবাব সাহেব পূর্বেই জ্ঞাত ছিলেন বিশেষ জ্ঞাত হইয়া আপন সেনাপতিকে আজ্ঞা করিলেন তুমি পঞ্চাশ হাজার সৈন্য লইয়া পলাশির বাগানে গিয়া প্রস্তুত থাকহ। সাবধানে সমর করিবা কোনরূপে ইন্দ্ররাজ জয়ী হইতে না পারে বাকি যে সৈন্য এখানে থাকিল তাহা লইয়া আমি পঞ্চাশ গমন করিব কিন্তু ইন্দ্ররাজেরা বড় যোদ্ধা এবং অশেষ মন্ত্রণা জানে কোনরূপে জুট না হয় সাবধানঃ। সেনাপতি মীর জাফরালি খাঁ বিস্তরঃ সাহস দিয়া সৈন্যের সহিত পলাশির বাগানে আসিয়া রণসজ্জা করিয়া আছেন কিন্তু মনোমধ্যে বিচার করিতেছেন কিঞ্চে ইন্দ্ররাজেরা জয়ী হবেন অনেক

বিবেচনার পর সৈন্তের মধ্যে প্রধানতঃ যেই সৈন্ত তাহারদিগের সহিত প্রণয় করিয়া কহিল তোমরা কেহ মনোবোগ করিয়া রণ করিও না যে সেনাপতি সেই যত্নপি এমন গতি করিতে প্রবর্ত্ত হইল ইহাতেই সকল সৈন্ত ওদ্রাস্ত করিয়া অসাবধানে থাকিল। পরে [১০৮] ইঙ্গরাজের যাবদীয় সৈন্ত পলাশির বাগানে উপনীত হইয়া সমর আরম্ভ করিল নবাবি সৈন্ত সকল দেখিল যে প্রধানতঃ সৈন্তেরা মনোবোগ করিয়া যুদ্ধ করে না এবং ইঙ্গরাজের অগ্নিবৃষ্টিতে শততঃ লোক প্রাণ ত্যাগ করিতেছে কি করিব ইহাতে কেহ উদ্যাক্রমে যুদ্ধ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিতেছে। যুদ্ধ ভাল হইতেছে না ইহা দেখিয়া নবাবের চাকর মোহনদাস নামে এক জন সে নবাব সাহেবকে কহিলেক আপনি কি করেন আপনকার চাকরেরা পরামর্শ করিয়া মহাশয়কে নষ্ট করিতে বসিয়াছে। নবাব কহিলেন সে কেমন। মোহনদাস কহিল সেনাপতি মীর জাফরালি খাঁ ইঙ্গরাজের সত্তে প্রণয় করিয়া রণ করিতেছে না অতএব নিবেদন আমাকে কিছু সৈন্ত দিয়া পলাশির বাগানে পাঠান আমি যাইয়া যুদ্ধ করি আপনি বাকি সৈন্ত লইয়া সাবধানে থাকিবেন পূর্বের দ্বারে যথেষ্ট লোক রাখিবেন এবং এইকণে কোন ব্যক্তিকে বিশ্বাস করিবেন না। নবাব মোহনদাসের বাক্য [১০৯] শ্রবণ করিয়া ভয়যুক্ত হইয়া সাবধানে থাকিয়া মোহনদাসকে পঁচিশ হাজার সৈন্ত দিয়া অনেক আশ্বাস করিয়া পলাশিতে প্রেরিত করিলেন। মোহনদাস উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত যুদ্ধ করিতে প্রবর্ত্ত হইল মোহনদাসের যুদ্ধেই ইঙ্গরাজের সৈন্ত শঙ্কাদিত হইল। মীর জাফরালি খাঁ দেখিলেন এ কণ্ড ভাল হইল না যত্নপি মোহনদাস ইঙ্গরাজকে পরাভব করে আর এ নবাব থাকে তবে আমারদিগের সকলেরি প্রাণ যাইবেক অতএব মোহনদাসকে নিবারণ করিতে হইয়াছে ইহাই বিবেচনা করিয়া নবাবের

দূত করিয়া এক জন লোককে পাঠাইলেন সে মোহনদাসকে কহিল আপনাকে নবাব সাহেব ডাকিতেছেন শীঘ্র চলুন। মোহনদাস কহিল আমি রণ ত্যাগ করিয়া কি প্রকারে যাইব নবাবের দূত কহিল আপনি রাজাজ্ঞা মানেন না। মোহনদাস বিবেচনা করিল এ সকলি চাতুরি এ সময়ে নবাব সাহেব আমাকে কেন ডাকিবেন ইহা অন্তঃকরণে [১১০] করিয়া দূতের শিরচ্ছেদন করিয়া পুনরায় সমর করিতে লাগিল। মীর জাফরালি খাঁ বিবেচনা করিল বৃষ্টি প্রমাদ ঘটিল পরে আত্মীয় এক জনকে আজ্ঞা করিল তুমি ইঙ্গরাজের সৈন্ত হইয়া মোহনদাসের নিকট গিয়া মোহনদাসকে নষ্ট করহ। আজ্ঞা পাইয়া এক জন মহাযা মোহনদাসের নিকট গমন করিয়া অগ্নিবাণ মোহনদাসকে মারিল সেই বাণে মোহনদাস পতন হইল। পরে নবাবি যাবদীয় সৈন্ত রণে উভয় দ্বিধা পলায়ন করিল ইঙ্গরাজের জয় হইল।—

গরে নবাব স্বাজেরদৌলা সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মনেতঃ বিবেচনা করিলেন কোনমতে রক্ষা নাই আপন সৈন্ত বৈরা হইল অতএব আমি এখান হইতে পলায়ন করি ইহাই স্থির করিয়া নৌকোপরি আরোহণ করিয়া পলায়ন করিলেন। পরে ইঙ্গরাজ সাহেবের নিকটে সকল সমাচার নিবেদন করিয়া মীর জাফরালি খাঁ মুরসিদাবাদের গড়েতে গমন করিয়া ইঙ্গরাজী পতাকা উঠিয়া [১১১] দিলে সকলে বৃদ্ধিল ইঙ্গরাজ মহাশয়েরদিগের জয় হইল তখন সমস্ত লোকে জয়তঃ ধ্বনি করিতে প্রবর্ত্ত হইল এবং নানা বাজ বাজিতে লাগিল। যাবদীয় প্রধানতঃ মদ্য ভেটের দ্রব্য দিয়া সাহেবের নিকট সাক্ষাৎ করিলেন সাহেব সকলকে আশ্বাস করিয়া যিনি যে কণ্ঠে নিযুক্ত ছিলেন সেই কণ্ঠে তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়া রাজপ্রসাদ দিলেন মীর জাফরালীকে নবাব করিয়া সকলকে আজ্ঞা করিলেন তোমরা সকলে সাবধান

পূরক রাজকর্ম করিবা রাজ্যের প্রভুল হয় এবং প্রজা লোকে দুঃখ না পায় সকলে আজ্ঞাহুসারে কার্য করিতে লাগিলেন।—

পরে নবাব শাজেরদৌলা পলায়ন করিয়া যান তিন দিবস অতীত অত্যন্ত ক্ষুধিত নদীর তটের নিকট এক ফকিরের আশ্রয় দেখিয়া নৌকার কর্ণধারকে কহিলেন এই ফকিরের স্থান তুমি ফকিরকে বল কিঞ্চিৎ খাদ্য সামগ্রী দেও এক জন মহত্ব বড় পীড়িত কিঞ্চিৎ আহার করিবেক [১১২] ফকির এই বাণী শ্রবণ করিয়া নৌকার নিকট আসিয়া দেখিল নবাব শাজেরদৌলা অত্যন্ত বিষন্ন বদন ফকির সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়াছে বিবেচনা করিল নবাব পলায়ন করিয়া যায় ইহাকে আমি ধরিয়া দিব আমাকে পূর্বে যথেষ্ট নিগ্রহ করিয়াছিল তাহার শোধ লইব ইহাই মনোমধ্যে স্থির করিয়া করপুটে বলিল আহাদের দ্রব্য আমি প্রস্তুত করি আপনারা সকলে ভোজন করিয়া প্রস্থান করুন। ফকিরের প্রিয় বাক্যে নবাব অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া ফকিরের বাটীতে গমন করিলেন ফকির খাদ্য সামগ্রীর আয়োজন করিতে লাগিল এবং নিকটে নবাব মীর জাফরালি খাঁর চাকর ছিল তাহাকে সন্ধান দিল যে নবাব শাজেরদৌলা পলায়ন করিয়া যায় তোমরা নবাবকে ধর। নবাব জাফরালি খাঁর লোকে এ সন্ধান পাবামাত্রে অনেক মহত্ব একত্র হইয়া নবাব শাজেরদৌলাকে ধরিয়া মুরসিদাবাদে আনিলেক।

পরে অভিগোপনে নবাব মীর জাফরালি খাঁর [১১৩] পুত্র মীর মিরণকে সংবাদ দিয়া ইঙ্গরাজের বড় সাহেবকে সংবাদ দিতে যায় তাহাতে মীর মিরণ নিষেধ করিয়া কহিলেন যে আর কাহাকেও এ সমাচার কহিবা না। মীর মিরণ মনোমধ্যে বিবেচনা করিলেন যদি বড় সাহেব এ সন্ধান শ্রবণ করেন তবে শাজেরদৌলা কদাচ নষ্ট হইবে না তবে আমারদিগেরও মঙ্গল হওয়া ভার এবং যেহেতু পাত্র মিত্রগণেরা আছে

ইহারা শ্রবণ করিলেও কদাচ নষ্ট করিতে দিবে না বরং নবাব শাজেরদৌলাকে নবাবি দেওনের চেষ্টা পাইবেক অতএব নবাব শাজেরদৌলাকে এক দণ্ড রাখা নয় ইহাই স্থির করিয়া আপনি থড়া হস্তে করিয়া নবাব শাজেরদৌলার নিকটে উপনীত হইলেন। নবাব শাজেরদৌলা দেখিলেন মিরণ আমাকে ছেদন করিতে আসিতেছে তখন মিরণকে অনেক২ জ্ঞতি করিলেন। কিন্তু নির্দয় মিরণ কদাচ ক্ষান্ত হইল না। পশ্চাৎ নবাব শাজেরদৌলা ঈশ্বরে মনোযোগ করিয়া নিঃশব্দে রহিলেন [১১৪] তখন মিরণ থড়াত্তে নবাবকে ছেদন করিয়া পশ্চাৎ প্রচার করিলেক এই সকল বৃত্তান্ত বড় সাহেব শ্রবণ করিয়া যথেষ্ট খেদ করিলেন এবং পাত্র মিত্রগণ সকলেই মহাব্যথিত হইয়া কাতর হইলেন।—

মহারাজ মহেন্দ্র পাত্রকর্মে আপন ভ্রাতাকে নিযুক্ত করিয়া কলিকাতায় সপরিবারে আসিলেন তখন বড় সাহেব বিবেচনা করিলেন জবনকে প্রত্যয় নাই অতএব পূর্বে যেমত নবাবি ভার ছিল সেমত না রাখিয়া রাজ্য করতল করিতে লাগিলেন স্থানেই সাহেব লোক কর্তা নবাবের লোকে কার্য করে এইরূপ রাজকর্ম হইতে লাগিল রাজ্যের শাসন দিনই হইতে লাগিল প্রজালাকের যথেষ্ট স্থখ কোন শঙ্কা নাই উয়ক্রমে কেহ কাহার উপরে দৌরাণ্য করিতে পারে না রাম রাজার দ্বায় মহত্ব সকল স্থখী হইল এইরূপে কাল ক্ষেপণ করেন।—

কিঞ্চিৎ কালের পর বড় সাহেব কলিকাতায় আসিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে আহ্বান করিলেন। [১১৫] রাজা বড় সাহেবের আজ্ঞা পাইয়া কলিকাতায় উপনীত হইয়া বড় সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন বড় সাহেব রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে যথেষ্ট মর্যাদা করিয়া কহিলেন তোমার মনোনীত যাঁহা তাঁহা বিস্তারিত করিয়া বল আমি

পূর্ণ করিব। মহারাজ করপুটে নিবেদন করিলেন আমি কেবল অহুগ্রহের আকাজ্জিত! এই কথার পর বড় সাহেব রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে কহিলেন তুমি আমার নিতান্ত বিশ্বাসপাত্র এবং তোমার মজ্জণায় সর্বত্র জয়ী হইলাম তোমার যাহাতে ভাল হয় তাহা আমি সর্বদা করিব মহারাজাকে অনেক প্রিয় বাক্য কহিয়া সে দিবস বাসাঘ বিদায় করিলেন পর দিবস রাজাকে বিস্তর রাজপ্রসাদ দিয়া যথেষ্ট সম্মান করিলেন আর পূর্বের যে রাজকর রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় দিতেন তাহা অপেক্ষা পাঁচ লক্ষ তঞ্চা ঘুচাইয়া ছয় লক্ষ তঞ্চা রাজকরের নিয়ম করিয়া দিলেন ও রাজার স্বধাতি বিলাং পর্য্যন্ত লিখিয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে বিদায় করিলেন। রাজা বড় সাহেবের প্রসাদ প্রাপ্ত [১১৬] হইয়া ও রাজ্যের প্রভুল করিয়া এবং যখনকার যে সমাচার সাহেবতক নিবেদন জ্ঞাত করায় একারণ সর্ব্বাংশে ভাল এক জন লোক বড় সাহেবের নিকটে রাখিয়া আপনি রাজধানীতে গমন করিলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পূর্বে যে নাম ব্রাহ্মণেরা দিয়াছিলেন বড় সাহেবও সেই নাম প্রচার করাইলেন যাবদীয় মহম্মদ পত্রাদিতে লেপেন অগ্নিহোত্রী বাজপেয়ী শ্রীমমহারাজরাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুর এইরূপে সর্ব্বদেই মহারাজার স্বধাতি হইল।—

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের ছই রাণী প্রধান রাণীতে পঞ্চ পুত্র জ্যেষ্ঠের নাম রাজা শিবচন্দ্র দ্বিতীয় ভৈরবচন্দ্র তৃতীয় মহেশচন্দ্র চতুর্থ হরচন্দ্র পঞ্চম ঈশানচন্দ্র এই পঞ্চ পুত্র বড় রাণীর ছোট রাণীর এক পুত্র শম্ভুচন্দ্র রাজার এই ছয় পুত্র পুত্রসকল সর্ব্বাংশে উত্তম নানা বিজ্ঞাতে বিশারদ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় পুত্রসকলের রূপে এবং গুণে অত্যন্ত হুষ্ট রাজার সর্ব্বগুণ ধীরবর্গের সহিত অশেষ শাস্ত্রের বিচারেই কাল [১১৭] কেপণ এবং নিজাধিকার অস্তিশর শাসিত যাবদীয় লোকের প্রতি দয়া

এবং দরিত্রে দান সুদার্ত্ত জনেরে ভোজন করান এইরূপে কাল কেপণ। কিছু কালানন্তরে বিবেচনা করিলেন জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবচন্দ্র রায় অত্যন্ত শাস্ত এবং পণ্ডিত সর্ব্বগুণে গুণাবিত দেখিয়া নিজ রাজ্যে শিবচন্দ্র রায়কে অভিষিক্ত করিয়া রাজা করিলেন। এবং আপনি ঈশ্বরে মন স্থির করিয়া ধ্যান করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন। রাজা শিবচন্দ্র রায় রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া সর্ব্বদা পিতৃসেবাজেই মনোযোগ এইরূপে বহু কাল যায়। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের ঈশ্বরপ্রাপ্তি হইল।—

মহারাজ শিবচন্দ্র রায় নিয়ম মতে জিয়ানন্তরে কলিকাতায় আসিয়া বড় সাহেবের নিকট সাক্ষাৎ করিলেন। সাহেবলোক অহুগ্রহ করিয়া যথেষ্ট মধ্যালা করিয়া অধিকারের প্রভুল করিয়া দিয়া রাজ্যে বিদায় করিয়া দিলেন।—

রাজা শিবচন্দ্র রায় নিজ রাজ্যে গমন করিয়া যাবদীয় প্রধান পাত্র মিত্রগণকে আহ্বান করিয়া [১১৮] আজ্ঞা করিলেন তোমরা অনেক কালের মজ্জী আমার পূর্ব্বপুরুষ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রাদি মহাশয়ের যেমন রাজনীতি কর্ষ করিয়াছেন সেইমত তামাকেও তোমরা মজ্জণ দিবা আমিও সেইমত কার্য্য করিব। এই বাক্য পাত্রমিত্রগণেরা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া নিবেদন করিলেন মহারাজ আপনি মহামহোপাধ্যায় সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত মহাশয়কে মজ্জণ দিবার অপেক্ষা নাই তবে যখন যে স্মরণ করান তাহা নিবেদন করিব। পাত্র মিত্রগণের বাক্যে রাজা শিবচন্দ্র রায় অত্যন্ত হুষ্ট হইয়া রাজপ্রসাদ দিয়া সকলের সম্মান করিলেন এইরূপে পরম স্থখে রাজ্য করেন।

কিঞ্চিৎ কালের পর মহারাজ শিবচন্দ্র রায় মনোমধ্যে বিবেচনা করিতেছেন পূর্বে যে সকল মহারাজারা আমারদিগের বংশে ছিলেন তাহারা অশেষ প্রকার পুণ্য কর্ষ করিয়া দেশ দেশান্তরে খ্যাতিাপন্ন

হইয়াছেন অতএব আমিও সেই মতচরণ করিব ইহাই স্থির করিলেন।

কিঞ্চিৎ গোপে নবদ্বীপ হইতে প্রধান২ পণ্ডিত[১১২]গণকে আহ্বান করিয়া আনিয়া কহিলেন আমার ইচ্ছা যে মহতী ঘট। করিয়া একটা যজ্ঞ করি অতএব আপনারা বিবেচনা করিয়া আজ্ঞা করুন কি যজ্ঞ করিব। পণ্ডিতবর্গেরা কহিলেন মহারাজ সোমবাগ করুন। মহারাজ শিবচন্দ্র রায় পণ্ডিতেরদিগের বাক্যে উত্তম২ যজ্ঞ করিয়া এবং বহুবিধ দান করিয়া ঈশ্বরে মনোৰ্পণ করিয়া লোকান্তরে গমন করিলেন।—

মহারাজ শিবচন্দ্র রায়ের এক পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র রায় কিছু দিনানন্তরে ঈশ্বরচন্দ্র রায় মহাশয় নবদ্বীপের রাজা হইলেন। পূর্বের যে সকল মন্ত্রীরা ছিলেন সে সকল মন্ত্রীদিগেরও লোকান্তর হইয়াছে উপযুক্ত মহন্ত না পাইয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্নচিত্ত দিন২ রাজ্যের ক্ষীণতা এবং নানা প্রকারে অর্থব্যয় এই প্রকারে কতক কাল রাজ্য করিলেন। ইহার পুত্র গিরীশচন্দ্র রায়। মহারাজ ঈশ্বরচন্দ্র রায় কল্পতরুর ছায়া দাতা এবং ঈশ্বরে সৰ্বদা মন ও বহুবিধ দান করিয়া লোকান্তর গমন করিলেন।—

[১২০.] পরে গিরীশচন্দ্র রায় মহাশয়কে সাহেবলোক সকলে যথেষ্ট অহুগ্রহ করেন এইক্ষণে তিনিই নবদ্বীপের রাজ্য করিতেছেন কিন্তু রাজ্যের অনেক ক্ষীণতা হইয়াছে তথাপি পূর্বের মহারাজার। যেমত ব্যবহার করিয়াছেন সেমত আচরণ করিতেছেন। মহারাজ গিরীশচন্দ্র রায় অত্যন্ত দাতা। যাচক জনকে কদাচ বিমুখ করেন না এইরূপে রাজ্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং পূর্ব২ মহারাজারদিগের যে সকল রুত্যা তাহার যেরূপ ব্যয় ছিল এখন যে রাজ্যের নানতা হইয়াছে তথাপি সে সকল ব্যয়ের নানতা নাই এবং পূর্বে যেমত২

রাজনীতি ছিল ও এখন সেই মতচরণ করিতেছেন যাবদীয় বিশিষ্ট হয় পণ্ডিতবর্গেরা অদ্যাপি আগমন করিলেও পণ্ডিতের যথেষ্ট সম্মান করেন এবং অশেষ প্রকার দীর্ঘসকলকে সন্তোষ করিয়া বিদায় করিতেছেন কোন মতেই নিন্দা কর্ম করেন না।—

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় মহাশয়ের চরিত্র সমাপ্ত হইল।—

লু

আলু খেয়ে কাগুন্নিয়া হালুয়ার সনে
ফেরে ঢালু বালুচরে শালুকের বনে;
শুক তাগু, কোথা জল দয়াগু বিধাতা?
সহসা বেখিয়া বুনে ভালুকের মাথা—
কাগুন্নিয়া বসে গুলে লাল শালু-ছাতা।
খালুই লইয়া তার তালুই মশায়
আলুপাণ্ডু হয়ে ঢালু-তালুকেতে যায়।
আলুবাঁ ব্যস্তন খেয়ে পরে পাটালুন
অলুক, অলুক নিজে, আলুক আসুন।
চালুনি থাকিবা রোজ শীতুঁচেরে কয়—
আমিই হালুম-বুড়ে, কারে জ্বার ভয়।

মধুকরের মোচাক (পসথুমাস কবিতা)

২ মধুকরকুমার কাঞ্চিলাল *

নয়ন আমার ফুলবনে মধুমন্ত অলি সম
চতুর্দিকে উদ্দাম আগ্রহে ধায় বেগে,
রূপমধু লুঠে আনে, শত হৃন্দরীর মুখ 'পরে
ক্ষণিক রহিয়া স্থির আকুল আনন্দ আহরণে,
একটি নিমেষ শুধু একটি মুখের স্পর্শ লভি ;
নয়ন ফিরিয়া যায় মনের অন্তরতম কোণে,
যেখানে বকের মাঝে লক্ষ কক্ষে করিয়া বিভাগ
রাখিয়াছি মধুচক্র সম সম এ হৃদয়খানি ।
কবে কোন্ কুসুমের ছবিটুকু লেগেছে নয়নে,
মুহুর্তের আলোকের স্তমিষ্ট পরশ,
তাই কষ্টে করেছি সঞ্চয় মনে মনে ;
অল্পে অল্পে হৃদয়ের কক্ষগুলি ভরে গুঠে,

মধুচক্র পূর্ণ হয়ে আসে দীরে দীরে,
বিশ্বের কুড়ান কত সৌন্দর্যের কথা—
হৃদয় করেছে পূর্ণ অসম্পূর্ণ বাসনার রসে ;
তাই বিলাহিব আজ অপরের পরিতৃষ্টি তরে,
নিবিড় সঞ্চয় স্থখ সে আমার একান্ত নিজেয়,
সঞ্চিত যা আছে তাহা তোমরাই কর উপভোগ ।
আমি অলি, বসন্তে আমার আগমন,
আমি উড়ে যাই দূরে ঋতু অবসানে—
মরণের হৃদুর সীমান্ত পারে, আরও দূরে
রেখে যাই চির শুধু সঞ্চিত মধুর চাক্রে,
যেথা পাবে প্রাণ শীতান্ত্র ক্ষুধার্ত্ত জীবজনে,
বারতা বাদের কর্ণে বসন্তের আসে নাই কভু,
নয়ন বাদের ছিল হৃদয় সেই স্নিগ্ধ মধুমাসে
আমার হৃদয়খানি তারা যেন থণ্ড থণ্ড করে
সঞ্চিত মধুর বিন্দু লক্ষ কক্ষে করে আবাদন,
আমার নয়নলক্ষ ঐশ্বর্যের করিয়া বণ্টন
ক্ষণিক জীবন লভে মরণের রিক্ত সীমানায় ॥

* মধুকরকুমার মরিচাচেন কিন্তু ইহলৌকিক নানা গলদের জন্ত স্বর্ণে বাইতে পারেন
নাই । ঔপন্যাসিক শ্রীচর্যামণি জীবিত্বিত্ত্ববণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট দরবার
করিয়া জানিলাম যে কৃত্যোনীপ্রাপ্ত ব্যক্তির নামের আগে 'না' দিয়া অস্থখার দেওয়াই
বিধেয় ।

পরিব্রাজকের ডায়েরি

স্বস্তিক

একবার পূজার সময়ে বাঁকুড়া শহরে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। বাঁকুড়ার পশ্চিম প্রান্তে 'নূতন চটি' নামে এক পল্লি আছে। অপেক্ষাকৃত ফাঁকা এবং স্বাস্থ্যকর জায়গা বলিয়া সে সময়ে এই দিকে অনেকগুলি নূতন বাড়ি তৈয়ারি হইতেছিল। অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় বাংলা দেশের মধ্যে এক জন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত এবং বৈজ্ঞানিক। তিনি অধ্যাপনা কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর হইতে নূতন চটিতে বসবাস করিতেছেন। তাঁহার বাড়ির নাম 'স্বস্তিক'। তিনি বাঁকুড়ায় উপস্থিত আছেন সংবাদ পাইয়া এক দিন বিকালে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম।

যোগেশবাবু যে সময়ে কটকে অধ্যাপনায় নিযুক্ত ছিলেন, তখন আমার সহপাঠীগণের নিকট তাঁহার বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনিয়াছিলাম। যে সকল ছাত্র যোগেশবাবুর কাছে উদ্ভিদ-বিজ্ঞা শিক্ষা করিত, তাহাদের পর্যবেক্ষণ শক্তি উদ্বোধিত করিবার জন্য তিনি অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্ন করিতেন।—কলেজে উঠিতে কতগুলি সিঁড়ি ভাঙিতে হয়, পড়িবার ঘরে কয়খানি কড়িকাঠ আছে, মহানদীর পুলে জন্তের সংখ্যা কত—এ সকল প্রশ্ন সহসা করিলে বাহারা প্রত্যহ কলেজে পাঠ করিতে আসিত অথবা মহানদীর কূলে বেড়াইতে যাইত, তাহারাও ঠিকমত বলিতে পারিত না। যোগেশবাবু তখন তাহাদিগকে উপদেশ দিয়া বলিতেন, নিজের দৃষ্টিকে সর্ব সময়ে সতেজ রাখা বিজ্ঞানের

সর্বাপেক্ষা মূল্যবান শিক্ষা। আজ হয়তো পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য আমরাগকে গাছের পাতার আকৃতি পর্যবেক্ষণ করিতে হইতেছে, তাহার বৃদ্ধি ও আহার প্রণালী সম্বন্ধে গবেষণা করিতে হইতেছে। হয়তো পরবর্তী জীবনে এ সকল জ্ঞানের বিন্দুমাত্র প্রয়োজন হইবে না। কিন্তু উদ্ভিদ-বিজ্ঞান স্বস্তিক ধরিয়া আমাদের মনে যে সকল বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ও চিন্তাপ্রণালীতে অভ্যস্ত হইয়া যায় তাহাকেই তিনি সকলের বড় লাভ বলিয়া বিবেচনা করিতে শিখাইতেন।

অধ্যাপক যোগেশচন্দ্রের নিকট যদিও আমি নিজে পড়ি নাই; তবু পাঠ্যাবস্থায় কয়েকবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। তখনও তাঁহার প্রশ্নের বাণে সময়ে সময়ে বিভ্রত হইতে হইলেও তাঁহার মনের জীবন্ত ও যৌবন-মূলভ ভাবে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত। সেই জন্য বাঁকুড়ায় স্বযোগ পাইয়া প্রথমে তাঁহার সাক্ষাৎ লাভের চেষ্টা করিলাম।

নূতন চটিতে পৌছিয়া স্বস্তিক খুঁজিয়া লইতে দেরি হইল না। সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র পশ্চিম দিকে একটি খোলা বারান্দায় চেয়ারের উপর স্থির হইয়া বসিয়া আছেন। তাঁহাকে পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধ দেখাইতেছিল এবং দীর্ঘ শ্বেতশ্রুগতে তাঁহার মুখমণ্ডলকে সৌন্দর্য ও গাভীরো মণ্ডিত করিয়াছিল। তাঁহার চোখে একটি স্থির ও শান্ত দৃষ্টি বিরাজ করিতেছিল।

অধ্যাপক যোগেশচন্দ্রকে প্রণাম করিয়া বসিবার পর তিনি কুশল প্রশ্নাদির পরে নানা গল্প আরম্ভ করিলেন। অবশেষে শিল্পশাস্ত্রের প্রসঙ্গে নিজের বাড়ির কথা তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “আচ্ছা বল তো বাড়ির নাম ‘স্বস্তিক’ রেখেছি কেন?” আমি আসিবার সময়ে গৃহের

উত্তর দিকে একটি বড় স্বস্তিক চিহ্ন অঙ্কিত দেখিয়াছিলাম তাহার উল্লেখ করায় তিনি বলিলেন, “ও তো একটা কারণ, কিন্তু তা ছাড়া আরও দুইটি কারণ আছে।” বলিয়া শিল্পশাস্ত্রের শ্লোক আবৃত্তি করিয়া ব্যাখ্যা করিলেন, যে গৃহের পূর্বে অলিন্দ থাকে তাহাকে স্বস্তিক বলে। কিন্তু তাহার পর বলিলেন, “আরও একটা বিশেষ কারণ কি জান? সাধারণত লোকে শান্তি চায়। আমি বাপু শান্তি চাই না, স্বস্তি চাই। মাজুঘের মন যখন যুদ্ধে হার মানে তখনই সে শান্তি চায়। কিন্তু আমাদের সংগ্রাম তো অবিরাম চলবে, মাঝে মাঝে দু এক দণ্ড স্বস্তি পেলেই যথেষ্ট। এই হ’ল বাড়ির স্বস্তিক নাম রাখার আসল কারণ।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “কিন্তু চারিদিকে যদি ঝড়ঝাপটাই থাকে, মন স্বস্তি পাবে কেমন করে?” তিনি সম্মুখে হাত প্রসারিত করিয়া আকাশের দিকে ইঙ্গিত করিলেন। চাহিয়া দেখিলাম, সূর্য অনেকক্ষণ ডুবিয়া গিয়াছে, কিন্তু আকাশ তখনও সূর্যাস্তের বর্ণে লাল এবং হলুদ রঙের মেঘে সজ্জিত হইয়া আছে। উপর হইতে সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়া আসিতেছে, কিন্তু পশ্চিমের রং তখনও যেন ছাড়িয়াও ছাড়ে নাই।

অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, “দেখেছ? এই কি আমাদের পক্ষে যথেষ্ট নয়? এই যেন আমাদের মাখনা দিতে পারে।”

বুঝিলাম বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিকের মন আজও পূর্বের মতই প্রাণীপূর্ব অবস্থায় রহিয়াছে, বাদ্যকা তাহাকে কিছুমাত্র স্পর্শ করিতে পারে নাই। তিনি অমৃতত্ব লাভ করিয়াছেন।

সন্তোষ সিংহ*

সন্তোষ আমাকে কয়েক দিন হইল চিঠি লিখিয়াছে—“এখানে পুতুর কাটার কাজ শেষ হ’লেই আবার অল্প একটা কাজ আছে—কংগ্রেসের সভা করা। জেলা কংগ্রেস আমাদের হাতে ভার দিয়াছে, সে জন্ত খুব চেষ্টা ক’রে সভা সংগ্রহ করতে হবে।

“এখানে বেশ এখন একটা না একটা কাজ নিয়ে আছি। দিনগুলো বেশ কেটে যাচ্ছে। আমার একটা বদ অভ্যাস যে যদি constant work এর মধ্যে না থাকি তবে আর মন টিকতে চায় না। কিন্তু এখন নাগাড় কাজের মধ্যে আছি ব’লে দিনগুলো কেমন যেন কেটে যাচ্ছে।

‘একটা পুতুর কাটার ভার আমার উপরে। সে জন্ত রোজ এক বেলা তিন মাইল দূরে অল্প গ্রামে থাকতে হয় আর বিকেলে এখানে এসে খানিকক্ষণ কেতে কাজ করি। সন্ধ্যার পর স্নান করে কাগজ পড়তে পড়তে রান্না হয়ে যায়। খেয়ে নেয়ে রাত্রি দশটা সাড়ে দশটার সময় শুই। কোথা দিয়ে যে রাত কেটে যায় জানতেও পারি না। আবার ভোরে উঠে স্নান করে নলদা গ্রামে চলে যাই। এমনি ভাবে দিনগুলো কেটে যাচ্ছে।”

বাস্তবিক আশ্চর্য ছেলে এই সন্তোষ। কাজে তাহার কোন দিন ক্লান্তি নাই, পরের বেগার দিতে তাহার জুড়ি পাওয়া ভার। যতক্ষণ শরীরে সামর্থ্য আছে ততক্ষণ বিনা বাক্যব্যয়ে কাজ করিয়া যাইবে, কেহ না বলিলে বিশ্রাম সে কিছুতেই করিবে না। সত্যাগ্রহের সময়ে

* নামটি প্রকৃত নহে। যদি এই নামে কংগ্রেসের কোনও কর্মী থাকেন, তিনি যেন ইহাকে নিজের চরিত্রের বর্ণনা ভাষিয়া ঘূষিত না হন। অন্ততঃ একবার নামের গোলাযোগে পড়িয়াছিলাম।

জেলখানায় একত্র বাস করিবার সময়ে দেখিয়াছি, বহু লোকের রক্ষন করিবার ভার গ্রহণ করিয়া সে ধোঁয়ায় গরমে এক মনে কাজ করিয়া যাইতেছে। দিনের পর দিন অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে তাহার চোখে কালি পড়িয়া গিয়াছে, নিজের ময়লা জামা কাপড় কাচিবার পর্বস্ত সময় পায় নাই। তবু যতক্ষণ না অপরে তাহাকে ছুটি দিয়াছে ততক্ষণ সে নিজেকে কখনও ছুটি চায় নাই। পরের একটা মিষ্ট কথায় সন্তোষ একেবারে গলিয়া যাইত। কিন্তু কেহ আপনা হইতে তাহার দিকে না চাহিলে সে কোনও ছুতা করিয়া কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিত না।

সন্তোষ আলস্কে যেমন ঘৃণা করিত, সর্বপ্রকার হীনতার প্রতিও তাহার সেইরূপ ঘৃণা ছিল। জেলখানায় তামাকের ব্যবহার একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু তাহা সন্তোষের একটি দুর্বলতা ছিল। সে প্রহরীদের মারফৎ লুকাইয়া নস্ত্র, সাবান প্রভৃতি আমদানি করিত। প্রহরীগণ সর্বদা তাহার কাছে চিঠি লেখাইতে আসিত বলিয়া সন্তোষের উপকার করিতে তাহাদেরও ক্লান্তি ছিল না। কিন্তু সন্তোষের গুণের মধ্যে সে একা কখনও কিছু ব্যবহার করিত না। তাহার নস্ত্র এবং সাবানের বহু অংশীদার জুটিয়া গেল। এক দিন বিকাল বেলায় দেখি সন্তোষ শুকনুখে ওয়ার্ডের পাশে কাঁটা তারের বেড়ার ধারে বসিয়া আছে। তারে কতকগুলি পাজামা ও গামছা শুকাইতেছে। কি হইয়াছে জিজ্ঞাসা করায় সে ট্যাক হইতে কোটা বাহির করিয়া মোটা এক টিপ নস্ত্র লইয়া বলিল, “দেখুন না, পাজামা কেচে শুকাতে দিবেছিলুম, কে তার বদলে একটা ময়লা পাজামা রেখে আমারটা নিয়ে পালিয়ে গেছে। যত সব চোর এই জেলখানায় এসে জুটেছে।” আমি হাসিয়া বলিলাম, “চোর জেলখানায় থাকবে না তো কোথায় থাকবে?”

অধিকাংশ সত্যাগ্রহীর প্রতি দারুণ রাগ লইয়া বাহির হইয়া

আসিলেও কিন্তু সন্তোষ কংগ্রেসের কাজ ছাড়িল না। জেল হইতে বাহির হইয়া সে আমাদের সঙ্গে বীরভূমে কংগ্রেসের আপিসে যোগ দিল। কিন্তু অল্প দিনে বুঝিতে পারিলাম যে তুই বংসর কারাবাসের ফলেও তাহার স্বভাব বিন্দুমাত্র পরিবর্তিত হয় নাই।

তাহার স্নেহের অত্যাচার আমাদের সকলকে মাঝে মাঝে সহ্য করিতে হইত, এড়াইবার যো ছিল না। এক দিন মশারি টাঙাইয়া রাজ্জে সন্তোষ আর আমি এক বিছানায় শুইয়া আছি। গল্প করিতে করিতে ঘুম আসিয়াছে, মশারি কেলিয়া দিয়া ঘুমাইবার আয়োজন করিতেছি এমন সময়ে সন্তোষের নজর পড়িল যে মশারির চাল ঠিক সমান নাই, একটি খুঁট কিছু উপরের দিকে উঠিয়া রহিয়াছে। অমনি চোখের ঘুম মাথায় চড়িল, সন্তোষ মশারির চাল খাটিয়ার তক্তার মত সমান করিবার কাজে লাগিয়া গেল। একবার করিয়া একটা খুঁট বাঁধে আবার ভিতরে আসিয়া দেখিয়া যায় কোথাও কোচকাইয়া আছে কি না; আবার অপর দিক হুতো কামিয়া দেয়, না হয় আমাকে তাহা একটু ধরিতে বলে। এমন করিয়া দস্তাধতির পর তাহার বিশ্বাস হইল যে মশারিতে আর কোথাও কোন জুটি নাই। ইতিমধ্যে আমাদের নড়া চড়ার স্বযোগে কয়েকটি নিরীহ মশক মশারির ভিতর আশ্রয় লইয়াছিল। সন্তোষ সন্ধান পাওয়া মাত্র কুলুঙ্গি হইতে এক পয়সা দামের একটি লাল মোমবাতি জ্বালাইয়া আমাকে ধরিতে বলিল এবং নিজে একটির পর একটি মশা মারিতে লাগিল। আমার চোখ তখন ঘুমে জড়াইয়া আসিতেছে। কিন্তু সন্তোষের উত্তোষ পূর্বে বাধা দিবার সাহস হইল না। অবশেষে তাহার মশা-মারা শেষ হইলে তবে ঘুমাইয়া বাঁচি।

শুধু কি তাই? নিজেরই উপর তাহার অত্যাচারের সীমা ছিল না? এক দিন রন্ধরের হিসাবপত্র দেখিতেছি এমন সময়ে

দেখিলাম জানালার ধারে মাছের শুইয়া সন্তোষ একটা ছোট ওয়ুথের শিশি লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছে। হঠাৎ সে কেমন একটা বিকট শব্দ করিয়া উঠিল এবং উঠিয়া বসিয়া দুই হাতে বুক চাপিয়া দরিয়া হাপানি রোগীর মত দাক্ষ্য হাঁপাইতে লাগিল। ঘর তখন ইউক্যালিপটাস অয়েলের গন্ধে ভরিয়া গিয়াছে। ব্যাপার কি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তাহার চোখ মুখের অবস্থা দেখিয়া মুখে মাথায় জলের ঝাপটা দিতে লাগিলাম এবং জ্বারে বাতাস করিতে লাগিলাম। সন্তোষ একটা কথাও বলিতে পারিতেছিল না, নিখাস টানিতে তাহার খুব কষ্ট হইতেছিল।

প্রায় পনের মিনিট পরে সে স্থির হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। জাগিয়া উঠিলে কি হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিলাম। তখন সে রহস্য উন্মোচন করিয়া বলিল, কে তাহাকে জানাইয়াছে নাকের মধ্যে কোন রকমে আধ আউন্সটাক ইউক্যালিপটাস ঢালিয়া দিতে পারিলে তাহার আর জীবনে কখনও সদি হইবে না। এক গাল হাসিয়া সে এখন বলিল, “এবারে দেখবেন আর জীবনে কখনও ঠাণ্ডা লাগবে না। পাঁচ আনা দিয়ে এক আউন্স কিনে এনেছিলুম, সবটাই একেবারে ভিতরে চলে গেছে।”

আমি তাহাকে আর কি বলিব, খালি মারিতে বাকি রাখিলাম। কোন দিন টোটকা চিকিৎসায় ছেলেটা প্রাণ হারাইয়া পাপের ভাগী না করে।

খাবার-দাবারের ব্যাপারে সন্তোষের একটা অসাধারণ বৈরাগ্য ছিল। একবার শহরে তাহাকে কংগ্রেস আপিসের ভার দিয়া রাখা হইল। কাছের মধ্যে কংগ্রেসের সভা করিবে, চবকা বিলি করিবে এবং কাটুনিদের কাছে স্তূতা পিগ্রহ করিয়া তাঁতি বাড়ি বুনিতে দিয়া

আসিবে। তাহার সহিত আরও দুই তিন জন কর্মী ছিল। কিন্তু তাহারা সকলেই অলস এবং শুধু ঘোঁকের মাথায় উগ্র রকম কাজ করায় অভ্যস্ত। এক জায়গায় স্থির হইয়া কাজ করার মত দৈর্ঘ্য তাহাদের ছিল না। সন্তোষ কংগ্রেস আপিসের ভার গ্রহণ করিবার প্রায় দুই মাস পরে আমি এক দিন উপস্থিত হইয়া দেখি সে একাই রহিয়াছে এবং তাহার শরীরও কিছু দুর্বল এবং পাত্তবর্ণ হইয়া গিয়াছে। অপার কর্মীগণ কোথায় জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, “তারা কিছু করবে না, এমন কি রামা পর্যন্ত করতে চাইত না। কেবল বাজার করতে যেত আর এর ওর বাড়িতে চা খেয়ে গল্প করে বাড়ি ফিরত। আমি তাই উপরো উপরি সাত দিন ভাত আর উচ্ছের অম্বল রেঁধেছিলুম। ভাল-টাল কিছু নয়। তাতেই সবাই পালিয়ে গেল।” আশ্চর্য হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “তুমি কি এখনও তাই চালাচ্ছ না কি? শরীরের এমন দশা হয়েছে কেন?” সে তখন জানাইল মহাত্মা গান্ধীর “আরোগ্য দিগদর্শন” পড়িয়া সে কেবল কাঁচা আহাৰ করিতেছে। তখন নীতকাল। পালংশাক, মূলা হইতে আরম্ভ করিয়া কপি ও আলু পর্যন্ত অপর অবস্থায় উদরস্থ করিতেছে! মাছের পর পক্ষি দুই বেলা আহাৰ করা যে একটা কুসংস্কার এ জানও ইতিমধ্যে সন্তোষ অর্জন করিয়াছে।

তাহার অল্প বিশেষ শক্তিত হইলাম এবং তাহার শীর্ণ শরীরের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলাম, “কিন্তু তোমার শরীর যে বড় খারাপ হয়ে যাচ্ছে।” সে দমিবার পাত্র নয়। বলিল, “না দাদা, শরীর খুব ভাল আছে। এমন হালকা লাগে যে সর্বদাই কাজকর্ম করতে ইচ্ছা করে। খাবারের কথা ভাবতেও ইচ্ছা করে না। সেদিন রমেশবাবুদের বাড়িতে কাপড় দিতে গেলুম। দৈন্ত্রি বৌদি খেতে বসেছেন।

মশলা দেওয়া মাছের তরকারি দেখেই প্রথমে একবার থাওয়ার দারুণ ইচ্ছা হ'ল। তার পর জানেন কি করলুম? মনকে বললুম, 'বটে, তোমার লোভ যায় নি? আচ্ছা, আজ পালাংশাকও রাজে বন্ধ।' "

বুখিলাম ছেলেটাকে একা ছাড়িয়া গেলে না থাইয়াই মরিয়া যাইবে। আহারতত্ত্বের সম্বন্ধে অত্যধিক জ্ঞানের ফলে হয়তো অবশেষে অনাহারেই সে প্রাণ হারাইবে। তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিলাম। কিন্তু আমাদের হরিজন পাঠশালায় তাহাকে বেশি দিন বাধিয়া রাখা গেল না। নদীয়ায় ছুভিক্ষের সংবাদ পাইবামাত্র সে ছুটি লইয়া চলিয়া গেল এবং সেখানে নানাবিধ গুরুতর খাটুনির মধ্যে পরম সুখে থাকিয়া সম্প্রতি জানাইয়াছে, কোন্ দিক দিয়া যে তাহার দিন কাটিয়া যাইতেছে তাহা সে টেরই পায় না। আশ্চর্য্য ছেলে!

হুনা

হুস্তর সিদ্ধু নাই মাখিমা।
নয় জন হিন্দু, গায় আলখামা
মুসলীম বর্ণজন, বলে জয় আল্লা—
বিস্তর মারামারি বিস্তর হামা
চাকরী কাউনসিলে চলে জোর পামা
হরি ন্তা, খোদা নয়, জয় বাস্ততামা।

কেন

১

টুস্কি বাজায়ে শুনি ধহকের টকার,
তবলা বলিয়া ভাবি টেরিলের কাঠকে,
লাগুবড়াবড়ে শুনি সেতারের ঝঙ্কার,
থাঙের চেয়ে কেন ভালবাসি চাটকে!

২

লেখনীকে কেন হায় মনে করি বন্দুক,
গোলাগুলি কেন ভাবি আছে সব ওষ্ঠে,
বস্তিবালাকে ভেঙে বলি 'তোর কোন্ দুখ?
দয়া করে এসে বোস্ পরাণ-প্রকোষ্ঠে'!

৩

লহা হাত পা কেন আকারীকা আঙ্গুল,
কান ঢাকা বুক গোলা কেন যত চির।
লেজ নাই তব্ মোরা কেন নাড়ি লাঙ্গুল,
যাবতীয় সেন, সোম, শম্ভা ও মিজ!

৪

পিলে রোগা প্রেয়সীর বিবর্ণ অঙ্গের
মলিন শাড়িতে হেরি স্লাম্পেন্ বর্ণ!

এবং মাতাল হই! মনে হয় বঙ্গের
অন্ধনে মূর্ত্ত বা ইবসেনি স্বপ্ন!

৫

স্বপ্নী হই কেন ভেবে শালিকের চাঁৎকারে
শক্তি সিংহেরা আছে নত মন্তে,
স্বয়ং ঐরাবৎ পলায়েছে দিকারে,
কম্পিত শ্রীগুরু আছে জোড় হস্তে!

৬

বিজ্ঞান, আটের যত বুলি বিশ্বের
মুখস্থ কেন করি টাটকা ও মজ।
পেটেতে অন্ন নাই তবু কেন নিঃশ্বের
স্বপ্ন করে চাই রোজ পান করা মজ!

৭

হেসো নাকে। মানে আছে এ জ্বরদন্তির
কেন যে কবিতা লিখি না মানিয়া ছন্দ!
কেন মোরা দল বেঁধে হইয়াছি অস্থির
গোবরের মাঝে পেতে গোলাপের গন্ধ।

৮

এক ঘেয়ে জীবনের এ নরককুণ্ডেই
হে বন্ধু, মাঝে মাঝে চাই বৈচিত্র্য;
চরণ উর্দ্ধে তুলি' নীচ করি মণ্ডেই
ঘোষালকে মাঝে মাঝে ভাবি তাই মিত্র।

“বনফুল”

হরতনের বিবি

আমাদের ক্লাবের গোবর্দ্ধন চাটুযো ত্রিভুজ খেলায় অস্থিতীয়। শুধু তাহাই নহে, তাহার মত আমবািশাস প্রেম্যার খুব অল্পই আছে। কিন্তু গোবর্দ্ধনের ধারণা যে সে অত্যন্ত আনন্দলাকি ইন কার্ডস। কারণ এ পর্য্যন্ত কোন দিন সে খেলায় ক্ষতিতে পাবে নাই, তাসপ্রাপ্তির দুর্ভাগ্য এবং পার্টনার পাচকড়ি উভয়ে মিলিয়া এ যাবৎ গোবর্দ্ধনকে দমাইয়া রাখিয়াছে। ত্রিভুজ পাচকড়ির মত টিমিড প্রেম্যার আর নাই, পার্টনারকে বিশ্বাস করিয়া তাহার কল সাপোর্ট করা পাচকড়ির সাহসে কখনও কুলায় না। ফলত গোবর্দ্ধন প্রত্যেক দিন অব্যর্থ গেমগুলি হারাওয়া অথবা জোর করিয়া ডাকিয়া হাজারের পর হাজার ডাউন দিতে থাকে। ইহার পর গোবর্দ্ধন পাচকড়িকে ঠিক না মারিলেও—তাহার প্রতি একেবারে মারাত্মক হইয়া উঠে, এবং যতক্ষণ পাচকড়ি তাহার সিগারেট কেসটি খুলিয়া তাহার সম্মুখে ধারণ না করে, ততক্ষণ তাহার কোধানল কোন ক্রমেই প্রশমিত হইতে চাহে না। অথচ পার্টনার হিসাবে পাচকড়িকে সে ছাড়িতে পারে না, ইহার কারণ সিগারেট ব্যতীত আরও কিছু আছে,—তাহা বলিতেছি।

ক্লাবের মধ্যে ত্রিভুজ যেমন গোবর্দ্ধন, অর্থাৎ তাহারই মতামতসারে, পাচকড়ি তেমনি টেনিসে। উভয়ে উভয়কে নিজের স্কিল শিক্ষা দিবার জন্য এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা পড়িয়াছে। ইহা হইতে কাহারও নিষ্কৃতি নাই। গোবর্দ্ধনের মধ্যে—ফণ্টার এবং ক্যালবার্টসন, পাচকড়ির—পেরি এবং কোসে।

টেনিস কোর্টে পাচকড়ির মূর্ত্তি অজ্ঞানরূপ, গোবর্দ্ধন তখন তাহার

শিক্ষানবীশ কিন্তু এ যাবৎ তাহাকে বিভিন্ন রূপ মারের কায়দা শিক্ষা দিবার জ্ঞান অশেষ প্রকার উপদেশ দিয়াও কোন ফললাভ করিতে পারে নাই। উভয়ে লাভসেটের পর লাভসেট খাইতে থাকে, কারণ এ পর্য্যন্ত পাঁচকড়ির কোন বল কোর্টের মধ্যে পড়ে না, এবং গোবর্দ্ধনের কোন বল নেট পার হয় না। এ জ্ঞান পাঁচকড়ি নিরন্তর গোবর্দ্ধনের অক্ষমতাকে দায়ী করিয়া তাহাকে যে সব গালিগালাজ করিতে থাকে—তাহা হজম করা গোবর্দ্ধনের পক্ষে কখনই সম্ভব হইত না যদি গোবর্দ্ধন না জানিত যে সন্ধ্যার পর তাহার পালা পড়িবে, এবং তখন সে পাঁচকড়িকে রীতিমত বুখাইবে, প্রস্তুত অপদার্থকে।

পাঁচকড়ি বলিত, এই জ্ঞান গোবরা—ওকোমটোর ব্যাকহাও ড্রাইড—

ফলে বলটি কোর্ট পার হইয়া দূরবর্তী তালবৃক্ষের শীর্ষদেশে অতিক্রম করিয়া চাটুঘোদের পুষ্করিণীর মধ্যস্থলে স্থানলাভ করিত।

গোবর্দ্ধনের দুর্বল প্রতিঘাত যখন বলটিকে নেটের ওপারে পাঠাইতে অক্ষম হইত, পাঁচকড়ি ধমক দিয়া বলিত, ওই কি একটা মার হ'ল! বলেছি না অলওয়েজ হার্ড হিট করবি, তাতে বল আউট হয়—কোন ক্ষতি নেই, তা না হ'লে হাতে শট বসবে কি করে? জানিস, সে দিন নর্থ ক্লাবে মদনমোহনের সঙ্গে আমার খেলা পড়েছিল, কিছু না, শুধু এক একটা ড্রাইডে বাছানকে হিমসিম খাইয়ে দিলাম।

আমরা অবশ্য জানিতাম। যাক, তাহা প্রকাশ করিতে পারিব না। কারণ পাঁচকড়ি হালে বন্ধিও প্রায়কটিস করিতেছে,—তাহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলাই নিরাপদ নহে।

সন্ধ্যার পর। গোবর্দ্ধন বলিতেছে, জ্ঞান পাঁচকড়ে, কাল তুই বড্ড ভুল খেলেছিস, খাও হাও অলওয়েজ কভার করে দিবি, নাউ,

আই হ্যাভ ওপ'ড অ্যাট টু স্পেড্‌স,—জাট মিল্—সাড়ে পাচটা কুইক টিক আমার হাতে—

অপোনেট হলধর ও প্রেমচাঁদ হাঁ হাঁ করিয়া উত্তিত, একি তুমি ইনডিকেশন দিয়ে খেলতে চাও নাকি?

পাঁচকড়ি বোমালুম পাস দিয়া যাইত।

গোবর্দ্ধন রক্তচক্ষু করিয়া তাহার হাতখানা সকলের সম্মুখে মেলিয়া ধরিয়া বলিত, কি সর্দনাশটা তুই করলি বল দেখি পাঁচকড়ি? একখানা স্নায়ের হাত অমনি অমনি গেল! এই দেখ স্পেড্‌সে নো লুজার, হার্ট্‌স অফ, ক্লাব্‌সে সিংলটন টেকা—আর ডায়মণ্ডসে—নাঃ, আচ্ছা তোমরাই বল এতে কি বলতে ইচ্ছে করে পাঁচকড়িকে?

হলধর ও প্রেমচাঁদ মহানন্দে সোরগোল করিয়া উত্তিত, বেশ হয়েছে, এখন খেলে বাঁচ।

পাঁচকড়ি স্তিমিত নেত্রে বলিত, আমি কি করব, আমার সাপোর্ট দেওয়ার কিছু না থাকলে?

গোবর্দ্ধন প্রাণপণে চীৎকার করিয়া উত্তিত, ইউ ফুল, ইউ ব্রকহেড—ইউ মাষ্ট কীপ দি কল ওপন।

ইহার পর গোবর্দ্ধন ও পাঁচকড়ির মধ্যে কোন বাক্যালাপ হইত না, কেবল পাঁচকড়ি সিগারেটের কেসটা গোবর্দ্ধনের সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া ধরিত এবং তাহাদের প্রতিকূলে ডাউনের অর্ধ হাজারের পর হাজার চাপিতে থাকিত।

গোবর্দ্ধন মাঝে মাঝে বক্ষবিদ্যার দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া আপন মনে বলিত, ও, এমন হতভাগা গাধাকে নিয়ে পড়েছি আমি, সিগর হাতগুলো সব জলে গেল মশায়, দুস্তোর, কাল থেকে আর খেলতেই আসব না।

কিন্তু ইহা নিতানৈমিত্তিক। পরের দিনও গোবর্দ্ধন যথেষ্ট আশায়িত হইয়া পাঁচকড়িকে লইয়া বসিত এবং পাঁচকড়ি যতই তাহার আশার মূলে কুঠারাঘাত করিত—ততই গোবর্দ্ধনের আন্তরিকতা দ্বারা বিদীর্ণ হইত।

আসল কথা, গোবর্দ্ধনের জীবনের সর্বোচ্চ আশা যে সে এক দিন ভালনারের ছাণ্ডে গ্র্যাণ্ড স্নাম করিবে। তাহার পর জীবনের অবশিষ্ট দিবসগুলিতে হারিতে থাকিলেও তাহার কোন ক্ষোভ থাকিবে না। দিনের পর দিন সে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছে।

সেই বাঞ্ছিত দিবস এক দিন অত্যন্ত আশিয়া উপস্থিত হইল। সেদিন পাঁচকড়ির মেজাজও বৈরাগ্য আশ্রয় প্রকারে খুলিয়া গেল—তাহাকে বৈবের সন্ধ্যায় বাতীত আর কিছুই বলা চলে না।

গোবর্দ্ধন ও পাঁচকড়ির ভালনারের ছাণ্ড, অর্থাৎ এইমাত্র উহার গেম করিয়াছে। গোবর্দ্ধন এইবার ছই ইন্সবনে কল আরম্ভ করিয়া পাঁচকড়িকে জানাইল তাহার হাতের শক্তি অত্যধিক। পাঁচকড়িও তাহাকে রকমারি কলের দ্বারা সাহায্য করিল। চার চিড়িতন কল হইবার পর পাঁচকড়ি ডাকিল, ফোর নো ট্রাম্প্‌স। গোবর্দ্ধন আনন্দে আত্মহারা হইয়া বৃষ্টি বাকি কয়টা টিক নিশ্চয় পাঁচকড়ির হাতে, অতএব দিস ইজ দি অপারচুনিটি, আর পাঁচকড়ির উপর কল ছাড়িয়া দেওয়া নয়, নাউ অর নেভার! সে মগধে ডাকিয়া উঠিল, গ্র্যাণ্ড স্নাম ইন নো ট্রাম্প্‌স। তখন তাহার হৃৎস্পন্দন চৌদুন লয়ে বাজিতেছে। উত্তেজনা তাহার হাত পা কাঁপিতেছে।

পাঁচকড়ির হাতখানা লইয়া সে দেখিল, হা গ্র্যাণ্ড স্নাম হইবে ঠিকই, যদি হরতনের বিবিটা finesse করিয়া ধরা যায়। হলধরের ডারিং ছাণ্ড, ওরই হাতে বিবিটা place করা ঠিক।

গোবর্দ্ধন ইন্সবনের টিকগুলি আদায় করিয়া কহিতনটাকে establish করিল, এইবার চিড়িতনটা খেলিবার পূর্বেই হরতনের বিবি কিনেস করিতে উদ্যত হইল। ডামির হাত হইতে ছোট একটি হরতন খেলিয়া হলধরের পর গোবর্দ্ধন দশ মারিয়া প্রেমচাঁদের হাতে ছাড়িয়া দিল। এই মুহূর্ত্তে তাহার মনে হইল যেন সে এভারেট শূন্দের শিখরে পা বাড়াইয়াছে, হয় এখনই জীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য হস্তগত হইবে, নচেৎ উনত্রিশ হাজার ফুট নিয়ে মৃত্যুর অন্তলক্ষ্য গম্বীর তাহাকে গ্রাস করিয়া লইবে।

কিন্তু হরতনের বিবি প্রেমচাঁদের হাতে, বিবি মারিয়া সে পিঠ গুটাইয়া লইল, বলিল, বাস, এইবার গ্র্যাণ্ড স্নামের দফা শেষ।

সঙ্গে সঙ্গে গোবর্দ্ধন মুচ্ছিত হইয়া পড়িল। টেঁচারে করিয়া আমরা গোবর্দ্ধনকে তাহার বাটিতে লইয়া আসিয়াছি। তাহার আর জ্ঞান হয় নাই, ডাক্তার আসিয়া বলিলেন—অ্যাপোপ্লেক্সি, জীবনের আশা নাই।

গোবর্দ্ধনের পায়ের নিকট তাহার স্ত্রী ইন্দুমতী অশ্রুবিসর্জন করিতেছে, পাঁচকড়ি বিষম বদনে শিয়রে আসীন। হলধর পাশে ঝাঁড়াইয়া নিরন্তর স্বীয় কেশাকর্ষণ করিতেছে, এবং বলিতেছে, হায়, একি হ'ল! প্রেমচাঁদ অপরাধীর মত নিশেধে গালে হাত দিয়া বসিয়া আছে।

গোবর্দ্ধনের মৃত্যু ঘটিল। তাহার বন্ধুবর্গ সকলে তাহার চিতার উপর এক একটি নূতন প্যাকেট বহুমূল্য তাস উপহার দিলেন। তন্মধ্যে প্রত্যেক প্যাকেটের হরতনের বিবিটা টানিয়া দেওয়া হইল। গোবর্দ্ধনের চিতানল জলিয়া উঠিল এবং তৎসহ হরতনের বিবিকুল জলিতে লাগিল। পাঁচকড়ি আর চোখের জল রাখিতে পারিল না, হাতের সিগারেটটার সর্গশেষ টান দিয়া সে কাঁদিয়া উঠিল, ওরে গোবরা রে, কেন তুই

গ্যাও লাম ডাকতে গেলি রে, আমিই বা কেন তোকে সাপোর্ট দিলাম রে ভাই!

গোবর্দ্ধনের চিতানল নিভিয়া আসিল। কিন্তু এ কি অদ্ভুত ব্যাপার! জলন্ত অগ্নির আঁকিয়া বাকিয়া যেন ঠিক হরতনের বিবিরই আকার ধারণ করিয়াছে! আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! আমরা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিলাম। পাঁচকড়ি উন্নত স্বরে কহিল, তবে রে সর্ব্বনাশী, মরবার পরও তাকে নিস্তার দিবি না? বলিয়া সে ঘুসি পাকাইয়া চিতামির উপর লাফাইয়া পড়িতে উদ্ভত হইল, প্রেমচাঁদ তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। কিন্তু পাঁচকড়ি বস্ত্র অড্যাস করিতেছে, তাহার ঘুসি বিকল হইবার নহে—তাহা সটান বসিল প্রেমচাঁদের নাকে এবং তাহার নাকটি একেবারে গুঁড়া হইয়া গেল। সেই হইতে প্রেমচাঁদ নাকে কথা কয়।

কিন্তু অগ্নিময়ী হরতনের বিবি ইতিমধ্যে যেন একবার ফিক করিয়া হাসিয়া লইল।

রাস্তাবাহাদুর

হুতো না হুতো না রাস্তাবাহাদুর মা বীণাপাণির সেবি—

কাল হ'তে পার, বেঁড়া হ'তে পার, দ্বিতীয় পক্ষ may be.

দরদর ধারে অশ্রু ধরিয়া ভিলে জবজবে কোলে,

কোট-পাখুন অঙ্গে চড়ায়ে চাঁচি খিতে হবে খোলে :

সেলাম করিতে হবে চিরকাল জিপুরা বর্ধমানে,

চোখে তত জল করিবে বতই ভুলিতে পাইবে কানে।

বিলাত মাইয়া বলিতে হইবে কোথায় জীমিঞাপুর,

রাস্তাবাহাদুরী সহিবে নী দান্তে, হতে পার বাহাদুর।

কলিশন

জীবন-যাত্রার তুলনা মেলে না,
কেউ বলে শ্রোতের মতন
ভেসে যায়, যেমন গিয়েছে ভেসে
আরও বহু ঢেউ যুগান্ত ব্যাপিয়া
একই পথ বেয়ে,
কত গিরি গুহা পার্শ্বতা প্রদেপ
সমতল ভূমি পার হয়ে,
বৃক্ষ মহীকূহ নগর প্রান্তর
সবের গা ঘেসে,
শেষ অবধি ধীর মন্দ গতি
পড়িয়া সমুদ্রে হয় শেষ :
বড় একঘেয়ে বৈচিত্র্যবর্জিত,
তবে ব্যক্তির নিজের কাছে
পরিবর্তনশীল।
কেউ বলে চক্রে মতন ঘোরে
এ জীবন,
অর্থাৎ ঢাকা ভাঙবার আগে
লক্ষ বার একই ভাবে
ঘুরে ঘুরে
ধোড় বড়ি খাড়া ছন্দে •

হয়ে যায় শেষ :
 না আছে বৈচিত্র্য
 না পরিবর্তন,
 শুধু গতি
 গতাস্তর বিহীন।
 আজ কাল শুনি—
 জেমস ওয়াটের পর থেকে—
 রেলের সঙ্গে জীবন খুব মেলে।
 অর্থাৎ জীবন চলে যায়
 নিজের বাঁধা পথে,
 চারি পার্শ্বে ক্ষত স'রে যায়
 কত কিছু—
 কত স্টেশন, কত দৃশ্য,
 কত সঙ্গী, চেনবার আগেই
 বিদায় হয়ে যায়।
 রেলগাড়ী কিন্তু চ'লে চলে
 ঠিক নিজ পথে,
 কোন ব্যতিক্রম নাই
 তার পূর্বে নির্দিষ্ট পথের।
 ঠিক উপমা!
 শুধু সব রেলগাড়ী এক নয়,
 কোনটা মালগাড়ী পাড়ে থাকে
 সাইভিংএ শত দিন,
 কোনটা শুধুই ঘর মেরামত,

আবার হয়তো একটা
 এক্সপ্রেস কি মেল।
 কোনটা চলে আশ্রা দিল্লী,
 কোনটা বৈচি বনগাঁ।
 গোড়ায় টিকিট ঠিক কেনা চাই
 নয় তো মুদ্বিল;
 আর মুদ্বিল,
 টিকিট প্রথম শ্রেণীর ও
 রেলগাড়ী মেল
 ও গন্তব্য উত্তম পথে হলেও,
 হয়ে যায় কখন সখন
 কলিশন।

ডিরেল্ড্

ডিরেল্ড্ যারা হয়েই আছে সাতশো বছর আগে,
 কলিশনের ভয় তাহাদের মিথ্যা বেথাও দাড়া,
 দুই জোয়ালে জুতে নিয়ে যণ্ড এবং ছাগে
 কাদায় যাত্রা পথ চলছে, তাদের কোথায় বাধা?
 ল্যাজ মলি আর মাছি তাড়াই কিবা হিলিম ফুঁকি—
 নৃদ্বা পানে চেয়ে মিছাই ধুকচে পৃথাম্বী।

পৃথিবীর পাগলামী

(পূর্বসূত্র)

সে কয়েকটি কথায় শুধু এই প্রকাশ—

ছানকিন, ৪ঠা সেপ্টেম্বর।—চৈনিক জনশাসনতন্ত্রের আন্তর্দেশিক মন্ত্রী আজ কর্তৃপক্ষীয় রিপোর্ট ছাপিয়েছেন, যার দ্বারা বোঝা যায়, কুড়ি কোটি লোক আজ সেখানে কার্ধ্যহীন। সন্ধান নিয়ে আরও সংবাদ পাওয়া গেছে, দুর্ভিক্ষ মড়কারিতে ক্লিষ্ট তিন কোটি চল্লিশ লক্ষ লোককে বাদ দিলেও, হালের বহুপীড়িত জনসংখ্যা তিন কোটির বেশীই পড়ায। চীনদেশের অধিবাসীদের অর্দ্ধাংশই আজ উপায়হীন।

প্যারিসের চীনদেশীয় দূতনিবাস রয়টার প্রেরিত সংখ্যার নিভুলতা স্বীকার করে বলেছিল, “এ সব সংখ্যা, মোটামুটিই ধরা হয়েছে। আমরা সংবাদ পেয়েছি, দুর্ভাগ্যদের সংখ্যা চার থেকে পাঁচ কোটি পর্যন্ত; এদের না আছে আশ্রয়, না আছে রুটি; এক কথায় এরা আসন্ন দুর্ভিক্ষ-পীড়িত হতভাগার দল।”

“এদের মধ্যে মৃতের সংখ্যা কত?”

“কোন ষ্ট্যাটিষ্টিক্সই আজ পর্যন্ত সে সংখ্যা ঠিক করতে পারে নি। কেবল এই পর্যন্তই আমরা বলতে পারি যে, এ ধরণের দুর্ঘটনা চীনদেশের ইতিহাসে আজ পর্যন্ত দেখা যায় নি।”

হুদিন পরেই লেখক এরোগেনে চড়ে বসলেন; এই এরোগেনে প্রতিদিন সকাল আটটার সময় ল্য বৃঞ্চে ছেড়ে মন্ডো পর্যন্ত যায়; পর দিন বেলা একটার সময় তিনি সোভিয়েটিক রাজধানীতে

উপনীত হন এবং তখনই ট্রান্স-সাইবেরিয়ানের ট্রেন ধরেন। রাশিয়া ও চীনের মধ্যবর্তী সীমানায় আফ্রানো-চাইনিজ সোসাইটির এক নূতন এরোগেনে ছিল, এখানে পিকিন পর্যন্ত যায়। তাতে উঠে তিনি কাল্পানে আসেন।

বেশী দিনের কথা নয়, সীমানা থেকে পিকিং পর্যন্ত এরিয়েল সাভিস ছিল; কিন্তু এক দিন মোঙ্গলরা একটা পোষ্টাল এরোগেনেকে অবতরণ করতে বাধ্য করে, সেই থেকেই সাভিস বন্ধ। পাইলট ও রেডিও-টেলিগ্রাফিষ্ট গুস্তাভেরর কাজের অভিযোগে এখনও জেলে পচছে। এ সত্ত্বেও অনন্তবিশ্রুত বনহীন সমতল প্রান্তর এবং পর্বতের উপর দিয়ে আবার ওড়া হ'ল; ঘন কুয়াশা আর মন্ডোলিয়ার উপর মেরুদেশীয় ঝঝা ভেদ ক'রে এরোগেনে ছুটে চলল।

এ কথা সত্যি যে মক্কাভূমির উপর দিয়ে এই রোমান্টিক অথচ বহু ধরণের যাত্রার বেশ বর্ণনা করা চলে, কিন্তু চীনদেশের যে অবস্থা, সে অবস্থায় কি এর কোন প্রয়োজন আছে? যে সব কল্পনাভীত ভীষণ ব্যাপার তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন, তার তুলনায় এই—পৃথিবীর অর্দ্ধপথ এরোগেনে অতিক্রম করা বা মন্ডোলদের হাতে মারা যাবার বিপদকে অবহেলা করায় কি বিষয়ের কিছু আছে?

এক সুইডেনবাসী, যিনি বর্তমানে এক জন মন্ডোলদেশীয় অভিজাত হয়েছেন, তাঁরই সম্পত্তির কাছে, শহরের সীমানায় এরোগেনে নামান হ'ল। এই অদ্ভুত সুইডিশ ভদ্রলোকের নাম অগাষ্ট লার্সন; ইনি উর্গার জীবন্ত বৃদ্ধ হতুহুতুর বদ্ধ ছিলেন এবং এখন সমস্ত মন্ডোল রাজবংশেরই বদ্ধ। ইনি এদেশকে এদেশের অধিবাসীদের চেয়েও ভাল জানেন; সেই কারণে একে লোকে এক জন নেতা ব'লে গণ্য করে। রাজারা উটের ক্যারাবান নিয়ে এর সঙ্গে দেখা করতে আসেন এবং

এর সঙ্গে সমানে সমানে আলাপ করেন। উটের দল যেখানে ছিল তারই কাছে লেখকদের দাতব এরোপ্লেন বিশ্রাম করছিল।

শত শত জন্তু, খুঁচাল টুপী মাথায় শত শত উষ্ট্রচালক এবং মিলিটারী গার্ড। সামনেই রাশিয়ান কন্যাল; রক্তপাতকা বাতাসে পত পত করে উড়ছে; রাশিয়ার প্রভাব এখানে দিন দিন বেড়েই চলেছে, এ তারই চিহ্ন।

এক টেবিলে বসে আছেন তাঁরা। টেবিলের উপর তিস্ততেক লামার মন্দির থেকে আনা এক বাস্ত-যন্ত্র—টোলকের মত; এ যন্ত্রটি দুটো মাথার খুলি দিয়ে তৈরি—একটা ছেলের, একটা মেয়ের; যন্ত্রের পাশেই হাড় দিয়ে গাঁথা এক মালা।

লাস'ন লেখককে জিজ্ঞাসা করলেন, “কিসের জন্তে আপনি নিজের জীবন বিপন্ন করতে এই চৈনিক নরক-কুণ্ডে এসেছেন? ধরা যাক যে ছড়িঙ্ক-পীড়িত স্থানে আপনি উপনীত হতে পারলেন, ইয়াংসিকিয়াং-এর উপত্যকার নরক থেকে বেঁচে বেরুতেও পারলেন; ধরে নিলাম আপনি মড়কের কবলে পড়লেন না বা অনাহারে প্রাণ দিলেন না, কিংবা ডাকাতদের গায়ের ছাল তুলে নেওয়ার হাত থেকেও বেঁচে গেলেন; বৃহলাম, চীনদেশে এই যে প্রাণের সব ধ্বংস করছে, তার হাত থেকে আপনি বেঁচে ফিরে এলেন, কিন্তু কি হবে তাতে আপনার, কে আপনার কথা শুনবে, কে এই কোটি কোটি লোকের দৈহিক ও মানসিক যন্ত্রণার সম্বন্ধে একটুও উদগ্রীব হবে, বলতে পারেন?”

আমেরিকান এক পণ্ডিত এ দলে ছিলেন। তিনিও লাস'নের কথায় সাহায্য দিলেন।—কিন্তু এক জন এশ্বিনীয়ার বললেন, “অহুমতি করেন তো আমি ছ কথ্য বলি। চীনে যা ঘটছে, তার প্রকৃত সংবাদ জগতের জ্ঞান দরকার।” এর কারণ অতি সোজা। এক্ষেত্রে এই

অভূতপূর্ব বিপদের সংবাদের জন্ত কোন কৌতূহলের কথাও উঠছে না, দয়া-দাক্ষিণ্যের কথাও উঠছে না। নিজের আশ্রয়কার জন্তেই ইউরোপের সব জ্ঞান দরকার। চীনের ব্যাপারের মধ্যে, স্বচ্ছদৃষ্টিতে কি হচ্ছে তা দেখা, ইউরোপের দরকার।

“সোভিয়েটক পঞ্চবাষিকী প্রাণে মধ্য-এশিয়ার ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালাইজেশনের জন্তে চৌত্রিশ কোটি ফুড়ি লক্ষ ডলার সোনার বায়ের কথা ধরা হয়েছে। মঙ্গোল আদেশ অনুসারে আমেরিকান এশ্বিনীয়াররা চীন-সীমান্তের লম্বালম্বি যে রেলওয়ে করছে, তার ফুড়ি জগতে নেই। টম্ফের হুশো মাইল দক্ষিণে বিরাট এক মেটালার্জির কারখানা, কুসনেটস্কে তৈরি হচ্ছে; এও আমেরিকান এশ্বিনীয়ারদের হাতে এবং এর ধরচা পড়বে প্রায় পনের কোটি ডলার। উরালে ম্যাগ্নিটোগরু প্রায় তৈরি হয়ে গেছে; এই বৃহৎ ইস্পাতশালা আমেরিকার অতি-আধুনিক প্রণায় তৈরি। এই দুটো কারখানাকে পূর্ব থেকেই হ'ক আর পশ্চিম থেকেই হ'ক, কোন রকমে আক্রমণ করা সম্ভব হবে না; এবং ত্রিশ দিনের মধ্যে এ দুটোই যুদ্ধের গোলাগুলি তৈরি করার কারখানায় রূপান্তরিত হতে পারবে। চীন-সীমান্তের সঙ্গে প্যারালেল যে ব্রড-গেজ লাইন গেছে, তা এই স্থানকে যুক্ত করেছে। আর এই সীমান্তের লম্বালম্বি সব স্থানেই রাশিয়ার প্রবল প্রচারকার্যে অনেক ভাল ফলই ফলছে।

“ষ্টালিন সর্বদাই বলেন, সমস্ত এশিয়াকে সোভিয়েটক হতে হবে। তিনি এ কাজের জন্তে রাস্তা তৈরি করছেন অতিরিক্ত ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালাইজেশনের সাহায্যে, এবং এর জন্তে যে পূর্ব-সর্বের আবশ্যক তাও করতে বাকি রাখছেন না।

“যথচ দেখুন, আজ যখন সেই আইডিয়ালের গোড়াপত্তনের কাজ

শেষ হতে চলেছে, অমনি চীনদেশ বন্ধায় ডুবল। জগৎ যে ধরণের দুভিক্ষ জীবনে দেখে নি, সেই ধরণের দুভিক্ষ দেখা দিয়ে লক্ষ লক্ষ লোক ধ্বংস করে দিলে। দেশ এখন সোভিয়েটদের কাজের উপযুক্ত। কারণ, ধীরে ধীরে সমস্ত জগতে রেভলিউশনের ক্ষেত্র যারা তৈরি করছেন, চীনদেশের আজকের এই সব-জিনিষের অভাবই তাঁদের প্রধান সহায়।

“ইউরোপ আমেরিকার ব্যবসার বাজার হচ্ছে এই বিশাল চীনদেশ, যা এখনও একেবারেই ব্যবহার করা হয় নি। গত বছরে এ দেশে আমেরিকা থেকে আমদানির মূল্য পনের কোটি ডলার পর্য্যন্ত উঠেছিল। চীনদেশের সমস্ত জনসংখ্যার প্রয়োজন মেটাবার জন্তে দুই মিলিয়র্ড ডলারের আমদানির দরকার, অথচ এ বছর চীনদেশের এক ডলারও আমদানি করবার সামর্থ্য নেই; এ দেশের এই কোটি কোটি ক্ষুধিত অধিবাসীর অবস্থা সমস্ত জগতের কলকারখানা বন্ধ করে দেবে। এদের ক্ষুধা, লক্ষ লক্ষ ইউরোপীয়ান ও আমেরিকান শ্রম-জীবীদের কর্মহীন করবে এবং চীনের এই কল্পনাভীত দুর্বস্থা সমস্ত জগতেরই দুর্বস্থার সৃষ্টি করবে। ইউরোপে যেমন সকলের বিশ্বাস, চীনদেশ আমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে অবস্থিত, এ বিশ্বাসের কোনই ভিত্তি নেই; তার আজকের এই দুশ্চিন্তা কাল ইউরোপের দুশ্চিন্তায় পর্য্যবসিত হতে পারে।”

ক্রমশ

জিস্কার গ্রন্থ অবলম্বনে

শ্রীতরুণ ঘোষাল কর্তৃক লিখিত

ছবি-ওয়াল গম্প

ছবিগুলি দেখিতে দেখিতে আগ্রহ জন্মিল, তাহারা কি নির্দেশ করিতেছে তাহা জানিবার জন্ম। কোন ছবিতে আছে কার্যবিশেষ-রত, আবার কোনটাতে ভাববিশেষ-উদ্বেলিত এক বা বহু ব্যক্তি-বিশেষ। এইরূপ পাঁচ-ছয়টি। সে ব্যক্তিবিশেষরা কে, তাহারা কেন ঐরূপ স্থানে আছে, কেন ঐরূপ কার্য করিতেছে বা মুখাবয়বের ঐরূপ ভাব করিয়াছে—এই সকল অবগত হইবার একটা দুনিবার আকাঙ্ক্ষা হইল। সিনেমা-গৃহে intervalএর পর আগামী ছবির বিজ্ঞাপনে তার খণ্ড খণ্ড অংশগুলি দেখিলে যেমন সেই পূর্ণ ছবিটি দেখিবার একটা আগ্রহ জন্মিয়া যায়, আমারও সেইরূপ সহজেই প্রবৃত্তি জাগিল বই পড়িয়া ফেলিতে, ঘটনার ছবি-নির্দেশিত স্থলগুলিতে আসিতে। এইবার পড়া আরম্ভ করিলাম, আগ্রহাতিশয়োদ্ভূত তালে পড়া চলিল। * * * প্রথম যে ছবি, গল্পের সেই স্থলে আসিলাম। ছবির সহিত মিলাইলাম। কেমন গোল বাধিল। ও হরি! বৃত্তিতেই পারি নাই, কখন ছবিটি আমার মনে একটি বিশেষ বিষয়-বস্তুর ইঙ্গিত দিয়া বসিয়া আছে! ছবিটিকে প্রথম দেখিবার কালে মন অস্পষ্ট কিন্তু নিশ্চিত এক বিষয়কে স্মৃতি করিয়া বসিয়া আছে, তাহারই স্পষ্টতর রূপের সন্ধানে গল্প পড়িতে গিয়া ভিন্ন একটি ইঙ্গিত পাইয়া বসিল। মিলাইতে গিয়া গুণ্ডগোল, এবং তৎফল অতৃপ্তি।

গল্পে ছবি চলিতে পারে না। গল্পের স্থলবিশেষকে পাঠকের কল্পনায় গল্প অপেক্ষা স্পষ্টতররূপে ধরিয়া দেওয়াই গল্পে ছবির উদ্দেশ্য। (এখানে বলা আবশ্যক, আমি গল্প বলিতে প্রধানত নভেলে বিবৃত

বড় গল্প উদ্দেশ্য করিতেছি।) গল্পের প্রধান আশ্রয় নায়ক এবং নায়িকা। স্বতবাং গল্পের ছবিতে নায়ক-নায়িকার উপস্থিতি আবশ্যক হইয়া পড়ে। সেইখানেই ছবিতে পাঠকের মন প্রথম এবং সর্বাপেক্ষা অধিক চোঁট খায়। নায়ক এবং নায়িকাকে কখনও সোজাহুজি স্পষ্ট রূপ দেওয়া যাইতে পারে না; কেননা, তাহাদের স্পষ্ট কোন রূপ নাই, তাদের বাস্তব-রূপ-বিশিষ্ট অঙ্গাবয়বের কোন ধারণা সম্ভব নহে। “হুমারসম্ববে” উমার আপাদমস্তক দেহ-বর্ণনায়, অথবা “মেঘদূতে”— “তন্দ্রী শ্রামা শিখরিদর্শনা পর্ববিষাধরোদ্গী, মধ্যো ক্লামা চকিতহরিণী-প্রেক্ষণা নিম্ন-নাভিঃ। শ্রোণীভরাদলসগমনা স্তোকনম্রা স্তন্যভ্যাং...।” —ইহাতে নারী অঙ্গের যে যে লাভণ্য বর্ণিত হইয়াছে এই সকল লাভণ্য-বিশিষ্ট কোন বাস্তব নারীকে তোমার সামনে উপস্থিত করিলে তোমার মন প্রথমটা চমকিয়া উঠিবে সত্য, কিন্তু পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গেই কেমন বাধ বাধ ঠেকিবে। তুমি বলিয়া উঠিবে, “না, মিলিতেছে না, আমার মানস-সঙ্গারিণী নায়িকা আরও উপরে।” তাহাকে কল্পনার অন্তরালে শুধু অহুভবই করিতে পারি; সে কল্পনাকে স্পষ্ট ভাষা দিতে পারি না, বাজনা দ্বারা কাজ সারিতে হয়। তোমাকে শুধু বলিয়া দিতে পারি, এই যে মন্দির। তোমার মন থাকিলে সেখানকার দেবতার অস্তিত্ব স্বতই তুমি স্বীকার করিয়া লইবে। মনের মাঝে নায়িকার স্তম্ভীর অস্তিত্বের যখনই কোন স্পষ্ট কল্পনা করিতে গিয়াছি, তখনই দেখি, ফসাইয়া গেল। হাতের তালুতে জল আছে। জলের অস্তিত্ব বেশ বৃষ্টিতে পারিতেছি; কিন্তু যেই মৃতার মধ্যে ধরিতে গেলাম, আঙুলের ফাঁক দিয়া সব জল বাহির হইয়া গেল, জলের অস্তিত্ব আর অহুভব করিতে পারিলাম না। নায়িকার সব চাইতে বড় কথা,— সেরা স্তম্ভরী। সিনেমার পর্দায় অনেক সময়ই অনেক হলিউড-বাসিনী

অনভ্যন্ত চোখে সেরা স্তম্ভরী বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে। প্রলুব্ধ চিত্তে তাহাদিগকে আমার নায়িকার আসনে বসাইতে চেষ্টা করিয়াছি। প্রথম এক অস্থির মোহে ঠিক বৃষ্টিতে পারি নাই, কি হইল! বধন মোহ কাটিয়া যায়, তখন মন উহার দিকে চাহিলে কেমন বাধা পায়। মনোমধ্যে নায়িকার ধারণা স্পষ্ট হস্তপদাদি-বিশিষ্ট কোন নারীমূর্তি নহে, উহা সক্রিয়-ভাবময় অহুভূতিবিশেষ। দ্রৈঘ্যদ্বিধ-ঘোষমা কোন কিশোরীকে দেখিয়া একবার এত আনন্দমুখর হইয়াছিলাম যে বৌদিদের নিকট কয়েক দিন নানান কথা শুনিতে হইয়াছিল। তার সখন্দে চিন্তা করিতে করিতে এক দিন সখ হইল তাহাকে আমার রূপকথার রাজকন্যা রূপে ভাবিতে। ধান-গভীর মনে রাজকন্যাকে আশ্রয় করিলাম। রাজকন্যা তাহার আলো-আধারি অস্তিত্ব লইয়া আমার মনে উদিত হইল। বৃষ্টিতে পারিলাম, রাজকন্যা বড় দূরের বস্ত, কাছের বস্ত করিয়া তাকে পাওয়া সম্ভব নয়। তবু কিশোরীর ভিতর তাহাকে পাইতে গেলাম। দেখি, মুহূর্ত্ত পূর্বে রাজকন্যা-কল্পনা-নিমগ্ন মন যে মুহু মুহু আনন্দের আঘাত অহুভব করিতেছিল সে আনন্দময় ভাব-বিলাস খামিয়া গিয়াছে, মন বিমর্ষ মলিন হইয়া পড়িয়াছে। যে জলোচ্ছাসমুখর কাকলিতে দশ দিক পূর্ণ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহাকে যেই বাধিলাম, অমনি শুধু জলকে পাইলাম কল-কাকলিময় জলোচ্ছাসকে পাইলাম না। রাজকন্যা সেই দূরের রাজকন্যাই রহিল, বাহাকে পাইলাম সে সীমা-ব্রাহ্মতা অভূষিত নারী বাস্তবী।

বিবাহিতদিগকে প্রায়ই বলিতে শোনা যায়, বিবাহের পর কিছু দিন আনন্দোচ্ছাসে কাটে, তার পর যে তিমিরে সেই তিমিরে। ইহার কারণ, তরুণ স্বামী তরুণী ভার্য্যাকে মনে করে, এই বৃষ্টি তার অস্তর-বস্তিনী নায়িকা। তাই তাহার অত উচ্ছ্বাস। দাক্ষ্য পাইতে খাইতে

হুদিন বাদে তাহার মন সে সীমার মধ্যে হাঁপাইয়া উঠে, নায়িকাকে পাইতে অসীমের মধ্যে হাঁপাইয়া পড়িয়া তৃপ্তি পায়।

নায়ক-নায়িকার দেহরূপকে বাস্তব ভাবে পাইতে যাওয়া নিরর্থক প্রয়াস। তাই বোধ করি, আধুনিক কাব্য সাহিত্যে নায়ক বা নায়িকার দেহরূপ বর্ণনা—যাহা সেকালে কবির কৃত্ত্ব-প্রকাশের একটি প্রধান অবলম্বন ছিল—প্রায় উঠিয়া যাইতেছে। উহারা যে নায়ক বা নায়িকা এইটুকু বুঝাইয়া দিয়াই কবি নিশ্চিন্ত হন। পাঠকও চরিত্রবিশেষকে নায়ক বা নায়িকা বুঝিতে পারিয়া আপন ভাবলোকে তাহার অরূপ অস্তিত্ব নির্বাণ কল্পনা দ্বারা অহুভব করিয়া তৃপ্তি পায়।

যাহাকে কবি ইন্দ্রিতের অধিক আর কিছু দিয়া বর্ণনা করিতে পারিলেন না তাহাকে কেন যে সোজাহুজি স্পষ্ট ভাবে পাঠকের মনে ধরিয়া দিতে চিত্রশিল্পী প্রয়াস করিলেন তাহা বুঝা ভার। যদি সম্ভব হইত কবি নিজেই তাহা করিতেন; তিনি সখ করিয়া তাহার নায়িকাকে ঐদিক দিয়া অসম্পূর্ণ রাখেন নাই। চিত্রশিল্পীও যদি ঠিক জিনিসটিকে ঠিক ভাবে আঁকিতেন তবে দেখিতে পাইতাম, তিনিও বাঞ্ছনা দ্বারা ইন্দ্রিতের অধিক আর কিছুই দেন নাই। তাই যদি কোন গল্পে চিত্রশিল্পী ঠিক ছবি আঁকেন, তবে দেখি, তিনি গল্পে ছবির যে উদ্দেশ্য অর্থাৎ কবি-বর্ণিত বিষয়কে স্পষ্টতর রূপদান তাহা রক্ষা করিতে পারেন নাই। ঐ মূল উদ্দেশ্যই ভুল। উহাকে রক্ষা করিতে গেলে ছবি হয় না, ছবি করিতে গেলে উহা রক্ষিত হয় না।

প্রসঙ্গ কথা

শরৎচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ

ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ব্রাহ্ম নন, কিন্তু অভিজ্ঞতাপ্রসূত সত্যভাষণের বড়াই তিনি প্রায়ই করিয়া থাকেন। ঔপন্যাসের নায়ক-নায়িকার মুখ দিয়া তিনি বহু বিচিত্র সত্য বলাইয়াছেন; সেদিন শ্রয়ং ঢাকার কোনও এক সভায় বলিয়াছেন, তিনি জীবনে এমন কোনও কথাই লেখেন নাই যাহা তাহার অভিজ্ঞতাপ্রসূত নয়। রাজা-উজীর-মারা গালগল্পের দেশে এরূপ কথা শুনিলেও আনন্দ হয়।

১৯২৬ সালের-ইংরেজী ৬ই অক্টোবর বুধবার তারিখে শরৎচন্দ্র নিশ্চয়ই স্বস্থ এবং সজ্ঞানে ছিলেন এবং তাহার বয়স এখন যাটের উর্দ্ধে হইলে দশ বৎসর পূর্বে নিশ্চয়ই তিনি শিশু ছিলেন না। দীর্ঘ পক্ষাশ বৎসরের অভিজ্ঞতা লইয়া তিনি ঐ তারিখে লিখিয়াছিলেন—

“...মুসলমান যদি কখনও বলে হিন্দুর সহিত মিলন করিতে চাই, সে যে ছলনা ছাড়া আর কি হইতে পারে ভাবিয়া পাওয়া কঠিন।

একদিন মুসলমান লুঠনের জঘন্য ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল, রাজা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্ত আসে নাই। সেদিন কেবল লুঠ করিয়াই কাঁধ হয় নাই, মদির দাসে করিয়াছে, প্রতিমা চূর্ণ করিয়াছে, নারীর সতীত্বহানি করিয়াছে, যন্ত্রণা, অপরের ধর্ম ও সমূহবৈষম্যের পরে যতখানি আঘাত ও অপমান করা যায় কোথাও কোন সন্দোহ মানে নাই।

দেশের রাজা হইয়াও তাহার এই জঘন্য প্রত্নির হাত হইতে মুক্তিকাজ করিতে পারে নাই। গুরজল্লভ প্রত্নি নামজাদা সম্রাটের কথা ছাড়িয়া দিয়াও যে আকবর বাদশাহের উদার বলিয়া এত খ্যাতি ছিল, তিনিও কহর করেন নাই।

আজ মনে হয় এ সংস্কার উহাদের ব্রজাগত হইয়া উঠিয়াছে।.....

শিক্ষা মানে যদি লেখাপড়া জানা হয়, তাহা হইলে চাহী মজুরের মধ্যে হিন্দু মুসলমানে বেশী তারতম্য নাই। কিন্তু শিক্ষার তাৎপর্য যদি অন্তরের প্রসার ও চরমের কালচার হয় তাহা হইলে বলিতেই হইবে উভয় সম্প্রদায়ের তুলনাই হয় না। হিন্দু নারীহরণ ব্যাপারে সংবাদ-পত্রগুলিয়ার প্রায়ই দেখি এক্স করেন মুসলমান নেতার। নীরব কেন? তাঁহাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা যে পুনঃপুনঃ এতবড় অপরাধ করিতেছে তথাপি প্রতিবাদ করিতেছেন না কিসের জন্ত? মুখ বুজিয়া নিঃশব্দে থাকার অর্থ কি? কিন্তু আমার ত মনে হয় অর্থ অতিশয় প্রাঞ্জল। তাঁহার। শুধু অতি বিনয়বশতই মুখ ফুটিয়া বলিতে পারেন না, বাপু, আপত্তি করিব কি, সময় এবং সুযোগ পেলে ও-কাজে আমরাও লেগে যেতে পারি।

মিলন হয় সমানে সমানে। শিক্ষা সমান করিয়া লইবার আশা আর যেই করুক আমি ত করি না। হাজার বৎসরে কুলায় নাই, আরও হাজার বৎসরে কুলাইবে না।.....

হিন্দুস্থান হিন্দুর দেশ। হস্তরাং এ দেশকে অধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার দায়িত্ব একা হিন্দুরই।.....মুসলমানের সংখ্যা গণনা করিয়া চঞ্চল হইবারও আবশ্যকতা নাই। সংখ্যাটাই সমসার পরম সত্য নয়।.....জগতে অনেক বস্তু আছে যাহাকে ত্যাগ করিয়াই তবে পাওয়া যায়। হিন্দু-মুসলমান মিলনও সেই জাতীয় বস্তু।”

১৯৩৬ সালের ১৬ই আগষ্ট রবিবার তারিখের ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’য় ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজের দশম বামিক অধিবেশনের সভাপতি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিভাষণ হইতে এইবার কিছু সভাভাষণ সংগ্রহ করা যাউক।

“[লীলাময় রায়] পরে বলছেন, “হিন্দু মুসলমানে আপোষ ছাড়া আর কিছু করবার নেই। হস্তরাং, ব্যবধান থেকে যাবে, জাতীয়তাও হবে না, আত্মীয়তাও না।” এদব উক্তি ক্ষোভের প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু বলি, এদের

মত ঐচ্ছিক সাহিত্যিক, পণ্ডিত ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরাও আজ যদি এই কথা বলতে থাকেন ত নৈরাশ্রে যে সমস্ত দিক কালে হয়ে উঠবে।.....গুলাজেদ আলী সাহেব পরে বলেছেন, “যাদের মনে রইলো এবল বিরুদ্ধতা, অন্তরে রইলো গভীর অগ্রেম, চিন্তে রইলো স্বার্থ ব্যবধান- তাদেরকে টেনে পাশাপাশি দাঁড় করানো হলো। তাতে শিষ্টাচারের তাগিদে হাতের সাথে হাত মিললো, তাদের দৃষ্টি বিনিময় হলো না, একজনের অন্তর রইলো আর একজনের অন্তর থেকে শত যোজন দূরে।”.....কিন্তু এই কি সমস্ত সত্য? সত্য হলে এই অব্যাহিত ব্যবধান ঘুটিয়ে মিতালী করতে কটা দিন লাগে?.....জনেজি নাকি আমার ‘রামের হৃদয়’ গল্পটা (ম্যাটিকের পাঠ্যপুস্তকে) দিয়েছেন। অতি নিরীহ বস্তু,—বোধ করি আশা এর থেকে রামদের হৃদয় হবে। কিন্তু মুসলিম এই যে, দেশে রহিমরাও আছে যে!

সেমিন খেতে বসে His Excellency আমাকে এই প্রশ্নই করেছিলেন। আমি উত্তর দিয়েছিলাম আমার সঙ্গর কাজে পরিণত করতে চাই উভয় সমাজের আশীর্বাদ।.....

কোণায় কোন লেখার মুসলিম সমাজের প্রতি অবিচার করেছি,—করিনি বলেই আমার ধারণা—”...

স্বর্গীয় পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের সত্যনিষ্ঠ শিষ্যের উপযুক্ত কথা বটে। ঢাকায় গিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের শুধু যে হৃদয়ই খুলিয়াছে তাহা নয়, ভাষারও বদল হইয়াছে, যথা—“এ দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার পূর্বে”—“এই যাট বছর বয়সে নিজেকে অস্থপমুক্ত, বেকুফ ইত্যাদি” “আমার সালান গ্রহণ করুন।” চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শুধু সত্যনিষ্ঠ নন, কৌশলীও। অস্ত্রাঙ্ক power-এর মত হিন্দুসমাজের buying powerও হয়তো কমিয়াছে!

মোট কথা, ১৯২৬ ও ১৯৩৬ এই উভয় সনের শরৎ চট্টোপাধ্যায় যদি একই ব্যক্তি হন তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই ভূতপূর্ব মহামহোপাধ্যায় এবং অধুনা মৌলানা। আমরা মহামহোপাধ্যায় মৌলানা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শাস্ত্রীকে অসংখ্য প্রণাম নিবেদন করিয়া বহুত বহুত সালাম কবুল করিতেছি। 'চুধন আলিদন' লইয়া রসিকতা করা চলে জানিতাম কিন্তু মুসলমান সমাজের মত গম্ভীর ব্যাপার লইয়াও যে রসিকতা করা যায় এবং তাহাও His Excellencyর সম্মুখে থাইতে বসিয়া—ইহা নূতন দেখিতেছি।

প্রিয়রঞ্জন সেন ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

অপরাধ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের। লেখাপড়া শেখানোর নামে ছেলেদের মাথা থাইতে হইলে এক দল লোককে অধ্যাপক এবং বক্তা (Lecturer) নিযুক্ত করিতেই হইবে এবং ঠক বাছিতে যেখানে গাঁ উজাড় সেখানে হাতের কাছে সচরাচর থাংরা থাকেন তাহাদিগকে নিযুক্ত করাই ভাল, কিন্তু চাকরি দেওয়ার সময় চাকুরীদের লেখাপড়ার দোড় কতটা তাহা না জানিলেও তাহাদের সহিত একটা লেখাপড়া না করিয়া লওয়াটা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাধ। 'তাবলু শোভতে' এই বিখ্যাত চারুকানীতি স্বরণ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এই মর্মে লেখাপড়া করিবেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুষ্কোণ দেওয়ালের মধ্যে অধ্যাপক ও বক্তারা যাহা খুশী বলিতে পারিবেন, বাহিরের জনসাধারণের কাছে তাহারা বক্তৃত্য বা লেখ্য তাহাদের বিদ্যা জাহির করিতে পারিবেন না। বাহিরে আমরাও আমাদের ছেলেরা অগাধ বিদ্যাসমুদ্রে অবগাহন করিতেছে ইহা ভাবিয়া খুশী থাকিব এবং তাহারাও বিপন্ন হইবেন না। মাঝে মাঝে পত্রিকার পৃষ্ঠায় বা সভাসমিতিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াই

এই সকল অধ্যাপক ও বক্তারা আমাদের নিকৃৎপন্থ শাস্তিতে বিষ ঘটাইতেছেন। আমরা জানি, তাহাদের কেহ কেহ নামে এবং বেনামে 'টেক্সটবুক' লিখিয়া বাজারে ছাড়েন; ইহাতে আমাদের আপত্তির কারণ নাই এই জ্ঞাত্যে যাহারা তাহাদের বক্তৃতা শুনিয়া পরীক্ষা দেয় তাহারা ই 'টেক্সটবুক'গুলি পড়িয়া থাকে, বিধে বিধ ক্ষয় হয়।

শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন মহাশয়ের কথা ধরা থাক। একবার তিনি 'প্রবাসী'র পৃষ্ঠায় বাংলা ভাষায় এক শত ভাল বইয়ের নাম করিয়া ফেলিয়া আমাদের গকে চমকাইয়া দিয়াছিলেন। এবারে তিনি 'বাংলার শপসম্ভার' লইয়া 'বঙ্গশ্রী'র (ভাদ্র, ১৩৪৩) পৃষ্ঠায় 'কিঞ্চিৎ ভাষণ' করিয়াছেন। দেখিতেছি দুই বৎসরের অধিক কাল তিনি আমাদের নিশ্চিত থাকিতে দিবেন না, মনস্থ করিয়াছেন।

গত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া বাংলার সাময়িক পত্রিকাসমূহে এই ধরণের হাজার হাজার গবেষণামূলক প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে; গবেষণার নামে যে যাহা খুশী বলিতেছেন। কেহ প্রতিবাদ করে নাই, 'অমৃতং বালভামিতং' বলিয়া; বাংলা ভাষার এত দিন শৈশব চলিতেছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু অধ্যাপক ও বক্তা এই বালক-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন—ছিচ্চাকাহুনে দীনেশচন্দ্র, জামাতা তমোনাশ, রসজ্ঞানী বিশ্বপতি এবং সহজিয়া মণীন্দ্রনাথ প্রভৃতি।

শুনিতেছি, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য আর শিশু নাই। তাহার নাকি ভরা ঘোবন। স্বতরাং আদর দিয়া তাহার মাথা খাওয়া আর চলে না; ভুল করিলে চোখ রাঙাইয়া, শব্দ কথা শুনাইয়া সমঝাইয়া দিবার বয়স তাহার হইয়াছে।

প্রিয়রঞ্জনবাবুও ভুল করিতে পারেন, এবং করিয়াছেনও। কিন্তু

সে ভুল মারাত্মক এই জ্ঞান যে তিনি অধ্যাপক, এবং যে বিষয়ে লিখিয়াছেন সেই বিষয় লইয়াই বহু কাল যাবৎ আলোচনা করিতেছেন, বস্তুত তাঁহার অধ্যাপনা বিষয়ের এইগুলিই গোড়াকার কথা। তিনি গোড়াতেই গলদ করিয়া বসিয়াছেন।

বাংলা ভাষার শব্দসম্ভার লইয়া মস্ত একটা ভূমিকা ফাঁদিয়া এই প্রবন্ধে তিনি বাংলা ভাষায় কয়েকটি অভিধান সম্বন্ধে পরিচয় দিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এবং শব্দসম্ভার আলোচনা করিতে গিয়া তিন পৃষ্ঠা প্রবন্ধের মধ্যে তিনি রবীন্দ্রনাথের

হেথায় অর্থাৎ হেথা অনার্থ্য

হেথায় ত্রাবিড় চীন

লইয়া উজ্জ্বল কাদিয়াও ফেলিয়াছেন। কিন্তু আসলে ফাঁক, প্রাচীনতম অভিধানগুলির অধিকাংশের নামই তিনি জানেন না এবং যে কয়েকটির নাম তিনি করিয়াছেন সেগুলির লেখকের নাম এবং প্রকাশ-কাল সম্বন্ধে ভুল করিয়াছেন। তাঁহার এই প্রবন্ধে স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে যে স্বযোগ এবং স্ববিদ্যা সত্ত্বেও বাংলা সাহিত্যের এই মহাগবেষক উল্লিখিত অভিধানগুলি চোখে দেখিবার লোভ সন্দরণ করিয়াছেন; তিনি সংযমী লোক। অথচ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, এশিয়াটিক সোসাইটি, অথবা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে পরীক্ষণ করিলেই এগুলির দর্শন তিনি পাইতেন। দায়িত্বজ্ঞানহীন লোকের লেখা পুস্তক ও প্রবন্ধ এবং মুদ্রাকরপ্রমাদ-জর্জরিত ক্যাটালগুমাত্র তাঁহার সম্বল। বালীগঞ্জের বৈঠকধানায় অথবা পুরীর সমুদ্রতটে এই জ্ঞান লইয়া ঘণ্টাখানেক আশ্রয়প্রদ লাভ করা যায় কিন্তু প্রবন্ধ লেখা চলে না। প্রবন্ধশীর্ষে সম্পাদকীয় মন্তব্যটিও অসাধারণ—

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিদেশীর রচিত একাধিক অভিধান এবং বাঙ্গালীর রচিত দুই একখানি অভিধানের পরিচয় আছে।

এ খবরও কি প্রিয়রঞ্জন সেন মহাশয়ের দেওয়া? পাত্রী মাস্টার-দা আস্‌সুম্প্‌সাঁউ রচিত Vocabulario Em Idioma Bengalla, E Portuguez (Lisboa, Anno M.DCCXLIH) এবং Henry Pitts Forster প্রণীত A Vocabulary, in two parts, English and Bongalee, and Vice Versa প্রথম ভলুম (1799) অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিদেশীদের রচিত এই দুইখানি মাত্র অভিধানের সংবাদ ছাড়া আর কোনও অভিধানের কথা আমরা তো এযাবৎকাল কোনও পুস্তক, প্রবন্ধ বা পুস্তক-তালিকায় পাই না। মাত্র সেদিন ১৮৮৮ সালে প্রকাশিত Catalogue of The Library of the India Office, Vol. I-এর ৩২৫ পৃষ্ঠায় Extensive Vocabulary of Bengali, English and Udiya, 2 Vols. Calcutta, 1793 নামীয় একটা পুস্তকের সন্ধান পাইয়াছি। ইতিপূর্বে, অল্প কুত্রাপি এই পুস্তকের নামোল্লেখ পাই না। লং সাহেবের ক্যাটালগে নয়, গ্রীয়ার্সন সাহেবের Linguistic Survey of India-র ৫ম খণ্ডেও নয়। এই পুস্তকটি সম্বন্ধে লঙনের ইণ্ডিয়া অফিস হইতে বিস্তারিত বিবরণ না আসা পর্যন্ত আমরা আর কিছু বলিতে পারি না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙালীর রচিত দুই একখানি অভিধানের কথা ইনি কোথায় পাইলেন?

‘বঙ্গ-শ্রী’-সম্পাদক প্রবন্ধ চাহিয়াছেন, প্রিয়রঞ্জনবাবু প্রবন্ধ লিখিতে বসিলেন। তিনি এ বিষয়ে এক জন ‘অথরিটি’ স্মরণ্য পরিশ্রমেরও প্রয়োজন হইল না। দীনেশ সেনের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের পরিশিষ্টে ছাপা লং সাহেবের ক্যাটালগ ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্য’, ৬২৮-২৯ পৃষ্ঠা, নতুন সংস্করণ) হইতে ছবছ অল্পবাদ করিয়া মহাগবেষকের গবেষণাবৃত্তি চরিতার্থ হইল, ‘বাংলার শব্দসম্ভার’ গড়িয়া উঠিল। আশ্চর্যের বিষয়,

বাংলাভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে এত বড় এক জন নামজাদা ব্যক্তি (যিনি বঙ্গভাষার উপর ইয়োরোপীয় প্রভাব দেখাইয়া থিসিস ছাপাইয়া পি. আর. এস. হইয়াছেন—ঋজু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়!) বঙ্গভাষায় প্রথম রচিত পুস্তকগুলি একবার চোখে দেখিবার আগ্রহও তাঁহার হইল না! অথচ যাহা চোখে দেখিলেন না, সে বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা নাই! হেজিপেজি সাধারণ প্রবন্ধ-লেখক হইলে আমরা এই ধরণের মন্তব্য করিয়া নিজেরা লজ্জা পাইতাম না, তিনি শিক্ষক এবং তাঁহার মতামতের উপর ছাত্রদের জ্ঞান নির্ভর করিতেছে বলিয়াই আমরা বহু ছুখে এই সকল কটুক্তি করিতেছি।

লং সাহেবের ক্যাটালগে ভ্রমক্রমে ছাপা হইয়াছে—“The first Bengali Dictionary was by Foster, a civilian and Sanskrit scholar, printed in 1799, in 2 vols.” সাহেবের নাম যে Forster, Foster নহে তাহা অন্তত ১০০ খানি পুস্তক ও ক্যাটালগে প্রকাশিত হইয়াছে। ডঃ হুশীলকুমার দে প্রণীত যে পুস্তকখানি (Bengali Literature of the Nineteenth Century) অবলম্বন করিয়া তিনি তাঁহার ছাত্রদের class notes দেন (এগুলির কিছু নমুনা আমরা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি) তাহার ৮২ পৃষ্ঠায় হেনরি পিটস ফরষ্টারের জীবনী সম্বন্ধে কিছু বলা আছে। লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়াম, ইণ্ডিয়া অফিস, কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সর্বত্রই এই পুস্তক আছে স্বতরাং লাইব্রেরিগুলির ক্যাটালগ খাটিলেই সেন মহাশয় সঠিক সংবাদ পাইতেন। তাছাড়া, গ্রীষ্মাবসন সাহেবের Linguistic Survey-খানিও কি তিনি দেখিবার সুযোগ পান নাই? অভিধানখানির দুই খণ্ডই ১৭৯২ সালে প্রকাশিত হয় নাই, উহাও লং সাহেবের ভুল, ১ম খণ্ড

প্রকাশিত হয় ১৭৯৯ সালে, দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮০২ সালে। মূল্য সম্বন্ধেও ভুল, দুই খণ্ডের মূল্য নিকারিত হয় ৫৫/-; ৬০/- নয়! *

ইহার পরেই সেন মহাশয় লিখিতেছেন—

ফরষ্টারের পর উল্লেখযোগ্য অভিধান পীতাম্বর মুখোপাধ্যায়ের শব্দসিদ্ধ (১৮০৯)।

১৮০৯ সাল লং সাহেবের ভুল। এই পুস্তকের এক খণ্ড আমাদের নিকট আছে, সাহিত্য-পরিষদেও এক খণ্ড আছে। টাইটেল পেজটি এইরূপ—ভগবান্ অমরসিংহ / রুত / অভিধান অকারাদিক্রমে / ভাষার / বিবরণ করিয়া শব্দসিদ্ধ / নাম / রাখিয়া কলিকাতায় ছাপা / হইল / সন ১২২৫।

সন ১২২৫ ইংরেজী ১৮১৮ সন হয়। গ্রন্থের ভূমিকা শেষে গ্রন্থ-সমাপ্তির তারিখ এইভাবে লিখিত হইয়াছে—

গগণ গণেশ ভূজ গগণভূমিতে।

গ্রন্থ সমাপ্তির শাক জানিবা পণ্ডিতে। তৎসং।

ভূমি—১, গগণ—৭, গণেশভূজ—৪, এবং গগণ—০ অর্থাৎ ১৭৪০ শকে গ্রন্থ সমাপ্ত হয়। ১৭৪০ শক—ইংরেজী ১৮১৮ সন।

কত ভুল দেখাইব? এই প্রবন্ধের প্রায় প্রত্যেকটি উক্তিই ভুল। কেরীর অভিধানের মূল্য ১২০/- টাকা ছিল না, ছিল ১০৭/- টাকা। কেরীর সহকর্মী মার্শম্যান কিন্তু অপেক্ষাকৃত অনেক কম মূল্যে অর্থাৎ দশটাকায়, ছাপিল হাজার শব্দ লইয়া বাংলা হইতে ইংরেজী অভিধান প্রকাশিত করেন।

এই উক্তি হইতে মনে হয় যে মার্শম্যান সাহেবও স্বয়ং একটি অভিধান রচনা করিয়াছিলেন। মার্শম্যান সাহেব কোনও অভিধান

রচনা করেন নাই, তিনি কেবল সাহেবের অভিধানকে সংক্ষেপ করিয়াছিলেন মাত্র।

রামকমল সেনের অভিধান সম্বন্ধে প্রিয়রঞ্জন সেন মহাশয় লিখিয়াছেন;

তিনি পনের বৎসর পরিশ্রমের ফলে টড ও জনসনের অভিধান অবলম্বনে আচার্য হাজার শব্দ সংগ্রহ করিয়া ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত করেন। তাহার মূল্য হয় ৫০/-।

রামকমল সেন প্রণীত A / Dictionary / in / English and Bengalee; / translated / from / Todd's Edition of Johnson's English Dictionary / In two volumes / By / Ram Comul Sen, /From the Serampore Press, / 1834.

সেন মহাশয়ের তিন লাইনে কয়টি ভুল দেখুন, জনসনের অভিধানের টড-কৃত সংস্করণ—টড ও জনসনের অভিধান নয়। প্রকাশকাল ১৮৩৪,—১৮২৮ নয়। এবং পনের বৎসর পরিশ্রম সম্বন্ধে উক্ত গ্রন্থের Preface-এ যাহা লেখা হইয়াছে তাহা এই—

On the establishment of the Hindoo College and the Calcutta School Book Society in 1816, for the education of the Natives, the want of an English Bengalee Dictionary was most sensibly felt, and the task of preparing one seemed imperative upon those who took an interest in the cause of native education and the diffusion of knowledge amongst them. As I had the honour to share in their labours, I commenced upon a translation into Bengalee of Johnson's English Dictionary, Octavo Edition, containing about 40,000 words. When the manuscript was nearly completed, I committed the work to the press in 1817 under the patronage of the College of Fort William...

কিন্তু ছাপাখানা-বিভাগে বইখানি ছাপিতে ১৭ বৎসর লাগিয়াছিল। ইতিমধ্যে Todd's Edition of Johnson's Dictionary কলিকাতায় আসে এবং গ্রন্থকার অভিধানের আয়ও ২০০০০ শব্দ বাড়িয়া মোট শব্দ-সংখ্যা ষাট হাজার করিয়া দেন।

১৮৩৪ সালের পূর্বে ছাপা হইয়াছিল এমন অনেকগুলি অভিধানের নাম শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন মহাশয় করেন নাই, তন্মধ্যে John Mendies প্রণীত Abridgement of Johnson's Dictionary in English and Bengalee এবং A Companion to Johnson's Dictionary in English and Bengalee (Serampore, 1828) এই দুইটির নাম বিশেষ ভাবে উল্লিখিত হওয়া উচিত ছিল। শ্রীযাত্রসন সাহেব বলিয়াছেন যে পরবর্তী কালে যত অভিধান প্রকাশিত হইয়াছে “most of these are based on that of Mendies”। রামকমল সেনের Vocabulary, English-Latin-Bengalee (the Bengali in Roman Letters) Calcutta 1821; T. Chackrabarti (তারারচন্দ চক্রবর্তী) প্রণীত A Dictionary in Bengali-English, Calcutta, 1827; Morton—Bengali-English Dictionary, Calcutta 1828; Sir G. C. Haughton, A Dictionary, Bengalee and Sanskrit, explained in English...London 1833. প্রভৃতির উল্লেখও এই প্রসঙ্গে করিলে ভাল হইত।

রমাপ্রসাদ চন্দ ও রামমোহন

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে হিন্দুসমাজের বর্ণনা করিতে গিয়া ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসকার শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন,

“The whole country, and especially the province of Bengal, was steeped in the most debasing forms of

idolatry. The moral and spiritual aspects of religion and its elevating influence upon character had long been lost sight of and in their place the grossest superstitions had taken hold of the national mind."

ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র 'প্রবাসী'র বর্তমান অবস্থা (পরিস্থিতি ?) প্রায় তৎকালীন বাদ্দলী সমাজের মতই হইয়াছে। পৌত্তলিকতা-বিরোধী প্রবাসী ব্রাহ্মসমাজের তথাকথিত প্রতিষ্ঠাতা রামমোহন রায়কে লইয়া এমন ঘোরতর পৌত্তলিক হইয়া উঠিতেছেন যে পৌত্তলিক আমরাই লজ্জায় মাথা হেঁট করিতেছি। প্রবাসী হইয়াছে পূজামণ্ডপ, গৃহস্থানী শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় যজ্ঞমান, পুরোহিত হইয়াছেন অত্রাঙ্গণ এবং অত্রাঙ্গণ শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ—মূর্তি স্থাপিত হইয়াছে রামমোহনের, ঘটা করিয়া ধূপ ধুনা জালাইয়া নৈবেদ্য সাজাইয়া পূজা শুরু হইয়াছে। আমরা হাঁ করিয়া দেখিতেছি ও 'ধ' বনিয়া গিয়াছি। বিজ্ঞানগণের মহাশয় বাঁচিয়া থাকিলে এবং এই উৎসবে উপস্থিত হইলে সর্বপ্রথমেই রামমোহনের 'প্রতিমা' রাস্তায় টানিয়া ফেলিতে বলিতেন।

মাজুলী তাবিল ব্যবহারের মত ব্যক্তিগত প্রয়োজনে বা বিশ্বাসে পূজা অর্চনা করিবার অধিকার সকলেরই আছে, 'স্বতরাং যজ্ঞমানকে আমরা কিছু বলিতে চাহি না, কিন্তু পুরোহিতের মন্ত্র তুল হব যে! অং বং এর মত শুনাইতেছে বটে, কিন্তু ব্যাকরণসম্মত হইতেছে না। একাধারে ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্ম কাহাকেও এই কাজে লাগাইলে হইত না।

কলিকাতায় রাজা রামমোহন রায়ের আগমনের তারিখ লইয়া শ্রীযুক্ত ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত পুরোহিত মহাশয়ের বিতর্ক প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। গত জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে ২০২ পৃষ্ঠায় পুরোহিত মহাশয় বলিয়াছিলেন,—

১৭৩৭ শকে রামমোহন রায় কলিকাতায় 'বেদান্ত গ্রন্থ' প্রকাশিত করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ রচনা করিতে এবং ছাপাইতে দুই বৎসর লাগা সম্ভব। সুতরাং যদি অধুমান করা যায় রামমোহন রায় কলিকাতা আসিয়া 'বেদান্ত গ্রন্থ' রচনা করিয়াছিলেন তবে ১৭৩৫ শকে তাঁহার আগমনকাল খোঁজা করিতে হইবে।

বেদান্ত গ্রন্থের প্রকাশকাল ১৮১৫ সন; এই তারিখ গ্রন্থের টাইটেল পেজে দেওয়া আছে। সুতরাং তিনি ১৮১৫—২—১৮১৬ সনকেই যে রামমোহনের কলিকাতা আগার বৎসর বলিতেছেন তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ ঘটে না। কিন্তু তাহা হইলে মামলা খারাপ হইয়া যায়; সুতরাং পুরোহিত মহাশয় শ্রাবণ মাসের প্রবাসীতেই মন্ত্র বদলাইয়া বলিতেছেন,

আমি নাকি লিখিয়াছি রামমোহন রায়ের কলিকাতা আগমনের তারিখ ১৭৩৫ শক বা ১৮১৩ সন।.....১৮১৩ জ্যৈষ্ঠে রামমোহন রায় কলিকাতায় আসিয়াছিলেন এমন ইঙ্গিতমাত্রও আমার লেখায় নাই।

তবে তিনি রামমোহনের কলিকাতা আগমনের তারিখ কি বলিয়াছেন, তাহাই জিজ্ঞাসা।

ঐতিহাসিক বলিয়া পুরোহিত মহাশয়ের খ্যাতি আছে। তাঁহার ঐতিহাসিক অহুসঙ্কিত্সার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। জ্যৈষ্ঠের 'প্রবাসী'র এক স্থানে তিনি লিখিয়াছেন,

১৭৭০ শকের [জয়বাহিনী সভার] আয়ের হিসাবে রাধাপ্রসাদ রায়ের নামে ২২২ জমা দেখা যায়। কিন্তু ১৭৭৪ এবং ১৭৭৫ শকের আয়ের হিসাবে রাধাপ্রসাদ রায়ের নামে কোনও টাকা জমা দেখা যায় না। ইহার কারণ কি বলা যায় না।

অত্যধিক সত্যনিষ্ঠাবশতই পুরোহিত মহাশয় কারণ বলিতে পারেন নাই, ঐতিহাসিক গবেষণা আর একটু কম করিলে তিনি জানিতে পারিতেন যে ১৭৭৩ শকের শেষে রাধাপ্রসাদ রায় পরলোকগমন করেন

(১৩৩৮ সালের ফাল্গুন মাসের প্রবাসীর ৬২৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) পৌত্তলিক হইলেও সেখান হইতে চাঁদা পাঠাইবার কোনও ব্যবস্থা তিনি করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

মহাজ্ঞানের আর একটি নমুনা বর্তমান সংখ্যা (আশ্বিন) প্রবাসীর ৮৭৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। যিনি আজীবন ইতিহাস চর্চা করিলেন এবং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বাহাকে গুণী জ্ঞানে পুরোহিত-পদে বরণ করিয়াছেন, তিনি স্ট্যান্ডফোর্ড আর্নটের ঠিক নামটি পর্যন্ত জ্ঞানেন না। ইংরেজী বাংলা উভয় ভাষাতেই লেখা হইয়াছে “স্ট্যান্ডফোর্ড আর্নট (Standford Arnot) !” যন্ত্রগুপ্তিই এই জ্ঞান প্রযোজন!

পুরোহিতের চোখাচ লাগাতে যজমানও ভুল করিতেছেন। ১৩৪৬ আশ্বিন ৮৫২ পৃষ্ঠার ফুটনোটে প্রবাসীর সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন,

সমসাময়িক ও নিরপেক্ষ ‘সমাচার বর্ণন’ এই সব কুৎসা বিশ্বাসের অযোগ্য ও মিথ্যা মনে করিতেন...

রমাশ্রমাদ চন্দ মহাশয়ের সহিত সংশ্রব কম করিলে তাঁহার মনে পড়িত যে রামমোহনের ‘চারি প্রশ্নের উত্তরে’র চারি প্রশ্ন ‘সমাচার বর্ণন’েই বাহির হইয়াছিল।

কিন্তু রামমোহন, রাজারাম, রামানন্দ ও রমাশ্রমাদ—নবরামায়ণ রচনায় আধুনিক বাঙ্গালিকির আবির্ভাব প্রয়োজন, তত দিন আমাঙ্গিককে অপেক্ষা করিতেই হইবে।

সংবাদ-সাহিত্য

“যেমন রূপালঙ্কারবতী সাক্ষী স্ত্রীর জন্মার্থবোকা হুতুত পুরুষেরা দিগম্বরী অসতী নারীর সন্দর্শনে পরাশ্রয় হন, তেমনই সালঙ্কারা শাস্ত্রার্থবতী সাধুভাষার জন্মার্থবোকা সং পুরুষেরা নগ্রা উজ্জ্বল্য নৌকিক ভাষা শ্রবণ-মাত্রোত্তেই পরাশ্রয় হন।” ‘পরিচয়’ সম্পাদক মহাশয় এই পণ্ডিতবাক্য প্রমাণে বাংলা লিখিয়া থাকেন। হুতরাং আমরা তাহার রীতি লইয়া রত্নরহস্য করিতে প্রস্তুত নই। শুধু তাই নয়, আমরা তাহার বক্তব্যও স্পষ্টতার অভাব পাই না। এই যে তিনি শ্রবণ সংখ্যা ‘পরিচয়’ রবীন্দ্রনাথ সপক্ষে লিখিয়াছেন,—

“কল্মিলের চুম্বার্গে [চুম্বার্গে—জাপার ভুল নহে] যে-বীজসতার প্রবেশ স্বভাবতই বাহত, তাঁর সঙ্গে মাধুর্যের সঙ্কীর্ণাশ্রয় সম্প্রদায় শুধু গন্ত-কাষের নৈরাজ্য। বলাই বাহুল্য বীর মনোহা এই দুজনে নিশ্চিন্তির সন্ধান, তিনি সংসার-মুক্ত বটে, কিন্তু ঐতিহ্যকে নন, ব্যক্তিগতত্বের পরাকাষ্ঠা তাঁকে নিরবধি প্রতিতির পুনরাবিষ্কারে নামিয়েছে, এবং জাতীয় অম্মুত্তির প্রতিফল হলেও তাঁর স্বকীর্ত্তা মনুষ্যত্বেরই পুনরুজ্জীবন।”

ইহাতে আমরা যে কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথ সপক্ষেই অনেক কথা জানিতে পারিলাম তাহাই নয়, কোন মার্গে কিসের প্রবেশ বাহত, কিসের প্রবেশ অবাহত তাহাও শিখিলাম, ‘পরিচয়’-সম্পাদক মহাশয় নিজের চুম্বার্গে থাকিয়া আমাদের মত মূর্খদিগকে জুত(১)-মার্গ করিয়া পাঠকদিগকে কিরূপে উদ্ধারগামী করিতেছেন তাহাও বৃত্তিতে পারিলাম। তবে আমাদের একটা ধারণা ছিল সম্পাদক মহাশয়ের চুম্বার্গে কেবলমাত্র দেশীয় প্রবেশ বাহত, বিদেশীয় প্রবেশ

অব্যাহত। এখন দেখিতেছি বিদেশীর মধ্যেও তিনি পরাচোয়ার নির্ভীকার বর্জন করিতে চলিয়াছেন। ভাস্কর্য্যে তিনি লিখিয়াছেন,—

"শত বোম্ব সবেও 'বি ডিরাইন অফ দি ওয়েস্ট'-এর অনাদর হঠকারিতার পরাকাষ্ঠা। উদাহরণত অর্গল টয়েনবির নাম নেওয়া যেতে পারে, এবং স্পেন্সারী অবলম্বনবাদের খণ্ডনে তিনি দৃষ্টবিনো, এডুয়ার্ড মেইয়ার, গিলবট' মারে ইত্যাদির পৃষ্ঠপোষক যে সেতুবন্ধ নিষ্ঠাও অগ্রসর, তাতে ইয়েরগেনের ভাবাপু উদারনীতির হত্যাকার গতই স্পষ্ট হোক না কেন, তথাও তবের নিষিদ্ধ হয়তো আরো ছুটি।"

কোন মূলবিশেষের ব্যবসায়ীর সহিত অর্ধবপোক্তের 'যে সম্পর্ক আমাদের সহিত স্পেন্সার টয়েনবির ইত্যাদির সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর নহে। হতবাক অব্যাপারে ব্যাপার করিবার চেষ্টা করিয়া নিজ্ঞান ও নির্দ্বন্দ্বিতা প্রকট করিতে চাই না। তবু একটা কথা মনে হয়, ফারারের পর ক্লার্ক-ম্যাক্সওয়েলের গবেষণা যদি হঠকারিতা না হয়, নিউটনের পর আইন্সটাইনের আবির্ভাব যদি হঠকারিতা না হয়, 'প্রাবোধচন্দ্রোদয়ের' পর 'পরিচয়ের' সম্পাদকী যদি হঠকারিতা না হয়, তাহা হইলে স্পেন্সারের পর একা টয়েনবীর হঠকারী হইলেন কেন? কিন্তু এ-সকল নিগূঢ় বিষয়ে তর্ক করিবার সামর্থ্য ও সাহস আমাদের নাই। আমরা পূর্ণগণক মাত্র করিলাম। নাকেতে নির্জ্বরগণ নিরপেক্ষভাবে এই স্মারকটের নিষিদ্ধ করিবেন।

রবীন্দ্রনাথ চক্-চিকিৎসা করাইতে কলিকাতা আসিয়াছিলেন। শুনিলাম 'পরিচয়ে' রবীন্দ্র-পরিচয় দেখিয়া চিকিৎসা না করা হয়ই শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া গিয়াছেন।

সত্য কথা সহজ করিয়া অতি অল্প লোকেই বলিতে পারে। যদিও 'পরিচয়ে'র নিকট হইতে আমরা প্রাঞ্জলতা আশা করি না, তথাপি ভাস্কর্য্যে 'সাহিত্য ও সমাজ' প্রবন্ধের লেখক সত্য কথা যে শুধু সহজ করিয়াই বলিয়াছেন তাহা নয়, অতি সংক্ষেপেও বলিয়াছেন—

"প্রেমেন্দ্র মিত্র... বিত্তন নিঃসমাজের নিয়ন্ত্রণের.....

রবীন্দ্রনাথ.....বিত্তশাসী জমিদার তথা দুখী স্বাধীন্যভোগী ভ্রমসম্প্রদায়ের...

শরচ্চন্দ্র...মধ্যবিত্ত-বহির অজ্ঞ সুসংস্কারের সাধারণত্রাণ ভাবাপন্ন..."

সত্য কথা আরও অল্প বল হইতেছে। 'ভাস্কর্য্যে' 'প্রবাসী'তে শ্রীমুক্ত দক্ষিণারঞ্জন ঘোষ 'কৌন্তিন' প্রসঙ্গে বলিতেছেন—

"কিছু বিপব আসিয়াছে অল্প দিক হইতে। শিক্ত সমাজে কেহ কেহ, এমন কি সমাজ ঘরের মহিলারা পর্বাণ, একান্ত কৌন্তিন-আগরে নামিয়াছেন। অথচ যে অজ্ঞ, সন্নয় ও সাধনা থাকিলে কৌন্তিনাধিকার জন্মে, তাহা তাঁহাদের সকলের নাই।"

আমরা গত সংখ্যায় মুগীর হৈসেলের কথা বলিয়াছিলাম, অধিকারের কথা বলিতে সাহসী হই নাই।

রায় বাহাদুর ধগেন্দ্রনাথ মিত্রের দিনকাল খারাপ যাইতেছে বলিতে হইবে। সেদিন শরচ্চন্দ্র ঢাকার মুসলিম সমাজের সভাপতির অভি-ভাষণে 'প্রেমের ঠাকুর' লইয়া তাঁহাকে বেশ একটু ঠুকিয়াছেন। দক্ষিণাবাবু বলিতেছেন,—

"সোনার ঘোড়ার নামে—কি কুৎসিত কিয় ও ভাব সমাজে চলিতেছে, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিববিজ্ঞান্যে পঠিত একখানি গ্রন্থ হইতে বুঝা যায়।"

বইখানি শ্রীগগেন্দ্রনাথ মিত্র রচিত 'শ্রীপদামৃত মাধুরী'। 'প্রবাসী'র

সম্পাদক মহাশয় এই পুস্তক সঞ্চদে মন্তব্য করিয়াছেন, “উল্লিখিত গ্রন্থখানি বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠন পাঠনের উপযোগী নহে।”

দেখিতেছি, বিলাত যাওয়া সকলের সঙ্গ নাই।

“বিনাসের গোখুলি লয়ে প্রত্যেকের আত্মককার কোড়ে সারাদিবসের কর্মসম্পন্ন মানুষটি যখন এসে পৌছয়, তেহাঁরী অকৃতি তার অবসাদ দূর করবার জন্ত যেন বিক্রিয়ে দেন নিখিল ভুবনের জ্বাম অধরে তাঁর শান্ত সন্ধ্যার ছায়াফলখানি।

অন্ধকার ক্রমেই ঘনিয়ে আসে, অদূরে শোনা যায় আগের-রজনীর নুপুরধ্বনি। দিগন্ত ছেয়ে নেমে আসে এক প্রশান্ত গভীর বিশুল স্তব্ধতা। মানুষের মনে অন্ধার জেগে ওঠে কেমন যেন অহেতুক করণ (কামলতা), তাকে যেন চারিদিক থেকে হাতছানি দিয়ে ডাকে এক খামল কননার কুহকী মায়া।

সে যেন সেই হৃদয়-প্রসারিত-দৃষ্টি নীল-নয়না নীলিমার আত্ম আশি-ভার্য প্রভাব। নিজালু পৃথিবীর হস্তি-হৃদয় শিল্পি অঙ্গে সে যেন তরুণী জ্যোৎস্নার প্রেম-হৃকোমল প্রথম স্পর্শ।

.....তিমির রাতির নিবিড় ঘন অন্ধকার নিবিড়তর হয়ে ওঠে ক্রমে। এহেন সময় অন্ধকার দেখা দেয় ভুবনের খাটে খাটে পূর আকাশের তীরে—এক মৃদু পেলব মুহুর্ত অলোক বিস্তার।

চাঁদ হেসে ওঠে।.....সপ্তশিখরিত নক্ষত্রবালার ঈর্ষা যে বিধু.....অতি শৈশবেই জননী যার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন—“আমি চাঁদ আছি। চাঁদের কপালে চাঁদ উপ দিয়ে যা।—”

পাঠক মনে করিতেছেন বৃষ্টি বক্ষিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী হইতে উদ্ধৃত করিতেছি; এবং ইহার পরই হয়ত জগৎ সিংহের বৃকে তিলোত্তমার ঝাঁপাইয়া পড়িবার কথা আছে। মোটেই নয়—আমাদের নরেন দা' ভাস্কর ভারতবর্ষে ‘জ্যোতিবিজ্ঞা’ বিষয়ক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, ইহা তাহারই ভূমিকা। রসমামলাই—প্রণেতা বৃক্ষচন্দ্র

দাস মহাশয়ের হাতে পড়িলেও জ্যোতিবিদ্যার ভাষা ইহা অপেক্ষা রসস্ব হইতে পারিত না। ভাবিয়াছিলাম, একটি বিশেষ তথির পরে নরেনদা'র গৌফই বৃষ্টি কেবল কুলিয়া পড়িয়াছে; এখন দেখিতেছি, তাঁহার ফোবুটিন ক্যারেট ইরিডিয়াম-পয়েন্ট কলমটাও গলিয়া মোমবাতি হইয়া গিয়াছে।

দাদা বালীগঞ্জের ‘ভালো-বাসা’র (দাদার বাড়ীর নাম) খোলা ছাদে বসিয়া ঘোলা চোখে নক্ষত্রলোক পর্যবেক্ষণ করিতেছেন, লোকের ফুরফুরে হাওয়া তাঁহার ঘনকৃষ্ণ গৌফের প্রান্তভাগ লইয়া একটু ইয়াকি বৃষ্টি করিয়াছে—দাদা Orion আর Andromedae অবস্থান নির্ধারণ করিতে ব্যস্ত; হঠাৎ বৌদিদি হয়ত বেলের পান্না হাতে উপস্থিত; নক্ষত্রের অবস্থান-বিপর্যয় ঘটিল, অমনি আকাশে হঠাৎ জ্যোৎস্নার বান ডাকিল, দাদা চাঁদ বেচারাকে লইয়া পড়িলেন; জ্যোতিবিদ্যার প্রবন্ধ হইয়া উঠিল প্রেমের মহাকাব্য—মাব হইতে ভারতবর্ষ-কর্তৃপক্ষ তারা-চাঁদের একগাদা ছবি ছাপিয়া মহাপাপের ভাগী হইয়া বসিলেন। আকাশের নক্ষত্রলোক বা ছায়াপথের ছবির চাইতে দাদার প্রবন্ধে ছায়া-লোকের (Film world) তারকাদের (তাড়কা?) ছবি জোড়ায় জোড়ায় দিলে যে কত বেশী মানানসই হইত এবং প্রবন্ধ-গৌরব যে কতখানি বৃদ্ধি পাইত, ‘ভালো-বাসা’য় পড়িয়া দাদা নিশ্চয়ই এতদিনে তাহা বৃষ্টিতেছেন। অবশ্য দাদার অবস্থায় পড়িলে এ-তারা এবং ও-তারার মধ্যে পার্থক্য আমরাও সম্ভবত বিস্তৃত হইতাম। তা ছাড়া দাদার অভ্যাসদোষ খটিয়াছে। নীচের তারাদের লইয়া দাদা ভারতবর্ষের বৃকে প্রায় দুই বৎসর খাঁটার্খাটি করিয়াছেন যে!

যাক—দাদা চাঁদের ফাদে পড়িয়াছেন। শনিবারের চিঠির এক কবি একদা লিখিয়াছিলেন,

চাঁদের ফাদেতে বাঁধা পড়ে খাঁদা লোকে চাঁদা করি কাদে।

দাদা খাঁদা নন, কিন্তু তবু কাদিয়াছেন। বিনাইয়া বিনাইয়া কাদিয়াছেন—

“হিমাংকুরিটী সোমদেব.....রজনীনাথ চন্দ্র।কৌমুদীবরত চন্দ্র

.....জ্যোতিবিনের পরম শত্রু.....জোহনামত বামিনীর পরাণপ্রিয় এই আলোক-পুলকিত চন্দ্র।

প্রকৃতির পরম রহস্যরূপে উদ্ভূত আদিম সন্ধ্যার আবির্ভূত হইয়াছিলেন যিনি, কত কবির ছন্দোবশিত, কত প্রবীণগুণের স্বর্ণ-বাহিত, কত ভক্ত ভাবুরের স্বরস্বত যিনি.....সেই বিবের ঐতিহাসিক চন্দ্র—এ যে আশ্চর্য! সন্ধ্যার মিষ্ট আলোর অধীশ্বর—যিনি আমাদের প্রতিদিনের অবসরকণের সঙ্গী হয়ে আসেন, রাতের পর রাত থাকে শিরের দীপ নিয়ে স্নেহে আছেন দেখতে পাই, পৃথিবীর মিলন-রাজে যিনি আমাদের প্রধান সঙ্গী, আমাদের মধু-মাধবীর উৎসবকে যিনি মধুরতর করে তোলেন, আমাদের সম্মিলিত প্রেমের বাগের খাঁর দ্বিত মুখখানিই একমাত্র প্রাণপন্থর দোস্তি দান করে.....তার কাছে আমাদের কোনো লজ্জা—কোনো সঙ্কোচই থাকে না।”

অপূর্ণ চন্দ্র, নির্মল চন্দ্র, রমাপ্রসাদ চন্দ্র (ব্রজবুলি) বলিলেই চাঁদ-পূর্ণ হয়ত সমাপ্ত হইতে পারিত। কিন্তু দাদা হঠাৎ কেন জানি না ফেপিয়া গেলেন। চিঠিয়া মটিয়া চাঁদকে সে কি গালি! প্রবন্ধ কিন্তু জ্যোতিবিদ্যার উপরই চলিতেছে।

“সে একবারেই নিঃশব্দ এক ছদ্মবেশী। পরের ধনে সে পোদ্দারী করে। মিখা চাতুরীর ছলনায় সে এতকাল আমাদের ভুলিয়ে এসেছে।.....মধুরপুঙ্খদারী ঝড়কাক।.....খান্নাঝাড়ী.....”

দাদা রাগের মাথায় বলিতে ভুলিয়াছেন যে, চাঁদ নোট জাল করে এবং বিভ্রান্ত গ্যাংলিং করিয়া তলাককে পথে বসায়।

দাদা প্রকৃতিস্থ হইলেন, এইবার তত্বকথা—

“পৃথিবী থেকে চন্দ্রের দূরত্ব মাত্র ২,৩৮,৩১০ মাইল।...আলোকপ্রবাহের

গতি প্রতি সেকেন্ডে ১৮৬,৭৭২ মাইল।”

প্রবন্ধ শেষ হইল। সোনার চাঁদ নরেন দা!—চাঁদের রূপালে চাঁদ টি দিয়ে যা।

পাঠক লক্ষ্য করিবেন, নরেনদার হাতে পড়িয়া চমকপ্রদ উপস্থাপনের নায়কের সমস্ত লক্ষণ চন্দ্রে প্রকাশ পাইয়াছে, প্রথমে সেই মনোহরণ প্রেমময় মূর্তি, তারপর নায়িকার হাসি-অশ্রুর ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে শত লম্পটের স্বরূপ প্রকাশ; সর্বশেষে মোটরের মিটারে মাইলে আট আনা উঠিতেছে। এ যেন ‘শেষ প্রদর্শন’র শিবনাথ। ইচ্ছা করিলেই নরেন দা চাঁদকে শত্ৰুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে অতি কুংসিং রোগাক্রান্ত করিয়া মারিতেও পারিতেন, মারেন নাই শুধু.....যাক।

ঔষধ ধরিয়াছে বলিতে হইবে। রায় বাহাদুর উস্তার শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, ডি-লিট মহাশয় আমাদেরকে চমক লাগাইয়া দিবার জন্ত নতুন গবেষণা প্রকাশ করিতে স্বীকৃত করিয়া দিয়াছেন—J. R. A. S., J. A. S. B., Z. D. M. G. প্রভৃতি ইংরেজী বর্ণবহুল সিনেমার কাগজে নয়, একেবারের ভাষান্তরের মুখপত্র ‘বাতায়নে’। বিষয়ও গুরুগম্ভীর, ‘বাঙ্গলা ভাষার আদিরূপ’। উস্তার সেন বলেন,—

“গত তিন শতাব্দীর মধ্যে বহুল পরিমাণে সংস্কৃত শব্দের আমদানী করিয়া আমাদের ভাষার রূপটি এরূপ পরিবর্তন করিয়া দেখিয়াছি যে, আপাতদৃষ্টিতে মনে হইবে, বাঙ্গলাটা সংস্কৃতেরই রূপান্তর।”

কি সাংঘাতিক ভুল, আসলে যখন বাংলা ভাষা আরবীর রূপান্তর!

শুধু এই নয়। গোমস্তা, সরকার, মুছরি প্রভৃতি ক্রম ইকারকে দীর্ঘ ঈকার এবং দন্ত্য স-কে তালবা শ করিয়া ভাল বাংলা লেখে না বলিয়া রবীন্দ্রনাথ বুখাই অপবাদ দিয়াছিলেন। দীনেশবাবু বলেন, উহা আদৌ বর্ণাঙ্কিত কি না ভিজ্জাসা, কারণ তাঁহার মনে হয় উহা অনেকটা প্রাকৃত রীতি অস্বাভাব্য। প্রাকৃত রীতি না হইলেও প্রাকৃত জনের রীতি ত অবশ্যই।

তার পর দীনেশবাবু যাহা করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া ও পড়িয়া আমরা একেবারে মুগ্ধমান হইয়া পড়িয়াছি। এইবারে আর বাংলা নয়, একেবারে ইংরেজী ভাষাতত্ত্বের একটা যুগান্তকারী কথা; শুধু একটি বাক্যে ও তিনটি দৃষ্টান্তে ইংরেজী ভাষার সমগ্র ইতিহাস ধরিয়া দেওয়া—

‘গোড়শ শতাব্দীতে ইংরেজের ‘girl’ এর স্থলে ‘guerle’, ‘vote’ এর স্থলে ‘voat’, ‘politics’ স্থলে ‘politiks’ লিখিতেন।’

দীনেশবাবুর জয়জয়কার। নিশ্চয়ই তাহার অজ্ঞানোভে’ ভাক পড়িবে, কারণ ‘নিউ ইংলিশ ডিক্সনারী’ পর্যন্ত ভুল করিয়া এই তিনটি শব্দের এই সকল রূপ দিয়াছে,—

GIRL—

- 13th Century—gurle.
- 14th-16th—gerl (e).
- 14th-17th—girle, gyrle.
- 16th—guirle, gierle, gyrll.
- 17th—garle.

VOTE—

- 16th Century—vote, wote, woit, wott.
- 16th-17th—voite.
- 17th—voate, woatt.

POLITIC—

- 15th Century—polityk, poletyk.
- 15th-16th—politik, polytyk (e).
- 16th—Politique, Polytique, politik, politick, polityke, politique, politike, politic.

17th—politick, pol’tick.

ইংরেজী শব্দের বিভিন্ন বানানও বোধ করি দীনেশচন্দ্রের মতে প্রাকৃত রীতি অস্বাভাব্য।

কিন্তু দীনেশবাবুর গবেষণার মধ্যে আমাদের সব চেয়ে ভাল লাগিয়াছে একটি জিনিস। এত জ্ঞানী গুণী হইয়াও তিনি আমাদের গকে ভুলিতে পারেন নাই। বাংলার ভাষার আদিরূপের পরিচয় দিতে গিয়া “স”, “জ”, “ন” এই তিনটি অক্ষর ভিন্ন আর কোন অক্ষর তাঁহার মনে আসে নাই। বঙ্গমহাশয়ের ভিলোক্তমাও এইভাবেই জগৎ সিংহের নাম লিখিয়া লজ্জায় আরক্তিম হইয়া উঠিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কি হইয়াছে তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। কমলাকান্তী নেশার জন্ম ধর্মভীরু, সং, শিক্ষিত এবং জ্ঞানী ব্যক্তিও নির্জলা মিথ্যা কথা বলে, প্রলাপ বকে, হৃৎস্পন্দ দেখে শুনিয়াছি। কিন্তু স্মৃতিভ্রংশ হয় এই কথা ত ‘মর্ফোমেনিয়া’ সম্বন্ধে প্রকাণ্ড বৈজ্ঞানিক পুস্তক ঘাটিয়াও পাইলাম না। অথচ ব্যাপারটা যে ঘটে তাহা ত নিশ্চিত, নহিবে প্রথমে চূধন-আলিশ্বনের বেলা, দ্বিতীয়বার মুসলমানদের প্রতি অবিচার করিবার প্রসঙ্গে, ও তৃতীয়বার মুসলমান-সমাজ লইয়া উপহাস লেখার কথায় শরৎচন্দ্রের বারবার স্মৃতিবিভ্রম হইতেছে কেন? ‘বাতায়নে’ দেখিতেছি তিনি লিখিতেছেন,—

“লাটসাহেব বলেন, মুসলমানদের গল্প লিখবে। এ কাজ যদি করত পার তা হলে অত্যন্ত ভাল হয়। সাহিত্য নিয়ে আমি কোনদিন হেলেখেলা করিনি।— অজ্ঞ ব্যাপারে হস্ত কণা রাখতে পারি।”

অথচ গত ৩১শে জুলাই তারিখের ষ্টেটসমানে পড়িয়াছিলাম,—

MR. SARAT CHATTERJI

Dacca, July 29.

Mr. Sarat Chandra Chatterji who arrived here yesterday was presented with an address by the staff and students of the Dacca Hall. Replying, Mr. Chatterji said that he intended to devote the rest of his life in depicting Moslem social life which was an important factor in Bengali society.

—Associated Press.

আশ্বিনের 'প্রবাসী'র প্রথম ছবি 'আশ্রম-বালিকা'। গাছপালা দেখিয়া মনে হইতেছে কলিকাতা নয়। কোথাকার আশ্রম? শ্রীচিন্তা-মণি কর করিয়াছেন, আমরা চিন্তা করিতেছি।

পরস্পার প্রতি যাবতীয় প্রেমকে 'কামজ' মনে করিয়া যাহারা শিহরিয়া উঠেন তাহাদের অবগতির জন্ত জানাই, শব্দিত হইবার কারণ নাই। বিচিত্রা-সম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ভাস্কর বিচিত্রায় 'অভিজ্ঞান' উপন্যাসে প্রিয়লাল চৌধুরী মায়কং এক নতন উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন।

(প্রিয়লাল) "কেমন করে যোগাবে যে, মিসেস মুখার্জির প্রতি তার আকর্ষণ কামজ নয়, সে আকর্ষণের সহিত মিসেস মুখার্জির দেহের কোনো সম্পর্ক নেই, একমাত্র যে বস্তুর সহিত আছে তা তার পরলোকগতা স্ত্রীর আকৃতির সহিত মিসেস মুখার্জির আকৃতির বিশ্বজনক সাদৃশ্য।"

স্বতরাং ডক্টর প্রিয়লাল চৌধুরী মিসেস মুখার্জির নিকট হাজির হইলেন। তিনি বাগানে ফুল গাছের পরিচর্যা করিতেছিলেন।

"প্রিয়লাল সত্যতঃ মুখে বললে, "আমি যদি আপনার দশটি গাছের মধ্যে একটি গাছ হতাম মিসেস মুখার্জি, তা হলে আপনার কাঁচির আঘাত থেকে এমন একটি

অকৃত ফুল আপনাকে উপহার দিতাম যাতে শুধু আপনার নিজের মালীই নয়, সারা লক্ষ্যে সহরের মালী আপনার কাছে হার মানত।"

তারপর মিসেস মুখার্জিকে স্ত্রীর ফটো দেখাইয়া প্রিয়লাল বাবু অহরোধ করিলেন,

"মুষ্টিপূজা করে মানুষ যেমন ভগবানকে পাবার চেষ্টা করে, আমিও ঠিক তেমনি ভাবে আপনার দ্বারা সন্ধ্যাকে পাবার চেষ্টা করি। আপনি তা জানেন মিসেস মুখার্জি, শুধু physical পাওয়াই পাওয়া নয়, spiritual পাওয়াও খুব একটা বড় রকমের পাওয়া।"

Spiritual পাওয়াতে আমাদের আপত্তি নাই, কিন্তু কাঁচির খোঁচা খাইয়া ফুল ফোটানটাও কি spiritual?

কিন্তু একথা'র উত্তরে মিসেস মুখার্জি কোনও কথা বলিলেন না, শুক্ক হইয়া বসিয়া রহিলেন।

"অদূর মেইমিনি গাছে একটা ঘুঘু নিরবসর জেকে চলেছিল।"

বুদ্ধিমান ঘুঘু!

প্রিয়লালবাবু কিন্তু বলিয়া চলিলেন—

"আমার প্রার্থনা, একদিনের জন্তে, শুধু একদিনের জন্তে অগ্রগ্রহ করে আমাকে ভাবতে অহমতি দিন যে, আপনি যেন মিসেস মুখার্জি নন,—আপনি যেন সন্ধ্যা।...আপনার হবে মুক অভিনয়। আমার হবে মুখ।"

Spiritualism সব্বো 'সাইলেন্ট' যুগে আমরা বিপদ ঘটিতে দেখিয়াছি, 'টিকি'র যুগের তো কথাই নাই! কিন্তু ইহার পরেও যদি কেহ গাঙ্গুলী মহাশয়কে প্রাচীনপন্থী বলিয়া বাতিল করিতে চান তাহাকে অন্ততঃ ভাষী না বলিয়া আমাদের উপায় নাই।

মধুর ও মোলায়েম হইবার দিকে বাড়ালো লেখক মাজেরই বরাবর একটা স্বাভাবিক প্রবণতা আছে। 'আলী' 'ইমা' 'ইকা' প্রভৃতি যোগ করিয়া রূঢ় ও কঠিনকে মধুর ও তরল করিবার প্রচেষ্টা প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যে প্রচুর লক্ষ্য করা যায়। এককালে 'ইয়া' ছিল—পরকীয়া, সহজিয়া, নিকড়িয়া, নাইয়া, মোহনিয়া, মায় চিরঞ্জীয়ারা পর্য্যন্ত আমরাগকে বাতিবাস্ত করিয়াছিল। ব্রতচারীদের কল্যাণে 'ই-আ'র revival হইলেও সে স্বতন্ত্র ই-আ। নীলিমা, লালিমা, শোনিমা, ঘনিমা, তনিমা, মধুরিমা,—'ইমা'র দিনও প্রায় শেষ হইয়াছে। এখন 'ইকা'র দিন।

—

প্রাচীনকালে গৌড়গণোদ্দেশ্যদীপিকা বা চৈতন্যমঙ্গলকারিকা জাতীয় পুথি ছিল। পদকল্পলতিকায় মহাজন পদাবলী সংগৃহীত হইয়াছিল; পুথিগুলির পুষ্পিকাতে সন তারিখও দেওয়া থাকিত। তখন কুলকামিনীরা শিবিকা আরোহণ করিতেন, স্বর্ণ-পেটিকায় প্রণয়াম্পদের কাছে প্রণয়-লিপিকা প্রেরণ করিতেন; প্রোথিতভক্তৃকা সাহসিকা অভিনায়িকারা গৃহসারিকাকে দাড়িধ্বজ খাওয়াইয়া ঘনরুক্ষ প্রায়ুট নিশায় সঙ্কেতস্থলে যাত্রা করিতেন; ষারী হয় কলিকার টিকায় আঙুন দিয়া গঞ্জিকা সেবন করিয়া বৃন্দ হইয়া থাকিত, নয় নাসিকা-গঞ্জে গৃহ-তোরণ মুখর করিত। প্রেমের তখন দাহিকা-শক্তি ছিল। মারীগুটিকায় আচ্ছন্নদেহা প্রেমিকার কাছে সম্রাসী উপগুপ্ত পর্য্যন্ত আসিতেন; মন্দির-বেদিকার অন্তরালে মদন-নাটিকার অভিনয় হইত; তরলিকা, বকুলাবলিকা, মালবিকারা দূতী ও নায়িকাগিরি করিত। মোটের উপর সে এক অতি প্রহেলিকাময় স্থণের দিন ছিল। মরিয়াও লোকে মণিকর্ণিকার ঘাটে যাইত।

—

পরবর্তীকালে চণ্ডীকাব্যে আমরা গোদিকার সাক্ষাৎ পাই। বাংলা টিকার প্রবর্তনও প্রায় সেই সময়ই হয় এবং কাব্যকার অপেক্ষা টিকাকারের প্রাধান্য ঘটে। তার পর ঊনবিংশ শতাব্দীতে পুরুষোত্তমচন্দ্রিকাকার ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সমাচারচন্দ্রিকার সম্পাদক হইলেন। নন্দকুমার কবিরত্ন নিত্যধর্মাস্তরঞ্জিকা বাহির করিলেন। জ্ঞানদীপিকা, কাশিকা, সত্যধর্মপ্রকাশিকা, ধর্ম্যধর্মপ্রকাশিকা, দূর্বাবর্ণিকা, কাশীবাস্তী প্রকাশিকা, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, স্থলভ পত্রিকা, মাসিক পত্রিকা, বঙ্গবিদ্যাপ্রকাশিকা, মনোরঞ্জিকা, চিত্তরঞ্জিকা, গ্রামবাস্তী-প্রকাশিকা, বামাবোধিনী পত্রিকা, হিন্দুরঞ্জিকা, অবকাশরঞ্জিকা, মাসিক প্রকাশিকা, প্রচারিক, আধ্যাত্মপ্রকাশিকা, বালরঞ্জিকা, ভগবৎতত্ত্ববোধিকা, উৎকলদীপিকা, সংবাদবাহিকা—পর পর যে কত পত্র ও পত্রিকার ঝটিকা প্রবাহিত হইল তাহার ইয়ত্তা নাই। 'ইকা'স্তন্যামা বহু ধর্মমভা ও বিবিধ-পুস্তক-প্রকাশিকা জাতীয় পুস্তক-প্রকাশালয়ে দেশ ছাইরা গেল। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রবেশিকা পরীক্ষা সুরু হইল এবং তাহার পর নাটক ও নাটিকার সংখ্যা এত দ্রুত বাড়িতে লাগিল যে বহুমুখ্য পরিহাস করিয়া লিখিলেন—না টক, না মিটি।

—

তাহার পরেই আমাদের দুঃখের দিন সুরু হইল। আমরা গল্পিকা-সেরীর অধম হইলাম, আমাদের বাসভবনে চামটিকা উড়িল, আমাদের দুঃখে পিপীলিকারা পর্য্যন্ত কাঁদিল। ঠিকা গাড়ীর গাড়োয়ানের মত, পাঁচ সিকায় কেনা বৈষ্ণবীর মত, অথবা নিকা করা বিবির মত অনাদরে আমাদের দিন কাটিতে লাগিল।

—

কিন্তু হইলে কি হয়, সাহিত্যে আমরা অধিকতর মধুর ও মোলায়েম হইয়া উঠিলাম। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কবিতা হইতে চয়ন করিয়া 'চয়নিকা' বাহির করিলেন; 'কবিতা'র কবিতাগুলি লোকের মধ্যে মুখে শোনা যাইতে লাগিল। 'কবিতা' প্রায় সকলের কণ্ঠস্থ হইল। তার পর সবুজ পত্রের যুগে রবীন্দ্রনাথের কথিকা ও গল্পিকাগুলি লিপিকায় স্থান পাইল; গীতবীথিকা, নবগীতিকা, গীতপঞ্চাশিকা বাহির হইল; এবং শেষ পর্য্যন্ত অবস্থা এমনই দাঁড়াইল যে, 'গড্ডলিকা'-লেখক বাঙ্গরসিক রাজশেখর বসু মহাশয় পর্য্যন্ত নিত্যন্ত গদ্যব্যাপার বাংলা অভিধানের নাম 'চলন্তিকা' রাখিয়া ফেলিলেন।

এদিকে বালিকারা পুরানবস্ত্র লেখাপড়া শুরু করিয়াছে, হেঁচুয়া দীপিকায় দুই এক জন সাতারও দিতেছে, বাবুদের বাগান-বাটিকাগুলি জঙ্গলে পরিণত, বোতলে ছিপিকা আর খোলা হইতেছে না, ঘটিকাঘরের দ্বারা আমাদের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রিত হইতেছে; রাসিকা অশ্লীল বিধায় পরিত্যক্ত, শ্রালিকা সম্বোধন আর রসিকারা বরদাস্ত করিতেছেন না—মোট কথা, আমাদের প্রাচীন আচার ব্যবহারগুলি বর্তমানের স্তব্ধকাগুহে হয় সিকায় তুলিয়া রাখা হইতেছে, নয় ব্যাপিকার মত পথে পথে লাক্তিত হইয়া ফিরিতেছে। পত্রিকায় দীপিকা, খায়ে লবঙ্গলতিকা, কবিতায় লালিকা (parody)—ভাষার অঙ্গে যেন ছুরিকা চলিতেছে। ফলে মেটরিয়া মেডিকার প্রয়োগ হইতেছে বেশী, হাড় ভাঙিলে আনিকা, এবং অন্তর্গত অনন্তবটিকা সেবন করিয়া আমাদের রক্তকণিকা ফিকা হইয়া আসিল। শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী সম্পাদিত একখানা 'কালিকামঙ্গল'ও বন্দী-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে বাহির হইয়াছে, 'বিচিত্রা'য় উপেনবাবু বিতংকিকা ও পুস্তকিকা বিভাগ খুলিয়াছেন, সভায় সভায়

কথার মালিকা গাথিয়া লোকে অহমিকার চূড়াস্ত করিতেছে, আধুনিকা সাহসিকারা গোপনে অভিসারিকা না শাজ্জিয়া অতিআধুনিক পত্রিকার লেখিকা ও পাঠিকা হইয়া চিত্তবিনোদন করিতেছেন, জননী এখন আর সম্ভানপালিকা নহেন, কলিকার মালা গাথার দিন চলিয়া গিয়াছে, কুণ্ঠাটিকায় চারিদিক অন্ধকার।

কিন্তু তালিকা বাড়াইয়া লাভ নাই; আমরা বাড়ালী ও বাংলার যুগধর্মের কথা জ্ঞাপন করিলাম। আমাদের আসল বক্তব্য এই যে, যখন এতই চলিতেছে, Anthology যদি চয়নিকা হইতে পারে, Current Usage চলন্তিকা হইলে যদি দোষ না হয়, তাহা হইলে Democracy-ই গণিকা হইবে না কেন?

কোনও একটি 'আধুনিক পাক্ষিক পত্রিকায় এক জন আধুনিক লেখক সম্বন্ধে লেখা হইয়াছে,—

"যা তিনি দেখেন, তাই তাঁর হৃদয়কে ছুলিয়ে দেয়। সেই যোগনই তাঁর সাহিত্য। লেখককেও দোলায়, পড়ুয়াকেও দোলায়।"

সহর ও মফস্বলের মেলাগুলিতে নাগর-দোলার রেণুয়াজ উঠিয়া যাইতেছে, উক্ত লেখকের বইয়ের একটি ষ্টল খুলিলে সম্ভবত দর্শকদের হুং খোচে। লেখকও ছুলিবে, পড়ুয়ারাও ছুলিবে।

মাসিক মোহাম্মদীর ভান্ড সংখ্যায় 'চিন্তাধারা' বিভাগে সৈয়দ এমদাদ আলী সাহেব হিন্দু-মুসলমান প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

"মুসলমানকে অমুসলমান করিবার জন্য বহুদিন ধরিয়া হিন্দুগণ যে চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। আমরা পোষাকে পরিধ্বনে একত্রণ অমুসলমান হইয়া গিয়াছি।"

লেখক ভাষার কথা উল্লেখ করিতে ফুলিয়াছেন। কিন্তু দৃষ্টান্ত তিনি স্বয়ং জোগাইয়াছেন। এই সংখ্যার মোহাম্মদীর প্রথম কবিতা 'আলমুগীর আওরঙ্গজেব'। কবিতাটির লেখক সৈয়দ এমদাদ আলী। ছই পৃষ্ঠার কবিতা, ১০৪ পংক্তি। কবিতার শব্দ সংখ্যা মোট ৬০২। তন্মধ্যে ইসলাম, মুসলিম, মোগল, মুসলমান, আলমুগীর, জিন্দাপীর, দিল্লী, আগ্রা, বাবর, বিজাপুরী ও শিবাজী ১১টি স্থানবাচক ও নামবাচক বিশেষ্য ছাড়া বাকী ৫৯৮টি শব্দ সংস্কৃত তৎসম বা তৎসম্ভব। তৎসম শব্দই পাঁচ শতের অধিক। আমরা এমদাদ আলী সাহেবের ভাষাতেই (মোহাম্মদী গ্রন্থ, ১৩৪৩ পৃঃ ৭৮২) বলি,—

"তাহাদের যে-যবির (?) কথা তাহারা সময়ে অসময়ে আঙড়িয়া আঙড়িয়া লাভ করে, তাহারাও ভাষায় আমি বলি, মুসলমানের 'এ যৌবন জলতরঙ্গ রোখিবে কে?'"

সতাই তো, রোখিবে কে ? হরে মুরারে, হরে মুরারে।

—

নয়া-বাঙালী বিনয়-ইবন(কুমার)-সরকার মালিক-উল্-ইলুম্ (এম-এ) সাহেব(মহাশয়) নয়া হিন্দু ও নয়া মুসলমান বানাইতে খাড়া হইয়াছেন। মালদহে রামকৃষ্ণ শতবাহিনীর ধর্মসম্মেলনে তিনি পাঁতি জাহির করিয়াছেন,—

"১। মুসলমানের ছোঁআ অথবা রান্না খাইলে হিন্দু নরনারীর জাত মারা যাইবে না।

২। মুসলমানের বেটা বিবাহ করিলে হিন্দুপুত্রের জাত মারা যাইবে না।

৩। হিন্দুর বেটার সহিত মুসলমানের বিবাহ হইলে হিন্দু বেটার জাত মারা যাইবে না।

৪। হিন্দু সমাজ বিবাহের নিয়মে সেকালের শাপ ছাড়িয়া একালের সরকারী কাহুন (১৯২৩) মানিয়া চলিতে অভ্যস্ত হউক। এই কাহুনের মোট

কথা নিম্নরূপ,—যে জাত বা সমাজ বা ধর্মের বিবাহ কর না কেন, তোমার নিজের ধর্ম-জলাঞ্জলি দিতে হইবে না।

৫। মুসলমানের ঘরে হিন্দু বেটাকে দু-চার দশ মাস থাকিতে হইলেও হিন্দু বেটার জাত মারা যাইবে না।

৬। এই সকল ক্ষেত্রে কোনো প্রকার "প্রাশস্তিত্ত", "গুচ্ছ", আচার বা সংস্কার আবশ্যক হইবে না।

৭। হিন্দু দেবদেবীর মূর্তিকে মুসলমানেরা ছুঁইলে অথবা অপমান করিলে দেবদেবীর জাত মারা যাইবে না।

৮। হিন্দু মন্দিরে গরু কোর্পাষি হইলেও মন্দিরের জাত মারা যাইবে না।"

কিন্তু এই পাঁতি দেগিয়াই ডর পাইয়া সনাতনী হিন্দুরা যেন বদ্বজ্রবান আরম্ভ না করেন। সরকার মহাশয়ের দিল্ টিক্ আছে। এই একই বক্তৃতায় তিনি কবুল করিয়াছেন,—

"আমার মুখে আর কেন কথা বাহির হইতে পারে ? বিগবিজয়ের কথা লইয়া জন্মিয়াছি, সেই বিখিজয়ের কথাই পাইব। হিন্দুধর্মের বিখিজয় আজ আমার মুখা।...

"সমগ্র ভারতবর্ষ আরা, সনাতন বা হিন্দুধর্মের তাঁবে আঁসিয়াছে : ভারতের বাহিরে — উত্তর-দক্ষিণ-পূব-পশ্চিম,—চারদিকে তামাম এশিয়ায় হিন্দুধর্মের এক্তিয়ার কার্যে হইয়াছে।"

উদ্ভোদিত্তে বাত করিলেও সরকার মহাশয়ের হিন্দুদ্বানী কমে নাই, ইহা তামাম হিন্দুই ইয়াদীকিদি। মুসলমানও হয়ত বলিবেন, "হকের ফতে অবশস্তাবী ; সরকার সাহেবের থলে হইতে বিল্লী নিকালিয়া আসিল।"

—

একটি পাহাড় বা টিলা, অতিক্রম করিলেই 'শুজ বোয়াম অপরিমাণ' — তাহার উপর একটি শিকড়হীন নিম্পত্র গাছ সোজা দাঁড়াইয়া ম্যাজিক দেখাইতেছে এবং উপরের দিকে বহু বিচিত্র ডঙ্গীতে ঝাঁকিয়া

শাখা উপশাখার অবস্থা পার না হইয়া শিরা উপশিরার ভেদে খেলাইয়া রক্তবর্ণ ফুলে পরিণত হইয়াছে। পুষ্পযুক্ত আড়াইটি পাতা একস্থানে ভিড় করিয়া বসিয়া আছে। নীচে রক্তবসন ও শ্বেত উত্তরীয় শোভিতা একটি সীওতাল মহিলা হাতে মুখ ঢাকিয়া সম্ভবত স্তনভারে ধমকের মত বাকিয়া মাথায় সাধা ফুল গুজিতেছে। পাশে একটা কলসী। ইহাই ভ্রমের 'প্রবাসী'র শ্রীপদ্মোৎসবের সেন অঙ্কিত 'পুষ্পভরণ'। পানিয়া ভরণ নয়, এবং দড়িটিও সম্ভবত তুলকমে শিল্পীর হাতেই রহিয়া গিয়াছে।

ব্রাহ্মসমাজের মূখপত্র 'প্রবাসী' পত্রিকায় 'চণ্ডীদাস-চরিত' নামক বিংশ শতাব্দীতে রচিত সত্যাক্ষরী কাব্য কবি চণ্ডীদাসের জীবনোতিহাসের উপাদান স্বরূপ ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত হইতেছে। পৌত্তলিকতার এমন জয়গান নিরাকারবাদীর মুখে আর কখনও এমন ভাবে শোনা যায় নাই। জিলা-অন্ধ হইয়া রামানন্দবাবুর মত প্রবীণ ও পণ্ডিত ব্যক্তি যদি এই সকল কার্যে সাহায্য দিতে পারেন, তাহা হইলে ধর্ম্মাঙ্ক হইয়া লোকে মাছুষ খুন করিবে তাহা আর বিচিত্র কি? আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস তিনি এই মহাকাব্যপাণি এখনও পড়িয়া উঠিতে পারেন নাই।

'শ্রীপদ্মোৎসব'তে অশ্লীলতা আছে কিন্তু সে-সকল নিঃসন্দেহে মহাজনকৃত অশ্লীলতা। রামানন্দবাবু এ পুস্তক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াইবার উপযুক্ত নয় বলিয়াছেন। কিন্তু আধুনিক অক্ষম কবি রচিত নকল অশ্লীলতাকে তিনি কি করিয়া স্ব-সম্পাদিত পত্রিকা-পৃষ্ঠায় স্থান দিতেছেন তাহা বুঝা কঠিন।

স্বরত বিবা-খামিনী ব্রজকি কুল-কামিনী

লম্পট নিলজ ভ্রাম পেথি।

তপন-তনয়া-তটে রহসি রহি নীরবে

গোপিনীর হরিল পিঙ্কন।

তোমার মদন-মোহন।

—প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩৪৩—৩২৭ পৃ.

এখানে বাঁকা কথাটি বাদ দিয়া কবি কিঞ্চিৎ অশ্লীলতা বর্জন করিলেও আশা করি 'প্রবাসী' সম্পাদক মহাশয় নিজ পরিবারে স্থর করিয়া ইহা পঠিত হইতে দিবেন না।

'য' স্থলে 'এ' দিয়া হালের লেখাকে প্রাচীন করা খুব কঠিন নয়, কিন্তু 'প্রবাসী'র পৃষ্ঠায় পীরিত্তির বান ছোটান! বলিতে হইবে শ্রীযুক্ত সত্যাক্ষর সাহান্না অখনট ঘটাইয়াছেন।

তুই কপটে টাদের অমিআ কপটে আনিএা চানিএা

তুই কপটে রাধার কোমল পরাণে ছুটালি পীরিত্তি বান।

... ...

হায় ঝু একি করিলি কুব্জার সনে মহিলি

ছি ছি কোন লাজে তুই করিলি রাধার পীরিত্তের অপমান।

আমাদেরও এই প্রশ্ন।

সাময়িক পত্র লোকশিকার কাজ করিয়া থাকে। 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ' মারফৎ শ্রীযুক্ত নিতানারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রবন্ধগুলি হইতে আমরা বলশেভিক ও কমুনিষ্ট রাশিয়ার একটি পরিচয় পাইয়াছিলাম। শিকার সঙ্গে সঙ্গে লোভও হইয়াছিল, সুযোগ ও সুবিধা থাকিলে একবার ঘুরিয়া আসিতাম।

সেই 'প্রবাসী'ই (ভাত্র, ১৩৪৩) শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার, এম-এ, পি এইচ-ডি, বার-এট-ল মারফৎ আমাদিগকে অল্প কথা শুনাইতেছেন—

"কমানিষ্টরা এক্ষণে রাশিয়ায় বাহ্য করিতেছেন তাহা কেবল শক্তিসাধক কল্পিত গল্পের জোরে নিজেদের মত জনসাধারণের উপর চাপাইতেছেন। ইহা খেচ্ছা-চারিতাই, লোককে বুকাইবার চেষ্টা নহে। ইহাদের এই খেচ্ছাচারিতা বা ব্যস্তিচার নানা ক্ষেত্রেই সূত্র হইয়া উঠিয়াছে।"

'প্রবাসী' ঠিকই আছে, নিস্তানারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ই কি Writers' Buildings রূপ বকবন্ধে পরিশ্রুত (distilled) হইয়া যতীন্দ্রকুমার মজুমদার হইয়াছেন? আমরা গরীব লোকের বড় ভাবিতেছি।

রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা'র কাব্য বানাইয়া উদরস্থ করিয়া শ্রীহরেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয় ভাষ্যের 'প্রবাসী'র পৃষ্ঠায় কলকণ্ঠে আমাদের 'আজ্ঞান' করিয়াছেন। তাহার ইচ্ছা আমরা

বাধাবন্ধহারা

ছুটে যাই উদ্গাদের পারা।

কিন্তু 'উদ্গাদের পারা' বলিয়া কবি বিনয় করিতেছেন কেন?

রবীন্দ্রনাথের 'শব্দতত্ত্ব' ও রামেন্দ্রচন্দ্রের 'শব্দকথা'—ঠক্কট, কনকন, তরুতরু, ছলছল্ জাতীয় অনেক ধ্বনিবাচক শব্দের সন্ধান বই ছুটিতে পাওয়া যায়। ভাষ্যের ভারতবর্ষে 'মণিবাগ' গল্পে নূতন একটি শব্দের সন্ধান পাওয়া গেল।

অনিমেয় বৌদি এবং এক বান্দবী (ব্যারিষ্টার-কন্ডা) ডালিয়াকে লইয়া থিয়েটার দেখিতে গিয়াছে।

"ডুপ উঠতেই বাইরের বাতি নিভে যায়;...অভিনয় দেখার চাইতে নভেলী চংএ একটা অভিনয় করার ভক্ত মন তার পিস-পিস করতে থাকে।"

বাতি-নেবা অন্ধকারে বান্দবী ডালিয়ার সামিথো হাত নিস্পিস করিলেই ধনি স্বাভাবিক হইত। কিন্তু মন—পিস-পিস? কথায় বলে, মন-না-মতি!

বর্তমান 'ভারতবর্ষে' আধুনিকতার আবির্ভাব দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। এতকাল 'ভারতবর্ষের' মলাটে শুধু চিত্রে আদমমুখারী বা বাংলার সকল লোকের চিত্র ক্রমান্বয়ে দেখিয়া আসিতেছিলাম। কয়েক মাস হইল এই রিপোর্ট সম্পূর্ণ হইয়া মণ্ডিয়ায় 'ভারতবর্ষ' 'কভার ডিজাইনে' মনোনিবেশ করিয়া বাংলার পাঠকের রুতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। বর্তমান মাসে মাঁচির আকাশে ঘনঘটা করিয়া একটি তিনকোনা মেঘের সমাবেশ দেখিয়া আশা হইল যে অচিরে উক্ত মেঘের চতুর্দিকে বারিবিম্ব সিকনে "হেঙ্গাগন" "পেণ্টাগন" ও "অক্টাগন" জাতীয় বৃক্ষলতাদিতে 'ভারতবর্ষের' ল্যাওয়েপ হৃদয় হইয়া উঠিবে। দখ 'প্রবাসী'র প্রভাব! 'মো পয়জন' কিন্তু ঠিক ধরিয়াছে।

গত সংখ্যার প্রসঙ্গ কথায় শ্রীমতী শ্রামলীয়া চাট্‌থোর বিরুদ্ধে একটি পত্র পাইয়া আমরা কিছু মন্তব্য করিয়াছিলাম। শ্রীমতী চাট্‌থো আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া একপত্রে লিখিয়াছেন যে 'মৌন জীবনে নারী ও নর' প্রবন্ধটি তিনি ছই বৎসর পূর্বে রচনা করিয়াছিলেন কিন্তু রুজাপি ছাপিতে দেন নাই। তাহার মাষ্টার মহাশয়ের বন্ধু সেটি পড়িতে

লইয়া গিয়া ফেরত দেন নাই। প্রবন্ধটি কোথাও প্রকাশিত হইয়া থাকিলে তাহার অজ্ঞাতসারেই তাহা ঘটিযাছে।

বর্ষ শেষ

এই সংখ্যায় 'শনিবারের চিঠি'র অষ্টম বর্ষ শেষ হইল। কাঠিক হইতে নবম বর্ষ আরম্ভ হইবে। নূতন সংখ্যা আশ্বিনের ২০শে (ইংরাজী ৬ই অক্টোবর) তারিখে প্রেরিত হইবে। আশ্বিনে যাহাদের চান্দা শেষ হইবে তাহারা যদি তৎপূর্বে বাষিক মূল্য ৩০ ডাকযোগে অগ্রিম পাঠাইয়া দেন তাহা হইলে তাহারা ভি. পি.র দরুন অতিরিক্ত খরচ হইতে অব্যাহতি পাইবেন। যাহারা আগামী বৎসর গ্রাহক থাকিবেন না তাহারা অল্পগ্রহপূর্বক চিঠি দ্বারা জানাইলে বাঞ্ছিত হইবে। যাহারা টাকা পাঠাইবেন না, চিঠিও দিবেন না, তাহাদের নামে কাঠিক সংখ্যা ভি. পি. তে প্রেরিত হইবে।

কম্প্রাধ্যক্ষ, শনিবারের চিঠি

চা-এর ব্যুৎপত্তি

একই জিনিষ মহাচীন হইতে আমদানি হইল—ইংরাজীতে হইল "Tea (টা)" আর বাংলায় হইল "চা"। ভাবিতে লাগিলাম একই জিনিষের এইরূপ বিভিন্ন নামকরণ হয় কেন? ইংরাজের জিহ্বাতে আর বাঙ্গালীর জিহ্বাতে কি এতই পার্থক্য যে একই চীনে কথার এইরূপ উচ্চারণ পার্থক্য হইল?

সম্ভ্রুতি কোন কাথ্যাব্যপদেশে মহাচীনের কোয়াংটং—যাহা ইংরাজী ভূগোলে বা মাপে Canton বলিয়া উল্লিখিত হয় ও ফু: চু: (Foochow) শহরে গিয়াছিল। ফু: চু:র চীনারা চীনদেশের "চীনে বাঙ্গাল"—তাহারা চীনের সভ্য ভাষা ভাল উচ্চারণ করিতে পারে না। কোয়াংটংয়ের সভ্য চীনারা যে জিনিষকে "ছা: া:" বলে ফু: চু:র অসভ্যরা তাহাকে "তা: া:" বলে। আর এই ফু: চু:র চীনারা ফেরি করিয়া ঐ ভ্রাবটি মোচার পোট গীজদের বিক্রয় করিল। উহার উহাদের ভাষায় বা জিহ্বায় নামকরণ করিল "তা"। ইংরাজরা উহাদের নিকট হইতে ধার করিয়া উচ্চারণ করিল "তে"—ইংরাজ কবি পোপ লিখিলেন:—

O thou great Anna ! whom three
realms obey,
Sometimes dost thou take Counsel
and sometimes tea"

কিন্তু ইংরাজ যতই চা পান করিতে লাগিল, জিহ্বার জড়তা ততই বাড়িয়া যাইতে লাগিল। উহার এক্ষণে চাকে "চা" বলিয়া উচ্চারণ করে।

কোয়াংটংয়ের "ছা: া:" মহামুনি বিশিষ্টের সহিত কামরূপে প্রবেশ করিয়া "চা"রূপ ধারণ করিল। আমরা বাঙ্গালীরা যে চা প্রথমে পাইতে শিখি তাহা কামরূপ হইতে আনীত চা—সুতরাং উহার "চা" নামই বলবৎ রহিল। এই হইল বাংলা 'চা'-এর ব্যুৎপত্তি। আমাদের কথা যদি স্মৃতিবাবুর ভাল না লাগে তাহা হইলে তিনি শীঘ্রই ইহার প্রতিবাদ করিয়া শনিবারের চিঠি মারফৎ জানাইবেন। ইতি

পরিচয় ও বিজ্ঞাপনী

[ভবিষ্যতে 'শনিবারের চিঠি'তে সমালোচনার জন্য কেহ পুস্তক পাঠাইবেন না। কোনও পুস্তক সম্বন্ধে কিছু বলিবার প্রয়োজন হইলে আমরা নিজেরাই সেগুলি সংগ্রহ করিয়া লইব।]

গোবিন্দদাসের কল্পচক্র—শ্রীমণ্ডলকান্তি ঘোষ ভক্তিবৃন্দ প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীহচার্যকান্তি ঘোষ। ২নং আনন্দ চাটুয্যের লেন, কলিকাতা। পৃ: ১৫৬, মূল্য ১০ আট আনা।

ইংরাজী ১৮৯২ সালে শান্তিপুত্রের জয়গোপাল গোপালী মহাশয় 'গোবিন্দদাসের করচ' নামে বিদ্যা একখানা কবিতার বই প্রকাশ করেন। বইখানা ভাল বলিয়াই লোকে ধরিয়া লয়। হুতরাং বইখানা ভাল বিক্রি হয় না।

দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর পরে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের মাধ্যম কঠোর ভাষিরা এক প্রকাণ্ড ভূমিকা সহ ১৯২৬ সালে হঠাৎ গোবিন্দদাসের করচের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিয়া যলেন।

রাঘবহাছর ব্রহ্মচর্য বইএর পাঠ সম্বন্ধে জয়গোপালের রচনাই রাখিলেন। কিন্তু ভূমিকায় ভাষ্যতা দিলেন ভীষণ। সে কি গবেষণা। কোরাণ পুরাণ কিছু আর থাকি রহিল না। বিদ্যালয়ের কি কেহ মাথা মুকলি নাই? এই রকমের আবর্জনার পিছনে পরমা বরত করিতে এতটুকু সজোচবোধ হইল না—টহাই আশ্চর্য।

বাঙ্গালার বৈষ্ণব সম্প্রদায় প্রায় সকলেই গরীব; তাহাদের মধ্যে বাঁহারা পরমাওয়ালা, তাহারা উদাসীন। হুতরাং মাত্র গণা রায়বাহাদুর ও তাঁর পুত্ররক্ষক বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে বড় একটা কেহ কথা কহিতে পারিবার না। কিন্তু এত দিনে দেখিতেছি ভগবান মূখ ভূমিকা চাহিয়াছেন। বৈষ্ণব-সম্প্রদায় অজ্ঞান শ্রীমুখ মণ্ডলকান্তি ঘোষ ভক্তিবৃন্দ

মহাশয় সম্প্রতি করচা রহস্ত প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে রাখিয়াছেন। তিনি দীর্ঘজীবী হউন।

ডাক্তার ব্রহ্মচর্যের ভূমিকার উপযুক্ত মূল্যের এই করচা রহস্ত। প্রবীণ, বৈষ্ণব-সাহিত্যানুগামী হলেখক ভক্তিবৃন্দ মহাশয় অতি হৃদয় তর্ক-যুক্তিধারী একটা প্রমাণ প্রয়োগে প্রতিপন্ন করিয়াছেন কবিতাগুলি জয়গোপালেরই রচনা। গোবিন্দ কাম্যার বলিয়া কোন লোক ছিল না। বাঙ্গালী সাহিত্যে ভাল প্রতাপটাদের কাহিনী কেমন মনোরমের পাচার হইতেছিল, পাঠক করচা রহস্তে তাহার সন্ধান পাইবেন।

ভারতীয় ব্যাপ্তি ও আধুনিক চিকিৎসা

১ম খণ্ড। শ্রীপদ্মপতি ভট্টাচার্য ডি. টি. এম. সম্বলিত। দ্বি বৃক কোম্পানী লিমিটেড ৪৩ বি, কলেজ স্টোরার, কলিকাতা। পৃ—১+৭২৮+১৬; মূল্য ৬/-।

ইংরেজী ১৮৪৯ সনে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্রথম বাঙ্গালী ছাত্রদের অন্ততম হুবিপাত মধুসূদন গুপ্ত মহাশয় বালাভাষায় 'গুপ্ত ফার্মাকোপিয়া অর্থাৎ ইংলণ্ডীয় গুণ্য কল্লাবলী' নামক এক পুস্তক প্রকাশ করেন। তাহার পর বিগত ৬৭ বৎসরের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সমস্ত বহু চিকিৎসা-গ্রন্থ বাংলায় রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু লেখার দোষেই হউক, অথবা যে কারণেই হউক বাংলায় লেখা কোনও চিকিৎসাগ্রন্থই জনসাধারণের নিকট বিশেষ আদৃত হয় নাই।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আলোচ্য গ্রন্থখানিকে সর্বসাধারণ সমাদরের সহিত গ্রহণ করিবেন। গ্রন্থকার ডাক্তার পদ্মপতি ভট্টাচার্য মহাশয় বহু হুসাহিত্যিক এবং হলেখক। সরস এবং প্রাঞ্জল ভাষায় তাহার গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে সর্ববিধ অর ও তাহার বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা সম্বন্ধে বিশদ বর্ণনা দিয়াছেন। এই পুস্তকখানি চিকিৎসক এবং অচিকিৎসক উভয় সম্প্রদায়েরই প্রভূত উপকারে লাগিবে। অজ্ঞানিত মেয়েরা পৃষ্ঠায় বইখানি পড়িয়া বুঝিতে পারিবেন এবং পারিবারিক চিকিৎসার কাজে লাগাইতে পারিবেন। গ্রন্থকার নিবেদনে লিখিয়াছেন, "এই পুস্তকে যৌক্তিক তথ্য বাস্তব করা হইয়াছে তাহা সুপ্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক সত্য, হুতরাং নিঃসন্দেহ গ্রহণযোগ্য। ইহাতে অসম্পূর্ণতা

ধাকিলেও অতিশয়োক্তি নাই। বস্তুতঃ ইহা কেবল চিকিৎসা-পুস্তক হিসাবে রচিত নহ, আধুনিকযুগের ব্যাধি-বিজ্ঞান হিসাবে রচিত।.....এই পুস্তকে নানাজগ জায়েরটরি-পরীক্ষার দ্বারা রোগনির্ণয়ের উপায় সকল যথারীতি বর্ণিত হইয়াছে এবং কোন পরীক্ষার দ্বারা কোন রোগ চিনিতে কিরূপ সাহায্য পাওয়া যায় তাহা বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে।"

এই গ্রন্থের সুখণ্ড লিখিয়াছেন ডাক্তার নীলরতন সরকার এবং ভূমিকা লিখিয়াছেন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বইখানির মূল্য ইহা দ্বারা ই উপলব্ধি হইবে।

রোগের বীজ, রোগের বাহন, রোগের ক্ষেত্র, অর পরিচয়, অর চিকিৎসার সাধারণ বিধি, ম্যালেরিয়া, ত্র্যাকওয়াটার ফিবার, কালাজ্বর, টাইফয়েড, কোলাই বীজাণুর অর, ট্রেপটোককাস্ কর্তৃক বিধ্বস্ত অরাদি, ষ্ট্যাফিলোককাসজনিত ব্যাধি, রিউমাটিক ফিবার, ডেব্রু, সন্ধি কামির অর ও নিউমোনিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা, মেনিঞ্জাইটিস, বসন্ত রোগ, কাইলিয়ার অর, ইডুর কামড়ানোর অর, হীট-ট্রেক্স—ইত্যাদি বহু বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

বাংলার ঘরে ঘরে এই পুস্তক রক্ষিত ও গঠিত হওয়া আবশ্যিক। আশা করি এই গ্রন্থ আদৃত হইবে।

সচিত্র বিশ্বকোষ ২য় সংস্করণ, ২৬—৫০ সংখ্যা, দ্বিতীয় ভাগ। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীনেগেন্দ্রনাথ বহু সিদ্ধান্তবারিধি সঞ্চলিত, বাধাই মূল্য ১০/-, প্রতি সংখ্যা ৫/-।

এই বহুখ্যাত ও বহু ব্যবহৃত পুস্তকের নতুন সমালোচনার আবশ্যক নাই। জীবনের শেষ সীমান্তে আসিয়া, নানা শোকতাপকে অতিক্রম করিয়া প্রাচ্যবিদ্যার্নব মহাশয় যে ঐ উজ্জ্বলের সহিত বিশ্বকোষের ২য় সংস্করণ সম্বলন ও সম্পাদন করিতেছেন তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়। দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থের আয়তন বাড়িতেছে, প্রত্যেক বিষয়ের প্রবন্ধ সমস্ত তথ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইতেছে এবং বিশেষ বিশেষ বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ প্রবন্ধ লিখিতেছেন। আশা করি প্রাচ্যবিদ্যার্নব মহাশয় দীর্ঘজীবী হইয়া এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিবেন। ১ম সংস্করণ বিখ্যাত বাংলায় গৌরব ছিল, দ্বিতীয় সংস্করণেও তাহার সেই গৌরব অব্যাহত থাকিবে।

বাক্সলীর সার্কাস—অবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসু, পাবলিসিটি ষ্টুডিও,

৩৬৭নং অপার চিৎপুর রোড। মূল্য ১০/-।

এই সচিত্র পুস্তকখানি পড়িয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। বোসেস সার্কাসের সহিত আমরা আবার পরিচিত। গ্রন্থকার বোসেস সার্কাসের প্রতিষ্ঠাতা প্রিয়নাথ বহু মহাশয়ের পুত্র, হতারা এই পুস্তকে আমরা বহু জ্ঞাতব্যতথ্যের সন্ধান পাইতেছি। ব্যায়াম বিভাগেও যে কৌশলপ্রাণ বাঙালী যথেষ্ট কৃতিত্ব অর্জনে সক্ষম এই পুস্তক পাঠে তাহা আমরা জানিতে পারি। ইহাতে অনেক আশার কথা আছে।

আফিমের ফুল—অনিরুদ্ধ রায়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। মূল্য ২/-।

ঔষধসাধানি না বিটেকটিভ, না রোমাণ্টিক—সম্পূর্ণ নতুন ধরণে লিখিত। একঘেয়ে বাঙালী জীবনেও যে বৈচিত্র্য সম্ভব তাহার করণও আশাশ্রয়। লেখার কৌশলে মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, বুদ্ধি সত্য ঘটনার বিরূপ পড়িতেছি। ইহা ক্ষমতার পরিচায়ক।

নতুন কবিতা—হরপ্রসাদ মিত্র, বসন্তকুমার গদ্যোপাধ্যায় ও অমিয়কুমার গদ্যোপাধ্যায়। মূল্য ১০/-।

বইখানিতে তিন জনের লেখা ১৪টি কবিতা আছে; প্রেমেন্দ্র মিত্র, জীবনানন্দ দাশ ও মুদ্রদেব বহুকে বইটি উৎসর্গীকৃত। রাত্রির অন্ধকার এখনও তিরোহিত হয় নাই, ভোরের পানীরা কীর্ণকণ্ঠে ডাকিতে চাহিতেছে।

টাকাকড়ি—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ, এম-এ, বি-এল। চক্রবর্তী চট্টাঙ্গি এণ্ড কোং লিম্। মূল্য ১৫/-।

দরিদ্র দেশে টাকাকড়ির কথা যত বেশী আলোচিত হয় ততই ভাল। রবীন্দ্রবাবু এই আলোচনা মূলীয়মান সহিত করিয়াছেন।

চিত্তাশ্রাবী—শ্রীবিপ্লবনাথ ভট্টাচার্য। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। মূল্য ২/-।

চিত্তাধারা ধার করা চিত্তা নয়। এ ধরণের musings বাংলা সাহিত্যে বড় বেশী নাই। পড়িতে পড়িতে আত্মবিস্মৃত হইতে হয়, অথচ নিজেকে মনে পড়ে।

এগারোই ফাল্গুন—হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। কমলা
পাবলিশিং হাউস। ২৭, কলেজ স্ট্রীট। মূল্য ১।০।

বাংলার অতি-আধুনিক কথাসাহিত্যের প্রচণ্ড উন্নতির মধ্যে এই গ্রন্থ উপস্থাস্থান
আমাদিগকে যে আরাম দিয়াছে গ্রন্থকারকে সেজন্ত ধন্যবাদ না দিয়া পারিতেছি না।
মহিম ও রমলা চরিত্র দুইটিকে গ্রন্থকার লিপি-কৌশলে অপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন।
গ্রন্থপাঠের সঙ্গে সঙ্গে 'এগারোই ফাল্গুন' আমাদের মনেও বিশেষভাবে চিত্রিত হইয়া যায়।
সরোজিনীর কঠোরতা, মেনকার দৃঢ়তা, ফলে পিতার মৃত্যুশয্যা মহিমের সহিত বাগবদ্ধ
রমলার কিরণের সহিত বিবাহ। কিরণের সমস্ত কলুষ মহিমের তাগ ও রমলার প্রেমে
নিশেষে হুইয়া গেল। পড়িতে পড়িতে সমবেদনার হৃদয় ভরিয়া যায়।

DWARKIN'S HARMONIUMS



হারমোনিয়ম কিনিতে হইলে ডোয়াকিনের হারমোনিয়মই আপনার
কেনা উচিত। ডোয়াকিনই হাত হারমোনিয়মের আবিষ্কারক এবং
এই যন্ত্রের বাহা কিছু উন্নতি এ যাবৎ হইয়াছে তাহা ডোয়াকিনের
বাড়ী থেকেই উদ্ভূত।

বাজারের জিনিষ ২৪ টাকা কম দামে অবশ্য পাইতে পারেন কিন্তু
তাহা ডোয়াকিনের জিনিষের মত নির্ভরযোগ্য কখনই হইতে পারে না।

সচিত্র মূল্য তালিকার জন্য লিখুন।

DWARKIN & SON, 11, Esplanade, Calcutta.

শনিরঞ্জন প্রেস, ২৪½ মোহনবাগান রো', কলিকাতা হইতে

শ্রীপ্রবোধ দাস মুদ্রিত ও প্রকাশিত।